"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

গোধূলি মন

॥ এই সংখ্যায় ॥

O প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি মন O

O আপনার প্রেরীত গোধূলি মন (২টি) পুজা-সংখ্যা সহ পেয়েছি। পুজাসংখ্যার প্রচ্ছদ ও অন্যান্য সংযোজন আমার খুব ভাল লেগেছে। পত্রিকাটির চেহারাই ব্যক্ত করে তার সাংস্কৃতিক আবেদন। ছোট গল্পগুলির পরিসর এতো ছোট বলেই হয়তো আরো ভাল লাগে। কবিতার সংযোজন অনবদ্য। ছোট ছোট প্রবন্ধগুলি যথেষ্ঠ মননশীলতার পরিচয় বহন করে। সত্যি, সুরুচিপূর্ণ হয়ে উঠেছে পুজাসংখ্যাটি। শিল্পী সৌমেন অধিকারীর আঁকা প্রচ্ছদটি খুব সুন্দর মানিয়েছে গোধূলি মনের পুজা সংখ্যায়। দেরিতে হলেও জানাচ্ছি গোধূলি মন মহিলা সংখ্যাটির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সে সংখ্যাটিও স্মরণীয়। আপনাদের যে সংখ্যাটিতে অজিত রায়ের 'ক্ষুধিত প্রজন্মের কবি ও কবিতা' প্রকাশিত হয়েছে সেই লেখাটি পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করছি। কারণ, আমাদের পত্রিকায় 'হাংরি জেনারেশন' নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা আছে। এ সম্পর্কে কিছু প্রবন্ধ পেয়েছি (মহাদিগন্ত পুজা সংখ্যা) পেয়েছি। আপনি যদি আরো কিছু প্রকাশিত বিষয়বস্তু সমীর বাবুর কাছে দিয়ে দিতে পারেন, ভাল হয়।

গজেন্দ্রকুমার ঘোষ
সুর্টে, সুইডেন

* * * * * *

O মাঝে মাঝে আপনার 'গোধূলি মন' পাই। মাঝে মাঝে বললাম, কারণ 'আবু সয়ীদ আইয়ুব' সংখ্যা বা সে রকম বিশেষ সংখ্যা একটাও পাইনি। তবু বলি, আপনার সম্পাদনা পরিচ্ছন্ন। লিটল ম্যাগাজিনের একজন যোগ্য সম্পাদক হিসাবে মেনে নিতে পারি। জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১ সংখ্যায় অজিত রায়ের 'ক্ষুধিত প্রজন্মের কবি ও কবিতা' আলোচনাটি নির্বাচন ও প্রকাশের জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাই। ইতিমধ্যে কুচবিহার থেকে '.বিট' পত্রিকায় এবং এবং দীপঙ্কর রায়ের 'পথের পাঁচালী'র দ্বাদশ সংকলনে হাংরি জেনারেশন সংক্রান্ত কিছু কিছু লেখা চোখে পড়েছে। কিন্তু অজিত রায়ের লেখা সব দিক থেকে স্বতন্ত্র, উজ্জ্বল এবং অনেকটা নিরপেক্ষ।

আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি আদর্শগত, গুণগত বা মাত্রাগত পর্যায়ে হাংরি আন্দোলন নকশাল আন্দোলনের ধারে কাছে পৌঁছোয়না। বাংলা সাহিত্য প্রথা ভেঙে প্রাতিষ্ঠানিক বিরোধীতায় কিছুই হতে চায় না, হাংরি তাই ব্যতিক্রম—কিন্তু খুবই ছোট মাপের। সুরুতে পুলিশ এবং শুচিবায়গ্রস্থ বাঙালী এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছেন এখন আবার বুদ্ধিজীবীরা স্মৃতিচারণায় তিলকে তাল করে ফেলছেন। তবে সম্পাদকের দায়িত্ব থাকে মূল্যায়ণের পর্যালোচনার। সে দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন। তবে অজিত-বাবুর সুচনা অংশের সঙ্গে সিদ্ধান্তের স্ব-বিরোধ আছে। এমন-কি রবীন্দ্র বিরোধীতায় কল্লোলগোষ্ঠী যে সফল ভূমিকা নিতে পেরেছিল, যে সৃষ্টিকর্মের নমুনা প্রদর্শন করেছিল, তার সঙ্গে তুলনা করলেও হাংরি আন্দোলন'কে অকিঞ্চিৎকর বলতে আমরা বাধ্য।

অজিতরায়ের প্রবন্ধের আর একটি বৈশিষ্ট্য শক্তি-সুনীল তথা এ্যাসটাবলিসমেন্টের যথাযথ সমালোচনা।

আপনাকে আমার অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি শেষ করছি।

অজিতেশ ভট্টাচার্য
শিবতলী কমপ্লেক্স, বালুর ঘাট পশ্চিমদিনাজপুর

* * * * * *

O প্রীতিময়েষু,

আপনার পুরস্কার প্রসঙ্গে আমি আনন্দিত। আপনাকে অভিনন্দন, আন্তরিকভাবেই। সেই সঙ্গে 'উত্তর প্রবাসী' কর্তৃপক্ষকেও প্রীতি

সোফিওর রহমান
তেরপেখিয়া, মেদিনীপুর

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি-মন

২৭ বর্ষ/১ম সংখ্যা
মাঘ/১৩৯১

প্রতি সংখ্যা দেড় টাকা
বার্ষিক (সডাক) পনের টাকা

সম্পাদকীয় ঃ

॥ প্রজাতন্ত্র, শীত ও বইমেলা ॥

আমাদের ৩৫-তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালনের উৎসবে যখন আমরা সামিল হতে চলেছি—ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে—অনেক বিপর্য্যয়। আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী—যাঁর নিরাপদ ছায়ায় নিশ্চিন্তে বাস করছিলাম আমরা··অকালে তাঁকে হারাতে হোল। নেহরুর জীবিত অবস্থায় যেমন প্রশ্ন উঠেছিল--নেহরুর পর কে ? ইন্দিরাজীর জীবিতকালেও তাঁর সম্ভাব্য উত্তরাধীকারী নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছিল। অবশেষে আন্তর্জাতিক যুববর্ষে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীত্বের পদে বসেছেন শ্রীরাজীব গান্ধী। দেশ শাসনে তিনি কতটা সফল, কতটা ব্যর্থ—সে মূল্যায়ণের সময় এখন নয়। আমরা অপেক্ষায় থাকবো। ৩৫-তম প্রজাতন্ত্র দিবস ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে নতুন সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির সূচনা করুক।

এদিকে উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে শীত কামড় বসাচ্ছে মাঝে মাঝে। গঙ্গাসাগর থেকে পূণ্যস্নান সেরে ফিরে এসেছেন পূণার্থীরা। কোলকাতার রাস্তা থেকে উধাও বাসেরা ধীরে ধীরে আবার ফিরে আসতে শুরু করেছে।

পাবলিশার্স এণ্ড বুক সেলার্স গীল্ডের উদ্যোগে এবারের বইমেলার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। ৩০শে জানুয়ারী থেকে ময়দানে জমিয়ে আসর বসছে। এবারে ছোট পত্রিকাকে মাত্র দেড়শো টাকায় টেবিল-স্থান দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন কর্তৃপক্ষ। প্রতিবারই বইমেলায় অনেক মানুষ খোঁজ করেন 'গোধূলি-মনের ষ্টলের। প্রতিবারের মতো এবারেও তাঁরা হতাশ হবেন। আমাদের লোকবল নেই। ষ্টল চালানোর মতো। সন্দীপ দত্তের 'পত্রপুটে'র ষ্টলে এবং জাগরী' সম্পাদক অপূর্বকুমার সাহার ষ্টলে আমরা থাকার চেষ্টা কোরব।

অশোক চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক
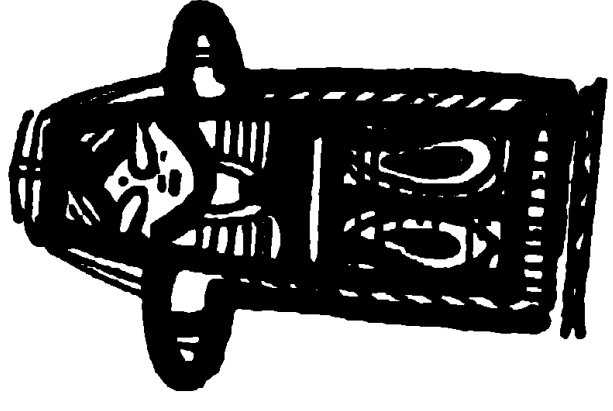
১৯৮৪ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ঃ জারোশ্লাভ সাইফার্ট
(Jaroslav Seifert)

পঙ্কজকুমার ঘোষ

১৯৮৪ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারটি পেলেন জারোশ্লাভ সাইফার্ট। চেক সাহিত্যে তিনি সুপরিচিত কবি। বহির্জগতে তিনি সুপরিচিত না হলেও অপরিচিত নন। ইংরেজী ও জার্মান ভাষায় তার কিছু অনুবাদ আছে।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার এবার পাবেন বলে যাঁদের নাম নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে প্রচার হচ্ছিল—তাঁদের মধ্যে সাইফার্ট নামটি ছিল না। গৌরবের বিষয়, ১০ই অক্টোবর রেডিওতে ১৯৮৪ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাবার সম্ভাবনা নিয়ে একজন ভারতীয় মহিলা কবির নামও উল্লেখ করা হয়। তিনি হলেন কেরালার মহিলা কবি কমলা দাস।

সাইফার্টের পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদটিতে তাঁর দেশের সংবাদ মাধ্যমে তেমন উল্লাসের জাগরণ তোলে মাত্র একটি সংবাদপত্রে তা প্রথম পৃষ্ঠার খবর ছিল। আর সব সরকারী আধাসরকারী সংবাদপত্রে সংবাদটি ছিল চারের পাতায় বা সাতের পাতায় নেহাৎ একটি ছোট্ট ঘোষণার মত। কেন এই বিশ্ববরেণ্য লেখকের প্রতি অনীহা? কারণ ১৯৬৮ সালে প্রাগে রুশ অভিযানের পর চার্টার ৭৭ এর প্রতিবাদ দলিলে যে সব বুদ্ধিজীবীরা স্বাক্ষর দেন, জারোশ্লাভ সাইফার্টও তার মধ্যে একজন। জনপ্রিয়তার জন্য তাঁর উপর তেমন কোন নির্যাতনের সরকারী ব্যবস্থা আরোপিত হয়নি। আজ তিনি ৮২ বছর বয়সে রুগ্ন, অসুস্থ,

হাসপাতালে শয্যাশায়ী। নোবেল পুরস্কার ঘোষণার দুদিন পরে চেকোস্লোভাকিয়ার সরকারের পক্ষ থেকে হাসপাতালে কবিকে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

সাইফার্টের কবিতা কী রাষ্ট্র বিরোধী? মোটেই তা নয়। সাইফার্টের কবিতা চেকোস্লোভাকিয়ার গণমানবের অন্তরের ভাষা। বেসরকারী ভাবে তাকে চেকোস্লোভাকিয়ার জাতীয় কবি বলে আখ্যায়িত করা হয়। চেকোস্লোভাকিরা দুটি গণগোষ্ঠী নিয়ে একটি রাষ্ট্র। তাঁদের ভাষাও দুটি। চেক ও স্লাভিক ভাষা। দশমিলিয়ন লোকের মাতৃভাষা চেক আর পাঁচ মিলিয়ন লোকের মাতৃভাষা স্লাভিক। সাইফার্ট চেক ভাষার কবি। সুদীর্ঘ তিন শত বছরের পরাধীনতায় (অ্যাস্ট্রো হাঙ্গেরিয়ান শাসনের অধীনে) চেকোস্লোভাকিয়ার সাংস্কৃতি ও জাতীয় ঐতিহ্য বিলুপ্তির অতলে তলিয়ে গিয়েছিল। ১৯১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের পর চেকোস্লোভাকিয়া তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফিরে পেলো। তিনশত বছরের পরাধীনতার পর চেকভাষাও সংস্কৃতির নিজস্বতা বলতে তখন তেমন কিছু থাকার কথা নয়। জার্মান ভাষা ও সংস্কৃতিই ছিল চেকো-স্লোভাকিয়ার সরকারী ও বেসরকারী সংস্কৃতি। এমন কি চেক ভাষায় শিক্ষিত লোক কথা বলতোনা। যেমন ইংরেজি ছিল উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে শিক্ষিত লোকের সামাজিক ভাষা।

তখন একদল দেশপ্রেমিক সংস্কৃতি সচেতন মানুষ সজাগ হয়ে উঠেন সাংস্কৃতিক চেতনায়। তিন শতাব্দীর পরাধীনতায় একটা জাতি তার নিজস্ব সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলে তা আমরা দেখেছি ভারতবর্ষেও। ভারতে বিশেষত: বাংলায় যেমন এই হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতির পুনরোদ্ধারের জন্য একটা নবজাগরণ (রেনেসাঁ) এসেছিল, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সংস্কৃতি সচেতন মহাপুরুষদের নেতৃত্বে, যার তরুণ পতাকাবাহী উত্তর পুরুষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মধ্যেই বাংলা কাব্য সাহিত্যের পরিপুর্ণতা লাভ করল। তেমনি চেক সাহিত্যের নব-জাগরণের উত্তর পুরুষদের মধ্যে একজন ছিলেন তরুণ কবি জারোস্লাভ সাইফার্ট। ১৯২১ সালে নবজাতক গণতন্ত্রী চেকোস্লোভাকিয়ার তরুণ সাইফার্টের প্রথম কাব্যগ্রন্থে ফুটে উঠল দেশপ্রেম আর সামাজিক সাম্যের বাণী। ১৯২০ সালে চেকোস্লোভাকিয়ার সাংস্কৃতিক জীবনে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা হলো "Devets:l" নামক সাংস্কৃতি মোর্চার জন্ম। Devets:l ছিল বামপন্থী শিল্পী ও সাহিত্যিকদের এক সংগঠন। এঁদের প্রগতিশীল চিন্তার প্রভাব চেকোস্লোভাকিয়ার শিল্পে, সাহিত্যে এবং অভিনয়ে নতুন এক দিগন্ত উন্মোচন করল। সমস্ত বিশদশক জুড়ে এই সংগঠনের প্রভাব চেকোস্লোভাকিয়ার সংস্কৃতির নবনির্মাণের পানে আলোর দিশারী হয়েছিল। জারোস্লাভ সাইফার্ট ছিলেন এই সংগঠনের অন্যতম সক্রিয় সভ্য।

এই Devets:l এর সংস্কৃতি আন্দোলন কালক্রমে দুটি ধারার জন্ম দেয় চেকোস্লোভাকিয়ায়। শুরুতে সর্ব-হারার কাব্য যা বিপ্লবোত্তর সোভিয়েট শিল্পরীতির ধারার উত্তরবাহক এবং মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী। কালক্রমে একান্তই চেকোস্লোভাকিয়ার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির রূপ দিতে জন্মনিল "Poetismen" এর। ইউরোপে নবশিল্প আন্দোলনের জোয়ার তখন প্রবল-বেগে প্রবাহিত। জডাইমম, আপোলিনায়ারের (কিউবইসম এর সমর্থক ও কবি এবং ফরাসী নব-সংস্কৃতি আন্দোলনের অগ্রদুত) নব শিল্প চিন্তার প্রভাব সমৃদ্ধ করল 'Poetismen' এর ভবিষ্যৎ অগ্র-গতির পথ। আধুনিক চেকোস্লোভাকিয়ার সাংস্কৃতিক নিজস্ব গতিপথে এই ধারাটি আজো অপ্রতিহত।

১৯২১ সালে সাইফার্টের প্রথম কবিতা সংকলন MESTO V SIACH (অশ্রুসিক্ত নগরী) প্রকা-

শিত হয়। তখন যিরিভলকার (JIRI WOLKER) সর্বহারা কাব্য সাহিত্যে স্বনামধন্য কবি। সাইফার্টের প্রথম কাব্য প্রকাশিত হলো সহজ সরল ভাষায় এবং মুক্ত ছন্দে। সর্বহারাদের হয়ে প্রতিবাদ জানালো যুদ্ধ এবং পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও অধীনতার বিরুদ্ধে। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার সর্বগ্রাসী অপ্রগতির বিরুদ্ধেও সজাগ ছিল লেখনী।

সাইফার্ট প্রাগের উপকণ্ঠে সর্বহারাদের দরিদ্র পল্লীরই বাসিন্দা, তাই শ্রমজীবি মানুষের সঙ্গে আত্ম সংযোগ ছিল অকৃত্রিম। তাঁর কবি হৃদয় চিরদিনই এমন এক পরিবর্ত্তনের স্বপ্নে বিভোর ছিল, যা জন্ম দেবে এমন এক সমাজের, যেখানে যুদ্ধের আতঙ্কে মানুষ থাকবে না ত্রস্ত। ঘৃণা, আর মানুষের মধ্যে অসাম্য হবে নির্বাসিত। তাঁর সহজাত কাব্য প্রেরণার উৎসকেন্দ্র হলো নাগ্নিব শিল্প, ছড়া, লোক গাথা আর এক ভাববিমুখ বিপ্লব চিন্তা।

সাইফার্টের কাছে যুদ্ধই মানবতার বড় শত্রু, যা মানুষকে তার জীবনের আনন্দ, ভালবাসা ও সৌন্দর্য উপভোগের অধিকার থেকে,করে বঞ্চিত।

পুর্ব বর্ণিত Poetismen এর সঙ্গে সাইফার্ট ছিলেন সক্রিয় ভাবে যুক্ত। ১৯৩০ সালে পাশ্চাত্য জগত যখন অর্থ-নৈতিক সংকটে ভুগছে, সেই সুযোগে জার্মানীতে নাজিবাদের আবির্ভাব আর চেকোশ্লোভা-কিয়ার কমিউনিষ্ঠ পার্টিতে তখন স্ট্যালিনবাদের প্রভাব বিস্তার করেছে। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তখন Poetismen এর প্রভাব স্তিমিত হয়ে গেলো। চেকোশ্লোভাকিয়ার আরো কিছু বুদ্ধিজীবী সংস্কৃতি পন্থীর মত জারোস্লাভ সাইফার্ট ও Poetismen ত্যাগ করলেন এবং ক্রমে কমিউনিষ্ট প্যর্টির সঙ্গেও তাঁর যোগসুত্র চিরতরে ছিন্ন হলো।

সাইফার্টের অবশ্য বাসনা ছিল, একজন সুকবি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই শুরু থেকেই তাঁর নিজস্ব এক শৈলী দিয়ে, চলমান মানবজীবনের অন্তরের আবেদনকে তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন।

মানুষের অনুভুতি ও তার পারিপার্শিক জগতেই তাঁর কবিতার চরণ ধ্বনি। চেক্ সাহিত্যে তিনি শ্রেষ্ঠতম গীতিকবিতার শ্রষ্টা। তাঁর কবিতা স্নিগ্ধতায় নম্র, সুর সঙ্গতিতে অনবদ্য। ছন্দময় ব্যঞ্জনা আর খানিকটা বিষাদের আবছা আবেগে একান্তই কাব্যময়। এই মর্মস্পর্শী আবেদন তাঁর কাব্যকে চেকসাহিত্যে জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছে।

সাইফার্টের কবিতা আজ "বিশ্বের রোদন" রসে আপ্লুত। ধর্ম বিশ্বাসে সন্দেহবাদী তবু গৃহকাতরতা তাঁকে টানে অতীতের হারিয়ে যাওয়া কৈশোর, প্রেম ভালবাসার প্রতি। পলায়নমান এই জীবন ক্রমে ক্রমে সব কিছু হারায়। সাইফার্টের লেখনি এই আশীতি পর পর্য্যায়েও স্তব্ধ হয়ে যায় নি। তাঁর কবিতা আগের চেয়েও অনেক আবেগপুর্ণ ও।

চেক সাহিত্যে প্রেমের কবিতা খুবই জনপ্রিয়। সাইফার্টের নিম্নলিখিত বইগুলিতে পাওয়া যায় অপুর্ব কিছু প্রেমের কবিতা যা চেক সাহিত্যে অনবদ্য সৃষ্টি। বইয়ের নাম ও প্রকাশ সাল : তোমার যত্নের আপেল (Jablkos Klina, 1933), ভেনাসের হাত (Ruce Venusiny, 1936), বিদায় শরৎ (Jaros-bohem, 1937) ত্রিশ দশকের চেকোশ্লোভাকিয়া ক্রমেই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার দরুণ সাংস্কৃতিক অনিশ্চয়তার কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছিল। সাইফার্ট তখন চেকোশ্লোভাকিয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে স্বদেশের ঐতিহাসিক সঙ্গতি যাতে না হারায় তার জন্য অনেক দেশাত্মবোধক কবিতা লেখেন। জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা উত্থান পতনের কবিতায় তা উজ্জ্বল।

চেকোশ্লোভাকিয়া যখন নাজি বাহিনীর পদতলে দলিত, সাইফার্টের কবিতা তখন জনতাকে দিয়েছে নৈতিক সাহস আর মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণা। তাঁর প্রিয় সহর প্রাগ তাঁর কবিতায় তখন সমস্ত দেশের অস্তিত্বের প্রতীক চিহ্ন এবং জীবন সত্ত্বা।

ঃ যুদ্ধোত্তর যুগ ঃ

জারোস্লাভ সাইফার্ট প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কিশোর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পূর্ণবয়স্ক সংগ্রামী কবি। ১৯৪৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ার আবির্ভাব সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রজোটের মধ্যে একটি স্বাধীন সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসাবে।

সাইফার্ট ত্রিশ দশকে Poetismen ছাড়ার সাথে সাথেই চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করেন। সে থেকেই তিনি সোশ্যাল ডেমক্র্যাট দলের সঙ্গে যুক্ত হন। সাইফার্ট চেকো-শ্লোভাকিয়ায় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মধ্যে দেশজ ঐতিহ্য ও মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাসী। কিন্তু নতুন সমাজতন্ত্রীক চেকোশ্লোভাকিয়ায় রাষ্ট্রের খবরদারী আরোপিত হতে শুরু হলো সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর। সৃজনশীল লেখকদের তাঁদের অনুমোদিত পথেই সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে।

১৯৪০ সালে নাজী অবরোধের সময় দেশবাসীকে স্বদেশ ও দেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার জন্য লিখে-ছিলেন Bozena Nemcovas এর স্বর্ণপালক নামে একটি বই। নামটি ১৮০০ সালের জনপ্রিয় লেখিকার স্মরণে (নামটি) নেওয়া। এই কাব্য পুস্তকের মাধ্যমে তিনি বলতে চেয়েছিলেন দেশপ্রেমের কথা। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও গর্ববোধের কথা। জুগিয়েছিলেন মুক্তি যুদ্ধে দেশ প্রেমের প্রেরণা। একটি জাতিকে কখনো অবলুপ্তিত করা সম্ভব নয় যতদিন ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিভূরা তাঁদের স্মরণে অবিস্মরণীয়। এই ছিল বইটির মর্মবাণী।

১৯৫০ সালে সাইফার্ট আবার নতুন করে প্রের-ণায় উদ্বুদ্ধ হলেন ১৮০০ সালের লেখিকা Bozena Nemcovas এর লেখায়। এবার যে বই তিনি লেখেন তার নাম 'ভিক্টোরিয়ার (উপর) গান' (Piser O Viktoree) তাঁর এই বইটি রাষ্ট্রের প্রতি পরোক্ষ আক্রমণ বলে বিবেচিত হয়। যদিও এই বইটি ছিল হারিয়ে যাওয়া অতীতের প্রতি এক গৃহকাতরতা। সাইফার্ট রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে দোষী সাব্যস্ত হন। যদিও ত্রিশদশকের অর্থনৈতিক দুর্দিনে এই ধরণের স্বতস্ফূর্ত্ত আদর্শবাদী অসংখ্য কবিতা লিখেছিলেন তিনি। সাইফার্ট এবার থেকে সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাথে নির্ভয়ে সংগ্রামক্ষেত্রে অবতরণ করলেন। ১৯৫৬ সালে চেক সাহিত্য সম্মেলনে নির্ভয়ে তিনি সরকারের সংস্কৃতি নীতির সমালোচনা করেন। সাহিত্যিক ও কবিদের তিনি স্মরণ করিয়ে দেন তাঁদের ঐতিহ্যময় কর্ত্তব্য যাতে গণ বিবেকের বাণী মূর্ত্ত হয়ে উঠে সত্য ও সুন্দরের দর্পণে। ষাট দশকের মাঝামাঝি জারো-স্লাভ সাইফার্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছেড়ে আবার ফিরে এলেন কবিতার রাজ্যে। কিন্তু এবার তাঁর কবিতার সম্পূর্ণ নতুন মুড। নতুন ব্যঞ্জনা আর ভাবে স্বতন্ত্র দ্যোতনা। গঠনরীতিতেও স্বাতন্ত্র চোখে ধরা পড়ে। তিনি নিয়মতান্ত্রিক পদ্যরীতির পদ্ধতি পরিহার করে-ছেন সম্পূর্ণভাবে। এখন তিনি সহজ সরল গদ্যরীতিতে লেখেন কবিতা। গদ্য কিন্তু ছন্দের স্পন্দনে সজীব বলেই তা কবিতা। ভাষা সাবলীল তত্ত্বপূর্ণ ভাষা। এ কবিতার বিষয়বস্তু নিতান্তই তাঁর অন্তরের উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা—এক শঙ্কিত সৌন্দর্য—নামান্তরে যাকে আমরা জীবন বলি। তাঁর কবিতার স্মৃতিপটে উঠে আসে সব পরিচিত কাছের পরিবেশ, কাছের মানুষ, সহর প্রাগ, শিল্প সংস্কৃতি আর প্রাত্যাহিক ছড়িয়ে থাকা সব কিছু যা স্মৃতি আর ভালবাসার প্রলেপে ঢাকা। হারিয়ে যাওয়া অতীত যা স্মৃতি আর ঐতি-

ক্ষের স্মৃতিতে সমৃদ্ধ তার জন্য আকুলতা আর যন্ত্রণা কবির কাছে আরো প্রবল। ১৯৭০ সালে লেখা বই "মড়ক সমাধি" (Morvy Sloup) যার সুইডিস অনুবাদ Post Monumentet (সাইফার্টের নোবেল পুরস্কার ঘোষণার দিন পর্যন্ত সুইডিস ভাষায় একমাত্র অনূদিত বই যার সমস্ত কপিই গুদামজাত ছিল ক্রেতার অভাবে) চেকোস্লোভাকিয়ায় সাইফার্টের প্রতিটি নতুন বইয়ের জন্য বইয়ের দোকানে ক্রেতার ভীড় সব সময় দেখা যায়। সাইফার্টের সৃষ্টির জন্য ইতিমধ্যেই (তাঁর জীবিত কালেই) চেকোস্লোভাকিয়ার জনসাধারণ তাঁর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারী হয়ে উঠেছে। ষাট দশকে সাইফার্ট 'জাতীয় শিল্পী' সম্মান (বেসরকারী) সম্মান গ্রহণ করেন বলে সরকারী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর কাছে ছিলেন অপাংক্তেয়। কবি ১৯৬৮ সালে সোভিয়েটের প্রাগ অভিযানের পর 'চার্টার-৭৭' এ স্বাক্ষর করেন গণতন্ত্র ও মানব অধিকারের দাবিতে। ১৯৬৯ সালে চেকোস্লোভাকিয়ার সাহিত্য সমিতির (বেসরকারী) সভাপতি নির্বাচিত হয়ে বৃদ্ধ বয়সে তাঁর আদর্শের প্রতি দৃঢ়তার পরিচয় দেন।

সাইফার্টের লিখিত পুস্তকের সংখ্যা ত্রিশের মত, কতিপয় পুস্তকের নাম—

(ক) Mesto V Slzach, 1921 (অশ্রুসিক্ত নগরী)

(খ) Jablkos Klina, 1933 (তোমার যত্নের আপেল—প্রেমের কবিতা)

(গ) Ruce Venusiny, 1936 (ভেনাসের হাত)

(ঘ) Jaro Sbohem, 1937 (বিদায় বসন্ত--প্রেমের কবিতা)

(ঙ) Svetlem Odena, 1940 (আলোক বেণী-দেশাত্মবোধক কবিতা)

(চ) Kammeny Most, 1944 (পাথরের সেতু—দেশাত্মবোধক কবিতা)

(ছ) Vejfr Bozeny Nemcove (Bozena Nemcova's এর সৌরপালক, ১৮০০ সালে মহিলা লেখিকার স্মরণে জাতীয়তাবোধ জাগানোর কবিতা সংগ্রহ)

(জ) Prilba Hlfny (মাটির শিরস্ত্রান)

(ঝ) Pisen O Vikto (১৯৫০ সালে Bozena Nem Covas এর সাহিত্য প্রেরণায় আবার নিজস্ব ঐতিহ্য কেন্দ্রিক কাব্য গ্রন্থ "ভিক্টোরিয়া বিষয়ে গান")

(ঞ) Maminka, 1954 (মায়ের স্মৃতির প্রতি, তাঁর মা ছিলেন সাধারণ শ্রমিক রমণী)

(ট) Koncert Na Ostrove (একটি দ্বীপে সমবেত সংগীত)

(ঠ) Halleyova Kometa, 1967 (হ্যালীর ধুমকেতু)

(ড) Odlevani Zvonu, 1967 (ঘণ্টা ঢালাই)

(ঢ) পিকাডলির ছাতা—1979 সালে প্রথম প্রকাশিত হয় প: জার্মানীর মিউনিখ সহরে। কয়েক মাস পরে প্রাগ সহর থেকে চেক ভাষায় প্রকাশিত।

(ণ) Morvy Sloup, 1970 (মড়ক সমাধি, প্রথম প্রকাশ প: জার্মানীর কোল্‌ন সহরে, ১৯৮১ সালে প্রাগে প্রকাশিত হয়।

(ত) Vsecky Krasy Sueta, 1983 (সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্য—স্মৃতিচারণ মূলক পুস্তক, প্রথম প্রকাশ প: জার্মানীর কোল্‌ন সহরে) ১৯৮৩ সালের শেষের দিকে প্রাগ থেকে প্রকাশিত তার শেষ বই Byti Basniken (একজন কবি হিসাবে)

(সৌজন্য উত্তর প্রবাসী)

কবি অশোক চট্টোপাধ্যায় পরিচিতি
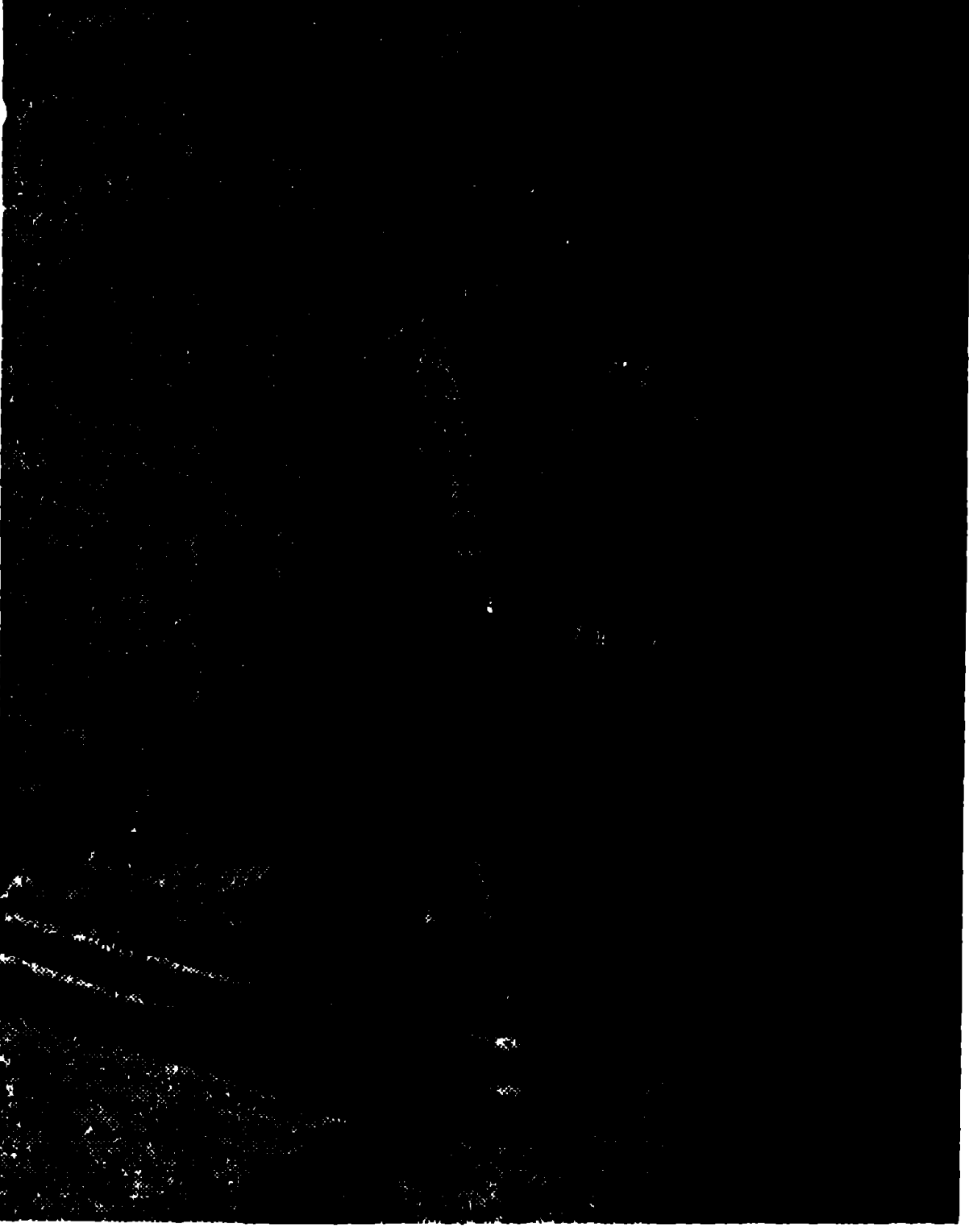
গোধুলিমন সম্পাদক কবি অশোক চট্টোপাধ্যায় এর জন্ম হুগলী জেলার সিঙ্গুর গ্রামে ১৩৫০ বঙ্গাব্দের ২৪শে বৈশাখ। পিতা তারকদাস চট্টোপাধ্যায় ও মাতা বাণী দেবী। পড়াশুনা স মান্য কিছুদিন হাওড়ায়, পরে চন্দননগরে। খেলাধুলা সাহিত্যচর্চা পড়াশুনা সব কিছুই দাদামশাই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর আন্তরিকতায় মূর্ত্ত হয়ে উঠে।

১৩৬৬ বঙ্গাব্দ থেকে সাহিত্য ত্রৈমাসিক হিসাবে 'গোধুলি' পত্রিকা সম্পাদনা শুরু। ১৩৮২ বঙ্গাব্দ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নথীভুক্তির কারণে' 'গোধুলি মন' নামে এখন মাসিক সাহিত্য পত্র হিসাবে এখনও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

১৩৭৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় প্রথম বই, উপন্যাস। 'এল কাছাকাছি'। দ্বিতীয় বই এবং প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উত্তর তিরিশে এসে' বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দুই বাংলার প্রবীন এবং নবীন কবিদের অভিনন্দন লাভ করে। ওপারের কবি বন্দে আলী মিয়া লেখেন—'অধিকাংশ আধুনিক কবিতা কষ্ট-কল্পিত। এবং বিপরীত অর্থবোধক শব্দসমূহ দ্বারা পাশাপাশি সজ্জিত দুর্বোধ্য একটি বিশেষ ধরণের কাব্য। 'উত্তর তিরিশে এসে'র কবিতাগুলি সেই ধরণের কবিতা থেকে স্বতন্ত্র এবং সেই কারণেই পাঠকের দৃষ্টি ও মনকে সহজে আকর্ষণ করে। ঐ একই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে কবি ডঃ শুদ্ধসত্ত্ববসুর ভাষায়—'কবিতাগুলি পড়তে কোথাও বাধেনা, বুড়ো হাড়েও শীতান্তে বসন্তের আমেজ লাগায়, ন্যাড়া, নিষ্পত্র গাছও মঞ্জরিত হয়'। সুদীর্ঘ ২৭ বছরে এপার ও ওপার বাংলার অজস্র পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের অসংখ্য কবিতা।

কবি অশোক চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সামুদ্রিক নোনাগন্ধ'ও প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ পত্র, সাময়িকপত্র দ্বারা অভিনন্দিত।

শ্রীচট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখ-যোগ্য দুটি কাব্য সংকলন ঃ

১। কাব্য সংকলন (ছবি পরিচিতি সহ)

২। এপার ওপার কিছু কবিতা (দুই বাংলার কবিতা)

সম্বর্দ্ধনা ও পুরস্কার

জানুয়ারী '৭৯—বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব চন্দননগর কর্ত্তৃক ইনস্টিটিউট অব চন্দননগরে।

১৯৮২ শ্যামনগর, ২৪ পরগণার তৃণাঙ্কুর পত্রিকাগোষ্ঠী কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধনা। ভারতচন্দ্র লাইব্রেরী হলে।

১৯৮৩ —নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন (হুগলী জেলা শাখা) কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধনা। কোন্নগর সাধারণ পাঠাগারে।

১৯৮৩ —ইয়ং রাইটার্স কর্ত্তৃক জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য সম্বর্দ্ধনা।

১৯৮৫ —২০শে জানুয়ারী, সুইডেনের উত্তর প্রবাসী নির্বাচিত ১৯৮৪ সালের সাহিত্য পুরস্কার।

অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

গবেষণা

মাথার ওপরে ছিল চাঁদ
নাকি চাঁদের উপরে ছিল চোখ
যে ভাবেই বলা হোক্
বস্তুতঃ চাঁদ চাঁদই থাকে।
কিছু কিছু সংরাগী ছবি
এ ভাবেই থেকে যায়
পাত্রের আধার তৈল
নাকি, পাত্র তৈলের আধার
এ ভাবেই চিরদিন গবেষণা চলে
মাথার ওপরে থাকে চাঁদ
নাকি, চাঁদের ওপরে থাকে চোখ।

রমণী

সে রাতে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে ছিল
হাড় ঠাণ্ডা করে
রমণীর গাঢ় উষ্ণতায়
শীতরাত শেষ হয়।
সম্ভোগের চরম পুলকে
শিহরীত হয়ে ওঠে
তরুণ কিশোর ॥
অন্ধকার ঘর জুড়ে
আগুনের ম্লান লাল শিখা
নিটোল রমণী দেহ ঘিরে।
পরিণত রমণীর কাছে গুপ্তবিদ্যা
শিখে নেওয়া তরুণ কিশোর
সকালের রোদ মাখে গায়।

অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

মেঘজমে

মেঘ জমে কথার পরতে শুধু শুধু জমে ওঠে মেঘ
কে জানে কখনও কোন বৃষ্টিপাত হবে কিনা ভোরে
আলোর আখরে
কার নাম কাহার হৃদয়ে লেখা থাকে
মেঘ জমে কথার পরতে শুধু শুধু জমে ওঠে মেঘ।

কবে কোন কিশোরী বয়সে হরিণীর মতো ভীরু চোখে
যে মেয়েটি চেয়েছিল। সে এখন পরের গৃহিণী
আকাশে জমলে মেঘ কোন কোন আষাঢ়ে-শ্রাবণে
সেই কিশোরের কথা এখনও কি মনে পড়ে তার ?
মেঘ জমে কথার পরতে শুধু শুধু জমে ওঠে মেঘ।

খোলা মাঠে বৈশাখী ঝড় দু'জনে মেখেছে গায়ে
বোঁটা খসা পাকাপাকা আম কোঁচড়ে-পকেটে
সেই সব ছেলেমানুষীর স্মৃতির রমাতা নিয়ে
একজন প্রৌঢ়-মানুষ কাটাচ্ছে অবসর ক্ষণ।
মেঘ জমে কথার পরতে শুধু শুধু জমে ওঠে মেঘ।

বয়স বাড়ার অর্থ : মৃত্যুর আরো কাছে যাওয়া
বয়স বাড়ার অর্থ : সঞ্চয়ে ভরে ওঠা ঝুলি
বয়স বাড়ার অর্থ : বিতৃষ্ণা পার্থিব জগতে।
সে এখন জেনে গেছে প্রতিবেশী কত স্বার্থপর
মেঘ জমে কথার পরতে শুধু শুধু জমে ওঠে মেঘ
কে জানে কখনও কোন বৃষ্টিপাত হবে কিনা ভোরে।

Sunil

২৬শে জানুয়ারী '৮৫ সংখ্যা, এগার
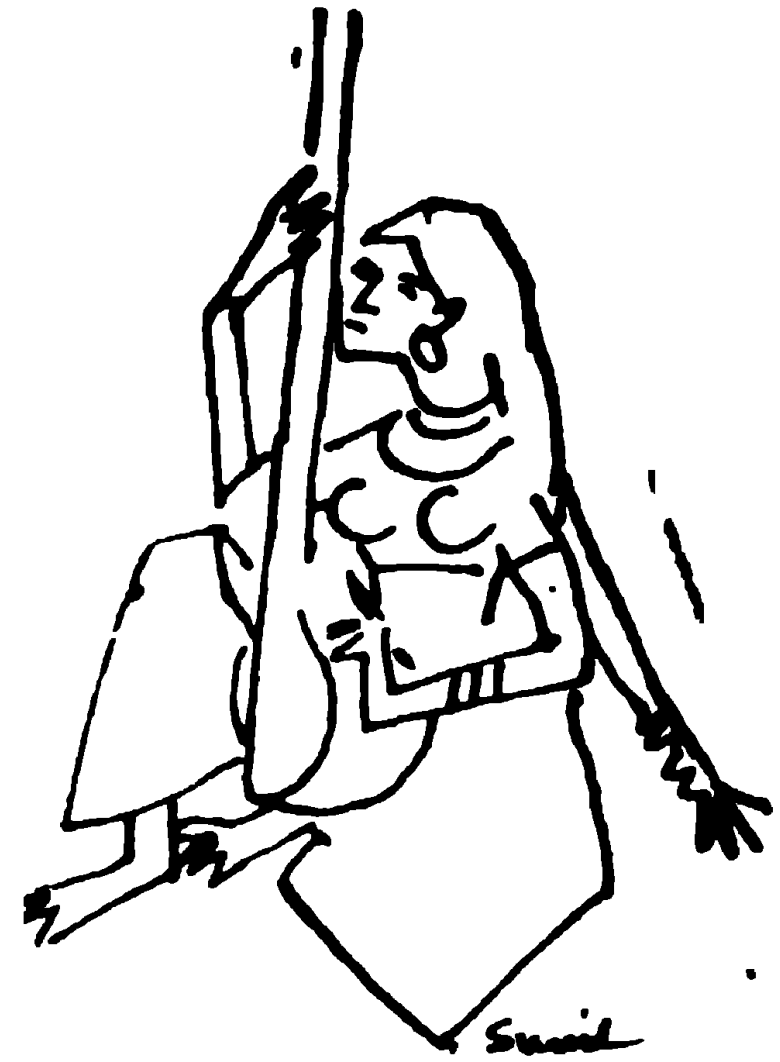
দিলওয়ার ঃ একজন শুদ্ধতম শব্দ সৈনিক

ফারুক নওয়াজ

"যে সমাজ ব্যবস্থায় আমরা বাস করি, তাকে ধারণ করে আছে আধাসামন্ত, আধা-পুঁজিবাদী শক্তি। আধুনিক বিশ্বে এটা হচ্ছে এক আত্মহননকারী রক্ষণাবেক্ষণ। এ সমাজ ব্যবস্থায় সর্বাঙ্গ সুন্দর মানুষ হয় আতঙ্ক, নয় আরাধনার পাত্র। অথচ এ দুটি পথই মানবিক গুণাবলী বিস্তারের পথে কঠিন অন্তরায়।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি,—পাপের সাথে আপোষকারী পুণ্যশক্তির স্বার্থ স্পৃহার কারণেই এখানে বিস্তৃত জীবনবোধ খণ্ড-খণ্ড হলয়ে ধ্বংসাত্মক আনন্দসন্ধানী। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই এর অবসান ঘটাতে পারে। জীবন বিদগ্ধ কবি সাহিত্যিক ও বুদ্ধি-জীবীদের কর্মতৎপরতার সময় অনুপস্থিত। বলিষ্ঠ চেতনার তরুণেরাই এক্ষেত্রে সমধিক কাম্য।"

এ সমাজে প্রতিভাধর সাহিত্যিকরা যথার্থ মূল্য পাচ্ছেননা কেনো? এই প্রশ্নের জবাবে উপরোক্ত মন্তব্য করেন বাংলাদেশের সংগ্রামী কবি ব্যক্তিত্ব দিলওয়ার।

তৎকালীন পুর্বপাকিস্তান। রাজনৈতিক অস্থি-রতা; অসুস্থ সমাজব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খলতায় দেশ বে-সামাল। আমাদের লেখক সম্প্রদায় দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পথভ্রষ্ট।

ঠিক তখন-ই দিলওয়ারের আবির্ভাব। তখন কেউ কেউ আপোষের স্তুতি পাঠে ব্যস্ত। কেউবা সংঘাতের পথ বেছে নিলেন। দিলওয়ার ও দুটোর কোনটাই গ্রহণ করলেন না। সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি ও

শুদ্ধতম বৈপ্লবিক চেতনায় পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থার লক্ষ্যে বলিষ্ঠ কলম হাতে এগিয়ে এলেন তিনি।

দিলওয়ারের কবিতার বিষয়বস্তু মানুষ। মানুষ বলতে সংখ্যা গরিষ্ঠ সেই জনতা--ঘর্মাক্ত খেটে খাওয়া, মধ্যবিত্ত এবং সর্বহারা মানব গোষ্ঠী।

আমাদের অনেক কবি সাহিত্যিকরাই সাধারণ ও মধ্যবিত্ত মানুষকে নিয়ে লেখার চেষ্টা করেন তবে কেউ নাগরিক কেউ গ্রামীণ হিসাবে চিহ্নিত। দিলওয়ার এ বদনাম থেকে মুক্ত। দিলওয়ারের কবিতায় নগর-গ্রাম একাকার; হাতুড়ি-কোদাল-কাস্তে-চাকার সহ-বস্থান। শহরে শ্রমিকের দুঃখ ও গ্রামের কৃষকের যন্ত্রনায় দিলওয়ার পার্থক্য দেখেননি!

শামসুর রাহমানের দুঃখ চায়ের কাপে, ড্রেসিং টেবিলের বেলজিয়াম গ্লাসে, ভ্যানিটিব্যাগের ফোঁকরে সীমাবদ্ধ আর দিলওয়ারের দুঃখ গ্রাম শহরের অসংখ্য যন্ত্রণাকাতর মানুষ। অন্যান্যদের মতো দিলওয়ার আত্মকেন্দ্রিক নন্, নন্ অশুচি চিন্তাধারার পোষক। আলমাহমুদ যেখানে রমণী স্তনের বোঁটায় খুঁজে ফেরেন কামুকউপমা, দিলওয়ার সেখানে খুঁজে পান আপন জননীর স্নেহশীলা সাদৃশ্য—মাতৃত্বের উপমা বকুল।

মূলতঃ দিলওয়ার স্বদেশ তথা পৃথিবীর সাধারণ মানুষের নির্ভীক টেপরেকর্ডার। আশাবাদী-মুক্তিকামী কবিতার অতন্দ্র অনীক। ছন্দ আঙ্গিক সুষমা এবং শব্দ চয়নেও দিলওয়ার বিশুদ্ধ শিল্পী। তাঁর লেখনী বাস্তব এবং শিল্প সম্মত।

এঁর কয়েকটি কবিতার কিয়দংশে তা লক্ষ্যণীয়:

(১) বিপ্লবের রক্ত অশ্ব ডেকে গেছে বহুবার
বাঁধন ছিঁড়ে
সর্বহারা মানুষের ভীড়ে
বহুবার একখানি বাঁকা তলোয়ার
কাটিয়াছে জমাট আঁধার।
[শানিত অতীতের গান/জিজ্ঞাসা]

(২) যখন হাপিয়ে উঠি প্রাত্যহিক ক্ষুদ্রতার চাপে
তখনি এ মন চায় নভোচুম্বী পর্বতের প্রেম
নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে স্বপ্ন নীল ইচ্ছের হারেম
সভ্যতার দয়া যেনো আত্মলীন মৎস্যের বিলাপে।
[মধ্যবিত্ত বিশয়/ঐক্যতান]

যতদিন বেঁচে আছো ততোদিন মুক্ত হয়ে বাঁচো
আকাশ-মাটির কণ্ঠে; শুনি যেনো তুমি বেঁচে আছো।
[যতোদিন বেঁচে আছো/ঐক্যতান]

রাজনৈতিক চক্রান্তের শীকার কবি দিলওয়ারকে স্বদেশ দেয়নি তাঁর যথার্থ সম্মান, তবে তাঁর আন্ত-র্জাতিক খ্যাতি কেউ কেড়ে নিতে পারবেনা।

তার অজস্র কবিতা বিদেশী পত্র-পত্রিকায় অনু-দিত হয়েছে। ডঃ মনজুর আহমদ, কবীর চৌধুরী এবং ভারতের মৈত্রেয়ী দেবী ও চিন্ময় ঘোষ ও এঁর বেশ কিছু কবিতা অনুবাদ করেছেন। হাসপাতালের রোগ শয্যায় শুয়ে শুয়েই মার্কিন কবি 'নর্মান রষ্টেন' এর সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। পরবর্তিতে ওঁদের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। দিলওয়ারের ইংরাজী কাব্য-গ্রন্থ "FACING THE MUSIC" বিদেশের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

১৯৮০তে কবি কবিতায় বাংলা একাডেমী পুর-স্কার পান। ১৯৭৮-এ সিলেট বাসীদের পক্ষ থেকে তাঁকে খুব ঘটা করে গণ-সংবর্ধনা জানানো হয়। খেলাঘর সিলেট জেলা শাখা প্রতিবছর ১লা জানুয়ারী কবির জন্মদিন পালন করে।

কর্মজীবন ঃ

দীর্ঘদিন 'দৈনিক সংবাদ' এর সহ-সম্পাদক ছিলেন। দেশ-স্বাধীনতার পর নির্ভীক জাতীয় দৈনিক গণকণ্ঠের সহ-সম্পাদক এবং বাংলাদেশে অবস্থিত সোভিয়েত দুতাবাসের পত্রিকা উদয়নের উর্দ্ধতন অনু-বাদক হিসাবে কাজ করেছেন।

নীতি ও পথের প্রশ্নই তাঁর কাছে বড। জীবনে অনেক সংস্থাতেই উচ্চপদে কাজ করেছেন কিন্তু যখনই নীতি বহির্ভূত কিছু দেখেছেন তখনি ইস্তফা দিয়েছেন।

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ

(১) পুবাল হাওয়া, ১৯৬৪ (২) জিজ্ঞাসা (৩) ঐকতান, ১৯৬৪ (৪) বাংলা তোমার আমার (৫) রক্তে আমার অনাদি অস্থি (৬) স্বনির্বাচিত সনেট (৭) FACING THE MUSIC (৮) উত্তিন্ন উল্লাস (৯) নির্বাচিত কবিতা

সম্পাদিত

(১) সমস্বর (২) মৌমাছি (৩) উল্লাস (৪) যে আমার জন্মাবধি (৫) মরুদ্যান (৬) গ্রাম সুরমার ছড়া।

তাঁর লেখা কিছু গানও রেকর্ডিং হয়েছে। আধুনিক ছড়া আন্দোলনেরও তিনি অগ্রগামী সৈনিক আলোচকদের অধিকাংশই তাঁকে 'ছড়া রাজ' আখ্যা দিয়েছেন। ছন্দ চাতুর্যতা ও আগুনের শব্দ স্ফুলিঙ্গ-ই তাঁর ছড়ার প্রকৃত উদাহরণ।

বর্তমান জীবন

বর্তমানে দিলওয়ার সুরমা নদীর দেশ সিলেট শহরে নিজ বাড়ীতে বাস করছেন। প্রিয় সহধর্মিনী আনিসা দিলওয়ারের মৃত্যু তাঁকে অনেকটা ঝিমিয়ে দিলেও আনিসার সহোদরা ওয়ারিসা কবিকে স্বামী হিসাবে তাঁর জীবনের সাথে একত্রিত করে তাঁর সুখ-দুঃখের সাথী হয়েছেন। তাঁর সেবা-ভালোবাসায় কবির লেখনী সচল-সরব। কবির দ্বিতীয় পুত্র 'কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার'ও প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ কবি।

দিলওয়ার-এর কবিতা

বেঁচে থাকার মন্ত্র

সর্বত্রই বেঁচে থাকা যায়,—
হাটে মাঠে ঘাটে গঞ্জে অথবা মহলে
মৃত্যুর টহলদারী সর্বত্রই অভিন্ন দেখায়
অথচ অভিন্নতা দেশভেদে ঘোরতরো পাপ.
পাপকেও বৈষম্যের পুণ্যহস্তে ঢেকে রাখা যায়.
কি সহজ বেঁচে থাকা অনুন্নত দেশে !
হাঁস মোরগের মতো বিভিন্ন খাঁচায় !
রোদ ভরা উঠোনের কোণে
কিছু কিছু অন্ধকার মুখ টিপে হাসে,
অণু থেকে আণবিক. দারুণ উজ্জল বিস্ফোরণে
জনতা ঈশ্বর হয় শোষণে বিবর্ণ ঘাসে-ঘাসে !

চৌদ্দ/২৬শে জানুয়ারী '৮৫ সংখ্যা

মর্মাহত শোকের শূন্যতা

আশা রাখো প্রিয়তমা সমস্ত শোকের তালিকায়,
এইমাত্র বৃন্তচ্যুত একটি কুসুম বলে গেল ;
উড্ডয়নে গুলিবিদ্ধ একটি বিহঙ্গ চলে গেলো—
অবিকল কথাগুলি রেখে তার অনন্ত শয্যায় !
অতএব আশা রাখো অন্ধগর্ভ খনির শ্রমিক.
আশা রাখো অভিযাত্রী শ্বাপদ সংকুল বনাঞ্চলে
আশা রাখো কথাকর্মী লেখণীর রক্ত চলাচলে
তৃষ্ণার্ত মাঠের চাষী. তুমি হে নাবিক বৈমানিক।
আশা শুধু আশা নয়,—রাত্রির দুরুহ অন্ধকারে.
সীমিত দ্যুতির কণা বলে এক নায়ক জোনাকী
নক্ষত্রের মতো কিছু আশায় আলোর বিশালতা.
জাতক বিপ্লব যেন পদ্মিনী নারীর দেহাধারে
চন্দ্র-সূর্য ধরে থাকে নিরাতংক দুহাতে একাকী.
আশাতেই চিরকাল মর্মাহত শোকের শূন্যতা !

কবিদের আড্ডা ঃ কেচ্ছামৃত

সোফিওর রহমান

[এ লেখাটি পড়ার জন্য যে মেজাজ থাকা দরকার সেরকম মেজাজটি এলেই পাঠকরা পড়বেন—এই বিশ্বাস। সো: র:]

লুটের পয়সায় দু'জন সমাজবিরোধী গোস্ত, রুটি, কোর্মা, কোপ্তা খেতে খেতে আড্ডা দিচ্ছে খোশমেজাজে।
সাধারণকে ভেড়া বানিয়ে দু'জন স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতা প্ল্যান করছে বোসপাড়ায় এবার স্লোপয়জন করবে। এবং এ সময়ের দু'জন কবি ঐ রেস্তোরায় বসে মদ গিলছেন।

১ম দলের কাজ অতর্কিতে মানুষকে বিপদে ফেলানো। ২য় দল ধীরে ধীরে সবাইকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে। ৩য় দল এসব যুদ্ধের মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত এক কবির তাৎক্ষণিক জামাই সাজবেন।

বোঝা গেল, এদের কারও মধ্যে ভালোবাসা নেই। এরা ভালোবাসতে জানে না।

এরপর সাহসের সঙ্গে এ-লেখা মোড় ফেরালো।

'আমি' নামক মানুষটি নিজেকে বহুদিন দেখিনি। আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজের পাশে নিজের ছায়া, তিনটি—হলপ করে বলতে পারি কোনটিই আমার নয়। স্বভাবতই খুঁজছি আমার হারিয়ে যাওয়া আমিকে :

একজন কবি ভালোবাসতে জানেন। শ্রদ্ধা করতে জানেন। নিজেকে নিঃস্বার্থ ভাবে বিলিয়ে দিতে পারেন তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এবং এ-মাধ্যমই তাকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখে। নাম শুনলেই বলে দেওয়া যায় অমুক কবি অমুক সময়ের পিতা। ধরে নেওয়া যাক, নামটা 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়'। সমসাময়িক ও অনুজ প্রতীম কবিরা দেখতে পান সময়-পঞ্চাসের মর্যাদাব মুকুট সুনীলের মাথায়। কারও মনে ঈর্ষা, কোথাও স্তাবকের অঞ্জলি, কোথাও বা ভাবটা এমন যে কে সুনীল—হরিদাস পাল। যাই হোক, বর্তমান কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রের একটি দিক বোঝানো যাক। পঞ্চাশের প্রতিষ্ঠিত সুনীল আজও টিকে আছেন তার সৃষ্টি দ্বারা। আজও চমকে দেন কবিতায়। এখনো তিনি লিখতে পারেন তিরিশ বছরের সুনীলের মতো তাজা কবিতা। ৮৪-৮৫তে লেখা কবির কবিতা দেখলে কার না ঈর্ষা জাগে! সুনীলের 'আঙুলের রক্ত' কিংবা 'এক এক দিন' মনে করিয়ে দেয় সুনীল আজো বুড়ো হয়নি। আর এই কবি সম্পর্কে যারা ভাবেন একটু গা ঘেঁসে থাকতে পারলেই কবি হয়ে যাবো। তারা কিন্তু ভুল করছেন। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। পা-চাটাদের কখনোই ভালো চোখে দেখেন নি তিনি। হয়তো বিশ্বাসও করেন না। আর কবি ও কবিতার ক্ষেত্রে শহর-মফস্বলী কারবার যা চলছে এই পশ্চিমবাংলায় তা সুনীলের কাছে রীতিমতো ঘৃণার। সৎ মানুষ ভালো কবিতা এবং পরিশ্রমী তরুণরাই তাঁর প্রিয়।

স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায় সত্তরের কবিদের একজন। জীবনে অনেক সংগ্রাম করেছেন। একমাত্র বৃদ্ধা মাকে নিয়েই তাঁর সংসার। বেঁচে থাকার বিষময় যন্ত্রণায় জ্বলতে পুড়তে পুড়তে যৌবন ও প্রৌঢ়ের সন্ধিক্ষণে স্নেহলতা আজ কষ্টিপাথর। পশ্চিমবঙ্গীয় কবিদের চরিত্রলিপি লেখা আছে তাঁর স্মরণের প্রতি-পাতায়। আঘাত তো কম পেলেন না। কম প্রতারিত তো হননি। হিন্দী--বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির মিলনসূত্র হিসেবে স্নেহলতা গতবছর উত্তর--প্রদেশ সরকার কর্তৃক সম্বর্দ্ধিত ও পুরস্কৃত হয়েছেন। ইউ, পি--র সব প্রধান সংবাদ পত্রগুলিতে সাড়ম্বরে সে সংবাদ প্রকাশিত হলেও এ রাজ্যের একটি কাগজেও তা ছাপা হয় নি। ভাবুন তো আমাদের চরিত্রটা! এমন অবহেলা শুধু স্নেহলতাকেই নয়, আমাদেরও হতাশ করে। হ্যাঁ, যতোদূর মনে হয় কবি স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায় এখন আর তেমন লিখতে পারছেন না। হয়তো কিছুটা ফুরিয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে স্নেহলতা নিজে কি বলেন ?

বহরমপুর শহরে একটি অভিজাত ক্লাব 'শক্তি--মন্দির'। এখানেই রোজ আড্ডা দেন ঐ শহরের একমাত্র চরিত্রবাণ Little Magazine 'বৌবন' পত্রিকার দুই কর্ণধার শুভ চট্টোপাধ্যায় (চাঁদু) এবং সমীরণ ঘোষ। সঙ্গে থাকেন নারায়ণ ঘোষ, গোপাল ভট্টাচার্য, কৌশিক চট্টোপাধ্যায় এবং মানসিক হাস--পাতালে কর্মরত খালেদ নৌমান এবং আরো অনেকে তাহলেও আজকাল খুব একটা আড্ডা জমেনা এখানে আর। শুভ নিজের নতুন প্রেস নিয়ে ব্যস্ত। টু পাইস ইনকাম ভালোই হচ্ছে। লেখার চেয়ে পয়সাই এখন শুভর প্রিয় বেশী। অথচ এই শুভকেই অমিতাভ চৌধুরী 'যুগান্তর' পত্রিকায় পার্মানেন্ট ভাবে নিতে চেয়েছিলেন। তখন শুভ-র উক্তি ছিল 'ব্যাবসায়িক কাগজে কাজ করলে লেখকের স্বাধীনতা থাকে না।'

ছিমছাম রোগাটে চেহারা সুশ্রী তরুণ সমীরণ ঘোষ পূর্ত্তবিভাগের এ্যাসিস্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়র। বহরম-পুরের বর্ধিষ্ণু মুসলমান পরিবার এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী দাউদ খাঁনের সুন্দরী কন্যা মিতা বেগমের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। কালচক্রে ওদের প্রেম নিয়ে ঐ শহরে রাজনৈতিক ঝড় বয়ে গেল।... শিপ্রা নাম্নী এক কন্যাকে বিয়ে করে সম্প্রতি পিতা হয়েছেন। সুগন্ধী সেন্টের মতো এখন কবিতা আসে তাঁর কাছে। বন্ধু-বাৎসল্যে সমীরণ যতোখানি এগিয়ে ততখানি পিছিয়ে যান নিন্দা আলোচনায়।

অন্যদিকে বাঁকুড়া শহরের মুষ্টিমেয় তরুণদের কবিতার আড্ডা মানে নিন্দার নির্ঝর বয়ে যাওয়া। এই শহরে আছেন ঈশ্বর ত্রিপাঠী, রূপাই সামন্ত প্রভৃতি অগ্রজ কবিরা। তা এঁরা একে অপরে কমতি কিসের। রূপাই দেখতে পারেন ঈশ্বরকে, ঈশ্বরও তাই। হ্যাঁ ঈশ্বর চাইছেন আপাতত রাজ্য সরকারের একটি পুরস্কার তাঁর ভাগ্যে জুটুক। নোবেলটা দেবী হলেও ক্ষতি নেই। অন্যদিকে তরুণ—সুব্রত, পরিমল, সজলরা ওদের ঘাঁটাচ্ছেনও বেশ। আর কোলকাতার বড় বড় (?) কবিরা বাঁকুড়া শহরে পা দিলেই এঁরা বর্তে যান। যে যার মতো লাইন করতে ছাড়েন না। এরই ফলস্বরূপ সত্যসাধন চেল একবার মতি মুখো-পাধ্যায়ের কবিতা চুরি করে 'দেশ' পত্রিকায় ছাপাতে পেরেছিলেন ঐ দাদার জোরে। তাই ভাবছি, কবিতা কী পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তরের মানে নেমে গেল নাকি !

প্রথমে যে কথা বলছিলুম, দু'জন সমাজবিরোধী, দু'জন স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতা এবং দু'জন কবির আড্ডা। এবং সেই প্রসঙ্গে ভালোবাসা ও আমার হারিয়ে যাওয়া আমি কে খোঁজা। উপরোক্ত ২+২ +২=৬ জন মানুষের নৈতিক কোন পরিচয় নেই। ১ম দু'দল অপরাধী বলে চিহ্নিত। শেষ দলের দু'জন মদ খাচ্ছেন বলেছি। নিশ্চয়ই জানেন, উপরোক্ত

দু'জনই এই সমাজেই জন্মেছেন এবং প্রতিপালিত হয়েছেন; কিন্তু একে অপরকে ভালোবাসতে পারলেন না। তিনটি দলই একই রেঁস্তোরায়—যে রেস্তোরা উৎস আত্মবিক্রয়ের।

এখন কবিদের আলোচনা শুরু হ'ল। একজন বলছেন, অমুক কাগজের অফিসে গিয়েছিলাম, অমুক দাদা আমাকে গাড়ী করে বাড়ী নিয়ে গেলেন। অন্য-জন বলছেন, তোর ঐ কবিদার মেয়েটি ডাসা পেয়ারার মতো।...একবার নিয়ে ঘুমোতে হবে।...প্রথম জন মত পাল্টে বলল, এক কাজ করি আয়, মেয়েটিকে ওর বাবা অফিসে ডেকেছে বলে গাড়ী করে তুলে নিয়ে যাই চল।...

১৯৮৪-র ২৬শে আগষ্ট কলেজস্ট্রীট মার্কে-টের কাছাকাছি এমন ঘটনা শুনেছিলুম আমি ও আমার বান্ধবী সুচেতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে ঐ দু'জন কবির নাম বললুম না অনিবার্য কারণেই। তবে ঐ দু'জন কবি সম্প্রতি বেশ লিখছেন। একাধিক বইও বের করেছেন।

এবার পাঠক ভাবুন, তিনশ্রেণীর ছ'জন মানুষের চরিত্রে ভালোবাসা বলে বিন্দুবিসর্গ কিছু আছে কিনা। ধারাবাহিকতায় ফেরা যাক—

দক্ষিণ-পূর্ব মেদিনীপুরের একদা তুখোড় ছেলে শ্যামলকান্তি দাশ এখন কলকাতায়। অমিতাভ দাস প্রণব মাইতি, তপন মাইতি প্রভৃতি তার ছোটবড় বন্ধুরা এখন প্রসঙ্গ পেলে শ্যামলকে চিবিয়ে ফেলেন। অকৃতজ্ঞের একশেষ বলে নর্দমায় ডোবান আর ওঠান। শ্যামলকে এসব বললে শ্যামল ভোগ করার মতো মিটমিটিয়ে হাসেন। আমাকেই প্রশ্ন করেন সোফিওর কেন ওরা এরকম করছে? আর আমরা যারা পরে এসেছি, যেমন হরপ্রসাদ, জহর, দেবাশীষ প্রধান, নিরঞ্জন এবং আমি ওদের খেয়োখেয়ি বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করি। আশ্চর্য হয়ে যাই, 'এরা কেন কবিতা লেখেন'! আর কাঁথিতে প্রণব মাইতি যাদেরকে নিয়ে বসেন-ওঠেন লক্ষ করেছি তাদের আলোচনায় স্থান পায় কবিতা নয়, কবিদের নিন্দা ও কেচ্ছা। অনেক আড্ডায় গেছি, সর্বত্রই কমবেশী নিন্দা-আলোচনা হয়ে থাকলেও প্রণব মাইতি এবং সম্প্রদায় এ সবের তুঙ্গে, গুরুর গুরু। আবার এই জেলারই দ্বিতীয় অন্যতম Little Magazine 'অমৃত-লোকের' সম্পাদক সমীরণ মেদিনীপুরে শহরে প্রায়, পাণ্ডব বর্জিত দেশে থাকেন। একা, হ্যাঁ একাই তিনি নীরবে আশাতীত শিল্প শোভনভাবে পত্রিকাটি চালা-চ্ছেন, যা এই জেলার অনেক তরুণের আদর্শ হওয়া উচিৎ।

বন্ধু পাঠক, আপাতত শেষ হ'ল কেচ্ছামৃত। সকলেই আমার ও আপনার বন্ধু। কারও প্রতি ব্যক্তি-গত কোন রাগ নেই। শুধু ছবিটুকু তুলে ধরে নিজে-দের শুধরে নিতে চাই, বাস্।

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের সেই রেঁস্তোরা থেকে আমি ও সুচেতা ফিরছি দমদমের পথে। ট্যাক্সির মধ্যে কারও মুখ থেকে কোন কথা বেরুচ্ছে না। নীরবতা ভাঙলো সুচেতাই। সে যেন নাটকীয় ভাবে বলল, 'সোফিওর, কবিতা জিনিষটা কি, সেই ঘটনার পর তার ঐ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারিনি তখন। আজ যখন এ কেচ্ছামৃত লিখছি তখন কেবলি মনে হচ্ছে কবিতা আর কিছু নয়: বহির্জগতের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী আর অন্তর্জগতের ভাঙা গড়ার আর এক নাম কবিতা। আমি বিশ্বাস করি, এই ভাঙাগড়ায় আমি ফিরে পাবো আমার আমিকে।

॥ সংবাদ ॥

O পুলিশ কর্মীদের জন্য হুগলীতে প্রথম ফ্রি ট্রিটমেন্ট সেন্টার

হুগলী জেলা পুলিশ এসোসিয়েশন পরিচালিত ফ্রি ট্রিটমেন্ট সেণ্টার ১৯৮৪ সালে পাঁচ বছর পুর্ণ করলো। কয়েকজন সহৃদয় চিকিৎসক, পুলিশ কর্মী ও জনসাধারণের সহযোগিতায় ১৯৮০ সালে মাত্র ১০জন চিকিৎসক ও সামান্য ওষুধ নিয়ে সেণ্টারটি চালু করেন জেলা পুলিশ এসোসিয়েশন। বর্ত্তমানে ২৯ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এখানে পালা করে বসে-ছেন। পুলিশ কর্মী ও তার পরিবারদের চিকিৎসার জন্য রয়েছে প্রায় ২ লক্ষ টাকা মুল্যের চিকিৎসার আধুনিক সরঞ্জাম। ই. সি. জি. মেশিন, ব্লাড সুগার মাপার যন্ত্র ছাড়াও রয়েছে আধুনিক প্যাথলজি বিভাগ। রোগীরা এখানে চোখ-কান-গলার জটিল রোগের চিকিৎসা পাচ্ছেন। হুগলী জেলা পুলিশ এসোসিয়েশনের সম্পাদক অমৃতলাল সিংহ রায় জানান, প্রতিমাসে ৮০০-৯০০ রোগী সেণ্টারে আসে। এছাড়া বহিরাগত কিছু দুঃস্থ রোগীরও চিকিৎসা করেন ডাক্তারবাবুরা। ১৯৮৩ সালে সেণ্টার বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে দুর্ঘটনায় পঙ্গু এক কনষ্টেবলকে ১৮০০ টাকা মুল্যের কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়েছে।

O কয়েকটি আগামী অনুষ্ঠানে

উপলব্ধি সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে ঋষিণ মিত্রের সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠান ও স্বরচিত কবিতা পাঠ, আবৃত্তি ও গানের অনুষ্ঠান হচ্ছে আগামী রবিবার ৩রা ফেব্রুয়ারী দুপুর ১টা থেকে শ্যামনগরের ভারতচন্দ্র লাইব্রেরীতে।

সিঁড়ি পত্রিকার উদ্যোগে ১৭ই ফেব্রুয়ারী '৮৫ দুপুর একটা থেকে আলোচনা চক্র ও কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ২৪ পরগণার মধ্যগ্রামের সোদপুর রোডের রাধারমণ সুপার মার্কেটে।

অখিল ভারতীয় সঙ্গীত কলাকেন্দ্র ১৭ই ফেব্রু-য়ারী ভারতীয় ভাষা পরিষদ হলে এক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বসাচ্ছেন। অনুষ্ঠান শুরু বিকেল ৫-৩০ মিঃ থেকে। অনুষ্ঠানে খেয়াল পরিবেশন করবেন—শ্রীবিজয় চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমতী বেলা সাহা।

O হজরত ওয়সী পীরের স্মরণ সভা

বাংলার মহান সাধক রসুলে নোমাপীর ফার্সী ভাষার বাঙালী মহাকবি হজরত ফতেহ আলি ওয়সী পীর কেবলার ৯৮ তম তিরোধান দিবস মহা সমা-রোহের সহিত কলিকাতা মাণিকতলা ২৪/১ মুনশী পাড়া লেনস্থ মাজার সংলগ্ন প্রাঙ্গণে গত ২০শে অগ্রাণ (৬ই ডিসেম্বর ৮৪) বৃহস্পতিবার পালিত হয়ে গেল। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ভারতের ওয়সী মেমোরিয়াল এ্যাশোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আলহাজ হজরত পীর মওলানা জয়নুল আবেদিন আখতারী সাহেব। বিখ্যাত ঐতিহাসিক মাদ্রাসা আলিয়ার প্রাক্তন অধ্যক্ষ হজরত মওলানা আবু মাহফুজুল করিম মাসুমী সাহেব প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন—শাহ জালালী পীর সাহেব কেবলার সাহেব জাদাগন (আলহাজ হজরত পীর মওলানা মাহমুদ বখত বখতেয়ারী সাহেব, পীরজাদা মওলানা নুরুল মঈন চিশ্‌তি, পীরজাদা মৌঃ রমজানুল মঈন জালালী) হাফেজ মওলানা ফজলুল অহীদ রায় কোলাবী, হাফেজ মওলানা মুবারক আলি রহমানী, মনোজ রায়, অর্ধেন্দু চক্রবর্ত্তী, পীরজাদা মওলানা গোলাম মহিউদ্দিন জিলানী, বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন, এ্যাড-ভোকেট জনাব আব্দুস সালাম সাহেব, ডাঃ আসলাম সাহেব আরও অনেকে। ভারত এবং বাংলাদেশ থেকে অগণিত ভক্তবৃন্দ এসেছিলেন হজরত ওয়সী পীরের স্মরণ সভায় শ্রদ্ধা জানাতে। সারা ভারত ওয়সী মেমোরিয়াল এ্যাশোসিয়েশন কর্ত্তৃক সভাটি আয়োজিত হয়।

সংবাদ

উত্তর প্রবাসী সাহিত্য পুরস্কার

বিগত ২০শে জানুয়ারী ১৯৮৫ তারিখে কোলকাতার মহাবোধী সোসাইটি হলে ১৯৮৩ ও ১৯৮৪ সালের জন্য 'উত্তর প্রবাসী' সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হোল যথাক্রমে গল্পকার বলরাম বসাক ও কবি অশোক চট্টোপাধ্যায়কে (সম্পাদক গোধুলি-মন)। অনুষ্ঠানের প্রথম কর্ম-সূচি ছিল পুরস্কার বিজয়ীদের মধ্যে মান-পত্র ও পুরস্কার বিতরণ। 'উত্তর প্রবাসী'র পক্ষ থেকে ডঃ সমীরকুমার মিত্র একে একে বলরাম বসাক ও অশোক চট্টো-পাধ্যায়ের হাতে পুরস্কার ও মানপত্র তুলে দেন। পরে মানপত্র থেকে প্রথমে বাংলায় পরে সুইডিস ভাষায় পড়ে শোনান। পুরস্কার প্রাপ্তির পর বলরাম বসাক তাঁর গল্প লেখার প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। অশোক চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন— আমরা এখানে বসে ভাবতে পারিনা কিভাবে ওঁরা সুদূর সুইডেনে বসে দু'বাংলার লেখা সংগ্রহ ও বাছাই করে বাংলা ভাষায় এ ধরণের সুন্দর সংকলন প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি অশীতি-পর বৃদ্ধ কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রও তাঁর ভাষণে 'উত্তর প্রবাসী'র ভূমিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। প্রবাসী হয়েও বাংলা ভাষার প্রতি তাঁদের আন্তরিক ভালবাসার কথা উল্লেখ করে বলেন—সাহিত্য চর্চা ওঁদের কাছে শখ নয়—ওঁদের আন্তরিকতা থেকে আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিৎ।

() উত্তর প্রবাসী সাহিত্য পুরস্কার বিজয়ী গল্পকার বলরাম বসাক (বাঁদিকে) ও কবি অশোক চট্টোপাধ্যায় (ডানদিকে)

অনুষ্ঠানে আধুনিক কবিতার গীতিরূপকার ঋত্বিণ মিত্র সন্দীপ দত্তের 'লিটিল ম্যাগাজিন' কবিতার ও অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'দেওয়াল লিখন' কবিতার গীতিরূপ পরিবেশন করেন।

সাহিত্য ত্রৈমাসিক 'উত্তর প্রবাসী'র ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৫ই মার্চ ১৯৮৫। ঐ বৎসর থেকেই সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়। ১৯৮১ সালের পুরস্কার পেয়েছিলেন গল্পকার কণা বসু মিশ্র। ১৯৮২ সালের পুরস্কার বিজয়ী ছিলেন কবি অশোক চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক 'ঈগল')।

O কবি সম্মেলন

শনিবার ১লা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় 'রবিবাসরীয় জনতা'র উদ্যোগে ২৯ কলেজ ষ্ট্রীটে এক কবি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত।

এই অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন অমিতাভ দাশগুপ্ত, সুশীল পাঁজা, অশোক চট্টোপাধ্যায় (ঈগল) অশোক চট্টোপাধ্যায়, (গোধূলি মন) শিশির গুহ, জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ, গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল চক্রবর্তী শেখর চন্দ্র, শ্যামল গায়েন, কমলেন্দু দাক্ষিত, অলোক বসুরায়, মদন দাস।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রামবাংলা এগিয়ে চলেছে প্রগতির পথে

স্বাধীনতা লাভ করার সময়ে আমরা চেয়েছিলাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, কিন্তু ভারতবর্ষ এখনো এই আকাঙ্খিত সিদ্ধিলাভ করতে পারেনি।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গে পটপরিবর্তন ঘটল। রাজ্য জুড়ে সাধারণ মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে তোলা সম্ভব হল এক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, যাতে শাসনব্যবস্থা সম্প্রসারিত হল গ্রামস্তরে। গ্রামের মানুষেরাও অনুভব করতে পারলেন যে স্থানীয় শাসন আসলে তাঁদেরই হাতে।

পঞ্চায়েতের নানান পরিকল্পনা এবং কর্মসূচীর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামজীবনে এল নবজীবনের জোয়ার। ভূমিহীন শ্রমজীবীদের মধ্যে চাষের জন্য বন্টন করা হল সরকারের অধিকৃত নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত জমি, আর গৃহহীনদের দেওয়া হল বাস্তুভিটা। অপারেশন বর্গার মাধ্যমে জমির ওপরে ভাগচাষীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল, তৈরি হল নতুন রাস্তা, এল স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ-সুবিধা। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ও ক্ষুদ্র সেচের জন্য গৃহীত নতুন নীতিও সুফল এনে দিয়েছে। সমবায় ব্যবস্থা প্রসারিত হয়েছে গ্রামে গ্রামে, সেই সঙ্গে বিভিন্ন কুটিরশিল্প, মৎস্যচাষ ও পশুপালনের ক্ষেত্রেও দেওয়া হয়েছে নতুন সুযোগ। গ্রামের শ্রমজীবীরা এখন পাচ্ছেন নির্ধারিত নিম্নতম মজুরী। তফশিলী জাতি ও উপজাতিসহ সমগ্র দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের জন্য চালু করা হয়েছে বিশেষ উন্নয়ন পরিকল্পনা। সমাজভিত্তিক বনসৃজন এবং নতুন বনভূমি সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে পরিবেশকে নির্মল রাখার বিষয়েও মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামবাংলাকে প্রগতি ও উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

O ইন্দিরা গান্ধী সংখ্যা পেলাম আজ। সত্যি, অবাক লাগে ওদিকে সপ্তাহ না ফুরোতে 'দেশ' হাজির, এদিকে মাস না যেতে 'গোধূলি মন'। একটি বাণিজ্যিক—লক্ষ লক্ষ সংখ্যা ছাপা—হাজার, হাজার টাকা লাভ, অন্যদিকে ক্ষুদ্রপত্রিকা, লাভের ঘর শূন্য,—তবু থেমে নেই-কেন? কী ভাবে চলে? উত্তর নেই এর তবু চলে, মানুষ চালায় অশোকবাবু, কী এর গোপন কথা? আমরা বিস্মিত—গোধূলি মনের এই গতি দেখে। একটি ক্ষুদ্র পত্রিকাও যে পাতায় পাতায় (হোক চেনা, অন্যত্র আগেই মুদ্রিত) ছবি নিয়ে বেরোতে পারে—ভাবলে অবাক লাগে সম্পাদকের এই দাঁতে দাঁত ঠেকিয়ে ক্ষুদ্র পত্রিকাকে হাতিয়ার করে এই লড়াই দেখে। ভালই হয়েছে মোটামুটি। কবিতা-গুলিই এর বৈশিষ্ট্য আর 'জগৎ লাহা' যা লিখেছেন আমাদের অনেকের কথাই তাই—। ক্যাপ্টেনও মন্দ লেখেননি। এবং সর্বশেষে আপনাকে অভিনন্দন 'উত্তর প্রবাসী' পুরস্কার পাচ্ছেন বলে—বলরাম তো এক সময় বড় পত্রিকাতেও লিখতেন, দেখেছি। কিন্তু ক্ষুদ্র পত্রিকাতেই আপনার লেখা পড়েছি শুধু সেই হিসেবে এটি আমাদের কাছে খুব আনন্দের খবর। সত্যিই খুব খুশী আমরা। 'উত্তর প্রবাসী' পুরস্কারে ধন্য অশোক/জানাই অভিনন্দন আপনাকে আনন্দিত চিত্রলোক,'গোধূলি মন করছে প্রমাণ প্রতিক্ষণ, প্রতি-দিন/ক্ষুদ্র পত্রিকা হতে পারে ক্ষীণ, তবু নহে নহে দীন।" গোধূলি মন বেঁচে বর্তে থাকুক—মাঝে মাঝে আমাদের লেখাটেখা বেরোক—ব্যস, আমরা খুশী।

নিভা দে

২৮ ভাবা রোড, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫, বর্ধমান

* * * * *

O আপনার পত্রিকা 'গোধূলি মনের' ইন্দিরা সংখ্যা পেলাম। স্বল্প সময়ে সাধু প্রচেষ্টা। 'ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু ও তিনটি প্রশ্ন' বিষয়ের উপর তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত আমার ভাল লেগেছে। পরবর্তী সংখ্যা কি জানাবেন।

আর আপনাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন রইল 'উত্তর প্রবাসী'র তরফ থেকে পুরস্কার পাবার জন্য নির্বাচিত হওয়ায়। আমি গজেন্দ্রবাবু চিঠি বেশ কিছুদিন আগে পেয়েছি। ভীষণ ইচ্ছা ছিল যাবার। সম্ভব হচ্ছে না নিকটতম এক আত্মীয়র বিবাহ থাকায়। খুব খারাপ লাগছে, জানেন। আপনার সাহিত্য সেবা পরিপূর্ণতা লাভ করুক। লিটিল ম্যাগাজিনের সাথক যোদ্ধা হিসাবে আপনার সাফল্য আরও জয়যুক্ত হোক্ এই প্রার্থনা রাখি। সেদিন কেমন লাগলো জানিয়ে চিঠি দেবেন, কেমন? নমস্কারান্তে

দীপালি দে সরকার (ঊর্মি)

* * * * *

O প্রিয় অশোকদা,

প্রথমেই আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পুরস্কার আপনার অনেকদিন আগেই পাওয়া উচিত ছিলো। কেননা, আমরাই যখন কলম ধরেছি, আপনি তখনই হাজার হাজার পাতা ভরিয়েছেন। অন্তত আমার হাফ-প্যান্টের বয়স সে-কথাই বলে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে এ-সংবাদে সত্যি খুব আনন্দ পাচ্ছি। বলরাম বসাকের সংবাদটা আগেই পেয়েছি। আপনার খবরটা আপনার কাছ থেকে পেয়েই সবচেয়ে ভালো লাগছে। বিশেষত যে মন ও নিষ্ঠা নিয়ে আপনি দীর্ঘদিন 'গোধূলি মন' সম্পাদনা করছেন তার জন্যেও আপনাকে কেউ পুরস্কৃত করুক—আমার এই বাসনা। 'উত্তর তিরিশে এসে'-র কবিকে আর এক সদ্য তিরিশোত্তীর্ণ বয়স তাই আজ প্রাণের ভালোবাসা জানাচ্ছে। আপনি গ্রহণ করুন।

প্রমোদ বসু

৫৮ বিশ্বেশ্বর ব্যানার্জী লেন

কদমতলা, হাওড়া-১

O প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি মন O

O প্রিয় অশোক,

সাগরপারের 'উত্তর প্রবাসী' পত্রিকার ১৯৮৪ সালের নির্বাচিত কবি হিসাবে আপনাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই সম্মান লিটিল ম্যাগাজীনের নিঃস্বার্থ অতন্দ্রপ্রহরী এক সম্পাদককে, যিনি ব্যক্তিগত লাভালাভের উর্ধে উঠে, তথাকথিত বাণিজ্যিক লেখক গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা অগ্রাহ্য করে, দীর্ঘদিন নীরবে সাহিত্য সাধনা করে আসছেন। আপনার গৌরবে আমি গর্বিত, যেহেতু লিটিল ম্যাগাজীনের সঙ্গে আমার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং 'গোধূলিমন' আমার অতিপ্রিয় একটি পত্রিকা।

উত্তরোত্তর আপনার আরো সমৃদ্ধি হোক্, এই প্রার্থনা। ভালো থাকুন।

ইন্দিরা গান্ধী সংখ্যা পেয়েছি। লেখকদের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে পত্রিকাটি পাঠকদের প্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন। ইতি

মতি মুখোপাধ্যায়

ল্যাবরেটরি ইস্কো কুলটি-৭১৩৩৪৩

বর্ধমান

O সুন্দর প্রচ্ছদ, চমৎকার কাগজ ও প্রায় নির্ভুল। ছাপার অনন্য পুজাসংখ্যা পেয়ে খুবই খুশী হয়েছি। কেবল একটাই অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হয়েছি যে এ সংখ্যার প্রকৃত মূল্য আমি দিইনি এবং সেই অর্থে যেন নিজেকে কিছুটা অনধিকারী মনে হচ্ছিল।

ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের প্রবন্ধ অত্যন্ত সুপাঠ্য এবং এক নিশ্বাসে শেষ করেছি। পরিশ্রমী প্রাবন্ধিক অজিতরায়ের প্রবন্ধ ভালোই লাগল। দু এক যায়গায় পুনরুক্তি আছে। তাঁর মন্তব্য "জগদ্রামের কালে ভারতের ভক্তি আন্দোলন ছিল মূলত খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত" তর্ক সাপেক্ষ। সমসাময়িক বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের রচনা "রাধাকৃষ্ণ মঙ্গল" স্মরণীয়। তাছাড়া ঐ সময় চৈতন্য-চরিতামৃতের ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব কী একেবারেই ছিলনা? অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই বৈষ্ণব পুঁথি লেখকের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশজনের বেশী (দ্রষ্টব্য: বাংলার বৈষ্ণব সমাজ, সঙ্গীত ও সাহিত্য-৬৪ বাসন্তী চৌধুরী পৃঃ ৩০৯-৩১৩) "পাগলা ষষ্টি" নাটকের ডায়ালগ "চরকায় সুতো কাটা আর রামধুন গাওয়া ছাড়া আর তো কিছু শিখিনি দাদা" গান্ধীবাদ ও গান্ধীবাদী সম্বন্ধে নাট্যকারের অজ্ঞতার পরিচয়। ঐতিহাসিক বিকৃতি সত্ত্বেও সস্তায় হাততালি ও সরকারী অনুদান পাওয়ার এটা খুব সুযোগপযোগী রাস্তা।

'ঝিম হয়ে থাকা' 'দীর্ঘতর অপেক্ষায় আছি' ও 'গভীর নীরবতা' কবিতা তিনটি খুবই ভালো লাগল। ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেলাম ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসুর "স্মৃতি থেকে"। এটি একটি মহৎ রচনা—বিন্দুতে বিশ্বের ছায়া। রবীন্দ্র-সান্নিধ্য-ধন্য ডঃ বসুকে আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।

আপনার স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করি। চিরদিন বাংলা সাহিত্যের সেবা করে যান।

ইতি

জ্যোতির্ময় বসু

ফ্ল্যাট-২, বলক্-ডি ৮২ বেলগাছিয়া রোড

কলকাতা-৭০০০৩৭

* * * * * *

O 'গোধূলি মন' নিয়মিত পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ। দু'একটি বাদে অধিকাংশ সংখ্যাই উল্লেখযোগ্য, Book Self-এ রেখে দেওয়ার মত।

সুইডেনের 'উত্তর প্রবাসী' ১৯৮৪ সালের পুরস্কারের জন্য তোমাকে নির্বাচিত করায় অত্যন্ত খুশী হয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে এবং অতিথি-র পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও অভিনন্দন।

অসিতকৃষ্ণ দে

সম্পাদক—অতিথি

GODHULI-MONE N. P. Regd. No. RN. 27214/75 26th January '85 (মাঘ ১৩৯১)
Vol. 27, No. 1 Postal Regd. No. Hys-14 Price—Rs. 2·00 only

অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পপুলার প্রিন্টার্স, বারাসত, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও নতুনপাড়া, ...নগর হইতে প্রকাশিত।

গোধূলি মন

এই সংখ্যায় ঃ

অলংকরণ ঃ সুনীল চট্টোপাধ্যায়

ফাল্গুন ১৩৯৬ সংখ্যা

O প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি মন O

O গোধুলি মনের শারদীয় সংখ্যা পেয়েছি। এ সংখ্যায় মুদ্রিত চিঠিপত্র থেকেই প্রমাণিত হয়, লিটিল ম্যাগাজিন উপযুক্ত রচনা প্রকাশ ক'রে কতখানি জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে। এক দু'বছরে নয়, বহু বছরের চেষ্টায় গোধুলি মন আজকের এই যোগ্যভুমিতে পা রাখতে পেরেছে। অবশ্যই আর সে বয়েসে নবীন নয়, এখন তো দায়িত্ব নিতেই হবে, সমালোচনার মুখোমুখি হবার সাহসও অর্জন করতে হবে। বিশেষ সংখ্যাগুলিতে গোধুলি মন যেমন চিহ্নিত হচ্ছে, সাধারণ সংখ্যাগুলিতেও বিশিষ্ট রচনা তাকে স্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল করছে। এই ভুমিকা আরো সুদুর প্রসারী হোক এবং প্রভাবিত করুক অন্যান্য ছোটো কাগজগুলিকে। অনেকদিন আমি গোধুলি মনের সঙ্গে যুক্ত, কাজেই গোধুলি মন যদি উৎকৃষ্ট মানের হয় নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। সম্পদকের শ্রম ও আন্তরিকতাকে জানাই অভিনন্দন।

প্রীতিসহ :
অজিত বাইরী
উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া

O O O O

O প্রতিবারের মতন এবারও শারদীয়া "গোধুলি মন" অপুর্ব সুন্দর হয়েছে। বহু পত্রিকার মাঝেও এই পত্রিকাটি তার স্বাতন্ত্রে নিজস্ব প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে ভেবে আনন্দ পাই। সেই "গোধুলি" থেকে শুরু করে দীর্ঘদীন যাবৎ এ পত্রিকার সাথে যুক্ত থেকে আমি গর্বিত। আপনি ও আপনারা সবাই আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

সর্বাঙ্গীন শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছাসহ
বিনীত
অমিয়কুমার সেনগুপ্ত
বাঁকুড়া-৭২২১৫৩

O দিনের পর দিন চাকুরীর (গুরুত্বপুর্ণপদে) এতই জড়িয়ে পড়ছি যে সময়মত খোঁজ নিতে পারিনা এজন্য লজ্জিত ও কুণ্ঠিত। তোমার 'গোধুলি-মন' নিয়মিত হাতে পাই আর খুশীতে ভরে উঠি, যে লিটিল ম্যাগের ইতিহাসে একটি বিরল ঘটনার অস্তিত্ব টের পাই। আর Retire করতে দশ মাস বাকী। এবার পুজায় বসুমতী, দৈনিক লিপি, অভিযাত্রী, ধ্বনি, অভিযান সাময়িকীতে লিখেছিলাম।

হঠাৎ ইন্দিরা সংখ্যা প্রকাশের খবর শুনে একটি কবিতা পাঠালাম। ঘটনার আকস্মিকতায় কবিতাটি লেখা পড়েছিলো। ধ্বনির বার্ষিক সম্মেলন ভোটের জন্য পিছিয়ে গেল। তুমি ও সকল কবিবন্ধুদের বিশেষ করে বীরেশ্বর, অরুণ, সমীরকে আমার প্রীতি ও ভালবাসা দিও।

প্রফুল্ল অধিকারী
শান্তিধাম
রেলপার/আসানসোল

O O O O

O প্রেয়ার দপ্তরে যে সমস্ত কাগজ নিয়মিত আসে 'গোধুলি মন' তার মধ্যে অন্যতম। সম্প্রতি 'গোধুলি মন' এর পুজা সংখ্যাও দপ্তরে এসেছে। আকারে ও আয়তনে 'গোধুলি মন' এর চেহারা (পুজা সংখ্যার) বেশ লোভনীয়। সবচেয়ে আশ্চর্য করে এ পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ। লিটল ম্যাগাজিনের প্রকাশনের চিরাচরিত ধারণার বিরুদ্ধে গোধুলি মন এর প্রকাশ আমাদের বিস্মিত করে।

পত্রিকাটির আলোচনা পড়ে বিশদ জানাব। তবে এতে কবিতার আধিক্য চোখে লাগে। কবিতার সংখ্যা কমিয়ে ফিচারধর্মী লেখা বেশী প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করব। অলংকরণে সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের স্কেচগুলি আলাদাভাবে চেনা যায়। বেশ ভাল।

আন্তরিক অভিনন্দনসহ
স্বপন নাগ
ডি-১/৪৫৮ আর্মাপুর এস্টেট, কানপুর-২০৮০০৯

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি মন

২৭ বর্ষ/২য় সংখ্যা

ফেব্রুয়ারী/১৯৮৫
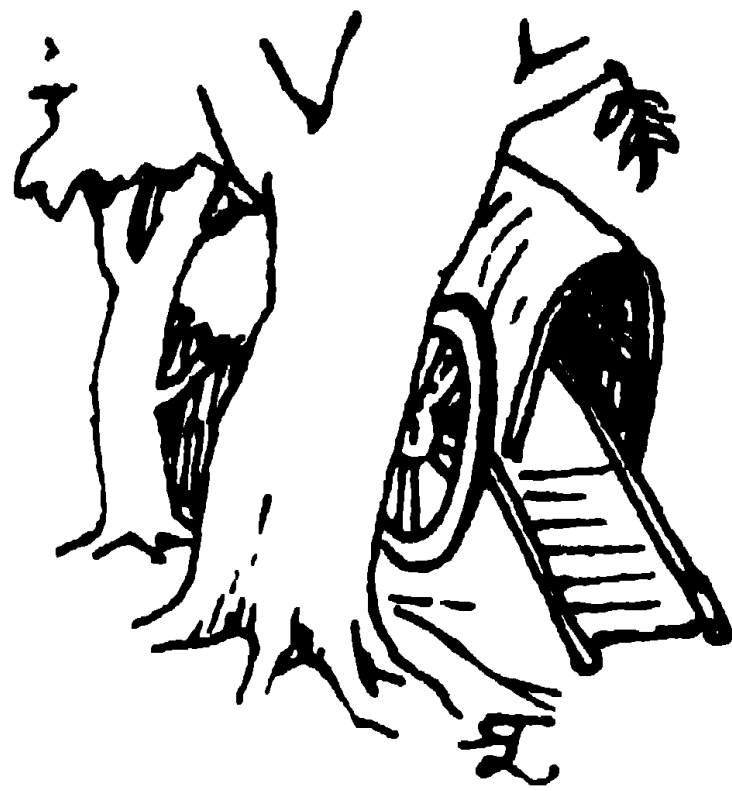
প্রতি সংখ্যা দুই টাকা
বার্ষিক (সডাক) কুড়ি টাকা

অলোক চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক

সম্পাদকীয়
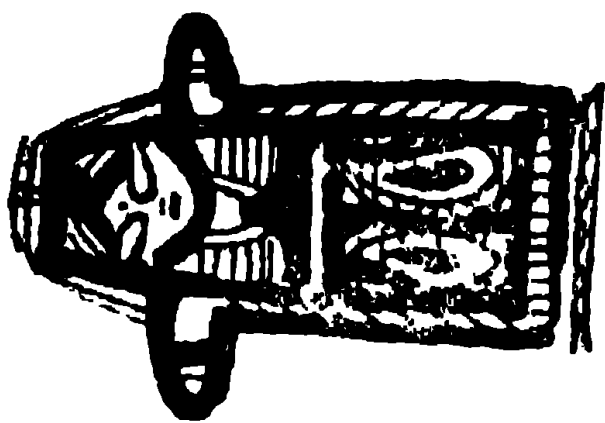
অনেকেই প্রশ্ন রাখেন—'পত্রিকার নাম 'গোধূলি-মন' কেন? কেউবা বলেন 'ভীষণ রোমান্টিক নাম—অথচ পত্রিকাটি নিঃসন্দেহে ধ্রুপদী।' অনেকে আবার গোধূলি-মনকে ভুলক্রমে 'গোধূলি লগ্ন' বলে বা লিখে ফেলেন। এবারের বইমেলাতেও অনেকেই আমার কাছে এ প্রশ্ন রেখেছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের নথীভূক্তিকরণের আগে পত্রিকার নাম ছিল 'গোধূলি'। দিনের শেষ এবং রাত্রি শুরুর আগের মুহূর্ত্ত গোধূলি। পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল উচ্ছলতাহীন তারুণ্য এবং স্থবিরতাহীন প্রবীণের মিলিত চিন্তার ফসল সাজানো থাকবে পত্রিকার পাতায়।

'মন' যুক্ত হবার পরও পত্রিকার নামকরণের সার্থকতা নেই—এ কথা বলা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত হবে না। সাতের কোটা/আটের কোটায় যাঁদের বয়স যেমন নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, মন্মথ রায় কিংবা শুদ্ধসত্ত্ব বসু তাঁরা যেমন গোধূলি-মনকে নিজেদের পত্রিকা মনে করেন; একেবারে তরুণতম কবি সোফিওর রহমান কিংবা মনোরঞ্জন খাঁড়া কিংবা প্রমোদ বসু তারাও তাই ভাবছেন।

উপন্যাসে তারাশঙ্কর ঃ একটি সমীক্ষা

অজিত রায়

বাংলা উপন্যাস-পুরুষের পথচলা শুরু হয়েছিল ভবানীচরণ মুখুজ্যের 'নববাবুবিলাস' (১৮২৩) থেকে। রক্তমাংসের আভাস ছিল না, কিন্তু একটা অস্পষ্ট অবয়ব সেই নবাগন্তুকের মধ্যেই ফুটে উঠেছিল। এক কনকনে শীতের রাত্তিরে আমাদের গাঁ ছেড়ে যাবার পথে ওই রকম এক নাইট-গার্ডকে দেখেছিলাম। লোকটির সমস্ত শরীর ছিল ভারি ওভারকোটে আপাদ-মস্তক আবৃত এবং মাথায় নাইট-ক্যাপ। সেই টুপি দিয়ে কপাল আর ভ্রূ এমনভাবে ঢাকা ছিল যে শত চেষ্টা করেও তাকে চিনতে পারিনি। পরে জেনেছি লোকটা আমাদের বাড়িরই গণেশ পাহারাদার। বাংলা সাহিত্যের পথে উপন্যাস পুরুষটিকে প্রথম চেনা গেল বঙ্কিম যুগে। কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী'র (১৮৬৫) ঘোড়ায় চড়ে যিনি এলেন, তিনি ঠিক আমাদের প্রতিদিনকার চেনাজানা জগতের মানুষ নন। সেখানে তাঁর মাথা থেকে টুপিটা আলগা হলো বটে, কিন্তু পুরোপুরি খসল না। সেটা খসালেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তাঁর চোখ জীবনজিজ্ঞাসু সমাজবিজ্ঞানীর নয়, মনোধর্মী কবির। তাই রবীন্দ্র-উপন্যাস গা থেকে ওভারকোট খসিয়েও নতুন বউয়ের মতো অন্তর্মুখীন হয়ে রইল। আর শরৎ-পর্বে সেই পুরুষই যখন বাঙালীর নিভৃত গৃহকোণে আটপৌরে সংসার পেতে বসল, তখনও আমাদের স্বাদ পুরোপুরি মিটল না বটে কিন্তু আশার উনুনে বাতাস লাগল। মুন্সীগঞ্জ সাহিত্য সম্মিলনী সভায় শরৎবাবু আশ্বাস ব্যক্ত করলেন, 'এই অভিশপ্ত অশেষ দুঃখের দেশে নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুক্ষ সাহিত্য যেদিন আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ দুঃখ বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।'

কথাশিল্পীর এই অনুমানের ভিত্তি কী? অর্থ-নীতির পড়ুয়ারা চাহিদার নিয়ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, মূল্য ও চাহিদার সম্পর্ক হলো, সাধারণত দাম কমলে চাহিদা বাড়ে আর দাম বাড়লে চাহিদা কমে। মূল্য ও চাহিদার এই বিপরীতমুখী প্রবণতার উদাহরণটা সাহিত্যের ক্ষেত্রে পুরোদস্তুর খেটে যায়। সাহিত্যের অন্যবিধ উপকরণের মতো, উপন্যাসও নিজের সামা-জিক বিশ্বাসকে আশ্রয় করে উদ্বর্তিত হয়। সাহি-ত্যের ইতিহাসে উপন্যাসের পরিক্রমা হয়েছে অব-তরণে। উঁচু থেকে নিচের দিকে চলেছে এ অগ্রগতি। কল্পনার রঙীন ভাব-বিলাস পরিত্যাগ করে যে ঔপ-ন্যাসিক যত বেশি বেছে নিয়েছেন রূঢ় বাস্তবের বন্ধুর পথ—সাহিত্যের বাজারে তার চাহিদা তত ঊর্দ্ধমুখী হয়েছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্বয়ং শরৎচন্দ্র। কিন্তু তবুও, কল্লোলের আগে অবধি স্থৈর্য স্থিতিবোধ বিশ্বাসের বলয়ে জীবনকে সংবৃত করে রেখেছিল, চতুষ্পার্শ্বস্থ মসৃণ জীবনযাত্রায় জীবনমোহের একটা

স্থির অবিকম্পিত উপলব্ধি ঔপন্যাসিকের চিত্তে সদা জাগ্রত ছিল। তাই শরৎবাবুর এই ভাবনার যথার্থ রূপকার তিনি নিজে নন, —মাণিক-তারাশংকর।

চলতি শতকে বাংলা পত্রিকা-জগতে প্রথম চমক 'কল্লোল', যা এসেছিল দীনেশ দাসের সম্পাদনায় ১৯২৩ সনে। কল্লোল ছিল 'উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন'। এর পথ চলা শুরু হয়েছিল রাবীন্দ্রিক ছোটগল্পের প্রস্থানভূমি থেকে। মাত্র সাত বছরের আয়ুষ্কালে এই পত্রিকা এমন কতকগুলি প্রতিভার স্ফুরণ ঘটিয়েছিল, যাঁদের ঋণ পরিশোধ করা এযুগীয় পাঠকের পক্ষে অবাস্তব কল্পনা। তখনকার তরুণ গাল্পিকেরা এই প্লাটফর্মে জড়ো হয়েছিলেন শুধুমাত্র সময়কে স্পর্শ করবার তাগিদেই নয়, বরং তখন সমাজ ও জীবন যে অস্থির অবস্থার শিকার হয়ে চলেছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কুফল তদানীন্তন মানব সমাজকে যেভাবে বহন করে নিতে হয়েছিল, সেই অস্থিরতা ও উচাটনের তরঙ্গে তাড়িত হয়ে সেই-সব লেখকেরা 'জীবনগত ও সাহিত্যশিল্পের প্রবণতা' গুলিকে রূপ দেবার জন্যেই চেষ্টা করেছিলেন, দেশ ও দশের অন্তরঙ্গ চালচিত্র তৈরি করেছিলেন। এই প্রচেষ্টা এমন ব্যাপক ভাবে ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। বাস্তব জীবনদর্শন সত্যোদ্ঘাটনের বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা কল্লোল যুগের উপন্যাসে যেভাবে রূপলাভ করেছে, জগৎ ও জীবনের ওপর তার প্রভাব বলশালী ও সুদূর প্রসারী। শুদ্ধ নির্মোহ বাস্তবতার অকুণ্ঠ প্রতিষ্ঠা আর সমাজের অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের প্রকাশ—এই দুইয়ে মিলে কল্লোলীয় সাহিত্যে ফুটেছে জীবনানুভবের যন্ত্রণা। চৈতন্যের ঊর্ধ্বে বিহার নয়, বস্তুতান্ত্রিক শ্রেয়োবাদী ভাবনা। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এর অন্যতম প্রতিনিধি।

'পাখীর ছানাটি আজ মরিয়াছে হায়,
তার মা এসে কতই কাঁদিতেছে তাই।'

এটা কোনো বাল্মীকির ক্রৌঞ্চমিথুন কিংবা অনুষ্টুপ-ছন্দের উদাহরণ নয়। তারাশংকরের প্রথম জীবনে কবিতা উৎসারিয়ে উঠেছিল এই পয়ারে। পরে অনতিবিলম্বে তিনি বুঝলেন, কবিতা তাঁর ভাবের বাহন নয়। তিনি লিখলেন গল্প। তাঁর প্রথম গল্প 'রসকলি' (১৯২৭) প্রকাশ পায় কল্লোলে। সেই শুরু! তারপর তাঁর অসংখ্য সৃষ্টি-সমুচ্চয় উল্কার বেগে ধাইল দেশ ও দশের বাস্তবায়ণে, তাতে ফুটে উঠল এক রকম আদর্শায়ন, যা বস্তুচর্য্যার শ্রেষ্ঠফল। তাই শরৎচন্দ্রের পর তারাশংকরের আবির্ভাব একটু আকস্মিক হলেও বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। যেখানে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকে বস্তু ছেড়ে উঠেছেন বলাকার ডানায়, যেখানে শরৎচন্দ্র ঢুকেছেন বস্তুর কর্মশালায়, সেখানেই তারাশংকর ব্যক্তি ছেড়ে ঢুকেছেন মনের কন্দরে। এ ঘটনা অসংলগ্ন নয়। যৌন, সমাজতান্ত্রিক, মানসিক ও প্রোলেতারীয় মানুষের আবাহন হয়েছে তাঁর সাহিত্যে। বাঙলার উর্বর জমিতে শেকড় চারিয়ে ফেলতে তাই তারাশংকরকে বেগ পেতে হয়নি। তিনি আঁকলেন 'আঞ্চলিক' ছবি। রাঢ়ভূমি লাল রঙে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বাংলা সাহিত্য। এখানে আছে বৃহত্তর অন্বেষণ, আছে বেদে বাগদী কাহার ডোম সকলের কোলাহল। শরৎচন্দ্র কিংবা প্রবোধকুমার (মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়) ভবঘুরেদের যে ছবি এঁকেছেন, তারই ওপর নতুন রঙ চড়ালেন তারাশংকর। উপেক্ষিত সমাজ আমন্ত্রিত হলো সাহিত্যের ভোজসভায়। সম্ভব হলো গণ-সাহিত্যের প্রগতি। কবিকঙ্কণের চণ্ডী আর ঘনারামের ধর্মমঙ্গলে যে কালকেতু ও কালুডোম দেখা দিয়েছে, তারা শরৎচন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে সাপুড়ে, জোলা,

বাগদী, বেশ্যায়। এরা মাণিক-প্রেমেন্দ্র-শৈলজানন্দের ভেতর দিয়ে কাহার ডোম, বোষ্টমিতে পরিণত হয়েছে। এরই অগ্রগতিতে এসেছে তারাশংকরের জনপ্রিয়তা।

বিদ্রোহ, সমাজ-ভাঙন আর গণ-প্রগতি- এই তিনের সন্নিপাতে তারাশংকরের উপন্যাস। বর্তমান নিবন্ধটি এতো ক্ষুদ্র যে, এই তিন স্তরের বিস্তৃত মূল্যায়ণ ধৃষ্টতা আমার নেই। এ আলোচনা নিতান্তই অতি সংক্ষেপিত। কিন্তু রূপশিল্পীর এই তিনটি চেতনা কোন কোন উপন্যাসে কিভাবে মুখর হয়েছে, তার আভাস আলোচ্য নিবন্ধে পাওয়া সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস। 'পাষাণপুরী' ও 'চৈতালী ঘূর্ণি' প্রথম স্তরের পরিচয়বাহী। এ দুটি উপন্যাসে, আদর্শ ও বাস্তবের সংঘাতে ধ্বনিত হয়েছে বিদ্রোহীর জয়োল্লাস। 'পাষাণপুরী' কারার নিরানন্দ প্রাণণ-গাথা। এ উপন্যাস পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায় দস্তয়ভস্কির 'হাউস অফ দ্য ডেড'। সাইদ, গৌর, কেষ্ট, চৈতন প্রভৃতি আড়ালের কুশীলব। কালী কামারের চরিত্রটি পূর্বস্মৃতি ও বর্তমান নিয়ে গঠিত। তার মধ্যে আছে এক ধরণের উন্মত্ততা। ঘানির টানে, সান্ত্রীর পদশব্দে আর ঘণ্টার ঢং-ঢংয়ে বাস্তব ধাক্কা দিচ্ছে দরজায়, আর অমনি বিদ্রোহ ঝংকার দিয়ে উঠেছে: 'মানুষ মানুষের বিচার করিয়া প্রাণদণ্ডের বিধান দেয়—এর মধ্যে যে চরম দীনতা, তার চেয়ে দুর্ভাগা মানুষের আর কিছুই নাই'। অন্যদিকে 'চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাসে, গোষ্ঠ ও দামিনীকে কেন্দ্র করে উঠেছে শ্রমিক সংগ্রামের ঝড়। এ গল্পের নিপীড়িত মানুষ পূর্বাপরি বেশি বিদ্রোহী: 'মানুষের ক্ষুধার তাড়নায় যীশুর সাধনা আজ ধর্মযাজকের কোমরে বাঁধা লোহার ক্রুশে নিস্পন্দ, ব্যর্থ; বুদ্ধের বাণী আজ পাষাণের গায়ে আখরের রেখায় মূক'। সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি এমন কটাক্ষ ইতিপূর্বের সাহিত্যে কোথায়? অদ্ভুত শৈল্পিক ও রূপক-বহুলতায় রাঙানো হয়েছে বিদ্রোহের এই আগুনকে।

সমাজ ভাঙনের ছবি সুস্পষ্ট অভিব্যঞ্জনা লাভ করেছে দ্বিতীয় স্তরে। পাশাপাশি ফুটেছে প্রেম আর রাজনীতি। তিনে মিলে রচিত হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। প্রেমের মাধ্যমে ধ্বংসের ছবি প্রথম ফুটে উঠেছে 'রাইকমলে' (১৯৩৪)। শরৎ সাহিত্যে কমললতা এসেছিল বৈষ্ণব প্রেমের আধুনিকতা নিয়ে। এরই সগোত্রীয় হলো কমলিনী। তার সঙ্গে হয়েছে রসিকদাসের প্রণয়। পরে রঞ্জন এসে রাঙিয়ে দিয়েছে কমলিনীকে। নায়িকার জীবন দুর্বিষহ হয়েছে পরীর আবির্ভাবে। তার বুকের যন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে এইভাবে:

'সখি বলিতে বিদরে হিয়া,
আমারই বঁধুয়া আন্‌বাড়ী যায় আমারই আঙিনা দিয়া'

সমস্যা দানা বেঁধেছে 'প্রেম ও প্রয়োজন' (১৯৩৫) উপন্যাসে। প্রয়োজন ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হয়েছে রমা নলিনী-সঞ্জীব ত্রিভুজ প্রেমে। নানাবিধ বাধা-বিঘ্নের পর রমা পেয়েছে সঞ্জীবকে। এরপর চন্দ্রনাথ-মীরা এবং হীরু-যাযাবরী সম্পর্কে অনল ধূমায়িত হয়ে উঠেছে 'আগুন' (১৯৩৭) উপন্যাসে। এ গল্পের শৈলী ভিন্ন। আত্মজৈবনিক প্রক্রিয়ায় বলা হয়েছে নিরুর জবানীতে। হীরু খেয়ালী, কিন্তু চন্দ্রনাথ স্বাধীনচিত্ত। এখানে তারাশংকর ঢুকেছেন মনের গভীরে। 'কবি' এই পর্যায়ের একটি শ্রেষ্ঠ ফসল, যা প্রকাশ পেয়েছে ১৯৪২ সালে। নিতাই ডোমের কবিয়াল হওয়ার গল্প 'কবি'। তার মনের পর্দায় দোল দিয়েছে দু'জন—ঠাকুরঝি আর বসন্ত। মারা গেল দু'জনেই, খাঁ খাঁ করতে লাগল নিতাইয়ের জীবন। শোকে ভেঙে পড়েছে কবিয়াল। কিন্তু সমস্ত ছাপিয়ে

একটা চাপা বীরভূমি লোকগীতের সুর যেন সমস্ত উপন্যাসে অনুরণিত হয়েছে : 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে ?'

ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদের সুন্দর পোস্টমর্টেম প্রতিবেদন পাই তারাশংকরের উপন্যাসে। সাম্রাজ্যবাদী মেঘ ছেয়ে ফেলেছে তামাম ভারতবর্ষকে। এ দেশের চেহারা তখন থেকেই আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক। সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে যাওয়ায় সমাজে এসেছে ফাটল শ্রেণীসংগ্রামে, তারই রূপায়ণ চোখে পড়ে 'নীলকণ্ঠে' (১৯৩৩)। শ্রীমন্ত ও গিরির শোকগাথা হলো 'নীলকণ্ঠ', যার পূর্বনাম 'যোগবিয়োগ'। কৃষির ভিৎ টলে গেছে, পয়সাকড়ির অভাবে কৃষক পরিবার হয়েছে উদ্বাস্তু। শ্রীমন্ত সংসার ঘূর্ণিতে দিশেহারা। তাকে জেল খাটতে হয়েছে শ্রীপতির মাথায় লাঠি মারার অভিযোগে। স্বামীর বন্ধু বিপিনের কাছে বাঁধা পড়তে বাধ্য হয়েছে গিরি। তার বিবেক জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়েছে। তা থেকে নিষ্কৃতি লাভের আশায় শেষাবধি ঘরে আগুন লাগিয়ে প্রতিকার খুঁজেছে শ্মশান-শয্যায়। অন্যদিকে অবহেলা আর বঞ্চনার বাতাসে বড়ো হয়েছে গিরির তনয় নীলকণ্ঠ। কিন্তু তার কাছেও কোনো মেনিফেস্টো নেই, ফলে সে বিভ্রান্ত। শেষ পর্যন্ত শ্রীমন্তের সঙ্গে বাড়ি ছাড়া হয়ে নিরুদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে নীলকণ্ঠ। সাজানো হয়েছে দুঃখের দীপমালা।

বাংলার প্রাচীন গ্রাম-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য ব্রিটিশরাজ ব্যবহার করেছিল দুটি অস্ত্র—ভূমিরাজস্বের নতুন ব্যবস্থা এবং তার জন্যে ফসল বা দ্রব্যের পরিবর্তে মুদ্রার প্রচলন। এই দুই হাতিয়ারের আঘাতে বাঙলার মাটি বিগত শতকেই শ্মশান হয়ে উঠেছিল। জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্যক্তিগত মালিকানা। চাষীদের ঘাড়ে চেপে বসেছিল পরগাছা শোষকদের বিরাট পিরামিড। এই পিরামিডের শীর্ষদেশে ছিল ইংরেজ বণিকরাজ, তলদেশে থাকল বিভিন্ন রকমের উপস্বত্বভোগীর দল সহ জমিদারগোষ্ঠি। তারাশংকর এসব জিনিস দেখাননি বটে, কিন্তু তাঁর উপন্যাসে ফুটে উঠেছে তৎপরবর্তী যুগের এক নিখুঁত চিত্র। 'কালিন্দী' (১৯৪০) উপন্যাসে এই চিত্র শ্রেণীসংঘাতের। এখানে আছে মানব ও প্রকৃতির পটে জড়দ্বেষর লীলা। একদিকে সামন্ত-প্রতিভূ রামেশ্বর, অন্যদিকে কালিন্দীর ধু-ধু চর। প্রাচীন গ্রাম সমাজের প্রতীক মহীন্দ্র ও অহীন্দ্র। কৃষিসভ্যতা ভেঙে পড়ছে, জাগছে শিল্পসভ্যতা। ধানের জমিতে গড়ে উঠছে কলকারখানা। এ যেন ঠিক গোল্ডস্মিথের 'ডেস্টারটেড ভিলেজ'-এর প্রতিচিত্র। জাতির সত্তায় চিড় ধরেছে, তারই পরিচয় আছে 'মন্বন্তর' (১৯৫০) উপন্যাসে। দারিদ্রের নাগপাশে আবদ্ধ যন্ত্রণাক্লিষ্ট মহানগরীর মুখব্যাদন সোচ্চার হয়ে উঠেছে : 'মাঁয় ভুখা হুঁ'—। পাঠকের হয়তো টমাস ম্যানের বুডেনব্রুকস-কে স্মরণে থাকতে পারে। তারই ছবি আছে সুখময় চক্রোত্তির সংসারে। অবশ্যি এখানে ম্যানের মতো জাটিল্য নেই, আছে সারল্য। পাশাপাশি আছে কানাই, বোমা আর গীতা। তবে, দুর্ভিক্ষ চিরস্থায়ী হয় না, সুখের সূর্য উঠবেই। তারই আভাস পেয়েছে বিজয়—'মহামরণ, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর মধ্যেও তারা (মানুষ) ঐ আশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে ; যুদ্ধের সমাপ্তিতে আসবে মুক্তি।' এ নিছক আশাবাদ নয়। মানুষের ইতিহাসই বাৎলে দেয়, শ্রেণীসংঘর্ষের মধ্য দিয়েই ঘটবে শোষণের অবসান। সেই ইঙ্গিতই বহন করেছে 'পদচিহ্ন' (১৯৫০)। এখানেও শ্রেণীসংগ্রামই লেখকের মুখ্য উপজীব্য। ১৯০০ থেকে ১৯০৮-৯ সাল পর্যন্ত এই উপন্যাসের ঘটনাকাল। সামন্তবাদ যে ধনতন্ত্রে রূপান্তরিত হবে, এতে পাই তারই ইঙ্গিত। এ ইঙ্গিত

পুর্বাপেক্ষা ব্রলিষ্ঠতর। গল্পের রস গড়িয়েছে জমিদার স্বর্ণবাবু আর ভুঁইফোঁড় বড়লোক ব্যবসায়ী গোপী-চন্দ্রের সংঘাতে। সমাজ 'ভাবজীবন এবং কঠোর বাস্তবের বিপরীতমুখী স্রোতের সংঘাতে ভেসে চলে ছোট ছোট ডিঙির মতো'। এতে অবশ্য ধনতন্ত্রের কাছে সামন্ততন্ত্রের যে পরাজয় দেখানো হয়েছে, তাতে তারাশংকরের পর্যবেক্ষণশক্তি সম্পর্কে পাঠক সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে।

তারাশংকর যে-ধরণের রাজনীতিমূলক উপন্যাস লিখেছেন, তার শিরোনামা হতে পারে 'সাধুসংকল্পের আলোকে ব্যক্তির মতাদর্শ।' অনেকের মতে, তাঁর 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯) রাজনৈতিক মতাদর্শকে পট-ভূমিকায় রেখে ব্যক্তিজীবনের বিবর্তনের প্রথম সার্থক রচনা। যেটা তারাশংকরের ছিল, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎবাবুর মধ্যে সেটা ছিল না—একটা রাজনৈতিক মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি। সন্ত্রাসবাদ থেকে গণ-আন্দো-লনের দিকে ভারতীয় ইতিহাসের মোড় ফেরার ব্যাপারটি তারাশংকর নিজ জীবনের উপলব্ধি থেকে বুঝেছিলেন। তাই সন্ত্রাসবাদের করুণ গম্ভীর অপেক্ষা ভারতীয় গণ-সংগ্রামের প্রথম উদার অভ্যুদয় শিব-নাথের জীবনেতিহাসের মাধ্যমে বেশি অভিনন্দিত হয়। কিন্তু এটাই 'ধাত্রীদেবতা'র রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে সাফল্যের দাবিতে বড়ো পয়েন্ট নয়। সে-দাবি অন্যত্র। জনৈক নবীন সমালোচক লিখেছেন, 'ধাত্রীদেবতা আসলে শিবনাথের জীবনী—সেই সূত্রে তার পারিবারিক জীবনকথাও বটে। মায়ের মৃত্যুর পর শিবনাথ-পিসিমা-গৌরীর জীবন স্রহতিসূত্র ছিঁড়ে এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে গেল। তার মূলে অনেকটাই আছে শিবনাথের স্বোপার্জিত কঠিন মতাদর্শ। কিন্তু ভারতব্যাপী প্রথম গণ-সংঘর্ষের জোয়ারে সেই বিচ্ছিন্ন পরিবার আবার পুনর্মিলিত হল—এই মিলনের ফলে জন্মলাভ করল একটা পরিবার—পারিবারিক জীবন-নাট্যের রাজনৈতিক সূত্রধার-কল্পনার দিক থেকেই 'ধাত্রীদেবতা' বিশিষ্ট। শিবনাথের সন্ত্রাসবাদী অধ্যায়-টিই বাংলা সাহিত্যে একমাত্র বিশ্বস্ত আলেখ্য।' এ গল্পে মাটিই দেশ আর এদেশ দেবায়নের উদ্‌গতিতে এগিয়েছে। রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে শিবনাথ ছেড়েছে পারিবারিক শান্তি আর আশ্রয় করেছে আন্দোলনকে। গৌরী একটু ভিন্নধর্মী। শিবনাথের মনে যে তাত্ত্বিক উপলব্ধি দেখা যায়, তার রূপায়ণও হয়েছে : 'সমস্ত জীবের ধাত্রী যিনি ধরিত্রী, জাতির মধ্যে তিনিই তো দেশ, মানুষের কাছে তিনিই বস্তু।'

'সন্দীপন পাঠশালা' (১৯৪৫) তারাশংকরের ম্লানায়মান প্রতিভার সাক্ষী। এ উপন্যাসটির পুর্বনাম 'উদ্বাস্তু'। এতে ধ্বংসোন্মুখ সমাজের ছবি আছে। অসহযোগ আন্দোলনের ক্যানভাসে আঁকা হয়েছে দুটি চরিত্র—ধীরানন্দ ও সীতারাম। পাঠশালাটি ভেঙে গেছে, সীতারাম হয়েছে দৃষ্টিহীন। বাঁচার আকাঙ্ক্ষা শূন্য। সন্দীপন পাঠশালার উদ্দীপনের শক্তি নেই। করুণ-রসই চাপিয়েছে। ফলত, এ উপন্যাস হয়েছে তারাশংকরের অপকর্ষের বাহক। বড়ো রাজনৈতিক ঘটনার সংঘাত সংক্ষোভের মধ্যে গল্প বাঁধতে পারলেই 'রাজনৈতিক উপন্যাস' হয় না। তা হলে, ১৯৪৬ সালের গণ-অভ্যুত্থান অবলম্বনে রচিত 'ঝড় ও ঝরা-পাতা' (১৯৪৬) সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাস হয়ে উঠত। কিন্তু হয়নি। ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নটাই এখানে তারাশংকরের লক্ষ্য ছিল। রাজনৈতিক মতা-দর্শ অস্তিত্বের অংশ হিসেবে দেখা দেয়নি। ক্লার্ক গোপেন মিস্তিরের জীবনে একটা ঝড় উঠেছে, তাতে চুরমার হয়েছে তার সংসার, চিড় লেগেছে সমাজ-বাঁধনে। ঝড়ে রইল শুধু সমাজের ঝরাপাতা। কেমন যেন নিয়তিবাদ এখানে মাথা চাড়া দিয়েছে। এ-সবে

রাজনৈতিক গল্প বলা যায় না। বস্তুত, সত্তর দশকের আগে পর্যন্ত, মহাশ্বেতা দেবীর আগে যথার্থ রাজনৈতিক উপন্যাস সত্যি সত্যিই লেখা হয়নি।

তবে গণসাহিত্যের ব্যাপক প্রসারে তারাশংকরের অবদান অনস্বীকার্য। 'গণদেবতা'য় (১৯৪২) জনগণই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ। এ জনগণ শ্রমিক, খামারী, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী তথা শহর আর গ্রামাঞ্চলের পেটিবুর্জোয়াদের নিয়ে নয়। এ জনগণ কেবলমাত্র গ্রামীণ! পল্লী মায়ের ছেলেপুলেদের মধ্যে প্রধান হলো দ্বারিক চৌধুরী, ছিরু ওরফে শ্রীহরি পাল, দেবু পণ্ডিত ও শিবশেখর ন্যায়রত্ন। শিবকালীপুরের চণ্ডী-মণ্ডপে, পঞ্চায়েতী মজলিশে অনিরুদ্ধ আর গিরীশ দাবি করল, আদিকালের নিয়ম মত শুধু ধানের বদলে সম্বচ্ছর গাঁয়ের লোকের কাজ করা আর সম্ভব নয়। চাই নগদ পয়সা। কামার-ছুতোরের এই আস্পর্দ্ধা দেখে, পঞ্চায়েতের হালের মোড়ল ছিরু রাতের অন্ধকারে সাবাড় করে ফেলল অনিরুদ্ধর ফলন্ত ধানের মাঠ। পুলিশকেও হাতের মুঠোয় রাখে ছিরু পাল। ওর নজর অনিরুদ্ধর বাঁজা বৌ পদ্মর ওপর। অন্যদিকে তার নিয়মিত নৈশ বিহার চলে পাতুবায়েনের যুবতী বোন দুর্গার সঙ্গে, ভাগ্যদোষে যে আজ স্বৈরিণী। পাতু প্রতিবাদ করতে ছিরু জবাব দেয় চাবুকের মুখে, পরে আগুনের মুখে—চুপিসাড়ে হরিজন বস্তিটাকে পুড়িয়ে ফেলে। গাঁয়ের পাঠশালার আদর্শবান পণ্ডিত দেবু ঘোষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে, মিথ্যা অভিযোগে জেল খাটে দেড় বছর। গাঁয়ে এলো 'খানাপুরী'। অর্থাৎ ইংরেজ শাসকের নির্দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে প্রত্যেক গৃহস্থের জমির মাপজোক। বলে দেওয়া হলো, কার কতটুকুতে অধিকার। দেখা গেল, অনেক গরীবের জমির কোন হদিস নেই। কংকনার জমিদারকে হাত করে ছিরু হয়ে দাঁড়াল ছিরু গোমস্তা—গাঁয়ের গরীব-গুর্বোদের মাথা-কাটা রাজা। অনিরুদ্ধর পতন ঘটল দুর্গার যৌবন-মদে। জেল থেকে ফিরে দেবু অবাক! চণ্ডীমণ্ডপ হয়েছে ছিরু গোমস্তার কাছারী, গাঁয়ের লোকেদের সেখানে আর অধিকার নেই। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে খবর আসছে প্রজা-আন্দোলনের, প্রজা-ধর্মঘটের। দেবুর ঘরে অভাব, খিদের জ্বালা। তা হোক, তবু সে থামবে না। তারাশংকর যেন বলতে চেয়েছেন: 'ভেঙেছে দুয়ার, এসেছে জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়।'

এরই দ্বিতীয় পর্যায় এসেছে 'পঞ্চগ্রামে' (১৯৪৪)। মহাগ্রাম, শিবকালীপুর, দেখুড়িয়া, কুসুমপুর ও কঙ্কনা নিয়ে বয়ে চলেছে কাহিনীর ধারা। দেবু ঘোষই এখানে প্রধান চরিত্র, যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে শিবকালীপুরের শ্রীহরি, কঙ্কনার বড়োবাবু, মহাগ্রামের ন্যায়রত্ন মশাই এবং কুসুমপুরের দৌলত শেখ। বেশ ক'টি বড় ঘটনাও আছে এ-পর্যায়ে—জন্নাবাগ্দীদের ডাকাতি, ময়ূরাক্ষীর বন্যা আর '৩০ এর অসহযোগ। অনিরুদ্ধর ঘর ভেঙেছে। পদ্ম বিয়ে করেছে খৃষ্টান নগেন্দ্রকে, আর অনিরুদ্ধ পালিয়েছে সাবিত্রীকে নিয়ে। কৃষিজ আভিজাত্য টলমল, জেগে উঠছে শিল্প-কৌলিন্য। এতেই আসবে 'মুক্তি'। পঞ্চ-গ্রামে আবার আসবে জোয়ার, গড়ে উঠবে ঘরদোর, নতুন পথঘাট।

আমাদের সর্বশেষ আলোচ্য গ্রন্থের নাম 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৮), যা লেখা হয়েছে কথ্য ও অপভ্রংশে। এ-উপন্যাসে কথাশিল্পী তারাশংকর একে-বারে মানবসভ্যতার আদিম যুগে এসে ঠেকেছেন। এরই জন্যে তিনি পেয়েছেন 'শরৎচন্দ্র পদক'। গল্প গড়ে উঠেছে ৬টি পর্বে—কাহিনীর পটভূমি কোপাই নদীর হাঁসুলী বাঁক আর মৌজা বাঁশবাদি, যা কাহার-দের আবাসভূমি। কালরুদ্রের মন্দির আর কাহারদের

প্রাত্যহিক জীবনচর্য্যায় লেগেছে বিশ্বসমরের তরঙ্গ আর কোপাইয়ের ধ্বংসকারী বন্যা। এ যেন আদিম জৈবভুমি, 'আস্তিকালের আঁধার'। এই আস্তিকালকে রূপ দিতে লেখক ব্যবহার করেছেন গ্রামের প্রবাদ আর লোকগীতি। 'সবুজের অভিযানে' নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল গ্রামটা, আর তারই ভিতের ওপর উঠে দাঁড়াল ইস্ত্রি-করা শহর। কান্নার ঢেউ উপচে পড়েছে পাগলের গানে:

'হাঁসুলী বাঁকের কথা—বলবো কারে হায়
কোপাই নদীর জলে, কথা ভেসে যায়।'

কথা পেড়ে বসলে, তা ফুরোতে চায়না। তারাশংকরের উপন্যাস নদীটি এমন দীর্ঘ, যার কথা এতো ছোট্ট পরিসরে আঁটানো সম্ভব নয়। সুতরাং, শেষ করার আগে আবার ফিরে যাচ্ছি আগের কথায়। শিল্প-সাহিত্যের নানাবিধ মাধ্যমের মতো, উপন্যাস ও নিজের সামাজিক বিশ্বাসকে অবলম্বন করে উদ্ভাবিত হয়। এবং যে উপন্যাস-সাহিত্য যত বেশি মানুষের কাছাকাছি যেতে পারে, তা তত বেশি জনপ্রিয়তা পায়। তারাশংকর এর ব্যতিক্রম নন। উপন্যাসের বিষয়ও বিষয়ী ক্রমে নীচের দিকে নামছে, এবং তারাশংকর তারই একটা বিশেষ স্তর। তিনি রক্তমাংসের মানুষকেই লোকচক্ষুর গোচরীভূত করেছেন। এ মানুষ যে জগতের বাসিন্দা, তা আমাদের প্রতিদিনকার চেনাজানা জগৎ। তাঁর উপন্যাসের মানুষ বাস্তব-মানুষেরই শাব্দিক রূপ। চরিত্রগুলি লেখকের দরদের রক্তমাংসে সজীব হয়েছে। উপন্যাসগুলি সজীব ও প্রাণধর্মী করতে তিনি ব্যবহার করেছেন 'স্থানিক' রঙ। হয়তো বা কালের গণ্ডি পেরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার মতো সার্থক সৃষ্টি কমই আছে; কিন্তু যা পেয়েছি, তা সাময়িক হলেও তো অবজ্ঞার নয়।

কবিতা

কবিতা:

কবিতা:

আর এক নাগাসাকী/পম্পা মুখোপাধ্যায়

এ যেন আর এক নাগাসাকী।
বোবা, প্রেতপুরী।
গলিতে গলিতে শবযাত্রীদের আনাগোনা।
পথে ঘাটে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে—
বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাস!
রাস্তায় ছড়িয়ে রয়েছে,
বাঁচার করুণ প্রার্থনা।
এবারের শীতে, অনেক কচি পাতাও হলুদ হ'য়
ঝরে গেল' ততোধিক।

৩১শে অক্টোবর ১৯৮৪/অশোক মণ্ডল

যুদ্ধের প্রকৃত মহিমা নিয়ে জেগে আছে
সবুজ ধানক্ষেত।
আমাদের মেঠো আলে বেড়াতে এসে
সম্মানিত অতিথি-পর্যটক
রেখে গ্যাছে প্রশংসার দুর্লভ পালক।
এ-কি অন্যমনস্ক ঔদার্য্য ?
গঙ্গাংশ ও প্রাঘিমার সীমারেখা ভেঙে
জ্যোৎস্নার মাঠে আমরা সারারাত
করেছি হৃদয়ের গল্প। শুধু এই ?
শঙ্খধ্বনি আজানের মিলিত সুরে গলা মিলিয়ে
কামানের বারুদ-স্তূপে
আমরা কি ফোটাতে চাইনি ফুলের
শিল্পময় উল্লাস ?

তবু কেন এই ক্রুর রক্তপাত
ইতিহাসের কলঙ্কিত পাতা থেকে উঠে আসে
মিরজাফরের ছায়া ?

হাহাকারের মেঘ ফুঁড়ে অবশেষে বৃষ্টি নামে
আমাদের অস্থির বিশ্বাসে, স্বরচিত কুরুক্ষেত্রে।
একে একে নামিয়ে রাখি অস্ত্র, যুদ্ধের পোশাক
কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ?
যুদ্ধের প্রকৃত মহিমা নিয়ে জেগে আছে
সবুজ ধানক্ষেত, ভারতবর্ষ।

উপেক্ষা/শৌনক বর্মণ

স্বাতীর কোল ঘেঁসে যে তারা ক্রমশ হারিয়ে যায়
তাকে ঘিরেই সুখ-স্বপ্ন, পাহাড় কেটে বসতি গড়া
বুকের ওমে তাকে নিঃশব্দে সেঁকে নেওয়
কোন্ শয়তানের কু-মন্ত্রণায়
সে আমায় দিয়েছে উপেক্ষা, নিরন্তর উপেক্ষা।
তথাপি তার জন্য বসে থাকা নিশ্চুপ একাকী
ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয় যন্ত্রণা, বড় যন্ত্রণা।

নখ দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিলো কারা নরম জ্যোৎস্না
পরিত্যক্ত এই আমি শুধু পড়ে আছি
স্নেহহীন রুক্ষ ভিটেমাটি আঁকড়ে।

কবিতা : কবিতা : কবিতা :

সে যায় শুধু বিশুদ্ধ গোমুখে/নিভা দে

স্মৃতিহীন বিস্মৃতির ঢেউ আসছে ধেয়ে—
আমি টের পাই—
মস্তিষ্কের ঝিল্লিতে তার বিপুল প্রত্যাখ্যান
দিনে দিনে বাড়ে—
আমি টের পাই—
অভিধান হাতে নিয়ে ভুলে যাই শব্দের সাম্প্রতিক মানে
চতুর বর্তমান ফাঁকি দিতে জানে বেশ
কেরাণীর কায়দায়
হঠাৎ অতি প্রাচীন দিনেরা উঠে আসে
উল্টো ঝাপটে—
মাটি খুঁড়ে-
স্মৃতির গলি ঘুঁজি পথ বেয়ে সে যায়
শুধু বিশুদ্ধ গোমুখে
বিস্মৃতি তো ভাল কখনো কখনো
বন্যার পলিতেই প্রতিটি শস্যের ক্ষেত—
সম্ভবত এভাবেই উর্বর হয় বার বার—।

আনুপূর্বিক উপস্থিতি/মহম্মদ মতিউল্লাহ

আর সব কিছু প্রস্তুত ছিল
ঘরসংসার পলতে বাতি বাসন কোসন
আমার উপস্থিতিশূন্য মান সম্মান
বস্তুতঃ আমার অকরণীয় সবকিছুর ছিল
উজ্জ্বল উপস্থিতি
আমি এসেছি পথে, নেমেছি ধুলোয়

পথের পাশে বিস্তীর্ণ বিপথে খাদে।
ও নিজেও প্রস্তুত ছিল
জবুথবু রোদ্দুর, লোভাতুর কথাবার্তা
পথ পাশে বালিকার
নিছক নৈর্ব্যক্তিক।
নেমেছি ধুলোয় একাকী
পথের পাশে বিস্তীর্ণ বিপথে খাদে।

অন্বেষণ/সমীর মণ্ডল

আমি দেখলাম,
বুক ভরা বেদনার কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে
কুয়াশা ভেজা ভোরে
পাতা কাঁপে, পাতা ঝরে, হিম ঝরে।
দেখলাম, এক ট্রেন ক্ষুধার্ত ইঁদুর
চলে গেল প্লাটফরম ছেড়ে।
আমার চোখের সামনে নেমে এলো
জেলখানার অন্ধকার
এখানে সকাল নেই, দুপুর নেই
শুধু রাত-রাত খেলা
দিনের পর দিন মেশে আঁধারে ;
কঙ্কালে কঙ্কালে হাসা হাসি, ছোটা ছুটি।
আমার হৃদপিণ্ড নেমে যায় ভূগর্ভের নীচে
নিকষ অন্ধকারে
সেখানে হারিয়ে গেছে আমার স্রষ্টা
তবু আমি খুঁজি প্রতি মুহূর্তে তাকেই
ভূপৃষ্ঠের সুরম্য উদ্যানে।
হিমানী স্তব্ধতায় টপ, টপ, জল পড়ে
গাছের বুক বেয়ে ঝরা পাতার বুকে।

নিত্য সঙ্গী দু'জন/শুদ্ধসত্ব গুহ

পুড়ছে দেহটা চিতায়, আগুন জ্বলে দেহে
লেলিহান বহ্নিশিখার হাত
আকাশটাকে টানছে কাছে স্নেহে।
নাইনোক্লক নাম দেওয়া সেই ফুল,
নগ্ন আলোয় পাপড়িগুলো ভীত।
সূর্য যখন আকাশে ছড়ায় আগুন।
দারুণ লাজে ফুলটা তখন মৃত!
ছাই ছিটিয়ে আগুন নিলো বিদায়,
নাইনোক্লক নাভিই থাকে পড়ে।
রোজ জীবনের নিত্যসঙ্গী দু'জন—
মহাকালকে আছে জড়িয়ে ধরে।

অনুভব/কুণাল মণ্ডল

মানুষেরা ফুল ভালোবাসে
ভালবাসে তরঙ্গিত নদী
শীতল শিশির নাচে ঘাসে,
এ সময় কাছে ডাকো যদি
বুক জ্বলে দীপ্র দাবদাহে
অন্ধকার জলে ভাসে মুখ
মলিনতা আছে কি প্রবাহে
একা একা থাকা নাকি সুখ।

অমল হালদারের

গল্প

ঝিলের জলে লাশ

শালিকটাকে দেখে কেমন যেন সুখ হতো অমলের। একখানা জানলা দিয়ে নীল আকাশের ছায়া যেন অমলের বিছানাটাকে ছুঁয়ে যেত। আর অতীতের হারানো দিনগুলো যেন শালিক হয়ে নেচে বেড়াতো অমলের চোখের সামনে। ঠিক তেতালার ছাদের ঐ শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের ফোয়ারায় যেমন করে আজ স্নান করে শালিকটা তেমনি করেই সেদিন হয়তো নাচতো জলের স্রোতে অমল, হেঁটে বেড়াত শীতলঘরে বালুচরে, লুকোচুরি খেলতো কাশফুলের বনে। তার পর–কোথায় যেন হারিয়ে যেতো সে।

সে কথা আজ হারিয়ে গেছে! তবু শালিকটা সেদিনের ইতিহাস হয়ে মাঝে–মাঝে আজও কাঁপিয়ে তোলে অমলকে। ঐ লাজুক চলন শালিকটা আর ঐ–শালিকের প্রেয়সীটা যখন শীততাপ যন্ত্রের ফোয়ারায় বসে স্নান করে তখন সত্যি সুখ হয় অমলের।

এখন দুপুর। এই দুপুরে শালিক দুটো আসবে। ওদের কিচির মিচির শব্দে মাতিয়ে তুলবে আকাশকে। আর ঘুম ভাঙিয়ে দেবে অমলের। দূরে নিমগাছটা হাতছানি দেবে। এখন নিমের আর পাতা নেই, নিম ফুলের গন্ধে এখন অমলের ঘরের ফিনাইলের গন্ধ উবে গেছে, ডেটলের গন্ধও এখন আর নাকে আসেনা। বাইরের ঝির-ঝিরে শালিক দুটো ভিজছে ও বাড়ির ছাদে। আজ যেন সমস্ত বাইরের পৃথিবীটা অমলের কাছে রোজ দেখা ঐ শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের ফোয়ারা–টার মতো মনে হচ্ছিল।

অথচ অন্ধকার হলে সেই একতলার ছোট্ট কেবিন ঘরটাকে যেন লাশকাটা ঘর মনে হয় ওর। সমস্ত হাসপাতালে বাড়িটা ছাড়িয়ে দূরে ঐ লাশকাটা ঘরের ছাদে শকুনগুলো যখন রাত্রে কাঁদতে শুরু করে আর একটা জমাট ভয় যেন সমস্ত আকাশটাকে কালি ঢেলে কদাকার করে তোলে ওর চোখে। গুচ্ছ–গুচ্ছ সাদা ফুল যেন বাদুড়ের মত ঝুলতে থাকে সেই অন্ধকারে।

সত্যি, রাত্রিটা কেমন যেন একলা মনে হয় ওর। সিস্টার সেন রাতের ওষুধ খাইয়ে চলে গেল। দূরে ঝিলটার জলে কাঁপন তুলে রাত্রি দশটার গাড়িটার শব্দে অমল জানে এবার রাত্রের মতো আর কেউ আসবে না। কিংবা এলেও ওষুধ নিয়ে অথবা থার্মোমিটার নিয়ে কেউ বিরক্ত করবে না তাকে।

বিকেল হলে অমল বিরক্ত হয়। কেমন একটা যান্ত্রিক সৌজন্যে অমলের অসুখটা যেন বেড়ে ওঠে। আত্মীয়–স্বজনের হায়–আপসোস ওকে ক্লান্ত করে তোলে। অমল ওর অসুখটা জানে। আর জানে বলে কারো থেকে এতটুকু লোক দেখানো সৌজন্যের প্রত্যাশা সে করে না।

যার প্রতি ওর দাবী ছিল, যার উপর ওর অধিকার ছিল, সেই অনুভা একদিন ওকে সত্যি ভালবাসতো। সেদিন অমলের অসুখ ছিল না। এমনি একটা অন্ধকার ঘরে সেদিন অমল সেন বন্দী ছিল না। সেদিন অধ্যাপক অমলের অনেক কিছু ছিল। অনুভা সেনের আদর আপ্যায়ন এক একদিন যে স্ত্রীর সাধারণ পর্য্যায় থেকে উপরে উঠে যেতো অমল সেদিন বুঝতে পেরেছিল। আর তা নিয়ে কপট দাম্পত্য কলহের নাটক তৈরী করে সেদিন বেশ কৌতুক বোধ করত অমল।

আজ কিন্তু অনুভার অভিনয় কপট নয়। দীর্ঘদিন অভিনয় করে অনুভা কেমন যেন সত্যিকারের অভিনেত্রী হয়ে উঠেছিল। বিকেল হলে এমনি একটা অভিনয় যেন করে অনুভা। রোজ...। অমল জানে আজ সে আর ঐ শালিকটার মতো খেলতে পারে না। কাশফুলের গুচ্ছের মত নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারে না।

কিংবা অনুভা যা-চায় তা হওয়াও হয়তো সম্ভব নয় অমলের পক্ষে। তবু অমল শালিক হতে চেয়েছিল। জানলার ফ্রেমের পর্দ্দায় চলমান মেঘের মতোই চলতে চেয়েছিল। প্রথম বাদাম ফুলের মত গন্ধ হতে চেয়েছিল অমল।

সে গন্ধের খবর অনুভা পেয়েছে। জীবনের সেই সাদাফুল দিনগুলোকে দুপুরে একলা শুয়েশুয়ে স্বপ্ন দেখে অমল। অনুভার বুকের কাছে মুখ নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার স্বপ্ন। বৃষ্টির সেতারে মুগ্ধ রাতে কেয়া ফুলের মাধুরীতে দুজনে এক হওয়ার একটি ছায়া যেন বেদনার মতো এখনো ক্লান্ত করে তোলে অমলকে। গলার ব্যথাটা বাড়ে। গতকালের 'রে'তে হয়তো গলাটা পুড়ে গেছে। চাকা-চাকা মাংস নেমে এসে যেন গলাটাকে শূন্য করে দিয়েছে। আজ ক'দিন ধরে কিছু গিলতে পারে না অমল।

অমল জানে আর ক'দিন পরেই হয়তো সেই লাশঘরের অন্ধকারটা নেমে আসবে অমলের চোখে। সেদিন হয়তো শালিক দুটোকে দেখতে পাবে না। সেই ফোয়ারার জলের নাচন শুনতে পাবে না। অনুভার অভিনয়ও হারিয়ে যাবে ওর মন থেকে।

সেদিন দুপুরের হাল্কা রোদে সামনের বাড়ির ছাদ থেকে একটা করুণ কান্না ভেসে আসছিল। শালিকের কান্না যেন সমস্ত দুপুরের নিস্তব্ধতাকে একটা করুণ সুরে বেঁধে রেখেছিল। অমল দেখল শালিকটা সেই শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ফোয়ারার কোণে সুতোয় হয়তো পা-জড়িয়ে গেছে ছাড়া পাওয়ার জন্য পাখা ঝাপ্টাচ্ছিল। আর দূর থেকে ঐ প্রেয়সী শালিকটা যেন আমার চোখে ওর মৃত্যু দেখছিল। সেই ফোয়ারার জলের ধারায় শালিকটা মরেছিল। আর রোদে বৃষ্টিতে ভিজে ও পুড়ে শালিকটাকে যেন কেমন একটা চামড়ার প্যাঁকাটি বলে মনে হয়েছিল। প্রেয়সী শালিকটা আসতো। একা বসে থাকতো ঐ ফোয়ারার ধারে। আবার চলে যেত। অমলের বুকে কেমন যেন একটা ব্যথা বেজে উঠতো। দুপুরের সেই করুণ আলোকে যেন মৃত্যুর অন্ধকারের মতো মনে হতো অমলের।

কিন্তু প্রেয়সী শালিকটা একা রইল না। আবার একটা শালিককে কোথা থেকে যেন জুটিয়ে নিয়ে এসেছিল সে। আবার ওরা দুজনে ফোয়ারায় স্নান করতো। স্নান শেষ হলে দূরে এই নিমগাছের ডালে গিয়ে বসতো। আর ঠিক ঐ মৃত শালিকটার মতো যেন ঠোঁটে ঠোঁট রেখে তার প্রেয়সী শালিকটাকে কি বলতো। তখন হয়তো হয়তো ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে কদম ফুলের গন্ধ এসে অমলের বুক ভরিয়ে দিতো।

অমল জানে আর একটু পরে বিকেল হবে। আর বিকেল হলেই অনুভার সঙ্গে ডাক্তার সুনীল বোস আসবে। সুনীল বোস ওদের বাড়ির ডাক্তার। সে ওর শরীরের খবর নেবে। অহেতুক যেন কতকগুলো উপদেশ ছড়িয়ে দেবে বিজ্ঞাপনের মতো অমলের মুখের উপর। অনুভার কমলালেবুর রস তৈরী তখনও হয়তো শেষ হবে না। তবু অনুভা উঠে যাবে। ডাঃ বোসের গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে ঐ নিমগাছের পাশে কদম গাছটার নীচে। অমল হয়তো ওর চোখকে বিশ্বাস করতে পারবে না। তবু অনুভা প্রায় ডাঃ বসুর গা-ঘেঁসে ঐ কদম গাছটা পর্যন্ত যাবে। ততক্ষণে হয়তো হাসপাতালের নীচের চত্বরটা অন্ধকারে ভরে গেছে।

সেই অন্ধকারে অনুভা আর সুনীল হয়তো ততক্ষণে মিশে গেছে। এত উপর থেকে অমল আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। অমলের মাথাটা যেন ঘুরে গেল। সুনীলের কথা মনে হলে আজকাল অমলের মাথা ঘোরে। আর সেই ফোয়ারার জলে মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই এ সেই শালিকটার মতোই যেন ছটফট করে অমল। দুপুরের রোদে সেই মৃত শালিকটার পচা গন্ধটাকে যেন লাশ ঘরের কাটা মৃতদেহের গন্ধের মতোই মনে হয়।

অমলের গলার ব্যথাটা বাড়ে। রাত দশটার ট্রেনটা সারা হাসপাতাল বাড়িটাকে যেন আলোকিত করে ঝিলের জল কাঁপিয়ে চলে যায়। ঐ শব্দটা যেন এখনো অমলের কানে লেগে আছে।

আজকাল কোন শব্দকে যেন অমল ভুলতে পারে না। সেদিন বিকেলে সুনীলের কথাগুলোও অমল ভুলতে পারছে না। কি করবো মিসেস সেন। মিঃ সেনের অসুখটা যে কিছুতেই-কাবু করতে পারা গেল না। রোগ বেড়েই চলেছে। আমরা ডাক্তার, আশা আমরা রাখবোই তবু ভগবান……।

সে চলে যাওয়া গাড়িটার শব্দের মতোই যেন ঐ সুনীলের কথাগুলো, অমলের কানে বাজছিল। আর সুনীলের লোভটাকেই যেন উপলব্ধি করছিল অমল সেই অন্ধকার রাত্রে, সেই একলা ঘরে। সুনীল চিরকাল লোভী ছিল। স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ার সময় ওর ঐ লোভ অমল দেখেছে। বিশেষ করে অনুভা গুপ্তকে ঘিরে সেদিন কলেজে যে নাটক অভিনীত হয়েছিল অমল, সুনীল ও অনিলের মধ্যে সে ইতিহাস অমলের মনে আছে। অমলই জয়ী হয়েছিল সেদিন!

অনুভা গুপ্ত তার ঘরে এসেই তার বলিষ্ঠ পৌরুষের ছায়ায় ডুবেছিল সেই কলেজের দিন-গুলোতে। অমল জানে আজ সেই পৌরুষ হারিয়েছে। চাকা-চাকা মাংস গলে পচে আজ সে মৃত শালিকটার মতো যেন অনুভার যৌবনের জোয়ারে উথাল-পাথাল হচ্ছে। আর সুনীল সেই পরে আসা শালিকটার মতো যেন অনুভার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অমল আয়নার পাশে এসে নিজেকে দেখল। ওর গলায় হাত দিল। সত্যি—অমল সব কিছু হারিয়ে ফেলেছে। নিজের পরিচিত চেহারাটাকেও অমল যেন আজ চিনতে পারলো না। কেমন একটা ভুতুড়ে অন্ধকারে বসে থাকা সেই লাশঘরের মাথায় সেই শকুনটার মতোই যেন ওকে মনে হল অমলের।

সত্যি অমল বুঝি স্বার্থপর। সে কিইবা দিতে পেরেছে অনুভাকে। এ-রোগজীর্ণ শরীরের বন্ধনে সে সামাজিক অধিকারের দায়িত্বে অনুভাকে বেঁধে রেখেছে। কিংবা অনুভার সকল আশায় কালি ঢেলে রাত্রির অন্ধকারে হয়তো একটি চাঁদনী রাতকে বন্দী করতে চাইছে।

অমল ভাবল অনুভা যদি ঐ প্রেয়সী শালিক হতো, তবে শালিকের সমাজে অমল হয়তো অপাং-ক্তেয় হতো না। অমলের চোখে সেই নতুন শালিক

দম্পতির ক্রীড়ারত চিত্রটি ফুটে উঠেছে। সেই জানালার পাশে এসে অমল দাঁড়াল। সেই শীতাতাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের জলের ফোয়ারাটা দেখে যেন অমলের মনে হ'ল সে আর বাঁচবে না। আজকে সকালেও চাকা-চাকা মাংস পড়েছে গলা থেকে। রক্ত পড়েছে। এক্সরে-র আলোটা বুঝি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, গলাটায় একবার হাত বুলাল অমল। মনে হলো গলাটা কেটে গেলে এখন যেন এক ফোঁটা রক্তও বেরুবে না।

অমল নিমগাছ ও কদমগাছটাকে দেখল। ঝির-ঝিরে বৃষ্টিতে আজকের বিকেল অন্ধকার। তবু অনুভা এসেছিল। জানলার পাশে বসেছিল। অমল কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু বলতে পারলো না। কেবল চেয়ে চেয়ে অনুভাকে দেখতে লাগল।

অমন করে কী দেখছো······অনুভার প্রশ্নে যেন কোন আন্তরিকতা ছিল না। অনুভা যেন অভিনয় করছে। আজ অমলের, অনুভার সেই অভিনয় ভালো লাগলো। তাই অমল কিছু বললো না। অমল জানে একটু পরে সুনীল আসবে। হ্যাঁ সুনীল এসেছিল। ওর হাতের কমলালেবুর লাল রংটার মতোই সুনীলকে দেখতে লাগছিল। সত্যি অনুভার পাশে সুনীল কে মানায়। দেখল অনুভা আর সুনীল গেল।

সেই বৃষ্টির রাতে নিমগাছটার নিচে দাঁড়ানো গাড়িটার হর্ণটার চিৎকার যেন অমলের শানাই মনে হয়েছিল।

সেই শানাই এর সুর, রাত্রির অন্ধকারে সেই লাশ-ঘরটার উপরে বসা শকুনটার চিৎকারে অমল যেন নিজেকে ফিরে পেল। ঝির-ঝিরে বৃষ্টিতে নিম ফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল। সিস্টার রাতের ওষুধ দিয়ে গেছে। অমল আজ ওষুধ ছুঁলনা।

আজ যেন আবার অমল সেই মরা শালিকটাকে দেখল। সেই পিছনের ছাদে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের ফোয়ারায় মরে আছে। অমলের ঐ পূর্ব দিকের লাশঘরটার কথা মনে পড়লো। কেমন একটা মৃত্যুর ছায়া যেন অমলের আশে-পাশে ঘুর-ঘুর করছে মনে হল। অ্যাক্সিডেণ্ট হলে বা আত্মহত্যা করলে ময়না তদন্তে বুঝি মানুষ ঐ লাশঘরে আসে। কয়েক বছর আগে দেখা রেল লাইনে গলা রেখে, যে লোকটা মরেছিল সেই দৃশ্যটা মনে পড়ল অমলের। গলাটায় হাত বুলিয়ে যেন কান্না পেল আজ।

কে···যেন দূরে ডাকছিল অমলের মনে হল! ঐ দূরে ঝিলটায় একটুপরেই ট্রেন গাড়িটার আলোর ছায়া পড়বে। ঝির-ঝিরে বৃষ্টিতে গাছগুলির তলা স্যাঁত-স্যাঁতে হবে। না ওদিক দিয়ে যেতে অমল পড়ে যাবে না। কিংবা গলার উপর দিয়ে ঐ ট্রেনটা চলে গেলেও বুঝি এক ফোঁটা রক্তও বেরুবে না।

আজ তবু অন্ধকারটাকে বড় ভয় হল অমলের! তবে কি মৃত্যুর আগে মানুষ অন্ধকারকে ভয় করে···? অমল ধীর পায়ে হেঁটে গেল। হাসপাতালের ঝিলটার পাশে দাঁড়াল না। বৃষ্টিতে ভিজে শীত করছিল অমলের। এইতো শেষ শীত। অমলের মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। সেদিন অমল বুঝি ট্রেনের ইঞ্জিনের হেড লাইট দেখতে পায়নি। সেই আলোর বৃত্তে কেমন একটা অন্ধকার যেন অমলকে টেনে নিয়ে চলল। তখন সেই মৃত শালিকটার মতোই বাঁচবার শেষ চেষ্টা করেও সেই আলোর জোয়ারে বোধহয়, অমলের রোজ দেখা ঝিলের জলে লাফিয়ে পড়ল। ঝুপ করে একটা শব্দ হলো মাত্র। ঝিলটায় তখন আলো ছিল না। কয়েকটা বাদুড় ইঞ্জিনের হুইসিলের মতো একটা করুণ চিৎকার করে উড়ে গেল।

★ গল্পটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে।

শারদ সাহিত্য ঃ সমীক্ষা

- ধৃতরাষ্ট্র/মনোজ রাউত/শিলিগুড়ি
- শিলিগুড়ি/জয়ন্ত হাজরা/শিলিগুড়ি
- পঞ্চমা/সোফিওর রহমান/তেরপেখিয়া মেদিনীপুর
- অনুস্তুর/তপনকুমার মাইতি, নরেশচন্দ্র দাস /হলদিয়া

এ বছর লিটিল ম্যাগাজিনের শারদ সংখ্যায় যেটা বিশেষ করে চোখে পড়ছে তা হল এক বা একাধিক প্রবন্ধের উপস্থিতি। উল্লিখিত চারটি কাগজও এর বাইরে নয় যে একথা বললে যথাযথ হবে না। এখানে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির কোনটিতে মেধার লাবণ্যময় ব্যবহার ('লেখকের উপনিবেশ' হাসান আজিজুল হক 'ধৃতরাষ্ট্র') কোনটিতে তথ্যের অনুপুঙ্খ বিস্তার (অসীম রেজ 'শিলিগুড়ি', বিকাশ সরকার 'ধৃতরাষ্ট্র', দীপক মিত্র 'অনুস্তুর', প্রভাসচন্দ্র চৌধুরী 'পঞ্চমা') কোথাও বা বলিষ্ঠ ঋজু গদ্যের ব্যবহারে আর সব লেখাকে ছাপিয়ে যাওয়ায় স্পন্দিত। পরিসর স্বল্প হলেও (উত্তর বঙ্গের গম্ভীরা গান 'ধৃতরাষ্ট্র', নজরুলের গানে শ্রীরাধার লৌকিকতা 'অনুস্তুর', ইসলামী স্থাপত্য 'পঞ্চমা') উল্লেখযোগ্য পরিশ্রমী রচনা।

কবিরা খুব রাগি হবে, মুখে রাখ ঢাক থাকবে না, কারো ভালো লাগুক চাই না লাগুক মুখের ওপর বিদ্যুচ্চমকের মত সত্য কথাটা বলে দিতে কসুর করবে না তারা। তারা টালমাটাল পায়ে ভাঙচুর করতে করতে আবিষ্কার করবে এক নতুন পৃথিবী। বিস্ময়ে মূক হয়ে যাবে কবিতার পাঠক। তেমন ভাঙচুর নেই, নেই নতুন কিছু আবিষ্কারের কোন ইঙ্গিত। তবু গতানুগতিক হলেও ভাল লাগে পঞ্চমার বেশ কিছু কবিতা। ৮০-এর দশকের কয়েকজনের দৃপ্ত ভঙ্গি ভাল লেগেছে ঐ কাগজে। অনুস্তুরে-ও বেশ কিছু ভাল কবিতা প্রকাশিত।

পাশাপাশি গল্পের আলোচনায় এলে মন খারাপ হয়ে যায়। একমাত্র ছোটগল্পের জন্যেই নাকি বাংলা সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যের সমপর্যায়ে—এরকম একটি সিদ্ধান্ত আমরা বোধহয় মেনে টেনে নিয়েছি। কিন্তু হায়, এরকম স্পর্দ্ধিত গল্প নেই কেন! সংখ্যাতেও যে গল্প বড্ড কম। ৪টি কাগজে ৮টি গল্প। তুলনায় কবিতা ৮৪ এবং প্রবন্ধ-১৭। প্রকাশিত গল্প গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্প সুজিত দাশগুপ্তের ('জামা', শিলিগুড়ি) তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ('জঙ্গল: কয়েক মুহূর্তের পোষ্টমর্টেম', অনুস্তুর) এবং বিষ্ণু বেরার ('ইমানদার', পঞ্চমা) সুজিত দাশগুপ্ত'র (জামা) বিষয়টি বড় সুন্দর। আঙ্গিকটিও ভাল। যদিও প্রচলিত। তা সত্ত্বেও আমাদের নতুন করে ভাবায়। সহজ ভাবে গভীর কথা বলা লেখকের আয়ত্তে।

হাজারো এলেবেলে কাগজের ভিড়ে আলোচ্য চারটি কাগজ লেখা নির্বাচন, সম্পাদনা ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করবে। লিটিল ম্যাগাজিনের যথার্থ চরিত্র তৈরী করার তেমন কোন প্রচেষ্টা

লক্ষ্য করা না গেলেও আপাতত যা পেয়েছি তার জন্যে সম্পাদকদের ধন্যবাদ।

গৌর বৈরাগী

○ জাগরী (শারদীয়া সংখ্যা) সম্পাদকঃ অপূর্ব কুমার সাহা, বাগবাজার কলকাতা।

সুন্দর মলাটে ঢাকা "জাগরী"। প্রচ্ছদ সুচিন্তিত। পত্রিকাটি খুলতে গিয়ে কতকগুলো কবিতায় চোখ পড়ল। কবিতা শুধুমাত্র কবিতা লেখার জন্য যদি হয় তবে পাঠক হিসেবে কিছুটা মেনে নেওয়া ছাড়া এই সৃষ্টিগুলোর পরিশ্রমের মূল্যায়নের অন্য কোন পথ দেখছি না। তবুও লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত এবং সমীর মণ্ডল কিছুটা আমেজের ছোঁয় দেন।

গল্প ও রম্য রচনার ক্ষেত্রে দিলীপ মিত্রের 'ডেথ স্কোয়াড' বড্ড বেশী হতাশ করে। মনোহর বিশ্বাসের, জয়দেব রায়ের, প্রফুল্লকুমার সিংহের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় কিন্তু রম্য রচনার গতিতে বিচরণে শৃংখলা কম এবং যথেষ্ট মুন্সীয়ানার অভাবে শেষ পর্যায়ে পাঠককে ভাবায় না। একটা তৃষ্ণা অহেতুক ভাবে থেকেই যায়।

ভাল লাগল নবকুমার শীলের এবং সমীরণ রুদ্রের প্রচেষ্টাকে বিশেষ করে। প্রবোধ রায় চক্রবর্তী এবং শক্তি রাহার বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীর অপ্রতুলতা সত্বেও পাঠককে খুশি করে।

○ বর্তমান দ্বিতীয় ভুবন, শারদ সংখ্যা, ভদ্রকালী, হুগলী, সম্পাদক মোমেন চট্টোপাধ্যায়, প্রণবকুমার চৌধুরী।

সাধারণ মলাটে সুন্দর প্রচ্ছদ শিল্প। কবিতায়, গল্পে এবং প্রবন্ধে মোটামুটি একটা সার্থক পত্রিকা। প্রবন্ধে সত্যজিৎ রায় নতুনত্বের গন্ধ ছড়াতে পারলেন না। বিশেষ রচনা হিসেবে দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তথ্য মূলক রচনা আকর্ষণ করে।

কতকগুলি ভাল কবিতার সন্ধান পেলাম এ কবিতায়। প্রবীর পোদ্দারের, সমর মাঝির কব্জির মোচড় একটা অন্য অনুভূতিতে পৌঁছে দেয়।

গল্পে যথেষ্ট রকম হতাশ করলেন অসিত দত্ত। মোমেন চট্টোপাধ্যায় তার গল্পে নির্দিষ্ট একটা পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছেন। রজনীগন্ধার উপস্থিতির এবং কথামালার ছক মেলানোর রূপকে গল্পের মূল বক্তব্যে পৌঁছবার চেষ্টা ঠিক সার্থক হয় নি। সুপ্রযুক্ত আঙ্গিকের দোষে গল্প মাঝে মাঝে শ্লথ হয়েছে এবং হোঁচট খেয়েছে।

○ 'রা' পত্রিকা, সম্পাদক ঋতীশ চক্রবর্তী, দ্বাদশ বর্ষ দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা। বিধান পার্ক বরানগর কলকাতা।

প্রবন্ধ ও রম্য রচনাগুলিতে রসদ বড্ড কম। তবুও ডাঃ আবীরলাল মুখার্জী কিছুটা মন ভরালেন।

কবিতায় মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়,"জ্যাঠো মাইতি মনে দাগ কাটেন। সঞ্জয় দত্তের 'বন্য খরার চড়া' খুবই দুর্বল প্রয়াস বলে মনে হল।

সচীদুলাল দাসের 'নির্জন স্বাক্ষর' সার্থক গল্প হয়ে ওঠেনি। গল্পের আঙ্গিক এবং গতি মোটেই সংযমী এবং সুচিন্তিত নয়। বিষয়বস্তু এবং ভাবনা চিন্তা খুবই দুর্বল।

○ সন্দীপন, ১৭ বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৯০ সম্পাদক কাশীনাথ ঘোষ। বৈদ্যবাটী/হুগলী

সাধারণ মলাটে মোটামুটি প্রচ্ছদ। পত্রিকাটি মূলত কবিতা নির্ভর। কবিতাগুলো পড়লাম। সার্থক সংযত কবিতা তেমন পেলাম না। বেশীর ভাগই আবেগ তাড়িত। তবুও পাতা উল্টোতেই দিজেন

আচার্য, সন্দীপ দত্ত নজর কাড়লেন। সন্তোষকুমার মাজীর শব্দ ঝংকার সত্যই দুরপরবাসে বিশ্বস্ত রক্তে স্বপ্ন দেখায়। ভাল লাগল সমীর মণ্ডলকে এবং মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়কে তাদের রচনার কক্ষে।

গল্পে গৌর বৈরাগী পাঠককে কিছুটা গভীরতাব ছোঁয়া দেন। "জীবন যাপনের" একেবারে অনেক ভেতরে আমরা সেই জ্বালার উৎসকে খুঁজেছি। গল্পের গতি তার বক্তব্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাবলীল।

শীতল দাসের প্রয়াস প্রশংসনীয়।

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

O শারদীয় শিশুপ্রিয়/চাতরা, শ্রীরামপুর, হুগলী/দাম দু'টাকা

ছোটোদের পত্রিকার বড় অভাব। তেমন ছোটোদের পত্রিকা আর কই। তবু 'শিশুপ্রিয়' দীর্ঘ ১২ বছর চলছে এবং এর দীর্ঘায়ু কামনা করি। ছোটোদের গল্পগুলি ভাল লাগবে তবে ছড়ার যে স্বকীয়তা থাকা দরকার তা নেই। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, দেবরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও গৌতম গুলুইকে বলা যায়।

O মনিমুক্তা/২০, দেবেন্দ্র গাঙ্গুলী রোড, হাওড়া-৩

ছড়া ও কিছু ছোটোদের গল্প নিয়ে মনিমুক্তার পুজা সংখ্যা। গল্পগুলির মধ্যে বেশ ভাল লাগল মাণিক মুখোপাধ্যায়, সর্বানী সাধুখাঁ, অজিতকুমার দাস, কেয়া সামন্ত ও শংকর মিত্রের গল্প। ছড়াগুলি ছড়িয়ে পড়ার দাবী রাখতে পারেনি। তবু ভাল বলা যায় কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমল ত্রিবেদীর ছড়া। ভবানী প্রসাদ মজুমদারের ছড়াটা মন্দ নয়। কিন্তু প্রখ্যাত ছড়াকারের ছড়ার ঢং বা আদল বা আঙ্গিক বা ছাপ স্পষ্ট।

O স্বাস্থিক/নিউটাউন, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি/বিনিময় এক টাকা

উদয়ন ভট্টাচার্যের প্রবন্ধটি সময়োপযোগী রচনা। পেশাগত বিপদ সম্বন্ধে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা সত্যি ভাববার। এই প্রসঙ্গে একটা কথা, তিনি যদি কিছুটা প্রতিকারের (কি ভাবে অন্তত রক্ষা পাওয়া যায়) কথা বলতেন তা হলে খেটে খাওয়া মানুষরা প্রতিনিয়ত ভয় বা ক্ষয় নিয়ে কাজ করত না। এছাড়া অন্য গল্পগুলি কি সত্যই গল্প হয়ে উঠল। একই কথা কবিতার ক্ষেত্রেও।

O পুণশ্চ শারদসংখ্যা ১৩৯১/সাহিত্য সংসদ, মায়াপুর, হুগলী/অনুদান ৫ টাকা

সম্পাদকীয়তে যত মুন্সীয়ানা আছে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ নির্বাচনে ততটা দেখতে পেলাম না। কবিতায় কবিতা খুঁজে পেয়েছি অজিত বাইরী, প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়, সাধন বারিক, গোকুলেশ্বর ঘুমটিয়া ও আবুল কাসেম এদের কবিতায়। আর দিনেশ দাস 'হত-ভাগাদের কবরে' কবিতায় বেশ সুন্দর এবং সহজভাবে যে কথা উপহার দিলেন তা অনন্যতার দাবী রাখে। গল্পের ক্ষেত্রে নিখিলেশ ঘোষের অঙ্ক হিসেবের গরমিলেই থেকে গেল। তিনি কি বলতে চাইলেন এবং পরিমিতিবোধ থাকলে গল্পটা গল্প হিসেবে পাঠকের মনোযোগ কাড়তে পারত।

বিশেষ যে প্রবন্ধটি পত্রিকাটির একটি অনবদ্য উপাদান তা হল 'গণেশ পাইনের শিল্প মানস' এটিই পত্রিকাটির অমূল্য সম্পদ।

অমল দাস

সংবাদ

○ হুগলীতে প্রতিবন্ধী কেন্দ্র

কানে শোনা ও কথা বলায় অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের জন্য হুগলীর "প্রতিবন্ধী কল্যাণ কেন্দ্র" (ব্যাণ্ডেল চার্চের নিকট) আগামী ১১ই মার্চ থেকে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত এক বিশেষ সহায়তা দান শিবিরের আয়োজন করেছে। অসুবিধাগ্রস্তদের অভিভাবক সহ সকাল ১০টা থেকে ১২টার মধ্যে উক্ত শিবিরে যোগাযোগ করতে জানানো যাচ্ছে।

○ শিল্পী হরিশংকর চট্টোপাধ্যায়ের একক ভাস্কর্য্য ও চিত্র প্রদর্শনী

একাদেমী অফ্ ফাইন আর্টস-এর উত্তর গ্যালারীতে ২২শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হোল শিল্পী হরিশংকর মুখোপাধ্যায়ের ভাস্কর্য্য ও চিত্র প্রদর্শনী। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্য শাখার রীডার ডঃ শংকরলাল মুখোপাধ্যায়। ঐ দিনের অনুষ্ঠানের সভানেত্রী ছিলেন একাদেমীর সভানেত্রী শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন দুই প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীফুলচাঁদ পাইন ও শ্রীমতী সানু লাহিড়ী। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের ভাস্কর্য্য ও চিত্র উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে।

○ স্বর ও লিপি'র কবিতা সন্ধ্যা

হুগলীর হিন্দমোটরের স্বরলিপি মৌলালীর প্রজ্ঞানন্দ ভবনে এক নতুন পরিকল্পনায় সুন্দর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন ২২শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায়। নির্বাচিত তিন কবি অজিত বাইরী, প্রমোদ বসু ও বিশ্বনাথ সিংহ স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। কবিতা আবৃত্তি করেন সমীরণ চ্যাং, সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় ও সোমা দাস। কবিতার গীতিরূপ পরিবেশন করেন ঋষিণ মিত্র, সুধীন সরকার ও তাপসী চট্টোপাধ্যায়। বিভূতি চন্দ সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

○ কল্লোল—আয়োজিত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা

হুগলী-চুঁচুড়া তথা পশ্চিম বাংলার অন্যতম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান চুঁচুড়া কল্লোল সাংস্কৃতিক সংস্থার একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল চুঁচুড়া রবীন্দ্রভবনে। এই সংস্থাটি গত ১৯৬৫ সাল থেকে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছেন। তখন প্রতিযোগিতার আসর বসতো চুঁচুড়া ষণ্ডেশ্বরতলায়।

এ বছর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী '৮৫ থেকে ১৭ই ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয় গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ৮৫। কিছু নাটক মানুষের মনে নাড়া দিয়েছে।

উত্তরপাড়ার সীমন্তক নাট্য সংস্থার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রীঅমিতাভ ঘোষের (বিশল্যকরণী) অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছি। এত উন্নতমানের অভিনেতা বিরল।

নীচে প্রথম ১০টি সংস্থার নাম দেওয়া হলো !

১) সীমন্তক, উত্তরপাড়া (বিশল্যকরণী), (২) যন্ত্রতন্ত্র, ভদ্রকালী (সদ্গতি), (৩) অভিযাত্রী, পাণিহাটী (নিহত শতাব্দী), (৪) ক্লাসিক, চন্দননগর (মাছি), (৫) চিনসুরা কালচারাল (গুরুঠাকুর), (৬) নন্দন, হাওড়া (মন্ত্রীবিলাস), (৭) থিয়েটার ল্যাব, উত্তরপাড়া (হিপোক্রীট), (৮) আমরা কজন, হুগলী (রাজা আয়দিশউস্) (৯) টুলরুম-রিক্রি: ইচ্ছাপুর (অনির্বান), (১০) এষণা, চুঁচুড়া (ডাক)।

কৃষকদের নিকট মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

সমবায় কৃষি ঋণ শোধ করুন

পশ্চিমবঙ্গে সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ অর্থ অনাদায়ের ফলে কৃষিতে দাদনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এর ফলে কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না। এই অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন।

এবার গত বছরের মত রাজ্যের সর্বত্র ফসল ভাল হয়েছে, এবং বাজারে পাটের দাম ভাল হওয়াতে কৃষকদের পক্ষে ঋণ শোধ করা সহজ হবে।

ঋণ-গ্রহীতা সকল কৃষকের কাছে আমার আবেদন, আপনারা সবাই ঋণ পরিশোধ করুন এবং নতুন করে ঋণ গ্রহণ করে কৃষিতে বেশী করে অর্থ বিনিয়োগ করুন।

কৃষিতে নিযুক্ত দরিদ্র মানুষকে বেশী করে ঋণ দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু কিছু সংখ্যক সম্পন্ন চাষী নিজেরা ঋণ শোধ করছে না এবং অপরকেও ঋণ শোধ না করতে প্ররোচিত করছে। ফলে দরিদ্র কৃষক, বর্গাদার ও ক্ষেতমজুরদের প্রয়োজনমত ঋণ দেওয়া যাচ্ছে না। এই অবস্থাও চলতে দেওয়া যায়না। দরিদ্র কৃষকের স্বার্থে আজ বকেয়া ঋণ আদায় ও নতুন ঋণ দান করা প্রয়োজন।

ঋণ আদায়ের কাজে পঞ্চায়েত, কৃষক সংগঠন, সমবায় সমিতি, বিধায়ক, সবাই এগিয়ে আসবেন, এই আশা আমি করি।

জ্যোতি বসু
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

হুগলী জেলা তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত

বাইশ, ফাল্গুন ১৩৯১ গোধুলি-মুন

GODHULI-MONE [illegible] R. N. 27213/75 . February '85 [illegible]
Vol. 27, No. 2 Postal Regd. No. Hy-214 Price—Rs. 2·00 only

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পপুলার প্রিন্টার্স, বারাসত, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও নতুনপাড়া, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

গোধূলি মন

এই সংখ্যায় :

চৈত্র ১৩৯১ সংখ্যা

O প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি মন O

O গোধূলিমন, বইমেলা, ৮৫ সংখ্যাটিতে সোফিওর রহমানের একটি দুঃসাহসীক লেখা পড়লাম। সত্যি কথা বলতে কি মুষ্টিমেয় দু-চারজন কবিছাড়া আর সকলেই একে অপরের নিন্দায় মুখর। শুধু সাহস করে ছাপার অক্ষরে এযাবৎ প্রকাশিত হয়নি। সত্তরের স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায় তার কবিতার উজ্জ্বলতা এখন আর বজায় রাখতে পারছেন না। প্রায় লিটিল ম্যাগাজিনে—যেখানে তার কবিতা দেখি হয় সেগুলো পুরনো লেখা নয়তো স্নেহলতার কাব্যগ্রন্থ থেকে টুকে পাঠানো। স্নেহলতার কাছে আমাদের প্রশ্ন—নতুন কবিতা লিখতে না পারা অন্যায় নয়, তাই বলে পুরনো কবিতা পাঠিয়ে ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলিকে প্রতারণা করা ঠিক নয়। যতদুর মনে হয় 'যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের' মাঝখানে এসে স্নেহলতা আর লিখতে পারছেন না। শ্যামলকান্তি দাসকে নিয়ে কেচ্ছামৃত লেখার অনেক উৎস আছে—সোফিওর একটু চেষ্টা করলেই তা খুঁজে পাবেন। অশোকবাবুও বোধহয় জানেন। প্রীতি

সমীরকুমার রক্ষিত

কলিকাতা-৫০

O O O O

O অযাচিত ভাবে গোধূলিমনের শারদীয়া সংখ্যা হাতে এসে গেল। খুব সুন্দর করেছেন কাগজ। এবারের গোধূলিমনে 'প্রসঙ্গ গোধূলিমন' দারুণ উপভোগ্য হয়েছে। সাহিত্যক্ষেত্রে এরকম পত্রযুদ্ধের গুরুত্ব অনেক। শ্রীঅজিত রায়ের Philosophical দিকটা বেশ চাঁছাছোলা। পত্রিকাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে তাঁর অবদান অনেক। গদ্যে, পদ্যে, অঙ্কনে তিনি এই পত্রিকাকে ভরে তুলেছেন। হাংরি কবিদের নিয়ে তিনি যে আলোচনা করেছেন, তা 'কৌরবে'র দপ্তরেও আলোচিত হয়েছে। আমি লেখাটি না দেখলেও আলোচনার মাধ্যমে শ্রীরায়ের Understanding টা যা বুঝেছি তাতে তাঁকে সাধুবাদ না দিয়ে পারছি না।

এবারের শারদ সংখ্যায় অজিতবাবুর প্রবন্ধ 'দুর্গাপকুররাত্র, আঠারো শতক এবং জগদ্রাম' সার্থক ও সময়োপযোগী। সোফিওর রহমানের গল্প 'কল্পনা, সময় কি পাথর হয়' এবং অরুণ মণ্ডল কৃত ল্যাংষ্টন হিউজ ও তাঁর কবিতা খুব সুন্দর লেগেছে। সামগ্রিক বিচারে গোধূলি মন যথার্থ Little Mag. আপনারা সবাই আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানুন। ইতি

বিমলাকান্তি বসু

রাজেন্দ্র নগর, পাটনা-২৬

O অশোকবাবু আপনার সম্পাদিত পত্রিকা আজ ডাকযোগে পেলাম অতএব আপনার আন্তরিকতার জন্য জানাই অশেষ ধন্যবাদ।

'গোধূলি মন' কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ '৯১ সংখ্যাটি হাতেপেয়ে দুচারটি কথা না জানিয়ে পারলাম না যদি কোনো ভুল করে থাকি অবশ্যই প্রকাশে বিবেচ্য। মনেধরে : গোধূলিমন প্রসঙ্গ, সংবাদ, সম্পাদকীয় গল্প অপেক্ষা কবিতাগুলি খুবই হৃদয়গ্রাহী। অসাধারণ ফারুক নওয়াজ ও আর কবি যার লেখা—"রক্তের মধ্যে সুর"। কিন্তু বিশ্বাস করুন মোটেও ভালো লাগেনি—শারদ সাহিত্য : সমীক্ষা. অন্তত লিটিল ম্যাগাজিনে এধরণের তাচ্ছিল্য মানে নিজেদের গায়ে থুথু ছেটানো ছাড়া আর কিবা হতে পারে! পাঠশালাকে যদি কলেজ বলে ধরে নেন তাহলে হাতেখড়ি হবে কোথায়? জগত লাহা মহাশয়কে সবিনয়ে বলি যদি দয়া করে সেই সব অর্থাৎ (আপনার কথায় অযোগ্য) অজস্র ছোট পত্রিকার মাত্র একটি করে লাইন সমীক্ষার ফল স্বরূপ প্রকাশ করতেন তাহলে সেই সব সম্পাদকেরা আপনার কাছ থেকে নিশ্চয় কিছু উপকার পেতেন বলেই মনে করি। অবশেষে আপনাদের সর্বিক মঙ্গল কামনা করি। নমস্কারান্তে

তপন

'সাহিত্য ভবন', ১৭, ঈশ্বরচন্দ্র ব্যানার্জী লেন

কলিকাতা-৭০০০৩৭

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধুলি মন

২৭ বর্ষ/৩য় সংখ্যা

মার্চ/১৯৮৫
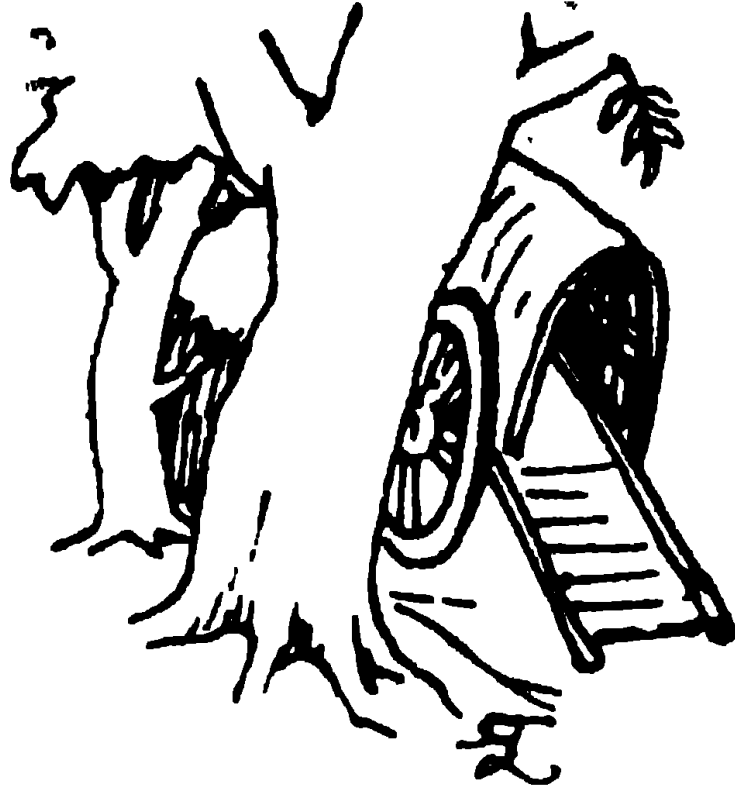
প্রতি সংখ্যা দুই টাকা
বার্ষিক সডাক কুড়ি টাকা

সম্পাদকীয়

'গোধুলি-মন' বিগত বইমেলা সংখ্যায়' সোফিওর রহমানের 'সাহিত্যের আড্ডা : কেচ্ছামৃত' শীর্ষক লেখাটি পড়ে মেদিনীপুরের কতিপয় সম্পাদক তথা সাহিত্যকর্মী সম্মিলিত প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়েছেন। প্রতিবাদ পত্রটি হুবহু 'প্রসঙ্গ : গোধুলি-মন' বিভাগে প্রকাশ করা হোল। ইতিপূর্বে ঐ লেখা প্রসঙ্গে যে কটি পত্র পেয়েছি সকলেই লেখককে স্পষ্ট বক্তব্যের জন্য সাধুবাদ জানিয়েছেন।
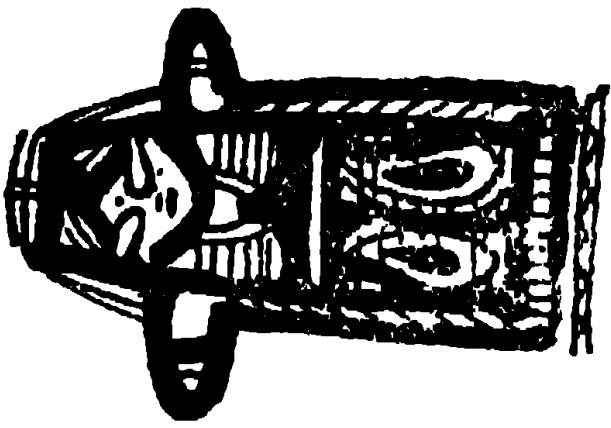
সাহিত্যের অঙ্গণ পরিস্কার থাক। বিশেষতঃ ছোট পত্রিকা তথা লিটিল ম্যাগাজিনের অঙ্গণ;—সেই কারণেই এই ধরণের লেখা প্রকাশের সার্থকতা আছে বলে মনে করেই আমরা লেখাটি প্রকাশ করেছিলাম। আয়নায় নিজেদের মুখ দেখে নিজেদের ঠিক করে নেবার জন্য। ব্যক্তিগতভাবে কারোকে আঘাত করা বা ছোট করার কোন্ উদ্দেশ্য আমাদের ছিলনা। এবং ছিলনা বলেই ঐ সম্মিলিত প্রতিবাদ পত্র ছাড়া অন্যান্য জেলার সম্পাদক তথা সাহিত্য প্রেমিকরা আমাদের অভিনন্দিত করেছেন। তবু যদি কেউ ঐ লেখায় আহত হয়ে থাকেন তবে আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

অশোক চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক

সম্পাদকীয় কার্যালয় ॥ নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর ॥ হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥ ভারত

উলুবেড়িয়ান যুবকের সিগন্যাল (৪ /সৌমিত্র ব্যানার্জী

কেউ কোথাও নেই, কোনখানে কেউ
বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে গেরামের রঙ।
লাল ধুলোতে গরুর চাকার দাগ।
উলুটি বেয়ে শব্দ করছে টুপ টাপ টুপ
এখানে মৌনতা রাখা শ্রেয়।

ভরা যৌবনা নদীর কাছে, এখন
আমি করজোড়ে একটা সেতু চাইছি,
যে আমাকে কালো রাখাল বালকের
সাথে করে পৌঁছে দেবে কবিতার খোড়ো চালা ঘরে।

প্রার্থনায় কাতর রাগী রোদ্দুর আমাকে ডাকছে।
রাতের জাফরাণী জ্যোৎস্না আমাকে ডাকছে।
চোখের সামনে কয়লার ইঞ্জিনের মতো
সরু হয়ে যাওয়া রেল লাইন ধরে
আমার দুর্বিনীত জেদী শব্দ গুলো হারিয়ে যাচ্ছে।
ফুরিয়ে যাচ্ছে আহা ফুরিয়ে যাচ্ছে—
এক জেদী যুবকের প্যালেটর রক্তিম রঙ॥

সোনালী ধ্বস/শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়

মনের সিঁড়ি ভাঙলো যখন
পায়ের কাছে
আতঙ্কতে দু'হাত দূরে
যাইনি সরে
পূর্ণিমা চাঁদ সাক্ষী আছে
তখন থেকেই দু'হাত দিয়ে
চোখ ভরা জল মুছিয়ে দিয়ে
সব কথাতেই সুর দিয়েছি কণ্ঠ দিয়ে
কথায় কথায় দাস হয়েছি
সিঁড়ির কাছে
ভুল কিছু কি থেকেই গেছে ঐ নদীতে
রক্ত শিরায় অস্থিতে আজ
পূর্ণিমা চাঁদ সাক্ষী আছে
মনের সিঁড়ি ভাঙলো যখন
পায়ের কাছে।

লক্ষ্য রাখতে হবে/রবীন সুর

এই হত্যার পর দেশ
কোনদিকে এগোয়
আমাদের তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

তিনিও কি কোনো হত্যার ব্যাপারে
অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িয়েছিলেন ?
অনেক শহীদবেদী নিস্তব্ধতার পাশে গিয়ে
আমাদের পুনর্বিবেচনায় বসতে হবে !

মানুষের ইতিহাস
রক্তগঙ্গার ইতিহাস
কে অ্যাণ্টনি
কে ব্রুটাস
তার উপর নির্ভর করছে
আমাদের অভিনন্দন
অথবা অভিসম্পাত।

চণ্ডাশোকের মত বড় হত্যাকারী কে
ধর্মাশোকের মত কল্যাণকামী কে
আমাদের তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

অভিজ্ঞান/বিজয়কুমার দত্ত

পাহাড়ে ওঠার দিন দূর অস্ত। এখন ভ্রমণ
সমতলে ঘাসের সবুজে
চড়াই উৎরাই ভেঙে ছোটাছুটি করে
যে দিন গিয়েছে চলে, তাকে
কে আর এ অবেলায় শুধু মনে রাখে ?

ঘোরানো সিঁড়ির শেষে সাজানো মন্দিরে
কোথাও রয়েছে হয়ত' ধ্যানের প্রতিমা
তাকে আর, পূজা-উপকরণের ভারে
সাজিয়ে রাখার কোনো অবকাশ নেই
জীবনের শাদা-মাটা অভিজ্ঞান এই।

যাকে পাওয়া যায় না—তার
অন্বেষণে যত ঋতু অফুরান উড়ে চলে যায়
তত পাঁজি-পুঁথি কিংবা নীল ক্যালেণ্ডার
কখনো হবে না ছাপা পৃথিবীর সময় জোয়ার,

এই বার্তা অদৃশ্য ভাঁটার শব্দে শোনে—
হৃদয় হয়ত' জানবে সেই কথা, শেষের সেদিন
অনির্দেশ্য টেলিগ্রামে, ছিন্নপত্রে, ভুল টেলিফোনে।

চিত্রকল্প (১)/সন্তোষকুমার মাজী

দীঘার সৈকতে এলে
স্রোতের কিনারে আমি হেঁটে যাই
পা ডুবিয়ে চলি

তীরে এসে ঢেউ ভাঙে ফেনায়িত ঢেউ
কেমন শিহর লাগে
ক্রমে ক্রমে সরে যায় বালি
শির শির্ জল সরে
যেন সরে যায় ভূমি···

দূরে ঢেউ উচ্ছ্বসিত গভীর জলধি
সহস্র নাগিনী যেন জিঘাংসায় উদ্বেলিত, ফোঁসে
আবার সৈকতে এসে নত হয়, ভাঙে

এভাবেই নিরন্তর সমুদ্রমন্থন
অস্থির সৈকত জুড়ে অবিরাম পাঞ্চজন্য বাজে···
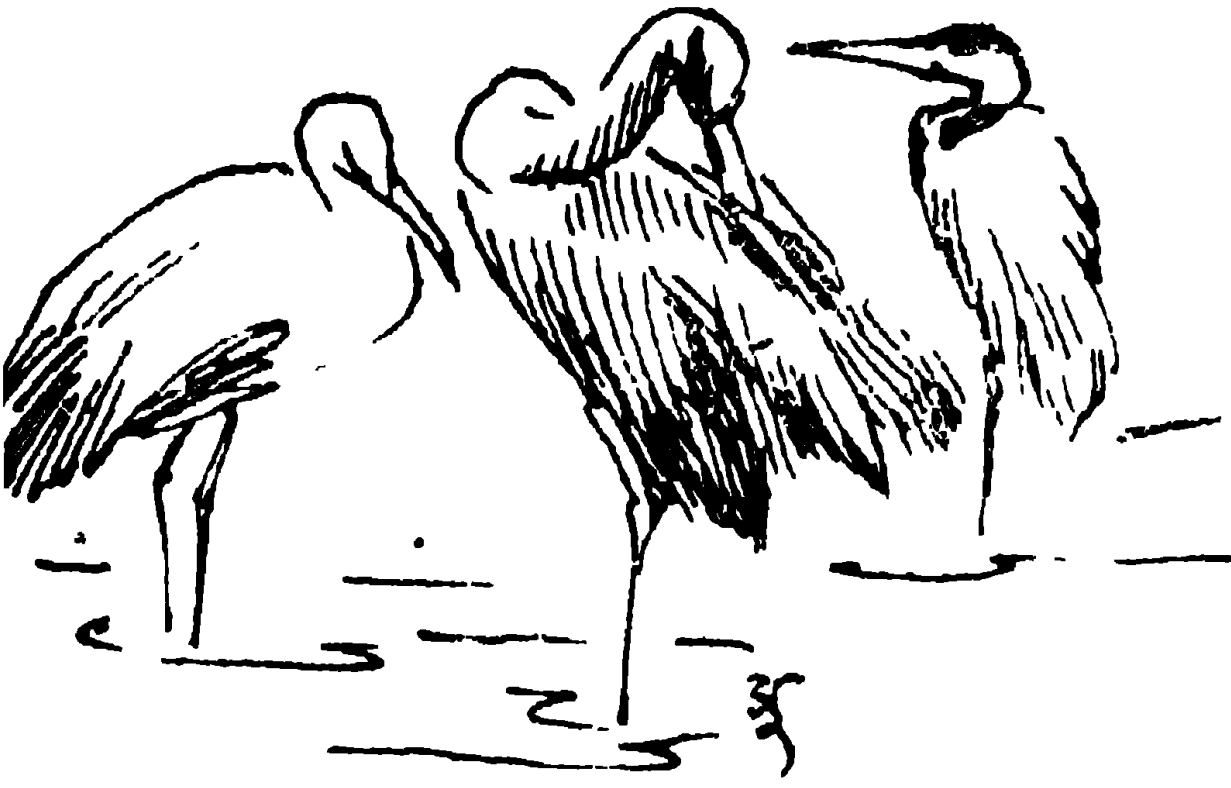
কাঁচের কার্ণিস/জহরলাল বেরা

তাই-হোক পুঁথি-পোকা
বেঁধে নিক পারা দেওয়া কাঁচের কার্ণিস,
জীবনের ওপার থেকে উঠে আসে।
তুমি মানে নীলবর্ণ পরিতাপ ;
তাই হোক পুঁথি-পোকা
তোমার লাজুক কিশোরী পরুক প্রথম পোষাক।

নির্মেঘ নৃত্য পটিয়সী
পায়ের নূপুরে বাজাও জলের অহমিকা,
যে আছে প্রবাসে বিবাগী
তাকে তুমি ফেরাও ;
তাই হোক পুঁথি-পোকা
বেঁধে নিক পারা দেওয়া কাঁচের কার্ণিস।

কবিতা

কেউ কোনো প্রশ্ন কোরোনা/ফারুক নওয়াজ

আমাকে কেউ কোনো প্রশ্ন করোনা, কেউ কিছু জানতে চেয়োনা।

এক সময় কবিতা লিখতাম; এখোন লিখিনা —সম্রাটের নিষেধ।
সম্রাট ঘোষণা দিয়েছেন; কবিতা লিখলে জীবন বাজেয়াপ্ত হবে,
মহামান্য সম্রাট আমার কলম কেড়ে নিয়েছেন
আমার কবিতার উপমা ও শব্দগুলো মর্গে পাঠিয়েছেন;
ময়না তদন্ত হবে।

সম্রাটের বিশ্বাস ওগুলোর ভেতরে তাঁর মৃত্যুর জীবাণু আছে॥
আমাদের সম্রাট স্বদেশ ও গণতন্ত্রের জন্য সব কিছুই করতে পারেন!

আমাকে কেউ কোনো প্রশ্ন করোনা, কেউ কিছু জানতে চেয়োনা।

আমার কথা বলার উপর সম্রাট নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন,
আমার কথাবার্তায় নাকি গণতন্ত্র বিরোধী ও দেশদ্রোহী গন্ধ আছে;
সম্রাট আমার সমস্ত কথাবার্তা ইতিহাসের ব্ল্যাকহোলে পাঠিয়েছেন,
শাহানশাহ্‌ শ্বাসরুদ্ধ করে সেগুলোর মৃত্যু ঘটাবেন॥
আমাদের সম্রাট স্বদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সংকল্পবদ্ধ!

আমাকে কেউ কোনো প্রশ্ন করোনা, কেউ কিছু জানতে চেয়োনা।

আমাদের সম্রাট নয়কোটি মানুষের স্বঘোষিত ঈশ্বর!
তাঁর কয়েক লক্ষ খাকী ও জলপাই রঙ্‌ ফেরেস্তা রয়েছে;
তাঁদের ঘাড়ে থাকে কল্‌জে ছিদ্রকরা নারকীয় অস্ত্রসামগ্রী,
এই সমস্ত ফেরেস্তারা বয়ে আনেন অবিশ্বাসীর মৃত্যু পরোয়ানা।
সম্রাট স্বদেশ ও গণতন্ত্র রক্ষার্থে-ই এদের নিয়োগ করেছেন!

আমাকে কেউ কোনো প্রশ্ন করোনা, কেউ কিছু জানতে চেয়োনা।
এক সময় কবিতা লিখতাম; এখোন লিখিনা, সম্রাটের নিষেধ।
আমার কথাবার্তায় সম্রাট নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন।
আমাদের সম্রাট স্বদেশ ও গণতন্ত্রের জন্য সব কিছুই করতে পারেন॥

হায় অভাগিনী/রবীন ভট্টাচার্য্য

এই প্রথম দেখলুম
চন্দন কাঠের আগুন,
টেলিভিসনের পর্দায়।
ইন্দিরার চিতা চন্দনকাঠের।

আত্মীয় স্বজন সব
থালা থালা চুয়া—
উৎসর্গ করছিল চিতায়—

এই আছিলায়
স্বদেশী-বিদেশী মানুষের ভীড়ে
শান্তিবন আজ
কল্লোলিত সমুদ্রের বুক।

টিকি দাড়ি পণ্ডিতেরা
মন্ত্রে পড়ে যায়
সেই মন্ত্র ভেসে যায়
ইথারে ইথারে।

চন্দন কাঠের চিতা
পর্দায় পর্দায়
এনে দেয় দেশপ্রেম,
বুকে বুকে শোক
জমাট পাথর।

অভাগীর ভাগ্যহীনতার কথা
মনে পড়ে গেল এ সময়!
বড় সখ মরণের পর
চিতা জ্বলবে তার।

দুঃখিনী মায়ের সেই
সামান্য সখ
মেটাতে পারেনি আজও
কাঙালীচরণ।

অভাগীর স্বপ্ন ভেসে যায়,
উত্তর-দক্ষিণ আর পূরব-পশ্চিমে:
শান্তিবন ভেসে যায়
চন্দনের সুবাসে সুবাসে

নারী কেন বিপথগামী

নিবেদিতা ভৌমিক

দুটি সিলেবলে গঠিত শব্দ Modern, যার অর্থ আধুনিক। আধুনিক অর্থে সাধারণত আমরা বুঝি ট্র্যাডিশনাল চিন্তাধারার পরিবর্জন পুরনো সংস্কারের যুক্তিগত ব্যাখ্যার উন্নতিসাধন উন্নত আদব কায়দা সংস্কৃতি ইত্যাদির গ্রহণ। তবে আধুনিক বলতে "যা কিছু পুরনো তাই বর্জনীয়" বোঝায় না। প্রয়োজনে পুরনো পরিমার্জন ও সংস্করণই আধুনিকতা।

বর্তমানে আধুনিকের বিকল্প "Mod" শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যা Modern-এ বিকৃতি রূপ। এই Mod কিন্তু আধুনিকের মত মার্জিত নয়। এটি উগ্র কদর্যরুচিসম্পন্ন এক গোষ্ঠিকে বোঝায়, যারা "আধুনিক" শব্দ ব্যবহারে ক্রুর হাসি হাসে এবং রেগে ওঠে। এদের মতে "মড" ব্যক্তিরাই অভিজাত পরিবারভুক্ত সন্তানই। নগ্ন, অর্ধনগ্ন পোষাকে সজ্জিত অপসংস্কৃতির স্বীকার, মদ্যপ, ঠগ, প্রতারকরাই এই "মড" শ্রেণীভুক্ত। নারী, পুরুষ কেউই এর বাইরে নয়।

আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মেয়েদের এই "মড" নেশার পেছনে কি মানসিকতা কাজ করে। সমীক্ষা করে দেখেছি তিন শ্রেণীর মেয়েরা এই তালিকাভুক্ত (১) দরিদ্র (২) উচ্চমধ্যবিত্ত (৩) ধনী (ক) অশিক্ষিত (খ) উচ্চশিক্ষিত (গ) প্রাথমিক শিক্ষিত। (১) সংসার চালানোর জন্য (২) আয় বাড়ানোর জন্য (৩) সময় কাটানোর জন্য।

দরিদ্ররা প্রথমে এর কোনোটিরই স্বীকার হয় না। কিন্তু অর্থ রোজকারের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে যখন কোনো উপায় পায় না তখন সংসার বাঁচানোর জন্য চাকুরীদাতা পুরুষের যৌন ক্ষুধা মেটানোর জন্য তাদের হাতে ক্রীড়নক হয়ে ঐ "মডনেশের" তালিকাভুক্ত হয়। এই শ্রেণীকে মুখে দোষ দিই কিন্তু বিবেক দিয়ে ঠেলে ফেলে দেওয়া যায়না। কারণ ক্ষুধা এমনই যা মানুষকে অতি জঘন্য কাজেও টেনে আনে। আর মেয়েরা নিজেরাই যখন মূলধন তখন প্রথমের দিকে না সমর্থন করলেও পরে আস্তে আস্তে মেনে নেয়।

দ্বিতীয় শ্রেণী সংসারের আয় বাড়ানোর জন্য চাকরী করে। এরা বেশীরভাগ "কনভেণ্ট" স্কুল থেকে পাশ করা ছাত্রী। স্কুল থেকেই এরা "মড" হয়ে যায়। ড্রিঙ্ক করা, নেশার ট্যাবলেট খাওয়াতো এদের কাছে ফ্যাশান। এদের পোষাক অর্ধনগ্ন। যৌন আকর্ষণের কম্পিটিশনে যেন যোগ দেয়, কে কত নিজের যৌবন-পাত্র দেহটি পুরুষের কাছে আকর্ষণীয় করতে পারে। যৌন আবেদন শরীরে, তাকানোয়, হাঁটায়, কথাবার্তা ও আদবকায়দায়। নির্দিষ্ট বয় ফ্রেণ্ড থাকা এদের ধারনায় অক্ষমতা। যে যত বয় ফ্রেণ্ড বদলাবে তার বাজারদর তত বেশী। এরা অফিস আদালতে চাকুরী-নেয় নিজের যৌবনকে চাকুরীদাতার কাছে বন্ধক দেয়। সামান্য কিছু পাবার জন্যও এরা নিজেদের সতীত্ব বিসর্জন দেয়। সতীত্ব-এর কোন মূল্য অবশ্য এদের কাছে নেই এরা রিসেপসানিষ্ট বা পি, এ, কাজ নিতেও দ্বিধা করে না। এ সমস্ত পদের কোনো কলঙ্ক নেই। তবে পদাধিকারীদের বেশীর ভাগ সংখ্যাই এগুলি দুষিত করে। বসের মনোরঞ্জনের জন্য

তাঁকে সঙ্গ দেয়, মদ্যপান করে। লম্বা সরু আঙুলের ফাঁকে দামি সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে। একেই তো বেশীর ভাগ পুরুষ নারীগন্ধে লোভ সংবরণ করতে পারে না। তার উপর নারীরাই যদি তাদের সাহায্য করে এতো সোনায় সোহাগা। সে কারণে পুরুষদের দোষ দেওয়ার আগে নারীদের ধিক্কার না দিয়ে পারি না।

লজ্জা (যা ছিল এককালে নারীভূষণ) এদের কাছে সভ্যতার প্রতিবন্ধন। লাজুক মেয়েরা গেঁয়ো। উন্নতি করতে হলে লজ্জানামক বস্তুটি ত্যাগ করতে হবে এবং যুগের সাথে তালমিলিয়ে চলতে হবে। এদের কাছে নারীত্ব বা সতীত্বের কোন অর্থই হয় না। মুখে সবসময় ইংরাজী, বোঝার উপায় থাকে না যে এরা বাঙালী। সময়ে কখনও সখনও মুখফস্কে একটা আধটা বাংলা শব্দ বেরিয়ে পড়লে বুঝি যে এরা বাঙালী। ঘরোয়া বাঙালী মেয়েদের নিয়ে এরা ব্যাঙ্গ করে, ঠাট্টা করে। প্রশ্নজাগে তবে কি এরাই ঠিক যারা বয়ফ্রেণ্ড বদলে পুরুষের মাথা চিবিয়ে বহু স্ত্রীর চোখের জলে বান ডাকায়। এই আনরেজিষ্টার্ড 'প্রস'দের হাত থেকে কি সমাজের কোন মুক্তি নেই। সংক্রামক রোগের মতো এরোগ ক্রমশ ছড়িয়েই পড়ছে। মুক্তির আশ্বাস কোথায়?

আর একশ্রেণী আছে যারা এই "মডলেশ" বাবা-মার কাছ থেকে পায়। বাবা যেখানে কার্যসিদ্ধির জন্য মাকে পুরুষের খোরাক হিসাবে ঠেলে দেয়। সন্ধ্যের পর যে বাড়ী মদের গন্ধে ভরপুর, মাঝরাত্রেও যাদের নাচ থামে না তাদের বাড়ীর মেয়েরাও সে একই হবে এতে আর সন্দেহ কি? বিবেক বলে তো কিছু এদের নাই। কোনো কিছু অপারক হলেই নিজে যৌন-মূলধন কাজে লাগায়। এতো স্বাভাবিকই এই দেখেই-তো এরা বেড়ে উঠেছে। "বিয়ে" "ফিক্সড বয় ফ্রেণ্ড" এদের কল্পনার বাইরে। একজন পুরুষ নিয়ে সারা-জীবন বসবাস এরা ভাবতেই পারেনা। তাইতো বিয়ে নামক লাইসেন্সটি করিয়ে নিয়ে পুরুষ বদলায়। শিক্ষাদীক্ষাতো এদের থাকেই। তার ওপর এই এডি-স্যানাল কোয়ালিফিকেশনটি যোগ করে দেওয়া উচ্চপদ অধিকার এদের কাছে কোনো সমস্যাই নয়। অধিক গুণসম্পন্না মহিলারা যা পাননা এঁরা তাই পান। এবং সমাজে সম্মানের উচ্চশিখরে উচ্চপদাধিকার করে সবার সম্মান পেয়ে আনন্দ উপলোব্ধি করে। আর ঐ গুণসম্পন্না মহিলা সতীত্ব বজায় রাখতে গিয়ে কোথায় তলিয়ে যান যার কোনো পরিচয়ই থাকে না।

এখন প্রশ্ন সমাজে কোনটি শ্রেয়। নারীত্ব ও সতীত্ব বজায় রাখা না বিসর্জন দিয়ে বড় হওয়া। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি—বর্তমান পোষাক যতই নিন্দনীয় হোক না কেন তার একটি যুক্তির দিক আছে, এতে অর্থ-নৈতিক সহায়তা হয়। সময় বাঁচে, ঝামেলা কমে। কিন্তু যে পোষাকে যৌন আবেদন থাকে তাও কি কাম্য বা প্রশংসনীয়। পাঠক বিচার করুন।

নারীদের এই বিবেকের অবনতির ফলে সমাজের ক্ষতি হচ্ছে। অনেক সতীসাধ্বী স্ত্রী ভাবতেই পারেন না যে বাড়ীর বাইরে তাদেরই সমজাতীয় আর একদল রমণী জাল বা ফাঁদ পেতে আছে। যার ফলে তাঁরা ঘরে থেকে স্বামীকে বিশ্বাস করে নিজেই প্রতারিত হন। এর থেকে অর্থাৎ ঐ আনরেজিষ্টার্ড প্রসের হাত থেকে মুক্তিপেতে হলে ওদের বিবেকে জাগরণ ছাড়া সম্ভব নয়। আমি জেনেছি অনেক ক্ষেত্রে ওরাই পুরুষদের প্রোভক করে যৌন মিলনে। এর পেছনে অবশ্য ওদের পার্থীব কিছু পাবার উদ্দেশ্য থাকে। ডাক্তারদের কাছ থেকে প্রেসক্রাইভড্ "পিল" নিয়মিত ভাবে খেতে এরা ভোলে না।

(শেষাংশ বার পৃষ্ঠায়)

গ্রামীণ দরিদ্র ঋণগ্রহীতাদের স্বার্থে রাজ্য সরকারের আইন

যুগ যুগ ধরে গ্রামের দরিদ্র চাষী, কারিগর ও ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক তাঁদের জীবিকার জন্য গ্রামের সুদখোর মহাজন, জোতদারদের কৃপার উপর নির্ভরশীল থাকতেন। তথাকথিত এই মহাজন ও জোতদার শ্রেণী গ্রামের খেটেখাওয়া মানুষের অভাবের সুযোগ নিয়ে চড়া সুদে টাকা ধারে দিত। তার না ছিল কোন হিসাব অথবা আদায়ের রসিদ, ফলে ঋণগ্রহীতা কোন দিন ঋণমুক্ত হতেন না। এইভাবে গ্রামের অবহেলিত অভাবি জনসাধারণ চরম বঞ্চনা ও শোষণের মধ্যে দিন কাটাতেন। অচলায়ত শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে গ্রামীণ জনসাধারণকে রক্ষা করবার জন্য ভারত সরকার ১৯৭৫ সালে একটি ঘোষণায় প্রতিটি রাজ্য সরকারকে জানালেন যে গ্রামের মহাজন ও জোতদার প্রদত্ত ঋণ আইন বলে মকুব করা হোক।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার গ্রামীণ মানুষদের এই সুদখোর মহাজন ও জোতদারদের প্রদত্ত ঋণের হাত থেকে ত্রাণ করতে ১৯৭৫ সালে দুটি আইন প্রণয়ন করেছেন। এই আইনগুলি হোল -

(১) পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ঋণিতা ত্রাণ আইন, ১৯৭৫—১৯৭৫ খৃষ্টাব্দের ৩৭ আইন।

(২) পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ঋণিতা ত্রাণ আইন, ১৯৭৫—১৯৭৫ খৃষ্টাব্দের ৪৬ আইন।

প্রথমোক্ত আইনে যে ব্যবস্থা আছে তদনুযায়ী কোন ঋণগ্রহীতা যদি ছোট চাষী বা প্রান্তিক চাষী বা ভাগচাষী বা ভূমিহীন শ্রমিক বা গ্রামীণ কারিগর হন, তাহা হইলে দুই বৎসর সময় পর্যন্ত মোকদ্দমা স্থগিতাদেশ ইত্যাদি রূপে তাহাকে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হইবে। অর্থাৎ—(ক) কোন দেওয়ানী আদালতেই তৎকর্তৃক গৃহীত ঋণ সম্পর্কে কোন মোকদ্দমা আবেদন বা কার্য্যবাহ গ্রাহ্য হইবে না। (খ) কোন দেওয়ানী আদালতের সমক্ষে কোন ঋণের আদায় সম্পর্কিত কোন বিচারাধীন মোকদ্দমা, আবেদন বা কার্য্যবাহ স্থগিত রাখা হইবে। (গ) কোন ঋণের আদায় সম্পর্কে কোন দেওয়ানী আদালতে এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বে কোন ডিক্রি প্রদত্ত হইলে তাহা কার্যকর করা হইবে না। উক্ত সাময়িক রেহাই-এর সময়কালে কোন ঋণের জন্য ঋণগ্রহীতা সুদ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন না।

(৩) দ্বিতীয় আইনে গ্রামীণ ঋণগ্রহীতাগণকে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিয়া অতিরিক্ত ত্রাণ সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে (ক) যেক্ষেত্রে কোন কৃষি শ্রমিকের সর্বপ্রকার উৎস হইতে মোট বার্ষিক আয় ২,৪০০ টাকার অধিক নহে, (খ) যেক্ষেত্রে কোন প্রান্তিক চাষীর ভূমি সেচাধীন নহে, (গ) যেক্ষেত্রে কোন কারিগরের সর্বপ্রকার উৎস হইতে মোট বার্ষিক আয় ২,৪০০ টাকার অধিক নহে।

ঋণগ্রহীতা যদি কোন ছোট চাষী বা প্রান্তিক চাষী হন এবং যদি তাহার ভূমি সেচাধীন হয় তাহা হইলে সেরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাহার ঋণ বহুল পরিমাণে হ্রাস করা হইবে এবং ঐ ঋণের দরুণ কোন সুদ প্রদেয় হইলে তৎসহ ঐ ঋণ তিনি অনধিক সাত বৎসর সময়ে ধরিয়া পরিশোধ করিতে পারিবেন অধিকন্তু সুদের হারের ক্ষেত্রেও তিনি অতিরিক্ত ত্রাণ সহায়তা পাইতে পারেন। তদুপরি দ্বিতীয় আইনে এরূপ ব্যবস্থাও আছে যে,

(৪) যে ঋণ সম্পর্কে এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে সেরূপ কোন ঋণের (১) ক্ষেত্রে কোন ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা রাজস্ব আদালতেই কোন মোকদ্দমা, আবেদন বা কার্য্যবাহ গ্রাহ্য হইবে না এবং এই আইন বলবৎ হইবার পর ঐ আদালতের সমক্ষে বিচারাধীন কোন মোকদ্দমা, আবেদন বা কার্য্যবাহ বাতিল হইয়া যাইবে। (২) আপাতবলবৎ কোন চিঠিতে যাহাই থাকুক না কেন যে ঋণ সম্পর্কে এই আইনের বিধানবলী প্রযোজ্য হইবে সেই ঋণ সম্পর্কে কোন দেওয়ানী আদালতের কোন ডিক্রি বা বঙ্গীয় সরকারি প্রাপ্য আদায় আইন, ১৯১৩ অনুযায়ী কোন প্রমাণপত্র কার্যকর করা চলিবে না। দ্বিতীয় আইন অনুযায়ী ত্রাণ প্রার্থনা করিয়া আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে পেশ করিতে হইবে।

(৫) পরিশেষে বলা হচ্ছে যে উপরে বর্ণিত আইন কেবলমাত্র সুদখোর মহাজন ও জোতদার প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যে সমস্ত ক্ষেতমজুর, ছোট চাষী, ভাগচাষী ও গ্রামীণ কারিগর সমবায় সমিতি থেকে অথবা সরকার অনুমোদিত ব্যাংক অথবা ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাংক ইত্যাদি থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন তাদের নিয়মমাফিক ঋণের আদায় দিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

(হুগলী জেলা তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত)

চৈত্র ১৩৯১/গোধূলি-

মেয়েদের এই অবনতির পেছনে মনস্তাত্ত্বিক আরও কয়েকটি কারণ আছে। বর্তমান সিনেমা। বিশেষতঃ হিন্দী। তবে বর্তমান অনেক বাংলা নামীদামী পরিচালকরাও সিনেমাকে যৌন উদ্দীপক ও অপসংস্কৃতির বাহক করে তুলছেন। এর প্রভাব অনস্বীকার্য। তাছাড়াও অনেকে এখন ফ্রাসট্রেশনে ভোগে। দারিদ্রতা এক ভয়ানক অভিশাপ। এর হাত থেকে রক্ষা পাবার আকাঙ্ক্ষা সবার থাকে। এই আকাঙ্ক্ষা অনেক সময় মেয়েদের নৈতিক বিচার ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়। পরে তারা এমন লম্পট বস্ বা ব্যবসাদারের মহৎ ও দয়ালু আভরনের প্রলোভনে পড়ে গিয়ে পরে পরে এই পথে অর্থাৎ আনরেজিষ্টার্ড প্রসে পরিণত হয়। তাছাড়াও অনুকরণ প্রবৃত্তি মানুষকে নীচে নামিয়ে দেয়। ধনীর দুলাল যে ভাবে জীবন ভোগ করবে সাধারণের পক্ষে তা কখনও সম্ভব নয়। কিন্তু তাদের অনুকরণ করার প্রবণতা থেকে যায়। যখনই এই উদ্দেশ্যে সাহায্য করতে সক্ষম কাউকে পায় তখন আস্তে আস্তে তা গ্রহণ করে এই জালে জড়িয়ে পড়ে।

এই হল মোটামুটি "মড" মেয়েদের চিত্র। কাজেই দেখতে পাচ্ছি স্ত্রী স্বাধীনতা পাওয়া এবং এই অধিকার বিক্রীত করার জন্য সাবলম্বী হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় নিজেদের সর্বস্ব বিসর্জন দেয়। এরা সমাজে কোন মঙ্গলতো করেই না বরং অনেক বধুর ভাগ্য বিপন্ন করে। এদের হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হলে সরকারকে তৎপর হতে হবে। মহাজাতিসদন, রবীন্দ্রসদন, কলামন্দিরএ যেমন অপসংস্কারের বাহন ডিস্কোড্যান্সের প্রোগ্রাম করতে দেওয়া হবে না, বিশেষ করে মহাজাতি সদন যেহেতু মহিলাদের সংগঠন সেহেতু এখানেতো অপসংস্কৃতির প্রোগ্রাম হবেই না। এই রকম কঠোর সিদ্ধান্ত যদি সরকার নেন তবেই এর মুক্তি নতুবা কোন বিকল্প নাই। প্রিয় পাঠক আপনারা আমার লেখণীর সত্যতা বিচার করুন এবং রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীর সাহায্যের ন্যায় এর হাত থেকে সমাজকে মুক্তি পেতে সাহায্য করুন।

পুস্তক নথীকরণ ধারা ১৯৫৬ অনুযায়ী প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি

ফর্ম-৪ * (রুল-৮)

পত্রিকার নাম : গোধূলি-মন

প্রকাশকাল : মাসিক

সম্পাদক প্রকাশক সত্বাধিকারী :
অশোক চট্টোপাধ্যায় (ভারতীয় নাগরিক)
ঠিকানা : নতুনপাড়া, চন্দননগর, হুগলী

মুদ্রাকরের নাম : রবীন্দ্রনাথ দে
(ভারতীয় নাগরিক)
ঠিকানা : বারাসত, দেপাড়া, চন্দননগর

উপরোক্ত তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাঃ অশোক চট্টোপাধ্যায়

তাং— ২০।৩।৮৫

সাহিত্য লেখার কলা কৌশল

অমল হালদার

যে যুগে সাধারণকে বাদ দিয়ে সাহিত্যের বুনিয়াদ রচিত হত, সে যুগের মানুষ সাহিত্য সাধনার আগে তার ভাবভঙ্গী নিয়ে মত্ত থাকতেন। কি ভাবে লিখবেন সেইটি ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। কি লিখবেন তা যেন গৌণ হয়ে আসত। পাঠককেও এই ভাবভঙ্গী বা লিখনভঙ্গী বোঝবার জন্য কম মানসিক কসরৎ করতে হয়নি। সেকালে পাঠকও যেমন স্বল্প, লেখকও তেমন স্বল্প ছিল। পাঠকের যে একটা মন আছে এ-কথা হয়ত লেখক বিশেষভাবে গ্রহণ করতেন।

রোম্যান যুগের গল্প আছে, লেখকরা লিখে পাঠককে ডেকে শোনাতেন, কাজেই এটা অনুমান করা যেতে পারে, লেখক কবি কোন শ্রেণীর লোকদের ডেকে সাহিত্য পড়ে শোনাতেন। এখানে লেখক রুচির ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভোগ করতেন। পাঠকরাও শ্রেণীবদ্ধভাবে নিজেদের রুচিবাগীশ বলে ভাবতেন।

লিখনভঙ্গীর কূট-কৌশলটাকে নিতান্তই ভাবগত ব্যঞ্জনা বলে প্রচার করা হত। ফলে সাহিত্য যে বহু আয়াসসাধ্য একলব্ধ বস্তু (সাহিত্য অর্থ) তাই মনে হত। আজকের দিনে বিজ্ঞানকে যেমন অযাচিত কৌলীন্য দিয়ে মানুষের মনের জগতে এক বিশেষ আসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে, সেদিন কাব্য, সাহিত্য, তর্কশাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদিকে মানুষের মন-জগতে একটি বিশেষ আসনে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা ছিল। হয়ত এর মধ্যে রাজশক্তি অথবা তৎ সংশ্লিষ্ট কোন শ্রেণীর প্রভাব থেকে থাকবে।

কিন্তু একটা ছুৎমার্গ পন্থা যে তখন অনুসৃত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নাই। তৎকালীন কাব্য সাহিত্যের বিষয়বস্তু উপকরণ কি প্রাচ্য দেশে, কি পাশ্চাত্ত্য দেশে উচ্চতর মাধ্যমে এক বিশেষ রূপকে অক্ষুণ্ণ রাখতে এক অতি জটিল ভঙ্গীর সৃষ্টি হয়েছিল।

কিন্তু টেক্‌নিক আর ষ্টাইল এক নয়; এর বিভিন্নতা আপনা থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ে। সেই বিভিন্নতা কি? কোনটুকু এর প্রভেদ-যার জন্য আমরা ষ্টাইলকে টেক্‌নিক থেকে অর্থাৎ কলাকৌশল থেকে আলাদা করে দেখতে পারি-কলাকৌশল প্রধানতঃ এক বিশেষ মাত্রাবোধ থেকে জন্ম নেয়, একটা ছোট গল্প কোথায় এসে থামবে। ঘটনাকে কোন বিশেষ পথে বাঁক ফিরিয়ে দিলে পাঠকের মনে স্পষ্ট দাগ পড়বে। অথচ গল্পের গতি শ্লথ হবে না, এ সম্পূর্ণ নির্ভর করছে লেখকের মাত্রা বোধের উপর।

এই মাত্রাবোধটি এত সূক্ষ্ম যে, এ বলে বোঝানো বা নিয়মিত পাঠ দিয়ে শেখানো যায় না। সম্ভবত সাহিত্যের রাজ্যে এই রহস্যটি সবাই স্বীকার করে নেবেন। সাহিত্যের কলাকৌশল শেখবার স্কুল বোধ হয় আজও হয়নি। তা বলে কি শিখছে না......? (নোবেল প্রাইজ পাবার পর আঁলবেয়ার কাম্যু, প্যারিস অঞ্চলের এক কাঁফেতে তরুণ লেখকদের সাহিত্য লেখার পাঠ শেখাতেন!)

এর ওর কলা-কৌশলও ধার করে সাহিত্যের হাটে বেচা-কেনা কি চলছে না......? পাঠকও তা গ্রহণ করছেন। জানিত বা অ-জানিত ভাবেই গ্রহণ করছেন। এ'ত আকছারই হচ্ছে। আর এতে কেউ বাধাও দেয় না।

গোধুলি-মন/চৈত্র/১৩৯১/জের
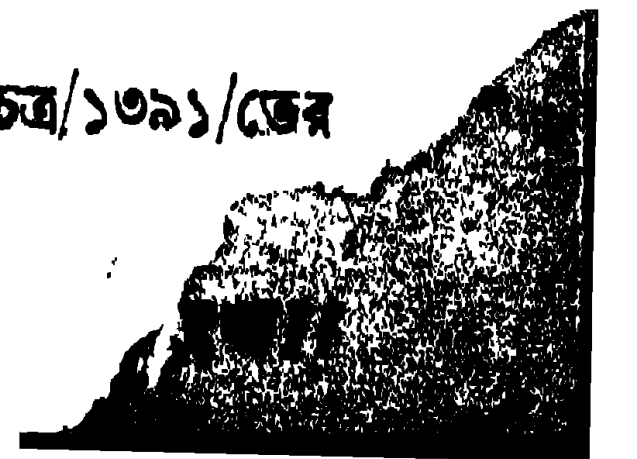
সমালোচকের প্রভাবের প্রতিধ্বনি খুঁজতে গিয়ে কেউ-কেউ বৈশিষ্ট্য ধরে নামকরণ করেছেন, এই নামকরণের স্বীকৃতি পেয়ে কোন-কোন লেখক অমুক জাতের বলে স্বীকৃত হচ্ছেন। এমন কথা বলছি না যে এতে লেখকের সাধনার পরিচয় নেই।

লেখকের মন-মেজাজ বুঝে তাঁর কলা-কৌশল সহজাত হয়ে ওঠে, যেমন তরুণ বাংলা সাহিত্যে গল্প লেখক হিসাবে ৺শৈলজানন্দের কথা। গল্প লেখার ভঙ্গী দেখে মনে হয়, শরৎচন্দ্র বুঝি অন্যরূপে ফিরে এলেন। এত করে ৺শৈলজানন্দের সাহিত্যিক উৎকর্ষ ম্লান হয়নি। তার কারণ, শরৎচন্দ্র যে মেজাজে গল্পের আসর জমিয়েছেন। দুয়ের কলা-কৌশলের ক্ষমতা থাকলেও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদ রয়েছে। বিভূতিভূষণের গল্পের গঠনও অনেকাংশে শরৎচন্দ্রের রোমান্টিকতা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। এতক্ষণ শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করে শৈলজানন্দ ও বিভূতিভূষণের কথা বলেছি।

কিন্তু শরৎচন্দ্রকে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ উভয়েই সৃষ্টি করেছেন। শরৎচন্দ্র ঘরোয়া মানুষকে নতুন ভঙ্গীতে দেখিয়েছেন বলেই, আমাদের পরিচিত সমাজ আমাদের বিসদৃশ বোধ হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় যে ভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে—তা মূলত উনবিংশ শতাব্দীর কাহিনীকারের ভঙ্গী বা কলা-কৌশল। রবীন্দ্রনাথ এ সবের ব্যতিক্রম। ছোটগল্পের সূক্ষ্ম কাজ তাঁর হাতেই প্রথম দেখা যায়। কলা সাহিত্য সৃষ্টির কলা-কৌশলের পরও যে একটি সূক্ষ্ম বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি থাকতে পারে তা আমরা রবীন্দ্রনাথে প্রথম অনুভব করি।

বঙ্কিমের রচনায় যেমন ব্যক্তি ও ঘটনার সংঘাত প্রবল এবং ঘটনার প্রতিক্রিয়া সূত্রে মানব জীবনের মর্মান্তিক দুঃখ বিকাশ লাভ করেছে, রবীন্দ্রনাথেও তেমন ব্যক্তি, মন ও ঘটনার পরস্পর সংঘাত চলেছে। এই সংঘাতের মধ্য দিয়েই মন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যে এই মন রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কার। ইতিপূর্বে মনের এই বিচিত্র খেলা আর দেখা যায়নি। বর্তমান যুগে আমরা স্টাইল বলতে যা বুঝি, তা এই বর্ধিত স্বরূপ মাত্র নোতুন-নোতুন ভাষা আহরণ করে আসছে।

সাহিত্য রচনায় অবশ্য স্টাইলের প্রশ্নটা সব সময়েই নিহিত থাকে। কিন্তু এই স্টাইলটা যুগ চেতনার বাহন হয়েই সাহিত্যে দেখা দেয়। বঙ্কিমের যুগে যে সমাজ, যে ভাষা সমাজ কর্মের প্রতীক তা তখনও সুবৃহৎ জটিলতার আশ্রয় নেননি।

বঙ্কিমের ভাষায় শব্দের সম্ভার আছে, কিন্তু যে শব্দ-প্রচল ব্যবহারে ভাষায় সূক্ষ্ম ভাব ধারণ করে তা প্রকাশ পায়নি। তার অর্থ পারিপার্শ্বিক সমাজের মানুষেরা এখনও বিভিন্ন জীবন কর্ম স্রোতের মধ্যে গা ভাসিয়ে দিয়ে শব্দকে বিচিত্রভাবে প্রয়োগ করেনি!

তার কারণ বঙ্কিমের যুগে শব্দ ভাষা হয়ে বহু ভাষাযোগে একটি ভাবের প্রকাশ করেছে। ভাষার এই যৌগিক ধর্ম স্থিতিশীল সমাজের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কাজেই একই ভাষাকে বিভিন্ন জীবন-কর্মের মধ্য দিয়েই বিচিত্রভাবে প্রয়োগ করার পদ্ধতিই স্টাইলের সূচনা করে। এখানে আমরা ভাবধর্ম ভাষার কথা বলছি না, ভাবকে আড়াল করে ভাষার নব-নব ক্ষেত্রে বিচরণের ইঙ্গিত করেছি মাত্র। অবশ্য সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করলে, বলতে হয় যে ভাষা কোন অবস্থাতেই ভাবহীন থাকতে পারে না।

এ সত্য মেনে নিয়েও বলা যেতে পারে যে ভাষা প্রয়োগ গুণেই বিশেষ ভাবের অধিকারী হয়ে পড়ে। এখানে ভাব ও ভাষার সংযোগ বিয়োগের কথা বাদ দিয়েও, ভাষা ক্ষেত্র বিশেষের প্রশ্নটি প্রধান হয়ে ওঠে এবং এই প্রয়োগটি যথাযথ হয়েছে কিনা সেইটেই খাঁটি স্টাইলের বিচার্য বিষয়।

William Hazlith বলছেন, The proper force of words lies not in the words them selvs but in their application ...It is not pomp or pretension, but the adoptation of the expression of the idea that clinches a writer's meaning. যেখানেই ভাষাকে প্রয়োগের প্রশ্ন কেন পারিপার্শ্বিক কি ভাষা কতটা নতুন অর্থ খুঁজে পেল? ভাষার ব্যবহারগত নব পরিচিতি এই পথে আসে। ইতিপূর্বে যে সাহিত্যের মধ্যে ব্যক্তি, মন ও ঘটনার পরস্পর সংযোগের কথা তুলেছিলাম এবার ষ্টাইল সম্পর্কে সেই কথাটি আবার এসে পড়ল।

সমাজের জীবন কর্ম যত প্রসার লাভ করবে ততই মন বহুবিচিত্র বিন্যাসে ধরা পড়বে। বঙ্কিমের যুগের যে সমাজ চেতনা ছিল, রবীন্দ্র যুগের নারীর সে সমাজ চেতনা নেই। এই দুই যুগের মধ্যবর্তীকালে নয়া পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি হয়েছে। ভাষা গুরুত্ব পেয়েছে। মন ও ভাষার মাধ্যমে নতুন রূপ নিয়ে ভাবের ও বচন ভঙ্গীর অভিনবত্ব প্রকাশ করেছে--অবশ্য যথোপযুক্ত পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সখ্য রেখে।

...এক কথায় পারিপার্শ্বিক, স্থাপিত বচন ভঙ্গীর সখ্যমিলনকে ষ্টাইল বলা যেতে পারে।

ইতিপূবে জীবন কর্মের কথা উল্লেখ করেছি তার কিছু বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন। সমাজে কোন ব্যক্তিকে বুঝতে হলে বা তার ভাবকে বুঝতে হলে তার কর্মজীবনই যথেষ্ঠ। সাহিত্যের রাজ্যে এরকম অনেক ব্যক্তির ওপরই ব্যক্তিত্ব বলতে যা বুঝি-তা আরোপ করা হয়। কিন্তু আমরা জীবনের কথা বুঝি বা তার সঙ্গে কর্ম সংযুক্ত করে বুঝি--তখন বহুর সমষ্টিগত চরিত্র ভাব ইত্যাদিকে মিলিয়ে একটা অনির্দিষ্ট সত্তা বুঝি।

সাহিত্যে মানব চেতনার পরিধির সঙ্গে বহুর সংহত জীবনধারা আজ এসে মিশেছে। বর্তমান সাহিত্যের মধ্যে এমন একটা নতুন রূপ দেখা যাচ্ছে যে,—চরিত্রের যেখানে বহু সমন্বিত পারিপার্শ্বিক গুরুত্ব লাভ করেছে। এই বহুর ছায়া যেখানে পড়েছে সেখানেই সমগ্র জীবনের আভাষ পাওয়া যাবে।

সেখানে বহুর মিলিত কলরব আছে, কোন-কোন কাণ্ঠের কর্কশতা ও আছে, কিন্তু এই বিচিত্র সুর পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এমন একটা ভাষা সুরের সংহতিতে বেরিয়ে আসছে যে তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই বহু রচিত সম্পদকে আমরা জীবন-কর্ম বলেছি।

এখন প্রশ্ন হল সাহিত্যে জীবন-কর্মের সঙ্গে ষ্টাইলের যোগ সূত্র কোথায় স্থাপিত হল? একথা আমরা বলেছি যে পারিপার্শ্বিক স্থাপিত বাচনভঙ্গীর সখ্য মিলনকে ষ্টাইল বলা যেতে পারে।

যেখানেই বাচনভঙ্গী ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে আসছে সেখানেই ব্যক্তি কেন্দ্রিক ষ্টাইল জন্ম নিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের "শেষের কবিতায়" এই ব্যক্তি কেন্দ্রিক ষ্টাইলের সন্ধান পাওয়া যায়। চরিত্র নিজেই পারিপার্শ্বিকতা রচনা করছে নিজেই তার থেকে ষ্টাইলের নির্যাস আহরণ করছে। কিন্তু অনুরূপ পারিপার্শ্বিক গোর্কীর লেখায় পাওয়া যায় না। বিশেষ করে তাঁর 'By Stander' প্রভৃতিতে। পারিপার্শ্বিক উদ্ভূত এই ষ্টাইলের ভঙ্গী মুখ্যত একই রচনায় বিভিন্ন প্রকৃতির বচনভঙ্গী থেকে জন্ম নিয়েছে। এবং এই ষ্টাইলের পেছনে ব্যক্তির চেতনা ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। তার মানে সব মিলে একটা সরল রেখায় পরিণত হচ্ছে। সাহিত্যে এই রেখা সদৃশ ষ্টাইল এ যুগের সৃষ্টি হলেই তা মেনে নিতে হবে। না, এমন কোন বাধ্য বাধ্যকতা নেই, তবে ষ্টাইল সর্বকালেই প্রভাব ছড়ানোই তার কর্ম। * * *

সংবাদ

○ নবম পূর্বাঞ্চলীয় আন্তঃ রাজ্য ভলিবল প্রতিযোগিতা

আগামী ২২শে মার্চ থেকে ২৪শে মার্চ '৮৫ পর্যন্ত বাঁশবেড়িয়া সন্তান সংঘের পরিচালনায় বাঁশ-বেড়িয়া ফুটবল মাঠে নবম পূর্বাঞ্চলীয় আন্তঃ রাজ্য যুব ভলিবল প্রতিযোগিতায় আসর শুরু হচ্ছে। অংশ গ্রহণ করছেন--বিহার, আসাম, ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশ, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, উড়িষ্যা, মণিপুর, পশ্চিমবঙ্গ পূর্বাঞ্চলের এই রাজ্যগুলির পুরুষ ও মহিলা দলগুলি।

সংগঠন সমিতি এই প্রতিযোগিতায় খরচ খরচা ধরেছেন প্রায় ৬০ হাজার টাকা। প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে ২২শে মার্চ '৮৫,। ৩১৫ জন খেলোয়াড় ও ৫২ জন অফিসিয়াল সহ এতে অংশ নিচ্ছেন মোট ৩৯৪ জন।

২২শে মার্চ '৮৫ বিকেল ৩টায় এক বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হচ্ছে, উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়া-মন্ত্রী মাননীয় শ্রীসুভাষ চক্রবর্তী।

প্রতিযোগিতার সব খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে সকাল, বিকেল এবং সন্ধ্যেবেলায়।

○ পরলোকে আখতারী ওয়সী পীর

ওয়সী মেমোরিয়াল এ্যাসোসিয়েশনের চেয়ার-ম্যান ও হালকায়ে জেকের হেফজুল কোরাণ সোসাইটির পরিচালক মোজাহেদে মিল্লাত আহলে সুন্নাতুল জামাত আলহাজ হজরত পীর মওলানা জয়নুল আবেদিন আখতারী ওয়সী পীর (র:) গত ১২ই ফেব্রুয়ারী স্বল্পকালীন রোগ ভোগের পর এস এস কে এম হাসপাতালে ভোর ৪টায় পরলোক গমন করেন।

দীর্ঘ ৩৩ বৎসর এক নাগাড়ে খিদিরপুর সেন্ট-বার্ণাবাস হাইস্কুলে শিক্ষকতা করার অনন্য গৌরবের অধিকারী, নিরভিমান, বন্ধুবৎসল, পরম ধর্মানুসন্ধানী এক বিরল চরিত্রের মানুষ ছিলেন তিনি। বিখ্যাত সুফী সাধক ও ফার্সী ভাষার বাঙালী মহাকবি হজরত ফতেহ আলী ওয়সী পীর কেবলার পরম ভক্ত রূপে তিনি প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করেন এবং এই প্রচার-বিমুখ সাধককে জন সমক্ষে প্রতিষ্ঠা করার কাজে তাঁরই নিরলস প্রচেষ্টায় আকৃষ্ট হয়ে বহু গবেষক এই কবির জীবনী ও কাব্যশৈলীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। এ্যাসোসিয়েশনের প্রাণপুরুষ ও সমগ্র কাজের প্রেরণা দাতা এই মহান ব্যক্তির তিরোধানে এ্যাসো-সিয়েশন ও বাংলার ওলামা সমাজে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তা সহজে পূরণ হবার নয়।

○ শোক সভা

গত ১৬ই মার্চ '৮৫ ওয়সী মেমোরিয়াল এ্যাসো-সিয়েশনের অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আলহাজ হজরত পীর মওলানা জয়নুল আবেদিন আখতারী ওয়সীরের পরলোক গমনে গভীর শোক জ্ঞাপন করা হয়।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে তাঁকে এ্যাসোসিয়ে-শনের প্রাণ পুরুষ রূপে বর্ণনা করা হয় ও তাঁর জীবন কালের দীর্ঘ সময় সমাজের উন্নয়ন মূলক কাজে ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে অতিবাহিত করেন। সভায় তাঁর ধর্মচেতনা, উদারদৃষ্টি ভক্তি ও স্নেহপরায়ন বৃত্তিগুলির উল্লেখ করা হয়।

সভায় অপর এক প্রস্তাবে চেয়ারম্যান পদে তাঁর জ্যৈষ্ঠ পুত্র পীরজাদা মওলানা গোলাম মহিউদ্দিন জিলানীকে সব সম্মতিক্রমে নির্বাচিত করা হয়।

সংযুক্ত সাধারণ সম্পাদক থেকে ভাইস চেয়ারম্যান রূপে নির্বাচিত কর হয় জনাব সেখ আহমাদ আলিকে। অপর এক প্রস্তাবে জনাব সেখ আহমদ আলিকে সাধারণ সম্পাদক ও কাজি মহম্মদ আব্দুল্লাহকে সহকারী সম্পাদকে নির্বাচিত করা হয়।

() কার্য্যকরী কমিটি

প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান - মরহুম আলহাজ হজরত পীর মওলানা জয়নুল আবেদিন আখতারী সাহেব (রঃ)।

চেয়ার ম্যান—পীরজাদা মওলানা গোলাম মাহ-উদ্দিন জিলানী।

ভাইস চেয়ারম্যান - শ্রীমনোজ রায়, শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, সেখ আনোয়ার আলি।

সাধারণ সম্পাদক - শেখ আহমদ আলি।

সহঃ সাধারণ সম্পাদক—কাজী মহম্মদ আব্দুল্লাহ।

কোষাধ্যক্ষ—সেখ বাউজুল হোসেন।

কার্য্যকরী সদস্য কমরুদ্দিন আহমাদ, অর্ধেন্দু চক্রবর্ত্তী, সেখ সোকর আলি, মওলানা মুবারক আলি রহমানী।

() শ্রীরামপুর গান্ধী ময়দানে জেলা বই মেলার আয়োজন

আগামী ১৬ই মার্চ থেকে শ্রীরামপুর গান্ধী ময়দানে ন'দিন ব্যাপী জেলা বই মেলার সূচনা হচ্ছে। ঐ দিন বিকাল চারটার সময় রাজ্যের পরিবেশমন্ত্রী মাননীয় শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় বই মেলার উদ্বোধন করবেন। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। জেলা সমাজ শিক্ষা দপ্তর আয়োজিত এই বই মেলায় কলকাতার বহু উল্লেখযোগ্য সংস্থাই অংশগ্রহণ করবেন। তাছাড়া মেলার ন'দিন মেলা প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ও আয়োজন করা হয়েছে। মেলা প্রাঙ্গণে হুগলী জেলা পত্র-পত্রিকা সম্পাদক সমিতি জেলার পত্র-পত্রিকা প্রদর্শনের জন্য এক প্রদর্শনী মণ্ডপের ব্যবস্থা করেছে। জেলা গ্রন্থ-মেলার সর্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্য স্থানীয় শ্রীরামপুর কলেজ ও শ্রীরামপুর টেক্সটাইল কলেজের অধ্যক্ষদ্বয়, বিভিন্ন পৌরসভার পৌরপতি, স্থানীয় কয়েকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধানদের নিয়ে একটি শক্তি-শালী কমিটি গঠিত হয়েছে। মেলা কমিটির সম্পাদক ও জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক মাননীয় শ্রীসচ্চিদা-নন্দ দে রায় বই মেলার সাফল্য কামনা করে সমস্ত গ্রন্থানুরাগী মানুষের আন্তরিক সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন।

() হুগলী জেলা সংগ্রহশালার উদ্বোধন

হুগলী জেলা সংগ্রহশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হল গত ১লা মার্চ। উদ্বোধন করেন জেলা শাসক শ্রীনিখিলেশ দাস। এখানে ২৭৫টি নিদর্শন দেখার জন্য আছে। বিভিন্ন রাজাদের অস্ত্রসস্ত্র, পোড়া মাটি ও কাঠের তৈরী বিভিন্ন শিল্প নিদর্শন এখানে স্থান পেয়েছে।

() হুগলী জেলা গ্রামীণ কৃষি ও যুবমেলা

সদর হুগলী ক্লাবের উদ্যোগে জেলা গ্রামীণ কৃষি ও যুবমেলা আগামী ২৪শে মার্চ চুঁচুড়া ময়দানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, চলবে ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত। মেলা উপলক্ষে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের বিশেষ দল থাকছে। এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি-যুব ক্রীড়া দপ্তর বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করছে। পাশা-পাশি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও স্টল খুলবে বলে মেলা কমিটির পক্ষে শেখ নুরুল ইসলাম ও সুস্মিত অধিকারী জানান। ১৫ দিনের মেলায় বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার, কৃষি-যুব আলোচনা সভা ও সাং-স্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকছে। মেলা উদ্বোধন করার জন্য পঃ বঙ্গের রাজ্যপালকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে।

সম্প্রতি আপনার সম্পাদনায় 'গোধূলিমন' পত্রিকার বইমেলা সংখ্যায় 'সাহিত্যের আড্ডা : কেচ্ছামৃত' সোফিওর রহমানের লেখাটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমরা এই লেখাটি প্রকাশের জন্যে আপনার কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা মনে করি আপনি এই লেখাটি প্রকাশ করে 'গোধূলিমন' পত্রিকার খ্যাতিকে অবনমিত করেছেন যেমন, তেমনি আমাদের মেদিনীপুর জেলার কবি ও লেখকদের অপমাণিত করেছেন। কেননা, আমরা মনে করি ব্যক্তিগত জীবনে কোনও মানুষের প্রতি কোনও মানুষের উষ্মা থাকতেই পারে (যদিও শ্যামলকান্তি দাশের প্রতি প্রণব মাইতি, অমিতাভ দাস বা তপন কুমার মাইতির কোনরকম উষ্মার প্রকাশ আমাদের কাছে কখনও প্রকাশিত হয়নি।) তা নিয়ে একটি লিটিল ম্যাগাজিনের মূল্যবান পত্রগুলি খরচ করার মধ্যে কোন সাহিত্য প্রয়াস প্রমাণিত হয় না। শ্যামল কান্তি দাশকে নিয়ে যে তিনজন কেচ্ছাকারীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে আপনার কাগজে, ব্যক্তিগত জীবনে এবং সাহিত্যক্ষেত্রে এই তিনজন কবি শ্যামল কান্তির গুণগ্রাহী, গভীর আত্মীয়। এদের সঙ্গে শ্যামলকান্তির ঘনিষ্ঠতা প্রায় দু'দশকের। তাই এ ধরণের 'কেচ্ছামৃত' আমাদের মনে হয় সাহিত্যের কোন উপকারে আসে না। লিটিল ম্যাগাজিন যে মূল্যবান দায়িত্ব পালন করে আপনি এই লেখাটি প্রকাশ করে সেই কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। তাই এই লেখাটি প্রকাশ করার পেছনে আপনার সামনে কি কি উদ্দেশ্য ছিল। আমরা সবিস্তারে জানতে চাই। আশা করি সম্পাদক হিসেবে আপনি সেই দায়িত্ব থেকে পিছপা হবেন না। আমাদের এই সম্মিলিত প্রতিবাদ কেবলমাত্র সাহিত্যের জন্যে। আমরা এবং আপনি—সবাই আমরা সুন্দরের পূজারী, সুন্দর মনের অধিকারী। আসুন আমরা সবাই মিলে সাহিত্যের প্রাঙ্গণকে সুন্দর এবং নিষ্কলুষ করে তুলি।

১। সমীরণ মজুমদার (সম্পা: অমৃতলোক)
২। প্রশান্ত দাস (বঙ্গোপসাগর/ডুগডুগি)
৩। রতনতনু ঘাটী
৪। তপনকুমার মাইতি (সম্পাদক : অন্তত্তর)
৫। কবি শেখর দাস অধিকারী
(সহযোগী বঙ্গোপসাগর ও ডুগডুগি)
৬। নরেশচন্দ্র দাস (সম্পাদক : অন্তত্তর
বিভাগীয় সম্পাদক : ডুগডুগি)
৭। শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় (হলদিয়া)
৮। গৌরহরি দেবদাস (হলদিয়া)
৯। সুদর্শন বৈতালিক (হলদিয়া)
১০। বিধুভূষণ করণ (হলদিয়া)
১১। বিমানকুমার ঘোষ (অনিন্দ্য)
১২। রাজপ্রসাদ মাহাতো (মেদিনীপুর সংবাদ)
১৩। পিনাকবিজয় চক্রবর্তী (সন্ধানী)
১৪। তারাপদ সমাদ্দার (প্রধান গ্রন্থাগারিক রাজনারায়ণ বসু
(স্মৃতি পাঠাগার
১৫। অসিত দত্ত (বিহানকাল ও কড়চা)
১৬। তাপস মাইতি (সম্পাদক : উপত্যকা)
১৭। দেবাশিস গোস্বামী (সম্পাদক : অনন্যা)

O প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি মন O

O অভিনন্দন গ্রহণ করুন। গতকাল 'উত্তর প্রবাসী' প্রদত্ত পুরস্কারের খবর জানতে পারলাম। সেই সঙ্গে নিমন্ত্রণ অনুষ্ঠানে যোগদান করার।

এক কথায় বলতে পারি খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। একজন সাহিত্য সেবী হিসেবে আরেকজনের এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে যথার্থ খুশী হয়েছি। বহু বছরের রক্তাক্ত ভালবাসা ও অমানুষিক পরিশ্রম করে পত্রিকা প্রকাশ করছেন। অকৃত্রিম আন্তরিকতায় কবিতা লিখছেন। পুরস্কার দিয়ে এই নিষ্ঠা ও ভালবাসাকে সম্মান জানান যায় না। স্বীকৃতিই প্রধান। তাতেই আমরা খুশী। ভালবাসায়

জীবনময় দত্ত
কংকরবাগ কলোনী
পাটনা/বিহার

* * * * * *

O প্রথমে আন্তরিক অভিনন্দন নেবেন 'উত্তর প্রবাসী' পুরস্কারের জন্য। আপনার এই পুরস্কার লিটল ম্যাগাজিন জগৎকে এক আনন্দের হাট বসিয়ে দেয়। আপনার কবিতা যতই পড়ি, ততই কবিতাকে ভালবাসতে শেখায়।

'গোধূলিমনের' 'ইন্দিরা গান্ধী' ও 'বইমেলা' সংখ্যা পেলাম। বইমেলা সংখ্যা সবে পেলাম। ইন্দিরা গান্ধী সংখ্যাটি একটা ইতিহাস হয়ে রইল—প্রয়াত প্রধান মন্ত্রীর মতোই।

আশাকরি ভবিষ্যতে আরো আকর্ষণীয় ও অনন্য রূপে আপনার সম্পাদিত গোধূলিমন পাবো।

শুভেচ্ছান্তে
ধীরাজকুমার দে
৯/১ কালী প্রসন্নন্যায়রত্ন লেন
কলকাতা—৭০০০৩৬

* * * * * *

O বইমেলা সংখ্যা পড়লাম। খুব ভাল লাগল। বিনয় নয়, মনের সত্যি কথাটা জানালাম। অভিধান পাশে নিয়ে বসতে হয় বলে ইদানিং আধুনিক কবিতা পড়তে মনে কেমন যেন অনীহা জাগে। মনে হয়, অনেক কবি বোধহয় ইচ্ছে করেই তাঁদের কবিতাকে দুর্বোধ্য করে তোলেন। জানিনা কেন! গোধূলিমন এর এই সংখ্যায় তোমার এবং ওপার বাংলার কবি দিলওয়ার-এর কবিতাগুলি পড়ে ভাল লাগল। স্বতন্ত্র ধরণের। 'কবিদের আড্ডা : কেচ্ছামৃত'-তে একটি নির্মম বাস্তব চিত্র উপহার দেবার জন্য সোফিওর রহমানকে সাধুবাদ জানাই। বালুরঘাট, 'মধুপর্নী' পত্রিকার অনুষ্ঠানে বছর দুই আগে ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তারপর বোধহয় আর সাক্ষাৎ হয়নি। এই লেখাটির মাধ্যমে সোফিওর প্রকৃত বন্ধুর কাজই করেছে। সত্যি, আমরা কোথায় চলেছি! গতবছর ১৯৮৪ সালে ময়দানে বইমেলার অডিটোরিয়ামে লিটল ম্যাগাজিন সংক্রান্ত সেমিনারে আমার বক্তব্যের সময় কিছু অপ্রিয় কথা বলেছিলাম বলে পরিচিত অনেকেই আমার উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। যদিও উপস্থিত শ্রোতা এবং প্রবীন লেখকেরা অভিনন্দন জানিয়ে ছিলেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। আমরা যারা লিটল ম্যাগাজিন করি, নিজেদের আয়নার সামনে দাঁড়ানোর বোধহয় সময় এসেছে। কোন রকমে তিন-চার পৃষ্ঠা ছাপিয়ে কিছু প্রকাশ করলেই কি তাকে লিটল ম্যাগাজিন আখ্যা দেওয়া যায়? ইদানিং তারই হিড়িক পড়ে গেছে চারিধারে।

'উত্তর প্রবাসী' সম্পাদক গজেনকুমার ঘোষের ১৯৮৪ সালের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত চেক্ কবি জারোস্লাভ সাইফার্ট-এর ওপর আলোচনাটি নিঃসন্দেহে বইমেলা সংখ্যার মান বৃদ্ধি করেছে। তবে এইসঙ্গে আলোচিত কবির একটি বা দুটি [illegible] থাকলে ভাল হত। 'গোধূ[illegible] উঠুক।

গোধূলি মন

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

O বহুদিন আগে আমরা হাংরি জেনারেশনের একটি সংকলন করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু তখন পারিনি। অনেকে বলেছিল ওটা নিয়ে লেখা ছেপো না। তাতে অনেক সাহিত্যিক, বিশেষত সুনীল, শক্তি খেপে যেতে পারেন। প্রথমে বুঝিনি সেই কথাটা। কিছুদিন আগে আপনার পত্রিকায় হাংরিজেনারেশনের ওপর একটি অগ্নিগর্ভ লেখা পড়লাম। এখন বুঝছি আমার হিতাকাঙ্খীরা কেন সেদিন সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সুনীল, শক্তির চরিত্র আজ আর কারো অজানা নয়। কিন্তু এতো সাহসী ভাবে অজিত বাবুর আগে কেউ বলেছেন বলে জানি না। শুধু আমি নয়, হয়তো বা আরো অনেকে সেটির উত্তাপ অনুভব করেছেন। সমালোচনা করবার মতো কলমের জোর আমার নেই। একটাই কথা বলতে পারি—সেটি অতুলনীয়।

আমরা যারা বছরে দুবছরে এক আধটা ভাল লেখা লিখতে পারি না হাজার চেষ্টা করেও—অজিত বাবু আমাদের প্রেরণা। আসানশোলের লিটলম্যাগাজিন লাইব্রেরীতে গোধূলিমনের প্রকাশিত অজিত বাবুর মোট তিনখানি রচনা এযাবৎ দেখেছি। তিনখানি সংখ্যার মতো তিনখানি রচনাই অতুলনীয়। প্রথমটি 'জগদ্রামের সুলোচনা ও মধুসূদনের প্রমীলা' সুকুমার বাবুদের আকর্ষণ করার মতো। দ্বিতীয়টি আজকের প্রথিতযশা ঔপন্যাসিকদের প্রেরণা নেবার মতো— 'কবি বঙ্কিম'। আর তৃতীয়টির কথা আগেই বললাম।

এই একই কথা জীবেন্দু বাবু সম্পর্কে বলা না গেলেও তিনিও নমস্য। অসাধারণ তাঁর রচনা শৈলী। অসাধারণ বিদ্বতা। এখানেই অজিত বাবু আর জীবেন্দু বাবুর মধ্যে পার্থক্য। দুজনেই তথ্যজ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞানী। কিন্তু জীবেন্দুবাবুর প্রবন্ধে যেখানে অধ্যাপক উঁকি মারেন। অজিতবাবুর রচনায় সেখানে সাহিত্যিক উঁকি মারেন। দুজনকেই প্রণাম জানিয়ে চিঠি শেষ করছি। ভবিষ্যতে এই দুজনের প্রবন্ধের আশায় থাকলাম

দেবাশিস বসু
(সদস্য : আসানসোল লিটল ম্যাগ, লাইব্রেরী)

O আশাকরি কুশলে আছেন। আপনার পাঠানো 'গোধূলি-মন' ইন্দিরা গান্ধী সংখ্যা পেয়েছি। পেয়েছি বইমেলা সংখ্যা ও ফাল্গুন সংখ্যা। সাগর পারের 'উত্তর প্রবাসী' পত্রিকা আপনাকে ১৯৮৪ সালের নির্বাচিত কবি হিসেবে সম্মানিত করেছেন, এ কারণে আনন্দিত ও গর্বিত। একটি উন্নতমানের পত্রিকার সম্পাদক ও কবি হিসেবে এই সম্মান আমাদের খুশি করেছে, বস্তুত লিটল ম্যাগ এর সম্পাদকদের কাছেও এ যে কত আনন্দের হয়েছে তা অনুমান করা যায়। বেশ কয়েকবছর ধরেই 'গোধূলি মন' এর লেখক এবং শুভানুধ্যায়ী হিসেবে থেকে কোন দ্বিধা না রেখেই এ কথা বলতে পারছি। কলকাতার বাইরে থেকেও কত সহজে প্রতিটি মাসিক সংখ্যা আপনি যে এখনও প্রকাশ করতে পারছেন তা লিটল ম্যাগ এর সম্পাদকদের অনুপ্রাণিত করবে সন্দেহ নেই। 'গোধূলি-মন' সকলের কাছে আরও প্রিয় হয়ে উঠুক এ কামনা নিশ্চয়ই করছি। 'ইন্দিরা গান্ধী' সংখ্যা নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

কুনাল মণ্ডল/শৌনিক বর্মন এর কবিতা ভালো লেগেছে (ফাল্গুন সংখ্যা)।

জারোস্লাভ সাইফার্ট সম্পর্কিত আলোচনা (বইমেলা সংখ্যা) খুব ভালো লাগলো। অনেক তথ্য জানা গেলো। লেখককে ধন্যবাদ। অজিত রায়ের আলোচনা (এবারে ফাল্গুন সংখ্যায় তারাশংকর এর ওপর) বেশ টানছে—হেলাফেলা করতে পারছি না অন্য বিষয়ে আরো ভালো তথ্য তার কাছ থেকে অন্য সংখ্যায় পাবো এই আশা রাখছি। বইমেলা সংখ্যায় কবি দিলওয়ার এর ওপর লেখাটি একজন সৎ কবিকে ও তাঁর লেখনীকে চিহ্নিত করেছে

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
২০, চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা, ৭০০০২৫ ॥ ২১.৩.৮৫ ॥

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি মন

২৭ বর্ষ/৪র্থ সংখ্যা

এপ্রিল/১৯৮৫

বৈশাখ/১৩৯২

প্রতি সংখ্যা দুই টাকা
বার্ষিক সডাক কুড়ি টাকা

অশোক চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

সম্পাদকীয়
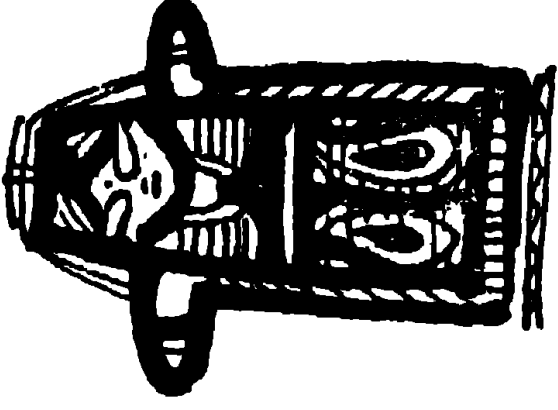
সেই আশ্চর্য্য দেবকান্ত পুরুষ
(বাল্মিকী প্রতিভার সেই ছবি)
আমাদের চেতনে-অবচেতনে
আমাদের কবিতা ও গানে
আমাদের প্রাত্যহিকতায়
ভরে থাকে অমল-সুধায়।

শতবর্ষ কেটে গেছে কবে
এ কালের কবিদল
দলবদ্ধ ছুটে আসে তবু
জোড়াসাঁকো—রবীন্দ্রসদনে।

লেখার প্রসাদগুণে মানুষও অমরত্ব পায়
মানুষ দেবতা হয়ে জেগে থাকে
মানুষের প্রাত্যহিক জীবনচর্য্যায়।

সম্পাদকীয় কার্যালয় ॥ নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর ॥ হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥ ভারত

কবি রামপ্রসাদের অপ্রাপ্তপূর্ব পুথি

অজিত রায়

চলতি দশকের এক কবি ষাট দশকের সৃষ্টিশীল কবি ও গোধূলি মনের সম্পাদক অশোকদাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—'ঈগলের অশোক চট্টোপাধ্যায় এবং আপনি উভয়েই সম্পাদক ও লেখক, একই নাম; ভাবীকালের ইতিহাসে আপনাদের উত্তরসূরীরা অসুবিধায় পড়বে না?' নাম ও সৃষ্টিকর্ম এক হওয়ার দরুণ অবতরিত নিবন্ধের লেখকের মনেও এই ধরণের একটি শংকা দেখা দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে রামপ্রসাদের সংখ্যা অনেক, প্রত্যেকেই কবি। কালিমঙ্গলও শাক্ত পদাবলীর রচয়িতা রামপ্রসাদ সেন ছাড়াও বৈষ্ণব কবি দ্বিজ রামপ্রসাদ এবং কবিওয়ালা রামপ্রসাদ ঠাকুরের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। কিন্তু আমার আলোচ্য কবি অন্য এক রামপ্রসাদ। রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্বেষু গবেষক ও অধ্যাপক ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা বছর কয়েক আগে পশ্চিম সীমান্তে বাংলার পাতকুম অঞ্চল থেকে কিছু প্রাচীন পুথির সন্ধান পেয়েছেন। তন্মধ্যে দুটি পুথির রচয়িতা এই রামপ্রসাদ।

গোধূলি মনের পাঠকদের মধ্যে যাঁরা আমার 'জগদ্রামের সুলোচনা এবং মধুসূদনের প্রমীলা' ও 'দুর্গাপঞ্চরাত্র, আঠারো শতক এবং জগদ্রাম' প্রবন্ধ দুটি পড়েছেন তাঁদের কাছে এ তথ্য নিশ্চয়ই স্বিরীকৃত হয়েছে যে, রামপ্রসাদ হলেন যুগান্তরকালের একমাত্র সম্পূর্ণ রামায়ণের স্রষ্টা জগদ্রাম রায়ের জ্যেষ্ঠ্য পুত্র। পূর্বোক্ত প্রবন্ধদ্বয়ে এই কবিযুগ্ম পিতাপুত্রের বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হওয়ায় বর্তমান নিবন্ধে তার পুনরাবৃত্তি নিরর্থক মনে করি।
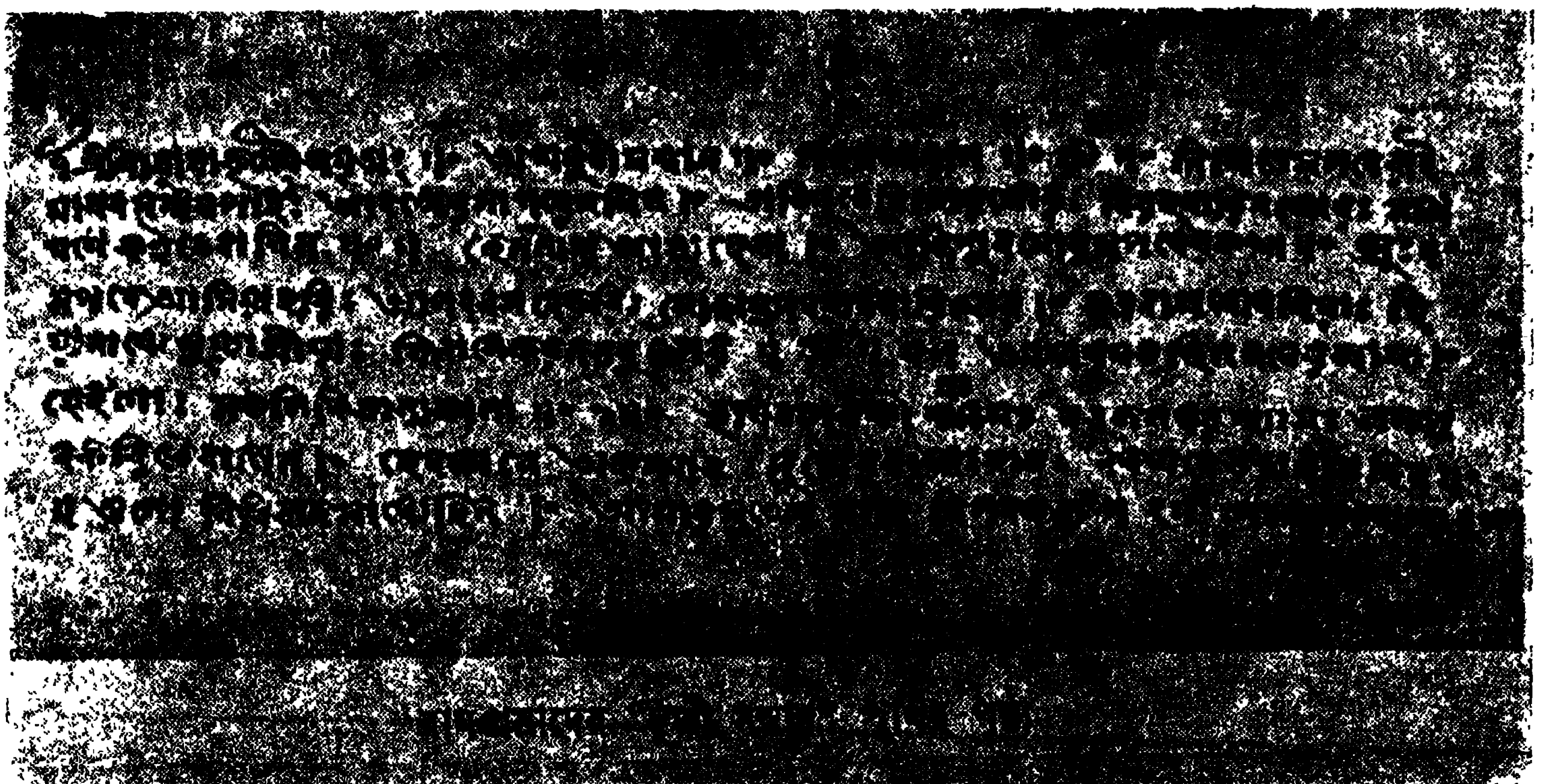
চর্যাপদগুলি বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হলেও, 'বিষ্ণুপুরাণ' অনুসরণে লেখা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামধেয় পদসমূহ মদীয় সাহিত্যের আদি কাব্য হিসাবে পরিগণিত। এটি ছিল পঞ্চদশ শতকের নাটগীতি-পাঞ্চালী। পরের শতকে গুণরাজ খাঁ ওরফে মালাধর বসু কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণবিজয় নামে ভাগবত অনুসরণে যে কৃষ্ণলীলা কাব্যটি রচিত হয় তার সমাদর আঠারো শতকের গোড়া পর্যন্ত অটুট ছিল। কিছুকাল পরে যশোরাজ খাঁ লেখেন কৃষ্ণমঙ্গল। অতঃপর যে কটি রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ফিরিস্তি রচিত হয়, সবই চৈতন্য ভক্তদের কীর্তি। গোবিন্দ আচার্যের কৃষ্ণমঙ্গল, পরমানন্দ গুপ্তের কৃষ্ণলীলা, রঘু পণ্ডিতের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী, দ্বিজ মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল, দৈবকীনন্দ সিংহের গোপালবিজয়, কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, কবিবল্লভের রসকদম্ব প্রভৃতি এর উদাহরণ। পরবর্তীকালে পদাবলী-কীর্তনরীতি প্রতিষ্ঠা পেলে কৃষ্ণমঙ্গল পাঁচালির ধারা ক্ষীণ হয়ে আসে। তাতে কাব্যকলার উন্নতির পরিবর্তে একঘেয়েমি আর 'অঞ্চলবিশেষে গ্রাম্যরসভাগ-বৃদ্ধির' দরুণ যে অবনতি সূচিত হয়েছিল, উনিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত সেই ধারা ছিল অব্যাহত। দ্বিতীয় পর্যায়ের পদাবলীতে কৃষ্ণলীলাবর্ণন দুই মতে পাই—কৃষ্ণের ব্রজলীলা ও রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা। পদকর্তারা মূলত তিনটি গুরু-সম্প্রদায়ে বিভক্ত—শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যদের মধ্যে রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবিরাজ, দিব্যসিংহ, গোবিন্দ দাস চক্রবর্তী, বীরহাম্বীর প্রমুখ; নরোত্তম-শিষ্যদের মধ্যে বসন্তরায় চম্পতি-ভূপতি, শিবরাম দাস প্রমুখ এবং গদাধর পণ্ডিতের শিষ্যদের মধ্যে নয়ন নন্দ মিশ্র, অনন্ত প্রমুখের পদাবলীতে কৃষ্ণলীলা গান দুর্লক্ষ্য নয়। তথাচ এগুলি খণ্ডে-উপখণ্ডে রচিত। আঠারো শতকের শেষভাগে রামপ্রসাদ রায় রচিত 'কৃষ্ণলীলামৃত' সেই তুলনায় অনেক বড়ো এবং শিল্পগুণে অভিনিবেশ-যোগ্য। এই কৃষ্ণলীলামৃত কাব্য নিয়ে আলোচনার তাগিদেই বক্ষমাণ নিবন্ধের অবতারণা।

প্রথমে রামপ্রসাদের কাব্যের প্রকৃত নাম বিচার করার ভার নিবন্ধকার হিসাবে আমার উপর বর্তায়। এটির নাম নির্ধারণের সমস্যা আবহমান কালের। শারদীয়া গোধূলি মনের (১৯৮৩) পাতায় আমি, দীনেশচন্দ্র ও সুকুমার সেনকে অনুসরণ করে এর নাম উল্লেখ করেছিলাম 'কৃষ্ণলীলামৃত রস'। দীনেশচন্দ্র সেনের অনুমানের ভিত্তি ছিল সাহিত্য পরিষদের একটি পুথি, যেটির সম্পূর্ণ কপি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিল। ইতিপূর্বে কালীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভণিতাযুক্ত গ্রন্থটির যে কপি প্রকাশিত হয়েছিল, দেখা গেছে বসন্তবাবুর সংগৃহীত পুথি থেকে তা অভিন্ন। (১) দীনেশচন্দ্র গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন 'কৃষ্ণলীলামৃত রস'। ডঃ সুকুমার সেন এই নামই গ্রহণ করেছেন অসন্দিগ্ধ ভাবে। (২) নামটি সম্পর্কে নির্দ্বিধ হতে না পেরে আমি খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারি কাব্যটির 'সঠিক' নাম—'কৃষ্ণলীলামৃত সিন্ধু'। বাঁকুড়ার মেজিয়া সংস্কৃত স্কুলের শিক্ষক ও গবেষক পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই নামই উল্লেখ করেছেন, যিনি জগদ্রামী রামায়ণের উপর গবেষণা করছেন। (৩) কৃষ্ণলীলামৃত সিন্ধুর গবেষক রাণীগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক ডঃ বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আমাকে এই নামই জানিয়েছেন। কিন্তু ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা সংগৃহীত উদ্ধব সম্বাদ ও দূতী সম্বাদ পুথি দুটির পাণ্ডুলিপি দেখার পর আমার সন্দেহ আপাতত মিটেছে। ডঃ লাহা 'স্থির সিদ্ধান্ত' করেছেন যে, 'প্রাপ্ত পুথি দুটির রচয়িতা যে এই রামপ্রসাদ এবং

এঁর রচিত কাব্যের নাম যে 'কৃষ্ণলীলারস' নয়, 'কৃষ্ণলীলামৃত' সে সম্পর্কে আমরা সুনিশ্চিত। (৪) উদ্ধব সম্বাদ ও দুতী সম্বাদ সেই অপ্রাপ্তপূর্ব বৃহৎ কাব্যেরই (কৃষ্ণলীলামৃত) অংশবিশেষ। 'অপ্রাপ্তপূর্ব' বলছি এই কারণে যে অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের তালিকার পাণ্ডুলিপিতে এই পুথিগুলির উল্লেখ নেই। পুথি দুটিতে রামপ্রসাদ নিজের নাম উল্লেখ করলেও, পদবীর বেলায় নীরব থেকেছেন। তবে সৌভাগ্যবশত তিনি পিতার নাম উল্লেখ করেছেন— 'জগত তনয় প্রসাদে কয়'। (৫) এতেই বোঝা যায় যে তিনি জগতবাম বা জগদ্রাম রায়ের পুত্র।

উদ্ধব সম্বদ ও দুতী সম্বাদ —দুটি পুথিই খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত। প্রথমটির মাত্র চারটি পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়েছে। হরিৎ কাগজে অক্ষরগুলি উজ্জ্বল। লিপিকাল কিংবা লিপিকর্তার কোনো উল্লেখ নেই। দূতী সম্বাদের একটি পৃষ্ঠা (পৃঃ ৬) বাদে মোট ১১ পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়েছে, যন্মধ্যে ৫ সংখ্যক পৃষ্ঠার এক-চতুর্থাংশ ছিন্ন। কাগজ অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল, পাতলা। উদ্ধব সম্বাদের পুথির মাপ ৩১×১১ সে. মি. এবং দুতী সম্পাদের মাপ ২৬'৫×১১ সে মি.। দুতী সম্বাদের লিপিকাল ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৭০ বঙ্গাব্দ। লিপিকার 'শ্রীদিগম্বর সিংহ সরকার, সাং হাল রসুল্যা (৬) পরগণা পাতকুম'। দুটি পুথিই কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত। উভয় পুথিকাল ও লিপিকার যে এক ব্যক্তি, লিপির ছাঁদ ও রীতি সে সম্পর্কে আমাদের সুনিশ্চিত করে।

উদ্ধব সম্বাদের প্রথমে 'অথ উদ্ধব সম্বাদ' নামে উল্লিখিত হলেও অন্যস্থলে 'জন্মখণ্ড মত কৃষ্ণলীলামৃত গায়' রূপে আখ্যায়িত। অর্থাৎ এটি কাব্যের 'জন্মখণ্ড' এর অন্তর্গত। দ্বিতীয় পুথিটিও ('অথ দুতী সম্বাদ') 'ইতি মাথুর বিরহ সম্পূর্ণ' নামে অভিহিত। এটি কীর্তনের অথবা ঝুমুরের ছাঁদে রচিত, সর্বত্র 'যথারাগ' শব্দটি আছে। কৃষ্ণের মথুরাগমন, রাধার বিরহ, সখীদের দৌত্যে কৃষ্ণের বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন তথা রাধাকৃষ্ণের মিলন শেষে কৃষ্ণের পুনরায় মথুরাগমনে পুথির সমাপ্তি। ডঃ লাহা লিখেছেন—'পুথি দুটির রচয়িতা যে অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন শক্তিশালী কবি সে কথা প্রাপ্ত কয়েকটি পৃষ্ঠাতেই সে চচার। কৃষ্ণ হারা বৃন্দাবনের বর্ণনায় সখীগণের খেদে— 'ব্রজে যত প্রাণে সবাকার হানি ব্রজনাথ তুমা ছাড়ো আঁখি নীরে এক যমুনা তরঙ্গ বাড়ে' অথবা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বসিত ব্যঙ্গে—'পরাণ সরলা মুগুধিনী বালা কুলের বাহির করি/মদনের করে বিলায়ে তাহারে না দেখ নয়ন ভরি' —কবির প্রতিভার ও শিল্পদক্ষতার অনস্বীকার্য প্রমাণ ও পরিচয় পাই। স্বপ্ন মিলনের পর নিদ্রাভঙ্গে বেদনাদীর্ণ রাধিকার বিবহবার্তা বিজ্ঞাপনে যাঁরা রসজ্ঞতা এবং শিল্পচাতুর্যের পরিচয় প্রদান করতে সক্ষম হয়েছেন সমগ্র বৈষ্ণবকাব্যে এমন কবির সংখ্যা বেশি নয়। তাঁদের মধ্যে রামানন্দ বসু, বংশীবদন এবং জ্ঞানদাস প্রশ্নাতীত গৌরবের অধিকারী। রামপ্রসাদ এই গৌরবের অংশীদার।' (৭)

এই মন্তব্য যে অতিশয়োক্তি নয়, তার প্রমাণ মেলে কৃষ্ণলীলামৃত কাব্যের 'মাথুর বিরহ' নামাঙ্কিত দুতী সম্বাদ সম্পর্কিত অংশের সূচনাপর্বে :

'নিশিতে স্বপনে রাই, মাধব সঙ্গম পাই
আনন্দের সাগরে মজিল।
ভাঙিতে নিন্দের ঘোর বিরহ বাড়িল জোর
সখিগণে কহিতে লাগিল ॥
হে ললিতা আস্ত হেতা।
আজি শুন মোর স্বপনের কথা ॥
স্বপনে আসিয়া হরি আপন বসন করি
মোছায়্যা নয়ান বারি মোর।

কত না প্রবোধ দিয়া হিয়া মাঝে যয়্যা প্রিয়া
বিলাসে করল তনু ভোর ॥
আমার যত ছিল মনের জ্বালা।
হেই গো সকলি নিভাল্য কালা ॥
তৃষিত চাতকী হোয় নব জলধর শ্যাম
জলদান করিতে লাগিল।
হেনকালে অকস্মাৎ দুর্দৈব ঝন্ঝাবাত
নবঘনে উড়াইয়া দিল ॥
ওগো বিধি বাদ সাধ্যে ছিল।
আমার সুখের স্বপন বিফল হল ॥
পাথর চাপায়্যা বুকে পড়িয়াছিলাম দুঃখে
তাহাতে সোয়াস্ত নাহি পাই।
ছলাতে নিঠুর কালা দেখা দিয়া দেয় জ্বালা
শোকানলে পোড়ায় সদাই ॥'

শ্রীমতীর মানসিক অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠলো স্বপ্নদর্শনের পর। জীবনের আশা ক্ষীণ হয়ে গেল দুঃসহ বিরহ বেদনায়—

ধৈরজ ধরিতে নারি শ্যাম শোকে যদি মরি
কদম্ব তরুতে মোর রাখ মৃত শরীরে।
না বাপে দেখিতে যদি কভু আসে গুণনিধি
কমল নয়নে সেত দেখিবেক আমারে ॥
কদম্ব তলাতে আসি যখন বাজাবে বাঁশি
শুনব সে গান যাতে মৃত তরু মঞ্জরে।
সে অঙ্গ বাতাস পায়্যা শীতল হইবে হিয়া
জুড়াব তাপিত প্রাণ মৃত তনু ভিতরে ॥

রাধার কণ্ঠে মরণকামনার কথা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সখী ললিতার বুকে যেন শরাঘাত হলো। রাধার মৃত্যুর কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। ললিতা রাধাকে সান্ত্বনা দেবার সুরে বলল :

'শুন বিনোদিনী নিবেদন বাণী
এখনি কেন বা মরিবে।
দূতী পাঠাইয়া সংবাদ আনায়্যা
তখন যে হয় করিবে ॥
শ্যাম বিলাসের কলেবর তোর
তাহা যদি পরিহরিবে।
তুমি মল্যে রাই শুনিলে তেখাই
শ্যাম কি পরাণ ধরিবে ॥
একের বিরহে না বাঁচিবে দোঁহে
সংসার আঁধার করিবে।
রাই মল্যে ভেঞি শ্যাম গেলে এই
কলঙ্কে ভুবন ভরিবে ॥'

সখীর কথায় রাধা কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। অতঃপর ললিতাকে বললেন মথুরায় গিয়ে মথুরানাথকে ব্রজধামে ফিরিয়ে আনতে। দূতী যেন কৃষ্ণকে বলেন :

'তোমায় পুছিতে পাঠাল্য রাই।
ব্রজে যাবে কিনা ভাব তাই ॥
ওহে যদি না নিশ্চয় যাবে।
তবে রাধার সনে দেখা না হবে ॥'

রাধার নির্দেশে দেবিকা, ধাত্রেয়ী প্রমুখ সখীদল মথুরার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। পাওয়া গেল রাধার প্রেমিক কৃষ্ণকে। সখীরা তাঁকে ব্যঙ্গ করে বললেন :

সখী কহে শ্যাম বদন হেরি।
মো সবে চিনিতে পারিলে হরি ॥
কার সহচরী কোথায় ধাম।
কার কিবা নাম কহনা শ্যাম ॥
মথুরায় আসি ভুপতে হল্যে।
রাজভোগে সব বিসরি গেলে ॥
কুবুজার পতি হলে এখানে।
আমা সবে আর চিনিবে কেনে ॥'

শ্যাম অর্থাৎ কৃষ্ণও কম রসিক নন। সখীদের বক্রোক্তি শুনতে শুনতে—

'শ্যাম বলে কি কহ সহচরী।
তুমাদিগে পাশরিতে কি পারি ॥
বিধাতা বিবাদে এমত কল্য।
ছলা ছাড়ি দূতী মঙ্গল বল ॥

আজ প্রাণদূতী বৈসহ কাছে।
কহ ব্রজবাসী কেমন আছে ॥
যশোদা মায়ের মঙ্গল বল।
কুশলে আছয়ে সখা সকল ॥
প্রাণপ্রিয়া সব গোপিনীগণ।
কহ দেখি সখি আছে কেমন ॥
পরাণ অধিকা রাধিকা প্যারি।
কেমতে আছে কহ সহচরী ॥
ললিতা বিশাখা সখীর গণে।
আমা বল্যে তারা করে কি মনে ॥'

সখীরা তখন গলায় দুঃখ ও ক্ষেদ ঢেলে জবাব দিল :

'ব্রজের বারতা কি কব সে কথা
সবি তথা অসম্ভব।
তব শোকে হরি ব্রজ নরনারী
প্রাণহীন যেন সব ॥
প্রাণহরি হয়্যা হারা।
তারা জিয়ন্তে হয়্যাছে মরা ॥
দেহ অতি ক্ষীণ সদা উদাসীন
কেশবাস নাহি বান্ধে।
শ্রীদাম সুদাম কোথা সখা শ্যাম
এই বলি ঘন কান্দে ॥
তুমার সুবল সখা কেবল ক্ষীণ।
সেত ধুলায় পড়ে নিশিদিন ॥

সখীদের বিবরণ পরম্পরায় কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুর ব্রজভুমির করুণ রূপটি ছবির মতো আঁকা হলো। তথাচ কৃষ্ণ নিশ্চুপ রইলেন দেখে তাঁকে পিঙ্গল কটাক্ষ হেনে জনৈক তন্বী মুখরা বলল :

'শুন শুন মাধব মৌনে রহসি যব
সুমুঝল ভাব তোহারী।
হইয়া মথুরাপতি সুখ সম্পদেতে মতি
বিসরিলে ব্রজনরনারী ॥
তোমার নিশান চলে আগে।
ঘোড়া হাতি ধায় বেগে ॥
গুণী গীত গায় রাগে।
ধেনু চরা মনে লাগে ॥
ডিণ্ডিম ঢোল খোল বাজত চলত সৈন্য চতুরঙ্গ।
চামর ব্যজন ভুষণ মণি ঝলমল চন্দনচর্চিত অঙ্গ ॥
ফুলমালা গোধুলি গায়।
পল্লবে করিথ বায় ॥
বেণু শৃঙ্গায় গীত গায়।
রাখাল বেশ কি ভনে ভায় ॥
পুরজন পরিজন জনক জননী পুন:
সকল মিলিল সথুরায়।
পাটে বসি হল্যে রাজা অধীন দেশের প্রজা
ব্রজসুখ কোন লেখা তায় ॥'

কটাক্ষপাত মুহূর্তেই অশ্রুপাতে বদলে গেল। সমস্ত সখী রাধার বিরহ দশার বর্ণনা করতে গিয়ে ভেঙে পড়ল কান্নায়। সকাতরে তারা শ্যামকে বলল :

'হে মাধব বদন তুলে ফিরে চাও।
এখন রাধার উপায় বলে দাও ॥
উপর গগনে চাহিয়া যখনে
নীল নব ঘনে দেখি।
পুরুব মরমে তোমার ভরমে
আইস বন্ধু বলে ডাকি
রাইয়ের দু নয়নে বহে ধারা।
চেয়্যে থাকে খেপার পারা ॥
চান্দ দরশনে শ্যামচাঁদ মনে
করিয়া কান্দয়ে লেহে ॥
বিজুর প্রকাশে মনে করি হাসে
ভাসয়ে নয়ন লোহে ॥
রাই শ্যামল তমাল দেখ্যে
ধায়্যা কোলে ধরে তাকে ॥

যমুনা সলিল   দেখি অতিকাল
ঝাঁপ দিতে চায় হেতায়।
সুখী বুঝিব   নাহিক রাধার
হয়্যাছে পাগলি প্রায়॥'

রাধার বিরহ বর্ণন করতে গিয়ে যে সখীরা এতো করুণ সুরে কথা বলছিল, তারাই আবার শ্যাম প্রসঙ্গে ফিরে বিষকণ্ঠে বিদ্রূপের গরল নির্গত করতে লাগল। কৃষ্ণকে তীব্র ভর্ৎসনায় জর্জরিত করে সখীরা বলল :

'তুমার মাথায় পাগ জামা ঘোড়া।
সঙ্গে ধায় হাতি আব ঘোড়া॥
বাঁকা চূড়া গুঞ্জা ছড়া।
আর কি মনে লাগে পীতধড়া॥
রূপ গুণ রস খনী।
মথুরার রমণী ধনী॥
রাধার গৌরব গেল।
কুব্জা পাটে রাণী হলা॥
উচিত মিলন কল্য।
বিধি বাঁকায় মিলায়ল॥'

এখানেই ক্ষান্ত হলো না গোপিনীদের গরল বর্ষণ। তাঁরা পূর্ববৎ তীক্ষ্ণ গলায় বলল :

'দুতী কহে শুন শ্যাম   রসিক নাগর নাম
ব্রজ মাঝে মিছাই ধরিলে।
লুব্ধ ভ্রমর হেন   তেয়াগি কমল বন
কেতকীর কুসুমে ভুগিলে॥
কুবুজা কামিনী পাই।
তেজ রসবতী রাই॥
বল হলধরের ভাই।
ব্রজে কি যাইবে নাই॥'

কৃষ্ণ ব্রজভূমিতে ফিরবেন কিনা—এই কথা শুধিয়ে সখীরা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল :

'শুন শুন মাধব   উচিত কহিয়ে অব
যদি বল না যাইবে আর।
পুরুব মানের কালে   দাসখত লিখি দিলে
সব সখি সাখি আছে তার॥
সেই খত দেখাইব।
রাধার দোহাই দিব॥
করে ধরে লয়্যা যাব।
তুমায় মধুপুরে কে রাখিব॥'

সখীরা তাঁকে হাতে দড়ি বেঁধে ব্রজে নিয়ে যাবে শুনে শ্যাম বিচলিত হলেন—

'কৃষ্ণ কন শুন সই।
মরম কথা তোরে কই॥
দৈব বসে কোথাও রই
রাধার বৈ আর কারো নই॥'
প্রসাদ বলে কয় হরি   যত বল সহচরী
কহিবার আছে অধিকার।
সজল লোচনে হরি   কন পরিহার করি
আমি অনুগত তার॥'

কৃষ্ণ যখন বললেন, তিনি রাধার বৈ আর কারও নন, তখন গোপিনীদের মধ্যে আশা ও আনন্দের বান ডাকল। কৃষ্ণকে ব্রজধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তারা ব্যাকুল ও উতলা হয়ে উঠল। তারা মাধব অর্থাৎ কৃষ্ণকে বলল :

'যদি রাখিবি ব্রজ   ব্রজরাজ তবে সাজ
মোদের সঙ্গে আয় হে।
তুমার মোহে   নয়ন লোহে
ভাস্যেই যায় হে॥
ব্রজ নগরে   শোক সাগরে
বিরহ মগর তায় হে
ব্রজবাসী মীন   হেরি নিশিদিন
গ্রাসিতে সদা ধায় হে॥'
ফিরিয়া যাব   যখন কব
না আইলে ব্রজ রায়।

গোপসখাগণ তেজিব জীবন
না বাঁচিব তব মায় ॥
কিশোরী তোমার দিলে শতবার
শরীর তেজিতে যায়।
সখী বিশাখা ধরি রাধিকা
যতনে যোগায় তায় ॥
লইতে তোরে পাঠায়্যা মোরে
রাই চাতকিনী প্রায়।
যমুনা তীরে নয়ন খিরে
পথ পানে খন চায় ॥
কুবুজা ডরে ব্রজ নগরে
যাত্যে মন নাহি ভায়।
যদি না যাবে রাধার তবে
দেখা না পাবে হায় ॥

সখীদের কথা যেন পাহাড়ি ঝরণার খাত—কটুতায় কালকুটের সমান. আবার করুণায় আদরে আদ্র। উপরোক্ত অনুরোধ সাঙ্গ করে সোহাগে গালি মিশিয়ে হিমবর্ষণ সংকুচিত সকালের মতো তাদের কণ্ঠ যেন মিলিত হয়েছে কবি রামপ্রসাদ রায়ের কাতর মিনতির সুরে :

'দেখায়্যা বদন কুবুজা সদন
পুন: আস্য মথুরায়।
দূতীর সনে 'প্রসাদ' ভনে
ধরিয়া শ্যামের পায় ॥'

সখীরা মুহূর্তের তরেও নীরব থাকতে পারে না। 'গঞ্জনার গুঞ্জন' রচিত হয় আবার, এবার দ্রুত লয়ে :

'পরিহরি পরিহরি রাই কিশোরী
ও নির্দয় হইছ হরি।
ইকুল উকুল পতি গুরুজন।
ত্যাজিয়া চরণ ভজিল যে জন ॥
প্রাণের আধা ছাড়িয়া রাধা
কেমনে জীবন রইছ ধরি ॥
বাড়ায়ো পরিতি করিয়া ছলা।
ছাড়িয়া আইলে কুটিল কালা ॥
মুগ্ধবালা বিরহ বারী।
সইব কত অবলা নারী ॥
না দেখি তিলেক রইতে নারে।
রাখিলে তারে যমুনা পারে ॥
চলহে নাগর ব্রজ নগরে।
তার গা রাখায় শোকসাগরে ॥'

সখী-দূতীদের দ্রুত লয়ের গুঞ্জন থামলে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

'হে দূতী বিনতি মোর কইবে শ্রীমত রে।
কহি তোর ধরি করে এই বল্য রাধিকারে
পুরুষের ভাব যেন না ছাড় আমারে।
বিধাত্য বিবাদ কর্যো মধুপুরে থুইল মোরে
অহনিশি প্রাণ ঝুরে না দেখ্যে তাহারে ॥
তারে ছাড়ি মথুরায় কেবল আছয়ে কায়
পরাণ পড়্যো আছে রাধিকা গোচরে ॥
যথা থাকি যথা যাই যে দিকে ফির্যো চাই
রাধাময় বিনা কিছু না দেখি সংসারে ॥
জলেস্থলে রাধা নামে জিহ্বা জপে বনে ধামে
রাধা চাঁদমুখ দেখি অন্তরে বাহিরে ॥'

এরপর কৃষ্ণের কাছে বিফল হয়ে দূতীরা সবাই ফিরে গেল ব্রজধামে। কৃষ্ণ সঙ্গে এলেন না দেখে রাধার বুক হাহাকারে ফেটে পড়ল :

'দূরে হত্যে দূতীগণে দেখিয়া।
রাধা কহে সখীবদন চায়্যা ॥
হে ললিতা দেখ বিশাখা সই।
দূতী একা ফিরে আইল অই ॥
নিশ্চয় নিঠুর হইল শ্যাম।
আর না আসিবে এ ব্রজধাম ॥

মানের গরবে গঞ্জিনু হরি।
মাধব না আইল সে মনে করি॥
এখন ফলিল সে সব পাপ।
করমের দোষে ভুঞ্জয়ে তাপ।
নিছা আসে আর পরাণ ধরি।
পরাণ তেজিব ভাবিয়া হরি॥

পরিশেষে রাধা সখীদের মুখ থেকে শ্যামের কুশল বার্তা শুনতে চাইলেন :

'কহ সহচরী কুশল কথা।
মাধব মঙ্গলে আছয়ে তোথা।
তুমা সবে দেখি কমল আঁখি।
কি কথা বলিল কহ না সখী॥'

রাধিকার উৎকণ্ঠা দেখে দূতীগণ কৃষ্ণের প্রশংসায় সরব হলো :

'শ্যামের প্রেমের তোলনা নাই॥
রাজপথে আমা সভারে দেখি।
রাজকাজ তেজি কমল আঁখি॥
নিভৃতে মোদিগে লইয়া তোথা।
একে একে পুছে কুশল কথা॥'

সখীদূতীদের মুখেই কৃষ্ণের কথা শুনে রাধা পরিতৃপ্ত হলেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তিনি রসিক কৃষ্ণকে স্বপ্নে দর্শন করলেন :

'নানা রস কেলি স্বপনে করি।
রাধারে সন্তোষ করিয়া হরি॥
যশোদা মায়ের তোষিয়া মন।
মথুরাকে পুনঃ কল্যা গমন॥
জগত তনয় প্রসাদে গায়।
মাথুর বিরহ হইল সায়॥'

মাথুর বিরহকে স্বপ্ন মিলনে পরিসমাপ্ত করেছেন কবি রামপ্রসাদ। এরই সঙ্গে শেষ হয়েছে কৃষ্ণলীলামৃত কাব্যের 'দূতী সম্বাদ' খণ্ডটি। এবং এই সঙ্গে শেষ করতে পারি বর্তমান নিবন্ধের ঝাঁপি। কৃষ্ণলীলামৃতের এই অপ্রাপ্তপূর্ব পুথির প্রকাশই এই নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। সম্পূর্ণ কাব্যটি আকারে বৃহৎ, যাকে নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে গবেষণার শেষ নেই। অসীম ধৈর্য-শালী না হলে সেটি পড়ে ওঠা প্রায় দুষ্কর। তদুপরি বক্ষমান পুথিট পাওয়া না গেলে কিংবা প্রকাশ না পেলে এমন অপূর্ব অংশটি পণ্ডিতপ্রবরদের অগোচরে থেকে যাবে এই আশংকায় এর ছাল ছাড়ানো অংশ-টুকুই আপাতত নিবেদিত হলো। ভবিষ্যতে পাঠকেরা সদয় হলে রামপ্রসাদ-জগরাম প্রসঙ্গে তৃতীয় দফায় আলোচনার সময় কৃষ্ণলীলামৃত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

তথ্য চয়ন :

(১) দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ; পৃ ২৮৭
(২) সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ; প্রথম খণ্ড, অপরাধ ; পৃ ৪১৩
(৩) অজিত রায়কে লেখা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১ ডিসেম্বর '৮৩র চিঠি
(৪) ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা : সাহিত্য প্রসঙ্গে ; পৃ ১১
(৫) রামপ্রসাদ রায় : দূতী সম্বাদ ; পুথি পৃ ১০
(৬) বর্তমানে রঘুনিয়া গ্রামটি বিহারে সিংভূম জেলার পত্তকুম থানান্তর্গত।
(৭) ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা : প্রাগুক্ত ; পৃ ১৩

খোঁজ (২)/শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাতী ! স্বাতী
পাহাড় বনের মৌনতা ফিরিয়ে দিল স্বাতী স্বাতী
সমুদ্রের রলরোল ভ্রূক্ষেপেই আনলো না
জনবসতির গায়ে ঐ আর্তশব্দ দাগ কাটলো না কোনো

প্রহারে পীড়নে উদ্বাস্তু চোখ তোমার চোখে পড়তেই
কবেকার পাথরচাপা সরিয়ে দিয়ে
হু হু করে ঝর্ণার জল এসে ভাসিয়ে দিলো বুকের খরা
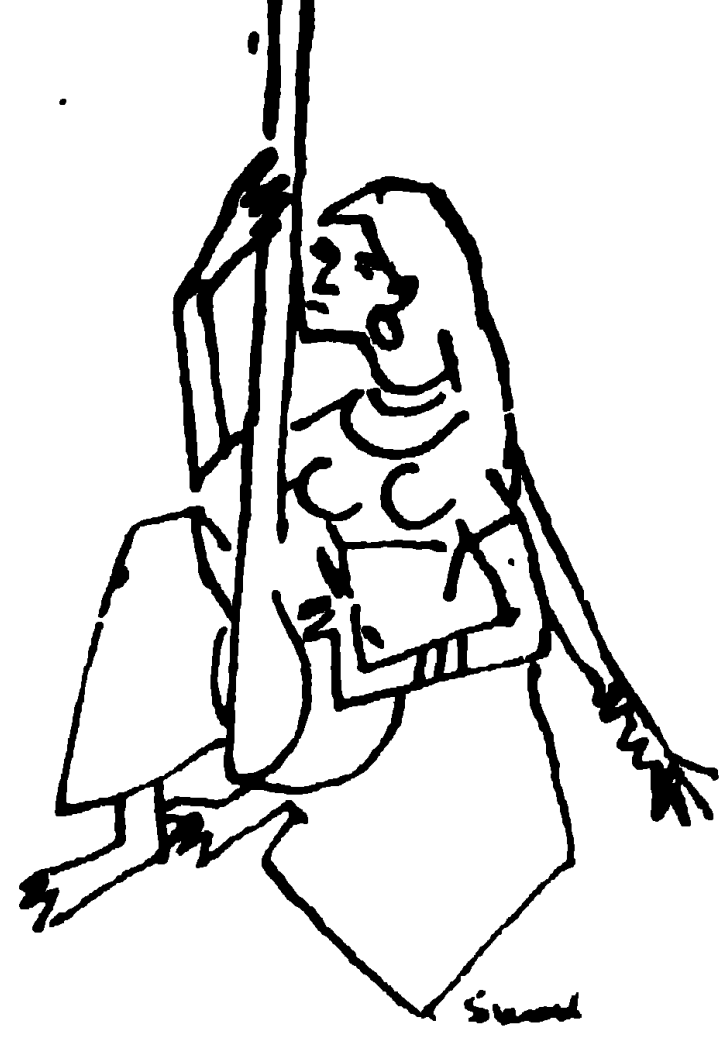
তা কি আদৌ সম্ভব/কৃষ্ণসাধন নন্দী

অবিশ্বাস্য কিছু ঘটে যায় যদি
উন্মুক্ত হতে পারে সি হদ্বার
ওখান দিয়ে দিব্যি হেঁটে যাওয়া যায়
গটগট অন্দরমহলে। ত ন আস্বাদ
নোতুন কিছু ব্যাঞ্জনার
তা কি আদৌ সম্ভব ? তবে তো
শস্যে ঢাকা হবে সমস্ত মাঠ
মিলে মিশে হৈ চৈ পঙ্ককাল
ফোয়ারা নিয়ম ভাণ্ডার—

অবিশ্বাস্য কিছু ঘটে যায় যদি।

চলে যাওয়া/মনোরঞ্জন খাঁড়া

কখনও তেমন করে চলে যাওয়া যেত
কান্না-বাতাস খাল বিল বিমর্ষ আলোর লণ্ঠন তাপ
হা-হুতাশ ফেলে
পাখোয়াজ আকাশ কি সোনাদানী নিমফল ঘাটে
কে যেন দুঃখের ভে·র হিরন্ময় আলোক ছড়ায়

কখনও তেমন করে অন্য অন্য কোন ডালে
ঝড়ের বাতাস ফুঁড়ে নীল নীল শব্দ সুষমা
সবুজের গা থেকে তুলে আনা কিছু বা অশৌচ আঁশের
সৌখিন হাওয়ায় নোনা পা'টি নেড়ে চড়ে উড়ে বসা যেত

ভাষা কবিনারী/মঞ্জুভাষ মিত্র

অতি সুন্দর ভাষা কবিনারী মধুর গ্রীবার তরল আন্দোলনের ছোঁয়ায়
প্রিয়পুরুষের হৃদয়কে কাছে টেনে আনে যেন উচ্চ কঠিন তীব্র আকর্ষণে
আমি তো ভেবেছি পৃথিবীর বুকে কোনো একস্থানে স্থির হয়ে ঠিক রবনা কখনো
স্রোতময় জলে জমে না শ্যাওলা, একঘেয়েমির ক্লান্তি অতীব ঘাতক
ঘুরে ফিরে সেই একই ভূ-দৃশ্য প্রতিদিন দেখা ; আমি তো ভেবেছি এবার ভ্রমণে যাব
সমুদ্রতীরে নীলাভ উষ্ণ নারকোলবনে; কামনাগন্ধী দিবসরজনী কাটাবো
বুকের উপর স্থির হয়ে রবে ভাষা কবিনারী : জলের কোমল দর্পণ-জোড়া
ত্রিদশভুবন ; সেই তো কবিতা পরমেশ্বরী নারীকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনের স্বাদ
কান পেতে শুনি আমার মনের নিষিদ্ধ সুখ বুকের গোপন দুয়ার খোলার ধ্বনি
সেই একতমা আত্মের কাছ থেকে চিরদিন নির্দেশ নেই জীবনের পথে
কবিতাকুঞ্জে স্বপ্ন কুড়াবো, বর্ষ ফুরালো এবারের মত মোহময়ী পর্বতে
আমার মনের ভাবনা ফোটাবো ললিত শিল্পে তাকে দেব নারীরূপ
শব্দে শব্দে রূপবতী সেতু রচনা করবো চলে যাবো এক সুগন্ধ ফুলবনে
সে নারীর স্তনে ছন্দরত্ন চরণে পয়ার নিতম্বদেশে ষষ্ঠ মাত্রাবৃত্ত
যা আমার প্রিয় । ঠোঁটে স্বরাঘাত, স্বর্ণহারের মহান দ্যোতনা কণ্ঠমূলে
চাঁদের মধুর আলোর মতন আমি পড়ে থাকি সে নারীর বুকে উন্মুখ চোখে চুলে
শহরের পথে তার সাথে দেখা হয়েছে একদা ভুলে আমি আজও যাইনি সেকথা
সাগরের পথে 'সিন্ধুমরাল' নামক জাহাজে ঘননীলরাতে তার সাথে দেখা হবে
যেখানেই যাব কলঙ্কহীন ঈশ্বরীবৎ চিরপ্রসঙ্গ সে আমার সাথে রবে
মনের কথাকে বনে গিয়ে বলো, বোলো না সে কথা কোনো মানুষের কানে
মনের কথাকে নারীকাণে বলো স্বভাবের স্রোতে দিবস কাটাও আত্মছন্দ গানে
প্রহরে প্রহরে প্রণয়কে করো মননের সখী কুমারী নামক ফুলবনে চলে যাও
ছন্দে গেঁথেছ শব্দের মালা মণিমুখে সুখ, নগ্ননারীর চিত্র সামনে রেখে
দিবস কাটাও ; দায়িত্বহীন সুন্দর হও নৌকা ভাসাও প্রবাসে ঝর্ণা ধারায়
ভাষারমনীর সাথে কথা বলো সারারাত ধ'রে সারাদিন তার চিত্র নিকটে রেখে
শিল্পের ধ্যানে দিবস কাটাও । গোলাপ আঘ্রানা শিল্প ভরেছে ত্রিদশভুবন
শুধু মনে রেখো একস্থানে বসে কাটাবেনা দিন এবার ফাল্গুনে ভ্রমণে যাবে
হৃদয়ে তোমার সঙ্গীত আর রত্নের ভীড় ; [illegible]দবতী ভাষা হ'ল কবিনারী
নারীর গ্রন্থ লিখে লিখে যায় বেলা······

বৈশাখ/১৩৯২/গোধূলি-মন/তের

মাত্র একদিন/অমল দাস

গৃহস্থালী ছিঁড়েখুঁড়ে
একদিন চলে যায় গৃহস্থ মানুষ ;

ওইদিন পেছনে যে টান ছিল
সংসারী আদান প্রদান
সে সব সেখানে ফেলে
চলে এল নেশায় নেশায়
সে মানুষ ভুলে গেল
রোজকার একই আর
একঘেয়ে ব্যস্ত জীবন
যেন সে ভীষণ অন্ধ হ'য়ে
ভেসে যাবে স্ফটিক সন্ধানে
সেখানেতে সব রঙ এক ক'রে
শব্দে বর্ণে স্পর্শে হবে এক
সে নিজেই তা জানে।

তবু সে যাবেই
তবু সেভাবেই
একদিন সব ছিঁড়ে চলে আসে
সবান্ধব নেশাতুর হ'তে
রোজকার বোধ নিয়ে
তখন সে হবু সম্রাট—
একদিন মাত্র একদিন।

প্রতীক্ষা/অশোক চট্টোপাধ্যায়

একান্তে বিকেলে কোন
কিংবা কোন নিস্তরঙ্গ গ্রীষ্মের দুপুরে
যখন তোমার ছুটি
অবকাশ অনন্ত অপার—

সেই যুবকের কাছে
কি তোমার চাওয়া ছিল ?
কি ছিল ? কি ছিল ? করে
এখনও ভাবনা ঘোরে
নিজস্ব নির্জনে।

পরিণত সুঠাম যুবতী —
তুমি সেই যুবককে
শেখালেকি অবৈধ প্রণয় ?
প্রেমকি অবৈধ হয় ?
স্পর্শের অমোঘ যাদুতে
তুমি তার চেতনার সমস্ত তার
বেঁধে দিতে গভীর আশ্লেষে ;

আরবার ডাকবে কখন
সে যুবক প্রতীক্ষায় আছে।

কবিতা

একটি প্রসঙ্গ : প্রেম সম্বন্ধে
দিলীপকুমার ঘোষাল

তার বাড়ির সামনে
সাজানো ফুলের বাগান
পাঁচ পাঁচটা লাশ আগলে
বসে আছি
আমি।
ফুল পাঠিয়েছে
সে আমার জন্য।
পাঁচটা মুখের আদল
পাঁচটা ফুলের মধ্যে!

কাল লাশ আগলাবে
অন্য কেউ,
পায়ের কাছে ফুল
আমার মুখে
মাছি ভন্‌ভন্‌
করবে তখন্‌!

দুটি কবিতা/সংযম পাল

১। হাসি ও ভোর
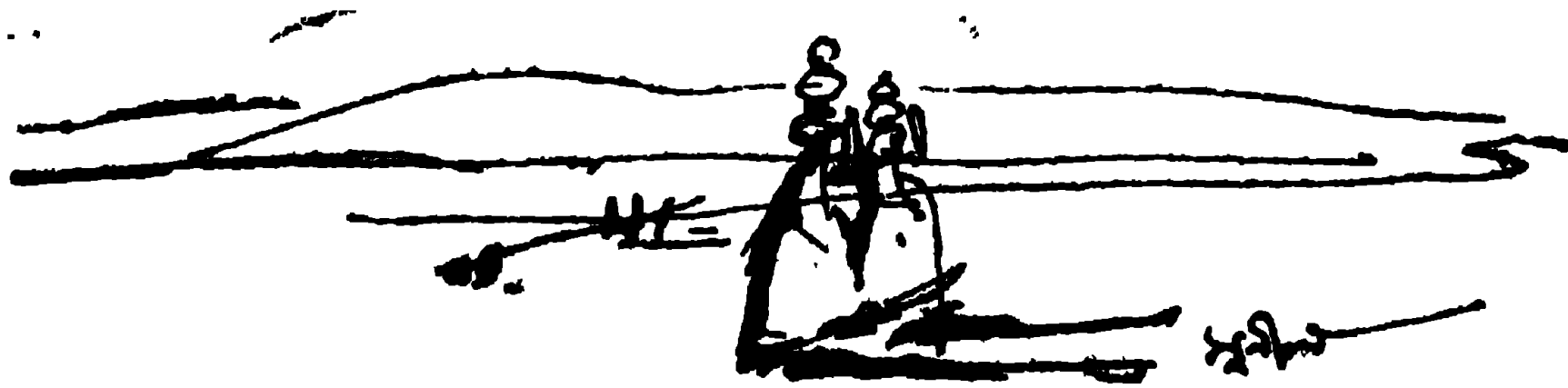
প্রাচুর্যের হাসি আজ বন্যতা ছড়ায়।
আকাশ গোলাপী-নীলে ভ'রে গেছে, জ্যামিতিক রেখার বিক্রমে
মহান শূন্যের কোল পাঠ্যের মতোন
আমার দৃষ্টি ভ'রে ঔৎসুক্য আনে। এত ভোর,
কোমল বুকের মতো নরম সকাল
গাছেদের ঘন শীর্ষে সবুজ ডাঙায়
কি ছড়ায়, দেখি আমি, অনুভবে পরিপূর্ণ হই।

রাস্তার ও পাশে ওই চারটি সরল মেয়ে হাসে।
হাসির প্রাচুর্য, আর আরো হাসি, অনন্যের উন্মুখ হাসির
বন্যতা ভরেছে এই সকালের ঔদার্য, আমার ভেতর
লম্বা চোঙের মতো যা' ছিলো গহিন শূন্য, তাকে ভ'রে আজ
রুধিরের স্রোতোপনে কে আসে নিঃশব্দে নেমে, আঙুলে বাঁশরী,
সুর ওঠে, পূর্ণতার সুর।

প্রচুর সহর্ষ হাসি, আর তার হাসিপথে তাঁর আগমন
আমাকে বন্য করে, সাপিনীর বন্যতায় বাঁধে।

২। ডানার আঘাত

তাঁর ভালোবাসা আকাশের থেকে ভাসে।
গাছের ফুলের কুঁড়ির বর্ণে ঘন
তাঁর ভালোবাসা নতুন গন্ধে ভাসে।

আমি বুঝি, আজ আমারও ভেতরে ভাসে।
কিছু ভাসে, কোনো অস্তিত্বের ডানা—
আমাদের মুখে ডানার ঝাপট লাগে।

আমরা এমন আঘাতেই বেঁচে থাকি।
আমি জানি, তাঁর ভাসন্ত ভালোবাসা
ডানার ঝাপটে মানুষ বাঁচিয়ে রাখে।

কবিতা ঃ কেয়ার অব কলকাতা

অমৃতেন্দু চৌধুরী

কবিতাকে নিয়ে কলকাতার মত এত মাতামাতি, এত উৎসব ও মেলা, কিংবা এতবেশী লোক অন্য কোথাও কবিতা লেখেননি। এখানে প্রাতঃভ্রমণে কবিতা নিয়ে আলোচনা হয়, রাত্রির ঘুমও আসে কবিতা পড়তে পড়তে।

আর পনেরো বছর পরে আমরা নতুন এক শতাব্দীর মানুষ হয়ে যাব। পাল্টে যাবে সময় এবং কবিতা, জন্ম নেবে কত নতুন নতুন কবি—ইতিহাস তার হিসেব রাখবে না হয়তো, হয়তো গবেষক তার সামান্য সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে একটা অঙ্ক দেখাবেন, যেখানে কবিতা ও কবি উভয়কে করা হবে অপমানিত, হয়তো ফ্রান্সের মতো একদিন কবিতা হাস্যাস্পদ হয়ে যাবে। কবিতা হবে শিল্পের অপাঙক্তেয় পংক্তি। নতুবা……

যাইহোক আদা-ব্যাপারী হয়ে আমার জাহাজের খবর নেওয়ার দরকার নেই। কবিতার অনুরাগী পাঠক এবং কবিতার কর্মী হিসেবে ঠিক এখনই আমি যা পাচ্ছি, সমগ্র বাঙলা সাহিত্য যা পাচ্ছে সেই ভাবে শুরু করি। এই আশির দশকের (অতীতের কোনো সময়ের কবিতা ও কবি সম্পর্কে আমি যাচ্ছি না।) কয়েকটা বছরে আমরা কাদের কিভাবে পেয়েছি। অন্তত ষাট ভাগ তরুণ এখন এই দশকে কবিতা লিখছেন। তাঁদের অনেকেই ভাল লিখছেন। অনেকেই লেখার চেষ্টা করছেন—আবার কেউ কেউ কিছুই পারছেন না। তাই জন্মলগ্নেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি রেখেছেন, কবি হিসেবে ক্রমশ সঞ্চয়ী হয়ে উঠছেন, এবং ক্রমশ মুগ্ধ করছেন আর কিছুটা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছেন আমি তাদের কথাই এখানে বলব।

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সোফিওর রহমান, অজিত রায়, মল্লিকা সেনগুপ্ত আমার আজকের আলোচনার বিষয় হতে পারত, কিন্তু এদের মধ্যে অজিত, মল্লিকার আরোও পঁচিশ-তিরিশটি কবিতা অন্তত না পড়া পর্যন্ত কিছু বলতে চাইছি না। এখানে বলে নিই এদের কাউকেও আমি চিনি না, তবে এদের কারো বই সংগ্রহ করে, কারো সঙ্গে ডাক মাধ্যমে কিছু কবিতা চেয়ে নিয়েছি মাত্র।

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের একটি বই বেরিয়েছে, নাম—'যাওয়া নেই, ফেরা নেই', বইটি পড়েছি, একবার নয় একাধিক বার। সামান্য কিছু ভুল চোখে পড়লেও সেগুলিকে দেখার মতো দেখিনি, পাঠকের পবিত্রতা ও আন্তরিকতা দিয়ে ভরিয়ে নিয়েছি। নীলাঞ্জন আশির দশকেরই কবি—অন্তরে রবীন্দ্র প্রেমিক, অঙ্গ সজ্জায় এলোমেলো, জীবন ধারায় ক্ষয়িষ্ণু এবং বোধে চিরকালীন ব্যথাতুর।

একজন কবি ঠিক কবি হয়ে ওঠার আগে কতদিন যে উপবাসে থাকে, ভাঙ্গে শরীর, সময়ের কার্পণ্যে নিজেকে তিল তিল করে লোভী ক্ষুধাতুর করে তোলে তার উদাহরণ নীলাঞ্জন নিজে। নীলাঞ্জন একদিন মরে যাবে, এ পৃথিবীর ধুলোয় অগ্নিকণায় তার শরীর ছাই হবে 'আয়নার ভাঙ্গা চোরা কাঁচে' সে রক্তাক্ত হবে, তবু তার যাওয়া হবে না কোথাও, বাঁধা হবে না ঘর, ফিরে আসা হবে না – শুধু একটি জায়গায় সে পৌঁছে যাবে, যেখানে পেয়ে যাবে একটা স্পর্শ, যেখানে কবিতার সার্থকতা, যেখানে আবহমান সুখ। আসল ব্যাপারটা এতেও পরিষ্কার হোল না অচেতন অবচেতন স্তরের নীলাঞ্জন যে উপলব্ধি করেছেন তা আপাত বিন্যস্ত নয় অথচ খুবই সূক্ষ্ম এবং সুকুমার। সুররিয়ালিজম কবিতা ভুবনের রূপতৃষ্ণা ও রহস্যময়তার খবর তার কবিতায়—উপবাসে হা-হুতাসে রূপোলী বয়স আসে ভেসে যায় ওবধি প্রণয়/এখানে পথতো নেই তবুও পথের ডাক মনে হল এতই অধরা/চোখ জ্বলে গেল তাপে, রূপের দারুণ দাহে জেনে গেছি, ভুল সব জরা"। এই জীবন ও জগত দুয়ের মধ্যেই নীলাঞ্জন কবিতার স্বাদ পেয়েছেন, ধরতে পারেননি শুধু ছুঁয়েছেন মাত্র আসলে আলো না দেখে যদি অন্ধকার সঙ্গী হয়—কোন দুঃখ থাকে না, কিন্তু অন্ধকারের বুক চিরে আলো হাসলে যে কষ্ট আমাদের বুক তোলপাড় করে এবং সেই কষ্ট সহ্য করে আলোর জন্য যারা শ্রম করে তারাই শিল্পী। শিল্পী নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায় সেই 'অন্ধকারে'র সামনে দাঁড়িয়ে, অনেক অনস্তিত্বের মধ্য থেকে আস্তিকতা খুঁজে বার করার জন্যই সচেষ্ট।

কবির শব্দ কখনো কোথাও গম্ভ ভাবে দুর্জরিত হয়নি, অথচ বহুদিনের পুরোনো শব্দ পুরোনো ছন্দ কবির হাতে আধুনিকতা লাভ করেছে –

একেকটি দিন এমন প্রবাস, বৃষ্টি ভোলে শ্রাবনী রাত
একেকটি দিন এমন খেলা, উড়ছে পাতা ঘূর্ণী হাওয়ায়
জন্মদিনের রাজপ্রাসাদে জ্যোৎস্নামেঘের বিনম্র স্তব
অন্বেষণে এতই সুদূর গৃহ আমার মাতৃভূমি?

কবিতা মূলতঃ শব্দজাত ভাবার শিল্প, এই শিল্পে যিনি সামান্য কথা মোক্ষম ভাবে বলতে পারেন তিনি কবিতার শিল্পী। কবিতা আবহমান এক নদীর মতন এদেশে বয়ে চলেছে মৃত্যুহীন, সময়ের প্রজন্মে সে নদী শুধু রূপ পাল্টেছে মাত্র। তার চলার শব্দ তার বুকের ভাষা এক থেকেও রণনে ভিন্নতর। নীলাঞ্জনের কবিতায় আমরা ভিন্ন আস্বাদ পাই, নীলাঞ্জন প্রতীক ও চিত্রকল্পে এবং কবিতার কায়া গঠনে মেধা-প্রাজ্ঞভাবে পাঠককে ভিন্ন আস্বাদ দিতে পেরেছেন— নীল চোখে তুমি বোঝো বসন্ত, আমি শুধু দেখি ক্ষয়/কতখানি ব্যথা জানে জাহ্নবী? স্রোতে ভাসে কত তৃণ'। এই চিত্রকল্পে পুরোনো প্রসঙ্গ আজকের আধুনিকতা অর্জন করেছে, একটি সরল রৈখিক ধ্বনিময়তা

আধুনিক অন্তর্মুখীনতা টের পাইয়ে দেয় পাঠককে।

দিনে যে তস্কর আমি, গাঢ় রাত্রি তবু স্থাখো জেগে
আছে ব্যথার বাসর
নারী ও নদীর কাছে জরা ও জীবন থেকে আমি
খুঁজি ঘর, শুধু ঘর
ঘর চাই, ধীবর সেজে তো তাই খুঁজে ফিরি
অভিজ্ঞান অঙ্গুরীবলয়—

উপরোক্ত তিনটি পংক্তিতে "নারী ও নদী" এবং "অভিজ্ঞান অঙ্গুরীবলয়" দুটি অনুষঙ্গ ও উপমা অতি প্রাচীন, কিন্তু অন্বেষণের আত্মবীক্ষণে কবি নীলাঞ্জনের হাত আমাদের কাছে পাকা শিল্পীর মতো ভিতরটা দেখিয়ে দেয়। ষাটের দশকে যে কবিতা ছিল স্বীকারোক্তির আশির দশকের তরুণের হাতে তা হলো আত্মদর্শনের।

আশির দশকের আত্মবীক্ষণের এক গভীর ভাবনার রহস্যময় কবিতার জনক সোফিওর রহমান। সময় হিসেবে আশির শুরুতেই এর আত্মপ্রকাশ এবং ঈর্ষাতীত ও মুগ্ধকর ভাবে এই কয়েক বছরে আট দশটি কাগজে আলোচিত হয়েছেন। কবি সোফিওরের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনটি—এক : জাগতিক ও মহাজাগতিক জটিলতার মধ্যে জীবন ও কালানুগ বাক্য সৃজনের প্রতি মোহ বা অনুরাগ, দুই : আত্মসমীক্ষা এবং আত্ম জিজ্ঞাসার মৌলিকতা এবং তিন : চিত্রকল্পে মেধা ও মৌলিক স্বাতন্ত্র।

জাগতিক ও মহাজাগতিক অনুভূতিগুলির মধ্যে চৈতন্যের সূক্ষ্মতম তন্ত্রীগুলি যখন কেবলি ব্যথায় ভরপুর 'হিম শৈলের মুখোমুখি নিবিড় আঘাতে ক্ষত বিক্ষত' নায়ক কোথাও হতাশ না হয়ে এই জীবন জগত ও মহাজগতের ত্রিতীর্থে চঞ্চল পাখীর উড়ুক্কু ভালবাসার মতো প্রেম—আলেয়াকে পেতে চান না। ভালবাসার স্থায়ী অমৃত সন্ধানে সোফিওরের অবিরাম অন্বেষণ—তা সে 'ক্ষুধাতুর ঘরণার' কিংবা 'রক্তাক্ত পায়রার' অথবা 'প্রতিবন্ধী শিশুর' চিত্রকল্প যেভাবেই আসুক না কেন এক জীবনে বহু বসন্তের উপলব্ধিতে পাঠক পরমায়ু পেয়ে যায়, যেন মুখে অমৃত আস্বাদ।

'ফুলেরা জেগে ওঠে অমিত আলোর মহল, জানে না
কি তার বাহার
আমি জানি, আত্মার বিন্দু বৃন্তে ফল ফলাবার এই
সে মধুময় ঘোর
অমৃতের চাবুক যার বুক ভেঙেছে সেই জানে সৃষ্টির
কি বাহার।'

অথবা—

'হলদীর ভাঁটায় তার উজানের ক্লান্ত নিঃশ্বাস, ভাঙা
ঢেউ
নিরিবিলি ভেসে যায় একাকী লখীন্দর, ক্যানেলের
মিহি ঝরণায় কার এলো চুল ?
বাৎসল্যে বহতা বাতাস
আকাশের কানে কানে কী কথা শোনালো—
মন্দির ঝাউ দুলে দুলে নাচে ওড়িশী নর্তকীর মতো,
জন্ম থেকে মৃত্যু থেকে জন্মাবধি এক অস্থির অন্ত
বিদ্যুৎ
ওই এলোচুলে ঘন হয় হলদীর জোয়ার বেলার মতো'

উপরোক্ত প্রথম তিনটি ছত্রে সোফিওরের কবিতার বুক ভাঙা দগ্ধ জীবিত নায়ক সোফিওর নিজেই, যেখানে ভাঙা বুকের উপর ফুল ফুটেছে—সত্যি কি ফুল ফুটেছে ? আসলে একজন কবি তার আত্মার পবিত্রতার স্পর্শ তার কবিতার মাধ্যমে পাঠককে জানিয়েছেন, যেখানে 'জাগতিক শোকের মিছিল ধুয়ে ঝিনুক পাহাড়ের' মতো পৌরুষ জাগে অর্থাৎ মৃত্যুময় মানুষের মৃত্যুহীন প্রেমের ভাস্কর্য। দ্বিতীয় কবিতায় 'বাৎসল্যে বহতা ...... মতো' পর্যন্ত পড়ার পরই আশ্চর্য এক দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বুকের বুদবুদ অন্তর বিদ্যুৎ হয়ে জীবনের জয়গান গায়, ফলে চিত্র-

করে মন্দির ঝাউ দুলে দুলে নাচে ওড়িশী নর্তকীর মতো। বেঁচে থাকার বিষময় যন্ত্রণায় জ্বলতে পুড়তে পুড়তে যে মানুষ আরো বাঁচতে শেখায় কিংবা সমস্ত যন্ত্রণা—

'সারা দেহে বেদনার মেঘ
এক ব্যথিত বাতাস ছুটে এলে তার দিকে
দিগন্ত জুড়ে অন্তর্মুখী সুর
অপর্ণু হৃদপিণ্ড
ঝরণার মতো শিবরঞ্জনী' হয়ে সুর ছড়ায়

সেখানেই তো কবিতার সার্থকতা। নয় কি?

সোফিওর রহমান সেই কবি—আজকের অনুভূতি, এখনকার ধারণা অব্যবহিত পরেই ভাঙছেন, আবার গড়ছেন ভিন্ন কৌশলে। এক একটা মুহূর্ত এবং মুহূর্তের অণুকণাগুলি তাঁর কাছে কবিতা হয়ে ধরা দিয়েছে। কোথাও একটি মুহূর্ত তাঁর প্রেমিকা, কোন দিন জননী আবার কখনো বা প্রেমিকা এবং সব ক্ষেত্রেই মুহূর্তগুলি তার নিজের সপক্ষে বদরাগী ব্রহ্মবিদ তরুণের শস্যকাম কবিতার অমৃত তৃষ্ণা যেন, সেই তৃষ্ণায় নিজের পক্ষে তাঁর নিজের মুখাগ্নি—নিজেরি ক্ষণ জন্মের প্রার্থনা—সেইজন্য সোফিওর প্রতিদিন বার বার জন্ম নিচ্ছেন।

কবির কবিতার ভাষায় তৎসম-তদ্ভব-দেশী-বিদেশী বহু শব্দ বাঙলা কবিতার আধুনিক ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে অনেকের মতো। তার চিত্রকল্প একই ছবির উপর ভিন্ন ভিন্ন উপমায় মধুর, যেমন—সমুদ্রের ঢেউ কখনো 'যন্ত্রণার শিকল হয়ে গেছে' আবার কখনো নীল দোলনায় হীরক উজ্জ্বল ঝরনা' আবার কোথাও সমুদ্রের ঢেউ তাকে দিয়ে দুলে সরে যায় কাঁচের বাটির মতো'। এসব কিছুর আড়ালে সোফিওর অর্জন করেছেন তাঁর মেধা মনন ও অভিজ্ঞতা দিয়ে। জীবনের এমন সুন্দরতম মুহূর্তগুলি রূপসী কবিতায় ধরে রাখাই সোফিওরের প্রিয় নেশা যেন।

আশির দশকের আরো দুই উজ্জ্বল কবি অজিত রায় ও মল্লিকা সেনগুপ্তকে নিয়ে পরে আলোচনার ইচ্ছে রইল, আপাতত ফিরে চলুন কলক তায় যেখানে আকাশে বাতাসে মিছিলের শ্লোগানে এমনকি কফির পেয়ালায়ও কবিতার উত্তাপ।

কিছুক্ষণ

জাইদুর রহমান এবং আমি

ফারুক নওয়াজ

শুক্রবার। শান্ত-মায়াবী বিকেল। মতিহারের সবুজ-সৌম্য পরিবেশ। মার্চের ৮ তারিখের স্মৃতিময় কবিতার আসর।

রাজশাহী ও দেশের বেশ ক'জন তরুণ কবি ঐ দিন মিলিত হয়েছিলেন এক মন নিয়ে।

আমার হাতে ছিলো আবুসয়ীদ আইয়ুব সংখ্যা সহ কয়েকটি 'গোধূলি-মন'। 'গোধূলি-মন' থেকে মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ছাতা' এবং অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'মধ্যরাত' কবিতা দুটি আবৃত্তি করে তরুণ কবি জাইদুর রহমান অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন।

মালেক মেহমুদ, হাসনাত আমজাদ এবং তৌফিক হাসান যথাক্রমে সুনীল গঙ্গো-পাধ্যায়, আলমাহমুদ ও আবুল হাসানের কবিতা থেকে আবৃত্তি এবং নিজেদের কবিতা পাঠ করলেন।

জাইদুর রহমানের সুললিত কণ্ঠ তার কবিতার মতোই সুন্দর। মুখোমুখি এই প্রথম এঁর সাথে পরিচয়। দেখালাম 'গোধূলি-মন' এর কয়েক সংখ্যা। অঙ্গসজ্জা এবং সম্পাদকের রুচিজ্ঞানের প্রশংসা করলেন।

জানালেন, মোহিনী মোহন, অশোক চট্টোপাধ্যায় এবং অভিজিৎ ঘোষের কবিতার সাথে কিছুটা পরিচিত তিনি।

জাইদকে বললাম—'গোধূলি-মন' যুবক-দের সম্পদ। জানালাম—আপনাকে নিয়ে 'গোধূলি-মন' এ আলোচনা করবো।

যাইহোক নির্ধারিত দিনে তাঁর সুন্দর-সাজানো গোছানো ঘরে উপস্থিত হলাম।

কফির কাপে চুমুক দিতে-দিতে তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনে নিলাম।

১৯৫৯ এর ২৫শে নভেম্বর রাজশাহীতে জন্ম। মাসিক অনির্বাণে প্রথম কবিতা ছাপা

হয় ১৯৭২-এ। প্রিয়গ্রন্থ—শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন। প্রিয় কবি—আল্লামা ইকবাল। প্রিয় রঙ—সবুজ।

সমসাময়িক কার লেখা ভালো লাগে জানতে চাওয়ায় আমার নামটা সর্বাগ্রে উচ্চারণ করেন। আমি হাসলাম। অন্য কারো নাম জানতে চাইলাম। জাইদ কিছুক্ষণ থেমে বললেন,—সৈয়দ নাজাত হোসেন, অনীক মাহমুদ, সালেক মেহমুদ প্রমুখ।

ব্যক্তিগত জীবনে—অবিবাহিত সমাজ বিজ্ঞানে এম. এ। বর্তমানে ইফা, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম শ্রেণীর কিশোর মাসিক 'ময়ূর পঙ্খী'র সহ-সম্পাদক পদে কর্মরত। রেডিও বাংলাদেশের সাহিত্য বিভাগ—'নবারুন'-এ প্রায়ই অংশ গ্রহন করেন।

মার্জিত ও সাবলীল শব্দ-ভাষায় উজ্জ্বল জাইদুর রহমানের গল্প-কবিতা গুলি। মূলতঃ শিশু সাহিত্যেই জাইদ সার্থক তরুণ শিল্পী।

বিদায় নিয়ে এক সময় চলে আসি। চলে আসার সময়—'গোধূলি-মন'-এর জন্য জানালেন; গোলাপ শুভেচ্ছা।

অবোধ/জাইদুর রহমান

নিদ্রাহীন সহস্র বছর ধরে
পথ চেয়ে বসে আছি,
শুকনো পাতার শব্দে
যেনো, তার পদধ্বনি বাজে;
বিশ্বাস পুষে রাখি
আসবেই সে।

হঠাৎ কে যেনো বলে;
ফিরে যাও, ফিরে যাও
যৌবন যায় ··· যায় ···
অবোধ বাউল॥

পঁচিশে বৈশাখ ঃ রবীন্দ্রনাথ/মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

পঁচিশে বৈশাখ এলে কাঁধে ঝোলা শান্তি নিকেতনী ব্যাগে
লাফ দ্যায় কয়েকটা দু'ফর্মার লিট্‌ল ম্যাগাজিন ;
তাপমান যন্ত্রের পারদ অনেকটা উপরে উঠে যায়
কবিতারা ডেকে ওঠে 'মোহিনী ··· মোহিনী······' ।

রবীন্দ্র সদন থেকে জোড়াসাঁকো আর কত দূরে ?

সমস্ত কলকাতা জুড়ে শিল্পে শস্যে বেপরোয়া মিছিল
সুসজ্জিত ভবনগুলো ক্রমশই শান্তিনিকেতন
বিশ্ব ভারতীর তুমি অধ্যাপক লাল কৃষ্ণচূড়া ফুল পকেটে রেখেছো
উষ্ণ রক্তের এক অনিবার্য্য অভিবাদন
নীল মেঘে আকাশের কোথায় পাঠাও ?

এতো ফুল পঁচিশে বৈশাখে ফুটে ? চন্দন সৌরভ
কবিতার রাজ্য জুড়ে পুণ্য লোভী মানুষকেও পুরোহিত করে
সামনে বিশাল নদী, ঢেউ এ ঢেউ এ কবিতার নৌকো দোল খায়
জীবনের গানে গানে এতো ভালবাসা আছে
জেনে নিই পঁচিশে বৈশাখে

কবি তুমি কবিতায় ঢাকা পড়ে গেছো
ফুলে ফুলে মানচিত্রে তোমাকে খোঁজার দিন শেষ হয়ে যায়
ভুলে যাই একদিন নক্ষত্রও আমাদের প্রত্যেকের ঘরে বাইরে
অফুরন্ত আলো দিয়েছিল

এখনো আলোর যন্ত্রণা নিয়ে জন্মের পবিত্র দিন ভরে তুলতে চাই ।

কবিতা
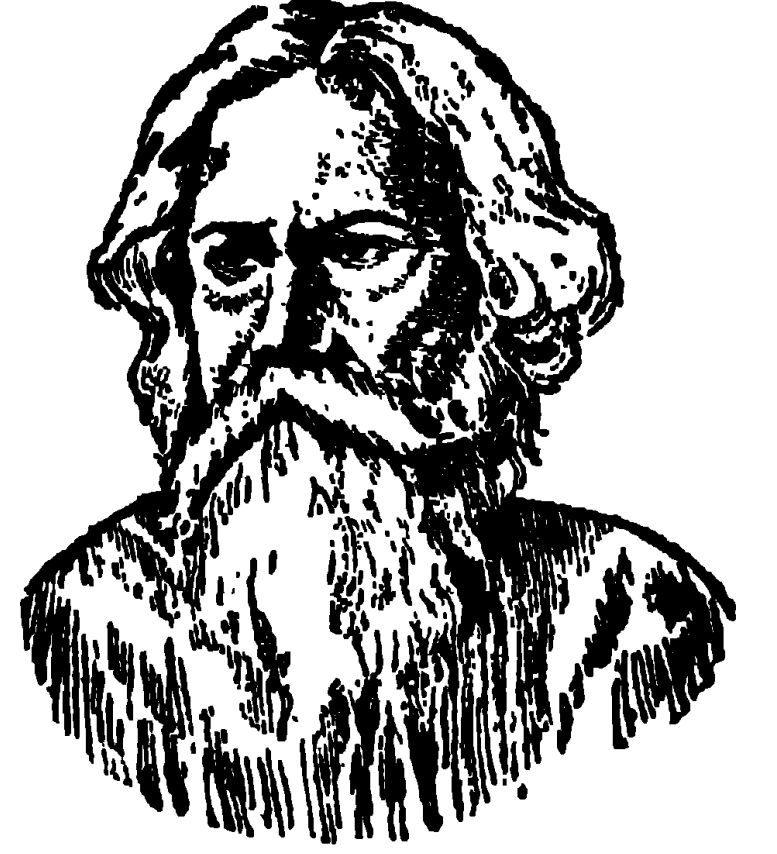
পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম/অভিজিৎ ঘোষ

আমার বাবা ছিলেন এ শহরের গন্যমান্য ডাক্তার
আমি মায়ের কোলপোঁছা সপ্তম গর্ভের সন্তান, এলেবেলে
অতি সাধারণ কেরানী

বাবার ছিলো চমৎকার তিনতলা বাড়ী, ল্যান্সডাউনে ;
ছিলো ঝকঝকে অষ্টিন অফ ই ল্যাণ্ড, ফুর্তির অঢেল পয়সা
ছিলো কত স্বজন-বান্ধব, গুণমুগ্ধ চাটুকার, ইয়ার বন্ধুরা

শহরের পূর্বপ্রান্তে নির্জনে একা একা
কেটে যায় আমার নিরানন্দ দশটি বছর

দীর্ঘদেহী সুপুরুষ বাবা হাসলে মেঘের গর্জ্জন ;
চোখ তুলে সামান্য তাকালে পেতাম জুজুর ভয়
বাবা যে কোনো ঝুট-ঝামেলা মেটাতেন অতি সহজেই
তুড়ি দিয়ে কাটিয়েছেন প্রফুল্ল রাত্রিদিন

জীবনে কুয়াশা ছিলো না তাঁর, ছিলো না চৈত্রের দাবদাহ
তিনি জনমানুষের সেবাকে নিয়েছিলেন ব্রত হিসাবে

আর আমি ভারবাহী পশুর মতো গুণ টানছি
শ্রীহীন কলকাতার ধূলো জড়ানো নড়বড়ে চেহারা
ফুটে আছে আমার সারা অবয়বে
বুকে অহরহ বাজছে না পাওয়ার ব্যর্থ হাহাকার
প্রতিকারহীন ক্ষোভের চিতা

বাবা কত সহজেই মানুষের মনে বয়ে আনতেন
মৃত্যু বিনাশী গান, আশার স্বপ্ন, কল্যাণের ঢেউ

আর শোকের কফিনের পাশে
আহত বাঘের মতো আমি হিংস্র, একা
আত্মহননের জন্য
হাতে চক্‌চক্ করছে বর্ণময় ছুরির উদ্যত ফণা

মানবতার সপক্ষে একটি অক্ষর লেখার
যোগ্যতাও আমার নেই……

সংবাদ
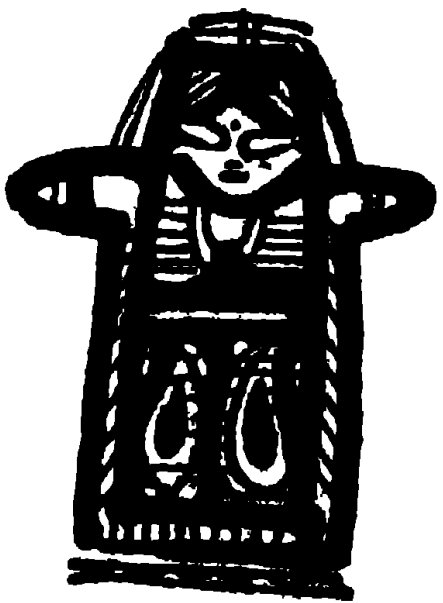
○ অথঃ রোটারী আই এম এম. এ সংবাদ

চন্দননগর রোটারী ক্লাব নির্মিত স্বাস্থ্য সুরক্ষা কেন্দ্রে কয়েকজন ডাক্তারের বিরাট পরিশ্রম ও অনেক সময়ের বিনিময়ে যে কাজ হয়েছে তার স্বীকৃতি স্বরূপ বিরাট ট্রফির ও স্পেশাল অ্যাওয়ারডের অধিকারী হোল 'ভদ্রেশ্বর রোটারী আই. এম এ ক্লিনিক'।

তাদের উদ্যোগে সাতটি ক্যাম্পের সাহায্যে বহু মহিলার বন্ধ্যাকরণ এত জনপ্রিয় হয়েছে যে রোটারী আই. এম. এ ক্লিনিক এখন 'রোটারী ইন্টার ন্যাশনাল' মহলে 'ফ্যামিলি প্ল্যানিং ক্লিনিক' বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। রোটারী ডিষ্ট্রিক্ট ৩২৯ (পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, নাগাল্যাণ্ড ও নেপাল) এর ৬৬টি ক্লাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন হিসেবে এসেছে এই পুরস্কার।

১৯৮৪ সালের উদ্বোধনী দিন থেকে সমাপ্তি দিন পর্য্যন্ত রোটারী আই. এম. এ ক্লিনিকে ডা: রঞ্জিত ব্যানার্জী, ডা: বিমল চ্যাটার্জী, ডা: বৈদ্যনাথ শ্রীমানী, ডা: চণ্ডী সর্দার ও ডা: (ক্যা) সমীর দত্তের যৌথ উদ্যোগে বহু স্থানীয় শিশুকে ইনজেকশান্ ও ওষুধের সাহায্যে ডিফ্‌থিরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, পোলিও, টাইফয়েড ও কলেরা রোগমুক্ত রাখা হয়েছে। তারমধ্যে দেওয়া হয়েছে পোলিও ৯৬৪, ডি. পি. টি ৯৪২ ডি. টি, ২৪৯, টি. টি ৪০০, টি. এ. বি ৩৫।

দেশের জনসংখ্যার বিপুল চাপকে লাঘব করার উদ্দেশ্যে ৬টি ক্যাম্পে ২৯৭ জন মাকে দূরবীন পদ্ধতিতে বন্ধ্যাকরণ (ল্যাপারোস্কোপিক টিউবেক্টোমী) করা হয়েছে।

এই শাখার ৪ জন ডাক্তারের (ডা: চণ্ডী সর্দার, ডা: (ক্যা) সমীর দত্ত, ডা: বলাই দাস, ডা: বৈদ্যনাথ শ্রীমানীর সাহায্যে হারিট অঞ্চলের বন্যার্তদের মধ্যে ২৪৩ জনকে ওষুধ ও ইনজেক্‌সান দেওয়া হয়েছে প্রায় ২ কি: মি: নৌকো পথে গিয়ে পুর্ব বাদিনান এলাকায়।

বিঘাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন খিতাড়া প্রাইমারী স্কুলে ও বি. বি. সি শিশু সেবাসদনের কেন্দ্রে রোটারী আই. এম. এ ক্লিনিক ৭৫১ ছাত্র ও শিশুকে দিয়েছে বিভিন্ন ওষুধ ও সবরকম প্রতিষেধক টিকা।

৮৪ সালের অন্তশিখরে চন্দননগর রোটারী ক্লাবের প্রচেষ্টায় ও-আই. এম-এ চাঁপদানী ভদ্রেশ্বর শাখার ব্যবস্থাপনায় ২ নং পৌরভবন রোড চাঁপদানীতে আর একটা শাখা খোলা হয়েছে এবং সেখানেও ৪৩১ জনকে সেবা করার সুযোগ হয়েছে ডা: বিমল চ্যাটার্জী, ডা: চণ্ডী সর্দার ও ডা: অখিল মজুমদারের সমবেত চেষ্টায়।

ছাত্রদের মধ্যে ডিফথিরিয়া ও টিটেনাস রোগ প্রতিরোধের জন্য ডাবল্ অ্যান্টিজেন (ডি. টি) দেওয়া হয়েছে তেলিনীপাড়া ভদ্রেশ্বর স্কুলে ২৩৬, জহরলাল স্কুল তেলিনীপাড়ায় ১৮২ ছাত্রকে।

সামাজিকতা ও মিলনের উৎসাহে গত ৬ই জানুয়ারী শাখার ডাক্তার ও তাঁদের পরিবার সহ ৫৫ জন মিলিত ভাবে পিকনিকের অনুষ্ঠান করেছিলেন বৈদ্যবাটী শ্যামাচরণ নার্শারীর বাগানে। বনভোজনের

উপাদেয় খাওয়ার অতিরিক্ত পাওনা হিসাবে ছিল ব্রেকফাস্টের পরে বিভিন্ন স্পোর্টস্ আর লাঞ্চের পরে কালচারাল প্রোগ্রাম।

৮৪-৮৫ সালের আই. এম. এ চাঁপদানীতে ভদ্রেশ্বর শাখার নির্বাচনে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডা: বিমল চ্যাটার্জী, ভা: প্রেসিডেণ্ট ডা: নারায়ন মণ্ডল ও ডা: রঞ্জিত ব্যানার্জী। সেক্রেটারী হয়েছেন ডা: বৈদ্যনাথ শ্রীমানী ও জয়েণ্ট সেক্রেটারী ডা: (ক্যা) সমীর দত্ত। ট্রেজারার ডা: অহিভূষণ চৌধুরী, অডিটর ডা: অমিত মিত্র। ডা: বৈদ্যনাথ শ্রীমানী দিল্লীতে ও কলকাতায় যথাক্রমে অল-ইণ্ডিয়া ও রাজ্য স্তরের সদস্য নিযুক্ত হয়েছেন। ডা: চণ্ডী সর্দার ও ডা: বিমল চ্যাটার্জী হয়েছেন রাজ্য স্তরের সদস্য। রোটারী আই. এম. এর কনভেনর হিসাবে ডা: (ক্যাপ) সমীর দত্ত এ বছরেও নিজ স্থান অক্ষুন্ন রেখেছেন। নতুন কার্য্যকরী সমিতি আরও জনহিতকর কাজের মাধ্যমে রোটারী আই. এম. এর সেবার প্রকল্প উত্তোলিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

O তৃণাঙ্কুর আয়োজিত কবি সম্মেলন

২৪ পরগণার শ্যামনগর থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্র তৃণাঙ্কুর আগামী ১২ই মে রবিবার শ্যামনগরের ভারতচন্দ্র লাইব্রেরী হলে কবি সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। স্বরচিত কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, কবিতার গান ছাড়াও কবিতা বিষয়ক আলোচনার জন্য কয়েকজন প্রখ্যাত আলোচক উপস্থিত থাকছেন ঐ সম্মেলনে। তৃণাঙ্কুর সম্পাদক কবি গৌরাঙ্গদেব চক্রবর্ত্তী সম্মেলনে যোগদানের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কবিতাপ্রিয় সমস্ত মানুষকে।

O পরলোকে কবি শামসুদ্দিন আহমদ

বাংলাদেশের যশোরের কোটচাঁদপুর উপজেলা থেকে প্রকাশিত কোটচাঁদপুর সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ও প্রখ্যাত প্রবীণ কবি শামসুদ্দীন আহমদ বিগত ১৬ই এপ্রিল '৮৫ ভোর ৩-৩০ মিনিটে পরলোক গমন করেছেন। গোধূলি ও গোধূলি মনে তাঁর লেখা একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে। এক সময় ড: শুদ্ধসত্ব বসুর 'একক' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমরা তাঁর প্রয়াত আত্মার শান্তি কামনা করি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা জানাই।

○ সংক্ষিপ্ত সংবাদ

অলক ভড় সম্পাদিত চক্রব্যুহ সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে ৩রা চৈত্র হুগলী জেলার নসকরডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বসেছিল জেলার তরুণ কবি ও গল্পকারদের এক মিলন মেলা। গল্প, কবিতা পাঠ ও আলোচনার উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গৌর বৈরাগী, দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, অমল দাস, স্বর্ণলতা মিত্র (ঘোষ), অরুণ সরকার, কার্তিক মোদক, আসিস ভট্টাচার্য, অতীশ চট্টোপাধ্যায় ও অলক ভড়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি বিগত ২৩শে জুলাই হুগলী জেলা পরিষদ হলে এক আন্তরিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদায় সমর্দ্ধনা জানালেন সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দে রায় মহাশয়কে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি ও হুগলী জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅনিলকুমার দত্ত মহাশয়।

দুটি কবিতা/শান্তি সিংহ

কবি

ধুন্ধুমার কবি এক বিকেলের ঘাসে বসেছিল
উড়েছিল বক আর উইপোকা বর্ষার সন্ধ্যায়
জলজ স্বপ্নের দল ইতিউতি মেলেছিল চোখ
বিষ পিঁপড়ের জ্বালা, লবেজান শব্দ খোঁজে কবি!

প্রেম

এইভালো চেয়ে থাকা, নিলয়বিহীন কিছু আশা
কিছু সুখ, বেশী দুঃখ, তারো বেশী অত্যাগসহন
ঠারেঠোরে বোবা-কালা, জলে যেন মাছ—
চোখে চোখ সরোবর, মন বুঝি তুঁতে বেনারসী!

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

O আশীর দশকে যে কয়েকজন সাহসী তরুণ কবি বাংলা সাহিত্যে এই সকাল বেলায় কবিতার মুষ্টিমেয় পাঠকের কাছে পবিত্র আলো ছড়িয়েছেন—তাঁদের মধ্যে সোফিওর রহমান, নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং প্রকাশ কর্মকার নিজ নিজ স্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল।

সত্তর-এর দশকে অভিজিৎ ঘোষ যে সাহসের জন্য মর্যাদা পেয়েছিলেন এবং স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায় মহিলা হয়েও জীবন ও কবিতার ক্ষেত্রে যেভাবে সংগ্রাম করেছিলেন আমাদের মনে হয়—অভিজিৎ-এর সাহসী এবং স্নেহলতার সংগ্রাম মিলেমিশে আলাদা আকাশ দিয়েছে সোফিওর-এর লেখায়, যদিও এতখানি সাহস সঞ্চয় করে কেচ্ছামৃত (Salt & Suger) লিখে অযথা অপরের ক্রোধের শিকার হওয়া ঠিক হয়নি। তবে সোফিওর-এর ভাষায় "আমার হারিয়ে যাওয়া আমিকে খোঁজার" পক্ষে যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য উক্তি—এখানে লেখকের "আমি" ব্যাপক অর্থে সাম্প্রতিক সকল কবি চরিত্রে। আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই সত্তর ও আশির কবিদের চরিত্র দেখে। এরা সামনে প্রসংশা পেছনে কেচ্ছা নিয়ে বেঁচে আছেন—এরাই এখন সংখ্যায় বেশী। এই সব কবিদের কাছে আমাদের অনুরোধ দয়াকরে সকলে অন্তরে, মধু সঞ্চয় করুন। 'কবিদের আড্ডা' শীর্ষক লেখাটিতে সোফিওর মোটামুটি একটা স্পষ্ট ছবি তুলে ধরেছেন, এতে অনেকে চটে যাবেন, স্নেহলতা, শ্যামল, সমীরণ ইত্যাদি খুশি হবেন—তবে সলিড লাভ হবে কবি এবং কবিতার পাঠককুলের। কলেজস্ট্রীটের কাছে সেই (?) রেঁস্তরায় এই সময়ের দুজন কবির—যে মাংসল আড্ডার কথা সোফিওর প্রমান সহকারে উল্লেখ করেছেন সেকথা ভাবলে পাঠকের গা শিউরে উঠবে, হয়ত অনেক বাবা মা তাদের মেয়েদের বোলবেন—'কবি বন্ধুদের সঙ্গ থেকে তোমরা নিরাপদ দূরে থাকো।' সাবাস গোধূলিমন, সাবাস,—এরকম একটি লেখা উপহার দেওয়ার জন্য। এ রকম সাহসী সম্পদ ভবিষ্যতে ও দেবেন আশাকরি। খুব শীঘ্র সপরিবারে আপনার পত্রিকার গ্রাহক হবো ভাবছি। অন্তরের শুভ কামনা—

অরূপ ভট্টাচার্য্য
কল্পনা ভট্টাচার্য্য
২/১ ইবক্যান বক্স লেন, কলিকাতা-৭০০০০৬

O O O O

O আপনার চিঠি ও পরে পরেই গোধূলিমন পেলাম। প্রথমটির জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু দ্বিতীয়টির জন্য কৃতজ্ঞতা, কারণ 'গোধূলি-মন'-এর এই সংখ্যাটি দারুণ মূল্যবান। সাইফার্ট সম্বন্ধে গজেন বাবুর লেখাটি অন্যরকম আলোকপাত করলো। দেশ, কাল সম্বন্ধেও কিছু জানা গেলো।

আপনার সম্বন্ধে কৌতুহল ছিলো। অনেক কিছু জানা গেলো। আগামী বছর গুলিতে আরো নির্মল পুরস্কার ঝরে পড়ুক জীবনে আপনার। 'মেঘ জমে' কবিতাটি অনন্য।

দিলওয়ার সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। আপনার পত্রিকার এইগুলি বড় কৃতিত্ব। উনি তো দারুণ বলিষ্ঠ কবিতা লেখেন।

সোফিওর রহমানের 'কেচ্ছামৃত' মজায় পড়লাম। প্রণাম জানবেন।

—বিনীত
সংযম পাল
বোলপুর, বীরভুম

O প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন O

O আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে যখন আমি 'অবহি' বলে একটি পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলাম তখন আপনাদের পত্রিকার একটি সংখ্যা (গোধূলি মন/কবিতা সংখ্যা জুন '৭৭) অবহির দপ্তরে কোনভাবে এসে পৌঁছায়। আপনাদের সেই কবিতা সংখ্যার প্রচ্ছদটি হাল্‌কা সবুজ ও ম্যাজেন্টা রঙে বেশ অভিনব ছিল। মধ্যে ছিল সুনীল গাঙ্গুলী ও সামসুর রহমানের সচিত্র চমৎকার সাক্ষাৎকার। অনুবাদ কবিতাগুলিও ছিল ভালো। শুধু মৌলিক কবিতার কবিদের পরিচিতির ছদ্মবেশমাখা প্রশংসাপত্র দৃষ্টিকটু লেগেছিল।

সেই সময়ে আমি চিনতাম দুজন অশোক চ্যাটার্জীকে। আপনাকে ও ঈগলের অশোক চ্যাটার্জীকে। এখন আরও একজনকে চিনি। বারাসাতের 'তরঙ্গ প্রবাহ' পত্রিকার অশোক চট্টোপাধ্যায়। যদিও সেই পত্রিকার দৃষ্টিকোণ সত্তর দশকের বারুদেব-গন্ধমাখা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক, যদিও আমি বর্তমান মানসিকতায় ওই পত্রিকারই কাছের লোক, তবু আপনাদের পত্রিকার দুটি বর্তমান সংখ্যা সাগ্রহেই পড়লুম।

একটা কারণ: এতদিন ধরে নিয়মিত বার করছেন, এটাই সুন্দর।

দ্বিতীয় কারণ: অন্যান্য [illegible] 'কার ন্যাকামি আর হাল্‌কা 'কবি[illegible]ত', 'কবিতার জন্যে জীবনধারণ' ইত্যাদি [illegible] আপনার পত্রিকা একটু অন্যরকম। [illegible] সংখ্যায় 'নোবেল জয়ী' জারোস্লাভ সাইফা[illegible] তো রীতিমত সিরিয়স গোত্রের। এছাড়া নিজের কবিতাও বেশ সরল ও ঋজু। আপনার [illegible]র তিরিশে এসে-র কবিতা গুলিতে যে নির্ভান সরলতা ছিল এখনও আপনার 'গবেষণা' বা 'মেঘ জমে' কবিতা গুলিতে দেখলাম তা বর্তমান। আপনি এতদিন ধরে লিখছেন অথচ পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় অন্ধ হয়ে (যা আপনার কাছের সমসাময়িক কবিদের তৈরী করা) চেষ্টাকৃত জটিলতা অর্জন করেননি, এটাও সুন্দর।

আচ্ছা, কৃষ্ণা বসু কি আর লেখেননা? আগে তো লিখতেন। সম্ভবত: 'শব্দের শরীর' বলে একটি কাব্যগ্রন্থেরও জননী ছিলেন তিনি, আচ্ছা, আপনাদের বর্তমান 'ইন্দিরা সংখ্যার' জগৎ লাহা কি 'যুবতী ধরম বা 'বেডসাইডের' সেই অসাধারণ জগৎ লাহা? আপনাদের ইন্দিরা সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি মন্দ নয়। তিনজনের উত্তরগুলিও সম্ভবত: আপনাদের কাঙ্খিত প্রত্যাশা পূর্ণ করেছে। কিন্তু শ্রীলাহার উত্তরগুলি এতই পরস্পর বিরোধী যে (যে কোন মৃত্যু চরম বেদনাদায়ক মনে রেখেই) কতগুলি প্রশ্ন রাখছি:

যে প্রিয় নেত্রীর মৃত্যুতে শ্রীলাহা চোখের সামনে মহাক্ষয়' প্রত্যক্ষ করেছেন এবং আশংকা বোধ করেছেন এবার হাল ধরবে কে (যদিও পরে শোভন সুন্দর রাজীব গান্ধীর আগমনে আশ্বস্ত হয়েছেন); সেই নেত্রীর নেতৃত্বাধীন দেশটির বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্রে কিন্তু তিনি শোচনীয়ভাবে হতাশ তাঁর মতে, দেশে জুলুম বেড়েছে, দেশের ষাট ভাগ লোক অভুক্ত, প্রতি গ্রামে পানীয় জল নেই, এবং ভারতবাসী মাত্রেই অসৎ।

প্রিয় নেত্রীর রাজত্বকাল যদি কোন মহাজয়ই সূচিত না করতে পারে, তবে মহাক্ষয়ের আশংকায় উত্তর দাতার [illegible] ভেঙে পড়া কি ব্যক্তিগত ইচ্ছাপুরণের গল্পের কোন অংশ? যদিও উত্তর দানের প্রারম্ভে তিনি রাজনীতির লোক নন বলে বিনয় দেখিয়েছিলেন, কিন্তু সেই বিনয়কে দু-পাঁচ কথা বলে খেলিয়ে তুলতে গিয়েই হয়েছে বিপত্তি, তাঁর অমন শিল্পকর্মটিও মাঠে মারা গেছে।

আপনাদের চিঠিপত্র বিভাগটি দেখলাম পিঠ চাপড়ানিতেই ভর্তি। আমার চিঠি সর্বাংশে সেই মাত্র যদি স্পর্শ করতে না পেরে থাকে, তার জন্যে ক্ষমা চাইছি।

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়
পোঃ সাউথ গড়িয়া
২৪ পরগণা-৭৪৩৬১৩

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি মন

২৭ বর্ষ/৫ম সংখ্যা

মে/১৯৮৫

জ্যৈষ্ঠ/১৩৯২

প্রতি সংখ্যা দুই টাকা
বার্ষিক সডাক কুড়ি টাকা

অশোক চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক
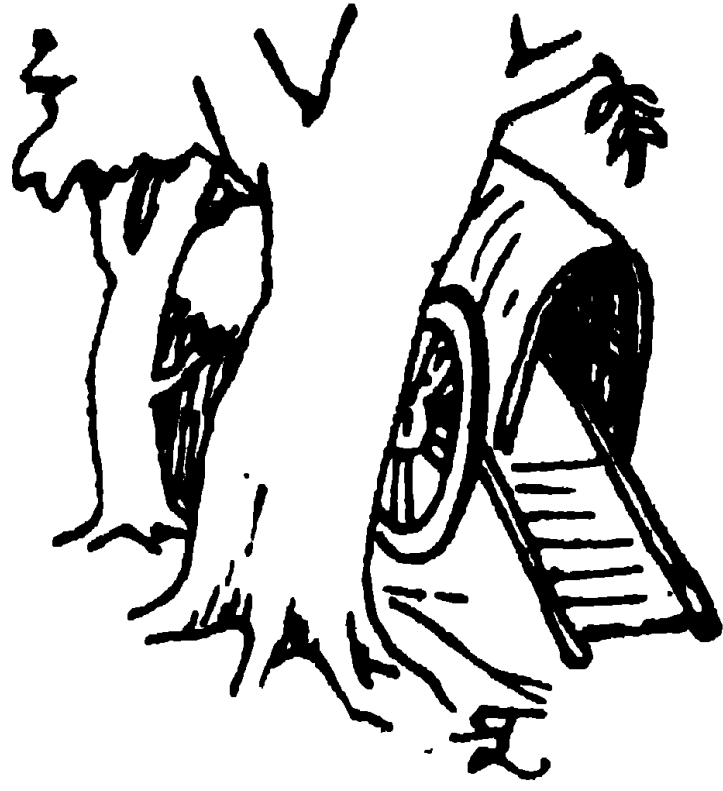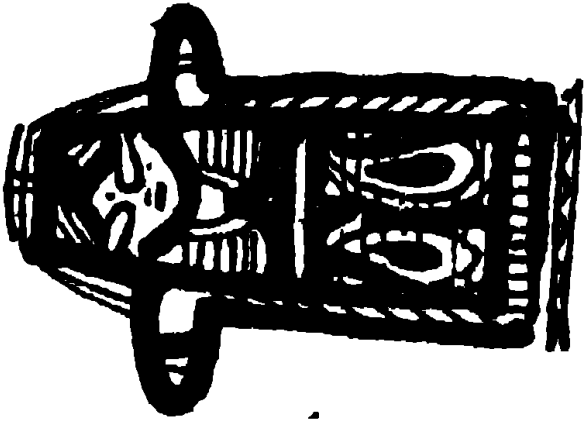
সম্পাদকীয়

যেমন কাশফুল আর শিউলি ফোটার সাথে সাথেই নড়ে চড়ে বসেন ছোট কাগজের লেখকেরা এবং সম্পাদকেরা— 'কাছে এল পূজার ছুটি…'

তেমনি আর একটি উৎসবের ছোঁয়ায় জেগে ওঠে সাহিত্য প্রিয় বাঙালী তরুণেরা। [illegible] লক্ষ।

দূ[illegible]ম গঞ্জ থেকে যার যেমন [illegible], দুফর্মা, তিনফর্মার নৈ[illegible] সাজিয়ে ছুটে আসেন জে[illegible], কেউবা রবীন্দ্র সদনে।

[illegible]য়ে উৎসবের রঙ লাগে কোলকাতায়।

দুর্গাপূজার মতো আজকের বাঙালীর আর এক বড় পূজার নাম রবীন্দ্রপূজা।

সম্পাদকীয় কার্যালয় ॥ নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর ॥ হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥ ভারত

'নদী মাতৃক উপন্যাস'

নিভা দে

মানুষের কাব্যে, সাহিত্যে সুচিরকাল থেকে নদী বড় বেশী স্থান নিয়ে আছে। জীবন দায়িনী নদীর কূলে কূলে সুপ্রাচীন অতীত থেকে সভ্যতার বিকাশ। নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে মানুষের হৃদয় আন্দোলিত, আনন্দিত, কখনও কখনও বিষন্ন ; জীবন আর নদী দুই স্রোত পাশাপাশি প্রবহমান। নদীর দোলাতে জীবন আর মৃত্যু নাচে……। ইতিহাসের পাতায় পাতায় বিখ্যাত সব নদী আপন গৌরবে বিরাজিত। নীল হোয়াং-হো, ইয়াংসিকিয়াং, গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, রাইন, টেম্‌স্‌, ভোলগা, ডন, পদ্মা, মেঘনা, আড়িয়ালখাঁ…। মিষ্টি নামের কত নদী বহমান আমাদের স্বপ্নের জগতেও, মধুমতী, সুবর্ণরেখা…।

কোন শৈশবে শুনেছি নদীর সঙ্গে মানুষের একান্ত আলাপন— "ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে……বল কোথায় তোমার দেশ"…। আবার কৈশোরে প্রশ্ন করেছি—'নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ? তার উত্তরে শুনেছি নদীর কুলু কুলু কণ্ঠস্বর 'মহাদেবের জটা হইতে', … 'আমরা যথা হইতে আসি আবার তথায় ফিরিয়া যাই।'

আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে নদী প্রিয়া। নদী দেখলেই তারা ছুটে যায় ন [illegible] র মুখ দেখে যেন অপরি[illegible] তৃপ্তি পায়, নদীর মধ্যে যেন নি[illegible] য়ায়।

আমাদের [illegible] বহু উপন্যাস নদীর নামে ধন্য। নদী সেই উপন্যাসগুলিতে নান[illegible] পালন করেছে। নদী কখনও নীরব, কখনও সরব, নদী কখ[illegible], কখনও অতি সক্রিয়। নদী কখনও সেখানে অন্তরঙ্গ গভীর [illegible] রে।

দ্রুত এরকম কিছু নদী মাতৃক উপন্যাসের ওপর চোখ বুলিয়ে আসা যাক। খুব দ্রুত বলছি এই কারণে যে এখানে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ অল্প তাই সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনাটি শেষ করতে চাই।

নদীমাতৃক যে উপন্যাসগুলি আমাদের বিশেষ পঠিত ও প্রিয় সেগুলি কালানুক্রমিক সাজালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬), প্রবোধ বন্ধু অধিকারীর ধলেশ্বরী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালিন্দী (১৯৫০), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' (১৯৫০), অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' .(১৯৫৬), মহাশ্বেতাদেবীর 'যমুনা কী তীর (১৯৫৮), সুবোধ ঘোষের জিয়াভরলি (১৯৬৩), দীপ্তি ত্রিপাঠীর 'শিপ্রা নদী পারে' (১৯৬৫), শ্রীবাসবের গোমতী গঙ্গা (১৯৬৬), প্রবোধ সান্যালের 'এক চামচ গঙ্গা (১৯৬৮), সমরেশ বসুর গঙ্গা (মৌসুমী ১৯৭৪), আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'আবার কর্ণফুলী আবার সমুদ্র' (১৯৭৬), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মহানন্দা' (পাত্রজ ১৯৭৮), বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নদীর সঙ্গে দেখা' (১৯৮০), দীপক চৌধুরীর 'কীর্তিনাশা' (১৯৮১)।

এই পনেরোখানি উপন্যাস অবশ্য সবই সমমর্যাদার নয়। বাংলা সাহিত্যের দিকদর্শন হিসেবে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে গেলে অবশ্যই 'পদ্মানদীর মাঝি' কালিন্দী, ইছামতী, তিতাস একটি নদীর নাম, এবং গঙ্গা, ধলেশ্বরীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়।

আবার ভাষা-জীবন-সাহিত্যের ও প্রাত মিশ্রণে সার্থকতার সৃষ্টি বলতে ইছামতী, ধলেশ্বরী, তিতাস একটি নদীর নাম পর্যায়ক্রমে সাজাতে ইচ্ছে হয়।

নদীর নামে অবশ্য আরো কিছু উপন্যাস ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যেমন কোয়েলের কাছে, বিপাশা, সাবরমতী, তুঙ্গভদ্রার তীরে, অ[illegible]রণী তীরে ইত্যাদি। আপাতত উল্লেখযোগ্য এই (পূর্বোক্ত) ১৫ খানা উপন্যাস নিয়েই আলোচনা করা যাক। এই উপন্যাসগুলিকে নদীর ভূমিকা হিসাবে তিন রকম ভাগ করা যায়—প্রথম পর্যায়ে বিষয়বস্তু হিসাবে সাজালে এই ভাবে উপন্যাসগুলিকে ভাগ করা যায়।

(১) মাছ মারা জেলে, মালোদের কাহিনী নিয়ে রচিত উপন্যাস—পদ্মানদীর মাঝি, তিতাস একটি নদীর নাম, গঙ্গা। এই তিনটির মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দিতে ইচ্ছা করে তিতাস একটি নদীর নামকে, তারপর পদ্মানদীর মাঝি, ও পরে গঙ্গাকে।

(২) খেয়া পারাপারের মাঝিদের জীবনভিত্তিক 'ধলেশ্বরী'—এখানে ধলেশ্বরী একাই একশো।

(৩) বাকী উপন্যাসগুলিকে আর এক শ্রেণীতে ফেলেও আবার বলা যায়—

(ক) নদী ভিত্তিক ঐতিহাসিক উপন্যাস শিপ্রানদী পারে

(খ) দার্শনিক উপন্যাস—'ইছামতী'

(গ) মূলত প্রেমের উপন্যাস—'যমুনা কী তীর', 'গোমতী গঙ্গা'

(ঘ) কালিন্দী, মহানন্দা – জটিল জীবন কাহিনী

(ঙ) বিশেষ অর্থ প্রাধান্য নিয়ে নদীর উপস্থিতি পাই—জিয়াভরলি, এক চামচ গঙ্গা, কর্ণফুলী, কীর্তিনাশা এবং গোমতী গঙ্গায়।

উপন্যাসগুলিতে নদীর ভূমিকা মূলত দু'রকম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। এই শিরোনামে নদীমাতৃক উপন্যাসগুলির অন্তর মহলে একবার ঘুরে আসা যাক দ্রুত পদ[illegible]

[illegible]য় আলোচনা শুরু করলে প্রবোধ বন্ধু [illegible] 'ধলেশ্বরীর' নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। [illegible]য়িকা 'ধলেশ্বরী' নদী নিজেই। মাঝ-[illegible]রী' আর তাকে ঘিরে খেয়া পারাপারকারী [illegible] জীবনযাত্রা। দেউলিয়া গ্রামের বাঘের মতো শা[illegible] মাঝিসর্দার শিবচরণ, বিপিন তার সহযোগী, শিবুর স্ত্রী নয়নতারা, নয়নতারার মনের মানুষ রামু এবং অনেক অনেক চরিত্র নিয়ে তাদের জীবনের নাটকীয় ঘটনাবলী নিয়ে ধলেশ্বরী (১ম খণ্ড) উপন্যাস। আর এই সব ঘটনার সাক্ষী ধলেশ্বরী—

ধলেশ্বরীর হাতেই জীবন মৃত্যুর দোলায় দোলে তার আশেপাশের গ্রামের মানুষরা। তারা 'ধলেশ্বরী'কে ভালবাসে তাকে নিয়ে গান বাঁধে, তাদের প্রথম বিয়োনো গরুর প্রথম কয়েকদিনের দুধ ধলেশ্বরীকেই দেয়। ধলেশ্বরী কখনও শান্ত-স্নিগ্ধ, কখনও রুদ্র, ভয়াল; তবে রুদ্রাণী রূপই এই উপন্যাসে বেশী। বহুবার লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন কাব্যিক সুন্দর ভাষায়, এই উপন্যাসের ভাষা ধলেশ্বরীর তীরস্থ নাঝি-দের মুখের ভাষা টানা তীব্র-রুক্ষ-কর্কশ।" ধলেশ্বরী তীরবর্তী মানুষদের আহার দেয়। নদীই তাদের ধ্বংস করে, নদীই তাদের বেড়াবার জায়গা ধলেশ্বরী তাই এই উপন্যাসের যথার্থ নায়িকা।

এই পর্যায়ে পরবর্তী সার্থকনাম নদী মাতৃক উপন্যাস হিসাবে 'তিতাস একটি নদীর নাম' করতে হয়। এই উপন্যাস শুরু ও শেষ হয় তিতাসের বর্ণনা দিয়ে। তিতাস মাঝারি নদী। পদ্মা, মেঘনার মতো নয়, আবার শীর্ণকায়াও নয়। তার তীরের জেলে মালোদের জীবনযাত্রাই এই উপন্যাসের মূল কাহিনী। এই উপন্যাসের প্রথম বত্রিশ পাতার অধিকাংশ স্থান জুড়ে বিভিন্ন ঋতু, সময়ের তিতাসের [illegible]ব বর্ণনা। বাংলা তথা বাঙালীর জীবনের [illegible] জীবনের সঙ্গে কী গভীরভাবে একটি নদী [illegible] সুন্দর কাব্য সুষমা মণ্ডিত ভাষায় পাতায় [illegible]। এর কাহিনী ৪টি পর্যায়ে বিন্যস্ত— (১) [illegible] নদীর নাম—প্রবাস খণ্ড। (২) নয়াবসত—[illegible] বিবাহ (৩) রামধনু—রাঙা নাও (৪) দু'[illegible] পতি—ভাসমান। ৩৫০ পাতা জুড়ে কিশোর-সবুজ-বাসন্তী-রামকেশর, সুবলার বৌ অনন্ত এই মানুষ-গুলোর জীবনদ্বন্দ্ব মুখর কাহিনী বর্ণিত। একদিন তিতাস শুকিয়ে যায় তীরবর্তী মানুষগুলোর জীবনেও নেমে আসে শেষে ছায়া। এই উপন্যাসে অনেক চরিত্র অনেক ঘটনার ঘনঘটা তবু নায়ক যেন শেষ পর্যন্ত এই তিতাস। উপন্যাসটির ভাষা দেশোয়ালী, কাব্যিক, মনকাড়া, খুব নরম, নরম মাটির মতো স্নিগ্ধ মন কেমন করা ভাষা।

এই উপন্যাসটি বিষয়ে আরও একটি বিশেষ তথ্য এই যে-এই একটি উপন্যাস লিখে লেখক অদ্বৈত মল্ল-বর্মন বাংলা সাহিত্যে একটি আসন করে নিতে পেরেছেন এবং বইটি প্রকাশের পুর্বেই তিনি ক্ষয় রোগে মারা যান। তারাশঙ্করের কালিন্দীরও শুরু ও শেষ কালিন্দী নদীতে ভেসে ওঠা একটা চরের বর্ণনা দিয়ে (কালিন্দীর আসল নাম ব্রাহ্মণী) আর মাঝখানে অনেক লড়াই, ঈর্ষা দ্বন্দ্বের কথা সেই চরে আবিষ্কার প্রতিষ্ঠার শুরু। সাধু ভাষায় রচিত ৩৫৭ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসের সমগ্র কাহিনী কালিন্দীর চরটিকে কেন্দ্র করে তাকে ঘিরে অনেক রক্তারক্তি, হানাহানি। ভেঙ্গেপড়া জমিদারদের মানসিকতা, নতুন বামপন্থী চিন্তাধারা কিভাবে বিচ্ছিন্ন করে তোলে জমিদার পুত্রকে তা সুন্দর অথচ বাস্তবোচিত ভাবে পরিবেশিত এই উপন্যাসে। উপন্যাসের নাম কালিন্দী শুরু ও শেষ যাকে নিয়ে তা সর্বার্থে সার্থক। বহু পঠিত ও চল-চ্চিত্রায়িত [illegible] উপন্যাসের পর দীর্ঘ ৪২/৪৩ বছর কেটে গেলেও এখনও এটি পড়তে বসলে যথেষ্ট নেশা লাগে, লেখার গুণে মন অত্যন্ত আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে।

নদীমাতৃক উপন্যাসগুলির মধ্যে একমাত্র ও প্রথম রবীন্দ্র[illegible]র একটি উপন্যাস 'ইছামতী'। ছোট্ট নদী ইছামতী লেখকের চিন্তা ও চেতনার জগতে কিন্তু বড় বেশী ঢেউ তুলেছে এ নদী। নদীকে নিয়ে আর কোন উপন্যাসে এতখানি গভীর দার্শনিক তত্ত্বচিন্তা করেননি কোন লেখক। এই উপন্যাসের দু'টি মূল কাহিনী নীল কুঠিয়াল—বড় সাহেব শিপটন, ছোট সাহেব ডেভিড, দেওয়ান রাজারাম আর অন্যটি রাজা—

রায়ের তিনবোন তিনু-বিনু-নিনু এই তিন কুলীন কন্যার স্বামী হঠাৎ সংসার ধর্মে জড়িয়ে পড়া সন্ন্যাসী মন ভবানী বাঁড়ুজ্যে। যতোবারই লেখক এই উপন্যাসে ইছামতীর বর্ননা দিতে গিয়েছেন ততোবারই তা ভবানী বাঁড়ুজ্যের দৃষ্টিতে দেখা অনুভূত দর্শনচিন্তার গভীরতার ছোঁয়া লাগা··· । একটা নদী যে মানুষের কাছে কত গভীর নিবিড় সত্য হতে পারে কতখানি দিতে পারে—তার বার বার প্রমাণ এই উপন্যাসের পাতায় পাতায়।

নদীর প্রত্যক্ষ ভূমিকার বিচারে এর পরই 'মহানন্দার' নাম করতে হয়। এই উপন্যাসের পট-ভূমিকা মহানন্দার তীরে প্রধানত—সামান্য কিছু আছে অন্যত্র এবং কোলকাতায়। এখানে 'মহানন্দা' শুধু নদী হিসাবেই নয় মাঝে মাঝে মহানন্দা উজ্জীবিত পরিচ্ছন্ন জীবনস্রোত বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়েছে। উপন্যাসের শুরু মহানন্দার বর্ণনা দিয়ে। তার তীর-বর্তী যাদবদের গ্রাম্য ধনী পরম (ভণ্ড) ভক্ত যতীশ ঘোষের ছেলে নীতীশ, তার স্ত্রী মল্লিকা, নীতীশের ভালবাসার ছোঁয়া লাগা অলকা তাদের নিয়েই এব কাহিনী বুনোট। উপন্যাসের শেষ এইভাবে কোল-কাতায় মৃত মল্লিকার সদ্য প্রসূত ছেলেকে অলকা কোলে তুলে নিল এবং—এরপর যো' 'ব। মহানন্দার জলে নতুন জোয়ার আসবে।"

নদীর পরোক্ষ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা শুরু করতে পদ্মানদীর মাঝির কথাই আগে বলতে হবে। মাঝি বলতে যারা সাধারণত নৌকা পারাপার করে তাদেরই বোঝায় কিন্তু এই [illegible]স মাঝিদের কাহিনী নয়, পদ্মায় মাছমারা জেলেদের জীবনকথাই বলা হয়েছে। পদ্মাতীরের গ্রাম কেতুপুর (চরডাঙ্গা) সেই গ্রামের মানুষ কুবের। কুবেরবাই আর তার সংসার জন্মখোঁড়া স্ত্রী মালা পিসি, মেয়ে গোপী, দুই ছেলে লখা, চণ্ডী, সদ্যপ্রসূত সাহেবপানা আর এক পুত্র ম্যানিকা। কপিলা, হোসেন মিয়া, গণেশ, ধনঞ্জয় প্রভৃতি আর সব চরিত্র এই উপন্যাসের উপজীব্য। এদের মুখের ভাষা খুব চোয়াড়ে, তীব্র কর্কশ নয়—তবে পূর্ব বাঙলার নিজস্ব ভাষা বা বাঙাল ভাষাতেই এরা কথা বলেছে। রহস্যময় পদ্মার বিশেষ বর্ণনা বা পদ্মানদী প্রীতি কারো ব্যবহারে প্রকাশ পায়নি। পদ্মা এখানে শুধুই কেতুগ্রামের পার্শ্ববর্তী একনদী-চরিত্র যদিও ৮৮ পৃষ্ঠায় এইভাবে মাণিক লিখেছেন, যদিও নদী ছাড়া সবই বাহুল্য······শুধু এই বিশাল একাভিমুখী জলস্রোতকে পদ্মার মাঝি ভালবাসিবে সারাজীবন, মানবী প্রিয়ার যৌবন চলিয়া যায়, পদ্মা তো চির যৌবনা। এই উপন্যাসে অন্যত্র কোথাও পদ্মার বিশেষ বর্ণনা নেই। তাই বলা যায় এই উপন্যাসে সবচেয়ে রহস্যময় পদ্মা নয়, হোসেন মিয়া আর কপিলা। উপন্যাসের ভাষায় বিশেষ কাব্যিক সৌন্দর্য নেই······।

মহাশ্বেতার 'যমুনা কী তীরে' যমুনার বিশেষ ভূমিকা নেই। উপন্যাসের শেষে যেখানে নায়ক আনন্দ আর নায়িকা বাহার একত্রে যমুনার ঘাটে (বন্যায়) প্রাণ দিয়ে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চির মিলনে মিলিত [illegible] সেখানেই শুধু যমুনার ভূমিকা। যমু[illegible]র উল্লেখ বা বিশেষ বর্ণনা নেই।

[illegible]' আসামের একটি নদী। এই উপ-[illegible]যদিও জিয়াভরলি তবু নদীর কোন [illegible]কা নেই এখানে। নাম তবু জিয়াভরলি [illegible]জিয়াভরলির মতো একটি সুন্দর ছলছল তরুণী [illegible]কা—নদীর মতোই সুন্দর কলকল করে সারা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সে প্রবাহিত—সবার হৃদয়কে স্নেহাতুর ও স্নিগ্ধ করে। নদীর মতোই রহস্যময়ী শুক্তি বসু, গগন বসুর মেয়ে—নদীর মতোই চঞ্চল এবং

স্থির। নদীর গতির মতোই তার হৃদয়ও দোলাচলময়, নদীর জলকে যেমন বাঁধা যায় না—শুক্তির মনকেও তাই বাঁধা গেল না। সে আপন বেগে পাগল পারা—সহজ, সুন্দর সাবলীল রহস্যময়ী এই জিয়াভরলি আসলে শুক্তি বসু নিজেই। সুবোধ ঘোষের ভাষার প্রসাদ গুণেই এই উপন্যাসটি পড়া যায় মাত্র।

দীপ্তি ত্রিপাঠীর 'শিপ্রানদীপারে'র নামের মধ্যে আছে আশ্চর্য নরম সৌন্দর্য ও সত্য, এ উপন্যাসের নায়ক স্বয়ং কালিদাস ও তাঁর কাল। উপন্যাসটির মূল উপজীব্য শিপ্রা নদীর তীরের উজ্জয়িনীর কাহিনী—ঐতিহাসিক সব ঘটনা। এছাড়া নদীর আর কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। দু'চারবার সামান্য বর্ণনা আছে। কালিদাস এ নদীতেই স্নান করে' স্নানস্নিগ্ধ শরীরে, মস্তিষ্কে নতুন নতুন কাব্যচিন্তা করেন। এ উপন্যাসের পাশ দিয়ে প্রবাহিত শিপ্রা নদী—মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কালিদাসের কাব্য নদী স্রোত। উপন্যাসের ভাষা মনোরম, কাব্যিক, সংস্কৃত মহাকাব্যের মতো। একাধিকবার পড়ার মতো।

শ্রীবাসবের 'গোমতী গঙ্গা'য় আক্ষরিক অর্থে গঙ্গার উপস্থিতি নেই কিন্তু গোমতীর উপস্থিতি প্রবল-ভাবে। গোমতী নদীর ভূমিকা এখানে সর্বধ্বংসী প্রলয়ের, বন্যার। উপন্যাসের শেষ [illegible] র গর্ভে, শুরু হয়েছিল গঙ্গার তীরে কো[illegible] তবু গোমতী সব শেষ করতে পারে না। [illegible] মিলিত দুর্বার প্রেমের ধারা—দেবশ্রী [illegible] র ধারা চির প্রবহমান বিগত আগত সব প্রে[illegible] এই অর্থে গোমতী গঙ্গা নামকরণ সার্থক—[illegible] গভীরতায় এবং সাধারণ অর্থেও। লেখ[illegible] সুন্দর, ঝরঝরে এবং কাব্যগুণান্বিত।

প্রবোধ সান্যালের 'এক চামচ গঙ্গা'র পটভূমি গঙ্গারতীর কাশী এবং শেষাংশ দিল্লী। কিন্তু গঙ্গার এখানে কোন ভূমিকা নেই। গঙ্গা কথাটি এখানে বিশেষ অর্থে হয়ত এক চামচ পবিত্রতা, এক চামচ মুক্তি এই অর্থে ব্যবহৃত।

সমরেশ বসুর গঙ্গার নাম গঙ্গা না হয়ে গঙ্গা নদীর মাঝিও হলেও অযৌক্তিক হ'ত না। কিন্তু নাম হ'ল গঙ্গা—ফলতঃ নামটি হয়ে উঠল একটি ধানের শিষের ওপরে একটি শিশির বিন্দুর মতো নিটোল, কাব্য-মণ্ডিত। অথচ এ উপন্যাসের কোথাও কাব্য নেই—না ভাষায়, উপস্থাপনায়, না ভাববস্তুতে। মাছমারা অর্থাৎ জেলে। মালোদের জীবন সংগ্রামের তীব্র মর্মান্তিক কাহিনী এর পাতায় পাতায়। গঙ্গা এ উপন্যাসে বিশেষ কোন ভূমিকা পালন করেনি, কোথাও তার কাব্যিক বর্ণনা নেই। গঙ্গা না হয়ে পদ্মাও হতে পারত। নিবারণ, পাঁচু, ময়ারাম, বিলেসদের মাছমারার ক্ষেত্র অর্থাৎ যেখানে ইলিশ পাওয়া যায়—এখানে এছাড়াও মাঝে মাঝে এসেছে ইছামতী, রাইমঙ্গল, বিদ্যেধরী, কালিন্দী ইত্যাদি নদীর নাম। গঙ্গা তার থেকে বেশী বার ব্যবহৃত যেহেতু গঙ্গাতেই নৌকা ভেসেছে মাছ মারার জন্য। গঙ্গার একটিমাত্র টানা কয়েক লাইনের বর্ণনা আছে ৭২ পৃষ্ঠায়। এ উপন্যাসের ভাষা চাঁছা-ছোলা, ঝাঁঝাল, শক্ত পোক্ত [illegible]তিরিক্ত শব্দ, ভাবের আশমাত্র নেই। তবু গঙ্গা নাম সার্থক যেহেতু গঙ্গার হাতেই তাদের জীবন-মরণ, হাসা-কাঁদা, তাই সার্বজনীন গঙ্গা পুজার বর্ণনা এখানে আছে।

'আবার কর্ণফুলী আবার সমুদ্র'—উপন্যাসে ২৪১র মধ্যে প্রথ[illegible]লি আসে ৮০ পৃষ্ঠায় এবং তারপর পর পর কয়েকবার। 'কর্ণফুলীতে' উপন্যাসের প্রধান পুরুষ লোকানন্দের পিতার মৃত্যু হয় নৌকাডুবিতে। পরবর্তী কালে নারীর প্রতি তীব্র আকাঙ্খা লোকানন্দ একজনের পরামর্শে তার যে কোন পাপ কর্মের

ইতিহাস কর্ণফুলীকে গিয়ে শোনাত—এভাবে সে পরিচ্ছন্ন মানুষ হ'য়ে উঠত। এখানে এইভাবে কর্ণফুলী মুক্তির ইংগিত বহন করে সার্থক হয়ে উঠেছে। '৭৮ সালের বন্যার পটভূমিকায় লেখা বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নদীর সঙ্গে দেখা। বিশেষ কোন বক্তব্য নেই নদীকে নিয়ে এই উপন্যাসে।

দীপক চৌধুরীর 'কীর্তিনাশা' নদীনামা উপন্যাস অথচ 'কীর্তিনাশা' ঠিক নদী হিসাবে এখানে অনুপস্থিত। কীর্তিনাশা এখানে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত নদী তথা যা কীর্তিনাশ করে। জমিদার বাড়ির কীর্তি মহিমা নষ্ট করছে বর্ধিষ্ণু চালকল মালিক নতুন সমাজব্যবস্থা। "বল্লভপুরের পশ্চিম দিকে প্রায় মাইল পাঁচেক দূরে কীর্তিনাশা নদী" 'পদ্মার এক শাখা?' এই বল্লভপুরের কাহিনী বর্ণিত এই উপন্যাসে। উপন্যাশ শেষ হয় নতুন শতাব্দী জাগছে পুরনো কাল বিদায় নিচ্ছে এই ইঙ্গিত দিয়ে।

সোফিওর রহমানের কবিতা গুচ্ছ

আত্মপ্রতিকৃতি

[উৎসর্গ : মৃদুল দাশগুপ্ত প্রিয়বরেষু]

ভ্রমরের সখি নতুন শক্তির উৎস জ্ঞানে, এক তরুণী-মনসা
পাক খায় প্রেমের নিষিদ্ধ গন্তিমুখে
যেখানে ভেঙেছে শাসনের বসত
তার পরকীয়ায় হাজার বিদ্যুতের রাতজাগা আলো,
পুঞ্জীভূত সমস্যায় শুধু এক অনুভূতিমালা-
অনাথ উত্তরাধিকারে তার রাজেন্দ্রাণী মিছিল
যদিও সে একা, চর্যাপদের হরিণী
হলুদ উষ্ণীষ বুকে নি
সখি ও বান্ধবী সে একমাত্র ভ্রমরের
যেন চৈত্রের বোরোধানে নতুন শরতের
তার জিগীষার বর্ণে ও বিকল্পে
কলকাতা কি আবার শ্যামস
চর্যারাগের পিতা ? ভ্রমরের সখি
সলোমন পাখি জোড়া শালিখের স্বপ্ন বুকে নিয়ে
একা হাঁটে, হেঁটে যায় আদিতম একক শব্দব্রহ্মের মতো…
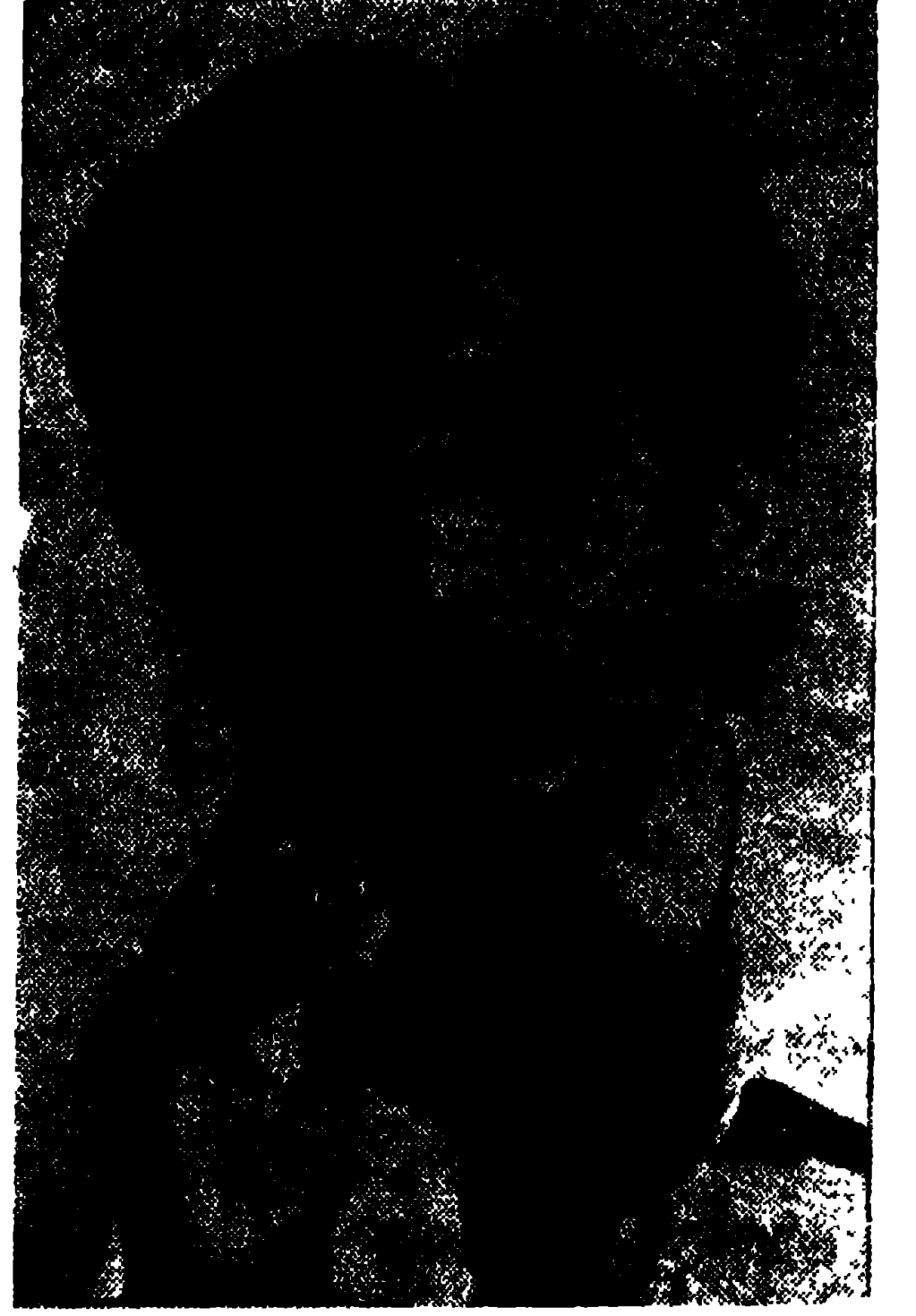
মেদিনীপুরের তেরপেখিয়া গ্রামের যে তরুণটি সমকালীন বাংলা কবিতার অঙ্গণে নিজের আসনটি পাকাপোক্ত করে নিয়েছেন তাঁর নাম সোফিওর রহমান।

খুবই অল্প সময়ের মধ্যে সাদামাটা ভাষায় চিত্রকল্পের যাদুকাঠি [illegible] সোফিওর নিজস্ব জীবন-দর্শ[illegible] নির্মান করেন কবিতার প্রতিমা। নর-নারীর শারীরিক সম্পর্কও তার কবিতার তুলিতে বোধের গভীরে টেনে নিয়ে যায় কবিতাপ্রিয় পাঠককে।

কবিতা

স্বতন্ত্র সঙ্গমের ইন্ধন

অদ্ভুত এক নদীর মধ্যে বন্দী হ'য়ে আছে মানুষ, তার বুকে
আমিও, সময় ও ঘামের স্রোত মস্তিষ্ক থেকে মেরুদণ্ড
ভায়া করে ভেসে বেড়ায় অহরহ। প্যানারোমিক ঋতুচক্রে

শুধু ক্ষয়, এবং ক্ষয়, অমৃত উৎস কোথায়? কিছু স্বপ্নতাড়িত
অদৃশ্য ভবিষ্যত, কীটদষ্ট আবেগের মিছিল, আর অগভীর কথামালা
স্রোতের শ্যাওলার মতো। নতুবা কবিতার কাগজের মেধাহীন মেদ
ক্ষয়িষ্ণু বন্যা আনে, মাতৃত্বহীন ও নদীর জঠর অদ্ভুত এক কৌশলে
মানুষকে গিলে খ চ্ছে, আমাকেও। মোহতাড়িত প্রহরগুলি কেচ্ছামৃতে
কেটে যায় কফি হাউসে, হাঁয়রে, অন্ধের দিন আর রাত।
এভাবে বাঁচা য য়?

আমি তো পারিনা, একটা যুদ্ধ খুঁজি, সঘন ধ্বংস—
ঠিকহলো অন্যসঙ্গম, আমাদের না পারা কাজ করতে পারবে
এমন মানব শিশু জন্মাবে যে মিলনে।

রাজার ঘাটের শ্রীরাধা

রাজার ঘাটের শ্রীরাধা যে পরিচিত অনুরাধা নামে
অনঙ্গ অন্ধকারে তাকে একদিন দিয়েছিলুম কৈশোরের শেষ ঘাম
আর, এক যৌবনের প্রথম চুম্বন, কৃষ্ণপুত্রের জাগ্রত সঙ্গীত

রাজার ঘাটের অনুরাধা অনেকদিন [illegible]ল আমার বন্ধু,
বান্ধবী নয়—রাজপথে গোধূলির দিকে তার নিঃশঙ্ক ঠোঁটের
এবং শিশির ও ঘাসের ঘন দাম্পত্যে ছিল নক্ষত্র মণ্ডলের
মহা[illegible]

আজ তার দেহে শতাধি[illegible] সা[illegible]ল
রক্তভ্রমর উত্তরাধিক রে ক্ষয়িষ্ণু শব্দপুঞ্জের অবিরাম আর্তন
আড়তদারের আলোয় ও মুখ কালো হয়ে আছে দিনরাত
সেদিনের অন্ধকার আর আজকের আলো—
কোথায় সুখ অনুরাধা?
অবিশ্বাসের বাহুর বিস্তারে কেন তুমি একা?
বন্ধু কোথায়? তোমার প্রথম পরকীয়ার
শ্রীরাধা মসনদ?

কবিতা

ঘুণ

সাতদিন ভাতহীন সাতরাত নির্ঘুম
একটানা এতোদিন কে বাড়ালো শীত !
সঙ্গীহীন নিশিদিন নাভিমূল নিঃঝুম
অমাবস্যার খেলা দিয়ে কে নাড়ালো ভিত ?

সব অপরাধ ওই মেয়েটির

আমাদের দিকে পেছন ফিরে বসে আছে মেয়ে
সদ্যজাত মোহনার দিকে মুখ, কলঙ্ক ধোয়া
আলোর এলো চুল, আর নদীতে
ওই সুন্দরীর ধ্রুপদী দেহের ঘাম

যেখানে প্রথম ঝরোকায় জমছে শিশির ধানের বুকে
কোথায় অপরাধ আমাদের মাঝি-মুনিসের ?
শ্বেত কঙ্কনের হীরকোজ্জ্বল ঘর-গায় মাঝিও দেখেছে
এই জন্ম ও প্রজন্মের কাঙ্ক্ষিত শব্দকলা, এবং
২০৮০ সালের এক তরুণী-মনসা—

কে বেশী পবিত্র, কার শ্বেতকণার মজলিসী ঠুংরি
উদাস নৌকোকে ডুবালো ঘূর্ণন পাকে ? জানি,
সব অপরাধ ওই মেয়েটির
পেছন ফিরে আকর্ষণ বাড়িয়েছে অধিক
তার সম্মুখে নতুন শতাব্দী ও শস্যের আগমনী সংবাদ।
[শ্রীরাধার শরীর জুড়ে এখন অন্য শরীরের সাড়া]

গণতান্ত্রিক

রাত বিরেতের মোড়ে রুপার জ্যো আছে সোনার হরিণ,
পাশে বন্ধ্যা মাঠ আর জাগ্রত মিছিল নাগরিক রাজনীতি
যেই তুমি পতাকা তুলে নিলে হাতে
লেখক শিল্পী কলাকু শৃঙ্খলিত শব
ভৌতিক আগুন জ্বালায় আলেয়া যার নাম
আমাদের দেশে রাতের জ্যোৎস্নার ঠোঁটে রুপার ফল
এভাবে গণভিড় বাড়ায় জ্যোতি বসু রামারাও ভাষণে,
মধ্যবিত্ত লক্ষণেরা বর্তে যায়, বয়েসের বন্ধুরাও
জ্যোৎস্নার পাশে শুয়ে শুয়ে নগরে রাখাল সাজে কিংবা দেহাতী,

শুধু বন্ধ্যা মাঠ জাগে না আর

জ্যৈষ্ঠ/১৩৯২/গোধূলি-মন/বার

শতক্রে মজুমদারের

বেহুলার বিয়ে
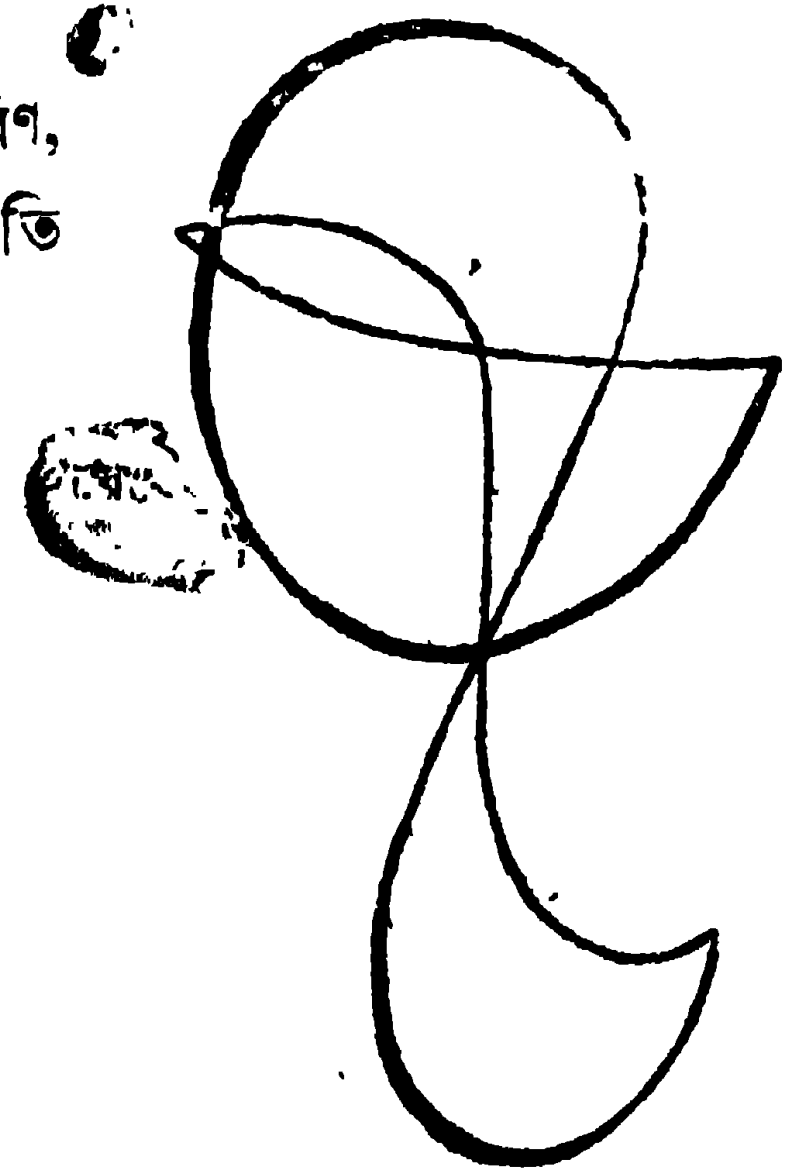
নাচতে নাচতে পদ্ম বাড়িতে ঢুকল।

হ্যাঁ মাসি, বেউলা নেই?

উনুনের ভেতর চাট্টি পাতা-নাতা ঢুকিয়ে আন্নাকালী ফুঁ দিয়ে আঁচ তুলছিল। ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার ঘুপচি ঘরটা।

জবাব দিতে একটু সময় লাগল।

'কেন রা?' বলেই সে উনুনের দিকে মন দেয়। হাঁটুর ওপর শাড়ি তুলে দাওয়ায় বসে পড়ল পদ্ম। ছিটে বেড়ার ফাঁক-ফোকর দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মেরে, খ্যান খেনে গলা ছাড়ল, 'বলো না—দরকার আছে—'

'তোর দরগার তো—সিনেমায় যাবি বুঝি—'

'ধ্যাত্ বলো না।' পদ্ম মুখ ভ্যাটকালো।

'কাজে গ্যাচে—ফিরতে দেরি হবে।'

'অ—'

পাছা দুলিয়ে পদ্ম চলে গেল।

দেখলে [illegible]-পিত্তি জ্বলে যায় আন্নাক[illegible] পাড়াময় হিল্লি-দিল্লি করে বেড়াচ্ছে। ঘনশ্যাম তো হাল ছে[illegible]ছে। কোনো চিন্তা-ভাবনার বালাই নেই। তিন-তিনটে [illegible]য়। গরু-ছাগল হয়ে চড়ে বেড়ায়। যে যার দোসর খুজে [illegible]

তাই [illegible] হয়। ঐ তো [illegible]কান রিকশাওলার সংগে ভাগলো। [illegible]বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে [illegible]র ঘাড়ে।

পদ্মরও নাকি বর ঠিক-ঠাক। [illegible]ার এক ছোকরা। দিনের বেলা আনাজ সাজিয়ে বসে রথতল র বাজারে, আর রাত্তিরে সাইকেল নিয়ে হুস-হাস ছোটে। সামনে পেছনে পিপে। চোলাই পাচার হয় এন্তার।

তবে আন্নাকালীর ধারণা ঐ ছেলে পদ্মকে বে করবে না। আর করলেও বেহুলার মত হবে।

খানিক পরে বেহুলা ফিরল।

আন্নাকালী বলল, বৈকালে সরকারদের মুড়ি ভাজতে হবে। খেয়াল থাকে যেন—'

হাতের চেটোয় সরষে তেল ঢেলে মাথার তালুতে ঘসে নিল বেহুলা। এসব এলেবেলে কথা কে কানে নেয়। একটা গামছা শাড়ির ওপর দিয়ে জড়িয়ে, পুকুরের দিকে গেল।

আন্নাকালী বুঝল, খবর পৌঁছে গেছে।

মা-মেয়ের কথাবার্তা এক রকম বন্ধই। যে টুকু না বললে নয়। তাও দুজনের মাঝ-খানে কেউ থাকলে তার মাধ্যমে হয়।

সারাক্ষণ খিটিমিটি। বিয়েঅলা মেয়ে বাপের বাড়ি থাকলে যেমন হয়।

কিন্তু বেহুলাকে তো থাকতে হবেই।

এসব জানে আন্নাকালী। তবু নিজের মেজাজকে বাগে আনা মুশকিল। মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ে আগড়ুম-বাগড়ুম কথা। বেহুলাও ছেড়ে দেবার নয়। একদিন তো কোমরের আঁচল শক্ত করে জড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। আন্নাকালীর হাতে বাখারি। এই মারে তো সেই মারে।

দুজনের অকথ্য খিস্তাখিস্তি।

সামনে দিয়ে যাচ্ছিল লতার মা। ... অনেক কষ্টে।

ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে আন্নাকালী বে... চুমকিদের বাড়ি কাচাকাচি আছে। বলে... "রঘুরটা যেন বেড়ে রাখা হয়। সে দুপুরে... বলেছে।

রঘু হল ছোট ছেলেটা। সে ছিল আর এক হেজ্জোড়।

বল্টিনাথ মারা যাবার সময় মায়ের পেটে। আন্নাকালী বলেছিল, কোন সর্বনাশ পেটে এসেছে, কে জানে—জন্মাবার আগেই বাপকে গিললো। মাল তো বল্টিনাথের জল-ভাত।

না হলে, সেদিনই বা গলা অব্দি টেনে জলে নামবে কেন।

কাটা পুকুরে সেই যে ডুব মারলো, আর জ্যান্ত উঠতে হল না।

হাফ প্যান্টে দড়ি বাঁধতে শেখার আগে থেকেই রঘুর চুরি-চামারি রপ্ত। গাছের কাঁচা ফল-মূলে তাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। দুপুর বেলা পুকুর ঘাটে ঘাটে চক্কর মেরে বেড়াত। ঘাটে বাসন-কোসন ভিজিয়ে যদি কেউ এদিক-সেদিক যায় টুক্ করে সরিয়ে নেবে। একদিন পঞ্চাকলু হাতে-নাতে ধরে ফেলল। রাংচিটের ডাল দিয়ে মেরে গা-পিঠ ফালা ফালা করে দিল।

এখন রঘু রামরাজা তলায় লেদের কাজ করে। পার্মেণ্ট হলে বিয়ে করবে। নিজেই মেয়ে ঠিক করে রেখেছে। তুলসি ধাড়ার পাঁচ নম্বরটা।

ঠিক সময়ে পদ্ম হাজির। বগল কাটা ব্লাউজ, এক হাত সমান পেট বার করা শাড়ি, আবার সিনেমা আর্টিস্টের মত কপাল ছোঁয়া চুল। সব মিলিয়ে সাজের বহর জেল্লা ছোটাচ্ছে বেশ। 'কয় রে হলো' বলে শাড়ির খস খস শব্দ তুলে সে ঘরে ঢুকল।

তক্তপোশের ওপর আন্নাকালী।

'কী গো মাসি শরীল খারাপ নাকি?'

পাশে বসল পদ্ম। আসলে আন্নাকালীর মন নিচ্ছে।

'অয়—... যা হয়—বাতের ব্যাথা।'

পাশ ফি... আন্নাকালী। চোখ খুলে দেখল, ঠোঁটে-গালে রংমাখা সাক্ষাৎ বহুরূপী।

'বাব্বা:—তুই কী বে করতে যাবি নাকি লো? কথাটা পদ্মকে আনন্দ দেয়। গালময় হাসি ছড়িয়ে বলে, 'তোমার যেমন কথা মাসি—এ আর এমন কী সাজ।'

'জানি নি বাপু—'

সায়া-ব্লাউজের ওপর যেন তেন শাড়ি জড়িয়ে বেহুলা বলল, 'চ—চ।'

ঝোলানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে পলকে দেখে নিয়ে পদ্ম বলল, 'চলি গো মাসি—'

আন্নাকালী বলল, 'হুঁ—'

বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে ওরা ঝটপট পা চালালো।

আন্নাকালী ভাবে, পোড়া কপালীটার সংগী জুটেছে বটে—তাও কদ্দিন থাকে। এর আগেও ধাড়াদের বড় মেয়েটার সংগে খুব হলায়-গলায় ছিল। পিরীত চটকে গেছে। কী করবে। এভাবে যদ্দিন চলে। ঘরে ঢুকলেই তো খুনসুটি। বিয়ে-থা আর হবে বলেও মনে হয় না। বয়স পেরোতে যায় যায়। ভেবেছিল, চিটি একটা হিল্লে করে দিল, হল না। কোথা দিয়ে সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। চিটিং ছিল রঘুর বন্ধুজন। বয়সে অবিশ্যি ছোটোই হবে বেহুলার। প্রায়ই বাড়িতে আসতো তবলা বাজাতে। রঘু ধরত হারমোনিয়াম বাঁশি। সুরের তালে তালে চিটিংয়ের ধাই-ধুই চাপড়। হিন্দি গানের সুরে পাড়া মাৎ। উঠোনে বাচ্চা-কাচ্চার ভিড় জমে যেত মেলায়।

চায়ের কাপ সাজিয়ে বেহুলা নি[illegible]য় যায়।

ঠায় বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

ঘাড় দোলাতে দোলাতে চিটিং চোখে চোখ রাখতো। আহ্লাদী আহ্লাদী ভাব করত বেহুলা। আর তখন হাড়ের ওপর চামড়[illegible]রা এমন চেহারা ছিল না। একটু মানান সই [illegible] তা এভাবেই এগিয়ে গেল অনেকটা। একদিন কাজ সেরে ফেরার পথে আন্নাকালী দেখল, চিটিংয়ের সাইকেলের পেছনে বেহুলা। পেট জড়িয়ে বসে আছে। হাসির ফোয়ারা ছোটাতে ছোটাতে নকাঠার বাগান পেরিয়ে চলে গেল। যাক—মেয়েটার একটা হিল্লে হল তাহলে। চিটিং ছেলে খারাপ নয়। তিন ক্লাশ কম ম্যাট্রিক পাশ। কাঁচকলে ফুরণের কাজ। তবে বিয়ে হয়ে গেছে একবার, এই যা একটু মুশকিল। মহাদেব সাঁতরার মেয়ের সংগে। বউটা খাণ্ডারস্য খাণ্ডার। চিটিংয়ের সঙ্গে বনিবনা হল না।

বাপের মুদিখানার দোকানে সে মেয়ে এখন পাল্লা ধরে।

তাই বেহুলাকে বিয়ে করার কোনো অসুবিধা নেই। তারপর দিন দেখে সিদ্ধেশ্বরীতলা থেকে সিঁদুর পরে এল।

কিন্তু ঘর করতে হল না। পরের দিন বেহুলা কাঁদতে কাঁদতে চলে আসে।

সে বউ নাকি আবার ফিরে এসেছে। মহাদেব সাঁতরা নিজে এসে মেয়ে রেখে গেছে, এমনিতে চিটিংয়ের মুখে খুব বারফট্টা। শ্বশুর-বউয়ের সামনে একেবারে নেংটিকুত্তা। টুঁ শব্দটি করলো না।

খানিক আগেই রঘু বেরিয়ে গেছে।

গড়িমসিতে আন্নাকালী সবে উঠেছে, এক্ষুনি বেরুতে হবে।

এমন সময় একটা লোক এল। টিনের সুটকেশ ঘাড়ে করে সে বাড়ি বাড়ি আলতা সিঁদুর এই সব বি[illegible]। কুলগাছির দিকে থাকে। আন্নাকালীর [illegible]। সুটকেশ রেখে লোকটা দাওয়ায় উবু [illegible]।

[illegible]কটা খবর আছে দিদি।'

[illegible]ান্নাকালী হাইতুলে বলল, 'তুমি আর খবর কই ?

'না। এটা একেবারে পাকাপাকি।'

পাশে দেয়াল ঠেস দিয়ে বসে আন্নাকালী।

লোকটা বলে চলে, 'আমতায় বাড়ি—জমি জিরেত আছে—লোক একেবারে মাটির মানুষ তবে—'

আন্নাকালী উৎসুক হয়, 'তবে কী ?'

'দোজ বরে।'

'তা হোক। কিন্তু বেহুলাকে পছন্দ হবে তো? ঐ তো চেহারার ছিরি করেছে—'

'তা হলেই বা—বিয়ের জল পড়লে ঠিক পাল্টে যাবে। আর তারও তো বয়স হয়েচে—আগের পক্ষের তিনটে—তোমার মেয়ে মানিয়ে গুছিয়ে চলতে পারলেই হলো।' 'হ্যাঁ, তা পারবে নি কেন, নিজের মেয়ে বলে বলছি না, তুমি তো জানোই, বেহুলার স্বভাব চরিত্তির।'

'ব্যাস। তাহলেই হলো—এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াও দিকিনি।'

আন্নাকালী ঘরে ঢুকল। শুধু জল দিল না। সঙ্গে দুটো বাতাসাও।

জলে ভিজিয়ে বাতাসা মুখে ফেলল লোকটা। তারপর ঢকঢক করে এক ঘটি জল শেষ করে লম্বা শ্বাস ফেলল, 'ব্যাস, আমি তাহলে কালই খবর দিয়ে দোবো।'

'ছাখো, বলে। এর আগেও তো তুমি খবর দিলে, তারা তো উচ্চো-বাচ্চো করলো নি—'

ঘাড়ে স্যুটকেস তুলে লোকটা সিধে হল।

'না—এবার আমি মেয়ের মাথায় সিঁদুর পরিয়েই ছাড়বো।'

পেছন পেছন একটু এসে আন্নাকালী বলল,

'একটু তাড়াতাড়ি বাপু—'

'হ্যাঁ, সে আর বলতে—'

লোকটাকে রাস্তা অব্দি এগিয়ে দিয়ে এল আন্নাকালী।

চিটিংটা হাতছাড়া হতে, আশা ভরসায় ছাই ঢেলে দিয়েছিল আন্নাকালী। পাত্র হিসেবে সে ভালোই ছিল। বরাত দোষে বেহুলার কপাল পুড়ল।

লোকটা চলে যেতেই—আন্নাকালী ভাবল, বেহুলার বিয়ের কথাটা সে জানে না বোধ হয়, জানাবার দরকার ও নেই।

বিকেলে বেহুলা ফিরতে আন্নাকালী বলল, 'আর চঙ করে মাথায় সিঁদুর দিতে হবে নি—ওবেলা একজন এয়ছিল, খবর দিয়ে গ্যাচে—এই বেলা সিঁদুর তুলে ফেল।'

বেহুলা শাড়ি ছাড়ছিল। কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না।

আন্নাকালী কাজে বেরিয়ে গেল।

বলতে কী, চিটিংয়ের ভরসায় একটু ছিল। আবার যদি ঝগড়া ঝাঁটি বাধে—।

কিন্তু খবর যতদূর, সেই দজ্জাল মাগীকে নিয়ে চিটিং দিব্বি ঘর করছে। বাচ্চা-কাচ্চাও হবে নাকি বৌয়ের।

আমতার এ জন আবার যেমন তেমন হলে হয়, না হলে সিঁদুর দেয়া আর তোলার খেলা চলতেই থাকবে।

চোখের আড়াল/জয়নব সাত্তার

"চোখের আড়াল যদি হবে ; মনেরও আড়াল
শীলাদেবী, তোমার কথাই মানতে হয়
তবে, পৃথিবীর রাতের সূর্য এশিয়ায়
আলো দিচ্ছেনা বলে—
সে পৃথিবীর আর কোথাও দিচ্ছেনা আলো ?
না, পারিনা তা, মানতে।

আবহমান কাল হতে
নিরন্তর সূর্য প্রত্যুতিতে জ্বলছে জ্বলবে
পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত।

"চোখের আড়াল যদি, মনেরও আড়াল"।
তবে স্মৃতির হলো কেনো জন্ম ?
এবং বাসভবন
কেনো তার অনন্তের বুকে।

O O O

আর এক অন্ধকার/শ্যামলকান্তি মজুমদার

এক অন্ধকার থেকে আর এক অন্ধকার
ঘনিয়ে আসছে দ্রুত
পাশাপাশি বসা মানুষেরা কেউ কাউকে
চিনতে পারছে না
ছায়াছায়া দৃশ্যপট ছড়িয়ে ছিটিয়ে চারপাশে
মাঝখানে ঘুরপাক খাচ্ছে [illegible]

গভীর ঘুমের মধ্যে ককিয়ে উঠছে কোন শিশু
পাশে মা-র আচ্ছন্ন শরীর রক্তহিম
মৃত্যুর হিমার্ত হাত ছুঁয়ে আছে রাতের নিশুতি
এক অন্ধকার থেকে আর এক অন্ধকার
ঘনিয়ে আসছে দ্রুত।
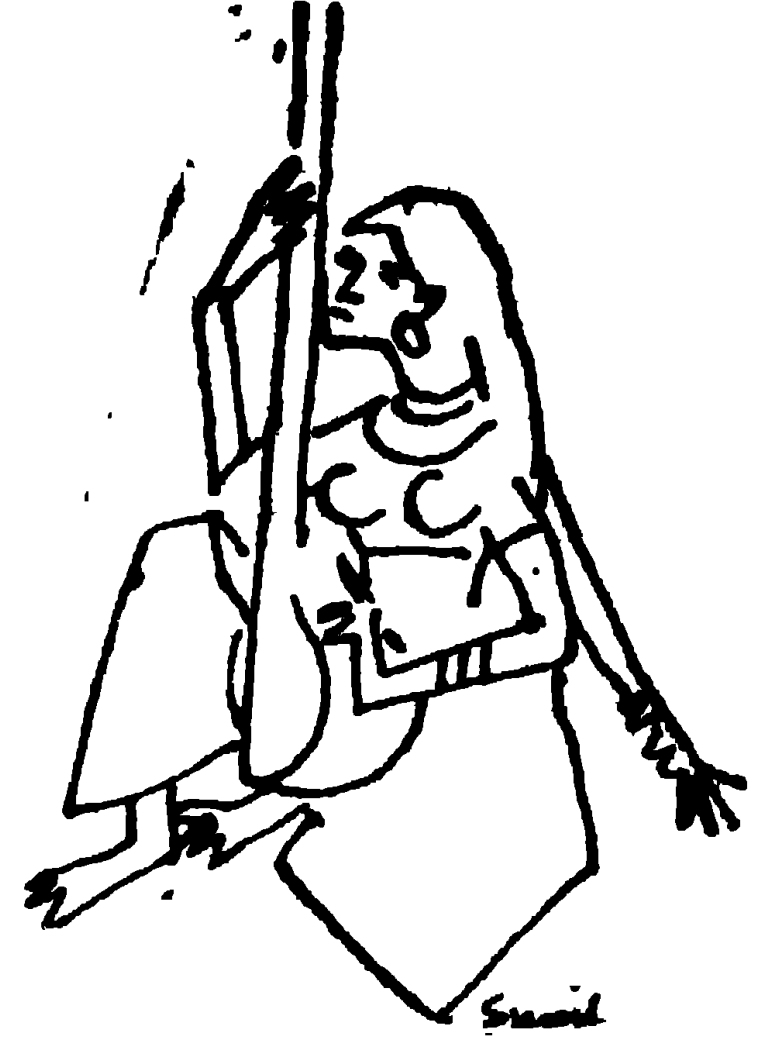
যাচ্ঞা/কল্যাণ মিত্র

ছেলেবেলায় বাজারে দোকানী ডাকতো—খোকা।
এখন সবাই ডাকে—কাকু।
তখন ভীষণ ইচ্ছে হতো
কেউ 'আপনি' বলুক শুনি
এখন আঁতকে উঠি : এতই কি গিয়েছি বুড়িয়ে।

জ[illegible] আমরা কেউ মানতে পারিনা
[illegible]ক
[illegible]তন আধারের সাথে মিশে যেতে
[illegible] এ জীবনের সাথে ঝোলানো রয়েছে
[illegible]মি নোয়ানো দুটি হাত ;
[illegible]র ফারাক।
তাই পাঁজরে সাজিয়ে চিতা
পেতে রাখি বুক
বুকের ভিতরে মন
দিনরাত ভিখারি আগুন ধিকি ধিকি।

গান্ধার, হে গান্ধার/জ্যোতির্ময় বসু

কতবার কত গুণী
তোমাকে স্পর্শ করেছে
মীড়, কম্পনে,
আলাপে কৃন্তনে।

জানি তুমি অতি অপরূপ,
তবুও ক্ষণে ক্ষণে তুমি রূপ বদলাও,
কেদারায় এক, বেহাগে অন্য
হীরার মত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে।
কিন্তু কী সে তোমার শ্রুতি-বৈভব,
যা রেখেছ তুমি মল্লারের অতলান্ত গভীরে?
যার অন্বেষণেই কেটে গেল
শতবর্ষের খাঁ সাহেবের জীবন ;
সুরের তপস্যায়—রামপুর থেকে মাইহার
ভোরের নামাজ থেকে সন্ধ্যার আজান।

* * * *

প্রেম/অসিত বিশ্বাস

শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মতো
তোমাকে ভালো লাগে
তোমাকে ভালোবাসি স্বাধীনতা
জয়ের প্রেমিক রাইফেলের মতো।
তোমার হাসি আমার প্রিয় যুদ্ধের সাইরেন
তোমার লুকোচুরি অভিমান
আমার হিংস্র জয়ের পদচারনা
তোমার ভালোবাসা আমার
গোলাপ অহংকার॥

শ্মশান-চণ্ডাল/দ্বিজেন আচার্য

ব্যাপকতা ছড়িয়ে রেখেছে বলে, শূন্যতার
মেলেনি প্রশ্রয়
উচাটন জল তার মিশে গেছে ফের মোহনায়।

যে মৃত্যু করেছে স্পর্শ, নিত্যদিন তোমাকে আমাকে
যার ক্লিন্ন-যন্ত্রণায় বুক জুড়ে কেবল কল্লোল
তার জন্য তার কোন বিড়ম্বনা নেই

কেননা,
সে জেনে গেছে শরীর সর্বস্ব করে নিদ্রাহীন
এই বাঁচা—এরকম বেঁচে থাকা, মানে নেই কোন।

এব জেনেছে বলেই সে শীতার্ত গভীর রাতে
বুকে আদৌ রাখেনা কম্বল……

O O O O

নক্ষত্র দিনের প্রত্যাশা/দীপালি দে সরকার

আমার মনের গন্ধ নিয়ে পৃথিবীর বাতাস
বয়ে যাক্ দিকে দিগন্তে
বয়ে আসুক নক্ষত্র দিনের প্রত্যাশা।
পৃথিবীর নদী-নালা মাঠ-ঘাট
পাহাড় পর্ব[illegible]র
হেসে উঠুক কুসুম-উচ্ছ্বাসে।
বিনুনীর বুনোন যাক খুলে
নীল পৃথিবীর 'পরে সবুজ আভায়
নরম মমতায় শুধু ধরা থাক্
আমার বুকের আঁচল খানি পরম বিশ্বাসে।

হীরেণ ভট্টাচার্যের দুটি কবিতা

অসমিয়া থেকে অনুবাদ ঃ অনিন্দ্য সৌরভ

প্রতীক্ষা

প্রতীক্ষার আহত দিন, শূন্যে লাফায় কোন
মায়াবী হরিণ ;
কালরাত আমার একটুও ঘুম হয়নি ;
মুগ্ধ নিয়তির কোলে আকাঙ্খার বীজ, নক্ষত্রের চকচকে চোখ
সুঠাম গঠন
রাত্রির শরীরে জলদগম্ভীর হরিণের ডাক
সগর্বে বিলীন।
আমার একটুও ঘুম হয়নি, হাতের মুঠিতে আমার দুঃখের
ডালিম !!

দৃশ্যান্তরের কবিতা

আমার রক্তে
রাগী কাঠবেড়ালীর
অসহিষ্ণু দাঁত,
আমি যেন শরীর ছিঁড়ে
বেরিয়ে যাব···
···দৃশ্যান্তরের রোদে
তোমার স্নেহমাখা হাতে
অফুরন্ত গন্ধ !

স্মারক/সমীর মণ্ডল

আমার হ্যাণ্ডব্যাগে লুকিয়ে রেখেছি
কিছু অলঙ্কার, কিছু অহংকার
হয়ত' বা কিছু কলঙ্ক থাকবে,
গোপনে তুলে রাখি
[illegible]মায়, নীল আকাশের বুকে।
[illegible] ছুটে আসে মেঘ সীমান্ত থেকে
[illegible] আপন মহিমায়
গোপনীয় করে আমার গোপনতাকে,
গুটোতে থাকে আমার স্মারক অনন্ত নীলে
যখন সমস্ত কিছু হারিয়ে যায়
তখন আমি ছুটে যাই সীমান্তে
সসীম হয়ে ওঠে প্রহরীরা, কিন্তু ধরতে পারেনা
বুকের আগুনে পুড়তে সুরু করে বিস্মরণ।

গঙ্গার তত্ত্বকথা/অলক ভড়

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ইয়াং সিকিয়াংএর নামে
শপথ করে সে বলেছিলো গঙ্গার উর্বরতা নিয়ে
আমাদের জমি একদিন শস্যশ্যামল হয়ে উঠবেই।
অথচ আজ গঙ্গার গভীরতা নিয়ে দুই বন্ধু
মেতে ওঠে যুদ্ধে। এভাবেই একটা স্রোত,
আর একটা স্রোতের নীচে চাপা পড়ে গঙ্গার আঁধারে।

তখনই সেই খোঁচা দাড়িওয়ালা প্রবীণ ভারতবর্ষের ছবি
আঁকতে আঁকতে থমকে থাকে। রঙের পাত্রে তুলি একান্ত
নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। অর্ধসমাপ্ত ভারতের ছবিকে একটা
বুনো জন্তুর মত দেখায় এবং প্রাকৃতিক ডানায়
উড়ে আসে চিল। নিরুৎসব শস্যের ক্ষেত্র।

গঙ্গার ভিতরে তখন ক্লান্তির দীর্ঘশ্বাস। একটা ঢেউ এর
নীচে আর একটা ঢেউ নিঃশব্দে হারিয়ে যায়। তবুও
জলের গভীরতা জেনে নৌকোর পরিধি বাড়ে ও কমে।
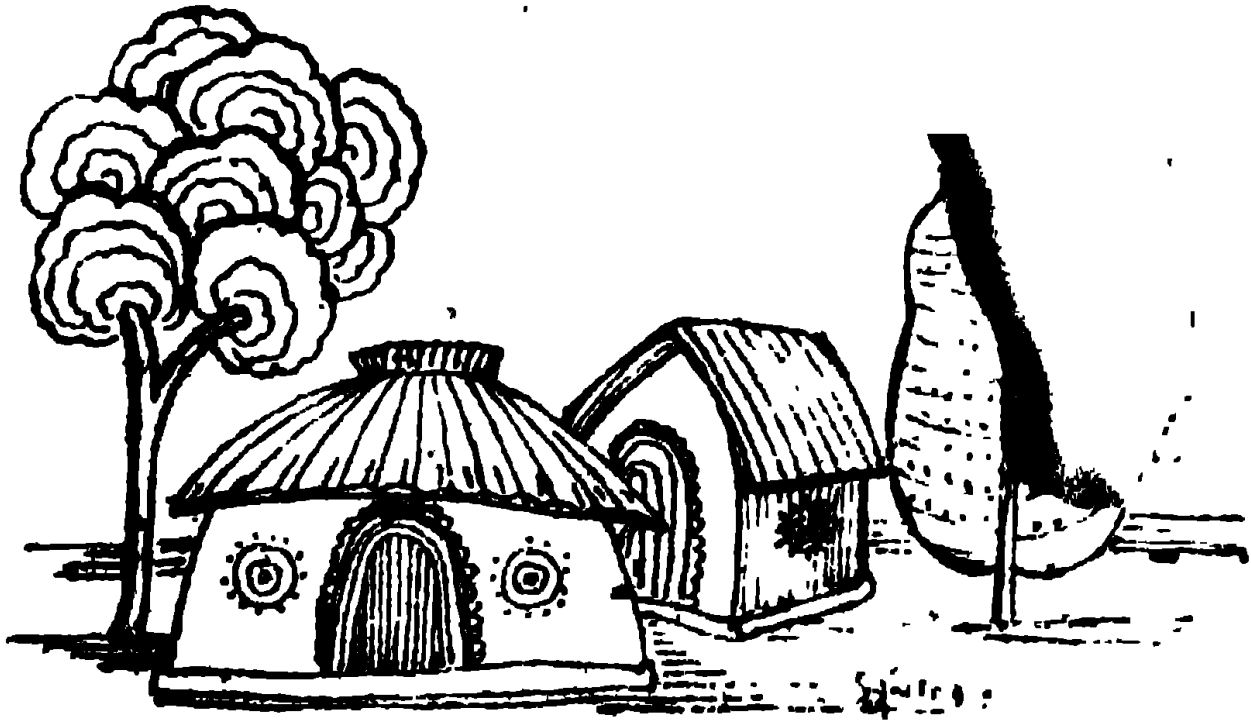
ভেতর আরো ভেতর/গৌরাঙ্গদেব চক্রবর্তী

ভেঙেছিল ভীষণ রকম ভেঙেছিল
চিৎকারে তার শব্দ ছিল নাইবা ছিল
দারুণ ভাবে ভীষণ ভাবে ভেঙে ছিল
বাঁধনগুলো পলকা বলে ভেঙেছিল।

আয়না কি আর সব ছবি পায়
অনেক কথা মুখশ্রী পায় কিংবা না পায়
ভেতর আরো ভেতর ভেঙে জোড়ায়
এসব কথা টের কে পায়?

স্তব্ধ মানেই জব্দ তো নয়
সন্ধ্যা [illegible]ড়া দুপায়
পাথরে নয় পাথরে নয় ভয়তো আমার
পাথর চুনায়

ভয় তো আমার ড্যাকার কথায়
ভয় তো আমার ফাঁকার কথায়
আয়না কি-আর সব ছবি পায়!

পুতুল পুতুল খেলা/রীণা চট্টোপাধ্যায়

অনেক কিছুই ছাড়া যায়
যদি ফিরে পাওয়া যায়
সেই সব পুতুল খেলার দিন।
অনাবিল সেই সব দিনে
পুতুলের সংসারে
শুধু সুখ ছিল
দুঃখ-টুখ্য কিছুই ছিল না।।
অনন্ত অবসর ছিল।

জ্যান্ত পুতুল নিয়ে
এখন আমার দিন কাটে
সময় হাতের ফাঁক গলে
গড়িয়ে যায় অতি দ্রুত লয়ে
জ্যান্ত পুতুল নিয়ে
এখন ব্যস্ত দিন কাটে
এতটুকু অবকাশ নেই।

কন্যা কুমারীর সমুদ্র তুমি/ঈশিতা ভাদুড়ী
(প্রয়াত : সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ স্মরণে)

স্থির হোয়না তুমি,
স্থিরতা তোমাকে মানায় না।
উচ্ছল ঢেউ নিয়ে লুটোপুটি করো।
তুমি আরও গভীর, আরো
অশান্ত হও।
কন্যা কুমারীকার সমুদ্র তুমি,
অস্থিরতা একমাত্র তোমাকেই মানায়।

তোমার দুঃখ খাবো বলেই/অরুণকুমার চক্রবর্ত্তী

আমি যে পা বাড়িয়েই আছি
তোমার দুঃখ খাবো বলেই
ভাঙা-সান্‌কি পেতেই আছি
তোমার দুঃখ খাবো বলেই
সিঁড়ি ভা... তো নেই ভাঙা সিঁড়ি
আমার ... টি নেবে
সে সময় তো আর বসে নেই

আ... াড়িয়েই আছি
তো... খাবো বলে ;
ভাঙা-সান্‌কি পেতেই আছি
তোমার দুঃখ খাবো বলেই
আমি যে হাত বাড়িয়ে আছি
তোমার সঙ্গে যাবো বলেই......

রবীন্দ্রনাথের "গোরা" সম্বন্ধে সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মন্তব্য

শীতল দাস

অতীত হলো ইতিহাস। আর সেই ইতিহাসকে খুঁজে বার করা খুবই কষ্ট সাধ্য কাজ। তবু আমরা ইতিহাসকে খুঁজে বেড়াই। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ কোথাও মণি-মাণিক্যও পেয়ে যাই।

সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে আমি এই রকম অনেক মণি-মাণিক্য পেয়েছি। তারই একটা নিদর্শন আজ এখানে দিচ্ছি।

সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যুগের চুঁচুড়ার খ্যাতিনামা সাহিত্যিক ছিলেন সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার। অক্ষয়বাবু ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সহপাঠী। হুগলী কলেজে তাঁরা একই সঙ্গে পড়াশুনা করতেন। আবার ওকালতী জীবনেও তাঁরা একসঙ্গে মিলিত হন। অক্ষয়চন্দ্র ছিলেন উকিল, আর বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রে[illegible] [illegible]াহিত্য সাধনাও একই সঙ্গে।

বঙ্কিম চন্দ্রের ছিল "বঙ্গদর্শন" পত্রি[illegible] [illegible]ক্ষয় চন্দ্র সরকারের ছিল "সাধারণী" ও [illegible] পত্রিকা। উভয়েই উভয়ের পত্রিক[illegible] লিখতেন।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ এঁদের সংস্পর্শে আসেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে বিরাট প্রতিভা ছিল—তা এই দুই জহুরী উপলব্ধি করেছিলেন।

সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার রবীন্দ্রনাথকে শৈশবকাল থেকেই স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন। অক্ষয়বাবু তাঁর কলকাতার বাসায় থাকাকালীন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতেন। আর তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের উপর বিশেষ দৃষ্টি রেখেছিলেন।

অনেকেই জানেন যে রবীন্দ্রনাথের "রাজপথ" ও "ভানুসিংহের জীবনী" এই অক্ষয়চন্দ্র সরকারের "নবজীবন" পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের "গোরা" যখন "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হয় সেটি পাঠ করে সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেছিলেন—'গোরা' গল্পে মানব চিন্তার যেরূপ বিশ্লেষণ হইতেছে সেরূপ বিশ্লেষণ বাঙ্গলা ভাষায় নাই-ই, ইংরাজীতেও অল্প দেখা যায়। ভিক্টর হুগোতে আছে। এইরূপ বিশ্লেষণে রবিবাবু অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইতেছেন। এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মানব চিন্তার ব্যবচ্ছেদ করা অতিসূক্ষ্ম অন্তদর্শীর কার্য। কিন্তু এরূপ ব্যবচ্ছেদ দর্শনের অঙ্গ, বোধ করি কাব্যের অঙ্গ নহে। কাব্যানুমোদী চাল প্রতিমা, [illegible] সূক্ষ্ম শিল্প অবশ্যই থাকা চাই। কিন্তু সে সমস্ত শিল্প প্রাপ্তকেন্দ্র হইয়া সংযত ভাবে থাকিবে।—এই বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া যদি দুই চারিটি প্রতিমা ফুটিয়া উঠে, তাহা হইলে 'গোরা'র গল্প সমধিক আদরের সামগ্রী হইবে।

এহেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নোবেল প্রাইজ' পাওয়ার পর সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখেছিলেন—'রবিবাবুর কবিতা এটি না হয় ওটি সকলকেই কখনও না কখনও মুগ্ধ করিয়াছে। তাঁহার সম্মান করিতে দেশবাসী পরাঙ্মুখ হয় নাই। স্বয়ং সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র নিজ গলদেশে গ্রহণ না করিয়া কুসুম মালারূপিনী যশের মালা রবিবাবুর গলদেশে দিয়াছিলেন।"

আজ আমরা রবীন্দ্রনাথকে যে ভাবে স্মরণ করি সেভাবে হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করলেও অক্ষয়-চন্দ্র সরকারকে স্মরণ করি না। তিনি আজ বিস্মৃত লেখক।

তবু যখন চুঁচুড়ার সাহিত্য চর্চা ভাগবিত হয় আমরা যখন নেশায় বুঁদ হয়ে সেই সাহিত্য খুঁজে বার করবার চেষ্টা করি—তখনই আলো-কিত হয় অনেক কিছু।

আপন ভাষায় ব্যাপকভাবে শিক্ষার গোড়াপত্তন

"আপন ভাষায়
ব্যাপকভাবে শিক্ষার
গোড়াপত্তন করবার আগ্রহ
স্বভাবতই সমাজের
মনে কাজ করে,
এটা তার
সুস্থ চিত্তের ল[illegible]
[illegible]বাঙ্গীকরণ"।
[illegible]নাথ ঠাকুর

শিক্ষা এবং [illegible]পকভাবে জনগণের মধ্যে প্র[illegible]রা এবং শিক্ষার গণতন্ত্রীকর[illegible]তিতে বামফ্রন্ট সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সমীক্ষা ঃ উত্তর প্রবাসী পত্রিকা

আমাদের দপ্তরে এসে জমা হওয়া পত্রিকার ভীড়ে কিছু কিছু পত্রিকা উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বিশেষত যাঁরা বাংলা থেকে অনেকদূরে বসেও আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের চর্চা তথা পত্রিকা প্রকাশ করে আসছেন। এবারের এই তালিকায় রাখছি সুদূর সুইডেন থেকে প্রকাশিত সাহিত্য ত্রৈমাসিক 'উত্তর প্রবাসী'কে। উত্তর প্রবাসীর প্রতিটি সংখ্যাই প্রখ্যাত শিল্পীদের আঁকা প্রচ্ছদে ও সম্পাদক গজেন্দ্রকুমার ঘোষের মননশীল প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে। চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যা ও পঞ্চম বর্ষের ২য় সংখ্যা দেখে মনে হোল দিনে দিনে পত্রিকা আরো সুন্দর আরো আন্তরিকতার মূর্ত্ত প্রকাশ। ১৯৮৪ সালের সাহিত্যে পুরস্কার প্রাপ্ত চেক কবি জারোস্লাভ সাইফার্টকে নিয়ে গজেন্দ্রকুমার ঘোষের মনোজ্ঞ আলোচনাটি গোধূলি মনের পাঠ দের কাছে পরিচিত। ৪র্থ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যায় ঐ লেখাটির উজ্জ্বল উপস্থিতি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি গ[illegible] [illegible]জীতে অনুবাদ করেছেন ক্ষিতীশ রায়। গল্পটির [illegible]ভাগে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছবি সহ সংক্ষিপ্ত পরিচি[illegible]ত হয়েছে। লিটিল ম্যাগাজিন পরিচিতিতে প্রকাশিত হয়েছে—উত্তর বঙ্গের শিলিগু[illegible] প্রকাশিত প্রবীর শীল সম্পাদিত 'অশনি' ৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা থেকে কিছু বাছাই লেখা। সুইডিশ সাহিত্য পরিচিতিতে এ সংখ্যায় হ্যারি মার্টিন সনের পরিচিতি দিয়েছেন কৃষ্ণা দত্ত আর হ্যারির গদ্য ও পদ্য থেকে অনুবাদ করেছেন সুনিলা প্রেণ। কবিতা-বিভাগে কবি দিনেশ দাসের 'ভাই' ও 'ফুটপাতের মানুষ' কবিতাদু'টি প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮৩ সালের 'উত্তর প্রবাসী' পুরস্কার বিজয়ী গল্পকার বলরাম বসাকের সচিত্র পরিচিতি ছাপা হয়েছে ৩য় প্রচ্ছদে।

৫ম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ শিল্পী অন্নদা মুন্সী। শিল্পী কন্যা বুবুমুন্সী একলুপ্ত কথায় বাবার একান্ত ছবি এঁকেছেন। এ সংখ্যার লিটিল ম্যাগাজিন পরিচিতিতে আছে জামসেদপুর থেকে প্রকাশিত 'কৌরব' পত্রিকা। কৌরবের ঐ সংখ্যায় অসাধারণ এক গল্প লিখেছেন উদয়ন ঘোষ 'কনকলতার কথা'। উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে শান্তি সিংহ, সিদ্ধার্থ বসু প্রমোদ বসু। তারাশংকরের গল্প 'তারিণী মাঝি' ইংরাজী অনুবাদ বিভাগে অনুবাদ করেছেন হীরেন গঙ্গোপাধ্যায়। কলেজস্ট্রীট পত্রিকায় প্রকাশিত শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পটি উল্লেখযোগ্য নয়। গল্পটি আদিরসাত্মক. এ সংখ্যাতেও গজেন্দ্রকুমার ঘোষের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে—'সুইডিশ সাহিত্যের ভূমিকা'। স্বল্প পরিসরের মধ্যে অভিজ্ঞল ষ্ট্রিণ্ডবার্গের চীনা ও সাহিত্যের আলোচনা করেছেন শ্রী ঘোষ।

এ সংখ্যার [illegible] প্রচ্ছদে সম্প্রতি কোলকাতায় অনুষ্ঠিত 'উত্তর প্রবাসী' পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের কিছু আলোকচিত্র ও ৩য় প্রচ্ছদে ১৯৮৪ সালের 'উত্তর প্রবাসী' পুরস্কার জয়ী কবি গোধূলি মন সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সচিত্র পরিচিতি রয়েছে।

সংবাদ

O হুগলী জেলায় রবীন্দ্র জয়ন্তী

O সারা দেশের সংগে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে হুগলী জেলার চুঁচুড়ার বিভিন্ন স্থানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৪ তম জন্মোৎসব সুরু হয়।

O চুঁচুড়া রবীন্দ্রভবনের পাশের রাস্তায় প্যাণ্ডেল করে প:বঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে রবীন্দ্র জন্মোৎসব শুরু হয়। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন রাজ্যের শিক্ষা (উচ্চ) মন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীদ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আবৃত্তি করেন প্রদীপ ঘোষ।

O মুখপত্র কার্যালয়ে এদিন রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হয় এবং মুখপত্র রবীন্দ্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বাধীনতা সংগ্রামী জনাব হামিদুল হক, প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন সাংবাদিক শ্রীধর দেব সরকার। রবীন্দ্র আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ডা: গঙ্গা শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, সলিল মুখোপাধ্যায়, জগবন্ধু মাহান্তি ও সত্যচরণ ঘোষ। পত্রিকার পক্ষ থেকে তারাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় বক্তব্য রাখেন।

O ২৭শে বৈশাখ চুঁচুড়ায় রবীন্দ্রভবনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রবীন্দ্র প্রন্থা[illegible]াধন করেন শিক্ষা (উচ্চ) মন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষ। শ্রী ঘোষ আশা করেন যে এই গ্রন্থাগার সাহিত্য অনুরাগী ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের প্রয়োজন মেটাবে।

O মঞ্চের এককোণে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মাল্যভূষিত ছবি। ধুপের ও ফুলের গন্ধে ভরে যাচ্ছে অনুষ্ঠান স্থল। মাঝে মাঝে গঙ্গা থেকে জোর বাতাস ঢুকে আসছে জানলা দিয়ে। এমনই মনোরম এক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হোল চন্দননগর মহকুমা শাসকের অফিস কর্মীদের রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা। অনুষ্ঠান শুরু হোল ছোট্ট মেয়ে অদিতি চট্টোপাধ্যায়ের আবৃত্তি দিয়ে। ও আবৃত্তি করল নজরুলের 'খুকু ও কাঠবেড়ালী'। এরপর শুরু হোল সঙ্গীতের আসর। প্রদ্যোৎ ঘোষ তিনটি রবীন্দ্র সংগীত শোনানোর পর এলেন সমর ভোম। নিজের কথা ও সুরে 'ওগো বিদ্রোহী কবি নজরুল' গানটি গাইলেন প্রাণের আবেগ দিয়ে—সে আবেগ মুহুর্তেই শ্রোতাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। পর পর কয়েকটি নজরুল গীতি পরিবেশনের পর একটি স্বরচিত হাসির গান দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করলেন সমর ভোম। তবে 'আমার খোকার মাসী……' —এই ধরণের হাল্কা গান ঐ দিনের অনুষ্ঠানে পরিবেশনের উপযুক্ত ছিল না। চন্দননগরের প্রখ্যাতা মহিলা কণ্ঠশিল্পী শ্রীমতী সন্ধ্যা ঘোষ গাইলেন চারটি গান। তার মধ্যে 'গঙ্গা-সিন্ধু-নর্মদা' ও 'ফুলে ফুলে ঢুলে ঢুলে' শ্রোতাদের আনন্দ দেয়। মহকুমা শাসক দপ্তরেরই এককর্মী চিন্ময় রায় পুরাণো[illegible]ণার একটি সুন্দর গান পরিবেশন করেন।

[illegible]র উল্লেখযোগ্য শিল্পী ছিলেন মানসী কুণ্ডু, বা[illegible] নিতাই ঘোষ ও প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়।

[illegible]নের অনুষ্ঠানের একমাত্র আমন্ত্রিত কবি [illegible]চট্টোপাধ্যায় তিনটি কবিতা আবৃত্তি করে[illegible]

অনুষ্ঠানের শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানান সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুবিমল দাশশর্মা।

সংস্থার সভাপতি চন্দননগরের মহকুমা শাসক সঞ্জয় মিত্র অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন।

○ কিছু মহাপ্রয়াণ

○ ২৬শে ফেব্রুয়ারী পরলোক গমন করলেন সাহিত্যিক সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ। এক সময় তাঁর কলম থেকে 'মুখের রেখা' 'জল দাও' প্রভৃতি উপন্যাস এবং সহমরণ, যাদুঘর প্রভৃতির মতো গল্প বের হলেও জীবনের শেষ দিকে তাঁর সাংবাদিক সত্তা সাহিত্যিক সন্তোষকুমারকে চেপে রেখেছিল। শেষের দিকে বেশী সময়টাই সাহিত্যের জন্য বরাদ্দ করলে, হয়তো আরো কিছু উল্লেখযোগ্য গল্প, উপন্যাস পেতে পারতাম আমরা।

○ কাস্তের কবি দিনেশ দাস চলে গেলেন। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত—

> 'বেয়নেট হ'ক যত ধারালো
> কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু,
> শেল আর বোম হ'ক ভারালো
> কাস্তেটা শান দিও বন্ধু!'
>
> (কাস্তে)

সেই একটি মাত্র কবিতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জনমানসে গভীর দোলা লাগালেন কবি দিনেশ দাস। তারপর তাঁর অব্যাহত জয়যাত্রা। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিতা' প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে। [illegible] সালে প্রকাশিত হোল 'ভুখ মিছিল'। এই দ্বি[illegible] গ্রন্থের মানবিক বলিষ্ঠ আবেদন কবিকে প্র[illegible] দিল। তাঁর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম কাব্যগ্র[illegible] 'অহল্যা', কাচের মানুষ' ও 'রাম গেছে বন[illegible]

○ প্রমথ নাথ বিশী পরলোক গমন [illegible] ১০ই মে। ছাত্রবস্থা থেকেই শ্রী বিশীর সাহিত্যচর্চার শুরু। ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, সাহিত্য সমালোচনা, নাটক, কাব্য—সাহিত্যের সব শাখাতেই তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৬০ সালে রবীন্দ্র-পুরস্কার পান। রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কীয় আলোচনা গ্রন্থগুলির জন্য তাঁকে বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে রেখেছে।

○ কবি অরুণ ভট্টাচার্য পরলোক গমন করলেন ৬০ বছর বয়সে। সুদীর্ঘ ৩০ বছর থেকে তিনি সম্পাদনা করেছেন কবিতা ও কবিতা বিষয়ক গদ্যের পত্রিকা 'উত্তরসূরী'। সঙ্গীতের অধ্যাপক হিসাবে তিনি রবীন্দ্রভারতী, বিশ্বভারতী ও খয়রাগড় সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'সমর্পিত শৈশব', 'সময় অসময়ের কবিতা', 'কবিতার ভাবনা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

○ কবি দিনেশ দাসের শ্রদ্ধাবাসর

৫ই মে '৮৫ কবি দিনেশ দাস এর স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হল পরম শ্রদ্ধা ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে বাগনানে। উদ্যোক্তা 'কফন' পত্রিকাও তির্যক সাংস্কৃতিক সংস্থা। শোকার্ত বাসরে নম্র নিবেদনের মাধ্যমে বহু কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক প্রয়াত কবির উদ্দেশ্যে ফুল ছুড়ে দিলেন আলোচনায়, গানে, কবিতায়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করলেন কবি কৃষ্ণ ধর। এছাড়াও অমিতাভ দাশগুপ্ত, শান্তনু দাস, প্রদীপ ঘোষ, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শৈবাল মিত্র, রতন ভট্টাচার্য, রুচিরা মুখোপাধ্যায়, অলকেন্দু পত্রী, মহর্ষী পত্রী মেলে ধরেন শ্রদ্ধার্ঘ্য। সংগীত পরিবেশন করেন কবির কথায় শ্রীঋষিণ মি[illegible] [illegible]কাটা ইয়ুথ কয়ার দিয়ে যে অনুষ্ঠানটির যবনিকা পাত হয় তার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন শেখ আবদুল কাইউম্, পার্থ বসু, অজিত বাইরী, শেখ সৈয়দ আলি। অনুষ্ঠান বিন্যাসে কবির প্রতি ঋণ পরিশোধ করেন প্রবীর দাস ও সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

O প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি–মন O

O চৈতালী গোধূলিমন–এ মেদিনীপুর জেলার সতেবো জন প্রতিবাদীর নাম দেওয়া একটি পত্র দেখলাম। তাদের কেউ কবিতা লেখক, কেউ সম্পাদক ইত্যাদি। তারা সোফিওর রহমানের 'কবিদের আড্ডা' শীর্ষক লেখাটি পড়ে অনেক কথা জানিয়েছেন, এক জায়গায় বলেছেন · ···"সাহিত্যের কোন উপকারে আসে না। লিটিল ম্যাগাজিন যে মূল্যবান দায়িত্ব পালন করে আপনি এই লেখাটি প্রকাশ করে সেই কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়েছেন।' আশ্চর্য্য ঐ সব সম্মিলিত পত্র লেখকদের বোধ, জ্ঞান এবং দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বিবেচনা কত নিচু এবং সহজ। সোফিওর রহমান তরুণ কবি এবং সম্পাদক হিসেবে যে চিত্র সাহসের সঙ্গে তুলে ধরেছেন এবং অশোক চট্টোপাধ্যায় লিটিল ম্যাগাজিনের উল্লেখযোগ্য সম্পাদক হিসেবে তা প্রকাশ করে যে সচেতন কর্তব্য পালন করেছেন তা 'আয়নায় নিজেদের মুখ দেখে' মেদিনীপুরের এ সম্মিলিত পত্র লেখকরা একটু চেষ্টা করে নিজেদের শুধরে নিতে পারতেন। তাদের উদ্দেশ্যে আমাদেরও সম্মিলিত বক্তব্য—বুকে হাত দিয়ে বলুন তো আপনারা নিন্দা করেন না? প্রতিবাদ করার আগে নিজেদের কাগজ গুলোর চরিত্র ঠিক করতে পেরেছেন? আপনাদের জেলায় কি না হয়–(১) 'বঙ্গোপসাগর' পত্রিকায় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ–এর গল্প চুরি করে রাজকুমার পণ্ডার নামে ছাপানো হয়। (২) বি, বি, সিতে প্রোগ্রাম না করেও (অর্থাৎ প্রোগ্রাম না পেয়ে), উপত্যকায়' [illegible] ছাপানো হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই বলতে [illegible] করে—সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ। আর তার সম্পাদক ও সাহিত্য কর্মীদের কি অদ্ভুত চরিত্র। তাই বলছিলাম কি ভাল লেখা লিখতে না পারায় এবং ভাল কাগজ করতে না পারার অপমানটুকু আগে গায়ে মাখুন, তারপর অপরকে দোষারোপ করুন। তাছাড়া অশোক চট্টোপাধ্যায় লিটিল ম্যাগাজিনের মূল্যবান দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ বলেই আপনাদের জেলার তরুণ কবিরা দুহাত খুলে লিখতে পারছেন, নইলে শ্যামল কান্তি দাস ও সোফিওর রহমান এর পর আপনাদের জেলা থেকে কবি খুঁজে পাওয়া যেত না। সবিনয়ে

যাজ্ঞী চৌধুরী, সূর্যকান্ত বসু, সুব্রতা রাহা, অমলেন্দু পাল, শ্যামল দত্তরায়, অর্পিতা মিত্র, পার্থ মুখোপাধ্যায়, যুধাজিৎ দাশগুপ্ত, শংকর সরকার।

কফি হাউস, কলকাতা–৭৩

* * * * * *

O গোধুলি মন, ফাল্গুন, ১৩৯১ পড়ে চিঠি লেখার তাগিদ্ অনুভব করলুম মূলত গুটিকয় কবিতার জন্যে। অশোক মণ্ডলের কবিতাটি আমার খুবই ভালো লেগেছে। পাশাপাশি নিভা দে, কুণাল মণ্ডল, ও শুদ্ধসত্ব গুহ–র কবিতাও ভালো।

আসলে যে কথা বলতে চাই, তা হলো এ সংখ্যার প্রতিটি কবিতা পড়েই তৃপ্তি পেয়েছি। এবং ভালো লেগেছে, যেহেতু এঁরা প্রত্যেকেই অহেতুক জটিলতাকে বর্জন করেছেন।

গত ইন্দিরা গান্ধী সংখ্যার সম্পাদকীয় সম্পর্কে আমি একই কথা বলতে চেয়েছিলাম। সম্পাদকীয়টি চমৎকার কবিতা ছিলো। অনেক নতুন মুখ আপনার কাগজে দেখছি এবং ভালো লাগছে তাঁদের ভালো লেখা পড়ে।

শ্রীতান্তে

অজিত বাইরী

উলুবেড়িয়া, হাওড়া

* * * * *

[illegible] ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা পেয়েছি। দুটো সং[illegible] কবিতার দিককে বেশ শক্তিশালী বলে মনে হয়েছে। তবে তা অন্য দিককে খুব লঘু করে নয়। চৈত্র সংখ্যায় কবিতায় উল্লেখযোগ্যতার দাবী রাখে সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন সুর ও জহরলাল বেরা। অমল হালদারের 'সাহিত্য লেখার কলা কৌশল' বেশ মননশীল কিন্তু 'নারী কেন বিপথগামী' পড়ে ব্যবসায়ী পত্রিকার মত আমার মনে হয়েছে। মনে হয়েছে বড় বেশী বিশ্লেষণধর্মী।

অলক ভড়
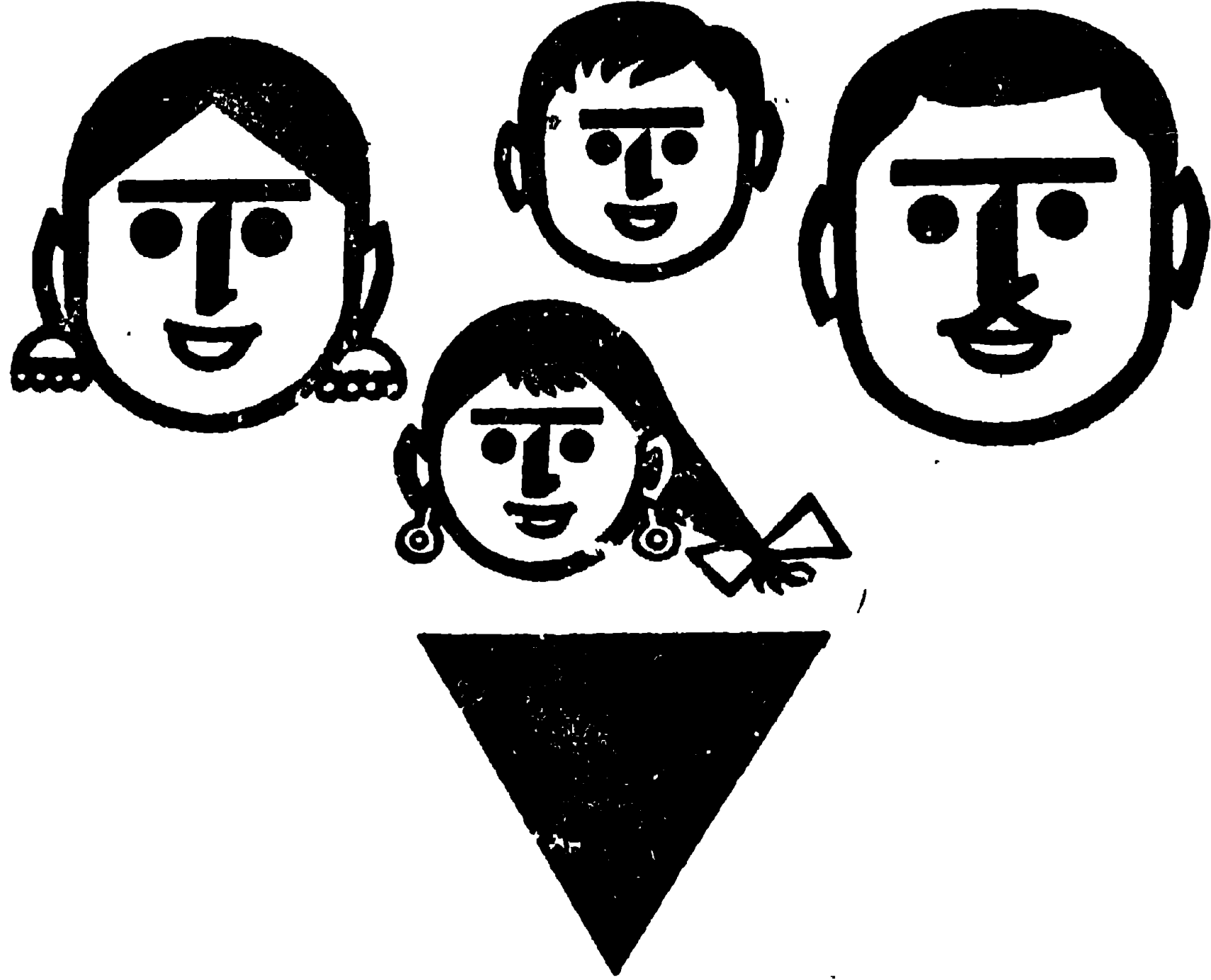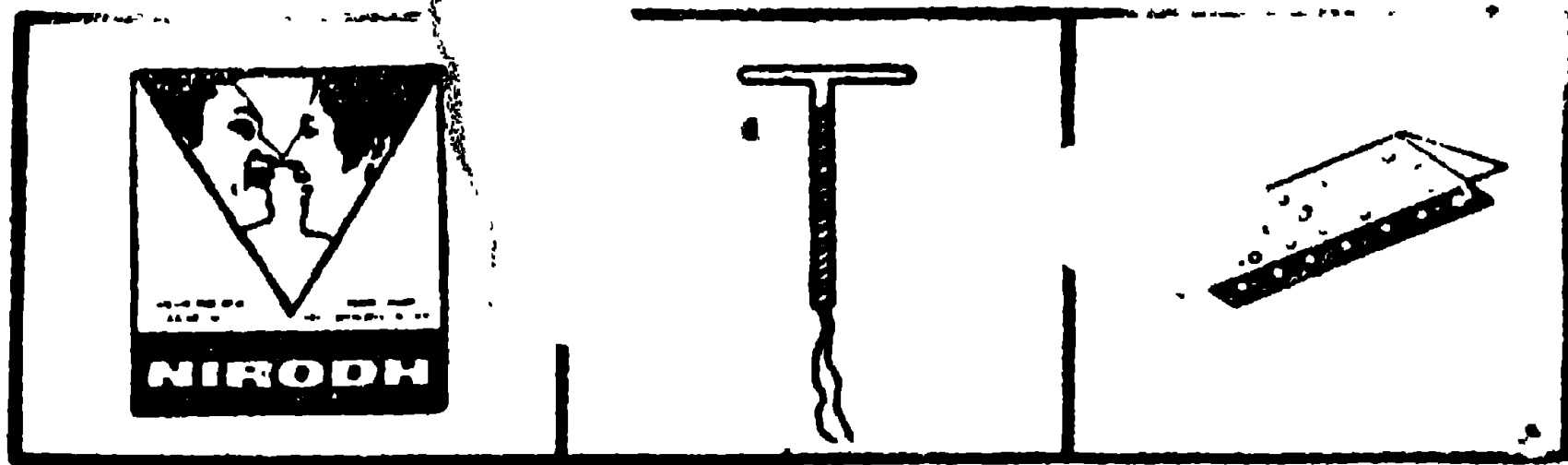
O প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন O

O এই সংখ্যা 'গোধূলি-মন' পেলাম। অজিত রায় আপনার পত্রিকার এক উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার, একথা স্বীকার করতেই হবে। মুক্ত গদ্য লিখছেন তিনি, ভাবনাঋদ্ধ। এই সংখ্যায় অমৃতেন্দুবাবুর আলোচনাটিও গভীর। নীলাঞ্জন বা সোফিওবকে ছুঁয়ে ছেড়ে জাননি তিনি ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেছেন। এই ধরণের আলোচনার প্রয়োজন আছে, কারণ তা পাঠকের ভালো কম্পাস হতে পারে।

আমার কবিতা ২টি ছাপানোর জন্য কৃতজ্ঞতা জানবেন। দারুণ প্রচার আপনার পত্রিকার, প্রকাশের লোভ স্বাভাবিক।

এবারের প্রচ্ছদটিও খুব সুন্দর, পুঁথির ব্লকে নিশ্চয়ই অনেক খরচা হয়েছে।

মঞ্জুভাস মিত্র আমার অগ্র... এবং আমার কবিতার এক... তাঁকে আমার কবিতাপাঠের ... আপনি প্রণাম জানবেন।

O O O O

O অনেক শুভেচ্ছা, বেশ ক'দিন আগে আপনার ছবি সহ কবিতা পেয়েছি। পরে ৩ কপি বৈশাখ সংখ্যা। অজিত রায়কে ধন্যবাদ 'কবি রাম-প্রসাদের অপ্রাপ্তপূর্ব পুঁথি' উপহার দেওয়ার জন্য। বাঙলা সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে লেখাটি আমার প্রচুর উপকারে এসেছে। চণ্ডীদাস সমস্যা নিয়েই এতোদিন আচ্ছন্ন ছিলাম।

অজিত রায়ের সাথে পরিচয়ের ইচ্ছা, যদি তিনি 'দেশ হিতৈষী'র জন্য এরকম কিছু লেখা দিতেন সুখী হতাম।

'অভিজিৎ ঘোষ' তাঁর কবিতায় স্মৃতিচারণ করতে ভালো বাসেন। 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম'তে শেষ ৮ লাইন আমার ভালো লাগলো। মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের— 'পঁচিশে বৈশাখ : রবীন্দ্রনাথ' বৈশাখ সংখ্যা গোধূলি মন'কে সফল করেছে।

আপনার 'মধ্যরাত/চার' কবিতাটি এখানে অনেকের প্রিয়।...... সবুজ শিশির মাখা ঘাস

শিউলীর আঁচল বিছিয়ে

বলেছিলো ; এইখানে বসো

সে বসেনি।...........'

একজন কবি তাঁর কিছু কিছু কবিতার জন্যই বেঁচে থাকে। আপনিও এর ব্যতিক্রম নন।

আগামী সংখ্যা দেশ হিতৈষীতে আপনার সম্পর্কে একটি আলোচনা এবং গোধূলি-মন ও কলকাতার 'একসাথে' পত্রিকার আলোচনা প্রকাশ পাবে।

পরবর্তীতে ডা: শুদ্ধস্বত্ব বসু ও মোহিনী মোহনের উপর লেখার ইচ্ছা। 'একক' ও 'কেতকী' আমার কাছে যাতে নিয়মিত আসে সে ব্যবস্থা করে দেবেন।

'গোধূলি-মন' 'শুদ্ধস্বত্ব বসু' সংখ্যাটি পেলে ...বো।

...ই' কবিতা সংখ্যা প্রকাশের সিদ্ধান্ত ...দুই বাঙলার কবিদের কবিতা ও আলোচনা

শুভেচ্ছাসহ—

ফারুক নওয়াজ
দেশহিতৈষী কার্যালয়
গুরুদাস বাবু লেন
যশোর, বাংলাদেশ

O O O O O

O 'চৈত্র সংখ্যা' অফিসে পেয়েছি। কয়েকটি কবিতা এবং অমল হালদারের লেখাটি অত্যন্ত ভালো লাগলো। এ-সংখ্যায় অজিত রায়ের কোন লেখা নেই কেন ? তিনি কিন্তু গোধূলি-মনের রত্নসম। আমার ওঁর লেখা খুব ভালো লাগে।

প্রমোদ বসু
৫৮, বিশ্বেশ্বর ব্যানার্জী লেন
কদমতলা, হাওড়া-৭১১১০১

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধুলি মন

২৭ বর্ষ/৬ষ্ঠ সংখ্যা

জুন/১৯৮৫

আষাঢ় ১৩৯২

প্রতি সংখ্যা দুই টাকা
বার্ষিক সডাক কুড়ি টাকা

সম্পাদকীয়
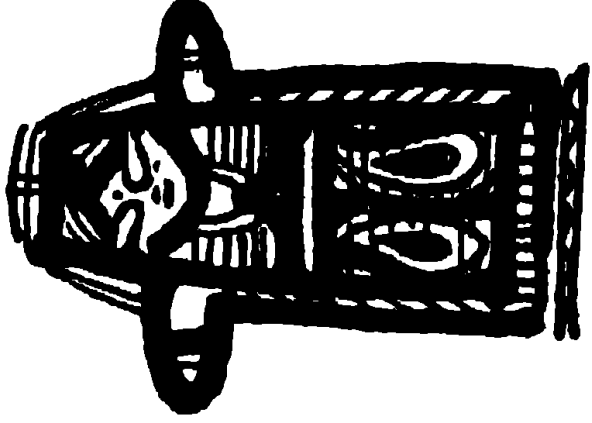
...এ এত চিঠি ... ...ঙ্গ করে সংখ্যাটিকে ...নামে অভিহিত করবেন। ...তো শুধুমাত্র কিছু গল্প ...শেষ করতে চাইনা আমরা। ...বাংলার বেশ কিছু মানুষের হাতে দিয়ে মূল্যায়নের সুযোগ করে দিই আমরা। কোন একটি লেখা পাঠকমনে সাড়া জাগালেই বোদ্ধা পাঠক তার নিজস্ব মতামত জানাতে কলম ধরেন। সেই আলোচনার সুবাদে শুধু যাঁর লেখার সমালোচনা তিনিই উপকৃত হননা, অন্যান্য লেখকেরাও কখনও কখনও নতুন আলোর ইশারা পান।

তাই প্রিয় পাঠক, সমালোচনার জন্য 'প্রসঙ্গ: গোধুলি-মন' বিভাগে আপনার সাদর আমন্ত্রণ রইল।

অশোক চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক

সম্পাদকীয় কার্যালয় ॥ নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর ॥ হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥ ভারত

আন্তন্ চেখভের ঃ ছোট গল্প

অমল হালদার

'সাধারণ মানুষ সৎও নয়, অসৎও নয়। তাঁরা ; একটু হয়ত সহানুভূতির কাঙাল।' এই গভীর মানবীয় অনুভূতিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে আন্তন্ পাভলেভিশ চেখভের সমগ্র সাহিত্য প্রয়াস।

আজ থেকে একশো পঁচিশ বছর আগে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী দক্ষিণ রাশিয়ার টাগানরোগ শহরে এক দরিদ্র মুদির ঘরে তার জন্ম। তার পিতামহ ছিলেন একজন সাধারণ ভূমিদা... ...শৈশবই চেখভকে সংগ্রাম করতে হয়েছে... অবস্থার বিপক্ষে? পেটের ... করেছে সাহিত্য সৃষ্টির কাজে। তা... ফরমায়েসী লেখা লিখতে হয়েছে তা... হয়েছে বিভিন্ন রঙ্গব্যাঙ্গের পত্র-পত্রিকায় ... ধরণের সব গল্প।

তবু এর মধ্যেও যুগান্তকারী প্র... ছিল না। তুনিরিক্ষ্য গোগোল্, তুর্গেনিফ, সাল... প্রমুখের প্রভাব হয়ত ছিল তাঁর প্রথম দিকের কাঁচা হাতের লেখাগুলিতে। তবে সেটুকু কাটিয়ে উঠতেও তাঁর দেরী হয়নি। অতি অল্প দিনের মধ্যে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে চেখভের ঘটল আত্মপ্রকাশ। সেই সাথে নিছক কৌতুক কাহিনীর 'আন্তোসা শেকন্ত'কে (চেখভের প্রথম দিকের ছদ্মনাম) ভুলল সবাই, আর এই ঘটনা রাশিয়ার এক শ্রেণীর পত্র-পত্রিকার অর্ধশিক্ষিত পাঠক সমাজের কাছে হয়ত বেশ কিছুদিন ধরেই একটু আফশোষের কারণ হয়েছিল।

তখন ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে চেখভের বয়স মাত্র আঠাশ বছর। এই সময়েতেই প্রকাশিত হয় তাঁর 'দি পার্টি' নামক বিখ্যাত গল্পটি। এই গল্পের মধ্যেই আমরা প্রথম বারের মত পেলাম চেখভের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বলিষ্ঠ স্বাক্ষর। যা তাঁর লেখাগুলিতে ছিল প্রায় অনুপস্থিত। আর এ স্বাক্ষর এক বৈপ্লবিক মূল্যবোধের সূচনা করল জার শাসিত রাশিয়ার গল্প সাহিত্যে।

'দি-পার্টি' নামক গল্পটিতে রয়েছে একটি বিশেষ মুহূর্তের বিবরণী। যে মুহূর্তটি একান্ত দুর্বিসহ হয়ে ...ধ দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি' ...নৈপুণ্যের সঙ্গে তারই মনস্তত্ত্বকে পরিস্ফুট ...ভ।

...া হেল এই গল্পের নায়িকা। সে অন্তঃসত্ত্বা, ...নের এই সন্ধিপর্বে স্মৃতি ও স্বপ্নের রোমন্থনে ... কোমল মনের বিচিত্র অনুভূতিই হল এ-গল্পের প্রধান উপজীব্য। এর পরের গল্পটি নাম 'এ নার্ভাস ব্রেকডাউন'। এ গল্পটির নায়ক হল একটি ছাত্র। নাম তার ভাসিলেভ। নিজের নৈতিক আদর্শে অবিচল থাকার সংকল্প তার। তাই সহপাঠিদের মতো রাত্রে বারবণিতাদের সঙ্গে অসামাজিক ঘনিষ্ঠতা করতে তার আদর্শে বাধে।

তবু সেদিনের রাশিয়ার সেই অসুস্থ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ভাসিলেভের মনের জগতে যে প্রচণ্ড ঘূর্ণমান অবস্থা দেখা যায়। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই

গল্পের প্রতি ছত্রে তারই বাস্তব চিত্র এঁকেছেন চেখভ।

এর পরই উল্লেখযোগ্য তাঁর 'এ-ডিয়ারি স্টোরি নামক গল্পটি। এটি বলা হয়েছে চিকিৎসা শাস্ত্রের একজন বিখ্যাত অধ্যাপকের মুখ দিয়ে। আয়ুর সীমান্ত ছুঁয়েছে অধ্যাপকটির বয়স। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে এবার কর্মজীবন থেকে অবসর নিতে হবে। এমন এক পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের ট্রায়াল ব্যালান্স কষতে বসেছেন তিনি। খতিয়ে দেখতে বসেছেন তাঁর পাওয়া না পাওয়ার হিসাব। অর্থ, যশ প্রতিপত্তি অনেক কিছুই পেয়েছেন তিনি। কিন্তু মুহূর্তের জন্য পাননি কোন স্নেহতপ্ত হৃদয়ের নিবিড় সাহচর্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের-সাধনাতে নিমগ্ন থাকার ফলে জীবনে-জীবন যোগ করার গোপন রহস্যটি তাঁর জানা হয়নি। জীবন সায়াহ্নে তাঁর এই করুণ দীর্ঘশ্বাসই গল্পটির আবহাওয়া-কে করে তুলছে বিষাদ মধুর।

এর পরেই বলতে হয় চেখভের 'ও[illegible] গল্পটির কথা। দেশবিদেশে বহু আলে[illegible] বিষয়বস্তু। রুশ বিপ্লবের নেতা স্বয়ং লেনিন [illegible] গল্পটি শেষ পর্যন্ত পড়ে আর আমি ঘরের মধ[illegible] থাকতে পারেনি। ছুটে বেরিয়ে এসেছি বাই[illegible] পড়তে পড়তে আমারও মনে হচ্ছিল হয়ত বা আমিও এরকম কোন ওয়ার্ডের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়ে আছি। এমনই আশ্চর্য্য হল চেখভের লিপি চাতুর্য্য।

কোন এক গ্রাম্য হাসপাতালের ভয়াবহ ছবি আঁকা হয়েছে, এই গল্পের সূচনায়। ডাঃ রাগিন এই হাসপাতালের ভার নিয়ে নতুন এসেছেন। তিনি টলষ্টয়পন্থী লোক। আত্মশুদ্ধির অপ্রত্যক্ষ উপায়ে পারিপার্শ্বিকের সমস্ত অন্যায় অবিচারকে প্রতিরোধ করাই তাঁর লক্ষ্য। তাই ঐ হাসপাতালের জঘন্য পরিবেশকে প্রথম দিকে তিনি যেন ঠিক দেখেও দেখেন-নি। নির্দিষ্ট রুটিনে নিজের কর্ত্তব্যের দায় সেরে গেছেন মাত্র। কিন্তু সমস্যা শুরু হল ঐ হাস-পাতালের ৬ নং ওয়ার্ডটিকে নিয়ে। এই ওয়ার্ড হল একটি জেলখানা বিশেষ।......

এখানের ওয়ার্ডে নিকিতার শাসনাধীনে চিকিৎসিত হয় পাঁচজন মানসিক রোগী। এই চিকিৎসা হল অকথ্য গালিগালাজ আর অমানুষিক নির্যাতন।

ডাঃ রাগিন শুধু এই ওয়ার্ডটি পরিদর্শন করতে আসতেন মধ্যে-মধ্যে। এখানেই তার সঙ্গে দেখা হয় প্রেমোভের। এই অল্প বয়সী যুবকও একজন মানসিক রোগী। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অত্যন্ত রূঢ় এবং উদ্ধত তার দৃষ্টিভঙ্গী।

[illegible] আসা মাত্রই সে তাঁকে যথেষ্ট [illegible]ান তার সঙ্গে আলাপে এতই [illegible]শঃ ঘন-ঘন আসতে লাগলেন [illegible] ফলে গ্রামের লোক সন্দিগ্ধ [illegible]নেকেই ধরে নিল যে ডাঃ রাগিন [illegible] অবশেষে অন্য একজন চতুর ডাক্তারের [illegible]নকেও জোর করে বন্দী করা হল। [illegible]ার্ডেরই অভ্যন্তরে।' সেখানে তাঁর [illegible]নে চলতে থাকল নিকিতার সেই অমানুষিক নির্যাতন।......

এই গল্পটিকে আজকের দিনে অনেক সমালোচকই একটি রূপ কাহিনী বলে মনে করেন। তাঁদের ধারণা যে প্রতীকের সাহায্যে সে যুগের রাশিয়ার অন্যান্য বাস্তব অবস্থাই প্রকট হয়ে উঠেছে এর প্রতি ছত্রে। এবার ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'পেজেণ্টস' গল্পটি। এরপর থেকেই তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থার নির্ভিকতম সমালোচক হিসাবে সর্বজন স্বীকৃত হয় চেখভের একক ভূমিকা।

কেন না আগের কোন গল্পের মধ্যেই এত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি তাঁর বৈপ্লবিক চেতনা। এই গোত্রের অন্য গল্পগুলি হল 'দি নিউ ভিলা', 'অন অফিশয়াল ডিউটি,, 'ইন-দি র‍্যাভিন ইত্যাদি।

কিন্তু প্রধানত: কৃষিনির্ভর রাশিয়ার অর্থনীতিতে তখন সবেমাত্র শিল্প বিপ্লবের অঙ্কুর দেখা দিয়েছে। এই বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে লেখা চেখভের 'এ ওম্যানস কিংডম' গল্পটি। আনাআকি সোভনা হল এ গল্পের নায়িকা। পৈত্রিক উত্তরাধিকার সূত্রে সে একাই এখন ছোট কারখানার মালিক। তবু এতে ঠিক সুখী হতে সে যেন পারে না। প্রচুর ধনদৌলত তার অল্প বয়সের জীবনকে শুধু সমস্যার বোঝাতেই গুরুতর করে তোলে।

সেই সঙ্গে চেখভের 'থ্রি-[illegible] [illegible]নক ল্যাপটেভ যেন সব সময়েই [illegible] কাতর। সে'ও এক কারখান[illegible] যে কত অসৎ উপায়ে অর্জিত ও[illegible] সম্পদ। এর বিনিময়ে সে একান্ত ম[illegible] একজন স্বাবলম্বী দিন মজুরের জীবন।

অপর দিকে 'এ ডক্টরস ভিজি[illegible] ঘাটিত হয়েছে কলকারখানা জীবনের[illegible] নতুন দিনের সমাজ ব্যবস্থার ওপর পুঁজিবাদের সম্ভাব, ডাক্তার করোলিয়ভ চরিত্রের মধ্যে ভাবীবলশেভিক বিপ্লবের একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

চেখভের ছোট গল্প সম্পর্কে যে কোন আলোচনাই অসম্পূর্ণ থাকে তাঁর 'ষ্টেপে' গল্পটির কথা উল্লেখ না করলে আপাতদৃষ্টিতে দেখলে এর মধ্যে কোন সুসংবদ্ধ প্লটই খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয় বুঝি একটা বিরাট চিত্রপটের ওপর কোনো খেয়ালী শিল্পীর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শিল্প প্রয়াস। একটি দশ বছরের ছেলের চোখ দিয়ে এই গল্পটির মধ্যে দেখানো হয়েছে রাশিয়ার প্রায় সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত একটি আদিগন্ত তৃণভূমির বুকে রূপ ও রঙের অফুরন্ত বৈচিত্র্য।

এ-ছাড়া গল্পটির মধ্যে ভিড় করে আছে, অনেক খণ্ড বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী। সেগুলির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে মাটি ও মানুষের চিরন্তন সম্পর্কের ইঙ্গিত। 'দি-কিস্' 'দি-হাটসম্যান' 'দি-ফিস্' ইত্যাদি প্রথম-দিকের গল্পগুলির মধ্যেও সাহিত্যের এই অন্যতম বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করা যায়।

আন্তন্ চেখভের ১৮৬০ সালে জন্ম। মৃত্যু হয় ১৯০৪ সালে চেখভের শেষ গল্প প্রকাশিত হয় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুর ঠিক এক বছর আগে। গল্পটির নাম হল 'দি-বিট্রেড'। সামাজিক স্বাধীনতা আর শিক্ষার অভাবে প্রতিদেশে মেয়েদের ব্যক্তিত্বকে যেভাবে পঙ্গু করে তোলা হয় গল্পটি সেই অপপ্রয়াসের [illegible]ীব্র প্রতিবাদ।

[illegible]িয়া নামে এক অতি সাধারণ মেয়ে এ গল্পের [illegible]মা ও দিদিমার সঙ্গে সহরতলীর একটি বাগান [illegible]ার প্রতিদিনের জীবন কাটে। ঐ-জীবনের [illegible]ই কোন বিস্তার, কোন বৈচিত্র্য। তাই ষোল [illegible] বয়স থেকেই সে বিয়ের স্বপ্ন দেখে আসছে। আজ তার ২৩ বছর পুর্ণ হল। স্থানীয় গির্জার পুরো-হিতের ছেলে অ্যানড্রুর সঙ্গে তার এখন বিয়ের সব ঠিকঠাক।......

অ্যানড্রুকে নাদিয়ার বেশ ভাল লাগে কিন্তু অনেক দেখেশুনে সে আজ স্থির নিশ্চয় যে, এ বিয়ের ফলে মধ্যবিত্ত জীবনের একটা খাঁচা থেকে অন্য একটি খাঁচায় শুধু ধরা দিতে হবে তাকে। তাদের পারি-বারিক বন্ধু শাশার পরামর্শে নাদিয়া তাই লেখাপড়া শেখার জন্য পালিয়ে গেল 'পিটার্সবার্গে'। এই শিক্ষার

মধ্য দিয়ে সে এক নতুন জীবনের স্পন্দন অনুভব করল নিজের মধ্যে।

নাদিয়ার স্বপ্ন পৃথিবীর প্রতিটি দেশের মেয়েদের মধ্যে— 'Sooner or later such a life will begin' গল্পটির পরিসমাপ্তি এই নিশ্চিন্ত প্রত্যয়ের সুর নিয়ে। সামাজিক কোন সমস্যার ব্যাপারে চেখভ যে কোনদিনই অন্তরের দিক থেকে নৈরাশ্যবাদী নন. তার শেষ গল্পের এই শেষ ছত্রটিই তার প্রমাণ। কেননা ষ্টেথেস্কোপ ছেড়ে যিনি কলম ধরেছেন, সহজেই নিরাশ হবার পাত্র তিনি নন। ছাত্র জীবনে চেখভের লক্ষ্য ছিল ব্যক্তি বিশেষের ব্যাধির নিরাময়। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি চাইলেন গোটা সমাজ দেহের রোগ মুক্তি আর এ যে দুরূহের সাধনার ক্ষেত্রে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন চেখভ। তাই কোন অবস্থাতেই নৈরাশ্যবাদী তিনি হতে পারেন না।

অনেক সমালোচকের মতে চেখভের গল্পের উপাদানই তার দৈনন্দিন জীবনে অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত। এ ব্যাপারে তিনি টলষ্টয়ের সহধর্মী। চেখভ বিশ্বাস করতেন যে··· the ordinary world, viewed with the right degree of sensitivity is more thrilling than any envented world.

ক্রফোর্ডের মতে, চেখভ হলেন সমাজ জীবনে শাশ্বত ব র্থতার গাথাকার। তিনি হলেন "a wise-ocserver with a wistful smile and acting heart." তাই তার রচনার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে একটা আশ্চর্য সাহিত্যিক নিরপেক্ষতা-aesthetic distance.

তাই তার আড়াই-শো গল্পের প্রায় প্রতিটির মধ্যে আমরা দেখি সর্বস্তরের নিপীড়িত, বঞ্চিত নর- ...য়া মিছিল। আর সেই সংকল্প ...চে থাকা। সেই সঙ্গে আমরা অনুভব করি এদের এই তথ্যনিষ্ট

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

O "উত্তর প্রবাসী" পত্রিকা যে সভা... নাকে সম্মানিত করেছেন, সেই সভায় উপস্থিত থা... আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্বেও থাকা হলনা। এর জন্য দুঃখ ছিল কিন্তু অপরাধ বোধ ছিলনা। কিন্তু এতদিন অবধি আপনাকে কোন অভিনন্দন জানাতে না পেরে নিজেকে নিজের কাছেই ছোট মনে হচ্ছে। দেরীতে হলেও আমার সানন্দ ও সগর্ব অভিনন্দন গ্রহণ করুন। এতে যেন আমরা যারা গোধূলি মনকে ভালোবাসি সকলেরই সম্মান বৃদ্ধি হল।

আপনার কাছে একটি অনুরোধ। কবি অমিয় চক্রবর্তীর শ্রীরামপুরে জন্ম। তাঁর সাহিত্য কৃতি নিয়ে ...বার করলে কেমন হয়? যদি আপত্তি ...তা আরেক শ্রীরামপুরের কবি হরপ্রসাদ মিত্র কেও অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। অবশ্য এটা আমার একটি প্রস্তাব; যা ভালো মনে করেন করবেন। অজিত রায়কে আমার অভিনন্দন জানাই "কবি রাম-প্রসাদের অপ্রাপ্তপূর্ব্ব পুঁথির" জন্য। আপনার দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করে এখানেই শেষ করছি।

ইতি—

জ্যোতির্ময় বসু
ফ্ল্যাট ২, ব্লক ডি
৮২ বেলগাছিয়া রোড
কলকাতা-৭০০০৩৭

পোষাকের নীচে/মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

পোষাকের নীচে কোন চাঁদ ছিলো না
কিংবা নিঃস্তরঙ্গ নদী
কয়েকটা নক্ষত্র শুধু উঁকি মেরে আকাশ দেখছিলো
পোষাকের বাইরে ছিল এলোমেলো ফুলের বাগান।

এক একটা ফুলের ডগে ধারালো ছুরির ফলা নেচেছিলো রক্ত পিপাসায়।

বিধ্বস্ত দুর্গের কাছে হাঁটু গেড়ে তোমার প্রার্থনা
তোমাকেও ক্লান্ত করেছিলো
তোমার সমস্ত রঙ, সূর্য ফুল স্বপ্নের মঞ্জরী
চুরি করে নিয়ে গেছে সে কোন নিষাদ?
তুমি তার ঠিকানা জানলে
লোনা সভ্যতার ঢেউ অবরে
ধীরে ধীরে স্পর্শ করে গে

পোষাকের নীচে কোন চাঁদ ছিলো না
কিংবা কোন নদী
এক টুক্‌রো আগুন তার জিভ দি
চুষে খাচ্ছে এখনো তোমাকে

তুমি কেন স্থির বৃত্তে একটুও নড়ে বসলে না?

আড়ালে/বিশ্বম্ভর নারায়ণ দেব
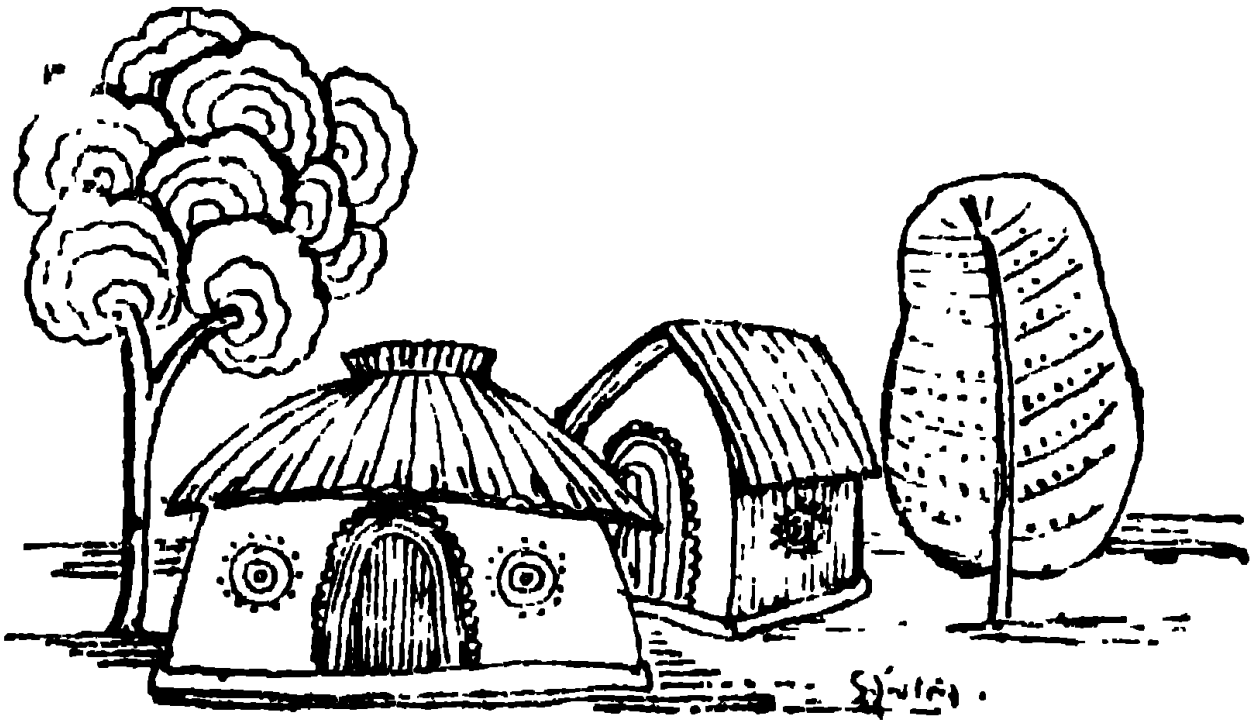
য়ার ছৌনাচের মুখোশের আড়ালে
কত নিরন্ন মুখ আজ
অপুষ্টির সাথে হাত মিলিয়েছে।
প্রতিটি তুলির টানে সরব যন্ত্রণা, তবুও
কি অপরূপ শিল্প সৌন্দর্য্যে ভরা এই মুখোশগুলি
সুদূরের পিয়াসীরা তাদের রঙ্গীন
ঝুলি ভরিয়েছে এই মুখোশগুলির
উজ্জ্বলতায়, হে পুরুলিয়ার
ছৌনাচের মুখোশশিল্পীরা এবার—
তোমাদের তুলিতে দধিচীর রূপ নিয়ে এসো।
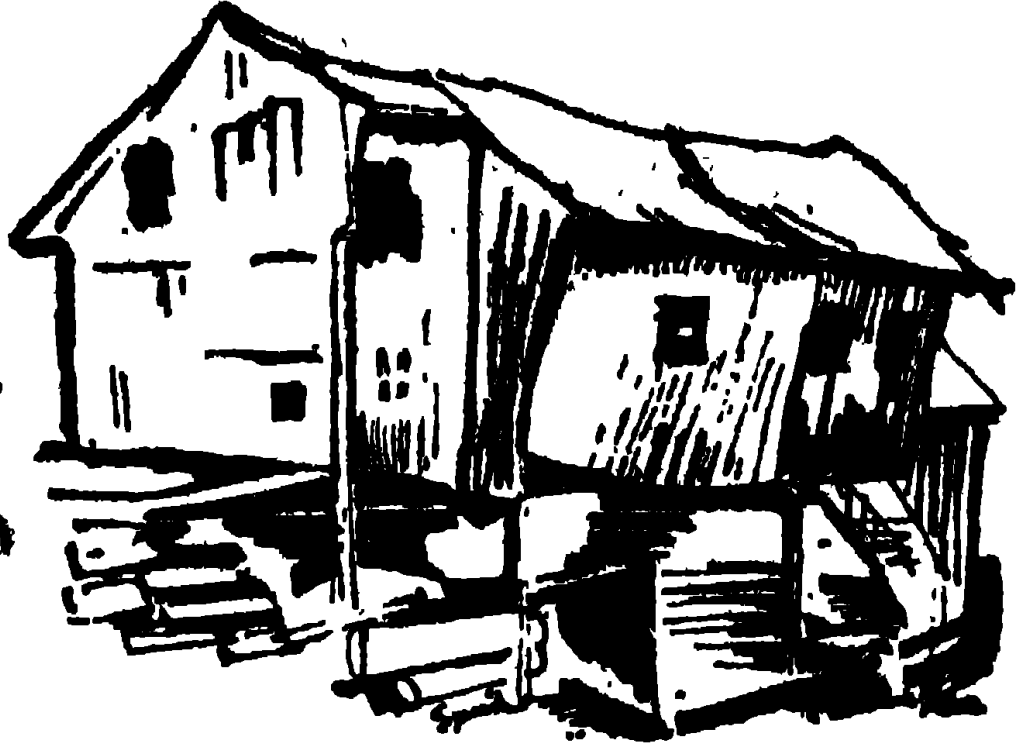
ভ'রে থাকো আমাকে—সুবর্ণদ্বীপ/নিভা দে

মানুষ তো শেষ পর্যন্ত যায় কারো কাছে
যেতেই হয় তাকে—সুবর্ণদ্বীপ
যেমন আমি—তোমার কাছে……
তুমি আমাকে নিয়েই শুধুই খেলাই যে
খেলো ! ভাঙো—, যা ইচ্ছে করো
মানুষ সবচেয়ে ভীরু অসহায়
তার ভালোবাসার কাছে
তবু সুবর্ণদ্বীপ—আমি তোমার কাছে
এইভাবে অবিরাম প্রার্থনায় মগ্ন আছি

তুমি ভ'রে থাকো আমাকে—অমাবস্যার
আকাশে সংখ্যাতীত নক্ষত্রের উজ্জ্বলজ্যোতিতে
তুমি ভ'রে থাকো আমাকে
চৈত্রের শিরীষের মাতাল অজস্রতায়
কোনো ফাঁক নেই যেখানে—সেই
উচ্ছ্বসিত পলাশের আনন্দে
ভ'রে থাকো আমাকে— ।

ভালবাসা (৫)/সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কৈশোরের সেই ভীরু চোখে চেয়ে থাকা তার
আমি ভুলতে পারিনি আজো ।
সে চোখের তারায় তারায় তবে কি লেখা ছিল ?
কোন গোপন হাতছানি, অথবা অন্যতর কিছু !
হাতছানি হবেই বা কেন, যেহেতু তার কুণ্ঠিত করতল
অনন্তকাল স্তব্ধ অনন্তকাল ধরে আমারই ইজারা ।
তবে কি তা স্পষ্টতর অন্য উচ্চারণ ?
অজস্রতার স্মৃতি ছিঁড়ে দুর্বহ প্রহরে
তাড়িয়ে ফিরেছে সদা যতেক প্রহরা
প্রহারে-প্রহারে ?

তনু দহনে
মি ঝিনুকের মতো ।
ত রণনে, তবে কেন তবু কেন
সেই মৃদু ঘণ্টাধ্বনি ?
সমর্পণে নৈবেদ্যের তীব্র দখল ?
ধম ফাগের রেণু ওড়ে
বিষণ্ণ সন্ধ্যায় ভেসে ওঠে কথা
কুঁড়ি হয়ে ফুটে থাকে, "তুমি ভালো থেকো ।"

নাট্য-ভাবনা/দিলীপকুমার ঘোষাল

শুরুতেই বেশ সমারোহ –
পালাটিও বেশ জমজমাট।
সে কোন সুন্দরী যুবতী
এবং পরিস্ফুট সর্বত্র
আলোয় আলোয়।

এবার শেষ দৃশ্য : সে তখন ঢুকছে
পরিপূর্ণ বৃক্ষের ডালপালায়
বাসা বেঁধেছে ভাড়াটে পোকা।
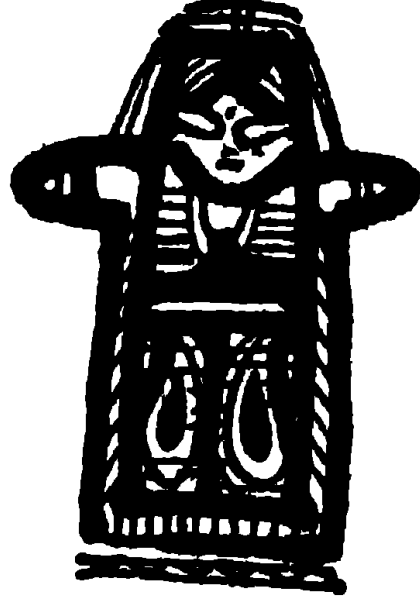
রাত্রির নৈঃশব্দ ভেঙে যাচ্ছে ক্রমশঃ
নিশাচরের হাততালিতে।

আমি উঠে আসছি
জমজমাট আসর থেকে।
লোহার সিন্দুকে উই ধরেছে এমন তুচ্ছ
রাহুবার লোভে।

আমি উঠে আসছি :
একটু পরেই পুরস্কারের পাঁক ঘাঁটবে ওরা॥

পাহাড়/বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়

এ'রকম কথা তো ছিলো না

সুরম্য কাননের হিরণ্য সুষমায়
বৃক্ষলোক হাসিয়ে ভাসিয়ে
মসৃণ শব্দে তুমি ফুলগুলি ফোটাবে।
ফুলের অন্তর্গত গভীর গভীরে
কুশল সংবাদের মতো ফলগুলি
গড়ে তুলবে দ্রুত
ফলের অন্তর্গত বীজগুলি
বিশল্যকরণীগুলি
অন্তত আমার কথা ভেবে।
নিরাময় কল্পে তুমি পুষ্ট করবে বুকে -
এই কথা ছিলো।......

অথচ তোমার বুকে এখন বৃক্ষ নেই–
পারঙ্গমহীনতার পাথর রয়েছে -
তুমি কি পাহাড় হয়ে গ্যাছো ?

আগামী/লালমহম্মদ খাঁন

...ণ আমাকে দেখতে পাই বাউলের বেশে ;
...শুদের মহফিল বসে,
...ম সংঘাত থেমে যায়,
...কাহিনীর উত্থান-পতন।

...বসর,
...প্রাণের ভিতর শুনি পাখীদের গান,
সজীব স্পন্দন বুকে অনায়াসে পৌঁছে যায়
প্রথম যৌবনে।

পরম প্রশান্তি ঘিরে, জীবনে এখন আমি আছি—
সারাক্ষণ বন্ধুজন কাছে আসে, মিত্রতার হাত রাখে হাতে,
আমার মায়ের হাসি, ফুটে ওঠে পৃথিবীর ফুলে।
দুঃসহ তপস্যায়, সময় কাটাতে আর হয়না আমায়,
একান্ত সহজে পাই সুসময় পাখীর নাগাল,
মুঠো হাত খুলতেই, নিখোঁজ কবিতাগুলি—
খুঁজে পাই বিনা চশমায়।

দক্ষিণদুয়ারের আলো/অমিতেশ মাইতি

স্তোকবাক্য শোনাবে তুমি ?   শুধু যে আজন্ম লাঞ্ছিত
এই মাতৃভূমিতে তাকে তুমি সান্ত্বনার বৃষ্টিতে ধুইয়ে দেবে
—এই তীব্র হাস্যকরতায় আমি শিমূলতুলোর সাথে উল্লাসে ফেটে পড়ি।
আমার আকাশ কতটা, তাতে মেঘ ও বৃষ্টির পরিমাণ কতখানি
সবই তো গভীরভাবে জানা। তুমি আর চাষীকে কি আকাশ চেনাবে !

স্বপ্নের দেশ ভেঙে গেছে, যতো স্বপ্ন ছিল জীবনের মূলে
কঠিন আঘাত হেনে তাকে নির্মূল করে দিচ্ছে কেউ, আমার ভিতরে তাই
চৈত্রের রোদ আর কৃষ্ণচূড়ার মতো রক্তের ছিটে জ্বলজ্বল করে।
ক্যানভাসে কি রং চাপাবো—লাল নাকি কালো,
হাড়ে কি ঢুকছে তেজস্ক্রিয় আলো ?

'যাই যাই' বলে পথে নেমে পড়ি।   পথে [illegible]
শুধু দক্ষিণ দুয়ার থেকে আলো এসে সেই[illegible]

অংশগ্রহণ/অসীমকাজল মহান্তি

যেখানে যত ছিল পরিশ্রমের সঞ্চয়
সব তিনি বিলিয়ে দিয়েছিলেন
দুচোখ বন্ধ করে– তবুও
অন্তিম বিদায় যখন সত্যিই
দরজার চৌকাঠে রাখল পা,
তখন দেয়াল থেকে পেড়ে
হাতে তুলে নিলেন বেহালা—
আর
[illegible]হালার কণ্ঠ দিয়ে ঝরাতে লাগলেন
[illegible]র চোখের জল

[illegible] ৩ ॥ ১৩/প্রমোদ বসু
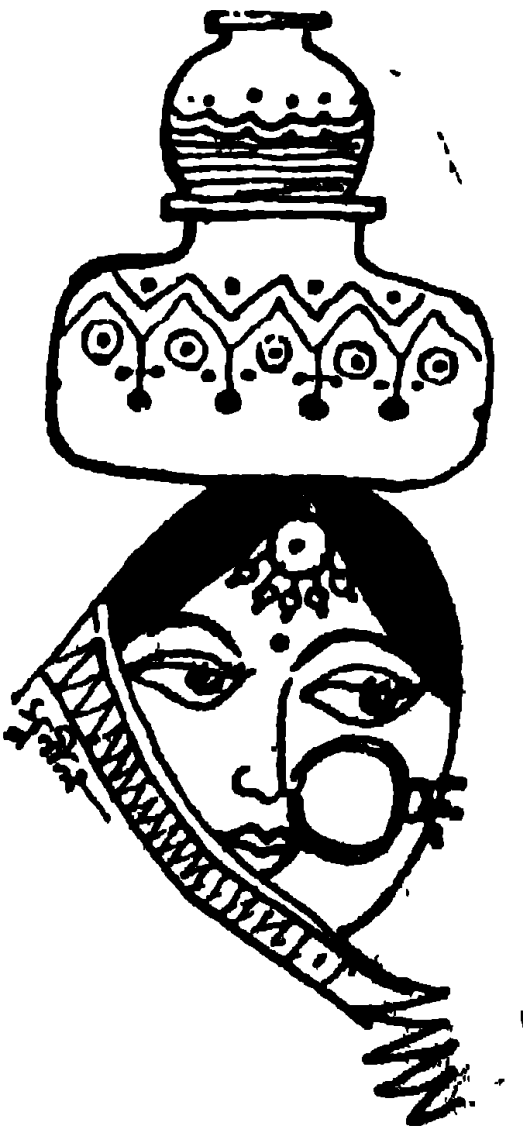
চুলে জেগে উঠছে দু'একটি সাদার প্রহর—
দীর্ঘতর স্মৃতির প্রবাহ,
নিন্দা ও প্রেম এখন পাশাপাশি দু'ঘর,
বেঁচে থাকা আমরণ দাহ।
একটা আয়না চাই, টাঙাবার একটি দেয়াল
ঘরের শূন্যতা ভেঙে যাই,
সর্বনাশ গিলে খায় রাত্তিরের শেয়াল
সকালের সন্ন্যাসে দাঁড়াই।

?ন্দিরা স্নেহ প্রণাম

রেজাউল করিম

ইন্দিরা গান্ধী চুরি হয়েছেন। তিনি আর পৃথিবীতে নেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি এমন এক গৌরব জনক মৃত্যু বরণ করেছেন যার জন্য ইতিহাস তাকে অমর করে রাখবে। মৃত্যু তাঁর দেহকে শেষ করেছে কিন্তু তাঁর আত্মাকে কোনদিন ধ্বংস করতে পারবে না। চিরদিন তিনি অমর হয়ে থাকবেন। অতীতে যেসব শহীদ অন্যায়ভাবে ঘাতকের হস্তে নিহত হয়েছেন, ইন্দিরা গান্ধী তেমনি যুগে যুগে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকবেন। এ যুগের মানুষ যে [illegible] শহীদগণকে মনে প্রাণে স্মরণ করেন তেমনি যুগ থেকে [illegible] স্মরণ করবে। যখনি কেউ এ দেশের মঙ্গলক[illegible] বলবে ইন্দিরা বেঁচে থাকলে তিনিও এ কাজ ক[illegible]কোন [illegible] বিশ্ব-সমস্যার উদ্ভব হবে এবং এ যুগের [illegible]ন করতে পারবেন না তখন বহুলোক বলে উ[illegible] বেঁচে থাকলে এর চেয়েও কঠিনতর স[illegible] করতে পারতেন। বাস্তবিক ইন্দিরা গা[illegible] বিস্ময়কর মানুষ। তাই আজ আমরা ইন্দিরাকে স্মরণ করি এবং তাঁর আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

ইন্দিরা গান্ধী ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা লাভ করার পর থেকে তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার বলে বহু ধরনের কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধান করেছেন। তিনি সবল হস্তে বহুপ্রকার দুর্নীতির মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। দেশের লোক বুঝল যে আমাদের দেশে এমন একজন বিরাট মহিলা শাসনভার গ্রহণ করেছেন যিনি কর্তব্য কাজ করতে কুণ্ঠিত হননি, পশ্চাদ পদ[illegible] সমস্ত প্রকার বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে [illegible]কাজে এগিয়ে গেছেন। পশ্চাদে ফেলে [illegible]নীতি তাঁর নীতি নয়। যখন পূর্ব বাংলার উপর [illegible]পশ্চিম পাকিস্তান আক্রমণ চালাল তখন ইন্দিরা গান্ধী এই আক্রান্ত পূর্ববাংলাকে রক্ষার জন্য এগিয়ে এলেন। এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে পূর্ববাংলাকে, পাকিস্তানের হাত থেকে রক্ষা করলেন। ইন্দিরার সাহায্য না পেলে আজ বাংলাদেশ বলে কোন দেশ জন্মলাভ করত না। বস্তুত স্বাধীন বাংলাদেশ ইন্দিরা গান্ধীর দান।

ব্যাঙ্ক ও খনি জাতীয়করণের ব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধী যা করেছেন তা আর কেউ করতে পারতেন না। তাঁর মন্ত্রিসভার অনেকে আপত্তি তুলেছিলেন, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী সমস্ত বাধা অতিক্রম করে এই মহৎ কাজ

সম্পন্ন করেন এবং সমাজতন্ত্রের পথে দেশকে এগিয়ে দেবার জন্য প্রথম পদক্ষেপ গ্রহন করেন। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার বহুবিধ গঠনমূলক কাজ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি রাজন্যবর্গের ভ্রাতা বন্ধ করেছেন। এটাও একটা দুঃসাহসিক কাজ। এসব মহৎ কাজ ইন্দিরা ব্যতীত আর কেউ করতে পারতেন না। অবশেষে আর একটা মহৎ কাজ করার জন্য ইন্দিরা গান্ধী প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সে কাজ হল বিচ্ছিন্নতাবাদকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা। ইন্দিরা গান্ধী চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন দেশের বাইরে যেমন শত্রু ভারতবর্ষের সর্বনাশ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সেরূপ কতকগুলি বিচ্ছিন্নতাবাদী দল ভারতবর্ষের মধ্যে নানা প্রকার অন্তর্দ্বন্দ্ব বাধাবার চেষ্টা করছিল। আর তাঁদেরকে গোপনে সাহায্য করছিল কয়েকটি বিদেশী শক্তি। ইন্দিরা গান্ধী এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করলেন ...

যারা গোপনে গোপনে এ দেশের মধ্যে থেকেও দেশের সর্বনাশ করে যাচ্ছিল তাঁরা ইন্দিরার এই মহৎ প্রয়াসকে স্বাগত জানাতে পারল না। তাঁরা গোপনে ষড়যন্ত্র করে যেতে লাগল। তাদেরই চক্রান্তের ফলে আজ ইন্দিরা গান্ধীকে শহীদের মৃত্যু বরণ করতে হল।

যা হবার তা হয়ে গেল, ইন্দিরা আর ফিরে আসবেন না। তবে পরলোকে যাবার বেলায় তিনি আমাদের স্কন্ধে নূতন দায়িত্ব দিয়ে গেলেন। সেই দায়িত্ব এই যে, আমাদেরকে সর্বশক্তি দিয়ে বিচ্ছিন্নতা-বাদের বিরুদ্ধে অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করে যেতে হবে। তবেই তিনি পরলোকে শান্তি পাবেন এবং সেখান থেকে আমাদেরকে আশীর্বাদ জানাবেন। তাই আমরা সমবেতভাবে ইন্দিরার পরলোকে অবস্থিত আত্মাকে জানাই যে আমরা তোমার অসমাপ্ত কাজ পূর্ণ করব, ... করব, এবং জাতীয় আদর্শকে ... াই বলি—ইন্দিরা আমাদের

O প্রসঙ্গ ঃ গো...

O মে-র গোধূলি... আমাকে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাচ্ছেন, তার ... মাসেই নিয়মিতভাবে বাংলার তরুণ সাহিত্যের অনে... । সম্ভব হচ্ছে

নিভা দে-র প্রবন্ধটি পড়লাম। ছোট পরিসরে ভালো লিখেছেন। নিজস্ব আলোচনা। উনি এই বিষয়ে আরো বড় কিছু লিখতে পারেন। আরো বিস্তৃত।

সোফিওরদার গুচ্ছ কবিতা প্রসঙ্গে এই প্রথম তাঁর ছবি দেখলাম। সৌম্য, কবির মতোই স্নিগ্ধ সুন্দর। কয়েকদিন আগে শিবনারায়ণ রায় তাঁর কথা লিখেছেন আমাকে। সোফিওরদার কবিতা পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও ওঁর বলিষ্ঠতাকে শ্রদ্ধা করি আমি। মেদিনীপুরের স্তম্ভ, নিশ্চয়ই।

'উত্তর প্রবাসী' সম্বন্ধে জানলাম বেশ কিছু। সত্যিই একটি পূর্ণ পত্রিকা প্রকাশ করেন আপনি। অন্যথায় আমরা অসমীয়া হীরেন ভট্টা-চার্যকে পাই কি করে? ধন্যবাদ। প্রণাম জানবেন।

সংযম পাল
বোলপুর

শুদ্ধসত্ত্ব গুহর

যোশেফ

ফাদার জন্ যেদিন বিলাসপুর থেকে বোম্বেমেলে হাওড়া ষ্টেশনে নামলেন। হঠাৎ একটা শিশুর আর্ত-চীৎকারে ক্লান্ত ফাদারের মনটা কোলাহল মুখরিত জায়গাটায় টেনে নিয়ে গ্যালো………

ভীড় সরিয়ে ফাদার
গ্যালেন। নাম দিলেন ম্যানু

আজ যোশেফের বয়স চা
কালোচুল গোনা যায়।……

সরল শান্ত আর সেন্টিমেণ্টাল যোশেফটা
না আসলে ফাদারকে প্রশ্ন করলে বলতেন,
কলেরা রুগীকে নিয়ে এ হাসপাতাল ও হাস...তাল
করছে·

যোশেফের গল্প অথবা ঘটনা আমি এমন ভাবে বলছি যেন যোশেফ—

না যোশেফের কফিনটা আমি, তীর্থ, শুভ, দেবাশীস, দিলীপ ফুল দিয়ে সাজাচ্ছি……

মনে পড়ছে একদিন একটা পাগলা কুকুর ফাদারের দিকে ধেয়ে এসেছিল কিন্তু যোশেফ অক্ষত ফাদারকে রেখে ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে, পেটে চোদ্দ খানা নিডিল নিয়েও ঐশ্বরীক হাসি দিয়ে উত্তর দিয়েছে……

আজ ও নেই, কেননা ভালবাসতো চন্দ্রিমাকে "Chandri is my heart" মাঝে মাঝে বলত যোশেফ। চন্দ্রিমার জন্ম দিনের আগের দিন একগোছা রজনীগন্ধা নিয়ে যখন ও গিয়েছিল সরল যোশেফটাকে ওর
...বি প্রেমিকের সামনে রজনীগন্ধার গোছা ছুঁড়ে
...ছিল যার কোন বাবা মার পরিচয় নেই……

...মণ্টাল যোশেফ শুধু একটা কথাই বলেছিল
...i when I shall go to god please throw
flowers on my Coffin"……

কফিনের একটা দিক আমার কাঁধে একটা দেবাশীসের, একটা দিলীপের আর একটা শুভর কাঁধে। মনে হচ্ছে যেন গীর্জার, জন্তুগুলোও আজ হৃদপিণ্ডের বেদনায় অস্থির আর সামনে হাতে একটা সুন্দর ল্যাম্প নিয়ে অশ্রুশিক্ত ফাদার……

শুধু মনে পড়ছে যোশেফ ভাঙা ভাঙা বাংলায় রবীন্দ্রনাথের একটা গান গাইতো—

"তবু মনে রেখো, তবু মনে রেখো
যদি দূরে চলে যাই তবু মনে রেখো"

গৌর বৈরাগীর

খেলতে খেলতে
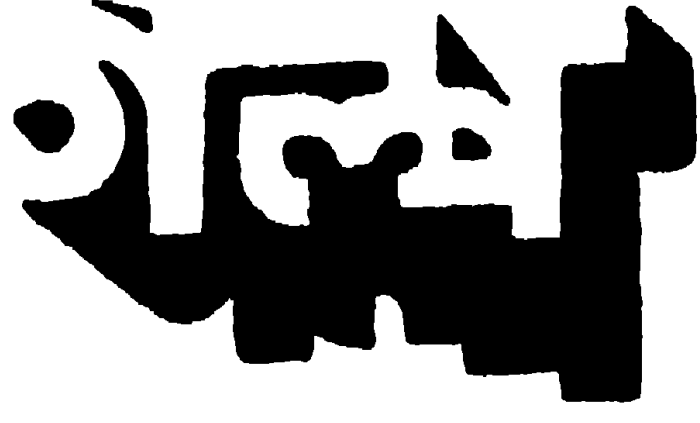
টুম্বা বলল্ বাপী আজ আমি চারজনকে খুন করেছি—তাই নাকি। বিকাশ চোখ বড় বড় করে তাকাল। চোখে খুশি খুশি, চোখে গর্ব, গর্ব, হাসি-মুখে শ্রীলেখার দিকে তাকাল বিকাশ। এই মাত্র কফির কাপ থেকে ঠোঁট নামাল শ্রীলেখা। চোখে চোখে তাকাল। তারপর হাসল।

আসলে এটা একটা খেলা। খুন খুন কে কটা খুন করতে পারে তার প্রতিযো... জন্যে টুম্বাকে একটা ব্যাটারী সেটের রি... দিতে হয়েছে বিকাশকে। ট্রিগারে আঙু... একটা কট্ কট্ শব্দ হয়। কির কির শ... ভেতরে একটা হলুদ আলো জ্বলে উঠে কার্তুজ বে... যাবার সংকেত পাওয়া যায়। এইটা নিয়ে খুন খুন খেলা করে টুম্বারা।

দুধের গ্লাস টেবিলে নামিয়ে টুম্বা তাকাল।

—আমাকে এবার একটা স্টেনগান কিনে দেবে বাপী।

—রিভলবারে আর কাজ হচ্ছে না। প্রশ্রয় প্রশ্রয় হাসি হাসল বিকাশ।

বারে কাজ না হলে চারটে খুন করলুম কি করে। নরম চোয়াল চেপে কথা বলল টুম্বা। একটা স্টেনগান থাকলে এক সঙ্গে অনেক খুন করা যাবে।

—তুমি আগে ভাল করে রিভলবার ধরতে শেখ। বিকাশ নরম গলায় বলল কথাটা।

—রিভলবার কি করে ধরতে হয় আমি জানিনা। গম্ভীর গম্ভীর গলায় বলল টুম্বা। তুমি দেখবে।

...গেল ও।

... দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে ...াও একটা খেলা। তবে এ ... খেলাটা অনেক বার দেখেছে ... করে যে টুম্বা খেলাটা শিখল তা জানেনা ...ত খেলতে জানে।

...ফুটে নরম শরীরটা হাতে বন্দুক ধরেই টান টা... হয়ে গেল। তীব্র চাউনি। সামনে বাবা। এখন তার শত্রু। তাকে আক্রমণ করার জন্যে ঝট করে বাঁ হাত কব্জি থেকে ভেঙে শরীরের সামনে চলে এল। রিভলবার ধরা ডানহাত এবার বাঁ হাতের কব্জির ওপর রাখল টুম্বা। ঠিক এই সময় কপাল কুঁচকে যায় টুম্বার। চোখে এক ভীষণ দৃষ্টি চলে আসে। নার্ভগুলো টান হয়ে ওঠে। শরীর স্থির এই অবস্থায় ট্রিগারে আঙুল রাখে ও। তারপর কটকট শব্দে গুলি বার করে রিভলবার থেকে। গুলি বেরিয়ে যাবার সময় হাতে যে ঝাঁকুনি দেয় সেটা পর্যন্ত ঠিক ঠিক নকল করতে পারে টুম্বা।

খেলাটা দেখতে দেখতে হো হো করে হেসে ওঠে বিকাশ। শ্রীলেখাও।

টুম্বা খর চোখে তাকায়। বলে— বারে হাসলে কেন তুমি, তুমিত' খুন হয়ে গেছ। মাটিতে লুটিয়ে পড়বে এবার।

—তাইত, তাইত। বিকাশ হাসি হাসি হয়ে সত্যি সত্যি সোফার ওপর লুটিয়ে পড়ে।

টুম্বা তখন বিজয়ী বীরের মত অবহেলায় মৃত শত্রুর দিকে তাকিয়ে পকেটে পুরে ফেলে রিভলবার। এই খেলাটা এত ভাল লাগে ওদের। মনে হয় এইকি তাদের ছেলে। এত স্মার্ট, এত বুদ্ধিমান, এত দুষ্টু, বিকাশত, কোনদিন এমন ছিল না। ছোটবেলায় সে নাকি হাবাগোবা ছিল। কথা ফুটত না মুখে। আর তারই ছেলে! সুযোগ পেলে শুনিয়ে দেয় বিকাশ। আর স্টেজে নামিয়ে দেয় তারা। টুম্বাকে একটা না একটা কিছু প্রদ... টুম্বা যখন আরও ছোট ছিল তখন তা... করতে হত। তারপর একটু বড় হতেই আবৃত্তি সরে এল টুম্বা।

বিকাশ বলল— বাধা দিও না। যার যা ঝোঁক।

শ্রীলেখা বলল— তোমার ছেলে কিন্তু ভীষণ স্মার্ট হবে দেখো। বলতে বলতে লালের ছোপ লাগল শ্রীলেখার গালে।

আবৃত্তির পর হঠাৎ আঁকার দিকে নজর পড়ল টুম্বার। গাদা গাদা রঙ আর ক্যানভাস চলে এল বাড়িতে। দামী দামী আর্ট পেপার।

এই সময় বাড়িতে যেই আসুক তাকেই আঁকা দেখতে হত। তারা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলত— বাঃ ছবিতে একটা ব্যাপার আছে কিন্তু। বড় হলে আপনার ছেলে— এসব শুনলে বিকাশদের এত ভাল লাগত। গর্বে বুক ফুলে উঠত তাদের। তাদের টুম্বা বড় হয়েছে। জগৎ জোড়া নাম ডাক। বিদেশে টুম্বার ছবির প্রদর্শনী। পিকাসোর পরেই টুম্বার নাম। ভাবতে ভাবতে বিকাশ আর শ্রীলেখার বুকের ভেতর দিয়ে একটা শান্তির নদী বয়ে যেত। কোন কোন দিন শ্রীলেখার চোখের কোণে জল বিন্দু। সুখের।

কিন্তু টুম্বার পরিবর্তনটা এত দ্রুত যে তাল রাখতে পারত না দুজনেই। হিমসিম খেয়ে যেত তারা। ছবি আঁকা শেষ হতে না হতেই 'বিল্ড ইয়োর ওন হাউস' খেলাটায় রপ্ত হয়ে গেল টুম্বা। তখন ঐ বোর্ডটা নিয়ে সারাদিন খাওয়া নেই, দাওয়া নেই।

অফিসের মি. সান্যাল বলেছিলেন—এটা শুধু খেলা নয়। ধৈর্য এবং বুদ্ধির পরীক্ষাও বটে। এমন করেইত ব্রেন সার্প হয়।

এরপর হঠাৎ একদিন একটা কমিক্স নিয়ে এল ...শ। ততদিনে ইংরেজি অক্ষর পরিচয় হয়ে সরল ...ুকে পড়েছে টুম্বা। আর তাকে পায় ...টা দেখার পরেই কমিকসের এক রাক্ষুসে ...ল টুম্বার। সে খিদে মেটাতে বিকাশের ... অবস্থা। এরও অবশ্য একটা ভাল দিক ... ভাল ভাল ছবির দৌলতে খুব তাড়াতাড়ি ...রেজি ভাষার হেঁসেলে ঢুকে পড়া যায়।

আর সেটাত একান্তই দরকার। সামনে এক অসম্পূর্ণ জীবন পড়ে রয়েছে না টুম্বার। এ জীবনেত' লড়াই করতে হবে। তাই বোধ হয় একদিন শুরু হল ঐ লড়াইয়ের খেলা।

একদিন বাড়িতে এসে টুম্বা মাকে বলল— মা আমি ক্যারাটে জানি। দেখবে।

শ্রীলেখা চোখ বড় বড় করে বলল—ওমা! তাই নাকি, কয় দেখি।

বলার আগেই শূন্যে লাফিয়ে উঠল টুম্বা। তারপর বেশ কিছু ক্যারাটের কায়দা কসরৎ দেখালো।

শ্রীলেখা অবাক। এ সব শিখল কোথায়। শ্রীলেখা হিন্দী সিনেমায় এমন দেখেছে। কিন্তু টুম্বা-কেত' হিন্দী ছবি দেখতে দেওয়া হয় না।

বিকাশ আসতেই কথাটা তাকে বলল শ্রীলেখা।

—তাই নাকি। আশ্চর্যত'। বিকাশ হাসল। নিশ্চয় স্কুল থেকে শিখে এসেছে। ঠিক সেই সময় শ্রীলেখা ডাকল টুম্বাকে।

—বাপীকে ক্যারাটের কায়দাটা দেখাওত' টুম্বা।

টুম্বা এত সুন্দর করল ব্যাপারটা, বাঃ বাঃ না বলে থাকতে পারল না বিকাশ। পরদিন অফিসে গিয়ে ঘটনাটা বলল। অফিসের পর রাস্তায় যার সঙ্গে দেখা হল তাকেই ব্যাপারটা হাসতে হাসতে জানাল। এরপর বাড়িতে যেই আসুক প্রত্যেকের সামনে টুম্বাকে ক্যারাটের কায়দা দেখাতে হত।

—যা দিনকাল। দেখতে দেখতে সবাই মতামত দিত। এসব শিখে রাখা খুব দরকার। কখন কি দরকার হয়।

এই সময় শ্রীলেখার চোখের সামনে ... 'ব্রুস্‌লির' ছবিটা ভাসত। বিশাল শক্তিমান। ... ব্যাপী নামডাক। কোটি কোটি টাকা।

এরপর বন্দুকের খেলাটা হঠাৎ একদিন ... ফেলল টুম্বা। কি সুন্দর টিপ। কি নিখুঁত ভঙ্গি। প্রথম প্রথম শুধু হাতে শুরু হয়েছিল ব্যাপারটা। ডান হাতের অন্য আঙুলগুলো মুঠো করে তর্জনী সোজা রেখে বন্দুক তৈরী হত। সে ভাবেই বাঁহাতের কব্জির ওপর ডান হাত রেখে গুলি করত সবাই মুখে। গুলি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মুখে গুঁইই গুঁইই শব্দও করত। দেখতে দেখতে খেলাটা আরও আধুনিক করে ফেলল টুম্বারা। তখন হাতে হাতে ব্যাটারী সেটের রিভলবার।

বাড়িতে এসে টুম্বা যখন বলত – জানো মা, আজ চারজন বদমাশকে খতম করে দিয়েছি।

ঠিক তখন শ্রীলেখার সামনে অরণ্যদেব এসে দাঁড়াত। অরণ্যদেবের সেই ছবিটা। টান টান ঋজু। ঝকঝকে স্বাস্থ্য, আর জগৎ জোড়া নাম ডাক।

এই সময় বাড়িতে যেই আসুক তার সামনে শ্রীলেখা আর বিকাশ তাদের অরণ্যদেবকে দাঁড় করিয়ে দিত।

যারা দেখত তারা বলত— ওমা কি দারুণ!

একদিন শ্রীলেখার দিদি মণিদীপা এল বাড়িতে। দিদির সামনে শ্রীলেখা তার পিকাসোর কথা, অরণ্য-দেবের কথা, আর ব্রুস্‌লির কথা বলতে লাগল।

—ওমা, তাই নাকি। মণিদীপা শুনতে শুনতে অবাক, কি আশ্চর্য! আমারটিও যে তাই।

—হাতে রিভলবার নিয়ে কি মুখ চোখের ভঙ্গি। বলে হি হি করে হাসল শ্রীলেখা।

...াস্ত শয়তান হবে। হাসি ...া।

...না, হো হো করে হাসল ...র জিনিস দেখতে হবেত।

...র কথা অন্য রাস্তায় বাঁক নিতেই শ্রীলেখা ...কে তাকাল। টুম্বা, মান্টি তোমরা পাশের ঘরে ... খেল। ওরা তিনজন সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে খেলতে গেল। এদিকে তিনজন কল কল করে উঠল কথায়। কথায় কথায় বেশ কিছুটা সময় চলে গেলে শ্রীলেখা চা করতে গেল। বসে রইল মণিদীপা আর বিকাশ।

—আমরা কি এদের মত ছিলুম।

—কি রকম। বিকাশের দিকে তাকাল মণিদীপা।

টুম্বা আর ডাকুদের মত।

হি হি করে হাসল মণিদীপা। হাসি থামতেই চিৎকার শোনা গেল পাশের ঘরের। মান্টির গলা।

—মা মা, টুম্বা দাদা মরে গেছে।

হাসি থেমে গেল মণিদীপার। রান্নাঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল শ্রীলেখা। পাশের ঘরে উঁকি দিল। তারপর পায়ে পায়ে সবাই গিয়ে দাঁড়াল পাশের ঘরে। টুম্বা খুন হয়েছে, মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে। ঠিক একজন মৃত শিশুর মত।

তাকিয়ে বুকের ভেতরটা ধ্বক্ করে উঠল শ্রীলেখার। সামনে ডাকু। ওর হাতে টুম্বার রিভলবার। রিভলবারের গায়ে জিরো জিরো সেভেন।

মণিদীপা ডাকুর পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াল— ছিঃ টুম্বা তোমার ভাই হয়না।

—ওত এখন আমার শত্রু। ডাকু সাড়া সাপটা বলল কথাটা।

কথাটায় অল্প হাসল মণিদীপা। শ্রীলেখা সে হাসিতে যোগ দিল না। সে এগিয়ে গেল পড়ে থাকা টুম্বার দিকে। তারপর মেঝে থেকে আলতো তুলে আনলো টুম্বাকে। এবার টুম্বার মুখের দিকে তাকাতেই চমকে উঠল শ্রীলেখা। টুম্বার মুখে হিন্দি সিনেমার পরিচিত ভিলেনের ছবি। অবিকল।
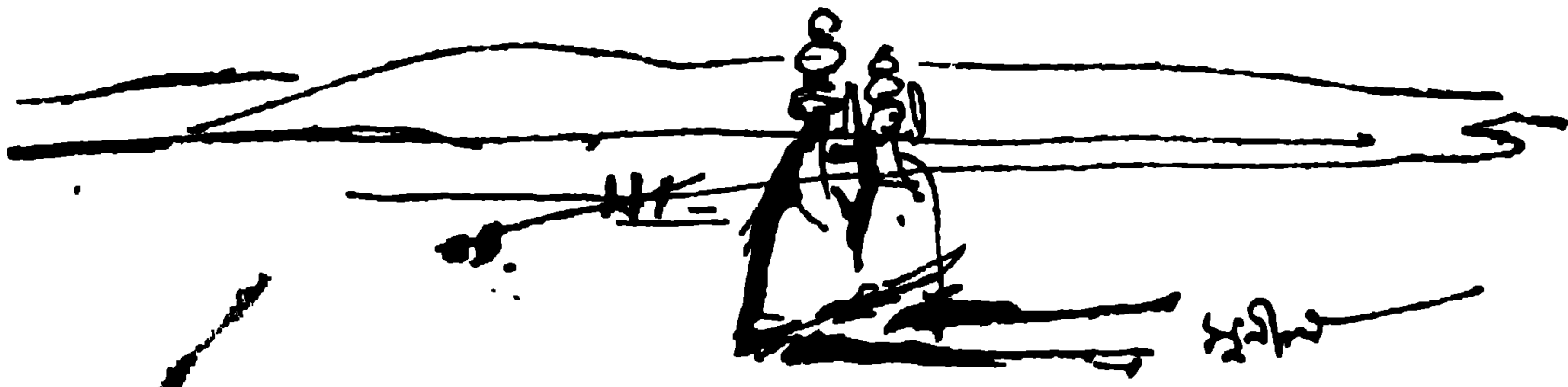
প্রসঙ্গ ঃ

O আজ "ত্রি... ...নার সম্পাদিত "গোধূলি-মন" (জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২/... ...। প্রাপ্তি স্বীকার করতে তাই এই দীর্ঘ চিঠি। ... ...নগর থেকে এরকম একটি উন্নত ধরণের মাসিক সাহিত্য ... এতদিন দৃষ্টির অলক্ষে ছিল! সম্পাদক মহাশয়কে প্রশংসা করতেই হবে।

এই সংখ্যায় : নিভা দের/নদী মাতৃক উপন্যাস, প্রবন্ধ, সোফিওর রহমানের কবিতার গুচ্ছ, শতক্রু মজুমদারের 'বেহুলা' গল্পটি সত্যি চমৎকার। শ্রীমজুমদার বর্তমান সমাজের দুষিত রূপটি তুলে সকলের প্রশংসা চেয়েছেন। এছাড়া কবিতা, সাহিত্য সমীক্ষা, সংবাদ, প্রচ্ছদ এক কথায় কোনটারই তুলনা করা কঠিন। নমস্কারান্তে—

মানব বিশ্বাস
শঙ্খনগর সাহিত্য সংসদ
বাঁশবেড়িয়া, হুগলী

সংবাদ

○ 'ত্রিসপ্তক' এর শহীদ তর্পণ

সম্প্রতি বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে আধুনিক কবিতায় গীতিকার ঋত্বিণ মিত্রের উদ্যোগে ফি বারের মতো এবারো ভাষা শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠান নির্বাপিত হল। অনুষ্ঠানে প্রধান কবি সমালোচক রানা বসু জানালেন এই ধরণের অনুষ্ঠানের যথার্থের কথা। সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন বসু তাঁর স্বাগত ভাষণে বললেন সেই সমস্ত প্রয়াত শহীদদের আত্মোৎসর্গের কথা-কাহিনী এবং একই সঙ্গে তিনি এও বললেন, সেই সময়ের ক্রান্তিকাল থেকে আজকের দশকে ভাষার উৎকর্ষতার তুলনামূলক ব্যাপকতা। উদ্বোধক ঋত্বিণ মিত্র ... স্থিত তামাম লিটিল ম্যাগাজিনিক মানুষজনদে... শহীদদের উৎসর্গাকৃত পথ ধরে আজকে ... ম্যাগাজিন করিয়েদের এগিয়ে আসতে বললেন ... পত্রিকার মাধ্যমে। উল্লেখযোগ্য উপস্থিতির ... সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুল কাইউম, শ্যামল মান্না, সন্দীপ দত্ত, স্বর্ণলতা ঘোষ (মিত্র) শৌনক বর্মন, ধীরাজ দে প্রমুখের কথা অন্তিমে প্রথমেই মনে আসে॥

○ তৃণাঙ্কুরের কবি সম্মেলন

বিগত ২রা জুন শ্যামনগরের ভারতচন্দ্র লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত হোল তৃণাঙ্কুরের কবি সম্মেলন। যদিও অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা ছিল দুপুর একটা থেকে। কিন্তু শেষমেষ অনুষ্ঠান শুরু হোল সাড়ে তিনটা নাগাদ। কবি অরুণ চক্রবর্তীর স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি দিয়ে। ঐ দিনের অনুষ্ঠানের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন— কৃষ্ণা বসু, সুনীল বসু, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, কৃষ্ণসাধন নন্দী, শ্যামলকান্তি মজুমদার, গৌরাঙ্গদেব চক্রবর্ত্তী, কল্যাণ মিত্র, কেশবরঞ্জন দে, অমল দাস, সনৎ মান্না, সমর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখাল বিশ্বাস ও অশোক চট্টোপাধ্যায়।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক নামে অনুষ্ঠানের সভাপতি থাকলেও অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন তৃণাঙ্কুর সম্পাদক কবি ... । অনুষ্ঠানের শেষে সভা- ... উল্লেখ করেন গৌরাঙ্গ ... সুনীল বসুকে ও প্রখ্যাত সঙ্গীত ... চার্যকে সুদৃশ্য ফুলদানী দিয়ে সম্বর্দ্ধনা ...। এ বছরের তৃণাঙ্কুর পুরস্কার পেলেন শ্যামলকান্তি মজুমদার। ... কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত ও কবি গৌরাঙ্গ ভৌমিকের কবিতা নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন কবি অধ্যাপিকা কৃষ্ণা বসু।

○ একটি কলাগাছে ন'টি মোচা

সম্প্রতি খুলনা জেলার শ্যামনগর উপজেলার বিড়ালাক্ষী গ্রামের মোঃ মজিবর রহমান সানার একটি কলাগাছে ৯টি মোচা ধরেছে।

এ ঘটনা এলাকায় ঐ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। শত শত লোক এটি দেখার জন্য প্রতিদিন ভীড় জমাচ্ছেন। এ খবর জানাচ্ছেন খুলনার দৈনিক অনির্বাণ পত্রিকা।

○ নিমাই সাধন বসুর সম্বর্দ্ধনা

১লা মে বিকেল ৫টায় হাওড়া মাতৃ আরাধনা সমিতির মণ্ডপে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও হাওড়ার কৃতি সন্তান ডঃ নিমাই সাধন বসুকে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। এই সম্বর্দ্ধনা সভার উদ্যোক্তা ছিলেন বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের হাওড়া জেলা শাখা ও হাওড়ার কয়েকটি পত্রিকা গোষ্ঠী—পারের খেয়া, নৈবেদ্য, আলেয়া, সাহিত্য বাণী, অভিনব অগ্রণী, অক্ষর, মাধ্যম, হাওড়া বার্তা, নীহারিকা, মধুকর, আলো ও অন্তরঙ্গ। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে নিমাইবাবু বলেন, বিশ্বভারতীর অঙ্গণে তিনি সর্বক্ষণ রবীন্দ্র সান্নিধ্য অনুভব করেন।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, ডঃ শিশির কর, ... মজুমদার, ডঃ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

○ সাহিত্য সংস্কৃতি ... বাসর

বিগত ১লা মে '৮৫ সাহিত্যবাণী ... আভাষচন্দ্র মজুমদারের শিবপুরের বাসভবনে ... সংস্কৃতি সম্মেলনের সাহিত্য বাসর অনুষ্ঠিত হোল। বুদ্ধদেব দাসের উদ্বোধন সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। হাওড়া জেলার বহু কবি/সাহিত্যিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ঐ দিনের অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে ডঃ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ সুদর্শন চক্রবর্তী। স্বাগত জানান সংস্থার সম্পাদক প্রবীর গোপাল মুখোপাধ্যায়।

○ প্রগতি সাহিত্য সংসদের সাহিত্য বাসর

সম্প্রতি বাগনানের গদীগ্রামে প্রগতি সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংস্থা এক সাহিত্য বাসরের আয়োজন করেছিলেন। কবিতা ও গল্পপাঠের ঐ দিনের অনুষ্ঠানে মাবুদ আলি, সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল মণ্ডল উল্লেখযোগ্য লেখা পড়েন। পঠিত লেখার ওপর সুন্দর ও মনোজ্ঞ আলোচনা করেন গল্পকার আফসার আমেদ ও পার্থ বসু।

○ সারাভারত গ্রামীণ সংবাদপত্র সম্মেলন

বিগত ৮ই ও ৯ই জুন বর্ধমানে অনুষ্ঠিত হোল সারাভারত গ্রামীণ সংবাদপত্র সম্মেলন। নামে সারাভারত হলেও শুধু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার কিছু প্রতিনিধি ও উড়িষ্যার কিছু প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। পত্র-পত্রিকা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বর্ধমানের জেলাশাসক এল, এস, আহুজা ও সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাপতি মহবুব জাহেদি।

শিল্পী ও সংস্থা সমূহকে সরকারী সাহায্য

জেলা তথ্য দপ্তরে হুগলী জেলার দুঃস্থ লোকশিল্পী ও সংস্থাগুলির কিছু সংখ্যককে সরকারী অনুদান দেওয়া হয়। হুগলী জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীশিবপ্রসাদ মুখার্জী এই অনুদান প্রদান করেন। সভায় অধ্যাপক নির্মল কুমার মুখোপাধ্যায় বক্তব্য রাখেন। যে সব শিল্পী ও সংস্থাগুলিকে অনুদান দেওয়া হয় তাঁরা হলেন বিনয় দাস, বলাই রুইদাস, কালিপদ দাস, রামপদ পাত্র, দুলাল রায়, শম্ভুচরণ রুইদাস, অনন্ত দাস বাউল, বাসুদেব মাল, হারাধন সাধুখাঁ, দমদমা আদিবাসি সংস্থা, আমোদপুর নেতাজী সংঘ এবং আদিবাসী সামাজিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংঘ।

পুস্তক সমীক্ষা

তিনজন কবি ঃ তিনটি সংকলন

উশীনর চট্টোপাধ্যায়

নির্মল বসাক, সোফিওর রহমান এবং ঈশিতা ভাদুড়ী—সাম্প্রতিক এই তিন কবির আলোচ্য কাব্যগ্রন্থত্রয়ের (ইন্দ্রানীকে/নির্মল বসাক/বিশ্বজ্ঞান, মুহূর্তের মানচিত্র/সোফিওর রহমান/বিশ্বজ্ঞান, শব্দে, রক্তে, আঙুলে/ঈশিতা ভাদুড়ী/সাংস্কৃতিক খবর প্রকাশনী।) বেশ কিছু কবিতাই ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন সাময়িক পত্রের পাতায় আমার নজরে এসেছে। তাই আমার কাছে অবশ্যই এগুলি সংকলন। এঁদের মধ্যে কবি হিসাবে নির্মল বসাকই প্রবীণ, এবং ইতিমধ্যে তাঁর আরো কয়েকটি সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে। নির্মলের কবিতার প্রধান যা অবলম্বন তা হোল এক ধরণের পি- নস্টালজিয়া, সাম্প্রতিক বাংলা কবিতাকে যা । তার সঙ্গে নির্মল মিশিয়ে দেন এক তন্ময়তা, যা তাঁর কবিতাকে আ বে হৃদয়ের গূঢ় একাকীত্ব এবং অন্তর-গত হয়ে যাননা। অস্তিত্বের অর্থহীনতায় তাঁর ভিত সক্রিয় হয়ে ওঠে, যা একটানে খুলে দেয় সভ্যত- , রঙচঙে চশমা। তাই যে নির্মল লেখেন, '…কিছু র ডন গুচ্ছ সবুজ শরীর থেকে রঙীন ঠোঁট নিয়ে হেসে যাচ্ছে মৃত্যু' এবং 'আমি সারাক্ষণ যাকে হারিয়ে এসেছি, তার কথাই ভাবছি' [পর্যটক] কিংবা "ছায়া পড়ে ছায়া বাড়ে ঢেকে যায় অন্ধকারে বন নদী সুনীল আকাশ/মেঘে মেঘে ছায়া বাড়ে নদীতীরে তবু সে আসেনা" [কী যেন আমার পাওয়ার কথা ছিল] সেই নির্মলই লেখেন 'ঘামে যে শিশুটি কেঁদে উঠেছে তার জন্য কি করেছ/শীতে যে শিশুটি পোষাক পায়নি যার মার বুকে দুধ নেই/……তার জন্য/আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে আমরা শুধু হাজার হাজার বাচ্চার ছবি আঁকলাম/শিল্প বোধহীন" [আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ ১৯৭৯] আসলে নির্মলের কবিতা যতটা খেয়ালী মনের পরিচায়ক, ততটাই সিরিয়স মনেরও। তাই তিনি আমাদের অপেক্ষাতুর রাখেন ভবিষ্যতের আরো কোনো পরিণামী অধ্যায়ের জন্য।

ইন্দ্রাণীকে

নির্মল বসাক

বিশ্বজ্ঞান

মুহূর্তের মানচিত্র

সোফিওর রহমান

বিশ্বজ্ঞান

সোফিওর কবিতা লিখছেন প্রায় এক দশক ধরে, এবং আলোচ্য সংকলনটি ছাড়াও প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আর একটি কাব্যগ্রন্থ। আমার মতে সোফিওর যথেষ্ট সময় সচেতন কবি, তবে এই সময় সচেতনতা কখনই বক্তব্য নির্ভর নয়, বরং নঙর্থক প্রগতির প্রতি তিনি ধিক্কারমুখর হয়ে ওঠেন। আবার এক ধরণের গূঢ় একাকীত্ববোধে কাতর হয়ে নিজেকে সবকিছু থেকে অনাত্মীয় মনে করেন তিনি, "চারদিকে প্রেতগ্রস্ত গহ্বরে ডাইনীর ঘন ফিসফাস" [কোনো পুণ্য নেই বলে] তবে এই অনাত্মীয়তা বোধ তাঁকে কোনো পলায়নী বাসনায় চালিত করেনা। বরং এক নিষ্ফল ক্রোধে তিনিও গুমরে ওঠেন, কে বলেছে রুক্ষ-ভূমির দুঃখ বুঝিনি ?/ শ্রাবণের আকাশ থেকে অঝোরে কেঁদেছি ফলে সারারাত/……কে বলেছে ভাঙা-ঘরে অসহ্য দহন ?/বুকের ব্যাটাম ভেঙে ছাউনি গেঁথেছি দুপুর রোদে।" [প্রিয় প্রশ্নের পর]। তবে শব্দ নির্বাচনে সোফিওর যতটা সিরিয়স কবিতার শরীর নির্মাণে সকল ক্ষেত্রে ততটা নয়। আমার মনে হয়, সোফিওরের মননের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে পয়ারের মেজাজ, অথচ তাঁর মজ্জি তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোমান্টিক ভাবালু- …নং ফলত প্রতীক বা চিত্রকল্পের হাতছানিতে ক্ষেত্রবিশেষে …ক বিস্তৃতি প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। তবু তাঁর সম্মুখ বিচরণ

শব্দে, রক্তে, আঙুলে

ঈশিতা ভাদুড়ী

সাংস্কৃতিক খবর প্রকাশনী

… কবিতাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে এক …র্ণ, যেখানে দেশ-কাল-পাত্রের প্রবেশের কোনো ছাড়… তিনি মিশিয়ে নিয়েছেন এক ধরণের কোমল রে… …ত… -বিস্মৃতির অনুষঙ্গে যে অনুভূতিকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন সে… কোনো পিছুটান নেই, নষ্টালজিয়া নেই, আছে এক নিবিড় আস্বাদন, যেন একাকীত্ব তাঁকে পরিপূর্ণ করে তোলে কিন্তু কোনো বিভ্রমের অনুভূতি জাগায় না, নঙর্থক অস্তিত্বে আকুল করেনা যেমন, নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে/উজ্জ্বল রঙ ভেসে আসে/নীলাম্বরী আঁচলে জড়ো হয় লাবণ্যতৃষ্ণা/এবং প্রেমের মধ্যে হারিয়ে যায় পুরোনো স্তব্ধতা/কারণ, বয়সের গূঢ় হিসাবের কাছে/লাল-হলুদ স্বপ্ন জমা আছে।" [বয়সের গূঢ় হিসাবের কাছে] আসলে সহজ-স্বচ্ছ এবং সর্বতোসুন্দর এক অনাবিল আনন্দময় মানবজীবনই তাঁর কাঙ্খিত। কিন্তু সেই আকাঙ্খার মনোভূমিতেই তাঁর বিচরণ এবং মনে হয় এই কল্পিত জীবনকে বহির্পরিচয়ে তিনি যতটা চেনেন, অন্তর্পরিচয়ে ততটা নয়। কিন্তু পরিপূর্ণ রমণী আঁকতে হলে কি তাঁর জড়ুলকে বাদ দিলে চলে ?

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

O চৈত্র সংখ্যা 'গোধূলিমন' পেলাম। প্রথমেই আপনার নিষ্ঠা এবং একাগ্রতার জন্য আপনাকে সাধুবাদ জানাই। এ সময় বড় কঠোর। কঠোরতম কাজ পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করে যাওয়া। সে কাজ আপনি সাবলীল এবং আন্তরিক নিষ্ঠায় পালন করছেন।

একটা পত্রিকার চরিত্র নির্ভর করে তার প্রবন্ধ বিভাগের বিশেষত্বের উপর। এ ব্যাপারে 'গোধূলিমন' অত্যন্ত দুর্বল। বন্ধু এবং একজন শুভানুধ্যায়ীর দৃষ্টিতে দেখলে বা বিচারে বসলে একথা না বলে পারা যায় না। প্রবন্ধগুলি যেগুলি প্রকাশনার জন্যে যাবে তা যে মতাবলম্বীই হোক তা ভালভাবে বিচার বিশ্লে... অপেক্ষা রাখে। অন্ততঃ প্রাবন্ধিক যে বিচারে... লিখছেন সে বিষয়ে তাঁর জ্ঞান এবং যুক্তির গ... অবশ্যই বিচার্য্য। না হলে তার দায় সম্পাদককে... করতেই হয়। আশা করবো সম্পাদক হিসাবে আপনি সম্পূর্ণ না হলেও বেশীর ভাগ অংশে একমত হবেন।

তা যদি হন তবে এ সংখ্যায় প্রকাশিত "নারী কেন বিপথগামী" প্রবন্ধটি আর একবার পড়ুন। এমন একপেশে কুযুক্তি (অযুক্তি ?) পূর্ণ এবং সমাজ সচেতনার অভাব এমন প্রবন্ধ কেমন করে প্রকাশ করলেন বুঝলাম না।

প্রবন্ধের শুরুতে অবশ্যই বেশ গাম্ভীর্য্য পূর্ণ বক্তব্য রয়েছে। আবার বিশ্লেষণী কায়দায় শ্রেণী বিভাগও করা হয়েছে। তারপর ?

আমরা যারা সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস একটু আধটু জেনেছি, তাতে পরিষ্কার ভাবে বুঝেছি ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের সাথে সাথেই নারী ও তার সমাজে গৌরব জনক অবস্থার থেকে নির্বাসিত হয়েছে। পুরুষশাসিত সমাজে নারীকে নানা রূপে অনুশাসনে আষ্ঠে-পৃষ্ঠে বাঁধা হয়েছে। এ ব্যাপারে মনুসংহিতার অবদান অত্যন্ত ঘৃণ্য। পুরুষ তার বিলাস-ব্যাসনের অন্যান্য সামগ্রীর মত নারীকেও ব্যবহার করেছে। এর ... মহাভারত নামক মহাকাব্য গ্রন্থের ... আছে। 'সতীত্ব', 'নারীত্ব' ... আবরণে নারীকে মোহাবিষ্ট ... নয় স্মরণাতীত কাল হতে পুরুষ ... ও ব্যক্তিক প্রয়োজনে নারীকে বহুভাবে ... করেছে। এতো গেল একটা দিক, নানা গ্রন্থ ...রাণিক কাহিনীর অবতারণা এ প্রসঙ্গে করা যায়। কিন্তু বিসমিল্লায় গলদ।

ভদ্রমহিলা বিশ্লেষণের ধার ধারেননি। উনি পরস্পর বিরোধী বক্তব্যে মেয়ে মাত্রই বিশেষ করে যারা চাকুরীজীবী তাদের চরিত্রে কলঙ্কলেপন করেছেন। পি. এ. ও রিসেপসানিষ্ট ইত্যাদিতে যাঁরা চাকরী করেন এমত মহিলাদের। এদের কাজ 'বস্'-দের মনোরঞ্জন এবং অন্যান্য অসামাজিক কাজেও অংশ গ্রহণ করা। এমত দুর্বল কদর্য্য যুক্তিজালে লেখাটি পূর্ণ।

ওনার মতে হিন্দী ফিল্ম এজন্য অন্যতম দায়ী। ওনার মতে রবীন্দ্র সদন মহাজাতি সদন ইত্যাদি

প্রেক্ষাগৃহে অপসংস্কৃতি মূলক অনুষ্ঠান হতে না দেওয়া। উনি কোথা থেকে জানলেন মহাজাতি সদন একমাত্র মহিলাদের জন্য। আশ্চর্য্য অজ্ঞতাজনিত স্পর্দ্ধা এবং তা ছাপাও হয়। শেষ কথা—উনি ক্ষমতাসীন সরকার কেও এ ব্যাপারে অর্থাৎ নারীদের অধঃপতন থেকে রোখার জন্য আহবান জানিয়েছেন। অথচ আমরা জানি, শাসক গোষ্ঠীর সক্রিয় মদত পুষ্ট হয়েই অপ-সংস্কৃতি ক্রমবর্দ্ধমান। রাস্তায় পর্ণগ্রাফির সচিত্র সম্ভার ঢেলে বিক্রী হচ্ছে। অথচ অপসংস্কৃতি বিরোধী শ্লোগান আজ গগন বিদীর্ণ করছে।

অপসংস্কৃতির সঠিক অর্থই বোধ হয় আমরা জানি না। মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করাই অপসংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত। নগ্নতা শুধুমাত্র অপসংস্কৃতি নয়, সং-জীবনমুখী শিল্পের প্রয়োজনে নগ্নতা আসতেও পারে, কিন্তু শেষ বিচারে তার প্র[illegible]

ভদ্রমহিলাকে আমার [illegible] বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করুন। [illegible] দিয়ে বিশ্লেষণ করুন। মেয়ে হয়ে মে[illegible] এমত লেখার আগে বুঝুন, সমস্ত প্রতিক্রিয়া[illegible] গেছে সমাজকাঠামোর গভীরে। একে [illegible] করে উপরিকাঠামোকে শুধুমাত্র চক্‌চকেই করা যা[illegible] দুর্গন্ধ চাপা যায় না। নারীবর্ষ-নারীস্বাধীনতা নামক গালভরা কথায় আজও বধূনির্য্যাতনের বলি চলছেই। মেয়েদের পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখার অভ্যাস অর্জন এখনও আমাদের বাবা-দাদা-ভায়েরা পাননি। একদিনে এমত সমাজ ব্যবস্থায় তা সম্ভবও নয়। তা সত্বেও বলবো আমাদের ঘরের ভায়েরা তাদের বিবেক সম্পূর্ণ বিসর্জন দেননি, তাই আমাদের মত মেয়েরা রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করি। চাকরি করে পরিবারের ভরণ-পোষণ করি। এমন মেয়ে আমাদের জানা অনেক আছেন, যাঁরা সংসারের চাপে ব্যক্তিগত সুখ-সাধ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে সংসারের মুখে হাসি ফোটাচ্ছেন।

অতএব লেখিকাকে অনুরোধ এমত লেখণী এবং এমন মন্তব্য না করে আশেপাশে চোখ মেলে দেখুন। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস পড়ুন।

আশাকরি আমার সমালোচনার মূল্য দেবেন। আমার সময় অত্যন্ত কম। দেখা করে 'উত্তর প্রবাসী' পুরস্কারের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে আসার ইচ্ছা ছিল। চিঠিতেই জানাচ্ছি, দীর্ঘদিন অসুস্থতার পর এখন সামান্য ভাল আছি। শুভেচ্ছাসহ—

মায়া দাশগুপ্তা
নবগ্রাম, সি ব্লক, হুগলী

O O O O

O তোমার পুরস্কার প্রাপ্তির পর একটা সৌজন্য[illegible]ক চিঠি দেওয়া উচিত ছিলো, দিইনি, কারণ [illegible]ার যে কোনও পুরস্কারকে আমরা নিজেদের [illegible]ার বলে মনে করি, তাই নিজের প্রশংসা নিজে [illegible] করে করি। ইদানীং যে তিনটি সংখ্যা পেলাম তাতে মনে হল সম্পাদক হিসেবে তুমি আগের থেকে অনেক বেশী সচেতন ও সাহসী হয়ে উঠেছ। একজন লিটিল ম্যাগের সম্পাদকের এই গুণটি থাকা দরকার। আমি নিজে কাগজ করি বলেই কথাটা বললাম। যদিও ছোট কাগজ করতে গেলে লেখা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে কতকগুলি অনিবার্য অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয় তা আমারও অজানা নয়। তাই মাঝেমধ্যে গোধুলি মনে যে সব গল্প/কবিতা/প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকা-শিত হয় সেগুলি অনেক সময় পত্রিকার মানের উপ-যোগী হয় না। তুমি সম্পাদক হিসেবে ভাগ্যবান, যে শ্রীঅজিত রায়ের মত একজন নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী

প্রাবন্ধিকের সন্ধান পেয়েছ। তবে তারাশংকরের উপন্যাসের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে লেখাটি আরও বেশী বিশ্লেষণ দাবি করে সেজন্য এটি 'ধারাবাহিক' হলে ভালো হত। শ্রীরায়কে সবিনয়ে জানাই যে, বাংলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত কোনও সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাস লেখা হয়নি (এটা আমার মতে)। মহাশ্বেতা দেবীর মত লেখিকাও পারেন নি, কারণ সমগ্র ভারতবর্ষের সামগ্রিক রাজনৈতিক চিত্র তথা সমগ্র জনগণের এবং সরকারের (বিশেষত বুর্জোয়া সরকারের) মধ্যে যে শ্রেণী দ্বন্দ্ব তা কোনও লেখাতেই প্রকাশ পায়নি। যা লেখা হয়েছে তা এক খণ্ড প্রকাশ মাত্র, সার্বজনীনতা কম। 'গঙ্গা'; 'যুগ যুগ জীয়ে'; বি, টি, রোডের ধারে (সমরেশ বসু) 'অজ্ঞাত বাস' (শৈবাল মিত্র), 'কালবেলা' (সমরেশ মজুমদার), অরণ্যের অধিকার, বা 'হাজার চুরাশীর মা' (মহাশ্বেতা দেবী) 'পথের দাবী' (শরৎচন্দ্র) 'গোরা' (রবীন্দ্রনাথ), 'আনন্দমঠ' (বঙ্কিম) প্রভৃতি উপন্যাসগুলি একটিও সেই পর্যায়ে পড়ে না। তারাশংকরের ক্ষেত্রেও কথা প্রযোজ্য। মূল বিষয়বস্তু থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে নারী-পুরুষের মানসিক বিশ্লেষণ মূর্ত উঠেছে। এমন কি মার্কসবাদী বলে কথিত লেখক... এর ব্যতিক্রম নন।

গল্পের ক্ষেত্রে তুমি অতীশ দেবব্রত (চট্টোপাধ্যায়যুগল) গৌর বৈরাগী, শতদ্রু মজুমদার, আশিসদা প্রভৃতিদের তেমনভাবে কাজে লাগাচ্ছ না কেন? অমল হালদার এখনও ততটা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেন নি। পারবেন। সনৎ মান্না কি পদ্য লেখা ছেড়ে দিল?

সোফিওর রহমানের লেখার জন্য কিছু কিছু সাহিত্য কর্মী তোমার প্রতি রুষ্ট। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মনে করি লেখাটি খুবই সার্থক। বর্তমানে যাঁরা নতুন লিখছেন বা কিছুটা পক্ক হয়েছেন তাঁরা একে অপরের প্রতি কি রকম মনোভাব পোষণ করেন তার প্রমান আমিও পাই। আনন্দবাজারের বদান্যতায় যাদের দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু কলমও জাতে উঠে যায়, তাদের দেখেছি কোন কোন সভায় অন্যের লেখার আলোচনার সময় 'দেশ' থেকে নিজের পদ্য পড়ে শুনিয়ে বলতে পারেন— 'পদ্যের শব্দ প্রয়োগ এই রকম হবে'। অথচ সেই কবির সম্ভবত ৪টি পদ্য দেশে ছাপা হয়েছে। তাও কিছু আগমার্কা গণেশ তৈল্যের কল্যাণে। কেউ যদি সেই কবির নাম জানতে চান জানাতে পারি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের টেবিলের সামনে বসে আমি কখনও গল্প করিনি। শুনেছি তিনি নাকি 'দেশ'-এর একজন মাথা, পদ্যটদ্য নির্বাচনে তাঁর ভূমিকা একটা থাকে। উদাহরণ দিই একটা: দীপক করের একই [illegible] ...রুয়ারী, ১৯৮৪ সংখ্যায় ছাপা হল ...রে'— এই টাইটেলে আবার ...আগে 'দেশ'-এ ছাপা হয়েছে ..., ১৯৮৩ সংখ্যায়— 'দু'চোখ নিংড়ে ...র ঋণপত্র'-এই নামে। কবি এবং কবিতা ...স্তু 'টাইটেল' ভিন্ন। এখানে কার সততা সম্প... সন্দেহ করব? কবির না নির্বাচকের? পরিচিত 'মুখ' হলেই তাদের লেখা 'দাদা'রা চোখবুজে চালিয়ে দেবেন? কারণ সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী সময়টা কম নয়। কবির payment-ও পেয়ে যাওয়ার কথা। তাহলে? যাঁরা নিজেদের একনিষ্ঠ সাহিত্য কর্মী হিসেবে মনে করেন, তাঁরা কেউ প্রতিবাদত করেন নি? দীপক করের কি কোনও বন্ধু নেই? তাঁরাও নিশ্চয়ই মেনে নিয়েছেন। আসলে এসব নতুন নয়, অনেক কাল আগের ট্রাডিশন।

চৈত্র, ৯১ সংখ্যায় নিবেদিতা ভৌমিকের লেখা পড়তে পড়তে অধিকাংশক্ষেত্রে মনে হল যেন সঠিক

অভিজ্ঞতাহীন কোনও মহিলা গোষ্ঠীর দ্বিতীয় শ্রেণীর নেত্রীর তাৎক্ষণিক বক্তৃতা যা কেবলমাত্র আবেগ তাড়িত। একটি জটিল বিষয়বস্তুকে তিনি বিচক্ষণ-তার সঙ্গে তথ্য সমৃদ্ধ ভাবে উপস্থাপিত করতে ব্যর্থ। শহরের উচ্চবিত্ত 'ললিপপ' নারীদের বিপথগামীতা নিয়ে তিনি বড় বেশী উচ্ছ্বসিত। অথচ আজকের দিনে সেটা কোনও কঠিন সমস্যা নয়, কারণ তাদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ। পাশ্চাত্য সভ্যতার ঘেরাটোপে তারা স্বেচ্ছাবন্দিনী তাই স্বেচ্ছাচারী। যদিও তারা সংক্রামক। তাদের 'ভাইরাস' অন্য নারীদেরও অসুস্থ করে তুলছে কালক্রমে। কিন্তু যখন দেখি কোন সাঁওতালী রমণী 'এয়ার হোস্টেস' ব্লাউজ পরে শ্রীদেবীর ষ্টাইলে নাচে তখন আমাদের সংস্কৃতির খুঁটি আঁকড়ে ধরতে হয় অত্যন্ত ব্যাথাতুর ভাবে। আজকের দিনে নারীদের বিপথে যাওয়ার যে কারণগুলি প্রধান তারমধ্যে অন্যতম (১) প্রকট অর্থনৈতিক বৈষম্য (২) বুর্জোয়া মাস-মিডিয়ার।
হ্যাঁ, আমি সেই শতকরা
মধ্যবিত্ত নারীদের কথাই বল
এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজ কাঠামোর ঘৃণ্য।
তাদের মধ্যে আছে-প্রেম, স্নেহ, প্রীতি। তা
কন্যা, জায়া ও জননী। তাদের নেই শুধু
পর্যাপ্ত ভাতের গন্ধ। সর্বকালে, সবদেশে নারীদের বিপথে নামিয়েছে পুরুষ, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ-ভাবে। কারণ, প্রত্যেক নারীর মধ্যেই নিহিত থাকে একটা সুস্থ সংসারের স্বপ্ন। নাহলে আমাদের দেশের মেয়ে বিদেশের বাজারে পণ্য হয় কি করে? এর ওপর আছে রামছাগলের মত উর্বর মস্তিষ্ক সম্পন্ন রাজনৈতিক নেতাদের লোভের ছুরির আঁচড়ে দেশ বিভাগ। আসলে এইসব নারীদের যতদিন না সুস্থ রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ করা যাচ্ছে, ততদিন এ সমস্যা থেকে মুক্তি নেই। নিবেদিতা দেবী, প্রবন্ধ সব সময় তথ্য নির্ভর হওয়া বাঞ্ছনীয় আবেগ সেখানে গৌন। সব শেষে বলি— 'দারিদ্রতা' না 'দারিদ্র' কোন শব্দ সঠিক?

অমল হালদারের প্রবন্ধ 'সাহিত্য লেখার কলা কৌশল' প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে তিনি আলবেয়ার কাম্যুর কিছু তরুণকে লেখক হবার কলাকৌশল শেখানোর কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন— সাহিত্যের কলাকৌশল শেখান যায় না। আপেক্ষিক ভাবে সত্যি। তবু একটা তথ্য জানাই। মঁপাসা একবার ফ্লবেয়ারের কাছে ১৮/২০ বছর বয়সে হাজির হয়ে বলেছিলেন— ফ্লবেয়ারের কাছে থেকে তিনি লেখক হতে চান। ব্যক্তিগত ভাবে ফ্লবেয়ার ছিলেন একটু দাম্ভিক প্রকৃতির। তিনি বলেছিলেন—'লেখক হবে? এতো সোজা? যাও, এই বইটা মুখস্ত করে আসবে বলে একটি বেশ মোটা বই ছুঁড়ে দিয়ে নিজের কাজে মগ্ন হয়ে পড়েন। মঁপাসা কিন্তু পরের দিন সকালেই হাজির হয়েছিলেন বইটি মুখস্ত করে। তখন ফ্লবেয়ার অবাক হয়ে দেখেছিলেন যে, তিনি ঝোঁকের মাথায় যে বইটি ছুঁড়ে দিয়েছিলেন তা ছিলো একটা ডিক্সিনারী। সেই থেকে মঁপাসা ফ্লবেয়ারের ছাত্র হয়ে যান।

প্রীতি সহ

অরুণ সরকার
যুগসন্ধানী
খামারচণ্ডী, হরিপাল, হুগলী

O O O O

O আপনার পাঠানো পত্রিকা 'গোধূলি-মন' পেয়েছি। বর্তমান লিটল ম্যাগাজিন যত প্রকাশিত হচ্ছে তারমধ্যে এর আলাদা স্থান এবং মূল্যায়নও কম নয়। আপনার সম্পাদনাকেও তারিফ করতে হয়। হাজার মাইল দূরে আমরা থাকি। এখান থেকে নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশনা করা খুবই। অসুবিধা বিশেষ করে এ জায়গায় বাংলা হরফের ছাপাখানা নেই, নির্ভর করে থাকতে হয় কলকাতার ওপর।

শিবব্রত দেওয়ানজী
Qr. No. 18/B Street-1
Sector-I Bhelai-49001
M. P.

O প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন O

O 'গোধূলি-মন' চৈত্র ও বৈশাখ সংখ্যা পেয়েছি। খুব মন দিয়ে পড়ি। প্রথম থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত। চট্‌করে ফুরিয়ে যায়। তখন আফসোস থেকে যায়। চৈত্র সংখ্যায় 'চিত্রকল্প' কবিতাটি বেশ ভাল লেগেছে। আর সাহিত্য লেখার কলা কৌশল (অমল হালদার) আলোচনাটি সাহিত্যের টেকনিক ও ষ্টাইল সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী আলোচনা। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লিখছি, 'নারী কেন বিপথগামী' লেখাটি খুবই হাল্কা যুক্তি ও তত্ত্বের উপর লেখা একটি আলোচনা। লেখাটি সনাতনপন্থী কোন ধর্মীয় মুখপত্রের উপযুক্ত, গোধূলি মনে এধরণের লেখা যেন পত্রিকার ভারসাম্য রক্ষার পরিপন্থী। প্রবন্ধের বিষয়বস্তুটি আলোচনার যোগ্য— এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন অবান্তর। তবে আলোচনা আরো যুক্তিপূর্ণ হওয়া উচিত। কেন এই সনাতন প্রথায় ভাঙ্গন ? এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আধুনিক দুনিয়ায় বিজ্ঞানের বৈষয়িক উন্নতি এবং তার সুফল কুফল ভোগ রে সমাজের পুরাতন মানসিকতা কতটুকু ধরে রাখা সম্ভব তা যুক্তির কষ্টি পাথরে যাচাই করা প্রয়োজন। 'প্রগ' বলে গালি দিয়ে অন্য একদল নারীকে বিমুখ করা যাবে না। আন্তর্জাতিক শিল্প ও বাণিজ্যের বাবসায়িক প্রভাব আজ ব্যক্তি মানসে কি দুর্জয় প্রভাব বিস্তার করছে। সে সর্বগ্রাসী রাহুর কবল থেকে মুক্তির উপায় কি ? এবং তার কতটুকু সম্ভাবনা আছে অর্থনৈতিক উপনিবেশগুলিতে। এসব অনেক কিছুর আলোচনা দরকার। আর শুধু নারীই কেন বিপথগামী, --বিপথগামীতো পুরুষেই ক তাঁদের স্বার্থে বিপথ দেখায়। এ শুধু প্রাচ্যেই নয়, পাশ্চাত্য দুনিয়াতেও।

বৈশাখ সংখ্যার কাব্য (সম্পাদকীয়) কি সুন্দর। অজিত রায়ের রামপ্রসাদের পুথির পরিচয় পড়ে খুবই ভাল লেগেছে। পুথির উ হপূর্ণ। মূলপুথিটি পড়ার জন্য আগ্রহ জাগে।

অমৃতেন্দু চৌধুরীর কবিতা আলোচনার মাধ্যমে নতুন কবিদের পরিচয় পড়ে ভাল লেগেছে। প্রবাসে বসে এই ধরণের আলোচনা পড়ার লাভ আছে। নতুন কবিদের সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরী করতে সহজ হয়।

২৫শে বৈশাখ, একটি খসড়া, প্রেমসম্বন্ধে এবং প্রতীক্ষা, এই কবিতাগুলি এ সংখ্যায় আকর্ষণীয়।

সবশেষে কৃতজ্ঞতা বশতঃ আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যাঁরা বইমেলা সংখ্যায় আমার লেখা 'জারোস্লাভ সাইফার্ট' আলোচনাটি পড়ে আপনার মাধ্যমে প্রশংসা পত্র পাঠিয়েছেন। গোধূলি মনের দীর্ঘায়ু কামনা করি। আপনারা আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

গজেন্দ্রকুমার ঘোষ
উত্তর প্রবাসী, বক্স-২০৬১, সুর্টে সুইডেন

MEMBER { All India Small & Medium News Paper Asscciation, Delhi.
Little Magazine Editors Association, Calcutta
Hooghly Dist. Patra Patrika Somity, Hooghly.

Member all India Small & Medium News Paper Association, Delhi.
GODHULI-MONE N. P. Regd. No. RN. 27214/75 June '85 আষাঢ় (১৩৯২
Vol. 27, No. 6 Postal Regd. No. Hys-14 Price—Rs. 2·00 only
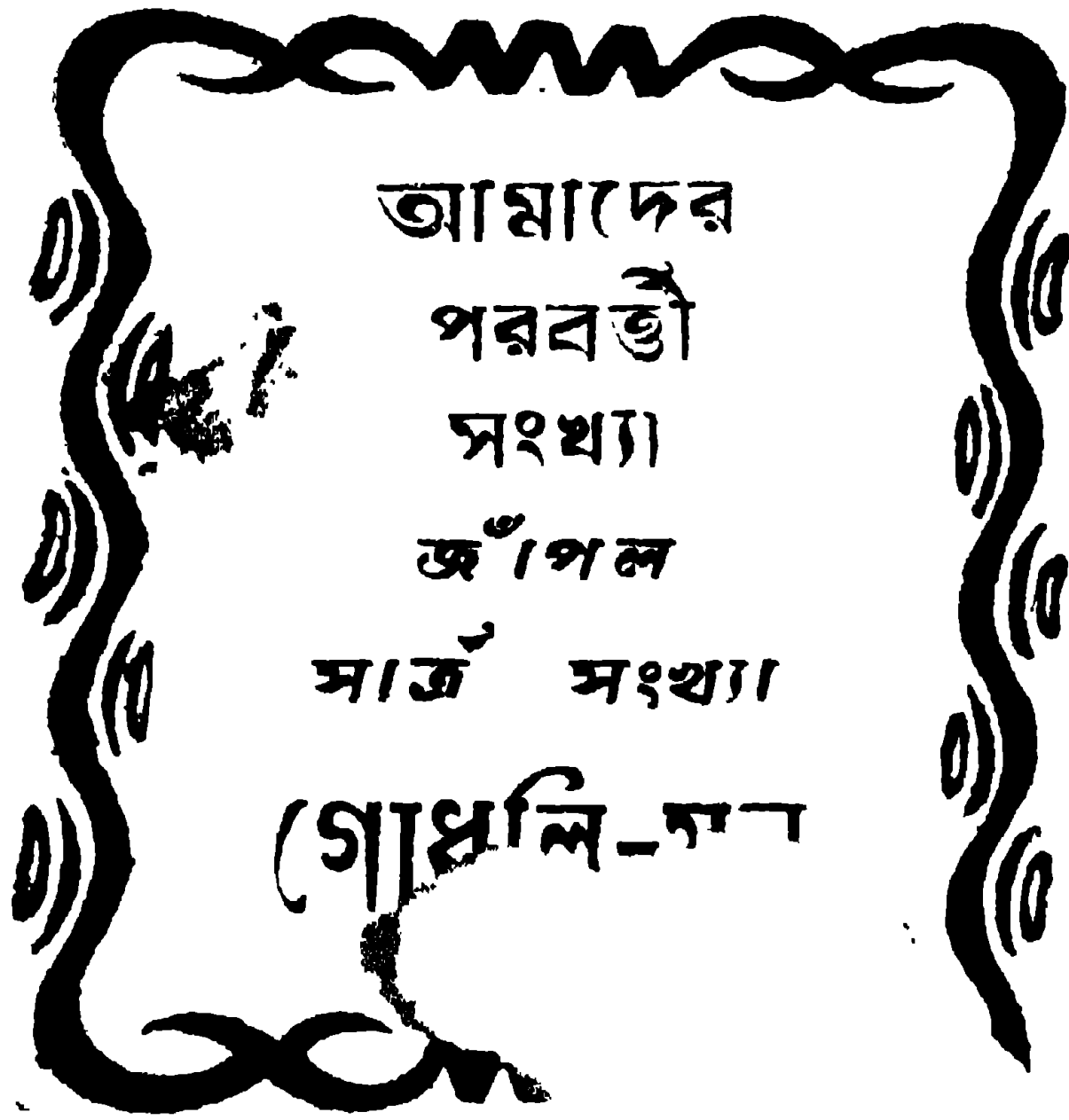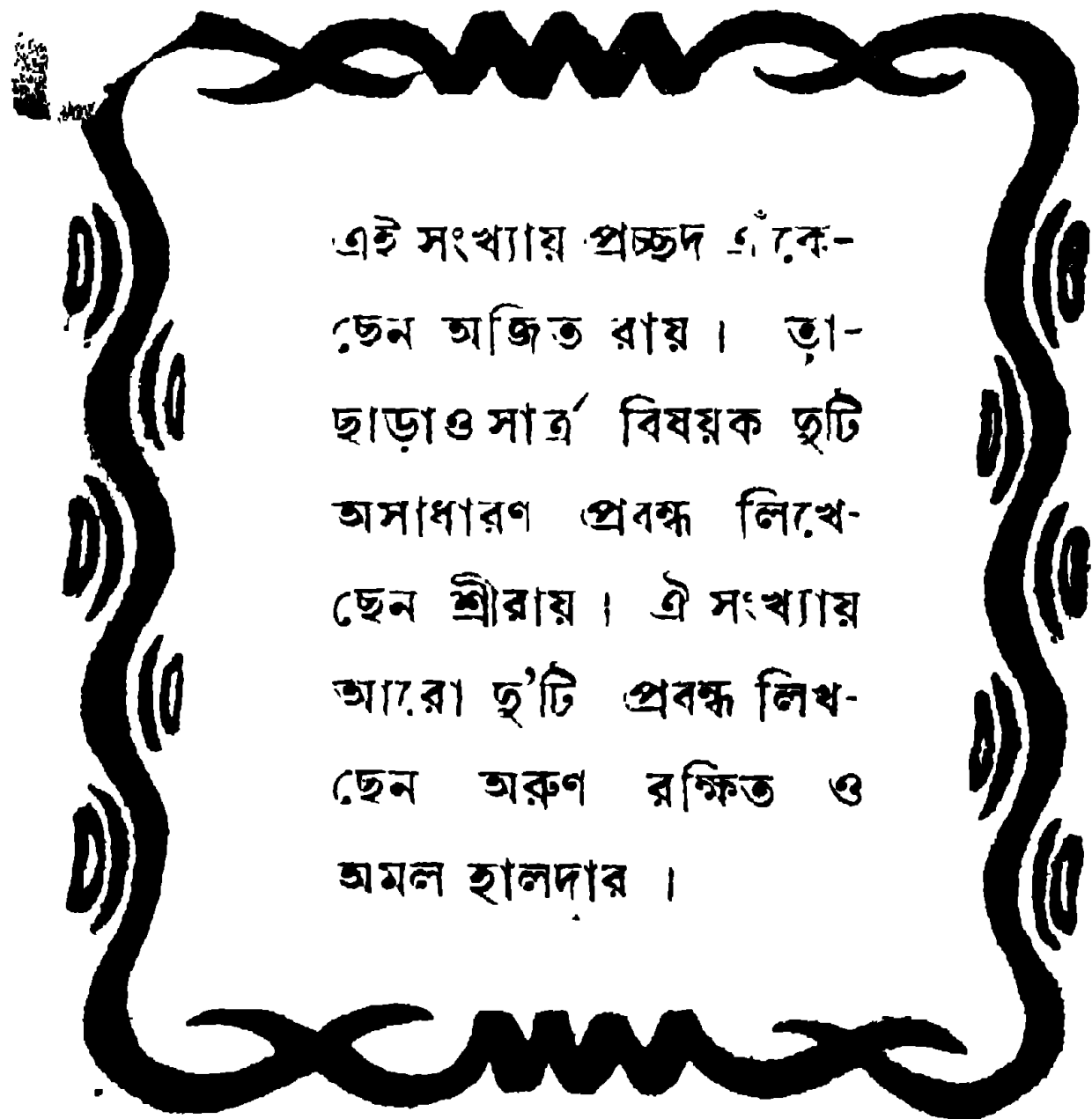
আমাদের
পরবর্তী
সংখ্যা
জ্যাপল
সার্ত্র সংখ্যা
গোধূলি-মন

প্রকা[illegible] শ্রাবণ মাসে

এই সংখ্যায় প্রচ্ছদ এঁকে-
ছেন অজিত রায়। তা-
ছাড়াও সার্ত্র বিষয়ক ছুটি
অসাধারণ প্রবন্ধ লিখে-
ছেন শ্রীরায়। ঐ সংখ্যায়
আরো ছু'টি প্রবন্ধ লিখ-
ছেন অরুণ রক্ষিত ও
অমল হালদার।

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পপুলার প্রিন্টার্স, বারাসত, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও নতুনপাড়া, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

গোধূলি মন

জাঁ পল সার্ত্র

স্মৃতি সংখ্যা

শ্রাবণ ১৩৯৫ সংখ্যা

Sartre : উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী

দর্শন : L' Imagination, 1936
L' Imaginaine. 1940
L' Etreet le neánt, 1943
L' Existentialisme est un humainsme, 1945
Esquisse d'une theórie des emotions, 1947

উপন্যাস ও গল্প : La Nauseé (38) ; Le Mur (39) (গল্প)
Les chemins de la liberté (চার খণ্ড) (বিভিন্ন সময়ে)

নাটক : Les Mouches (42) Huis Clos (44) La Putain Respectueuse (46) Morts Sans śepulture (47) Les Mains Sales (48) Le Diable at le bon Dieu (51) Nekrassov (53) Les Sequesties d'altona (59)

সমালোচনা : Baudelaire (47) Reflexions sur la question Juive (47)

Situations I, II, III, IV, V. VI, VII (বিভিন্ন সময়ে)

O প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন O

O আপনার পত্রিকা প্রত্যেক মাসে নিয়মিত পাচ্ছি তৎসহ আপনার প্রতি শ্রদ্ধাও প্রত্যেকদিন বেড়ে চলেছে কারণ একটাই, আজকাল তো কেউ নতুনদের আপনার মতন এরকম একটা বহুল প্রচারিত পত্রিকায় আশ্রয় দিতে কোন মতেই চায়না। পাঠক-গণ হয়ত আমার এই চিঠি পাঠ করে ভাববেন ফাল্গুন এবং আষাঢ় মাসে আমার স্থান হয়েছে 'গোধূলি-মন'-এর পাতায় তার জন্যই এত বিনয় প্রকাশ। সেই ভ বুক পাঠকগণ আমার এই তথাকথিত (তাঁদের চিন্তাধারায়) বিনয় প্রকাশকে মার্জ্জনা করবেন। একটা কথা আমার বিবেকের কাছে সত্য শ্রীযুক্ত অশোক চট্টো-পাধ্যায় মহাশয় যথার্থ অর্থে মানুষ। আপনার একটা অটোগ্রাফ সহ ফটোচাই আর তৎসহ ফাল্গুন, জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ়ের প্রত্যেকটি চার কপি করে। শ্রীযুক্ত অজিত বাইরী মহাশয়কে আমার প্রণাম জানাবেন। দেশ পত্রিকায় ওনার লেখা পড়লাম। আমার সবশেষ অনুরোধ কোন্নগর, হুগলী-র স্বনামধন্য কবি শ্রীনীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী নিয়ে আলোকপাত করুন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান অনেক ওনাকে আমার প্রণাম জানাবেন॥

শুদ্ধসত্ত্ব গুহ
রেলওয়ে মেস, কাটিহার (বিহার)

● একটি অনুষ্ঠান সংবাদ

'গোধূলি-মন' শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা আয়োজিত প্রতিযোগীতায় ১৯৮৪ সালের শারদ সংখ্যার প্রচ্ছদের জন্য সারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত হয়েছে। আগামী ৬ই আগস্ট শিশির মঞ্চে এক অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রভাস ফদিকার মহাশয় পুরস্কার বিতরণ করবেন।

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি মন

২৭ বর্ষ/৭ম সংখ্যা
জুলাই ১৯৮৫
শ্রাবণ/১৩৯২
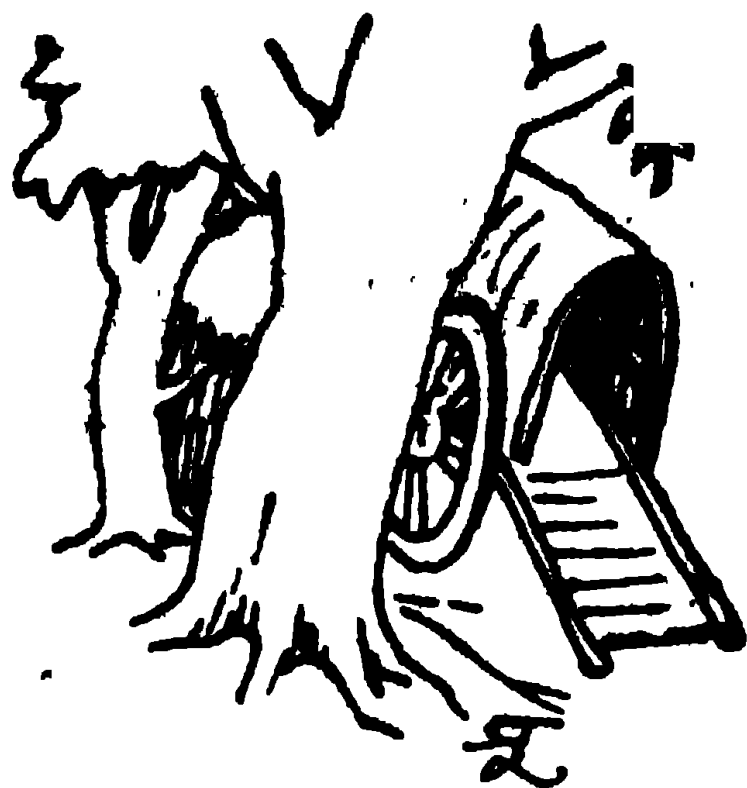
প্রতি সংখ্যা দুই টাকা
বার্ষিক সডাক কুড়ি টাকা

তোমার মনীষা নিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ তুমি/

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

তোমার মনীষা নিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ তুমি জল আগুন ফুলের সংসারে·

অসংখ্য বৃক্ষের মতো মানুষেরা মধ্যরাতে অক্সিজেন নিয়ে
জীবন দর্শন খুঁজে ঃ পোড়া রুটি হলুদ পৃথিবী
রক্ত মাখা মুখগুলি এঁকে রাখে প্রতিদিন পণ্ডিতি পেন্সিলে।
সাদা কাগজের পৃষ্ঠা ধরে রাখে এক একটি নিপুণ স্কেচ
মেধার আতস আলো বোধ ও বোধির মধ্যে
শুরু করে বিশ্লেষণ— জীবনের গূঢ় সমীক্ষায়।

চাঁদ ভেঙে দশটুকরো বহমান নদীটির জলে
হাওয়ায় দুলছে সেতু, নিরুপম ভাস্কর্যের আশ্চর্য প্যাভেল
শুদ্ধতম জীবনের বিতর্কিত তুমি বারান্দায়
দ্যুতির দ্যোতনা দিয়ে ভেদ করো কুয়াশা রহস্য আর জটিল যন্ত্রণা।

এখনো গজিয়ে ওঠা তর্কের টেবিলে শুনি সূত্রগুলি ঝিকিমিকি করে

বারুদের গন্ধ পেয়ে খসে যায় এক একটি মলাট
তোমার দর্শণে তুমি দার্শনিক স্থির সিদ্ধান্তের চাবিকাঠি
দরজা গুলো খুলে যায়, আমাদের প্রত্যেকের চতুষ্কোণ ঘরে
এক বুক হাওয়া ঢুকে আর্দ্র মুখে স্পর্শ রেখে যায়।

তোমার মনীষা নিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ তুমি শতাব্দীর নীল কুয়াশায়।

অশোক চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক

সম্পাদকীয় কার্যালয় । নতুনপাড়া । চন্দননগর । হুগলী । পশ্চিমবঙ্গ । ভারত

সাহিত্য, দর্শন, জাঁ পল সার্ত্র এবং কিছু সবিনীত প্রশ্ন
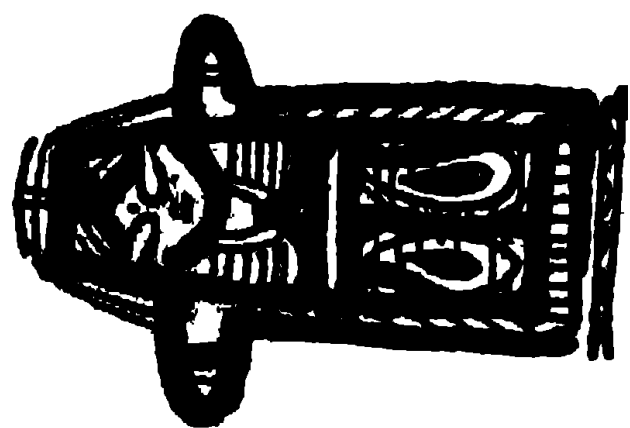
অজিত রায়

অনৈক ভারতবর্ষীয় লেখক সত্তর দশকের গোড়ার দিকে ফ্রান্স সফর থেকে ফিরে এসে লিখেছিলেন : 'প্যারিসে আমি কোনো শহর দেখিনি, দেখেছি ব্যক্তিকে — ব্যক্তি নয়, দেখেছি একটি সম্পূর্ণ দর্শনকে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এঁটে বসা বুর্জোয়া জীবনকে ঝাঁটা মারার বাসনা আমি সেখানে প্রত্যক্ষ করেছি।'

কোন্ ব্যক্তিটিকে দেখে এই উক্তি? আমরা তো জানি ফরাসী দেশে সেই সময় সবচেয়ে উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল জাঁ পল সার্ত্র'র। তাঁকে দেখেই নিশ্চয় এই মন্তব্য। সার্ত্র ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই এক বোধ-উজ্জ্বল পুরুষ। বস্তুত, উত্তর-সামরিক যুগে বিশ্বের সাহিত্য ও দর্শনক্ষেত্রে যেসব বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী, জাঁ পল সার্ত্র'র আসন ছিল তাঁদের সকলের শীর্ষে। অধিকন্তু এ-মন্তব্য সার্ত্র'র ক্ষেত্রে অত্যুক্তি নয় যে তিনি জীবদ্দশাতেই 'ব্যক্তি'র সীমা পেরিয়ে 'মিথ' হয়ে উঠেছিলেন। এই মিথ সেইসব কর্মকাণ্ডের দরুণ, যেগুলির ফলসমষ্টিতে সার্ত্র আগাগোড়া 'খবর' হয়ে থেকেছেন এবং দ্বিতীয় মহাসমরের পরের দু-তিন দশকে সাহিত্য, রাজনীতি ও জীবন নিয়ে যত আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে সমস্ত-কিছুর কেন্দ্রভূমিতে অবস্থান করেছেন। ভাষান্তরে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগে সার্ত্র ছিলেন এমন গগনচুম্বী ব্যক্তিত্বের অধিকারী, যিনি বিশ্বের তাবৎ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, মতামত দিয়েছেন, বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, মূল্যায়ন করেছেন, ক্রুদ্ধ হয়েছেন, বর্জন করেছেন এবং বুদ্ধিজীবী মহলে অনুক্ষণ বিতর্কের ঝড় তুলতে সক্ষম হয়েছেন। ফলত বিশ্ব জনমত হয়েছে প্রভাবিত। তিনিই প্রথম লেখক যিনি ফরাসী উপন্যাসের নায়কের ভাবমূর্তি ভেঙেচুরে দিয়ে এমন নায়কের সঙ্গে পাঠকদের সাক্ষাৎ ঘটিয়েছে যার নিজস্ব সত্তা আছে, যে প্রতিষ্ঠিত নৈতিক মূল্যবোধকে ছিঁড়েখুঁড়ে তছনছ করে দিয়ে নতুন মূল্যবোধের অন্বেষায় তৎপর। গোটা ফ্রান্স যখন মার্কস-বিরোধিতায় মত্ত, তখনই সার্ত্র ছিলেন কট্টর মার্কস অনুগামী। সেদেশের সমাজ-পরিবারে যখন ধর্মই সর্বস্ব, তখনই বাজে কাগজের ঝুড়িতে জমা থাকতো সার্ত্র'র গ্রন্থাবলী। বিশ্বে যখন বিবাহটাই সবচেয়ে সুন্দর প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত, সার্ত্র তখন বোভোয়ার সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ বছর অবিবাহিত থেকে একসঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ বসবাস করেছেন এবং অনবরত পদাঘাত করেছেন 'ঘর বাঁধার' বুর্জোয়া ধারণাকে। যিনি রাশিয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে হাঙ্গেরি ও চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতি সমর্থন জাহির করেন, সেই সার্ত্র'ই বিশ্বের সেরা নোবেল প্রাইজকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন,-- 'নোবেল প্রাইজ! যেভাবে আমি আলুর বস্তায় লাথি মারতে পারি, সেইভাবে এই পুরস্কারকেও।' সার্ত্র। লাথি মারার জন্যে যারা

বাইরের শিবিরে আছেন লেখক হিসেবে, মানুষের তরফ থেকে, তোমাকে জানলাম।

॥ দুই ॥

সার্ত্রর 'দ্য ওয়ার্ডস' কে আমি কখনই আত্মজীবনী বলে ভাবতে পারিনি। মনে হয়েছে দর্শন-কাব্য। 'পড়া' আর 'লেখা' এই দুটি ভাগে তিনি যেন নিজেকে ভাগ করে হাজির করেছেন। যেমন নির্মম ভাবে দ্য ওয়ার্ডস লেখা হয়েছে, তার মোকাবিলায় সিমোন দ্য বোভোয়ার পারেও ম্লান। শব্দের প্রতি আস্থা এবং শব্দের মাধ্যমেই বিশ্বকে ব্যাখ্যা করা তথা বদলানোর বিশ্বাস একজন সাহিত্যিকের পক্ষেই সম্ভব, দার্শনিক বা রাজনীতিকের পক্ষে অসম্ভব।

দ্য ওয়ার্ডস পড়ে জানতে পারি, সার্ত্রর কৈশোর স্মৃতির সিংহভাগ দখল করে ছিল নানা বিচিত্র ঘটনা। ঠাকুরদা, গাঁয়ের ডাক্তার লুই গিলেমিন এক কপর্দকশূন্য জমিদার-তনয়ার পাণিগ্রহণের পর তাঁর সঙ্গে কথা না বলে কাটিয়েছিলেন চল্লিশ বছর। গিলেমিনের দুই পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠপুত্র এমনই তোতলা ছিলেন যে কোন একটি বাক্য একদমে কখনও বলতে পারেননি। কন্যাটিকে যাঁর সঙ্গে বিয়ে দেন সেই ক্যাথলিক অভিজাতটি বিয়ের মাস খানেকের মধ্যেই উন্মাদ হয়ে যান। আর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র জাঁ বাপতিস্তে কোচিন চীনে নৌবিদ্যা প্রশিক্ষণে গিয়ে এমন ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে ফিরে আসেন যে, অ্যান-মারি শোয়েইৎজারের সঙ্গে বিবাহিত জীবনের সুখ বেশিদিন সইতে পারেননি। জাঁ পলের জন্মের পরই তিনি ইহলীলা সাঙ্গ করেন। সার্ত্র লিখেছেন, 'জাঁ বাপতিস্তের মৃত্যু আমার জীবনে বড় ঘটনা। এতে আমার মা ফিরে পেলেন বন্দীত্ব, আমি পেয়ে গেলাম স্বাধীনতা।'

অবশ্যি সেই ঘুণ-ধরা পরিবারে শান্তি ও শৃঙ্খলার অভাব ছিল অবশ্যম্ভাবী। অ্যান-মারির বুকের দুধ ভজিয়ে খাওয়ায় শিশু সার্ত্র ছটফট করেছেন দীর্ঘদিন ক্ষুধা-কাতরতায়। আটকৈশোর তাঁর গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরোয়নি, কান্না তো নয়ই। স্মৃতিচারণায় সার্ত্র বলেছেন— 'আমি একটি কাঁপা কাচমহল ছিলাম'। সে বয়সের দুটি ঘটনা, যে-দুটি সার্ত্র ও তাঁর দর্শনকে বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে, এখানে উল্লেখ্য। প্রথম ঘটনাটি তাঁর ন বছর বয়সের। এক বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যায় দশটি বালককে নিয়ে গিলেমিন একটি স্বরচিত দেশাত্মবোধক নাটক মঞ্চস্থ করেন। সার্ত্র সামর্থ্যানুযায়ী অভিনয় করলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল তিনি সবার নজর কেড়ে নেবেন। কিন্তু সকলে তারিফ জানালো বন্ধুটিকে। সার্ত্র ঈর্ষা বশত বর্ণচোরের দাড়ি টেনে খুলে ফেললেন। এতে কেউ হাসেনি, বরং তাঁর মা তাঁকে ধমক দিলেন—'এমন সুন্দর দাড়িটা তুই ছিঁড়ে ফেললি!' সার্ত্র ওখানে আর দাঁড়িয়ে না থেকে সোজা গিয়ে ঢুকলেন স্নানঘরে। তারপর বহুক্ষণ ধরে আরশিতে নিজের চেহারা দেখলেন।…
দ্বিতীয় ঘটনাটি ১৯১৫ সালের। সার্ত্র একটি লাল কভারওয়ালা বই উপহার পেলেন এক দামী [illegible] কাছ থেকে। বইটিতে কিছু প্রশ্ন ছিল; যেমন তোমার প্রিয় রঙ কী, তুমি কী খেতে ভালবাসো, কোন ধরণের গন্ধ তোমার পছন্দ ইত্যাদি ইত্যাদি। দাদার প্রশ্নগুলোর জবাব চাইলেন। সার্ত্র খুব খুশি, কেননা এই সুযোগে নিজের পছন্দ-অপছন্দ বড়দের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে। বইটি খুলে পেনসিল নিয়ে বসলেন তিনি। একটা প্রশ্ন ছিল: 'তোমার সবচেয়ে প্রিয় বাসনা কী?' জবাবে সার্ত্র নির্দ্বিধায় লিখলেন—'সৈনিক হয়ে মৃতদের প্রতিশোধ নেওয়া'।

কৈশোরে তিনি কিশোরদের [illegible] বর্তে কিশোরদের [illegible] পরিচয় দিয়েছেন। যাকে তিনি [illegible] একটি [illegible] বলে সত্যায়িত করেছেন। সার্ত্রর চেহারা এমনই 'কুৎসিত' ছিল যে

ঘন ঘন চুল কাটাতে তিনি তীব্র আপত্তি প্রকাশ করতেন। 'কুরূপ' হওয়ার দরুণ তিনি একধরনের 'হীনমন্যতায়' ভুগতেন, নিজেকে 'ঘৃণা' করতেন। ল ওয়ার্ডসে তিনি লিখেছেন: 'নিজের হীনভাবনার সম্ভাবনাকে শেষ করার জন্যে, নিজেকে অস্বীকার করার জন্যে এবং অন্যের দ্বারা অস্বীকৃত হবার জন্যে আমি নিজেকে বিরূপিত করেছি। চেহারাটাকে পাল্টানোর জন্যে আমি মুখে অ্যাসিড ঢেলেছি। কিন্তু পণ্য তো ব্যাধির চেয়েও ভয়ংকর। নিজের আসল 'স্ব'-এর আড়ালে আমি সম্মান-অসম্মানকে মাকতোলা করতে চেয়েছিলাম।'— কিশোর সার্ত্রর মানসিকতা তাঁর পরবর্তী অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারার বিকাশের প্রক্রিয়াটিকে স্পষ্ট করে। নিজের প্রতি নির্মম হওয়াটা তাঁর পক্ষে ছিল সহজাত। কৈশোরেই সার্ত্রর মনে প্রশ্ন জেগেছিল—'ভাল কি, মন্দই বা কি?' অবশ্য তিনি লিখেছেন, আমার মধ্যে কোনো অতি-অহমিকা ছিল না, আমার শোক ছিল ধর্মের মধ্যে নিহিত'।

॥ তিন ॥

যদিচ সার্ত্রর পুরো জীবনটাই ছিল সজীব ও কর্মক্ষম, তথাচ অস্তিত্বের স্বরূপ সন্ধানে, চেতনার সংজ্ঞায়, মনুষ্যত্বের দিগভ্রান্তিতে তাঁর মনীষা ব্যতিব্যস্ত নিয়েছিল যে বছরগুলিতে সেই দু-তিন দশকের কর্মময় জীবনের পরিচয় অতি সংক্ষেপে ইত্যবসরে জেনে রাখা ভাল। সেই জীবনের শুরু ১৯৪০ সালে হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কয়েদখানা থেকে। কেননা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সার্ত্র ছিলেন হিটলারের বিরুদ্ধে। হিটলারী শাসনের অন্ধকার দিনগুলিতে ইলিয়া এরেনবুর্গ, তলস্তয়ের পুত্র লেভ এবং লুই আরাগঁ প্রমুখের সঙ্গে গোপনে রক্তমাখা ইস্তেহার বিলি করেছেন। এই সচেতনতাকে তিনি মার্কসবাদের অত্যন্ত কাছাকাছি বলে মনে করতেন। সেইজন্যেই ১৯৬৮ সালে তেষট্টি বছর বয়সেও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অভ্যুত্থানকে উক্ত সমর্থন ও মাওবাদী ছাত্র আন্দোলনের সমর্থনে স্বদেশে দ্য গ্যলের বন্দীশালায় কাটিয়েছিলেন।

নিজের অভিজ্ঞতা, কর্ম ও সৃষ্টির দ্বারা সার্ত্র এটা দেখিয়েছেন এবং বলেওছেন যে, 'বিংশশতকের যে কোন গুরুত্বপূর্ণ লেখক বা বুদ্ধিজীবী মার্কসবাদের ধাক্কা না খাওয়া পর্যন্ত নিজের সার্থকতা প্রমাণ করতে পারেন না। মার্কসকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কেননা এই শতকের চুলচেরা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ একমাত্র মার্কসেই মেলে।' সকলেই জানেন যে সত্তর দশকে সার্ত্র প্যারিসে মাওবাদী সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের বিদ্রোহের বিরুদ্ধে গৃহীত সরকারের দমনমূলক নীতির তীব্র প্রতিবাদ এবং উগ্র বামপন্থী কাগজ 'লা কোজ দু পোপ্ল' সম্পাদনার মত দুঃসাহসিক কাজে লিপ্ত হন। সেই কাগজ রাস্তায় রাস্তায় বিলি করেছেন শ্রীমতী সিমোঁ দ্য বোভোয়ার ও জাঁ লুক গোদারের সহযোগিতায়। স্টুটগার্টে বামপন্থী যুব নেতা কন ব্যান্ডিটের সঙ্গে আলোচনায় আলোচনায় দিন কাটিয়েছেন। জার্মান-নিয়ন্ত্রিত ফ্রান্সে তিনি স্বদেশপ্রেমীদের প্রতিবাদের লেখক। আলজিরিয়ার ফরাসী উপনিবেশের প্রশ্নে মুক্ত স্বদেশে তিনি এক ক্রুদ্ধ, নিন্দিত, আক্রান্ত স্বদেশ সমালোচক।

যেমন বিতর্কিত ছিলেন মানুষটি, তেমনি তাঁর দর্শন। দুনিয়ার হরেক ঘটনায় উদ্দীপিত বা হতাশ হবার মতো দায়িত্বশীল মানুষ ছিলেন তিনি। যিনি একসময় ছিলেন মার্কসবাদী শিবিরে, তিনিই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কমিউনিস্টদের কার্যকলাপে নিরাশ হয়ে লিখেছেন: 'ক্রিতিক দে লা রেজঁ দায়ালেকতিক-এর লেখা আমাকে এমন এক পথ দেখালো যে

আমি কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবমণ্ডল থেকে বেরিয়ে পৃথক মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে উঠেপড়ে লাগলাম। ক্রিতিক এমন একটি মার্কসবাদী রচনা, যা কমিউ-নিস্টদের বিরুদ্ধে যায়। আমি দেখেছি যে কমিউ-নিস্টরা মার্কসবাদকে সম্পূর্ণ ভুল পথে অযথার্থ রূপে ব্যাখ্যা করেছেন, এখন আমি ওদের দলে নই।'

এইভাবে তিনি মার্কসবাদের সমর্থক হয়েও অস্তিত্ববাদের নিরিখে মার্কসীয় অবশ্যম্ভাবিতা তত্ত্বের বিরুদ্ধাচার করেছেন। ফলত হিটলার বা স্তালিন—কারও গারাদালয়ই সার্ত্রের কঠোর সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পায়নি। বিপরীতে জার্মান ও কমিউ-নিস্ট—উভয়ের কাছেই তিনি নিন্দা কুড়িয়েছেন। কিন্তু সার্ত্র আজও যে আমাদের শ্রদ্ধেয়, তার কারণ তিনি মার্কসবাদীদের কাছে নিন্দিত হয়েও কমিউনিস্ট বিরোধী শিবিরে নাম লেখাননি। মার্কসবাদী শিল্প পন্থাতে আস্থা হারিয়েও, বুর্জোয়া শিল্পবোধকে মেনে নিতে পারেননি—বরং ঘৃণা করেছেন। প্রাজ্ঞতা ও সাহসের যুগ্মমিলনে তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক অননুকরণীয় ব্যক্তিত্ব।

সার্ত্র নিজের অস্তিত্ববাদকে দর্শনের সংজ্ঞা দেননি, বলেছেন—আইডিয়োলজি। বিশাল মার্কসবাদী দর্শনে সন্নিবিষ্ট হয়েছে সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী চিন্তনপদ্ধতি। কিন্তু এটিকে কেবল তাঁর 'ত্যাগ' মনে করলে ভুল হবে, বস্তুত এর মাধ্যমে তিনি নিজের জীবনের নিঃসঙ্গতা আর মুক্তমন তথা বিশ শতকের বাস্তবানু ভূতিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কতিপয় সমালোচকের ধারণা, এটি সার্ত্রের অধঃপতন। সত্যি কি তাই? নিবন্ধের শেষভাগে এ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা যাবে, এখন বরং সার্ত্রের শেষ বয়সের কথা বলা যাক। 'আদিউ—বিদায় সার্ত্র' নামের ঘনিষ্ঠ স্মৃতিচারণে সিমোঁ দ বোভোয়ার আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত এক জাঁ পল সার্ত্রের ছবি দেখিয়েছেন। ১৯৭৫ সালে 'ন্যু ইয়র্ক রিভিউ অব বুক্‌স'-এ প্রকাশিত সার্ত্রের সঙ্গে মিশেল কোঁতার দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই সার্ত্রের সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে রেখেছেন—'ভালো স্বাস্থ্যের চেয়ে ভালো লেখা অনেক বেশি সুন্দর।' আর তারই ফলশ্রুতিতে '৭০-৮০ সালের সময়সীমায় রচিত বোভোয়ারের স্মৃতিচারণে আমরা এক ভগ্নস্বাস্থ্য, দুর্বল, শিথিল, জরাগ্রস্ত সার্ত্রকে পারী, ভেনিস ও রোমের পথে হাঁটতে দেখি। সেই সময়েও তিনি নিজেকে রাজনৈ-তিক ক্রিয়াকলাপে মাত্রাতিরিক্ত জড়িয়ে রাখার কারণে তাঁকে নিয়ে সিমোঁ দ্য বোভোয়ার ছিলেন নিয়ত উদ্বিগ্ন। '৭১ সালের ডিসেম্বরে, ইতিমধ্যে সার্ত্রের দু বার হার্ট স্ট্রোক হয়ে গিয়েছে, তিনি বললেন, 'ফ্লবেয়র লেখা হয়তো শেষ করা যাবে না, কেননা আমি সত্তর পেরোতে পারব না।' কিন্তু তার পরও বেঁচে থাকলেন সুদীর্ঘ ন বছর বিশ্রামহীন ভাবে। রোগ ঠেকাতে যা ন্যূনতম করা দরকার, সেটাও তিনি করেননি। অবশেষে ১৬ এপ্রিল ১৯৮০ পুরো একটা যুগের সমাপ্তি। ভোলকেল কাব্যান্দোলনের কবি মার্শেল প্লিনের ভাষায় 'Satre is a Fossil' জাঁ পল সার্ত্রের মত প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব সর্বদেশে ও সর্বকালে দুর্লভ; অধিকন্তু এই নৈরাজ্যের যুগে, বিক্ষোভ আর খণ্ডতার যুগে সার্ত্রের মৃত্যু বুদ্ধিজীবী-জগতে অনাবৃষ্টির মতন অপূরণীয় ক্ষতি।

॥ চার ॥

প্রথম যেদিন আমি সার্ত্রের 'নাশিয়া' পড়া শুরু করি, সেইদিন এবং তার পরের ক'টা রাত বুকে অসহ্য জ্বালা নিয়ে নির্নিমেষ নেত্রে কেটেছে আমার; নিজেকে ল্যাজ-কাটা ঘুড়ির মত উড়িয়ে ফিরেছি কল্পনার মুক্তাকাশে এবং কল্পনা যেহেতু মুক্তপক্ষ নয়

তাই বারংবার গোত্তা খেয়ে আশা নিরাশার দোলায় দুলেছি। কেন এমন হয়েছিল, আজ আর সেটা মনে নেই। সম্ভবত উপন্যাসের নায়ক আমাকে টেনেছিল, যদি হতে পারি ওইরকম—এই চিন্তা পেয়ে বসেছিল। পরে জেনেছি, শুধু আমি কেন, বিশ্বের সাহিত্য সমালোচকেরা আজও নাশিয়ার প্রশংসায় নির্দ্বিধ। সার্ত্র সেই ৪৮ সালে নাশিয়াকে নিজের শ্রেষ্ঠ রচনা বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং ১৯৭৫ অবধি সে-উক্তির হেরফের ঘটেনি। অর্থাৎ জীবনের শেষ ক্ষণটি পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যিক সত্তাটি ছিল জীবিত।

নাশিয়া সহ সার্ত্রর উপন্যাসের মধ্যে দ্য এজ অব রিজন (১৯৪৬), দ্য রিপ্রাইভ (১৯৪৮) আয়রন ইন দ্য সোল (১৯৫০) প্রভৃতির নাম সবিশেষ স্মর্তব্য। এছাড়া আছে আটটি নাটক। ছোট গল্প : ইনটিমেসি। প্রবন্ধ গ্রন্থের তালিকায় দ্য সাইকোলজি অব ইমজিনেশন (১৯৩৬), বিইং অ্যাণ্ড নাথিংনেশ: অ্যান এসে অন ফেনোমেনোলজিক্যাল অনতোলজি (১৯৪৩), একসিসটেনশিয়ালিজম অ্যাণ্ড হিউম্যানিজম (১৯৪৫) এবং সিচুয়েশন ১, ২, ৩ প্রভৃতি উল্লেখ্য। এছাড়া হোয়াট ইজ লিটারেচার ও বদলোর (১৯৪৭) বই দুটিতে অস্তিত্ববাদী সাহিত্য সমালোচনার চূড়ান্ত নিদর্শন দ্রষ্টব্য। এবং আত্মজীবনী : দ্য ওয়ার্ডস। কিন্তু একজন সাহিত্যিকের সাহিত্যসৃষ্টির উর্দ্ধেও যে কোন পরিচয় থাকতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সার্ত্র। সাক্ষাৎকার' নামধারী যে-কটি গ্রন্থে আমরা সার্ত্রর কথপোকথন বা সংলাপ পড়েছি, সেগুলি বাস্তবে সাক্ষাৎকার নয়— ইস্তেহার, যা প্লেটোর রচনার সঙ্গে উদাহৃত। শুনেছি সক্রেটিস কথপোকথনের মধ্যে দিয়ে দর্শনের জটিল সমস্যার সমাধানে পৌঁছতেন। সার্ত্রও তাঁর তরুণ প্রবীণ বন্ধু-বন্ধুনীদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে নিজের দার্শনিক, সাহিত্যিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বময়।

বিশ শতকের ফরাসী উপন্যাসের ধারায় বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা নানা পরিবর্তন এনেছে। স্পেনের গৃহযুদ্ধ, হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসী পশু-শক্তির সারা ইউরোপ ব্যাপী নৃশংস তাণ্ডবলীলা এবং সাম্প্রতিক দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে মুক্তি-যোদ্ধাদের অনড় সংগ্রামের দ্বারা ফরাসী চিন্তাবিদ ও শিল্পীসমাজ বিশেষভাবে আলোড়িত। ঔপন্যাসিকদের মধ্যে জর্জ দুয়ামেল, জর্জ বেয়ারনান্স, আঁদ্রে মলরো, আলবেয়ার কাম্যু এবং জাঁ পল সার্ত্র প্রভাবিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

তুলনার প্রশ্নে সার্ত্র-কাম্যু প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর হবে না। আলবেয়ার কাম্যু ছিলেন সার্ত্রর একাধারে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আদর্শ সহযোগী অথচ কট্টর বিরোধী। কাম্যু সেই জাতের ভাষাশিল্পী ছিলেন যাঁদের সৃষ্টি ও জীবন ওতপ্রোত, যাঁরা লেখনীর মাধ্যমে জীবনের গাঢ়তম উপলব্ধি ও বেদনাঘন যন্ত্রণা এবং কঠোর মূল্য দিয়ে অর্জিত সত্য ভাস্বর করতে চেয়েছেন। আধুনিক দার্শনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে কাম্যু একজন। সাহিত্য স্রষ্টা রূপে তাঁর জীবনবোধ যেমন ভাবুক পাঠকের ঔৎসুক্য জাগায় তেমনি তাঁর রচনা শৈলীর ঋজুতা, বলিষ্ঠতা ও ভাবলুতাবর্জিত শিল্পরুচির পরিচায়ক। লেখায় একটা তথ্যনিষ্ঠ ও নির্মোহ নিরপেক্ষতা লক্ষণীয়। তাঁর চিন্তার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে আঁদ্রে মলরোর সাহিত্যচিন্তায়। উভয়েই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফরাসী নিগ্রহের পটভূমিতে একদিকে নাগরিকদের ব্যক্তিগত দুর্দশা অনুশীলন করেছেন, অন্যদিকে তৎকালীন ফরাসী সমাজের বাস্তবধর্মী অধ্যয়নেও ব্রতী হয়েছেন। বৃহত্তর সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক কল্যাণের সঙ্গে ব্যক্তি স্বাধীনতার যোগ ঘটানো যায় কোন উপায়ে—এ চিন্তা দুজনের জীবনেই প্রধান

হয়েছে। উভয়েই মানুষের মূল্য যাচাই করতে গিয়ে আস্থা প্রকাশ করেছেন : Un homme est la somme de ses actes ; des choses it est capable d'achever—c'est tout. অর্থাৎ মানুষের পরিচয় তারই কাছে, সে কি করতে পারে শুধু তাতে। জীবন সম্পর্কে নিরাশাবাদী কাম্যুর সঙ্গে সার্ত্রের মতবিরোধ তাঁদের বন্ধুত্বের চেয়ে কম ছিল না। বিশেষ একটি রাজনৈতিক বিশ্বাসকে নিয়ে বিরোধটা বাধে চরমভাবে। এক সাক্ষাৎকারে সার্ত্র বলেছেন, 'গোড়া থেকেই আমি অরাজকতাবাদী'। কাম্যুও অ্যানার্কিজমের ভক্ত, কিন্তু রাজনীতিতে তিনি সক্রিয় ছিলেন না। তিনি হিটলার পরিচালিত নাৎসী বর্বরতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন কিন্তু মূলত ছিলেন সাহিত্যিক। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস La Pe'ste বা The Plague-এ নাৎসী অত্যাচারে যন্ত্রণাদগ্ধ প্যারী নগরীর একটি মর্মস্পর্শী রূপকের অবতারণা হয়েছে এবং স্থান কাল নির্বিশেষে 'প্লেগ' যে তামাম সামাজিক রাজনৈতিক ধার্মিক অন্যায় ও পাপের প্রতীক তা বলতে চেয়েছেন। কাম্যুর আগ্রহ ছিল যে কোন দলীয় রাজনীতি তথা মতবাদের উর্দ্ধে স্থান পাক অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিরলস লড়াইয়ের প্রয়োজন। যাঁরা দ্য প্লেগ পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, রাজনীতি ক্ষেত্রে হিংসাশ্রয়ী বিপ্লব সম্বন্ধে কাম্যুর মোহমুক্তি, বায় বিতৃষ্ণাও ফুটে উঠেছে তার চরিত্রের মধ্যে। যাঁরা চরম সামাজিক প্রগতির দোহাই দিয়ে রক্তক্ষয়ী ও হিংসাত্মক বিপ্লবের সমর্থন করেন তাঁদের প্রতি কাম্যুর পুর্ণ অনাস্থা। তিনি বিশ্বাস করেন কোন মানবিক উদ্দেশ্য সাধনের যুক্তি দিয়েই হিংসাকে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায়।

স্বীকার করতেই হবে যে কাম্যু রাজনীতিক ছিলেন না, ছিলেন পুরোদস্তুর সাহিত্যিক। পক্ষান্তরে সার্ত্র যতটা না সাহিত্যিক, তার ঢের বেশি রাজনীতিবিদ। সার্ত্রের সম্পাদিত লে তঁ মোর্দ্যোন কাগজে প্রকাশিত ফ্রাঁসাই জাঁসোর রচনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কাম্যু একটি সমালোচনা লেখেন, যাতে জাঁসোকে বলা হয়েছে 'মোস্যো লে ডিরেকৎও'। এতে সার্ত্র মনোক্ষুণ্ণ হয়ে কাম্যুকে একটি চিঠিতে (যেটি উক্ত পত্রিকাতেই ছাপা হয়) কড়া ভাষায় লেখেন— 'তুমি আত্মগরিমার শিকার হয়েছো, নিজেকেও ঠিক মত দেখতে পাও না।' এর অনিবার্য পরিণতিতে দুই বন্ধুর সম্পর্ক ছিন্ন হয়। অবশ্যি কাম্যু ছিলেন তাঁর 'শেষতম প্রিয় বন্ধু'। ১৯৬০ সালে মোটর দুর্ঘটনায় মাত্র সাতচল্লিশ বছর বয়সে কাম্যুর অকাল প্রয়াণ ঘটলে শোকার্ত লিখতে গিয়ে সার্ত্র নির্দ্বিধায় মন্তব্য করেন : 'কাম্যু ছিলেন আমাদের শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানুষ।'

॥ পাঁচ ॥

'আপনার উপন্যাসগুলোতে আপনার যৌনজীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে...' মিশেল কোঁতার এই জিজ্ঞাসায় সার্ত্র বলেছিলেন, 'শুধু উপন্যাসে কেন, আমার দর্শন বিষয়ক বইগুলিতেও এটি স্পষ্ট। কিন্তু সেগুলি আমার কামজীবনের এক একটি অবস্থার বর্ণনা মাত্র। সেখানে আমাকে সম্পূর্ণভাবে খোঁজার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। আমার বিশ্বাস, কোন লেখকের 'স্ব' সম্পর্কে জানার জন্যে তাঁর বিশ্ব সম্পর্কিত ধারণাটি জানা দরকার। একজন লেখকের উচিত সমস্ত জিনিস সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা। বিশ্ব যখন বস্তু, লেখক তখন অবশ্যই ব্যক্তি এবং তিনি বিশ্ব সম্বন্ধে যা কিছু বলবেন সবই তাঁকে খোলসমুক্ত করবে। আমার মতে, মানুষের সত্যকার মুক্তি তার নিজের স্বেচ্ছাচারকার প্রেরণা ছাড়া আসে না, এবং তা মূলত যৌনজ।'

মার্কসায়নের দৈহিক রূপ এখানে প্রকট। ফলত মার্কস অনঙ্গের মত ছড়িয়ে গেছেন বিশ্বময়। অনঙ্গ বৈদেহী নয় তার বাস অঙ্গে। যৌনবোধের ব্যাপারে সার্ত্রে ও জঁ৷ লুক গোদার প্রায় সমমনোভাবী। ১৯৮২ সালে গোদারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাগী ছবি 'ব্রিটিশ সাউণ্ডস'—এর দ্বিতীয় সিকোয়েন্সের একটি দৃশ্য নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে। দৃশ্যটিতে ছিল একটি নগ্ন রমণী। সাউণ্ডট্রাকে নারীমুক্তি আন্দোলনের কথা। রমণীটির উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় যোনির সামনাসামনি ক্লোজশট। যাতে ফুটে ওঠে নাভি থেকে উরুর মধ্য-ভূমি। এটি ফিল্মের নতুন ধারায় সংক্ষিপ্ত ও বলিষ্ঠ শট। পুরো সিকোয়েন্সটাতে গোদার দেখাতে চাননি যৌনতা বা নারীদেহের সৌন্দর্য। বরং ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন যৌনতা ও স্বাধীনতার পারস্পরিক জটিল ও অসম সম্পর্ক। দৃশ্যটিতে ডায়ালেকটিক্যাল ইণ্টার প্লে নারী স্বাধীনতা বিষয়টিকে ছাপিয়ে যৌন ও রাজ-নৈতিক আচরণ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তারপর 'যৌন বিকৃতি ও স্টালিনাইজম' 'একজনের লিঙ্গকে চাপ দেওয়া ও শ্রমিক সংগঠনের সিদ্ধান্ত গোপন রাখা' প্রভৃতির মাধ্যমে সমান্তরালতা দেখানোর প্রয়াস। পরিশেষে, দৃশ্যটির সার্থকতা কোথায় তা বলা হয়েছে 'ফ্রয়েডীয় বিপ্লব ও মার্কসীয় যৌনতা'র মাধ্যমে। একই বক্তব্য ও আঙ্গিক পাই জঁ৷ পল সাত্র'র 'সোভয়া লে মর্দ্যা' গল্পের নিম্নোধৃত অংশে :

'...মিশেল আমার মাথাটা দু হাতে ধরে অনেক-ক্ষণ নিজের নাভি আর উরুর মাঝামাঝি চেপে থাকল। ওর কোমল উরুর পেলবতা ও উগ্র পারফিউমের সুবাসে আমার দম বন্ধ হয়ে এসেছিল। আমি মুক্তি চাই-ছিলাম, ওই মেয়েটির কাছ থেকে, নিজের যৌনতার কাছ থেকে মুক্তি চাইছিলাম। স্বাধীনতা আমার বড় প্রিয়। হাতের রিভলবারটা গরম হয়ে এসেছিল।... মিশেল আমাকে দীর্ঘতম চুমু দেবার জন্যে নিজের জিবটা আমার মুখে ভরে দিল। তারপর গোঙানির মত অস্ফুট গলায় বলল, 'বোর্দ্যা তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছো, আর আমি যুবতী।' কথাটা দারুণভাবে চমকে দিল আমাকে। হাতের মুটি শক্ত হলো। প্রবল আক্রোশে মিশেলের পিঠ খামচে ধরলাম। মিশেল আরও ঝুঁকে পড়ল, তারপর বলল, 'আহ্ কী আরাম!' তারপর সে আমাকে সোজা ভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ঘন হয়ে দাঁড়াল। আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল আমাকে। আমি ওর লাল ফ্রকটার চেন টেনে খুলে দিয়ে ওর জামার তলায় হাত চালিয়ে ওর তলপেটের নরম অংশটা বারবার স্পর্শ করলাম। আর্দ্র হয়ে উঠল হাতটা··। তৃষ্ণায় আমি থরথর। অসহায় ভাবে বললাম, 'যৌন-তাকে আমি হারাতে পারছি না মিশেল ; তুমি উদার হও। আমাকে ছেড়ে দাও — মুক্তি দাও — '। কিন্তু মিশেল কিছুই শুনতে পেল না। আবেশে ওর চোখ বুজে এসেছিল, ঠোঁট কাঁপিয়ে বলল, 'আমাকে বিছানায় নিয়ে চলো, প্লিজ—'। তৎক্ষণাৎ আমার জেদ চেপে গেল, যৌনতাকে জয় করবই। শয্যা-গ্রহণের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে আমি মিশেলের ফ্রকের বোতামগুলো খুলে দিলাম। শেষ বোতামটা খোলার সময় মিশেল একটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফ্রকটা গা থেকে খসিয়ে দিল। ভেতরে ছোট্ট দুটি অন্তর্বাস। মিশেল নিজেকে আরও নিবিড় করে সঁপে দিল আমার মধ্যে। আমার রিভলবারটা আরও শক্ত হয়ে উঠেছে।... মিশেল নিজের হ্রস্ব ব্রা-টা দেখিয়ে চোখে প্রশ্রয় ঢেলে উৎসাহভরে বলল—'খুলে নাও।' কাঁধের কাছে গিঁটটা টান দিতেই অন্তর্বাসটা ঝুপ করে মাটির ওপর পড়ল। লালচে দুটো স্তনের চোখ কেমন উন্মুখ···। মিশেল নিজের বুক আড়াল করতে চাইলো। আমি বাধা দিয়ে হাত দুটো পেছন দিক থেকে বেঁধে দিলাম।... এবার জাঙিয়াটা খুলতে হবে। ···খুলে

ফেলতেই মিশেল সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াল আমার সামনে। তারপর তৃষ্ণার্ত ঠোঁট ফাঁক করে কয়েক জোড়া দাঁত দিয়ে আমার পিস্তলটাকে খাবলে ধরল। আর তখন, ঠিক তখনই আমি ওকে সজোরে ছুঁড়ে দিলাম জলন্ত স্টোভটার ওপর। মুহূর্তে ওর সুডোল নিতম্বের গোল অংশটা দগ্ধ হয়ে গেল। ...ও তখন চীৎকার করে কী যেন বলছে। আমি রিভলবারটা ওর দিকে তাক করে সব কটা গুলি ঝেড়ে ফেললাম। মিশেলের উলঙ্গ দেহটা কাটা জন্তুর মত ছটফট করতে করতে স্থির হয়ে গেল। পিস্তলটা আমি পকেটে পুরে প্রাণ খুলে হাসলাম— হা: হা: হা: —'

সার্ত্রের যৌনবোধের স্বরূপটি আরো স্পষ্টতা পেয়েছে 'ইরোস্ট্রেটস' গল্পে। নায়ক পল হিলবেয়ার এক অদ্ভুত চরিত্র। সে রেণী নামে মেয়েটিকে ৫০ ফ্রাঙ্কের বিনিময়ে নির্বস্ত্র করে নিজের চতুর্দিকে নগ্নদেহে ঘোরাফেরা করতে বাধ্য করেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রেণী রিভলবারের ভয়ে হিলবেয়ারের চারপাশে উলঙ্গদেহে পায়চারী করে। দুজনের মধ্যে কোন সংগম ঘটেনা। পরিশেষে রসদ কষে হিলবেয়ার মেয়েটিকে বিদায় করে দেয়। সার্ত্রের কামজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বোধ তাঁর গল্পে রূপায়িত। বলা যায়, সেগুলি তাঁর অস্তিত্ববাদী দর্শনেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে। সার্ত্রের উপন্যাস ও গল্পে বেশ কিছু যৌন-বর্ণনা আমার অনেক সময় কষ্টপাঠ্য ঠেকেছে, দুর্বোধ্য ঠেকেছে; অথচ অনাবশ্যক ঠেকেনি। মনে হয়েছে যে তাঁর লেখার ধরণ-ধারণ অপ্রত্যাশিত রকমের জটিল হলেও আসল রসটি অত্যন্ত প্রণালীতে ধরা পড়ত না। হয়ত প্রশংসার মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। তথাচ এটা মানতেই হবে যে সার্ত্রের নিজস্ব যে বর্ণনাশৈলী আছে, তা অমোঘ। তাঁর নিজস্ব একটি ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যও আছে; যে শব্দগুলি আমাদের কাছে সাধারণ, সেগুলি তাঁর কাছে 'বিশেষ'। যেমন Love, hate, absord, exactly, negation, question, faith, false, me, we, I, self, you, knowledge, relation, word, world, space, lines, language, freedom, cage, situation, quantity, quality প্রভৃতি। কিন্তু যে শব্দটিকে সার্ত্রে তীব্র ঘৃণা করতেন, সেটি হলো ADMIRATION. তিনি বলতেন, আমি কাউকে অ্যাডমায়ার করি না, আমি চাই আমাকেও যেন কেউ অ্যাডমায়ার না করে।' তাঁর মতে সঠিক শব্দ ESTEEM, যাকে তিনি LOVE-এর সমার্থক হিসেবে মেনেছিলেন। যদিচ সার্ত্রেকে অ্যাডমায়ার করার মত ধৃষ্টতা আমাদের নেই; কেননা তাতে তাঁর অপমান হয় না, হয় আমাদের। সার্ত্রে নমস্ত।

॥ ছয় ॥

সার্ত্রে নমস্ত। নমস্ত, কেননা অস্তিত্ববাদী দর্শনের নদীটি সার্ত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েই সাগরে রূপান্তরিত হয়েছে। আধুনিক ইউরোপে খৃষ্ট দর্শনের সামনে চ্যালেঞ্জ এসেছিল অনেক আগে। সোরেন কিরকেগার্ড প্রমুখ দার্শনিক এর পথিকৃৎ। তখনই ব্যক্তিজীবনের সাথে অস্তিত্ববাদের ঘটে সেতুবন্ধন। ফ্রিডরিস নিৎসে, কার্ল জেসপার্স, গ্যাব্রিয়েল মার্শাল, মার্টিন হাইডেগার প্রমুখ তারই উত্তরসাধক। তবে, যাকে বলে পরিপূর্ণতা সেটা ঘটেছে জাঁ পল সার্ত্রের মাধ্যমে। যদিচ এ দর্শনের কোন ধারাবাহিকতা নেই, পরস্পর পরিপূরক মাত্র,— তথাচ ব্যক্তিজীবনের সাথে এর পাকা গাঁটছড়া বাঁধতে পেরে সার্ত্রে হয়েছেন আমাদের প্রণম্য।

কিন্তু শ্রদ্ধাই একজন দার্শনিকের ক্ষেত্রে সার কথা নয়। আমরা বিজ্ঞানপ্রসূত যুগের সন্তান, সুতরাং যাচাইয়ের তাগিদ আমাদের আছে। সার্ত্রের দর্শনকে ঘিরে আমার মনে কিছু সন্দেহ জেগেছে, তার সবিনিত উত্থাপন এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথমে

তাঁর অস্তিত্ববাদী ধারণাটি বিচার্য। সার্ত্র বলেছেন : 'মানুষ যেহেতু নিজের সব কটি পরিস্থিতির জন্ম স্বয়ং উত্তরদায়ী, অতএব অস্তিত্বের আসল অর্থ স্বাধীনতা। অর্থাৎ মানুষ আজীবন, সে যা হতে পারে তা হবার চেষ্টা করে।... আমি মৃত্যুর ব্যাপারে স্বাধীন নই, বরং একজন মরণশীল ব্যক্তি। . আমার কাছে মৃত্যু এক অবুঝ সীমা, অন্যের অস্তিত্ব আছে বলেই আমার স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ।' সার্ত্র এমন এক সমাজের পরিকল্পনা ও বিকাশের জন্ম চেষ্টা করেছিলেন, যেখানে 'চাহিদা কখনও নির্দ্ধারক তত্ত্ব হবে না' বরং স্বেচ্ছানুরূপ নির্বাচনের 'স্বাধীনতা' মানুষের থাকবে। সাধারণ মানুষ কেবলমাত্র অন্ন-বস্ত্র, গাড়ি-বাড়ি, ফ্রিজ-টেলিফোনকে মোক্ষ মনে করে, কিন্তু বৌদ্ধিক মানুষের সুখ এসব পার্থিব বস্তুর মধ্যেই নিহিত থাকতে পারে না। স্নেহ প্রীতি ভালোবাসা ভাতৃত্ব চিন্তার বিকাশ ও মনোভাবের আদান-প্রদান ব্যতীত জীবন অর্থপুর্ণ হতে পারে না। সাত্র'র কল্পনায় এমন এক সমাজ ছিল যেখানে পার্থিব আবশ্যকতার পুর্তির সাথে সাথে মানুষের বোধজাত উদাত্ত আত্মিক চাহিদাগুলির কেবলমাত্র পুর্তি নয়— তার চেয়ে উর্দ্ধে — যেখানে বাছাই বা চয়নের সুযোগও থাকবে। পরিকল্পনাটি যে মহৎ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন একটি সমাজের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ কি এতই সোজা?

দ্বিতীয়ত, সাত্র'র মতে স্বাধীনতা জিনিসটা ব্যক্তির অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি অনিবার্য শর্ত। অথচ তিনিই বলেছেন যে 'পুর্ণ স্বাধীনতা' বলে কোন বস্তু নেই। সার্ত্র ঈশ্বরকে অস্বীকার করে মানুষের জয় ঘোষণা করেছেন, কিন্তু নিজেই বলেছেন, 'মানুষ আমৃত্যু নিজের অতীতের প্রতি দায়বদ্ধতার একটি যোগফল ভিন্ন কিছু নয়'। ঈশ্বর বলে কিছু নেই এবং যা কিছু আছে তা ব্যক্তি-ইচ্ছা বা তার নৈতিক সৃষ্ট-সৃষ্টির নামান্তর। তারই ভিত্তিতে ব্যক্তির পক্ষে নির্বাচন সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, সমস্ত বস্তুই যখন মোহময়, তখন নির্বাচনটা করব কিভাবে? যা কিছু আমরা বর্তমান থেকে পাচ্ছি তা থেকেই তো বাছাই সম্ভব! অথচ ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে বর্তমান ধরা পড়ে পৃথক পৃথক ভাবে। এটি সাত্র' লক্ষ্য করেননি। ফলতঃ বিশ্ব জুড়ে যাঁরা তাঁর দর্শনে প্রভাবিত হয়ে নতুন পথে যাত্রা শুরু করেছেন তাঁরা স্ব স্ব সংস্কার ও পরিবেশ মোতাবিক দ্বন্দ্বের আবর্তে পড়ে ঘুরপাক খেয়েছেন।

উদাহরণত, সাত্র' চেয়েছিলেন প্রতিটি স্বামী-স্ত্রী মন-মোতাবিক দাম্পত্য-সূত্র ভাঙা গড়ার ব্যাপারে স্বাধীন হবে। কিন্তু এটি ফরাসীদের মধ্যে সম্ভব হলেও শ্লোক ও দোহার দেশ ভারতভূমিতে সহজ নয়। সিমোঁ দ্য বোভোয়ারের সঙ্গে দীর্ঘ সঙ্গযাপন সত্বেও সার্ত্র অবিবাহিত থেকেছেন, সন্তান জন্ম দেননি। অথচ সে অধিকার তাঁর ছিল, তিনি নিজে 'ব্যক্তি-একক' হওয়ার নিরিখে 'উপভোগ' করেছেন। অন্যদিকে, ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিজীবনেও সামাজিক উত্তরদায়িত্বকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করাকে তিনি সুনজরে দেখেছেন। এই কারণেই তিনি 'বন্ধ কপাট' রচনা করেছেন (মনে রাখতে হবে, তখনও তিনি 'আদার ইজ হেল'-কে মান্যতা দিয়েছেন)। কিন্তু সার্ত্র এটা লক্ষ্য করেননি যে বিবাহের মত 'বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান'কে অস্বীকার করতে পারলেই সমাজের প্রতি দায়িত্ব ফুরিয়ে যায় না। বিবাহ যদি 'বুর্জোয়া সংস্কার' হয়, তবে সন্তানের অভাব অপরের সন্তানকে (যা বিবাহেরই পরিণতি) দত্তক নেওয়ার ব্যাপারটাকে কী বলা হবে?—এ প্রশ্ন নিয়ে সার্ত্র নিশ্চয়ই ভাবিত হননি। ভুলে গেলে চলবে না যে সার্ত্র নিজেই আলে'ত নামে একটি মেয়েকে দত্তক নিয়েছিলেন, এবং আলে'ত (তাঁর পালিত কন্যা হলেও) বিবাহেরই পরিণতিতে জন্মেছিলেন।

আর একটি কথা। সার্ত্র চেয়েছিলেন, ব্যক্তি 'পরাদর্শী' হোক। তিনি বলেছেন, 'মানুষে মানুষে যে সম্পর্কচ্যুতি ঘটে, তার একমাত্র কারণ, আমরা একে অপরের কাছ থেকে কিছু-না-কিছু গোপন করে চলি।' কত উদার সার্ত্রর কল্পনা যে 'এমন একদিন আসবে যেদিন কেউ কারো কাছে কিছু গোপন করবে না।' কিন্তু তিনি হয়ত লক্ষ্য করেননি যে তাঁরই অনুগামীদের এক অংশ এর খেলাপ করে চলেছেন। তাঁদের মধ্যে কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় 'অমুক সময় তুমি কার সঙ্গে কোথায় কী করছিলে?'— তবে নিশ্চয়ই তাঁরা অস্বস্তি বোধ করবেন। কেউ হয়ত সার্ত্ররই উক্তি উদ্ধৃত করে বলবেন— 'আমরা নিজেরাই নিজেদের কাজের নির্বাচনের ব্যাপারে পূর্ণত স্বাধীন এবং উত্তরদায়ী।'

বস্তুত এই প্রয়োগহীন দর্শনই সার্ত্রর মৃত্যুর পর মাদাম সিমোঁ দ্য বোভোয়ার শোক বাড়িয়েছে: 'শ্রমিকদের তিনি ভালবাসতেন অথচ শ্রমিকেরা তাঁকে পছন্দ করত না।' সারা পৃথিবীর শ্রমিকদের জন্য যে দর্শন, সেই দর্শনসমুদ্রে একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও সার্ত্র নৌকো ভাসাতে পারেন নি। যে নিহিলিস্ট দর্শন তাঁকে নানা পথে ঘুরিয়ে মাওবাদের সমর্থক করে তুলেছিল, সেটাই আবার মার্কসপন্থার বাইরে একটি স্বতন্ত্র বিচারধারা প্রণয়নের জন্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। নোবেল প্রাইজকে 'এক বস্তা আলুর সমান' বলে প্রত্যাখ্যান করলেন, অথচ সার্ত্রকেই তাঁর নিকটবন্ধু আরো বলেছেন: 'তুমি যদি অস্তিত্ববাদী হও তবে তুমি পুরোপুরি মুক্ত, তুমি যদি মার্কসপন্থী হও তবে অনায়াসে তুমি বিশ্ব-ইতিহাসের মূল ধারার মধ্যে সন্তরণ করতে পারো। আর তুমি যদি দুটোই হও তবে চিলি, ভিয়েতনাম, কিউবা নিয়ে রেস্তোরাঁয় বসে আলোচনাই তোমার সার হবে।'

সার্ত্র ও তাঁর দর্শন আজও বিতর্কের বিষয়। সার্ত্র এমনই এক মিথ যার খোলস ছাড়ানোর অবকাশও রয়ে গেছে উত্তরসূরীদের হাতে। ভবিষ্যৎ বলে দেবে ইতিহাসে তাঁর 'শব্দ' ও 'ন্যায় অন্যায়' সন্ধানের মূল্য কতটুকু। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে তিনি কি সঠিক বাক্যটি ধরতে পেরেছিলেন? হয়ত বা তাঁর দর্শন হয়ে যাবে ইতিহাসেরই বিষয়বস্তু। আমরা সেইদিনের অপেক্ষায় থাকব। আপাতত আমরা সেই মহাজ্ঞানীকে শ্রদ্ধার উচ্চাসনেই রেখে দেব। কেননা অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রথম সার্থক রূপকার, সুসাহিত্যিক, নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যাতা, শ্রীমতী বোভোয়ার সঙ্গে মেধা উজ্জ্বল বিবাহবন্ধনহীন চির বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও ওয়াণ্ডা কে মিশেল ভিঁয়া প্রমুখ বান্ধবীর একান্ত সাথী এবং পালিতা কন্যা আলেতের সঙ্গে পিতৃসুলভ সম্বন্ধ ইত্যাদি নানান বর্ণোজ্জ্বল ঘটনার নায়ক জাঁ পল সার্ত্র পরবর্তী দুই প্রজন্মের কাছে হয়ে উঠেছিলেন প্রতিভা ও আবেগের এক প্রত্যক্ষ যোগফল। উজ্জ্বল কিংবদন্তী।

তথ্যচয়ন:

জাঁ পল সার্ত্র — The Words.
জাঁ পল সার্ত্র — Existentialism & Humanism.
জাঁ পল সার্ত্র — Intimacy.
জাঁ পল সার্ত্র — Being & Nothingness: An Essay On Phenomenological Anthology
সিমোঁ দ্য বোভোয়ার — Adiu (ইং অনুবাদ: প্যাট্রিক ও ব্রায়ান)
অরুণ মিত্র — সার্ত্র ও তাঁর শেষ সংলাপ
আলবেয়ার কামু — The Plague (বাং অনু: দেবীপদ ভট্টাচার্য)

মিশেল কোঁতা	সার্ত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার (New York Revew of Books, 1975)	রমেশ বক্সী	সার্ত্র কা অস্তিত্ববাদ (সারিকা, ১৬মে '৮০)
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	ফরাসীর হার্দ্য পরিবর্তন : স্বগত	অজিত রায়	সার্ত্র অওর কুছ সওয়াল (ধর্মযুগ, ১মে '৮০)
দীপংকর চক্রবর্তী	শেষের প্রহর (দেশ, ১৫ সেপ্টেম্বর '৮৪)	যীশু চৌধুরী	সার্ত্রের প্রয়োগহীন দর্শন (পরিবর্তন, ১৬মে '৮১)
		পুষ্কর দাশগুপ্ত	আজকের ফরাসী সাহিত্য (আজকাল, ২৪ জুন ১৯৮২)

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

O বাজারী পত্রিকা যখন মানুষের বুক চেপে বসে আছে, অভাগার নিঃশ্বাসে শুষে নিচ্ছে অক্সিজেন তখন একটি লিটিল ম্যাগ কি ভাবে সাহিত্য সংস্কৃতির মানচিত্রে নিজস্ব ছাপ রেখে টিকে আছে ভেবে ওঠাও অকল্পনীয়। দুরন্ত অশ্বারোহীর ভূমিকায় মাটি দাপাচ্ছে। নিত্য নতুন পরিকল্পনায় মানুষের দরোজায় হাজির হচ্ছে এজন্য গোধূলি-মনের আড়ালে যে ব্যক্তিত্ব তাকে শুধু অভিনন্দন জানিয়ে ছোট করতে চাই না, গর্ব অনুভব করি সহযোগী যোদ্ধা হিসাবে।

প্রতিটি সংখ্যা নিয়মিত পাঠিয়ে আপনি অনেক ঋণী করেছেন। তবে আশা ভালবাসার ঋণ শোধ করার দায়িত্ব বা গরজ নেই, কেননা তার ভাণ্ডার সংকুচিত নয়। অকৃপণও নয়।

দুই বাংলার সংস্কৃতি বিনিময় পটভূমি বিস্তৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। আগামী-কালের সাহিত্য যাত্রীরা স্বচ্ছন্দে খুঁজে নিতে পারবে নিজস্ব পথ, সময়ের ক্রান্তিকাল উন্মোচিত করবে গোধূলি-মনের জন্ম ও জীবন।

নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও একাগ্রতা লিটিল ম্যাগের ইতিহাসে দুরূহ দায়িত্ব নিয়ে পরিচালনার ক্ষেত্রে এই কঠোরতম দিনে আপনার ভূমিকাটি নিঃসন্দেহে মূল্য এনে দেবে।

প্রফুল্ল অধিকারী
শান্তিধাম
রেলপার/আসানসোল-২

O লিটিল ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ সংগ্রহ করা আমার ফ্যাসন। কিছুদিন আগে কলকাতা গিয়ে আপনার গোধূলি-মনের চারটি সংখ্যা নিয়ে দারুণ অবাক হোলাম। গোধূলি-মন নামে একটি কাগজে এত সুন্দর সুন্দর প্রচ্ছদ বেরোয়, জানতাম না।

বৈশাখ সংখ্যায় অতুলনীয় প্রচ্ছদটির জন্যে শিল্পী লেখক অজিত রায়কে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা অজিত রায়ের প্রচ্ছদ আরও চাই।

আশীষ মিত্র
অজন্তা আর্ট সেন্টার
বীরভূম

জ্যঁ-পল সার্ত্র ঃ সাহিত্য চিন্তা

অমল হালদার

জ্যঁ-পল সার্ত্রের জন্ম হয় প্যারিসে ১৯০৫ সালে ২১শে জুন। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী তাঁর ছিল। 'একোল নরমান সুপেরিয়র' এর প্রাক্তন ছাত্র কিছুকাল উচ্চবিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপনা করেছেন। সাহিত্যিক, দার্শনিক ও বিশিষ্ট ফরাসী নাট্যকার সার্ত্রকে ১৯৬৪ সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়—নোবেল পুরস্কারের আড়াই লাখ টাকা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই আড়াই লাখ টাকা লণ্ডনের এ্যাপার সাইড কমিটিকে দেওয়া হয়।

সার্ত্রে বলেছেন—আমি চিরদিনই সরকারী মর্যাদা প্রত্যাখ্যান করে এসেছি, ১৯৪৫-এ আমাকে যখন 'লিজ-ন্ত অনার' দিয়ে ফরাসী সরকার সম্মানিত করতে চেয়ে ছিলেন, আমি তা গ্রহণ করিনি। আমার মনোভঙ্গী লেখকের সাহিত্য কর্মের প্রকল্পের ভিত্তিতে গঠিত। যে লোক রাজনৈতিক, সামাজিক বা সাহিত্যিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত তাঁর নিজস্ব মাধ্যম হল লিখিত বাক্য। তার ভেতর দিয়েই তিনি কাজ করতে পারেন।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে 'জর্জ বার্নার্ড'-শ এইভাবেই ৬,৫০০ পাউণ্ডের নোবেল প্রাইজের চেক ফেরত দিলেন। বললেন, আমার পাঠক এবং আমার যারা পৃষ্ঠপোষক তাঁরাই আমার ভরণপোষণের ভার নিয়েছেন। এই চেক যেন নিরাপদে উত্তীর্ণ সাঁতারুকে লাইফবেল্ট ছুঁড়ে দেওয়া (a lifebelt throw to swimmer who has already reached the shore in safety.) শেষ পর্যন্ত তিনি এই সুইডিস সাহিত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে যে Anglo-Swedish Literary Foundation স্থাপন করেছিলেন তার জন্য ব্যয় করেন। কিন্তু নোবেল প্রাইজ সম্পর্কে তাঁর উক্তিটুকু স্মরণীয় :— "I can forgive Alfrid Nobel for having invented dynamite But only a fiend in human form could have invented Nobel Prize." সার্ত্রে বলেন—স্বপ্ন ও কর্মজগৎকে নিয়ে সুররিয়ালিস্ট-এর এই যে জগৎ সেখানে আপাতত সত্যের উর্দ্ধে রয়েছে ভিন্ন ধরণের সত্যের অস্তিত্ব। সুররিয়ালিস্টদের কাছে, যা দেখেছি, যা পাচ্ছি, যা করেছি তা যেমন সত্য; তেমনি যা ভাবছি, যা চাইছি, যা স্বপ্নে দেখছি তা-ও তেমনি সত্য। কিন্তু মনে হয়, সত্যের এই অর্থ ব্যাপকতা অনেক সময় জীবনকে ভরিয়ে তোলে উৎকণ্ঠায়, ক্লান্তির ভারে ন্যুব্জ করে দেয় বেঁচে থাকার সুন্দর মুহূর্তগুলিকে। আবার এই উৎকণ্ঠা যেহেতু মনের, এই ক্লান্তি যেহেতু মনের··· তাই এই জাতীয় অন্তর্লীন শূন্যতাবোধহেতু মনের গোপনে রক্তাক্ত হওয়ার দুর্বিষহ যন্ত্রণা কোলরিজের 'Dejection : An Ode'. (১৮০২) কবিতায় প্রকাশ পেয়েছিল এইভাবে— 'A grief without a Pang, Void, dark and drear/A Stifled, drowsv, unimpassioned grief,/Which finds no natural outlet, No relief,/In word, Or sigh, Or tear.' ব্যক্তি মানুষের মনোলোকের ঐ শূন্যতাবোধ এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সুনির্দিষ্ট পরিধি অতিক্রমণের দুর্নিবার

বাসনাই (তা-সে আত্মহননের পথে সম্ভব হলেও) পাশ্চাত্যে বিশেষ দার্শনিকতত্ত্বে রূপ নিচ্ছিল উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে। অবশ্য পারিপার্শ্বের সঙ্গে ব্যক্তির দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক-জাত শূন্যতাবোধ আরও অনেক আগে সাহিত্যে রূপ নিয়েছিল, অন্তত ষোড়শ শপ্তদশ শতক থেকে।

তাঁ পল সার্ত্র তার সাহিত্যকর্মে ও দার্শনিক প্রবন্ধে ভাগ্য, বংশানুগতি, ফ্রয়েডীয় 'অবচেতনের' অনিবার্য প্রভাব সব কিছু অস্বীকার করে ব্যক্তি মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্বের সার্থকতা ও মূল্য ঘোষণা করলেন এই... মানুষ নিজেই নিজের কর্তা, নিজের জীবনকে সে নিজে যতটুকু গঠিত করে তোলে তার জীবন ততটুকুই। তাঁর গোয়েটজ্ (Lucifer and the Lord নাটকে) এর মুখে অস্তিত্ববাদীর বাণীই উদ্‌ঘোষিত হ'ল—The silence is God. The absence is God,-God is the loneliness of man. There was no one but myself ;—I alone decided on evil ; and I alone invented God... If God exists, Man is nothing, if man exists . * * *

* * * Absurd Drama : Penguin (1971) মুখবন্ধে Marlin Esslin লিখিত

অতঃপর গোয়েটজ্ জানিয়েছে- 'God does not exist'। কিন্তু যেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্বে এবং অনস্তিত্বে মানুষের অনস্তিত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভরশীল, অতএব ঈশ্বরই যখন নেই তখন এটাই একমাত্র সত্য যে, মানুষ আছে। দুঃখ যত তীব্রই হোক, অস্তিত্ব যত বিপন্ন হোক, যত সত্যই হোক যে এই পৃথিবীতে আমরা এসেছি 'Only for once. Once and no more And never again. তবু একথা ঠিক যে, এ জীবন বর্জনীয় নয়।✱

✱ The Duino Elegies (the Ninth Elegy) : Rilke, J. B. Leishman—অনুদিত।

যদিও সার্ত্র উপন্যাসের পৃষ্ঠায় লেখকের সর্বময়তার বিরুদ্ধে সরব হয়ে মোরিয়াকের সমালোচনা করে বলেছিলেন—একথা বলার সময় এসেছে আজ যে ঔপন্যাসিক ঈশ্বর নন ; কিন্তু সার্ত্র-র স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন ঔপন্যাসিক যিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন তিনি ও কি এক অর্থে ঈশ্বর সদৃশ ন'ন ? শুধু তাই নয়, তাঁর 'The Age of Reason'-এ ম্যাথুর চিন্তা ও সক্রিয়তার কি তারই স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না ?

ডবু-জে হারভে তাঁর একটি প্রবন্ধে এই বিষয়ে ঠিকই বলেছেন, তাত্ত্বিক হিসাবে সার্ত্র শিল্পীর সর্বময়তার সমালোচনা করলেও কার্যত নিজের সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেই তত্ত্বকে নিজেই খণ্ডন করেছেন।

সাহিত্যের একদিকে লেখক, অন্যদিকে পাঠক, একজন দাতা অপরজন গ্রহীতা। মাধ্যম ভাষা। সাহিত্যিক যে ভাষার মাধ্যমে তার অভিজ্ঞতা, আবেগ বা অনুভূতি প্রকাশ করেন, পাঠকের কাছে তার ভাবের উদ্দীপক বস্তুমাত্র। এই ভাষা মাধ্যমের উদ্দীপনাই পাঠককে সাহায্য করে লেখকের বক্তব্যের গভীরে প্রবেশ করতে। লেখক ও পাঠকের মধ্যে দাতা ও গ্রহীতার যে সম্পর্ক আছে, সেখানে দাতা লেখক যদিও সর্বত্র নিজের প্রজ্ঞা, ইচ্ছা ও পরিকল্পনার মুখোমুখি হয়ে থাকেন। তবু যে সাহিত্য তিনি রচনা করেন তা তিনি নিজের জন্য করেন না।

সার্ত্র'র অভিমত হচ্ছে, সাহিত্যিকের লক্ষ্য পাঠক-সমাজ এবং লেখক ও পাঠকের সমবায় সম্বন্ধেই লেখকের মনোজগতের সত্ত বাস্তব রূপ লাভ করে। শিল্পের জগতে শিল্পীর সর্বময় প্রভুত্ব মানেন না সার্ত্র।

কিন্তু সার্ত্র বিষয়-নির্বাচন ও শিল্প রূপায়ণে লেখকের স্বাধীনতা স্বীকার করেও সৃষ্টির মূল ভার অর্পণ করেছেন লেখক নয়, পাঠকের উপরেই। তাঁর

মতে, লেখকের দায়িত্ব 'প্রকাশ' করা, আর পাঠকের দায়িত্ব সৃষ্টি করা।

যে ভঙ্গিতে 'ক্রাইম এণ্ড পানিশমেন্টে'র রাসকলনিকভ চরিত্রের জন্মদাতা তিনি শুধু রাসকলনিকভ-কে তাঁর কল্পলোক থেকে বাইরের জগতের কাছে প্রকাশ করেছিলেন মাত্র, কিন্তু রাসকলনিকভের প্রকৃত অস্তিত্ব স্রষ্টা পাঠকের হৃদয়ে। সার্ত্র-র এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে তিনি মনে করতেন, পাঠকের মনোলোকই সাহিত্যের প্রকৃত জন্মভূমি।

সার্ত্রর ব্যাখ্যানুযায়ী সাহিত্যিক ও পাঠকের সহযোগিতায় যে সাহিত্য জগৎ সম্পূর্ণতা লাভ করে সেখানে যদ্যপি লেখক নির্বাসিত ন'ন তথাপি সাহিত্যের প্রকৃত পাঠকের স্বীকৃতিতে। একটি উপমার দ্বারা তিনি জানিয়েছেন... যদি ও একটি আনন্দদায়ক প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে, আমি বুঝি যে আমি এই দৃশ্যের রচয়িতা নই, তবু আমি জানি আমার চোখের সামনে গাছ-পাতা-ঘাস-মাটির ঐক্যমূর্তির সৌন্দর্য্য সম্ভব ছিল না আমি ছাড়া। ঠিক তেমনি পাঠকের স্বীকৃতি ছাড়া সম্ভব নয় সাহিত্যের অস্তিত্ব, যত আগ্রহেই লেখক তাকে প্রকাশ করুন না কেন।

সাহিত্য বিচারে সমালোচকের বা পাঠকের স্বতন্ত্র স্বাধীন বিচার ক্ষমতার উপর গুরুত্ব আরোপ এবং নিজের সৃষ্টির রসাস্বাদনে লেখকের ব্যক্তিত্বে সমালোচক ব্যক্তিত্বের জাগরণে, সার্ত্রর নন্দনতত্ত্বে দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অস্তিত্ববাদীদের সম্পর্ক ভিন্ন গবেষণার বিষয়, তবু সার্ত্রের মতের সদৃশ রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে: কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়; তখন স্ব-স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহবা সৌন্দর্য, কেহবা নীতি, কেহবা তত্ত্ব সৃজন করিয়া থাকেন।... "কাব্য হইতে কেহবা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহবা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহবা নীতি বা বিষয়জ্ঞান উদ্ঘাটন করিয়া থাকেন, আবার কেহ বা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না... যিনি যাহা পাইলেন তাহাই লইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে ঘরে ফিরিতে পারেন, কাহারও সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখিনা, বিরোধে ফলও নাই।" (কাব্যের তাৎপর্য: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পঞ্চভূত গ্রন্থে) অভিরুচি অনুযায়ী কাব্য থেকে ইতিহাস, নীতি বা দর্শনের মর্মার্থ সন্ধানের—স্বাধীনতা আছে প্রত্যেক স্বাধীন ইচ্ছা-বিশিষ্ট পাঠকের, রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যই সার্ত্রর 'বিষয়গত বাস্তবতা' তত্ত্বের ভিত্তিতে নতুন করে ব্যাখ্যা লাভ করল।

সার্ত্র ও নীৎসে, এই দুই অস্তিত্ববাদী দার্শনিকের সাহিত্য সম্পর্কে বক্তব্য এবার সূত্রাকারে সাজানো যেতে পারে:—

১) যদিও লেখক সমকাল সচেতন, তবুও তাঁর সাহিত্যে তিনি গড়ে তুলবেন এক মায়ার জগৎ, চির পরিচয়ের মাঝে নব পরিচয়ের জগৎ।

২) সাহিত্য বাস্তবের হুবহু অনুকরণ নয়।

৩) বিষয় নির্বাচনে স্বাধীন ইচ্ছা বিশিষ্ট সাহিত্যিক ঈশ্বরের মতোই স্বাধীন, যদিও তাঁর সর্বজ্ঞতা ও সর্বময়তা স্বীকার্য নয়।

৪) সাহিত্যিক সাহিত্যকর্মকে দৃষ্টিগোচর করান, কিন্তু সাহিত্যের প্রকৃতি স্রষ্টা হচ্ছেন পাঠক। পাঠকের চেতনালোকেই সাহিত্যের প্রকৃত অস্তিত্ব।

৫) সাহিত্যের রচয়িতা হিসেবে লেখকের স্বাধীনতা যতটা, সাহিত্যের আস্বাদক ও বিশ্লেষক হিসেবে পাঠকের স্বাধীনতা তার চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়।

ক) এঁদের সকলের মতোই কাব্য সাহিত্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ, এবং (খ) সাহি-

ত্যের জগতে পাঠক বা রসিকের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।...

যদিও অ্যারিষ্টটল ও 'ট্রাজেডি' আলোচনা প্রসঙ্গে দর্শকের ভূমিকায় গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন, তবু তাঁর 'ট্রাজিক প্লেজার'-এর অসাধারণত্ব ব্যাখ্যা যত চমকপ্রদই হোক না কেন, পাঠক বা দর্শকের হৃদয়ে রসাভিব্যক্তির যে সুক্ষ্ম প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছিলেন অভিনব গুপ্তাচার্য, সমগ্র পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য দর্শনে তার কোন তুলনাই নেই।

পাঠকের সত্যোপলব্ধির জগতেই সাহিত্যের প্রকৃত জন্ম, অস্তিত্ববাদী সার্ত্রের এই বিশ্বাসের মূলে ছিল তাঁর 'বিষয়াগত বাস্তবতায়' আস্থা। সার্ত্র ছিলেন পাঠকের মনের সৃজনধর্মের উপর শ্রদ্ধাশীল।

১৯৪৬-এ প্রকাশিত হয় সার্ত্র সম্পাদিত সাহিত্য পত্র 'Les Temps Modernes' এই পত্রিকা উত্তর-কালে বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। এই কালেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটল, যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের মহান চিন্তানায়ক হিসাবে জাঁ পল সার্ত্র সর্বত্র স্বীকৃতিলাভ করলেন। প্যারিসে 'কাফে দ্য ফোর' যেখানে সার্ত্র ও বন্ধুদের মজলিস বসত তা তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হল।

শ্রীমতী বোভোয়া লিখেছেন— সার্ত্রের পিঠে অনেক ঘা হয়ে গিয়েছিল। চাক-চাক ঘাগুলো ভয়ঙ্কর দেখতে। সার্ত্রের মৃত্যুর পর সিমোন জেনে-ছিলেন ওগুলো সাধারণ ঘা নয়।... গ্যাংগ্রিন...।

শ্রীমতী সিমোন বোভোয়া লেখেন, সার্ত্র জেনে ফেলেছিলেন যে তাঁর মৃত্যু এগিয়ে আসছে! তখন সার্ত্রের একমাত্র দুশ্চিন্তার কারণ, অর্থের অভাব। জীবনের শেষ কটা বছর ধরেই অর্থকষ্ট গেছে তাঁর।

১৬ এপ্রিল ১৯৭৯ সার্ত্র ৭৪ বছর বয়সে পর-লোক গমন করেন। কিন্তু তাঁর সৃষ্টি সাহিত্য জগতের কাছে অমর হয়ে থাকবে।

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

O আশাকরি কুশলে আছেন। 'গোধূলি-মন' পত্রিকার মে ও জুন '৮৫ সংখ্যা সময় মতো পেয়েছি, কিন্তু পারিবারিক কিছু কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য সময় মতো উত্তর দিতে পারিনি। এ কারণে ত্রুটী নেবেন না। প্রতিমাসেই অপেক্ষায় থাকি, কোন পত্রিকা পাই বা না পাই 'গোধূলি-মন' নিয়মিত পাবই, এক-জন লিটিল ম্যাগ এর সম্পাদকের এযে কতবড় পরিশ্রম এবং কতখানি অনুরাগ তা আপনার কাগজ পেয়েই বুঝতে পারি। অবাক হই কিভাবে নিয়মিত এভাবে কাগজ বের করে চলেছেন। একসময় 'চান্দ্রমাস' নামের পত্রিকা সম্পাদনা করেছি। সত্তরের দশকে। কিন্তু ৭ বছর চালানোর পর কিভাবে যে একদিন বন্ধ করে দিতে হ'ল ভাবতেও পারি না। তাই আপনাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারি না। যে সংখ্যায় সোফি-ওর রহমানের অনেকগুলি কবিতা পড়তে পেরে ভালো লাগলো। ভালো লাগলো দ্বিজেন আচার্য ও অরুণ-কুমার চক্রবর্তীর কবিতা। শীতল দাসের নিবন্ধটি ছোট, কিন্তু আকর্ষণীয়। জুন সংখ্যায় অমল হালদার-এর আলোচনাটি অন্য আলোর দিশারী। 'চেখভ'-কে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। গৌর বৈরাগী কম লেখেন কিন্তু ভালো লেখেন। ওর 'খেলতে খেলতে' মনে থাকে। ওকে আরও একটু ব্যবহার করুন। অমিতেশ মাইতি ও সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা ভালো লেগেছে। আর চিঠিপত্র---বেশ মজার, তথ্যপূর্ণ। সার্ত্র-সংখ্যার জন্যে অপেক্ষায় রইলাম।

গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
২০, চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা--২৫

জাঁ পল সার্ত্রর

গল্প

ইরোস্ট্রেটস

অনুবাদ : অজিত রায়

মানুষকে ওপর থেকে দেখা উচিত। আলো নিভিয়ে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ো। কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ হবে না যে তুমি তাকে লক্ষ্য করছো। মানুষ নিজের সামনের জিনিস সম্পর্কে সজাগ থাকে, কখনও কখনও পেছনের জিনিস সম্পর্কেও, কিন্তু সমস্ত সচেতনতা পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি উচ্চতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আট তলা উঁচু থেকে ভাবি হ্যাট কেমন দেখায়, কে কখন সেটা দেখেছে? নিচের দৃশ্যই মানবতার বড় শত্রু, অথচ তার মোকাবিলা করার কৌশল ওদের জানা নেই। হা: হা: হা:! জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আমি হাসতে থাকি।

আটতলার ঝুল বারান্দা; এটাই সেই জায়গা যেখানে আমার সারাটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। তোমাকে বস্তু প্রতীকের সাথে সাথে নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বকেও স্বীকার করতে হবে। নইলে সব উবে যাবে। অন্য মানুষের তুলনায় আমার শ্রেষ্ঠত্ব কতটুকু? অবস্থাগত শ্রেষ্ঠত্ব, তার বেশি কিছু নয়। এই শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে আমি অনুক্ষণ নিরীক্ষণ করি। সম্ভবত এই কারণেই নেত্রদামের মিনার, আইফেল টাওয়ারের চূড়া, সাক্রে-কোউর, রুয়ে ডু দাম্বের চেয়ে উঁচু আমার আটতলা ভবনটিকে আমার এত পছন্দ।

নিচে এলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। মানুষগুলোকে উঁচু ভাবতে পারি না। ওরা আমারই সমান লম্বা। একবার একটা মরা মানুষকে দেখেছিলাম। লোকটার খোলা চোখের সতর্ক চাউনি আর জমাট রক্ত দেখে নিজের মনেই বলেছিলাম, 'এ তো তুচ্ছ!' কিন্তু তবু আমি লাশটাকে দেখে বেঁহুশ হয়ে পড়েছিলাম। ওরা ধরাধরি করে আমাকে ওষুধের দোকানে নিয়ে গিয়েছিল, চড়চাপড় মেরেছিল, তারপর কী যেন খেতে দিয়েছিল। ইচ্ছে করলেই আমি ওদের খুন করতে পারতাম। আমি জানি ওরাই আমার শত্রু, কিন্তু ওরা সেটা জানে না। ওদের ধারণা আমিও ওদের মত। যদি জানতে পারে আমি ওদের বিষয়ে কী চিন্তা করি, তবে নিশ্চয়ই আমাকে মেরে ফেলবে। কয়েকবার জানতে পেরে ধোলাইও দিয়েছে। স্টেশন হাউসে দু-ঘণ্টা ধরে আমাকে জুতোপেটা করেছে। আমি যেন মার খাওয়ার জন্যই জন্মেছি। আমি খুব রোগাসোগা আর দুর্বল। রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে এর ওর ধাক্কা খাই, হোঁচট খাই, পড়ে যাই। ওদেরকে আমি ভয় পাই, এটাই আমার ঘৃণার কারণ। অবশ্যি অন্য কারণও আছে।

আমি একটা রিভলবার কিনেছি। তুমি নিজের কাছে কোন বিস্ফোরক ও শব্দকারী যন্ত্র রাখলে তোমাকে সেটা সাহস জোগাবেই। আমিও এখন বেশ সাহসী। ফি রবিবারে পিস্তলটা আমার পকেটে থাকে। মন মন প্রস্রাবাগারে গিয়ে ওটাকে পরখ

করি। লোকে ভাবে আমি বুঝি পেচ্ছাপ করছি, কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি তা করি না।

এক শনিবারের রাতে আমি মানুষ খুন করার সিদ্ধান্ত নিলাম। লি-এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। মেয়েটা রুয়ে মোঁতাপার্নাস্সের হোটেল-চত্তরে ধান্দা করে। আমি কখনও কোন মেয়ের সঙ্গে বিছানায় শুইনি, ওদের যৌন কুসুম নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করিনি। ব্যাপারটাকে আমি ঘৃণা করি। শুনেছি এই সময় পুরুষেরা মেয়েদের ওপর উপুড় হয়ে শোয়, আর মেয়েরা থাকে চিৎ হয়ে। আর মোটের ওপর ফায়দা লোটে মেয়েরাই। আমি এসবের পক্ষে নেই। আমার ঘৃণার কাছে যে কোন নারী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য।

দুকেন্স হোটেলে প্রতি শনিবার লী আমার সঙ্গে কাটায়। পোশাক খুলে পুরোপুরি ন্যাংটা হয়ে আমার সামনে দাঁড়ায়। আমি ওকে স্পর্শমাত্র না করে ওর নিরাবরণ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি।... এক শনিবার লী এলো না। ভাবলাম বুঝি সর্দি হয়েছে। আমি অন্য মেয়ের সন্ধানে গেলাম। রুয়ে ওডিসায় একজন কালো চুলের মেয়ে ছিল। একটু বয়সী। ভরা যৌবন। বুক দুটো বেশ উঁচু আর ফুলকো ফুলকো। প্রৌঢ়া রমণীদের আমি ঘৃণা করি না। ওরা নির্বস্ত্র হলে অন্যের চেয়ে বেশি ন্যাংটা লাগে।... কিন্তু মেয়েটা আমার চাহিদা সম্পর্কে কিছুই জানে না। জানাতে ভয় পাচ্ছিলাম। যদি রেগে যায়? পয়সা কড়ি ছিনিয়ে আচ্ছা করে ধোলাই দিয়ে হয়ত ভাগিয়ে দেবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনস্থির। ঠিক করলাম, ঘরে এনে রিভলবার দেখিয়ে ওকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করিয়ে নেব। তারপর ভাগ্যে যা থাকে! পিস্তলটা পকেটে পুরে দুরু দুরু বক্ষে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এই প্রথম মুখোমুখি। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কেশদাম। সুচারু নিটোল পীনোন্নত দুটো স্তন। টিকলো নাক। চিবুকটি অনবদ্য। খাঁজকাটা থুতনিতে একটি দুর্লভ টোল। পাতলা আরক্ত চুম্বন মাদকতাপূর্ণ অধরোষ্ঠ। ওকে দেখে আমার প্রতিবেশিনী, পুলিশ সার্জেন্টের যুবতী বউয়ের মুখটা মনে পড়ল। আমি খুশি হলাম। অনেকদিন থেকে ওকে ন্যাংটা দেখার লোভ ছিল। সার্জেন্টের অনুপস্থিতিতে আমি ওদের জানলার দিকে চোখ গেড়ে তীর্থের কাকের মত বসে থাকতাম, বউটা কখন কাপড় ছাড়বে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, বরাবরই সে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে পোশাক বদলাতো।

হোটেল স্তেলার ছ-তলায় একটা রুম খালি ছিল। মেয়েটা একটু মোটা হওয়ার দরুণ সিঁড়ি ভাঙার সময় হাঁপাচ্ছিল। ছ-তলায় উঠে ওর বুক দুটো অসম্ভব রকমের ওঠানামা করছিল, যেন ব্রা উপচে ছিটকে বেরিয়ে পড়বে। স্তন দুটির যেখানে মিলন ঘটেছে, সেই খাঁজের ভেতর হাত চালিয়ে সে একটা চাবি বের করল। তারপর আমার দিকে চেয়ে কষ্ট হাসি হেসে বলল, 'বেশ উঁচু।' আমি জবাব না দিয়ে ওর হাত থেকে চাবিটা নিয়ে দরজাটা খুললাম। তখনও আমার হাতে পিস্তলটা ধরা ছিল। বাতি জ্বলল। ফাঁকা ঘর। ওয়াশ বেসিনের ওপর এক টুকরো সাবান। আমার হাসি পেল। তোয়ালে কিংবা সাবানের প্রয়োজন আমার নেই। মেয়েটা আমার পেছনে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। আমাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছিল। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। মেয়েটা নিজের চকচকে ঠোঁট এগিয়ে দিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা ধাক্কা দিয়ে ওকে দূরে সরিয়ে দিলাম।

'কাপড় খোলো!' আদেশের সুরে বললাম।

ঘরে কাপড়ে মোড়া একটা আরাম কেদারা ছিল। বসে পড়লাম আয়েশ করে। সিগারেটের তাগিদ অনুভব করলাম। মেয়েটি নিজের আবরণ মোচন

করতে করতে হঠাৎ বিস্ময় ভরা চোখ নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'নাম কি তোমার?' আমি ওর পাছার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম।

'রেনি।' ও বুকের বোতাম খুলতে খুলতে বলল।

'বেশ বেশ রেনি, তাড়াতাড়ি করো। আমি অপেক্ষা করছি।'

তুমি পোশাক খুলবে না?'

'তুমি খুলতে থাকো,' আমি বললাম, 'আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না।'

রেনি ওর কোমরে এঁটে থাকা জাঙিয়াটা খুলে ফেলল। তারপর ব্রা। দুটোই কাপড়ের স্তূপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে সে আমার সামনে দাঁড়াল। ওর যৌবনপুষ্ট দেহ ফেটে বেরোচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এক মদির আহ্বান। গোড়ালি থেকে মসৃণ কবোষ্ণ জংঘা পর্যন্ত টের মেলে সুষমার। মতিন পাখির তলপেটের মত নরম-তুলতুলে পেট। সুবর্ত নাভি। নাভি এমন গভীর হলে কামের তীব্রতা বোঝায়। বেশ্যাদের শরীরেও সন্তাপ থাকে. কিন্তু না ছুঁলে শৈত্য বা উষ্ণতা বোঝা যায় না। কিন্তু আমি ছোঁবার পক্ষপাতি নই।

'তুমি কি খুব ক্লান্ত, ডার্লিং?' রেনি আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি নিজের প্রেমিকাকে দিয়েই সবকিছু করাতে চাও?' বলতে বলতে সে আমার চেয়ারের হাতল দুটো ধরে আমার হাঁটুর ওপর বসবার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'না, তেমন কিছু নয়।' আমি ওকে বললাম।

'তবে? তুমি আমার কাছ থেকে কি চাও?' ওর মাই দুটো গাম্ভীর স্তনের মত প্রসন্ন উদারতায় ঝুলছিল।

'কিছু না। শুধু পায়চারী করো। আমার আশেপাশে ঘোরো' আমি বললাম, এর বেশি আমি তোমার কাছ থেকে কিছু চাই না।'

সে অখণ্ড অঙ্গভঙ্গি নিয়ে ঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণ ঘোরাফেরা শুরু করল। পদসঞ্চারে যেরকম অঙ্গ দুলতে লাগল, মনে হল যেন লাবণ্যের নদীতে ছোট ছোট বীচিকলা। পরিপুষ্ট বিপুল নিতম্বের পেশীগুলো প্রতি বিক্ষেপে যেন আলাপনে মত্ত। কিন্তু মেয়েটা যখন নিজের পীন, বর্তুল ও পরস্পরআশ্লিষ্ট স্তন, ক্ষীণ কটি, গভীর নাভি আর বিশাল উরু ও জঘন নিয়ে পায়চারী করতে লাগল তখন আমার মনে হলো মেয়েদের নগ্ন অবস্থায় হাঁটাচলা করতে দেখার মত নীরস, ঘৃণ্য আর ক্রোধোদ্রেককারী ব্যাপার আর কিছুই নেই। মাটিতে সোজাসুজি হাঁটতে পারে না এরা। উরুর থলথলে মাংস দিয়ে যৌন কুসুমটিকে ঢাকবার নিষ্ফল প্রয়াস করে। রেনিও কোমরটাকে ধনুকের মত বেঁকিয়ে হাত দুটো ঝুলিয়ে হাঁটছিল। আমি যেন স্বর্গবাসী; গরম চাদরে আকণ্ঠ আবৃত হয়ে শান্তভাবে বসে ছিলাম। আর মেয়েটা নিজের টলমল যৌবনের সব ক'টি কলা একে একে আমার সামনে প্রদর্শন করছিল। এক সময় ও একটা নোঙরা ইঙ্গিত করে হাসল। আমিও কী যেন বললাম। একমুখ লজ্জা মেখে ও বলল— অসভ্য।' তারপরেই নিজের ব্রেসিয়ারটা তুলতে গেল……

'এ্যাই।' আমি ধমকে উঠলাম, 'এখনও সময় হয়নি। একটু বাদে আমি তোমাকে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক দেব। কিন্তু সেই পয়সার দাম আমি চাই।'

আমার ধমকানিতে সে ঘাবড়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই কাপড়ের স্তূপ থেকে জাঙিয়াটা তুলে নিল: 'ঢের হয়েছে। তুমি ঠিক কি চাও বলো তো? আমাকে কি বোকা বানাতে ডেকেছো?'

আমিও রেগে গিয়ে পিস্তলের নলটা ওর দিকে তাক করলাম। ও ভয় পেয়ে অসহায় চোখে তাকাল। তারপর জাঙিয়াটা ফেলে দিয়ে আবার পায়চারী শুরু

করল। তারপর আমি নিজের ছড়িটা ওকে দিলাম। যা যা বললাম, একে একে সব করে গেল সে। শেষে আমি উঠে পড়লাম: 'আবার দেখা হবে।' পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক গুঁজে দিলাম ওর হাতে: 'এতোগুলো পয়সার বিনিময়ে আশা করি আমি খুব বেশি কষ্ট দিই নি তোমাকে।' পয়সাগুলো নিয়ে সে চলে গেল।

রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মেয়েটাকে মনে পড়ল। উদোম খোলা বুক দুটো, ভীরু চোখ, সিঁড়ির ধাপে কেঁপে কেঁপে ওঠা ওর থলথলে পেট—সব মনে পড়ল। হায় কী বোকামী! মেয়েটাকে যেতে দেওয়া ঠিক হয়নি। সাবাড় করে দেওয়া উচিত ছিল। ওর তলপেটের নরম অংশটার চারপাশে কয়েকটা ছেঁদা করে দিলে ভাল হতো। সেই রাতে এর পরপর তিনটে রাত আমি ওর নাভির স্বপ্ন দেখলাম। কালচে, ঘামঝরা সুগভীর নাভিকুণ্ড! তার চার দিকে ছটি ছোট ছোট লাল রঙের ছেঁদা।

এই ঘটনার পর থেকে আমি রিভলবার ছাড়া এক মুহূর্তের জন্যও কোথাও বেরোই না। লোকের পিঠ দেখে বেড়াই আর ভাবি এদেরকে খুন করলে কেমন হয়।… প্রতি রবিবার শাস্ত্রীয় সংগীতসভার শেষে শাতেলের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করাটা আমার নিত্য অভ্যেসে দাঁড়িয়েছে। রোজ সন্ধে ছ-টার সময় আমি কলিং বেলের আর্তি শুনি। দরজা হাট করে খুলে রেখে বেরিয়ে পড়ি। লোকে চোখে রঙীন স্বপ্ন মেখে ঘুরে বেড়ায়। আর আমার স্বপ্ন? আমি ওদের সাবাড় করার স্বপ্নে বুঁদ। ঠিক করেছি মেয়েদের প্রাণে মারব না। ওদের উত্তপ্ত যৌনাঙ্গে পিস্তলের নল ঢুকিয়ে ফেড়ে দেব, কিংবা নিতম্বে—যাতে ওরা নেচে উঠবে।

এখনও সিদ্ধান্তটা স্থিরীকৃত নয়। কিন্তু ইতি-মধ্যেই ডেনফার্ট রোশেরোর শুটিং গ্যালারিতে প্যাক-টিস শুরু করে দিয়েছি। আমার সহকর্মীরা অভি-বাদনও জানিয়েছে। কিন্তু ওদের করমর্দনে আমি বরাবরই ভীত। করমর্দনের সময় ওরা দস্তানা খুলে উলঙ্গ হাতগুলোকে এমনভাবে নাড়ায়, যা আমার কাছে চরম অশ্লীল ঠেকে। আমার সহকর্মীরা প্রায় সবাই নিষ্কর্মা। ওরা লিণ্ডবার্গের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমি ওদেরকে জানাই: 'আমার কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ নায়ক বেশি পছন্দ।'

'নিগ্রো?' মসি অবাক হয়।

'না নিগ্রো নয়। কালো, যেমন কালো জাদুতে। লিণ্ডবার্গ শ্বেত নায়ক। ওকে তাই ভাল লাগে না।'

'বাপু, আটলান্টিক পার হওয়া কি এতোই সোজা?' বুখসিন তেঁতো গলায় বলল।

কালো নায়ক সম্বন্ধে আমার ধারণাটা ওদেরকে জানালাম।

'অরাজকতাবাদী।' লামেসিস মন্তব্য করল।

'না,' আমি দৃঢ় গলায় বললাম, 'অরাজকতা-বাদীরা একদিক থেকে মানুষকে ভালবাসে।'

'তবে সে একটা পাগল।'

মসির কিছুটা পড়াশোনা আছে। সে হস্তক্ষেপ করল: 'আমি তোমার নায়ককে চিনি।' সে আমাকে বলল, 'তার নাম ইরোস্ট্রেটস। সে রাতারাতি বিখ্যাত হতে চেয়েছিল, তাই ইফিসাসের মন্দিরটাকে পুড়িয়ে ফেলার চেয়ে সহজ উপায় তার মাথায় আসেনি।'

'আর ওই মন্দিরটা যে গড়েছিল, তার নাম কি?'

'আমার মনে নেই।' মসি স্বীকার করল: 'সম্ভবত কেউই তার নাম জানে না। দু হাজার বছর আগে ইরোস্ট্রেটসের মৃত্যু ঘটেছে। তার কাজকর্ম তোমাকে প্রেরণা যোগাতে পারে, আমাদের নয়।'

ইরোস্ট্রেটস আমার ক্ষেত্রে সত্যিই প্রেরণাদায়ক। এমনিতে তার কাজ ভয়ংকর মনে হতে পারে, কিন্তু

সামগ্রিক বিচারে বেশ সুন্দর। আমি স্বয়ং একটি রিভলবারের মত, টরপেডোর মত, বোমার মত। আমিও একদিন ফেটে পড়ব এবং ম্যাগনেশিয়ামের মত ক্ষুদ্র অথচ তীক্ষ্ণ আলোর মত বিস্ময় ছড়িয়ে পড়ব। আমি অরাজকতাবাদী ?

এরপর ওদের সঙ্গে আর কোন আলোচনা করিনি। হপ্তা কয়েক অফিসে নিজের মুখও দেখাইনি। সড়কে সড়কে ঘুরে কিংবা নির্জন ঘরে বসে ভবিষ্যতের কাজকর্ম নিয়ে নিজের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করেছি। পরিণামে, অক্টোবরের গোড়ার দিকে ওরা আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করল। মুক্তি পেয়ে তখন আরাম করে বসলাম চিঠি লিখতে। একটি চিঠির ১২০টি কপি তৈরি করলাম।

মহাশয়,

আপনি একজন সফল লেখক। আপনি মানবতাবাদী। সব ধরণের মানুষের প্রতিই আপনার সমান দরদ। দেহের অন্য অঙ্গের চেয়ে হাতের প্রতিই আপনার যত্ন বেশি। কেননা প্রতিটি হাতে পাঁচটি করে আঙুল থাকে এবং প্রত্যেকটির সঙ্গে আপনার বুড়ো আঙুলের যোগ রয়েছে। লোকে আপনার বই পেলে লোভীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেগুলি তারা সুসজ্জিত আরাম কেদারায় বসে পাঠ করে এবং মহৎ প্রেম নিয়ে চিন্তা করে।... তাদের অনেক খামতি--কুরূপতা সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা, পয়লা জানুয়ারিতে বেতনবৃদ্ধি না হওয়া ইত্যাদি দুঃখকে প্রশমিত করতে আপনার লেখার জুড়ি নেই। তাই ওরা খুশি হয়ে আপনার নবীনতম গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করে: 'দারুণ লেখা!'

আমার ধারণা, আপনি সেই ব্যক্তিটির সম্পর্কে আগ্রহী হবেন, মানুষের প্রতি যার বিন্দুমাত্র ভালবাসা নেই। ভাল কথা, আমিই সেই মানুষ; এবং আমি মানুষকে এত কম ভালবাসি যে এক্ষুনি বাইরে গিয়ে আধ ডজন লোককে খুন করতে পারি। এটা আলবৎ অমানবিক ? সভ্যজনোচিত কাজ নয় নিশ্চয়ই ?... আপনি কি ভাবছেন, বুঝেছি। কিন্তু যেসব জিনিস আপনাকে আকৃষ্ট করে, সেসবের প্রতি আমার দারুণ ঘৃণা। আমি আপনারই মত মানুষকে বাঁ হাতে ইকোনমিক রিভিউয়ের পাতা চিবিয়ে খেতে দেখেছি। এটা কি অন্যায় যে আমি সামুদ্রিক সিংহকে ভোজনরত দেখতে বেশি পছন্দ করি ?... মানুষেরা যখন মুখ বন্ধ করে চিবোয়, ওদের চোয়াল ওঠানামা করে, তখন কেমন কুৎসিত দেখায়। ওরা যেন ক্রমশ দুঃখের দিকে এগোচ্ছে। আমি জানি ওদেরকে আপনি পছন্দ করেন; আপনার মতে এটি আত্মার সতর্কতা। কিন্তু আমি এটাকে বরদাস্ত করতে পারি না।

যদি আমাদের মধ্যে কেবলমাত্র রুচিগত বিরোধই থাকত, তবে আপনাকে কষ্ট দিতাম না। কিন্তু সমস্ত কিছু এমনভাবে ঘটে যেন তামাম শালীনতা আপনার মধ্যেই আছে, আমার মধ্যে কিছুই নেই। আমি পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে তো স্বাধীন, যদি আমি মানুষকেই অপছন্দ করি তবে আমি অপদার্থ এবং সূর্যালোকের নিচে স্থান পাওয়ার অযোগ্য। ওরা জীবনের ওপর একাধিপত্য বিস্তার করেছে। আশা করি আপনি আমার মন্তব্য অনুধাবন করতে পারছেন। ৩৩ বছর ধরে আমি এমন একটি বন্ধ কপাটে করাঘাত করে চলেছি যার ওপর লেখা রয়েছে: 'আপনি যদি মানবতাবাদী না হন তবে প্রবেশ নিষিদ্ধ'। আমাকে সবকিছু ছাড়তে হয়েছে। নির্বাচন করতে হয়েছে: সেটা হয়ত বা অসংগতি, কিংবা করুণ প্রচেষ্টা।... মানুষ—আমার মতে, এক একটি সংগঠিত ও ক্ষণভঙ্গুর জাতি। আমার ব্যবহৃত অস্ত্র পর্যন্ত ওদের কব্জায়। যেমন শব্দ: আমি নিজস্ব ভাষা চেয়েছিলাম; কিন্তু যেসব শব্দ ব্যবহার

করেছি, জানি না কত মানুষের মাথায় ঘষা খেয়ে সেগুলি আমার কাছে এসেছে।··· কিন্তু এই যে আপনাকে চিঠি লেখার সময় সেই বহুব্যবহৃত শব্দগুলো ব্যবহার করছি, এটা মোটেই অসংগতি নয়। বরং এই শেষ বার। আমি বলছি, মানুষকে ভালবাসুন; অন্যথায় আপনাকে ওরা তাড়িয়ে দেবে। যাই হোক, আমি নির্বাসন চাই না। এক্ষুনি আমি পিস্তল নিয়ে সড়কে গিয়ে দাঁড়াব। বিদায়! হয়ত আপনিই সেই ব্যক্তি যার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটবে। আপনি হয়ত লেশমাত্র কল্পনা করতে পারছেন না যে আপনাকে খুন করতে পারলে কি পরিমাণ খুশি হবো। তা যদি না-ই ঘটে তবে আগামীকাল খবরের কাগজ পড়বেন: 'পল হিলবেয়ার নামক জনৈক ব্যক্তি উন্মাদ অবস্থায় এডগারকুইনেট মেন রোডের ওপর ছ-জন পথচারীকে হত্যা করেছে।' সংবাদপত্রের গল্পের গুরুত্ব আপনার চেয়ে কে বেশি বোঝে? আপনি হয়ত ভাবছেন আমি 'পাগল' নই। কিন্তু মহাশয়, আমার কথা বিশ্বাস করার জন্যে আপনাকে আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি।

পল হিলবেয়ার

চিঠিগুলোকে ১০২ খানি খামে ভরে ১০২ জন ফরাসী লেখকের নাম লিখে ঠিকানা লিখে বাণ্ডিল করে টেবিলের দেরাজে পুরে দিলাম। পরের দু হপ্তা আমি বাইরে বেরিয়েছি খুব কম। নিজেকে ক্রমশ অপরাধী করে গড়ে তুলেছি। প্রায়ই আয়নায় নিজের চেহারাটাকে পাল্টাতে দেখেছি। চোখ দুটো বড় বড় হয়েছে, যেন পুরো মুখটাকে গিলে ফেলবে। চশমা পরলে আমাকে কালো আর দয়ালু ঠেকে। কিন্তু আর চোখ দুটো শিল্পী অথবা খুনীর চোখের মত তীক্ষ্ণ। জানি গণহত্যার পর এ-চেহারায় পরিবর্তন আসবে। আমি দুজন রূপসী মেয়ের ছবি দেখেছি—ঝি'দের ছবি—যারা নিজেদের মনিবগুলোকে হত্যা করে তাদের সর্বস্ব লুঠ করেছিল। খুন করার আগের আর পরের ছবি। পরের ছবিতে ওরা বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।···

আমি ব্যয়বহুল জীবন শুরু করেছি। ভেবিনের এক রেস্তরাঁ থেকে আমার জন্যে সকাল-সন্ধ্যা খাবার আসে। ওয়েটার ঘন্টি বাজিয়ে ফিরে যায়। তারপর আমি উঠে দরজা খুলি। ফরাশের ওপর আমার জন্যে ধোঁয়া শুদ্ধ একটা বড় প্লেট রাখা থাকে।

২৭শে অক্টোবর সন্ধ্যায় আমার পকেটে মোট ১৭ ফ্রাঙ্ক এবং ৫০ সেণ্ট অবশিষ্ট ছিল। রিভলবার আর চিঠির বাণ্ডিলগুলো নিয়ে আমি নিচে নেমে এলাম। দরজাটা খোলা রাখলাম, যাতে কাজ সেরে দ্রুত ফিরে এসে ঘরে ঢুকতে পারি। শরীরটা ভাল নেই। হাত দুটো ঠাণ্ডা, মাথায় রক্তের চাপ। চোখ জ্বলছিল। হোটেল দেস এলোসিস আর স্টেশনারী দোকানগুলোর দিকে তাকালাম (ওখান থেকেই আমি পেন্সিল কিনেছিলাম), অথচ ঠিক চিনতে পারলাম না। আমি অবাক: 'এটা কোন্ সড়ক?' বুলেভা দ্যু মোঁত পার্নাস্তে লোকে লোকারণ্য। কেউ আমাকে ধাক্কা দিচ্ছিল, কেউ দিচ্ছিল চাপ, কনুয়ের খোঁচা। মুখ বুজে সব সহ্য করলাম। হঠাৎ দেখি আমি ভিড়ের মাঝে আটকে পড়েছি, ভয়ংকরভাবে একা এবং ক্ষুদ্র। যে কেউ খেয়াল মাফিক আমাকে আঘাত করছে। পকেটের পিস্তলটার জন্যে আমি ভীত ছিলাম। যে কেউ ধরে ফেলতে পারে! ওরা কড়া চোখে আমাকে দেখছিল, কেউ কেউ ঘেন্না মেশানো গলায় বলছিল: 'অ্যাই তুমি, তুমি···'। ওরা আমাকে মেরে গুঁড়িয়ে ফেলতে পারে, পুতুলের মত ওপরে ছুঁড়ে দিতে পারে। ভেবেচিন্তে আমি পরের দিন পর্যন্ত কাজ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। কুপোলে গিয়ে আহার সারলাম। তাতে ১৬ ফ্রাঙ্ক

আর ৮০ সেণ্ট খরচ করে ফেললাম। বাদবাকি ৭০ সেণ্ট গটারে ছুঁড়ে দিলাম।

তিন দিন অনাহারে শুয়ে কাটালাম। চোখে অন্ধকার দেখছিলাম। বাতি জ্বালানো কিংবা জানলা খোলার মত শক্তিও আমার ছিল না। সোমবার কে যেন দরজায় নক করল। আমি নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে অপেক্ষা করলাম। তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে কী-হোলের মধ্যে চোখ রাখলাম। কালো পোশাকের ওপর একটা বোতাম চোখে পড়ল। আবার বেল বাজল। তারপর সে চলে গেল। কে ছিল, জানি না রাত্তিরে স্বপ্ন দেখলাম তালগাছ, বহতা নদী, গম্বুজের ওপর নীললোহিত আকাশ। আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম না, ফি ঘণ্টায় টৌটিতে গিয়ে জল খেয়ে আসতাম। কিন্তু ছিলাম ক্ষুধার্ত। সেই বেশ্যাটাকে আবার দেখলাম— সম্পূর্ণ উলঙ্গ। পিস্তলের ভয় দেখিয়ে আমি ওকে হাঁটুর ভরে ঝুঁকে পড়তে এবং হাত-পায়ের ওপর ভর দিয়ে জন্তুর মত দৌড়তে বাধ্য করেছিলাম। তারপর ওকে একটা স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে গুলি করে দিয়েছি। এই বেশ্যাগুলো আমাকে এত জ্বালিয়েছে যে ওদের মেরে আমি সুখ পাই। স্বপ্ন ভেঙে নিথর হয়ে পড়ে রইলাম। ভোর পাঁচটায় নিচে নামার জন্য ব্যস্ত হলাম। কিন্তু ভিড় দেখে নামতে সাহস হলো না।

সকাল। খিদে পাচ্ছে। ঘামও ঝরছে। বাইরে রোদ্দুর। ভাবলাম আমি বন্ধ ঘরে অন্ধকারে আটকে পড়েছি। তিন দিন ধরে কিছু খাইনি। অথচ এক্ষুনি আমাকে বাইরে গিয়ে হাফ ডজন লোককে খুন করতে হবে।··· সন্ধে ছটা নাগাদ খিদেটা চাগিয়ে উঠল। রাগটাও। ফার্নিচারে হোঁচট খেলাম। তারপর বেডরুম আর বাথরুমের আলো জেলে দিয়ে জোর গলায় গান ধরলাম। পরে বেরিয়ে পড়লাম। সব কটা চিঠি ডাকবাক্সে ফেলতে পুরো দু মিনিট লাগল। রুয়ে ওডিসা থেকে বুলেভা দ্যু মোঁতপার্নাসে পৌঁছলাম। একটা কাঁচের জানলায় নিজের মুখ দেখলাম। তারপর পরিষ্কার উচ্চারণে বললাম: 'আজ রাত্তিরেই।'

রুয়ে ওডিসায় ফিরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। দুজন মেয়েমানুষ হাত ধরাধরি করে সামনে দিয়ে চলে গেল। যেতে দিলাম ওদের। কিছুক্ষণ পর তিনজন পুরুষ। ওদেরকেও ছেড়ে দিলাম: আমার দরকার ছ-জন। সাতটা পাঁচ মিনিটে এডগার-কুইনেট মেন রোডে ছুটো দল এলো। একজোড়া শিশু সহ ওদের বাবা মা। পেছনে তিনজন বৃদ্ধা। আমি এগিয়ে গেলাম। মহিলাটি আগুন চোখে আমার দিকে চেয়ে একটা বাচ্চার হাত ধরল। পুরুষটি নিচু গলায় বলল: 'অসভ্য কোথাকার।' আমার বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল। ওদের সামনে গিয়ে সটান ঘুরে দাঁড়ালাম।

'মাফ করবেন।' লোকটা আমার ধাক্কা খেল।

তৎক্ষণাৎ মনে পড়ল: আমি নিজের অ্যাপার্টমেণ্টের দরজা বন্ধ করে এসেছি, অথচ সেটি খোলা থাকার কথা। দরজাটা খুলতে সময় নষ্ট হবে।··· লোকগুলো কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল। আমি ওদের অনুসরণ করলাম। কিন্তু গুলি করার ইচ্ছে উবে গেল। মেন রোডের ভিড়ে ওরা হারিয়ে গেল। আমি দেওয়ালে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আটটা আর নটার ঘণ্টা শুনলাম। নিজেকে বোঝাতে চাইলাম: 'লোকগুলোকে মেরে কি হবে, ওরা তো আগে থেকেই মরে পড়ে আছে।' হাসতে চাইলাম। একটা কুকুর এসে আমাকে চাইতে শুরু করল। আবার খুন করার বাসনা আমাকে পেয়ে বসল।

এবার একজন বিশালকায় ব্যক্তির পিছু ধরলাম। ডাবিহ্যাট আর ওভারকোটের ফাঁক দিয়ে ওর লালচে গর্দান আর খোঁচা খোঁচা চুল চোখে পড়ল। আমি পিস্তল বের করলাম। শীতল চকচকে জিনিসটা মুহূর্তে ঘৃণা জাগিয়ে তুলল। একবার আমি পিস্তলটা দেখছি, আর একবার লোকটার ঘাড়। আমি অধৈর্য হয়ে উঠলাম।··· লোকটা হঠাৎ ফিরে তাকাল কটমট চোখে। রেগে গেছে নাকি? আমি আমতা আমতা করে বললাম—'ইয়ে বলছিলাম যে রুয়ে দ্যে লাগাই-ত্তের রাস্তাটা আপনি চেনেন?'

যেন শুনতেই পেল না। আমি ব্যগ্র হয়ে উঠ-লাম। ওর পেট লক্ষ্য করে পর পর তিনটে গুলি ছুঁড়লাম। বোকার মত লোকটা হাঁটুর ভরে পড়ল। একটা হাত বাঁ কাঁধের ওপর থেকে ঝুলে পড়ল।

'জানোয়ার!' আমি বললাম, পচা জানোয়ার!'

তারপর দৌড় লাগালাম। পেছন থেকে হৈচৈ কানে আসছে। একজন জানতে চাইল 'ঝগড়া বেধেছে নাকি মশাই?' পরমুহূর্তেই দূর থেকে চিৎকার ভেসে এলো— 'খুন! খুন! খুন!'···।

একটা মারাত্মক ভুল করেছিলাম: রুয়ে ওডিসা থেকে পালানোর সময় আমি এডগার কুইনেটের দিকে ছোটার বদলে বুলেভা দ্যু মোঁতপার্নাস্তের দিকে ছুটেছিলাম। ভুলটা যখন ভাঙল তখন দেরি হয়ে গেছে। সবাই আমাকে ঘিরে ধরল। সবারই চোখে বিস্ময় (একজন মহিলার মাথায় ছিল পালকওলা সবুজ টুপি)। দূর থেকে তখনও ভেসে আসছে ক্ষুধার্তদের চিৎকার—'খুন, খুন!' আমি মনের ভার-সাম্য খুইয়ে ফেললাম: এদের হাতে আমি মরতে চাই না। আমি দু-বার গুলি ছুঁড়লাম: লোকগুলো আর্ত চীৎকারে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ল। আমি চট্ করে একটা কাফের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। মস্তপগুলো আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিন্তু বাধা দিল না। আমি পায়খানার ভেতর ঢুকে কপাট বন্ধ করে ফেল-লাম। রিভলবারে এখনও একটা গুলি আছে।

কয়েক লহমা। আমি হাঁপাচ্ছি। কেমন যেন মৌন-নিস্তব্ধতা। পিস্তলটা চোখের সামনে নিয়ে আমি সেটার ছেঁদা খুঁজলাম। গোল, কালো ছেঁদাটা দিয়ে গুলি বেরোবে। আমি অপেক্ষা করতে লাগ-লাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা এসে পড়ল। পদশব্দ। ফিসফিসানি। নিস্তব্ধতা। আমি বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম। ওরা হয়ত আমার নিঃশ্বাস শুনতে পাচ্ছে।··· কে যেন ছিটকিনি ঘোরাচ্ছে। লোকটা নিশ্চয়ই আমার পিস্তলের ভয়ে দরজায় সেঁটিয়ে আছে। আমি ফায়ারের জন্য তৈরি হলাম।

'আচ্ছা, ওরা কেন অপেক্ষা করছে?' আমি সবিস্ময়ে নিজেকে প্রশ্ন করলাম: 'ওরা যদি দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে তবে হয়ত আমি আত্মহত্যারও সুযোগ পাবো না। ওরা আমাকে জীবন্ত ধরে ফেলবে।'·· কিন্তু ওদের তাড়া নেই। আমাকে আত্মহত্যার বেশ সুযোগ দিচ্ছে। জানোয়ার, ভয় পাচ্ছে!

কিছুক্ষণ পর একজনের গলা শুনলাম: 'এই, দরজা খোলো! আমরা তোমায় মারব না।'

তারপরেই পাষাণবৎ নীরবতা। আমি হাঁপা-চ্ছিলাম। 'ওরা আমাকে ধরতে পারলে নিশ্চয়ই পিটুনি দেবে, হাত ভেঙে দেবে, চোখ দুটোও উপড়ে ফেলতে পারে।' ওই বিশালকায় লোকটা কি মরেছে? হয়ত মরেনি। হয়ত ওকে আমি ঘায়েল করেছি মাত্র। আবার এমনও হতে পারে গুলি দুটোতে কেউই জখম হয়নি।···

'তুমি কিন্তু বাঁচতে পারবে না।' আবার শুনলাম।

ওরা কি যেন করছিল, ফরাশের ওপর কী একটা ভারি জিনিস ঘষটাচ্ছিল। আমি তৎক্ষণাৎ রিভল-বারের নলটা নিজের মুখে পুরে ট্রিগার টিপতে গেলাম।··· কিন্তু পারলাম না। চারদিকে নিস্তব্ধতা ছেয়ে এসেছিল। বাইরে ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

আমি রিভলবারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কপাট খুলে দিলাম।

সংবাদ

O "কমব্যাট" এর সাহিত্য সাঁঝ

O উলুবেড়িয়ার 'কমব্যাট সাংস্কৃতিক প্রসেনিয়াম' এর উদ্যোগে সম্প্রতি এক জীবন-মনস্ক সাহিত্য-ক্ষোভের শান্তায়ণ ঘটল কোলাঘাটে। অনুষ্ঠানে প্রসেনিয়াম এর হরেক শিল্পী সেনারা তাদের ভাবে, ভাষায়, শব্দে, সংরাগে স্তনন তুলল তামাম অডিটোরিয়ামে। জগৎ রঞ্জন ঘোষাল, সুকুমার ঘোষ, চন্দন দে চৌধুরী, অরুণ চক্রবর্তী, মিনতি সাহা, বাবলু দাশ, দুলাল মণ্ডলের স্বক্ষেত্রের উদ্ভাস শ্রোতাদের ছুঁয়ে গেল। কর্ণকুন্তীসংবাদ এর পরিবেশনায় আলুথালু শ্রোতাদের অশ্রু সেঁচে নিলেন কমব্যাট কর্মাধাক্ষা সায়রী মুখোপাধ্যায় ও সম্পাদক সৌমিত্র বন্দোপাধ্যায়।

O "ঘিধাতে পড়াতে শেধান" ওর সাহিত্যবাসর

O সম্প্রতি হাওড়া জেলার বলিয়ে-কইয়ে এই সংস্থার ১১৪ তম গেট্টুগেদার অনুষ্টানটি নির্বাপিত হল যথাবিহীত মর্যাদাব সঙ্গে বাগনান ১ নম্বর ব্লক তথ্য কেন্দ্রেব সদর নিবাসে। মূলত: সাহিত্যসম্পৃক্ততা ছাডাও বিজ্ঞান বিষয়েও সজ্ঞান মনস্কতা আছে এই সংস্থায়। সাঝবেলায় ছায়াময় নিভৃতাবকাশে পড়শী সাহিত্য কলাকুশলীদের প্রস্থনায় রঙিন হয়ে উঠেছিল উৎসব অঙ্গণ। রনজিৎ কুমার সাহু, পার্থ বসু, শ্রীকান্ত পাল, বিশ্বনাথ পাকিরা ছড়া, গান, গল্পে সময়টিকে রীতিমত রাত-জাগানী বাসরে পরিণত করেছিল। "ছড়া"র ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ স্পষ্ট উচ্চাবণ রাখেন ছড়াকু সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ঘরোয়া আঙ্গিকে বরাবরের মতো পরিচালনা করেন বষিয়াণ সাহিত্যপ্রেমী পরিমল ঘোষ। ফিনাহিনার এই নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান পর্বে জলযোগের ভূমিকাটিও মধুসুদন দোলুই এর কর্মকাণ্ডে আদৌ ফেলনা নয়॥

O দুই কবি : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সুশীল রায়

O সুশীলদার সঙ্গে আমাদের যতটা ঘনিষ্টতা ছিল, বীরেনদার সঙ্গে ততটা নয়। দু'জনের বাড়িতেই আমরা গেছি বহুবার। কখন ও কোন কবি সম্মেলনে নিয়ে আসার জন্য, কখনও বা কবিতা সংকলন কিংবা পত্রিকার কোন বিশেস সংখ্যার জন্য কবিতা চাইতে। ২৫শে ফেব্রুয়াবী ১৯৭৯তে তেলিনীপাড়ায় যে বাংলা কবিতা সম্মেলন হয়েছিল। তাতে অন্যান্য অনেক কবির সঙ্গে এঁদের দুজনকেও ধরে এনেছিলাম আমবা। তাছাড়া ঐ সম্মেলন উপলক্ষো প্রকাশিত দুই বাংলাব কবিতা সংকলন 'এপার ওপার কিছু কবিতা'য দুজনেই লিখেছিলেন। দুজনেই ছিলেন তরুণদের ঘনিষ্ট বন্ধুর মতো। খুবই সহজভাবে মিশে যেতে পারবেন তাদের আড্ডার মধ্যে। বীরেন দা 'উচ্চারণে'র কয়েকটি সংখ্যা যুগ্মভাবে সম্পাদনা করলেও নিজে নিয়মিত কোন পত্রিকা চালাননি। সুশীল দা তাঁর অনিয়মিত কিন্তু আক্ষরিক অর্থে 'ধ্রুপদী' পত্রিকাটি দীর্ঘদিন চালিয়ে গেছেন। তাঁদের স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাই।

O রবিবাসর : রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী

O ২৬শে মে, চন্দননগর "রবিবাসর" শিল্প ও সাংস্কৃতিক অনুশীলন কেন্দ্র'র ছাত্রছাত্রীদ্বারা এক মনোজ্ঞ পরিবেশে রবীন্দ্র নজরুল জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে ছোটদের নৃত্য বিভাগের পক্ষে রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশন করে—বর্ণালী ঘোষ, সুমিত্রা ঘোষ, অদিতি চট্টোপাধ্যায়। বড়দের নৃত্য বিভাগে রবীন্দ্র ও নজরুলের বিভিন্ন সংগীত ভিত্তিক নৃত্য পরিবেশন করে রিণ্টু মুখোপাধ্যায়, মৃদুলা পাল। আবৃত্তিতে কোয়েল চট্টোপাধ্যায়, রত্না দাস। রবীন্দ্র নজরুল সংগীত পরিবেশন করে—আরতী মুখোপাধ্যায়।

MEMBER { All India Small & Medium News Paper Association, Delhi
Little Magazine Editors Association, Calcutta
Hooghly Dist. Patra Patrika Somity, Hooghly. }

GODHULI–MONE   N. P. Regd. No. RN. 27214/75   July '85 শ্রাবণ ১৩৯২
Vol. 27, No. 7   Postal Regd. No. Hys–14   Price—Rs. 2·00 only

অগ্রগতির পথে দৃঢ় পদক্ষেপ

জনগণের অনেক সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ফলেই পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সরকারের অষ্টম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের লগ্নে সেই সমস্ত সংগ্রামের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যেমনি বাঞ্ছনীয় তেমনি প্রয়োজন সরকারের কার্যক্রমের বাস্তব মূল্যায়ণ করা।

বামফ্রন্ট সরকার নিজস্ব কর্মসূচী রূপায়ণে বর্তমান সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন।

উপর্যুপরি দু'বার জনগণের রায়ে নির্বাচিত হয়ে এই সরকার সীমিত সামর্থের মধ্যেই জনগণের সেবা করে চলেছে। কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের লড়াই চালানোর পাশাপাশি প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের কাঠামো গঠনের লক্ষে সরকার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা সম্পর্কিত পরীক্ষা নিরীক্ষা সমগ্র জাতির চোখ খুলে দিয়েছে। ভূমি সংস্কার ও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচী লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের মনে আশার স্বপ্ন জাগিয়ে তুলেছে। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন অধিকার অর্জন করতে হলে দৃঢভাবে অধিকার দাবী করতে হবে।

রাজ্য সরকার তার বর্তমান সামর্থের চৌহদ্দির মধ্যেই কৃষি, সেচ এবং কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগের চেষ্টা করেছে যার দ্বারা দরিদ্র ও নিঃস্ব মানুষের আয় বাড়তে পারে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতা সত্বেও সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে বিগত কয়েক সপ্তাহে বামফ্রন্ট সরকার কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। এই সব ব্যবস্থা কর্মসংস্থান ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক বিরাট সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। ১৯৭৭ সালের পর থেকে বিদ্যুত উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণিত হওয়ার ফলে শিল্প বিকাশের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। পরিবহণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সাম্প্রতিক উন্নতি লক্ষণীয়।

রাজ্য সরকারের সযত্ন কর্মপ্রয়াস তফসিলী জাতি ও উপজাতি এবং হিমালয়ের পাদদেশে বসবাসকারী মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে।

কিছু দুর্বলতা আছে যেগুলি বামফ্রন্ট সরকার আট বছরেও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এই সমস্ত ত্রুটি দূর করার চেষ্টা অবিরত চলেছে। কিন্তু যে সুনির্দিষ্ট কৃতিত্বের দাবী বামফ্রন্ট সরকার অবশ্যই করতে পারে তা হলো এই সরকারের শাসনকালে রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁদের আত্মসম্মান ও আত্মগৌরব ফিরে পেয়েছেন। এই আত্মসম্মানকে মূলধন করেই আগামী বছরগুলিতে রাজ্যের মহান গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পপুলার প্রিন্টার্স, বারাসত, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও নতুনপাড়া, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

গোধূলি মন

☐ এই সংখ্যায়ঃ—

ভাদ্র ১৩৯২ সংখ্যা

০ প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন ০

● 'গোধূলি-মন' নিয়মিত পাই। অনেক নতুন মুখ, বিশেষজ্ঞের রঞ্জনরশ্মি মাখানো প্রবন্ধ, সংবাদ ও পাঠকের অন্তঃদৃষ্টি, কাব্য এবং পত্রপত্রিকার সমীক্ষা, আমাদের—আধুনিক সাহিত্যের শিল্পী-কর্মী ও পরস্পর বিরোধী বন্ধু (?) দের মধ্যে এক অদৃশ্য আত্মীয়তা গড়ে ওঠে এই পত্রিকাটির মাধ্যমে। কলকাতায় যখন হাত খুলে লেখার মতো কোন প্লাটফর্ম নেই, তখন কলকাতা থেকে বহুদূরে কবি অশোক চট্টোপাধ্যায় একক প্রয়াসে আমরা অর্থাৎ এই সময়ের তরুণরা মাতৃস্তন্যের মতো পেয়েছি 'গোধূলি-মন' কে, এই অর্থে 'গোধূলি-মন' একটি ঐতিহাসিক চরিত্র (সময়ের দিক থেকেও বোধহয়)। এমন একটি ক্ষুদ্র পত্রিকাকে না ভালোবেসে পারা যায়? কিন্তু ভালোবাসা যদি লেখা প্রকাশের স্বার্থে হয় তাহলে তা নিজেদের প্রবঞ্চনা করার সামিল। নয় কি? তাই বলছিলুম; 'গোধূলি-মন' যাতে আরো বিশ বছর নিয়মিত প্রকাশ হয় সেদিকটা সবাইয়ের ভাবা দরকার। তা না হলে অমল হালদার, অজিত রায়ের মতো তরুণ প্রাবন্ধিকের লেখা আমরা নিয়মিত পড়তে পাবো না। অনেক তরুণ কবি হোঁচট খাবেন।

দ্বিতীয়ত, এই পত্রিকার যে নান্দনিক চরিত্র আমরা পেয়েছি তা একা সম্পাদক কতোদিন বজায় রাখবেন। তৃতীয় নয়ন থেকে বলতে পারি, আগামী-দিনে সাহিত্যে যাঁরা প্রতিষ্ঠা পাবেন তাঁদের অনেক-কেই গোধূলি-মন' আজ পাথেয় জোগাচ্ছে।

তৃতীয়ত, এদেশে শিক্ষিত উপার্জনশীল মানুষের সংখ্যা কম নয়। শিক্ষিত সাধারণের কাছে সবিনয়ে অনুরোধ - যারা কোন না কোন সময়ে পত্রপত্রিকা পড়েন, বই-র পাতা খোলেন এবং যাদের আর্থিক আয় বছরে ৪,৮০০ টাকা বা তার বেশী তারা অনুগ্রহ করে বছরে প্রত্যেকে ২০'০০ টাকার ক্ষুদ্র পত্রিকা কিনে পড়ুন। বছরের যে কোন সময়ে একজন শিক্ষিত মানুষ প্রকৃত শিক্ষিতের মতো কমপক্ষে ২০'০০ টাকার ক্ষুদ্র পত্রিকা কিনলে এবং পড়লে এই বাড়তি খরচটা হিসেবের মধ্যে আসে না। অথচ ঐ টাকায় প্রকৃত লিট্‌ল ম্যাগ গুলির আর্থিক সমস্যা নামক রোগের উপশম হবে। তাছাড়া নিজেদের মেধার নবীকরণও হবে। আর সত্যি কথা বলতে কি, আপনাদের এই ক্রয় মানসিকতা দেশের সাহিত্য সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করবে। আমি সাধারণের সুবিধার জন্য কয়েকটি ক্ষুদ্র পত্রিকার নাম উল্লেখ করছি: ১) গোধূলি-মন, ২) মহাদিগন্ত, ৩) বিভাব ৪) 'এবং, ৫) পরিচয় ৬) পঞ্চমা ৭) পক্ষবন্ধ ৮) কবিতীর্থ এবং ৯) চতুরঙ্গ ১০) জিজ্ঞাসা ইত্যাদি।

সর্বশেষে বলি, গত দুটি সংখ্যায় নিভা দে, দ্বিজেন আচার্য, দীপালি দে সরকার, অলক ভড়, সংযম পাল, প্রমোদ বসু, প্রভৃতির কবিতা পড়ে আমার মনে হয়েছে ভবিষ্যতে আরো বুদ্ধিদীপ্ত কবিতা এঁদের কাছ থেকে পাবো। হ্যাঁ, কাব্যসমালোচনা পর্যায়ে শ্রীউশীনর চট্টোপাধ্যায় বলেছেন আমি কবিতা লিখছি "প্রায় এক দশক ধরে"। তাঁর ধারণা ভুল। ১৯৮০ সালের আগে আমি কোন কবিতা লিখিনি। শুধু পড়াশোনা করেছি কবিতার ওপর।

সোফিওর রহমান
তেরপেখিয়া-৭২১৬৫৬

* * * * * *

● আষাঢ় সংখ্যা 'গোধূলি-মন' পেলাম। গদ্যে, পদ্যে, আলোচনায়, চিঠিতে সংখ্যাটি ভালোই লাগলো। রেজাউল করিমের লেখাটি সাদামাটা হলেও জাতীয়তাবোধের ইঙ্গিত আছে। সিংহভাগ কবিতার সবগুলিকে ভালো বলে বিপদ চাই না। অবুও 'গোধূলি-মনের' মতো ভালো কাগজ—লিখিয়েদের ভালো রাস্তা আর কই?......

বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়
পোঃ মটুকবনী
ভায়া—শালতোড়া,
জেলা - বাঁকুড়া

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি মন

২৭ বর্ষ/৮ম সংখ্যা
আগষ্ট/১৯৮৫
ভাদ্র/১৩৯২
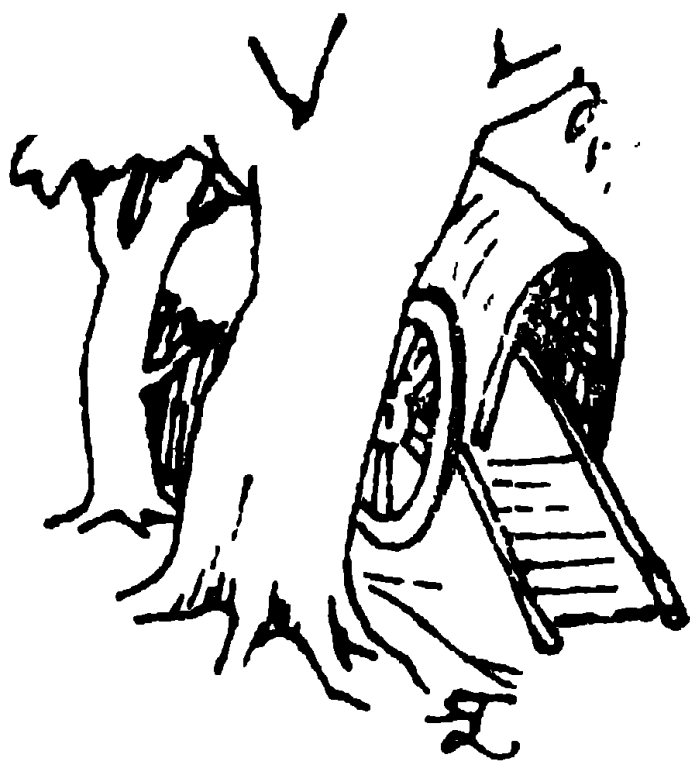
প্রতি সংখ্যা দুই টাকা
বার্ষিক সডাক কুড়ি টাকা
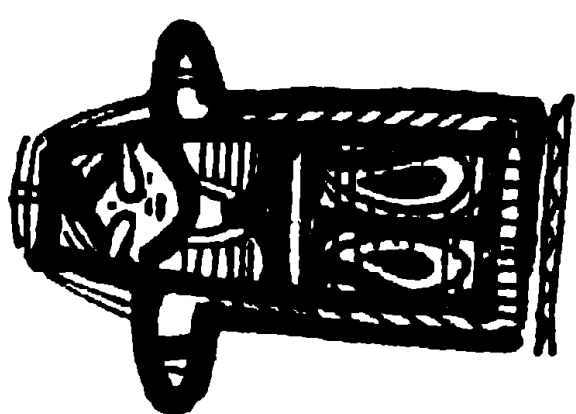
অশোক চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক

সম্পাদকীয় ঃ—

আগের পৃষ্ঠায় 'প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন'-এ আমাদের দুই শুভানুধ্যায়ীর চিঠি ছাপা হয়েছে। এ রকম আরো বেশ কিছু চিঠি আমাদের দপ্তরে এসে আমাদের উৎসাহিত করছে। কেউ কেউ আর্থিক সাহায্যও পাঠিয়েছেন ইতিমধ্যে। প্রিয় সহৃদয় শুভানুধ্যায়ী, আমাদের সাধ্যানুযায়ী এতদিন নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ করার পর এবার হয়তো গতি শ্লথ হয়ে পড়বে। কারণ রসদে টান পড়েছে এবার। সম্পাদকের পকেট শূন্য হয়ে আসছে। সামান্য বিজ্ঞাপণ এবং কিছু অনিয়মিত গ্রাহক চাঁদা এবং সামান্য বিক্রীর টাকায় খরচ-খরচা ওঠানো অসম্ভব।

যদি আপনার মনে হয়ে থাকে গোধূলি-মন সামান্য হলেও বাংলাসাহিত্যে তার কিছু অবদান আছে, তবে আপনার কাছে প্রাপ্য গ্রাহক-চাঁদা অচিরেই পাঠান এবং গোধূলি-মনকে বাঁচতে দিন ॥

● সম্পাদকীয় কার্যালয় ॥ নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর ॥ হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥ ভারত

বাংলা দেশের কবিতা ঃ

ছড়া/কুতুব উদ্দিন আমির

দেশের মানুষ সবাই এখন
একটু শুধু ভাত চায়,
খুন-খারাবি বন্ধ করে
নির্ঝঞ্ঝাট রাত চায়।
দেশ চালাবার হিসাবমত
শক্ত একটি হাত চায়,
নয়তো তারা এর সমাধান
করতে প্রতিঘাত চায় ॥

উচিৎ কথা বলবে তুমি ?
করবে তোমায় বন্দী,
মুক্তি পাবে ওদের মতে
করবে যেদিন সন্ধি।
নয়তো তোমার হবেই হবে
যাবজ্জীবন সাজা,
এইতো দেশের বিচারপতি
এইতো দেশের রাজা ॥

বেশ, ভালো আছি/ফারুক নওয়াজ

তাড়িয়ে দিলে বলেই তো চলে এলাম
তবে কেনো জানতে চাও, কেমন আছি ?
এ কেমন খেয়াল তোমার ? বিলাসী অসুখ ?

আমি সব ভুলে যেতে পারি ;
মাছের শরীরের মতো ঝলসিত দিন
মেঘের পালকের মতো রূপোলী স্মৃতি
সব কিছু নিমিষেই ভুলে যেতে পারি।
তাড়িয়ে দিলে বলেই তো চলে এলাম
তবে কেনো চোখের পানিতে ভরো চিঠির অক্ষর ?
এ কেমন খেয়াল তোমার—এ কোন রীতি ?

যে ঢেউ চলে যায়, সে আর ফেরেনা কখনো,
'উনিশ'শ চুরাশি' আর আসবেনা ফিরে।
মনে করো আমি সেই ঢেউ, চলে যাওয়া উনিশ'শ-চুরাশি

এই তো ভালোই আছি ; বেশ, ভালো আছি !
মেঘের বয়স দেখে, জলের ভেতরে মেঘ
গলিত রোদের শব, ম্লান দিগন্ত-নীল
দেখে-দেখে বাকী দিন এইভাবে চলে যাবে।

এইতো জীবন ; সীমাবদ্ধ হাওয়ার বেলুন

তাড়িয়ে দিলে বলেই তো চলে এলাম
তবে কেনো জানতে চাও ; কেমন আছি ?

আত্ম জিজ্ঞাসা/সাবু রহমান

তন্বী তরুণীর লাল ঠোঁটের স্পর্শে
আমি কি ভুলে গেছি ;
আমার বৃদ্ধ পিতা, তার হাড় সর্বস্ব
শরীরে এবং আমার শরীরে প্রবাহিত রক্ত ?
বাগান বিলাস মানি প্লান্টের অভিজাত্যে
আমি কি ভুলে গেছি ;
আমার মাষ্টার মশাই—
তার শতচ্ছিন্ন ঢোলা পাঞ্জাবী
এবং ক্ষয়ে যাওয়া চটি ।
কালো টাকা ; রঙীন জীবনের প্রলোভনে
আমি কি ভুলে গেছি ;
আমার গ্রামের গণি মিয়া, তার ঋণে জর্জরিত
জীবন এবং অকাল মৃত্যুর প্রতীক্ষা ?
আমি কি ভুলে গেছি সব ; কঠিন সত্য
বিবর্তন, পাহাড়ের গুহা, বর্ব্বর জীবন
ঘাত-প্রতিঘাত এবং আজকের সভ্য সমাজ ;
আমি কি ভুলে গেছি ;
একটি মৃত্যু আর একটি মৃত্যুর জন্ম দেয়
এক ফোঁটা রক্ত নতুন দিনের ইঙ্গিত দেয় !
এবং আমি ভুলে গেছি—
ইতিহাস কথা কয় !
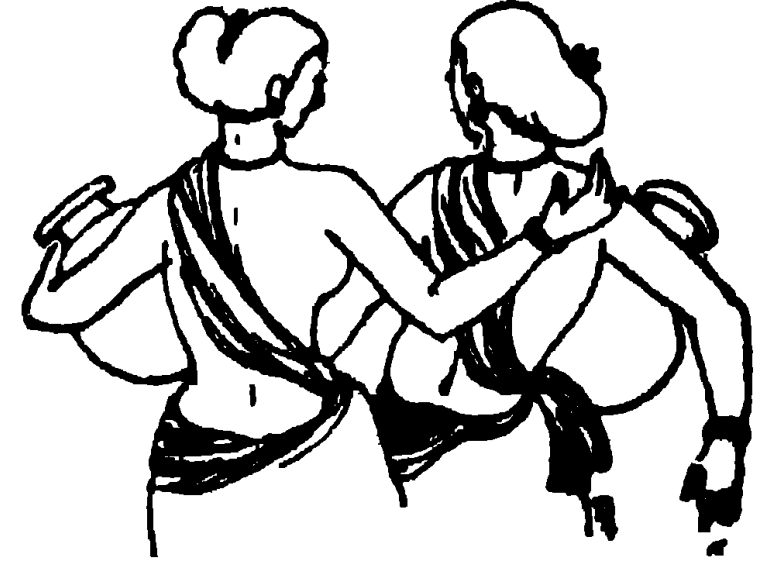
আশ্বাস/মহুয়ারা মহাসন

কিছু কিছু ভালোবাসা অহরহ দাগ কাটে
গভীর হৃদয়ে । কখনো কখনো অনিবার্য
মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার সাধ জাগে
হাসি-গান-ফুল-পাখি-মান-অভিমান
সব কিছু মিলে জীবন সজীব হয়
আজন্ম বিশ্বাসে ।
আজকাল বেশী ভালোলাগে তোমার আশ্বাস,
নির্ঘুম চোখে ঘুম নেমে আসে । রাতের আঁধারে
কল্পনার রাজপুত্র হয়ে কাছে আসো তুমি
সোনার কাঠির ছোঁয়ায় ঘুম ভেঙ্গে যায়
ষড়যন্ত্রের কঠিন শৃংখল থেকে মুক্তির
প্রত্যাশায় আমি চেয়ে থাকি—চোখের
পাপড়ি গুলো নড়ে চড়ে ওঠে, বড় ভাল লাগে,
মনে হয় এই ভাবে বেঁচে থাকি চিরকাল
সুনিবিড় ভালবাসার আশ্বাসে ।
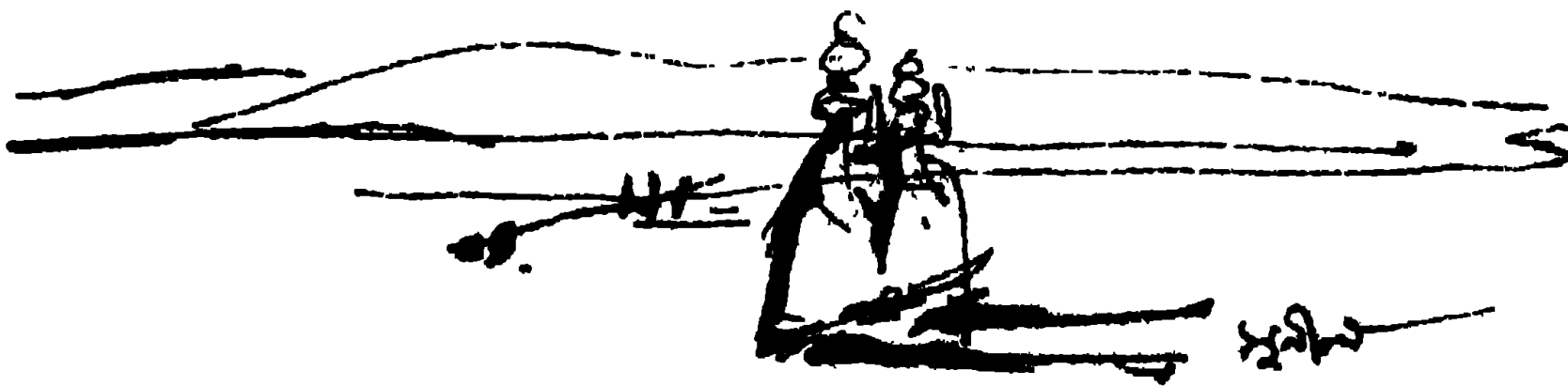
আজীবন আমি কান্না/
ইলিয়াস হোসেন

একটু আগের আমি
একটু পরের আমি
এক থাকি না
আমরা জানিনা
জীবন থেকে জীবন
কখন বিদায় নেয়
দিনের বুক থেকে
কখন আলো নিভে যায়
রাত দেখেনি কোনো দিন
সূর্যের লাল মুখকে।
আমি পৃথিবীতে যেদিন
প্রথম কেঁদেছিলাম;
সেদিন তোমরা হেসেছিলে।
আজ যখোন কাঁদছি
তখনও তোমরা হাসছো
বেশ— তাই ভালো।

অবেলায়/মোসাররফ হোসেন খান

এই অবেলায় বিষন্নতায় বসে আছি একলা আমি
হাঁটছে মানুষ ঘাড় ডিঙিয়ে, উড়ছে পাখি, ভাসছে মেঘ
চন্দ্রসূর্য্যি সেওতো চলে আপনমনে কক্ষ পথে
ক্লান্ত পথিক আমিই কেবল বসে আছি দ্রষ্টা চোখে
সময় গড়ে
কষ্ট বাড়ে
তবু আমি বসে আছি;
একটি শিশু কখন এসে বলবে আমায়—
'এই এসেছি হাতের কাছে অনিয়মের ভাঙ্গতে পাহাড়
এইতো আমি আদিম যুগের তীরন্দাজের অগ্নি শিশু'।

এই অবেলায় ঠায় এখানে বসে আছি একলা আমি
সময় গড়ে
কষ্ট বাড়ে
তবু আমি বসে আছি ভাঙ্গা গড়ার স্বপ্ন এঁকে
দ্রষ্টা চোখে এই অবেলায় বিষন্নতায়॥
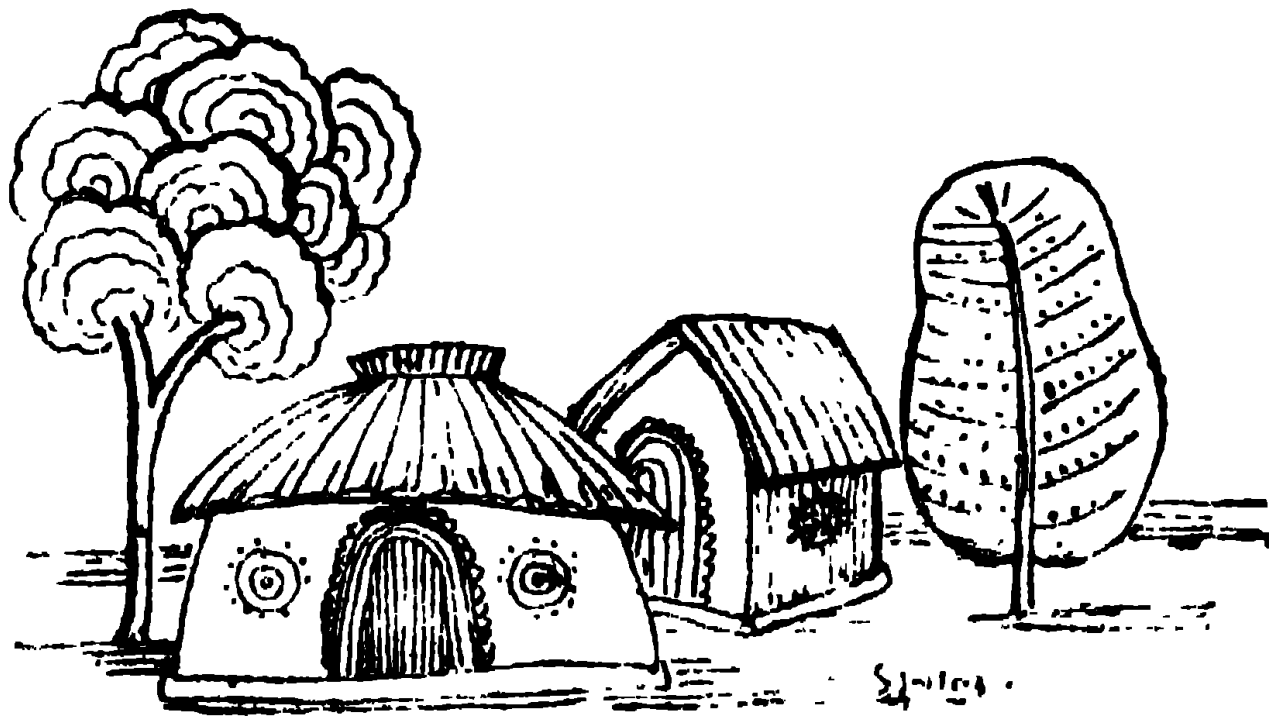
দেশান্তরী

নয়ন তালুকদার

এলোমেলো সাদাচুল বাউল মেঘের মতো
মৃত্যুর পাড়ায় পাড়ায় ঘুরপাক খেতে খেতে
গ্রাম ছেড়ে
দেশান্তরী হয়ে যাচ্ছো মানুষ।
দুপুরের রোদে তাতে মাঠের ফসল
চতুর কর্তার ঘরে অনাদরে
নোনাঘাম, রক্তের সেলামী ফেলে
স্ববংশ ফতুর হয়ে
আল্লার ফকিরের মতো
উদয়াস্ত বিবাদ নিষেধ করে
শান্তির সনদপত্র পতাকার মতো
দু'হাতে দুলিয়ে দুলিয়ে
গ্রাম ছেড়ে
দেশান্তরী হয়ে যাচ্ছো মানুষ।

দুঃখের গলা টিপে
বাঁচতে চাইলে –মানুষ বাঁচে
স্পর্ধার হাতকে হাতুড়ী করে
বাঁচতে চাইলে—মানুষ বাঁচে
উদ্ধত যৌবনের খোল-করতাল বাজিয়ে
বাঁচতে চাইলে—মানুষ বাঁচে
আর্তনাদ করে গান গাইলে
নাগিনীরা তোলে ফণা
জীবনের বাঁক বেয়ে আসে
ভয়ংকর অরণ্য আভাস·········

গর্বিত প্রত্যাখানে প্রসন্ন কষ্ট বুকে ধরে
বিশ্বাসী সাহস দেখলে
প্রদীপ্ত ভঙ্গিমায় জাগে
জীবনের বিলুপ্ত ঝিলিক
শেকড়ের সাথে অক্ষমতা বেঁধে
এক পা চলেনা জীবন।
কবরের গ্লানি নিয়ে নিষ্ঠুর নীরবে ঘুমায়
বুকের মানিক—ঘুমায়,
যে একদিন হতে পারতো কৃষকরাজা
সবুজ উদ্ভাসিত স্বপ্নময় মাঠে।
তবু হৃদয় আবৃত করে পাখীর ঠোঁটের মতো
উলঙ্গ বাতাসের সাথে কানাকানি করতে করতে
চোখের বন্যায় হায় আবাদ ভাসিয়ে দিয়ে
গ্রাম ছেড়ে
দেশান্তরী হয়ে যাচ্ছো মানুষ।
পূর্ব-পুরুষ নোনা জলে ডুব দিয়ে
আঁটি আঁটি ধান কেটে আনন্দে তুলতো ডাঙ্গায়,
করতালী বাজিয়ে গাইতো লক্ষ্মীর গান
গায়ে-গায়ে মিশে থাকতো পরস্পর কৃষকের মন ;
এমন সুন্দর দিন আর নেই—
সাঁকোটা কী ভেঙ্গে গেছে অকাল জলের তোড়ে
অথবা 'বেলের' খাজনার দায়ে
নিলামে খরিদ হয়ে গেছে সেই মন (?)
সে কেমন উল্লাসের দিন ছিল
কেউ তা' সঠিক জানি না—

নিষ্কলুষ ইতিহাস নেই !
বর্ষার ঘোলা জলে পাক খেয়ে খেয়ে
আধমরা ইঁদুরের মতো
বিপন্ন ধানের ছড়ির মতো
কিংবদন্তী আছে মুখে মুখে।
মড়ক ও মারীর শোকে
উত্তর পুরুষ হায় ভুলে গেছে
প্রজন্মের তীক্ষ্ণ উচ্চারণ,
আজন্ম নাড়ীর টান অস্বীকার করে
গ্রাম ছেড়ে
দেশান্তরী হয়ে যাচ্ছো মানুষ।

অমৃতের তপ্ত স্বাদ
গ্রাম ছেড়ে
কোথায় খুঁজবে ?—কোথায় ?!
বস্তির হা-মুখে খাড়া বিদ্রোহী বিমুখ ঈশ্বর,
কেরানির কলমের মতো নাস্তানাবুদ
নির্বোধ যন্ত্রণায় ঘোষণা করছে বিরক্ত করুণা-
সেও এক অসহ্য নরক।
গ্রামে তবু কাতরায় ঘু-ঘু পাখী
দুর্বহ শয্যায় গোঁঙায় প্রৌঢ় অশিতি—
সমবেদনায় কাঁদে এই ক্লান্ত হৃদয়,
অক্ষম আক্রোশে জ্বলে 'সুবর্ণ জীবন'।
সময়ের ঘূর্ণিপাকে বিচুর্ণ হতে হতে
গ্রাম ছেড়ে
দেশান্তরী হয়ে যাচ্ছো মানুষ।

মাটির স্বীকারোক্তি

আবু জহুরুল

সময়ের প্রবর্তনে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বাড়ে
জীবনের নীলক্ষেত, লালক্ষেত, হলুদ কিংবা সবুজ
ক্রমান্বয়ে পাড়ি দিয়ে একটি অভিজ্ঞতার সুষমায়
পৌঁছে যায় মানুষ যেমন সহজে মরণের পায়ের
শব্দ আসে।

বাতাসের শরীরে লেখা হয় গন্ধ-সুগন্ধ
মাটির বুকে পদচিহ্ন ! তবুও সুষমা জেগে থাকে
সমুদ্রের ধোঁয়ার মতন অবিকল ঘনঘটা কুয়াশার
অবিরাম জৌলুশে।

মানুষের পায়ের চিহ্নে ব্যথাতুর
প্রকৃতি ফিরে যেতে চায় আদিম গৃহবাসে যেমন
মেঘ বলে অবসন্ন বিকেলে চৈত্রে যাবো অনিবার্য।

তবুও পৃথিবী
আজো বেঁচে আছে মাটির সহজ স্বীকারোক্তিতে
সন্তানের দুর্ব্যবহারেও মা যেমন পড়শীকে
গল্প শোনায় সুখোরাজ্যের এক শাহজাদার গল্প

নিরবিচ্ছিন্ন কৃষকের ক্ষেত/অসিত বিশ্বাস

এর চেয়ে অনেক ভালো ছিল
ওখানে যদি একটা লাউয়ের চারা পোঁতা থাকতো
নয়তো বা আমড়ার গাছ, তবুও মাঝে মধ্যে
দু একটা ফল তার জনগণের শরিক হতো
একি আবাদ হয়েছে কাল কেউটের
আপনার গান আপনি গাইতে গেলেও ফোঁস
নিরবিচ্ছন্ন কৃষকের ক্ষেত এমনি অবাদ হয় বুঝি
কাল খবর পেলাম লায়লার ভাই তার ধর্ষিতা বোনের
প্রতিবাদ করতে গিয়ে সে এখন শ্রীঘরের চত্বরে
তাড়াচ্ছে ডাঁশ

নমিতার শাঁখা ভেঙে গেছে
মহাজনের ঋণের দায়ে
বন্যায় গৃহহারা লক্ষ লক্ষ নরনারী স্বর্গ পোড়াচ্ছে
কালো কাফনের নীচে
খোলাটে আকাশ তলে মৃত মা'র স্তন মুখে গুঁজে
উপবাসি শিশু চাপড়াচ্ছে মাটি
আহা কি বড় সু-সময় আজ !
এমনি বুঝি মাতাল শিল্পির বেয়াদব তুলি চিত্র আঁকে
অনেক ভালো ছিল ওখানে যদি একটা
লাউয়ের চারা পোঁতা থাকতো—নয়তো বা—
আমড়ার গাছ। তবুও মাঝে মধ্যে জনগণ তার
দু-একটা ফলের শরিক হতো।

কল্পনার আকাশে/রাবেয়া রোস্তম

ভাবনার আকাশে শুকতারার আবির্ভাব, নিকুঞ্জ পথে
কালো মেঘগুচ্ছ হয়ত ঢেকে দেবে,
প্রগতিশীল চলার কক্ষপথ নিষ্ঠুর ঘর্ষণে !
কল্পনার অব্যক্ত কত হাসি গান।
সহিষ্ণুতা ভুলে কঠোর হতে কঠোরতর
মৌনতার হৃদয় স্পন্দনে সুচাঘাতে !
মানচিত্র এঁকে গেছে বৃহৎ রাজ্যের,
সম্রাট আছে কিন্তু.........
ভাবনার আকাশটা স্থান, কাল, পাত্রের ন্যায়
পরিবর্তন ঘটে স্বার্থের তাগিদে,
সে প্রকৃতির নিয়ম ; ভুলে যায় বসন্তের শুভাগমনে
অমূল্য কোহিনুর।
তাই রঙিন স্বপ্নগুলো আজ কদাকার
হতাশায় আল্পনা আঁকছে—
আমার এ দুর্লভ দুরাশার সতীর্থ ব্যথায়।
ঝরে পড়া শিশির কণার মত, নিঃশেষ হয়ে আসে
ভোরের নবীন সূর্যের আগমনে—
আমার ভাবনার আকাশটা লাল হয়ে
আহত বলাকার মত মুষড়ে পড়ে,
ভেঙ্গে যায় আমার স্বপ্নের তাজমহল।

শরৎচন্দ্রের রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ

জীবেন্দু রায়

ঠিক সুনির্দিষ্ট রাজনীতিক বা সামাজিক চিন্তা বলতে যা বোঝায়, তেমন কিছু শরৎচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধ বা বক্তৃতায় প্রকাশ করেননি। কিন্তু সুনির্দিষ্ট কিছু না হলেও যা লিখেছেন বা বলেছেন তা তাঁর সময়ের প্রেক্ষিতে প্রগতিশীল। মতামতগুলি অনেকটা সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের সরাসরি প্রতিক্রিয়ার মতো ব্যাপার। রবীন্দ্রমতের প্রভাব বা প্রতিফলনও লক্ষণীয়, শুধু লক্ষণীয় নয় সুমুদ্রিত। একটি স্বাতন্ত্র্যের উল্লেখ করতে হয়। স্বাতন্ত্র্য বলতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। সেটি হলো কেন্দ্রীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে একধরণের চাপা ক্ষোভ, সেই সঙ্গে বাংলার নেতৃত্ব বাঙালীই করবে এ ব্যাপারে পশ্চিম ভারতের কিছু করণীয় নেই এই ধরণের একটি সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ বোধ। দেশবন্ধু বা সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর গাঢ় অনুরাগের একটা সূত্রও এখানে। মহাত্মা সম্পর্কেও তিনি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল। সে শ্রদ্ধা সর্বভারতীয় নেতৃত্বের প্রেক্ষিতে। কিন্তু বাঙালীর স্থানিক সমস্যা বাঙালি নিজেই সমাধান করবে,—এ ব্যাপারে অন্য কারোর কর্তৃত্বের প্রয়োজন নেই, এরকম একটা চিন্তার ওরিয়েনটেশন তাঁর ছিলো। এবং সেটি তাঁর একক চিন্তার দৃষ্টান্ত কিছু নয়। বাঙালী বামপন্থী, কংগ্রেস করলেও। শরৎ বসুদের কথা সকলেই মনে করতে পারবেন। আর একটি কথা। সেটি অনেকটা তাঁর রচনা বা বক্তব্যের স্টাইল গোত্রীয় ব্যাপার। বঙ্কিম, বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথ, তাঁদের মত পাঠক বা শ্রোতা গ্রহণ করুক বা নাই করুক, নিজেদের মত পরিষ্কার করে প্রকাশ করতে কখনও সঙ্কোচ বোধ করতেন না। শরৎচন্দ্র কিন্তু সেরকম সাহসিকতার মনোভাব যথেষ্ট দেখাতে পারেননি। এ ব্যাপারে তিনি সাধারণত সামঞ্জস্যের নীতিই অনুসরণ করেছেন। তাছাড়া বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে একটা অবিন্যস্ততার ভাবও লক্ষ্য করবার মতো। প্রবন্ধগুলিকে টুকরো ভাবে বিশ্লেষণ করে এ কথাগুলি ভালোভাবে ভেবে দেখতে পারি। তার প্রধান কথাই হলো 'সমন্বয়', তথাকথিত মৌলিকতা বা 'রাডিকালিজম্' কিছু নয়।

ক : 'আমার কথা'

মহাত্মা যে ব্যাপক গণজাগরণের ব্যাপারে আন্তরিক যত্ন, উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা দেশের গরিষ্ঠতম মানুষের কাছে বাহিরের সামগ্রি হয়েই থেকে গেছে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ব্রিটিশের কারাগার থেকে যে কোনওদিন মুক্ত হওয়া, দেশের লোকেরই ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু এ বিশ্বাস যথার্থ ছিলো না অন্তত দেশের লোকের পক্ষে। দেশের লোক এ ভরসা করতে পারেননি। মহাত্মা এবং তাঁর অনুগামী পঁচিশ হাজার হতভাগ্য সহকর্মী ছাড়া দেশের বৃহত্তম মানব অংশ দিব্য জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছে। বুদ্ধির বক্রবিচারে তারা নিজেদেরকে এই মর্মে আশ্বস্ত করেছে যে অহিংস অসহযোগ অবিবেচনা প্রসূত বাস্তব বুদ্ধির সংস্পর্শ রহিত একটা কর্মসূচী মাত্র।

বিফলতা সেক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী। সামান্যতম অসুবিধের মধ্যে না গিয়ে দেশের মানুষদের এই স্বার্থপরতা শরৎচন্দ্রকে পীড়িত করেছে। একদল মানুষ দেশের জন্য সব হারিয়ে নীরবে পচবে এবং অপরের কাছে উপহাসাস্পদ হবে এ অসহ্য। মহাত্মাজির আদর্শে মানুষের যে শুধু ভরসা নেই তা নয়, সামান্য শ্রদ্ধাটুকুও অনুপস্থিত। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেশের মানুষকে একদিন করতেই হবে। আমাদের দেশের বিপুল সাধারণ মানুষের মনোভাবটা অনেকটা এই রকম, আমার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের, সামান্য বিঘ্ন উপস্থিত না করে এই লোকগুলি যদি স্বরাজ এনে দেয় দিক। তারপর তাকে রসগোল্লার মতো পরমানন্দে উপভোগ করা যাবে'খন। এই মনোভাবের প্রতিক্রিয়াতেই তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন।

আমাদের নিস্ফল, বাক্ সর্বস্ব, সুবিধাবাদী রাজনীতির ভারি সুন্দর একটা ছবি শরৎচন্দ্র এঁকেছেন। আমতা অঞ্চলে প্রফুল্ল রায় মশাইকে নিয়ে দেশপ্রেমের মহাযজ্ঞ সমাধা করতে বেরিয়েছিলেন। জয়ধ্বনির অপ্রতুলতা একেবারেই ছিলো না। কিন্তু বিপুল ব্যয় করে যাতায়াতের পর ধনশালী ব্যক্তিরা তাঁত এবং উন্নয়নকল্পে তিনটাকা পাঁচ আনা চাঁদার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বিলিতি কাপড় বর্জনের মহিমাও একই ধরণের। এই দুঃখ, বেদনা আর অন্ধকার প্রেক্ষিত থেকে স্বরাজ কি করে সম্ভব হবে। এই নঞর্থক ছবি দেখে শরৎচন্দ্রকে নৈরাশ্যবাদী বলে অবশ্যই মনে হবে। আসলে মধ্যবিত্ত মন খুব দ্রুত জাগরণ তথা ফললাভের প্রত্যাশা করে, খুব তাড়াতাড়িই প্রতিদান চায়, অথবা ধরা পড়েই বলে আমার কাজ শেষ, এইবার আমি ছুটি নেব এবং পন্ডিচেরীতে যাবো। শরৎচন্দ্র যেটা তলিয়ে বুঝতে চাননি, তা হলো, রাতারাতি শুধু আহ্বানেই কি কোটি কোটি মানুষ দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে নেমে পড়ে! হুজুগ সব সময়েই স্বল্পকালস্থায়ী। অপ্রস্তুত প্রেক্ষিতে যা হবার তাই হয়েছে। বিপুল মানুষকে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে পাশে পেতে গেলে বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। শুধুমাত্র আবেগ কখনও স্থায়ী ভালো কিছুকে সম্ভব করে তুলতে পারেনা।

মহাত্মা তো সেই অসম্ভব দিয়েই সব কিছু সম্ভব করতে চাইছিলেন। এক একধরণের এক্সট্রিমিজম্—তবে ভাবমূলক।

খ : 'স্বরাজ সাধনায় নারী'

১৩২৮ সালের পৌষ মাসে এটি পঠিত এবং প্রকাশিত হয়। এর কিছুকাল পূর্বে 'নারীর মূল্য' নামে তাঁর বহুশ্রুত রচনাটি প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে এক সর্বজনীন প্রেক্ষিত থেকে নারীর অধিকার এবং মূল্যের অন্বেষণ করেছিলেন তিনি। তাতে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবেই তাঁকে নিতে হয় যে, নারীকে তার সঙ্গতি প্রাপ্য অধিকার থেকে কম বেশী পৃথিবীর প্রায় সব পুরুষই বঞ্চিত করে রেখেছে। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ সারা দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে। 'শরৎচন্দ্র' লিখেছেন, 'পুরুষের স্বার্থের যেমন সীমা নেই, তার নির্লজ্জতারও তেমনি অবধি নেই।...আমি ভাবি এই বঞ্চিতার দান না পেলে এ সংসার ব্যাপী নরযজ্ঞের প্রায়শ্চিত্তের পরিমাণ আজ কি হত? অথচ একথা ভুলে যেতেও আজ মানুষের বাধেনি।'

অপরকে গালিগালাজ দিয়ে, তাদের ত্রুটি বিচ্যুতির উপর ভর দিয়ে নিজের এবং দেশোদ্ধারের সাধনা আমাদের। কিন্তু এ ব্যাপারে নিজের দায়িত্বটুকু নীরবে, সভয়ে এড়িয়ে যেতে চাই। এইরকম, মেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত অপমানকর একটি ব্যাপার হলো কন্যাপণ। শরৎচন্দ্র অভিযোগের সুরে বলেন, মেয়ের বাবাদের বক্তব্য, যে কন্যাপণের বিরুদ্ধে তাঁর মতো

লেখকেরা উত্তেজক কিছু লিখে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেন না কেনো? কিন্তু প্রকৃত কথা হলো, এ বকলমায় কি সামাজিক ক্ষত সারে! আসল প্রতি-বিধান রয়েছে কন্যার পিতারই হাতে। এবং তা সম্মিলিত ভাবেই সম্পন্ন করতে হবে। এর সঙ্গে লেখক হিসেবে, শিল্পী হিসেবে কণ্ঠ যোগ করতে তাঁর আপত্তি নেই বরং পূর্ণ সম্মতি আছে। কিন্তু অন্যভাবে নয়। এর বেদনা আছে। কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, স্বেচ্ছায় বরণ করে নেওয়া এই দুঃখ একদিন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বহুজনের পক্ষে কল্যাণকর হয়ে ওঠে। এ দায়িত্ব আমরা তখনই যথার্থভাবে পালন করে উঠতে পারবো যখন নারীকে নারীমাত্র হিসেবে নয়, সম্পূর্ণ মানুষ বলে গ্রহণ করবো। পুরুষ পিতার পিতৃত্বের গৌরবও এখানে। শরৎচন্দ্র লিখেছেন, 'মেয়েমানুষকে আমরা যে কেবল মেয়ে করেই রেখেছি, মানুষ হতে দিইনি, স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশের হওয়া চাই-ই। অত্যন্ত স্বার্থের খাতিরে যে দেশ, যেদিন থেকে কেবল তার সতীত্বটাকেই বড় করে দেখেছে, তার মনুষ্যত্বের কোন খেয়াল করেনি, তার দেনা আগে তাকে শেষ করতেই হবে!'

সতীত্বকে তিনি তুচ্ছ বিবেচনা করেন না। কিন্তু একেই তার নারীত্বের পক্ষে পরমমূল্য দেওয়াকে তিনি 'কুসংস্কার' বলে মনে করেন। মানুষের পক্ষে সবচেয়ে স্বাভাবিক এবং সত্যকার দাবী হচ্ছে, মানুষ হবার দাবী। একে ফাঁকি দিলে তারণাই কেবল সত্য হয়ে ওঠে। নারীকে কেবল মানুষ হিসেবে যারা যে পরি-মাণে মর্যাদা দিয়েছে এই অসত্যের অন্ধকারও তাদের জীবন থেকে ততখানি অপসৃত হয়েছে। তাঁর একথা প্রকৃতই ভাববার, যখন তিনি লেখেন, পৃথিবীতে এমন দেশ পাওয়া যাবেনা, যারা মেয়েদের মনুষ্যত্বের অধি-কার হরণ করেনি, তাদের মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা অন্য কোনও প্রবল জাতি কেড়ে নিয়ে জোর করে রাখতে পেরেছে। ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে একথা তাঁর কাছে অধিকতরো সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এসব কথা কেতাবী তত্ত্ব কথা মাত্র নয়, দেশের তথাকথিত অন্ত্যজ ব্রাত্য জাতকের যে অধিকার তাদের মনুষ্যত্বের উদ্-বোধনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে দিতে হবে, সেই একই অধিকার প্রাপ্য আর এক ব্রাত্য অন্ত্যজ শ্রেণীর, তারা মেয়েমানুষ'। জীবনের এই খণ্ডরূপ আমাদের সর্বতোভাবে আক্রমণ করেছে। অপরকে অধিকার না দিয়ে আমরা প্রতিমুহূর্তে নিজেদের জীবনকেও লাঞ্ছিত করে চলেছি। সেও নিয়তই অপমানিত, ধিক্কৃত। সমস্ত ভারতবর্ষেই এক অর্থে সেই সকরুণতার প্রেত-নৃত্য।

অভিভাষণটির সূচনায় শরৎচন্দ্র 'রাজনীতি'র প্রসঙ্গ এনেছেন। তিনি রাজনীতিকে আর্থিক এবং সামাজিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভেবেছেন। রাজ-নীতি যে এসবেরই যোগফল তথা মিলিতরূপ, ব্যাপারটা তিনি সেভাবে দেখেননি। তাঁর ধারণা, আমাদের আর্থিক এবং সামাজিক 'স্পষ্ট দুঃখগুলো' স্থূলদৃষ্টিতেই দেখা যায় এবং এগুলি প্রতিকারের চেষ্টা করলে রাজনৈতিক নেতারা অন্যান্য দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে রাজনীতির ব্যাপারে অনেক বেশী পরিমাণে আত্ম-নিয়োগ করতে পারেন। আসলে 'রাজনীতি' বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপোস রফা সংঘর্ষ সংগ্রামীর কর্মসূচী, স্বরাজ্য পার্টির নির্বাচন তথা শাসন ব্যাপারে অংশগ্রহণের কথা। আমাদের নেতারা সে সময়ে ক্ষমতা দখলের ওপরেই জোর দিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিলো, রাজ-নৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর না হওয়া অবধি আর সমস্তই অর্থহীন, কারণ সেসব ক্ষেত্রেও পররাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ আধিপত্য রয়েছে। শরৎচন্দ্রের ধারণা, এই আর্থিক

সামাজিক প্রশ্নগুলির সমাধান রাজনীতি নিরপেক্ষ ভাবেই সাধারণ উদ্যোগী দেশপ্রেমিক মানুষের পক্ষে সম্ভব। এর ব্যাপারে তাঁর ওপরে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দেখবার মতো। একটা বড়ো প্রভেদও অবশ্য ছিলো। তা হলো রবীন্দ্রনাথের মতো রাজনীতিকে তিনি কখনও বর্জনীয় মনে করেননি।

গ ঃ

মহাত্মা বস্তুত দেশের জন্য এক সীমাহীন দুঃখ স্বীকারের প্রতীক। এই দুঃখ স্বীকারের বাহিরের গড়ন অপরের কাছে নানাবিধভাবে প্রতীত হতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষ আর তার মানুষকে যিনি জীবনসর্বস্ব বলে মনে করেছেন তার কাছে এর তাৎপর্য স্বতন্ত্র। অহিংস অসহযোগ আর সত্যাগ্রহই সব ভালোবাসা আর বিশ্বাসের ধ্রুবক। দেশকে ভালবাসতে গিয়ে এই সত্যকে তিনি গৌণ ভাবতে পারেননি। চৌরি-চৌরার ঘটনা যখন ঘটেছে তখন এই সত্যের প্রেক্ষিতেই আন্দোলন মধ্যপথে প্রত্যাহার করেছেন। শাসকের পীড়ন কোন পর্যায়ে পৌঁছে মানুষকে তার হিংসাত্মক ভূমিকায় নামতে বাধ্য করেছে মহাত্মা তাকে বড়ো বলে ভাবেননি, শেষত পশুশক্তিই প্রাধান্য পেয়েছে, যে সত্যকে মূলধন করে তিনি তার অভিপ্রেত লক্ষ্যের দিকে যাত্রা চালিত করেছিলেন তা খণ্ডিত হয়েছে এই ভাবনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। নিখিল ভারত-কংগ্রেস সম্মেলনে যখন তাঁর ওপর দিয়ে নীরব ও সরব গঞ্জনার ঝড় বয়েছে তখনও এই সত্যপ্রতীতি বিচলিত হয়নি। এর জন্য একান্ত অনুকূল সহযোগী এবং ভক্ত অনুচরদের সঙ্গেও তাঁকে মানসিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। 'অনুরক্ত ও ভক্তের অশ্রদ্ধা, অভক্তি ও বিদ্রূপের দণ্ড' এ সব কিছু নীরবে বহন করে মহাত্মাজী জন্মভূমির উপরেও তাঁর সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সত্য অনুরাগী এই পথেই অগ্রসর হবেন, নিজেকে বঞ্চনা করে নয়, পরের উপর 'মোহবিস্তার' করে নয়, হিংসা ও আক্রোশের অর্থহীন অগ্নিকাণ্ডের মূল্যেও নয়, তাঁরই মতো শুদ্ধ ও সমাহিত অন্তরে লোভ, মোহ ও ভয়কে সব দিক দিয়ে জয় করে।

আরও একটা বড়ো সত্য তিনি তুলে ধরেছেন। অন্তত শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে। সেই অনুযায়ী কোনও দেশ যখন স্বাধীন ও স্বাভাবিক অবস্থায় যাবে তখন দেশাত্মবোধের সমস্যাও খুব একটা জটিলতরো কিছু হয়না, দেশপ্রেমের পরীক্ষাও অত্যন্ত কঠিনভাবে দিতে হয়না। কিন্তু সেই দেশ যদি কখনও পীড়িত, রুগ্ন হয়ে ওঠে তখন কিন্তু এই শিথিল পরিস্থিতি আর বর্তমান থাকেনা। এই দুঃসময় থেকে উত্তরণের নেতৃত্ব যিনি দেন, দেশের সমস্ত মানুষের সামনেই 'পরার্থপরতা'র পরীক্ষা তাঁকে দিতে হয়, তিনি কতখানি সত্যসন্ধ তার নীরব, নিরভিমান প্রমাণ প্রতিষ্ঠার জন্য। কোনও বক্তৃতা বা চাতুর্যে এ কাজ সিদ্ধ হয়না। শতসহস্র ভারতবাসী এই পরীক্ষাই এক সময়ে দিয়েছে। অনুপ্রেরণার সেই পবিত্র আগুনটুকু স্বয়ং মহাত্মার।

ঔপনিবেশিক সরকারের কাছে আমাদের হতভাগ্য ভারতবাসীর কোনও বিশ্বাস যোগ্যতাই নেই। মহাত্মাজীও তা জানতেন। কিন্তু বিবাদ বিসংবাদ, বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে তাঁর সত্যধর্ম অনুযায়ী এই রাজশক্তির হৃদয় নিয়েই তিনি পড়েছিলেন। অস্ত্রধারীর পন্থায় নয়, তাঁর সমস্ত আবেদন নিবেদন এই আত্মার কাছে। প্রশাসনের বিবেক বা আত্মার কোনও অবকাশ না থাকতে পারে, কিন্তু এই শক্তির যারা চালক তাদের পরিত্রাণ মেলেনি। এই অন্তর্লীন সহানুভূতির জাগরণ ঘটানোতেই তো তাঁর সমূহ প্রযত্ন। বিবেক বা আত্মিক শক্তি স্বার্থ বা অনাচারে

মতো মলিন বা আচ্ছন্ন হয়েই থাক, অন্তরের সাধনায় একে তিনি অমলিন মহিমা দেবেন এই তাঁর বিশ্বাস। এর থেকে তাঁর বিচ্যুতি নেই। কিন্তু লোভ, মোহ ক্রোধ বা বিদ্বেষ দিয়ে তো হিংসাকে নিবারণ করা যায় না, মহাত্মা তাই নিজেকেই নিঃশেষে নিবেদন করেছিলেন। এই তাঁর কাছে ধর্মযুদ্ধ, তপস্যা। একেই তিনি বীরের ধর্ম বলে অসংকোচে অকপটে প্রচার করেছিলেন। মনুষ্যত্বের যে নিরবধি অপমান সমস্ত পৃথিবী জুড়ে, তার প্রতিবিধান শাস্ত্রধারীর ঔদ্ধত্যে নয়, তা নিহিত কেবল মানুষের প্রীতির মধ্যে, তার আত্মার উপলব্ধির মধ্যে, এই মহাসত্যকে তিনি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিলেন বলেই অহিংসাব্রতকে সাময়িক কোনও বাহ্য উপায়মাত্র বলে নয়, এক শাশ্বত ধর্মবলে ভাবতে পেরেছিলেন। আর এইজন্যই আমাদের রাজনীতিক আন্দোলনকে আধ্যাত্মিক বলে বোঝাবার জন্য দিনের পর দিন প্রাণপ্রাত প্রয়াস করেছিলেন। প্রতিপক্ষের বিদ্রূপ এবং স্বপক্ষের অবিশ্বাস কিছুই তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। ইংরেজ-রাজশক্তির উপর তিনি বিশ্বাস হারিয়েছেন, কিন্তু 'মানুষ ইংরাজদের আত্মোপলব্ধির' প্রতি তাঁর বিশ্বাস অবিচল হয়ে রয়েছে। 'মুক্তধারা' নাটকের আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন 'মারনেওয়ালার' ভিতরকার দ্বন্দ্ব, যেখানে বিবেকবান অংশই শেষত জয়ী হয়। অন্যের সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ না করে মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা যে কত বড়ো বস্তু এবং এর প্রতি দ্বিধাহীন আগ্রহও যে কত বড়ো স্বদেশ মুক্তির সাধনা তা সমবায়শীন অনেক বড়ো মাপের মানুষও উপলব্ধি করতে পারেননি। সত্যকে খণ্ড করে তিনি প্রার্থনা করেননি, সত্যকে শর্তহীন ভাবে সম্পূর্ণ আকারেই তিনি চেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের অভিমত হলো, 'এই চাওয়ার মধ্যেই মানব-জাতির সর্বপ্রকার এবং সর্বোত্তম লক্ষ্যের' পরিণতি বিদ্যমান। হিংসার পথে তাই তাঁর প্রাপ্য অর্জন করতে তিনি সংকুচিত হয়েছেন। তিনি চেয়েছেন, 'দাতার প্রসন্ন হৃদয়ের সার্থকতার দান', সাময়িক অসত্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি যে সত্যাগ্রহী হয়েছেন তা মহত্তর সত্যের প্রেক্ষিতেই।

বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে মহাত্মার নৈতিকতার শক্তি ব্যাপারটিকে শরৎচন্দ্র সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। প্রতিপক্ষ বলেছে ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে আমাদের চিরদিনের বন্ধন ব্যাপারটা সত্য হবে কি করে। নিরুপদ্রব শান্তির জন্যই বা এতো ব্যাকুল হওয়া কেন? ইংরেজ তো শান্তিপূর্ণ নৈতিকতার পথে ভারতসাম্রাজ্য জয় করেনি, সুতরাং সব নিরুপদ্রব নৈতিকতার দায় কি কেবল একলা আমাদের! মহাত্মার উত্তর—একথা কোনোভাবেই সত্য নয়, জগতে যা কিছু অন্যায়ের পথে, অধর্মের পথে একসময়ে অর্জিত হয়েছে, তাকে ধ্বংস করেই ন্যায় ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা যায় না। 'অবাঞ্ছিত জারজ সন্তান অধর্মের পথেই জন্মলাভ করে অতএব দুহাতে বধ করিয়াই ধর্মহীনতার প্রায়শ্চিত্ত করা যায় তাহা সত্য নয়।'

মহাত্মার রাজনীতিক তথা অধ্যাত্ম দর্শনের চমৎকার বিশ্লেষণ শরৎচন্দ্র করেছেন। এর মূল্য আরও বেশী কেননা কংগ্রেসী রাজনীতির এই অবিসংবাদিত নায়ক তখন মূল্যমান একটি প্রভাব তথা অস্তিত্ব, আজকের মতো ইতিহাসের সামগ্রী নয়। সমকালীন বিতর্কিত রাজনীতিক ব্যক্তিত্বকে এতখানি নিরপেক্ষভাবে ধরা সত্যই এক ধরণের শক্তির পরিচায়ক। ব্যক্তিগতভাবে মহাত্মাপন্থী রাজনীতিক বিশ্বাস তাঁর নয়। অথচ যখন তিনি বিশ্লেষণ করেন, তখন প্রতিপক্ষের প্রেক্ষিত থেকে নয়, মহাত্মার মনোভূমি থেকেই নব বিশ্বাসগুলিকে বিবৃত করেন তিনি। এই অবিসংবাদিত রাজনীতিক নায়ক তখন পুরো দৃশ্যগ্রাহ্য হয়ে ওঠেন। প্রবন্ধটির শেষে বিপক্ষের

জোরালো যুক্তিগুলির সামান্য ছোঁয়া দেন তিনি, কিন্তু কিভাবে মহাত্মা নিজেকে রক্ষা করেন সেই ব্যাপারটিই শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য পায়। হয়ত বিশেষ একটি সংখ্যার প্রশস্তি করার মানসিকতাও এর পিছনে কাজ করে থাকবে। অন্যথায় সব্যসাচীর স্রষ্টা, মহাত্মার ভক্ত হন কি করে।

ঘ : 'দেশবন্ধু স্মৃতি'

দেশবন্ধুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক দূর থেকে শ্রদ্ধা নিবেদনের মাত্র নয়। যেমন মহাত্মা বা নেহরুর সঙ্গে। দেশবন্ধুকে অত্যন্ত নিকট থেকে দ্বন্দ্ব পরিবেশে তিনি পেয়েছিলেন। অনেক অন্তরঙ্গ বচনে তাঁদের দুজনের নিভৃত মুহূর্ত মুখরিত হয়ে উঠেছে। তা শুধু বায়বীয় শব্দসমূহের সমষ্টিমাত্র নয়। রীতিসিদ্ধ অর্থে ঠিক রাজনীতিক মানসিকতার ব্যক্তি না হলেও শরৎচন্দ্রের মানসিকতার দিক, ভারতবর্ষের চলিষ্ণু রাজনীতির প্রবাহ সম্পর্কে তাঁর ধ্যান ধারণা এতে প্রতিবিম্বিত। 'স্মৃতিকথা' নামাঙ্কিত রচনাটি এই সূত্রে একটু ভেবে দেখা যেতে পারে। 'স্মৃতিকথা' নামটি খুব স্বাভাবিক এই কারণেই যে দেশবন্ধু মহাপ্রয়াণে তাঁরই স্মৃতিতে এটি রচিত।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে যে স্মৃতিকথায় তাঁর প্রথম বচনই হলো, সমস্ত রকম কর্তব্যকর্মের মধ্যে এতো বড়ো বৈরাগী তিনি আর দেখেননি। দেশবন্ধু একদিন নিজেও লেখককে বলেছিলেন, যে লোকে ভাবে তিনি ব্যক্তি বিশেষের প্রভাবে কেবল আবেগ বশবর্তী হয়েই অতখানি অর্থকরী পেশা পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু এ ভাবা সত্য নয়। তারা জানেনা যে, এ তাঁর বহুদিনের একান্ত বাসনা, শুধু ত্যাগের ছলনা করেই ত্যাগ করেছেন। ভবিষ্যতের সামান্য সঙ্গতি হাতে না রেখেই।

এর পিছনে বাসন্তীদেবীর অবদান কম নয়। 'স্বরাজ সাধনায় নারী'তেই যে সহধর্মিনী নারীর কল্পনা তাঁর ছিলো এ সেই সমান ধর্মবতী নারী। স্বামীর সুখে দুঃখে আদর্শে ধ্যানে প্রতিমুহূর্তে অনুগামিনী এই অসামান্য নারীর প্রশান্ত রচনায় শরৎচন্দ্র তাই অক্লান্ত। ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে এমনই সাধ্বী, লক্ষ্মীর আবির্ভাব তিনি সর্বান্তঃকরণে প্রত্যাশা করেছেন।

একটি কথা। দেশের মানুষের বিরুদ্ধতা, ঊদাসীনতায় একবার শরৎচন্দ্র ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। বেশ ক্ষোভের সঙ্গেই বলেছিলেন, দেশের লোক সাহায্য করতে যদি এতটাই বিমুখ হয়ে থাকে তবে তাদেরই বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অগ্রসর হবার কি প্রয়োজন। দেশবন্ধুর উত্তর অত্যন্ত সপ্রতিভ। এবং সে উত্তর প্রফেশনাল রাজনীতিবিদের নয়, দেশপ্রেমিক রাজনীতিকের, যিনি বলেন, দোষ আমাদেরই, আমরাই কাজ করতে জানি না, আমরাই গণসাধারণের কাছে আমাদের কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারি না। অন্যথায় বাঙালী কৃপণ নয়, সে ভাবুক। একদিন যখন তাকে যথার্থই সব বোঝানো যাবে সে তার যথাসর্বস্ব দিয়ে দিতে কার্পণ্য করবে না।

এই সহনশীলতা এবং মানুষের প্রতি প্রগাঢ় কর্তব্য আর মমত্ববোধই নেতৃত্ব তথা ব্যক্তিত্বের পূর্বসূত্র। ব্যক্তিপুজোকে আমরা মুখের যুক্তিতে আড়াল করতে চাই, কিন্তু বিশ্বাস আর আচরণ সব সময়েই কোনো না কোনো ভাবে এই ব্যক্তিপুজোর মানসিকতাকেই পুষ্ট করে চলে। সে কথা শরৎচন্দ্র গোপন করেননি, স্পষ্ট লিখেছেন, 'আমাদের অনেকেরই মন হইতে দেশের কাজ করার ধারণাটা ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আমরা করিতাম দেশবন্ধুর কাজ।'

চরকা, খাদি বা হিন্দুমুসলমান মিলন প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের স্বতন্ত্র বক্তব্য ছিলো। যদিও সেই স্বতন্ত্র

বক্তব্য স্পষ্ট সুনির্দিষ্ট কিছু একটা নয়। তবে অন্ত্যজ জাত্য হিন্দুজাতিগুলির প্রতি আমাদের মানবিক, সম্ভ্রমের মনোভাব জাগ্রত করতে হবে, এদের পূর্ণ মনুষ্যত্বে উদ্‌বোধিত করতে হবে; মেয়েদের প্রতি যে অন্যায় নিষ্ঠুর সামাজিক পীড়ন চলে আসছে তার প্রতি-বিধান করতে হবে—এসব ভাবনাগুলি মোটামুটি স্বচ্ছ। এগুলিকে তিনি সামাজিক সমস্যার অন্তর্গত বলেই বিবেচনা করতেন। এসব কথায় দেশবন্ধুরও হৃদয়ের আন্তরিক যোগ ছিলো।

শরৎচন্দ্র একটা কথা বারবার বলতেন। জন-গণেশ হঠাৎ যে বিরাট একটা কিছু করে ফেলতে পারে, সে ব্যাপারটায় কিছুটা বিশ্বাস করলেও দীর্ঘ-স্থায়ী সংগ্রামের সহিষ্ণুতা যে তাদের একদমই নেই একথা অসংকোচেই তিনি বলেছেন। তাঁর আস্থা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছেলেদের ওপর। তাঁর সমস্ত 'আবেদন নিবেদন' এদের কাছে, কেননা, 'ত্যাগের দ্বারা কেউ কোনদিন যদি দেশ স্বাধীন করতে পারে, ত শুধু এরাই পারবে।'

এসব চিন্তাও এক ধরণের ভাবগত 'এক্সট্রিমিজম'। কোটি কোটি অর্ধ-শিক্ষিত, অর্ধ-ভুক্ত, অন-অনুশীলিত মানুষের কাছে একেবারে মাপে মাপে মানানসই ত্যাগ দেশব্রত উদ্‌যাপন করা, হিসেব না মিললেই ক্ষুব্ধ হওয়া, রাগ করা! বরিশাল কংগ্রেস ভেঙ্গে যাবার পর, বা 'ঘরে বাইরে'র মাষ্টারমশাই যে কথা বলেন, যে এতদিন যাদের আমরা কখনও খবর নিইনি উল্টে পীড়ন করেছি, রাতারাতি নিজেদের প্রয়োজনে তাদের পাশে চেয়েছি, এ কখনও হয়! শরৎচন্দ্র কিন্তু বিষয়টি সে প্রেক্ষিতে বিবেচনা করেননি। তবে সশস্ত্র বিপ্লবীদের সম্পর্কে আরো একমত না হলেও তাদের ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন। সব ব্যাপারেই ঠিক দেশবন্ধুর সঙ্গে সায় দেননি। ব্যবহারিক প্রয়োজন বা নিজেদের শক্তির আপেক্ষিক দীনতার প্রেক্ষিতে দেশবন্ধুর যে আপোষ পন্থা সে ব্যাপারে অবশ্য তিনি মন্তব্য করেননি। সেটা ঠিক সমর্থন না ভিন্ন মতপোষণ তা স্বচ্ছ হয়না। তবে তিনি যখন পাদ-পুরণের মতো জালিয়ান-ওয়ালাবাগের স্মৃতি তাঁর মন থেকে দূর হয়নি, তখন সম্ভবত টোরি গভর্ণমেণ্টের নিষ্ঠুরতার ব্যাপারে দেশ-বন্ধুর বিশ্বাসের প্রতিধ্বনিই করতে চেয়েছিলেন, আর তাহলে তো রণনীতিগত একটা আপোষের প্রশ্নও এসে পড়ে। কিন্তু তার স্পষ্ট প্রসঙ্গ কিছু নেই।

রাজনীতি বিষয়ে লেখা শরৎচন্দের প্রবন্ধ সংখ্যা নাম মাত্র। অধিকাংশই অভিভাষণ, দু একটি স্মৃতি কথন গোত্রীয়। নিজে কিছুকাল প্রত্যক্ষভাবে জিলা স্তরে কংগ্রেসী রাজনীতি করেছেন, যদিও ঠিক রাজ-নীতিক মানসিকতা তাঁর ছিলো বলে মনে হয়না। 'পথের দাবী' সম্বন্ধে মনে রেখেই একথা বলা যায়। তাঁর মতামতগুলি অনেকটাই প্রতিক্রিয়ার মতো ব্যাপার। কখনও তাতে প্রকাশ পায় ইউটোপিআ আদর্শ, কখনও একটা পাল্টা কর্মসূচী রাখবার চেষ্টা, কখনও বা রবীন্দ্রনাথের 'সবুজের অভিযান' কবিতার মাপে উচ্ছ্বসিত যৌবন স্তুতি বা দেশের বৃহত্তম দীর্ঘ-স্থায়ী সংগ্রামে তরুণদের আহ্বান করা যেমন 'তরুণের বিদ্রোহ'। কখনও বা দেখি 'সত্যাশ্রয়ী'র মতো আত্মগঠন মূলক রচনা। 'মহাত্মাজী' প্রবন্ধে তাঁর জীবনাদর্শের প্রতি তিনি গভীরভাবে শ্রদ্ধানত, অন্যদিকে 'নূতন প্রোগ্রাম' রচনায় খাদি, চরকা নিয়ে যৎপরোনাস্তি ব্যঙ্গ পরিহাস। এসব কিছুই অবশ্য অন্য একটি সূত্রে বিশ্লেষণ করা যায়। তা হলো সব্যসাচীর স্রষ্টাকে ঠিক কংগ্রেসী পদ্ধতির আন্দোলনের বোতলে পুরে রাখা যায় না। যাঁর কল্পনায় 'মূলমন্ত্র এক্সট্রিমিজম' ঐ অবধি গেছে, শ্রদ্ধা সত্বেও গান্ধী-নীতির সঙ্গে ঠিক তাঁর অন্বয় সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারেনা।

ঘটেছেও তাই। 'স্মৃতিকথা'য় আছে, দেশবন্ধু যখন বলেছেন, 'আমার ভারি ইচ্ছে হয় যে চরকা কাটা শিখি, কিন্তু কোন রকম হাতের কাজেই আমার পটুতা নেই', শরৎচন্দ্রের সস্মিত উত্তর—'ভগবান আপনাকে রক্ষা করেছেন'।

নূতন প্রোগ্রাম তো বিদ্রূপে রসিকতায় পূর্ণ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই। যেমন 'বাঙলার খদ্দেরের এক-জন আড়তদারের কথা'। আশ্রম তৈরী হইতে আরম্ভ করিয়া ছাগদুগ্ধ পান করা পর্যন্ত তিনি সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন—তেমনি টিকি, তেমনি কাপড় পরা, তেমনি চাদর গায়ে দেওয়া, তেমনি হাঁটু মুড়িয়া বসা, তেমনি মাটির দিকে চাহিয়া মৃদুমধুর বাক্যালাপ সমস্ত। কিন্তু ইহাতেও নাকি পূজার উপচার সম্পূর্ণ হয় নাই, ষোলো কলায় হৃদয় ভরে নাই, উপেন্দ্রনাথ বলেন, এবার নাকি তিনি সম্মুখের দাঁতগুলি তুলিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।'

চরকায় আত্মনির্ভরতা আসে, মহাত্মা থেকে আরম্ভ করে তাবৎ চরকাপন্থীদের বিশ্বাসের প্যারডি করে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, "আমাদের পরাণ একবার আত্মনির্ভরতার বক্তৃতা দিয়া বক্তব্য সুস্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে উপসংহারে concrete উদাহরণ দিয়া বলিয়া-ছিলেন,—'মনে কর তুমি গাছে চড়িয়া পড়িয়া গেলে। কিন্তু পড়িতে পড়িতে তুমি যদি হঠাৎ একটি ডাল ধরিয়া ফেলিতে পার, তবেই জানিবে, তোমার আত্ম-নির্ভরতা (Self-help) শিক্ষা হইয়াছে, তুমি স্বাব-লম্বী হইয়াছ।"

এই লেখাটিরই একেবারে শেষে ছিলো, আরও একটা কথা ভাবি, এ ভালই হইয়াছে যে দেশবন্ধু স্বর্গে গিয়াছেন। ফিলিস সরকাসের বিবরণ young Indiaর পাতায় তাঁহাকে চোখে দেখিতে হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ প্রথাসিদ্ধ রাজনীতিক আন্দোলন বা উদ্যোগের একরকম বিরোধীই ছিলেন। শরৎচন্দ্র সে অর্থে বিরোধী নন, কিন্তু রাজনীতিতে থাকলেও ঠিক সুনির্দিষ্ট নিজস্ব কোনও কর্মসূচী তাঁর ছিলোনা। তবে কয়েকটি জিনিস লক্ষণীয়। যেমন রাজনীতিতে বাঙালী ওরিয়েনটেশনের প্রবল একটা ঝোঁক তাঁর ছিলো। সেই সূত্রে দেশবন্ধু সুভাষের প্রতি তাঁর গাঢ় অনুরাগ; দেশবন্ধু বাঙলা দেশে তখন মহাত্মার প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিত্বের মতো; যেমন নেহরু রাজত্বের প্রথম দিকে ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। বাঙালী দক্ষিণপন্থী রাজনীতির মধ্যেও বামপন্থার অন্বেষণ করেছে।

আর একটি জিনিস শরৎচন্দ্রের প্রগতিশীলতা। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে নিকটে আকর্ষণ করার যে ধর্ম তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যকর্মে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, সেই একই মনোধর্ম তাঁর প্রবন্ধ, রচনাতেও প্রতিবিম্বিত। এই ধরণের গতিশীলতা থেকেই তিনি সকলকে সত্যাশ্রয়ী হবার আহ্বান জানান। ভিতরে বাহিরে, মৌখিক বচনের সঙ্গে অন্তরের বিশ্বাসের অন্বয় মেল বন্ধন ঘটানোই এই সত্যাশ্রয়ী মনোভাব। এই নিষ্ঠা এবং সততা ব্যতি-রেকে নিবেদিতপ্রাণ দেশকর্মী হওয়া যায় না। শুদ্ধ মানবিকতার দিক থেকে, লিবারালিজমের দিক থেকে এই মনোধর্মই জাতি গড়ে তোলে। যাঁরা আমাদের নেতৃত্ব দেবেন এবং যাঁরা নেতৃত্বকে অনুসরণ করে তাঁদের আরব্ধ ব্রতকে এগিয়ে দেবেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে এ কথা কেবল কথার কথা মাত্র নয়, এ সততাটুকুর অভাব ঘটেছে বলেই, রাজনীতি আজ সুবিধাভোগী আর সমাজবিরোধীদের প্রধান কর্মকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিকৃত জীবননীতির জন্যই মেয়েরা এদেশে মা বলে বাহিরে ঘোষিত হলেও, কার্যত তাদের অবস্থা দাসীরও অধম। বিকৃত জীবন-

নীতি থেকে সে কখনও মহৎ দেশপ্রেম জন্ম নিতে পারেনা শরৎচন্দ্র একথাই বারবার বলেছেন। এই মহান জীবনশিল্পী মহৎ জীবন আর মহৎ রাজনীতিকে পৃথক করে দেখতে পারেননি।

পরিশিষ্ট ঃ 'সমাজধর্মের মূল্য'

'সমাজধর্মের মূল্য' রাজনীতিবিষয়ক কোনো প্রবন্ধ নয়, কিন্তু বিশুদ্ধ রাজনীতি বলে কিছু হয়না— সামাজিক, আর্থিক বা সাংস্কৃতিক জীবনের নির্যাস হিসেবেই তার অস্তিত্ব তথা বিদ্যমানতা। সেই অর্থেই জীবনের যে উদার বিস্তৃত রূপ, অন্তত আপেক্ষিক ভাবেও শরৎমননে ধরা পড়েছিলো, এবং জীবনের যে উদার রূপ সর্ববিধ গতিময়তার প্রাক্শর্ত এখানে সে কথাই রয়েছে। তাঁর আক্রমণ প্রধানত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধেই। যদিও জাতিভেদ ব্যাপারটা একেবারেই খারাপ, বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথের মতো জোর দিয়ে সে কথাটা তিনি বলতে পারেননি। পাঠক 'পল্লী-সমাজ' উপন্যাস-এর কথা মনে করতে পারবেন। এই প্রবন্ধেও প্রচলিত সামাজিক বিধিকে একেবারে লঙ্ঘনের পরামর্শ নেই। বরং এ কথাই আছে, যতক্ষণ এটি সামাজিক শাসন-বিধি, ততক্ষণ তো শুধু ন্যায্য দাবীর সীমানায় একে অতিক্রম করে তুমুল কাণ্ড করে তোলা যায় না। বা এইরকম তথাকথিত ন্যায়সঙ্গত অধিকারের বলে একা একা বা দু'চারজন সঙ্গী জুটিয়ে নিয়ে বিপ্লব বাধিয়ে দিয়ে যে সমাজসংস্কারের সুফল পাওয়া যায় তা কোনোমতেই বলা যায় না।

বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণার ওপর শরৎচন্দ্র তাঁর সাধ্যমতো একটি সংশোধনী এনেছেন। হারবার্ট্ স্পেনসারের মত অনুযায়ী ব্যক্তির স্বাধীনতা সমাজের জন্য সঙ্কুচিত হতে পারেনা। এ স্বাধীনতার সীমানা যে তা অপরের তুল্য স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবেনা। কিন্তু কার্যত এই 'অপরের তুল্য স্বাধীনতায়' কত দিক থেকে যে কত রকম টান ধরে এত বড় সত্য কথাও আর নেই।

অথচ পরের অনুচ্ছেদেই তিনি লেখেন, সামাজিক আইন বা রাজার আইন যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রসারিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজ যদি তার শাসন বা অন্যায় দেশাচারে কাউকে কষ্ট দিতেই বাধ্য হয়, তার 'সং-শোধন না করা পর্যন্ত এই অন্যায়ের পদতলে নিজের' সঙ্গত দাবী বা স্বার্থ বলী দেওয়ায় 'যে কোন পৌরুষ' নেই বা তাতে যে 'কোন মঙ্গল হয়না এমন কথাও ত বলা যায় না।' তাঁর কথা হলো, যেমন রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চরম প্রতিবাদ হলেও তা প্রায়শই কার্যকরী হয় না, সমাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সম্পর্কেও সেই কথা প্রযোজ্য। ব্রাহ্ম সমাজ চরম বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে প্রকৃত পক্ষে বৃহত্তর জীবনধারা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলো এবং তাদের ইচ্ছা সুমহৎ হলেও আজ তার অধঃপতন আসন্ন বা সুনিশ্চিত। শরৎচন্দ্রের পরামর্শ, 'দেশের ব্রাহ্মণেরাই যদি সমাজতন্ত্র' এতকাল পরিচালনা করে আসেন, তবে এর মেরামতির কাজও তাঁদের দিয়ে সারতে হবে। কেননা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থেকে একথা সুপ্রত্যক্ষ যে দেশের লোক এ বিষয়ে পুরুষানুক্রমে যাদের বিশ্বাস করতে অভ্যাস করেছে, হাজার বদ অভ্যাস হলেও সে অভ্যাস তাঁরা ছাড়তে চাইবেনা।

কথাগুলি শুনতে অস্বস্তিকর। কিন্তু অতি বাস্তব, দিবালোকের মতই সত্য স্পষ্ট। সমাজ অর্থনীতির মৌলিক পরিবর্তন তথা প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্ক তথা মানবিক মূল্যবোধের বদল না ঘটিয়ে ওপর ওপর সংস্কার করতে গেলে এইটিই ঘটে এবং নিয়তই ঘটছে। তাই রামমোহন, রামকৃষ্ণদেব, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিবে-

কানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, নেহরু বা সুভাষচন্দ্র কেউই ভারতবর্ষের মূল জীবন প্রবাহের কোনও পরিবর্তন ঘটাতে পারেননি। ধর্মান্ধতা, জাতিভেদ, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের নিপীড়ন সবই অবিচল রয়েছে, কয়েকটি শহর আর ব্যাংকোয়েট হলের ভোজকালীন বৃহৎবচন তো ভারতবর্ষকে প্রতিবিম্বিত করেনা। যদি কেউ দাবী করেন ভারতবর্ষের মূল জীবনধারায় লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে তাহলে বুঝতে হবে তিনি অসংখ্য কপটাচারী রাজনীতিকেরই একজন। এত বুঝে সব শরৎচন্দ্র বলেননি। কিন্তু নির্গলিতার্থ তাই দাঁড়ায়।

শরৎচন্দ্র কিন্তু আপ্তবাক্য শাস্ত্রবচনের প্রতিবাদী। তাঁর প্রতিবাদের প্রেক্ষিত হলো একমাত্র প্রাচীনতাই কোনও বস্তুর সভ্যতার নিরীখ নয়, তাকে দেখতে হবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে, দেশ কাল অনুযায়ী বা দেশ কালের গতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পুরানো শাস্ত্র বাক্যের গ্রহণ বর্জন চলবে। জীবন আর গতিশীল সমাজের পাশে যা মৃত তাকে পরিত্যাগ করতেই হবে। এ সেই অনেকটা রামমোহন বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারের পদ্ধতি আর কি? শাস্ত্র বাক্যকেও আধুনিক মনের মাপে ঢালাই করে দেওয়া। এই সব শাস্ত্র বাক্য নতুন কালের প্রেক্ষিতে একেবারেই অচল এ ধরণের র‍্যাডিকালিজম্ তাঁর পক্ষে অকল্পণীয়, তিনিও সেই সংস্কারপন্থী এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে চিন্তাগত স্তরেও পুরো আঘাত করতে সাহস পাচ্ছেন না শরৎচন্দ্র। প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ সম্ভব না হোক চরম উদাসীনতাকেই এ ধরণের রণনীতি করে এর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতে পারতেন তিনি। তা তিনি করেননি। তাঁর নীতি কিছুটা সংঘর্ষ কিছুটা আপোষ রফা।

কিছুটা সংঘর্ষে লাভ অবশ্য আছে। চাতুর্বর্ণ্য প্রথার অন্ধ সমর্থকদের তিনি যে যথেষ্ট আক্রমণ করেছেন এটাই বা একেবারে কমকি! এক থেকে দশে না হোক পাঁচে তো যাওয়া যাচ্ছে। সমাজপতিরা অন্তত এটুকু বুঝছেন যে এ লোকটি সরাসরি তাঁদের সমর্থক নন। হৃদয়ের পরিবর্তনে ভিৎ না নড়ুক, দরজা জানালা তো কমজোরী হয়ে যাবার কথা।

একটা কথা উপসংহারে ছক মাফিক হলেও বলতে হবে। তা হলো শরৎচন্দ্রের মননের যে সঙ্কট বা দুর্বলতা তা গোটা উনিশ শতকের মনোধর্মেরই প্রতিফলন। সব ক্ষেত্রেই রিফরমেশন চেয়েছি, ঐতিহ্যের সঙ্গে বিযুক্ত হয়ে পড়ার ভয়েই হোক বা সামাজিক শাসনের মূল শক্তি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে রেয়াত করেই হোক র‍্যাডিকালিজম্ বাদ দিয়েছি। একসট্রিমিজমও তো অনেকটা সেই ধারাতেই। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের মূল ভিৎটাকে অক্ষুন্ন রেখে ওপর ওপর কয়েকটি মাথা কেটে উড়িয়ে দেওয়া। যার শেষ জের দেখেছি উগ্র বাম আন্দোলনে। আসলে উনিশ শতক থেকে জাতীয় ইতিহাসের যে ধারা শুরু হয়েছিলো, কার্যত এখনও তার গুণগত পরিবর্তন বিশেষ কিছু ঘটেনি।

প্রসঙ্গ : গোধূলি-মন

● উত্তর প্রবাসীর পুরস্কার লাভ করেছেন এজন্য অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাচ্ছি।
জুন সংখ্যা গোধূলি-মন পেয়েছি। আন্তরিক ধন্যবাদ।
'গোধূলি-মন' এ সবসময়েই কিছু না কিছু বৈচিত্র্য থাকে। এবারে পত্র সম্ভার।

নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়
৪৬ বি, রিচি রোড, কলকাতা-৭০০০১৯

পুস্তক সমীক্ষা

'আত্ম যুযুধানে মত্ত দুটি চোখ, সময়ের রাজপথে'

অজিত রায়

বাঙালি মাত্রেই কবি। এ আমাদের দুর্ভাগ্য, না বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য বলা দুষ্কর। হালে পঞ্চমা কাগজে জনৈক ভদ্দরলোক পরিসংখ্যান মারফৎ দেখিয়েছেন যে তিরিশ দশক থেকে আশির এই পাঁচ বছরে কুল্লে ৩৮০টা কবি বঙ্গভূমি ফুঁড়ে বেরিয়েছেন। ৫৫ বছরে ৩৮০টা হলে ফি বছরে সাতজন। অর্থাৎ গত ৫৫ বছর ধরে বঙ্গদেশে প্রতি দু মাসে একটি কবি হয়েছেন। ধন্য মা বঙ্গঠাকরুণ! পোরবন্দর থেকে ব্রহ্মপুত্র, কাশ্মীর থেকে কুমারিকা অন্তরীপ—বিশাল এই ভারতভূমি পড়ে থাকতে একা তোমার জঠরেই এমন বিপুল পরিমাণে কবির আবির্ভাব সত্যি বিস্ময়কর! হে বঙ্গজননী, তোমার জন্যে করুণা হয়। দুঃখ পাই, বেদনা হয়! কান্না পায়? থাক সে কথা।

সম্প্রতি অজিত বাইরীর (জন্ম ১৭ নভেম্বর ১৯৮৪, কনকপুর, হুগলী) কাব্যগ্রন্থ 'প্রিজনভ্যান এবং কালপুরুষ' হাতে নিয়ে মনে হলো বাবা-রে, কবিতার বই এইরকম। যেন ছারপোকার গোরস্থানে গিজগিজ করছে অজস্র এপিটাফ। রচনার সংখ্যা একশো? প্লাস তিরিশ? দেড়শোও হতে পারে। গুণতে পারিনি। লজ্জা। হরেক বিষয়ের এমন ককটেল দেখে মনে হয়েছিল সব মিথ্যে কচকচি, বানানো, সিউডো কবিতা। আসলে কিন্তু এটি তিন-মিশেলি বিষয়ের চার গোছা কাব্যাংশের একটি ক্ষুদে সংকলন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'I am, I know, I express—মানুষের এই তিন দিক এবং এই তিন নিয়েই একটি অখণ্ড সত্য।' সুক্ষ্ম অন্বেষায় অজিতের কবিতায় এই তিন মিশেলি প্রকাশ আমাকে মুগ্ধ করেছে। অবশ্যি, তাঁর অসীম ধৈর্যবতী লেখনী বেগমের কাছে আমি গোড়া থেকেই গোলাম। বিজ্ঞাপনে দেখেছি তিনি আগে থেকেই পাঁচ খানা পদ্য বইয়ের বাবা হয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ কিনা সতীত্ব-মার্কা নিরীহ আগরবাতি পদ্যের তিনি একাধারে বর্ষীয়ান প্রতিপালক ও লক্ষ্মীসফল বাজারমাতিয়ে স্রষ্টা। এহো বাহ্য। শুনেছি মনোপলি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের কোল আলো করা গঙ্গাজল কবিতার লেখকও বটেন। কবিত্বের ওপর অজিতের এমন নিঃসপত্ন দখল আমাকে মুগ্ধ করেছে। কনগ্র্যাট্‌!

গোড়ায় এক গণ্ডা নমুনা— (১) 'রীণাদি নয়, রীণাদির স্মৃতিই/এখন আমাকে/একা একা নিয়ে আসে ছাদে,/অন্ধকারে উদাসীন বসে থাকি দিক চক্র-হীন' (রীণাদি ও ছাতিমফুল), (২) 'তোমার কাছে এলে কত সহজেই ভুলি—/তোমাকেও ঘিরে দাঁড়িয়েছে হেমন্ত।' (তুমি আমি পাশাপাশি), (৩) 'আমার গর্বিতা স্ত্রী তাকিয়ে আছে আমার দিকে।/আমি দেখি/তার পবিত্র ভারবহনের ভঙ্গিমা।' (প্রতীক্ষা) এবং (৪) 'আমাকে নাও তুমি সাহসী

যুবক/ডুবিয়ে দাও তোমার চিবুক ও দাড়ি।' (ঈপ্সিতা)। প্রেমের এমন মধুরতম, মদিরতম আলেখ্য, এমন বিশ্বভুবনীন বিস্তার ইদানিংকার কবিতায় দুর্লক্ষ্য। প্রতিভার কথা থাক, প্রত্যয় যথার্থ। প্রতিভাবান শিল্পীকেও অনন্য শব্দ বা Walter Pater-এর অনুকরণে বলবো, unique words-এর জন্য শব্দের মৃগয়া করতে হয়। অজিতের সেই শব্দের শরব্যতা যেন তাৎক্ষণিক, স্বভাবসিদ্ধ ও অব্যর্থ: 'কবি তো গরিব নয়, আছে তার হরেকরকম/বাসনা ও ব্যসন।' (যেতে পারি ডিঙিয়ে পাহাড়)—এখানে 'গরিব' কথাটির বদলে অন্য কিছুই প্যানর্গ হতো না। কিংবা ধরা যাক এই দুটি কবিতাংশ: 'পাঁকে নেমে পদ্ম নয়/গুগলি তোলে শেফালী' (জলের ওপর ঈষদচ্ছ রক্ত) এবং 'এখন বিশ্রাম নেবে এ-দেহ, বুকের ওপর আমার বানিয়েো একটা কুঁড়ে আর একটা বাগান' (প্রিয় কিশোরকে···)। এরকম stunnig lesson-এর মধ্যেও আমরা ওই অনন্য শব্দ খুঁজে পাই।

কবিতা কেন লেখেন অজিত বাইরী? এর কৈফিয়তে তিনি আমাকে একটি লেখা পাঠিয়েছেন। তার মূল কথা, আগে তিনি মানুষ, পরে কবি। সাধু। বিপ্লবের প্রতি তাঁর মনোভাব গুলিয়ে গেছে, নাকি এও এক প্যাটার্নের বিপ্লব, বোঝা যায়নি। 'আমিও মনে মনে' 'লোরকার রক্ত' 'অন্য কোন আলো···' প্রভৃতি পদ্যে বিপ্লব-টিপ্লব কথা আছে, অথচ অজিত মনে করেন 'সমুদ্র ভাল মন্দ, তার চেয়েও উৎকৃষ্ট মদ রবিঠাকুরের গান'। কবি নারীজন্ম ব্র্যাকেট দেখে আত্মহত্যা বাসনা ছেড়েছেন, বানচাল করেছেন মহৎ কবিতা সৃষ্টির সম্ভাবনাকেও: 'এখন দিনরাত আউড়ে যাচ্ছি শক্তি সুনীল শরৎ/শঙ্খ আলোক তারাপদ প্রণবেন্দু অমিতাভ সমরেন্দ্র···(অভিসন্ধি)। অজিত যুগব্যাধির নিদানের যে তর্ক দিয়েছেন, তা সমর্থ্যে নয়। কেননা যুগের অবক্ষয় যথার্থত যুগধর্ম নয়, যুগের অপধর্ম। অবক্ষয়িত যুগের কবির একমাত্র কাজ হওয়া উচিত সেই অপধর্মকে অতিক্রম করে নিত্যধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা। পারেননি অজিত। একদা সত্তর দশকের রক্তোজ্জ্বল কবি সৃজন সেন একটি কবিতায় লিখেছিলেন:···'থানার বড়বাবুও চান, দেশে বিপ্লব হোক'/···এবং সে বিপ্লব আসবে ঐ থানাবাবুদের হাত ধরে/ঘুষের টাকার মতো নিঃশব্দে।' এরই প্রায়-নকল করে অজিত বাইরী লিখেছেন:··· 'বিপ্লব আসুক থানার ও.সিও চায়,/চায় বিপ্লব আসুক/বাঁ হাতের টাকার মতো নিঃশব্দে।' (বিপ্লব আসুক)। শুনতে রুক্ষ লাগলেও বলছি, বিপ্লবের স্বপ্ন যে দেখেনি, সে সত্যিকারের বিপ্লবের কবিতাও লিখতে পারে না, যুগরোগের নিদান দেওয়া তো দূরের কথা। নকল করলেই কি ডায়লেকটিক্স লেখা যায়? 'বিপ্লব আসুক' কবিতায় সাংবাদিক সুলভ বাগ্‌বৈভবে অজিত এক একটি ছবি এঁকে অবশেষে বিপ্লবের প্রতি সহৃদয়ের গোপনতম অভিলাষটি এক পরম করুণ দীর্ঘশ্বাসে উন্মুক্ত করেছেন: 'বিপ্লব আসুক, কে না চায়?/কিন্তু সকলেই চায়/বিপ্লবের আঁচ গায়ে না-লাগুক।' কিন্তু কবির আকুলতা যেন আড়তদার আর থানার ও.সির স্বার্থজনিত মনোভাবের বাথায়, বিপ্লবের প্রতি কবির নিজস্ব কোনো আগ্রহ সে বেদনায় অনুপস্থিত। তিনি যেন রবীন্দ্রনাথ ও মার্কসকে মেলাবার অপচেষ্টায় আশাহত হয়ে লিখে ফেলেন—'দাঙ্গা কার্ফু গুলি বিদেশী উৎখাত, গণহত্যা—/হায়, আমার নির্লিপ্ত, নিস্পৃহের ঠাণ্ডা রক্তে/কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটায় না।' এখানেই অজিতের স্ববিরোধ।

'···কালপুরুষকে' নিয়ে বিজয়া মুখোপাধ্যায় (দেশ) এবং মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়ও (আজকাল) সমীক্ষা করেছেন দেখলাম। তবু, আমার এই আলোচনা ভাষ্যান্তর না হলেও, অজিতকে ভবিষ্যৎ কর্মোক্ষমতা দেবে এটুকু আশা। অবশ্য অজিত লিখেছেন:

…'কে আমাকে অস্বীকার করলো/কে-ই বা স্বীকার ক'রে নিল আমাকে/কুটতর্কে প্রয়োজন নেই কেন…'। সুতরাং এহো বাহ্য।

প্রতিভার তিন ধর্ম—কল্পনা, মনন আর প্রকাশ-ক্ষমতা। প্রতিভাবান কবি না হলে এই তিনের সুষম সমন্বয় অসম্ভব। আশির দশকে যে কজন কবির মধ্যে এই তিনটি প্রকাশ পেয়েছে, সোফিওর রহমান তাঁদের মধ্যে। এঁর স্ফুরণ এদিকে সেদিকে দেখেছি বটে, ছবিতেও দেখেছি ইনি সৌম্য সুদর্শন, তথাচ 'মুহূর্তের মানচিত্রে' এই কবির প্রতিভাকে নতুন করে আঁচ করলাম। গ্রন্থের অর্দ্ধশত সুমুদ্রিত কবিতাগুলির প্রায় সমস্তই এই দশকে লেখা এবং সম্ভবত এই প্রথম সোফিওরের পিতৃত্ব। বেশির ভাগ কবিতায় রসলাবণ্যের মতো বাগর্থের আলো যেমন ফুটেছে, তেমনি হয়ে উঠেছে মনন সঞ্জাত। কবিতায় সাবলীলতা যে কতো স্মার্ট হতে পারে তার উদাহরণ— 'সবুজের নন্-স্কেলিং বনজ প্রসাধনে আকাশের নীল মোম/দিয়ে মাজা আধোজাগা কুঁড়ির কুণ্ডলীতে স্বর্গীয় দ্যুতি,/ প্রাকৃতিক আলোর সম্মুখে সে এক অদ্ভুত অনুভূতি—/ প্রথম রমণেরও অধিক, এর নাম সুধা? (নির্বাস) কিংবা 'স্থাখো, মমতার বাতাস ঐ মৃদু শিস দিলে ডেকে উঠলো নদী/তখনি দয়িতের চোখে চোখ রেখে পেয়ে গেল পদ্ম, সুখের অনিবার্য রতি।' (মগ্নচকিতে)

জনৈক ডাকসাইটে ভদ্দরলোক কবি-সমালোচক আমাকে একবার বলেছিলেন, 'আশির দশকে বাংলা কবিতা কোনো ব্রেক পায়নি' ইত্যাদি। 'মুহূর্তের মানচিত্র' আমার হাতে থাকলে তখন, ধাঁ করে ভদ্দরলোকটিকে ছুঁড়ে মারতাম। আমার মতে, নীলাঞ্জন, সোফিওর, জহর, মল্লিকা, রাখালরাজ, মনোজিৎ, সংযম এবং আমি প্রমুখ এই দশকের কম্পাস আঁকছি এবং অন্য কয়েকটি দশকের বাইরে অননুকরণীয় পদ্য লিখছি। যাই হোক, সোফিওরের কবিতার মাধ্যমেই আমি স্বমন্তব্য সপ্রমাণ করতে চেষ্টা করছি। দেখুন, আশির দশকের কবির শব্দার্থচেতনার, ব্যঞ্জনা-সৃষ্টির অপূর্ব দৃষ্টান্ত— ১) 'কবির হৃদয় নিঙড়ে কবিতাকে পেয়েছি/দূর উপলখণ্ডে বসে থাকা নায়িকার মতো—' (ভোর ৫টা…) ২) 'বুকের পাটাতন ভেঙে যে যুবক উঠে দাঁড়ালো আজ' (শস্যের পিপাসা) ৩) 'স্মরণীয় মোহর দিয়ে গড়া সে বাসায় আমার ও সুচেতার/কতো যাওয়া-আসা, ভালোবাসার পদ্ম মিলে যাওয়া…(মুহূর্তের মানচিত্র-২) এবং ৪) 'এই মুহূর্তের গভীরতায় আমার আর্তি রঙীন হ'ল…/স্থাখো, জন্ম নিলুম কত সোফিওর, এবং সোফিওর, এবং সোফিওর' (মুহূর্তের মানচিত্র-১)।

টগবগে তাজা তরুণ (জন্ম ১৯৫৪) কবি সোফিওর সম্পর্কে জনৈক সমীক্ষক জানিয়েছেন যে তিনি অর্থাৎ সোফিওর 'সারাদিন তেরপাখিয়া থেকে তুরস্ক, তেহেরান থেকে ত্রিনিদাদ, পশ্চিমবাংলা থেকে বাংলাদেশ ভুবন পর্যটন করেন, তাঁর কাঁধের থলেতে থাকে পৃথিবীর যাবৎ স্বপ্ন, বুকের অশনিপাত, কবিতা-ভাবনা-চিন্তার চালচিত্র…' আর 'আত্মযন্ত্রণা, আত্মজিজ্ঞাসা, সমাজ-মনস্ক, নষ্ট রাজনীতি, দুঃখবোধ ও প্রেমের বিষয় কবির উপজীব্য।' সমীক্ষকের দ্বিতীয় বাক্যে আমার সায় ষোলো আনা। সত্যি, এমন কবি-কবি মানুষের সংকলন উদ্ধার করে আমাদের দেবুদা (বিশ্বজ্ঞান) একটি মহৎ ইবাদৎ সারলেন। সমীক্ষকের মতো, আমিও উজ্জ্বল, উত্তোরণকামী কবি সোফিওরের দিকে উড়িয়ে দিলাম গন্ধরাজের করতালি। করতালি। করতালি।

অজিত বাইরী: প্রিজনভ্যান ও কালপুরুষ, ১৯৮৪, মহাপৃথিবী, সাত টাকা।

সোফিওর রহমান: মুহূর্তের মানচিত্র, ১৯৮৫, বিশ্বজ্ঞান, সাত টাকা।

॥ সংবাদ ॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সংযুক্ত সংগ্রাম কমিটির আন্দোলন

● ঐতিহাসিক ৯ই আগষ্ট '৮৫ বেলা ১০টা থেকে ৬টা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী যুক্ত সংগ্রাম কমিটির বন্ধুরা ১৮ দফা দাবীর ভিত্তিতে এক অবস্থান সত্যাগ্রহে সামিল হন। পরে তাদের দাবী–দাওয়া সম্বলিত স্মারক পত্রটি ছয়জনের এক প্রতিনিধিদল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট প্রদান করেন, ঐ প্রতিনিধি দলে ছিলেন, সভাপতি অসীম ব্যানার্জী, আশীষ রায়, দিলীপ দাস, প্রণব ঘোষ, বকুল নাগ, বিপ্লব দে।

এই সত্যাগ্রহ অবস্থানকালে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা, সভাপতি অসীম ব্যানার্জী একদিকে কো:অডিনেশন কমিটির স্তাবকতা এবং অন্যান্য সংগঠনগুলির নিস্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানান। সাধারণ সম্পাদক, সহ: সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব দে বৃহত্তর সংগ্রামের আবেদন জানান। উক্ত অবস্থায় বক্তব্য রাখেন প্রণব ঘোষ, আশীষ রায়, দিলীপ দাস, সত্যরঞ্জন রায় প্রভৃতি বক্তারা।

॥ স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার ॥

অসংখ্য শহিদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীর মহান আত্মত্যাগে আমাদের দেশ ভারত স্বাধীনতা পেয়েছে আজ থেকে আটত্রিশ বছর আগে ঠিক এই দিনটিতে। সেদিন থেকে শুরু হয়েছে ভারতীয় জনগণের দারিদ্র ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির সংগ্রাম। এই সংগ্রামের মূলমন্ত্র বহু জাতি গোষ্ঠীর এই দেশের ঐক্য। আজ ভারতের বিভিন্ন অংশে সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী অশুভ শক্তি মাথা তুলে সাধারণ মানুষের ঐক্য বিঘ্নিত করছে, অগ্রগতি রুদ্ধ করছে।

বামফ্রন্ট সরকারের সঠিক নীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গ আজ এই সব বিভেদপন্থার বিপদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আসুন এই সুস্থ ও ঐক্যের পরিবেশে সমস্ত বর্ণ, ধর্ম, ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ পশ্চিমবঙ্গকে গড়ে তুলি। সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ও বিভিন্ন বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও নতুন নতুন শিল্প স্থাপন, ব্যাপক জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার, দারিদ্র থেকে মুক্তি, সকলের জন্য স্বাস্থ্য, সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে এবং জাতীয় সংহতি রক্ষায় জনগণ ও সরকারের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই ১৫ আগস্টে আমাদের অঙ্গীকার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

(হুগলী জেলা তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত)

Member All India Small & Medium News Paper Association, Delhi.
GODHULI-MONE N. P. Regd. No. RN. 27214/75 August '85 ভাদ্র ১৩৯২
Vol. 27, No. 8 Postal Regd. No. Hys-14 Price—Rs. 2·00 only

অনন্ত জ্যোতি

স্বাধীনতার দীপ্ত শিখা
প্রজ্বলিত করে গেছেন
আমাদের দেশের বীর জনগণ
আমাদের কোটি কোটি জনগণের হৃদয়ে
তা আজ নিয়ত দীপ্যমান
কোন ঝড় এসে তাকে
নিভিয়ে দেবে সাধ্য কি ?
এটি সেই প্রদীপ্ত শিখা
যা আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে
আমাদের স্বাধীন করেছে—
৩৮ বছর আগের এই দিনটিতে।
এটি সেই উজ্জ্বল শিখা
যা আমাদের প্রগতি এবং সমৃদ্ধির
পথ নির্দেশ করে
আমাদের সবল এবং আত্মনির্ভর করেছে।
স্বাধীনতার এই ভাবনা
চিরকাল আমাদের হৃদয়ে
জাগরুক থাকুক

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পপুলার প্রিন্টার্স, বারাসত, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও নতুনপাড়া, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

রূপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি মন

২৭ বর্ষ/৯ম-১০ম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর/১৯৮৫
আশ্বিন/১৩৯২

প্রতি সংখ্যা দুই টাকা
বার্ষিক সডাক কুড়ি টাকা

অশোক চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক
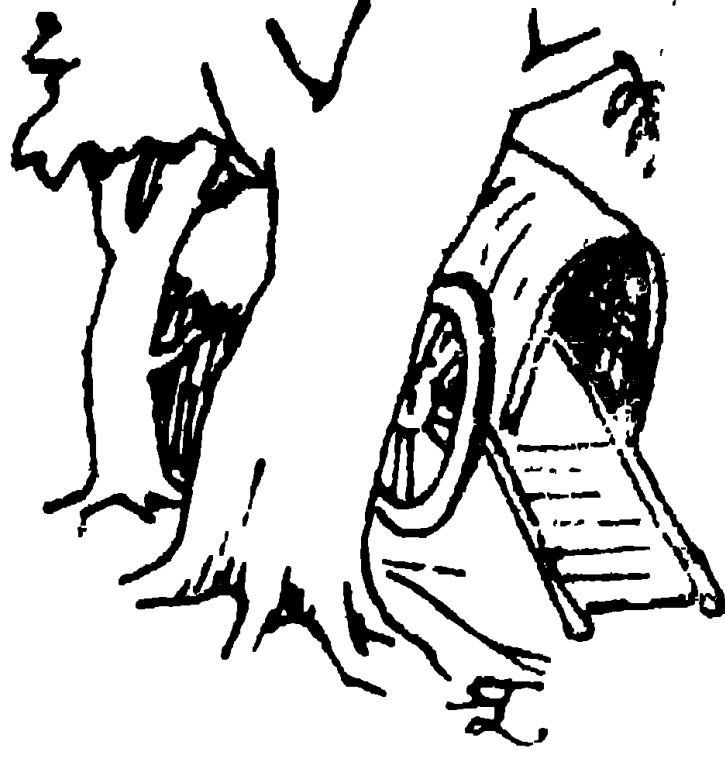
সম্পাদকীয় ঃ—

বৃষ্টিতে ধুয়ে যাওয়া আকাশের ঝকঝকে নীলিমায় শাদা শাদা মেঘের টুকরো ভাসছে আকাশে। পূজো-পূজো গন্ধ আকাশে বাতাসে।

পূজোর সঙ্গে সাহিত্য বাঙালীর হৃদয়ে কিভাবে যেন জড়িয়ে গেছে।

মনে পড়ে আমাদের ছোটবেলায় দেব সাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত ছোটদের পূজাবার্ষিকী বের হয়ে যেতো মহালয়ার আগেই। তাছাড়া বড়দের জন্য আনন্দবাজার বা দেশ। মহালয়ার আগে প্রকাশিত হলেও সেগুলো আগে পড়ার নিয়ম ছিল না আমাদের। বাঁশপাতার কাগজে মুড়িয়ে সুতো দিয়ে বেঁধে, গালা দিয়ে সিল করে আলমারীতে তোলা থাকতো সে সব। মহালয়ার ভোরে রেডিওতে চণ্ডীপাঠ শুরু হলেই ঘুম-ঘুম চোখে উঠে পড়া। মুখ হাত ধুয়ে তৈরী হয়ে নেওয়া এবং একটু বেলা হলেই আলমারী থেকে বের হতো নতুনপাতার মিষ্টি গন্ধ মাখা সেই সব [illegible]বার্ষিকী। আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করে এক একজন এক একটি নিয়ে পড়তে বসা। আমাদের সেই উৎসুক প্রতীক্ষা সার্থক হয়ে উঠতো অসামান্য বিদ্যু ঝলকের মতো অধিকাংশ গল্প উপন্যাসে। তখন সাহিত্য আজকের মতো বাজারী হয়ে পড়েনি। এখন সে আন্তরিক প্রতীক্ষাও নেই। ভুলিয়ে দেবার মতো সে রকম লেখাও উধাও। তবু পূজা আসছে এবং পূজাসংখ্যাও।

সূচীপত্র

শারদীয়া গোধূলি-মন/১৩৯২

প্রচ্ছদ ঃ অজিত রায়

কবিতা

যাবার টানে/অজিত বাইরী

যাবার টানে নদীর পিরিচ থেকে স'রে যায় বালি
গেরুয়া জলে ধুয়ে যায় উঠোনের মাটি –
প্রেম যায়, ভালোবাসা যায় !

যাবার টানে যায় খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, বংশ মর্যাদা
সুখ যায়, স্বচ্ছলতা যায়।

যেতে শুরু করলে
জলস্রোতের মতো ভিটে-মাটি
জমি-জিরেত, ঘটি-বাটি—সবই যায়।

অহংকারও যাবার সময় ছাগলে মুড়নো
গাছের মতো নিঃশেষে মুড়িয়ে রেখে যায়।

অন্তলীনা/শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়

আমাকে স্পর্শ করে
তৃতীয় গ্রহের মত
নিয়ে গেছে কতদিন
রক্তমুখী টিলার পাশে।
গোধূলি লগ্নে এসে
উর্দ্ধশ্বাসে নিয়ে গেছে কতদিন
রূপালী নদীর বুকে
জ্যোৎস্নার তল দেখাতে
আমার দুইটি খোলা পথ
নদী মুখো যাত্রীর মত
আমি কাল বুঝিনি তার
শরীরের সবকটি খাঁজ
দয়া-মায়া-স্নেহ-ভালোবাসা-ক্রোধ-অপমান
কি যে রেখেছে কোথায়
ভিতরে বাহিরে
কে এই রাধিকা আমার উঠান ছুঁয়ে
নিশি পাখীর মত ডেকে ডেকে
চায়ের পেয়ালায় রেখে গেছে রাগ।

যাবতীয় পদ্মাময়/গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

সুক্ষ্ম অনুভব থেকে ভেঙেচুরে জন্ম নেয় আকাঙ্খার ব্যস্ত ছায়াগুলি
অদৃশ্যে রঙিন বর্ণ ভাসে ভাঙে প্রাকৃত নিয়মের বিজন সংগীত
মনন সদৃশ কিছু বিলুপ্তির শেষ থেকে জেগে ওঠে অকাল বোধন
তবুও বৃষ্টি আসে প্রণয় আস্বাদে মুছে নেয় সূর্যাস্তের রঙ
বৃক্ষ জানে ছায়া দিতে কখনও বা হাওয়ার দাপট
জ্যোৎস্না বিজনে ছড়ায় বনজ বাতাসে অবিরল
মেঘের মিনার থেকে শূন্যে দোলে জ্যোৎস্না ঝালর
বাড়ন্ত বৃক্ষ ভূমিস্পর্শে ছুঁয়ে থাকে উজ্জ্বল প্রান্তর
পদ্মময় কোরে তোলে যাবতীয় গ্রামীণ জীবন

টুকরো-১/চন্দ্রশেখর ঘোষ

সাধনায় ছিল না ত্রুটি, ব্যবধান থেকে গেছে তবু—
অপরাজিতা মন ছিল, এখন শুধুই গাঢ় নীল অবয়ব
সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে মানুষ নেমেছে এইখানে—

মায়া নয় কায়ার আড়ালে শুয়ে জ্যান্ত নীল শব ॥

অরণ্যের গোপন কন্ট্যুর/কমলেশ পাল

দুপুরে গাছের নিচে ছায়া পেতে শুয়ে আছে বন।
আমাদের বিলাস-বীক্ষণ তাকে নিয়ে।
আমাদের দেখে নেয়া অসম্বৃত বেশবাস তার—
গোপন কন্ট্যুর কিছু, বস্তিদেশ, রোমাঞ্চিত ভূমি।
দেখে নেয়া, যা কিছু দেখার নয় অন্য পুরুষের।

ঝিঁঝিঁ ওঠে ছি-ছি ক'রে। হাওয়া বলে : যাও।
তোমাদের ভ্রমণ গুটাও! বৃক্ষলতা ভিড় ক'রে
বলে।

ঝোপের আড়ালে দুটি চিত্রলের চোখ
ছুঁড়ে মারে তীব্র তিরস্কার।

অরণ্যের অসামান্য অধিকার দেখে
আবার যন্ত্রের দিকে দ্রুত পায়ে ফিরে যেতে থাকি।
হরিৎ গ্যালারি জুড়ে হেসে ওঠে পাখি
পাথরে জলের হাসি আমাদের উপহাস করে।

আমি ভাল আছি/সমীর মণ্ডল

আমি ভাল আছি
রোজ সকালে পাখী আসে আমার জানালায়
নাচে তালে তালে, গান গায়, ডাকে আমায়
ঘুম ভাঙে, সোনালী সূর্য আসে আমার ঘরে
প্রতিদিন একভাবে
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতের প্রচণ্ড অহংকারে।

নিদাঘের অপ্রসন্নতা মন ছুঁয়ে যায়।
মনে পড়ে, বিগত দিনের স্মৃতি-রাগ-অনুরাগ
কৌতুকমহিমা, দুষ্টুমীর দিনগুলি
ঘড়ির কাঁটার তালে তালে
এলোমেলো রং মেলে দেয় আকাশের বুকে
যৌবনবতী শ্যামল শোভা
লজ্জায় অবনত মাথা
দুধ ভরে আসে ধানের বুকে

হিল্লোল তোলে সুরভি মায়ায়।
কোন দুঃখ নেই, কোন অভিমান নেই
হলুদ পাল তুলে নৌকা ভাসে নদীতে।
হাজার প্রাচুর্যের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রমে
পাহাড়ের নির্জনতা, স্তব্ধতা, ক্লান্তিবোধ
মৃত্যু হাতছানি দেয়, আলিঙ্গন করে।

শুধুই তোমার জন্যে
তোমাকে ঘিরে আমি বেঁচে আছি
আমি ভাল আছি।

দেবী দুর্গা ও তাঁর বাহন

ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য অনুসারে মহিষাসুরের অত্যাচারে বিপর্যস্ত দেবতাদের রোষ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিষ্ণুমায়া চণ্ডী। ক্রুদ্ধ দেবতাদের মুখ থেকে তেজ নির্গত হোল। প্রথমে রুষ্ট হলেন বিষ্ণু, তৎপরে শিব, তৎপরে অন্যান্য দেবগণ। সকল দেবতার মুখ থেকে নির্গত তেজ একত্রিত হয়ে এক অপূর্ব জ্যোতির্ময়ী নারীমূর্তি পরিগ্রহ করেছিল—একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্ত লোকত্রয়ং ত্বিষা। তখন দেবগণ নিজ নিজ অস্ত্র ভূষণ ইত্যাদির দ্বারা দেবীকে সুসজ্জিত করেছিলেন। শিব দিলেন শূল, কৃষ্ণ দিলেন চক্র, বরুণ দিলেন শঙ্খ, অগ্নি দিলেন শক্তি, মরুদ্‌গণ ধনু ও বাণপূর্ণ তূণ দিয়েছিলেন, ইন্দ্র বজ্র ও ঘণ্টা দিলেন, যম দিলেন দণ্ড, সমুদ্র দিলেন নাগপাশ, প্রজাপতি ব্রহ্মা দিয়েছিলেন অক্ষমালা ও কমণ্ডলু। সূর্য সমস্ত রোমকূপে নিজ রশ্মি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, কাল দিয়েছিলেন শঙ্খ ও চর্ম অর্থাৎ ঢাল। হিমালয় নানাবিধ রত্ন ও সিংহবাহনটি দেবীকে উপহার দিয়েছিলেন—"হিমবান্ বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ।" দেবতেজে নির্মিত এই দেবীর নাম চণ্ডী। ইনিই বঙ্গভূমিতে দুর্গা নামেই সবিশেষ প্রসিদ্ধা। বামন পুরাণে এই দেবীর নাম কাত্যায়নী। কাত্যায়নীরও জন্ম দেবতাদের কোপ থেকে মহিষাসুর বধের উদ্দেশ্যে। কিন্তু কাত্যায়নী শুধু দেবতাদের তেজের মূর্তি নন, দেবতেজের সঙ্গে ঋষির তেজও মিশ্রিত হয়েছিল। বামন পুরাণ অনুসারে দেবতাদের তেজ ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে উপস্থিত হলে দেবতেজের সঙ্গে ঋষির তেজ মিশ্রিত হয়। এই সম্মিলিত তেজ থেকে কাত্যায়নীর জন্ম হয়।

> কাত্যায়নস্ত্বাপ্রতিমেন তেজসা মহর্ষিণা তেজ উপাকৃতঞ্চ।
> তেন বিসৃষ্টেন চ তেজসাবৃতং জ্বলৎপ্রকাশার্ক সহস্রতুল্যং।
> তস্মাচ্চ জাতা তরলায়তাক্ষী কাত্যায়নী যোগবিশুদ্ধ দেহা॥ (বামন–১৮।৭-৮)

—মহর্ষি কাত্যায়ন তাঁর অতুলনীয় তেজের দ্বারা ঐ তেজকে বর্ধিত করেছিলেন। ঋষিসৃষ্ট তেজের দ্বারা আবৃত হওয়ায় সেই দেবতেজ সহস্র সূর্যের মত প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। সেই তেজ থেকে চঞ্চল ও দীর্ঘনয়ন বিশিষ্টা যোগবিশুদ্ধদেহা কাত্যায়নী জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

কালিকাপুরাণেও দেবতাদের তেজ ঋষি কাত্যায়নের দ্বারা কায়া লাভ করে মহিষাসুর বধ করেছিলেন।

> ততস্তেজোতির্ধৃতবপুর্দেবী কাত্যায়নেন বৈ।
> পশ্চাজ্জঘান মহিষং জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী॥ (কা.পু.৬০।৭৭)

বামন পুরানের উপাখ্যানে মহিষাসুর বধের পর দেবী কাত্যায়নী শিবের পাদমূলে প্রবেশ করেছিলেন। এখানে কাত্যায়নীকেই দুর্গা বলা হয়েছে। দেবী ভাগবতে ব্রহ্মা মহিষাসুরকে বর দিয়েছিলেন যে কোন পুরুষের দ্বারা সে হত হবে না। তাই মহিষাসুরের

অত্যাচারপীড়িত দেবগণ বিষ্ণুর নিকটে গিয়ে বলেছিলেন,—

ধাত্রা তস্মৈ বরো দত্তো হ্যবধ্যোহসি নরৈঃ কিল।
কা স্ত্রী ত্বেবংবিধা বালা যা হন্যাত্তং শঠং রণে॥
উমা মা শচী বিদ্যা কা সমর্থাস্য ঘাতনে॥
(দে. ভা. ৫।৮।২৪)।

—ব্রহ্মা তাকে বর দিয়েছেন, তুমি পুরুষের বধ্য হবে না। সেই শঠকে যুদ্ধে বধ করবে এমন স্ত্রীলোক কোথায়? উমা, লক্ষ্মী, শচী, সরস্বতী কে তাকে বধ করতে সমর্থ?

বিষ্ণু তখন বললেন, দেবতাদের তেজ ও রূপসম্পদের দ্বারা উৎপন্না সুন্দরী নারী তাকে বধ করবেন। তারপর দেবতাদের মুখ থেকে তেজ নির্গত হতে লাগলো, সেই তেজ দেবতাদের সম্মুখেই বিস্ময়কর সুন্দরী নারীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করলো

পশ্যতাং তত্র দেবানাং তেজঃ পুঞ্জসমুদ্ভবা।
বভূবাতিবরা নারী সুন্দরী বিস্ময়প্রদা॥
(দে. ভা. ৮।৮।৪৩)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে দেবী চণ্ডী বা কাত্যায়নী ক্রুদ্ধ দেবতাদের তেজ থেকে উৎপন্না হয়েছিলেন। এই দেবীরই অপর নাম দুর্গা। দুর্গ বা দুর্গম নামক দানবকে বধ করে দুর্গা নামে প্রসিদ্ধা হয়েছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী স্বয়ং দুর্গমাসুরকে বধ করে দুর্গা নামে পরিচিত হন।

তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।
দুর্গা দেবীতি বিখ্যাতং তম্মে নাম ভবিষ্যতি॥
(মা. পু. ৯১।৫০)।

দেবী ভাগবতে দেবী দুর্গাসুরকে বধ করেছিলেন। সেই জন্যে তাঁর নাম হয় দুর্গা। দেবী বলেছেন, দুর্গামাসুর হন্তৃত্বাদ্দুর্গেতি মম নাম যঃ। (দে. ভা. ৭।২৮।২৯)—দুর্গামাসুরকে বধ করার জন্যই আমার নাম হয়েছে দুর্গা। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে দুর্গাসুর ব্রহ্মার বরে বেদের অধিকারী হওয়ায় পৃথিবীতে যাগযজ্ঞ বিলুপ্ত হওয়ার কারণে অনাবৃষ্টিতে শস্যহানি ও প্রজা বিনষ্ট হওয়ায় দেবী শতনয়ন দিয়ে অশ্রুপাত করে পৃথিবীকে জলপূর্ণ করায় পৃথিবী শাক ও ফলমূলে পূর্ণ হয়ে যায়। এইভাবে জীব ও দেবতাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হওয়ায় দেবীর নাম হয় শতাক্ষী এবং শাকম্ভরী। চণ্ডীর উপাখ্যানেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে। মনে হয় শাকম্ভরী কৃষিদেবী, নয়ত শস্যশালিনী বসুন্ধরা। কিন্তু পুরাণানুসারে শতাক্ষী শাকম্ভরী-দুর্গা ও চণ্ডী একই দেবতা। স্কন্দপুরাণে শাকম্ভরী দুর্গাসুরকে বধ করেছিলেন। দুর্গাসুর ও মহামহিষরূপ ধারণ করে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। দেবীপুরাণে দেবীকে দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী বলেও দুর্গা বলা হয়েছে (৮৩।৬২)।

পুরাণে দেবতেজঃ সম্ভূতা চণ্ডী ও হিমালয়-দুহিতা হরজায়া পৃথকদেবসত্তা। কিন্তু পার্বতীচণ্ডী দুর্গা শতাক্ষী-শাকম্ভরী সব মিলে মিশে এক মহাশক্তিতে পরিণত হয়েছেন। এমন কি কালী, তারা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যা জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবীরাও এই মহাশক্তির সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়েছেন।

শরৎ কালে বাঙ্গালী হিন্দু আশ্বিনের শুক্লা ষষ্ঠি থেকে দশমী পর্যন্ত দেবী মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার অর্চনা করে থাকে। বাঙ্গালী হিন্দুর এইটি বৃহত্তম জাতীয় উৎসব। যজুর্বেদে দেখা যায় শরৎকালে নানাপ্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে রুদ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান হোত। এই যজ্ঞে রুদ্রের কোপশান্তির আকাঙ্খায় রুদ্রের সঙ্গে রুদ্রভগিনী অম্বিকার ও সন্তুষ্টি বিধান করা হোত। অম্বিকা পরে রুদ্র বা শিবের পত্নী পার্বতীচণ্ডীর সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়েছেন। রুদ্র যেমন যজ্ঞের নাম, অম্বিকাও তেমনি যজ্ঞাগ্নি। বৈদিক বিষ্ণু সূর্য—যিনি তিন পদে বিশ্বভুবন পরি-

ক্রমা করেন। বিষ্ণু যেমন সূর্য তেমনি যজ্ঞেরও নাম, রুদ্র তেমনি যজ্ঞরূপী হয়েও সূর্যের ধ্বংসাত্মিকা শক্তি। রুদ্রের শক্তি রুদ্রানী অম্বিকা চণ্ডী ও তাই সূর্যাগ্নির ধ্বংসাত্মিকা শক্তি। এই শক্তিই বিশ্বভুবনে পরিব্যাপ্তা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন। অন্যান্য দেবতারাও একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। চণ্ডীর আবির্ভাব তাই দেবতাদের তেজে। দ্যুলোকের অগ্নি সূর্য ও মর্ত্ত্য-লোকের অগ্নি বৈদিক ঋষিদের দৃষ্টিতে অভিন্ন। সূর্যাগ্নির সর্বব্যাপিনী তেজোরূপা শক্তি মহিষাসুর বা বিশালাকৃতি অসুর অর্থাৎ বিশ্বের অশুভ শক্তিকে বিনাশ করছেন। বেদে মহিষ শব্দের অর্থ বিরাট বিশাল মহৎ। এই বিশ্বের অশুভনাশিনী মহাশক্তি তিনিই দেবী দুর্গা নামে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পূজিতা।

মহাশক্তির বাহন মৃগরাজ সিংহ। চণ্ডীর উপাখ্যানে সিংহ যুদ্ধে দেবীকে দানববধে সহায়তা করেছিল। আধুনিক কালে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার বাহন সর্বত্রই সিংহ, কিন্তু প্রাচীন মূর্তিতে দেবীর বাহন অনেকস্থলে গোধা বা গোসাপ। গোধা বাহনা চণ্ডীর প্রস্তরমূর্তি অনেক পাওয়া গেছে। কালিকাপুরাণ বলেছেন,

কদাচিৎ সা ক্ষিতিপ্রেতে কদাচিদ্রক্তপঙ্কজে।
কদাচিৎ কেশরীপৃষ্ঠে রমতে কামরূপিণী॥

(কা. পু. ৫৮।৫৯)

—ইচ্ছারূপিণী দেবী কখনও সাদা শবে অর্থাৎ শিবে কখনও রক্তপঙ্কজে, কখনও সিংহপৃষ্ঠে আনন্দিত হন।

শিবের উপরে কালিকা, রক্তপথে লক্ষ্মী বা কমলেকামিনী এবং সিংহপৃষ্ঠে বিরাজ করেন দুর্গা। পদ্ম প্রাচীন মুদ্রায় ও শাস্ত্রাদিতে সূর্যের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত। রক্তপদ্ম উদীয়মান সূর্যের বর্ণ বহন করে। গো শব্দের অর্থ পৃথিবী বা সূর্যরশ্মি। পৃথিবী বা সূর্যরশ্মিকে ধারণ করেন বলে সূর্য গোধা।

সিংহ প্রাচীনকালে সরস্বতীর বাহন ছিল। সরস্বতীর দুটি রূপ বেদে সুস্পষ্ট —এক, জ্যোতির্রূপা সরস্বতী; দুই, নদীরূপা। ঋগ্বেদে সরস্বতী অন্ন, ধন ও সম্পদ দান করতেন, রক্ষা করতেন, তিনি দানবও বধ করেছেন। যখন জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী ও নদী সরস্বতী মিলেমিশে বিদ্যাদেবী সরস্বতীতে পরিণত হলেন, তখন অশুভ শক্তিনাশিনী দুর্গা এলেন মর্ত্তে জগতের কল্যাণ বিধান করতে। প্রাচীন বিবরণে ও মূর্তিতে সরস্বতীকে মেষ, সিংহ ও ময়ূর এই তিন প্রকার বাহন গ্রহণ করতে দেখা যায়। কৃষ্ণযজুর্বেদে সরস্বতীকে সিংহী বলা হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে সরস্বতী সিংহীরূপ ধারণ করেছিলেন। সরস্বতী যখন দানবদলনী ছিলেন তখন সিংহ তাঁর বাহন ছিল। অশুভনাশিনী দানব দলনী দুর্গা-চণ্ডী সরস্বতীর কাছ থেকেই সিংহ বাহন কেড়ে নিয়েছেন। ফলে ব্রহ্মার শক্তি হিসাবে ব্রহ্মাণী সরস্বতী ব্রহ্মার কাছ থেকে হংসবাহন গ্রহণ করেছেন। অবশ্য উপনিষদে হংস শব্দের অর্থ সূর্য। জ্যোতিরূপা সরস্বতীর বাহন সূর্যরূপী হংস হওয়ায় দোষের কিছু নয়। কিন্তু দানব দলনী যে দেবী রুদ্রের ধ্বংসাত্মিকা শক্তি তাঁর বাহনও সিংহ ছাড়া অন্য কিছু হতেই পারেনা। ঋগ্বেদে সূর্যবিষ্ণুই গিরিচর সিংহ—মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠা (ঋক্ ১।১৫৪।২)। দেবী যেমন দেবতেজ থেকে জাতা তাঁর বাহনও তেমন তাঁর তেজ থেকে জাত। পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে (৪৪ ৭৮) দেবীর বাহন সিংহ দেবীর ক্রোধ থেকেই জন্মগ্রহণ করেছে। হরি শব্দে সূর্য, বিষ্ণু, সিংহ ইত্যাদিকে বোঝায়। কালীবিলাসতন্ত্রে সিংহকে বলা হয়েছে হরিরূপী বিষ্ণু—

সিংহস্ত্বং হরিরূপোঽসি স্বয়ং বিষ্ণুর্ণ সংশয়ঃ।
পার্বত্যা বাহনং ত্বং হি অতস্ত্বাং পূজয়াম্যহম্॥

(১৮।৩০)।

—হে সিংহ তুমি হরিরূপী স্বয়ং বিষ্ণু, তাতে সন্দেহ নেই। তুমি পার্বতীর বাহন, তাই তোমাকে পূজা করি।

পশুরাজ বলে সিংহ পুজ্য নয়, তিনি হরি বা বিষ্ণুরূপে পুজ্য। বিষ্ণু ত সূর্যই। তাই জ্যোতিরূপা অশুভনাশিনী চণ্ডী দুর্গার বাহন সূর্যবিষ্ণুরূপী হরি বা সিংহ যথাযথ ভাবেই কল্পিত হয়েছে। একসময়ে শরৎকালে যে রুদ্রযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হোত তারই স্মৃতিরূপে দেবতেজে জাতা অশুভ শক্তির প্রতীক মহিষাসুরের হন্ত্রী সিংহবাহিনী দেবী দুর্গার অর্চনা শারদোৎসবের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে।

প্রসঙ্গ ঃ গোধুলি-মন

● আপনার ২৭.৭.৮৫ তারিখের চিঠির জন্য ধন্যবাদ। অত্রসাথ ৫০্ টাকার একটি ক্রশ চেক্ পাঠালাম। প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন।

আপনি লিখিয়াছেন আমার চাঁদা ৪৫্ বাকি পড়িয়াছে। আপনার অন্যমনস্কের জন্য যোগ করিতে ভুল হইয়াছে।

আমি ওসব যোগ-বিয়োগের মধ্যে যাই নাই। সেকারণে পঁয়তাল্লিশ পার করিয়া একেবারে পঞ্চাশে চলিয়া গেলাম। ইচ্ছাছিল একেবারে শতকে যাওয়া। দেখুন অশোকবাবু 'গোধুলি-মন' এর মত পত্রিকা অর্থের বিনিময়ে পাওয়া কঠিন। এর পিছনে যে শিল্প রসিক মনন অনুরণিত হইতেছে ও যাহার স্বাদ আমি নীরবে স্বার্থপরের মত গ্রহণ করিয়া চলিয়াছি তাহার বিনিময়ে আমি কি দিতে পারিতেছি ভাবিলে মাঝে মাঝে অনুশোচনা হয়, লজ্জা পাই।

আপনার এই সহৃদয়তা, শিল্প অন্ত প্রাণ নিরলস কর্মকাণ্ড দিনে দিনে আরো আরো বৃদ্ধি পাক এই প্রার্থনা করি।

আমাকে আপনাদের একজন ভাবিলে খুশি হইব।

তুষার কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
C/o ক্লোরাইড ইণ্ডিয়া লিমিটেড
৬এ, হাতিবাগান রোড, কলিকাতা-৭০০০১৪

পুনশ্চ ক্ষুধিত প্রজন্ম ঃ গেরো ফাঁসগেরো

অজিত রায়

হাংরি জেনারেশন প্রসঙ্গে গোধূলি-মনে আমার দ্বিতীয় দফায় আসর গ্রহণে যাঁরা অস্বস্তি বোধ করছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁরাই আমার পাঠক। অবশ্যি ইতিপূর্বে ক্ষুধিত প্রজন্মের কবি ও কবিতা নিয়ে যে মজলিস বসিয়েছিলাম, তার পুনর্কথন করে পাঠকের বিরক্তির উনুনে বাতাস দেওয়ার পক্ষপাতি আমি নই। আমি জানি হাংরিদের গোরস্থান খুঁড়ে হাল-ফিলের নভিসেরা যে হারে সেপ্টো রচনা করে চলেছেন, কেন্নোর মতো বহুপদ প্রাণীও সেখানে ফেল্। তারই গন্ধে বিশ্ব-বেরমাণ্ড এখন তোলপাড়। তবু কেন এই গু-মুত চটকানো? মলয় রায়চৌধুরী আমাকে অভিমান ভরে লিখেছেন—'হাংরিদের নিয়ে গালগল্প অনেক হয়েছে; সিরিয়াস নিরপেক্ষ ও অ্যাকাডেমিক আলোচনা হলে ভালো, কেননা তা হয়নি এখনও।' এ-দুঃখের যুক্তি যথেষ্ট। যাঁরা লিখেছেন তাঁরা যেন ফুটবলের খেলুড়ে, নিজের দলকে ডিফেণ্ড করে বিপক্ষকে গোল করা তাদের লক্ষ্য। তুলসীমঞ্চ থেকে ব্যক্তি-নিন্দার চিরাচরিত বঙ্গীয় ধারাটি তাঁরা ঝেড়ে ফেলতে না পেরে স্ব-স্ব মেধা শক্তি সম্ভাবনাকে রসাতলে পাঠাচ্ছেন। তাই মলয়ের ক্ষোভ লাঘব বক্ষমাণ নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য বলা যায়। আমি যে পুরোপুরি নিরপেক্ষ, এ-দাবি করছি না; বরং চোখে সংশয় মেখেই পাঠক এই সেপ্টো পড়ুন—এ-আরজি জানাবো! আলোচনার কোনো অংশ যদি পৈশুন্যচিহ্নিত মনে হয়, তবে তো রইলই উদ্গীরণের অবাধ অধিকার। বলে রাখি, আলোচনার শরীর একটু দোহারা হতে পারে; কিন্তু দোহাই, কমলাকান্তের মতো কেউ যেন না বলেন 'বাঈজী! এক ঘণ্টা হইয়াছে—এখন বন্ধ কর।' —কেননা এইসব গেরো-ফাঁসগেরো খোলার জন্যে পরিশ্রম ও পরিসর দুইই লাগবে বিশদ ভাবে।

॥ এক ॥

গোষ্ঠি সাহিত্য আন্দোলনের হুজুগ যুগে যুগে। সেই কোন্ উনিশ শো পাঁচের মাথা থেকে দোসরা মহাযুদ্ধের পা পর্যন্ত লণ্ডনের ব্লুমসবেরি মোহল্লার এক প্রপিতামহ কোঠায় ফি বেস্পতিবার সন্ধেয় জমা হতেন সস্বামী ভার্জিনিয়া উলফ, রজার ফ্রাই. ক্লাইভ বেল, জন মেনার্ড কিন্স, ই এম ফর্স্টার, লিটন স্ট্র্যাচি, ডনকান গ্রাণ্ট প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা। ইংরেজি সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ওই আড্ডাবাজরা 'ব্লুমসবেরি গ্রুপ' নামে আখ্যায়িত। এঁদেরকে নিয়ে যেমন লেখালেখি হয়েছে, তেমনি আলোচিত হয়েছেন বাংলার 'কল্লোল গোষ্ঠি'র প্রেমেন্দ্র অচিন্ত্য মাণিক প্রমুখ কিংবা বিনয় সরকার. সুনীতি চাটুজ্যে, সতীশচন্দ্র মুখুজ্যের 'ডন সোসাইটি'। একই ভাবে আলোচনা-সমালোচনার অন্ত ছিল না লরেন্স ফেরলিংগেটি, জ্যাক কেরুয়াক, অ্যালেন গিন্সবার্গ, গেগরী করসো, ই ই কামিংস, কেনেথ রেকসথ, হেনরি মিলার প্রমুখ

অ্যামেরিকান কবি-লেখকদের, তথাকথিত সামাজিক ধ্যানধারণার প্রতি প্রচণ্ড রকমের অনীহায় গড়ে ওঠা 'বীট গোষ্ঠি'কে নিয়ে। এবং সেই টালমাটাল সময়ে অর্থাৎ ষাট দশকে বাংলা সাহিত্যের সাজানো বাগান বেবাক তছনছ করে দিতে চেয়েছিল যারা, সেই হাংরিদের নিয়েও বুদ্ধিজীবী মহলে তর্ক-বিতর্কের উনুন আজ অবধি ধিকিধিকি জ্বলছে। মনোপলি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের কোল আলো করা গঙ্গাজল সাহিত্যকে ধিক্কার জানিয়ে যারা লিখতে চেয়েছিল পরিণত-মস্তিষ্ক রক্তক্ষরণ আর স্নায়ুতন্ত্রে অগ্নি সংযোগের গল্প-কবিতা, হাংরি গোষ্ঠি ছিল সেইসব তরুণ ও প্রতিভাবান লেখকদের।

শৈশব স্বপ্ন দেখে না। কৈশোর কল্পনা করে না। তারুণ্য বাধা মানে না। হাংরি আন্দোলনে যাঁর ভূমিকা ছিল পুরোভাগে এবং যিনি ছিলেন সবচেয়ে লড়াকু সেন্টিমেণ্টর, সেই মলয় রায়চৌধুরীকে নিয়েই কচকচি শুরু করছি। ২৪ ঘণ্টায় বাঁধা গতানুগতিক জীবন ও জগৎ সম্পর্কে প্রচণ্ড অনাস্থা, ঘৃণা আর প্রত্যাখ্যান—এই ত্রিবিধ অনুভূতি নিয়ে ষাটের ভোরে আত্মার এক নিদারুণ ছটফটানি মলয় যখন সবে টের পাচ্ছেন, তখন তিনি পাটনা ইউনিভার্সিটিতে অর্থ-নীতির পড়ুয়া। জীবনের সামনাসামনি হবার সময়। আর পাঁচটা গুডবয়ের মতো গলায় অ্যালমা ম্যাটার ঝুলিয়ে, পোস্টাল অর্ডার সহ অপ্লিকেশন ফর্ম জমা দিয়ে এ-দরজায় ঢুকে ও-দরজায় বেরিয়ে যাবার সময়। মলয় স্ট্যাটিস্টিক্যাল শীলমোহরের স্টাম্প দিয়ে অনার্সের নোটবুক লিখতে পারতেন, উঁচু বেতনে প্রফেসারি করে মাগ-ছেলেপুলে নিয়ে দিব্যি সংসার পাততে পারতেন…। কিন্তু দুর্মতি তবে আর বলেছে কাকে। মলয় হঠাৎ বুঝে ফেললেন—অসির চেয়ে মসী বড়ো। সাহিত্যের পাথেয় সাহিত্য—এই ওঁর হয়ে দাঁড়ালো জীবনের ধ্যেয়। বলিহারি গোঁ।

ব্রিটিশমাতার স্তন্যহারা ভারত তখন চোদ্দ বছরের খোকা। দেশবিভাজন, হা-ঘরেদের নিরাময় ব্যবস্থা, স্বদেশপ্রেম তখন টু-পাইস কামানোর ধান্দা, একান্নবর্তী পরিবার ভাঙছে, গাঁ থেকে নগর দূরে ছুটছে, মূল্যবোধ চূর্ণিত, বিশ্বাসের তলানিটুকুও শুষে নিচ্ছে সমস্যার বালি। এই সময় পাটনার দরিয়াপুর মোহল্লার রণজিৎ রায়চৌধুরীর বাইশ বছরের ছেলে মলয় মার্কসবাদ আর কবিতায় আক্রান্ত। তিরিশের পর চল্লিশ দশকের লেখা তাঁর কাছে কেমন ঘোলো ঠেকছে। পঞ্চাশ সবে জাগছে, নিজের জায়গা খুঁজছে; কিন্তু তা-ও ঘোলো। মলয় দেখলেন, কবিতাকে আর এ-ভাবে চলতে দেওয়া ঠিক হবে না। আন্দোলন চাই। দুম্ করে মলয়ের মাথায় গড়ে উঠলো আন্দোলনের জিগির। আচমকা একদিন 'ইংরেজি পদ্যের বাবা' জওফ্রি চসারের (১৩৩৯-১৪০০) এক টুকরো কবি-তার মধ্যে 'সমকালের অবধারিত সংজ্ঞা' লাভ করে মলয় যেন হাতে চাঁদ পেলেন: In the sowre hungry tyme. হাংরি শব্দের দ্যোতনা এবং অভিঘাত এমন নির্দিষ্ট করেন চসার যে, মনে হয়, চতুর্দিকের হুবহু। মলয় জানিয়েছেন যে তিনি অসওয়াল্ড স্পেংলার বর্ণিত সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের হদিস পান: 'ওই বয়েসে, স্পেংলার-এ যে আকর্ষণ আমি খুঁজে পাই, তা হলো এই উপপাদ্য যে, একটি সংস্কৃতি তিনটি স্তরের মধ্যে দিয়ে যায়—আরোহণ, রেনেসাঁস ও অবক্ষয়। প্রথম ধাপে তা সৃজনশীল এবং বাইরে থেকে কোন প্রভাব গ্রহণ করে না, রেনেসাঁসে অকল্পনীয় উদ্ভাবনক্ষমতা এবং অবক্ষয়ে তা বহিরাগত সংস্কৃতির মুখাপেক্ষী। সেই সময়ে, ১৯৬১ সনে, অবক্ষয়ের এই কনসেপ্ট বঙ্গ-সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত লাগসই মনে হয়। সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ওরফে সর্বগ্রাস। এই দার্শনিক সর্বগ্রাসে আরোপ হল চসার-কথিত হাংরি। অব-

ক্ষয়ের নির্বিচার দ্বিধাহীন আত্মসাৎ-প্রক্রিয়া বর্ণনা করার জন্যে হাংরি কথাটা।' (১)

মলয় নিজের প্রজন্মকে নাম দিলেন 'হাংরি'। বাল্যসুহৃদয় ড. সুবর্ণ উপাধ্যায়ের সঙ্গে এ-ব্যাপারে আলোচনাও করলেন। তারপর একদিন এক লিটল ম্যাগাজিনে একটা শুকো ছালছাড়ানো নাম পেলেন এবং ঠিকানা: হারাধন ধাড়া। মলয় লিখলেন হারাধনকে আন্দোলনে শরিক হতে। হারাধন জানালেন উনি 'দেবী রায়' নামে লিখবেন। এরই মাঝে গিন্সবার্গের সঙ্গে আলাপ। গিন্সবার্গ মলয়ের দাদা সমীরের সঙ্গে যোগাযোগসূত্রে পাটনায় এসেছিলেন। 'লোকটির চেহারায় শাস্ত্রসম্মত লক্ষণ একটিও নেই, যদিও পালিশহীন জুতো, ইস্ত্রিহীন প্যাণ্ট আর গায়ের গলাখোলা কোর্তায় গোষ্ঠি চেতনার পরিচয় আছে।'(২) বিদেশীদের সঙ্গে মলয়ের পরিচয় তখনও তেমন নিবিড় নয়, কিন্তু গিন্সবার্গ আকর্ষণ করলেন তড়িৎ কৌশলে। শুধু কবিতা নয়, জীবনযাত্রাও। উত্তাল উদ্দাম শেকড়-হীন নোঙর ছেঁড়া ···শক্তিও তখন পাটনায়। উৎ-সাহিত হয়ে তিনি কলকাতায় গিয়ে লিখলেন 'ক্ষুৎকাতর আক্রমণ', যা ছিল মলয়ের পরিকল্পনার প্রথম ভাষ্য। এর পরেই, ১৯৬১র এপ্রিলে বেরুলো: 'হাংরি জেনারেশন'। কলম তিনের ডবলক্রাউন ১/৮ সাইজের কাগজের এক পিঠে ছাপা ইস্তেহার। বার্জাস টাইপে ছাপা হলো: স্রষ্টা—মলয় রায়চৌধুরী, নেতৃত্ব—শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা—দেবী রায়।

বুক থেকে কলম বেরিয়ে এলো মলয়ের। রক্তের চাপে ক'টা লাইন ফুটে উঠলো: 'কবিতা এখন জীবনের বৈপরীত্যে আত্মস্থ! সে আর জীবনের সামঞ্জস্যকারক নয়, অতিপ্রজ অন্ধ বল্মীক নয়, নিবলস যুক্তিগ্রন্থন নয়। এখন, এই সময়ে, অনিবার্য গভীরতার সন্ত্রস্তক ক্ষুধায় মানবিক প্রয়োজন এমনভাবে আবির্ভূত যে, জীবনের কোনো অর্থ বের করার প্রয়োজন শেষ। এখন প্রয়োজন অনর্থ বের করা, প্রয়োজন মেরুবিপর্যয়, প্রয়োজন নৈরাত্মসিদ্ধি। প্রাগুক্ত ক্ষুধা কেবল পৃথিবী-বিরোধিতার নয়, তা মানসিক, দৈহিক এবং শারীরিক। এ-ক্ষুধার একমাত্র লালন-কর্তা কবিতা, কারণ কবিতা ব্যতীত কী আছে আর জীবনে। মানুষ, ঈশ্বর গণতন্ত্র এবং বিজ্ঞান পরাজিত হয়ে গেছে। কবিতা এখন একমাত্র আশ্রয়।

'কবিতা থাকা সত্ত্বেও, অসহ্য মানবজীবনের সমস্ত প্রকার অসম্বদ্ধতা, অন্তরজগতের নিষ্কুণ্ঠ বিদ্রোহে, অন্তরাত্মার নিদারুণ বিরক্তিতে, রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে রচিত হয় কবিতা—উঃ তবু মানব-জীবন কেন এমন নিষ্প্রভ। হয়তো, কবিতা এবং জীবনকে ভিন্নভাবে দেখতে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁদের অপ্রয়োজনীয় অস্তিত্ব এই সংকটের নিয়ন্ত্রক।

'কবিতা বলে যাকে আমরা মনে করি, জীবনের থেকে মোহমুক্তির প্রতি ভয়ংকর আকর্ষণের ফলাফল তা কেবল নয়। ফর্মের খাঁচায় বিশ্বপ্রকৃতির ফাঁদ পেতে রাখাকে আর কবিতা বলা যায় না। এমন কি, প্রত্যাখ্যাত পৃথিবী থেকে পরিত্রাণের পথরূপেও কবিতার ব্যবহার এখন হাস্যকর। ইচ্ছে করে, সচে-তনতায়, সম্পূর্ণরূপে আরণ্যকতার বর্বতার মধ্যে মুক্ত কাব্যিক প্রজ্ঞার নিষ্ঠুরতার দাবীর কাছে আত্মসমর্পণই কবিতা। সমস্ত প্রকার নিষিদ্ধতার মধ্যে তাই পাওয়া যাবে অন্তরজগতের গুপ্তধন। কেবল, কেবল কবিতা থাকবে আত্মায়।

'ছন্দ গন্ধ লেখার খেলাকে কবিতা নাম দিয়ে চালাবার খেলা এবার শেষ হওয়া প্রয়োজন। টেবল-ল্যাম্প ও সিগারেট জ্বালিয়ে, সিরিব্রাল কর্টেক্সে কলম ডুবিয়ে, কবিতা বানাবার কাল শেষ হয়ে গেছে। এখন কবিতা রচিত হয় অরগ্যাজমের মতো স্বতঃ-

স্ফুর্তিতে। সেহেতু বলাৎকারের পরমুহূর্তে কিংবা বিষ খেয়ে অথবা জলে ডুবে সচেতনভাবে বিহ্বল হলেই, এখন কবিতা সৃষ্টি সম্ভব। শিল্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবিতা সৃষ্টির প্রথম শর্ত। সখ করে, ভেবে ভেবে, ছন্দে গদ্য লেখা হয়তো সম্ভব, কিন্তু কবিতা রচনা তেমন করে কোন দিনই সম্ভব নয়। অর্থব্যঞ্জনঘন হোক অথবা ধ্বনি-পারম্পর্যে শ্রুতিমধুর, বিক্ষুব্ধ প্রবল চঞ্চল অন্তরাত্মার ও বহিরাত্মার ক্ষুধা নিবৃত্তির শক্তি না থাকলে, কবিতা সতীর মতো চরিত্রহীনা, প্রিয়তমার মতো যোনিহীনা, ঈশ্বরীর মতো অনুন্মেষিণী হয়ে যেতে পারে।' (৩)

সংক্ষেপে, জীবনের সামগ্রিক ক্ষুধাকে মলয় বলেছেন-মানসিক, দৈহিক ও শারীরিক ক্ষুধা। কিন্তু তাঁর নিজস্ব বয়ান মোতাবিক, এ-ক্ষুধা আত্মিক। অন্তরাত্মার ও বহিরাত্মার ক্ষুধা নিবৃত্তির সামর্থ্যে কবিতা আসলে বস্তুগত জীবন ও আত্মিক জীবনের মেলবন্ধন। কবিতা যেখানে জীবনের একমাত্র আশ্রয় (স্মরণীয়—রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'কবিতা আমার জীবনের সকল সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।') সেখানে কবিতা ও জীবন একার্থক, অথচ জীবনের সংকট কবিতা ও জীবনকে ভিন্নভাবে দেখা। কবিতা নিয়ে যারা বেনিয়াগিরি করছে তাদের প্রতি মলয়ের আক্রমণ ক্ষমাহীন। তুমি অর্থোপার্জন করে, খেয়ে-রেখে, সংসারের সব কাজ গুছিয়ে, ঘুম-না আসা পর্যন্ত বিছানার নরম ভাজিমে বুকে বালিস গুঁজে কিছুক্ষণ সৌখিন সাহিত্যচর্চা করলে, আধপাতা কবিতা লিখলে, আনমনে বাতিল অংশে নিজের আঁচড়ে নদী আঁকলে—তোমাকে কবি বা শিল্পী বলি কি করে? পার্বনিক আর নিত্য উপবাসে তফাৎ বিস্তর। কবি ড. উত্তম দাশ লিখেছেন: 'মলয়ের কাছে কবিতা হচ্ছে অবগ্যাজমের মতো স্বতোস্ফূর্ত, সুতরাং 'সচেতনভাবে বিহ্বল' হলেই কবিতা সৃষ্টি সম্ভব। অনেকটা রোমান্টিক কবিদের স্পন্টেনাস ওভারফ্লো অব পাওয়ারফুল ফিলিংস, অবশ্যই রোমান্টিকদের মতো আবেগে আত্মসমর্পণ নয়, কল্পজগৎ তৈরী নয়, সচেতন বিহ্বল অবস্থাই মলয়ের ধারনার কবিতা সৃষ্টির শর্ত। অন্তরাত্মার ও বহিরাত্মার ক্ষুধা নিবৃত্তির শক্তি না থাকলে তাকে মলয় কবিতা বলতে রাজি হননি।' (৪) এটা আলবৎ অভিনব। বিশেষত বহিরাত্মার ক্ষুধা উপশম। এই অভিনব মতধারা থেকেই হাংরির পথ চলা শুরু।

পরবর্তী সময়ে যখন হাংরি জেনারেশনের ছাউনিতে এসে জুটলেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সমীর রায়চৌধুরী, উৎপলকুমার বসু, সুবো আচার্য, শৈলেশ্বর ঘোষ, সুভাষ ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, সুবিমল বসাক, বাসুদেব দাশগুপ্ত, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ফাল্গুনী রায়, অরণি বসু, তপন দাস, ত্রিদিব বসু, মিহির পাল' শম্ভু রক্ষিত, বিনয় মজুমদার, রবীন্দ্র গুহ, শংকর সেন, অরুপরতন বসু, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অমিত সেন, অমৃততনয় গুপ্ত, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, ভানু চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভৌমিক, অনিল করনজাই, সুব্রত চক্রবর্তী, দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্র, অজিত ভৌমিক প্রমুখ—তখন মলয়ের চিন্তা ছড়িয়ে পড়লো গোষ্ঠিচেতনায়। ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ঠিক করে নেবার জন্য নির্ণায়ক নিয়মাবলীর দরকার পড়লো। সেই তাগিদে মলয় তৈরি করলেন একটি চোদ্দ দফা ইস্তেহার:

1. The merciless exposure of the self in its entirety.
2. To present in all nakedness all aspects of the self and thing before it.
3. To catch a glimpse of the exploded self at a particular moment.

4. To challenge every value with a view to accepting or rejecting the same.
5. To consider everything at the start to be nothing but a 'thing' with a view to testing whether it is living or lifeless.
6. Not to take reality as it is but to examine it in all its aspects.
7. To seek to find out a made of communication, by abolishing the accepted modes of prose and poetry which would instantly establish a communication between the poet and his reader.
8. To use the same words in poetry as are used in ordinary conversation.
9. To reveal the sound of the word, used in ordinary conversation, more sharply in the poem.
10. To break loose the tradional association of words and to coin unconventional and here-to-fore unaccepted combination of words.
11. To reject traditional forms of poetry and allow poetry to take its original forms.
12. To admit without qualification that poetry is the ultimate religion of man.
13. To transmit dynamically the massage of the restless existance and the sense of disgust in a razor-sharp language.
14. Personal ultimatum. (৫)

এই চোদ্দটি নির্ণায়ক নিয়মবিধিতেই ফুটে উঠলো আন্দোলনের নির্বীজ রূপরেখা এবং উদ্দেশ্য, কী আর কিভাবে লিখবো-র উত্তর। পূর্ণাবস্থায় ইগের ক্ষমা-বর্জিত প্রকাশ, খাস লহমায় বিস্ফারিত আত্মার ইঙ্গিত পুরোপুরি স্বকীয় শব্দবন্ধে ও প্রকাশভঙ্গিতে। ঐতিহ্য-বিচ্যুত গতানুগতের প্রতিবাদে। এবং তার ভাস্বরতা প্রাত্যহিকের অবানে। অজ্ঞতায়ই দাঁত গাড়বে আমূল। বাঁধাধরা মূল্যবোধের খেলাপে জেহাদ। 'ধর্ম অহিফেন, রাজনীতি বন্ধ্যা। মূলধন শুধু দেবতা-কবিতা। সেই কবিতাই হাংরিদের হাতিয়ার হলো। সশস্ত্র হাংরিরা ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। রাস্তায় ঘাটে দোকানে বাজারে দেওয়ালে পোস্টারে…সর্বত্র হাংরি হাংরি হাংরি…

লালবাজারের চোরা ঘরের এক বুক উপচানো টেবিলে চাপড় মেরে ইন্সপেক্টর অনিল ব্যানার্জী হুংকার ছাড়লেন : 'কী, অ্যাতো বড়ো আস্পদ্দা। হেড-কোয়ার্টার কোথায় ?' মহা ফ্যাসাদ। ইনফর্মার বাবুটি কঁকিয়ে জানালেন 'আজ্ঞে স্যার, পাটনায়।' সঙ্গে সঙ্গে আদেশ হলো—'স্ম্যাশ্ দ্য মুভমেণ্ট।'

৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ সন্ধে পৌনে ছটায় পুলিশ চড়াও হলো মলয়ের বাড়িতে। পাক্কা তিন ঘণ্টা তল্লাসির পর যেসব জিনিস সিজ্ড করা হলো, সেগুলো এইরকম (পুলিশী বিবৃতি মোতাবিক) : i) হাংরি জেনারেশনের একটি কপি ii) এক গোছা নামহীন কবিতা, ছোটোগল্প আর নাটকের পাণ্ডুলিপি iii) বাংলা আর ইংরেজিতে লেখা মলয়ের দুটি ডায়েরি iv) হাংরি জেনারেশনের দশটি লিফলেট v) মলয়কে লেখা বিভিন্ন জনের চিঠি vi) A Vehement criticism of our plan' নামে

মলয় লিখিত ২৭ খানি বুকলেট। vii) দুখানি ব্লক 'বীজানু বক্তনাশা'-র ১টি কপি ix) প্রদীপ চৌধুরীর একটি পুস্তিকা x) বাংল ছোটোগল্পে ভরা তিনটি একসারসাইজ খাতা xi) 'ইতিহাসদর্শনে'র বিশটি আলগা পাতা xii) Sex love life বইটির কপি xiii) 'উন্মাদ'-এর দুটি কপি xiv) হিন্দী কবি জয়শংকর প্রসাদের 'লহর' কাব্যগ্রন্থের ১টি কপি xv) 'ব্যাভিচার'-এর ১টি কপি xvi) মলয়ের 'বৈশাখ ও ফুটো চাঁদ'—এর পাণ্ডুলিপি xvii) নাম-বিহীন একটি ইংরেজি পাণ্ডুলিপি xviii) অভিষেক, Satirious, who is then, ছাব্বিশ বাচ্ছা, শীত্র আঁধারের দিকে, নিশিদিন, North Bengal express প্রভৃতির পাণ্ডুলিপি xix) সমীরের 'জানোয়ার'-এর ১১টি কপি এবং xx) একটি পুরনো করোনা (বেবি) টাইপ উইণ্টার মেশিন bearing No. L3A 0012. বাজেয়াপ্ত মালের তালিকা দেখে বোঝা যায় মলয় একজন লেখক, সৃষ্টিশীল লেখক। অর্থাৎ তিনি নিজের লেখার জন্যেই অভিযুক্ত।

কবিতাই ছিল মলয়ের একমাত্র হাতিয়ার। কিন্তু সেই অস্ত্র কি রক্ষা করতে পারলো তাঁর আন্দোলনকে? কবিতাকে বর্ম করে আত্মরক্ষা করতে পারলেন মলয়? একটি মাত্র কবিতা, কী ছিল তাতে যা বয়ে আনলো প্রচণ্ড তুফান? যাকে ঘিরে রচিত হলো প্রবল ঘূর্ণাবর্ত আর যে মলয়কে নিয়ে গেল সুমহান বিচারালয়ের সুমহান কাঠগড়ায়—সে কি সঞ্জীবনী, না গরল? অশ্লীল কবিতা লেখার অভিযোগে এর আগে অথবা পরে আর কোনো বাঙালি কবির হাতে হাতকড়া পরানো হয়েছে বলে তো আমিও জানি না। মলয় রায়চৌধুরীর সেই অভিশপ্ত কবিতাটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি এখানে দিলুম যেটি ব্যাঙ্কশাল কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট অমল মিত্র এবং কলকাতা হাই-কোর্টের বিচারপতি তারাপদ মুখার্জি পড়তে বাধ্য হন, এবং যেটি বিশ্বের ২৮টি ভাষায় অনুদিত :

প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার

ওঃ মরে যাবো মরে যাবো মরে যাবো
আমার চামড়ার লহমা জ্বলে যাচ্ছে অকাট্য তরুপে
আমি কি কোরবো কোথায় যাবো ও কিছুই ভাল্লাগছে না
সাহিত্য–সাহিত্য লাথি মেরে চলে যাবো শুভা
শুভা আমাকে তোমার তর্মুজ–আঙরাখার ভেতরে চলে যেতে দাও
চুর্মার অন্ধকারে জাফ্রান মশারীর আলুলায়িত ছায়ায়
সমস্ত নোঙর তুলে নেবার পর শেষ নোঙর আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে
আর আমি পারছি না, অজস্র কাচ ভেঙে যাচ্ছে কর্টেক্সে
আমি যানি শুভা, যোনি মেলে ধরো, শান্তি দাও
প্রতিটি শিরা অশ্রুস্রোতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে হৃদয়াভি-গর্ভে
শাশ্বত অসুস্থতায় পচে যাচ্ছে মগজের সংক্রামক স্ফুলিঙ্গ
মা তুমি আমায় কঙ্কালরূপ ভূমিষ্ঠ করলে না কেন
তাহলে আমি দু'কোটি আলোকবর্ষ ঈশ্বরের পোদে চুমো খেতুম
কিন্তু কিছুই ভালো লাগে না আমার কিছুই ভালো লাগছে না
একাধিক চুমো খেলে আমার গা গুলোয়
ধর্ষণকালে নারীকে ভুলে গিয়ে শিল্পে ফিরে এসেছি কতোদিন
কবিতার আদিত্যবর্ণা মূত্রাশয়ে
এসব কি হচ্ছে জানি না তবু বুকের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে অহরহ
সব ভেঙে চুরমার করে দেবো শালা
ছিন্নভিন্ন করে দেবো তোমাদের পাঁজরাবদ্ধ উৎসব
শুভাকে হিঁচড়ে উঠিয়ে নিয়ে যাবো আমার ক্ষুধায়

দিতেই হবে শুভাকে
ওঃ মলয়
কলকাতাকে আর্দ্র ও পিচ্ছিল বরাঙ্গের মিছিল মনে
হচ্ছে আজ
কিন্তু আমাকে নিয়ে কি করবো বুঝতে পারছি না
আমার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে
আমাকে মৃত্যুর দিকে যেতে দাও একা
আমাকে ধর্ষণ ও মরে যাওয়া শিখে নিতে হয়নি
প্রস্রাবের পর শেষ ফোঁটা ঝাড়ার দায়িত্ব আমায়
শিখাতে হয়নি
অন্ধকারে শুভার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়া শিখতে হয়নি
শিখতে হয়নি নন্দিতার বুকের ওপর শুয়ে ফরাসী
চামড়ার ব্যবহার
অথচ আমি চেয়েছিলুম আলেয়ার নতুন জবার মতো
যোনির সুস্থতা
যোনিকেশরে কাঁচের টুকরোর মতো ঘামের সুস্থতা
আমি আমি সগজের শরণাপন্ন বিপর্যয়ের দিকে চলে
এলুম
আমি বুঝতে পারছি না কিজন্য আমি বেঁচে থাকতে
চাইছি
আমার পুর্বপুরুষ লম্পট সাবর্ণ চৌধুরীদের কথা আ ম
ভাবছি
আমাকে নতুন ও ভিন্নতর কিছু কোর্তে হবে
শুভার স্তনের ত্বকের মতো বিছানায় শেষবার ঘুমোতে
দাও আমায়
জন্মমুহূর্তের তীব্রচ্ছটা সূর্যজখম মনে পড়ছে
আমি আমার নিজের মৃত্যু দেখে যেতে চাই
মলয় রায়চৌধুরীর প্রয়োজন পৃথিবীর ছিল না
তোমার তীব্র রূপালী য়ুটেরাসে ঘুমোতে দাও কিছু-
কাল শুভা
শান্তি দাও, শুভা শান্তি দাও
তোমার ঋতুস্রাবে ধুয়ে যেতে দাও আমার পাপতাড়িত
কঙ্কাল
আমাকে তোমার গর্ভে আমারি শুক্র থেকে জন্ম নিতে
দাও
আমার বাবা মা অন্য হলেও কি আমি এরকম হতুম ?
সম্পূর্ণ ভিন্ন এক শুক্র থেকে মলয় ওর্ফে আমি হতে
পার্তুম ?
আমার বাবার অন্য নারীর গর্ভে ঢুকেও কি মলয়
হতুম ?
শুভা না থাকলে আমি কি পেশাদার ভালোলোক
হতুম মৃত ভায়ের
ওঃ বলুক কেউ এসবের জবাবদিহি করুক
শুভা, ওঃ শুভা
তোমার সেলোফিন সতীচ্ছদের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীটা
দেখতে দাও
পুনরায় সবুজ তোষকের ওপর চলে এসো শুভা
যেমন ক্যাথোড রশ্মিকে তীক্ষ্ণধী চুম্বকের আঁচ মেরে
তুলতে হয়
১৯৫৬ সালের সেই হেস্তনেস্তকারী চিঠি মনে পড়ছে
তখন ভাল্লুকের ছাল দিয়ে সাজানো হচ্ছিল তোমার
ক্লিটোরিসের আশপাশ
পাঁজর নিকুচি করা ঝুরি তখন তোমার স্তনে নামছে
হুঁশাহুঁশহীন গাফিলতির বর্শে স্ফীত হয়ে উঠছে
নির্বোধ আত্মীয়তা
আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ :
মরে যাবো কিনা বুঝতে পাছি না
তুলকালাম হয়ে যাচ্ছে বুকের ভেতরকার সমগ্র অসহ্যতায়
সব কিছু ভেঙে তছনছ করে দিয়ে যাবো
শিল্পের জন্যে সক্কলকে ভেঙে খানখান করে দেবো
কবিতার জন্য আত্মহত্যা ছাড়া স্বাভাবিকতা নেই
শুভা
আমাকে তোমার লাবিয়া ম্যাজোরার স্মরণাতীত অসং-
যমে প্রবেশ করতে দাও

শারদীয়া গোধূলি-মন/১৩৯২/সতের

দুঃখহীন আয়াসের অসম্ভাব্যতায় যেতে দাও
বেসামাল হৃদয়বত্তার স্বর্ণসবুজে
কেন আমি হারিয়ে যাইনি আমার মায়ের যোনিবর্ত্মে'
কেন আমি পিতার আত্মমৈথুনের পর তাঁর পেচ্ছাপে বয়ে যাইনি
কেন আমি রজোস্রাবে মিশে যাইনি শ্লেষ্মায়
অথচ আমার নীচে চীৎ আধবোজা অবস্থায়
আরামগ্রহণকারী শুভাকে দেখে ভীষণ কষ্ট হয়েছে আমার
এরকম অসহায় চেহারা ফুটিয়েও নারী বিশ্বাসঘাতিনী হয়
আজ মনে হয় নারী ও শিল্পের মতো বিশ্বাসঘাতিনী কিছু নেই
এখন আমার হিংস্র হৃৎপিণ্ড অসম্ভব মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে
মাটি ফুঁড়ে জলের ঘূর্ণি আমার গলা অব্দি উঠে আসছে
আমি মরে যাবো
ওঃ এ সমস্ত কি ঘটছে আমার মধ্যে
আমি আমার হাতে হাতের চেটো খুঁজে পাচ্ছি না
পায়জামায় শুকিয়ে যাওয়া বীর্য থেকে ডানা মেলছে
৩০০০০০ শিশু উড়ে যাচ্ছে শুভার স্তনমণ্ডলীর দিকে
ঝাঁকে ঝাঁকে ছুঁচ ছুটে যাচ্ছে রক্ত থেকে কবিতায়
এখন আমার জেদি ঠ্যাঙের চোরাচালান সেঁদোতে চাইছে
হিপ্নটিক শব্দরাজ্য থেকে ফাঁসালো মৃত্যুভেদী যৌন-পর্চুলায়
ঘরের প্রত্যেকটা দেয়ালে মার্মুখী আয়না লাগিয়ে আমি দেখেছি
কয়েকটা ন্যাংটো মলয়কে ছেড়ে দিয়ে তার অপ্রতিষ্ঠ খেয়োখেয়ি...'

কবিতাটি প্রথম যখন পড়ি তখন বুকটা টিকটিকির কাটা ল্যাজের মতো অন্ধভাবে ধড়ফড় করে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, এ আমাদের সংস্কারের বাইরে। কিন্তু পরে কোনো শব্দই অবান্তর ঠেকেনি। আসলে শব্দের ব্যাপারে মলয়রা কোনো সংস্কারই মানেন না। মলয়ের সাফ কথা : 'A word is a word is a word is a word I will not allow any class distinction of words and expressions. I will not allow anyone to renounce, adjure, penalize or discard even a single word, expressions, slang, sentence or phrase on such plea that it is used by a particular class/group/caste/community'. আমি এই অজিত রায়, এখনো অবধি যে কোনো নগ্ন নারীদেহের সন্নিধে আসেনি, এ কবিতা আমার মধ্যে বিন্দুমাত্র যৌনোত্তেজনা আনেনি। পরিবর্তে পেয়েছি খাঁ খাঁ জ্বালা, ছটফটানি আর উদোলা বাতাসের ধাক্কা।...বুকে গেঁথে গেছে এক তরতাজা যুবকের আর্ত চীৎকার, অসহায়তা, যন্ত্রণা—ক্লেদ। কবিতার জমিতে গড়া প্রচলিত সব গাঁথুনির ভিৎ নড়বড়ে করে দিয়ে জীবনচর্যার সত্য প্রকাশ করে বলেই মলয়ের এই 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' হয়েছে হাংরি আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বকারী শ্রেষ্ঠ মুখবন্ধ। এবং এই কারণেই সমাজ, প্রশাসন ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের সব কটি কামান এক সঙ্গে গর্জে উঠেছিল 'প্র বৈ ছু' কে লক্ষ্য করে। মলয় জানিয়েছেন, পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত লেখকরা, এই ধরণের সংবাদ ছাপাতে লাগলেন : দেবদূতেরা কি ভয়ংকর (চতুষ্পর্ণা); ইহা কি বেহুদা পাগলামি (দর্পণ); সাহিত্যে বিটলেমি (যুগান্তর); সাহিত্যে বিটলেমি কি এবং কেন (অমৃত); কাব্যচর্চার নামে বিকৃত যৌনলালসা (জনতা); অশ্লীল পুস্তক রচনার অভিযোগ (আনন্দবাজার); কাব্যচর্চায় অবাধ যৌন-ভেজাল (জনতা); Erotic lives and loves of the Hungry Generation (Blitz); হা-ঘরে সম্প্রদায় (জলসা) প্রভৃতি। ভবিষ্যতের গবেষকরা

যদি খোঁজ নেন যে, এই সংবাদ-লেখকরা কারা, তাহলে হাংরি আন্দোলন ঠিক কোথায় ঘা মারতে পেরেছিল (?) তা টের পাওয়া যাবে।

যাই হোক, আমার 'প্র বৈ ছু' প্রসঙ্গে আসা যাক। ক্রিমিনেশন শুধু অশ্লীলতার হলে মলয় আমার কাছে বেকসুর খালাস পেয়ে যেতেন। কেননা বহু বাঘা বাঘা লেখক নিজেদের 'সাহিত্যে' ধর্ষণের মতো জঘন্য কুকর্ম করেও এখন গাড়ি আর মেম নিয়ে তিন-তলা ফ্ল্যাটের ছাদে বুকে হাওয়া লাগিয়ে পাইপ ফুঁকছেন। তাঁদের চাহিদা বাজারে হট কেকের চেয়েও চড়া। এক বহুলপ্রচারিত বাজারি পত্রিকায় (গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা নয়) একটি গল্প ছাপা হয়েছিল, তার অংশ বিশেষ সাধ্যমত কাটছাঁট করে উদ্ধৃত করছি: 'জয়ন্তর আঙুলটা রেখার পুলিন গহ্বরে গিয়ে ঠেকল। সুড়সুড়িতে শিউরে উঠে রেখা দুহাতে জয়ন্তর কোমর আঁকড়ে ধরল। মোটা মোটা মাখনের মত নরম জংঘা দুটো অনেকটা ফাঁক করে দিল। সেটার ঠোঁট দুটো হড়কে গেল দুপাশে। কী সাংঘাতিক গরম হয়ে উঠেছে সেটা! ভিজে উঠেছে, রস কাটছে। কোঁটটা ঠাটিয়ে মটরদানা হয়ে গেছে। জয়ন্তর আঙুলটা ওঠানামা করতে লাগল। নখ দিয়ে খোঁচাও দিতে লাগল। রেখা ইস্ ইস্ করে জয়ন্তর পাছা খামচে ধরল।... হঠাৎ জয়ন্তর পুরুষাঙ্গটা খপ্ করে ধরে, উত্তেজিত হাতে ভীষণভাবে টিপতে শুরু করল রেখা।...রেখার পাতলা পাপড়ি মেলা সূর্যমুখীর মত ঝকঝকে যোনিদ্বারের ঠোঁট দুটো জয়ন্ত টেনে ফাঁক করল।...রেখা থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগল'...। পুরো দেড় পৃষ্ঠার রগরগে বর্ণনা থেকে অনেক বাদসাদ দিয়ে এটুকু উদ্ধৃতি দিলুম; এতেই কী অসহ্য কষ্ট হয়েছে, কী নিদারুণ ঘৃণা হয়েছে তা লিখে বোঝাতে পারবো না।

কিন্তু এ-থেকে কেউ যেন না ভাবেন আমি আদিরসের বিপক্ষে। আদিরসের বর্ণনা যদি অশ্লীল হয়, তবে তো দুনিয়ার বারোয়ানা শিল্প-সাহিত্যকেই কোতল করতে হয়। আদি রস থাকলে আলম্বনের সঙ্গে উদ্দীপনা বিভাব থাকবে, এবং বিভাব থাকলে অনুভাবও থাকবে। নৈলে রসোৎপত্তি ঘটবে কেমনে। সুতরাং দেহের রহস্যে বাঁধা' এই অদ্ভুত জীবনকে স্বীকার করেও আদিরসকে কিভাবে অশ্লীল বলব? দেহের বর্ণনাকেও নয়। কারণ অনঙ্গের জন্য অঙ্গের প্রয়োজন তো আবশ্যিক। যদি অঙ্গ-অনঙ্গের এই বাঁধন ছিন্ন করতে চাই, তবে ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থি' সারস্বত উপলব্ধির গ্রন্থিই ছিঁড়তে হবে।

...কথাগুলো আমার নয়, বিনয় ঘোষের কাছ থেকে ধার করা। যদিও এর কোনো বাক্যের সঙ্গে আমার বিরোধ নেই। ১৯৬৪তে যখন কলকাতা পুলিশ হাংরি কবি লেখকদের গ্রেপ্তার করেছিলেন অশ্লীলতার দায়ে, তখন কিছু বিদগ্ধজনের মতামত নিয়ে সাহিত্যে অশ্লীলতার বিষয়ে একটি সিম্পোজিয়ামের বন্দোবস্ত করেছিলেন 'মহেঞ্জোদারো' পত্রিকার সম্পাদক সমীর রায়। ঐ প্রসঙ্গে অর্থাৎ সাহিত্যে অশ্লীলতা নিয়ে 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্রে'র লেখক বিনয় ঘোষ যে দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, এ খবর আজকের অনেকের অজানা। বিনয়বাবু লিখেছিলেন, 'রতিকেলির অপূর্ব ভাস্কর্যের নিদর্শন-গুলির সামনে দাঁড়িয়ে, কোন মিউজিয়ামে, মনে করুন যদি কোন বৃদ্ধ বারবণিতা, কলকাতার রামবাগান অঞ্চলের (হায় রাম!) কোন 'স্বনামধন্য' বিনোদিনী দাসী, হঠাৎ শিউরে উঠে, দু'হাত দিয়ে চোখ ঢেকে, মাথা হেঁট করে দাঁতে জিব কেটে বলে, 'ছি ছি লজ্জায় মরি। নারায়ণ-নারায়ণ। এবং তারপর নিজের ঘরে (অর্থাৎ চেম্বারে) ফিরে গিয়ে, গায়ে-মাথায় পবিত্র গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে, গলবস্ত্র হয়ে দেওয়ালে

টাঙানো শ্রীকৃষ্ণের 'বস্ত্রহরণ' ছবির দিকে চেয়ে বলে, 'ঠাকুর! একি করলে? এ চোখে এই পাপদৃশ্যও দেখতে হল?'—তাহলে যা হয় এও ঠিক তাই নয় কি? অর্থাৎ সরকার বা পুলিশের সাহিত্য-শিল্পকলার শ্লীলতা বিচারের ব্যাপারটা? Moral-Immoral-এর বিচারক হওয়ার প্রহসনটা? আমার তো তাই মনে হয়। কথাটি কিন্তু বোদলেয়ারের: 'All the imbeciles of the Bourgeoisie who interminably use the words 'immoral', 'immorality', 'morality in art' and other such stupid expressons remind me of Jouise Villedien a five-france whore who once went with me to the Lourre. She had never been there before, and began to blush and cover her face with her hands, repeatedly plucking at my sleeve and asking me, as we stood before deathless statues and pictures, how such indecencies could be flaunted in public' (Journals & Note book 1851-62)…সাহিত্যের moral censorship অনেকটাই আমার কাছে lingual censorship বলে মনে হয়…ইংরেজী obscenity ও pornography কথা দুটির অর্থ নিশ্চয়ই বাংলায় 'সাহিত্যে অশ্লীলতা'… কিন্তু অবসিনিটি কথার অর্থ কি? পার্নোগ্রাফিই বা কাকে বলে? কথাটা যদি obscena থেকে এসে থাকে তাহলে তার মানে হয় প্রকাশ্যে যে দৃশ্য দেখানো যায় না। কিন্তু ট্রাইবাল নৃত্য-উৎসবে প্রকাশ্যে যা দেখানো যায় একসময় সভ্যসমাজের রঙ্গমঞ্চে তা দেখানো যেতো না, আবার ইদানীং তা অনেকখানি দেখানো যায়…। …যারা মত বেচে, বুদ্ধি বেচে, প্রতিভা বেচে, বিবেক বেচে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে বর্তমান পণ্যসর্বস্ব সমাজে, তারা কি মর্ত্যলোকের স্বর্গের এঞ্জেলের সাবস্টিটিউট' না 'প্রস্টিটিউট'? যে বিজ্ঞানীরা অ্যাটম বোমার গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁরা কি savant না harlot? আর ধর্মদেবদেবী বা ধর্মসাহিত্যের কথাই যদি ওঠে তাহলে বোদলেয়ারের ভাষাতেই তার জবাব হল 'the most prostituted being of all is the ultimate being, that is God, since he is the supreme lover to each individual. এই অর্থে বারবণিতাদের goddess ও বলা যায়। রতিরঙ্গের একই বিষয়বস্তু ভাষা ও ভঙ্গির সমন্বয়গুণে একজন শিল্পীর হাতে অতীব রমণীয় শিল্প হতে পারে, আবার তারই দোষে আর একজনের হাতে তা এমনই অপাঠ্য নোংরা বস্তু হতে পারে যা পাঠকের বিবমিষা উদ্রেক ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। …সাহিত্যে অশ্লীলতার প্রতি সরকারের বা পুলিশের যে মনোভাব তা যেমন হাস্যকর, তেমনি নিন্দনীয়। তার বিচারক হবার কোন নৈতিক অধিকার তাদের নেই।…Cockburn Rule বা Obscene Publication Act অনুযায়ী যদি অশ্লীল সাহিত্যের বিরুদ্ধে সামাজিক করাপশনের অভিযোগ করা হয়, তাহলে সেই অভিযোগে প্রত্যেকটি সরকারি ও পুলিশী কর্মকে সকলের আগে সমাজকল্যাণের স্বার্থে দমন করতে হয়। যে সরকারের কর্মনীতি এবং যে সমাজের জীবনযাত্রা থেকে পদে পদে মানুষ জালিয়াতি, জুয়াচুরি, অপরাধ-ঘৃণা-হিংসা-জিঘাংসা শিখছে, পথে পথে, দেওয়ালে দেওয়ালে, শো-রুমে বৈদ্যুতিক বিজ্ঞাপনে যেখানে অ্যাডোলেসেন্টদের জন্যে 'নাস্টারবেশনে'র ও করাপশনের উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে ছড়িয়ে আছে, সেখানে কোনো বিশেষ সাহিত্য রচনার বিরুদ্ধে অশ্লীলতা ও নীতিহীনতার অভিযোগ করা নিতান্তই হাস্যকর…। তবু তাঁরা তা কেন করেন? কারণ অশ্লীলতার যে প্রত্যক্ষ physical excitement; যা সেন্সরকর্তারা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেন, তার বিরুদ্ধে তাঁদের ক্রোধের উদ্রেক হয় 'because they are

upset by their own response to it' [Alex Comfort]. (৬)

এই চিঠির দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃতির মাধ্যমে 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতারে'র স্বপক্ষে আমার অনেক কিছুই বলা হলো। তবু বলবো, অশ্লীলতার বিচারে ভাষা ও ভঙ্গিই মুখ্য, ভাব গৌণ। যতো গণ্ডগোল ভাষা নিয়ে; ভাব বা বিষয়বস্তু নিয়ে নয়। তা যদি হতো তবে তো কারারক্ষীরাই সবার আগে কয়েদখানায় প্রদর্শিত হতো। আসলে রিরংসা, মৈথুন, যোনি, লিঙ্গ রক্তোস্রাব, স্তন, ক্লিটোরিস, সতীচ্ছদ, গর্ভ, য়ুটেরাস, ধর্ষণ, বীর্য প্রভৃতি শব্দনিহিত ভাব সুশ্লীল সাহিত্যে স্বচ্ছন্দে চলতে পারে, কিন্তু এর নির্গলিতার্থ যদি গ্রাম্য মেঠো ভাষায় প্রকাশ করা হয়, তাহলে সংস্কার দোষেই তা রূঢ় ও অশ্লীল শোনায়।—এই বিচারে যে মলয়ের কবিতাটি অশ্লীল নয়—তা বলাই বাহুল্য। কবিতাটির কোনো লাইনে কোথাও অশিষ্ট বা ধিষ্ট শব্দ আছে বলে কেউ দাবি করতে পারবে না। মলয়ের বাহ্যিক সামাজিক আচরণে শিষ্টাচার ও আভিজাত্যের আইডেন্টিটি যেমন, তেমনি তাঁর চিত্তোৎকর্ষের। রুচি ও বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে এই আন্তঃসংস্কৃতি অর্থাৎ social refinement তথা inner culture কবির যে এক পরিচ্ছন্ন মানসপরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে, 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতারে'র সর্বপংক্তিতে তারই রিফ্লেকশন। মলয় এক আশ্চর্য পরিশীলিত কবি। এবং কবিতাটি তাঁর conscios–unconscious মনের recording. ...তবু তবু তবু 'প্র বৈ ছু' নিষিদ্ধ হলো সেন্সরকর্তাদের কাঁচিতে because দে are আপসেট by দেয়ার own রেসপন্স to ইট।

॥ তিন ॥

মলয়কে জেরা করার সময় পুলিশ কমিশনার পি কে সেন মন্তব্য করলেন 'ইকি! বান্দর ব্র্যাণ্ড বিড়ির বিজ্ঞাপনের মতো কাগজে সাহিত্য হচ্ছে।' মলয় আর দেবীর নাম তখন জানতোনা। ইতিপূর্বে হাংরি বুলেটিনের জন্যে লালবাজারের দারোগা কালীকিংকর দাস এক আই আর দায়ের করেছিলেন ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৪, এই মর্মে :'I K. K. Das, SI. DD do hereby lodge a report that following up a credible information that an obscene unauthorised Bengali booklet entitled Hungry Generation is in circulation. I collected a copy in which on scrutiny it was found to contain obscene passage in contributions of different writers. The accused persons entered into a criminal conspiracy to bring out the aforsaid obscene publication which was found in circulation from August 1964. I therefore, prefer a charge against the accused persons under Section 120B and 292 IPC. Sd/–Kali Kinkar Das, S. I. D. D. 2. 9. 64. (৭)

কালীকিংকর বাবুর অভিযোগের ভিত্তিতে জোড়াবাগান থানার দারোগা এস এন পাল ঐ দিনই এফ আই আর করলেন এই ভাষায় :

Sec. Bc/No. 36o dt. 2.9.64 U/S 120 B/292 IPC

Police Station—Jorabagan

Subdivision : Bankshall (North) District : Calcutta No. 7 Date and hour of occurrence-x

Date and hour when reported : 2.9.64 at 9.55 PM

Place of occurence and distance and direction from Police station and jurisdiction No. : Not known.

Name and residence of informant and complaint : S. I. K. K. Das of D. D.

Name and residence of accused : 1. Subha Acharjee 2. Pradip Choudhury 3. Debi Roy 4. Subimal Basak 5. Basudeb Dasgupta 6. Saileswar Ghosh 7. Utpal Kr. Bose 8. Ramananda Chatterjee 9. Malay Roy Choudhury 1o. Subhash Ghosh 11. Samir Roy Choudhury

Brief description of offence with section, and of property carried off, if any : Entering into a criminal conspiracy for an obscene unauthorised publication to wit a booklet Hungry Generation and thereby continued its circulation to corrupt the minds of the common reader. (৮)

পুলিশের দায়িত্ব বলিহারি। হাংরি জেনারেশনের অষ্টম সংখ্যায় যাঁরা লিখেছিলেন সেই এগারো জনকে মাত্র অভিযুক্ত করা হলো, বাদবাকি সবাই বেবাক ছাড় পেয়ে গেল! সংখ্যাটির প্রকাশক ছিলেন সমীর রায়চৌধুরী। প্রকাশস্থান : 48 A, Shankar Haldar Lane, Ahiritolla, Calcutta, India. মুদ্রকের নাম না থাকায় পুলিশী চশমায় এটি হলো unauthorised. যাই হোক পুলিশ হন্যে হয়ে তাঁতিপাঁতি খুঁজে বেড়ালো ওই এগারো জনকে। কিন্তু গ্রেফতার করলো মাত্র ছ জনকে : মলয় দেবী সুভাষ প্রদীপ সমীর আর শৈলেশ্বরকে। প্রথমেই, অভিযোগ রুজুর দিনই অর্থাৎ ২রা সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে অ্যারেস্ট হলেন শৈলেশ্বর ও সুভাষ। চার তারিখে মলয় গ্রেফতার হলেন পাটনায়। এর পর পরই চাইবাসা থেকে সমীর, কলকাতা থেকে দেবী আর ত্রিপুরা থেকে প্রদীপকে ধরে এনে হাজতে পুরে দেওয়া হলো। পুলিশের চমক এখানেই শেষ হলো না। পুলিশ এগারো জনকে অভিযুক্ত করে গ্রেফতার করেছিল ছ'জনকে। এবার ছ'জনকে গ্রেফতার করে ৩রে মে ১৯৬৫ সবাইকে রেহাই দিয়ে মামলা ঠুকলো একজনের বিরুদ্ধে। মামলা চলল স্টেট বনাম মলয় রায়চৌধুরী। যে প্রতিবেদনটির ভিত্তিতে মোকর্দ্দমা দায়ের করা হয়েছিল, সতর্ক পাঠক সেটি লক্ষ্য করুন :

Sec. Bc/No. 360 dt 2.9.64 U/S 292 I. P. C. Report of enquiry made by the Inspector of Jorabagan Section, Calcutta on the 3rd day of May 1965. Name of parties : State of West Bengal Vs. Malay Roy Choudhury of Dariapur Mohalla, P. S. Pirbahar, Dist. Patna, State Bihar. Nature of the complaint and the date of institution :—

In August 1964 a printed booklet entitled Hungry Generation published by Samir Roy Choudhury was found in circulation in Calcutta. The poetry captioned 'PRACHANDA BOIDYUTIK CHHUTAR' by Malay Roy Choudhury was found obscene and the Director of Public Prosecution, W.B. being consulted observed that the book was actionable under Section 292 IPC & suggested prosecution of Malay along with printer & publisher. Accordingly Jorabagan Ps case No. 360 dtd. 2.9.64 under Sec. 120 B &

292 IPC was instituted and Saileswar Ghosh and Subhas Ghosh who contributed to the book were arrested on 2.9.64 from their Calcutta residence and a number of said booklet were recovered from their possession. Malay was arrested at Patna on 4.9.64 and on search of his house more copies of the poem in question and a copy of the booklet were found and seized. Then Samir Roy Choudhury named as publisher and few other contributors namely Debi Roy alias Haradhon Dhara and Pradip Choudhury alias Shanti were also arrested in connection with this case. Samir disowned the publication and the printer could not be traced despite serious efforts. The opinion of the handwriting expert and oral testimony of the witness indicate that Malay was responsible for the production and circulation of this booklet containing an obscene poem composed by himself. Evidence forthcoming do not established direct responsibility of other accused persons. In view of the above circumstances Malay who is on court bail till today (3.5.65) may be proceeded against under Sec. 292 IPC. Sd/–A. Choudhury, Inspector of police, O/c. Sec. B. 3.5.65. Countersigned Sd/– K. K. Das. S. I. D. D. (৯)

৩মে ১৯৬৫ হাংরি জেনারেশনের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখনীয় দিন। এই দিনটিকেই ক্ষুধার্তদের আন্দোলন ভেঙে যাবার দিন বলা যায়। কেননা যে চার্জশীট মলয়কে দেওয়া হয় তাতে দেখা যায় শক্তি, পবিত্রবল্লভ, উৎপল, সন্দীপন, শৈলেশ্বর, প্রদীপ, সুভাষ, সমীর বসু, তারকনাথ সেন, সত্যেন্দ্রমোহন বারড়ি, বি পি. শর্মা, রমানাথ প্রসাদ, পশুপতি ব্যানার্জি এবং কালীকিংকর দাস পুলিশের পক্ষে অর্থাৎ মলয়ের বিরুদ্ধে বয়ান দিয়েছেন। শক্তি সন্দীপন শৈলেশ্বর উৎপল ও সুভাষ স্ব স্ব বয়ানে আন্দোলনের সাথে নিজেদের সম্পর্ক অস্বীকার করেন। অন্যদিকে মলয়ের তরফে সাক্ষ্য দেন জ্যোতির্ময় দত্ত, তরুণ সান্যাল, সত্রাজিৎ দত্ত, অজয়কুমার হালদার এবং সুনীল গাঙ্গুলীর মতো অ-হাংরি লেখকেরা। দেবী রায় মলয়ের বিরুদ্ধে বা হাংরি আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুলিশের সাক্ষী হতে বা বয়ান দিতে অস্বীকার করেন।

মলয় জানিয়েছেন, 'লালবাজারে আমায় এবং আমার দাদাকে জেরা করেন একটি ইনভেষ্টিগেটিং বোর্ড যাতে ছিলেন কলকাতা ও প: ব: পুলিশ এবং বি এস এফ, ইস্টার্ণ কমাণ্ড, সি বি আই তথা ব–এর উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অফিসাররা। তা প্রত্যেকে টেপ করেন।' আমি পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে সেইসব হাংরি লেখকদের জবানবন্দী এবং মানসিকতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যাবো, যাদের বিরুদ্ধ সাক্ষ্যের ফল শেষাবধি 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতারে'র অশ্লীলতা সাব্যস্ত তথা আলিপুর ব্যাঙ্কশাল আদালতের ৯ নং কোর্টে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট অনিলকুমার মিত্র মলয়কে ২০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে একমাস অশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ সঙ্গে অভিযুক্ত রচনাগুলির বিনষ্টিকরণের নির্দেশ। সাজার আদেশ হয় ২৮ ডিসেম্বর ১৯৬৫। আন্দোলনে শরিকদের মধ্যে সুবিমল বসাক নিয়মিত কোর্টে হাজিরা দিতেন। কলকাতা সারস্বত সমাজের রুই কিংবা পুঁটি, বাম বা ডান অথবা অন্য কোনো

হাংরি, কেউ আসতেন না। অবশ্যি গোপনে অর্থ-সরবরাহ করেছিলেন কেউ কেউ।

হাইকোর্টে অবশ্যি মোকর্দমা টেঁকেনি। বেকসুর খালাস পেয়েছিলেন মলয়। কিন্তু অনেক মানসিক টানাপোড়েন আর প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা দণ্ডের পর। ২৮ জানুয়ারী ১৯৬৬ মলয় রিভিশন পিটিশন করেন কলকাতা হাইকোর্টে। ব্যারিস্টার ছিলেন এ কে বসু, করুণাশংকর রায়, মৃগেন সেন এবং অনঙ্গকুমার ধর। অবশেষে ১৯৬৭র ২৬ জুলাইয়ে হাইকোর্ট নাকচ করে দেন নিম্ন আদালতের রায়। বিচারপতি টি পি মুখার্জি অশ্লীলতার অভিযোগ নাকতোলা করে জোর দিয়েছিলেন মোকর্দমার টেকনিক্যাল তত্বের ওপর। অর্থাৎ জোরটা ছিল অশ্লীল রচনাবাহী হাংরি জেনারেশনের প্রচার সংখ্যার ওপর, কালীকিংকর বাবুর ভাষায় যেটা কিনা প্রচারিত হচ্ছিল to corrupt the mind of the common redders এর উদ্দেশ্যে। বিচারপতি মলয়ের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগেও শাস্তিযোগ্য কোনো পয়েণ্ট ছিল বলে মানতে পারেন নি। পরিণামত মলয় বেকসুর খালাস পেলেন।

এর পরদিন থেকেই, অর্থাৎ ২৭ জুলাই ১৯৬৭ থেকে মলয় রায়চৌধুরী তাঁর বুকের ধন অত্যন্ত প্রিয় লেখা ছেড়ে দেন। কবিতা লেখা ছেড়ে দেন, সবায়ের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় ছিন্ন হয়ে যায় এবং ক্রমশ নিজেকে অসীম একাকীত্বে ঘিরে ফেলেন।...দীর্ঘ বিশ বছর পর ইদানীং মলয় আবার শুরু করেছেন লেখা-লেখি। এদিকে সেদিকে একটু-আধটু দেখছি-টেকচি। এটা শুভ, কেননা ওঁর সাম্প্রতিক লেখালেখির ধার আর স্বর দেখে মনে হচ্ছে বাংলা সাহিত্যে মলয়ের নিজস্ব কিছু দেবার আছে। —সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। এখানে সংক্ষেপে জানিয়ে রাখি, দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ মাস ব্যাপী মোকর্দ্দমার পর মলয় আবার স্ব-সম্পাদনায় বের করে-ছিলেন হাংরি জেনারেশনের দুটি সংখ্যা। লেখক হিসেবে সুভাষ আর শৈলেশ্বর ছাটাই। নবম সংখ্যায় মলয়ের বিরুদ্ধে লেখা শৈলেশ্বরের একটি চিঠি বেরিয়ে-ছিল। দশম সংখ্যায় হাংরি মামলার রিপোর্ট। হাংরি আন্দোলনকে জিইয়ে রাখার প্রয়াস পেয়েছিলেন সুবিমল, শৈলেশ্বর, পরে অরুণেশ ঘোষ। 'কিন্তু তা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে—সুবো আচার্য অনুকুল ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নেন, দেবী রায় বন্ধুবান্ধব পাল্টে ফেলেন, প্রদীপ চৌধুরী ত্রিপুরায় চলে যান, করুণানিধান মুখোপাধ্যায় নকশাল হয়ে যান, উৎপলকুমার বসু লণ্ডনে চলে যান, তপন দাস মারা যান এবং সব কিছুর মধ্যে খচখচ করতে থাকে ওই মুসলেকাগুলি।' (১০) এর পর ১৯৬৮ সালেই বন্ধ হলো 'হাংরি জেনারেশন'।

॥ চার ॥

হাংরি জেনারেশনের পয়লা বুলেটিন পড়ে যাঁরা এসেছিলেন, ধরে নিতে হবে মলয়ের বয়ানে তাদের সায় ছিল। অন্তত মলয়ের মৌল ধারণার সঙ্গে তাঁদের কোনো নীতিগত বিরোধ ছিল না। কিন্তু পরবর্তী কালে, কিংবা এখন, কি দেখতে পাচ্ছি? মলয়ের মতে, টেবলল্যাম্প ও সিগারেট জ্বালিয়ে, সেরিব্রাল কর্টেক্সে কলম ডুবিয়ে কবিতা বানাবার কাল ষাট দশকেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁরই গোষ্ঠীভুক্ত কিছু লেখক তলে তলে কোথায় গিয়ে পৌঁছলো? আমি একাধিক হাংরির বাড়ি ঘুরে দেখেছি, ওরা টাই-প্যাণ্ট স্যুট পরে মসমসে জুতোর শব্দ তুলে এগিয়ে গিয়েছে এলিভেটারের দিকে। কেউ হয়েছেন বিদেশি কম্পানির জে. ম্যানেজার, কেউ ব্যাংকের তাঁবেদার, কেউ প্রফেসর। আলাদা কামরা, সুইং ডোর, ডিম্বা-কৃতি টেবল, রিভলবিং চেয়ার, এয়ার কুলার। প্রশস্ত ঘর, বুকচেরা জামায় ভুরু প্লাক করা ওয়াইফ। কতো

স্বাচ্ছন্দ্য, কতো আরাম। অটোমেটিক ডায়াল শাদা টেলিফোন, জানলায় ব্লু ব্রিশ পর্দা, দেয়ালে লটকানো ইয়া বড়ো ল্যাণ্ডস্কেপ আর বিগ ম্যানদের কাঁধ রেখে কবির ফোটো। অফিসে ব্যবহারের জন্ম নিউ মডেলের আলোপিচ্ছল হিলম্যান গাড়ি, ডিরেক্টার্স মিটিং অ্যাটেণ্ড করে কর্তৃপক্ষের নেকনজরে। মলয়ের 'স্বার্থত্যাগ' সংগ্রাম তবে কোন্ মূল্য বহন করলো ?

আসলে নিরস্ত্র জীবনকে বাজি রেখে বাঁচার লড়াই লেতাব চেষ্টা করেছিলেন মলয় রায়চৌধুরী। পারলেন না। কেন পারলেন না? জন্মকালেই হাংরি আন্দোলনকে ধ্বংস করার বিরাট চক্রান্ত হয়েছিল কেন? কে বা কারা হাংরিদের বিরুদ্ধে পুলিশকে সক্রিয় করলেন? কেন পঞ্চাশের কবিরা যুথভ্রষ্ট ভাবে ষাট দশকের টুঁটি টিপে ধরতে চেয়েছিলেন এবং কেনই বা ষাট বা হাংরি নিয়ে এতো কুপ্রচার? এই সব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাকে সেই সব মুখকে পাঠকের আয়নার সামনে দাঁড় করাতে হবে, যাঁদের সক্রিয়তা ভিন্ন হাংরি আন্দোলন গড়ে ওঠা বা ভেঙে যাওয়া, কিছুই সম্ভব ছিল না। আমি একে একে সেইসব গেরো ও ফাঁসগেরো পাঠকদের সমক্ষে রাখছি, এবং আবেদন রাখছি পাঠককে গিঁটগুলি খুলে নেবার ব্যাপারে সচেষ্ট হতে।

॥ পাঁচ ॥

হাংরি জেনারেশনের দ্বিতীয় বুলেটিনের শিরোনাম ছিল 'সীমান্তপ্রস্তাব—১ : মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি নিবেদন। লেখক শক্তি চট্টোপাধ্যায়। এই শক্তি সেই শক্তি, যে শক্তি পরবর্তী কালে মদের বোতলের আকারে পদ্যের বই ছাপিয়ে বাজার মাৎ করেছিলেন। সে যাই হোক। শক্তিবাবুর তখন বক্তব্য ছিল :
'কবিতা ভাতের মতো কেন লোকে নিতেই পারছে না বুদ্ধ বন্ধ হলে নেবে? ভিখারিও কবিতা বুঝছে তুমি কেন বুঝবে না হে অধ্যাপক, মুখ্যমন্ত্রী সেন?'

বুলেটিনের এই শেষ কথাগুলি পড়তে পড়তে আমার মনে পড়ে গিয়েছিল, হিন্দীর সুখ্যাত ক্রান্তিকারী কবি ধুমিলের একটি কবিতা : 'কবিতা যে জানে সে পহলে/ম্যঁয় আপসে পুছতা হুঁ/জব ইসসে ন চোলি বন সকতী হ্যয়, ন চোঙা/তব আপ কহো/ইস সুসরী কবিতা কো/জঙ্গল সে জনতা তক/ঢোনে কা ক্যা হোগা?' কবিতাটি পড়লে মূল-সিদ্ধান্ত প্রতিপাদক পশ্চিমী দার্শনিক আ. এ. রিচার্ডস আলবাৎ ভড়কে যেতেন। কেননা কবিতাকে কাঁচুলি কিংবা জাঙিয়া বানাবার কথা তিনি নিশ্চয়ই কল্পনা করেননি। 'ক্রান্তিকারী' না হলে এ-চেতনা আসে? এদিক থেকে শক্তি চাটুজ্যেও আলবৎ বিপ্লবী। সম্প্রতি কোথায় যেন পড়লুম, শক্তির পদ্যের 'ভাত' আমাদের প্রাত্যহিক আহার্য ভাত নয়। এ-ভাত আসলে জীবন। তাঁর মতে নাকি জীবন আর কবিতা অঙ্গাঙ্গী, সমার্থক এবং পরস্পর পূরক। তাই নাকি? তবে তো এ-ভাত মলয় কথিত বহিরাত্মার ক্ষুধা নিবৃত্তির শক্তি। ভালো কথা। শক্তি তবে মলয়কেই সমর্থন করলেন।

সমর্থন! মলয়ের প্রতি শক্তির কী ধরনের সমর্থন ছিল? বাংলা অভিধানের তিন-চারটি কালেকশনে তন্ন তন্ন করে চুঁকেও এই 'সমর্থন'-এর বাস্তবিক অর্থ পাইনি। আমি হয়তো অভিধান দেখতেই জানি না। সুতরাং শক্তির কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করেই মানেটা খুঁজে নিচ্ছি। অবশ্য অর্থই অনর্থের মূল—এ কথাটা মাথায় রাখছি। প্রথমেই একটি নাতিদীর্ঘ উদ্ধৃতি, যাতে শক্তি নিজেকে ক্ষুধার্ত বলেই দাবি করেছেন : 'বিদেশে সাহিত্যক্ষেত্রে যে-সব আন্দোলন বর্তমানে হচ্ছে, কোনটি বীট জেনারেশন, কোনটি

অ্যাংরি বা সোভিয়েত রাশিয়াতেও সমপর্যায়ী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বাংলাদেশেও কোনো অনুরুক্ত বা অপরিষ্কার আন্দোলন ঘটে গিয়ে থাকে, তবে তা আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক পরিবেশে 'ক্ষুধা সংক্রান্ত' আন্দোলনই হওয়া সম্ভব। ওদিকে ওদেশে সামাজিক অবস্থা অ্যাফলুয়েন্ট, ওরা বীট বা অ্যাংরি হতে পারে। আমরা কিন্তু ক্ষুধার্ত। যে কোনো রূপের বা রসের ক্ষুধাই একে বলতে হবে। কোনো রূপ বা রসই এতে বাদ নেই, বাদ দেওয়া সম্ভব নয়।' (১১)

এর পাশেই পুলিশকে দেওয়া শক্তির জবানবন্দীটা পড়া যাক: 'My Name is Shakti Chatterjee. I am aged about 31 years I am B.A. and also a writer. I am a causal translator of USIS. It is a fact that this literarly movement was started by me with some other friends. I severed every connection with the organisation realising that they had diverted from the original idea. I have seen one booklet entitled Hungry Generation in which my name has been used as publisher of the book. I had no relationship with the so called Hungry Generation and this book was not published by me. According to my estimation the writing of Malay manifest mental perversion and language is vulgar. I also saw a copy of the booklet and strongly condemned the poem captioned 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' written by Malay...' (১২)

এ বয়ানে 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'কে অভিযুক্ত করার উদগ্র লক্ষ্যটা অস্পষ্ট নয়। তাছাড়া মনে হচ্ছে শক্তি নিজেকে হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টা প্রতিপন্ন করার জন্যও লালায়িত। নইলে movement was started by me লিখবেন কেন? আমি তো শুনেছি মলয়ের মাথাতেই পরিকল্পনাটা প্রথম আসে, পরে সেটা ট্রান্সফার হয় শক্তির মগজে। শক্তি কি তবে মলয়ের প্ল্যানটা ভেস্তে দিতেই তড়িঘড়ি কলকাতা ফিরে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'সম্প্রতি' কাগজে 'ক্ষুৎকাতর আক্রমণ' লেখেন? কোনো একটি রচনার শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়ে ব্যক্তিগত মন্তব্য চলে, কিন্তু পুলিশের কাছে মলয়ের কবিতাকে অশ্লীল প্রতিপন্ন করার তাগিদ শক্তি অনুভব করলেন কেন? সারাটা পঞ্চাশ জুড়ে কাচিত্তির পদ্য লিখে, ষাট দশকে এসে হঠাৎ কী হলো যার দরুণ তিনি 'ক্ষুধার্ত' হয়ে গেলেন এবং পরে হাংরি মুভমেন্টের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক অস্বীকার করলেন, অথচ তার আগে অবধি সে-ব্যাপারে কোনো উল্লেখই তিনি করেননি—এটা শক্তির কেমন চরিত্র প্রকাশ করে, পাঠক বিবেচনা করুন। এই কৃত্রিমতা শক্তির সর্বত্র।

॥ ছয় ॥

এবার হাংরির তিন নম্বর বুলেটিন লেখক মাননীয় সমীর রায়চৌধুরীকে এজলাসে হাজির করা হোক। অতুল্য ঘোষ নামক জনৈক নেতা-টাইপ ভদ্রলোকের একটি কাগজ ছিল। জনসেবক। সেখানে সমীর লিখেছিলেন—'ক্ষুৎকাতর আক্রমণ'। লিখেছিলেন: 'এই জীবনে, আমরা প্রত্যেকেই অন্তত: একটি সমান অনুভব সবাই বোধ করছি। সবাই করে। ক্ষুধা এমনই এক প্রাথমিক অনুভব।' জনৈক গবেষক মহোদয় জানিয়েছেন সমীরের আলোচ্য এই 'ক্ষুধা' আসলে নাকি নিছক পাকস্থলী সংপৃক্ত। মলয়ের

'বহিরাশ্রায় ক্ষুধা' ইত্যাদির সঙ্গে কোনো তুলনাই বৈজ্ঞানিক হবে না। অর্থাৎ এ-বক্তব্যের সঙ্গে মলয়ের মতাদর্শের কোনো যোগ নেই। কিন্তু তবু কেন জানি না, সমীরের এই রচনাটিই থার্ড বুলেটিন হিসেবে পুনপ্রকাশিত হলো হাংরি জেনারেশনে। আমি সমীরের লেখা বিশেষ কিছুই পড়িনি, তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলবোও না। শুধু সেই জপানবন্দী উদ্ধৃত করবো যাতে তিনি মলয়ের কবিতাকে অভিযুক্ত করা তো দূরের কথা, নিজেকে ও ভাইকে বাঁচানোর প্রাণ-ছুট কোশিশ করেছেন এ-বয়ান থেকে অবশ্যি সমীর সম্পর্কে একটা ধারণা পাঠক আপনাআপনিই করে নিতে পারবেন: 'My name is Samir Roy Chou lhury. I am Fishery Inspector in the Government of Bihar. I came to contact with Sakti Chatterjee, poet, who started Hungry Generation. He is a friend of mine and regularly comes to me at Chaibasa and stays there at my residence. I started contribution in H.G. pamplets. The first contribution by me being an essay reprinted from 'Janasebak', edited by Atulya Ghosh. In this article I tried to establish the ideals cf 'Attack on stervation' movement of FAO of USA. In the literary sphere I proposed to materialise ideal of USA i.e. Hunger for truth. Since then I have been in regular contact with Sakti Catterjee and Sandipan Chatterjee and have contributed in different leaflet and periodical etc. whenever desired by them, I have been alleged to be publisher of leaflet which is said to be containing obscene articles, but in fact I have not published them neither I have seen any of the articles prior to publication of the leaflet in question. Contributors may kindly be requested in this respect. Another pamphlet published in the month of August 1964 captioned H.G. regarging which I have to say that this booklet was edited by my friend Sakti and on his request it was sent to different intelectuals free of cost. I do not know the place from where the booklet in question was printed. (১৩)

জবানবন্দীতে কোথাও মলয়ের নাম নেই। নিজেকেও বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন সমীর। যুক্তিও ঢের আছে। বিহারের সুদূর চাইবাসায় থেকে কলকাতায় পত্রিকা করা যায় না—এ তো যুক্তিই বটে। অথচ আগস্ট সংখ্যার সম্পাদক শক্তি, এটা তিনি চাইবাসায় বসে জানলেন কি ভাবে? শক্তি তো তাঁর জবানীতে সম্পাদনার কথা অস্বীকার করেছেন। আসলে, রবি ঠাকুর বলেছিলেন, 'বাংলা পত্রিকার কম্পোজ করা এবং ছাপানো ছাড়া বাকি অধিকাংশ কাজই একা সম্পাদককে বহন করতে হয়।' কথাটা মলয় সম্পর্কেই প্রযোজ্য। কেননা সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রক হিসেবে যারই নাম থাক, সব কাজ মলয়ই করতেন। সুতরাং……

॥ সাত ॥

এই পঞ্চায়েতে দেবী রায়কেও ডাকছি। আগেই জানিয়েছি, এঁর আদি নাম হারাধন ধাড়া। পিতা যুগলকিশোর, জন্ম ৪ আগস্ট ১৯৪০, মধ্য হাওড়া। ঘাটের গোড়ায় এক তরুণীর প্রেম হারাধনকে কবিতায় টেনে আনে। সেই সময় এক লিটল ম্যাগাজিনে,

নতুন রীতির ছোটোগল্পের স্বপক্ষে হারাধন একটি চিঠি লিখেছিলেন। নিচে ঠিকানা। ফলে পাটনা থেকে মলয়ের পক্ষে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগে সুবিধা হয়েছিল। মলয় তাঁকে লিখলেন অধ্যাপক সুবর্ণ উপাধ্যায়ের কলকাতার পাইকপাড়ার বাসায় দেখা করতে। আন্দোলনের কথা লিখলেন। হারাধন নিমরাজি। তাঁকে মলয়ের 'সম্পূর্ণ কাঁচা মনে হলো।' রফা হলো, মলয় লেখা ছেপে হারাধনকে পাঠাবেন, প্রথমে কয়েকটা ইস্তেহার,। উনি উচিত জায়গায় পৌঁছে দেবেন আর যারা শরিক হতে চায় তাদের রচনা যোগাড় করে মলয়কে পাঠাবেন। মলয় যে সুনীল-শক্তির বন্ধু সমীরের অনুজ, এটা জানতে পেরেই 'হারাধন জানালেন তিনি দেবী রায় নামে লিখতে চান'। 'কলকাতায়, সুবর্ণ উপাধ্যায়ের ফ্ল্যাটে প্রথম মুখোমুখি, কথাবার্তা, আলাপ ও বন্ধুত্ব।' দেবী রায় আমাকে জানিয়েছেন, 'মলয় একবার এক চিঠিতে লিখেছিলেন—তুমি না হলে হাংরি জেনারেশন সম্ভব হতো না।' (১৪)

শুধু দেবী কেন, অন্যান্য হাংরির চিঠি বা লেখাতেও আত্মপ্রচারের গন্ধ অস্পষ্ট নয়। মায় মলয়ের মধ্যেও, উনি হাংরির কবর আঁকড়ে পড়ে আছেন সম্ভবত অমরত্ব লাভের আশায়। সে যাই হোক। দেবীর ঘোষণা মোতাবিক, দেবী ভিন্ন হাংরি হতো না। এবং মলয়ের চিন্তাধারার প্রতি একমাত্র তারই শ্রদ্ধা ছিলো ষোলো আনা। সবাই যখন ভয়ে একের পর এক মুচলেকা দিয়ে হাংরি জেনারেশন ষড়যন্ত্র মামলায় সরকারি সাক্ষী হয়ে যায়, দেবী, সদর্পে মলয়ের উকিলের সামনেই, তার বিরুদ্ধতা করেন। (১৫) কিন্তু ক্ষুধিত প্রজন্ম সম্পর্কে দেবীর বর্তমান মনোভাব কী? এর জবাবে দেবী কীট্সের ভাষায় আমাকে বলেছেন — 'হাংরি জেনারেশন আমার কাছে No hungry generations tread thee down,··· হাংরি নামক বিশেষ ঐ বুশশার্ট আমি কবে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। আমি এখন, নিজেকে ক্ষুধার্ত বলে মনে করি না। খুবই ভালো খাওয়া-দাওয়া করি। এ ফ্ল্যাটটার স্পেস খুব কম, চেষ্টা চালাচ্ছি যাতে বড়ো-সড়ো আরো একটা কেনা যায়। আমি যে চাকরি করি, তাতে অন্তত: পরবর্তী ধাপে অফিসার গ্রেডে পৌঁছবার জন্য একটা পরীক্ষা দিতে হয়। দু'বার পরীক্ষা দিয়ে ফেল করা আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না।··· কলকাতা আমার দ্বিতীয় জন্মভূমি। অফিসারী পরীক্ষা পাশ করার ফলাফল—কলকাতা থেকে আমার নির্বাসন, যা আমি চাই না কখনোই। যতোক্ষণ জেগে থাকি, ততোক্ষণ রেওয়াজ! I am not interested in being labelled, I am just keen to be myself—totally free. To do what I want to যা লিখতে চাই, তাই লিখি এখন। একটাই জীবন, পছন্দসই জীবন কাটানোই আমার অভিপ্রেত। আমার বিশ্বাস, 'ইজম' বা 'দলের' চাইতে মানুষ—মানুষের জীবন অনেক বড়ো।' (১৬)

॥ আট ॥

এই পরিচ্ছেদে আমি পর পর চারজনের জবানবন্দী তুলে ধরছি যাঁরা স্ব স্ব বয়ানে হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক অস্বীকার করেছেন :

শৈলেশ্বর ঘোষ : 'One Debi Roy @ Haradhan Dhara asked me to contribute in poem in Hungry Generation Magazine in the last part of September 1963 in Coffee House, College Street. After that I came to know most of the H.G. contributors as well as other writers also. I personally known Sandipan Chatterjee, Shamar Ganguly, Sunil

Ganguly, Rabindra Datta, Basudeb Dasgupta, Pradip choudhury, Utpal Basu. The April last one day I met Malay Roy Choudhury in the Coffee House and he requested me to give him some of my poems. From him I came to know that H.G. is going to be published. A month ago I got a packet containing the copies of the same. I know Malay who is the creator of H.G. I contributed twice in poems in H.G. Malay sent me some leaflets and 2/3 Magazines but I got no instruction what to do with these papers. Usually those papers were in my room. Excepting this I know nothing of H.G. To write in obscene language is not my moto. I am residing at the above adress with Subhash Ghosh who is my realation on a monthly rent of Rs. 45·00 for the last 2yrs, I am a school teacher of Bhupendra Smriti Vidyalaya Bhadrakali Hooghly from 1962 on a monthly salary Rs. 210. After the recent issue of H.G. which was published without my knowledge and consent I cut myself off from the said organisation. In future neither I shall keep relation nor I shall contribute in the H.G.' (১৭)

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় : The present publication in question also came to my notice. As a poet myself I do not approve either the theme or the language of the poem of Malay captioned প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার। I have severed all connections with Hungry Generation.' (১৮)

উৎপলকুমার বসু : In 1964 during summer Malay came down to calcutta from Patna and requested me to contribute article in the booklet which was contemplating to bring out. I contribute an article entitled কুসংস্কার। ...According to my estimation the writings of Malay carry a sense of disgust and nonsense. I feel that their literary movement degenerated into depravity and I have disassociated myself from the Hungry Generation. (১৯)

সুভাষ ঘোষ : I never liked to be acquainted with such type of Magazine which is in my opinion is bad and never though that my article captioned হাঁসেদের প্রতি would have been published in such Magazine. I do not believe in the moto of Hungry Generation and have cut off every relation with it after the publication of my article. (২০)

এঁরা প্রত্যেকেই আন্দোলনের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত হতে চেয়েছেন, এক কথায় বলা যায়, পুলিশের ভয়ে। আদর্শ-ফাদর্শের অমিল, বাজে কথা। স্রেফ নিজেকে আদালত ও মামলার থাবা থেকে নিস্তারের তাগিদে। শৈলেশ্বর ঘোষ পত্রিকাটির নিষিদ্ধ সংখ্যাটির ছাপা ও প্রকাশনার ব্যাপারে ডাহা মিথ্যা বলেছেন। অবশ্যি একটা ব্যাপারে তাঁর বয়ান আরো গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতারের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলেননি সম্ভবত বিতর্কে জড়াতে চাননি বলেই। সন্দীপন প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার সম্পর্কে ভালো না

সাগার মন্তব্য করলেও এমন কিছু বলেননি আদালতে যা শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হতে পারতো। উৎপলও তাই। ইনি বয়ানে যাই বলুন না কেন, কোর্টে মলয়ের কবিতাটিকে উঁচু স্তরের সাহিত্য কর্ম বলতে দ্বিধা করেননি— 'The poem is certainly a new kind of writing and experimental at that .. can be called literary piece.' পুলিশের কাছে উৎপল বলেছিলেন 'writing of Malay carry a sense of disgust and nonsence.' অথচ বিচারালয়ে বললেন 'The piece carries a sense of disgust of the writer.' আদালতে সুভাষ আর শৈলেশ্বরের জবানও পাল্টে গিয়েছিল। কোর্টের উইটনেস যেভাবে মসিলিপ্ত হয়েছিল তাতে সুভাষ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি 'a writer. The disputed poem impressed him favourable and appealed to him as a literary piece.' একইভাবে, মলয়ের কবিতাটি সম্পর্কে শৈলেশ্বর আদালতে বলেছিলেন যে, তাঁর 'first impression was that it was a poem with high literary value.' এ থেকে অবশ্যি মলয়ের প্রতি এঁদের শ্রদ্ধা বা সহানুভূতিই প্রকাশ পায়. হয়তো, গ্রেফতারের সাময়িক বিহ্বলতাই এঁদেরকে পুলিশের কাছে বলাতে বাধ্য করেছিল যে হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে এঁদের কোনো যোগ নেই।

প্রদীপ চৌধুরী কিন্তু ব্যতিক্রম। নিজের জবানবন্দীতে তিনি হাংরি আন্দোলনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের বয়ান দেননি, কাউকে অভিযুক্তও করেননি: My name is Pradip Choudhury. I am appearing at M.A. (English) exam. from Jadavpur University, this year as a casual student. I came in contact with this publication known as Hungry Generation sometime in 1963, while I was a student of Biswa Bharati University. I had contributed one of my poem entitled বাবা আমার বর্বরতা in the said booklet. I also sent a poem entitled সাময়িকতা to Debi Roy taking him as editor of the Magazine as was published in a previous issue of the H.G. latter on while the paper was running high controvery among public. I enquired Shakti Chatterjee about the moto of H.G. who was one of the editors. From the very beginning my outlook was philosophical. H.G. I considered an aesthetic movement and accor-ding I even placed it to the Philosophical Congress of Santiniketan. About the booklet in question I have only to confess that in some day of April 1963 Saileswar Ghosh and Subhas Ghosh came to Panthanivas where I used to reside and they told me that another booklet was going to be published under the patronage of Malay Roy Choudhury, Subha Acharjee and others who contributed in the booklet in question. I myself also felt some interest as one of my poem was going to be published ইত্যাদি ইত্যাদি। আরো কিছুটা উদ্ধৃত করা যেতো, কিন্তু অনাবশ্যক। প্রদীপ এ-বয়ানে পত্রিকার নিষিদ্ধ সংখ্যার প্রকাশ মুদ্রণ ও বিলির ব্যাপারে সমস্ত তথ্য নির্দ্বিধ ভাষায় লিখেছেন। আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্রের কথা সসাহসে ঘোষিত। স্বীকৃতি দেননি সংখ্যাটির অনৈতিক দিককে, বরং পুরোপুরি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুরো ব্যাপারটিকে গ্রহণ করার কথাই জানিয়েছেন। এই সাহস অন্যান্যদের মধ্যে ছিল না।

॥ নয় ॥

ক্ষুধিত প্রজন্ম বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আর একটি নাম : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। গোধূলি-মনে প্রকাশিত আগের প্রবন্ধটিতে তাঁকে নিয়ে আমি দু-চার বাৎ লিখে ফ্যাসাদে পড়েছিলুম। নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায় নামে জনৈক রমণী জানিয়েছেন : 'অজিত রায় প্রবন্ধটিতে মোটামুটি শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়ে ভারাক্রান্ত করেছেন—আবার 'এ হলো সুপার কোয়ালিটির ভণ্ডামি' বলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে নিচে নামিয়েছেন।' জানি না নীলিমা দেবী সুনীলদার রিলেটিভদের মধ্যে কেউ হন কিনা। অবশ্যি অজিতেশ ভট্টাচার্য বলেছেন যে আমার প্রবন্ধটির একটি বৈশিষ্ট্য 'শক্তি সুনীল তথা এস্টাবলিশমেন্টের যথাযথ সমালোচনা'। একই কথা লিখেছেন দেবাশিস বসু : 'সুনীল শক্তির চরিত্র আজ আর কারো অজানা নয়। কিন্তু এতো সাহসীভাবে অজিতবাবুর আগে কেউ বলেননি।'

বস্তুত আমি তেমন কিছুই করিনি। কোলরিজ বলেছিলেন, বেশির ভাগ সমালোচকই হলো Gossips, backbiters—gnats, beetles, wasps : এরা গুজব রটায়, পেছন থেকে কামড় দেয়, এরা হচ্ছে মশা মাছি গুবুরে পোকার সামিল। কেবল জ্বালিয়ে মারে, কিন্তু দুঃখের বিষয় উপযুক্ত শাস্তি পায় না। আমি কিন্তু সুনীলের বিষয়ে তেমন কিছুই করিনি। শুধু হাংরি জেনারেশন সম্বন্ধে তাঁর কিছু অভিমত তুলে ধরে তাঁর স্ববিরোধকে সপ্রমাণ করতে চেয়েছি। এতে কেউ ওপরে উঠে যায় বা নিচে নেমে আসে বলে মানি না। অবশ্যি শুনেছি, সুনীল-টুনীলরা এ-ধরনের উটপটাং মন্তব্য নিজের সম্পর্কে শুনতে চায় যাতে বিতর্কিত বা অমর' হওয়া সহজ। যাই হোক। আমি সুনীলের একটি মন্তব্য তুলে ধরে লিখেছিলুম : হাংরি জেনারেশন ভালো কি খারাপ সুনীল তা জানেন না। এবং এই ধাঁচের কোনো আন্দোলনে তিনি বিশ্বাস করেন না। মজার কথা হলো, যে সুনীল স্বীকার করেন সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে হলে হৈচৈ গোলমাল পাকাতে হয়, দেশ আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানকে গাল দিতে হয়; সেই সুনীলই প্রতিষ্ঠান বিরোধী হৈচৈ আর গোলমাল আর আলোড়ন সৃষ্টিকারী হাংরি আন্দোলনের নিন্দা করেছিলেন। অবশ্যি, যে লেখক আনন্দবাজারে কাজ করার সুবাদে একটা গাড়ি আর ফ্ল্যাট ব্যবহার করেছেন, বছর বছর গণ্ডায় গণ্ডায় বই লিখছেন, আপিসের পয়সায় হিল্লি-দিল্লি করে বেড়াচ্ছেন, তাঁর পক্ষেই হয়তো সুপার কোয়ালিটির ভণ্ডামি সাজে। আমি তাই লিখেছিলুম সুনীলের সততায় আমি সংশয়ী। (২১)

সুনীল হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে ঠিক কী বলতে চান, আজও তা স্পষ্ট নয়। উল্টোপাল্টা অনেক কিছুই বলেছেন। একসময় তিনি বলেছেন, 'আমি হাংরি জেনারেশনে যোগ দিইনি, কারণ আমাকে যোগ দিতে কেউ ডাকেনি। সমস্ত ব্যাপারটা শুরু হয় আমাকে না জানিয়ে। সম্ভবত আমাকে বাদ দেওয়াই ছিল ওদের উদ্দেশ্য।' (২২) আবার ১৯৬৬ তে কৃত্তিবাসে লিখেছেন : 'এই প্রকার কোনো আন্দোলনে আমরা বিশ্বাস করি না।…হাংরি জেনারেশন আন্দোলন ভাল কি খারাপ জানি না।' পাশাপাশি পড়া যাক তাঁর ১৯৬৯ সালের বক্তব্য : 'সাহিত্যে মাঝে-মাঝেই নতুন আন্দোলন আসে। ইদানিং কালের আন্দোলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাংরি জেনারেশন।' আবার কৃত্তিবাসেই লিখেছেন, 'এ পর্যন্ত ওদের প্রচারিত লিফলেটগুলিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কীর্তি চোখে পড়েনি। সাহিত্য সম্পর্কহীন কয়েকটি ক্রিয়াকলাপ বিরক্তি উৎপাদন

করে।' ঐ সময় আমেরিকার আই ও ডব্লু এ শহর থেকে একটি তারিখবিহীন (পোস্টমার্ক ১০.৬.৬৪) চিঠিতে সুনীল মলয়কে লিখেছিলেন: 'কিছু লেখার বদলে আন্দোলন ও হাঙ্গামার দিকেই তোমার লক্ষ্য বেশী। রাত্রে ঘুম হয় তো? আমার ওতে কোনো মাথাব্যথা নেই। যত খুশী আন্দোলন করে যেতে পারো—বাংলা কবিতার ওতে কিছু আসে যায় না। মনে হয় খুব একটা সর্টকাট খ্যাতি পাবার লোভ তোমার।...আমি এসব আন্দোলন কখনো করিনি, নিজের হৃৎস্পন্দন নিয়ে আমি এতই ব্যস্ত। তবে, একথা ঠিক, কলকাতা শহরটা আমার। ফিরে গিয়ে আবার আমি ওখানে রাজত্ব করবো। তোমরা তার একচুলও বদলাতে পারবে না। আমার বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই সম্রাট। তোমাকে ভয় করতুম, যদি তোমার মধ্যে এখন পর্যন্ত একটুও জেল্লা দেখতে পেতুম। (জনান্তিকে বলে রাখি মলয় তাঁর ১নং জার্নালে লিখেছেন, 'আমি এতো ক্ষুদ্র নই যে আমি এস্ট্যাব-লিশমেণ্টের বিরোধিতা করবো! আসলে এস্ট্যাবলিশ মেণ্টই আমার বিরোধিতা করে, আমাকে ভয় করে।') তোমার মতো কবিতাকে কমার্শিয়াল করার কথা আমার কখনো মাথায় আসেনি (চমৎকার! লাজবাব!!)। বালজ্যাকের মতো আমি আমার ভোকাবুলারি আলাদা করে নিয়েছি কবিতা ও গদ্যে। ...তোমার কবিতা সম্বন্ধে এখনো কোনো রকম উৎ-সাহ আমার মনে জাগেনি। অনেকের ধারণা যে পরবর্তী তরুণ জেনারেশনের কবিদের হাতে না রাখলে সাহিত্য খ্যাতি টেঁকে না। সে জন্তে আমার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের মুরুব্বি হয়ে-ছিল। আমি ওসব গ্রাহ্য করি না। (তাই নাকি! আমি তো দেখেছি বা শুনেছি তরুণ কবিরা সুনীল-দাকেও বোতল ট্যাক্স বা তাঁর টেবিলের সামনে বশং-বদ না হলে 'দেশে' কবিতা ছাপাতেই পারেন না)। আমার কথা হলো: যে যে বন্ধু আছো কাছে এসো, যে নও, দূর হও। চালিয়ে যাও ওসব আন্দোলন কিংবা জেনারেশনের ভন্ডামি। আমার ওসব পড়তে কিংবা দেখতে মজাই লাগে। দূর থেকে।...তোমা-দের উচিত আমাকে দূরে রাখা, বেশী খোঁচাখুঁচি না করা। নইলে, হঠাৎ উত্তেজিত হলে কি করবো বলা যায় না। (সতর্ক পাঠক, এই গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি অবশ্যই লক্ষ্য করুন—) দু-একজন বন্ধু-বান্ধব ও-দলে আছে বলে নিতান্ত স্নেহবশতই তোমাদের হাংরি জেনারেশন গোড়ার দিকে ভেঙে দিইনি। এখনও সে ক্ষমতা রাখি...তবে এখন ও-ইচ্ছে নেই।' (২৩)

সুনীলের সর্বত্র স্ববিরোধ, স্টাণ্ট। যে মলয়কে তিনি লিখেছেন 'তোমার কবিতা সম্বন্ধে আমার কোনো উৎসাহ নেই', সেই মলয়ের কবিতা প্রকাশের আগ্রহেই তিনি সমীরকে লেখেন 'মলয়ের বই আমি তো ওকে কৃত্তিবাস থেকেই বার করতে বলেছি, সাহিত্য-প্রকাশক কোন দরকার নেই'। এতে কি প্রমাণ হয় না যে মলয়কে তিনি কবি হিসেবেই স্বীকৃতি দিয়েছেন?– ক্ষুধার্ত আন্দোলন ভেঙে দেবার কথাই বা তিনি লিখেছিলেন কেন? ঈর্ষা যে নয়, তা নিশ্চিত, কেননা হাংরিরা ওঁর 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছিল না। তবে কি রাগ? শক্তি, সন্দীপন ও উৎপল কৃত্তিবাস ছেড়ে হাংরির ছাউনিতে গিয়ে ঢুকলেন, এই জন্তে? কিন্তু এতে এমন রাগ কি সম্ভব, যা হাংরি আন্দোলন ভেঙে দেবার মতো? নাকি হাংরিরা তাঁকে অন্ত কোনো ভাবে উত্যক্ত করেছিল? সুনীল এতো স্পষ্টবাক (?) অথচ হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর সঠিক মনোভাব অদ্যাবধি জানালেন না। 'সুনীল কেন গম্ভীরভাবে চিন্তা করে এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য রাখছেন না?' এ প্রশ্ন মলয়ের, আমারও।

এরকম উল্টোপাল্টা কথাবার্তা কি টেনিসন অনুবাদ কালে শেখা? মলয়ের ভাষায়—'দেশবিদেশ

ঘুরে ইন্‌জিরি জানা ওই-ভাকসাইটে ভদ্দরলোক উনি। বাঙালির প্রাগৈতিহাসিক গরিমায় যাঁরা খ্যাতিমান তাঁদের বোধহয় মিথ্যাবাদী হবার আর উল্টোপাল্টা বলার অধিকার আছে।' সুনীল হাংরি সম্পর্কেও এটা করছেন। কিন্তু টেনিসন অনুবাদের দরকার কি? এবার না হয় নিজস্ব ভোকাবুলারি দিয়েই নিজের ক্ষতটা দেখালেন, ক্ষতি কি?

॥ দশ ॥

এখন একটি প্রতিবেদন। হাংরিদের কর্মকাণ্ড নিয়ে জনমানসে ব ও অ-হাংরি লেখকদের মধ্যে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া ছিল, তারই রিপোর্ট। এই অবসরে বলে নিই, আমি যখন ওদের নিয়ে লেখালেখির কথা ভাবছি, তখন দুটো বাধা এসেছিল। দুটোই বাহ্যিক। প্রথমটির কথা গোধূলি-মনে'র পাঠক আগেই জেনেছেন: নিবন্ধটি লেখার সময় আমাকে এক রকম যুযুর ভয় দেখানো হয়েছিল। অনেকে এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিতে প্রাণনাশের আশংকার কথাও বলেছিলেন। লেখাটি প্রকাশের পরও বেশ ক'জন হাংরির (সম্প্রতি ওঁদের কেউ কেউ সুপ্রতিষ্ঠিত) হা রে রে শুনতে পেয়েছিলুম। এর বিপরীতে উৎসাহ মিলেছে চার আনা। সবটাই প্রথম আলোচনাটি প্রকাশের পর। অমৃতলোক পত্রিকা লিখেছেন 'এমন পরিশ্রমী প্রবন্ধ আজকালকার গতানুগতিকতার যুগে একটি দৃষ্টান্ত'। সুসাহিত্যিক বিভূতি মুখুজ্যে অশোকদাকে লিখেছেন 'অজিত রায়ের অসমান্তরাল প্রবন্ধ ক্ষুধিত প্রজন্মের কবি ও কবিতা প্রকাশ করে তোমরা একটি মহৎ কর্ম করেছো। এরকম একটা লেখার খুব দরকার ছিল।' অধ্যাপক বাসুদেব দেবও বলেছেন 'ক্ষুধিত প্রজন্মের কবি ও কবিতা লেখাটি দুঃসাহসিক। লেখাটি সময়োপযোগী ও জরুরী ছিল। রঙীন সৌখিন বেলুন ফুটো করার মতো কাজ দরকার।' শ্যামলেন্দু চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন 'গোধূলি-মনে অজিত রায়ের আমি ভক্ত হয়ে পড়েছি। লেখাটি একটি অসাধারণই নয়, বিরল রচনা।' একই ভাবে অজিতেশ ভট্টাচার্য আলোচনাটি নির্বাচন ও প্রকাশের জন্য অশোকদাকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছেন 'অজিত রায়ের লেখা সব দিক থেকে স্বতন্ত্র উজ্জ্বল ও অনেকটা নিরপেক্ষ।' সুইডেন থেকে গজেন্দ্রকুমার ঘোষ 'উত্তর প্রবাসী'তে হাংরিদের ওপর একটি লেখার জন্যে অশোকদাকে মৎকৃত রচনাটি পাঠাতে বলেছেন। পাটনা থেকে 'সপ্তদ্বীপা' সম্পাদক জীবনদা আমাকে লিখেছেন: লেখাটির খুব প্রয়োজন ছিল। জামশেদপুরের 'কৌরবে'র দফতরেও লেখাটি আলোচিত হয়েছে। বিমলকান্তি লিখেছেন, আমার দার্শনিক দিকটা নাকি 'বেশ চাঁছাছোলা'। আসানসোল লিটল-ম্যাগ গ্রন্থাগার থেকে দেবাশিস লিখেছেন, 'হাংরি জেনারেশনের ওপর একটি অগ্নিগর্ভ লেখা পড়লাম। অজিতবাবু আমাদের প্রেরণা।' এ ছাড়া সংযম পাল, প্রমোদ বসু, মতি মুখোপাধ্যায়, কুন্তল হাজরা প্রমুখও বিভিন্ন চিঠিতে মৎরচনার স্বীকৃতি দিয়েছেন। এসব আমি এই জন্য উল্লেখ করলুম যে, অনেকে মনে করেন, যেমন আমার সঙ্গীতজ্ঞ ও লেখক বন্ধু সুভাষ বিশ্বাস বলেছেন, আমার ইচ্ছাশক্তি খুব ঠুনকো। কিন্তু এই রচনা তার জবাব।

যাই হোক, আমার আলোচনা, জনমানস প্রতিক্রিয়া। প্রচলপন্থী সংস্কৃতিপ্রিয় গণদেবতাগণ যাঁদের শংকর-সুনীলের গল্পে চোখে জল আসে, তাঁদের মনোভাব কিরকম? প্রশ্নটা শুনেই জনৈক প্রৌঢ় পাঠকের পোস্তচচ্চড়ি খাওয়া আঠাশ ইঞ্চি বুকটা সিঁধিয়ে গেল: 'বলেন কি, ওরা সাহিত্যিক ছিল? বিচ বাজারে উদোম ল্যাংটো হয়ে খিস্তি কবিতা আওড়ানোকে আপনি কাব্য বলেন?' শুধু সাধারণ

পাঠক কেন, সুনীলের এক নম্বর চামচা দীপংকর রায়ের 'পথের পাঁচালি'তে জনৈক প্রখ্যাত মাস-মিডিয়া গানবেটি-ডিপ্লোম্যাট মলয়ের সম্পর্কে লিখে-ছিলেন—'মলয় যে ওদের নেতা সে নিজেই কবি নয়—সেটা তো প্রমাণ হয়েছেই, মলয় কি কবি হিসেবে দাঁড়িয়েছে?' যিনি লিখেছেন তাঁর অন্তত হাজার তিরিশেক কবিতা বাজারে ছটোপুটি খাচ্ছে। সৌভা-গ্যত তিনি মলয়ের পাঁচ বছরে লেখা তিরিশটা কবি-তার সঙ্গে স্বকবিতার তুলনামূলক অ্যাকাদেমিক চর্চায় নামেন নি। তখনকার দিনে যে মুষ্টিমেয় সাধারণ পাঠক হাংরি জেনারেশন পড়তেন তাঁদের মনোভাবও এইরকম ছিল। 'মুষ্টিমেয়' বললুম এই কারণে যে, কালীকিংকর দাস হাংরি জেনারেশনের বিরুদ্ধে to corrupt the mind of the common readers-এর অভিযোগ করেছিলেন, তেমনি common পাঠক সত্যিই খুব কম ছিল। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সাধারণ পাঠক বুকস্টলে কোল আলো করা 'তুমি কি সুন্দর' 'সুখী জীবন' বাদ দিয়ে রেস্ত খরচ করে 'অশ্লীল' পড়ার জন্যে হাংরি জেনারেশন কিন-তেন না। কেননা তার ভাষা বা আঙ্গিক তাদের বোধগম্যির বাইরে ছিল।

এছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যে হাংরিদের সম্পর্কে একটা চাপা ক্ষোভও ছিল। হাংরি লেখকরা কি পাঠক বিরোধিতা করেননি? আমি জানি তাঁদের লক্ষ্য ছিল প্রতিষ্ঠান। কিন্তু প্রতিষ্ঠান যেহেতু একটি বড়ো কাগজের অফিস নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকেন বৃহৎ পাঠকগোষ্ঠী, সুতরাং পরোক্ষত তাঁরাই হলেন হাংরিদের আক্রমণের লক্ষ্য। সেই পাঠককে খেপিয়ে তুলে হাংরিরা পাঠকদের একটা বিরাট অংশকে আহত সাপের মতো লেলিয়ে দিয়েছেন, এটা মানতেই হবে। এছাড়া হাংরিদের নোঙরামিও জনবিক্ষোভের আর একটি কারণ। সেটা মলয়ও স্বীকার করেছেন: 'জীবনের এরকম ক্ষমাহীন সন্ধিক্ষণে হারিয়ে যান চসার ও স্পেংলার। ক্ষিপ্র অবজ্ঞায়, আন্দোলনের নাম হয়ে যায় HG যা আমরা তখন ভেবে দেখার চেষ্টা করিনি। খালাসিটোলায় সারিবদ্ধ বেঞ্চে বসার চেয়ে গ্রামগঞ্জের আফিম-চরস গাঁজার আড্ডা, দীঘা-জুন-পুটের মাঝরাতের উলঙ্গ হুল্লোড়, বেনারস-কাঠমাণ্ডুর হিপি-হিপিনিদের সঙ্গে জটপাকানো চুলে স্নানশৌচ বর্জিত উদ্দাম উল্লাস, হাড় কাটা গলির বিছানায় দাঁড়িয়ে কবিতা পাঠ, গ্রন্থ কেটে তার মধ্যে লুকিয়ে আমদানি-করা মারিহুয়ানা-এল এস ডি-কোকেন, ভাঙ-বনের বাগানে দড়ির খাটের রাত্রি, পূর্ণিমায় গঙ্গাবক্ষে দিগম্বর নৌকোয়—পৃথিবী সম্পূর্ণ স্বাধীন নিজস্ব আর নিয়মহীন হয়ে যায়। হাংরি আন্দোলনকে এরপর থেকে বিদেশে বা বীট-প্রভাবিত, তৃতীয় শ্রেণীর আমেরিকান সাহিত্য, বাংরেজি, বিটলে এই সব বলা হতে থাকে।' (২৪)

জনৈক প্রাবন্ধিক 'কৌরব' পত্রিকা মারফৎ দাবি করেছিলেন যে ভারতীয় অর্থনীতির সঙ্গে সাহিত্যের গাঁটছড়া বাঁধবার চেষ্টায় 'বাংলা সাহিত্যে একটা হুল্লোড়' পড়ে যায়। তেমন কিছু সত্যিই ঘটেছিল কিনা সেটা বোঝবার জন্যে আমি তেষট্টি সালে লেখা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের একটি রচনা থেকে যৎ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দিচ্ছি: 'পাটনা থেকে মলয় রায়চৌধুরী নামক এক অজ্ঞাত যুবক এর নেতৃত্ব কিছুদিন করেন। কিন্তু হাংরি জেনারেশন এমন এক জিনিস যে কারো হাতেই নেতৃত্ব বেশিদিন থাকে না। প্রায় ২০টি বুলেটিন বা ম্যানিফেস্টো মোটামুটি শক্তি বা মলয়ের নির্দেশে বেরোয়, বেশির ভাগ ইংরেজিতে লেখা, তারপর এখন খুবই মজার ব্যাপার হচ্ছে। কিছুদিন আগে একটা পোস্টার কলকাতার পাবলিক ল্যাভাটরিগুলিতে টাঙানো দেখা গেল: THE HUNGRY GEN-

ERATION offers a Rs. 100,00,00,000 poem to the Saint who would bring Mao Tse Tung. স্পেশাল পুরস্কারের কথাও ছিল। কদিন আগে আমি পোস্টে একটা ভগবানের মুখোশ পেলুম, তার ওপর বড় বড় হরফে ছাপা : দয়া করে মুখোশ খুলে ফেলুন —হাংরি জেনারেশন। শুনলুম শ্বাপদ শয়তান ঈশ্বর কাকাতুয়া পুলিশ ভাঁড় শুয়ার শেয়াল ইত্যাদি সব রকমের মুখোশ নির্বিচারে পাঠানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী সাহিত্যিক ইউনিভার্সিটির চেয়ার ফিল্মস্টার থেকে সুরু করে টাইম টেবল ঘেঁটে বের করা অজ্ঞাততম রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার অবধি। এরা হাংরি জেনা–রেশনের পোলিটিক্যাল ম্যানিফেস্টোও বের করেছে, যার সুরু existence is prepolitical এই বাক্য দিয়ে।' (২৫)

মজার ব্যাপার আরো ঘটেছিল : জনৈক ব্যক্তি একদিন পিওনের হাত থেকে হলুদমাখা বিয়ের কার্ড বের করে খ, তাতে লেখা : 'ওঁ গঙ্গা। আলো মিত্র (হিন্দু ও রেজিস্ট্রি মতে ত্রিদিব মিত্রের অবিবাহিতা স্ত্রী) হাংরি জেনারেশনের শোকসভা ২৫ বৈশাখ দুপুর বারোটায়॥ মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবরে॥ মানুষের অকাল মৃত্যুতে।' আরেকটি অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড : মলয়ের একটি বইয়ের দাম রাখা হয়েছিল ৫০টি টি,বি, সিল বা ১৪৪৩৫০০ টাকা। একটি পত্রিকার দাম বুর্জোয়া আর পর্ণো–পাঠকদের ক্ষেত্রে দু-রকম ধার্য করা হয়। এইসব নানা অলীক কাণ্ড কারখানা 'হুল্লোড়'ই তো বটে। কিন্তু কি ধরণের হুল্লোড়, তা সহজে অনুমেয়।

অ-হাংরি লেখকদের কাছেও হাংরি জেনারেশন রহস্য বা কৌতুকের নামান্তর। সুনীলের উক্তি আগেই দিয়েছি। পরবর্তিতে মলয়কে লেখা তরুণ সান্যালের একটি চিঠির অংশ : 'আমি দেখলুম যাঁরা আপনাদের সঙ্গে আদৌ সম্পর্কিত নয়, যেমন আমরা —তারা মোটামুটি ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছি। তবে কোনো মনোবৈজ্ঞানিক বা সমাজতাত্ত্বিকের হদিস এক্ষুনি দিতে পারছি না। আপনাদের বহু কার্যকলাপ যা আমি লোকমুখে শুনেছি, তা আমার খুবই অপছন্দ হয়েছে।' (২৬) আবু সয়ীদ আইয়ুব হাংরিদের 'লেখক' হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চাননি। উপরন্তু গিন্সবার্গ যখন তাঁকে হাংরিদের সাহায্য করার জন্য আবেদন জানান তখন আবু সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, এ দেশে লেখার জন্য কেউ পুলিশীপীড়ন ভোগ করে নাকি! প্রয়োজনবোধে তাঁর চিঠির অংশ বিশেষ তুলে দিলুম : 'Malay and his young friends of the H.G. have not produced any worth-while to my knowledge, though they have produced and distributed a lot of selfadver–tising leaflets and Printed letters abusing distinguished writers in filthy and obscene language (I hope you agree that the word 'fuck' is obscene and bastard, filthy at least in the sentence 'Fuck the bastards of the Gangshalik School of poetry' they have used worst language in regard to poets whom they have not hesita-ted to refer to by name). Recently they hired a woman to exhibit her bosom in public and invited a lot of people including myself to witness this wonderful avantgarde exhibition! ...I do not agree with you that it is the prime task of the Indian Committee for cul–tural Freedom to take up the cause of these immature imitators of American Beatnik poetry... (২৭)

॥ এগার ॥

এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে, পূর্বকথিত, আর একটি কাঁসগেরো পাঠকের সামনে তুলে ধরছি। সুত্রটা মলয় ধরিয়ে দিয়েছেন। কেন পঞ্চাশের কবিরা যূথ–বদ্ধ ভাবে ষাট দশকের টুঁটি ধরতে চেয়েছিলেন এবং কেন ষাট নিয়ে এতো অপপ্রচার? হাংরি আন্দো–লনের পাণ্ডাদের মধ্যে শক্তি, সন্দীপন, উৎপল আর সমীর পঞ্চাশের। সারাটা পঞ্চাশদশক জুড়ে যাঁরা আঁকাচিত্তির কাব্য করলেন, ষাটের গোড়ায় এসে হঠাৎ এমন কী ঘটল রাতারাতি তাঁদের লেখার আদলই গেল পাল্টে? আর কেনই বা পঞ্চাশের ওই কবিরা নাস্তানাবুদ করার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন ষাটের কবিদের? ষাটকে ফেটে বেরুতে না দিয়ে নিজেরাই করলেন আত্মপ্রকাশ? মলয়ের এ-ক্ষোভ কাটতে চায় না কিছুতেই: 'বুদ্ধদেব, সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে-র চাউনি ভিক্ষে করাটা যাঁরা সমগ্র পঞ্চাশ দশক জুড়ে কবিতার পৃথিবী বলে মনে করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দলবদ্ধভাবে কেন ঘটে গেল ষাটের গোড়ায় এসে চরিত্রগত বদল? কী চলছিল তখন চতুর্দিকে? 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকায় শিবনারায়ণ রায় আর সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথোপকথনে দেখলুম এ-ব্যাপারটা তাঁরা ধরতে পারেননি। শঙ্খ ঘোষ নানান জায়গায় 'শতভিষা' 'কৃত্তিবাসে'র আলোচনা করেছেন অথচ এ-জিনিসটা চেপে গেছেন। সবচেয়ে টোটকা দিয়ে-ছেন মিহির রায়চৌধুরী। দিল্লীর 'প্রাংশু' পত্রিকায় তিন কিস্তিতে লিখেছেন 'ষাট (?) দশকের কৃত্তিবাস'। দীপংকর রায়ের 'পথের পাঁচালি'তে পবিত্র মুখো–পাধ্যায় আর অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'গোধূলি মনে' অজিত রায় নানা গোলমাল পাকিয়েছেন।' এক উত্তম দাশ (মহাদিগন্তের) ছাড়া এ-ব্যাপারে সব্বাই মলয়ের রোষের কারণ হয়েছেন।

সমীর রায়চৌধুরী সম্ভবত মলয়ের দাদা হিসেবে মলয় বা হাংরি জেনারেশনে ঢুকেছিলেন। বাকি তিনজন সম্পর্কেও বলার থাকে। কেননা 'Sandee-pan Chattopadhyay was also responsible for starting the Hungrylist movement in Bengal, along with Shakti Chattopadhyay the poet and Utpal Basu, a writer now living in London.' (২৮) গোড়ার দিকে হাংরি আন্দোলন বলতে কেবল চারজন: মলয়, দেবী, শক্তি আর সমীর। অর্থাৎ দুজন ষাট, দুজন পঞ্চাশ। তবুও হাংরি জেনারেশন হলো 'ষাট'–এর কাগজ। কেননা শক্তি নিজেকে 'ক্ষুধার্ত' বলে দাবি করেছেন। এটা জোর জবরদস্তি নয় কি? অনেকের মতে, শক্তিকে আন্দোলনে সামিল করাটা মলয়ের ভুল। কিন্তু পাটনায় থেকে, অতি বেগে ঝড় তোলার জন্যে, মলয়ের মনে হয়েছিল, শক্তিই উপযুক্ত। কিন্তু শক্তি কি সত্যিই ক্ষুধার্ত হতে পেরেছিলেন? মলয় জানিয়ে–ছেন, 'শক্তির লেখায় বীট অ্যাংরি ইত্যাদি অভিধার দরুণ পরে হাংরি আন্দোলনকে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়।' তবে কি এটা ধরে নিতে হবে যে হাংরি আন্দোলনকে বিকৃত বা ভেঙে দিতেই শক্তির অনু-প্রবেশ ঘটেছিল??? ১৯৬৩তে এসেছিলেন সন্দী-পন চট্টোপাধ্যায় ও আরো অনেকে, কিন্তু ঐ বছরই তিনি এবং বিনয় মজুমদার আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান। কেননা 'বিভিন্ন বড়মাপের পত্রিকা থেকে তাঁদের ওপর চাপ আসতে আরম্ভ হয়েছিল।' সন্দীপন তখন একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—'জেব্রা বের করার চেষ্টা করো। শক্তিকে বাদ দিয়ে করলে ঠিকই বেরিয়ে যাবে। কৃত্তিবাস আমার ধোপা–নাপিত বন্ধ করতে চাইছে।' (২৯) এরপর পঞ্চাশের দশকের উৎপল বসু শুধু হাংরি আন্দোলনে ছিলেন। কিন্তু 'অশ্লীলতার অভিযোগে কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রথমেই

তাঁকে ছ'মাসের জন্যে সাসপেণ্ড করেন। ফলে মাইনে হয়ে গেল অর্ধেক।...শেষবার সুযোগ দেওয়ার জন্যে একটি টাইপ করা কাগজে তাঁকে সই করে দিতে বলা হয়, যাতে লেখা ছিল—ভবিষ্যতে এই ধরণের রুচি বহির্ভূত লেখা আর লিখবো না। উৎপলদা সেই কাগজে সই করতে রাজি হননি...' (৩০) এর পর ১৯৬৪র মাঝামাঝি তাঁকে বরখাস্ত করা হয়।

এক সাক্ষাৎকারে সুবিমল বসাক একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন নামের, যাঁদের দ্বারা তিনি কলেজ স্ট্রীট মোহল্লায় হাংরি কালি কাগজ বিলির দায়ে প্রহৃত হন। (৩১) 'উত্তরসূরী' সম্পাদক প্রয়াত অরুণ ভট্টাচার্য লিখিত হুমকি দিয়েছিলেন যেন ভবিষ্যতে ওসব পাঠানো বন্ধ হয়। এই সময়, মলয় দাবি করেছেন, তাঁর কবিতা বিষয়ক বুলেটিন বিশেষ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল—যাকে দাবানোর ভরপুর কোশিশ চলেছিল পঞ্চাশের লবি থেকে।

॥ বার ॥

নটে গাছটি মুড়োবার আগে এবার একটি অনতি-সংক্ষিপ্ত উপসংহার দিচ্ছি। ধানবাদের এক প্রবীণ নকশাল নেতা বললেন: 'হাংরিদের হাতে গুলিভরা বন্দুক ছিল, কিন্তু ওরা ট্রিগা'র হারিয়ে ফেলেছিল। কেন? সেটা তোমায় খুঁজতে হবে।' বড়ো দুরূহ কর্ম। সতীত্বমার্কা নিরীহ আগরবাতি সাহিত্যের বাণিজ্যসফল লেখকদের ওরা লাথি মারতে পেরেছিল। ঝুনঝুন ওয়ালাদের মুখে মুতে দিতে পেরেছিল। শৈলেশ্বর ঘোষ ইস্তেহারে লেখেন—'সমস্ত ভণ্ডামির চেহারা মেলে ধরা, সভ্যতার নোনা পলেস্তরা মুখ থেকে তুলে ফেলা, যা কিছু গড়ে তোলা হয়েছে তাকে সন্দেহ করা হাংরি আন্দোলনের উদ্দেশ্য।' বস্তুতই হাংরিরা যেভাবে দুমাদ্দুম সবকিছু ভেঙে চুরমার করে দেবার সাহস নিয়ে এসেছিল, তা শ্রদ্ধাযোগ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু গলদ থেকেই গিয়েছিল, যা ওরা খেয়াল করেনি। পক্ষান্তরে, অনেক কবির ভাষায়: 'তোমরা যদি মুক্তচক্ষু আত্মজিজ্ঞাসু হতে, তবে নিশ্চয়ই দুনিয়ার তামাম অচলায়তন দুর্গের রুদ্ধ কপাট ভাঙার যথার্থ যোদ্ধা প্রমিক হতে পারতে।' আমি নিজস্ব সমঝদারিতে গলদগুলো খুঁড়ে বের করবার চেষ্টা করছি।

যে কোনো আন্দোলনের পর্যালোচনায় তার আবির্ভাব কালটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'ষাটের দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রায় একই সময়ে শহুরে তরুণ-তরুণীদের ভিতরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা যায়—তাঁদের আপন আপন দেশের রাষ্ট্র, সমাজ, প্রচলিত ধর্ম ও নীতিনিয়ম, আর্থিক ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ সব কিছুই ঐ তরুণ-তরুণীদের কাছে অসহনীয় এবং সে কারণে বর্জনীয় মনে হয়। প্যারিস, বার্লিন, প্রাগ থেকে বার্কালি, জাকার্তা, কলম্বিয়া, পিকিং—বিভিন্ন শহরে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। এই বিক্ষোভ তৎকালীন সাহিত্যেও প্রকাশ পায়। যা পৃথিবীব্যাপী এক মানসিক অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলা এনে দিয়েছিল। পশ্চিম বাংলাতেও শিক্ষিত তরুণ-তরুণী মহলে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই বিক্ষোভ রূপ নেয় নকশাল আন্দোলনে—বিপ্লবী বুলির অড়ালে ভারতীয় কম্যুনিস্ট নেতাদের সুবিধাবাদী ক্রিয়াকলাপ তাদের কিছুসংখ্যক তরুণ আদর্শবাদী অনুগামীদের মনে যে বিরূপতা জাগিয়ে তুলেছিল নকশাল আন্দোলনের সেটি ছিল একটি উৎস। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ষাটের দশকে কিছু বিক্ষোভ আন্দোলনের আকার খোঁজে। তাদের মধ্যে একটি ছিল হাংরি আন্দোলন।' (৩২)

দেশবিভাগের (স্বাধীনতা কথাটিতে আমারও আপত্তি) আগে সবুজপত্র, কল্লোল, কবিতা, পরিচয়, পূর্বাশা প্রভৃতি কাগজগুলির পেছনে ছিল বাঙালি মানসের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাপূর্ণ এক একটি আন্দোলন। 'এইসব পত্রিকা শুধু নতুন লেখকদের আকৃষ্ট করেনি, বাংলা সাহিত্যে ও চিন্তার ক্ষেত্রে নানারকম পরীক্ষার ও উদ্ভাবনার সম্ভাবনা খুলে দিয়েছিল। এই সব পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল জীর্ণ বাঙালী জীবনে ভাষা ও সাহিত্যকর্মের ভিতর দিয়ে নতুন উদ্দীপনা ও সামর্থের সঞ্চার করা।' কিন্তু দেশবিভাজনের পর, ষাটের টালমাটাল সময়ে হাংরি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখপত্র হাংরি জেনারেশন কোন ভূমিকা পালন করলো? যখন বাংলা সাহিত্যে অবক্ষয়ের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে হাংরি লেখকরা কোন্ ভূমিকা পালন করলেন? যে কোন সৎসাহিত্য নিজের সামাজিক বিশ্বাসকে আশ্রয় করে উদ্বর্তিত হয়। কিন্তু হাংরি লেখকরা তেমন কোনো সামাজিক বিশ্বাসকে তুলে ধরতে পেরেছিলেন কি? পারেননি। হাংরি জেনারেশনের ম্যানিফেস্টোগুলিতে ঘোষণার কমতি ছিল না। ওঁরা চেয়েছিলেন 'সভ্যতার সমস্ত কৃত্রিমতাকে বর্জন করতে, সম্ভব হলে উচ্ছেদ করতে, প্রাণশক্তির স্বাভাবিক উৎক্ষেপের পথে সব বাধাকে সরিয়ে তাকে মুক্তি দিতে। মলয়ের তখন বক্তব্য ছিল: 'কবিতা রচিত হয় অরগ্যাজমের মতো স্বতোস্ফূর্তিতে'; কবি অলোকরঞ্জন একটি চিঠিতে বলেছিলেন যে—'আপনারা যে-বক্তব্য পৌঁছে দিতে চেয়েছেন আমি তার নিহিতার্থ অনুমান করতে পারছি। বুঝতে পারি, অনির্বাচিত মানবস্বভাব আপনাদের উপপাদ্য। কিন্তু এখন পর্যন্ত আপনাদের দলের সকল—আপনার (মলয়ের) দল অবশ্য ভাঙনগড়নের দোটানায় এতই অনিশ্চিত যে ওভাবে নির্ধারণ করতে যাওয়ার অসুবিধে আছে—সদস্যদের কবিতায় আপনাদের প্রতিবাদমুখর নন্দনসংবিত্তের বলিষ্ঠতা এবং দার্শনিক ভঙ্গিটির ছাপ আমি খুঁজে পাইনি।' হাংরিরা তাঁদের ক্ষোভ, আক্রোশ, ব্যর্থতা ও আত্মাভিমানকে উচ্চণ্ডভাবে প্রকাশ করে রফাশ্রয়ী ভণ্ড, জীর্ণ, বাঙালি বাবুসমাজকে উচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন। পেরেছিলেন কি? পারেননি। এর জন্য অবশ্যি তাঁরা তুচ্ছ নন, চাওয়া ও পারার মধ্যে ফাঁক থেকে যেতেই পারে।

হাংরির পাশাপাশি খুব যে সৎ সাহিত্যের ছড়াছড়ি ছিল তা বলছি না। কিন্তু তবুও, তখনও অবধি যে স্থৈর্য স্থিতিবোধ বিশ্বাসের বলয়ে জীবনকে সংবৃত রেখেছিল, চতুষ্পার্শ্বস্থ মসৃণ জীবনযাত্রার জীবনমোহের একটা স্থির অবিকল্পিত উপলব্ধি লেখকদের মনে সদাজাগ্রত ছিল, তাকে আঘাত করে কোনো সুন্দর জীবনবোধের হাওয়া হাংরিরা ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন কি? পারেননি। একথা মানি যে, সমাজের দীর্ণজীর্ণ চেহারা, রাষ্ট্রব্যবস্থার রুগ্নাবস্থা, অধোগামী সংস্কৃতি, অবক্ষয়মুখী শিল্প সাহিত্য, পুঞ্জীভূত পীড়া-যন্ত্রণা থেকে আরোগ্য বা মুক্তি এনে দেওয়ার দায়িত্ব শুধু লেখকদের নয়, সমাজবিদ বিজ্ঞানী শিল্পী শিক্ষক ইত্যাদিরও। কিন্তু লেখকরা সে দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে তাদের ক্ষমা করা যায় না।

নর্দমা প্যান্টলুন ও ছুঁচলো জুতোওলা যেসব দাদাদের সন্ধানে পুলিশ হালে পাড়ায় পাড়ায় টহল দিচ্ছে, কিংবা নিজেদের নকশালপন্থী বলে জাহির করে যারা মাঝরাত্তিরে গেরস্তের বাড়ি তছনছ করছে, সরকারী কোষাগার লুঠ করছে, অথবা যারা সাহিত্যসন্ধ্যায় বিটল্স হিসেবে গলায় মালা পায় অথচ গঙ্গাধারে ছিলিম টানতে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে এক গোত্রে ফেললে হাংরিরা আপত্তি করেন। কেননা এরা বুদ্ধিজীবী। কিন্তু কোন শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী? ইংরেজিতে

ইন্টেলেকচুয়াল আর ইন্টেলিজেনশিয়া শব্দ দুটি ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত। অনেকে ইন্টলেকচুয়ালের প্রতিশব্দ হিসেবে 'বিদ্বজ্জন' 'প্রাজ্ঞ' প্রভৃতি ব্যবহারের পক্ষপাতি। আমার ধারণা ইন্টেলেকশন নামক মনন ক্রিয়াটিতে বুদ্ধিরই প্রাধান্য। বিদ্যাচর্চা যদিও এর আবশ্যিক অঙ্গ, কিন্তু ভিত্তি নয়। প্রজ্ঞা অবশ্যই লভ্য। তবে একজন ইন্টলেকচুয়াল কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্যাভাণ্ট বা সেজ নাও হতে পারেন। (৩১)

আঠারো শতকে ফরাসি বুদ্ধিজীবীরা যেভাবে লেখার মাধ্যমে মোনার্কিজমের বিরুদ্ধে নিপীড়ন ও মৃত্যুকে বরণ করে স্ব-জাতিকে গড়ে তুলেছিলেন, বিশ শতকী হাংরি লেখকরা তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। এঁরা নিজের স্বাধীন চিন্তা প্রকাশে বাধা পেয়ে অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করেছেন, এমন নয়। তথাচ সমাজের দায়িত্ব ভুলে পক্ষান্তরে তাঁরা দেশ ও দশকেই ধোঁকা দিয়েছেন। হাংরিরা ছিলেন ইন্টেলিজেনশিয়া শ্রেণীভুক্ত, কেননা এঁদের কাজ ছিল হাতে নয়, মাথায়। উনিশ শতকে জন্মালে এঁরা বুদ্ধিবাদী বলে আখ্যায়িত হতেন, কিন্তু এখন মার্কসীয় তত্ত্ববোধে এটি অবজ্ঞিত শব্দ। লেনিনের মতাবলম্বীরা বলবেন এঁরা বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী, কারণ বিপ্লব ও প্রগতির প্রতি এঁদের নৈতিক সমর্থন থাকলেও এঁরা প্রাচীন রক্ষণশীল চেতনাকে আঁকড়ে ধরে প্রগতিকেই বানচাল করে দেন। এঁদের মন রয়েছে বুর্জোয়া আর্থনীতিক ধাঁচে। এঁরা কমারসিয়ালইজড হয়ে চলেছেন আবার নিজস্ব লেখকতায় বিশ্বাসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে স্থির মনস্ক। এঁদের কাছে স্বার্থই সব, পরার্থ কিছু নয়। বাংলা সাহিত্যে এরকম মানসিকতার উদয় ইংরেজ, ইংরেজি আর ইংরেজিয়ানায়। ইংরেজি ছাড়া, এঁদের বিচারে, আর কোনো ভাষা শিক্ষাচর্চার মাধ্যম হতে পারে না। এঁরা ইংরেজত্ব আয়ত্ত করে অ-ইংরেজদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গর্ব জাহির করেন। এই স্বার্থবুদ্ধি নিয়েই এঁদের শ্রেষ্ঠ হওয়ার উদগ্র অভীপ্সা। উনিশ-বিশ দুই শতকেরই ভারতীয় ইন্টেলিজেনশিয়া শ্রেণীর কাছে স্বদেশের ঐতিহ্যে প্রবল অনীহা, তাই স্বদেশীর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাই এঁদের লক্ষ্য। দেশীয় শিক্ষা-কৃষ্টি এঁদের কাছে বাতিল। 'শিল্পায়ন তথা রাজনীতিক স্বৈরাচারিতা এঁদেরকে নিয়ন্ত্রিত করে। রাজনীতির আশ্রয়ে এঁরা থাকেন বলে রাজনৈতিক স্বৈরাচারিতায় এঁরা ইন্ধন যোগান, এবং নিজেরাও স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে ওঠেন এবং শিল্পায়নজাত দ্বন্দ্বের অপরাধমূলক দোষগুলি আয়ত্ত করে স্বাধীনতার আকাঙ্খায় এঁরা মুক্ত হয়ে যান।' শুনতে খারাপ হলেও বলবো, কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নয়, ক্ষুদ্র ব্যক্তিচিন্তাই ছিল হাংরি-বুদ্ধিজীবীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। উত্তম দাশের এ-বক্তব্যের সঙ্গে আমি কনসেনশণ্ট করছি যে, 'হাংরি রচনায় ব্যক্তিই সব গল্প কবিতার মূলসূত্র। ব্যক্তিরূপে লেখকই যেন সব জায়গা জুড়ে।' নিজের চিন্তার মধ্যেই ছিল তাঁদের বুদ্ধির উৎকর্ষ। তাঁরা পরাশ্রয়ী, কেননা তাঁরা বস্তুহীন ধর্মকেই প্রথম ও একমাত্র সত্য বলে মনে করেছিলেন। অর্থাৎ বুদ্ধির আসল স্বরূপ যে সত্যানুসন্ধান, তা ওঁদের মধ্যে ছিল না।

প্রসঙ্গত, এখানে বলে নিই যে বুদ্ধি বা ইন্টেলেক্ট কথাটির অর্থব্যাপ্তি সম্বন্ধে ধারণা অনেকাংশে অনেকের থাকলেও ভাষায় তা যথাযথ ও সর্বজনগ্রাহ্য ভাবে প্রকাশ করতে গেলে বিপদ আছে। বহুল প্রচারিত এক অভিধানে যেমন ইন্টেলেক্ট ও ইন্টেলিজেন্স—এ-দুটিকে প্রায় এক করে ফেলা হয়েছে, উপরন্তু ইন্টেলিজেন্সকে বলা হয়েছে 'প্রগাঢ় ইন্টেলেক্ট'। এরকম অসতর্ক অগোছালো ধারণা বহু নামজাদা প্রগতিক দেশেও বিদ্যমান। প্রকৃত প্রস্তাবে

ইণ্টেলেক্ট বা ধীশক্তির স্থান মানুষের সভ্যতা ও সং-স্কৃতির ইতিহাসে অনেক ওপরে। বুদ্ধি বা ইণ্টে-লেক্টের সাধারণীকরণে বস্তুজগৎ বস্তু সম্পর্কে শাশ্বত সত্যকে খুঁজে বের করে তার মাধ্যমে বিচার করা, বিচারের মধ্য দিয়ে সত্যকে জানা, সত্য দেখা -এবং সত্যের আলোকে ভালোমন্দ যাচাই করে চিরন্তন মূল্যবোধকে আয়ত্ত এবং ব্যক্ত করাই তো বুদ্ধির দায়িত্ব। সে দায়িত্ব হাংরিরা পালন করেননি। তাই নির্দ্বিধায় বলবো তাঁরা প্রকৃত অর্থে ইণ্টেলেকচুয়াল নন। বস্তু ও গুণের সমন্বয়ে নিখাদ সত্যের অন্বেষণই ইণ্টেলেকচুয়ালদের ধর্ম।

হাংরিরা কবিতা লিখেছেন কবিতা লেখার জন্যে, কোনো বৃহত্তর উদ্দেশ্যে নয়। ওঁরা যে কলা-কৈবল্যবাদী, তাও নয়। মানুষের ইতিহাস মূলত তার সমাজভিত্তিক অর্থনীতির ক্রমবিকাশ; আর স্থূল বিচারে হাংরিদের রচনা ছিল উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়ার মতো এক জাতীয় আর্থনীতিক বৃত্তি বিশেষ। সমাজমনস্ক লেখকের চিন্তায় থাকে দেশ ও দশের কল্যাণবোধ। কিন্তু হাংরিরা ভেবেছিলেন কিভাবে কোন উপায়ে কী দিয়ে লিখলে লেখাটা আকর্ষণীয়, চটকদার আর দুর্মূল্য হবে। মনে হয় সেই শর্তনিরপেক্ষ গুণগুলি অর্জনে তাঁদের তেমন আগ্রহ ছিল না, যা থাকলে কোনো লেখা সাহিত্য হয়ে ওঠে।

হাংরি জেনারেশন একটা আন্দোলন অবশ্যই ছিল, এবং স্বীকার করছি, প্রতিষ্ঠান-বিরোধী সাহি-ত্যকে মাটির কাছাকাছি নিয়ে যাবার তাগিদে ভারত-বর্ষের বুকে এখনও অবধি এটাই প্রথম এবং একমাত্র আণ্ডারগ্রাউণ্ড ও বৈপ্লবিক মুভমেণ্ট। প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের ঐকান্তিক অভীপ্সায় এর জন্ম। শৈলেশ্বর ঘোষের দাবি ছিল—'আন্দোলন তাকেই বলা যায় যা প্রতিষ্ঠিত চিন্তাভাবনাকে বা তার ধারক প্রতিষ্ঠানকে প্রবলভাবে ধাক্কা দেয়, প্রতিষ্ঠানের অন্তঃসারশূন্যতা ও মিথ্যাচারকে ধরিয়ে দেবার জন্য আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং সে আন্দোলন শক্তিশালী হলে প্রতিষ্ঠানের একাধিপত্য নষ্ট হয়ে যায়।' (৩৪) একথা ঠিক যে প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা হাংরি কর্মসূচীর গোড়ার কথা। 'কলেজ ইউনিভার্সিটির এবং খবরের কাগজের পয়দা করা' সাহিত্যের সঙ্গে এঁদের রচনার পার্থক্য সুমেরু-কুমেরু এবং এরা অমৃত আনন্দবাজারকে গালাগাল করছে এবং শ্রীঘোষের ঘোষণা মোতাবিক এইসব প্রতিষ্ঠান ও তাদের পৃষ্ঠপোষক লেখকদের বিসর্জনের বাজনা বেজে ওঠার কথা। কিন্তু বিরোধটা এসেছিল অন্য দিক থেকে, যার উল্লেখ আগেই করেছি, এখানেও করছি। শুধু বাঙালি বা ভারতবাসী নয়, পৃথিবীর সর্বদেশের মধ্যবিত্তশ্রেণীর মনোভাব চিরকালই বিদ্রোহবিমুখ এবং সংস্কারপন্থী ও আবেগী ফলত হুজুগে চূড়ান্ত রক্ষণশীল। শিল্পে-সাহিত্যে মনোভাব প্রায় জগদ্দল। যে চৌওয়ান্ন অংশ রেনেশাঁস এদেশে ঘটেছিল তাও বঙ্গদেশে। কিন্তু তার ফসল বাংলার ঘরে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথ ক্রস করে জীবনানন্দে আসতেই তো কেটে গেল ৫০ বছর। অতঃপর হাংরির মতো সুপার ন্যু ব্র্যাণ্ড আন্দোলনে সাড়া দেওয়া যে বাঙালীর পক্ষে অসম্ভব এটা ওঁরা ভেবে দেখলেন না, উপরন্তু আঘাত করে বসলেন সেই-সব প্রতিষ্ঠানকে যার সেণ্ট-পারসেণ্ট পাঠক এই বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সুতরাং বিসর্জনের বাজনা বেজে উঠলো হাংরি কবি-লেখকদেরই।

'হুজুগের আন্দোলন-টান্দোলনে আর যাই হোক, সাহিত্য হয় না'—আমার এ-মন্তব্যে অনেকের সায়। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন কথাটা নাকি 'বড়ো বড়ো হরফে ছাপার যোগ্য'। অজিতেশ বাবু লিখেছেন, 'বাংলা সাহিত্যে প্রথা ভেঙে প্রাতিষ্ঠানিক বিরোধিতায় কিছুই হতে চায় না, হাংরি তাই ব্যতি-

ক্রম—কিন্তু খুবই ছোটো মাপের। এমনকি রবীন্দ্র বিরোধিতায় কল্লোলগোষ্ঠী যে সফল ভূমিকা নিতে পেরেছিল, যে 'সৃষ্টিকর্মের নমুনা প্রদর্শন করেছিল, তার সঙ্গে তুলনা করলেও হাংরি আন্দোলনকে অকিঞ্চিৎকর বলতে আমরা বাধ্য।' তাপস মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'একদা আলোড়ন সৃষ্টিকারী, বর্তমানে বিচ্ছিন্ন প্রায় বিস্মৃত এই আন্দোলন বাংলা সাহিত্যের কোনো মোড় ফেরাতে পারেনি। বাক-সর্বস্বতা, গোষ্ঠিপ্রিয়তা এবং অন্য কবিদের সম্পর্কে ভুল মূল্যায়ন, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার যুক্তিহীন ঝোঁক—এগুলিই এই আন্দোলনের তথাকথিত দুর্বলতার দিক।' (৩৫)
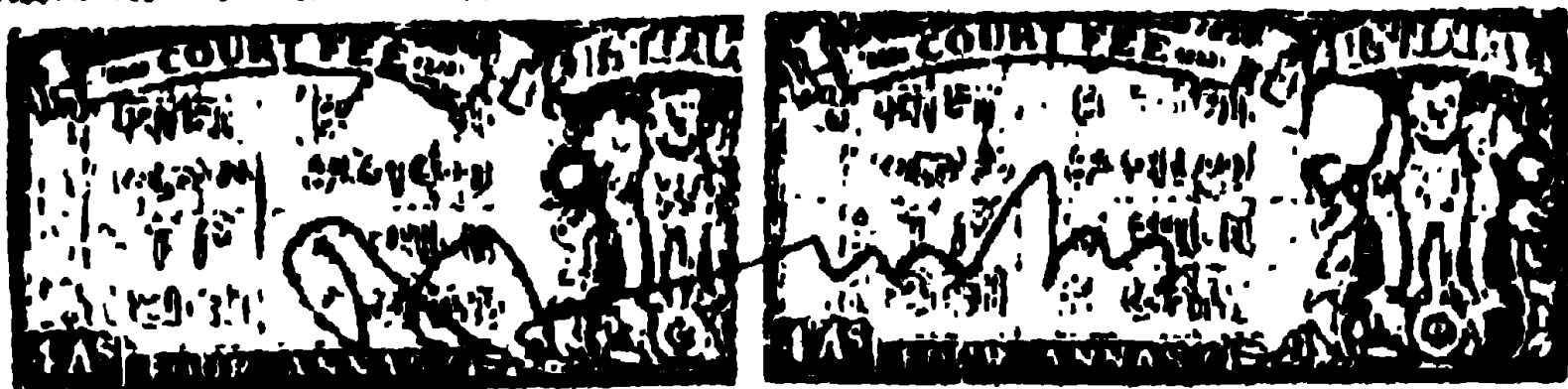
এক বাক্যে, হুজুগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে হাংরি জেনারেশনের অপমৃত্যু। গোষ্ঠীর জন্মলগ্নে যে অস্থির মানসিকতা কাজ করেছিল সেটাও একে ভেঙে ফেলার কারণ। হাংরিদের কারো কারো লেখায় গোড়ার দিকে সততা ছিল, কোন কোন লেখায় মৌলিকতারও আভাস ছিল—কিন্তু, শিবনারায়ণ রায়ের ভাষায়—'যে আত্মপ্রত্যয়, যে ধৈর্য, নিষ্ঠা ও অনুশীলন শুধু ক্ষোভ অথবা স্বতোস্ফূর্তি থেকে আসে না, অথচ যা না থাকলে চিৎকার আপনা থেকেই কিছু তার কবিতা হয়ে ওঠে না, মনে হয় সেই শর্ত নিরপেক্ষ গুণগুলি অর্জনে তাঁদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল না। এ-জন্য হয়তো পশ্চিম বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ দায়ী, অথবা হাংরিদের যুক্তিবিমুখ জীবনাদর্শ, অথবা স্বকামী চরিত্র, অথবা এসবের সমাবেশ।'

কোনো কিছু লেখবার সময় লেখাটা কেমন হচ্ছে বোঝবার জন্যে ওঁরা একজোট হয়ে আলোচনা করতেন না, এটা নির্ধারিত। আমার মতে, সাহিত্য সমাজের উৎপাদন হলেও, সাহিত্যকর্মটি শেষাবধি লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত—এবং এটাই জগতের সবচেয়ে নিঃসঙ্গ কাজ। গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ এ-প্রসঙ্গে উদ্ধরণযোগ্য: 'আপনি যখন কিছু লিখছেন, তখন কেউই আপনাকে কোনো মদত দিতে পারবে না। একেবারেই একা আপনি তখন প্রতিরোধহীন, অসহায়, ঠিক যেন জাহাজডুবির পর সমুদ্রে হাবুডুবু। আর আপনি যদি নিজেকে ঠিকপথে ফিরিয়ে আনবার জন্যে কারো সাহায্য নেন, তো সেটা আপনার বিষম ক্ষতি করে বসবে—কারণ আপনার মনের মধ্যে কী আছে সেটা তো আর কেউই জানে না।' উত্তম দাশ তাঁর নিবন্ধে আট জন হাংরি লেখকের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে তাঁদের বাগভঙ্গি, উচ্চারণ ও শব্দবিন্যাস আলাদা ও স্বতন্ত্র। এটাই স্বাভাবিক। মলয় বলেছেন, 'হাংরি আন্দোলন, যে কোন সাহিত্য আন্দোলনের মতন, সাবভারসিভ ছিল।' অর্থাৎ কোনো বহিঃপ্রভাব ছিল না। উদাহরণত 'দেবী রায়ের কবিতায় অ্যাড্রেনলিন এবং লিমফোসাইটসের যে-ব্যবহার এবং প্রশ্বাসকে উদ্বিগ্ন করার ফলে যে-চেতনা তৈরী হয় তাতে কোনো বিদেশি প্রভাব নেই।' মলয়ের সমীক্ষা: 'সতীনাথের প্লান্টার্স ক্লাব থেকে আণ্টাবাংলা যা আসলে অ্যান্টি-বেংগলি বলে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আমাকে দিয়ে গেছেন ফণীশ্বরনাথ রেণু—যাঁর বাড়িতে সকালে তাড়ি আর রাত্তিরে চরস খেতুম ৬১-৬২ নাগাদ—সেই বোধ, যা লিমফোসাইটস থেকে জন্মায়, তারই পৃষ্ঠপটে আমি পড়ি কলকাতা ও আমি, মানুষ মানুষ, ভ্রূকুটির বিরুদ্ধে একা এবং দেবী রায়ের কবিতা।' শৈলেশ্বর ঘোষের ফ্যাটালিজমকে শঙ্খ ঘোষ তাঁর বেতার সমীক্ষায় প্রতিবাদের সাহিত্য বলেছেন। একটা ছটফটানি টের পাওয়া যায় শৈলেশ্বরের কাব্যে, ছোট্ট বাক্যবন্ধে। অবশ্য মলয়ের তুলনায় বক্তব্য ছড়িয়ে যায় চেতনাধারার আপাত অসঙ্গতিপূর্ণ বিন্যাসে। সুবিমল বসাকের অপিনিহিতের প্রাবল্যে একটা দেওয়াল তৈরি হয়, যার দরুণ বাঙালি পাঠক

সমাজেই তিনি খুব কম পঠিত। এঁর মধ্যেও আছে নিজেকে না-চেনার অপরাধগ্লানি ও তজ্জনিত ছট-ফটানি। ইতিপূর্বের আলোচনায় আমি হাংরিদের নকশালদের সঙ্গে তুলনা করেছিলুম। অজিতেশ ভট্টাচার্য তাঁর চিঠিতে বলেছেন যে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করেন 'আদর্শগত, গুণগত বা মাত্রাগত পর্যায়ে হাংরি আন্দোলন নকশাল আন্দোলনের ধারে কাছে পৌঁছয় না।' একথা আমি মানি। কিন্তু আমি নকশাল ও হাংরি মুভমেণ্টের মধ্যে উৎস ও পদ্ধতিগত কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছি। কবি দেবেশ রায় 'দন্দশূক' পত্রিকায় সুভাষ ঘোষ ও বাসুদেব দাশগুপ্তর লেখা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে রাজনীতির নকশাল-পন্থার সঙ্গে এঁদের দার্শনিক মিল আছে এবং হাংরি আন্দোলন হলো তত্ত্ববিশ্বের ক্ষেত্রে নকশালপন্থার প্রথম ইঙ্গিত। করুণানিধান সম্পর্কে এ-মন্তব্য ধর্তব্য যিনি হাংরি মুভমেণ্টে হতাশ হয়েই হয়েছিলেন নক-

COURT FEE

Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios	Date of delivery of the requisite stamps and folios	Date on which the copy was ready for delivery	Date of making over the copy to the

In the court of the Presidency Magistrate, Calcutta.

9th court, Case No. C.R. 579 of 1965.

State---VS---Malay Roy Choudhury.

u/s 292 I.P.C.

Final order on the order sheet:-

28/12/65.

Accd. present. Judgment passed. Accused, is found guilty of the offence punishable u/s 292 I.P.C. convicted thereunder and sentenced to pay a fine of Rs. 200/- i/d to suffer S.I. for one month.

Sd/- A.K. Mitra.

Presidency Magistrate,

9th court, Calcutta.

'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' লেখার দায়ে মলয়ের ২০০ টাকা জরিমানার কোর্ট আদেশ

শাল। তাঁর রচনায়ও, যেমন সুভাষের গল্পে, কাটা-কাটা বাক্যবন্ধ ধীরে ধীরে এগোয়, এক বক্তব্য থেকে অন্য বক্তব্যে পিছলে—আগের শব্দবন্ধ পাকড়ানোর আগেই যেন. সবে বুঝে ওঠা যাচ্ছে কিন্তু তার পূর্বে এসে যাচ্ছে পরের অংশ। যাঁরা মনে করেন হাংরি গদ্যপদ্য বীট প্রভাবিত, তাঁদের ধারণা শুধরে নিতে অনুরোধ। অ্যালেন ও পিটার ঘাটের প্রত্যূষে চাই-বাসায় সমীরের বাড়ি আর তেষট্টির এপ্রিলে পাটনায় মলয়ের কাছে এসেছিলেন বটে কিন্তু শৈলেশ্বর, প্রদীপ, দেবী, সুবিমল, রামানন্দ, সুভাষ, সুবো, ফাল্গুনী, ত্রিদিব, বাসুদেব, তপন, করুণানিধান প্রমুখের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্রই ছিল না। পবিত্র মুখোপাধ্যায় মলয়ের লেখায় অ্যালেন গিন্সবার্গের যে প্রভাব দেখেছেন (৩৬) মলয়ের মতে 'বীটদের লেখা-লেখি না পড়ার জন্যেই এই অজ্ঞান তুলনা।' হাংরি রচনায় যে বীট রচনার ছাপ নেই তা এক সমীক্ষায় পোর্টল্যাণ্ড স্টেট কলেজের ইংরেজি-অধ্যাপক ডি এস ক্লিন বলেছেন এইভাবে: 'Their originality is in no doubt. Compare imagery. And length of line (as translation, the music can't be heard, but line-length is some indication of its nature.' (৩৭)

১৯৬১ থেকে ১৯৬৫ কেই বলা যায় হাংরি আন্দোলনের অস্তিত্বকাল। ৩ মে ১৯৬৫ চাক ভেঙে যাবার পর জেব্রা, ক্ষুধার্ত, প্রতিদ্বন্দ্বী, স্বকাল, চিহ্ন, জিরাফ, আর্তনাদ নিয়ে আরো কিছুকাল মৌমাছিরা গুণগুণ করছে বটে, কিন্তু মধু আর জমেনি। '১৯৬৪-র প্রথম থেকেই হাংরি আন্দোলনের শরিক কম হয়ে গেলেন। লেখার চেয়ে জীবনযাপনের ঢং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো। বয়স অনুযায়ী অভিজ্ঞতার ওজন বেশি হয়ে পড়ায়, আন্দোলনকারীদের ব্যক্তিগত জীবন এ-সময়ে ভয়াবহ, দুঃসহ, গ্লানিময়, দুঃখজনক, ছন্নছাড়া, রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ল।' এটাই স্বাভাবিক, কেননা এসব হাংরিদের সন্তানসন্ধান নয়, গোষ্ঠিকেন্দ্রিকতা, গোষ্ঠিপ্রিয়তা ও হুজুগের অবশ্যম্ভাবি ফল। প্রথম ধাক্কাতেই বিদ্রোহীদের হার মানা—গ্লানিকর হলেও—ছিল স্বাভাবিক।

মলয় বলেছিলেন: 'শিল্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবিতাসৃষ্টির প্রথম শর্ত।' কিন্তু শিবনারায়ণ বাবুর মতো, আমি মনে করি—শিল্পকৃতির জন্য প্রচলিত বা সাহিত্যের অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাষাই যথেষ্ট নয়, তার উপযোগিতা আছে কিনা এবং থাকলে লেখকের কর্তব্য কী, সেটা স্থির করেই বিদ্রোহ রচনা করা দরকার। হাংরিরা সেটা করেননি। শিল্পকৃতির জন্য বিদ্রোহ বা আন্দোলন জরুরী নয়; শিল্পী বা সৃজনশীল ভাবুক মাত্রেই নির্জনে নিরালায় সাধনার পক্ষপাতি। কিন্তু কোনো আন্দোলন—শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে হোক, আর জীবনের অন্য বিন্যাসেই হোক—সমাজে বা সাহিত্যে প্রভাব ফেলতে পারে না, যতক্ষণ না সেই আন্দোলনের অংশভাক্ যাঁরা—তাঁরা সৎ, নীতিনিষ্ঠ এবং পরস্পরের কাছে নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হন। সিদ্ধি, গাঁজা, মদ, চরস, এল এস ডি, মারিহুয়ানা হয়তোবা কল্পনাকে উদ্বেলিত করে, কিন্তু যে রসায়ণে অভিজ্ঞতা ও স্বপ্নের উপাদান শিল্পে রূপান্তরিত হয়, মাদক তার অনুঘটক নয়। অতএব শিবনারায়ণ বাবুর ভাষাতেই বলবো—হাংরিদের জন্য বেদনাবোধই প্রত্যাশিত।

তথ্য-চয়ন :

১) মলয় রায়চৌধুরী: হাংরি আন্দোলন—পিছন ফিরে দেখা। জিজ্ঞাসা, কার্তিক-অগ্রাণ-পৌষ ১৩৯১

২) বুদ্ধদেব বসু : বীটবংশ ও গ্রীনিচ গ্রাম। প্রবন্ধ সংকলন
৩) মলয় রায়চৌধুরী : ইশতাহার সংকলন
৪) উত্তম দাশ : হাংরি জেনারেশন—একটি সমীক্ষা শারদীয় মহাদিগন্ত ১৯৮৪
৫) মলয় রায়চৌধুরী : ইশতাহার সংকলন
৬) বিনয় ঘোষের চিঠি : মহেঞ্জোদারো, কার্তিক চৈত্র ১৩৭১
৭) FIR. 9·55 PM. 2.9.1964 by K K Das, SI, DD
৮) FIR. by S N Paul, SI of Jorabagan Police Station, dtd. 2. 9. 64
৯) Challan Report of enquiry made by the Inspector on Jorabagan, A Choudhury on 3. 5. 1965
১০) মলয় রায়চৌধুরী : জিজ্ঞাসা, প্রাগুক্ত
১১) শক্তি চট্টোপাধ্যায় : কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব। সম্প্রতি, তৃতীয় সং ১৯৬২
১২) Shakti Chattopadhyay : Statement in Jorabagan case No. 360, dtd. 18. 2. 62
১৩) Samir Roy Choudhury : Statement in Jorabagan case No. 360, dtd 17.9.64
১৪) অজিত রায়কে লেখা দেবী রায়ের চিঠি ৭-৭-৮৫
১৫) মলয় রায়চৌধুরী : জার্নাল ২৩। মহাদিগন্ত,
১৬) অজিত রায়কে লেখা দেবী রায়ের চিঠি ৭-৭-৮৫
১৭) Shaileshwar Ghosh : St tement in Jorabagan case No. 36o, dtd. 2.9.64
১৮) Sandeepan Chattopadhyay : Do, dtd. 15.3.65
১৯) Utpal Kumar Basu : Do. dtd. 5.4.65
২০) Subhash Ghosh : Do, dtd 2.9.64
২১) অজিত রায় : ক্ষুধিত প্রজন্মের কবি ও কবিতা। গোধূলি মন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১
২২) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : কৌরব ৩৪
২৩) মলয়কে লেখা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠি : Post mark 10.6.1968
২৪) মলয় রায়চৌধুরী . জিজ্ঞাসা, প্রাগুক্ত
২৫) সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় : এষণা অক্টোবর ১৯৬৩
২৬) মলয়কে লেখা তরুণ সান্যালের চিঠি ১৮-৬-৬৫
২৭) অ্যালেন গিন্সবার্গকে লেখা আবু সয়ীদ আইয়ুবের চিঠি : ৩১-১০-১৯৬৪
২৮) New Writing in India, Ed. Adil Jusswalla, P 308
২৯) আলো মিত্র সম্পাদিত হাংরি জেনারেশন আগ্নেয় চিঠিপত্রের জীবন্ত সংকলন
৩০) মিহির রায়চৌধুরী : প্রাংশু, পূজা সংখ্যা ১৯৮৩
৩১) Dick Bakken & Lee Altman : Hungry Anthology
৩২) শিবনারায়ণ রায় : সম্পাদকীয়/জিজ্ঞাসা, প্রাগুক্ত
৩৩) অজিত রায় : বাঙালি লেখকরা কি বুদ্ধিজীবী ? শারদীয় এবং ১৯৮৪
৩৪) তাপস মুখোপাধ্যায়কে লেখা শৈলেশ্বর ঘোষের চিঠি
৩৫) তাপস মুখোপাধ্যায় : অ্যালেন গিন্সবার্গ, বীট কবিতা ও হাংরিগোষ্ঠী। শারদীয় আন্তরিক ১৯৮২
৩৬) পবিত্র মুখোপাধ্যায় : পথের পাঁচালি, হাংরি সংখ্যা
৩৭) D S Klein : Salted Feathers

কবিতা
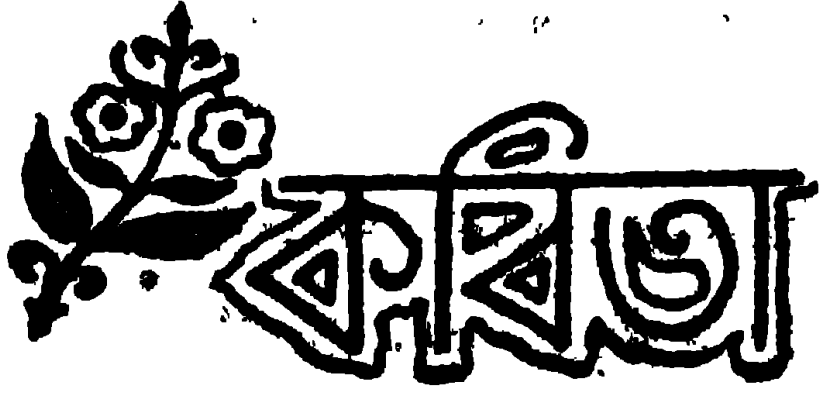
ছত্রিশ রাগিনী ৯/বিরাম মুখোপাধ্যায়

সূচনাপর্বের সাক্ষী সায়াহ্নের বন্ধু ময়দান
সাত রঙ চিরে-চিরে ইন্দ্রধনু মেঘের আড়ালে
স্বপ্নময় বতিচেল্লি-চিত্রমালা রেখার মিছিলে
ফিকে ঘাসফড়িঙের ভাঙা ডানা অস্থির উদ্বায়ু,
হাসি হাসি দাঁতের উচ্ছিষ্ট ছেঁড়া বাদামী বিকেল
থম্‌কে থাকেনি. কালবৈশাখীর ঝড়ে উড়ে গেছে
কিলো-কিলো মোমফালি-খোসা আড়ি পেতে উঁকি মেরে
চাক্ষুষ করেছে ব্যক্ত পূর্বরাগ খুচরো ভণিতা।

দেওয়া-নেওয়া মন তরঙ্গের ভেড়ি-বাঁধ ভেঙে
সমুদ্র খাঁড়িতে মেশে টান-টান শিরা-উপশিরা
রাগাঙ্গ সংগীত দাদরা-তালের বিমূর্ত মূর্ছনা—
ছাতা-পড়া সামাজিক দেওয়ালের নিকুচি করেছে
চন্দন-চাষের মোহ শেষ মেষ বৈষ্ণব সান্ত্বনা ;
বৃন্দাবনী-সারঙের সুর নিংড়ে নয়া-দোঁহাবলী
আমরাই আমিষ ইচ্ছার তৃপ্তি অমলে নির্মলে
কঠিনের মোকাবিলা, জিতে নিই চিৎবিত্ত খেলা।

পরিস্রুত কেকোবীন-ভিটামিনে কেমন আস্বাদ
জিভের অভ্যস্ত লোভ বদলেই সুধার সন্ধান—
কী-আহারে ক্যাক্‌টাস তপ্তবালু মরুর আবহে
বাহারের রক্তকুঁড়ি ফোটানোর দায়বদ্ধ দাবি
মিটিয়েছে অনুবৃন্তে, মৃত্তিকার গভীর শিকড়
সূর্যস্পর্শে প্রবালের প্রতিদ্বন্দ্বী পলাশ-যৌবন॥

অংশীদার/রণজিৎকুমার সেন

যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী : আমরা কি তাদের নির্বাসিত করবো ?
যারা স্বৈরাচারী : আমরা কি তাদের ঘৃণা করে দূরে রাখবো ?
যারা আঞ্চলিকতাবাদী, সাম্প্রদায়িক :
আমরা কি তাদের মূঢ়তাকে শুধু ধিক্কার দেবো ?
যারা সমাজবিরোধী, দাঙ্গাবাজ :
আমরা কি তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করবো ?
যারা ঘাতক, হন্তাকারী : আমরা কি তাদের বন্দী করে দণ্ড দেবো ?
—না।
তাদের সবাইকে নিয়ে আমরা একটা নতুন সমাজ গড়বো।
তাদের প্রত্যেকেরই কিছু বক্তব্য আছে, অভিযোগ আছে,
তাদের প্রত্যেকেরই একটা সুস্থ জীবন নিয়ে বাঁচার স্পৃহা আছে,
সেই স্পৃহার পৃষ্ঠপটে
তাদের বক্তব্যগুলো গেঁথে গেঁথে
আমরা এক নতুন বেদান্ত রচনা করবো;
তার সূত্রগুলোই হবে নতুন করে বাঁচবার মন্ত্র,
সেই এক একটি মন্ত্র এক একটি বুলেটের মতো গিয়ে ছিটকে পড়বে
কায়েমী স্বার্থান্ধ অচলায়তন সমাজের বুকে।
যারা উচ্চকোটি বংশোদ্ভব, যারা মধ্যসত্ত্বভোগী,
যাদের প্রাসাদের ভিৎ গড়ে ওঠে ঘুষে আর কালো টাকায়,
যারা ক্ষমতায় ব'সে অক্ষমকে করে প্রতারণা,
তারা যেদিন নিম্নভূমিতে নেমে এসে হাত প্রসারিত করে দাঁড়াবে,
বলবে : 'এস আলিঙ্গন করি,
মানবিক শিক্ষার আমাদের কোথায় বুঝি
একটা মস্ত ফাঁক থেকে গিয়েছিল,
তোমাদের মন্ত্রের গুলিটা এসে বিঁধে গেল সেইখানেই;
এখন আর সংশয় নেই,
এস, এবারে সবাই, আমরা এক মঞ্চের কুশীলব হয়ে দাঁড়াই,
এখানে সবাই আমরা একই নাটকের অংশীদার।'

মিছিলে মুখ/বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার লণ্ঠনের আলো
ধীরে ধীরে ক্রমে আসে,
শেষ হোয়ে আসে
ভরে দেয়া তেলটুকু।
মানুষের মুখ খোঁজা এখনো
হয়নি শেষ,
এখনো চলেছি আমি কেবলই চলেছি
ভুসো পড়া ক্লান্ত দৃষ্টি নিয়ে
সেই মুখখানি খুঁজে খুঁজে।

নিভে যাবে,
নেভার নিয়মে আলো অবশ্যই
নিভে যাবে
আরো কিছু পরে।
আবার নিশ্চিত কেউ জ্বালবে আলো
আবার চলবে কেউ আমার মতো
আলো হাতে, মুখ খুঁজে খুঁজে।

নচেৎ, না দেখা অন্ধকারে
সব মুখ এক হোয়ে
সেই মুখখানি কোথায় হারিয়ে যাবে
মুখের মিছিলে।

পাশপোর্ট/কৃষ্ণ ধর

নীলমলাটের সুদৃশ্য পাশপোর্টে নাম লেখা
তাতে আছে খুঁটিনাটি সব খবর, প্রয়োজনীয় জীবনপঞ্জি
হাল সাকিন, কোথায় কবে জন্ম, চেনা যায় এমন চিহ্ন
চোখের রঙ কালো, না নীল ? দ্রাবিড়, না ককেশীয় ? না আদিবাসী ?
সব রকম প্রশ্নের সঠিক উত্তর।
শুধু লেখা নেই তাঁর আসল পরিচয়
লেখা নেই তিনি সূর্যোদয়ের জন্য
আজীবন জেগে আছেন
কখনো কখনো নিশীথের নিঃসঙ্গতা অভিভূত করে তাঁকে

লেখা নেই কতদিন মানুষের পাশে পাশে
দীর্ঘ মিছিলে হেঁটেছেন তিনি
লেখা নেই হৃদয়ের ভিতরে তাঁর সুগভীর বেদনার ক্ষত
পাশপোর্টে আপাতত তিনি একজন সুনাগরিক
লেখা নেই একদিন এই সব সুদৃশ্য পোস্টার
টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারে মানুষ তাঁরই কথায়
তাঁদের জমাট অশ্রু একদিন গলে গিয়ে
স্রোত হয়ে যেতে পারে তাঁর মুখ চেয়ে

আপাতত নীলমলাটের পাশপোর্ট হাতে নিয়ে
ট্র্যানজিট লাউঞ্জ তিনি পার হয়ে যান একা একা
এক মহাদেশের সমাচার নিয়ে অন্য মহাদেশে
মানুষের জন্য তিনি অবিচল মমতায় লিখে যান
একালের রক্তঝরা কথা

তাঁর বুক পকেটে গোঁজা আছে শুধু একটি কলম

নীলমলাটের পাশপোর্টে এসব কিছু লেখা নেই।

একদিন এবং আজ/
ভাস্বতী চক্রবর্তী

নিজের ঘরেই আজ পরবাস।
জানলার ফ্রেমে আঁটা ছোট্ট আকাশ
ওড়নায় মুখ ঢেকে
ধীরে ধীরে নেমে আসে রাত,
আলোহীন অন্ধকারে বিরাম বিহীন
কাটে
কতদিন, কত ক—ত রাত।
একদিন আশা ছিলো, প্রেম ছিলো
আলো ছিল, আর ছিল বিরাট
আকাশ,
চন্দন সৌরভ ছিলো. পাখির
কাকলী ছিলো
ছিলো কতো দখিনা বাতাস।

আলোহীন ভাঙা ঘরে
আজ শুধু দিন গোনা
দিন ক্রমে বেড়ে হয় রাত।

ভাঙা-গড়া/অশোক চট্টোপাধ্যায়

একটা সাগর দিও
আর দিও কিছু ছোট ঢেউ
আশেপাশে নেই কেউ
শুধু বালিয়াড়ি আর
প্রান্তে তার ঘন ঝাউবন।

মাছের কঙ্কাল কিছু
ভাঙাচোরা ঝিনুকের টুকরো
টাক্‌রা
এখানে-ওখানে যদি
ছড়ানো থাকেতো, তাই থাকনা।

ঢেউয়ের মাথার প'রে
উড়ু উড়ু কিছু গাঙ চিল
গাঙচিল নাকি ওরা সিন্ধু সারস?
আমি শুধু ঢেউদের ভাঙাগড় দেখি
অবিরাম ভাঙা আর গড়া।
এভাবে শব্দকে নিয়ে
সারাদিন ধরে আমরাও
ভাঙা-গড়া খেলি।
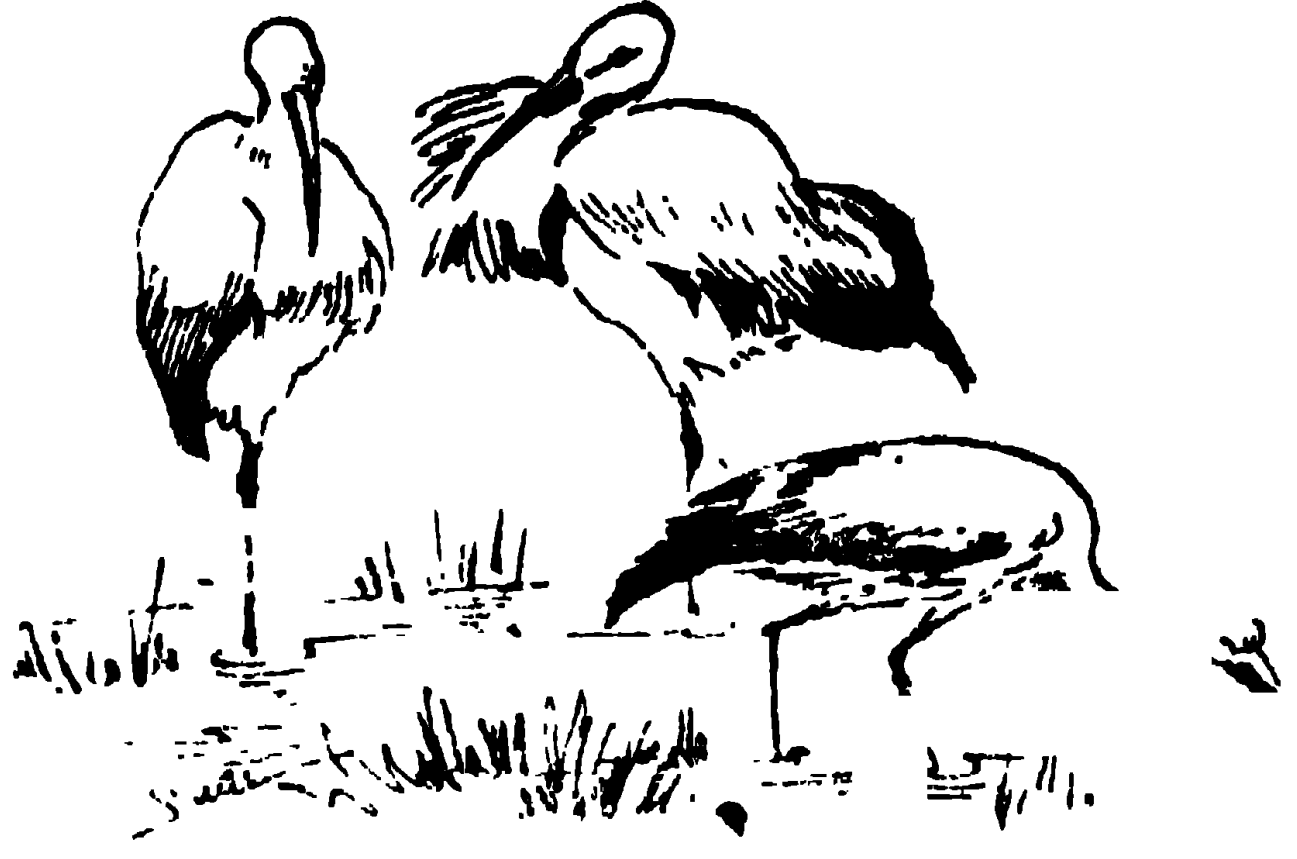
চিন্তামণি কর/গৌরাঙ্গ ভৌমিক

একটা খোশমেজাজী খঞ্জনা পাখি লাফাচ্ছিল ঝাঁপাচ্ছিল সেদিন
গাছের ছায়ায়, ভেতরের ঘরে য়ুরোপীয় ধ্রুপদী গানের সুর,
আমরা ড্রয়িংরুমে।

তিনি বললেন, 'বছর পাঁচেক আগে যদি আসতেন, তো,
এটাকে ড্রয়িংরুমই মনে হত না আপনার, এটা ছিল খোলা-বারান্দা
বছর পাঁচেক পরে যদি আসেন, তো, দেখবেন ড্রয়িংরুমটা
গোলাকার ডিমের মতো একটা শোবার ঘর হয়ে গেছে।'

তারপর, একটা মূর্তির দিকে তাকিয়ে তিনি স্বগতোক্তি করলেন,
'এই যে এই মূর্তিটা দেখছেন, বছর কুড়ি আগে এটা ছিল
মেহগনি কাঠের একটা টুকরো। প্রথমে হল মনোলিথ,
পরে ফ্লাই-ফিগার। অবশেষে, মিথুন মূর্তি। এটাই স্থায়ী।

সেদিন ছিল তাঁর জন্মদিন। নরেন্দ্রপুরে আকাশের নীলিমায়
একটা চিল ডানা ভাসিয়ে উড়ছিল। চিন্তামণি কর
তাঁর সত্তর বছর বয়সের সীমান্ত ডিঙোচ্ছিলেন।

তুতেনখামেনের পঞ্চম গান/মঞ্জুভাষ মিত্র

টেরেসে নামে ফুলের দিন এপ্রিলের প্রথম পদপাত
কান পাতলে শোনা যায় নিদ্রামগ্ন অপিচ মধ্যরাত
প্রেতগ্রস্ত ভুবন-শহর চাঁদের কপিশ চোখের নীচে
অসম্বদ্ধ মদ্যপানের ভিতর যেন প্রতারিত নারী
তবু সে যেন ভোরে জাগে যেহেতু সে বহুজনের
প্রিয়া

তার শরীরের খাঁজে খাঁজে এখন বিগোনিয়া
গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফোটালো বুক খুঁটেছে কোমল
পারাবত

স্তনচূড়ার স্বর্ণশস্য তবুও যাক বিলম্বিত ঝরে
নীল বাতাস শীত সূর্য ব্যারোমিটার দশ ডিগ্রী ছুঁয়ে
করোটিতে প্রেতস্বপ্ন স্মৃতিদুর্গে নিহিত হাতছানি
ভোরবেলা জেগে উঠে ও পথ দিয়ে যাব আমি
বরফছোঁয়া পাহাড় চূড়ার দিকে চেয়ে রাত জেগেছি
আমি সদ্যমৃতা নারীর অস্থিমাংস নখে খুঁটেছি
তার উরুর গোপন খাঁজে ফুলের দিন পশুভীতি
নামো ঝর্ণা কলঙ্কিনী ভালোবাসা দুঃখ প্রীতি
গ্রীষ্মরাতের কালো চিতা অলস শব্দবিহীন পায়ে
দেখ নামে, সুদূর নীল ভুবন জুড়ে বুলায় থাবা
তার কাছে সমাগত সূর্যস্রোতের হরিণীরা
নীরবে তারা কাতার দিয়ে অব্যক্তকে দেহদান করে
এই নিরালায় মৃত্যু আবেগ ; দুঃখ, নীল বরফ গলে
ওপারবতী নারীসত্তা তুমি আত্মদান করেছ
শরীরবিহীন ভ্রমণকারীর বহুল ভয়ালতার কাছে

তোমার ত্বকে ফুলের দিন মুখের ভিতর মৃত্যুস্বাদ
তরল মদে আজ সন্ধ্যায় আমার প্রতিবিম্ব পড়ে
ভালোবাসার তীর ছুঁড়েছি নীলভুবনের হরিণীকে
সপ্তসিংহ পেল তাকে পেল সান্দ্র পাহাড়চূড়া
তাকে পেল নক্ষত্রেরা তার মাংসের উষ্ণ পথে
যে যায় সে যায় চঙ্‌ক্রমনে সন্ধ্যাসকাল ফিরবে
না আর

ডানা মুড়ে করুণ কাতর নামো মৃতের হাহাকার
নামো রাত্রি ফুলের যাত্রী তবুও আমি তৃষ্ণাকাতর
গ্রীষ্মনারীর যোনিশিকড় রক্তপাথর মুখে ছুঁয়েছি
পরিণাম জেনেও আমি পাহাড় চূড়ায় ঘর বেঁধেছি
তুষারে গড়া গাজরনাক চতুর্মুখ হে ঈশ্বর
কবিতার বহু অর্থ ছুঁয়ে আমার অভিযাত্রা
এই এবারের মতন তুমি ক্ষমা করো দেখাও তাকে
ধূসল রাত্রি মৃত্যুফুল মৃতের ঠাণ্ডা অস্থিমাংস
কবরখানায় ছায়াঘোড়া শূণ্যরাত্রি গ্ল্যাডিওলাস
এমন দিনে দৃষ্টি আমার স্পর্শ করো বসন্ত, ঘাম··
এমন দিনে দৃষ্টি আমার বিদ্ধ করো রক্তপাতাল
আমি মাতাল ঘন নিবিড় নারীর মদ্য পান করেছি
তোমার প্রতিবিম্ব পড়ে হে গণিকা হে শহর
আমার কালো চোখের জলে ; শীতগর্ভা হে শহর
আকাশ থেকে নগ্ন তোমার আর্তনাদ নামে, ঝরে
আমার গোপন ভুবন তোমার রতিবিলাস পূর্ণ
করে

নির্জন রাখাল/অরুণকুমার চক্রবর্তী

সেদিন কতো কতোকালের বৃষ্টি ঝরেছিল বনঝাউয়ের বনে ;

সামনে সাগর, একটানা সাগরের গান, মাতালপাগল
হাওয়ায় হাওয়ায়, ঢেউয়ের মাথার থেকে উড়েছিল সিন্ধু-ঈগল

আশ্চর্য ঝাউয়ের বিস্তার ছিল কপালকুণ্ডলা থেকে
চন্দনেশ্বর পর্যান্ত; ছায়াবন্দী মিষ্টি জলের দীঘি,
এঁটেলকাদার চাতাল মাড়িয়ে সাগরের জল
ছুঁয়ে আসা, ছায়ায় ছায়ায় সারাদিন অলসযাপন,
নরম বালিতে শুয়ে সারাদিন সারাদিন মগ্নশিথিলতা
মরামাছের গন্ধে, ঝাউয়ের গন্ধে, সাগরের গন্ধে তার সারাটা দিন
করতলে টলটলে তরল জীবন নিয়ে তার যুদ্ধ
ঢেউয়ের সঙ্গে, নোনাজলের সঙ্গে, হাওয়ার সঙ্গে সারাটাদিন
মাছশিকারের গল্প, বাতাসের তুমুল কাঁপনে
ঝাউয়ের পাতায় পাতায় লক্ষ রমণীর শিৎকার তাড়িত হোয়ে
তারই সারাটাদিন মগ্ন অনুধ্যান, সঙ্গময় নৈঃসঙ্গের গান
আক্রান্ত করেছিল কোনো এক রমণীর হৃদয় .....

তারই খবর সে চেয়েছিল, রক্তের শেকড় থেকে, মন্থন
আর দহনের বুক থেকে, ঈশ্বরের অভয়মুদ্রার থেকে
তার এই চাওয়ার প্রতিমা বুঝি আজই মুখ তুলে প্রথম চেয়েছে

মনে হোলো, এই নারী বুঝি তার পরমা ভুবন, দ্বিতীয় প্রকৃতি ;
এই তার প্রধান আশ্রয়, মানসসঙ্গিনী
যার কাছে ধ্বংস হওয়া যায়, কর্ষণপ্রসূত শস্যে
নিশ্চিত জীবন জেনে মগ্ন হওয়া যায়, লগ্ন হওয়া যায়
নিঃস্ব হওয়া যায় সূর্যের মতোন, গাছের মতোন
কিংবা নদীর..... , নিজেকে পড়ে নেয়া যায় তারই আলোতে

তখন বাড়ালো হাত, হাতের মুঠোয় হাত ক্রমশ অস্থির
দুইজনে দাঁড়ালো এখানে............একদিন ;
সামনে সাগর, অবিরাম সাগরের গান, সুনীলনিখিল,
পাগল মাতাল হাওয়ায় হাওয়ায়, জলের চাতাল থেকে
ঢেউয়ের মাথার থেকে উড়ে যায় সিন্ধু-ঈগল
সাগর সম্মতি দেয়, সাক্ষী থাকে দীর্ঘ ঝাউবন
সাক্ষী সব নির্জন পালক, মাছ, চাঁদের হৃদয়,
বালিয়াড়ী মগ্ন ব্রাহ্মণ, অনন্ত ঢেউয়ের মন্ত্র
দুটি হাত বেঁধে দেয় নির্জনমালায়;
আগুনেরও আয়োজন থাকে, খটির ভেতর থেকে ঠিকরে পড়া

লাল্চে আগুন, রূপোলী মাছেরকুল
অমল হাসির গল্পে মেতে ওঠে, ভেসে যায় চাঁদ-ধোয়া জলে...

অনন্ত ঢেউয়ের উলুউলু ধ্বনির কাঁপন সাগরচাতালে
অনন্ত ঝাউয়ের বনে বেজে ওঠে শাঁখ ও সানাই
মেঘের মঙ্গলকলসগুলি উপুড় করে সারাদিন, সারাদিন
বৃষ্টির সেতারে বাজে বসন্তবাহার, সোনালী রূপোলী
মেঘের বরণডালা হাতে সুতীব্র আলোর রেখায় রেখায়
আকাশের উজ্জ্বল ঘোষণা : তুমি কবি, নির্জন রাখাল,
এই নাও নারী, একান্ত তোমার, বোধের ভুবন, তাকে চেনো
হৃদয়ে বসাও, শক্তিময়ী অপার প্রেমের মন্ত্রে
মাংসের গভীরে দেখো সৃষ্টির মহারাজনীতি, প্রেম, মহান বিচ্ছেদ

দেহের প্রতিটি পরামাণু দিয়ে জেনে নাও
পদ্মগন্ধ মহাযোনি এক পাতা আছে ভুবনে ভুবনে

গোধূলি আকাশ থেকে উড়ে এলো মুঠো মুঠো রক্তিম আবীর
সমস্ত ঝাউয়ের বাগানে বাগানে সাজানো হোলো
পাতারবাসর, সাগর পাঠিয়ে দিল সবুজ ঝিনুক
মুক্তো, মালা, দক্ষিণ-আবর্ত্ত শঙ্খ;
অনন্ত অপেক্ষার ভার নামাও এবার প্রিয়তম রমণী আমার
মহিয়সী, আধেক হৃদয়খানি পূর্ণ করো তোমার ছোঁয়ায়
এখন সময় হোলো, এখনই তো মেলে দেয়া যায় চার হাত
অসীমের দিকে; সামনে সাগর
দিগন্তরেখার রক্তে দেখে নেওয়া যায় শাশত সূর্যের উদয়
এখনই তো গাওয়ার সময়, আনন্দধারা বহিছে ভুবনে মা;
মাগো. এতো প্রেম সাজালে এখানে এতো রূপ রস গন্ধ
এতো ফুল ; বসন্ত মায়াবী মনোরম আনন্দমন্দিরা
সবই আমাদের জন্যে ? এই আকাশ ঝাউবন
এই সাগর সঙ্গীত এই উদাস প্রান্তর
ধ্যানস্থ ব্রাহ্মণ বালিয়াড়ী এই সব আমাদের জন্যে ।
… … … … … … … … … ..
আমরা আনন্দিত, পূর্ণ……সমবেত, সার্থক সক্ষম……
তবু এতো কালো মেঘ কেন প্রিয়তম রমণীর মুখে
এ মেঘ তো বৃষ্টি দেবেনা কোনোও দিন, কেন, কেন
রক্তাক্ত কপালে কেন গভীর ফাটল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে
রক্তের ঝোরা, এতো রক্ত সারাগায়ে, মনে, হৃদয়ে
এতো রক্তপাত, ওই হাত ফিরে যেতে চায় পাথরের ঘরে ?

এই ফুল, পাখির নির্জন পালক, মৃতমাছের গন্ধ
সাগরসঙ্গীত, চাঁদের অমল গান, মুগ্ধ বালিয়াড়ী
কিছুতেই সহ্য হোলো না তার ! শেকড়ে দাঁড়াতে ভয়, নির্জনতাকে
এতো ভয় পেলো ? মনোজকর্ষণগুলি এতখানি
অসহ্য হোলো তার ? অথবা রমন চায়নি বলে
ফিরে গেল ধর্ষণের পথে ! তবে কি শেখেনি নারী
জীবন শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাস ! জানে না কি
কাদার কৌটোয় ভরে ভেসে যাবে নাভি ও সম্বল ?
তবু গেল, চলে গেল, আমাকে মাড়িয়ে গেল
আমাকে মাড়িয়ে চলে গেল পাথরের ঘরে ।
পবিত্র পায়ের ছাপগুলি আজও নিশ্চিত
বুকে করে ধরে আছে ধ্যানস্থ ব্রাহ্মণ বালিয়াড়ী

বড় অসময়ে চলে গেল
কিছুতেই সময়ে গেল না, রেখে গেল বোধের ভুবন,
শুধু এলো, কাছে এসে বলে গেল, যাকে বলো পরমা রমণী

নির্জন রাখালের কাছে কখনও সে নির্জনে একাকী
আসেনি, আসে না, প্রেমে নয়, দুঃখে নয়,
কীর্তির ভেতরে নয়,
আমাদের সমস্ত অস্তিত্বের শেকড়ের শেষেই
কারুর ইচ্ছে এক ধ্যানস্থ বসে আছে অনন্ত আসনে
সেইখানে পুরুষ পুরুষ নয়, রমণী রমণী নয়
দোঁহে মিলে একাকার পুরুষরমণী;
কবি জানে, জানেই সে মহান কাঙাল
আর জানে অনন্তের বাঁশি হাতে
নির্জন রাখাল… … … … … …

অসৌর অত্যাচার/রবীন সুর
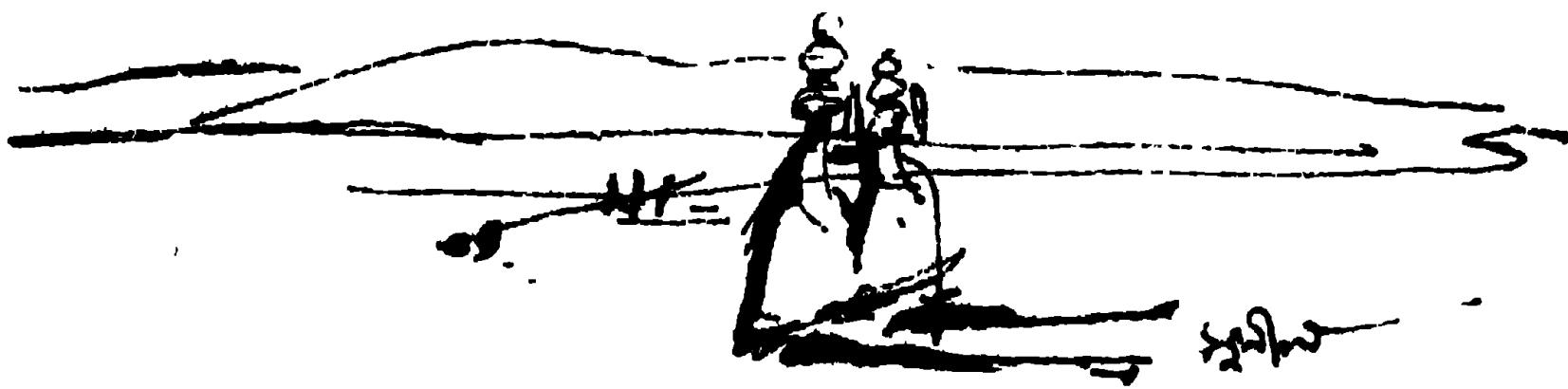
নিয়ত পচনশীল অভিজ্ঞতার নশ্বরতা জেনে নিয়ে
একটি যুবক তার চাতক তৃষ্ণাকে
বারংবার ছড়িয়েছে অবিনাশ জ্যোৎস্নার ভিতর
অথচ যখন
রূপকথার সনাতন চাঁদের মহিমা
দর্পিত অ্যাস্ট্রোনাটের গোড়ালি ঠোক্করে
লক্ষ বছরের সঞ্চিত ধুলোয় ছড়িয়ে যায়।

পাথুরে কংকাল ঘিরে যাদুঘরের ট্যাক্সিডার্মি নিষ্প্রাণ আবহ,
বৃক্ষহীন খরার শাসানি—
এক বিন্দু জল নেই মাটি ও আকাশে ঃ
পিপাসার আর্তজিবে কাঁটা বেঁধে,
অধরা শরীর ছুঁয়ে আলিঙ্গনের আকুতি
দু' বাহুর দশটি আঙুলে,
ক্ষত পুঁজ দূষিত রক্তের গন্ধে সংক্রামক ব্যাধি
আপাদমস্তক পেশীর শাঁস খায়—
চেতনায় ঘুণ ধরে স্নায়ু ছিঁড়ে
হাড়ের মজ্জাকে শুকিয়ে গুঁড়ো করে বাতাসে ছড়ায়।

উচ্ছিষ্ট সংরাগের ফলশ্রুতি
দুরারোগ্য অসোয়াস্তির পরাক্রান্ত দাপট
সব আবিষ্টতা নষ্ট করে দীপ্তিহীন দাহের কপাটে
ভালোবাসা এবং আবহমানের তৃষ্ণা
যুগপৎ অসৌর অত্যাচারের বালুময় উত্তাপে
কেবল খই হয়ে ফুটে পাল্টে যাচ্ছে নীরক্ত অবয়বে।

আকাশ ধরবে ব'লে/অমল দাস

আকাশ কাছেই ভেবে
ছুঁতে গেছে চারখানি হাত
দু'খানি বালক মন
প্রান্তরকালীন কিছু খেলা চেয়েছিল।
আকাশ ধরবে ব'লে
বার বার ছুটে যায়—
মাঠের ছাতিম হয়ে
আকাশকে যেখানেই দেখে
শুধু যে শূন্য ছিল চারপাশ
অবারিত লয়ে
শুধুই লালন ছিল প্রকৃতি
নীল মসলিনে—
বালক বোঝেনি
কিশোর চাঁদের হাট
কেবলই চেয়েছে দূরে
ওইত' আকাশ
ও আকাশ ওখানেই আছে।

দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, প্রেম/বরুণ মজুমদার

দু' একটা ছোটখাটো কথা দিয়ে
অনায়াসে প্রত্যাশা বাড়ানো যেতে পারে।
দু' একটা শব্দ নিয়ে গড়ে ওঠে প্রেম
হৃদয়ে হৃদয় তবু যোগ করা যায়।

অথচ কদাচিৎ বিশ্বাসী মানুষ পাওয়া যায়,
কাছাকাছি প্রতিবেশী বাড়ায় সন্দিগ্ধ হাত।
প্রতিবাদী ভাষা ভুলে প্রতিরোধ গড়ে তোলা বৃথা-
নদীর দর্পণে তবু মুখ দেখে কাটানো সময়।

এক মূর্খ ঘরামীকে অপরের ঘর বাঁধতে দেখে
নিজেকে বিবেকী বলে ভাবা যেতে পারে।
অথচ অনেকে জানি বিবেকের ঘরে
জমা রাখি মনের সে সিন্দুকের চাবি।

এক বর্ষা চলে গেলে শিহরিত প্রাণ
কিছুক্ষণ শান্তি চায়, পরিশুদ্ধ প্রেম।
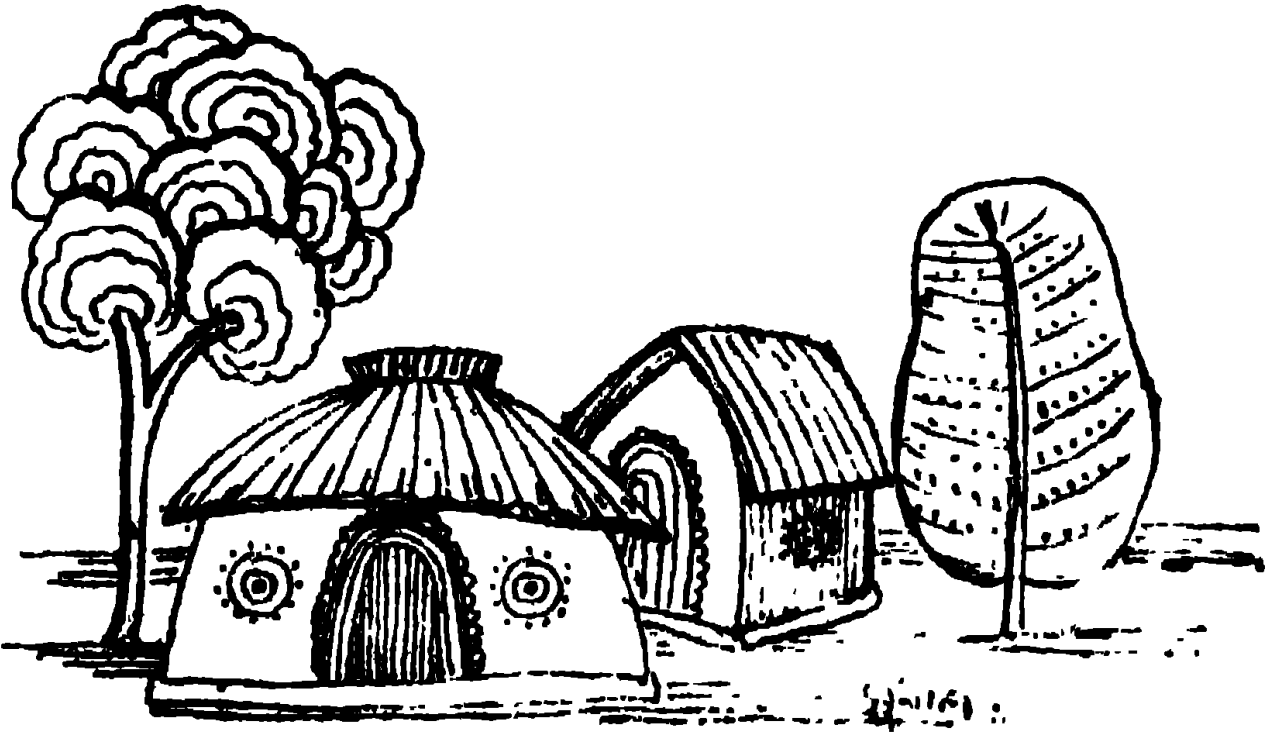
ধর্মাধর্ম/মলয় রায়চৌধুরী

অতোটা খাতির নেই যে
তোমরা কশাবে এই গালে থাপ্পড় আর আমি
টুক করে অন্য গাল তোমাদের হাতে
ছেড়ে দেবো
মেধার জাপানি পাখা আচমকা খুলে
দেখেছি গোখরো সাপ কিভাবে ছোবল মারে
বাতাসে নখাগ্র মেলে বাঘিনী লাফায়
বাঁহাত এগিয়ে আমি পরবর্তী সব আক্রমণ
রুখে নিয়ে চালোবো ডান হাতে ধরা চাকু।

হলুদ বাংলো বাড়ি/দ্বিজেন আচার্য

পাহাড় আড়াল অন্ধকারে বনের ভেতর তারি
জেগে থাকে উদাস হাওয়ায় হলুদ বাংলো বাড়ি
এপার ওপার মেঘের সেতু শালপিয়ালের বন
মাতাল হাওয়ায় উদোম নাচে মহুয়া চন্দন।

কাঁপতে থাকে গাছের ডালে তন্দ্রাহারা পাখি
হঠাৎ এ-কার আর্তনাদ—শার্সি খুলে দেখি :
অন্ধকারে আত্মলীনা নীরব কাঁদে বন
বুকের মধ্যে দীর্ঘ ছায়া আমারি মতন।

নিবিড় হয়ে, নীরব হয়ে নিঝুম হয়ে দেখি
নিঃঝুম বুকে কাঁদতে থাকে রাত্রি ও জোনাকি⋯

তোমাকে এবং তোমাকে/হরপ্রসাদ সাহু

রাত্রির পুকুরের মতো বেদনায় নির্ভাষ সে এখন
তার অন্তর্মুখী স্নায়ু কেঁপে যাচ্ছে বিমূর্ত দহনে
দুচোখ পশ্চিমে ম্লান, দুবাহু আকাশে ইতস্তত
শাখামূল দুলছে বাতাসে—শরীর ভীষণ কাৎ—
আর এই গোধূলিসন্ধ্যায় তুমি
বোধহীন গৃহহীন পাখির মতো শান্তি খুঁজছো এখানে।

স্বপ্নে তার ক্যানসারের বীজ, অস্থি জুড়ে ঘুণপোকা
নিঃশ্বাসে ভয়ার্ত বিতান--
তুমি কী শোননি? স্মৃতিরেখা! এতদিন ছুঁয়েছো আমাকে!
আসলে এ এক অন্ধযুগ, যন্ত্রণায় মানুষ কখনো হারেনি
সমস্ত আকাঙ্খা তার মৃত্যুর পরেও স্বচ্ছ, দুঠোঁটে
আর সেই ভেবে
তার সাথে এখনো লীন হয়ে আছি, এই আমি।

হৃদয় শুদ্ধ রাখো/ঈশিতা ভাদুড়ী

শুদ্ধতার বড়াই কোরো না তুমি
তোমার হৃৎপিণ্ডে নীল মাকড়সা
দেবতা জানেন।

শুদ্ধতার দিব্যি দিয়ে শ্বেতবসন
না-হয় না-ই জড়ালে।
দেহ তো অশুদ্ধ হওয়ার নয়।

হৃদয় শুদ্ধ রাখো।

দীঘা '৮৫/রীণা চট্টোপাধ্যায়

এই ঝাউবন ঘিরে
কারো মন স্বপ্ন-সচেতন
কেউ শুধু ছায়া খোঁজে
কেউবা বালুর বুকে
লিখে রেখে যেতে চায় নাম—
অথচ সে জেনে গেছে
চিরদিন কিছুই থাকেনা।

সাগর শুধুই দেখে,
'দেহি পদবল্লভ মুদারম' বলে
মাঝে মাঝে ছুঁতে চায় ঝাউ
ভেঙে শুধু চুরমার
শুধু ব্যর্থতার কিছু ফেনান্বিত ক্ষোভ
থেকে যায় বালুকা বেলায়॥

খুশীতে-প্রবল খুশীতে/নিভা দে

কাল ছলকে ছলকে উঠেছিল হীরের দ্যুতি
তার অধরে ও ওষ্ঠে—
বহুদিন পরে, কাল স্বাস্থ্যাল রোদ
উঠেছিল, খেলেছিল তার মুখে
প্রচুর উল্লাসে
কাল তার মুখে জ্যোৎস্নার জোয়ার
মেঘের পাহাড়কে ডুবিয়ে দিয়েছিল
ব্যাপক শক্তিতে—
কাল তার দিগন্তলীন ভ্রূ
খুশীতে উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে পাখা
মেলেছিল, ছায়া ফেলেছিল বার বার তার
আলোলাগা মুখের ওপরে—
কাল তার হৃৎপিণ্ড বার বার লাফিয়ে
আকাশ ছুঁয়েছিল-খুশীতে—
প্রবল খুশীতে—।

জীবন চরিত-৩/মতি মুখোপাধ্যায়

তুলসী বনে বাঘের মতো লোকটা করে হালুম্ হুলুম্
ছ্যা ছ্যা, এই তো ভারতবর্ষ
পরচর্চায় আর পরনিন্দায় কাটে দিন, উদ্বৃত্ত সময়
হাঁচি টিকটিকি বারবেলা, কি হরিদাসের গুপ্তকথা
রোগ দারিদ্র্য মিছিল স্লোগান
কেন যে জন্মালাম এই দেশে !

নিউমার্কেটের দরজির তৈরী ধারালো ক্রীজের
প্যান্ট শার্ট কোট
একটিও বোতাম ছেঁড়া নেই কোথাও
টিপটপ্ লোকটা বউয়ের জন্য কেনে পিওর সিল্ক
বোনের জন্য শ্রীরামপুরের তাঁতের শাড়ি
দেশ থেকে বাবা এলে লুকিয়ে রাখে কুলুপ এঁটে
ছেলেকে ইংরেজী শেখাতে
রাত বারোটা পর্যন্ত জেগে পড়ায়
ব্যা ব্যা ব্ল্যাকশিপ্‌…।

সর্দি হলে লোকটা লুকিয়ে মধু মাখিয়ে
তুলসীপাতা চিবোয়
পাড়ায় হাম হলে শেতলার থানে পুজো পাঠায়
বেকার ভাই চাকরির জন্য লিখলে
পরামর্শ দ্যায় ব্যবসা করার
স্বজনের মৃত্যুতে অবিচলিত মানুষটা
বড় সাহেবের কুকুরের অপঘাতে
অশৌচ পালন করে গুণে গুণে দশদিন।

শারদীয়া গোধূলি-মন/১৩৯২ পঞ্চায়

সোফিওর রহমানের **গল্প** **বীজ ঃ অনন্তের সংকলন**
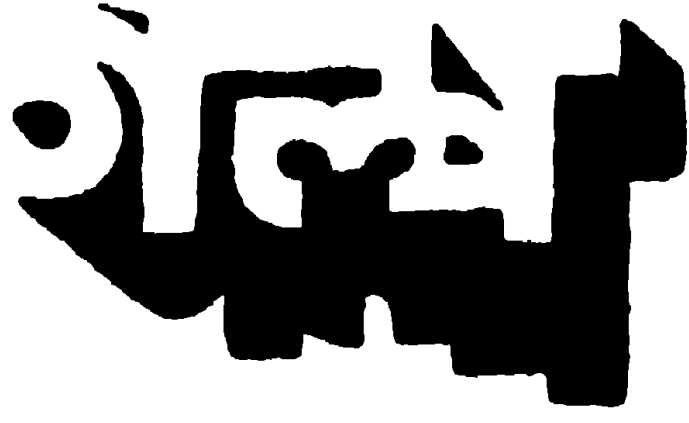
অনন্তের হাতে পায়ে বেড়ী। কোলে-পিঠে ঘা, আর দু'চোখে অন্ধকার। তবু সে ঘুরছে। আজ টালিগঞ্জে তো কাল হ্যারিসন রোডে। সকালে কার্জন পার্কে দেখা গেলে বিকেলে গঙ্গার ধারে। কখন কোথায় থাকে সে নিজেই জানে না।

অথচ অনন্ত এরকম ছিল না। লোকে বিশবছর আগেও তাকে অনন্তবাবু বলে জানত। শ্রদ্ধা করত। সকালবেলায় অনন্তবাবুর মুখোমুখি দেখা হলে অনেকে ভাবতো, আজ দিনটা ভালই যাবে। অবশ্য এমন ভাবনার সঙ্গত কোন কারণ নেই। যেটা আছে তা এক ব্যক্তিগত সংস্কারের উৎস। বাগবাজারের কে একজন ষাট বৎসর বয়েস পর্যন্ত যৌবনকে ধরে রেখে-ছিলেন, সন্তান লাভের আশায় পর পর তিনটে বিয়ে করেও নিঃসন্তান অবস্থায় আত্মহত্যা করেন। তিনিই নাকি রোজ সকালে উঠে অনন্তবাবুর বাড়ীর সামনে পায়চারি করতেন। উদ্দেশ্য, যদি সকাল বেলায় অনন্তবাবুর মুখ দর্শন হয় তাহলে তাঁরও সন্তান আসবে। অনন্তবাবুর একডজন পুত্র সন্তান।

তাই অনন্ত, অনন্তবাবু—যেন এক পবিত্র তীর্থের নাম। যেন পুত্রনবীশ পিতাদের পথিকৃত। আসলে, সৌম্য সুপুরুষ অনন্ত তার গভীর চোখ, বুদ্ধিদীপ্ত নাক, তলোয়ারের মত ভ্রূ—সঙ্গে সাতফুট তিন ইঞ্চির মেদ-হীন চেহারার ব্যক্তিত্বে সকলের নজর কেড়েছিলেন।

সেসব দিন আর নেই। অনেকগুলি বছর চলে গেছে। সময়ের পরিবর্তন অনন্তবাবু থেকে তাকে আজ 'অনন্ত' বানিয়ে দিয়েছে। এতে তার ক্ষোভ নেই। দুঃখ নেই। থাকলেও কিছু বোঝার উপায় নেই। দৃশ্যে শুধু কতকগুলি দামী কোনোটা রঙীন, কোনওটা কালো, কোনটা হলুদ, অনেকগুলি আবার ঠুনকে কাঁচের মত, একটু অসাবধান হলেই টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

অনন্ত গত কয়েকবছরে কারো সঙ্গে কোন কথা বলেছে বলে কেউ শোনে নি। কারও কাছে কিছু চেয়েছে বলে কেউ জানে না। সে শুধু হাঁটে, আর যথেষ্ট সময় নিয়ে সব কিছু দেখে। এক জায়-গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

১) বাগবাজারে, যেখানে আজ গিরীশ-মঞ্চ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে তার পুর্বপাশে খেলার মাঠটি একদিন সবুজ গালিচার মতো ছিল, যেন আবহমান এক কবিতার কিশোরী লাবণ্য। আজ যন নিঃশ্বাসের বিপর্যস্ত আঘাতে ক্লান্ত নরক।

২) শিয়ালদা-ষ্টেশন সংশ্লিষ্ট উদ্বাস্তুদের কাঁথা-বালিশের পুঁটলির মধ্যে দোতারা আর সারিন্দা মরাণ্য। রোজ রাত্রে দোতারা বাজিয়ে চলেন এক বৃদ্ধ, সারিন্দা হাতে তারই যুবক সন্তান। রণকান্ত দুই আদম অসম্ভব তেজী গলায় রাত্রির আকাশ কাঁপিয়ে দেয়। রহস্যঘন হয়ে ওঠে তাদের সুর।

৩) বিনয় বাদল দিনেশ বাগ তার কাছে ভ্রষ্ট নেতাদের উঠোন। অনন্ত সেখানে দাঁড়িয়ে রোজ পেচ্ছাপ করে।

৪) কলেজ ষ্ট্রীটে কোনদিন সে যায় না। ওখানকার আঁতেলদের সে ভীষণ ঘেন্না করে। পৃথিবীর কোন কাজে লাগে না এরা।

৫) এসপ্লানেডে সস্তা পাউডার মাখা যে সব মেয়েদের রোজ যখন কেউ না কেউ ট্যাক্সিতে তুলে উধাও হয়—অনন্ত দৃশ্যগুলি উপভোগ করে বেশ। গাঢ় বিদ্রূপ ঠিকরে পড়ে তার চোখ থেকে।

৬) প্রতিদিন এই ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করার পর সে একটি গোলাপ কেনে, শহীদ মিনারের তলায় গিয়ে বসে। হয়তো ঘুমিয়েও যায়।

কিন্তু অনন্ত কে? সে কি সংযত কোন পাগল। কিংবা শুধু ভবঘুরে। একজন বিদেশী মনস্তত্ত্ববিদ কলকাতা ভ্রমণে এসে পর পর কয়েকদিন অনন্তের পিছু নিয়ে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হি হিজ্ এ লাভার এ্যাণ্ড অন্‌লি এ অনেষ্ট ম্যান নাউ।

বিদেশী বিশেষজ্ঞের কথা শুনে সবাই হেসে উঠেছিল। কেউ কেউ মন্তব্য করেছিল, এক পাগল আর এক পাগলকে সার্টিফাই করছে। যাইহোক, এখানে অনন্ত একটা বিষয়। বিস্ময়ও হয়তোবা।

তার দু'চোখের গভীরতার কোন বর্ণনা দেয়া যায় না। ঈষদ ঘোলাটে সাদা পর্দার ওপর অন্তর্ভেদী দুটি খয়েরী। তারা অনুসন্ধিৎসু সবসময়। ঐ দুটি চোখের ওপর তাকালে মনে হবে প্রতিটি মানুষের ভেতরের প্রতি রক্তকণিকার হিসেব নিচ্ছে সে। প্রতি লোমকূপ দাঁড়িয়ে ওঠে ভয়ে। শ্রদ্ধায় দূরে সরে যেতে হয়। কোনো কিছু ধরা পড়ে যাওয়ার জন্ম দ্বিতীয়বার তার দিকে তাকানোর সাহস সঞ্চয় করে ওঠা যায় না।

কয়েকগজ দূরে দাঁড়িয়েও অনন্তের শরীর থেকে ঝলকে ঝলকে উত্তাপ পাওয়া যায়। গ্রীষ্মের দহন নয়, শীতের জমানো ঠাণ্ডা হাওয়া নয়, বর্ষার মাদকতাও নয়, বসন্তের কাঙ্ক্ষিত কিছু নয়—মনে হয় সে এক অন্য ইন্ধন, ঝকমকে স্যাটায়েরর দ্যুতি, হয়তো দীর্ঘ নতুন জীবনের বীজ। হাজার প্রেমিকার সোহাগ নিঃশ্বাস হয়তোবা।

তবে একথা ঠিক, অনন্ত অন্য জগতের মানুষ। নিজের জন্যেও কিছু করেনা, অন্যের জন্যও না। একজন ভিখিরির কিংবা পাগলের ক্ষুধা আছে। কিন্তু অনন্তকে কেউ খেতে দেখেনি। তার কোন স্থায়ী বাসা নেই। ছেলেরা কোথায় সে জানে না হয়তো, অন্তত কলকাতার কেউ কিছু জানে না। নিঃসঙ্গ ভিখিরি অনন্ত কলকাতাতেই ঘোরে। অন্য কোথাও চলে যায় নি এখনও পর্যন্ত।

একদিন গঙ্গার ধারে, আউটরাম ঘাটের কাছে তাকে ব্যস্ত মগ্ন ভাবে হাঁটতে দেখা গেল। নজর করতে বোঝা গেল একজোড়া নব দম্পতির পিছু নিয়েছে। অবাক কাণ্ড। চোখ দুটো লোভাতুর হয়ে উঠছে তার বন্য ক্ষুধাতের মতো স্বার্থপর দৃষ্টি। আকাশবানী পর্যন্ত দ্রুত বেগে হেঁটে গিয়ে অনন্ত হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কারণ, নবদম্পতি ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়েছে।

একদিন রাত্রি বারোটায় অনন্ত হেঁটে হেঁটে শেয়ালদার উদ্বাস্তুদের সংসারে হাজির। সেই পিতাপুত্র, দু'জন মানুষকে অনন্ত কিছু পয়সা দিল নিজের ঝোলা

থেকে। ঐ ঝোলার বয়েস যে কতো কেউ জানে না। গত দশ বারো বছর তাঁর ডান কাঁধে ঝোলাটি ঝুলছে। প্রয়োজনে হরেকরকম নতুন কাপড়ের টুকরো দিয়ে তাপ্পি। পকেটের মতো গোটা পঞ্চাশেক ছোট ছোট খোপ। লোকে বলে, অনন্তের ঐ ঝোলার মধ্যে নাকি প্রচুর অর্থ রয়েছে।

এরকম বলাবলির জন্য তাকে বিপদের মুখোমুখি হতে হয়েছে অনেক। রাতের ছিরো ছিনতাইবাজ চোর গুণ্ডাদের হাতে নির্মম প্রহার খেয়েছে সে। তবু মুখ খোলেনি, বলেনি কোথাও তার কোন গুপ্তধন আছে কিনা। গুণ্ডারা শেষ পর্যন্ত ভেবে নিয়েছে, সব বাজে কথা। অনন্ত একটা ভবঘুরে। অনন্ত তাই আজ নিরাপদ।

তার দেওয়া পয়সায় বাপবেটা তাড়ি খেয়ে দোতারা সারিন্দা হাতে তুলে নিল। সুরের দীপ্ত বিদ্রূপে কলকাতা কঁকিয়ে কেঁদে উঠলো যেন। শেয়ালদা ষ্টেশান চত্বর থেকে একেএকে এসে জড়ো হল আরো অনেক ভিখিরি ভবঘুরে উদ্বাস্তু। উড়ালপুলের নীচের গার্হস্থ থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন তরুণী। গভীর রাত্রে কলকাতা অন্যভাবে জন্ম নিল আবার—যেখানে একছত্র অধিপতি এই উদ্বাস্তুরা।

এসপ্লানেড চত্বরে যখন নিত্যনূতন কলগার্ল'রা এসে দাঁড়ায় প্রতিদিন, তখন অনন্ত এক অন্য মানুষ। অভাব যন্ত্রণা ও সামাজিক প্রতারণার জঞ্জাল থেকে বেরিয়ে আসা লাঞ্ছনায় কুঁজো যাওয়া এক বৃদ্ধ এই শহর ধ্বংস করে দিতে চায় যেন। মেট্রো সিনেমাহল, গ্রাণ্ড হোটেল, মনুমেণ্ট, ভিক্টোরিয়ার অহংকার তার দু' চোখের আগুনে বুঝি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। দাঁতে চিবিয়ে অনন্ত একটা তাজা গোলাপ দু'পায়ে পিষে মাড়িয়ে মত্ত হস্তির মতো সারা অঙ্গ ঝনঝনিয়ে ময়দানের মাঝ বরাবর ছুটে যায়। তার ছোটার মত্ততা দেখে লোকজন সরে দাঁড়ায়। হকচকিয়ে ট্রাফিক জমা হয়। ভুজাওয়ালার চুল্লী উল্টে যায়। দোকান তছনছ হয়। অনন্তের বুকে পিঠে কিল চড় লাথি ঘুঁষি পড়ে। ঝনঝন করে ওঠে তার শেকল ও বেড়ি। তারপর একসময় কলকাতা আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

অনন্তকে কে বা কারা কবে কোথায় এতো লম্বা শেকল ও বেড়ী পরিয়েছিল কে জানে। অনেকে বলে বাগবাজার ব্যায়াম সমিতির ছেলেরা অনন্তের পাগলামি দেখে নিরাপত্তার প্রয়োজনে ঐসব দিয়ে বেঁধেছে ওকে। সেই থেকে তার হাতে পায়ে বেড়ী। কালো ঘষা দাগ। দুচোখে আপাতদৃশ্য এক অন্ধকার। তার চতুর্দিকে গা-ছমছম করা ভয়। হতাশার ঝুরি নামছে ক্রমশ, দলাদলি, গুলি বোমা ভোট আর রক্তাক্ত রোদ্দুর। এ সবের প্রতিক্রিয়া অনন্তের শরীরে, সর্বাঙ্গে। তার কোলে-পিঠে ঘা—মোহন ও গোপন বর্তমান বছরগুলি। সে চেষ্টা করলে লম্বা এই শিকল ও বেড়ী কোথাও কেটে ফেলতে পারে। কিন্তু তা করে না। তবে তার চলতে বা ছুটতে অসুবিধে হয় না।

এখন অনন্ত বসে আছে ভিক্টোরিয়ার পেছনের দিকে সিঁড়িতে। সুন্দর হাওয়া বইছে। অনন্তের ভেতরেও হাওয়া—দামাল, গূঢ় অভিমানের স্রোত। তার সমস্ত শিরা উপশিরা জুড়ে মৌন ঝড় সন্ন্যাসীর মতো ব্রত করে ঘিরে আছে। সতর্কভাবে চারদিক চেয়ে দেখলো অনন্ত, এই রৌদ্রজ্বালা দুপুরে কেউ তাকে দেখছে কিনা। তারপর কাঁধের ঝোলা থেকে একটি সাদা ফুলস্কেপ কাগজ বের করল, একটি নতুন কলমও, আর পাঁচশ মিলিগ্রাম এমপিলিনের একটি শিশি। এমপিলিন তাতে নেই। লিকুইড ধরণের অন্যকিছু ভরা। একটা বিড়ি ধরিয়ে সুখটান দিতে

দিতে অনন্ত ভাবছে কিছু। চোখমুখে চিন্তামগ্ন পবিত্রতার আভা।

অনেকক্ষণ সাদা কাগজটির দু'পাশে কাঁপা কাঁপা হাতে কি যেন সব লিখল অনন্ত। তারপর ভাঁজ করে শিশি ভর্তি লিক্যুইড সম্পূর্ণটা খেয়ে চলতে শুরু করল। টলতে টলতে কাঁপতে কাঁপতে কয়েক ফুট এগিয়েই পড়ে গেল সহায়সম্বলহীন প্রাচীন বৃক্ষের মতো।

একটু দূরে বিহারের এক বাঁশীওয়ালা একটা করুণ সুর বাজিয়ে লোক জড়ো করছে বাঁশীগুলি বিক্রীর জন্য।

পুকুর পাড়ে বেঞ্চিতে বসে থাকা একজোড়া তরুণ-তরুণীর কাছে স্মার্ট সাদা পোষাকের এক পুলিশ কি যেন চাইছে।

ভাজা ছোলা বিক্রেতা এক কিশোর এগিয়ে এসে দেখে অনন্ত মরে গেছে। পায়ে পায়ে কয়েকজন ভিজিটরও দেখে গেল অনন্তকে। কৌতূহলবশে একজন তার হাতের কাগজটি নিয়ে পড়ল। পাগলের পাগলামি, মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে অনন্ত লিখেছে অনেককিছুই। কয়েকটা লাইন এরকম "এদেশের নব্বই ভাগ মানুষ স্বার্থপর। সব কাজের পেছনে এখন নিজের নিজের স্বার্থ ও বিলাস ছাড়া মানুষ অন্য কিছু জানে না।......বর্তমান কালের রাজনীতি মানুষকে নির্দয় ও নৈতিক চরিত্রহীন করে তুলেছে।......

কামসর্বস্ব তরুণরা নরকের দিকে এগিয়ে চলছে।... পশ্চিমবাংলা একদিন ব্যাভিচারের শীর্ষস্থানে পৌঁছবে।...সংসারেও শান্তি নেই, শ্রদ্ধা নেই, ভালোবাসা নেই। সমগ্র কলকাতায় আমি দুটি জায়গাতে পবিত্র ভালোবাসা দেখেছি, তারা হ'ল শেয়ালদা ষ্টেশনের উদ্বাস্তু এক বাপ-বেটা, দুজ ছাড়া কিছু বোঝে না যেন দুই বন্ধু। আর কিছুদিন আগে সদ্যবিবাহিত একটি ছেলে ও মেয়েকে দেখেছিলাম। রাস্তা চলতে চলতে আড়পেতে শুনেছি তাদের কথা। সেই ছোটবেলা থেকে ওদের দু'জনের পরিচয়, গভীর ভালোবাসা। ভালোবাসার দুই তীর্থ থেকে ওদের যে সন্তান জন্মাবে, আমার ধারণা সে নিশ্চয়ই একজন পরিপূর্ণ মানুষ হবে। মহামানবও হতে পারে।...... এই কলকাতায় যত সংখ্যক মেয়ে দেহ ব্যবসার পথ ধরেছে পৃথিবীর অন্য কোথাও বোধহয় এমন সংখ্যার উদাহরণ নেই। এতোবড় কলঙ্ক মাথায় নিয়েও আপনার মন্ত্রীগিরি সাজে? ....

অনন্তের চিঠিটি অনেকেই পড়ল আগ্রহ ভরে। কেউ বলল দার্শনিক, কেউ বলল সমাজসেবী, কেউ বলল প্রেমিক। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরেও অনন্তের চিঠি পৌঁছেছিল ঠিক। মাননীয় মন্ত্রী অনন্তের মরদেহ দাহ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু ঐ চিঠির ওপর তিনি কোন বিবৃতি দেন, বিরোধীরাও এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করেন নি।

গৌর বৈরাগীর **গল্প**

শ্যামল মারা গেছে

ট্রেন থেকে নামতেই মানিকের সঙ্গে দেখা। ও বলল—শুনেছিস।

মানিকের অবাক চোখের দিকে তাকিয়ে বললুম—কি শুনব।

—শ্যামল মারা গেছে।

—কোন শ্যামল।

—শ্যামলকে চিনিস না! শ্যামল বিশ্বাস।

নাম আর তার সঙ্গে টাইটেলটা পাশাপাশি শুনেই ধ্বক করে উঠল বুকের ভেতর। চোখের মধ্যে ঝিকমিক করে কটা তারা অটোমেটিক। আশ্চর্য আর কোন শ্যামল বিশ্বাস আমাদের পরিচিত আছে নাকি। আমি ত' জানি না। কে এই শ্যামল—জিজ্ঞেস করতে যাব তার আগেই মানিক বলে উঠল—একবার ওর বাড়িতে যাস। বৌটা খুব কান্নাকাটি করছে জানিস। ছেলেটার বয়স মাত্র পাঁচ।

কথাটা শেষ করেই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল মানিক। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হল। আমি শ্যামল বিশ্বাসকে ঠিক চিনতে পারছি না। চেনবার জন্য পর পর—চেনা, অল্প চেনা আর অচেনা মুখগুলো মনে আনবার চেষ্টা করলুম। কোন লাভ হল না। শ্যামল মারা গেছে। কবে মারা গেল। কি করে মারা গেল কত বয়েসই বা হয়েছিল তার। অবশ্য বছর পাঁচেকের একটা ছেলের কথা বলল মানিক। তার মানে সে নিশ্চয়ই আমাদেরই বন্ধু-টন্ধু কেউ হবে। জেড-এর বয়েস। হ্যাঁ প্রায় পাঁচই। এইসব ভাবতে ভাবতে খানিক সময় হাত ফসকে বেরিয়ে গেলে চমকে উঠলুম। দেরী হয়ে যাচ্ছে।

ট্রেন থেকে নামার পর ফালি রাস্তাটা পেরিয়ে যেতে এত ঝুটঝামেলা। এই ছোট্ট শহরে এখন মেলা ভিড়। বছর দশ আগেও এমন ছিল না। একটা করে ট্রেন এল তো হুড়মুড়িয়ে প্লাটফরম আর রাস্তায় লোক উপচে যা তা। কেটে বেরিয়ে আসতে কয়েক মিনিট।

ভিড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে আসতে আসতে শ্যামলের কথাটা ভুলেই গেছলুম। ট্রেন থেকে নেমে সিগারেট কেনাটা অবোস। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে হাঁটা শুরু করব। ঠিক সেই সময় মদন সামনে এসে দাঁড়াল। বলল—শুনেছিস!

এবার আর অবাক হতে হল না আমাকে। একটা সিগারেট ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললুম—এই বয়েসে, হঠাৎ কি এমন হয়েছিল।

সিগারেটে টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল মদন—তা ত' জানি না। আজ সকালে পল্লবের

সঙ্গে দেখা। ওই কথাটা বলল। কথা শেষ করে মুখে 'চুক' করে একটা শব্দ করল ও। শেষে গলাটা দুঃখী করে বলল—আজকাল শুনেছি মৃত স্বামীদের অফিসে বিধবা স্ত্রীরা কাজ পায় এদিকে শ্যামলের বৌটা নাকি পাসটাস করা নয়। বাচ্চা ছেলেটাকে নিয়ে কি যে করবে এবার।

একথায় মুখে একটা 'চুক' শব্দ আমারও উঠে এল। সেই সঙ্গে করুণ চাউনি। তাই দেখে মদন বলল—কাল রোববার। ভাবছি একবার যাব। তুইও যদি পারিস।

—সকালের দিকে পারব না। তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম আমি। দুপুরের দিকটায় যদি।

কথাটা শেষ হবার আগেই হাঁটতে শুরু করেছি। কথায় কথায় দেরী হয়ে যাচ্ছে। ভুবনবাবুর এক-কাঁড়ি কাজ জমে গেছে। শেষ না করলেই নয়। আবার একজনের মৃত্যুর খবরের সামনে দিয়ে হুট করেই চলে যাওয়াটা খুব খারাপ দেখায়। এমন কোন ঘটনা যদি আমার ক্ষেত্রেও—

এরকম ভাবলেই সবাই যেমন আচমকা থতমত খায় আমারও তাই হল। তারপরেই হেসে ফেললুম। অবশ্য হাসি এলেও জানি এমন ঘটনা ঘটতেই পারে। এই যে শ্যামল যাকে আমি ঠিক চিনতে পারছি না। সেও হয়ত আমারই মত। একটা ছেলে আছে পাঁচ বছরের। আর তার বউ—। কথাটা ভাবতে গিয়ে চমকে উঠতে হল। আশ্চর্য উমাও ত' পাসটাস করা নয়। উমা গ্রামের মেয়ে। ক্লাস এইট অবধি পড়া-শুনো। দেখতে গিয়ে বাবার খুব পছন্দ। কিন্তু আমার ক্ষেত্রেও যদি সেরকম কিছু হয়—

ধাঃ, এরকম হয় নাকি। একরকম ঘটনা পর পর এমন ঘটেই না। কথাটা ভুলতে ভুবনবাবুর কাজ-টার কথা মনে আনতে চাইলুম। কাজটা আজকের মধ্যে শেষ করতে পারলেই ভাল হয়। শুধু ওদেরই দরকার নয়। দরকার আমারও। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আড়াইশো টাকাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আজ যত রাতই হোক। উমাকে বলাই আছে।

ভাবনার ভেতর হাঁটাটাও বেশ জোর হয়ে গেছল। জি. টি. রোডের মুখে স্টেশনারী দোকানটা দেখে মনে পড়ল জিনিষটার কথা। অফিস বেরুবার সময় পই পই করে বলে দিয়েছে উমা। জিনিষটা এখনই নিতে হবে। ফেরার সময় রাত হলে দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। একথা ভেবে দোকানে গিয়ে দাঁড়াতেই শুনতে পেলুম কথাটা। সেই এক আলোচনা।

যেমন হয় দোকানে চেনা খদ্দের এলে আর হাতে তেমন কাজ না থাকলে। কত বয়েস হয়েছিল। বাড়িতে কে কে আছে? তাদের দেখার আর কে রইল। এইসব।

আসলে ছোটখাট জায়গায় এরকমই হয়। খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে মুখ থেকে মুখে। বয়েস হলে এতটা বোধহয় বাড়াবাড়ি করত না কেউ। কিন্তু বয়েস তার কমই। এখনও অনেকটা জীবন পড়েছিল তার। অন্য সময় হলে আমিও টুকটাক কথাবার্তায় যোগ দিতে পারতুম। কিন্তু এখন আমার একদম সময় নেই, জিনিষটা কিনেই চলে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে ওদিকের একটা কথা খট করে কানে এসে লাগল। চমকে তাকাতেই দেখি দোকানদার আমার দিকে তাকিয়ে। চোখাচোখি হতেই আমাকে দেখিয়ে বলল—হাঁ৷ ঠিক এর মতই স্বাস্থ্য। এই রকমই প্রায় হাইট। ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল। চোখে চশমা।

কথাটা শুনে বড় অবাক লাগল। আশ্চর্য এত মিল কি করে হয়। প্রায় এক রকমের দুজন মানুষ

থাকে নাকি। হয়ত থাকে কিন্তু নামটা পর্যন্ত এক হয় কি করে।

যাকে চিনিয়ে দেওয়া হচ্ছিল সে আমাকে দিয়ে মৃত মানুষটিকে সনাক্ত করতে চাইছিল। দেখতে দেখতে মুখে 'চুক' করে একটা শব্দ করল। তারপর আস্তে আস্তে বলল—হুম, বুঝতে পেরেছি। জোড়া মন্দির তলায় বাড়ি না।

—হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ পাড়াতেই। দোকানদার তাড়াতাড়ি বলে উঠল কথাটা।

কথাটা কানে যেতে আচমকা একটা ভয় দুলে উঠল ভেতরে। এটাও কি সম্ভব। অথচ সব ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। একটা ছেলে আছে পাঁচ বছরের। পাশ করা বউ নয়। গায়ের রঙ। হাইট। চোখে চশমা। ছোট করে ছাঁটা চুল আর পাড়াটাও পর্যন্ত ঠিক ঠিক।

না সম্ভব নয়। কিছুতেই এমন হতে পারে না। হলে এই আমি এইমাত্র অফিস থেকে ফিরে এলুম কি করে। স্টেশন থেকে এতখানি হেঁটে এসেছি। উমার দরকারের কথাটা মনে পড়তে জিনিষটা কিনতে দোকানে ঢুকেছি। এসব কথা ভেবে মনে মনে যখন হাসতে যাব সেই সময় গলাটা হঠাৎ চাপা করল দোকানদার—বৌটা নাকি পোয়াতি। কি বিপদ বলুন ত।

আশ্চর্য, বড় আশ্চর্য উমারও যে বাচ্চা হবে। পাঁচ মাস চলছে। এই খবরটা পর্যন্ত। ভাবতে গিয়ে এবার সত্যি সত্যি বুকটা কেঁপে উঠল। কপালে ঘাম জমছে বেশ বুঝতে পারলুম। মাথাটা টলছে যেন। গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে। জিব টানছে ভেতরে। আমি তাড়াতাড়ি বললুম—একটু জল পাওয়া যাবে।

হয়ত আবার কিছু হয়ে থাকবে। দোকানদার তাড়াতাড়ি বলে উঠল—আপনার কি শরীর খারাপ করছে নাকি!

ঘাড় নেড়ে না বলতে লোকটি যেন আশ্বস্ত হল। তারপর একটু হাসল—বিশ্বাস নেই মশাই যা দিনকাল।

দোকান থেকে বেরিয়ে আসতেই গুমোট ভাবটা কেটে গেল। ফুরফুর করে একটু হাওয়া লাগল গায়ে। অথচ মাথার ভেতর কি যে হচ্ছে। হ্যাঁ ভয়। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে চাইছে ভয়ে। ব্যাপারটা ঠিক ঠিক না জানা পর্যন্ত স্থির হওয়া যাচ্ছে না। ভুবনবাবুর ওখানে যাবার ইচ্ছাটাও খুঁজে পাচ্ছি না। কিছু একটা করা দরকার, গল্পে, উপন্যাসে কি সিনেমায় দেখেছি স্বপ্নে না জাগরণে এটা জানার জন্য অনেক সময় নিজেই নিজের হাতে চিমটি কেটে দেখে। কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের দুটো আঙুল বাঁ হাতের কব্জির ওপর সাঁড়াশি করে বসিয়ে দিলুম। উত্তেজনায় ব্যাপারটা এত জোর হয়ে গেল যে নিজেই উফ্ বলে দাঁড়িয়ে পড়েছি। পাশ থেকে একজন বলল—কি হল, কিছু কামড়াল নাকি।

—না না কিছু না। হেসে তাকাতেই চিনতে পারলুম। বললুম—পঙ্কা না, চিনতে পারছিস।

পঙ্কা হাসল—চিনেত পারব না কেন।

চলেই যাচ্ছি, তার আগে মনে হল পঙ্কাকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়। বললুম—কি শুনছি একটা। তুই শুনেছিস।

পঙ্কা বলল হ্যাঁ, সবাই শুনেছি। এরকম একটা ঘটনা।

—কি নাম যেন তার।

—শ্যামল, শ্যামল বিশ্বাস।

—কোন শ্যামল!

—তোর স্কুলের কথাটা মনে নেই। পঙ্কা একটু হাসল। তারপর বলল সে ছেলেটা ডাকঘরে অমলের পার্ট করে সোনার মেডেল পেয়েছিল।

থাকবে না কেন। অজানতে ঠাঁতে দাঁত চাপল আমার। মনে হল সবাই যেন আমার বিরুদ্ধে একটা চক্রান্তে লিপ্ত। না, আর দেরী করা ঠিক নয়। ভয় পেলেও চলবে না। গলাটা কেশে পরিষ্কার করে বললুম—তাকে আমি ভাল করেই চিনি। আর সে ছেলেটা বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে।

কথাটা শুনে আমার দিকে অবাক তাকাল পঙ্কা। বলল—কার কথা বলছিস তুই।

ঐ শ্যামল বিশ্বাসের কথা।

—ও মারা গেছে। নিষ্ঠুরের মত কথাটা ছুঁড়ে দিল পঙ্কা।

—আমার ভাই তাকে নিজের চোখে –

—অসম্ভব। মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিলুম। এ হতেই পারে না। কথাটা বলতে গিয়ে একটু চিৎকার মত হয়ে থাকবে। দু'একজন যেতে যেতে তাকাল।

পঙ্কা এবার হাসল—তুই এত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন। এমন ত হতেই পারে, আমাদের অজানতে কেউ কেউ—

না হয় না। অন্তত এক্ষেত্রে তেমন হয় নি। গলাটা নামিয়ে নরম করে বললুম—ও মরে নি তুই বিশ্বাস কর।

—পঙ্কা আবারও হাসল—আমার বিশ্বাসে কারো মরা বাঁচা নির্ভর করে না।

বুঝতে পারলুম পঙ্কাকে ওর বিশ্বাস থেকে টলানো যাবে না। ভয় লাগল আমার। ভীষণ ভয়। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। বুকের ভেতর ঢিব ঢিব করছে। এদিকে রাত নামছে ঘন হয়ে। আমি কি এখন বাড়ি ফিরব। কিন্তু এমন একটা ভুল না শুধরে কি করে ফিরি। সবাই একটা মিথ্যে জেনেছে। এ অবস্থায় বাড়ি ফেরা যায় না।

হাঁটতে হাঁটতে রথীনদার বাড়িতে গেলুম। বাড়িটা খুব চুপচাপ। ঘরের ভেতর থেকে ছিলতে আলো বারান্দায় এসে পড়েছে। সেই আলোয় চুপটি করে বসে আছেন রথীনদা। আমায় দেখে মুখ তুললেন সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস। তারপর নিজের মনেই ফিসফিস করে বললেন—শুনেছ নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ বা না কিছুই বললুম না। রথীনদার অন্তত আমাকে চেনার কথা। একসময় প্রায় প্রতিদিনই দেখা হত। কথাও হত। খুব বিপদে পড়লে রথীন-দার কাছে আসতুম। সেই রথীনদাও কি একই ভুল করছেন।

—প্রথমে শুনে আমি বিশ্বাসই করতে পারি নি। ফিসফিস করে বলে উঠলেন রথীনদা।

—আপনি কার কথা বলছেন।

একথায় আমার দিকে অবাক চাইলেন উনি—তুমি শোন নি। সেই যে শ্যামল, আগে আগে প্রায় আসত। বড় ভাল গানের গলা ছিল ওর। কথা বলতে গিয়ে আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিলেন উনি। তাকিয়ে নিজের মনেই গুন গুন করে উঠলেন। অন্ধকারের দিকে ফিরে সেই গানের—কথা খুঁজলেন। সুর খুঁজলেন। তারপর গুনগুনিয়ে একটা হারানো সুর গলায় তুলে এনে বললেন—এই গানটা বড় ভাল গাইত সে। আর শুধু গানই বা কেন। গলাটিও বড় চমৎকার ছিল তার। চর্চাটর্চা কখনও সে করত মনে হয় না। তবে হাতে তুলি আর রঙ নিলেই বড় সুন্দর সমুদ্র আনতে পারত সে। সমুদ্র, বালিয়াড়ি, তার পেছনে সারি সারি সবুজ ঝাউ গাছ।

এই অবদি বলে থামলেন রথীনদা। আমার দিকে ফিরলেন উনি। বললেন—আমি সেই শ্যামলের কথাই বলছি।

শুনে আমার যেন কি রকম হল। বুকের ভেতরে অজানতে বোধ হয় কিছু কেঁপে গেল। অথচ এমন হবার কথা নয়। আমার প্রতিবাদ করার কথা। ভুলটা ভাঙতে হবে আমাকেই। কথা বলতে গিয়ে

দেখি গলাটা বুজে গেছে। কেশে গলাটা পরিষ্কার করতেই রথীনদা আমার দিকে ফিরলেন। আমার কিছু বলার আগেই আবার বলে উঠলেন—আর একটা জিনিষ ছিল ওর। মাথার এলোমেলো চুলে হাত রাখলেন উনি। একটা বড় শ্বাস ফেলতে ফেলতে আকাশের দিকে তাকালেন—একটা মন। আস্তে ভেঙে ভেঙে বলে উঠলেন রথীনদা—গোটা একটা মন ছিল তার।

এরপর যেমন হয়। মৃতের স্মৃতি চারণের ঢঙে উনি বলে যেতে লাগলেন একটা একটা করে উজ্জ্বল ঝকমকে মনের কথা।

রাত ক্রমশ গভীর হচ্ছে। আকাশে আস্ত চাঁদ। সবুজ জ্যোৎস্না নেমেছে চরাচর জুড়ে। কোথাও বোধ-হয় রাতচরা পাখি ডেকে উঠল। ঘন হয়ে উঠল পরিবেশ। এর মধ্যে রথীনদা তখনও স্মৃতি চারণের মধ্যে। আমি একা শ্রোতা।

এমন হবার কথা ছিল না। কিন্তু বুঝতে পারছি না হওয়াটাই ক্রমশ হয়ে যাচ্ছে ভেতরে। গভীর জলতল থেকে এইমাত্র শ্যামলের মৃতদেহ ভেসে উঠল। আমি বলতে চাইলুম—না রথীনদা না, এটা ভুল।

কিন্তু গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরিয়ে এল না। তার বদলে শ্যামলের জন্যে চোখের কোণ সির সির করে উঠল আমার।

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়ের গল্প

থাকা না-থাকা
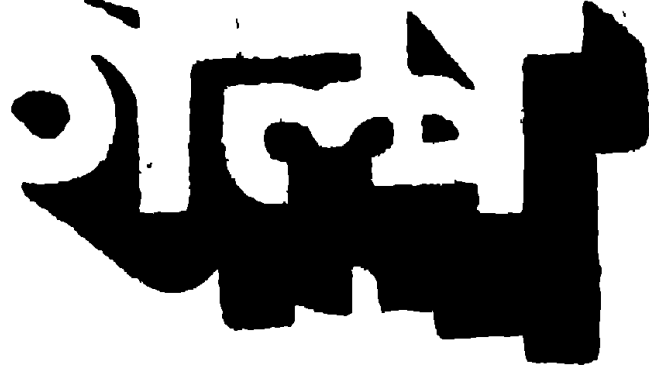
লোকটা ভাত খাচ্ছিল। ছোট্ট ঘর। আট-বাই-দশ। টিনের চাল। সুরকি-গাঁথা দেয়াল। জানালা বলতে মাত্র দুটি, পুবে-পশ্চিমে। মেঝেয় ব'সে ভাত খাচ্ছিল লোকটা।

দিনটা কোনো বিশেষ দিন নয়। সুতরাং রোজ যা-বা থাকে, যেমন থাকে, তেমনই। অলিতে-গলিতে ভীড়। পানের দোকানে হিন্দী গান। মই কাঁধে সিনেমার-পোষ্টার-সাঁটা লোকটার দেয়াল বেয়ে নামা-ওঠা। রকে ব'সে বুড়োদের গুলতানি, এটা কিন্তু প্রধান-মন্ত্রীর ঠিক কাজ হ'ল না। হাঁ মশায়, আপনি কি বলেন? কিংবা হিপ-হিপ-হুররে, থ্রি-চিয়ার্স ফর নব-জাগরনী সংঘ।

প্রথম গরাসে লোকটা ভাতই খেলো। পুবের জানালা দিয়ে ছুটে আসা পিস্তলের গুলিটা খেলো তারপর। মাত্রই ক'মুঠো শুকনো ভাত। আলুভাতে একটু। পেঁয়াজ একটুকরো। ডাল ছিল না। দ্বিতীয় গরাসে ভাত রক্তে মেখে গেল।

॥ ২ ॥

লোকটার অনেক কিছু ছিল।

তবে ছিল-ছিল ব'লে লোকটার কি-কি ছিল, তা যদি ব'লতে বসা যায়, তাহলে মজুতদারী আইনে তাকে গ্রেপ্তারও করা যেতে পারে। প্রথমেই বলা যায়, তার নাম ছিল। না, কালুয়া বা চিক্কুর, ভংলা বা বাটালি এরকম কোন নাম নয়। সেকেলে বাপ ছিল লোকটার। সেই-ই দিয়ে গেছে; রাধামাধব। পরে ছোট হ'ওে, শুধু মাধব। মা ডাকতো মধু ব'লে। হ্যাঁ, এরকম একটা মা-ও তার ছিল। কোনো-এক শীতের সকালে লাইনে কয়লা কুড়োতে গিয়ে মালগাড়ীতে কাটা পড়েছিল সেই মা। কার যেন অল্প একটু ভুলে, হাইড্রলিক প্রেসে কাজ করার সময় কাগজ-চাপ্টা হ'য়ে গিয়েছিল তার বাপ।

সেই জুট মিলেই, অবশ্য কাজ জুটে ছিল মাধবের। বাপ ছিল মিস্ত্রি। মিস্ত্রি মরতে ছেলে হ'ল হেল্পার। পরে অবশ্য সেও মিস্ত্রি তা থাকবে না-থাকবে না ক'রে এতদিন সেই কাজটাও ছিল। কাজটা ছিল ব'লে, তাব আরো কিছু ছিল। যেমন চুল্লুর নেশা ছিল। বাঁধা মেয়ে মানুষের কাছে যাতা-য়াত ছিল। একটা অবৈধ সন্তানও ছিল। তারই জন্তে জমানো, পোষ্ট অফিসের পাশ বইতে সাতশো তেত্রিশ টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা জমা করা ছিল।

লোকটার দুটো হাত, দুটো পা, দুটো কান ছিল। নাক ছিল একটা। একটা-একটা ক'রে হিসেব ক'রলে তার আরো অনেক কিছু ছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক'রে ছিল একটা দুঃখ। দুঃখটা

অবশ্য কী, তা জানা যায়নি। তবে লোকলাজ ভুলে মেয়ে মানুষটা যখন ডাক-ছেড়ে কাঁদতে লাগলো বুক চাপড়ে, তখন অনেকেই জেনে গেল, লোকটার একটা দুঃখ ছিল। সে নাকি মাঝে মাঝেই ফুঁফিয়ে-ফুঁফিয়ে কাঁদতো।

পাড়ার টুপি-খোলা রাজনীতিক ভুলুবাবু অবশ্য ব্যাপারটাকে পুরোপুরি বুর্জোয়াটিক ব'লে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথা হ'ল, শ্রমিক চরিত্র কখনও এভাবে দুঃখ জমা ক'রে রাখে না। তা না হ'লে ঝুনঝুনওয়ালা যখন সুখ জমা ক'রে রাখে, আমরা তাকে গাল দিই কেন?

এর ফলে স্পষ্ট বোঝা গেল, লোকটার ভেতরে একটা বুর্জোয়া মনোবৃত্তি ছিল।

॥ ৩ ॥

লোকটার অনেক কিছুই ছিল না।

তবে ছিল না-ছিল না ব'লে, তার কি-কি ছিল না, সেই তালিকা করতে ব'সলে তাকে অবশ্যই খাঁটি প্রোলেতারিয়েত ব'লে দেগে দেয়া যায়। প্রথমেই বলা যায়, তার নিজস্ব কোনো ভিটে-মাটি ছিল না। বাড়ীটা ভাড়ায় নেয়া। জলটা রাস্তার কলের। আলোটা কেরোসিনের। সে অবশ্য বলতো কেরা-চিনি। তা, বলতেই পারে। কেননা, তার পেটে বিদ্যে ব'লে কিছু ছিল না। ছিল না বিয়ে করা বউ, ছেলে-পুলে। শোনা যায়, এসব কারণেই নাকি তার বাঁচার বাসনাও বড়-একটা ছিল না।

বাসনা ছিল না ব'লেই, তার আরো অনেক কিছুই ছিল না। ফ্রিজ-টিভি ছিল না। জমি-পুকুর ছিল না। ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স ছিল না। ধড়ের ওপর মাথা থাকলেও মগজ-টগজ ছিল না। কোটরাগত চোখ থাকলেও তেমন দৃষ্টিশক্তি ছিল না। এই এতকিছু ছিলনা-র ওপর আরো একটা মস্ত জিনিস ছিলনা।

জিনিসটা কি, প্রথমে অবশ্য জানা যায়নি। কিন্তু লোকলাজ ভুলে মেয়েমানুষটা যখন বুক-চাপড়ে কেঁদে উঠলো ডাক-ছেড়ে, তখন অনেকেই জেনে গেল যে তার কোনো ঠেক ছিল না। ঠেক মানে অবশ্যই পার্টির ঠেক। লোকটার রাজনীতি-জ্ঞান একেবারেই ছিলনা। জুটমিলে মার্কসবাদী, তল্লাটে গান্ধীবাদী তার এক সহকর্মী অনেকবারই বুঝিয়েছিল, আরে বাবা এ দুনিয়ায় টিঁকে থাকতে গেলে...ইত্যাদি-ইত্যাদি। তা সে কথা সে কানে তোলেনি। তার মানে এই নয় যে, সকলকে সে এড়িয়ে চলেছে এতদিন। তা পারেনি। পারা সম্ভব নয়। আসলে সে সবরকম পোষ্টারই পড়েছে, সব দেয়াল লিখন। তার মোটা বুদ্ধিতে বুঝেছে সকলেই তার স্বার্থ দেখার জন্যে তৎপর। সুতরাং সে সকলকেই অর্থাৎ সব পার্টি-কেই চাঁদা দিয়েছে। জুটমিলেও সেই একই ঘটনা। শ্রমিক স্বার্থ তো সব ইউনিয়নই দেখে। সকলেরই দাবী দাওয়া সুন্দর। চমৎকার আন্দোলন। সে মোহিত হয়েছে। সেধে-সেধে নোট গুঁজে দিয়েছে হাতে। আসলে না দিয়েও তো কোনো উপায় ছিল না।

॥ ৪ ॥

ছিল এবং ছিলনা, অর্থাৎ তার এই থাকা না-থাকার মাঝখানে সে যে ছিল, এটা এতদিন ভালো ক'রে বোঝাই যায়নি। এই এতদিন পর, পূবের জানালার এক চিলতে আকাশটাকে ঢেকে পিস্তলের নলটা যখন উঠে এল, যখন সুঁই-সুঁই শব্দে ছুটে গেল গরম সীসের গুলি, তখন, সেই সর্বেমাত্র বোঝা

গেল, যে সে 'নেই' হ'য়ে গেল। অর্থাৎ সে ছিল। এবং তার এই অকিঞ্চিৎকর থেকে যাওয়াতে কারোর-না কারোর, কোনো না কোনোরকম অসুবিধেও ছিল। ফলে থেকেও যে ছিলো ব'লে জানতো না, তাকে সে মুহূর্তে 'ছিল' ব'লে জানিয়ে দেয়াটাও বড় কম কথা তো নয়।

এ কথাটা সবিস্তারেই আলোচিত হ'ল শান্তি-কমিটির সভায়। সকলের বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত ক'রে সভাপতি মন্তব্য করলেন, সে থেকে ছিল না। না-থেকে 'আছে' হ'য়ে গেল। ব্যাপারটা খুবই ভাবনার। কথাটা বোধগম্য হ'লনা অনেকের। মুখ চাওয়া-চাওয়ির সময় সভাপতি ফের মুখ খুললেন।

'যে গেছে, সে তো গেছেই। কিন্তু যে আছে, যারা আছে, তাদের কথা ভাবতে হবে। ভাবতে হবে তো আমাদেরই।'

সকলের ধারণা 'আছে' বলতে তো আপাততঃ সেই দু'জন। মাধবের মেয়েমানুষটা আর তার সন্তান। সন্তানের বয়েস অল্প, তার কথা ভাববার অনেক সময়ই পাওয়া যাবে। কিন্তু মেয়েমানুষটাকে নিয়েই হ'ল সমস্যা। এ ব্যাপারে দায়িত্ব নেয়ার প্রসঙ্গও এল।

সভাপতি বললেন, হেমন্ত তুমি কি·· ··· ?

—আমি আছি ভুপেন দা।

'মিন্তুন তুমি ?

—আমিও আছি ভুপেন দা।

এইভাবে দেখা গেল একে-একে অনেকেই আছেন। এবং অনেকের এই থাকার কারণে বোঝা গেল, মেয়েমানুষটাও আছে। বড় ভাগ্য তার। ভাগিস সে মানুষ নয়, মেয়েমানুষ। তাই থাকতে-থাকতেই সে বুঝতে পারলো, সে আছে।

শ্যামল মজুমদারের

শাড়ির ভেতরে
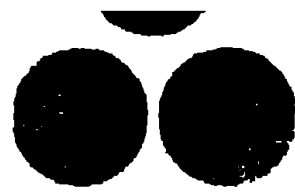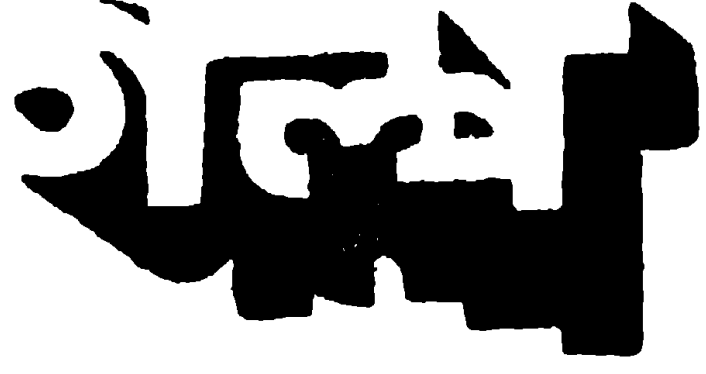
রদ্দুরের ভেতর রিক্সাটার গতি ছিল ধীর। মাথা নিচু করে মাঝ বয়সের লোকটি প্যাডেলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চালাচ্ছিল। যতটা জোরে রিক্সাটা যাওয়ার কথা, ঠিক ততটা জোরে যেতে পারছিল না। পারা সম্ভব নয়। কারণ বাতাসের টান উল্টোদিকে। পীচের রাস্তার ওপর চাকা সামনের দিকে গড়াচ্ছিল বটে। মাঝ বয়সের রিক্সাওয়ালাটির জোরও কিছু কম নয়। কিন্তু বাতাসের গতি রিক্সাটাকে টেনে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা। কেউ কী পারে সেখানে। প্রকৃতির বিপরীত দিকে যে চেষ্টা—সেটাই দৃশ্য, স্বার্থকতা তো সেখানেই। প্রকৃতিকে ভেঙে মানুষকে তার নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার যে দায়িত্ব এই রিক্সাওয়ালাটি নিয়েছে--সে তো বড় কম কাজ নয়। এমন দৃশ্য রাস্তা ঘাটে হরবকত্ এতই দেখা যায় যে চোখে সইতে সইতে তেমন করে আর কিছুই মনে হয় না।

এত বাতাসের মাঝখানেও লোকটির কপাল থেকে ঘাম রিক্সার হাতলে, হাতল ছাড়িয়ে রাস্তায় পড়ছিল। হাওয়ায় উড়ছিল চুল। রিক্সাওয়ালাকে ছুঁয়ে সেই হাওয়া গাড়ির ওপর বসে একজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার চুল-টুল, কাপড়-চোপড় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। রিক্সার হুড খোলা। রদ্দুর থাকলেও হাওয়া রদ্দুরের তেজকে শরীরে বসে চামড়া তাতিয়ে দেওয়ার সুযোগ দিচ্ছিল না। গায়ে রদ্দুর এই বসছে তো ওমনি হাওয়া এসে যেন মাছি তাড়াচ্ছে।

খুব বেশি আর দূর নেই। যেখানে তারা নামবে চোখের ওপর হাত রাখলেই হাতের চেটোর তলা দিয়ে দৃষ্টির পাট খুলে দিলে এখান থেকেই দেখা যায় জায়গাটা।

হাওয়ায় জামা গায়ে লেপ্টে গিয়ে ভদ্রলোকটির বুকের ছাতির মাপ ফুটিয়ে তুলছিল। মহিলাটি দুহাতে কাপড় ঠিক ঠাক সামাল দিতে দিতে লক্ষ্য করলো হঠাৎ, তার আঁচলটা রিক্সার চাকায় জড়িয়ে গেছে কখন। সে অবস্থাতেই কয়েকবার টানলো। হাওয়া যে কখন চাকায় লাট খেতে খেতে শাড়ির আঁচলটাকে জড়িয়ে দিয়েছে খেয়ালই করেনি মহিলাটি। আঁচল টানে আর চাকা ঘোরে। রাস্তা পেরোয় তো কাপড় জড়ায়। মহিলাটি কিছু বলে। পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে ভদ্রলোকটি দ্রুত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা যাচ্ছে তো হাওয়ার বিপরীত দিকে। হাওয়ারও তো একটা আক্রোশ আছে। তাই প্রতিশোধটা খুব সহজেই নিয়ে নিল সে।

বেশি টানাটানিতে শাড়িটা ছিঁড়ে যেতে পারে। এত দামী শাড়ি, মহিলাটি পাংশুটে হয়ে যায়। ভদ্রলোকটি রিক্সা থামাতে বলে। হাওয়ার টানের

উল্টো দিকে রিক্সাওয়ালাও যাচ্ছে। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছনোর আগে যে কোন কারণেই হোক রিক্সা থামিয়ে দেওয়া যায় না। তার কপাল থেকে ঝরছে যে ঘাম, সুতরাং তারও তো হেরে যাওয়ার ব্যাপার আছে। যেহেতু অনুরোধটা আরোহীর, তাই হাওয়া, প্রকৃতিকে ক্ষমা করে দিল সে।

রিক্সা থামলেই হাওয়া কিছুটা হালকা হয়। রিক্সাওয়ালা আর ভদ্রলোকটি চাকার ওপর ঝুঁকে পড়ে। স্পোকের ভেতর পাক খেতে খেতে এমন-ভাবে জড়িয়েছে যে ওপর থেকে হাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিছুতেই খোলা যাচ্ছে না। চারপাশে দু'একজন করে লোক জমতে শুরু করেছে। এক একজন এক একরকম পরামর্শ দেয়। আর চেষ্টা করতে করতে শাড়ির সুতোগুলো খুলে জড়িয়ে যায় বেশি। রিক্সার ওপর বসে মহিলাটি। কখনো পায়ের থেকে শাড়িটা তাকে আলগা দিতে হচ্ছে। আবার গুটিয়ে নিতেও হয় কখনো। কিন্তু চাকার থেকে শাড়িটা কিভাবে খুলে নেওয়া যায়? যেহেতু টেনে ছেঁড়া সম্ভব নয়। তাই কেউ কেউ চাকাটাই খুলে ফেলার কথা ভাবলো। তাহলে চাকা খোলার সব যন্ত্রপাতি আনার প্রয়োজন। আবার কেউ কেউ এর উল্টোটা করার প্রস্তাব রাখলো। যন্ত্রপাতির কোন দরকার নেই। খুব সহজেই শাড়িটা খুলে চাকার উল্টোদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জড়িয়ে যাওয়াটা অনায়াসেই ছাড়িয়ে নেওয়া যায়।

এটা সকলে বুঝতে পারছিল যে, দুটোর মধ্যে যেকোন একটা খুলতেই হবে। যারা দেখছিল, দৃশ্যটার থেকে একটা আদিম বস্ত্র গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা লাগে। শরীর চনমনিয়ে ওঠে তাদের। তেমন কিছু ব্যাপার নয়। যেটা সহজ সকলে সেটা করাই উপযুক্ত বলে মনে করলো।

রিক্সার থেকে নেমে মহিলাটি রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে এখন। এখানে দাঁড়িয়ে খুলতে গেলে কিছু একটা আড়াল তো দরকার। এব্যাপারে সকলেই একমত হয়ে গেল। চারদিকে দাঁড়িয়ে যে সব লোক-জন তারাই তো ঘিরে আড়াল করে রেখেছে। মানুষের এ তো বড় সুন্দর, কঠিন আড়াল।

তাহলে এবার........ভদ্রলোকটি এগিয়ে আসে কাছে। সকলে স্থির চোখে তাকিয়ে। প্রত্যেকেরই চোখের সামনে থেকে দিনের আলো সরে যায় যেন। চারদিকে ফ্লাড-লাইট। সামনেই যে মঞ্চ তাতে চূড়ান্ত দৃশ্যটা খেলে যাবে এইমাত্র। ঘিরে থাকা কয়েকটি মাথায় একটা বহু পুরনো দৃশ্য পাক খেয়ে যায় হঠাৎ। যদি দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের জীবন্ত দৃশ্যটা ফিরে আসে আবার। শরীর থেকে শাড়িরপাট খুলতে খুলতে স্তুপিকৃত হয়ে যায়।

আসলে মানুষের মধ্যে যেমন থাকে আর এক মানুষ। তেমনি শাড়ির ভেতরেই থাকে সেই শাড়ি। তার ভেতরে শাড়ি তারও ভেতরে আর এক শাড়ি। কিন্তু এখন দ্রৌপদীর মত কোন শক্তি তাকে যোগাবে সেই ক্ষমতা? এই আকাশ, রোদ্দুর, হাওয়া?
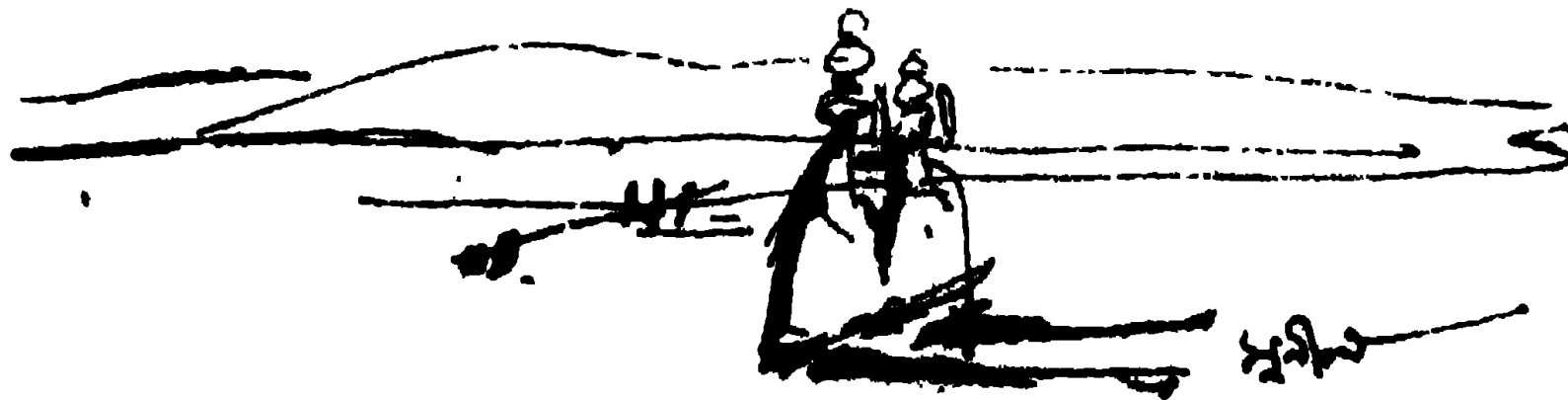
উচ্চাবচ ভূমিখণ্ডে আরোহী ও অবরোহী সুর

জগত সাহা

রবীন সুর কতো স্বচ্ছ গদ্যে অনুভূতি-অভিজ্ঞতা-আত্মব্যক্তিত্ব-নিঙড়ানো কবিতা লেখেন। কবিতার ভাষা চমৎকার তড়বড়িয়ে ছোটা গদ্যের ভাষা, আশ্চর্য তির্যক, তীক্ষ্ণ, দুঃখবেদনায় নম্র কখনো। মানুষগুলো, কবিতায় যারা আসছে, তারা জীবনযুদ্ধে মার-খাওয়া, কিন্তু লকলকে বেতের চাবুকের মতো, মচকায়, ভাঙে না। রবীন বেপরোয়া, তবু তাঁর মধ্যে কোথায় আত্মগোপন করে আছে এক দিগ্বি-জয়ী আলেকজাণ্ডার, যে বলে, কী আশ্চর্য এই দেশ, সেলুকস। যে কোনো বিষয়ই তাঁর কবিতায় এসে যায়, এ ব্যাপারে বাছাবাছি চালাই-কোঁড়াই তিনি পছন্দ করেন না। যে কোনো শব্দই কবিতায় আসতে পারে, কোনো শব্দই অকুলীন নয় (কতোদিন পরে বই মেলায় দেখা। ওর মুখটা দেখে মনে হল একদলা গু মাড়িয়ে ফেলেছে…)। রবীন সকলকে, সবকিছুকে নিয়েই ঠাট্টা বিদ্রূপ করেন, এমনকি নিজেকে নিয়েও, তাঁর মুখের ওপর মাঝে মধ্যে চার্লিচ্যাপলিনের মুখটাই যেন উঁকি মারে ভাসবো জলে অগাধ পথে—সবার মস্করা প্রোটিন ভেবে ছড়াবো রোজ হাসির শর্করা।)। কবিখ্যাতি তিনি চান বটে, যা জলের মত সম্মোচ্চ-শীল, সর্বত্রগামী; কিন্তু তিনি ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারেন, ভোরের আলোয় পৌঁছে দেখি এক পা ও এগোতে পারি নি! 'রবীনের কবিতায় আমি এক ঝোড়ো বিধ্বস্ত অথচ বিপ্লবী ও ব্যর্থকাম আত্ম-পুরুষের ট্র্যাজেডি খুঁজে পাই। জীবনকে পাশ কাটিয়ে চলতে শিখলেন না রবীন, তা-ই আরো সুষুপ্তি, আত্মনিমগ্নতা ও অন্ধকার অনুসন্ধান অপেক্ষিতই রয়ে গেল। 'পুনর্জন্ম নেই' হয়তো, কিন্তু 'শীত-গ্রীষ্ম' থেকে উত্তরণের উপায় বা আচ্ছাদন আছে অবশ্যই। রবীনকে সেকথা ভাবতে বলি।

'ভ্রূকুটির বিরুদ্ধে একা' দেবী রায়ের কবিতা গ্রন্থের এরকম নামকরণ থেকেই বুঝে নিতে কষ্ট হয় না যে, দেবী পুরো প্রতিষ্ঠান-বাদের বিরুদ্ধেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। দেবীর কবিতায় এক ভীষণ রাগী, সমাজ ব্যবস্থায় অবিশ্বাসী ও অস্থির, ব্যক্তিগত দুস্থতা-দুর্দশা সত্ত্বেও নিজস্ব সম্পদ-বিত্তে চিত্তসুখী, সময় এবং প্রতিবেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অস্থানে-স্বস্থানে ভ্রাম্যমান এক অসুখী, আপোসহীন বিদ্রূপ-শীল চিরযুবাকে খুঁজে পাই আমি। রবীনের মতো দেবীও লাগামহীন ভাষায় কথা বলেন। ববং বলা যায়, দেবী রবীনের চেয়েও মুখ-আলগা। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের নিরিখে গোটা সমাজ-সংসার-জীবনকে দেখার এবং দেখাবার অদ্ভুত শক্তি দেবীর। বারবার ঠকতে ঠকতে আর মা খেতে খেতে কি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে দেবীর। দেবী বলেন—'অপমান সইতে সইতে পিছনে দেয়াল, আমি, অপমানের গলা জড়িয়ে গেয়ে উঠি বেঁচে-ওঠার, গান।' খুব গোপন এক অসহায়তা, তা-ও তিনি সামাজিক অভিজ্ঞতার সামিল করে তোলেন (ওরা দুজন, দুজনার মৃত্যু কামনা করে রোজ নয়, যখন ঝড় ওঠে—ঈশ্বর তুমি, ওদের সং-সারে একটা জ্যান্ত খেলনা পাঠিয়ে দাও)।'

'ভ্রুকুটির বিরুদ্ধে একা'র কবিতাগুলো পড়তে পড়তে থ বনে গিয়ে ভাবতে লাগলাম, আমাদের সময়টা এতো বিশ্রী হয়ে গেছে। কলকাতা এতো নোংরা হয়ে গেছে। মানুষজন দেশ-কাল ভদ্রলোক–ছোটোলোক সবাই নোংরা! দেখুন, রোজই দেখি, পাশ দিয়ে হেঁটে যাই, অথচ গা ও চোখ-সওয়া হয়ে গেছে। দেবী চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখালেন। আমার মনে হয়, সমকালে রবীন এবং দেবীর চেয়ে ভালো কবি অনেক আছেন, কিন্তু এতো জীবন ও পরিবেশ-সচেতন কবি ভারি অল্প। কবিতায় প্রসাধন নেই, 'মোচড়' নেই (কোনো এক বর্ধিষ্ণু কবির শব্দ চুরি করে বললাম), ভারি ন্যাংটা-ন্যাংটা। কিন্তু এ-ও বোধহয় এঁদের কবিতার ভূষণহীনতায় ভূষণ—সাধু-সন্ন্যাসীর কি ভূষণ লাগে তার তো লাগে ভুষো।

অভিজিৎ ঘোষের 'দুঃখী দেবতার আত্মচরিত' যে তাঁর, এই সময়কালের আগুনেপোড়া এক জটিল মানুষের আত্মকথা তা বুঝতে আমার কষ্ট হয়নি। অভিজিৎ ভারি নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গিতে বড়ো বড়ো কবিতায় কি চমৎকার সব কথা বলেছেন। কবিতাগুলো যখন পড়ি নিজের মনে, যেন নিজেরই লেখা পড়ছি। মাত্র কয়েকটি লাইনে কিভাবে যে আমার মনোভাব প্রকাশ করি। কোন্ পংক্তি ছেড়ে কোন্ পংক্তি যে উদ্ধৃত করি! কারণ তার কবিতাগুলো গড়গড় করে কয়েক লাইন না পড়ে গেলে একটা বিশেষ কথাবৃত্ত বা চিত্রবৃত্ত কোনোটাই ঠিক বোঝা যায় না। তবে একথা বলিনা যে, সব কবিতার চরিত্রই এইরকম, একরকম। অনেকগুলো কবিতা পাচ্ছি, যেগুলো অনেক কথার, ঝুড়ি, কিন্তু কবিতা নেই কোথাও। কিন্তু প্রাপ্তি যে সে তুলনায় অনেক বেশি, তা স্বীকার করতেই হবে। দু-একটি কবিতা থেকে কিছুকিছু পংক্তি তুলে দিই: 'যোনির সংকেতে পয়ারের শব্দ শুনি; ইমন কল্যাণ'; 'কবিতার বন থেকে তুলে আনা চমৎকার সাদা ফুল আমি। একদিন টুক্ করে ঢুকে পড়বো মৃত্যুর অলৌকিক যানে; 'রমণীর সিঁথির মতো সরু আলপথ'; ত্রিতাপ দুঃখের মাঝে ঝরে যাই ঝুরু ঝুরু। বয়সের, ঘরে পড়ে মহাকালের ঢেঁড়া। আধখানা জীবনের হু হু।'

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ভারি শান্ত মৃদু আর নম্র—কবিতার মেজাজে। সময়ের উতরোল তিনি শোনেননি, সময়ের প্রতিকূলতায় তিনিও বিদ্ধ হন; কিন্তু অভিমানী মৃদু এবং নিজস্ব প্রতিবাদ তিনি গুন-গুন করেন ('আমি একা কেন্দ্রাতিগ প্রত্যাশী আমি মায়া মানস আধোঘুম কাছে আসে সব কিছু করে একাকার।') প্রকৃতি ও নারীকে একাত্ম করে দেখতে ভালোবাসেন কবি ('পেশোয়ার মেয়েটি যেন এভারগ্রীন পরমা প্রকৃতি'), কিন্তু কেমন যেন এক নিস্পৃহতা ('রতি ও রমণে তার গূঢ় অভিমান')। গৌর কবিতায় বেশ সুন্দর ছবি আঁকেন মাঝে মাঝে ('মেঘের মিনার ছুঁয়ে গোপন আবেগে উড়ে যায় ধুসর ঈগল'; 'আয়েসি রাত্রির চাঁদ চলে যায় বিলি কাটি চোখের সমুখ অন্ধকারে'; 'বরফকুচির মতো হিমঝড় ছুটে আসে। তোমার দুহাত পশম গরমে রমণীয় হয়'।) বলা বাহুল্য ছবিগুলো বাইরের নয়, ভেতরের, অনুভূতির রসে জারিত। জীবন সম্পর্কে খুব সোচ্চার প্রতিবাদ বা বিদ্রূপ নেই, বরং জীবনকে ভালোবাসার মৃদু উচ্চারণ পাই তাঁর কবিতায়। সময় সংকেত জেনে ফেলেও কবি কিন্তু রোম্যান্টিক (আমি পালাতে চাই……কোথায় কোন বাক্যহীন জীবনে দূর জগতের স্বর নেই চরাচরে'।)

গৌরের এই রোম্যান্টিক আচ্ছন্নতা, অলস ও মেদুর আত্মপলায়ন এক চিরপুরাতন স্বাদই এনে দেয়। শুধু ভাববিলাস নয়, কখনো কখনো অস্তিত্বের গভীর কুহক

আবিষ্কারেও গৌর আত্মনিমগ্ন ('একটা অস্তিত্বের নিকট জমি ছেড়ে একটা বীজের অন্ধকার ছেড়ে একটা অকারণ হাওয়ার ভাসা শরীর ছেড়ে, অতি-চেতন স্পর্শ গন্ধ মায়া নিয়ে আমরা থাকি'...)। শেষের দিককার কবিতাগুলো পড়ে মনে হল, গৌরের কবিতায় সুরবদল হতে চলেছে

- শীতবসন্তের কবিত : রবীন সুর
  অরণি প্রকাশন, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা,

ভ্রূকুটির বিরুদ্ধে একা : দেবী রায়
মহাদিগন্ত, বারুইপুর, ২৪ পরগণা

দুঃখী দেবতার আত্মচরিত : অভিজিৎ ঘোষ
ইয়ং রাইটার্স ১৬০ মাণিকতলা মেইন রোড, কলকাতা—৫৪

নিকটে আমার দিন : গৌরশংকর বন্দ্যো:
মরীচি, ৯৮/১ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা—১৪

ছড়া/সরল দে

হালুম হুলম করছে করুক
মানুষখেকো বাঘরা,
ভাগের মা-কে ভাগ করে নিই
দাও কেন হে বাগড়া ?
রাজা বললে, চুক্তি করো—
খেদাও উলুখাগড়া।

* * * *

রাজায় রাজায় ধানাই পানাই
ওম্ শান্তি ওম্
কে কার আগে জলে ভাসায়
তেজস্ক্রিয় বোম।

* * * *

তুমি আছো দূরে ওয়াশিংটনে
আমি আছি এই রহড়ায়,
প্রহরে প্রহরে ঘুম ভেঙে যায়
তারা যুদ্ধের মহড়ায়।
ধ্রুবতারা তবু ঝলমল্ করে
কালপুরুষের প্রহরায়।

বাঘের থাবা বনাম সুন্দরবনের বিধবাপল্লী

সমীরণ মুখোপাধ্যায়

স্বামীদের প্রাণ নিয়েছে বনের বাঘ কিমবা জলের কামট তাই এলাকার নাম হয়েছে বিধবা পল্লী। গোটা সুন্দরবন এলাকার এমন বিধবা পল্লীর পরিসরস্থান নেহাৎ কম নয়। সরকারী কাগজপত্রে বনের বাঘের কামড়ে মৃত্যুর খতিয়ান চট করে লেখা হয় না কেন না তাতে অনেক ঝামেলা, তবুও মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে সুন্দরবনের বিধবা পল্লীর বার্তাটি। বেসরকারী এক পরিসংখ্যান বলছে ১৯৭৬-৮৫ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মহকুমার মোল্লাখালি, পাখিয়ালয়, পালামাড়ি ও সাতজেলিয়ার বনসংলগ্ন এলাকা থেকে অন্তত: ৭৩৭ জন তাজা মরদ বাঘের পেটে গেছে কিংবা কামঠের ঘায়ে জখম হয়ে পচে ফুলে মরেছে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প দপ্তরে কিন্তু এর কোন সঠিক হিসেব নেই, প্রকল্পের অনেক আধিকারিকের বক্তব্য, ওরা সবাই বেআইনীভাবে কাঠ কিংবা মধু আনতে গিয়েছিল। অতএব তালিকা রাখা সম্ভব নয়।

তবু যাদের জিনিষ যায় তারা তো সংখ্যাতত্ত্বকে মনে রাখবেই। পেট কোন অজুহাতই মানে না তাই জঙ্গলে যত টহলদারীই

সুন্দরবনের শিশু পেটের ধান্দায় শামুক, গুগলির খোঁজে একেও পথে বেরতে হয়েছে

ছবি : প্রদীপ ঘোষাল

থাক রুটি রোজগারের ধান্দায় মানুষ জঙ্গলে ঢুকবেই। আর এইভাবে প্রবেশ মাশুল গুনছে সুন্দরবনের কয়েক হাজার বিধবা। ওপরের অংশে যে চারটি এলাকার নাম উল্লেখিত আছে সেটি ছাড়াও গোসাবা, বাসন্তী, সন্দেশখালি ব্লকের দুর্গম গ্রামে কয়েক হাজার বাঘে খাওয়া মানুষের স্ত্রী পুত্র পরিবার রয়ে গেছে।

সুন্দরবনের রাজত্বে প্রবাদ আছে এখানকার স্বামী হারা স্ত্রীরা কখনও চেঁচিয়ে কাঁদে না। এতে অমঙ্গল যত না হয় তার চেয়েও বেশি বিপদ আইনের। একটু চেঁচামিচি হলেই পুলিশ এসে সদ্য বিধবা-টিকেই পাকড়াও করে নিয়ে যাবে। কেন না তার স্বামী যাকে বাঘে মেরেছে সে কেন অনুমতি না নিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছিল? ঝুট-ঝামেলার ভয়ে এখন সুন্দর-বনের সদ্য বিধবারা সবাই প্রায় বুকের কান্না বুকে চেপে শাঁখা ভাঙে নদীর পাড়ে, সিঁদুর মুছে আবার তোড়জোড় করে রুটি যোগাড়ের।

সাতজেলিয়া গ্রাম সুন্দরবন এলাকার বড়সড় বিধবা পল্লী, ১৯৮৪ সালের নভেম্বর মাসে এই সাত-জেলিয়া গ্রামে একটি বাঘ লোকালয়ে ঢুকে নির্ব্বিচারে গরু-ছাগল মারতে থাকে। এই অবস্থায় কয়েকজন ডাকাবুকো ছেলে ছুটেছিল তীরধনুক আর বল্লম নিয়ে। তখনও ব্যাঘ্র প্রকল্পের কর্মীরা হাজির হয়নি ঘটনাস্থলে, ডাকাবুকো ছেলের দলে ছিল ২৩ বছরের শক্তসমর্থ তরুণ গঙ্গাধর জানা। হঠাৎ তার দিকে বাঘ তেড়ে যায়। কানের পাশে অনেকখানি চামড়া এখন বিশ্রী অবস্থায় ঝুলছে গঙ্গাধরের। ঘা পুরোপুরি শুকোয়নি। ৪ মাইল দূরের এক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে লাল ওষুধ এনে মাখছে গঙ্গাধর।

এই সাতজেলিয়া গ্রামের অন্ততঃ ২০ জন গত পাঁচবছরে বাঘের পেটে গেছে। গোটা গ্রামের প্রায় ৭০ ভাগ মানুষ বনের কাঠ কুড়িয়ে কিংবা নদীর মাছ ধরে সংসার চালায়। ৫০ বছরের বৃন্দাবন বাইনের জোয়ান স্বামী গতবছর এক পূর্ণিমার রাতে জঙ্গলে ঢুকেছিল কাঠ কাটতে। তারপরই বাঘের থাবা। পঞ্চু বাইনের লাশ আজও উদ্ধার হয়নি। তবে খবরটা পরের দিনই রটে গিয়েছিল। জঙ্গলের নিয়মই তাই। যারা প্রাণ মুঠোয় নিয়ে কাঠ কাটতে কিংবা মধু আনতে যায় তাদের জন্য ঘরের লোক ৪-৫ দিন সবুর করে। ছ-দিনের মাথায় না ফিরলেই সিদ্ধান্ত হয়; বাঘে নিল

সুন্দরবনের এক বিধবা, শুখা জমির মতই সব স্বপ্ন উবে গেছে
ছবি : প্রদীপ ঘোষাল

মানুষটাকে।

এইভাবেই সাতজেলিয়া গ্রামের চামী দাসী, তারাবালা মোড়ল, ভাগ্যবতী বহিন, আলতা মণ্ডল, করুণা বায়েন, কালীদাসীর স্বামীদের বনের বাঘ টেনে নিয়েছে, যাদের পুরুষমানুষটি গেছে তাদের ভাগ্যে নতুন করে বিপর্যয় ঘনিয়েছে। ঘরে হয়ত ৪-৫টি ছেলেমেয়ে, সোমথ কেউ নেই যে রোজগার করে আনবে। উপায়? একটা উপায় আছে দল বেঁধে নদীর পাড়ে গিয়ে হাতজাল পাতা কিংবা গলদা চিংড়ির পোনা ধরা। করুণা বায়েন স্বামী মারা যাবার পর গলদার পোনা ধরেই ভাত যোগাড় করছে। কালীদাসী জঙ্গলকে ভোলেনি, রোজ ছোটে কাঠ কুড়োতে, বলে, তেনাকে বাঘে নিল আমি আর বাঁচি কি কর্তে?

গোসাবা কিংবা সন্দেশখালি থানার অনেক গ্রামের অসহায় বিধবারা এখন অনেকেই কলকাতার ফুটপাতের বাসিন্দা, বাবুদের বাড়ি কাজ করে। রাতে ফুটপাতে ঘাপটি মেরে শোয়, সন্তবিধবাদের বিপদ শুধু গাঁ ঘরেই নয় শহরেও ওঁৎ পেতে থাকে। ১৯৮৩ সালের ফাল্গুনে বাঘে খাওয়া এক মরদের সমথ বউ এখন কলকাতার নিষিদ্ধ পল্লীর বাসিন্দা, শুধু শহর বলি কেন সুন্দরবনের অনেক গ্রামের অল্প কিংবা মধ্যবয়সী বিধবারা এখন গনিকা বৃত্তির অসহায় শিকার। তাতেও নুন-ভাত জোটে না। এক বিধবার কাতর স্বীকারোক্তি, ঘরে তিন তিনটে বাচ্চা। সবকটাই রিকেটে ভুগছে। অনেকেই বিকলাঙ্গ। হাড় সর্বস্ব শরীরটুকু নিয়ে তাকিয়ে আছে কখন মা ফিরবে। বাপটাকে অনেক ছেলে-মেয়েই দেখেনি হয়ত।

এইভাবে বছরের পর বছর প্রকৃতির অভিশাপ, বাঘের থাবা, কামটের চোট আর প্রতি পদে পদে অবজ্ঞা, লাঞ্ছনার জটাজালে আটকে আছে সুন্দরবনের দুর্গম গ্রামের অসহায় বিধবাপল্লী আর তাদের পরিবার পরিজন। স্বাধীনতার পৌনে চার দশক পার করে অন্ধকার আজও ফিকে হল না।
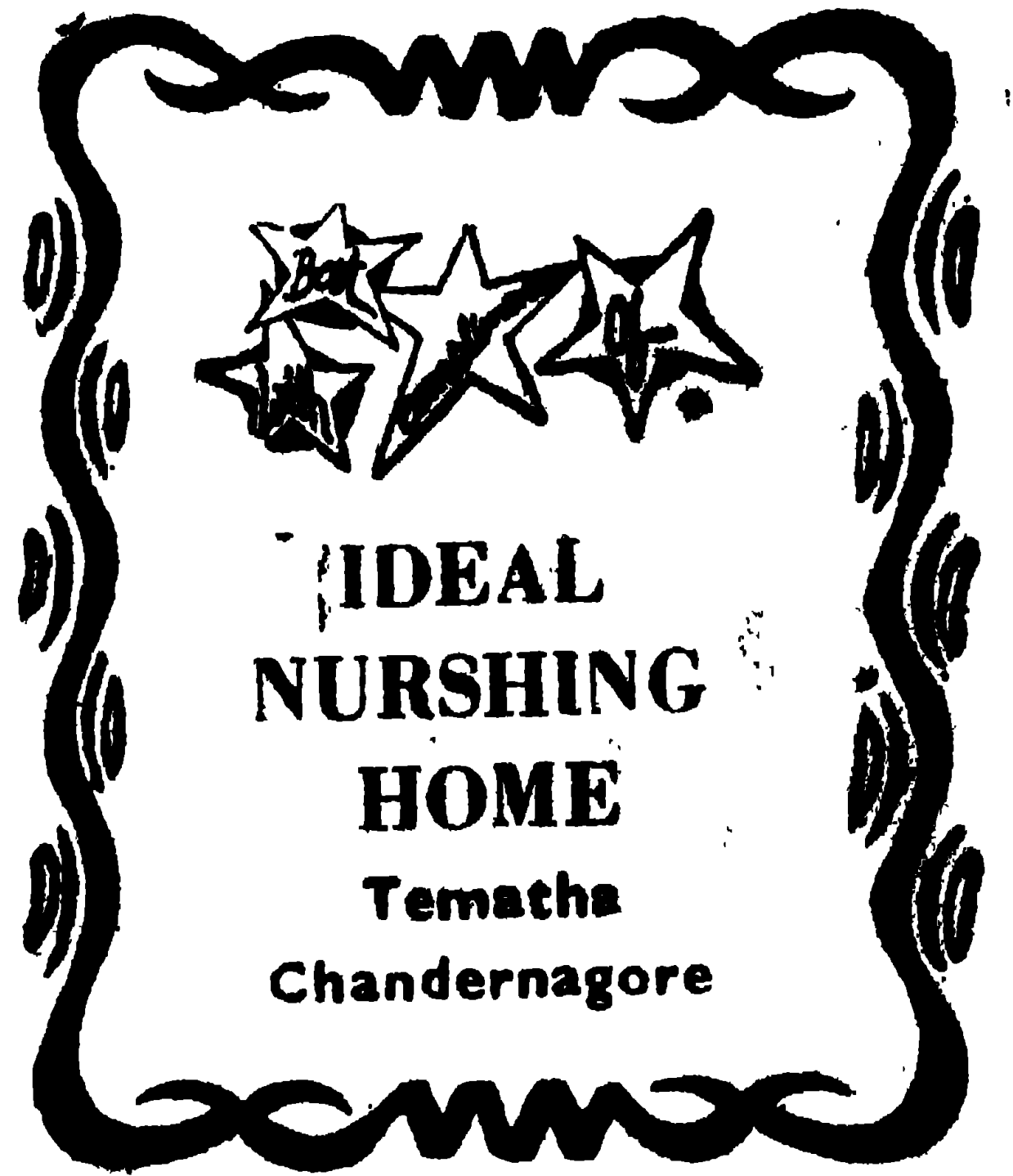
সংবাদ

○ পঞ্চমা সাহিত্যবাসর ১৯৮৫

গত ৮ই সেপ্টেম্বর মহিষাদল রবীন্দ্র পাঠাগার মঞ্চে 'পঞ্চমা' সাহিত্যবাসর ছিলো এক শুদ্ধতম ধ্রুপদী অনুষ্ঠান। বেলা ৩টা ২৫ কিশোরী মোনালিসা বসু সকল উপস্থিত অতিথি ও কবি সাহিত্যিকদের একটি করে লালগোলাপ দিয়ে বরণ করেন। ইতিপূর্বে অভ্যর্থনা টেবিলে প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে লাঞ্চ-চা-বৈকালিক টিফিন ও ডিনারের কুপন। সঙ্গে আরও দেওয়া হোল তিন রঙের 'পঞ্চমা'-র স্মারক অভিজাত 'ব্যাচ'। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশনের পরই মূল অনুষ্ঠানের প্রাণপ্রতিম উদ্যোক্তা ও 'পঞ্চমা'র সম্পাদক শ্রীসোফিওর রহমান প্রাঞ্জলভাবে তাঁর খোলাখুলি বক্তব্য রাখেন। একইসঙ্গে শুরু হোল কবিতার আলোচনা, কবিতাপাঠ, দর্শকওয়ারী বিদগ্ধ আলোচনা। কবিতা পড়লেন যথাক্রমে অমিত বিক্রম রাণা, নিতাই জানা, মহিউদ্দীন, শম্ভু রক্ষিত, কল্যাণ দাস, অলকেন্দু শেখর পত্রী, কৃষ্ণলাল মাইতি, শ্রীধর মুখোপাধ্যায়, তাপস চক্রবর্তী, নির্মল বসাক, ব্রজ চট্টোঃ, প্রবীর রায়, এ লায়লা প্রভৃতি।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে কবিতার গান পরিবেশন করলেন ঋত্বিক মিত্র ও সুকুমার পাহাড়ী। কিছুক্ষণ অবকাশে মঞ্চে বসেই পাওয়া গেলো চা-জলযোগ এবং উপস্থিত সকল সদস্যের উষ্ণ আতিথ্য। সভাগৃহের চারশো আসন কখন যেন কানায় কানায় ভরে উঠেছে। কবিতার নানা দিক ও বিষয় নিয়ে অত্যন্ত গভীর ও মনোজ্ঞ আলোচনা করলেন শ্রীধর মুখোপাধ্যায়, গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তম দাশ, অশোক চট্টোপাধ্যায় সজল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গৌরাঙ্গ ভৌমিক।

এখানে, উল্লেখ না করে উপায় নেই অরুণকুমার চক্রবর্তী এবং সজল বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন কবিতাপাঠে মুগ্ধ করেন তেমনই দুই শিশুশিল্পী রক্তিম রহমান এবং অদিতি (মৌ) চট্টোপাধ্যায় তাদের সাহস সুন্দর আবৃত্তিতে সকলের নজর কেড়ে নেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশিত হোল কৃষ্ণলাল মাইতির কাব্যগ্রন্থ 'এখন তাকে কোথায় পাবো'। বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন কবি গৌরাঙ্গ ভৌমিক। বিশেষ সংখ্যা হিসেবে 'পঞ্চমা' সাহিত্যবাসরকে উৎসর্গীকৃত 'মরীচি' পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এটি উদ্বোধন করেন কবি উত্তম দাশ। ঠিক তখনই শ্রোতার আসন থেকে বারবার অনুরোধ এলো 'গোধূলিমন' এর সম্পাদিক অশোক চট্টোপাধ্যায়কে লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে কিছু বলার জন্যে।

প্রথম থেকেই মঞ্চ ও শ্রোতাকক্ষ জুড়ে রঙিন ক্যামেরা ঘোরাফেরা করছে। ঘন ঘন চা আসছে। রাত্রি তখন প্রায় ন'টা। লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরীর কর্মাধ্যক্ষ সন্দীপ দত্তকে মঞ্চে তুললেন পরিচালক। সন্দীপ দত্ত সুন্দরভাবে তাঁর বক্তব্য রাখলেন। উত্তম দাশ, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তখন চারশোজন শ্রোতার কাছে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠছেন তাঁদের কবিতা পাঠ ও আলোচনার জন্যে। কৃষ্ণা দাস ও শশাঙ্ক মাইতি তরুণ কবিদের কবিতা পাঠ করে শোনাচ্ছেন, তখন নাটকের দল এসে উপস্থিত। দশটায় মঞ্চস্থ পর পর একাঙ্ক। শ্রোতাকক্ষের চারিদিকে তখন উপচে

সাধারণ দর্শক। এরপর প্রায় সবাই 'পঞ্চমা'র আথিতেয়তায় কাছাকাছি বাংলো, হোস্টেল, হোটেল এবং মোসলেমা খাতুন ও অন্যান্য অনেকের ব্যক্তিগত আবাসগৃহে রাত্রিযাপন করেন। পরদিন বেলা এগারোটা নাগাদ সবাই প্রায় চলে এলাম, কিন্তু মন পড়ে রইলো 'পঞ্চমা' সাহিত্যবাসরের অই উষ্ণ আসরে। মফঃস্বলে এত অভিজাত অনুষ্ঠান যে করা যায় সোফিওর তা প্রমাণ করলেন। অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন দিব্যাংশু মিশ্র, হরপ্রসাদ সাহু দেবাশীষ মাইতি, নিরঞ্জন মিশ্র, চঞ্চল পাড়ুই প্রভৃতি

O প্রগতি শীল সংসদের কবি সংবর্ধনা

হাওড়া জেলায় সাবসিটে ডানপিটে কবি পার্থ বসুকে কবি হিসেবে বরণ করা হল ফুলে, স্তোত্রে এবং তাঁর লেখা কবিতা পাঠের মাধ্যমে। বলাবাহুল্য নয় এসবই তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'ব্যাঙ প্রথামত জিভটাকে উল্টে নেয়' এর মুখ চেয়ে। আবৃত্তিকারদের মতো সোহাগী গলায় কবি মাবুদ আলি তার স্বগত বক্তব্যে জানাল ঠিক এইখান থেকেই পার্থদার পথ চলা শুরু হল, থামা নয়। পার্থবসু তাঁর বয়ানে জানালেন তিনি এই কবিতাগুলির যুগপৎ বাবা ও মা। যেহেতু সৃষ্টির ঔরসের মতোই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের জঠর-যন্ত্রনাও তাঁকে পোয়াতে হয়েছে বেশ। এ প্রসঙ্গে তিনি কবিতায় পাঠকদের মুক্তহস্ত হতে অনুরোধ জানান। পরবর্তী অংশে স্বরচিত লেখাপত্তর পাঠ করল অনেকে। বাদল মাঝি, রতন দাস, দিলীপ মালিক, শ্রীকান্ত পাল, কালীকৃষ্ণ গুহ, সোমনাথ চক্রবর্তীর অর্থ কমবেশী উপস্থিত সুধীজনদের আনন্দ দিতে পেরেছিল। আফসার আমেদের কবিতা সম্পর্কিত আলোচনা কম কথায় অনেক বেশী কিছু দিলো। সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ট্রেন ধরার ব্যস্ততা নিয়ে গলার পাঠ করলেন 'দিনেশ দাসকে' উৎসর্গ করা কবিতা। অনুষ্ঠানের সব থেকে 'ফরগেট এবল' কবিতা পড়লেন গোপাল মণ্ডল, তাঁর লেখায় ক্রমবনতির লাঞ্ছিত ছাপ সুস্পষ্ট।

O ধানবাদে বাংলা নাটক

নাটক : 'বাজীকরের খেলা'

রচনা : অজিত রায়

নাট্যরূপ : সোমনাথ চৌধুরী

নির্দেশনা : অতনু গুপ্ত

অনুষ্ঠান : ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৫,
আই এস এম অডিটোরিয়াম, ধানবাদ

প্রযোজনা : আমরা ক'জন, কুলতলা ধানবাদ

বিবাদমান রাজনীতি ও সামাজিক দুর্নীতিকে বিষয় করে লেখা অজিত রায়ের কাহিনী 'বাজীকরের খেলা' নাটকটি গত ২২শে সেপ্টেম্বর ধানবাদে বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ মাইন্স অডিটোরিয়ামে মঞ্চস্থ করা হলো। এর নাট্যরূপ দিয়েছেন সোমনাথ চৌধুরী এবং পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী অতনু গুপ্ত। নাটকটি প্রযোজনা করেন ধানবাদের সুখ্যাত নাট্যগোষ্ঠি 'আমরা ক'জন'। এই গোষ্ঠির এটি দ্বিতীয় নাট্য প্রয়াস। 'বাজীকরের খেলা' সেদিন ধানবাদের সন্ধ্যাকে মাৎ করে রেখেছিল। সমালোচক ও দর্শকমণ্ডলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বাজীকরের খেলার স্মরণীয় হয়ে থাকার আশ্বাস। ধানবাদের নাট্যসংস্থাগুলি ও নাট্যমোদিদের কাছে 'আমরা ক'জন' তাদের দ্বিতীয় নাট্য প্রয়াসের মাধ্যমে একটি নতুন নজীর গড়লেন। আশা করা যায় এই গোষ্ঠি ভবিষ্যতে আরো সুষ্ঠু ও মার্জিত রুচিবাহী নাটকের প্রযোজনা করবেন।

O শিল্প ও সাহিত্যের অনুষ্ঠান

৬ই আগষ্ট শিশির মঞ্চে এক সুন্দর সাহিত্য সভার আয়োজন করেছিলেন শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅনিলকুমার দত্ত। যে কোন কারণেই হোক প্রতিষ্ঠিত কবি সাহিত্যিকরা প্রায় সকলেই উপস্থিত থাকা সত্বেও দর্শক সংখ্যা একশোর এ ধারে-ও ধারে ছিল।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ড: প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র, ডঃ মণীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী, চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লুণ্ঠনের বীর সৈনিক গণেশ ঘোষ এবং তথ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীপ্রভাস চন্দ্র ফদিকার।

সাহিত্য এবং লিটিল ম্যাগাজিন নিয়ে তথ্যমন্ত্রীর আলোচনা খুবই মনোজ্ঞ হয়েছিল। তিনি যে লিটিল ম্যাগাজিন নিয়ে যথার্থই ভাবেন সে কথা তাঁর আলোচনাতে ধরা পড়েছিল।

শিল্প ও সাহিত্যের প্রতিযোগিতার মুদ্রণ সৌকর্যের জন্য দিল্লীর 'প্রাংশু' পত্রিকা, প্রচ্ছদের জন্য 'গোধূলি মন' ও 'বাসুর ঘাট সংবাদ'। কবিতার জন্য মিহির ঘরামী ও গোপাল কুম্ভকার পুরস্কৃত হন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে কবিতার গীতিরূপ পরিবেশন করেন সবিতাব্রত দত্ত।

O অথঃ রোটারী আই. এম. এ সংবাদ

গত ৪ অক্টোবর ৮৫' ডিস্ট্রীক্ট্ গভর্নর ৩২৯ রোটারিয়ান অজয়কুমার দত্ত ভদ্রেশ্বর গেট বাজারে রোটারী আই এম এ ক্লিনিক পরিদর্শন করেন। তিনি অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন যখন রিপোর্টে লক্ষ্য করেন যে ভদ্রেশ্বর কেন্দ্র গত বছরের তুলনায় হয়েছে আরও কর্মমুখর, নতুন খোলা কেন্দ্র চাঁপদানী খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়েছে এবং বিঘাটি শিশু সেবা-সদনকে কেন্দ্র করে আশে পাশের গ্রামের বহু বাচ্চাকে করা হয়েছে রোগমুক্ত। এছাড়া তেলিনীপাড়া ভদ্রেশ্বর-হাই স্কুল, নেহেরু স্কুল ও কাশমেল-উদুম, তেলিনীপাড়ায় সবছাত্রকে দেওয়া হয়েছে ডিফথিরিয়া ও টিটেনাসের প্রতিষেধক।

শুধু গত তিনমাসেই (জুলাই, আগষ্ট সেপ্টেম্বর ১৯৮৫) তিনটে সেণ্টার থেকে দেওয়া হয়েছে পোলিও = ৯০১ ডিপিটি = ৮৬৪ ডি টি = ৭০ টি টি = ১১১৭ ফলিফার ট্যাবলেট = ১১৬০০ নিরোধ = ৭০০ ওরাল পিল = ২৩, ২ বছরের মধ্যে নয়টা টিউবেক-টোমী ক্যাম্পে ১৭৪ জন মাকে বন্ধ্যাকরণ করা হয়েছে।

০ প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি মন ০

০ 'গোধূলি-মন'-এর জা পল সার্ত্র্‌ স্মৃতি সংখ্যাটি বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে। পত্রিকাটি বেশ উন্নতমানের বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা তার থেকে আপনার পত্রিকা আলাদা। তাই বিশেষ আগ্রহ জেগেছে। নমস্কারান্তে

বরুণ মজুমদার

সংবাদ বিভাগ, আকাশবাণী

০ সার্ত্র্‌'এর ওপর বিশেষ সংখ্যা করা সাহসের পরিচয়, এবং হাতে মজুত ভালো প্রাবন্ধিক না থাকলে খুব দুঃসাহসিক কাজও। আপনার অজিত রায় একাই ভরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কলমের জোর খুব, তিনি খাঁটি মৌলিক প্রাবন্ধিকের মতোই প্রয়োজনে মতান্তরে গেছেন। সন্দেহের কারণ তিনি যুক্তির মাঝে তুলে ধরেছেন। আমার কাছে এটি একটি সুন্দর পাঠ।

সেই তুলনায় অমল হালদার তৃতীয় শ্রেণীর। তিনি কি ইংরেজীর অধ্যাপক? দুঃখজনক কচাকচি তাঁর লেখায়, আদৌ গভীর নয় এবং বিরক্তিকরও। অজিত রায়ের পাশে ভীষণ ম্রিয়মান। অনূদিত ইংরোস্ট্রেটস ভালো লেগেছে, অথচ ভাষায় বাঁধুনি একটু জোলো আর পরোক্ষ-ভাবে আপনার কৃতিত্ব অসামান্য। ২৬টি পাতা সুসম্পাদনারই উদাহরণ।

সংযম পাল

বোলপুর/বীরভূম

০ গোধূলি মত নিয়মিত পাচ্ছি বলে কৃতজ্ঞ। ভাদ্র সংখ্যায় বাংলাদেশের কবিতা যদিও প্রতিনিধি স্থানীয় নয়, কিন্তু মাটির গন্ধ ও মানবিক অকৃত্রিমতায় মাখা বলে আমাদের বুদ্ধিবিলাসী নীরক্ত কবিতার পাশাপাশি কত আলাদা লাগছে! এই উপঢৌকনের জন্য ধন্যবাদ। প্রবন্ধ প্রথাগত না হয়ে শিল্প সাহিত্যের সাম্প্রতিক প্রবণ-তার ওপর বা ঐতিহ্য সম্পর্কিত হলে বেশ ভালো হয়। কিন্তু জানি, পল্লবগ্রাহী সমাজে একটি দুটি মননময় প্রবন্ধ সংগ্রহ করা কত কঠিন। আপনারা নিয়মিত ভাবে কি করে যে কাগজ প্রকাশ করছেন ভাবলে অবাক লাগে। তরুণদের কাছে 'গোধূলি মন' ক্রমশই আত্মীয় হয়ে উঠছে, দেখে ভাল লাগছে, এমন কি আমাদের মত বয়স্ক মানুষরাও ভালবেসে ফেলেছি কাগজটিকে তারই স্বীকৃতি এই হঠাৎ পত্র॥ শুভেচ্ছান্তে—

বাসুদেব দেব

ডি-৫, গার্ড হাউস এস্টেট

কলকাতা-৭০০০৪৮

আমার জীবনই আমার বাণী

সত্য
অহিংসা
শান্তি
প্রেম
সহনশীলতা
নির্ভীকতা
সরলতা
সাম্য
স্বদেশী

গান্ধীজীর কাছে এগুলি কয়েকটি প্রতীকী শব্দমাত্রই ছিল না। তাঁর প্রতি কাজ, প্রতিটি আচরণ ছিল ঐ পরশমণিগুলির স্পর্শে উজ্জ্বল।
আর তাই তাঁর জীবন ছিল মানবতা, মানবীয় মূল্যবোধের সার-সত্তা। তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি বাক্য শুধু শব্দের সমষ্টি-মাত্রই ছিল না—ছিল প্রকৃত অর্থে মহাত্মার বাণী।

এই বাণীই আমাদের
চিরদিনের প্রেরণা
হয়ে থাকুক
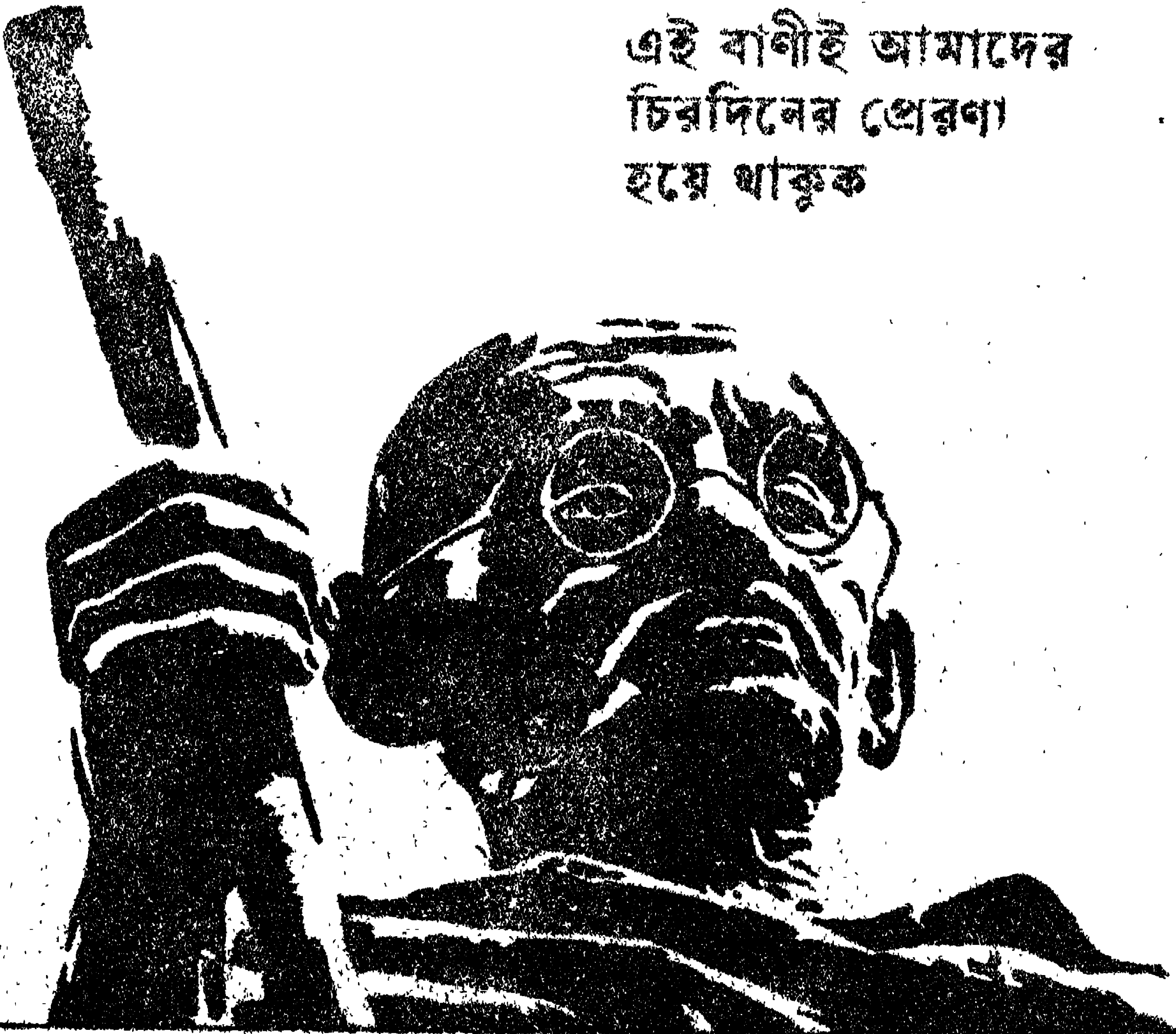
O প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন O

O মূলত লিট্‌ল ম্যাগাজিনের মান প্রবন্ধ যতখানি বাড়াতে পারে গল্প বা কবিতা ঠিক ততখানি নয়। যদিও কবিতাই সাহিত্যের মূল রস, 'গোধূলি-মন' বেশ কয়েকটা সংখ্যা পড়ার পর উল্লেখ যোগ্য প্রাবন্ধিক হিসেবে দুজনের নাম করা যায়, প্রথমত অজিত রায় এবং তারপরে অমল হালদার। এই দুই ব্যক্তির উদ্যোগেই জাঁ পল সাত্রঁ সংখ্যা বিশেষভাবে প্রশংসার দাবী রাখে। তবে সাত্রঁ'র জীবন দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়ে আরও বড় সংকলন করতে পারলে ভালভাবে পরিস্ফুট হত। তবে এর কারণ যে নিঃসন্দেহে অর্থাভাব সেটা ম্যাগাজিন করতে গিয়ে আমরাও বুঝি।

অজিত রায়ের প্রবন্ধে সাত্রঁ বিষয়ক আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন "এইভাবে মার্কসবাদের সমর্থক হয়েও অস্তিত্ববাদের নিরিখে মার্কসীয় অবশম্ভাবিতা তত্ত্বের বিরুদ্ধাচার করেছেন।" অস্তিত্ববাদের নিরিখে নয় 'সত্তা ও অনস্তিত্ববাদের' (Being and Nothingness) নিরিখেই এর বিরোধীতা করেছেন। এছাড়াও তিনি বলেছিলেন মার্কসবাদই শেষ কথা নয়। অর্থাৎ এর বাইরেও মার্কসবাদের সঙ্গে কিছু অবৈরী দ্বন্দ্ব ছিল সেটা উক্ত প্রবন্ধে পরিষ্কার হয়নি।

সিমোঁ দ্য বোভোয়ার সঙ্গে দীর্ঘকাল বসবাস করার পরেও তিনি তাঁকে বিয়ে করেননি কিংবা সন্তানের জন্ম দিতেও রাজী হননি। অথচ একটি মেয়েকে দত্তক রেখে প্রতিপালন করেছিলেন। এই ধরণের স্ববিরোধী মানসিকতার উৎপত্তি হয়েছিল কোন দার্শনিক চিন্তা থেকে? যদিও ব্যক্তিগতভাবে ফ্রয়েডীয় ও মার্কসীয় যৌনবাদকে মেনে নিয়েছিলেন, অজিত রায়ের প্রবন্ধে এগুলোর আরও একটু বিশ্লেষণ দরকার ছিলো।

সার্ত্রে'র জীবনে এক মহান আবিষ্কার 'মানুষের সংহতি'। দস্তয়েভস্কি বলেছিলেন মানুষকে চরম সংকটের মুখোমুখি না দেখলে তার স্বরূপ স্পষ্ট করে জানা যায় না। সেটা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে চাকরি করতে গিয়ে। ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে 'গোধূলি-মনে'ই কয়েকটা সংখ্যা আগে দেখলাম ইন্দিরা গান্ধী বিষয়ক নিবন্ধে। তাতে রেজাউল করিম লিখেছেন ইন্দিরা গান্ধী সমাজতন্ত্রের পথে দেশকে এগিয়ে দেবার জন্য প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আমার প্রশ্ন মুখে তিনি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংমিশ্রণ ঘটালেও প্রয়োগগত ভাবে তিনি কি তাই চেয়েছিলেন না করেছিলেন?

অলক ভড়
রাজবলহাট, হুগলী

O বহুকষ্টে গোধূলি-মনের সাত্রঁ সংখ্যা জোগাড় করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে। আজকাল তো পত্রিকা পড়ে আনন্দ পাওয়া এবং সুখ্যাতি করতে পারা দুইই যেন কঠিন ব্যাপার হয়ে পড়েছে। সেদিক থেকে গোধূলি-মন ব্যতিক্রম।

শ্রীমোহিনী মোহন গাঙ্গুলীর কবিতা অনবদ্য। উনি আমাদের সমসাময়িক কবি, আমরা ছেড়ে দিলাম, উনি এখনও লিখছেন—এটা শ্লাঘা। শ্রীঅমল হালদারের প্রবন্ধ অত ভালো লাগেনি। উনি যেন অ্যারিস্টটলের poetics নিয়ে কলেজের নোটস্ শেখাচ্ছেন। তবে তিনি নীৎসে ও সাত্রঁ'র সাহিত্য-দর্শনকে যে সূত্রাকারে সাজিয়েছেন, এটা অনেক সাধারণ পাঠকের কাজে লাগবে।

সংখ্যাটির সবচেয়ে বড়ো সম্পদ শ্রীঅজিত রায়ের প্রবন্ধ। অজিত বাবুর লেখা এতো ভালো লাগে যা প্রকাশ করার শব্দ কিংবা তাঁর রচনার ভাল-মন্দ বিচারে ঐ লেখার মূল্য ধার্য করতে যাওয়া এইটুকু চিঠির কর্ম নয়।

খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল
বেলিডাঙ্গা পার্ক, আসানসোল
বর্দ্ধমান

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি মন

২৭ বর্ষ/১১শ সংখ্যা
নভেম্বর/১৯৮৫
কার্ত্তিক/১৩৯২

প্রতি সংখ্যা দুই টাকা
বার্ষিক সডাক কুড়ি টাকা

অলোক চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক
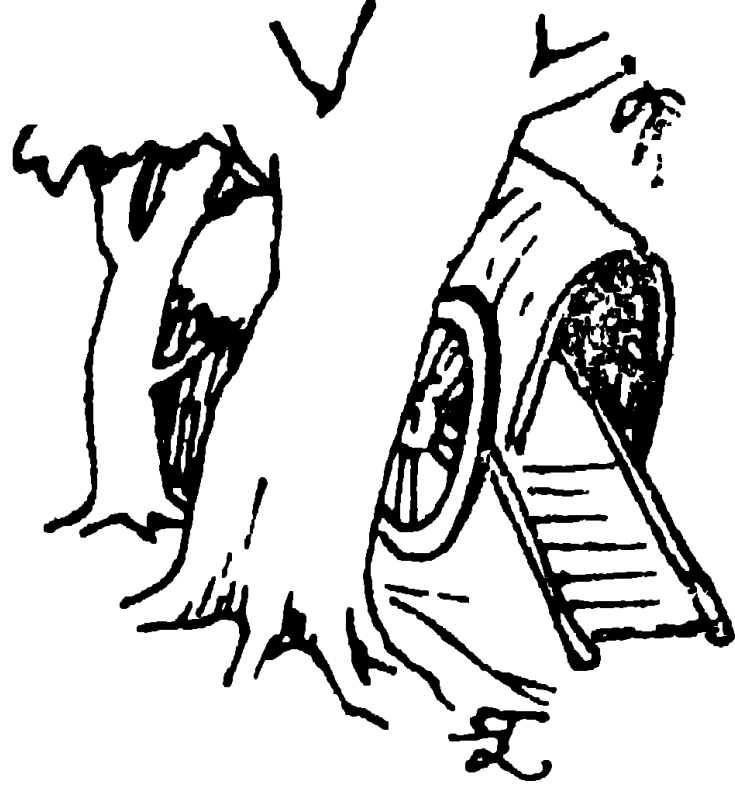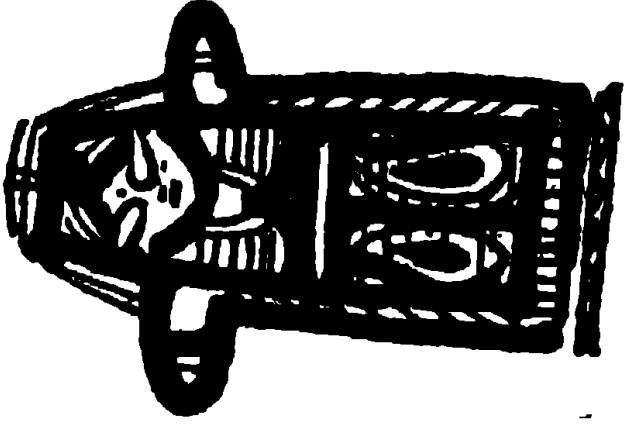
সম্পাদকীয়

ভাদ্র সংখ্যার সম্পাদকীয়তে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানিয়েছিলাম, পত্রিকার আর্থিক অসচ্ছলতার কাহিনী। সে কাহিনী অনেক সাহিত্য-বোদ্ধা মানুষকে ছুঁয়ে গিয়েছিল। লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরীর কর্ণধার সন্দীপ দত্ত, দুর্গাপুরের জলপ্রপাত সম্পাদিকা নিভা দে, জব্বলপুরের কবি শিবব্রত দেওয়ানজী, আসানসোলের বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কোলকাতার ক্লোরাইড ইণ্ডিয়ার তুষারকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ধমানের সিতারামপুরের শ্রীমতী পান্না আচার্য ও চন্দননগরের প্রবীর বৈদ্য প্রমুখেরা যে আর্থিক সাহায্য পাঠিয়েছেন এর জন্য আমরা তাঁদের কাছে ঋণী। কিন্তু সোফিওর রহমানের 'প্রসঙ্গ : গোধূলি-মন' এর চিঠি এবং আমার সম্পাদকীয় পড়ে যে ধরণের সাহায্য আন্তরিকতা গোধূলি-মনের পাঠকবর্গের কাছে প্রত্যাশা ছিল, তার কণামাত্র পূরিত হয়েছে। তবে যাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন গোধূলি-মন এখুনি হয়তো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাঁদের আশ্বাস দিতে পারি না, এখনই পথচলা বন্ধ হচ্ছেনা গোধূলি-মনের। কিছু কিছু মানুষের আন্তরিকতার ছোঁওয়া আবার আমাদের নতুন করে বাঁচার প্রেরণা জুগিয়েছে।

কবিতা

শেষ গান/বঙ্কিম চক্রবর্তী

কোথা' গেলে হে মানুষেরা ? যারা
আমার জন্মের নিয়তি লগ্নে ঝুম্‌ঝুম বাজিয়েছিলে ঘণ্টা।
আমার উদরে, ধমনীতে দ্রোহের সঞ্চারণ---
এখন শুরু হয়েছে।
আকাশের দিকে তাক্ ক'রে সব গুলি ছুটে গেল,
অগোৗণে মিশে গেল একটা পুরো জীবনের সাংকেতিক বিপ্লব
কোথা গেলে হে, মানুষেরা ? যারা
সিঁদুরে মেঘ দেখে এতোদিন নিজেদের জ্বালিয়েছিলে,
চিৎকারের গর্ভ ছিঁড়ে সফল করেছিলে সুনীল সম্মেলন।

ডুমুর ফুলের দিকে কাঙালের মতো কতোক্ষণ কাটাবে চেয়ে -
মিছিলের পুরনো নাগরিক।
ঠাকুর প্রণাম সেরে, আমিও ঘুরে দাঁড়িয়েছি
আজন্ম লালায়িত মূর্খ ভিখিরি।
'প্রাণ সখা, ভবে দাও হে দেখা' বলে
শেষ গান শেষ করতে চাই।

কিছু রং/বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছু রং
একটা তুলি
আর কয়েকটা রেখা,
এলোমেলো
কিংবা বিন্যস্ত
স্পষ্ট কিংবা অদেখা,
এরাই যদি
বাঁচিয়ে রাখে,
পিকাসো বা ভিঞ্চিকে ;
তবে
কিছু কালি
কলম আর শব্দ,
সে অবিন্যস্ত
কিংবা ছন্দবদ্ধ,
কেন বাঁচাবেনা
রবি, তারা বা ভারতীকে।
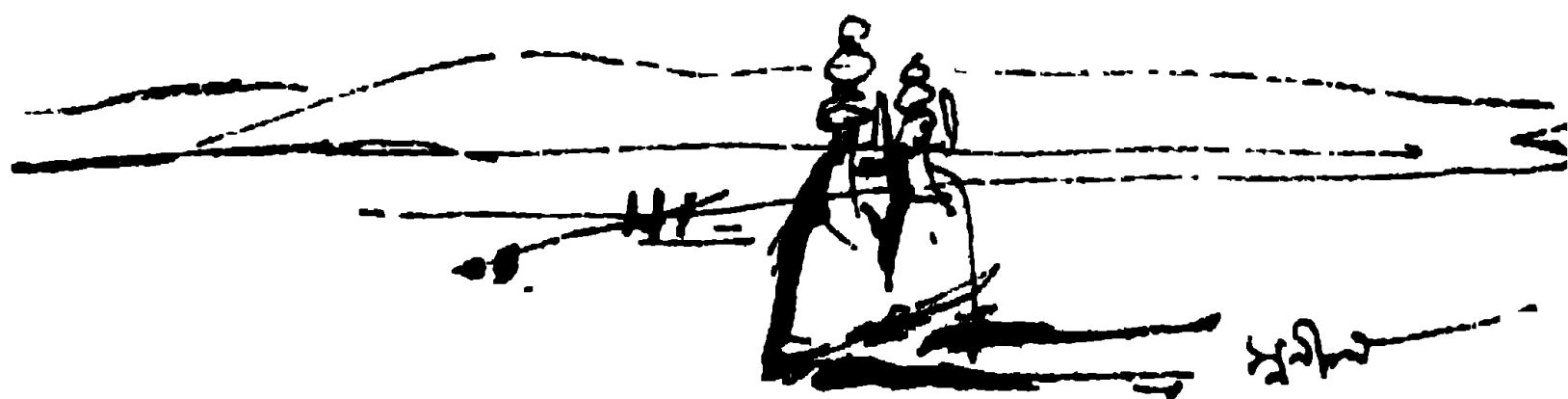
জীবন যাপন/বাসুদেব দেব

তার মনে পড়ছে মফঃস্বলের দিন
ঢেউ খেলানো টিনের ওপর সারারাত বৃষ্টি
আজ শহর একটা প্রকাণ্ড বিছের মত
তার মাংস হাড় আর মেধার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে
আজ প্রতিটি দিন ক্যালেণ্ডারের খোপকাটা ঘর থেকে
বেরিয়ে আসে একটি চাবুক হাতে
দাঁতে দাঁত চেপে তাকে সহ্য করতে হয় সব
এক একটা তারিখ তারই রক্তে দগদগে লাল হয়ে ওঠে

মনে করো না, এই ভাবে সে মার খাবে
একটু একটু করে জাগিয়ে দিচ্ছে তাকে
ডিজেলের ধোঁয়া, সহযাত্রীর কনুইয়ের গুঁতো,
বড়বাবুর টেঁড়া, ভদ্রমহিলার উদাসীন ভ্রূভঙ্গী আর
বন্ধুদের শীতল বিদ্রূপ, সে জেগে উঠছে রোজ

পদ্যের বই, দেয়ালের পোস্টার, প্রদর্শনীর ছবি
ছিঁড়ে খুঁড়ে সার্কাসের ছাড়াপাওয়া ভালুকের মত
সে শহরের অলিতে গলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখন,
জানালায় দিচ্ছে টোকা, নিরীহ এক ভদ্রলোকের
পায়ের ওপর পা রেখে সে লাফিয়ে বাসে উঠল এইমাত্র.

বন্ধুরা, একটু সাবধানে থেকো আজকাল
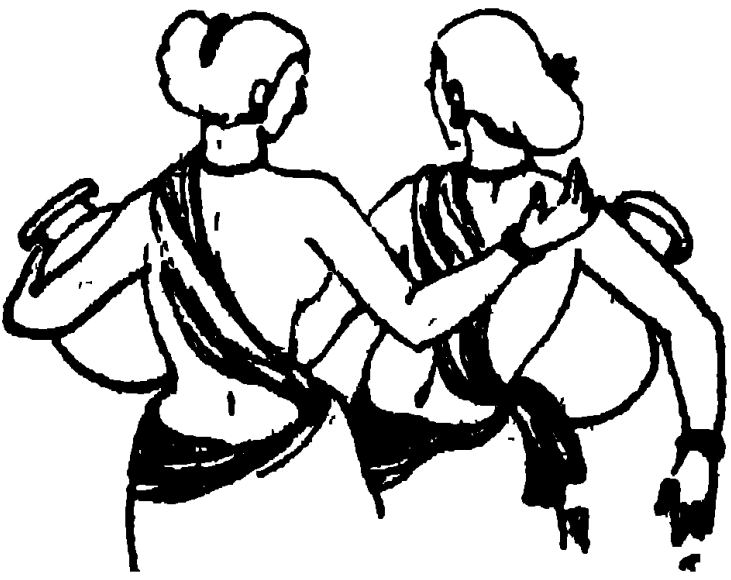
প্রুম্‌ক্রা/জ্যোতির্ময় বসু

ফুনট্-সো লিং থেকে পাকদণ্ডী বেয়ে উঠ্‌ছি
শুকনো ঝর্ণার পাথুরে স্মৃতির পথ ;
ছোট্ট বুনো গাছে নরম টগর ফুল,
বাগানে সাজান সুপুরি গাছের সারি।
পাহাড়ী পথের পাঁচিলের ঠিক পাশে,
কালো ত্বক নিয়ে সোজা উঠে গেছে এক
তিনতলা উঁচু অজানা নামের গাছ,
গায়ে তার লেগে ভায়োলেট অর্কিড।
পেরিয়ে এসে আরো খানিকটা পথ,
গেটের ভিতর প্রসারিত তৃণভূমি,
দূরে দেখা যায় তোরসা নদীর বাঁক্,
আশপাশ থেকে পলাশের হাতছানি ;
আমের ডালেতে মুকুলের সৌরভ,
কাঁঠাল গাছেও নব জাতকের দল।
মন্দিরের ভিতর থেকে অজানা ভাষায়
ভেসে আসছে সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি ;
বন্দনা হচ্ছে আড়াই হাজার বছর আগের
এক গৃহত্যাগী রাজপুত্রের।
এঁদের ভাষায় তিনি 'টেম্‌বা',
সারা বিশ্বে যিনি 'বুদ্ধ'।
কত যুগ ধরে তিনি চেয়ে আছেন,
তবুও শেষ হলনা বিভাজনের, হিংসার ;
অবিরাম অণু-যজ্ঞ নেভাডা গোবিতে,
মরু হৃদয়ে মরুদ্যান আজো মরীচিকা।

পারাপার/গৌরাঙ্গদেব চক্রবর্তী

তুমি হাসলে কোথায় যেন ঝমা ঝম বৃষ্টি নামে
দৃশ্যের আড়ালে নদী ফুলে ফুলে ওঠে।
যেন ফসলের পলি জমে আছে নদীর ওপারে
আমি ঘাটের কাছে আসি চুপিসারে।......
"ও ভাই মাঝি নিশ্চিন্তিপুরের ঠিকানা জান নাকি
কিম্বা আমাদের সেই হারাণের বসত বাড়িটি ?"

"লগি ঠেলে ঠেলে বাবু বিয়োগ শিখেছি
আমাদের যোগসূত্র নদী
যখন যে ঘাটেই নোঙর করি
সেই মুখ থেকে যেতে দেখি হারাণের বাড়ি।"

কোথায় যেন আবার নামে ঝমা ঝম বৃষ্টি
ফের ভাবি ঘাটে এসে এইভাবে ফিরে যাব নাকি !
বৃষ্টি নামা মানেই ফের খিল খিলিয়ে ওঠা
থেমে থাকা হাসি।

এখন দৃশ্যের কাছে নদী
বহুদূর চলে যেতে পারি।
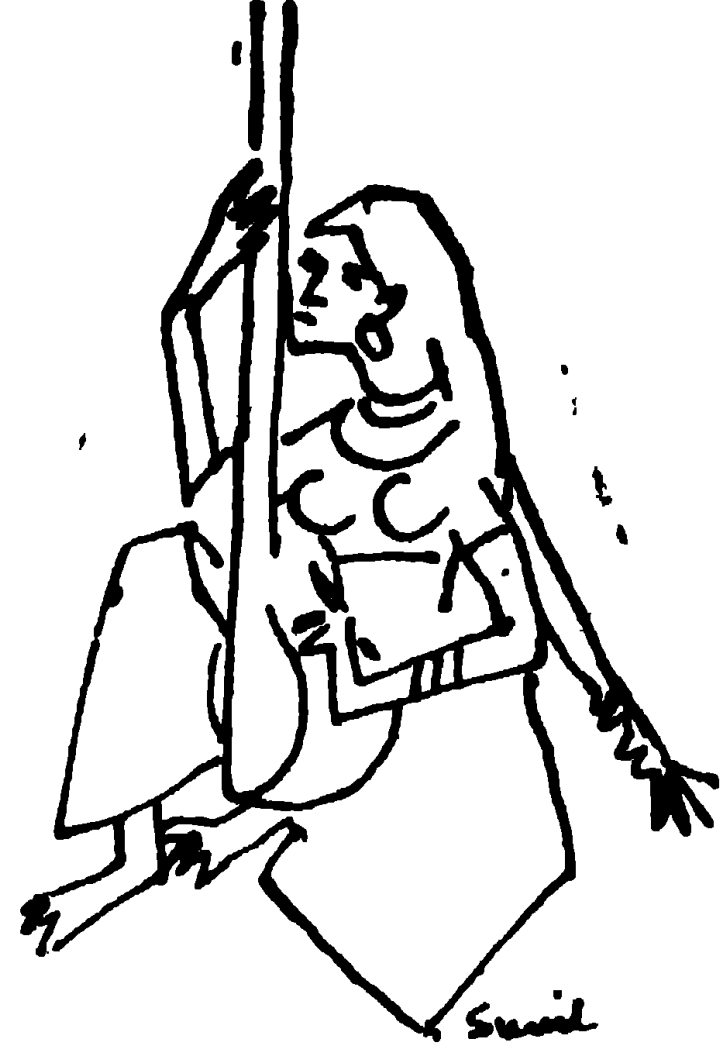
একটি জন্ম/শীতল চৌধুরী

গতকাল একজন নবজাতক এসেছেন
আমাদের আলো-আঁধারির ঘরে।

নতুন সন্তান পেয়ে তার মা

ভুলে গেছে দুঃখ, আর দুঃস্বপ্নের ঘেরা রাত্রির কথা।

পিতাও তাই মশগুল হয়ে গাঁজার আড্ডায়
দু'চোখ ভরে স্বপ্ন দেখছেন
একরাশ ফসলের গন্ধ, নতুন নবান্নের !
শুধু বৃদ্ধা ঠাকুমার মুখের সব কটি রেখা স্থির ;
গত বছরের খরার পর চোখে তার স্বপ্ন নেই—
শীতের রোদ্দুর পোহাতে-পোহাতে কেবল
গণিতের মতোন একটি একটি করে
মারছেন উকুন !

টয়েনবী'র দৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা

বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সাম্প্রতিককালে ইংরেজ ঐতিহাসিক টয়েনবী'র নাম বিদ্বৎ সমাজে তথা ঐতিহাসিক মহলে বহু আলোচিত। একাধিক খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর বিপুলায়তনের গ্রন্থ "ইতিহাস পাঠ (A study of History) বিভিন্ন কারণে খুবই আকর্ষণীয়। নিঃসন্দেহে টয়েনবী'র এই রচনাটি একালে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে খুবই উচ্চাভিলাষী প্রচেষ্টা। বিদ্বান, পেশাদার ঐতিহাসিক এবং বিশেষ করে ইংরেজদের মধ্যে তা যথেষ্ট ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছে ও সমালোচিত হয়েছে। এই সমালোচনার প্রচণ্ডতার মূলে তাঁদের প্রতি টয়েনবী'র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান। এখানে তিনি বর্তমান ইতিহাস লেখার মৌলিক মতবাদকেই প্রশ্ন করেছেন। পেশাদার ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকাশভঙ্গীকে তিনি যেভাবে আক্রমণ করেছেন তাতে ইতিহাসের মননশীল পাঠক তাঁকে আর উপেক্ষা করতে পারেন না।

স্বভাবতই ভারতীয় ইতিহাসকে টয়েনবী যে দৃষ্টিতে দেখেছেন তাকে বিচার করে দেখা যেতে পারে। অবশ্য তাঁর ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ে বিশেষ কোন স্বতন্ত্র মত নেই। "ইতিহাস পাঠ"-এ (A study of History) তিনি একে সব সভ্যতার অভ্যন্তরস্থ সাধারণ পরম্পরার অংশ হিসাবে বিবেচনা করেছেন। তা হচ্ছে সৃষ্টি তথা উৎপত্তি, বৃদ্ধি, পতন তথা ভেঙেপড়া এবং খণ্ড খণ্ড হওয়া। বিশ্বের একুশটি প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে ভারত যে দুটির জন্মভূমি ও বিশ্ব ইতিহাসে পূর্ণ, সে সম্পর্কে তিনি যথেষ্টই মনোযোগী।

তাঁর মতে ঐতিহাসিক অনুশীলনের সুস্পষ্ট ক্ষেত্র হচ্ছে "সমাজ" বা "সভ্যতা" যা জাতীয় রাষ্ট্র বা অন্য কোন রাজনৈতিক সম্প্রদায় অপেক্ষাও স্থানে ও কালে ব্যাপকভাবে বিধৃত। এইরকম একুশটি সভ্যতার নাম তিনি করেছেন।

টয়েনবী'র মতে ভারতবর্ষ দু'টি সভ্যতার জন্মদাতৃ ইণ্ডিক (Indic) ও হিন্দু; শেষোক্তটি প্রথমোক্তটিরই অনুগামী। হিন্দুসভ্যতা আজ বিগলনের শেষ দশায়, এটি ইণ্ডিক সভ্যতারই অন্তর্গত এবং তা থেকেই উৎপত্তি। এখানে ইণ্ডিক সভ্যতার উত্থান-পতন (আনুঃ ১৭০০খ্রীঃ পূঃ থেকে আনুঃ ৫০০ খ্রীঃ পূঃ) বিষয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে। আলোচনার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে টয়েনবী'র কাজের প্রধান লক্ষ্য সভ্যতার উত্থান-পতনের পরম্পরা সন্ধান করা। এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষাপটে ভারতীয় ইতিহাস আলোচিত হয়েছে, কিন্তু মূলসূত্র সেখানে খুব কমই উল্লিখিত হয়েছে। সে কারণে আমাদের দেশের ইতিহাসের পূর্ণ ও সম্পর্কিত বিবরণ সেখানে অনুপস্থিত। একথা মনে রেখে টয়েনবী-কথিত ইণ্ডিক সভ্যতা তথা প্রাচীন ভারত সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যর যথার্থতা বিচার করা যেতে পারে।

ইণ্ডিক সভ্যতার ইতিহাসের আরম্ভ আর্যদের আক্রমণ থেকে। এর পিছনে সিন্ধু-উপত্যকার প্রাক্-আর্য সংস্কৃতির বিষয়ে একটা ধারণা করা যেতে পারে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোতে সুপ্রকাশিত এই সুবিখ্যাত সংস্কৃতির উৎপত্তি টয়েনবী "সুমেরীয়া" বলে চিহ্নিত করতে চান। সিন্ধু সংস্কৃতি হচ্ছে একটা ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি, টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিসের অববাহিকায় লালিত। জলসেচের প্রয়োজন ও নদীকে নিয়ন্ত্রণের মত একই সংগ্রামের মধ্যে তা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা প্রকৃতই একটা সুমেরীক্ সমাজের অংশ---পঞ্জাব ও সিন্ধু সুমেরীক্ সার্বজনীন রাষ্ট্রেরই একটা অংশ। অতএব সিন্ধু উপত্যকার সংস্কৃতি ভারত-ইতিহাসের বাইরে বলেই চিহ্নিত হবে, আর সুমেরীক্ ইতিহাসেরই অংশ বলে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে, ইণ্ডিক সভ্যতায় সিন্ধু উপত্যকার সংস্কৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ, এর সঙ্গে সুমেরীয়া'র যোগাযোগ-ই আক্রমণশীল আর্যদের ভারতে এনেছে। এইভাবে ভারতে এসে আর্যরা ইণ্ডিক সভ্যতার পত্তন করেছে।

সুমেরীক্ সভ্যতার নানা অংশে ভেঙ্গে পড়া আনুমানিক ১৭৫০খ্রীঃ পুঃ বা ১৬৮৬খ্রীঃ পুঃ তে হাম্মুরাবী'র মৃত্যু থেকেই প্রকাশিত। ইউরেশিয়ায় জনসংখ্যার ভয়নক গতির কারণেই এর পতন। এরাই যাযাবর আর্য। আর্যরা আসলে বর্বর (অসভ্য)---বাস করতো সুমেরীক্ সাম্রাজ্যের উত্তর-পুর্ব সীমান্ত অঞ্চলে। সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে এই দুর্দ্ধর্ষ অসভ্য জনগোষ্ঠি সার্বজনীন রাষ্ট্রে ঢুকে পড়ে। আক্রমণকারীদের একটি দল, সংস্কৃত ভাষী শাখা, কালক্রমে সুমেরীক্ সাম্রাজ্যের ভিতরদিয়ে হিন্দুকুশ অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশের পথ আবিষ্কার করে সুমেরীক্ সার্বজনীন রাষ্ট্রের সীমান্তপ্রদেশ হিসাবে সিন্ধু উপত্যকা আক্রমণকারী বর্বরদের চোখে মনোহর শিকাররূপে ধরা পড়লো। এইভাবে, ভারতে আক্রমণ ছিল সুমেরীক্ সভ্যতার খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙ্গে পরার একটা পরিণাম; আর মেসোপটেমিয়ার ইতিহাসের উপজাত। নতুন বাসভূমে আর্যরা সংগ্রামের মধ্যদিয়ে এমন একটা সভ্যতার বিকাশ ঘটালো যার সঙ্গে প্রাচীন কোনও সভ্যতার সম্পর্ক নেই। একেই টয়েনবী বলেছেন—"ইণ্ডিক সভ্যতা"।

ইণ্ডিক সমাজের আদি কেন্দ্র ছিল সিন্ধু ও উর্দ্ধ গাঙ্গেয় উপত্যকা, এতদঞ্চলেই আর্যদের প্রাচীনতম বসতি। এই অঞ্চল থেকে তা ক্রমশঃ সমগ্র উপ-মহাদেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। জন্মলগ্নে ইণ্ডিক সভ্যতা প্রকাশ পেয়েছে গাঙ্গেয় উপত্যকায়—আর্দ্র গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্যানীর সঙ্গে সংগ্রাম করে। সিন্ধু উপত্যকায়ও কম-বেশী একই রকম সংগ্রাম, পুর্বসুরী সিন্ধু সংস্কৃতির মত—নদীকে আয়ত্তে আনা বা জলসেচের মত উন্নতমানের পদ্ধতি আবিষ্কার। বেদ ও মহাকাব্যদ্বয়—রামায়ণ ও মহাভারতে আদি ইণ্ডিক সমাজের চিত্র প্রকাশিত। ইণ্ডিক সমাজ অপর কোনও প্রাচীন সমাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন, কোনও পতনোন্মুখ সভ্যতার গর্ভ থেকে তা বিকশিত নয়। এর জন্ম এক বর্বর শিবিরে। জয়ী আর্যরা এক বিশিষ্ট অসভ্য (barbarian) ধর্ম ও ছন্দের স্রষ্টা, বৈদিক সাহিত্যে ও সংস্কৃত মহাকাব্যে যা সযত্নে রক্ষিত। বৈদিক সমাজ এক "নির্ভীক সমাজ" (heroic society) সীমান্তপারের বর্বরদের সৃষ্ট।

একটা নির্ভীক সমাজে 'যুদ্ধ'ই তো সার্বিক বৃত্তি, তাদের সৃষ্ট ধর্মও হবে বীরত্বব্যঞ্জক চরিত্রের। দেব-উপাসনাও তাদের ধারণায় যুদ্ধ-সংক্রান্ত সংগ্রামী ও লুণ্ঠনকারী। এইভাবে ইন্দ্র, রুদ্র, মরুৎ-গণ, নাসত্য প্রমুখ বৈদিক দেবতারা হয়েছেন সম্পূর্ণ সংগ্রামী

দেবতা। নির্ভীক সমাজ আবার জন্ম দিয়েছে মহাকাব্য ও বীরত্বব্যঞ্জক উপাখ্যানের, সেগুলি এক যোদ্ধু জনগোষ্ঠির মনস্তত্বের আদর্শস্বরূপ সৃষ্টি। রামায়ণ ও মহা-ভারত ইণ্ডিক সভ্যতা অর্থাৎ বৈদিক যুগের নির্ভীক দশার দান। ইণ্ডিক সমাজের উন্নতির দশা চলেছে বেদের কাল থেকে বুদ্ধের বা ঠিক তাঁর পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত। এই সভ্যতায় "ধর্ম" ছিল প্রধান বিশিষ্টতা বা শক্তি। উন্নতির দশায় সমাজের বিবিধ তৎপরতার মাধ্যমে তা প্রকাশিত। আনু: ৭০০ খ্রী: পূর্বাব্দ দিকে সমাজ তার সৃজনশীল জীবনীশক্তি হারিয়েছে এবং তা প্রয়োগ করেছে নিম্নগামী কার্যপরম্পরায়। জীবন সম্পর্কে দুঃখবাদী প্রবণতা গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর সমসাময়িক মহাবীরের মাধ্যমে যা প্রকাশিত—তা প্রমাণিত করে যে সমকালের ইণ্ডিক সমাজে সবকিছুই যথার্থ নয়। এ পর্যন্ত একটা সুসমঞ্জস প্রতিষ্ঠান (body) এখন তার ঐক্য হারিয়েছে। সামাজিক দেহে ও মননে অনৈক্য স্পষ্টতই সুপ্রকাশিত। বর্ণ-ব্যবস্থা এক সামাজিক অপরাধে অধঃপতিত হয়েছে। পুরোহিত-তন্ত্রী স্থানীয় রাজ্য ও মহাজনপদ প্রমুখের পারস্পরিক একাধিক ধ্বংসকারী যুদ্ধ সেই সামাজিক দুর্দশার সঙ্গে ব্যাপকভাবে যুক্ত হয়েছে। টয়েনবী'র ভাষায় এটা ছিল সুস্পষ্টরূপে একটা উপদ্রবের কাল। এর ক্ষয়ের পূর্বে সমাজের শেষ সৃজনক্ষম আলো সৃষ্টি করলো দর্শনের দু'টি উজ্জ্বল ধারা (school)—বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম এবং তারপর অবসন্ন হয়ে পড়লো। পূর্ব-থেকেই ধ্বংস হওয়ার সূচনা হয়েছে। সামাজিক দেহে বিভেদ বিশিষ্টতাপূর্ণ ত্রিধা-বিভক্ত সমাজকে সৃষ্টি করলো—প্রভাবশালী সংখ্যালঘু, দেশীয় শ্রমজীবী শ্রেণী এবং বিদেশীয় শ্রমজীবী শ্রেণী। প্রভাবশালী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সৃষ্টি করলো সার্বজনীন রাষ্ট্র এবং দেশীয় শ্রমজীবী শ্রেণী সৃষ্টি করলো সার্বজনীন ধর্মমণ্ডলী (universal church)। আর বিদেশীয় শ্রমজীবী তথা বিত্তহীন শ্রেণী অপেক্ষা করলো, সাগ্রহে লক্ষ্য করলো; সার্বজনীন রাষ্ট্রের কোনও দুর্বলতার চিহ্ন প্রকাশের জন্য, যাতে তখনই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

মৌর্য-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মধ্যেই ইণ্ডিক সমাজ সার্বজনীন রাষ্ট্র পেল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এর প্রতিষ্ঠাতা, অসি হস্তে তার রক্ষাকারী। খ্রী: পু: চতুর্থ শতকের শেষদিকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মৌর্য সাম্রাজ্য বর্তমান ছিল আনুমানিক খ্রী: পু: ১৮৭ অব্দ পর্যন্ত এবং দেশকে দিয়েছে ঐক্য, শান্তি ও শৃঙ্খলা। কিন্তু সাম্রাজ্য কর্তৃক দেয় রাজনৈতিক নিরাপত্তা সমাজের প্রকৃত ক্ষত নিরাময় করতে পারেনি। শুঙ্গ, কণ্ব, অন্ধ্র-সাতবাহন প্রভৃতি একাধিক বংশানুক্রমিক রাষ্ট্রের উৎপত্তি থেকে স্পষ্ট যে এর বিচ্ছেদ স্বাভাবিক লক্ষণের সঙ্গেই থেকেছে। এই কালের আরও চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইণ্ডিক সমাজে হেলেনিক সভ্যতার অনধিকৃতভাবে প্রবেশ। হেলেনিক সভ্যতাও সমকালে, ভেঙ্গে পড়ার দশায় পৌঁছেছে—বিদেশী যাযাবর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে, যারা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে। সেইকালে মধ্যএশিয়া হেলেনিক সভ্যতার সীমার মধ্যেই ছিল। ব্যাকট্রিয়ান-গ্রীক, শক ও কুষাণরা এই হেলেনিক প্রবেশের জন্য দায়ী। এইসব মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট রাষ্ট্র'র দুটি উদ্দেশ্য ছিল; হেলেনিক সভ্যতার উত্তরাধিকারী হিসাবে, তারা মৌর্য সার্বজনীন রাষ্ট্রের উত্তরাধিকারীদের মধ্যেও ছিল। এই দশা, ইন্দো-গ্রীক-কুষাণ যুগ, আমাদের দেশের অখণ্ড অংশ অপেক্ষাও বেশি করে ছিল হেলেনিক ইতিহাসের একটা অংশ। গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থানের মাধ্যমেই (আনু: ৩০০খ্রী: অ:) বিদেশী অনুপ্রবেশ থেকে নিজেকে ভারত মুক্ত করলো, যখন দেশীয় মগধীয়

রাজবংশ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ও ইণ্ডিক সার্বজনীন রাষ্ট্রকে পুণঃপ্রবর্তন করলো। গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যরই এক পুনরুত্থান এবং ইণ্ডিক সমাজের এক অবিচ্ছিন্ন অনুক্রম; যা সাময়িকভাবে হেলেনিক অনুপ্রবেশ কারীদের দ্বারা বিশৃঙ্খল হয়েছিল। গুপ্ত শাসনের কাল চূড়ান্তরূপে উৎখাত হবার পূর্বে ইণ্ডিক সভ্যতার ভেঙ্গে পড়ার শেষ দশা। টয়েনবী এই কালকে বলেছেন— "Indian Summer", একটা সাময়িক ক্ষয়রোধের কাল এবং এক স্পষ্টতঃ দীপ্তিমান প্রস্ফুটিত সংস্কৃতির কাল, সভ্যতার ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়ার শেষ প্রচেষ্টা। প্রকৃত সৃজনশীল শক্তির অভাবে অনিবার্য ধ্বংস দীর্ঘকাল পরিহার করা যায়নি। সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লো। হুণদের মত বর্বর বিদেশীয় নিম্নশ্রেণী এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ও চূড়ান্ত আঘাত দিল। ইণ্ডিক সভ্যতা ধ্বংস হল, কিন্তু এর ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকেই সৃষ্টি হল এক নতুন সভ্যতা— হিন্দু সার্বজনীন ধর্মমণ্ডলীর 'গুটিকা' (Chrysalis) থেকে। ইহা ইতিমধ্যেই কিন্তু ইণ্ডিক সভ্যতা বিলুপ্ত হওয়ার পূর্বেই ইণ্ডিক সমাজের শ্রমজীবী শ্রেণী উন্নতি করেছিল এবং, প্রত্যক্ষ করা গেছে গুপ্ত-রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যে। এই নতুন সভ্যতা হচ্ছে অনুমোদিত' হিন্দু সমাজ।

ইণ্ডিক সার্বজনীন রাষ্ট্রের সাধারণ উত্থান পতনের দিক থেকে এই সভ্যতার সৃজনশীল শক্তির ক্ষয়কে চিহ্নিত করতে গিয়ে দৃষ্টি অন্যত্র ফেরালে দেখা যাবে যে যখন প্রভাবশালী সংখ্যালঘুরা একটা সার্বজনীন রাষ্ট্র সৃষ্টি করলো, তখন দেশীয় শ্রমজীবী তথা নিম্নশ্রেণী সৃষ্টি করলো হিন্দু সার্বজনীন ধর্মমণ্ডলী—হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্ম ছিল বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া এবং সেই সঙ্গে, উপযুক্ত অর্থেই এরই এক অবিচ্ছিন্ন অনুক্রম। যে বৌদ্ধধর্ম অশোক এবং অন্যান্য কয়েকজন রাজার পৃষ্টপোষকতায় ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা গুপ্ত-শাসনের কাল থেকে হিন্দুধর্মের দ্বারা সেই শ্রেষ্ঠত্ব থেকে স্থানচ্যুত হল। অশোকের পৃষ্টপোষকতায় এই বৌদ্ধধর্ম ভারতের সীমা ছাড়িয়ে বিস্তৃত হয়েছিল এবং পশ্চিমের হেলেনিক সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ হল। ইন্দো গ্রীক, শক ও কুষাণদের মত মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্তরসূরী রাষ্ট্রগুলির কালেও এই যোগাযোগ অব্যাহত ছিল এবং ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসের পক্ষে তা প্রমাণ করা অবিশ্যক ছিল। কারণ এরফলে বৌদ্ধধর্মে "ভক্তি"—তত্ত্ব সংযোজিত হয়ে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করেছিল। জন্মলাভ করলো বৌদ্ধধর্মের এক বলবান শাখা—মহাযান মত এবং কালক্রমে তার বিজয়যাত্রা মধ্য এশিয়া থেকে চীন পর্যন্ত। (sinic) দেশীয় শ্রমজীবী শ্রেণীদের সে দিল এক সার্বজনীন ধর্মমণ্ডলী। ভক্তিতত্ত্ব ঈশ্বর ও উপাসকের মধ্যে এক অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত সম্পর্কের ধারণা, টয়েনবীর মতে, ভারত এনেছে সিরিয়াক্ (Syriac) সূত্র থেকে। এই ভক্তি তত্ত্ব আবার এমনই বৈশিষ্ট্যপুর্ণ যে তা বৈদিক জনের আদি আর্যীয় পৌত্তলিকতা হতে হিন্দুধর্মকে পৃথক করেছে এবং তা নিশ্চিতরূপে বৌদ্ধধর্ম থেকে উৎপন্ন। এদিক থেকে বিচার করলে মহাযান বৌদ্ধ মতেরই উত্তরসূরী হচ্ছে হিন্দুধর্ম। কিন্তু অন্যক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম ছিল বৌদ্ধধর্মের এক প্রতিক্রিয়া এবং এর সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে তুলনীয়। যেমন হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণদের সামাজিক প্রভুত্ব ও যজ্ঞের সার্থকতা স্বীকার করা। কিন্তু দুটির মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম ইণ্ডিক দেশীয় শ্রমজীবীদের সমর্থন আদায়ে যেখানে ব্যর্থ, সেখানে হিন্দুধর্ম চূড়ান্তরূপে সফল হয়েছে। হিন্দুধর্ম ছিল 'উন্নত ধর্ম', এতে পতনোন্মুখ ইণ্ডিক সভ্যতার দেশীয় শ্রমজীবীরা তাদের মুক্তি খুঁজে পেয়েছে।

শক, কুষাণ এবং শেষে হুণদের মত মধ্যএশিয়ার যাযাবররা ইণ্ডিক ইতিহাসে বিদেশীয় শ্রমজীবীদের অংশরূপে ভূমিকা নিয়েছিল। রাষ্ট্রতন্ত্রের দিক থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারত খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে উত্তর-পূর্ব ইরান ও Oxus—Jaxartes-এর সঙ্গেই ব্যাকট্রিয়ান গ্রীকদের অধীনে ছিল। এই ইন্দো-গ্রীক সাম্রাজ্য শক ও ইউ-চিদের মত ইউরেশীয় যাযাবরদের উত্থানে ধ্বংস হয়েছিল। ইউ-চিদের দ্বারা তাড়িত হয়ে শকরা সিন্ধু ও গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চল থেকে মালব ও গুজরাটে পশ্চাৎ অপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল এবং সেখানে নতুন এক রাষ্ট্রের পত্তন করলো। "৩৮৮ থেকে ৪০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনও এক সময়ে পশ্চিম-ভারতে শেষ সত্রপদের পরাজয় ছিল গুপ্তদের মাধ্যমে ইণ্ডিক রাষ্ট্রের সমুত্থানে চরম কাজ" (Toynbee, A Study of History, Vol. V, P. 276)। গুপ্তদের শক্তির মাধ্যমে কিছুকালের জন্য একটা কার্যকরী প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিদেশীয় শ্রমজীবীদের ওপর বিদ্যমান থাকলেও চাপ ক্রমাগত অব্যাহত ছিল। স্কন্দগুপ্ত কর্তৃক বিতাড়িত শ্বেত হুণরা তাঁর মৃত্যুর পর গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হুণ যোদ্ধা মিহিরগুল স্বল্পকালীন বর্বরীয় নৃশংসতার পরে যদিও বালাদিত্য ও যশোধর্মা কর্তৃক পরাজিত হয়েছিল, কিন্তু ইণ্ডিক সার্বজনীন রাষ্ট্রকে রক্ষা করা যায় নি। এর শেষ ঘনিয়ে এলো ক্ষেত্র ত্যাগ করার পরই—যখন "ক্ষণস্থায়ী উত্তরাধিকারীদের রাষ্ট্র"র উত্থান হল—রাজপুতদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে এবং হিন্দুসভ্যতার উন্নতির মাধ্যমে।

ধ্বংসোন্মুখ সমাজের একাধিক বিশিষ্ট লক্ষণ এখন প্রকাশ পেতে থাকলো। সমাজ যখন সৃষ্টিধর্মী থাকে তখন নতুন দাবীর কাছে যথার্থ সাড়া দেয়, এবং কখনই সে অতীত প্রতিষ্ঠানের দাসত্ব করে না। তেমন সমাজ একটা প্রতিষ্ঠানকে পরিত্যাগ করে যে এর উপযোগিতা হারিয়েছে। একটা প্রতিষ্ঠানের অবিচ্ছিন্ন অনুক্রম এর উপযোগিতা বাড়িয়েছে, হচ্ছে সমাজের সৃজনশীল ক্ষমতা হারানোর এক নিশ্চিত চিহ্ন। সে তখন নতুন দাবীর ক্ষেত্রে প্রকৃত সমাধানের পথ আবিষ্কারে অক্ষম। অবশ্যই নতুন অবস্থার সঙ্গে মিলে প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের সুসমঞ্জস মীমাংসা উন্নতির ক্রমিক গতিকে রুদ্ধ করতে পারে না। কিন্তু যদি প্রকৃতি ও পরিবর্তনের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে না পারে তবে প্রতিষ্ঠানটি অনুপযোগী ও অবাধ্য বলে প্রমাণিত হয়। প্রতিষ্ঠানের অবাধ্যতা জন্ম দেয় বিপ্লবকে অথবা সামাজিক পাপকে। এইকালের ইণ্ডিক ইতিহাসে আমরা একটা সামাজিক পাপের উদাহরণ পাই বর্ণ-ব্যবস্থায়। ভারতে বর্ণ-ব্যবস্থার উৎপত্তি আরও প্রাচীনকালে, কিন্তু এইকালে প্রকাশিত তার ফল উৎপত্তি কালের থেকে একেবারে ভিন্ন ধরণের।

ভারতে এই বর্ণ-ব্যবস্থার উৎপত্তি সম্ভবতঃ যাযাবর জয়ী আর্যদের সিন্ধু উপত্যকায় আগমনের কাল থেকেই যেখানে ইতিমধ্যেই বিজয়ী ও বিজিত এই সুনির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণীতে বিভক্ত উন্নত-সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল। সেইসঙ্গে সেখানে ধর্মীয় পার্থক্যও বিদ্যমান ছিল। ইণ্ডিক সভ্যতার ক্ষমতাশালী ধর্মীয় মতের উন্নতির পর্যায়ে এই ধর্মীয় পার্থক্য নিশ্চিতরূপে সুপ্রকাশিত। বিশেষ করে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই ধর্মীয় প্রভাব অনিষ্টকররূপে প্রমাণিত হয়েছিল, কারণ সৃষ্ট সামাজিক অবিচার এখন ধর্মীয় অনুমোদন পেল। জৈন ও বৌদ্ধ—উভয় ধর্মই রীতিপদ্ধতির বিরুদ্ধে-প্রতিবাদ জানালো এবং এইসব আন্দোলন এক সার্বজনীন ধর্মমণ্ডলী প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য হল। নিশ্চিতরূপে তা জাতিভেদ থেকে মুক্ত হয়েছিল। কিন্তু ইণ্ডিক সভ্যতার শেষ দশায় এই দুই আন্দোলনের কোনটিই

সার্বজনীন ধর্মমণ্ডলীর (Universal Church) ভূমিকা নেয়নি ; নিয়েছিল হিন্দুধর্ম, বর্ণ-ব্যবস্থাকে যে স্বীকার করেছিল।

আনুমানিক সাতশ' খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ইণ্ডিক সমাজে বিভেদের চিহ্ন প্রকাশ হতে দেখা গেছে। আচরণ, অনুভূতি ও জীবনের ক্ষেত্রে, তা সে ব্যক্তিরই হোক আর সমাজেরই হোক—আমাদের বিভেদের অধিকাংশ লক্ষণ আত্মার মধ্যেই আমরা লক্ষ্য করি। সুনির্দিষ্ট প্রাচীনের প্রতি মোহ'র সুপ্রকাশ ঘটলো। যেহেতু ইহা খণ্ড খণ্ড হয়েছে, ইণ্ডিক সমাজ ব্যাবীলোনীয় ও হিট্টাইট-দের মতই ক্রমশ: প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বৈশিষ্ট্যের দিকে পশ্চাৎগামী হল। ইণ্ডিক জগতে ধর্মীয় আচরণের ক্ষেত্রে যৌনতত্ত্ব এবং দর্শনের অতিরঞ্জিত বৈরাগ্যের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান বিদ্যমান। তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম দিনের পর দিন জনপ্রিয় হয়ে সমাজের এক বর্ধিষ্ণু ভূমিকা নিয়েছিল। প্রথম দিকে যোগ-সম্পর্কীত ক্রিয়াকাণ্ডেরও অনুরূপ বিস্তৃতি অদ্ভুতভাবে ও যথেষ্ট অসঙ্গতরূপে। "কিন্তু এই আপাত প্রতীয়মান অনৈক্য অদৃশ্য হয় যখন আমরা আমাদের ত্যাগ করার ও আত্মসংযমের চিহ্ন আরোপ করি—যেগুলি একটা সমাজের পতনের চিহ্নরূপে প্রতিভাত" (টয়েনবী-ঐ, পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ৪০২-৩)। কর্ম মতবাদে পাওয়া যায় একটা অসহায়তাবোধ ও পাপবোধ, তত্বটি বৌদ্ধ ও জৈন উভয় ধর্মই স্বীকার করেছিল। কর্ম-মতবাদের বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে উভয়—একটা অসহায়তাবোধ, সর্বশক্তিমান অদৃষ্টের অপরিবর্তনীয় অভিপ্রায়ের কাছে ব্যক্তির নি:সহায়তা বোধ এবং একটা পাপবোধ—বর্তমান দুর্ভাগ্যের কারণ বাইরের ব্যাপার নয় এমন অনুভূতি ও এইভাবে আক্রান্তর নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ বাইরে নয়।

সংস্কৃতির অশিষ্টতায় একটা সমাজের স্বাতন্ত্র্যের দ্রুত বিলুপ্তি প্রকাশ পায় বিদেশাগত উপাদানের সংমিশ্রণে। শক ও কুষাণরা গ্রীক ভাবধারা ও বিধি আমদানি করেছিল। পালি-প্রাকৃত'র মত নিকৃষ্ট চলিত ভাষাসমূহর জন্ম হল, তা অশোকের পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করলো এবং বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের ভাষা হল। শাসনকার্যের মাধ্যম হিসাবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে আর একটি স্থানীয় সংকর ভাষা প্রচলিত ছিল। তাদের ব্যবহৃত লিপি হচ্ছে খরোষ্টী, বিদেশী প্রভাবের এক পরিণাম। সমাজের অগ্রগতিতে ইহা আরও বেশীকরে এক সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। পতনোন্মুখ দশায় এই স্বাতন্ত্র্য বা অদ্বিতীয়তা সমাজ হারিয়ে ফেললো। এই হারানোর এক নিশ্চিত লক্ষণ হচ্ছে সমন্বয় প্রবণতার উন্মেষ। এই কালের ইণ্ডিক সমাজে বিভিন্ন হিন্দুধর্মীয় মতবাদ যথা বৈষ্ণব ও শৈব মতবাদের উত্থানে ধর্মীয় সমন্বয়বাদ সুপ্রকাশিত। কৃষ্ণ, বিষ্ণু, নারায়ণ প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতাদের একীভূতকরণে সৃষ্টি হয়েছে বৈষ্ণবমতবাদ (টয়েনবী -ঐ-, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৫৩৬)। উত্তরকালে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও মিলন ঘটেছে। বিষ্ণু পরিচিত হয়েছেন ব্রহ্মা ও শিবের সঙ্গে (টয়েনবী, -ঐ-৪র্থ পৃ: ৪৭)। সেই একই সমন্বয়-প্রবণতা মহাযান মতবাদেও প্রকাশিত, যাতে বোধিসত্বের ধারণা হিন্দুধর্মের ব্যক্তিগত ঈশ্বরের কাছে বহুল পরিমাণে ঋণী (টয়েনবী, -ঐ-, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৫৫২)। ভেঙেপড়া ইণ্ডিক সমাজের খণ্ড খণ্ড অবস্থায় অবাধ যৌনতা, বিভেদের বিপরীত অর্থে, সুপ্রকট। যাই হোক, অবাধ যৌনতা বোধ শেষ পর্যন্ত একটা ঐক্য বোধের জন্ম দেয়, মানবিক ঐক্যের চিন্তাভাবনা থেকে জাগতিক ঐক্যের মধ্য দিয়ে একেশ্বর-বাদে উত্তরণে তা মানব জাতির ঐক্য প্রকাশের দর্শনকে উদার ও গভীর করে। ইহা হিন্দু সার্বজনীন ধর্মমণ্ডলীর মত মহৎ ধর্মের উন্নতির পথ প্রস্তুত করেছিল।

বর্তমান এখন আকর্ষণ-হীন, এর থেকে

পেতে প্রচেষ্টা হল প্রাচীন রীতিনীতি পুনরুজ্জীবনের। দীর্ঘকাল স্থগিত থাকা অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানও পুষ্যমিত্রের মাধ্যমে পুনরায় শুরু হল, তারপর বিখ্যাত সমুদ্রগুপ্ত পর্যন্ত অন্যান্য রাজারাও তা বজায় রেখেছেন। "ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে তাঁদের সার্বভৌমত্বের যথার্থতা বিষয়ে আভ্যন্তরীণ কোনও সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ায় তাঁরা এই প্রাচীন রীতি প্রবর্তনের যথাবিধি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন" (টয়েনবী, —ঐ—, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫১)। এইসব শাসকদের পক্ষ থেকে প্রাচীন ও আরও আকর্ষণীয় দশার অবস্থা পুনরুজ্জীবনের ও পরে তাঁদের শাসনপ্রণালীকে গ্রাহ্য করানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রাচীন রীতিনীতি পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা করা হয়েছিল। পালি'র ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের কারণে বৈদিক আর্যদের ভাষা সংস্কৃত নিজের স্থান থেকে অপসৃত হল। বর্তমান ব্যবহার লুপ্ত হওয়ার পর সংস্কৃত হল তখন উচ্চশ্রেণীর ভাষা (classical language), সাহিত্যের স্থায়ী মর্যাদার কারণে-এর অনুশীলনের ধারা কিন্তু অব্যাহত ছিল। এই সাহিত্য ইণ্ডিক সভ্যতার বিকাশকালেই উন্নত হয়েছিল। কিন্তু সংস্কৃত'র প্রাচীন ধারার পুনরুজ্জীবনের জন্য একটা আন্দোলন ইতিমধ্যেই অশোকের রাজত্বকালে স্থান করে নিয়েছিল। "...সংস্কৃত'র একটা সফল পুনরুজ্জীবন আরম্ভ হয়েছিল অশোকের সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে, তাঁর মৃত্যুর কিছু আগে বা পরে; এবং এই প্রাচীন ধারার ভাষাগত আন্দোলন দৃঢ়তার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃত'র ওপর নব্য সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বিস্তার করেছিল ভারতীয় মূল খণ্ডে, সিংহলের একমাত্র দ্বীপে পালিকে টিঁকে থাকার জন্য ত্যাগ করে" (টয়েনবী, –ঐ–, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৭৬)। অত্যধিক প্রাচীনতা-প্রীতি (Archaism), ঘড়ির কাঁটাকে পিছিয়ে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা, স্বাভাবিকভাবেই সমাজকে অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু সংস্কৃত'র পুনরুজ্জীবন একটা প্রয়োজনীয় কাজ করেছিল। নব্য সংস্কৃত সাহিত্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থের বাহন হল এবং তারফলে একটা নতুন সভ্যতা 'হিন্দুধর্ম'র জন্মের জন্য ভাষার মাধ্যমরূপে বিবেচিত হল।

মহান অশোকেরও ব্যর্থতা স্পষ্ট। গৌতমের ধর্মের সহায়তায় সামাজিক অবনতি রোধ ও পারমার্থিক আকাঙ্খা দূর করতে তিনি বৃথাই চেষ্টা করেছেন, যার জন্য তখন ইণ্ডিক সমাজ ভুগছিল। দৃশ্যতঃ কেন অশোক ব্যর্থ হয়েছেন তার কারণ ভাবা শক্ত। হীনযান মানসিকভাবে বলিষ্ঠ ছিল, অশোকেরও দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সবিশেষ উদার ও সরল। তিনি নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সামান্যতম চাপও সৃষ্টি করেন নি। এবং এই ব্যাপারে তিনি একান্তই ছিলেন নিষ্পাপ। য কোনও অমিতাচারের মুখে মুখে নিন্দাও করেছেন। তাঁর রাজ্যে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের এবং অ-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের হিতসাধন করে ধর্মীয় উদারতার ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। "তথাপি অশোক সুস্পষ্টতঃ ব্যর্থ হয়েছেন। ফল এই হল যে বৃহত্তর মানব চেতনার ওপর থেকে নীচে—একটা দর্শন শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টার মহোত্তম—স্বতঃসিদ্ধ কারণে ততটাই দীন আশা করা যে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, এমন কি যখন অশোকের মত সম্রাট-ভিক্ষু'র আধ্যাত্মিক শক্তিও তার ভার নেন" (টয়েনবী, –ঐ–, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৬৮৩)। ইণ্ডিক সমাজের দার্শনিকের মুখোশ পরা এক নৃপতি বিনাশের হাত থেকে একে রক্ষা করতে পারেন না।

এইভাবে আনুমানিক সাতশ' খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ইণ্ডিক সভ্যতা উত্থান ও পতনের নিয়মিত দশার মধ্য দিয়ে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়। শেষের দিকে পতনের সব চিহ্নই সমাজে প্রকাশ পেয়েছে। সমগ্র রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতা, ব্যক্তিজীবনে অনৈক্য, প্রভাব-

শালী সংখ্যালঘুদের দ্বারা মৌর্য-গুপ্ত'র মত সার্বজনীন রাষ্ট্র'র প্রতিষ্ঠা—শক, হুণ, কুষাণদের মত বিদেশীয় শ্রমজীবীদের চাপ—ত্যাগ ও আত্মসংযমের মাধ্যমে সামাজিক বিশৃঙ্খলার স্বপ্রকাশ, অসহায়তা বোধ ও পাপবোধ, প্রাচীন রীতিনীতি প্রবর্তনের চেষ্টা এবং সমাজকে রক্ষায় দার্শনিক রাজার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি কালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে সেই ধ্বংস চূড়ান্তরূপে সাধিত হল; কিন্তু হিন্দু সার্বজনীন ধর্মমণ্ডলীর (church) মধ্য দিয়ে একটা গৌণ সভ্যতার দেখা ইতিমধ্যেই মিলেছে।

টয়েনবী কর্তৃক ইণ্ডিক সভ্যতার এই চিত্রাঙ্কণ থেকে এদেশীয় বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে "এ যেন বিশ্ব-স্রষ্টার এক চিঠির বাক্স, তাতে যা কিছু লেখা যায়।" তাঁর বিরুদ্ধে প্রথমেই এই অভিযোগ করা যায় যে তিনি ভারত-ইতিহাসের ওপর একটা পূর্ব-কল্পিত দৃষ্টান্ত চাপাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর অতিসরলীকরণ মতবাদের বহু বক্তব্যই বিশেষজ্ঞরা প্রত্যাখ্যান করবেন। পেশাদার ঐতিহাসিকবৃন্দ তাঁর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মতকে স্বীকার করতে দ্বিধা করবেন।

কিছু কিছু এদেশীয় বিশেষজ্ঞর সমর্থন অবশ্য তিনি পাবেন যখন তিনি বলেন যে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা সুমেরীয় সভ্যতার একটা অংশ। মার্শাল তো বহুপূর্বেই থেসালী (Thessaly) থেকে হোনান (Honan) পর্যন্ত বিস্তৃত সব তাম্রপ্রস্তর-যুগীয় সভ্যতার মধ্যে একটা সাধারণ সাদৃশ্য খুঁজেছেন। পশুপালন, গম বার্লি ও অন্যান্য শস্য চাষ, নকল খালের সাহায্যে ক্ষেত্রে জলসেচ, নগরে সমাজ—প্রতিষ্ঠান, নদীপথে চলাচল ও স্থলপথে চক্রযুক্ত যানের ব্যবহার, স্বর্ণ-রৌপ্য-তাম্র ও টিনের ব্যবহার, চিত্রলিপির মাধ্যমে কথাকে ধরে রাখা প্রভৃতি সবই আলোচ্য অঞ্চলের সব তাম্রপ্রস্তরযুগীয় সভ্যতায় বিদ্যমান ছিল। এইসব থেকে মার্শাল এইসত্যে উপনীত হতে চান যে সিন্ধু সভ্যতা ওরই একটা অখণ্ড অংশ (Marshall, J., Mohanjodaro and the Indus Civilization, Vol. I., P. 95)। হুইলারও তেমনি বললেন—সিন্ধু-উপত্যকা ও মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার মূলে একটিই আদি সভ্যতা (Wheeler, R.E.M. Indus Civilization (1960), P. 101)। গাড (Gadd) আবার বলছেন, সিন্ধু অঞ্চলে নির্মিত সীল মোহর মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্তি উভয় সভ্যতার মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগকে প্রমাণিত করে। হুইলারও একই কথা বললেন (loc. cit., P. 90–100)। আরও উল্লেখযোগ্য যে অধিকাংশ সীলমোহরই সার্গন ও সার্গন-উত্তর কালের। অতএব টয়েনবী'র পক্ষে কাল নির্ণয়ে অসুবিধা হয় নি, এবং সেহেতু তিনি ধরে নিয়েছেন যে সার্গন যখন সুমের ও আক্কাদ-এর সাম্রাজ্য নির্মাণ করলেন তখনই সুমেরীয় সভ্যতা সিন্ধু ও পঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত হল।

কিন্তু প্রকৃত বিষয় হচ্ছে এই যে বিশদভাবে আলোচনা করলে উভয় সভ্যতার অমিল যথেষ্টই প্রত্যক্ষগোচর হবে। কিছু সাধারণ মিল প্রত্যক্ষ হলেও সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা সুনির্দিষ্টভাবে স্বতন্ত্র। হরপ্পা'র মৃৎশিল্পর সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার মিল নেই (Piggott, S., Prehistoric India (1950), p. 191)। বরং এর উৎপত্তি খুঁজলে বেলুচিস্থানে পাওয়া যেতে পারে। গত তিন দশকে হরপ্পা সংস্কৃতির (বর্তমান বিদ্বানেরা সিন্ধু সভ্যতা নামকরণ না করে স্থানীয় নামে সংস্কৃতির নামকরণ করেন এই কারণে যে প্রতিটি প্রান্তের প্রাপ্ত সাংস্কৃতিক নিদর্শনে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমানলেখক) সঙ্গে সাদৃশ্য সম্পন্ন নিদর্শন ভারত-পাকিস্থানের নতুন নতুন স্থানে প্রাপ্তি থেকে এই সভ্যতার বিশাল ব্যাপ্তির প্রমাণই উপস্থিত। পূর্বে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে সৌ-

রাষ্ট্রের কচ্ছ অঞ্চল ধরে বেলুচিস্থানের উপকূল পর্যন্ত এর বিস্তৃতি, প্রসঙ্গত: ইহা স্মরণ-যোগ্য। 'ভারতের মধ্যে অবস্থিত কেন্দ্রগুলির কয়েকটি হচ্ছে—কালিবঙ্গন, লোথাল, রূপার, দেশলপুর, শিশওয়াল, আলমগীরপুর, গিলাণ্ড, কায়াথা। রেডিওকার্বন পদ্ধতির সহায়তায় নির্ধারিত কাল-নিরূপণের পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা আর্য-সভ্যতার ন্যায় আগন্তুক সভ্যতা নয়। এর উন্মেষ ও বিকাশ ভারতেই। সর্বপ্রথম বেলুচিস্থান ও আফগানিস্থানে মানুষের বসতি শুরু হলেও খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রথমদিকে সম্পূর্ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমূলক এক সংস্কৃতির আবির্ভাব হয় আমরি'তে। এবং সেই সংস্কৃতি নানা বিবর্তনের ভিতর দিয়ে হরপ্পা-সংস্কৃতিতে প্রকাশমান। যাই হোক, সিন্ধু অঞ্চলের অস্ত্রশস্ত্র, যথা ধারালো পাতলা ছুরি ও বর্শা, তাম্র ও ব্রোঞ্জের চওড়া কুঠার—মেসোপটেমিয়ার থেকে তা সম্পূর্ণই আলাদা। তদুপরি সিন্ধু-লিপি তো প্রাচীন জগতে আর কোথাও দেখিনা। পিগটের কথায় হরপ্পা সভ্যতা ছিল "...প্রধানত: স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং জন্ম বিশুদ্ধ ভারতীয়" (loc, cit., P. 210)। সর্বোপরি, এই সভ্যতার কালের প্রশ্নে টয়েনবী'র তথ্য আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। সাম্প্রতিক গবেষণায়ও এই সভ্যতার উৎপত্তি অমীমাংসিত এবং স্থিরীকৃত হয়েছে যে সিন্ধু ও রাজস্থানে প্রাপ্ত প্রাক্-হরপ্পাযুগীয় সংস্কৃতির কাল হচ্ছে ২৭০০-২২০০ খ্রী: পূর্বাব্দ এবং হরপ্পা-সভ্যতার স্থিতিশীলতা আনুমানিক ৫৫০ বৎসর (২৩৫০-১৭৫০ খ্রী: পূর্বাব্দ)। যাই হোক, সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার উন্মেষটাই আজও যেহেতু রহস্যাবৃত, সেহেতু সুমেরীয় সভ্যতার অংশরূপে টয়েনবী'র ঘোষণা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি থেকে সমর্থীত হয়না। অবশ্য একদল পণ্ডিত এই সম্ভাবনাকে এইভাবে উপস্থিত করতে চান—দু'টি সভ্যতা আদিতে স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট হয়েছিল এবং উত্তরকালে এক সাধারণ সমাজ ও সার্বজনীন রাষ্ট্রে সংযুক্ত হয়। অতএব টয়েনবী'র মতবাদ, প্রত্যক্ষ প্রমাণে সমর্থীত না হলেও এঁদের সমর্থন পাচ্ছে। প্রসঙ্গত: এইটুকু মাত্র উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মানবসমাজের বিবর্তনের তথা যাত্রাপথের ছক সর্বত্র একটিমাত্র সরলরেখায় নিবদ্ধ নয় এবং বিভিন্ন দেশের সমাজের পৃথক পৃথক ইতিহাস আঞ্চলিক প্রয়োজন থেকেই রূপলাভ করেছে।

একদা মনে করা হত যে আর্যরাই সিন্ধু তথা হরপ্পা-মহেঞ্জোদরো সংস্কৃতি ধ্বংস করে এবং ইন্দ্র এইসব 'পুর' ধ্বংস করে হয়েছেন "পুরন্দর"। সাম্প্রতিক গবেষণায় এর পতন ও ধ্বংসের অন্যতম কারণরূপে নিম্ন-সিন্ধু অঞ্চলের ভু-বিপ্লবে এবং ভারতের পশ্চিম উপকূল ধরে সমুদ্রতলের উত্থানে একাধিক প্লাবনের উল্লেখ করা যায়। এবং লোথাল, কালিবঙ্গন, কোটডিজি প্রমুখ প্রান্তের নিদর্শনাদি থেকে প্রমাণিত যে এই সভ্যতার শেষ ঘনিয়ে আসে ১৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের দিকে ও নিশ্চিতরূপে আর্যরা তার কারণ নয়।

এর পরেই আসে আর্য-আক্রমণ ও বৈদিক-সমাজ প্রসঙ্গ। এই বিষয়ে টয়েনবী'র ব্যাখ্যার সঙ্গে এদেশীয় অনেকেই একমত হবেন। কিন্তু আর্য-আগমণ বিষয়টি খুবই সমস্যাবহুল, যেহেতু তার কোন চিহ্নই বর্তমানে অপ্রাপ্তব্য সেহেতু তাদের আদি বাসভুমি এবং ছড়িয়ে পড়া বিষয়ে চূড়ান্ত মত দেওয়া যায় না। ১৯৫৯'তে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের গৌহাটি-অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে ইতিহাস বিদ অল্তেকার (এখন তিনি পরলোকে) হরপ্পা ও আর্যসমস্যার ওপর যে ভাষণ দেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে ভারতে আর্য-প্রবেশকালে হরপ্পা-সভ্যতার বাতি জ্বলছে। কমপক্ষে পাঁচশ' বছর (২০০০-১৫০০ খ্রী: পু:) ধরে হরপ্পা ও বৈদিক সংস্কৃতির মানুষ সরস্বতী দৃষদ্বতী'র অববাহিকায় পাশাপাশি বাস করে পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে। হরপ্পা-বাসীরাও সামরিক জনগোষ্ঠি,

অতএব বহুবার তাদের সঙ্গে বৈদিক আর্যদের শক্তি-পরীক্ষা হয়েছে। এখানেও মূল প্রশ্ন ওঠে আর্য-আগমণের কাল বিষয়ে। এদেশীয় বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর এক বৃহদাংশ এই মত দেন যে হরপ্পা-সংস্কৃতি ও আর্য সংস্কৃতির রীতিনীতি ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে অনেক মিল আছে, সেহেতু সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতায় বৈদিক আর্যদের অস্তিত্ব আছে। বিষয়টা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যাঁরা সিন্ধু সভ্যতা ও আর্যসভ্যতার অভিন্নতায় বিশ্বাসী তাঁরা উভয়ের মৌলিক বৈশিষ্ট্য-গুলিতে বিস্মৃত হন। বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে হচ্ছে—(১) সিন্ধু সভ্যতার ধারকরা শিশ্ন-উপাসক ও মাতৃকা-দেবীর পূজক; আর্যরা প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকৃতির উপাসক এবং পুরুষ দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তোত্র রচনা ও যজ্ঞ করত। (২) আর্যদের কাছে অশ্বই শ্রেষ্ঠ জন্তু, কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার ধারকদের কাছে বলীবর্দই প্রধান জন্তু। (৩) সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা নগর কেন্দ্রিক, আর্যরা গ্রাম-কেন্দ্রিক জীবনে অভ্যস্ত। (৪) সিন্ধু-সভ্যতায় লিখন-প্রণালী প্রচলিত, আর্যদের মধ্যে লিখন-প্রণালী অপ্রচলিত তথা অজ্ঞাত। (৫) সিন্ধু-সভ্যতায় মৃৎপাত্রের রঙ্ "কালো-লাল", আর্য-সভ্যতার ধারকদের মৃৎপাত্রের রঙ্ ধূসরবর্ণের। (৬) সিন্ধু সভ্যতা নিঃসন্দেহে কৃষিভিত্তিক, কিন্তু আর্যরা প্রথমে পশুপালক, পরে কৃষিকাজে অভ্যস্ত। তাছাড়া সিন্ধুসভ্যতার ধারকরা মৎস্যভোজী, কিন্তু আর্যরা মাংসভোজী হলেও মৎস্য ভক্ষণের সাক্ষ্য পাই না। প্রসঙ্গতঃ একটা বিষয় স্মর্তব্য যে বেদ রচনা যে নৃগোষ্ঠির এবং বৈদিক সাহিত্যে যে সমাজ-চিত্র চিত্রিত, তা কোন বিশেষ কালের নয় এবং সেই কালের বয়স যথার্থ অনির্ধারিত। কেউ বলেন বেদ রচনার কাল এক হাজার বছর, কেউ বলেন—তা দু'হাজার বছর। অতএব এই সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর আর্য-ভাষাভাষী জাতির ভাষা, ধর্ম, আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি ইত্যাদির বিবর্তনের তথা পরিবর্তনের চিত্রই বেদে প্রাপ্তব্য।

যাই হোক, বর্তমানের প্রবলতম মতটি হচ্ছে আর্যদের আদিবাসভূমি মধ্য এশিয়া। এডুয়ার্ড মেয়ার, পীক্, গর্ডন চাইল্ড (The Aryans (1926), P. 166 ff.) প্রমুখের মতে পামীর বা দক্ষিণ রাশিয়ার স্টেপ্—অঞ্চল ইন্দো-ইউরোপীয়দের আদি বাসস্থান। এদের ছড়িয়ে পড়ার কালে যে খুবই বিতর্কের ও সমস্যার বিষয় তা পূর্বে-উক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট। কিছু কিছু প্রমাণ যথা আনাতোলিয়ার হিট্টাইট, গ্রীসে ডোরিস্-বাসী আক্রমণকারী, হরপ্পা—নগরীর ধ্বংস এবং এশিয়ামাইনরের বোঘাজ-কোই-লিপি (আনুঃ ১৩৮০ খ্রীঃ পূঃ) থেকে আপাতদৃষ্টিতে প্রাপ্ত সময়ের সঙ্গে নিয়েনবী'র মতের মিল হচ্ছে। অর্থাৎ আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের দিকে ইণ্ডিক সভ্যতার উৎপত্তি। পূর্বেই এবিষয়ে সন্দেহের উল্লেখ করা হয়েছে।

ভারতে আর্য-তৎপরতার প্রাচীনতম রঙ্গমঞ্চ "সপ্ত-সিন্ধবঃ" (ঋক্. ১/৩২/১২, ১/৩৫/৮; ৪/২৮/১; ৮/২৪/২৭), পাঁচ শাখানদীসমেত সিন্ধু এবং সরস্বতী অথবা কুভা (কাবুল)। এক মতানুসারে, এই "সপ্ত সিন্ধবঃ" নিশ্চিতরূপে সিন্ধু উপত্যকা। অবশ্য সেইসঙ্গে ভারতে আদি আর্যবসতির মধ্যে উর্দ্ধ গাঙ্গেয় উপত্যকাও পড়ে। ব্রাহ্মণ সাহিত্য রচনার কালে আর্য—সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছে পূর্বে ও দক্ষিণে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হচ্ছে আদি আর্যবসতি স্থাপন সর্বদাই নদীকে কেন্দ্র করে। এইসব নদী তাদের চেতনায় ও ধ্যানধারণায় যথেষ্ট প্রভাব-বিস্তার করেছে যে তার প্রমাণ মন্ত্র রচনা ও উৎসর্গ।

বৃষ্টির দেবতা পর্জন্য এবং ঝড়ের দেবতা মরুৎ ও ইন্দ্র'র নামে মন্ত্র রচনা থেকে বৈদিক ভারতে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের ধারণা উপস্থিত। হরপ্পা-মহেঞ্জোদরোতে প্রাপ্ত চুল্লীতে দগ্ধ-ইটের প্রাচুর্য খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহ-

ব্রাবে জ্বালানী হিসাবে কাঠের সহজলভ্যতা এবং সীল-মোহরে গণ্ডার, হস্তী, ব্যাঘ্র আদি জন্তুর অঙ্কিত নিদর্শন ঐ অঞ্চলে অরণ্যানীর প্রমাণ উপস্থিত করে। অতএব আবহ-চিত্র গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বলেই বিবেচিত হচ্ছে।

এই দেশের অভ্যন্তরে, বিশেষ করে বর্তমানের উত্তর ভারতে বিস্তারলাভ করতে আর্যদের কঠিন রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করতে হয়েছে অন্-আর্যদের সঙ্গে, দাস ও দস্যুদের সঙ্গে—এই বিষয়টা ঋগ্বেদে যথেষ্ট প্রাধান্য পেয়েছে। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে 'আর্য' ভাষীগণ বিভিন্ন কুল বা 'জন' বা কৌমে বিভক্ত। ঋগ্বেদীয় দাস ও দস্যু বৈরী কৌমরূপে গণ্য। মূলত বৈদিক সমাজে অনার্য-কৌমের মানুষ দাস-রূপে পরিচিত। বৈদিক কৌমের পরস্পরের মধ্যেও যুদ্ধ হত গাভী অপহরণ প্রভৃতি সম্পদ লাভের কারণে। কতকগুলি কৌমের পুরুষদের কাজই ছিল যুদ্ধ করা। "যুদ্ধেই ইন্দ্র তার প্রধান বন্ধু খুঁজত" (ঋক্, ৮/২১/১৩); "হে ইন্দ্র আমরা ঘরে বসে বৃদ্ধ হতে চাই না..." (ঋক্, ৮/২১/১৫)। প্রকৃতপক্ষে বৈদিক দেবতাদের অধিকাংশই হচ্ছেন এইসব আর্য-যোদ্ধা। ওয়েবার-এর ভাষায়—"বেদের দেবতা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক ও বীর যোদ্ধা, বিদেশীয় হোমারের সঙ্গে সাদৃশ্য সম্পন্ন। বৈদিক যোদ্ধা এক দুর্গ-বাসী রথারূঢ় যোদ্ধা নৃপতি...।" ইন্দ্র'র চরিত্রের সঙ্গে এই প্রবণতার খুব মিল। তিনি একজন পূজনীয় যুদ্ধের বৈদিক নেতা, কমপক্ষে আড়াইশ' ঋক্ তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত। তিনি বৃত্র প্রভৃতি শত্রুদের পুরী নাশ-কারী, তাই হয়েছেন "পুরন্দর"। তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন মরুৎ-গণ। রথারূঢ় হয়ে তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধে রত। বর্তমান আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে ভারতে আর্য-বিজয়ের ক্ষেত্রে ইন্দ্র একজন সফল বিজয়ী নেতা। এতদ্ব্যতীত রুদ্র, নাসত্য প্রমুখ আরও একাধিক সংগ্রামী দেবতার সাক্ষাৎ বৈদিক সাহিত্যে প্রাপ্তব্য। এবং বৈদিক সমাজে যুদ্ধ যে অন্যতম মূল লক্ষণ ছিল তা সুস্পষ্ট।

আলোচ্য বৈদিক সমাজের সঙ্গে টয়েনবীর ধারণা-প্রসূত নির্ভীক যুগের (heroic age) উল্লেখযোগ্য মিল যে রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বিচার তো একদেশদর্শী। গর্ডন চাইল্ডের সংজ্ঞানুসারে যেহেতু বৈদিক আর্যদের লিপিজ্ঞান ছিল না, সেহেতু তারা অসভ্য দশায় বিরাজ করেছে—এই তত্ত্ব স্বীকার করা যায় না। প্রথম দশায় তারা বর্বর হলেও জটিল রূপকের সাহায্যে চিন্তন, অমূর্ত চিন্তার দিকে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা, দার্শনিক রহস্যবাদের দিকে ঝোঁক, অদ্বৈতবাদের তত্ত্বগত বিকাশ, জটিল যজ্ঞতত্ত্ব, প্রাণ ও আত্মার ধারণা, মনের বৃত্তি বিভাগ, ইত্যাদি ইত্যাদি সবই তো বৈদিক আর্যদের এক উন্নত সাংস্কৃতিক চেতনার প্রমাণরূপে উপস্থিত। বিষয়গুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা টয়েনবী'র "ইণ্ডিক সমাজের" চিত্রাঙ্কণে একান্তই অনুপস্থিত।

মহাকাব্যদ্বয়—রামায়ণ ও মহাভারত বিষয়েও টয়েনবী-উপস্থাপিত প্রকল্প ভুল। এগুলি বৈদিক-যুগের বহু পরবর্তীকালে সম্পাদিত, সম্ভবত: খ্রী: পূ: চতুর্থ থেকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে (Winternitz, M., A History of Indian Literature, Vol. I., P. 475, 516)। মহাকাব্যদ্বয় দীর্ঘকালের ব্যবধানে বর্তমানরূপ পরিগ্রহ করায় সমাজ বর্ণনায় অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। স্মর্তব্য যে ঋগ্বেদে ঐতিহ্য সম্পর্কীয় সচেতনতা পরিস্ফুট এবং ঋক্‌মন্ত্রে পুরাণী গাথার উল্লেখ রয়েছে, যা উত্তরকালে সঙ্কলিত পুরাণগুলির আদ্যরূপ। শতপথ ব্রাহ্মণেও 'ইতিহাস' ও 'পুরাণ' শব্দের উল্লেখ পাচ্ছি। অতএব রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের জনশ্রুতিগুলি ঋগ্বেদীয় কালের সমসাময়িক। কিন্তু জনক ও সীতার নামমাত্র উল্লেখ থকে বৈদিকযুগে

রামায়ণের উৎপত্তি প্রমাণিত হয় না। তেমনি, ভরত ও কুরু নৃগোষ্ঠির উল্লেখ থাকলেও কুরুক্ষেত্র'র মহাসংগ্রামের কোন উল্লেখ সেখানে নেই। ভারত-যুদ্ধের প্রাচীনতম উল্লেখ দেখি সাংখায়ন শ্রৌতসূত্র (১৫/৬) ও আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র'তে (৩/৪/৪)। মহাভারতে, সমাজবিজ্ঞানীর মতে, শেষ বৈদিক যুগ হতে সামন্তযুগের সভ্যতার নিদর্শন সঙ্কলিত। আর রামায়ণে সমৃদ্ধ ভারতীয় সমাজের চিত্র বর্ণিত। এবং রামায়ণের সমাজ-বর্ণনা মহাভারত অপেক্ষা আধুনিক বলে প্রতীত, অবশ্য উভয় মহাকাব্যে পুরোহিততন্ত্রের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

রামায়ণে এক একটি ক্ষত্রিয়কুলের রাজত্বের বিষয় উল্লেখ দেখা যায় (দ্র: —ড: ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—ভারতীয় সমাজপদ্ধতি, ১ম, পৃ: ১৪৬)। আর মহাভারতে কুলগত বৈরীভাব, স্পষ্ট বর্ণ-বিভাগ, প্রভৃতি ছাড়াও দু'টি বড় অনুষ্ঠান (১) একজন রাজচক্রবর্তীর অধীনে ধর্মরাজ্য স্থাপন ও (২) সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে পড়ায় মনে করা যেতে পারে যে মহাভারতের বর্তমান সঙ্কলন গুপ্তযুগেই সাধিত হয়েছিল। এই যুগেই ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রবল. টয়েনবী কথিত হিন্দুধর্মের তখন উন্নততর দশা। মহাভারতে তদানীন্তন ভাবসমূহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজার অধীনে ভারতে একজাতীয়তা আনয়ন করা, ধর্মরাজ্য স্থাপন পরিকল্পনা, ব্রাহ্মণ্যপদ্ধতির ওপর রাষ্ট্র ও সমাজকে স্থাপন করা, রাষ্ট্র সার্বভৌম সম্রাটের অধীনে স্তরভেদকরা প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। এবং সামন্ততান্ত্রিক যুগের বৈশিষ্ট্যও তাতে প্রকট। ড: ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্তযুগে "মহাভারতের" বর্তমান রূপলাভের পিছনে এক বড় রাজনীতিক ভাব লুক্কায়িত বলে সন্দেহ করেন। তিনি ধর্মরাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টাটিকে বৌদ্ধ অশোকের ধর্মের ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র স্থাপনের চেষ্টার অনুকরণ বলে মনে করেন (দ্র:—ভারতীয় সমাজপদ্ধতি ১ম খণ্ড, পৃ: ১৪৭-১৪৮)। বক্ষমান আলোচনা থেকে ইহা সুস্পষ্ট যে ভারতীয় মহাকাব্য কিছুতেই টয়েনবী কথিত আদি বৈদিক যুগের তথা 'নির্ভীক কালে'র (heroic period) সৃষ্ট নয়।

বীরত্বসূচক চরিত্র ছাড়াও টয়েনবী উল্লিখিত একটা বিকাশশীল সমাজের সঙ্গে অন্যান্য প্রসঙ্গও বৈদিক যুগে অনুপস্থিত। তাঁর পরিকল্পনায় ব্রাহ্মণ ও উপনিষদীয় যুগের স্থান নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। ইণ্ডিক সমাজের উন্নতির দশা সম্পর্কে খুব কম কথাই তিনি বলেছেন। কিন্তু তাঁর 'সমাজের' বিবর্তনের মতবাদ অনুসারে, এই কাল-ই (ব্রাহ্মণ-উপনিষদের যুগ) তো নিশ্চিতরূপে ছিল তা, যখন ইণ্ডিক সমাজ পূর্ণতর বিকাশলাভ করেছে এবং এর বিশিষ্ট গুণ অর্জন করেছে। কারণ গৌতম বুদ্ধের কালে ইতিমধ্যেই তা পতনের দিকে ধাবিত হয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, টয়েনবী কথিত ইণ্ডিক সমাজ আদি বৈদিক যুগ থেকে একেবারে বুদ্ধের কাল পর্যন্ত একটা সুসমঞ্জস আকৃতির ছিল কিনা। বাস্তব ও মানসিক সংস্কৃতি বিচারে তা কিন্তু ছিল না। বরং আমরা বর্ধমান ঐক্যের পরিবর্তে আরও বেশী সামাজিক বিশৃঙ্খলার প্রমাণ পাই। এই পর্বে জাতিভেদ প্রথা কঠোর হয়েছে। এর পূর্বেই, ব্রাহ্মণ সাহিত্য রচনার যুগেই পুরোহিত শ্রেণী কেবল নিজেদের সুযোগাদির দাবী করেছেন। বৈশ্যদের স্থান একটা দ্রুত সামাজিক পতনকে চিহ্নিত করেছে, সূত্র সাহিত্যে তা আরও বেশী উচ্চারিত। অনেক বিদ্বান উপনিষধেই ব্রাহ্মণদের দাবীর বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় প্রতিক্রিয়ার একটা ধ্বনি খুঁজে পেয়েছেন। আবার আত্মা ও ব্রহ্ম-সম্পর্কীয় জ্ঞান ক্ষত্রিয়ের কাছ থেকে ব্রাহ্মণরা লাভ করছেন—এমন দৃষ্টান্তও উপনিষদে রয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে তো একস্থানে ব্রাহ্মণের ওপর ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করা হয়েছে। এগুলি নিশ্চয়ই সামাজিক ঐক্যের নিদর্শন নয়। আদি

বৈদিক যুগেও বিভিন্ন আর্য কৌমের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটেছে। আদি আর্যবসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে "দশরাজার যুদ্ধ" বিভিন্ন বৈরী রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বীতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। অতএব বুদ্ধের কাল অপেক্ষাও বৈদিক সমাজ বেশী ঐক্যবদ্ধ ছিল—এমন কথা বলা যায় না।

টয়েনবী'র ৭০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দকে ইণ্ডিক সমাজের বৃদ্ধি ও পতনের সময়রূপে বিভক্ত করার যুক্তি স্বীকার করা খুবই কঠিন। এই ধরণের বিভাগ একান্তই অপ্রয়োজনীয় এবং অসম্ভব। অবশ্যই ইহা স্বীকার্য যে ধর্ম-ই হচ্ছে মূল যাকে কেন্দ্র করে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা এগিয়েছে। প্রাচীন ভারতের জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে ধর্মের স্পর্শ। অর্থ ও কাম, জীবনের পার্থিব প্রাপ্তির হু'টির সঙ্গে ধর্মের মিলনেই মোক্ষলাভ—জীবনের চরম লক্ষ্য। এক্ষেত্রে টয়েনবী তাঁর পূর্ব-সূরীদের মতই "ধর্মের" দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন ভারতীয় সভ্যতার শক্তির কেন্দ্রীয় উপাদানরূপে 'ধর্ম' কে চিহ্নিত করে। কিন্তু এই শক্তির প্রগতির সীমা সাতশ' খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত—এমন কথা স্বীকার্য নয়। এর পরেও তো প্রাচীন ভারতীয় 'জনে'র জীবনে ধর্ম সমভাবে আধিপত্য অব্যাহত রেখেছিল। জীবন ও ধর্ম সম্পর্কে মানুষের প্রবণতা প্রায় একই রকম ছিল। ইহা টয়েনবী স্বীকারও করেছেন (দ্রঃ—ঐ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৪–৩৮৫) এবং বলেছেন—ধর্মই উত্তরকালের হিন্দু-সভ্যতার জীবন পরিচালনায় কেন্দ্রীয় উপাদান। কোথাও এমন প্রমাণ নেই যাতে ধর্মের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে—টয়েনবী যাকে ইণ্ডিক সমাজের পতন-দশা বলছেন, সেই কালে।

মূলতঃ খ্রীঃ পূঃ ৭০০ থেকে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কালকে ভালভাবে অনুধাবন করে আমরা নিশ্চিতরূপে বলতে পারি যে টয়েনবী'র একাধিক মন্তব্য অবিমৃষ-কারী এবং প্রামাণিক বিশ্লেষণে অগ্রাহ্য। বৌদ্ধ-ধর্ম উত্থানের পূর্ববর্তী কাল তো ছিল একটা সামাজিক পরিবর্তনের প্রারম্ভ যখন অনেক প্রাচীন ও বিধিবদ্ধ মান উৎখাত হয়েছিল (Pande, G. C., Studies in the Origins of Buddhism, P. 310ff)। পূর্বেই 'যাগযজ্ঞ'র বিরুদ্ধে উপনিষদে প্রতিবাদ উচ্চারিত ও বলি'র সার্থকতা বিষয়ে প্রকাশ্যে সন্দেহ প্রকাশ দেখি। বিদ্যা (জ্ঞান) ও উপাসনাকে জটিল ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেওয়া হল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈদিক 'জন'দের স্থানে 'জনপদ'-সমূহ এখন রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য লাভের জন্য রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হল। আর সর্বপ্রথম মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন অর্থনৈতিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কারণ ঘটালো। ফলে উদ্ভব হল এক নতুন ও বিত্তশালী বণিক শ্রেণীর। এইসব মুষ্টিমেয় জনের হাতে সঞ্চিত সম্পদ নিশ্চিতরূপে সাধারণ মানুষের দুর্দশা বাড়িয়েছে। এ-সবই তো জন্ম দিয়েছে সামাজিক দুর্দশার এক চেতনাকে।

বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বের এই যে চিত্র, এর সঙ্গে টয়েনবী'র ধারণানুসারী "দুঃখের কাল" (time of troubles) নিশ্চয়ই তুলনীয়। ঐতিহাসিকের প্রশ্ন—তবে কি এই সামাজিক দুঃখ জন্মলাভ করেছে টয়েনবী'র মতবাদকে রক্ষা করতে? এর উত্তর নেতিবাচক হবে। এই কালের দুঃখবাদের স্বরূপ নিহিত ছিল আর্যীয় প্রবৃত্তিবাদ ও অন্-আর্যীয় নিবৃত্তিবাদ—চিন্তার এই দুটি স্রোতের সংঘর্ষের মধ্যে। এই দুই বিপরীত ধর্মী ভাবধারার নিদর্শন পূর্বেই উপনিষদে পরিদৃশ্যমান। অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে যুক্ত এই সংঘর্ষই ষষ্ঠ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের দুর্ভাগ্য'র জন্মদাতা। ইহা একটি দেশীয় সাম্প্রদায়িকতা-সঞ্জাত নয়, বরং ছিল দুটি ভাবধারার সংমিশ্রণ-জাত, মীমাংসার জন্য প্রচেষ্টা চালানো। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম, বিশেষ

করে জৈনধর্ম অন্-আর্যীয় প্রতিসংযমী ভাবধারা কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিল। অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম কিছুতেই প্রভাবশালী সংখ্যালঘুদের (dominant minority) সৃষ্ট নয়।

টয়েনবী'র মতানুযায়ী, খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে ইণ্ডিক সমাজে অবনতির লক্ষণ প্রকাশিত। সেই লক্ষণগুলি হচ্ছে (১) ব্যাক্ট্রিয়ান গ্রীক, শক ও কুষাণদের মত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বিদেশাগত উপাদানের আগমণের ফলে স্বাতন্ত্র্য দ্রুত নষ্ট হওয়া; (২) পালি-প্রাকৃত'র মত অপকৃষ্ট চলিত ভাষার উত্থান; (৩) পুষ্যমিত্র ও সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক প্রাচীন অনুষ্ঠান 'অশ্বমেধ যজ্ঞ'র প্রবর্তন এবং সাহিত্যের মাধ্যমরূপে সংস্কৃত'র নকল পুনরুজ্জীবন; (৪) অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস—কর্মবাদদ্বারা যা প্রমাণিত; (৫) ধর্মীয় ক্ষেত্রে সমন্বয়-প্রবণতা; (৬) বর্ণ ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান কঠোরতা; (৭) বৈরাগ্য-প্রবণতা এবং তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মে অতিরিক্ত বামাচার—সমভাবে বৃদ্ধি পাওয়া! বিষয়গুলিকে সংক্ষেপে বিচার করা যেতে পারে।

ঐতিহাসিক যুগে, এমন কি প্রাগৈতিহাসিক যুগেও-কোন সভ্যতা তথা সংস্কৃতি বিদেশীয় বা ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। সেক্ষেত্রে স্থানীয় সংস্কৃতি অনুপ্রবিষ্ট সাংস্কৃতিক চিহ্ন আত্মসাৎ করে সমন্বয় ঘটায়। প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্যেও বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠির মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ প্রমাণিত। ভারতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ভারত অপরের কাছ থেকে যা-ই ধার করুক না কেন—সম্পূর্ণরূপে তার ভারতীয়করণ করেছে ও একেবারে নিজের করে নিয়েছে। "ইহা হচ্ছে সেই স্থিতিস্থাপকতা যা নিজেই ভারতীয় সভ্যতার চিত্তাকর্ষক ধারাবাহিকতাকে ব্যাখ্যা করে" (অরবিন্দ)। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ থেকে খ্রীষ্টীয় ৩০০ অব্দ কালে তো ভারতে বৈদেশিক প্রভাব ব্যাপক। তার উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম অংশ ব্যাক্ট্রিয়ান গ্রীক, শক ও কুষাণদের অধীন। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, ভারতীয় জীবন ও সভ্যতায় উল্লেখযোগ্যভাবে অল্পই বিদেশী-প্রভাব আরোপিত। বিদ্বানজনের সিদ্ধান্ত এই যে বিদেশীপ্রভাব সীমিত এবং ভারতীয় সভ্যতার প্রবাহে তার উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা নেই। এই কালে (২০০ খ্রী: পূ:-২০০ খ্রী:) হেলেনীয় জগতের সঙ্গে পর্যাপ্ত যোগাযোগ থাকলেও ভারতের ওপর তার প্রভাব আশ্চর্যজনকরূপে স্বল্প। রলিনসনের ভাষায়—"হেলেনীয় প্রভাব সমগ্র পশ্চিম-এশিয়া ও মিশরে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিস্তারিত হলেও হিন্দুকুশ অঞ্চলে থেমে পড়েছে (Rawlinson, H. G., Intercourse between India and Ancient World, P. I61)। বরং ইহা প্রামাণিক সত্য যে ভারতে আগত বিদেশীরা ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করার বদলে দ্রুতই ভারতীয় ধর্ম ও জীবন-যাপনের পদ্ধতি গ্রহণ করে স্থানীয় জনস্রোতে মিশে গেছে। মেনান্দার ও হেলিওডোরস্-এর ভারতীয় ধর্ম গ্রহণ তো সুপরিচিত কাহিনী। সমাজে স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হওয়ার কোন চিহ্ন ভারতে হেলেনীয় রাষ্ট্রাধীন অংশেও দেখি না।

টয়েনবী'র "পালি-প্রাকৃত'র মত অপকৃষ্ট চলিত-ভাষার উন্নতি" বিষয়ক কথাগুলি খুবই বিভ্রান্তিকর ও অস্পষ্ট। একটা চলিত ভাষার উত্থান সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের লক্ষণরূপে কিছুতেই বিবেচিত হতে পারে না। সংস্কৃত অপেক্ষা পালি-প্রাকৃতকেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম বেশী মানুষকে আকর্ষণের জন্য অধিক গুরুত্ব দিলেও 'সংস্কৃত' কখনই সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয় নি। পণ্ডিত-জনের ভাষা হিসাবে এর বিশেষ খ্যাতি অব্যাহতই ছিল। দ্বিতীয় শতকের মধ্যবর্তী কালে ইহা সাহিত্যের মাধ্যমরূপে অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল; পূর্বে প্রাকৃত স্বল্পকালের জন্য এর সঙ্গে

প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছিল মাত্র। একেই টয়েনবী একটা মৃতভাষার উজ্জীবনে পুরাতনের প্রবর্তন বলে অভিহিত করেছেন, যা একান্তই ভুল। তাঁর রচনা ভাষ্য থেকে অনুমিত হয় যে প্রথমে তিনি পলি-প্রাকৃত'র উত্থানের বিরুদ্ধে, পরে আবার প্রাকৃত'র স্থানে সংস্কৃত'র পুনঃ-প্রতিষ্ঠায়ও তাঁর আপত্তি।

মূলতঃ 'সংস্কৃত' আলোচ্য কালের কোন পর্বেই অপ্রচলিত হয়ে পড়েনি। ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় ও ঐহিক ভাবধারায় ভাষার মাধ্যমরূপে তা ধারাবাহিকভাবে লালিত হয়েছে। সুবিখ্যাত ব্যাকরণ-বিদ পাণিনী (আনুঃ আবির্ভাবকাল খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতক থেকে খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতক), কাত্যায়ন (আনুঃ খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতক) এবং পতঞ্জলি'র (আনুঃ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক —পুষ্যমিত্র'র সমসাময়িক) আবির্ভাব সন্দেহাতীত-রূপে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা প্রমাণিত করে। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম তাদের সাহিত্যের মাধ্যম-রূপে পালি-প্রাকৃতকে প্রবর্তন করলেও সেইকালে সংস্কৃত'র সাহিত্যিক তৎপরতা কিন্তু অব্যাহত। এই কালেই মহাকাব্যদ্বয় সম্পাদিত হয়েছে, কয়েকটি অর্বাচীন সূত্র-সাহিত্য ও মনুসংহিতা রচিত হয়েছে। রুদ্রদামনের শিলালিপিতে সর্বপ্রথম সংস্কৃত'র ব্যবহার এর পুনরুজ্জীবন-রূপে আখ্যাত হতে পারে না। অশোক বৌদ্ধপ্রভাবে সংস্কৃত'র স্থানে কথ্যভাষা প্রাকৃততে শিলানুশাসন রচনার প্রচলন করেন। এই রীতি পরবর্তী শাসকরাও মিশ্রভাষা বলেই অনুসরণ করেন নি, করেছেন লিপি প্রচলনের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতির প্রতি আসক্তি-বশতঃ। আসলে কয়েকক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ভিন্ন, প্রাকৃত চতুর্থ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত লিপিমালায় ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ সাহিত্যের জগতে বৌদ্ধ ও জৈন লেখকরা দ্বিতীয় শতক থেকেই প্রাকৃতকে উপেক্ষা করে সংস্কৃত'র প্রতি তাঁদের অনুরাগ দেখিয়েছেন।

ইণ্ডিক সভ্যতায় অশ্বমেধ যজ্ঞ'র মত প্রাচীন রীতির পুনঃ প্রবর্তন সম্পর্কীয় টয়েনবী'র বিচার নিঃসন্দেহে তাঁর অধ্যবসায়ী বিশ্লেষণের অভাবরূপে গণ্য হবে। আপাতঃ দৃষ্টিতে তাঁর কথাতে সত্য রয়েছে, তা হচ্ছে পুষ্যমিত্র কর্তৃক একটা অনুষ্ঠানের পুনরুজ্জীবন —তা পূর্বে দীর্ঘকাল অপ্রচলিত ছিল। তিনি কিন্তু এই অপ্রচলনের প্রকৃতি ও কারণের গভীরে প্রবেশ করেন নি। ইহা ঠিক নয় যে অনুষ্ঠানটি মরে গিয়েছিল। তা অপ্রচলিত থাকার মূলে পূর্ববর্তী রাজবংশের রাজাদের অ-হিন্দুত্ব। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন জৈন, তাঁর পৌত্র অশোক বৌদ্ধ, তেমনিই তাঁর উত্তরাধিকারীরা। অতএব এঁদের কালে অশ্বমেধ-যজ্ঞ হওয়ার সুযোগ নেই। যখনই পুষ্যমিত্র'র মত একজন হিন্দু রাজা সার্বভৌমত্ব-সূচক অনুষ্ঠানের যোগ্যরূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন, অমনি রীতিটির প্রবর্তন হল। দক্ষিণের সাতবাহন, মধ্যভারতের নাগ এবং প্রবরসেন বাকাটক প্রমুখ রাজন্যকুলও এই অনুষ্ঠান করেছেন (দ্রঃ—Mazumdar, R. C., The Age of Imperial Unity, P. 199, 220)। সমুদ্রগুপ্ত এর পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন বলে গয়া-লিপির দাবীর মূলে সত্যতা নেই।

বহুবিতর্কিত কর্মবাদ অদৃষ্টবাদের আশ্রয় কিনা, সে সম্পর্কে টয়েনবী'র ধারণাকে যুক্তির দিক থেকে স্বীকার করলে বলতেই হবে—তাঁর কথামত ইহা প্রকাশ করছে এক অসহায়তাবোধ ও পাপবোধকে। কিন্তু এইটুকুই আমাদের খুব একটা সাহায্য করে না কারণ তাঁর মতানুযায়ী কর্মবাদ এমন এক বিশ্বাস যা পতনোন্মুখ ইণ্ডিক সমাজের চিন্তাভাবনাকে ব্যক্ত করছে (খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতক থেকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত)। প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্বাস তথা মতবাদ পূর্ববর্তী'র মত পরবর্তী কালেও দার্শনিকদের মধ্যে প্রবল ছিল, শঙ্করাচার্যের মত অদ্বৈতবাদীও প্রভাবিত হয়েছেন।

স্মর্তব্য যে শঙ্করাচার্যর আবির্ভাব টয়েনবী পরিকল্পিত অনুগামী হিন্দু সভ্যতার গঠনমূলক উন্নতি-দশায়।

টয়েনবী'র বর্ণ-ব্যবস্থার কঠোরতা-বিষয়ক মন্তব্যও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। সূত্র-যুগের সময় থেকেই বর্ণ ক্রমশঃ কঠোর থেকে কঠোরতর হয়েছে এবং এই যুগ তাঁর ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতক থেকে ইণ্ডিক সভ্যতার পতন আরম্ভ হয়। কিন্তু বর্ণ-ব্যবস্থার কঠোরতা তো ইণ্ডিক সভ্যতার খণ্ড খণ্ড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হয়নি। প্রগতিশীল কঠোরতা সঞ্চিত হয়ে এই ব্যবস্থা মনু-স্মৃতিতে আরও বিস্তৃত। সর্বোপরি, প্রাক্-বৈদিক পর্বে যার উন্মেষ সেই শক্তি-ধর্ম ও তান্ত্রিক-ক্রিয়াকাণ্ড তো গুপ্তোত্তরকালেই প্রাধান্য লাভ করেছে।

এ পর্যন্ত টয়েনবী'র ইণ্ডিক তথা ভারত-সভ্যতা বিষয়ক মতবাদের যথার্থতা বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হল। মতের ভিন্নতা সত্বেও স্বীকার্য যে তাঁর পরিকল্পনা যথেষ্ট আকর্ষণকারী এবং অনেক-ক্ষেত্রে চমৎকার সঙ্কেতপূর্ণ। সর্বোপরি তাঁর রচনার বাক্য বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বিদ্বৎমণ্ডলীকে "ইতিহাস পাঠ" অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করবে।

শতদ্রু মজুমদারের **গল্প** অজিত পানের খেলা

ভাষ্যকার ও কয়েকজন

বারোয়ারি তলার চেহারাই পাল্টে গেল। মাঠময় লোকজন, হৈ হট্টগোলে একেবারে উৎসবের আমেজ। মন্দিরের সামনে ছোটমত প্যাণ্ডেল। সেখানে ক্লাবের ছেলেরা। মন্দিরের ওপরে ত্রিশূল ছুঁইছুঁই মাইক। কখনো গান বাজছে, কখনো কথা। এখন শোনা যাচ্ছে: এই মাত্র দুটো টাকা দিল শ্রীরজত দাস। তখন সবাই মুখ বাড়িয়ে দেখল, মাঝ-মধ্যিখানে ঘণ্টে দাঁড়িয়ে। হাফপ্যাণ্টের ওপর নতুন স্যাণ্ডোগেঞ্জি। দু-হাত কোমরে রেখে একেবারে লাটসাহেব। যেন ছবি উঠবে। জানা গেল, গোবিন্দ দাসের ছেলের নাম রজত। সে নয় হল। কিন্তু কুড়ি পয়সা পেলে ঘণ্টে দুবার আলুকাবলি কিনে খায়। দুটাকা কোথা থেকে পেল? এটা চিন্তার বিষয়। গোবিন্দ সারা বছর মিলে নাইট ডিউটি দিয়ে ভোর-বেলা ডাবের কাঁদি নিয়ে ছোটে হাটগাছার বাজারে। দুর্গাপুজোয় এক টাকার বেশি চাঁদা ঠেকায় না। আর তার ছেলে কিনা—।

সাইকেল চালাতে চালাতে লোকটা এক জায়গায় স্থির। যেন গাছের শুকনো বাঁকা-চোরা ডালের ওপর মানুষ বসে। খেল একটা দেখাচ্ছে বটে! দু চাকার গাড়িটা নিয়ে যা খুশি তাই করে যাচ্ছে। ঘণ্টে নিজের হাতেই সেফটিপিন দিয়ে টাকাটা জামায় আটকে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে হাততালি। যেন লক্ষ-কোটি চটপটির শব্দ। ঘণ্টের হাসি হাসি মুখ। টুক্‌ করে তাকে সাইকেলে তুলে নিল লোকটা।

রডের ওপর দাঁড় করালো। কাঁধে বসালো। দুহাতের ওপর দেহটা শুইয়ে, পেটে হ্যাণ্ডেলের ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে বাচ্চা ছেলেকে দোল খাওয়ানোর মত করে যখন সাইকেল চালাচ্ছিল, তখনই কোন ফাজিল বলে উঠল, 'মেনু দোলে—তেরা মেনু—' অমনি হো হো হাসি। সঙ্গে সঙ্গে মাইক ধমকে ওঠে: আস্তে—আস্তে—। হ্যাঁ, মাত্র ২০ ঘণ্টা হল অজিত পান সাইকেল চালিয়েছেন—আরো ৮৬ ঘণ্টা এই মানুষটি এক নাগাড়ে সাইকেল চালিয়ে যাবেন।

পাড়াতে রবির দুর্নাম, কোথাও টুনি জ্বললেই সে হাজির। কথাটা ঠিক। দুপুর থেকে সেই যে গ্যাঁট মেরে বসলো, সমানে চালিয়ে যাচ্ছে।

উপমা, অলংকার আর কবিতার ছয়লাপ। ভাষার ফুলঝুড়ি যেন।

রোজ সকালে বিকালে একটা করে কবিতা লেখে রবি। লিটল ম্যাগাজিনে পাঠায় হরদম। জবাবী খামে ফেরৎ আসে। রবি দমে না। আবার লেখে। আবার ফেরত। বাবা বলেন, 'কিছু হচ্ছে না।

লিখে যাও। সহজ প্রতিষ্ঠা জীবনে ঘুণধরায়—'
কথাটা সে মনে রেখেছে। বাংলা অনার্সে ফেল করলেও প্রতিষ্ঠা রবি পেতে চায়। সে যত দেরীতেই হোক। গতকাল থেকে কাব্যচর্চা বন্ধ। মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে অজিত পান। সারা দুপুর মনে মনে ঠিক করে নেয় বিকালে কী বলবে।

এই যেমন আজকে। কখনো বলছে, অজিত পান বাংলা মায়ের দামাল ছেলে; কখনো ধ্রুব নক্ষত্র—উপগ্রহ। আবার বলছে, আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ।

ওর একদল ইয়ার হঠাৎ বলে উঠল, 'সাবাশ রবি—চালিয়ে যা—'

অন্যজন, 'স্ট্যামিনা আছে মাইরি।'

পেছনে যে রবির বাবা, সেটা কেউ দেখেনি।

দু'পা এগিয়ে, ছেলেটার মুখের দিকে তাকালেন মাষ্টার মশাই।

'কার?'

দুবার ঢোক গিললো ছেলেটা, 'না, মানে—'

'হ্যাঁ, কার স্ট্যামিনার কথা বলছো? যে খেলা দেখাচ্ছে তার, না মাইকে যে ভুলভাল বলছে তার?'

টুক করে সটকে পড়েছে দু'জন। বাকি রইল তারক।

এটাই এর বৈশিষ্ট্য। সব ব্যাপারে অন্যেরা ঝামেলা পাকিয়ে তারককে ঠেকিয়ে দেয়।

মাধ্যমিক পাশ করে দাশনগরে টেকনিকাল কলেজে ভর্তি হয়েছে। কম বুদ্ধি নিয়ে ফোড়ন কাটবে। চেপে ধরলে কাঁচু মাচু। বারফট্টা তবু ষোলো আনা।

তবে ছেলে ভালো।

তারক বলল, 'আমি তো কিছু বলিনি—'

'হ্যাঁ বন্ধুকে গিয়ে বলো, ভুলভাল কাগজে লেখাই যায়—মুখে বলা যায় না—আর যদি পারো তো মাইক্রোফোনটা হাত থেকে কেড়ে নিও—যত্তোসব!'

মাষ্টার মশাই পা চালালেন। বিকালের দিকে রোজই একা হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধার পর্যন্ত চলে যান। জানতেন না বারোয়ারি মাঠের এলাহি কাণ্ড। ভিড় দেখে দাঁড়িয়ে গেছেন। কী, না সাইকেলে কেরামতি দেখাচ্ছে এক ছোকরা।

তাতেই এত। কিছু বলবার নেই। মানুষের জীবনে বৈচিত্র্য কোথায়? পোকায় কাটা গম, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। গ্রীষ্মে খরা, বর্ষায় হাবুডুবু। এই তো জীবন।

আর বৈচিত্র্য মানে তো, হিন্দি সিনেমা। কখনো জশিস, কখনো আম্রিক।

এইভাবে তো আর জীবন চলতে পারে না। সুতরাং অজিত পানের কোনো দোষ নেই। সুযোগ পেয়েছে, ঢুকে পড়েছে।

দ্রুত পা চালিয়ে রাজার মাঠ পার হচ্ছেন মাষ্টার মশাই। দূরে শোনা যাচ্ছে: ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে……

কণকলতা

কাজ সেরে এই ফিরল কণকলতা। এবার উনুন ধরবে। আজ তিন বছর সে ধু-ধু বাড়িতে একা। তবে চালিয়ে যাচ্ছে, হাঁস-মুরগি-ছাগল নিয়ে।

ভেউরের মেয়ে মাহেস্ত ঘরের বউ হলে যা হয়। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ভিন্ন। ভেবেছে না খেতে পেয়ে শাশুড়ী টেঁসে যাবে।

দিন ঠিক চলে যায়। অবিশ্যি কুলগাছি থেকে মেয়ে-জামাই লিখেছে, সেখানে গিয়ে থাকতে। জামাই ও চায়। কণকলতা যায় নি। ভেউরের মেয়ে আগুটি নিয়ে উঠবে। ক'টা তো দিন আর।

মেয়ে টাকা পাঠায়। অম্বুবাচীর সময় আসে মেলায় ফল দিয়ে। গোবিন্দর ছেলে আজকাল তরকারি-মরকারি দিয়ে যায়। গড়ায় খুব।

আগে তো এত দরদ ছিল না। ফিকির একটা আছে। সাঁঝবেলার ঘণ্টা বাজল বলে! কণকলতা জানে, এসব বাড়ি দখলের তোড়-জোড়।

'ক্যাঁ-চ, করে ডেকে উঠল বাখারির বেড়া। ঘরের ভেতর থেকে কণকলতা নাকি সুর ছাড়ল, 'কে রা—'

'আমি ঠাকুমা।'

চৌহদ্দি জুড়ে নীরেট অন্ধকার। উঠোনের মাঝ-মধ্যিখানে একটা টিঙটিঙে ছায়ামূর্তি।

'আরে আমিটা কে ? নিজের কাছে সবাই তো আমি।'

'আমি তারক।'

লম্ফ হাতে বেরিয়ে এল কণকলতা।

'শিবের ব্যাটা ?'

তারক মুণ্ডু নেড়ে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ।'

বেড়ার গায়ে, টগর গাছের তলায় আরো ক'জন ছিল। এবার তারাও ভেতরে ঢুকল।

দাওয়ায় জুবুথুবু বসল কণকলতা।

'তা দরকারটা কী ?'

কাছে এসে ঝুঁকে পড়ল তারক। ফিসফিসিয়ে বলল, 'বলছি কী—তোমার একটা হাঁস দেবে ?'

'শোনো কথা—'

কণকলতা মুখ সিধে করল। শরীর তবু বেঁকে-বেঁকে 'ঠ'। 'না না হাঁস-টাঁস হবে না—'

'আরে শোনেই না—আবার দিয়ে যাবো।'

'না, না। সে তো সবাই দিয়ে যায়—'

অন্য একজন বলল, 'খেলা দেখিয়েই দিয়ে দেবে গো—'

দাওয়ার কোণে হাঁসের বাক্সের কাছে গিয়ে দাঁড়াল কণকলতা।

'কেন রা ? হাঁসের আবার কী খেলা ? হাঁসকে সাইকেলে চড়াবি নাকি—কেন রায়দের বাড়ি যেতে পারলি না তাদের তো ঘর ভরতি মুরগি—'

বুঝিয়ে আর পারা গেল না। ছেলেরা চলে গেল, অগত্যা।

শেষ পর্যন্ত জাগরণ সংঘের সেক্রেটারি নিরুপম চ্যাটার্জী এসে, দশ টাকা জমা রেখে তবে হাঁস নিয়ে যায়।

দুঃখের দিন তথাগত

একা ঘরে সাবিত্রী। সবাই বারোয়ারি তলায়। দুদিন হয়ে গেল, সে একবারও যায় নি। মা অবিশ্যি বারবার বলেছে, সন্ধের দিকে দেখে আয় না একবার, ভালো লাগবে।'

ভালো কিছুই লাগছে না। মরুভূমির মাঝখানে বসিয়ে রেখে জামাই ভেগেছে। চারদিকে কত কানা-ঘুঁসো। ঘটনার ডালপালা বেরিয়ে গেছে। গেলে হয়ত সাইকেল খেলা না দেখে তাকে নিয়ে ফিসফাস শুরু করে দেবে।

তিন মাস সাবিত্রী ঘরবন্দী। খড়্গাপুরে মাল আনতে যাচ্ছি, বলে জামাই গেল তো গেলই।

ভেবে ভেবে দিন যায়। এদিকে পেটের বাচ্চা বেড়েই চলেছে। বাবা অবিশ্যি বলেছিল, 'একটু খোঁজ-খবরের দরকার আছে।' কিন্তু সে সময়টুকু দিল না ওরা। চারদিনের মধ্যেই কাজ সারবে। ছেলে ম্যাট্রিক ফেল। খড়্গাপুরে মাছের কারবার। বিয়ের পর খড়্গাপুর যাবার নাম-গন্ধ নেই। মৌড়ি-গ্রামে ঘর ভাড়া করে রইল। মাঝে-মাঝে এদিক-সেদিক চলে যায়। আবার আসে এই করতে করতে একবার যে গেল, আর এল না।

হঠাৎ ঝ'ড়ো কাক হয়ে তারক ঢুকল।

'দিদি একটু দুধ গরম করে দে তো—'

বিবিধ ভারতীতে বাংলা গান শুনছিল সাবিত্রী। বলল, 'কেন, দুধ কী হবে ?'

'ও খাবে।'

'বলো যা—দুধ খেতে যাবে কেন—দুধ নেই।'

তারক নাছোড়, 'মা বললো, আছে—'

বলতে বলতে মা হাজির। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'অ সাবি দুধটা গরম করে দিয়েছিস?'

রেডিও বন্ধ করে সাবিত্রী বলল, 'দুধ কোথায়? ঐ তো একটু খানি, চায়ের—'

'আঃ তাই দে—না মা, আহা! কী সুন্দর খেলা দেখাচ্ছে কত কষ্ট করে—আচ্ছা আমিই নয় দিচ্ছি। তুই বরং গিয়ে একটু দেখে আয়—'

সাবিত্রী গেল না। গরম দুধ বয়মে করে নিয়ে তারক

ডাক্তারবাবু একটা হরলিক্স দিয়েছেন। বাচ্চুর মা তিন টাকার সন্দেশ। তারকের ইচ্ছে, তারাও কিছু দেবে। নিজে থেকেই তাই নিরুপমদাকে বলছে, 'আমরা গরম দুধ দোবো।' মাকে বলতেই রাজী।

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে নিরুপমের হাতে দুধের বয়েম তুলে দিল তারক।

অঞ্চল প্রধানের ভূমিকা

রাত হয়েছে। কে বলবে, এখন এগারোটা।

অন্যদিন হলে সব নিঃসাড়। পাড়াটা বেশ গমগম করছে আজ।

কাজকর্ম সেরে ফিরেছে, এমন লোকেরা খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুরতে ঘুরতে চলে আসে। কী করছে, দেখাই যাক না একটু! কিন্তু এত রাত্তিরে তো আর খেলা দেখানো যায় না, এখন বিশ্রামের সময়।

সাইকেল চালাতে চালাতেই বিশ্রাম। সারা রাত অজিত পান সাইকেল চালিয়ে যাবে। থামবে। সাইকেল থেকে নামবে না। নামলেই বিপদ। সাইকেলকে মাটিতে শোয়াবে। নিজে শোবে না। মাটি ছুঁলেই অজ্ঞান হয়ে যাবে।

ক্লাবের একটা ছেলে অঞ্চল প্রধান শশীবাবুকে এইসব বোঝাচ্ছিল।

ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলেন শশীবাবু।

'তুই যা যা—ওসব অন্য কাউকে বোঝাস।'

পাশেই ডাক্তারবাবু। সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'না না, ঠিকই বলেছে। হতেই পারে।'

ডাক্তারি মতে কৌশলটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন। তখন শশীবাবু অন্য কথায়।

'ঠিকাছে, তাই নয় হলো। কিন্তু জানা নেই, শোনা নেই একটা আননোন ছেলেকে এভাবে পাড়ায় এনট্রি দেয়াটা কি ঠিক হয়েছে?

অল্প হেসে ডাক্তারবাবু বললেন, 'তাতে কি আছে? এতে আর এমন কী হতে পারে?'

'হতে তো কিছুই পাবে না', ব্যাঙের হাসি টেনে শশীবাবু বললেন, 'সেবার বলাই মিত্তিরের বাড়িতে কী কাণ্ডটা হলো দেখলেন তো—'

পাড়ার মধ্যে প্রথম টি.ভি. এসেছে বলাই মিত্তিরের বাড়িতে। বিলিতি কুকুরকে বিস্কুট খাওয়ায় ওরা।

সেবারে রান্না পুজোর দিন সকালে বলাই মিত্তির বাজারে গেছেন, হঠাৎ বাড়িতে একটা অচেনা ছেলে এল দুটো ইলিশ মাছ নিয়ে। ছেলেটা বলল, 'বউদি বলাইদা মাছ দুটো পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, সাইকলটা নিয়ে আয়। দোকান বাজার সেরে ফিরবেন।' ছেলেটার হাতে সাইকেলের চাবি দিয়ে দেওয়া হল।

ব্যাস, তারপর যা হবার, তাই। বলাই মিত্তির ইলিশ মাছের ধারে কাছে যান নি। সাইকেল হাপিশ।

এই আর কী। কলকাতায় এসব হামেশাই। এখানে ঐ প্রথম। সকলের ভয় ধরে গিয়েছিল।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'না, এ আপনি কী বলছেন? সেটা ছিল সম্পূর্ণই আলাদা ব্যাপার।'

শশীবাবু গম্ভীর হলেন।

'না হলে তো ভালোই। হলে কিন্তু আপনারাই সামলাবেন'। ডাক্তারবাবু চুপ।

সব ব্যাপারেই শশী বাগচি নাক গলাতে চান। পঞ্চায়েতের ভোটে এবার গোহারা। মাতব্বরির নেশাটা এখনো যায় নি। জাগরণ সঙ্ঘের ছেলেরা সুপ্রভাত নিয়োগীকে সাইকেল খেলার সভাপতি করেছে।

শশীবাবুর রাগটা সেখানেই। গজ গজ করতে করতে চলে গেলেন তিনি।

এমন বন্ধু কে আছে আর

সাইকেল বোঝাই ডাব নিয়ে গোবিন্দ উঠোনে ঢুকল। রাত থাকতেই সে বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে থাকে দীন দয়াল। সন্ধানটা সে-ই এনে দেয়। বোকা-হাবা মানুষ। দু'চার টাকা দিলেই ঝামেলা চুকে যায়।

সবাই জানে গোবিন্দ দাস মিলে নাইট ডিউটি দেয়। কাল রাত্তিরের ডিউটি ছিল সেনের বাগানে।

হাজারি গাছের ডাব। সাইজ একেবারে নিটোল বাতাবি লেবু। মুখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল বলে। গরমের দিন আছে। ঝপাঝপ্ কেটে যাবে।

সাইকেল থেকে ডাব নামাতে নামাতে গোবিন্দ ডাক ছাড়ল, 'ঘণ্টে--কোথায় গেলি রে—'

ঘণ্টের সাড়া নেই। ঘরের ভেতর থেকে পারুল বেরিয়ে এল। কাঁকালে ঝুলন্ত বাচ্চাকে নামিয়ে কাজে হাত লাগায় সে।

'ঘণ্টেটা কোথায় গেল, এই সাত সকালে?

দুহাতে দুটো কাঁদি নিয়ে ঘরের দিকে যেতে যেতে পারুল বলে, 'সে তো ভোর না হতেই বারালিতলায় ছুটেছে—ঐ যে কী খেলা দেখাচ্ছে নাকি—'

'অ। তা সে কি আজকেও হচ্ছে?

'হ্যাঁ, বলে তো তিনদিন ধরে হবে। ছেলে তো আমাকে পাগল করে মারলে, এটা দাও—সেটা দাও—আর পারিনে বাপু—ছেলের যে কী মনে ধরলো কে জানে—'

কিছু ডাব ঘরে ঢোকাল, কিছু থাকল সাইকেলের সঙ্গে। একসঙ্গে সবগুলো বাজারে যাবে না। খানিকপরে ঘণ্টে এল। বাজারে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল গোবিন্দ। বলল, 'খালি খেলা দেখলেই হবে? পড়াশোনা নেই?

ঘণ্টে সোজা ঘরের ভেতর। সেখান থেকে বলল, 'একজামিন হয়ে গ্যাচে—'

'অ। তা'লে বাজারে যাবি তো, না কি?'

কাঁদির একটা ডাব বোঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছিঁড়ে ফেলল ঘণ্টে। সেটা তক্তাপোশের তলায় লুকিয়ে রেখে, দাওয়ায় এসে বলল, 'হ্যাঁ, যাবো। চা-মুড়ি খেয়ে নি—'

তারপর চা খেয়ে বাপ-ব্যাটায় বেরিয়ে পড়ল।

অনুরাধার জগৎ

মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছুটোতে লেটার পেয়ে পাড়ার সবচেয়ে ভালোমেয়ে হয়ে গেল অনুরাধা।

কলকাতার কলেজে পড়ে। সিনেমা দেখে না। অবসর পেলে সুচিত্রা মিত্রের রেকর্ড চালায়। তার ডানহাতে ঘড়ি, চোখে স্টীল ফ্রেমের চশমা। হাঁটার সময় চোখ থাকে নিজের পায়ের দিকে।

পাড়ার কোনো মেয়ে অবাধ্য হলে মায়েরা অনুরাধার দৃষ্টান্ত টানেন। তার মত মেয়ে পেলেন না বলে হতাশ বোধ করেন অনেকেই।

আজ রবিবার। বাড়িতে একটু হৈ-চৈ। অনুরাধা পড়ার ঘরে। তিন খানা রেফারেন্স বই খুলে মঙ্গল কাব্যের নোট তৈরি করছিল সে।

এমন সময় পাড়ার মেয়েরা এল।

মা বললেন, 'ও তো পড়ছে। পরে এসো না—'

'পরে আর সময় হবে না মাসীমা—আরো অনেক কাজ বাকি।'

'কী ব্যাপার, আমাকে বলতে অসুবিধা আছে ?

কালকে অজিত পান চলে যাচ্ছে। মহিলা সমিতির পক্ষ্য থেকে সম্বর্ধনা জানাতে চায়। প্যাণ্টের একটা পিস, একটা জাপানি লাইটার আর এক প্যাকেট দামী সিগারেট দেওয়া হবে।

অনুরাধার মা বললেন, 'ও-তাই। বেশ তো, কত চাঁদা?

'পাঁচ টাকা করে।'

'ঠিকাছে, আমি দিয়ে দিচ্ছি।'

'না মাসীমা, অনুরাধাকে একটু দরকার। ওকে দিয়ে একটা মানপত্র লেখাবো।'

শেষপর্যন্ত অনুরাধা দরজা খুলল। বাইরে এল। শুনল সব। কিন্তু কিছু লিখে দিল না।

শশীবাবুর মেয়ের যে দেমাক ভারী, এটা জানা কথাই। সোভিয়েত দেশ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় এক গাদা বই পেয়ে সে দেমাক তুঙ্গে। তাও জানা। কিন্তু পাড়ার মেয়ে। মহিলা সমিতির মেম্বার। আসাটা কর্তব্য এসেছিল তাই। গজ গজ করতে করতে মেয়েরা চলে গেল।

আবার শশীবাবু

রবি বলছে: আজকের প্রধান আকর্ষণ আগুনের বলয়ের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া। আপনারা দেখলেন, এইমাত্র চারটে কিশোরের পিঠের ওপর দিয়ে সাইকেল চলে গেল, তাদের কিছু হয়নি। কাল রাত্তিরে দেখেছেন, হাঁসের গলার ওপর দিয়ে সাইকেল চলে গেছে--হাঁসটা সম্পূর্ণ সুস্থ। বাড়িতে গিয়ে একটা ডিম ও পেড়েছে। এরকম অজস্র খেলার ডালি সাজিয়ে অজিত পান আমাদের গ্রামে উপস্থিত হয়েছেন।

রবির ভাষা আজকে তবু একটু সরগড়ো। এক নাগাড়ে অনেক বলছে তো, ভাই।

পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন শশীবাবু। কী খেয়ালে স্লো-সাইকেল করলেন।

ওঃ লোক একটা হয়েছে বটে। গ্রাম ঝাঁটিয়ে এসেছে। খুব হম্বি-তম্বি হচ্ছে তিনদিন ধরে। একটু দেখাই যাক না। রাস্তার ধারে ২৬ ইঞ্চি দু'চাকার ওপর থেকে মাটিতে বুড়োআঙুল ঠেকিয়ে ব্যালেন্স ঠিক করছিলেন অঞ্চল প্রধান। দেখলেন, কালো মত ট্রেক ছোকরা। চোখে কালো চশমা। দু'হাতে দুটো সাইকেল নিয়ে মাঠের মধ্যে জোর সাইকেল চালাচ্ছে সে। এলেম আছে বলতে হয়।

মন্দিরের শিব-ডগালে মাইক। দেশাত্মবোধক গান থামিয়ে নীলু মাষ্টারের ব্যাটা এন্তার জ্ঞান দিচ্ছে। তবে বলতে পারে ছোকরা। ভোটের সময় পেলে উপকার দিত। সেবার গোবরাটা যা বলল ছ্যা ছ্যা—।

: আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা আপনাদের কাছে যাচ্ছে, যার যা সামর্থ দিয়ে দিন।

বলতে বলতে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এল কৌটো হাতে একটা ছেলে। খচাং খচাং নেড়ে মাইকের ভাষায় সে-ও আবেদন জানাল। কী আর করা যাবে। মান-সম্মানটা তো এখনো ধুলো-কাদা হয়ে যায় নি। দুটো টাকা দিলেন শশীবাবু।

একটু পরেই মাইক সেকথা সবাইকে জানিয়ে দিল।

অজিতের তরে সকলে আমরা

একপোটাক ছাগল দুধ দিয়েছে কনকলতা। আর দুটো মুরগির ডিম। বলেছে, 'দেখিস আবার তোদের পেটে ঢোকে না যেন।'

ছেলেরা বলেছে, 'হেঃ হেঃ কী যে বলো ঠাকুমা—'

হ্যাঁ বাপু, আমার সাফসুপ কথা। সে বেচারী অত খাটা-খাটি করচে, একটু ভালোমন্দ খাবে না।'

নাক টিপে ছাগল দুধ খেল অজিত। উৎকট গন্ধ। কিন্তু উপকারী। শরীরে বল দেয়। ডিম দুটো সকালেই খেয়েছে। হাফবয়েল করে।

'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' বাজাতে বাজাতে অরবিন্দ সোসাইটির ছেলেরা চলেছে ব্যাণ্ডপার্টি নিয়ে। অজিত পানকে সম্বর্ধনা জানাবে। লাইনের পেছনে নাচতে নাচতে যাচ্ছে ঘণ্টে। এক গাল হাসি। হাতে একটা ডাব।

ফ্রিজ খুলে এক বোতল জল বের করলেন ডাক্তার বৌদি। শরবত বানাবেন।

নিরুপম বলে দিয়েছে, 'বৌদি আজকের শরবতের দায়িত্বটা কিন্তু আপনার।'

হাসি মুখে বৌদি রাজী। এ আর এমন কী।

ডাক্তারবাবু ফ্রিতে একটা ইনজেকশন করেছেন। বারোয়ারি তলার সবচেয়ে কাছে ডাক্তারবাবুর বাড়িটা। এটুকু না করলে আর জনদরদী কী।

নিরুপমের হাতে শরবতের গ্লাস দিয়ে বৌদি বললেন, 'আর দরকার হলে বলো—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চই।

নিরুপমের এখন অনেক কাজ। এক্ষুণি কুণ্ডুবাড়ি পাঠাতে হবে কাউকে। ৭০ কিলো ওজনের পাথর চাই একটা। অজিতের পিঠে পাথর ভাঙা হবে।

শরবতের গ্লাশ অজিত পানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিরুপম ছেলে খুঁজতে লাগল। অনেকেই যেতে রাজী হয় না।

গা-হাত-পায়ে হেভি ব্যাথা।

তা হতে পারে। ৮০ বালতি জলে অজিত পান চান করেছে। বড় পুকুর থেকে বালতি বালতি জল আনতে ছেলেরা কাহিল। সাইকেলে দাঁড়িয়েই চান হল।

তখন চানের জল তোলে নি, এরকম দু'একজনের সন্ধানে এদিক-সেদিক ছোটা-ছুটি করতে থাকে নিরুপম।

: দুটো টাকা দিলেন, শ্রীমন্ত দাস। এই টাকাটা অজিতবাবু কান দিয়ে তুলবেন।

আবার খানিক বাদে : পাঁচ টাকা দিলেন রায় পাড়ার শ্রীমতী রত্না চক্রবর্তী। এই টাকা অজিতবাবু নাক দিয়ে তুলবেন।

এ এক আশ্চর্য খেলা। কাল থেকে এটা শুরু হয়েছে। নাক দিয়ে, চুল দিয়ে এমন কি চোখের পাতা দিয়েও। এন্তার টাকা বিলোচ্ছে দর্শক। যেন নেশায় পেয়ে বসেছে। মাঠের মধ্যে ছড়ানো-ছেটানো টাকা অজিত পান যে কোন অংগ দিয়ে তুলে নিচ্ছে। টাকায় টাকায় জামা ভরে গেছে। পাক দিয়ে ঘুরে এসে, হ্যাণ্ডেলের ওপর তল পেটের ভর দিয়ে, সামনের চাকা বরাবর ঝুঁকতে ঝুঁকতে মাটির কাছাকাছি মুখ এনে নাক-কান-চোখ অর্থাৎ দর্শকের ইচ্ছে মাফিক যে কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে টাকা তুলে নেয় অনায়াসেই।

আবেগ সামলাতে না পেরে রবি বলে ওঠে : কী আশ্চর্য নিপুণতায় ঠিক গবাদি পশুর মত—

'আঃ কী হচ্ছে কী', ভিড়ের মধ্য থেকে কে যেন আপত্তি ছুঁড়ে দেয়।

তখন 'মাফ করবেন' বলে রবি চটপট নতুন কোনো উপমা হাতড়ায়। পায় না। অগত্যা পুরনো কথার ধানাই-পানাই।

মহিলা সমিতির সেক্রেটারী রাণুদি রেগে গেলেন খুব। বললেন, 'তোরা নিলি কেন অমন টাকা? একবার আসতে পারলো না—এত অহংকার কীসের—' মেয়েরা চুপ। অনুরাধা সত্যি খুব বাজে ব্যবহার করেছে।

'পরে আর সময় হবে না মাসীমা—আরো অনেক কাজ বাকি।'

'কী ব্যাপার, আমাকে বলতে অসুবিধা আছে?

কালকে অজিত পান চলে যাচ্ছে। মহিলা সমিতির পক্ষ্য থেকে সম্বর্ধনা জানাতে চায়। প্যাণ্টের একটা পিস, একটা জাপানি লাইটার আর এক প্যাকেট দামী সিগারেট দেওয়া হবে।

অনুরাধার মা বললেন, 'ও-তাই। বেশ তো, কত চাঁদা?

'পাঁচ টাকা করে।'

'ঠিকাছে, আমি দিয়ে দিচ্ছি।'

'না মাসীমা, অনুরাধাকে একটু দরকার। ওকে দিয়ে একটা মানপত্র লেখাবো।'

শেষপর্যন্ত অনুরাধা দরজা খুলল। বাইরে এল। শুনল সব। কিন্তু কিছু লিখে দিল না।

শশীবাবুর মেয়ের যে দেমাক ভারী, এটা জানা কথাই। সোভিয়েত দেশ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় এক গাদা বই পেয়ে সে দেমাক তুঙ্গে। তাও জানা। কিন্তু পাড়ার মেয়ে। মহিলা সমিতির মেম্বার। আসাটা কর্তব্য এসেছিল তাই। গজ গজ করতে করতে মেয়েরা চলে গেল।

আবার শশীবাবু

রবি বলছে: আজকের প্রধান আকর্ষণ আগুনের বলয়ের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া। আপনারা দেখলেন, এইমাত্র চারটে কিশোরের পিঠের ওপর দিয়ে সাইকেল চলে গেল, তাদের কিছু হয়নি। কাল রাত্তিরে দেখেছেন, হাঁসের গলার ওপর দিয়ে সাইকেল চলে গেছে--হাঁসটা সম্পূর্ণ সুস্থ। বাড়িতে গিয়ে একটা ডিম ও পেড়েছে। এরকম অজস্র খেলার ডালি সাজিয়ে অজিত পান আমাদের গ্রামে উপস্থিত হয়েছেন।

রবির ভাষা আজকে তবু একটু সরগড়ো। এক নাগাড়ে অনেক বলছে তো, ভাই।

পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন শশীবাবু। কী খেয়ালে স্লো-সাইকেল করলেন।

ও: লোক একটা হয়েছে বটে। গ্রাম ঝাঁটিয়ে এসেছে। খুব হম্বি-তম্বি হচ্ছে তিনদিন ধরে। একটু দেখাই যাক না। রাস্তার ধারে ২৬ ইঞ্চি দু'চাকার ওপর থেকে মাটিতে বুড়োআঙুল ঠেকিয়ে ব্যালেন্স ঠিক করছিলেন অঞ্চল প্রধান। দেখলেন, কালো মত এক ছোকরা। চোখে কালো চশমা। দু'হাতে দুটো সাইকেল নিয়ে মাঠের মধ্যে জোর সাইকেল চালাচ্ছে সে। এলেম আছে বলতে হয়।

মন্দিরের শিব-ডগালে মাইক। দেশাত্মবোধক গান থামিয়ে নীলু মাষ্টারের ব্যাটা এন্তার জ্ঞান দিচ্ছে। তবে বলতে পারে ছোকরা। ভোটের সময় পেলে উপকার দিত। সেবার গোবরাটা যা বলল ছ্যা ছ্যা—।

: আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা আপনাদের কাছে যাচ্ছে, যার যা সামর্থ দিয়ে দিন।

বলতে বলতে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এল কৌটো হাতে একটা ছেলে। খচাং খচাং নেড়ে মাইকের ভাষায় সে-ও আবেদন জানাল। কী আর করা যাবে। মান-সম্মানটা তো এখনো ধুলো-কাদা হয়ে যায় নি। দুটো টাকা দিলেন শশীবাবু।

একটু পরেই মাইক সেকথা সবাইকে জানিয়ে দিল।

অজিতের তরে সকলে আমরা

একপোটাক ছাগল দুধ দিয়েছে কনকলতা। আর দুটো মুরগির ডিম। বলেছে, 'দেখিস আবার তোদের পেটে ঢোকে না যেন।'

ছেলেরা বলেছে, 'হে: হে: কী যে বলো ঠাকুমা—'

হ্যাঁ বাপু, আমার সাফসুপ কথা। সে বেচারী অত খাটা-খাটি করচে, একটু ভালোমন্দ খাবে না।'

নাক টিপে ছাগল দুধ খেল অজিত। উৎকট গন্ধ। কিন্তু উপকারী। শরীরে বল দেয়। ডিম দুটো সকালেই খেয়েছে। হাফবয়েল করে।

'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' বাজাতে বাজাতে অরবিন্দ সোসাইটির ছেলেরা চলেছে ব্যাণ্ডপার্টি নিয়ে। অজিত পানকে সম্বর্ধনা জানাবে। লাইনের পেছনে নাচতে নাচতে যাচ্ছে ঘণ্টে। এক গাল হাসি। হাতে একটা ডাব।

ফ্রিজ খুলে এক বোতল জল বের করলেন ডাক্তার বৌদি। শরবত বানাবেন।

নিরুপম বলে দিয়েছে, 'বৌদি আজকের শরবতের দায়িত্বটা কিন্তু আপনার।'

হাসি মুখে বৌদি রাজী। এ আর এমন কী।

ডাক্তারবাবু ফ্রিতে একটা ইনজেকশন করেছেন। বারোয়ারি তলার সবচেয়ে কাছে ডাক্তারবাবুর বাড়িটা। এটুকু না করলে আর জনদরদী কী।

নিরুপমের হাতে শরবতের গ্লাস দিয়ে বৌদি বললেন, 'আর দরকার হলে বলো—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চই।

নিরুপমের এখন অনেক কাজ। এক্ষুণি কুণ্ডুবাড়ি পাঠাতে হবে কাউকে। ৭০ কিলো ওজনের পাথর চাই একটা। অজিতের পিঠে পাথর ভাঙা হবে।

শরবতের গ্লাশ অজিত পানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিরুপম ছেলে খুঁজতে লাগল। অনেকেই যেতে রাজী হয় না।

গা-হাত-পায়ে হেভি ব্যাথা।

তা হতে পারে। ৮০ বালতি জলে অজিত পান চান করেছে। বড় পুকুর থেকে বালতি বালতি জল আনতে ছেলেরা কাহিল। সাইকেলে দাঁড়িয়েই চান হল।

তখন চানের জল তোলে নি, এরকম দু'একজনের সন্ধানে এদিক-সেদিক ছোটা-ছুটি করতে থাকে নিরুপম।

: দুটো টাকা দিলেন, শ্রীমন্ত দাস। এই টাকাটা অজিতবাবু কান দিয়ে তুলবেন।

আবার খানিক বাদে : পাঁচ টাকা দিলেন রায় পাড়ার শ্রীমতী রত্না চক্রবর্তী। এই টাকা অজিতবাবু নাক দিয়ে তুলবেন।

এ এক আশ্চর্য খেলা। কাল থেকে এটা শুরু হয়েছে। নাক দিয়ে, চুল দিয়ে এমন কি চোখের পাতা দিয়েও। এন্তার টাকা বিলোচ্ছে দর্শক। যেন নেশায় পেয়ে বসেছে। মাঠের মধ্যে ছড়ানো-ছেটানো টাকা অজিত পান যে কোন অংগ দিয়ে তুলে নিচ্ছে। টাকায় টাকায় জামা ভরে গেছে। পাক দিয়ে ঘুরে এসে, হ্যাণ্ডেলের ওপর তল পেটের ভর দিয়ে, সামনের চাকা বরাবর ঝুঁকতে ঝুঁকতে মাটির কাছাকাছি মুখ এনে নাক-কান-চোখ অর্থাৎ দর্শকের ইচ্ছে মাফিক যে কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে টাকা তুলে নেয় অনায়াসেই।

আবেগ সামলাতে না পেরে রবি বলে ওঠে : কী আশ্চর্য নিপুণতায় ঠিক গবাদি পশুর মত—

'আঃ কী হচ্ছে কী', ভিড়ের মধ্য থেকে কে যেন আপত্তি ছুঁড়ে দেয়।

তখন 'মাফ করবেন' বলে রবি চটপট নতুন কোনো উপমা হাতড়ায়। পায় না। অগত্যা পুরনো কথার ধানাই-পানাই।

মহিলা সমিতির সেক্রেটারী রাণুদি রেগে গেলেন খুব। বললেন, 'তোরা নিলি কেন অমন টাকা? একবার আসতে পারলো না—এত অহংকার কীসের—' মেয়েরা চুপ। অনুরাধা সত্যি খুব বাজে ব্যবহার করেছে।

কলকাতা থেকে ফুল এসেছে অনেক। মাষ্টার মশাই কোটেশন দিয়ে দারুণ একটা লেখা দিয়েছেন। সব সুদ্ধ ১২০ টাকা উঠেছে। মহিলা সমিতিকে কেউ টেক্কা দিতে পারবে না। যদিও জাগরণ সংঘের ছেলেরা টাকার মালা দেবে, রাণুদি জানেন, সব দুটাকার নোট।

রাণুদি বললেন, 'দরকার নেই অনুরাধার নাম দেবার। টাকা ফেরত দিয়ে দিস। সমিতি থেকেই ওর নাম কেটে দেয়া হবে।'

তালভঙ্গ

ঘরে বসে আসন বুনছিল সাবিত্রী। শেষপর্যন্ত মাঠে গেল না গেলে হয়ত মনটা একটু হাল্কা হত। কিন্তু যে পাথর বুকে চাপিয়ে জামাই ভাগলো, অজিত পানের কী ক্ষমতা, তা নামায়?

হঠাৎ একটা ছেলে ছুটে এসে খবর দিল, বাঁশের মাচা থেকে তারক পড়ে গেছে—খুব লেগেছে—এখন ডাক্তারবাবুর বাড়িতে।

পুরুষ মানুষ কেউ ছিল না বাড়িতে। ঘরে তালা লাগিয়ে মা মেয়ে ছুটতে লাগল।

ডাক্তারবাবুর বাড়িতে প্রচণ্ড ভিড়। মাঠের প্রায় আদ্দেক লোক এখানে। ২০ ফুট উঁচু বাঁশের মাচা থেকে তারক একেবারে নিচে। জোর লেগেছে। জ্ঞানশূন্য অবস্থা।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে তারকের মা আছড়ে পড়ল। সামাল দিল ডাক্তার বৌদি, 'কিছু হয়নি মাসীমা, আপনি নার্ভাস হবেন না তাহলে ও আরো ভয় পেয়ে যাবে।'

তারকের মাথার কাছে সাবিত্রী। মুখে আঁচল চেপে কান্না লুকোচ্ছে।

একটা ইনজেকশন করে তারককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হল। কোমরের হাড় ভেঙে গেছে। নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে। অন্তর্গত রক্তক্ষরণ। অবস্থা শোচনীয়। মাইক চুপ-চাপ। ভিড় ছত্রকুটে গেছে। আপন মনে ঘুরে চলেছে অজিত পান। ধীর পায়ে হেঁটে নিরুপম চ্যাটার্জী তার কাছে যায়। কী বলে।

এই ঘটনার পর শেষ খেলাটা কী আর হবে। হওয়া উচিত ও নয়। দু তোলা সমান বাঁশের মাচা। ঘাড় উঁচু করে সেটা দেখতে হয়। দুটো বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে অজিত পানের সেখানে সাইকেল নিয়ে ওঠার কথা। এটা হল সেরা খেলা। রবির ভাষায়, প্রাণ-ঘাতী খেলা।

ঠিক হল, এই খেলাটা আর হবে না।

রিকশায় করে তারককে কমল কুণ্ডুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল।

রিকশায় সাবিত্রী আর মা। পেছনে, সাইকেলে রবি। যদি কিছু দরকার হয়।

যেতে যেতে সাবিত্রীর চোখে পড়ল উঁচু মাচাটা। সেখান থেকে পড়লে একটা ছেলের কী কী হতে পারে, এইসব অপভাবনায় সে হাবুডুবু।

মাচার নিচে, মাঠে, একজন টাকার জামা গায়ে দিয়ে সাইকেল চালাচ্ছিল। সাবিত্রী দেখেও দেখল না।

খেলা চলছে

১০৬ ঘণ্টা পুর্ণ হতে যখন মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি, ঠিক তখনই এমন একটা ব্যাপার ঘটল।

তারকের এই দুর্ঘটনায় অজিত পান দুঃখ প্রকাশ করেছে। অবশ্যই সমবেদনার ভাষা নেই।

ধীর গতিতে সে এখন সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। ১০৬ ঘণ্টা পুর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সাইকেল থামানো চলবে না।

শারদ সাহিত্য সমীক্ষা—১

গোধূলি-মনের প্রতিবেদন

[গোধূলি-মনের জনপ্রিয়তা ও প্রচার সংখ্যা যে হারে বাড়ছে, ঠিক সেই হারে বেড়ে চলেছে এই পত্রিকার সঙ্গে অন্যান্য পত্র-পত্রিকার যোগাযোগ। আমাদের দপ্তরে কলকাতা ও মফঃস্বল থেকে যতো লিটল ম্যাগাজিন আসে, তেমন অন্য কোনো পত্রিকা দপ্তরে যায় কিনা সন্দেহ ; এতে আমরা গর্বিত। প্রাপ্ত সব কাগজগুলির আলোচনা সম্ভব নয়। পর্যায়ক্রমে আমরা কিছু পত্রিকা নিয়ে আলোচনা রাখার চেষ্টা করছি।]

O কেতকী (মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শিয়ালডাঙা, পুরুলিয়া) : ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা। শারদ সংখ্যায় আছে একাধিক ভালো কবিতা। লিখেছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, উত্তম দাশ, রবীন সুর, অশোক চট্টোপাধ্যায়, সোফিওর রহমান, অজিত রায়, কামাখ্যা সরকার প্রমুখ। অনুবাদ কবিতায় তেমন উল্লেখ্য কেউ নন। প্রবন্ধে নারায়ণ চৌধুরী ভালো লাগে। পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদ।

O কবিতীর্থ (উৎপল ভট্টাচার্য, ৫০/৩ কবিতীর্থ সরণী, কল-২৩) : লিটল ম্যাগাজিনের উদ্দেশ্যহীন সিঁড়ি পরিক্রমায় উজ্জ্বল ব্যতিক্রম কবিতীর্থ। এর উদ্দেশ্য সৎ সাহিত্যের প্রকাশ ও প্রচার। এ-সংখ্যায় বিনয় ঘোষের 'ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীর ইতিহাস-ব্যাখ্যা' এবং সুবিমল মিশ্রের অ্যান্টি-উপন্যাস নিয়ে সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের আলোচনা মনে রেখাপাত করে। গল্পে সুবিমল মিশ্র ও প্রবাস দত্ত অনবদ্য। কবিতায় শামসুর রহমান, নির্মলেন্দু গুণ, দিনেশ দাশ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল-শক্তি-আলোকরঞ্জন আছেন তবে ভালো লাগে শান্তনু দাশ, সংযম পাল ও উৎপল ভট্টাচার্যের কবিতা।

O বিজ্ঞাপন পর্ব (রবিন ঘোষ, ১২ এজরা স্ট্রীট, কল-১) : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ সহ, তাঁকে নিয়ে অশোক মিত্র, সমীর রায় ও মনোজ নন্দীর আলোচনা ভালো লাগে। সুবিমল মিশ্র ও রবিন ঘোষের গল্পও।

O মহাদিগন্ত (উত্তম দাশ, মৃত্যুঞ্জয় সেন, পরেশ মণ্ডল, বারুইপুর, ২৪ পরগণা) : বাংলা প্রবন্ধ ও কবিতার দুনিয়ায় মহাদিগন্ত এখন একটি থার্মোমিটার। সাড়ে চার বছরে বেশ পরিণত। বর্তমান সংখ্যায় উত্তম দাশের শ্রুতি আন্দোলন বিষয়ে সমীক্ষাটি গবেষকদের পথনির্দেশ করবে। তবে, নিবন্ধের শুরুতেই 'যৌথবদ্ধ' শব্দটি বেশ দৃষ্টিকটু। অরুণ চট্টোপাধ্যায়, কেদার ভাদুড়ী, যতি মুখোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, মলয় রায়চৌধুরী ও মঞ্জুষ দাশগুপ্তের কবিতা এবং সোফিওর রহমানের কাব্যগ্রন্থ-সমীক্ষাটি স্মরণযোগ্য।

O কবিতাদর্পণ (তুষার চৌধুরী, ১২/২ মহেন্দ্র ব্যানার্জী রোড, কল-৬০) : গোটা পৃথিবীর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে বর্ণান্ধ দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার কালো আফ্রিকার বিপ্লবী কবি বেঞ্জামিন মেলোয়েজকে গত ১৮ অক্টোবর ফাঁসি দিয়ে এখন সকলের কাছে ধিকৃত। কবিতাদর্পণের শুরু হয়েছে সেই শাদা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কালো ঘৃণা দিয়ে। লিখেছেন স্বয়ং সম্পাদক। সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় কৃত সত্তর দশকের চার কবি—তুষার চৌধুরী, অনন্য রায়, রণজিৎ দাশ ও জয় গোস্বামীর কাব্যধর্ম নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা স্মর্তব্য; অবশ্য কবি-নির্বাচনে ঝোল টানাটানি আছে। সুবিমল বসাকের গল্প চমৎকার। এছাড়া তুষার চৌধুরী, মলয় রায়চৌধুরী, অজিত রায় এবং মল্লিকা সেনগুপ্তর কবিতাগুচ্ছ তথা কমল চক্রবর্তী, জহর সেনমজুমদার ও সোফিওর রহমানের একটি করে কবিতা অনেকের ভালো লাগবে। দেবব্রত চক্রবর্তীর প্রচ্ছদ সুন্দর।

O একক (শুদ্ধসত্ত্ব বসু, ১০/৩ সি নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীট, কল-২৬) : সাহিত্যের চুয়াল্লিশ বছরের প্রতিনিধি 'একক' এক উজ্জ্বল নাম। এ সংখ্যায় আদিত্য মুখোপাধ্যায়ের কবিতা অনেকদিন মনে থাকবে।

O কৃশানু (দীনেশচন্দ্র সিংহ, ৩০/১ কলেজ রো, কল-৯) : আঠারো বছরের কাগজ। সম্পাদকের নিষ্ঠা প্রশংসনীয়। ছাপা ও অঙ্গসজ্জা রুচিশীল। প্রবন্ধে পিনাকীরঞ্জন গুহ এবং শান্তিকুমার ঘোষ মননশীল। গল্পে কানাই কুণ্ডু, ভগীরথ মিশ্র স্বতন্ত্র। আরতি সরকার, শান্তু রায় এবং উত্তম দাশ গুচ্ছ কবিতায় মন টেনে নেন।

O শতভিষা (মৃণাল দত্ত, ৭৩/৩৮ গলফ ক্লাব রোড, কল-৩৩) : কবিতার বিশিষ্ট কাগজ শতভিষায় এবারে আলোক সরকারের অকপট সাক্ষাৎকার একটি মহার্ঘ। ভালো লাগে শ্যামলকান্তি দাশ, কমল চক্রবর্তী, মলয় রায়চৌধুরী, মল্লিকা সেনগুপ্ত, রাণা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের কবিতা। প্রচ্ছদ রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

O পঞ্চমা (সোফিওর রহমান, ভেরপাখিয়া, মেদিনীপুর) : পঞ্চমার এবারের সংকলনে ছাপার ত্রুটি নাকতোলা করলে, পত্রিকা পরিকল্পনা, রচনা নির্বাচন ও সম্পাদন-নির্মমতায় সোফিওরের শত তারিফ ও হাল্কা মনে হয়। বুদ্ধদেব বসুর একটি অপ্রকাশিতপূর্ব চিঠি ও তাঁর গল্পকলা বিষয়ে প্রভাস চৌধুরীর প্রবন্ধ বিশেষ অভিনিবেশের হকদার। অজিত রায় আলোচনা করেছেন বহির্বঙ্গের লিটল ম্যাগ নিয়ে। এরকম তথ্যবহুল লেখা ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশ পায়নি। বিহার, আসাম, ত্রিপুরা, উড়িষ্যা, দিল্লি, বম্বে, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মেঘালয়, অরুণাচল, বাংলাদেশ, সুইডেন, আমেরিকা প্রভৃতির লিটল ম্যাগের সঠিকানা দীর্ঘ তালিকা দিয়ে অজিত গবেষকদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। পঞ্চমায় এবার উত্তম দাশের কাব্যনাট্য ছাড়া কোনো কবিতা নেই।

O পত্রপুট (সন্দীপ দত্ত, ১৮ ট্যামার লেন, কল-৯) : আর একটি বড়ো কাজ করেছেন সন্দীপ দত্ত 'পত্রপুটে' বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত লিটল ম্যাগ সম্পর্কিত আলোচনা ও প্রবন্ধের পঞ্জী সংকলিত করে। এ-সংখ্যার আরো দুটি উল্লেখযোগ্য রচনা হলো—শঙ্খ ঘোষের 'লিটল ম্যাগাজিন আর সমকালীন রুচি' এবং দীপেন্দু চক্রবর্তীর 'লিটল ম্যাগাজিনের রোগ-নির্ণয়'।

O সুরঞ্জনা (হরপ্রসাদ সাহু, ঘাসীপুর, মেদিনীপুর) : অজিত রায় লিখিত 'হাংরি কবিতা : গোরস্থান পরিক্রমা' এ-সংখ্যার একমাত্র উল্লেখযোগ্য গদ্য! লেখাটি নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। জয় গোস্বামী,

সংযম পাল, মলয় রায়চৌধুরী, নিরঞ্জন মিশ্র, বিনোদ বেরা, সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা সুপাঠ্য।

O উত্তর প্রবাসী (গজেন্দ্রকুমার ঘোষ, সুর্টে, সুইডেন): হাংরি বিষয়ক বাবুল সিরাজীর সেন্টো এবং কিছু পুর্বমুদ্রিত লেখার ফটোস্টাট বের করে উত্তর প্রবাসীর সাম্প্রতিক 'হাংরি সংখ্যা'। নতুনত্ব নেই, কিন্তু প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ। এ-সংখ্যায় 'গোধুলি-মন' থেকে একটি গল্প নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য কিছু রচনা ভালো। উত্তর প্রবাসীকে আমাদের উষ্ণ অভিনন্দন।

O অনার্য সাহিত্য (শ্রীধর মুখোপাধ্যায়, ৮ সৃষ্টিধর দত্ত লেন, কল-৬): সুন্দর প্রচ্ছদ ও ছাপাই ছাড়াও, এবারের অনার্য সাহিত্যে বেশ কিছু ভালো রচনা স্থান পেয়েছে। তবে আশির কবিতা প্রসঙ্গে সম্পাদকীয়তে যুক্তির চাইতে শ্লোগানধর্মীতা বেশি। এবং রাজগোবিন্দ ঘোষালের প্রবন্ধ 'সাহিত্য : কিছু ভাবনা' অনেক যুক্তিপুর্ণ। যদিও তার প্রকল্পগুলি নিয়ে বিতর্কের প্রয়োজন। শ্রীধরের গল্পে স্টান্ট প্রিয়তা প্রকট। কবিতায় সোমেশ মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার চক্রবর্তী, অজিত রায়, তাপস চক্রবর্তী নতুন ব্যঞ্জনা দেখিয়েছেন। সোফিওর রহমান এবং অংশুদেব মণ্ডলের গল্প চোখ টানে।

O জাগরী (অপুর্বকুমার সাহা, ৭৪/৫এ, বাগবাজার স্ট্রীট, কল ৩): জাগরী নিসন্দেহে একটি ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা। ৩০ বছর চলছে। এ সংখ্যায় দুটি ভালো এবং নতুন আঙ্গিকের গল্প আছে। লিখেছেন অজিত রায় এবং বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতায় শান্তশীল দাশ, দেবাশিস বসু, আরতি সরকার, মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ আশানুরূপ। প্রচ্ছদ গতানুগতাশ্রয়ী। নিবন্ধে ভবানী পাঠক ও নিভা দে যথাযথ।

O অমৃতলোক (সমীরণ মজুমদার বিপ্লব ভবন, হোমিও কলেজ রোড, মেদিনীপুর): শুভাপ্রসন্নের আঁকা প্রচ্ছদ নিয়ে বেরিয়েছে শারদ সংখ্যাটি। উন্নতমানের কাগজ। প্রভাত মিশ্রর 'বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : আধুনিক লোককবিতাকার' এবং সোফিওর রহমানের 'রাজনীতি সাহিত্য : এক প্রাথমিক তদন্ত' অসাধারণ রচনা। মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় আলোচনা করেছেন পুরুলিয়ার সাহিত্যচর্চা নিয়ে। মলয় রায়চৌধুরী অনূদিত অ্যালেন গীন্সবার্গের কবিতা খুব আকর্ষণীয়। কেদার ভাদুড়ী, নবারুণ ভট্টাচার্য, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, বীতশোক ভট্টাচার্য, শান্তি সিংহ, প্রণব মাইতি, সংযম পাল, সমীরণ মজুমদার প্রমুখের কবিতা ভালো হয়েছে।

O প্রজ্ঞা (মৃণালকান্তি মৃধা, হাটগাছা, ২৪ পরগণা): বর্তমান সংখ্যায় সত্যনারায়ণ মজুমদারের বীরেন্দ্র-স্মরণ এবং অজিত রায়ের 'ফ্রান্ৎস কাফ্কা ও বেদনা' উল্লেখ্য সম্পদ। অভিজিৎ ঘোষ, শুদ্ধসত্ব বসু এবং সোফিওর রহমান ছাড়া আর কারো কবিতা ভালো লাগে না। প্রচ্ছদে রুচিহীনতার ছাপ।

O পুষ্পরাগ (হাসান মাহমুদ, বারান্দীপাড়া, যশোর, বাংলাদেশ): মূলত কবিতা বা পদ্যের কাগজ। ভালো লেগেছে অশোক চট্টোপাধ্যায়, ফারুক নওয়াজ এবং স্বপন মোহাম্মদ কামালের কবিতা। ফারুক নওয়াজের নিবন্ধ 'মাস, রক্ত, মুক্তির কবিতা : পাবলো নেরুদা' সংক্ষিপ্ত হলেও, আকর্ষক।

O টিপসই (ফারুক নওয়াজ, গুরুদাস বাবু লেন, যশোর): কবি ইলিয়াস হোসেনের প্রচ্ছদ নিয়ে টিপসই-এর সাম্প্রতিক সংখ্যা বের হয়েছে। কবি অশোক চট্টোপাধ্যায়ের ছবি-পরিচিতি সহ কবিতাগুচ্ছ এ সংখ্যার অনন্য সম্পদ। কাজী আল ফারুকের প্রবন্ধ

'ইলিয়াস হোসেন : ক্ষতবিক্ষত এক আশাবাদী কবি' দারুণ লেখা। এপারের শুদ্ধসত্ত্ব বসু, অজিত রায় মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সোফিওর রহমান প্রমুখের কবিতা আছে 'বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' বিষয়ে বিমলকান্তি ভট্টাচার্যের লেখাটি মূল্যবান। টিপসইয়ের পরবর্তী গল্প সংখ্যায় থাকছে মহাশ্বেতা দেবীর সাক্ষাৎকার, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, হাসান আজিজুল হক, ইউসুফ শরীফ, অশোক চট্টোপাধ্যায়ের গল্প এবং অজিত রায়ের বিতর্কিত প্রবন্ধ। ফারুককে অভিনন্দন।

O আর্য (শঙ্করনাথ চক্রবর্তী, ৬ এফ, বি টি রোড, কল—২) : অত্যন্ত সাদামাটা কাগজ। বিনয় মজুমদার, মল্লিকা সেনগুপ্ত, সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা এবং মলয় রায়চৌধুরীর গল্প ভালো লাগে। পার্থ মুখোপাধ্যায়ের 'কবিতার জন্ম-বিষয়ক দুরূহ সংবিধান এবং' একটি স্টান্ট ছাড়া কিছু নয়।

O মরীচি (কুণাল মণ্ডল, মহিষাদল, মেদিনীপুর) : বর্তমান সংখ্যায় দেবাশীষ গোস্বামীর আশির দশকের মেদিনীপুর সংক্রান্ত লেখাটি পড়ে মনে হলো উনি কবিতা সম্পর্কে কিছুই বোঝেন না। সম্পাদকের 'ব' কলমে হরপ্রসাদ সাহু আছেন, তাই হরপ্রসাদের (?) ছবি বেরিয়েছে। এই জেলার অন্যতম কবি সোফিওর রহমান যখন কবিতায় সকলের মন জয় করছেন, তখন মেদিনীপুরের মরীচি বের করছে তাঁরই বিরুদ্ধে লেখা। এই ধরণের অরুচিকর বিষোদ্গীরণের আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি।

O অনুত্তর (তাপসকুমার মাইতি, হলদিয়া টাউনশিপ, হলদিয়া) : ভালো প্রচ্ছদ, ছাপাও। প্রবন্ধে তপোব্রত সান্যাল, কবিতায় উত্তম দাস ও প্রণব মাইতি উল্লেখযোগ্য।

O সীমাবর্ত (শোভন সাঁতরা, গড়কমলপুর, মেদিনীপুর) : সম্পাদক ও দীপঙ্কর সেনের প্রচেষ্টা শ্লাঘ্য। গল্পে গৌর বৈরাগী অসম্ভব ভালো। 'এক অদৃশ্য পদশব্দ' বহুদিন পাঠকের মনে থাকবে।

O জলপ্রপাত (নিভা দে, ভাবা রোড, দুর্গাপুর) : অনেকদিন পর এই সংখ্যাটি হাতে নেওয়ার মতো। প্রবন্ধে সোফিওর, গল্পে জ্যোৎস্না কর্মকার উল্লেখযোগ্য। সম্পাদনার ক্রমোন্নতিতে আমরা আনন্দিত।

সংবাদ

O লিটিল ম্যাগাজিন সম্পাদক সমিতি আয়োজিত লিটিল ম্যাগাজিন প্রদর্শনী

সম্প্রতি তিনদিনব্যাপী লিটিল ম্যাগাজিন প্রদর্শনী, আলোচনা, কবিতাপাঠ ও সেমিনার হয়ে গেল কোলকাতার সিটি কলেজের প্রাঙ্গণে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'কৃত্তিবাস' সম্পাদনার অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেন। সমিতির সভাপতি 'একক' সম্পাদক ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু তাঁর সরস ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় তাঁর 'একক' সম্পাদনার পুরানো দিনের গল্প শোনান। ২য় দিনে ছিল কবিতা পাঠের আসর। কোলকাতার এবং বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কবিরা কবিতাপাঠ করেন।

৩য় দিনে সেমিনার। ঐদিনে আলোচনা করেন 'পত্রপুট' সম্পাদক ও লিটিল ম্যাগাজিন সংরক্ষণ ও পাঠাগারের সন্দীপ দত্ত, সম্পাদক সমিতির সম্পাদক নবকুমার শীল, 'অতিথি' সম্পাদক অসিতকৃষ্ণ দে ও 'জাগরী' সম্পাদক অপূর্বকুমার সাহা।

যে কোন কারণেই হোক। তিনদিনের এই অনুষ্ঠানে প্রত্যাশিত দর্শক সমাগম হয়নি।

Member all India Small & Medium News Paper Association, Delhi.
GODHULI-MONE N. P. Regd. No. RN. 27214/75 November '85 (কার্তিক ১৩৯২)
Vol. 27, No. 11 Postal Regd. No. Hys-14 Price—Rs. 2·00 only

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পপুলার প্রিন্টার্স, বারাসত, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও নতুনপাড়া, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

এই সংখ্যায় ঃ

আশির কবিতা সংখ্যা

বইমেলা '৮৬

পশ্চিমবঙ্গের অরণ্যে বন্যপ্রাণীর সান্নিধ্য উপভোগ করুন

(বন্যপ্রাণীর রোমাঞ্চকর সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে আসুন পশ্চিমবঙ্গের পৃথিবীখ্যাত সুন্দরবন এবং জলদাপাড়া সহ আরও চোদ্দটি অভয়ারণ্যে ।)

৪২৬২ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত সুন্দরবন নদীর মোহনায় অবস্থিত দেশের অরণ্যভূমিগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ। এ এক মোহময়ী সৌন্দর্য নিকেতন, যার অনুপম ভূদৃশ্যের অর্ধাংশই জলের আচ্ছাদনে ঢাকা, আর সেখানে সামুদ্রিক জোয়ার ভাঁটার অপূর্ব লুকোচুরি। প্রখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়াও সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক বৃহদাকৃতি কুমিরের আবাসস্থল। আর আছে প্রিয় বিরাট বিরাট জলজ সরীসৃপ ওয়াটার মনিটর, হিংস্র ফিশিং ক্যাট্, বিরল প্রজাতির কচ্ছপ, সুদর্শন চিতল, হরিণ অন্যান্য বহু রকমের প্রাণী ও অজস্র পাখী। সুন্দরবনের সজনেখালি পক্ষী নিবাসে নীড়-বাঁধা আবাসিকদের মধ্যে রয়েছে পাণকৌড়ি, শামুখখোল এবং বিভিন্ন প্রজাতির বক্ সারস ও জল বিহারী পাখী। জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গোটা অঞ্চলটাই তাদের কলকাকলিতে মুখরিত। ভগবতপুরের কুমির প্রকল্পে দেখতে পাবেন এই শিহরণ জাগানো প্রাণীর এক বিচিত্র সমাবেশ। অরণ্য জীবনের বিপুল সৌন্দর্য আপনি যাতে দুচোখ ভোরে উপভোগ করতে পারেন তার জন্য বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে ওয়াচ-টাওয়ার।

আর জলাকীর্ণ এই বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে লঞ্চে ভ্রমণ তো এক অনন্য অভিজ্ঞতা। দুষ্প্রাপ্য এক শৃঙ্গী গণ্ডার দেখতে হলে চলে আসুন তার আবাসভূমি উত্তরবঙ্গের জলদাপাড়া ও গরুমারা অভয়ারণ্যে। সেখানে অন্যান্য আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে বাইসন, হাতি, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিতা বাঘ, সম্বর. মৌচর কালো ভালুক প্রভৃতি। চাপড়ামারিতে দেখতে পাবেন নির্জন জলাশয়ে বন্য হাতীর অবাধ জলকেলী। হাতীর পিঠে চড়ে এইসব রোমাঞ্চকর সৌন্দর্য্য অনুভব করুন। এই অভিজ্ঞতা আপনার জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ক্রপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি মন

২৮ বর্ষ/১ম সংখ্যা
জানুয়ারী/১৯৮৬
পৌষ/১৩৯২

প্রতি সংখ্যা দুই টাকা
বার্ষিক সডাক কুড়ি টাকা

অশোক চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক
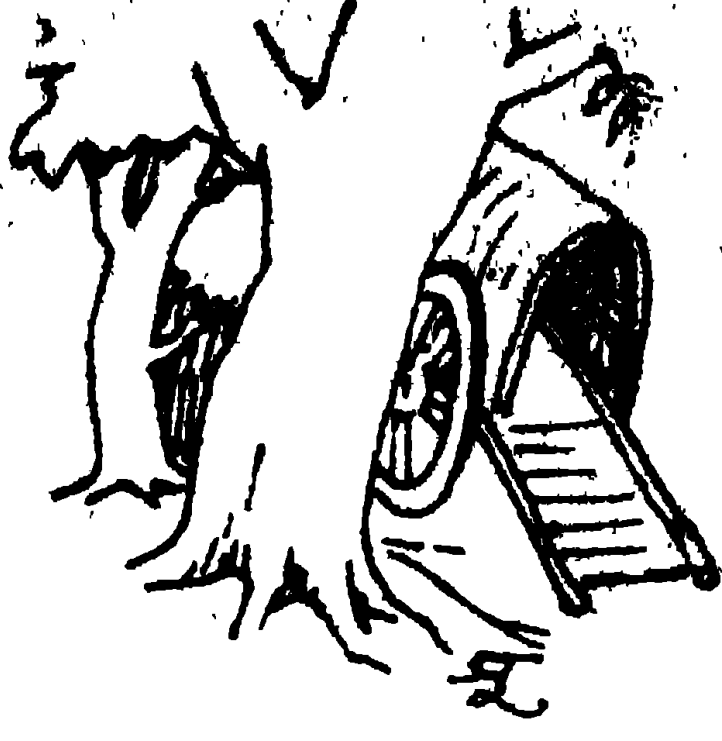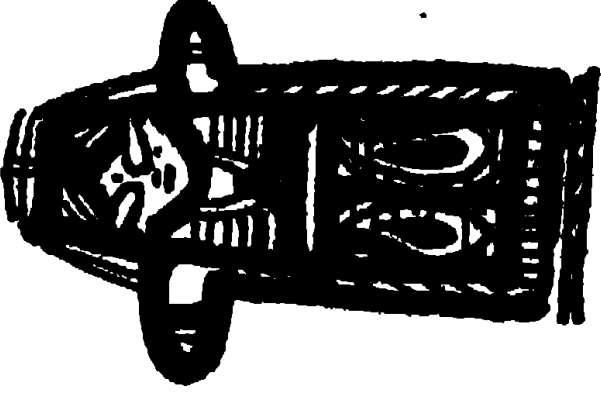
সম্পাদকীয়

প্রতিবছরই গীল্ড আয়োজিত 'কলিকাতা পুস্তকমেলা'য় বিশেষ কোন বিষয়ের ওপর সংখ্যা প্রকাশ করি আমরা। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আমাদের এবারের সংখ্যা 'আশির কবি ও কবিতা সংখ্যা।

যদিও বলে নেওয়া ভাল এই দশক বিভাজনের ব্যাপারটায় আমরা পুরোপুরি বিশ্বাসী নই। সাধারণতঃ যে দশকে যে কবির উল্লেখযোগ্য লেখাগুলি প্রকাশের মাধ্যমে ঐ কবি পাঠকের দৃষ্টিতে ধরা পড়েন, সেই দশককেই ঐ কবির দশক অর্থাৎ উক্ত কবি ঐ দশকের কবি হিসাবে চিহ্নিত হন।

মোটামুটি ভাবে বিভিন্ন লিটিল ম্যাগাজিন ঘেঁটে বর্ত্তমান সংখ্যার কবি ও কবিতা নির্বাচন। আশির কবিদের অধিকাংশেরই মধ্যে ষাট দশকের ক্ষুধিত প্রজন্মের কবিদের প্রভাব দেখা যায়। তবে হ্যাংরীদের অনেকের মধ্যে রমণী শরীর নিয়ে শব্দের ঘাঁটাঘাটি কবিতা হয়ে উঠতে বাধা পেয়েছে যেখানে, সেখানে আশির কবিরা নির্দ্বিধায় চিত্রকল্পের অনন্যতায় এবং কাব্যিক সুষমায় উত্তরণ ঘটাতে পেরেছেন। মল্লিকা, নীলাঞ্জন, সোফিওরের মতো কবিরাতো এই দশকের মাঝামাঝি সময়েই নিজেদের ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন অনন্তের মাঝে। শুধু আশির কবি বলেই নয় সময়ে এঁদের অনেকেই বাংলা সাহিত্যে সকলকালের উল্লেখযোগ্য কবি হিসাবে স্বীকৃতি পাবেন—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

অপ্রতিরোধ্য আট

অজিত রায়

কবিতা এখানেই শেষ হতে পারতো। চর্যাপদ থেকে চলমান শতকের সাত দশক ঢের হয়েছে। তবু হলো না শেষ। কেননা সমাজ স্বাস্থ্য মন দেহ বেঁচে থাকার অভিপ্রায়ে কবিতা এখনও অবিকল্পিত মদ, যা পরমাণু অস্ত্রের সঙ্গে কোনো ক্রমেই তৌল নয়, অথচ মানুষী সভ্যতার অবলুপ্তির শূন্য মুহূর্ত পর্যন্ত যার বেঁচে থাকার গ্যারান্টি সুনিশ্চিত। কেননা এর জন্ম ঘিলুর বীভৎস শাঁস থেকে। তাছাড়া, ছাপার কালিতে দেখায় না ম্লান এমন উজ্জ্বল নাম এখনও আছে। এসে পড়েছেন এমন কয়েকজন যাঁরা কখনো হয়ে উঠতে পারেন কাব্যভাবনা ও কাব্যেতিহাসে এক একটি স্বয়ংস্বতন্ত্র অধ্যায়। এঁরা প্রায় সকলে সেই বয়সের যে-বয়সে ভালো লেখা অসম্ভব নয়। প্রত্যেকে তরুণ স্বপ্নদর্শী উদার এবং অল্পবিস্তর প্রচারকাতর বলে, সুপরিচিত। এঁরা আট এর কবি।

প্রশ্ন উঠবে, আট দশকীয় কবিতার রেফারিগিরি এখনই কেন? সবে পাঁচ বছর। বাংলা সাহিত্যের এলায়িত মহানদীর নিছক বুদ্বুদ্। জবাবে বলবো, এটা রেফারিগিরি নয়—বাজারে মাল কেনার আগে যাচাইয়ের তাগিদ মাত্র। আমি মানি, যিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে এযাবৎ লিখিত কবিতার ধারাবাহিক অধ্যয়নে পটু, তিনিই আট দশকের কবি। অদীক্ষিত পাঠকের কাছে এঁদের শিল্পকর্ম 'দুর্বোধ্য'। ছন্দের মোচড় ভাষার খোলস ভেদ না করা অবধি এঁরা 'বর্ণচোরা'। তবে কদাচ ছিন্নমূল বা ভুঁইফোঁড় গোছের জীব নয়। তথাচ দশকওয়ারি কবি হিসেবে বেছেবুছে ক'জনকে মোহর দাগার নস্টালজিক প্রবণতা কমবেশি আমাদের সকলের আছে। চলতি দশকের স্বাতন্ত্র্য ব্যাখ্যায় পূর্বাপরের মধ্যে একটা সীমানা এঁরা এখনি গড়ে তুলতে পেরেছেন। বাংলা সাহিত্যের সার্থক সব কবিতার পাশে আশির কবিতার, একটা গণ্য অংশ অন্তত, সমমর্যাদায় গৌরবের চেয়ার দাবি করতে পারে,—এ-কথা আমি অন্যত্র দর্পভরে উল্লেখ করেছি; তাই এখানে আমার তাগিদ পুনরুল্লেখের নয়, প্রমাণের। পক্ষপাত-ফোবিয়া থেকে সাত হাত দূরে থাকবার কসম কবুল করে শুরু করলুম।

॥ এক ॥

যুক্তিবাদ ও মরমীয়াবাদের সাঁড়াশিটা কবিতাকে পিষতে পিষতে যে কোণঠাসা বিন্দুতে এনে ফেলেছে, আমাদের অর্থাৎ আট দশকের বাঁধন শুরু হয়েছে সেই রক্তাক্ত বিন্দু থেকে। চতুর্দিক সব একাকার। মাইকেল থেকে প্রাক্-রবীন্দ্রকাল নেবাক শূন্য। দু-একটা মস্তিষ্কবাহী লাশ ওঠাবার চেষ্টায় এক আধবার কসরৎ করলেও রবীন্দ্রনাথের তেজে নিশ্চিহ্ন। পরে যাঁরা হাত মকশো করছিলেন তাঁদের সবচেয়ে বড়ো 'সৌভাগ্য' যে মাথার ওপর রবীন্দ্রনাথ দুপুর বারোটার সূর্যকিরণটিকে তাঁরা পেয়েছিলেন। তারও পরে

জীবনানন্দ নিজের জীবদ্দশাতেই এমন বিপুল সংখ্যক অনুকারক লাভ করেছিলেন যে পঞ্চাশ দশক বেমালুম বেজন্মা থেকে গেছে। আর ষাট দশকের বাংলা কবিতার ইতিহাস চিহ্নিত হয়ে আছে দুটি বীভৎস ঘটনার দ্বারা। —হাংরি হাঙ্গামা আর শ্রুতি বিদ্রোহ। 'বীভৎস' বললুম এই কারণে যে, আমাদের সাহিত্যে যে তীব্র ক্যাকাচিত্তির গতানুগতিকার স্রোত, তাকে তছনছ বা ডিসটার্ব করাই ছিল আন্দোলন দুটির লক্ষ্য। রবি ঠাকুরের কথাকাহিনী জাতীয় এবং জীবনানন্দের আবেগমথিত সঙ্গারল কবিতার ক্রমানুকরণে পঞ্চাশের কবিতা যখন জঞ্জালে রূপান্তরিত, এই দু দল চোখা তরুণ তখন শুদ্ধ কিংবা আপাত ভিন্ন দেহে উপস্থাপিত করতে চাইলেন বাংলা কবিতাকে। যে-কারণে ষাটের বিদ্রোহীরা আমাদের প্রণম্য, ঠিক একই কারণে না হোক, একটু ভিন্ন কারণে সত্তরের কবিরা আমাদের নমস্য। তাঁরা আততায়ী ছিলেন না, ছিলেন প্রচলপন্থী। পূজারী ছিলেন না, কেননা রবীন্দ্রনাথ তো দূর বিষ্ণু দে বা জীবনানন্দকেও তাঁরা বিগ্রহ বলে মানেন নি। কেউ কেউ শক্তি সুনীলকে মনসা ভেবে চাঁদ সদাগর সেজেছেন বটে, কিন্তু আমরা যাঁদের সত্তরের প্রতিনিধি হিসেবে শ্রদ্ধা করি—অনন্ত রণজিৎ তুষার জয় মৃদুল কিংবা ধূর্জটি অন্তত কালাপাহাড় হবার হাস্যকর প্রহসন থেকে বিরত থেকেছেন।

এখন আশির দশক। সময়টা নিজের বলে তার সংকীর্তন করা আমার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমার এমন কোনো সিদ্ধান্তও পাঠককে গায়ে মাখতে হবে না যে আলোচ্য কালপর্বে যূথবদ্ধ ভাবে ভালো কবিতা লেখা হচ্ছে। আমি গোনাগুন্তি ক'জনের শিল্পসিদ্ধি বিষয়ে আপাতত ভাবিত যাঁরা ঘটনার অনিবার্য ক্রমে আট দশকের চরিত্র হিসেবে এখনি সুচিহ্নিত। সুতরাং এই দশকের চরিত্র ও নাম নির্ধারণ আমার প্রথম তাগিদ। কী নাম দেবো এই সময়টাকে? মলয়ের কাছে চলায় ছিলেন। আমি সেরকম কিছু ভাবছি না। এটা ঠিক যে আমি আমরাও কবিতার সমস্ত তৈরী মূর্তিকে সন্ত্রাৎ করে দেবার পক্ষে। ষাটের দাপাদাপি সম্পর্কে সচেতন থেকেও, আমাদের পক্ষে এমত ঘোষণা কী সমীচীন হবে না যে আশিতে পা দিয়ে বাংলা কবিতার একটা নতুন অধ্যায় শুরু হয়ে গেছে??? প্রতি বিশ-তিরিশ বছর অন্তর স্বাভাবিক ভাবেই কবিতার কুরুক্ষেত্রকে দাপাতে এক একদল শ্রীকৃষ্ণ আসে। আমরা কি ঠিক তেমনি এক রণভূমিতে দাঁড়িয়ে নেই? মুকুন্দদাস নতুন কবিতা লিখেছেন, মধুসূদন লিখেছেন আধুনিক, রবীন্দ্রনাথও। আবার বিষ্ণু দে জীবনানন্দ সুধীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব সুভাষ সুনীল অমিতাভ তুষার ধূর্জটি—আধুনিক কে নয়? এখনও কি আমাদের সময়টাকে 'আধুনিক' বলে চালাতে হবে? প্রশ্নটা উঠছে যেহেতু সময়টা শুধু পরিমাণগত নয়, গুণগত ভাবেও বদলে গেছে, যাচ্ছে। সেই সাঁড়াশিটা ঘষটে ঘষটে যে রক্তবিন্দুতে এসে থমকে গেছে, আমরা সেখানে আর আধুনিক থাকতে পারি না। আমরা তবে কী? কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউসে গত নভেম্বরের শীত-না-পড়া এক সন্ধ্যায় আবছা উজ্জ্বল মুহূর্তে আমরা প্রত্যেকে বুকে অতিরিক্ত ভালো-বাসা পুরে গোল হয়ে বসেছিলুন কবিতার আ-সিদ্ধান্ত পরীক্ষায়। সোফিওর রহমান অজিত রায় শ্রীধর মুখোপাধ্যায় তাপস চক্রবর্তী আরো কেউ কেউ। এবং কোন্ ব্রাহ্মমুহূর্তে জানি না, সম্ভবত সোফিওর, আমিও হতে পারি, কিংবা অন্য কেউ—চিৎকার করে বলে উঠেছিলুম—

> Cheer up উত্তর আধুনিক poets
> Now we will start our programme
> And the Earth will start to dissolve!
> Cheer up great souls!

ব্যাস্! ওই দুটি মাত্র শব্দের মধ্যে আমি-আমরা পেয়ে

গেলুম সমকালীন কবিতার অবধারিত শিরোপা— আমরা উত্তর আধুনিক। উত্তর-আধুনিক!! উত্তর-আধুনিক!!!

॥ দুই ॥

আমাদের সৌভাগ্য, এ-সময়ে এমন কোনো কেউকেটে কবি সশরীরে হাজির নেই যাঁর প্রভাব আমাদের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য। পাঠক হিসেবে কেউ কেউ কেউ জীবনানন্দ শঙ্খ সুনীল শক্তিতে আক্রান্ত হলেও, চলতি দশকে যাঁরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বা নতুন ভাবে নিজেদের ব্যক্ত করতে চান, ভাবে ও ভাষায়, কবিতার ইঙ্গিতে বা নিহিত অর্থে উক্ত 'বড়ো কবিদের অস্বীকার করা অনায়াস সাধ্য হয়েছে। নিছক অসন্তোষ বা দুর্বল বিদ্রোহের অভিমানে নয়, উত্তরণের অনিবার্য প্রণোদনায়। আট দশকের এই 'প্রভাবহীনতা'র মূল কারণ একাধিক। প্রথমত যাঁদের 'উত্তর-আধুনিক কবি' বলা হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে অত্যাশ্চর্য ভাবে স্বকীয় অভিনবত্ব ও হৃদয়ের সাহচর্য বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত তাঁদের কবিতায় বিগ্রহগামিতা তো নেইই, উপরন্তু এখন বিষমানুপাতিক গতির চাহিদা এমনই প্রবল যে পঞ্চাশ ষাট এমন কি সত্তরের নব্বুই শতাংশ কবিতার সংস্পর্শে এসে বোঝা যায়, তাঁদের সঙ্গে বর্তমান দশকের কবিদের আদর্শগত বিসদৃশতা কী চমৎকারভাবে চমৎকার! এর কারণ, এ-যুগের ভাব ও ভাবনা বৈষম্যের হেঁয়ালির আবর্তে পড়ে ক্ষয়িষ্ণুতার সুর আট-এর কবিদের স্পর্শ করেছে সবচেয়ে বেশি। তাই কবিতায় ভঙ্গুরতার ছাপ এ-দশকেই এমন দেদীপ্যমান। এটা যে খুব গর্বের, তা নয়। সমাজ ক্ষয়রোগী হলে কবিতা বা সাহিত্য তার মধ্যে লালিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তথাচ আট দশকীয় কবির প্রয়োগ-প্রতিভার বৈচিত্র্যে এ হয়েছে গর্বের, গৌরবের। কেননা এতে ফুটে উঠেছে অত্যাশ্চর্য এক ইঙ্গিতের দিব্যতা, যা কবিতাকে নিছক শ্লেষ বা ইস্তেহার মাত্র না করে 'কবিতা' করে তুলছে। উত্তর-আধুনিক কবি জানেন—যুগের অবক্ষয় যথার্থত যুগধর্ম নয়, যুগের অপধর্ম। অবক্ষয়িত যুগের উত্তর-আধুনিক কবিরা সেই অপধর্মকে অতিক্রম করে নিত্যধর্মের প্রতিষ্ঠায় সতত সচেষ্ট। নির্মাণ ও সৃষ্টির দ্বন্দ্বের বীজ ফেড়ে বেরিয়ে আসছে সার্থকপ্রায়, চার-ছ'টা সফল কবিতা। এগুলির মূল্য এই মাঝ-দশকে বিচারসাপেক্ষ বটে, কিন্তু তুচ্ছ যে নয়—এটা জোর দিয়ে বললুম।

॥ তিন ॥

কানাঘুষো অভিযোগের মধ্যে একটি প্রায় শুনছি: 'প্রেমের কবিতা' আশির রচনায় বিরল। যাঁরা বলছেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কালে জন্ম হয়নি বলে হাঁড়িকান্না জুড়ে দিতে পারেন। কেননা প্রেম পূজা প্রকৃতি ইত্যাদি বিশেষণ রবীন্দ্রনাথই প্রথম বসিয়েছিলেন। বস্তুত 'প্রেম' বলে আমাদের কাছে পৃথক কোনো চিহ্ন নেই। ফ্রান্স থেকে ফিরে মধুসুদন যখন বোদলেয়ারের গন্ধ না পেয়ে মিনমিনে চতুর্দশপদীতে মগ্ন হতেন অথবা বিগলিত মনে রবি ঠাকুর যখন আহ্লাদয় ভোগ করতেন কালিদাসের সান্নিধি, সেই ছায়া সুনিবিড় শিপ্রানদীর পাড়, হায় গো, আজ খাঁ খাঁ রেগিস্থান। এক দশক আগে পর্যন্ত প্রেমের কবিতা চন্দ্রালি আলো, মধুর বাতাস, আর টসটসে স্তনের বর্ণনা ছাড়া লেখা ছিল একরকম অসম্ভব। কিন্তু আজ নিশ্চিতভাবে পলেস্তরা-খসা জীর্ণবাড়ি, শক্ত বোশেখের মাঠ, আর লাল রং প্রেমের কবিতার উপমা হতে পারে। সঙ্গে দুটো ঝর্ণাসদৃশ চোখের বর্ণনা গুঁজে না দিলেও, সেটা হয়ে উঠবে নির্খাদ প্রেমের কবিতা। সুতরাং বসন্তের লো-কাট ব্লাউজ নাকতোলা করে আশির কবিতার হৃদয়রাজ্য খনন কার্যে মগ্ন হলে, অনভ্যস্ত পাঠকও দেখে নেবেন অগণন ঝরাফুল দিয়ে

সাজানো যে মাসের ঈপ্সিত সকাল। উদাহরণের চাহিদায় প্রথম উচ্চার্য সোফিওর রহমানের নাম, যাঁর কবিতায় প্রাণমূল উত্থিত হয়েছে নিষ্পাপ হৃদয়যাতনা, সুগভীর করুণা, মানবিক সৌন্দর্য ও প্রেমের তীব্র বিবশিতার জঠর থেকে—

যে মুহূর্তে ধ্বনিময় হ'য়ে ওঠে সুচেতার হাত,
তার স্তনের দুগ্ধবিন্দু ঝরায় সকালের অমৃত,
চেতনার ডানা সব রাঙা মেঘ পেয়ে যায়—
শ্রাবণের ধারাজলে তৃতীয় নয়ন দেখে নেয় সপ্তম ঋতু,
অই সম্ভ্রমে অতিথি পাখিদের ডানায় আজ
ধন্য হ'য়েছে রোদ
তাই সুচেতার ভেজা ঠোঁটে ঠোঁট রেখে জন্ম নেয়
নতুন পৃথিবী
একেকটি মুহূর্ত এমনি আসে প্রেমিকাকে মনে হয়
শাশ্বত জননী।

এই ধরণের রূপকল্পই সোফিওরের ক্লাসিক হবার সম্ভাবনাকে উসকে দেয়। ক্লাসিকের লক্ষণই এই—সরলতা। সোফিওর নিজেকে সমর্পিত রেখেছেন প্রেমে। শুধু কি প্রেমে? হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে যা নিঃসৃত হয়েছে তা বেদনাধারা। তাঁর এক একটি কবিতা পড়া শেষ করি আর মনে বিস্ময় জাগে। অবাক হয়ে ভাবি, এই যে এইমাত্র একটি জিনিস পড়লুম, এটা তো আমারই উপলব্ধি, কবি সেটা জানতে পারলেন কি ভাবে? এই ধরণের শব্দবন্ধে সোফিওরের কবিতাসৃষ্টির মৌল স্বরূপটিকে চিনে নিতে ভুল হয় না আমাদের। বস্তুত সোফিওরের কবিতার বিচরণভূমি প্রেম হলেও, বিস্ময়কর ভাবে তা বিরাট ও ব্যাপক। এই বিচরণ অঞ্চল শুধু বৈচিত্রের প্রকাশ নয়, একই প্রেরণার ঐশ্বর্যরঙিন বিভার প্রকাশ।

সোফিওর রহমানকে ঘিরে আমার দারুণ বিস্ময়, আকর্ষণ। তাঁকে কেউ নিছক জীবনানন্দ-ঘরানার বললে আমি উত্তেজ হই। জীবনানন্দের মুঠো যেখানে বেশ বড়ো আর দম বেশি, সোফিওর সেখানে নদী, যেন শাঁকমার টুকঠাক। সোফিওরের কবিতা অন্তোক্তপরিপূরক। তাঁর কাছে 'কবিতা' একটি মাত্র সত্তা। সে নারী। কখনো প্রেমিকা, কখনো কন্যা কখনও বা জননী। কিংবা রাবীন্দ্রিক ভাষায় বলা যাক— 'সে নিছক নারী—মাতা কন্যা বা গৃহিণী নয়—যে নারী সাংসারিক সম্বন্ধের অতীত মোহিনী, সেই।' অর্থাৎ আপনাতেই আপনার চরম লক্ষ্য। এই কবিতাকে সোফিওর পেয়েছেন হৃদয় নিঙড়ে 'দূর উপলখণ্ডে বসে থাকা নায়িকার মতো'। 'ব্যক্তিগত গার্হস্থ কিংবা শব্দের দরবার ওদেরই প্রযত্নে' সোফিওরের 'কবিতা সংসার'।

যদি বলতে পারতুম আমাদের সময়ের প্রথম কবি সোফিওর রহমান, তবে আমার বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ আসবে না জানি কেননা এ-সময়ের নির্জনতম কবিদের মধ্যে অভিনিবেশ দাবি করছেন একমাত্র তিনিই; কিন্তু যেহেতু পাঁচ বছর পরিণতির পক্ষে যথেষ্ট হলেও ঘোষণার পক্ষে কিছুই না—সুতরাং সামলে নিলুম। তবে এ-ঘোষণা করবোই, বাক্‌রীতির দুরূহতা ও বৃদ্ধাপম 'শব্দ-ব্যায়াম'কে লক্ষ্য করেই বলবো—স্বক্ষেত্রেই তিনি বিশিষ্ট। শব্দ-শরব্যতায় সোফিওর বেশ দুর্বার, ইদানিং তো দস্তুরমতো সার্থক।

আমি হরপ্রসাদ সাহাকে সোফিওরের সঙ্গে এক করে দেখতে পারি না, তথাচ হরপ্রসাদের এমন কবিতা দুর্লভ নয় যেখানে তিনি প্রবহমানতার চমৎকারিত্বে ও ছবি তৈরীর ক্ষমতায়, অনেকটা সোফিওরের কাছাকাছি। প্রেমের কবিতায় একটা সূক্ষ্ম বেদনাবোধে আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখেন হরপ্রসাদ—'যেন বন্দুকের ট্রিগারে আঙুল রেখে দাঁড়িয়েছিল মহাযুদ্ধের সৈনিক/ঠিক এখনই সেনাপতির আকস্মিক ইঙ্গিতের মতো তুমি এলে/আর অমনি জলে উঠলো

আগুন বুকের গহ্বরে।' জনৈক সমীক্ষক হরপ্রসাদের কবিতায় 'ফুলের ঘ্রাণের মতো অনাময়ের বাতাস' অনুভব করেছেন। হরপ্রসাদ একাধিক প্রেম-কবিতায় বিশুদ্ধতা জাহির করার অভিপ্রায়ে রাগ দ্বেষ বা দৃশ্য-জগতের অভিঘাত থেকে দূরে সরে গিয়ে সূক্ষ্ম এক অবক্ষয়ের বেদনাকে লালন করেছেন যা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী।

॥ চার ॥

নয়া দিল্লী থেকে একটা চিরকুট এলো; তাতে লেখা—'তৃপ্তি আমার, অতৃপ্তি মোর, মুক্তি আমার, বন্ধনডোর'। ইতি নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ইতি-পূর্বের অন্বেষণে জেনেছি, একজন কবি ঠিক কবি হয়ে ওঠার আগে কতদিন যে উপবাসে থাকে, ভাঙে শরীর, সময়ের কার্পণ্যে নিজেকে তিলতিল করে লোভ ক্ষুধাতুর করে তোলে তার উদাহরণ এই নীলঞ্জন। ষাটের ভোরে রক্ষণশীল সমালোচকেরা হাংরিদের দেখে যখন, ভবিষ্যতে চিন্তাহীন যৌনতা আর রাজনীতির হল্লাই হবে বাংলা কবিতা—এই ভেবে আঁৎকে উঠেছিলেন, তখন কি তাঁরা ভাবতে পেরেছিলেন তাঁদেরই উত্তরপুরুষরা কেউ কেউ হয়ে উঠবেন এমন রক্ত জর্জর কবি?

যে কবি চলমান সময়বৃত্তে জীবনকে চেনার ধরার তাগিদে ব্যাকুল তিনি জর্জর হবেনই। জানি, দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথও এমন আয়না পাননি যা দিয়ে জীবনের সমস্ত আকাশটাকে ধরা সম্ভব। তাই নীলঞ্জন যে সফল তা বলা মূর্খতা, বরং বলবো তাঁর এই ধরার ছটফটানির মধ্যে আছে বছর পঁচিশ বিহ্বলতা—

'লাল টিপ তার আমার চুলে জড়িয়ে থাকে বিষম ভুলে
যৌন সুখে মৃত্যুশোকের জরা
বুঝছি, খেলছি মিছিমিছি, জানলে যে কেউ বলবে, ছি ছি
বিষ মেয়ে, তোর রূপ কেন অধরা?
আকন্দ স্তনবৃন্ত ঠোঁটে সবুজ গোলাপ ব্যথায় ফোটে
স্নানের মজা পাইনি আমি কোনো
আমার যাওয়া আর হল না দিগন্তহীন নীল সীমানায়
বছর-পঁচিশ-বিহ্বলতা, শোনো…'

নীলাঞ্জনের কবিতার ভাষা ছাল ছাড়ানো গদ্য নয় বলে, কিংবা মিলপ্রধান ছন্দে আনুগত্য আছে বলেই, যাঁরা তাঁকে নিছক রবীন্দ্রানুসারী বলে অভিহিত করছেন, তাঁরা অজ্ঞ কিংবা নিন্দুক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধীত হতে পারেন, কিন্তু অনুকরণ কখনই নন। নীলাঞ্জন উত্তর-আধুনিক কবিরই একজন, অবচেতন পর্যায়ে যাঁর উপলব্ধি আপাত বিন্যস্ত না হলেও—অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুকুমার।

নাসের হোসেনের কবিতা এই পর্যায়ের আর এক বাঁধ, যা সময়ের সাগর দুর্দম হলেও ভেঙে পড়বে না বলে আমার বিশ্বাস।…শুধু একা নাসেরের কবিতা কেন?—পঞ্চাশ কিংবা সত্তরের কবিরা ভেবে দেখুন, সবই আছে—কাগজ কলম ছন্দের মোচড় ভালোবাসার সুষমা, অথচ আটের কবিতা নিছক 'আধুনিক' না হয়ে, হয়ে উঠলো 'উত্তর আধুনিক'। অথচ পঞ্চাশ বা সত্তর এরই মধ্যে কেমন উত্তিন্ন হয়ে পড়েছেন। ভেবে দেখুন, এই ক'মিনিটের ব্যবধানে কাগজ কলম ছন্দ ইত্যাদির কী অভাবনীয় তফাৎ। আপনারা কি কোনো দিন এভাবে পুতুল গড়তে গিয়ে, পুতুলই গড়তে পারবেন?—যা এই সদ্য ছাত্রটি পারবে বলে এখনই সব ক'টি লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। আমি নাসের এবং অপরাপর উত্তর আধুনিক রচনাকারের উদ্ধৃতি দিয়ে এ-মন্তব্য সপ্রমাণ করছি। এখানে পড়ুন নাসের হোসেন:

'বুকের উপরে তুলে নিয়েছি বিসর্জন, দেশব্যাপী বন্যার
…মুহূর্তের বুকে ছিন্ন শাড়ির বিবর্ণতা, চুম্বনের সুখ,
শোক

ও বিপন্নলতা। নীল অবসাদ—দাউ দাউ আগুন…
আগুন-তীব্র-শরীর এতোদিনে সময় হলো তবে তোর—
অনুসরণ—সর্বনাশের প্রচ্ছায়া মাড়িয়ে আর কতদূর
যাবি বল্'

এরপর আমি দু'জন কবির নাম, উত্তর-আধুনিকদের লিস্টে নয়, উত্থাপনের পক্ষে যাঁরা আমাকে ভাবিত করেন নির্মাণ বৈচিত্রে নয়—ছবি তৈরির চুম্বকে। প্রথম জন সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়। পড়া যাক তাঁর কবিতার অংশ: 'আমার দেবতা নেই, বিবাহও নেই। শুধু সোমরসে ভেজা গুনগুন। আর আমি চাই, শূন্যের দিকে ছোঁড়া আমার পাথরটুকরো যেন উড়ে যায় উঁচু থেকে আরেক উঁচুতে।' ইনি নীলাঞ্জন ঘরাণার কবি হতে পারেন, যেমন হতে পারেন, দ্বিতীয়জন ঈশিতা ভাদুড়ী: 'মৃত্যুর পরে প্রিয়জনের মুখও/যেভাবে ভুলে যাওয়া যায়/ঠিক সেইভাবে,/কি তার চেয়েও আরো সহজভাবে/আমি একটি শহরকে ভুলে যেতে চাই।/সেই শহরের মানুষজন,/প্রত্যেকটা গলি, মোড়ে মোড়ে বাতিস্তম্ভ-/কোলকাতার সমস্ত খুঁটিনাটি/আমি ভুলে যেতে চাই।'

॥ পাঁচ ॥

অভাব দারিদ্র জ্বালা বোমাভাঙা শহর শোষণ ত্রাসন প্রেমিকার বিচ্ছেদ—তাবৎ কষ্টময় জটিলতা আট-এর কবিদের প্রায় প্রত্যেকের ভেতর। কিন্তু যেখানে সবাই প্রায় লিবারেল অথবা অন্তর্মুখী ভাষার দরুণ, প্রকাশগামী হয়েও, দুরাগম্য—সেখানে জহর সেন-মজুমদার নিম্নোধৃত কবিতা লিখে সকলকে স্তব্ধ করে দেন—

'শুধু ভাবছি, কবে হঠাৎ পেয়ে যাবো বিশাল এক নদীর
সভ্যতা যার
পাড়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে ডাকবো—'ও ভাই, ও
বন্ধু ও বিবিজান ও প্রিয়া
শুনছেন, আমায় একটু আগুন দেবেন? শুকনো কাঠ
দেবেন?' আর
ডাকবো কোনো ষোলো বছরের কিশোরীকে।
বলবো: 'বাতাস দাও
একটু। কবিতা লিখব।'
তারপর সটান যে কোনো অপরিচিত মানুষের বাড়ী
গিয়ে বলবো, আমি

জহর সেন মজুমদার
—একথালা ভাত দাও'

জহর সেনমজুমদারের কবিতার প্রধান আকর্ষণই, এই স্তব্ধতা বা স্টার্ট। এ ছন্দ সম্পূর্ণ তার নিজস্ব। অন্তত এই এক ছন্দে পরিমার্জন ব্যতিরেকে লিখতে গেলে আমরা চোর বলে জুতো খাবো। জহর কবিতার সিঁড়ি বেয়ে গল্পের বিনুনি গেঁথে দুম্ করে হঠাৎ একটা ফুল ঝুলিয়ে দেন - এ জিনিস অন্যের হাতে আসেনি। জহরের কবিতাই সম্ভবত এই সময়কার উঠতি কবিদের মধ্যে সবচেয়ে সহজ সরল। এ-কথা ঠিক যে তাঁর বিরাট মূলধনের বড়ো একটা অংশের নাম স্টার্ট; তথাচ যে গুণে তিনি পাঠককে আচ্ছন্ন ধরে রাখেন তার নাম 'গতি'। যদিও এই ছন্দ ও রূপাঙ্ক ধারা অব্যাহত থাকলে বছর চারের মধ্যে জহর বাতিল হয়ে যাবেন অলিখিত নিয়মে, তবুও উত্তর-আধুনিক কবি-দের অন্তর্ভুক্ত হতে জহরের এখন কোনো বাধা নেই।

সহজগামিতা এসেছে আরো অনেকের মধ্যে। আমার কিছু কবিতায়, শ্রীধরের, সোফিওরের, আরো অনেকের মধ্যে। উদাহৃত করলুম রাজাগোবিন্দ ঘোষাল:

'…এক রূপোপজীবিনী
আমাদের প্রমোদভবনে আসে প্রতিদিন।
লাবণ্যহীন নির্লজ্জতা নিয়ে বসে থাকি,

ডুবে যাই, যুঙুরের শব্দ শুনি।
আর প্রতি রাতে
কাগজী মুদ্রার মতো ময়লা হোয়ে যাই।'

॥ ছয় ॥

সোফিওর নীলাঞ্জন বা জহরের কবিতা দুর্বোধ্য নয়। তাঁদের বোঝবার জন্যে মল্লিনাথ বা রাজশেখর লাগে না। সোফিওর বা নীলাঞ্জনের কাজ যেখানে চুকেবুকে যায়, সেখান থেকে মল্লিকা সংযম আর আমার যাত্রা শুরু। আমি ভাষার সারল্যে বিশ্বাসী, ভাবের নয়। সেখানে আমি দুরূহতার পক্ষপাতি। বন্ধু-মজলিশে আমার এ-বিশ্বাস ধিকৃত হলেও পাকে-প্রকারে তাঁরা উত্তর-আধুনিক কবিতায় দুরবগাহের অনুমোদন না করে পারেন নি। দুরূহ কবিতার অনুশীলন শ্রমসাপেক্ষ হতে পারে কিন্তু তা এক জায়গায় এসে থামতে বাধ্য। মতান্তরে, কবি শুধু একটা গাছ—তাঁকে ঘিরে যে বিস্ময়, রহস্যময়তা—তাই কবিতা।

এই প্রচল ভাবনার একান্ত প্রতিভূ আমি বা সংযম পাল নন—মল্লিকা সেনগুপ্ত। তাঁর কবিতার লক্ষণই হলো যা চট্ করে বুঝে উঠতে পারবো না বলেই শেষাবধি একটা চাপা আনন্দের রেশ আমাদের উন্মুখ করে রাখবে। কথাটা বস্তাপচা এবং পুনরুক্তি হলেও বলবো, 'যে কবিতায় গ্রীষ্মের ঘামের ফোঁটার মত কোন বিশেষ দেখা আপনা আপনি ফুটে ওঠে না—সে কবিতা ধোপে টেকে না।' মল্লিকা এমন ঘামঝরা কবিতা অনেক লিখেছেন। এ ধারার কবিতা ছদ্মবেশী, বিমূর্ত। কেননা তা বিরূপী। ক্ষারিক ও আক্ষরিক। একটি মায়িক অন্যটি কায়িক। ক্ষর ও অক্ষর মিলে শব্দরূপ। যা অনড়, রূপান্তরশূন্য, নিরন্তর বর্তমান তাই অক্ষর। এর অর্থও নির্দিষ্ট, বিকল্পহীন ও সুস্পষ্ট। আর ক্ষর ঠিক এর উল্টো, যা ক্ষরিত, বিচ্ছুরিত ও রূপান্তরিত। এর কোনো অর্থ নেই, আছে শুধু উপলব্ধি বা ছবি। কবিতা তাই মানে-হীন, সংজ্ঞাহীন—'অপরিভাষিত'।

আট দশকে মল্লিকাতেই অ্যাবস্ট্রাক্টিজমের ঝোঁক গভীরতম ও ব্যাপকতম। নিতান্ত ক্ষুদ্র রচনা সহ মল্লিকার এমন কোনো কবিতা নেই যা বিমূর্ত নয়। এই কারণে, আমার সমীক্ষা মোতাবিক, সাধারণের মধ্যে মল্লিকা সবচেয়ে কম পঠিত। প্রথম পাঠে তাঁর বিষয় ও শব্দচয়ন দেখে ভ্রম হয়েছে—তিনি বুঝি এই ভাঙা সময়ের প্রথম 'আধ্যাত্মিক' কবি—পরে বুঝেছি, ধ্যানগম্ভীর এই সন্ন্যাসিনীর বুকের অন্তঃস্থলে ঘাপটি মেরে বসে আছে এক দ্বন্দ্ব জর্জর আধুনিক প্রেমিক মানস :

'শতশরতের বীর্যে আমার স্বামীকে সাজাও
অগ্নিদেবতা--আমার প্রথম স্বামী ছিলো সোম
দ্বিতীয় দেবতা না, গন্ধর্ব, তৃতীয় অগ্নি
তুমি, যে আমাকে মানুষ স্বামীর হাতে তুলে দেবে।'

বিবৃতি কৌশলের অভিনবত্ব, শব্দের চমকপ্রদ অধিষ্ঠান এইসব বোরখা ভেদ করে মল্লিকা সেনগুপ্তের রচনার মধ্যে প্রথিত হতে পেরে আমি তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করেছি যে তিনি এমন এক দুনিয়ার অধিবাসিনী, যে-দুনিয়া অন্যান্য সমকালীন কবিদের পক্ষে অপ্রাপণীয়।'

আমি অন্যত্র কী প্রসঙ্গে যেন মার্কেজের অনুসরণে বলেছিলুম, সাহিত্যসৃষ্টি হচ্ছে জগতের সবচেয়ে নিঃসঙ্গতম কাজ। আত্মার একাকীত্বে লালিত সৃষ্টির পরম লগ্নে কোন্ কবি নিঃসঙ্গ নন? যেমন সংযম পাল। এই সেন্টো শুরু করার প্রাক্-মুহূর্তে সংযমের সঙ্গে যখন পরিচয় হলো, তার আগেই তিনি খ্যাতির আসনে সমারূঢ় হবার মুখে। তাঁর শব্দযোজনা পী

কেও মাড়াতে পারলেন না। হ্যাঁ, তাপস 'হ্যামলেট' বকবাস করলেও, কিছু স্মরণযোগ্য কবিতায় খুঁটি 'নিজস্বনির্মাণ' শিরোভূমিতে গেঁথেছেন। তারই একটি : 'আজ মৃত্যুর সমারোহে অভস্মিভূত শরীর অকস্মাৎ অগ্নিউৎপাতে সমবর্ধনা পাবে,/তবু এই প্রতিচ্ছায়া, এই পৃথিবীর অলিন্দে শব্দহীন, নিগৃহীত, নিরন্তন দগ্ধ থেকে যাবে।' তবে, অন্যান্য উত্তর-আধুনিক কবিদের মতো, আট দশককে তাপসের নিজস্ব কিছু দেবার আছে।

॥ সাত ॥

কোনো সাহিত্যসভায় কবি হিসেবে যদি 'অজিত রায়' নামটি উত্থাপিত হয়, তবে সবার আগে চমকে উঠবো আমি নিজে। অচলিত গদ্যের লেখক বলে বন্ধুমহলে আমার দুর্নাম আছে বটে কিন্তু কাব্যরোগী হিসেবে নৈব নৈব। ইদানিং অর্থাৎ ১৯৮৪-র ১০ই জানুয়ারীর পর থেকে এই গদ্যমালীর বাগানে যে পদ্যফুলের আগাছাকে লোকে 'কবিতা' বলে ভাবছেন, তা আসলে বুকে জমা কিছু রক্তকণা। কবিতাই যদি হয়, তবু তা দীর্ঘ বেদনার, কান্নার। অনেকের কবিতার শৈশব থাকে, কৈশোর থাকে। বিষয়ী মানুষের যে-বয়সে হাজার ডিং মেরেও দরজার ছিটকিনিতে হাত পৌঁছয় না—শুনেছি সেই কৈশোর লগ্নে অনেকের মধ্যে কাব্যরোগের দুর্লক্ষণ জাগে। ব্যাধি ক্রমে ক্রনিক এবং ক্রমে সপ্তায় দিনে গণ্ডায় গণ্ডায় বমি। আমার এসব কিছুই ঘটেনি। এক বছর আগে কবিতা আসেনি এবং যখন এলো, তাকে শিশু বা কিশোরী ভাবতে পারি না। জন্মক্ষণেই যে যুবতী—অযোনিসম্ভবা।

নিজের কবিতার কথা বলতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি শব্দের ভেতর, দুটো শব্দের মধ্যকার ফাঁক ফোকরে, শব্দের রন্ধ্রে-উপরন্ধ্রে লুকিয়ে রয়েছে এক-টাই শব্দ : যন্ত্রণা। যন্ত্রণাকে সন্তানের মতো লালন করে আমার কবিতা বেশ বুঝতে পারি, বেদনায় আক্রান্ত না হলে কবিতা এভাবে, চোরপায়ে, আমার কাছে হেঁটে আসতো না। আমি রোবট বনে যেতুম। এখন হঠাৎ কোনো ঘটনা, কোনো মুখ, কোনো কথা গাড়িয়ে দেয় দাঁত আমার গভীর শাঁসে। নিমজ্জিত হয়ে থাকি ব্যথার ভেতর, অনেকক্ষণ অতঃপর বর্ষা কিংবা উদ্গার। এবং যেখানে কোনো চতুরালি নেই। নেই সিউডোপনা। একথা ঠিক যে সমস্ত বেদনা লেখবার জন্যে নয়, কিছু ভোগের জন্যেও গচ্ছিত থাকে। কিন্তু একথাও ঠিক যে, যে-বেদনায় ভুগেছি আমি তার সবটুকু উজাড় করে ঢেলেছি নীল কাগজে। এই আমার কবিতা এই আমি। কবিতাই আগে পরে স্রষ্টা। আমার জন্ম কবিতায়। নবজন্ম। নিজেকে নতুন ভাবে আবিষ্কার :

Today it seems there is nothing so treacher-
ous as women,
Fitting violent mirrors on each wall of the
room
I am observing that women are treacherous
than Art...

ভালোবাসি, বলেছিলে
আমার অন্ধকার ভরে উঠেছিল দেওয়ালির আলোয়।
এখন ঐরাবৎ যেন ভেসেছে সফেন সমুদ্রে,
কানে জিব ঢেলে এঁকে দিয়েছো তুমি গান্ধীর বাঁদর
পুতুল
কুয়াশায় ভরে গেছে আমার সকাল…

অনেকের জিজ্ঞাসা, আমার গদ্যে কবিতায় যে 'সুপর্ণা' ঘুরে ফিরে আসছে, সে কে? বিস্তারে যাওয়া আমার পক্ষে বেদনাকর। আভাসে বলি মলয়ের

'শুভা', উত্তম ও ধূর্জটির 'রুণু', সোফিওরের 'সুচেতা'র মতোই আমার 'সুপর্ণা' এক রক্তমাংসের নারী, তার অস্তিত্ব আছে। সুপর্ণাকে ঘিরে আমার ভালোবাসা ঘৃণা প্রদাহ প্রজ্জলন উৎকণ্ঠা জ্বালার অন্ত নেই। মনে হয় সুপর্ণা নানা চরিত্রে ও রূপকল্পে হয়তো নতুন শৈলীতেও চিন্তায় ফিরে ফিরে আসবে…'আমাকে গোয়েন্দাগিরির একটা চাকরি দাও/আমাকে সুপর্ণার ভেতরে তদন্ত করতে দাও/আমাকে সুপর্ণার পাকস্থলী ঘেঁটে দেখে নিতে দাও/আমাকে রক্তাশী জানোয়ার শিকারী বনে যেতে দাও/দাও দাও দাও সুপর্ণাকে আমার হাতে তুলে দাও/টেবিলে শুইয়ে সুপর্ণাকে টুকরোটুকরো কাটার অধিকার দাও/আমাকে জেনে নিতে দাও/কবিতার চেয়ে নৃশংস কতো মানুষী শঠতা'…

আমার আর শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের জগৎ-সাদৃশ্য নিয়ে ইদানিং বচসা চলছে শুনতে পেলুম। বলতে কি অনেক আগে থেকেই শ্রীধরকে আমার খুব কাছের বলে মনে হয়েছে। মাঝে মধ্যেই সতর্ক হয়েছি যাতে শ্রীধরের বুকটা মাথাটা আমার কলমে এসে না যায়। পরে, সম্প্রতি শ্রীধরের কবিতার ধারাবাহিক অনু-শীলনের পর এই ভেবে আশ্বস্ত হয়েছি যে কবিতা নির্মাণের ব্যাপারে আমরা মূলত এক হলেও উপাদানে ও বিন্যাসে সম্পূর্ণত দুই মেরুর। উভয়ের রসবস্তু স্বতন্ত্র। আমি যা পারি না, শ্রীধর তা অনেক পরি-মাণে দিচ্ছেন এবং শ্রীধর যা দিচ্ছেন তার অনেকটা মলয় রায়চৌধুরী বিলিয়ে দিয়েছেন। তাই শ্রীধরকে অশ্লীলতার উদীয়মান প্রতিভূ যাঁরা বলছেন, তাঁদের প্রতি মায়া হয়।

শ্রীধরের কবিতা প্রচল অর্থে অবৈধ অশ্লীল iconoclastic, destructive এবং ছন্নছাড়া। শ্রীধর এটাই চান। আরোপিত কৃত্রিম টিনড ভালোবাসা ও রোমান্টিকদের তিনি ঘৃণা করেন। যে-কোন ঘটনার সঙ্গে 'মানুষের মানসিক ও শারীরিক সম্পর্ক ও প্রতিক্রিয়া' নিয়ে তিনি লিখতে চান। তাঁর আশ্বার, কবিতায় থাকবে 'সন্ত্রাস, নাশকতা ও চরম উদ্দেশ্যহীনতা'। অন্যদিকে 'কবিতায় জীবনের স্বেদ ও রক্তবিন্দুর অস্থিরতা ও চঞ্চলতা উপস্থিত থাকবে। কবিতায় জীবনের সঙ্গে জড়িত সমস্ত ঘটনার বিশ্লেষণ আসবে'। অর্থাৎ 'দায়বদ্ধতা' ব্যাপারটিকে নস্যাৎ করার ঘোষণা সত্ত্বেও শ্রীধর 'আরক্ত হৃদয় ও ফুসফুস' দেখাতে গিয়ে সেই দায়বদ্ধতাকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাই 'আশির দশকের কবি ও কবিতা সম্পৃক্ত, কখন একই সত্তা, কখন বিরোধী' কথাটা তাঁর বেলাতেই বেখাপ হয় না। শ্রীধরের আকাঙ্খিত কী সেই 'বিস্ফোরণ' যা প্রচলরীতির কবিতার বাইরে বেরুতে তাঁকে তাড়িত করে? তার সামান্য আভাস মেলে নিম্নোধৃত কবিতায়—

'বৈপরীত্য বলে কিছু নেই।
উপুড় হওয়া নগ্ন স্বৈরিণীর নিতম্বের ওপর
পাতাখোলা গীতা। Come on girls!
Let's create a nice dew kissed night
in between our legs.
পারমাণবিক বোমা তৈরীর কারখানা ভাসিয়ে দাও
সংগীত ও স্বৈরাচারে।'

॥ আট ॥

উপরোধৃত আলোচনায় উল্লিখিত ক'জনের ভেতর কে 'শ্রেষ্ঠ'—এ-প্রশ্ন অবান্তর। কেননা মানুষের চিন্ময় প্রবৃত্তি যেখানে কাজ করে, সেখানে কাঁচা-পাকার ভেদ থাকলেও চরম বা শ্রেষ্ঠ বলে কিছু থাকার কথা নয়। আলোচনার যেখানে 'শ্রেষ্ঠ' 'অপেক্ষাকৃত ভালো' 'উৎকৃষ্ট' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করেছি, বুঝতে

হবে সেসব প্রয়োগের ক্ষেত্র এমনভাবে সীমাবদ্ধ যাতে তার আক্ষরিক অর্থ, মতান্তরে একটা স্পর্শসহ তাৎপর্য মাত্রঁ মেলে। Art abhors superlatives. আর্ট-এর কবিতার নির্মাণ প্রক্রিয়া, সময় ও শব্দ-চেতনা, রূপ-কল্প, ছন্দ, ভাষা ইত্যাদি নিয়ে বস্তুনিক চর্চা এটা নয়; পূর্বাভাষ মাত্র। কেন আশির দশক অপ্রতিরোধ্য ও দুর্বার তারই আভাস দেবার চেষ্টা মাত্র। এই সেণ্টো লেখায় কোনো সহায়ক-রচনার মদত নিই নি; কেননা সবাই জানেন আশির কবিতা নিয়ে আলোচনা গ্রন্থ তো দূরের, কাগজেও তেমন আকাদেমিক চর্চা হয়নি। উপর্যুপরি আর্ট-এর কবিরা এমন আত্মমুখী বা উদাসীন বা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন যে তাঁদের সম্মিলিত কোরাস এযাবৎ প্রকাশ পায়নি। সবাই স্বয়ম্ভু নন আলবৎ। অথচ আমি ধানবাদে, নীলাঞ্জন দিল্লিতে, সোফিওর মেদিনীপুরে, মল্লিকা ধূপগুড়িতে, নাসের বহরমপুরে, সংযম বোলপুরে, জহর কলকাতায়—এমতাবস্থায় জোটবদ্ধ হওয়া যে কী মুশকিল তা বুঝিয়ে বলার নয়। তথাচ আমরা জোটবদ্ধ। গোষ্ঠিবদ্ধ। আমরা গোষ্ঠিবদ্ধ কেননা সময় আমাদের বলছে তোমরা ছন্নছাড়া নও—তোমাদের কবিতা আশ্চর্যভাবে এক সুরে উদ্ভাসিত এবং তা আধুনিকতা বা নতুনত্বের বেড়া ডিঙিয়ে এমন এক বদ্ধ কপাট চড় মেরে চলেছে, যা না খুললে তোমরা হবে 'বন্ধ্যা' বলে ধিক্কৃত—এবং যা খুলতে পারলে উত্তর আধুনিক কাব্যের তোমরাই হবে পথিকৃৎ। আপাতত অর্থবোধক কিছু প্রকল্প তৈরি করা যাক:

১। ইতিপূর্বে বিবৃত যাবতীয় শিল্পতাত্ত্বিক মতবাদই আমাদের কাছে মূল্যহীন।

২। কবিতার কোনো সংজ্ঞা নেই। কবিতা কোনো অনুমোদনের অপেক্ষা রাখে না।

৩। কবি যোগাযোগের যন্ত্র বা ক্যাটালিস্ট নয়। কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগস্থাপনের সবচেয়ে জ্যান্ত জিনিস কবিতা। আমি কী, সেটা বোঝার জন্যে স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট বা মা বাবা বন্ধুদের আইডেন্টিফিকেশন নয়—কবিতা রয়েছে। মন যা চায় তাই কবিতা। জীবনের যাবতীয় কিছু সমস্তই থাকবে কবিতার অস্ত্রাগারে।

৪। আমাদের দায়বদ্ধতা প্রথমে কবিতার কাছে, পরে নিজের কাছে এবং সবশেষে পাঠকের প্রতি। তবে কোনোরকম ব্যাখ্যা, বিধান বা তত্ত্বপ্রচারের দায়িত্ব কবিতার নেই।

৫। আমরা কোনো বিধিবদ্ধ আন্দোলন ছাড়াই গোষ্ঠীবদ্ধ।

৬। কবি যশ ও প্রচারকামী। নতুন ধরনের মুদ্রণ ও বানান বিন্যাস ছাড়াও, কবিতাকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করার সবরকম শিল্পনান্দন কৌশল আমরা ব্যবহার করবো। উদাহরণত, বিশেষ ভাববাহী কথা ইংরেজি হিন্দী বা অন্য কোনো অ-বাংলা ভাষায় অথবা সানাস্তভাবে প্রযুক্ত হরফ থেকে পৃথক হরফে ছাপিয়ে তার প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ।

৭। আমরা এমন কবিতা লিখছি লিখবো যাতে বিশ বছর পরের সমাজ সংসার আমাদের কবিতার কাছে শব্দ চাইতে পারে। শব্দের কোনো নির্দিষ্ট মানে বা ওজনে আমাদের অনাস্থা।

৮। সচেতনভাবে ব্যাকরণ বিরোধিতা আমাদের ধোয়। পাঠককে বোকা ভাববার কিছু নেই সুতরাং আমরা দুরূহতার পক্ষপাতি।

৯। লিরিকের ছাউনিতে ভারতীয় লোকায়ত ও শাশ্বত জীবনবোধ পক্ষান্তরে অধ্যাত্মবাদের আরোপ।

১০। অশ্লীলতা বলে কিছু নেই। আমাদের কবিতায় যৌনধর্মের অকপট বিবৃতি—বস্তুত হার্দ্য আবেদন মাত্র।

১১। খাওয়া শোয়া সঙ্গমেচ্ছার মতোই, কবিতার চর্চা বলে কিছু নয়, বেঁচে থাকবার অবিকল্প মদ।

১২। আট দশকের কাগজে সময়ের দাসত্ব নয়, থাকবে সময়ের রাজত্ব—যা কবিতাকে আসন্ন একুশ শতক অবধি অবলীলায় এগিয়ে দেবে।

এই বারো দফা প্রকল্পে, আমার সমঝদারিতে, যোগবিয়োগের কিছু নেই। যদি থাকে, বন্ধুবা দ্রুত চালান করুন তাঁদের সমর্থনযোগ্য নির্ণায়ক প্রকল্প। লেখা হোক উত্তর-আধুনিক কবিতা বিদ্রোহের শেষ ইস্তেহার। কেননা পাঁচ বছর অতিক্রান্তের পর, কামান দাগার অলসতায় নিছক 'বাঁজা' বলে চিহ্নিত হোক আমাদের দশক—এমন প্ল্যাকসো বেবি আমরা নই। আমরা ভুলে যাইনি লড়াকু কবির সেই উক্তি—'যা মৃত তা নড়ে না, চলাফেরা করে না, আন্দোলিত হয় না। জীবিত লেখাই কবিতার ব্যাপার, মৃত লেখালেখি মানে শব্দঘোঁট।' কিংবা আলবেয়ার কাম্যু যখন বলেন Art and rebellion will only die with the death of last man on earth তখনও কি নতুন কিছু শুনছি বলে আমাদের মনে হয়? সুতরাং এই সেই সময় যার তলায় লুটিয়ে আছে কুরুক্ষেত্র। কবিতার সঙ্গমকালে ডাকিনী যোগিনীরা লিঙ্গপথে ঢুকে পড়ার আগেই, উলঙ্গ দেহে ধর্ষণ ও আগুন নিয়ে উঠে দাঁড়াবার এই তো সময়।

আট দশক বৈষ্ণবদের আখড়া নয় যে অকপট প্রেম বিলিয়ে যাবে। আবার কবিতাকে আমরা দক্ষ মাস্তিত খুন-খারাবও ভাবি না। কবিতা হলো সেই তীক্ষ্ণাগ্র ভোজালি যা দুর্গন্ধিত রাষ্ট্রপক্ষের ভেতর থেকে সমাজের হয়ে-ওঠার প্রণালীকে আর একটু ধারালো করে দেওয়া, যাতে থাকে স্বচ্ছ জীবনের ইসারা, মতান্তরে মানব-গন্তব্যের সুলুক সন্ধান। এই মুহূর্তে কম্যুনিজম না ফ্যাসিজম কোনটা বেশি জরুরী সেটা নির্ধারণ করার আগেই আমরা উত্তর-আধুনিক কবিতার বিস্ফোরণ চাইছি নিছক হুজুগের বশে নয়। বরং আমাদের গভীর উপলব্ধি বলে যে, এই সমাজের শিল্প সংস্কৃতি সভ্যতা অর্থনীতির মধ্যযুগীয় আবর্জনা পোড়ানোর জন্যে একটা 'গিলোটিন উৎসব' দরকার। নিজেদের আপেক্ষিক অবস্থান আর একমাত্র সম্বল সাধের কলমটাকে চিনে নিতে পারলেই আমরা সেটা পারবো,—পেয়ে যাবো উদ্দাম ইসারা—কী এবং কিভাবে করবো-র জবাব। আর—

আর কিছুক্ষণ পরেই পৃথিবীর সমস্ত ঘড়ি একসুরে
বেজে উঠবে। উত্তর-আধুনিক সৈনিকেরা
যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে
বর্ণময় হতে শুরু করো—
Soon we will start our programme
And the Earth will start to dissolve!

প্রসঙ্গ : গোধূলি-মন

( ) আপনার পত্রিকার জঁ পল সার্ত্রে স্মৃতি সংখ্যা পেয়েছি। প্রত্যেকটি বিশেষ সংখ্যারই একটা আলাদা মূল্য আছে। আপনারা জঁ পল সার্ত্রে বিশেষ স্মরণ সংখ্যা প্রকাশ করে এক মূল্যবান দায়িত্ব পালন করেছেন। শ্রীঅজিত রায়ের লেখাটি বেশ তথ্যসমৃদ্ধ তবে অনূদিত গল্পটি নির্বাচনের দুর্বলতা বলে আমার মনে হয়েছে। প্রচ্ছদটি চমৎকার।

স্বপন নাগ
G-1/458, Armapose Estate
Kanpur 208009. U. P.

সোফিওর রহমান-এর কবিতা

○ আত্ম প্রদক্ষিণ

ফুল কি বুকের ভাষা ফোটায়? চির ভিক্ষুক এই যুবকের
দেহে কার পাঁপড়ি নগ্নরাত্রিতে ডাক দেয়?

চন্দ্রকলায় রাত্রি তখন নাচছিল, মুগ্ধপৃথিবী
নৃত্যআবহে বন্দী পুরুষের মতো যাতুহিম, প্রকৃতি কোথায়?

মুমূর্ষু-আমি হামা দেওয়া বালক বুঝিবা
মুক্ত ঠোঁটে একটি ফুল দাও, কোথায় জননী আমার

চন্দ্রকলায় জীবন বাড়াও শতস্তরে হই যেন অপারুণ
উদরে পচুক অতীত, দু'চোখে আগামীর অভিধান···
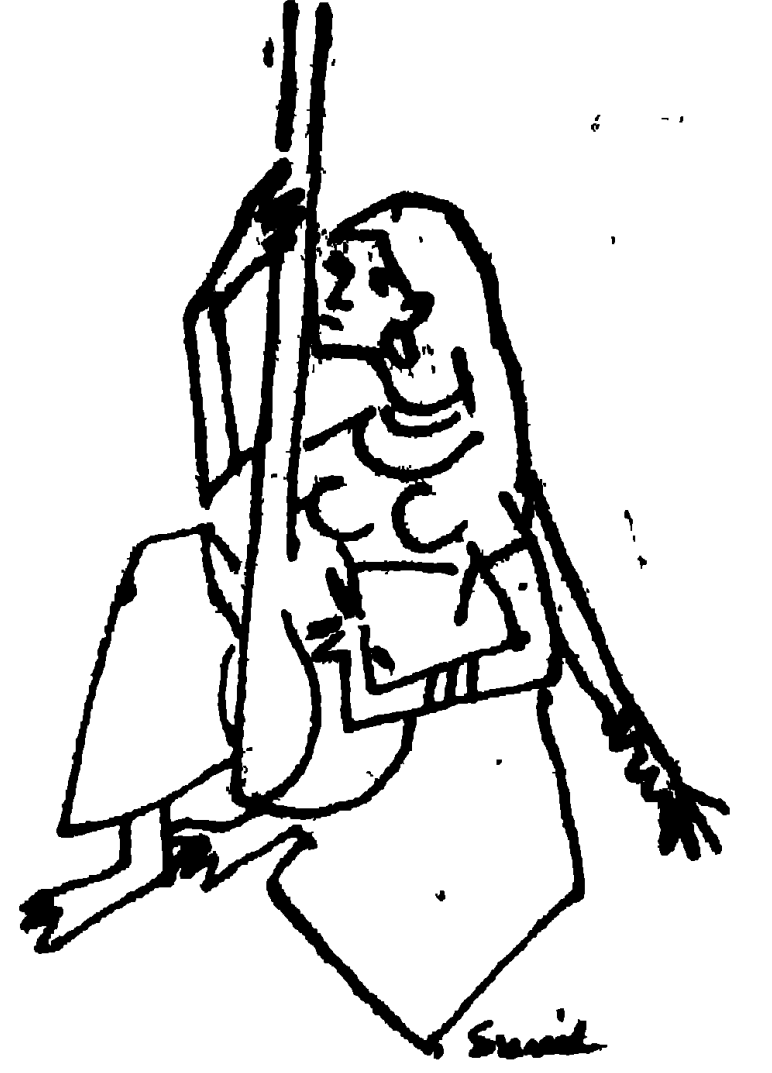
○ মুক্তবন্দর থেকে লিখছি

শহরলাগোয়া বন্দরে বেড়ানো আমার প্রিয়সখ.
তুমি জানো। ওখানে সূর্যোদয় প্রতিভার মতো,
ভালোবাসার বালার্ক প্রশ্নহীন অধিবাস।
ওখানে মুক্ত জানালা খোলা থাকে পূর্বপশ্চিমে
ওখানে বিকেল মায়ের পুষ্টস্তনের মতো দেদার।

ওই বক্ষ আমাকে কেবলি ভাঙে, বুকের অন্তর্মন্দির
জাগায় অসমাপ্ত প্রতীক্ষা, গড়ে নতুন সাম্রাজ্য।
শহর আমাকে দেয় না কিছুই. ভাঙে না—
কেবল মেদময় নেশার ঘেরাটোপে নাজেহাল করে।

আরো জেনে রেখো প্রিয়বান্ধবী. গ্রামের শস্যক্ষেতে
রাজনীতির বিষফুল আমার প্রিয়তমার শরীর করেছে নীল,
পিতার দেহে পাহাড় প্রমাণ বার্ধক্য। অনুজদের চোখে
ওয়াগনের মতো স্বার্থের পকেট, পালিয়ে এসেছি তাই।
মুমূর্ষু জীবন সঙ্গিনীর জন্য মালকোষের ছাউনি গেঁথেছি

বন্দরের অঙ্গন জুড়ে। পুরোণো সেতারেই বাজাবো তার প্রিয়রাগ
জ্ঞ মা । গ্ম মা । দদা ণণা । র্সা র্সসা র্স র্স । ন র্সা
জ্ঞ মা । গ্ম মা দদা ণণা । র্স র্সসা র্সা র্সা । ণা সা

প্রতিমুহূর্তে ক্রমাগত ঢেউএর বিকাশ
√শম্‌+তি (ক্ত)-র ঐশ্বরিক শব্দ এনে দেয় শস্যের প্রাণ
প্রিয়তমা সুস্থ বোধ করে। তাই গ্রামেও নয় শহরেও নয়
শহরলাগোয়া বন্দরে পূর্বপশ্চিম জীবনের রঙ বরাবর
আমাদের নতুন ছাউনিতে একদিন এসো প্রিয়বান্ধবী।

O সর্বনাশা উদ্বোধন

কিছুক্ষণ আলোর স্তব হ'ল, আর
সুফলা প্রান্তরে চেম্বার গড়লেন ক্রীতদাস কেনা ঝানু নাবিক

কালো দ্বীপে বাতি জ্বলল, ব্যর্থতার দিকে প্রদীপ
মরা অভ্যাসের বুকে কিছু সময়ের জন্য গর্ভিনী চাঁদ··
তারপর, প্রাঙ্গণের জমায়েত হাল্কা হতেই

অই আলোর নায়ক ভগ্নস্তূপের ফেনা ছাড়লেন,
স্তবের মোহময় মন্ত্রপাঠ
সব মানুষকে নিয়ে চলল আরো অনাহারে।
এক পরিত্যক্ত নির্বোধ জাহাজে
সবাইকে উলঙ্গ করে
ধারালো অস্ত্রহাতে নাচ শুরু করলেন আলোর দূত

নীরাঞ্জন মুখোপাধ্যায়-এর কবিতা

O ভাষা

বাংলা ভাষা আমি কি ঠিক মনের মতন বলতে পারি?
কবে যাব ঠিক জানি না, যাব যে, ঠিক সেটাই জানি—
জলের গন্ধে ওইটুকু স্নান, ও মাটি মা, ঘুমদুখিনী
আমায় তুমি ভুল বুঝোনা, জীবন কেন এমন কাগজ?

কেউ কি কারো ভাষা বোঝে ? চোখের নদী, শিউলি সকাল...
সমস্ত দেশ আগুন পোহায় প্রখর শীতে প্রহর ভরে,
আমার জন্য নয় আয়োজন অবাধ্য চৈতালী দিনের —
আমাকে কেউ ভুল বুঝো না, ভাষা কি যায় হৃদয়পুরে ?

O ফুলচোর

ডাকেনি আমাকে বোধিপরবাস অযাচিত অভিনিবেশে
দ্রাবিড়জঘনা ও বিষকন্যা দেখা দিলে ভোরে কী বেশে

অরণিমথিত আগুনে সমিধ আনেনি মূর্খ ও কিশোর
মুঠো গলে ফুল পড়ে যায়, তবু অপবাদ দাও, ফুল চোর

যাবে সে কোথায় ? কোন নিরালায় এখনো একাকী পোড়ে ধূপ ?
টেনে নিয়ে যায় বালির বাজনা, বারুদে পৃথিবী অপরূপ

হে যাজ্ঞসেনী, বাঁধবে না বেণী, দুঃশাসনের দিন শেষ
নাগরিক নির্মোক হবে ক্ষয়, দাও প্রশ্রয়, নিমেষেই...

ভোলো অভিমান, কবি সে কিশোর, কখনো বা স্থিতপ্রজ্ঞা
বিষ মেয়ে শিখে সে বুঝে নিয়েছে ত্রিভুবন বীরভোগ্যা

ইতিহাসহারা পিতৃপুরুষ দেখে কার চোখে নামে ঘোর
ভোর হল, ত্যাখো, দ্রাবিড়নয়না, দুয়ারে দস্যু ফুল চোর

প্রবাস কখনো নয়

যেখানে যাচ্ছি, সেখানে প্রবাস আমার কখনো নয় ।
দেখে নিতে চাই দিনের আলোয় হরিৎ হর্ম্যরাজি
ঘুম ভাঙানিয়া যমুনা, জীবন স্বপ্ন কখনো হয় ?
যেখানে ছিলাম, সেখানে চলেছি—প্রবাস কখনো নয়

দেখে যাই ছেঁড়া মানচিত্রটি—মুখগুলি ভাঙাচোরা
দেখে যাই শত ভাই ও বন্ধু ভারতবর্ষ ভ'রে
অবাঙ্‌মনোগোচর দেওয়ালি খেলায় এ রাজধানী
সেজেছে, যেভাবে স্বপ্নে যমুনা পরেছে কাঁচের চুড়ি—

এ ঘর সবারই তৃতীয় বিশ্ব, বিদূষক, সভাকবি
মাতৃভাষা যে বলতে ভুলেছে, কোটবুট এঁটোকাঁটা
হিরণ্য স্রোতে মেতে সে দেখেছে স্বদেশ দোকানে বাঁধা
তবুও মানুষ হাত ধরে বলে, জয় চিরজীবিতেরই···

ভারতবর্ষ কেমন সেজেছে! পরেছে রঙিন চুড়ি
ঘুমভাঙানিয়া ওই নবনীতা যমুনা আমারই বাড়ি
সে গন্তব্য আলোকঋদ্ধ, সেখানে মানুষ আছে
যমুনার কাছে নিজেকে কখনো প্রবাসী ভাবতে পারি?

অজিত রায়-এর কবিতা

O রঙ

পলাশ গাছের শীর্ষ ছুঁয়ে সন্ধ্যা নামছে ধূসর শাড়ি পরে
মুরগির খুপরির মতো ভাড়াবাড়ির প্রতিটি ঘরে
ফাগুনের রঙীন আলো।

সন্ধ্যা বৌদির নরম আঁচলে উলঙ্গ শিশুর আকুপাকু
Oh Mother, why didn't you give me birth
in the form of a lady—like you?
Mother, let me see my own self through
your eyes...

অভ্রগাঢ় আবিরে রমণীর চোখ বিকেলের রোদ্দুর-চিকৃচিক্,
অতঃপর রজনীদার কালো হাতের নির্ভয় বিচরণ। এবং
গেল মনের পাওনাগণ্ডা মুহূর্তে বুঝে নেওয়া; তারপর
আগামী বছরের ফাগমাখা প্রতীক্ষার নীলখাম
বিধানসভার জিরো আওয়ারে॥

শিশু ঘুমোয় দুধপানের শেষে, And
"Not sleep, which is grey with dreams,
nor death, which quivers with birth,
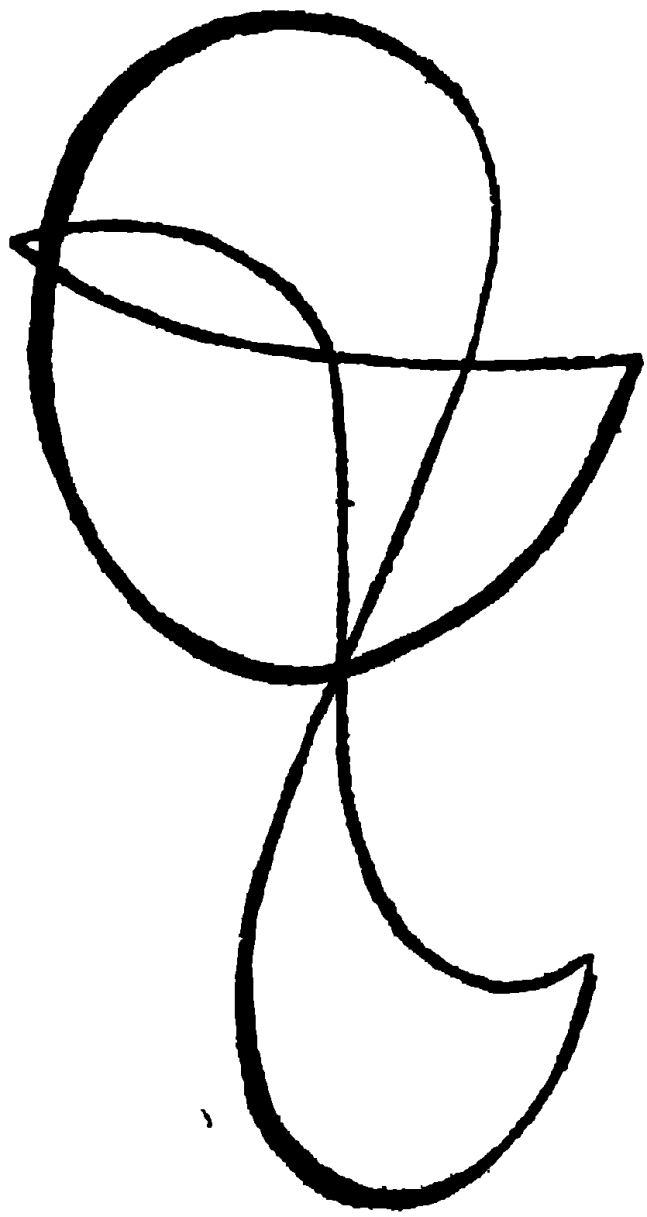
but heavy sealing
darkness,
silence,
all immovable'...

শুধু জেগে থাকে রজনীদার কালো হাত, সন্ধ্যা বৌদির
অভ্রচিকণ কোমল বুকে।

○ স্বপ্ন

সুপর্ণা, আমার হতে তুমি যদি, আজ
পরিয়ে দিতাম কল্কাপাড় নীরক্ত শাড়ি
নক্ষত্রের শীতল পূর্বাস্তে, একাকী
দেবালয়ে তোমার নয়নজল
রাতের হিমকণা বলে ভ্রম হতো তবু।
অথচ আজ, সুপর্ণা
পরিত্যক্ত বুড়োবুড়ির মতো বিষন্ন সন্ধ্যায়
উলঙ্গ রাধাকৃষ্ণমূর্তির সামনে
তোমার মেনিফেস্তো উচ্চারণ
আমার বুকে বয়ে আনে করুণ নিঃস্বতা···

এখন শুধু কল্কেগাছের তলায় ফেলে-আসা স্বপ্ন
মনে করে—আমি আছি বিরস তৃষায়॥

○ যন্ত্রণা

রাইসরষের ফাটকা বাজারে শেয়ারের দাম হু হু নামতে থাকার মতো
যখনই একরাশ যন্ত্রণার শর আমার বুকে বিঁধতে থাকে আমি
তখন শুনি পাশের বাড়ির কনভেন্ট-পড়া যুবতীর গলায়
সল বেলোর কবিতা:

যন্ত্রণা মধুর যন্ত্রণা এবার এসো
লালন করবো তোমায় সন্তানের মতো
স্তনের পারে।

পৌষ/১৩৯১/গোধূলি-মন/ঊনিশ

আমার যন্ত্রণা আরো বেড়ে যায় যুবতীর গলার স্বর :
যন্ত্রণা মধুর যন্ত্রণা এসো না আমার বুকের চূড়ায় ঘর বাঁধো।....
আমি হাঁফাতে থাকি ছটফট করি নিদারুণ যন্ত্রণায় আমার
সুপর্ণার কথা মনে পড়ে যায় বুক ভেঙে বাসা বাঁধে সল
বেলোর অনক্ত কবিতার লাইন....

সংযম পাল-এর কবিতা

O সমুদ্রগভীর কীট

কেন আমি এই জন্মে মানুষের পুত্র হ'য়ে সংসারে এসেছি ?
বরং হতাম যদি সমুদ্রগভীর কীট ডুবোপাহাড়ের
শ্যাওলা সম্বল ক'রে সুখে কাল চলে যেতো, রক্তাক্ত হতোনা

বুকের বাঁদিকে ভদ্র কলটির নীল ত্বক, রক্তাক্ত হতোনা
দু'চোখের কালো মণি তরল সম্পদ আর রক্তাক্ত হ'তোনা
সহজ সম্পর্কগুলি, আমাদের ভালোবাসা, ভাই বোন মা-র।

অনেক স্বচ্ছন্দে কাল কেটে যেতো অনায়াসে মাইলগভীর
আলোআঁধারির সেই জলতলে, অনেক ধবলশাঁখ ঝিনুকের দলে
প্রেম ক'রে কেটে যেতো, সামান্য ছুঁতোয় কিছু ভুলস্পর্শ, রোমাঞ্চিত
নুড়ি।

কেন আমি এই জন্ম মানুষের কারাগারে বিষাক্ত রেখেছি ?
জ্ঞানের সম্পদগুলো জ্বালামাখা, আলস্যের দিনগুলো পাপ,—
মানুষের ভালোবাসা বিষেভ'রে রাখে ভাষা, সৌজন্যবিলাস।

O জন্মচক্র

আমার অষ্টমী তিথি, কৃষ্ণপক্ষ, নক্ষত্র অনামী, আর
মেষ রাশি, কুম্ভ লগ্ন, নরগণ, আর
আমার আজন্ম ভাগ্যে দেবতারা উপহাস করে।

রাত্রির তক্ষকগুলি অভিশপ্ত জড়ো হ'য়ে আমার ঘরেই
উঠে আসে? দুয়ের আগ্নেয়গিরি থেকে লাল লাভাস্রোত, খর
আমার দিকেই ছুটে আসে?

সংসার চিনেছি, তার কাঁটাগাছ চোরাপথে ভেতরে ছড়ায়।
নারীকে চিনেছি, তাঁর সিঁদুরে আমার ত্রস্ত ঘরপোড়া—ভয়।
নিজেকে চিনেছি, দেখি বারেবারে অসহায়, কেন অসহায়?

আমার নীচস্থ শনি. আলস্যের আল্পনা আমার হাতেই
এবং মঙ্গল আজ রক্তের লালস্রোতে কলঙ্ক ছিটোয়।
আমার আজন্ম জন্মে আজ শুধু নিয়তিরা উপহাস করে।

O তারাপদ গঙ্গাপুত্র

রাত্রি যদি মিথ্যে বলে. দিন তবে আমার সত্যকে
বাতাসে ছড়াক, আর চাঁদের গোলাপবর্ণ থেকে ছলনার
মিথ্যেকে ঝরাক, যেন সূর্যের অনন্তবীথি সত্যকেই প্রকাশিত করে।

রাত্রিতে আমার মুখ মিথ্যে বলে, শরীরের ললিত লাস্যের
কাকাতুয়া সেজে যেন সততা ভোলায় আর তাই আমি তাকে
আমার বিপন্ন আর দুঃস্থতম দিনে আজ বিশ্বাস করিনা।

মৃত্যুই সততা। আর মৃত্যুই মহার্ঘ। আমি নিয়তির ঘরে
দেখেছি হলুদবর্ণ পদচিহ্ন দুটি তার। দিনের নির্মল
আলোকপ্রভায় আমি দেখেছি ছায়ার মধ্যে অপেক্ষায় সে।

আমার প্রহর আজ শেষ হবে। চিতামুখী, উদ্ধারণপুরে
আমার যে শব যাবে—বিহ্বলের একমাত্র আশা—
সেই শবে দিবালোকে হলুদ আগুন দেবে তারাপদ গঙ্গাপুত্র ডোম।
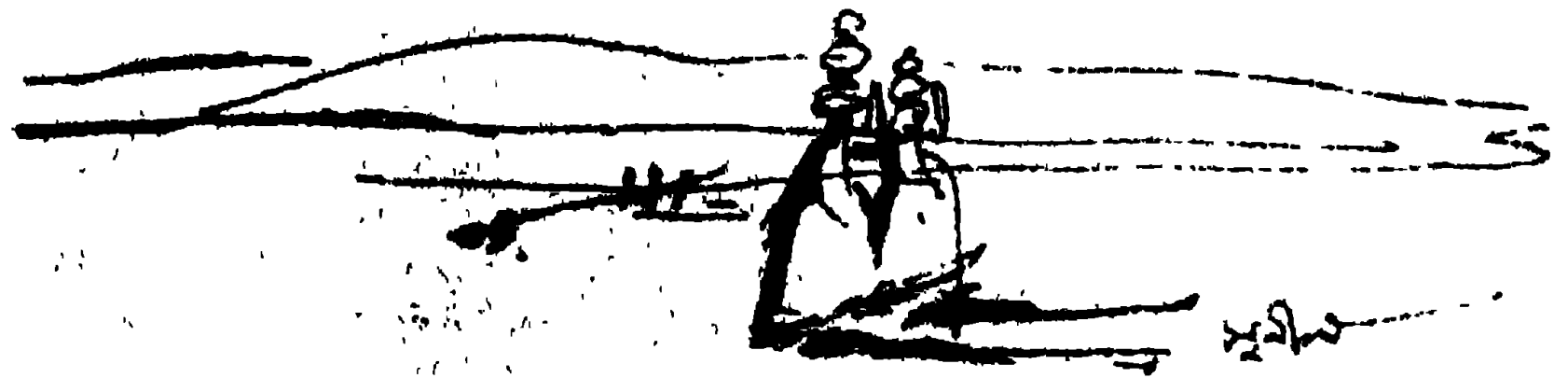
নাসের হোসেন-এর কবিতা

○ ঘোড়া

অন্তর্বিন্যাস ছিঁড়ে ছুটে যাচ্ছে ঘোড়া, যন্ত্রণার হাত !
আঙুলের ফাঁকে শহর—মুখের আড়ালে মুখ, প্রেম, গৃহস্থালী·
পৃথিবীর দশ ইঞ্চি ওপরে বাদামী কফিন নড়ে ওঠে—
পরামর্শ-ছলে ছুঁড়ে দিই বাতিদান রক্ত ছিটকে পড়ে—
দরজা বাগান থমথম—প্রশ্রয় পেয়ে হেসে উঠি—
হাসি বেজে ওঠে চতুর্দিক ! ক্ষিপ্রতায় দু'হাতে
সরিয়ে দিই অন্ধকার এবার
ঘুমোতে চাই—নিশ্চিন্তে জেগে উঠতে চাই—চাই
চিত্রা দেবের কোমর জড়িয়ে শুয়ে থাকতে—
তবুও হিংস্র দুটি চোখ চোখ রাখে বুকের ওপর !

অন্তর্বিন্যাস ছিঁড়ে ছুটে যাচ্ছে ঘোড়া বিস্তীর্ণ চত্বর····
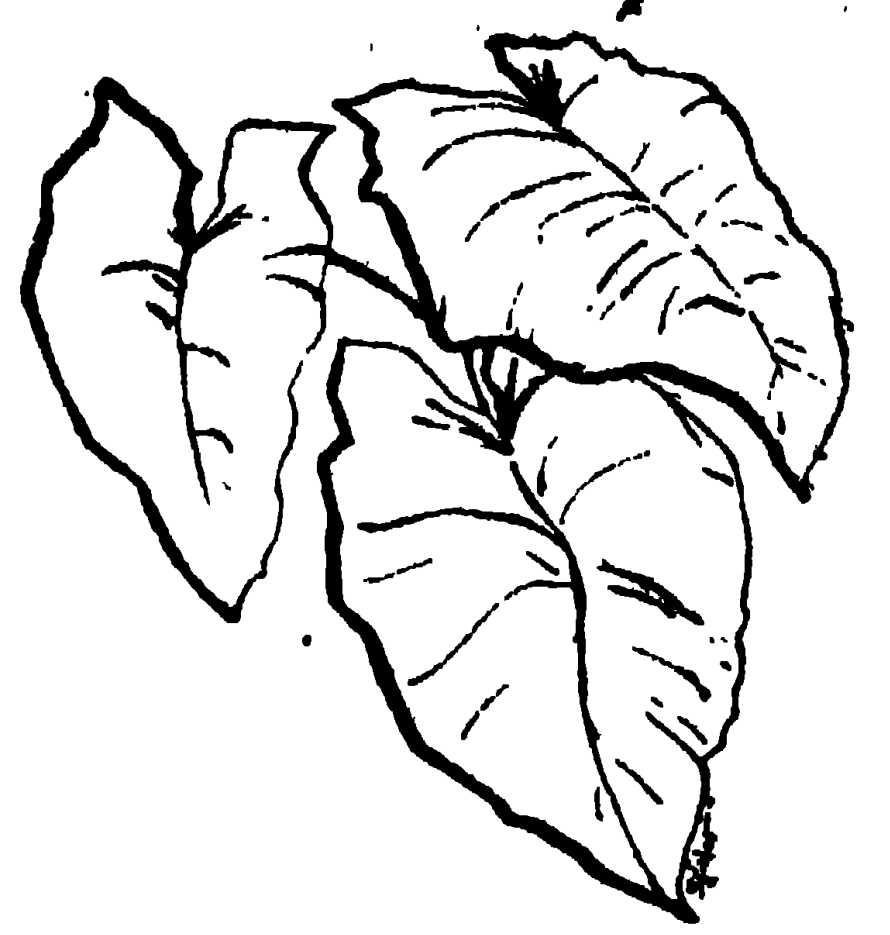
○ নিদাঘের আয়না

তোমার গোপন স্মৃতিতে ঝন্‌ঝন্‌ বেজে ওঠে আয়না—আর
ধোঁয়ার মধ্য থেকে অঙ্গারের স্তূপ ভেঙে পড়ে···একে একে
সমস্ত শীত চলে গেল, পড়ে থাকল গ্রীষ্ম, গরম—
অ্যাতোদিন যেসব স্মৃতিকে মনে হয়েছিল বিষাদ, তারা প্রিয় হয়ে
উঠছে ক্রমশ—আর
সেই নিমগাছ, প্রতিটি শাখায় ফুটে উঠছে ফুল ও ফল।

ঘাড় বাঁকিয়ে প্রবল তৃষ্ণায় নিশ্বাস ফেললে···তোমাটে মৃত্যু
দারুণ হাসে, তোমার ললাটের উজ্জ্বলতা কমে আসে—
ঘোর কণ্ঠস্বরে
কেউ কি ডেকেছিল রঙীন বিছানায় দু'দণ্ড শনাক্ত করণে ?
মুহূর্তের অভিজ্ঞতা ও ভাষাজ্ঞান টেনে নিয়ে যায়
শাদা প্রাসাদের নিকট—সিদ্ধান্ত বদল করে হেঁটে যাও তুমি
লম্বা রাস্তায়, জেগে থাকে শুধু অ্যাসফল্টের উজ্জ্বলতা····

O সে

সে আজকাল ঘুরে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন প্রদেশে
দেখে নিচ্ছে কতোখানি দৃঢ় হলো মানুষের বিশ্বাস
দু'চোখের মণি ছিঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে বাঘের মতো—তবু সে
অন্ধ নয়, সব ভাখে, সব চেনা ও অচেনা বাসভুবন, স্মৃতির পাথর—
নিশ্বাস নেবে না ভেবে শ্বাসরুদ্ধ করে, তবু বেঁচে আছে, 'বেঁচে আছি'
এই বিশ্বাস
জাগ্রত রাখে জাগ্রত রাখে ক্রমাগত···

সমস্ত সিগারেটের ধোঁয়া জমা হয় শরীরে. ভেসে যেতে থাকে
দরোজার কড়া নাড়ে, খোলে না, খোলে না দরজা—লাথি মেরে
ভেঙে ফ্যালে ঘরে ঢুকে ছাখে শরশয্যা. তেষ্টায় জল চায় বুঝি—
জল দেয়, জল দিলে অতঃপর সুস্থ হয়ে ওঠে, একসঙ্গে দু'জনে
বের হয় প্রাতর্ভ্রমণে।

ঈশিতা ভাদুড়ীর গুচ্ছ কবিতা

O চাঁদটাও ম্লান হয়ে গেছে

গভীর রাতে বারান্দায়
দাঁড়িয়ে স্পর্শ করি
নিজেকে। সমুদ্রের কথা ভাবি,
যখন বাগানে রক্তকরবী ফুটে আছে,
হৃদয় কাঁপে হাসনুহানার স্বপ্নে যখন।
ঠিক তখনই
বড় একা মনে হয়;
নিজেকে স্পর্শ করি। সহসা কি দেখি,
আকাশে চাঁদটাও ম্লান হয়ে গিয়েছে কখন।
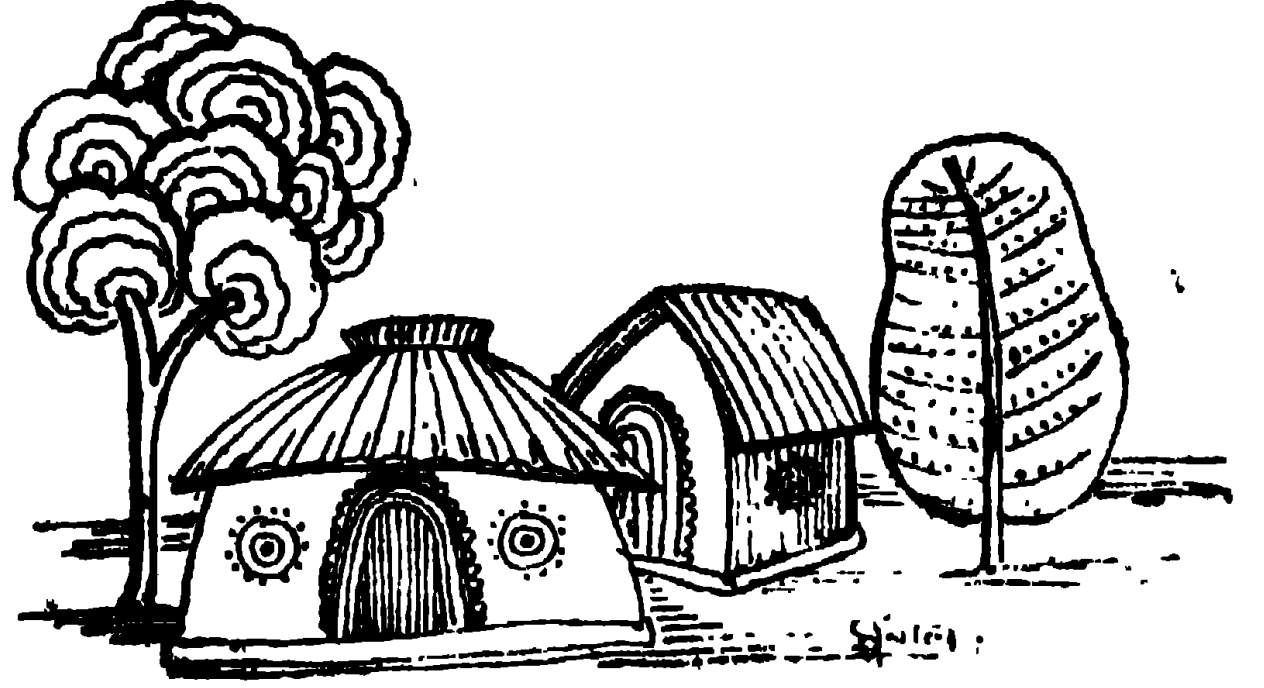
O বিবাহ কবির সততাকে নষ্ট করে

এক পেট খিদে নিয়ে বসে
আছে সংসার।
কবি-সত্তা কবেই মরেছে তার!
জানালার পাশে দাঁড়িয়ে
আত্মকেন্দ্রিক স্বামীটি—কবিতার
সাথে দীর্ঘ লড়াই যার;
বুকের মধ্যে দেড় বছরের
শিশু সন্তান কেঁদে ওঠে;
এক ফোঁটা দুধও নেই আর।

এই সব দেখে শুনে
এক অকাল বৃদ্ধ যুবা বল্লে—
বিবাহ কবিকে, কবির সততাকে
নষ্ট করে; তখন
স্বামী, প্রকৃতি আর সন্তানই
কবিতা হয়।
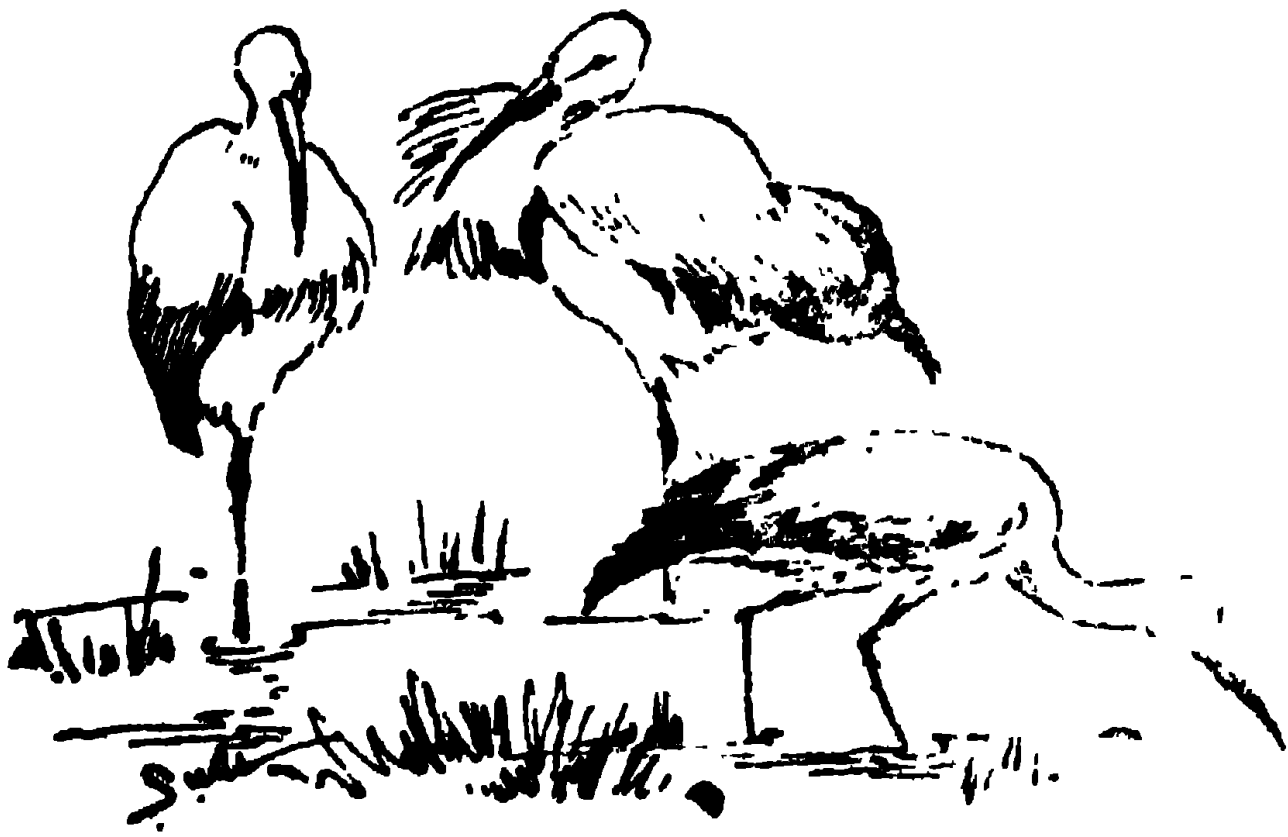
O একটা কামরাঙা ফুল দেব

ব্যবহারিক হোয়ো না তুমি,
দূরেই থাকো ;
প্রত্যেক রাতে আমি তোমাকে
একটা করে
সুন্দর ছবি উপহার দেব,
একটা কামরাঙা ফুল ।
অশ্রু-জলে স্নান করে
তোমার কথা ভাবব আমি,
স্বপ্নে তোমায় একলা দেখে
ভীষণ অবাক হব ।

তুমি দূরেই থাকো ।

প্রাত্যহিক সম্পর্কে মাধুর্য নেই
কোনো ।

() প্রিয়জনের শবদেহ নিয়ে

কেন দুহাতে সরাও সুখ
ভগ্নপ্রায় এ'হৃদয় থেকে ?
করতলে প্রাপ্ত সময়
বেয়ে চলে শরীরে, হৃদয়ে ।
বিষণ্ণ প্রতিমা বসে থাকে
দেহে অস্থি-মাংস-মজ্জা নিয়ে ।

সম্মুখ চিতায় ঘি, কাঠ
ইত্যাকার উপকরণে
শব একটি অত্যন্ত প্রিয় ।

আশি দশকের তিন কবির চিত্রকল্প

নাসের হোসেন

আমরা জানি সত্তর দশকে আবির্ভূত হয়েছিল বেশ কিছু ধাতববাহু তরুণ কবি। যে কোন সংস্কার তাদের সামনে চুর চুর ভেঙে পড়তো। অজস্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির রঙিন রিবন আমাদের চেতনায় মুহুর্মুহু আঘাত করতো, হতবিহ্বল করে তুলতো। যদিও একথা সত্যি গুটিকয় ছাড়া সত্তরের বাকি সব কবিই কি এক অজ্ঞাত কারণে আজ স্বল্পপ্রসূ বা স্তব্ধবাক। শিল্পের ইতিহাস অবশ্য এটাই। তিটি দশকের প্রারম্ভে বেশ কিছু সপ্ততরুণ শক্তিমান কবি আবির্ভূত হয়ে বাংলা কবিতার শরীরে তাদের তারুণ্যকে সঞ্চার করে দেয়। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, সত্তরের কবিদের সম্মিলিত কোরাস সম্ভবত সাতাত্তরেই পৌঁছে গিয়েছিল আপন মহিমায় চরম বিন্দুতে। এরপর পাঠকের জন্য পড়ে ছিল একমাত্র কাজ— আশি দশকের জন্য অপেক্ষা করা। বস্তুত ঘটল সেটাই অবিশ্বাস্যভাবে আশি নিজস্ব গতিতে নিয়ে এলো আবার বেশ কিছু শক্তিমান তরুণ কবিকে। বাংলা সাহিত্যে এরা প্রত্যেকেই নিজেদেরকে কত বিচিত্রভাবে মেলে দিতে থাকলো। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, সত্তরের কবিতার সুর থেকে আশির কবিতার সুর কি অদ্ভুতভাবেই না পাল্টে যাচ্ছে। রক্ত ফুটছে সত্তরের মতোই, হয়তো বা তার থেকেও বেশী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা রাখা হচ্ছে যথেষ্ট গোপন। যেন ভিতরে ভিতরে ছুটে যাচ্ছে তীক্ষ্ণ তীর ও গভীরতম এক অনুসন্ধান।

এই মুহূর্তে আশির কবিতার ল্যাবরেটরীতে অনেক কৃতি কবি গবেষণারত। এদের অনেকের কবিতা আমাকে আকৃষ্ট করে, মনের মধ্যে সৃষ্টি করে আনন্দবেদনার গভীর সঞ্চার। আলোচনার খাতিরে আমাকে বেছে দেওয়া হয়েছে তিনজন কবির তিনখানা বই নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সোফিওর রহমান ও মল্লিকা সেনগুপ্তর বইগুলি যথাক্রমে 'যাওয়া নেই ফেরা নেই', 'মুহূর্তের মানচিত্র' ও 'চল্লিশ চাঁদের আয়ু'। বিষয় : চিত্রকল্প।

চিত্রকল্প (Poetic image) হলো Sensucus picture in word—যার সঙ্গে ফিল্মি ভিসুয়াল দৃশ্যের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। চলন্ত, স্থির খণ্ডিত, বিস্তৃত যে কোন রূপেই মূর্ত হয়ে ওঠে এক একটি চিত্রকল্প অর্থাৎ এটি হচ্ছে এক একটি রূপরীতি বা প্যাটার্ণ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে কবির মানস ভূমগুলের জটিল অভিজ্ঞতা ও কল্পনা। প্রতিটি সার্থক চিত্রকল্পে একটি সুদূরপ্রসারী অভিজ্ঞতা ও আবেগ সংহত বাণীরূপ পরিগ্রহ করে। এবং একটি অনিবার্য তির্যকতা। এজরা পাউণ্ড : An image is that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time. হিউম বলেন, intensive manifold. সংহত বাণীমূর্তি তো বটেই, তার সঙ্গে যুক্ত থাকে চিত্রকল্পের সংলগ্নতার বিবরটিও। এলিয়ট যেমন বলেছেন : The reader has to allow the image to fall into his

memory successively without questioning the reasonableness of each at the moment, so that, at the end, a total effect is produced. চিত্রকল্পগুলির সংলগ্নতার মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে কবিতাটির সমগ্রতা। সুতরাং একটি কবিতার সব কটি চিত্রকল্পই যে যুক্তিযুক্ত হবে এমন কোন কথা নেই। কেননা এই সংলগ্নতাটি সম্পূর্ণ আবেগনির্ভর এবং এর সঙ্গে বুদ্ধিশাসিত কার্যকারণ প্রক্রিয়ার তেমন কোন সমর্থন নেই। আবার এমনও হতে পারে, সমগ্র কবিতাটি নিজেই একটি চিত্রকল্প। ডে লিউইস : An epithet, a metaphor, a simile may create an image. বহুপঠিত 'পাখীর নীড়ের মতো চোখ' এই উপমা ও চিত্রকল্পটিকেই ধরা যাক।

দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য —অলংকারের এই ঠুনকো বিচারে স্পষ্ট হয় না অসাধারণ চিত্রকল্পটির অন্তর্নিহিত সুবিস্তৃত জটিল অভিজ্ঞতা: দিশেহারা নাবিকের মতো দীর্ঘ পথ ভেঙে আসার যে ক্লান্তি, তা কবি মুছে ফেলতে চাইছেন পাখীর নীড়ের মতো শান্তির আশ্রয়ে। এভাবেই অভিজ্ঞতাজাত ভাষা ঘনীভূত হতে হতে জন্ম লাভ করে সত্যিকারের চিত্রকল্প।

কোন চিত্রকল্পে অভিজ্ঞতা যখন পায় অনিবার্যতা, তখনই তা হয়ে ওঠে বলিষ্ঠ। আর অভিজ্ঞতা ও প্রকাশভঙ্গির নতুনত্বই একজন কবির স্বকীয়তা প্রমান করে। আলোচ্য তিন কবি তাঁদের চিত্রকল্পের মধ্যে এই অনিবার্যতা, বলিষ্ঠতা ও স্বকীয়তার দাবী নিজ নিজ সাধ্যমতো ফোটাবার চেষ্টা করেছেন। বস্তুত কবিতা রচনা এক মারাত্মক খেলা। আর খেলা যখন, সফলতা অসফলতা নিত্যসঙ্গী এর। হাওয়েজ্ঞার, এগুনো যাক। তন্ন তন্ন করে দেখা যাক আশি দশকের কবিদের হৃৎপিণ্ড ও শিরাবিন্যাস।

১, নীলাঞ্জন বেশ কিছু কবিতায় যেভাবে চিত্রকল্পে কাব্যিক গূঢ়ধর্মের কাছে পৌঁছে দেন, তা সত্যিই স্মরণযোগ্য। আপাত দৃষ্টিতে তাঁর কবিতা হয়তো বড় বেশী সরল ও বিবৃতিমূলক। তবু এরই মধ্যে বিভিন্ন স্তরে সজ্জিত রাখেন আধুনিক জটিলতার গূঢ় আয়োজন। এককে সময় মনে হয়, তিনি বোধহয় ইচ্ছে করেই প্রথানুসারী। কে জানে, অন্যান্য সমকালীন কবিদের আঙ্গিক নিয়ে ভাঙচোর তথা পরীক্ষা নিরীক্ষা তাঁর কাছে হঠকারিতা মনে হয় কিনা। বস্তুত আধুনিক কবিতার শব্দচাতুরী নির্ভর কসরতের কাছ থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে তিনি সৃষ্টি করেন অত্যন্ত কাব্যময় সব কবিতা। এতটা কাব্যময়তা বোধ হয় এ যুগে বেমানান। অথচ প্রকৃত দৃষ্টিপাতে বোঝা যায় তিনি তাঁর কালকে এড়িয়ে কোন কথা বলতে চান না। প্রথার ছদ্ম আবরণের মধ্যে লুকিয়ে থাকে এই সময়ের বিষতীর, চূর্ণ বিষাদ ও শ্বাসরোধী পরিমণ্ডল। কখনও কখনও চেপে বসছে অসহ ক্লান্তিভার। বারংবার পরাজিত আত্মার নতুনভাবে যুদ্ধ ঘোষণার ইঙ্গিত। প্রেম প্রেমহীনতা বিশ্বাস বিশ্বাসহীনতার দোলাচল। সেই কষ্ট তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ, ক্রুর বাস্তব। একের পর এক ছিন্নবিচ্ছিন্ন ইমেজ সৃষ্টি করে কবিতার শরীরকে অদ্ভুত সুষমায় ভরিয়ে তুলতে পারেন নীলাঞ্জন।

নীলাঞ্জন তাঁর কবিতার মধ্যে এই রক্তাক্ত সময়ের সৎ প্রতিফলন ধরে রাখেন এইভাবে—

কী অঙ্গীকার জানো যৌবন বিপন্ন বিদ্রোহে ?
নন্দিনী তোর সোনার ফসল লুটে নেয় তস্করে

(আজ দ'লে যাই)

জীবনের সমস্ত গ্লানি-উৎক্ষেপ, ঢেউ ও সর্বগ্রাসী অতল টানকে সরাসরি উঠিয়ে আনেন অনুভবে। দুর্বিষহ বার্ধক্যে ভরে যাচ্ছে এই পৃথিবী, এই দেশ।

যেন দেখে নিই রূপোলী বয়স কোন্ দূর যুগে,
টুটা ফুটা মাটি, খরা
আমার শরীরে আরোপিত তারই জরা
(এত শীতকাল)

তীব্র অন্তর্মুখী, বেদনাদীর্ণ ও উদাসীন সমকালকে ফুটিয়ে তোলেন সুন্দর বিন্যাসে—

ভেঙে যায় যুবা ঢেউ, কাঠ ফাটে, ওড়ে ছাই,
হা হা করে চিতা (দেখে যাই সর্বনাশ)

এই মুখোশ সভ্যতায় কাঙ্খিত নারীর প্রেম কতটুকুই বা নিকষিত হেম? কিংবা কী সেই ক্ষণিক সুখের পরম প্রাপ্তি?

যোনির চিহ্ন কখন হবে চোখ
চিনব জীবন অন্ধ করা অগণ্য নির্মোক
(ও দামোদর)

প্রেমের সঙ্গে গুপ্ত থাকে রণহিংসার করাল লাল, পুনরাবর্তন, বোরডম, ক্লান্তি। শেষপর্যন্ত এই। ভাবপ্রবণ বিধুর যৌবন গেয়ে ওঠে ভালবাসার গান।

নীল অহংকারে আজ কবিতা প্রয়োগ করি
প্রাত্যহিক কাজে
জেনে গেছি, পৌরুষে মহিমা আনে চরিত্রের
ক্ষণিক বিচ্যুতি—
কত মেয়ে কাছে এল, যোনি ছেনে প্রেম শিখি,
ঠোঁটে দিই চুমো
দেহ পুড়ে ছাই হল, অশরীর ও প্রতিমা, আজ
তুই ঘুমো (এত যদি ঘৃণা)

তবুও যৌনতার শ্রেষ্ঠ অধিকারের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় মৃত্যুর আস্বাদ। বিকল্পে শান্তি। প্রশ্ন অবশ্য এখানেই থেমে থাকে না—আরো গভীরে নেমে যাওয়ার ইচ্ছা তাঁর।

অন্ধকারের গন্ধে মাতাল, দ্বন্দ্বে দেহের নৃত্য
শরীর ছেনে উপচে পড়ে মৃত্যু—এই কি পরমায়ু?
(দ্বন্দ্ব)

বেজে ওঠে দামামা, রক্তক্ষয়ী জীবনের রঙ্গমঞ্চে
জেগে ওঠে শূকরের তুমুল আর্তনাদ—
কেমন তামাসা দ্যাখো, আমরা যাব বলে আজ
পার্ক স্ট্রীটে কত বাজনা বাজে
শূল-বেঁধানো শুয়োরের আর্তনাদে ভয়ে যায় এ
যৌবন ভারতের বিংশ শতাব্দীর (কী দিদি)

অনাবিল সহজ সরল জীবন থেকে যেন আকস্মিকভাবেই তিনি পতিত হয়েছেন আজকের প্রতিকূল পরিবেশে। অদ্ভুত নস্টালজিয়ার বশবর্তী হয়ে স্বপ্নে দেখতে থাকেন কৈশোরের সবুজ ঘাসবন।

রৌদ্রের দারুণ শব্দে সবুজ প্রান্তর ফুঁড়ে ছুটে যায়
কৈশোরের ট্রেণ (দেহ)

বা

কোদালে কোপানো মেঘ, ওখানেই এ জীবন মিশে
যাবে, জানি
হাত ধরে ডেকে নেবে সেই বন্ধু, সর্বত্র ছড়ানো যার
পুরনো পোশাক (বালির ঘর)

বস্তুত তাঁর জন্য কেউ নেই অপেক্ষায়। কারুর জন্যই নেই। তবুও নিজস্ব বিশ্বাসে লেটার বক্স প্রতীক্ষা করে আকাঙ্খিত কারুর জন্য। ওয়েটিং ফর দ্য গোডো'র মতো চরম অ্যাবসার্ডিটি ক্রমশ আমাদের গ্রাস করে।

চিঠির বাক্সে হাসছে শুধুই শুকনো কাঠের রঙ
(ও দামোদর)

২. সোফিওরের অধিকাংশ কবিতায় আবেগ পরিস্রুত ও পরিমিত হয়ে অনিবার্য সংহতি ও সাফল্য লাভ করে। একটা আলাদা expression সৃষ্টি হয় নিবিষ্ট এষণায়। এই শক্তিমান কবির হস্তগত একটি বিশিষ্ট প্রকাশ শৈলী, ভিন্ন ভিকসন। সাধারণ আটপৌরে শব্দও তাঁর হাতে পায় চলমান জৌলুস। কয়েকটি ঐশ্বর্যময় নতুন শব্দসঙ্গের উল্লেখ না করলেই নয়—ত্রুপদী মেধায় ছুটন্ত রেণু, গৌরাসনের চাঁদ,

ভেজা বুকের ডানায়, ক্রান্তদর্শী গোলকের হাসি ইত্যাদি। এসবই চিত্ররচনায় তাঁর তীব্র ক্ষমতাকে প্রতিপন্ন করে। তাঁর কবিতার গভীরতার পেছনে রয়েছে উপযুক্ত শব্দের নির্বাচন ও প্রয়োগ কুশলতা। বস্তুত হৃদয়ের এক গভীর গোপন জায়গা থেকে উৎসারিত হয়ে আসে তাঁর কবিতা ও চিত্রকল্প। শিল্পপ্রতিমার নরম কুয়াশা ভেদ করে বের হয়ে আসে অনুভূতির বিভিন্ন বর্ণ দ্যুতিপ্রভ আলো এই উৎসারণের মধ্যে প্রায়শই পাওয়া যায় নিটোল ও পরিপূর্ণ কবিতার বোধের ব্রহ্মাস্বাদ। হাঁ ব্রহ্মাস্বাদ। কবি সোফিওরের কবিতায় তীব্র শুভবোধ ও সৌন্দর্য তৃষ্ণায় আমূল আন্দোলিত অনাস্বাদিত এক প্রেমের ঘরানা।

সোফিওরের কবিতায় মুহূর্ত বড় সীমাহীন। অবাধ বিস্ফারিত মহাকালের গভীর অন্ধকার বিবরে তলিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে তাঁর অস্ত্র—প্রেম ও কবিতা। জীবন ও মৃত্যুর মুখে চুমু খেয়ে উঠে দাঁড়ায় অমৃতের সন্তান।

বুকের পাটাতন ভেঙে যে যুবক উঠে দাঁড়ালো আজ
আ-লোম অন্তবর্তী ফল্গুতে তার সন্ প্রত্যয় জ্ঞা
ধাতুর কাজ (শব্দের পিপাসা) কিন্তু সংশয় থাকেই।
সতর্ক অনুভবে ধরা পড়ে যায় আসন্ন পরাভব।
জীবনের তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে মৃত্যুর কিনারায়
পৌঁছে যাওয়ার রহস্য।

মুহূর্তের নেই কোন ঘর, সতর্ক অনুভব; হয়তো
একদিন বিধ্বংসী বিমানের
ছবি, আর পোড়ানো বীজধানের শয্যায় দগ্ধ-জীবিত
কবি (মুহূর্তের মানচিত্র--২)

আসলে সেটিও আর একটি মুহূর্ত। মুহূর্তের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে মুহূর্তের শব, বিবর্তনের তীক্ষ্ণসুন্দর দ্যোতনা।

প্রতি জানালায় জেগে আছে বিবর্তনবাদ
আধুনিক আকাশের ফুসফুস (মুহূর্তের আমি)

এবং প্রথম ও শেষপর্যন্ত প্রেম। প্রেমের মধ্যে ডুব দিয়ে যাই দিয়ে জীবনকে অনুভব করা।

নিতম্ব অতিক্রান্ত তার চুলের ঘ্রাণ নিতে
নিতে বুঝি—
মহাসমুদ্রের তল, ঝিনুকের দেশ, ডুবুরীর তীর্থ
(তামসিক ডাইরী থেকে-১)

এই প্রেমময় আনন্দ একটি সামুদ্রিক উচ্ছ্বাসের মতো প্লাবিত করে প্লাবিত করে, নষ্ট করে না।

সাদা ফেনার মুকুট মাথায়
এক হুল্লোড়ে মানুষ
মাঝ সমুদ্রের নীলে কেবলি ভাসছে।
(জীবন্ত প্রতিক্রিয়ার মুকুট)

তবুও যন্ত্রণা। মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে নেমে আসে
সীমাহীন স্তব্ধতা।

আর এক পা এগিয়ে দেখি
অতীব নিবিষ্ট নিটোল
নির্বিকল্প অন্তিম এক চাহনি
যন্ত্রণায় নদীর ঢেউ শিকল হয়ে গেছে
(বিকেল ৫টা, ১৫ই আগষ্ট : ১৯৮৩)

কখনো বা পিছুফেরা। অবিরাম হন্ট করে
শৈশবের স্মৃতি—
কিংবা আগুনের টুকরো থেকে সিঁদুর রঙা সকাল
বিকেলে আমারই শৈশব
হরিৎ শস্যের ক্ষেতজুড়ে যায় দুরন্ত ঢেউ
আল্লাহ্‌র সমান অবিরাম প্রতিধ্বনি……
(কোন পুণ্য নেই বলে)

অন্বেষণ আর অন্বেষণ। সুদূর অসীম ভেঙে এগিয়ে
চলা চরৈবেতি।

জ্যোৎস্না কি বন্দী হ'য়েছে মুঠোয় ? স্নিগ্ধ সৌর্য—
সোমতীর্থকে না ? কামা মুহূর্তের লোভে আরো
পথ হাঁটি

স্নায়ুর বেলাভূমিতে নিজের ওকালতনামা…
(আরো পথ হাঁটি)

এক অপরূপ দক্ষতায় কবি বের করে আনেন বেঁচে
থাকার অর্থ ও উপলব্ধি—

এই জেগে থাকা মানে অন্ন ও আনন্দের
চলমান জৌলুস

প্রেম-ভ্রূণ-রক্ত-শরীর এভাবেই ক্ষয়ে যাক
পাওয়ার অনুক্রম
(অমৃতের চাবুক যার বুক ভেঙেছে)

মুহূর্তের মধ্যে মুহূর্তের জন্ম। একদিন প্রতিদিন। প্রেম ও জীবন সম্পর্কিত এক চিরন্তন আবহে মুখর হয়ে থাকে কবি সোফিওরের এই অসাধারণ চিত্রটি। যা একটি সম্পূর্ণ কবিতা এবং চিত্রকল্পও।

ভেজা কৃষ্ণচূড়ায় এখন মুখোমুখি দুটি পাখি
আত্মার ওষ্ঠ থেকে চেতনার স্ফুরণের রাখী
নিবিড় উৎসে প্রেমবাহ জিহ্বা,

ভেজা বৃক্ষের ডালায় জুড়ে হলুদ সুখের পর্যটন
ত্রুপদী মেধার ছুটন্ত রেণু—আনন্দ সন্তরণ
সমস্ত জাগতিক দ্বন্দ্বে আজ ঐ পাখীদের অনীহা।
(সুন্দর যেখানে-২)

কী ভীষণ স্তব্ধ মুহূর্তে পাঠককে হণ্ট করে সোফিওরের কবিতা। পাঠককে ভাবতে বাধ্য করেন তিনি। এখানেই সোফিওরের সার্থকতা।

৩. বাংলা কবিতায় ইমেজিস্ট আন্দোলন বলতে যদি কিছু থাকে তবে তার শুরু জীবনানন্দে। টুকরো টুকরো চিত্রকল্পে বিভিন্ন মানস অভিজ্ঞতার পরিস্ফুটন, যা পাঠকালীন পাঠক অনুভব করেন অলৌকিক শিহরণ। পাঠকের অনুভূতির স্তরগুলি আস্তে আস্তে খুলে যায়, হয়ে ওঠে চিত্রকল্পের সূত্রে সম্পৃক্ত। শক্তিময়ী কবি মল্লিকার কবিতার মধ্যে সর্বদা সার্থক না হলেও, এই ধারার স্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কবিতায় স্থান কালের সীমা গুঁড়িয়ে একই সঙ্গে অসংখ্য চিত্রকল্প গজিয়ে ওঠে। সে সব কিছুর মধ্যে মূল একটা সম্পর্ক বা কেন্দ্রীয় বোধ কাজ করে। বস্তুতপক্ষে কবি মল্লিকার মানস অভিজ্ঞতার বৈচিত্র খুবই বিস্ময়কর। সেকালের রাবণ, নীরো, ভেনাস, নেফরতিতি, হার্মাদ, খোজা উমরাও থেকে শুরু করে একালের হিটলার, সুহৃন, ববি স্যাণ্ডস অবধি তাঁর অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি। তেমনি কুরুক্ষেত্র থেকে হিরোশিমা। তাছাড়া আদিম লোকাচার যেমন ডাকিনী বিদ্যা মন্ত্রতন্ত্রের উদ্ভিকুদ্ধি এসবও উঁকি দেয়—উল্কি আঁকা হাতে শিঙা, কাঠের মুখোশ, মাদল, জড়িবুটি, পাথরের বিদ্যা, কালো পাথরের স্তর, টনটনে ব্যথাতুর স্তনে নতুন ধাতব খণ্ড, ভাসানের নাচে মাতোয়ারা নগ্ন দেবদাসী, গঙ্গামাটি ছেনে ছেনে দেবতার লিঙ্গ নাড়াচাড়া। ভীড় করেছে ভীতিপ্রদ প্রতীক ও অনুষঙ্গ— ভ্যাম্পায়ার, করোটি, টোটেম দেবতা, পিরামিড, সুড়ঙ্গ, বর্ণহীন মমি, শঙ্খচূড়, শকুনের ডানা, শিকারী ঈগল, কালো চুল শিকড়ের মতো, অসাড় গোঁড়ালি ফেটে পুঁজ রক্ত, ফণীমনসার রোঁয়া ওঠা শরীর। আছে মনোরম অনুভূতি ও একঘেয়ে দিবসযাপন—এলাচের গন্ধ, গমের মন্থর গন্ধ, রাজপথে হেঁকে যায় শিলকোটাঅলা। দারিদ্রক্লিষ্ট জীবনের ছবি—হাটে ডিম চুরি করা মেয়েটি, ঠোঙা ভরা সেঁকো বিষ, ঘর ভরা সন্তানের ক্ষুধা। পাঠকের বোধশক্তি হতচকিত করে মল্লিকার চিত্রকল্পে ঝাঁপ দেয় অদ্ভুত শিল আর বোমারু বিমান।

মল্লিকার চিত্রকল্পে পীড়িত মানবাত্মা আত্মোন্মোচনের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। এক মারাত্মক ক্ষর দীপ্তিমান হয়ে ওঠে শিরায় শিরায়, বোধে। প্রিয় পরিচিত জগৎ তখন এলোমেলো।

ব্লেড ছিলো ডান হাতে, কাজল পরছি ভেবে
আশ্লেষের ঝোঁকে
চালিয়ে দিয়েছি। অতো রক্ত ছিলো ওইটুকু চোখে
ব্যালেরিনা (রবার, রবার)

কিছু ছবি যেন আঁকা। কবিতার মধ্যে চিত্রকলার সাহায্য নিয়ে তৈরী হয় অসামান্য চিত্রকল্প।

ক্রমশ : মানুষ ডোবা জলে স্তব্ধ সন্ধ্যা নেমে এলো
ক্রমশ : পুরোনো ঘোলাটে একটা চোখের আভাস--
সেই চোখ যার চারিদিকে বহুবার পেনসিল
আঁচর কেটেছে (নীরোর বেহালা)

বা

কাদের বাড়ির ঝোপ ভেসে ভেসে যায় ঘোলাজলে
প্যান্টেলে আভাসটানা একদল যুবকের হাত
সাঁকোর ওপরে স্থির ('৬৮, জলপাইগুড়ি)

একালের আঙিনায় আদিম লোকাচারের স্বপ্নময় পদচারণ মল্লিকার একটি বলিষ্ঠ বিষয়।

জুড়িবুটি পাথরের বিদ্যা শুরু হলো,
গাড়ীবারান্দার শানে
প্রহর ঘোষণা করা হবে লোহার ঘণ্টায়।
অন্য কোন ধাতু
নেই সভ্যতার, মেষপালকের কোন ঘ্রাণ লাগে
না ইন্দ্রিয়ে (মুনস্টোন)

বা

কালো পাথরের স্তব, ভাসানের
নাচে মাতোয়ারা নগ্ন দেবদাসী, ওর টনটনে ব্যথাতুর
স্তনে নতুন ধাতব খণ্ড, পুজোর আঙিনা
ঘেরা টিন দিয়ে (মুনস্টোন)

এবং অবশ্যই প্রেম চেতনা। আহা সহেনা যাতনা।

মাথার শিরায় দপ দপ এক জোয়ানের তসবীর
(মধুমাস)

বা

এবার শ্রাবণ ছাড়েনি আমার
রেশম বস্ত্রের নিচে লাল ফুলে ওঠা স্তন, দগদগে,
অনুভূতিহীন
প্রগাঢ় শিমুল
কচি দূর্বা থেতো করে প্রলেপ লাগাই
গোপন খাইচ চলে রক্তে ও রতিতে (মধুমাস)
টাইম ও স্পেসকে মুহূর্তেই ভেঙে ফেলে বাদশাহী
স্মৃতির মোড়ক খুলে যায় অবলীলাক্রমে।
ফোয়ারা বৃত্তি ঝাপটে চুর থাকে নগ্ন রমনীরা
খোজা উমরাও
জানুসন্ধি আঁকড়িয়ে বসে পড়ে, হায় খোদাতালা
(মধুমাস)

কিংবা সুদূর মিশর বা রহস্যময় কোন গুহাকন্দরের চিত্রকল্পে নির্বাসিত জীবনের প্রতিচ্ছবি। আমাদের অবচেতন জগতের আতংক, ভয় ও অসহায়তাকে প্রতিষ্ঠিত করে দেন চোখের সামনে।

এসব যন্ত্রনা
তবু শুনে ফেলি, ঢিল ছুঁড়ে ওদের মুকুর ভেঙে
দিই, আর
ভাঙা কাচ পাহাড়ের থেকে একটা একটা করে
গেলো ঝরে
ওপরে আকাশ, উড়ে গেলো ভ্যাম্পায়ার নিচে
স্তব্ধ পিরামিড। (স্তব্ধ পিরামিড) মল্লিকার চিত্রকল্পে একই সঙ্গে ফুটে ওঠে উষ্ণতা ও শৈত্য, শূন্যতা ও বস্তুপুঞ্জের পারস্পারিক বিরুদ্ধতার প্রতিভাস। এভাবেই তিনি উঠে যান সুররিয়ালিষ্ট মহাকাশের তুঙ্গে—যেখান থেকে ঝরে পড়ে চুল, মেদ, ক্ষুধা, এবং অনিশ্বাস্যভাবে অদৃশ্য হয়ে যান অই সাব্‌কনসাস পর্বতের পেছনেই।

শিকারী ঈগল মাংসখণ্ড ভেবে ঠোঁটে তুলে
নিলো মল্লিকাকে
তখন অঘ্রাণ, বিন্ধ্য পাহাড়ের ঘাসে মোড়া
ক্যাবিনেট জুড়ে
ক্রমশ : নামছে শীত। (স্বীয় ঘোটকীর গন্ধে)

কোন সময়ে অবস্থান করে সেই সময়কে সম্পূর্ণরূপে বিচার করা কখনই সম্ভব নয়। আশির কবিদের চিত্রকল্পের আলোচনার মধ্যেও এই সীমাবদ্ধতা রয়েছে। একমাত্র আগামীকালই এর সঠিক বিচার করবে। বস্তুত কবিতা লিখতে লিখতেই একজন কবি তাঁর কবিতার কলাকৃতি ও গঠনের রূপান্তর ঘটান, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উচ্চারণবিধির। বাঁধা ছন্দে না বাকছন্দে—কবিতা কিসে রচিত হবে এই বিতর্ক এখনও শেষ হয়ে যায়নি। এটা ঠিক, বাংলা ছন্দের বিবর্তনে ক্রমশ স্বাভাবিক উচ্চারণের দিকেই আকর্ষণ বেড়েছে। আশার কথা, কবিতার ছন্দ, শব্দ ও উপস্থাপনের চর্চায় আজকের কবিরা অনেক বেশী যত্নবান। এই গদ্যরচনার মাধ্যমে আর কিছু না হোক, আশি দশকের কবির কবিতায় বিষয়গত তিনটি লক্ষণের দেখা পেয়েছি—আধুনিক সমাজের রক্তাক্ত বীক্ষণ, প্রেমময় অনুভূতির নতুন প্রকাশ ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য তৃষ্ণা। একদা আশি দশকের অপর একজন ক্ষমতাবান কবি মনীশ সিংহ রায় এই দশককে চিহ্নিত করেছিলেন 'সত্যানুসন্ধানের দশক' বলে। আলোচিত তিন কবি নীলাঞ্জন, সোফিওর ও মল্লিকার চিত্রকল্পের মধ্যে সেই সত্যানুসন্ধানের অভিজ্ঞতাকে অনুভব করে অলৌকিক শিহরণে জারিত হই। কেঁপে উঠি।

কবিতা

মুখ/শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

একটিমাত্র মুখ। সমস্ত দিন। দীর্ঘ পদযাত্রার সম্মুখে।
আর সেই মুখটিকে ফরাসী সুগন্ধের মধ্যে
সযত্নে সাজিয়ে রাখব বলে বেছে নিয়েছি
অক্টোবরের একটি শ্রেষ্ঠ সকাল।
সর্বব্যাপ্ত উদার নীলের মধ্যে উজ্জ্বল আলোকবিন্দুর মত
ভাসবে সেই মুখ।

এ মুখটি তোমার নয়। অথবা তোমারই। এবং আমি
কিম্বা অন্য একজন আমি। অন্য এক মুহূর্তের শ্রীধর
তোমার ভালবাসাহীন প্রেমের গোলাপি আলোয় বসে
তোমার অজানা শিকড় খুঁজবে।

একটিমাত্র মুখ।
রক্তস্রোতের মধ্যে সপ্তডিঙা ভাসিয়ে গৌমুখের
দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।
তাকে প্রলুব্ধ কোরে চিরস্থায়ী ক্যানভাসে বন্দী
করবার মত একটিও বন্দর আজ
আর অবশিষ্ট নেই আমার।

উৎসর্গ/হরপ্রসাদ সাহু

সুগন্ধি অস্থিভস্ম নাও, রক্তজল, অরণি পিপাসা…
এবং চন্দ্রকোষ রাগের ব্যথার বেদধ্বনি,
বোধের মন্দির থেকে নীতি ও নিয়ম ভাঙো, উন্মোচিত করো
প্রথম সূর্যের মতো সোনার প্রতিমা, ধ্যানের তোমাকে
আর ওকে মাখিয়ে দাও নষ্ট যুবকের এইসব পার্থিব সোহাগ
দোল পূর্ণিমায় আজ যেমন রঙে ও ঋতুতে মেতেছে সবাই।

ধুলো আবর্তে আছি, ভীষণ একাকী, শুধু –
রঞ্জন রশ্মির মতো তীক্ষ্ণহিম তোমার দুচোখ
আমাকে যেন সহস্রকাল বেঁচে থাকার মন্ত্র দেয় এখন,
আর কাঁচের স্বগত শপথ শূন্যের বিন্দুতে বসে হাসে,
ও নীল আঁচল ভেবে আমি ঝাঁপ দিই প্রতিদিন অ্যাসিড শিখায়
সোনামুখী, তাই নিয়ে এসেছি আজ অস্থিভস্ম, রক্তজল, অরণি পিপাসা
মাখিয়ে দাও ওকে, ধ্যানের তোমাকে, এই উৎসব দুপুরে।

আমি জল/মল্লিকা সেনগুপ্ত

তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছিলে বলে
গলে গেছি, নদী হয়ে গেছি।

এখন আমার জলে ছায়া
নগ্নপুরুষের –কে, কে তুমি?

তোমার ঔরসগন্ধ ধুয়ে
দিই তরল শরীর নেড়ে

আর আমি মাতাল ঢেউ হয়ে
তোমার কোমরে মাথা কুটি

আমি যে অক্ষম, শরীরের
সব ছিদ্র বন্ধ হয়ে গেছে

তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছিলে বলে।

রাতকাপালিক তুমি এলে/তাপস চক্রবর্তী

মেঘের বন্যা টেনে কাঁচা রোদ উবু হয়ে পড়ে থাকে আমার উঠোনে
ঐ দূরে উঁকি মারে বনছায়া মাখা বেথুয়া ডহরীর জঙ্গল,
সতর্কিত পাতা; ভীরু নির্জনতা, নিথর মাটি থেকে ওড়ে বর্ণহীন বিষণ্ন ছাই
সারাটা উপত্যকা জুড়ে যেন অহল্যার ঘুমে ঘুমোয় ওরা
বিধ্বস্ত সময়ঃ নিঃশব্দে শরীরে পদচিহ্ন এঁকে যায়।

তবু ইচ্ছে করে স্পর্শ করি তোমায় ইমারতী নারী
যেখানে আজো বাঁধতে পারিনি একটা ছোট্ট নীড়,

বড় অসময়ে চোখের দোরগোড়াতে উঠে আসে
আহ্নিক দোরে রাতের রাতকাপালিক।

কবিতা লেখার আগে/জহর সেন মজুমদার

চোখ খুললে দেখতে পাই
দু-জন মানুষ যুদ্ধ করছে।
চোখ খুললে দেখতে পাই পাহাড়ের মাথায় ব'সে
পা নাচাচ্ছে দুই তরুণ প্রতিভাবান কবি।
চোখ খুললে দেখতে পাই
মা কাঁদছেন, আর বাবা চশমা মুছছেন।
চোখ খুললে দেখি দুই অন্ধ যুবতী
গান গাইছে। ট্রেন আসছে।
চোখ খুললে দেখি এক পাগোল দুই হাত উপরে তুলে
লিখছে শ্রেষ্ঠ কবিতা।
চোখ খুললে দেখতে পাই দুই গর্ভবতী বৌ
মন্থর রাত্রিকে অভিশাপ দিচ্ছে।
আমি কবিতা লিখতে পারি না। অথচ এইসব ছোটখাট দৃশ্য
আমাকে ক্রমাগত টানতে থাকে কবিতার ঘরের দিকে।

শব্দের কাড়াকাড়ি/সুকমল বসু

যেন শব্দের প্রকরণে মেতে আছি,
বহুদিন হ'লো। খণ্ডিত এক ডানা
আমার ঘরের ব্যাকরণ কেড়ো নিলো।
সে কি চেয়েছিলো আকাশের মতো জানা?

ঝুরিস্বপ্নের আত্মপ্রতিভা জেলে
কেউ বলে গেল প্রতিমার উপকথা।
ছবিবৃক্ষের সব রঙ কেড়ে নিয়ে
পড়ে থাকে তার ইতিহাস ব্যাকুলতা।

গভীর পাথরে রক্তের রেখা দিয়ে
আমরা বেঁধেছি সূর্য্যের গানগুলি।
কোনো স্রোতে সুর ভাঙবেনা কোনো ঝড়ে,
এইতো জীবন পরমেয় অঞ্জলি।

আমাদের ভালবাসা, ভালবাসা
জহরলাল বেরা

বিপুল প্রাচুর্যে তোমাকে দেখি
সম্ভোগে যাবো না ভেবে—
অপ্রকাশিত যে দৈনতা,
পরিমিতি বোধের অহমিকা কুসুম
তাই চেয়েছি দু'হাত পেতে।

আমাদের ভালবাসা, ভালবাসা
জীবনের প্রেক্ষাপট—
চতুর্দিকে নীবিড় অন্ধকার।
ক্রমশঃ ক্রমশঃ কালের ছায়া-ঘন…

ছোট্ট যৌবন/শুদ্ধসত্ত্ব গুহ

বেলা ছোট্ট হয়ে এসেছে যৌবনের মতন অনেকটা
কাঁক ডাকা রাত কনে দেখা সন্ধ্যা অন্তরকম
ঠিক নেই কোন কিছুর
ডাক পড়লে ছুটে হাঁটবো এগিয়ে
সাহিত্য সভা শেষ হলে
ভাবতে থাকি যাওয়ার সময় হয়েছে
না বলিনি তো ওদের—যাবো না কেন ডাকলে?
যেতে পারবো না একথা মনে স্থান পায়না
নিশ্চয়ই আমি যাব।

মায়া/নিরঞ্জন মিশ্র

নৃত্যের তালে তালে তুমি অন্তর্হিতা হ'লে
অন্য এক নৃত্যে—অভিনব অচেনা মুদ্রায়।
আর তুমি নৃত্যের কেউ নও। নর্তকীর-ও।
দর্শকের। না সঙ্গতকারীর।

তোমার পায়ের পাশে বিশাল সমুদ্র বিসর্পিল।
অন্ধকার অন্ধজনের। কম্পমান কম্পাস। দিঙমূঢ় নাবিক
তুমিতো সে নও। সে-ই তুমি।
এমন ভীষণা, অভূতপূর্বা ; অন্তর্মুখীন।

সে নও। বীজবোনা দিনের [illegible]কালীন।
বরগোদা গ্রাম থেকে এসেছি[illegible]
পায়ে হেঁটে। মাটি ছুঁয়ে। মমতার সহোদরা তুমি।

আমি কী সেই ? সে-ই কী আমি ?
কোন এক সূর্য ডোবা সন্ধ্যায়
তোমার পায়ে নিজের হাতে পরিয়ে দিয়েছি
এমন মায়াবী ঘুঙুর।
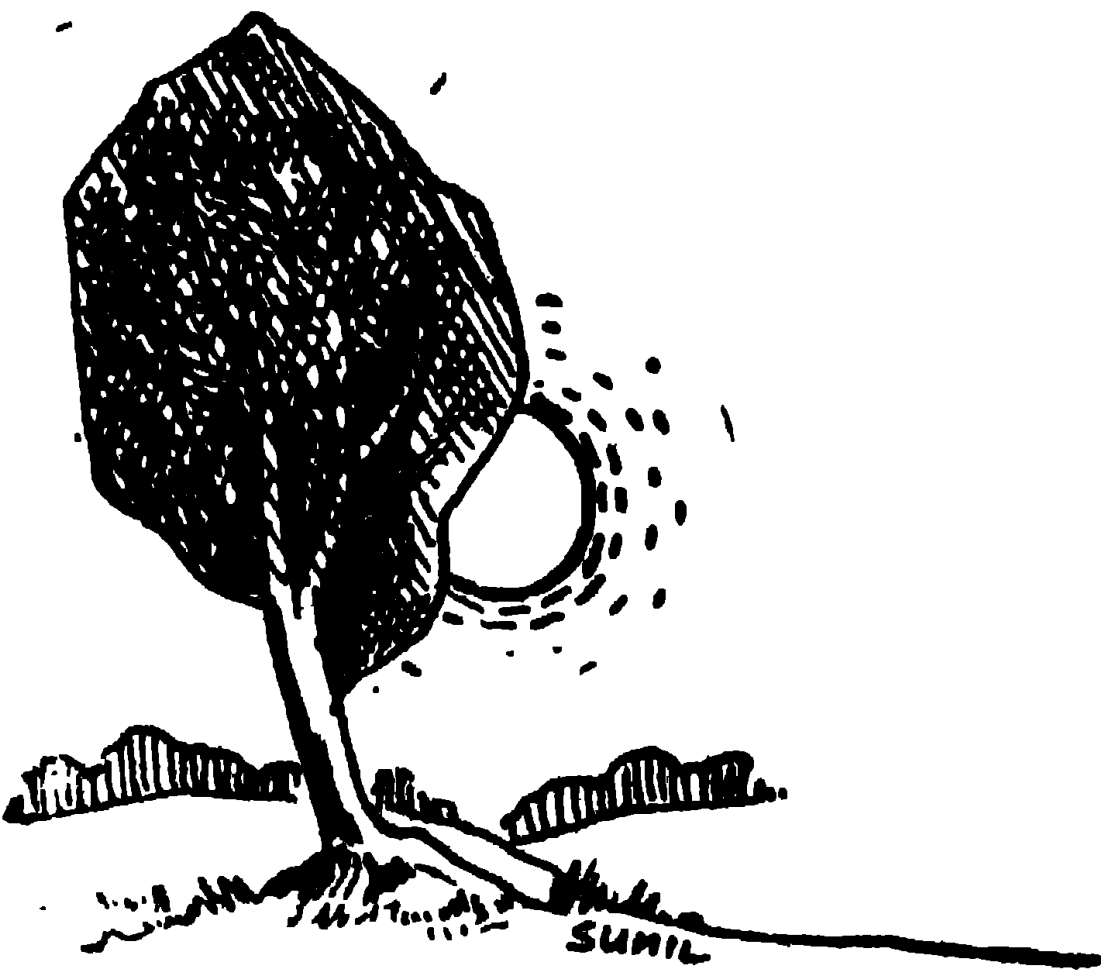
ব্যাধ/সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চোখেতে তার মগ্ন খাজুরাহ
বুকের মধ্যে নগ্ন হুলস্থুল।
স্বেচ্ছাচারী হাওয়ায় ওড়ে পাতা
স্রোতের টানে যেমন ভাসে ফুল।

দস্যি হাতে ভাঙছে নরম দেয়াল
করতলে এবার লুব্ধ পাখী।
জ্যোৎস্না ধীরে আলতো ফিকে
হতেই।
বেশ বোঝা যায় চোদ্দ আনাই
ফাঁকি।

কবিতা ইদানীং/রীণা চট্টোপাধ্যায়

ছিন্নমূল মানুষের মতো
অনিকেত শব্দের স্রোত
অবিরাম ভেসে ভেসে যায়।
ইদানীং এভাবেই
শব্দের শরীর নিয়ে খেলা
ভাসা ভাসা অল্প ছোঁওয়া-ছুঁয়ি
কবিতার সঙ্গে তাই
সেরকম মগ্ন সহবাস
এখনও হয়নি।

O এক্সিসটেনসিয়ালিষ্ট সংখ্যা পেলাম। লিটিল ম্যাগাজিনের Ex'stence-এর উষর মরুতে দাঁড়িয়ে আপনার কাগজ এখন রীতিমত পান্থপাদপ। সুশীলদার বাড়ীতে সাহিত্যবৈঠক ফেরত আমরা প্রথম এ সংখ্যা দেখলাম। দেখেই ভালো লেগেছিল। কাল বাড়ীতে পেলাম। ভারি ভালো লাগছে। প্রমোদ দা কাল আনন্দবাজারে 'গোধূলি-মন'-এর কথা বলছিলেন। বললেন, বোধহয় এই প্রাবন্ধিকের সঙ্গে আপনার মাধ্যমে যোগাযোগ করে এবারে প্রমোদদা খুব লাভবান হয়েছেন। ধানবাদের সঙ্গে চন্দননগর মারফৎ হাওড়ার নৈকট্য হল। এগুলো লিটিল ম্যাগাজিনের সৎ প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হয়, দূর হয় আপন, নিকট ইত্যাদি। তারপরে অবশ্য আমরা পূর্ণেন্দুদার কাছে গিয়েছিলাম। উনি আমার লেখায় Cutting এ্যালবাম এর ওপরে ছোট্ট একটা ছড়া লিখে দিলেন। 'প্রতিক্ষণ'-এ আপনি বোধহয় পাঠান না, না থাক এ সংখ্যার জন্যে আপনি বা অন্তরালের সমস্ত কলাকুশলীদের জন্যে রইল আমার শুভ কামনা। এইভাবেই কাগজ প্রতিটি পাঠকের প্রিয়জন-নিশ্বাস হয়ে উঠুক।

সৌমিত্র বন্দোপাধ্যায়
উলুবেড়িয়া, হাওড়া

O O O O

O অজিত রায়ের 'পুণশ্চ ক্ষুধিত প্রজন্ম : গেরো ফাঁসগেরো' লেখাটি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যকে বহুকাল পরে ঝাঁকুনি দিল। এমন নির্ভীক ও নিরপেক্ষ লেখা চোখে পড়ে না সচরাচর। আগের লেখাটি পড়িনি। পাঠালে কৃতজ্ঞ থাকবো। আমরা যারা H.G. সম্পর্কে ভাষাভাষা জানতুম অজিতবাবুর লেখাটি পড়ে সম্যক ধারণা হোল। যেভাবে একেক জনকে তিনি কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তা তো ইতিহাস। লেখককে প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়ার কথা পড়ে চমৎকৃত হলুম। অর্থাৎ তাঁর লেখাটির উদ্দেশ্য সফল হয়েছে পুরোপুরি বলা চলে। H.G.-এর ব্যর্থতার দিকগুলি সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন।

এই লেখাটি প্রকাশের জন্য বাংলা সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই ঋণী থাকবেন অজিতবাবুর কাছে। ওনার ঠিকানা চাই।

তপনকুমার মাইতি
সম্পাদক : 'অন্তুত্তর'
হলদিয়া

O O O O

O আশা করি ভালো আছেন। 'গোধূলি-মন' নিয়মিত বাড়ীর ঠিকানায় পাই। বইমেলা সংখ্যা আশির দশকের কবিদের আলোচনা ভালো। তবে অসম্পূর্ণ। রাজকুমার রায় চৌধুরীর নাম পেলাম না, একটু অবাক আমি এবং সংযম পাল। যাই হোক এ রকম সংখ্যা ভালো—তবে একটু নজরের প্রসার আশা করি। আমার নমস্কার নেবেন।

শেখ মহরম আলি
পিয়ারসনপল্লী/শান্তিনিকেতন

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি মন

২৮ বর্ষ/ ২য়-৩য় সংখ্যা।
ফেব্রুয়ারী মার্চ/১৯৮৬
ফাল্গুন-চৈত্র/১৩৯২

প্রতি সংখ্যা দুই টাকা
বার্ষিক সডাক কুড়ি টাকা

অশোক চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক
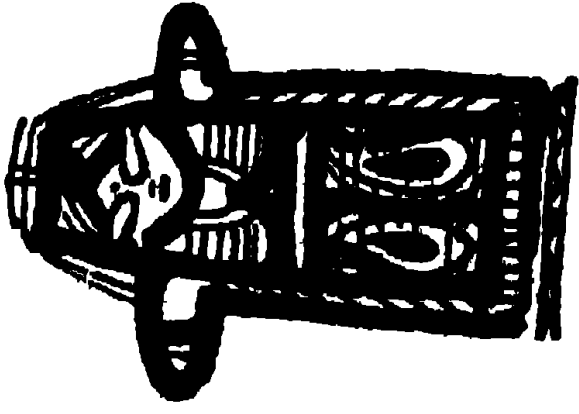
সম্পাদকীয় :—

প্রিয় পাঠক, সাধারণতঃ পূজা সংখ্যা ছাড়া অন্যান্য সংখ্যায় ছোটগল্পকে আমরা সেরকম করে প্রাধান্য দিইনা এ অভিযোগ আপনাদের অনেকের। আসলে একাধিক গল্প ছাপার পরিসর সাধারণ সংখ্যাগুলিতে থাকেনা। আর উপযুক্ত সংখ্যায় ভাল গল্পের দেখাও সচরাচর মেলেনা। যাহোক বিগত কয়েক মাসের সংগ্রহ কয়েকটি গল্পের সঙ্গে সদ্য পাওয়া আরো কয়েকটি মিশিয়ে এবারের এই গল্প সংখ্যা।

নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের সুখ-দুঃখ, দৈনন্দিনতা, প্রেম-ভালবাসা, একাকিত্বের বেদনা সবকিছু মিলিয়ে রয়েছে এবারের গল্পগুলিতে।

প্রিয় পাঠক, সমালোচনার অবাধ অধিকার রইল।

● সম্পাদকীয় কার্যালয় ॥ নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর-৭১২১৩৬ ॥ হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ

অরুণ সরকারের

গল্প

সংক্রামক

এক

পাঁচটা বাজতেই মহিম টেবিল গুছোয়। সকাল সকাল বাড়ি না ফিরলে সবিতার মুখ ভার হবে। হওয়াই স্বাভাবিক। সারাদিন একা। মেয়েরা মাছের মত। একা থাকতে পারে না। পিছল ত বটেই। তবে সবিতাকে নিয়ে মহিমের তেমন ভাবনা নেই। বছর তিনেক বিয়ের আয়ু, একদিনও অসুখ করেনি। পটল ক্ষেতের মত ঘন সবুজ তাদের সংসার। ভমাট। গরম তেলে লঙ্কা-পাঁচফোড়ণের সংসার মহিমের না পছন্দ। অবশ্য তেমন হবার উপায় কৈ? সবিতা ত একা। সারাদিন সে খরিদ্দারহীন বিক্রেতার মত একা ঝিমোয়। তার সংসার হল সেই নিঝুম দোকান। সবিতার জন্য তাই মহিম ভাবে। অথচ তাবা সন্তানও চায় না। চাইছে না, অন্তত এখুনি। অসুবিধে আছে। আসলে মহিম জানে, সাধারণ চ কুরেদের বাবা হওয়ার সুবিধে কখনও হয় না, অথচ তারা বাবা হয়ে যায় এক সময়। জল তরঙ্গ বাজে, সব অসুবিধে-গুলি কেমন হারিয়ে যায় সাময়িকভাবে। এসবও মহিমের অজানা নয়। পাকা পানফলের মত তার শরীর সবুজ হলেও, ভিতর শক্ত। পেকেছে। জলের মধ্যে। অতএব তার বোধ এমন কিছু নাবালোক নয়।

আসলে সে সবিতাকে নিয়ে সেই মাছের মতই এক অনাবিল স্রোতে ভাসতে চায়, যদ্দিন না শরীরে শেওলা জমে। তাই তার এই সকাল সকাল বাড়ি যাবার তোড়জোড়। বিগত তিন বছরে খুব কম দিনই ব্যতিক্রম।

সে টেবিল প্রায় সাফ করে ফেলেছিলো, এমন সময় পিয়ন এসে বলল—সাব, আপনাকে সাহেব তলব করেছেন।

মহিম একটু সময় পিওনের মুখের দিকে। তারপর ফুসফুসের জমা বাতাস বেশী ছেড়ে বলে—চলো, যাচ্ছি। মহিম বুঝলো আজ আর সকাল সকাল বাড়ি যাওয়া হবেনা। সাহেব ডাকা মানে অক্টোপাশে ডাকা। অন্য সকলের সাহেবরা বাঘ হলেও, তার মনে হয় ওরটা অক্টোপাশ। কাছে ডাকলে ছাড়তে চায় না। তবে সুবিধে' একটাই, আক্রমণ করে না। দাঁত, নখ নেই কোথাও লুকোন। সে উঠে দাঁড়ায় চেয়ার ঠেলে। তারপর করিডরে পা রাখতেই মনে হল,—পিয়নটার কাছে জানতে হবে "সাব" আর "সাহেব" শব্দ দুটোর অর্থ কি।

দুই

কাজ বিশেষ ছিলো না, তবু দেরী হল। এমন হবে মহিমের জানা ছিলো। তাই সে যখন অফিসের

ক্লান্তিময় বিবর থেকে কাঁকড়ার মত বেরিয়ে এলো, তখন ধর্মতলা নামক কোলকাতার যুবতী বুক নাচের সাজ পরেছে। কোলকাতায় ত রাত বোঝা যায় না, যেমন বোঝা যায় ওদের গ্রামের বাড়িতে। একটা অনিবার্য সিগারেট ধরিয়ে সে হাঁটতে হাঁটতে। বাস ষ্ট্যাণ্ডের দিকে। আশপাশের লোকজনগুলিকে আলোয় আলোয় ভারতমেলার পুতুলের মত মনে হয়। যেন কোলকাতায় একটিও দুঃখী লোক বাস করেনা। আসলে এখানকার লোক নিজেদের সুখ-দুঃখ বোঝে না বা জানে না, যেমন জানে না পুরোণ রাইটার্সের মাথায় বা ছাদে কতগুলি পাথরের ষ্ট্যাচু আছে। তাই এরা ভালো আছে। সুখে আছে।

সুখী উৎফুল্ল মুখ, চিতলের মত শরীর দেখতে দেখতে সে হঠাৎ সেই সুখী মুখের ভীড়ে একটি ব্যতিক্রম মুখ দেখে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। ভীষণ চেনা মনে হয় মুখ এবং মুখের লাগোয়া মানুষটাকে। যদিও তার মুখ অবিন্যস্ত দাড়ির অন্তরালে, পরণের পোষাকও তেমন পরিপাটি নয়। এ কি সেই লোক? মহিমের সন্দেহ হয়। তবে খুঁটিয়ে জরীপ করার পর সে নিশ্চিতে ডাকে—রতন—! এই রতন—! ব্যতিক্রম ও প্রায় অসুখী মুখটি ঘুরে দাঁড়ায়। তখনই মহিমের মনে হয় তার অনুমান আইনষ্টাইনের মত। একটু এগিয়ে এসে রতন বলে—তুই —, তুই মহিম না।
—হ্যাঁরে—বলে হঠাৎ দমকা বাতাসের মত পিঠ চাপড়ে। হাসে। রতনও। অনেকদিন পরে দু'জনের দেখা হওয়াটা আকস্মিক হলেও নিমেষে একে অপরের অতীতের স্লুইস গেট খুলে ফ্যালে। মহিম প্রাজ্ঞ পুলিশের মত খুঁটিয়ে দেখে রতনকে। চুল ও দাড়ি অবিন্যস্ত, যত্নহীন পোষাক। কাঁধে ঝোলা। ঝোলার গর্ভে কি আছে? বইয়ের মত মনে হচ্ছে। সেটাই সম্ভব, কারণ ও বরাবরই বই-ব্যতিকে। তারপর মহিম রতনকে বলে—চল, একটু চা খাই।

সুরেণ ব্যানার্জী রোডের এক নিরিবিলি চায়ের দোকানে মুখোমুখি চা খেতে খেতে রতন বলে—কত-দিন পরে বলত?

— তা-প্রায় দশ বছর ত বটেই।
—হুঁ, এই দশ বছরে তুই খানিক সুখি হয়েছিস মনে হচ্ছে।
—কি করে বুঝলি? মহিম হাসে।
—জানিস ত ছোট বয়স থেকেই কিছু কিছু লিখি।
—তা জানি। তবে লিখলেই ত আর—
—তাও ঠিক। তবু বলছি, তোর বাড়িতে এমন দুটি হাত আছে যা মানুষকে পরিচ্ছন্ন করে, সুখি করে।
—মায়ের?
—না, বউয়ের।
—তোর কি খবর? বিয়ে থা করেছিস।
—হ্যাঁ। তবে সংসারের থেকে লেখাই টানে বেশী। বাড়িতে থাকতে ভাল্লাগে না। রাত এগারোটার আগে বিবরে ঢুকি না।
—বলিস কি। আমার এমন কেস হলে ত কাঁচা কুমড়োর মত মুখ করে থাকবে। এই ত আজকেই যেমন—
--সেটা অন্যায় নয়, বিনিময়ে সে তোকে অনেক কিছুই দ্যায়।
—না দেখে এমন মন্তব্য করিস কি করে? চুটকো লেখক হচ্ছিস বলে?

রতন হাসে। হাসতে হাসতে বলে—দেখাবি? সে সিগারেট বের করে। মহিমকে এগিয়ে দ্যায়। ধরায়। মহিম ধোঁয়া ছেড়ে বলে—যাবি? চ। খানিক গল্প করা যাবে। সবিতারও বড় কথা কওয়া লোকের অভাব। তুই এলে জমবে।

তিন

কড়া নাড়তেই সবিতা দরজা খুলে দিল। এতোক্ষণ সে ঘড়ির দিকে চোরা চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে। বিরক্ত। তাই দরজা খুলেই সকালের চৈতি রোদের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে মহিমের ওপর এ্যাতো দেরী করলে যে, জানো না ঘরে একটা মেয়েছেলে একা থাকে, বেহালা জায়গাটা কি—! মহিমের সঙ্গের আগন্তুককে সে খেয়াল করে নি এতোক্ষণ। এখন করল। খেয়াল হতেই তার রদ্দুর সরিয়ে ফ্যালে ঝুপ। মহিম তখনও দরজার বাইরে। মিটিমিটি। সবিতা দরজা ছেড়ে একটু অপ্রস্তুতভাবে সরে দাঁড়ায়। মহিম রতনকে বলে—আয়। মহিমের পিছন পিছন রতন। ঘরে।

—দেখলি ত হাতদুটোর মত ঠোঁটদুটোও কেমন পরিপাটি!

—হুঁ। তবে আকর্ষণ আছে, এটাও রোমান্স।

—তুই এমনভাবে কথা বলছিস যেন তোর বউ এমন নয়। রতন কিছু বলে না। চেয়ারে বসে মহিমের পরিপাটি ঘরের সর্বত্র চোখে চোখে। তারপর সিগারেট। মহিম বলে—তুই একটু বোস, সবিতাকে ডাকি।

কিন্তু সবিতাকে ডাকতে হলনা। সে দরজায়। মানে চৌকাঠে। দু'হাতে জলখাবার। ঘরে এসে, রতনকে চার আনা চোখে দেখে টেবিলে জল খাবার নামিয়ে চলে যাবার মুখে মহিম বলে—কি ব্যাপার, চলে যাচ্ছো যে।

—চা করতে হবে ত?

—তার আগে আমার বন্ধুর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই—বলে মহিম শতকরা একশ ভাগ স্বামীর অনুকরণে পরিচয় করিয়ে দ্যায়। এইরকম পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মধ্যে কেমন একটা কৃত্রিমতা বা অস্বাভাবিকতা থাকে, যা রতনকে মাঝে মধ্যে অস্বস্তিতে ফেলে।

—জানো, ও খুব ভালো গল্প লেখে। অনেক পত্র-পত্রিকায় ওর লেখা খুব যত্ন করে ছাপে।

—ওমা, তাই নাকি! সবিতা সত্যিই অবাক হয়। সে এখন প্রায় আট আনা দৃষ্টিতে রতনকে। রতনও। সবিতা এক ঝিলিক হেসে বলে—বসুন, চা আনি, তারপর আপনার গল্প শুনবো। সে চলে যায়। মহিম আর রতন মুখোমুখি। সমান্তরাল চোখে।

—কি হল, চমকে গেছিস মনে হচ্ছে?

না, তা নয়, তবে এখন গল্প বোলতে হবে-এটাই যা অসুবিধে।

—কেন, অসুবিধে কিসের, নেই নাকি।

—আছে, তবে তোদের রাত হয়ে যাবে।

—আরে ধুর! রাত হলেই বা—, আমাদের গল্প করার এবং বলার দুটোরই কেউ নেই। চ, হাতমুখ ধুয়ে এগুলো শেষ করি।

ওরা ওঠে। হাতমুখ ধুয়ে। জলখাবার। সঙ্গে সবিতাও চা সমেত। টুকরো কথা। তবে মহিমের মনে হয় রতনের সব কথার মধ্যেই কেমন একটা হতাশা, অসুখির লোনা বাতাস।

—এতো রাত করছেন আপনার বউ কিছু বলবে না? সবিতা হঠাৎ বলে

নির্লিপ্তভাবে রতন বলে—আগে বলত, এখন বলে না।

কেন?

—অসুবিধে হয় না। একা থাকতে অভ্যস্থ হয়ে গেছে, তাছাড়া—রতন বাকিটা গলা পর্যন্ত টেনে এনেও চায়ের সঙ্গে আবার ভিতরে তলিয়ে দ্যায়। অন্যমনস্কভাবে সিগারেট। মহিমকেও একটা। সবিতা স্থির চোখে। দৃষ্টি এখন প্রায় ষোল আনা। লোকটাকে অদ্ভুত লাগে। লেখকরা কি এমনই হয়। এমন অসুখি—! কারণ সে সুখি লোকের

চেহারা চেনে। তারা ঠিক মহিমের মত দেখতে।
মহিম এবার বলে—কিরে, আমার বউকে গল্প শোনাবি না।
—কি আর শোনাবো, এই ত একটা ছাপা লেখা আছে, পত্রিকাটা দিয়ে যাচ্ছি—
—না, তা হবে না, আপনি পড়ে শোনান, আমি কোনও লেখকের পাঠ কখনও শুনি নি।
—আমি তেমন বিখ্যাত কেউ নই।
—নাই বা—, লেখেন ত?
—আরে অতো পাঁয়তাড়া কিসের? পড় না—।
রতন আর প্রতিবাদ করে না। ঝোলা থেকে বেছে একটা গরিব ম্যাগাজিন বের করে। এবং পাতা বদলে তার গল্প।

চার

রতনের গল্প

রাতের রান্নার ঝক্কি অনেকক্ষণ শেষ। শিউলী বেশ কিছু সময় শুয়ে। মাঝে একবার উল বুনেছে। শীতের আগামী মরশুমে তার পছন্দসই সোয়েটার। সবে ভ্রূণ অবস্থায়। তবে বেশীসময় ভালো লাগে নি। চোখ কেবল অবাধ্য হয়ে গোমড়ামুখো ঘড়ির দিকে ধাইছে। এখনও ধাইলো। প্রায় সাতটা। তার মানে অসিতের প্রায় একঘণ্টা লেট হল। তার মানে সেই লোকটা, অফিসের কর্ত্তা। আজও অসিতকে আটকেছে। এ ছাড়া অন্য কোন কারণ নেই। শিউলী জানে। অসিতের কথার ওপর বিশ্বাস তার আছে। সে এমন দেরী করে না। মাঝেমধ্যে ঐ অফিসের কর্ত্তা তাকে ফাইল-জ্যামের মধ্যে ফেলে দেরী করিয়ে দ্যায়। যান-জট হলে এত্তো সময় কখনও অসিত থমকে থাকে না। সে জানে,
তার জানার কথা, শিউলী একা থাকে। এবং পড়শীর ঘরে গিয়ে গল্পের জন্য সে কখনও ভিখারী হয় না। অতএব একা। হাজার লোকের মধ্যেও। যেন কোলকাতার মনুমেন্ট। এতো লোক, কোলাহলের মধ্যেও একা। শিউলী ততক্ষণ একা, যতক্ষণ অসিত বাইরে। সেজন্যই অসিত অফিস ছুটি হলেই একেবারে বিমান অবতরণের মত। বাড়ি এবং শিউলী।

শিউলীর ভাবনার মধ্যে, ঘড়ির গোমড়ামুখের কিচ-কিচ শব্দের মধ্যে, এছাড়া নিটোল স্তব্ধতার ভেতর সদরের কড়া নড়ে। সঙ্গে সঙ্গে শিউলীর অনুভূতিতে ধরা পড়ে অসিতের উপস্থিতি। এ কড়া নড়ার শব্দে একমাত্র অসিত। আসলে অসিতের সব কিছুই এখন শিউলীর মুখস্থ। সে চকিতে দরজার কাছে আসে। খোলে। —এ্যাতো দেরী করলে যে। তুমি কি জানো না যে এই নিরালা ফ্ল্যাটে আমি একা, কতদিন—বলতে বলতে সে হঠাৎ থমকায়। অসিত মিটিমিটি। তার জন্য নয়, আসলে অসিতের পিছনে আর একজন। অচেনা। তাই সে নিজেকে সামলে নেয়। বলে—এসো।
অসিত ভেতরে আসে। পিছনে সেই শিউলীর অচেনা। অসিত ঘরে এসে বলে—শুনলি ত, কেমন মনে হল?
—ভালোই। বেশ ঝাঁঝালো।
অসিত হাসে। ভীষণ সুখি হাসি। অন্তত আগন্তুকের তাই মনে হল। অচেনা লোকটা অসিতের সংসারের আনাচ কানাচ লোভাতুর চোখে। চারিদিকে কেমন সুখের ঝুল জমে আছে। ঘরের প্রতিটি ধুলিকণা থেকে আসবাব পর্য্যন্ত সুখমাখা। ঘরে যেন সুখের আগরবাত্তি। তারমধ্যে প্রতিমার মত শিউলী এলো জলখাবার নিয়ে।
—শিউলী, একে চিনতে পারছ। হাতমুখ ধুয়ে তোয়ালে মুখ মুছতে মুছতে অসিত।

শিউলী বলে—না, ঠিকমত—

—আরে ও তাপস! সেই যে ফুলশয্যার রাত্রে—বলেই অসিত প্রাণখোলা হো-হো।—অবশ্য তুমি সেই একদিনই—।

—হ্যাঁ, আপনার পক্ষে মনে রাখা শক্ত। তাপস বলে।

শিউলী এবার, প্রথমবার যেহেতু লোকটাকে সে ভুলে গিয়েছিলো, পুর্ণিমা চোখে। লোকটার চুল অবিন্যস্ত, গালভর্তি দুঃখি দাড়ি, পোষাক টোষাক কেমন যত্নহীন। মোটের ওপর লোকটা ভালো নেই—এমন বাক্সল।

শিউলী বলে—তা এতোদিন পরে হঠাৎ মনে পড়ল?

—না, অসিতের সঙ্গে ধর্মতলায় আচমকা দ্যাখা, ও ছাড়ল না।

—ভাগ্যিস আজকে অফিসে দেরী হল, তাই তোর সঙ্গে এমন দ্যাখা। অসিত বলে।

কথার মধ্যে শিউলী উঠে, টুক করে তিন কাপ। চা খেতে খেতে গল্প হয় অনেক। গল্পের সঙ্গে হাসি এবং দু'জন পুরুষের সিগারেট। অসিতের মনে হল, তাপসের মধ্যে সেই ধর্মতলার বিমর্ষতা এখন নেই। শিউলী দেখলো লোকটার ঘণ্টাখানেক আগের সেই মেঘলা নেই। চাঁদ উঠছে। মুখে কেমন যেন জ্যোৎস্না জ্যোৎস্না।

একসময় তাপস ওঠে। রাত হয়েছে। শিউলী আর অসিত দু'জনেই রাতে খেতে অনুরোধ। তাপস শুধু ম্লান হাসে। সায় না দিয়ে সদরে এগিয়ে যায়। দরজা পার হয়ে শিউলী ও অসিতের দিকে তাকিয়ে বলে—আসি। বেশ লাগল সন্ধেটা।

—আবার আসবেন তাপসদা।

– হ্যাঁ, আবার আসবি। বাড়ি ত চিনেই গেলি।

-আসলে ত রোজই আসা যায়।

—আসবেন, তাতে কি!

—হ্যাঁ, আমাদের ত কথা বলার লোকের বড় অভাব। শিউলী সারাদিন হাঁপিয়ে ওঠে।

—ঠিক আছে—চলি। তাপস এগিয়ে যায়। সারি সারি বিমর্ষ বৈদ্যুতিক চোখের আলোয় তাকে আরও ক্লান্ত ও বিষণ্ণ লাগে। শিউলী সদরে ছিটকিনি তুলে শোবার ঘর এবং রান্নাঘর তারপর রাতের খাওয়া এবং বিছানা।

অন্ধকার বিছানায় শিউলী বুকের আঁচল সরিয়ে অসিতের লোমশ ও বিবেচক বুকের কাছে নিজেকে গুটিগুটি গুটোতে গুটোতে বলে—লোকটাকে কেমন যেন লাগল।

—কাকে?

—ঐ তাপসদাকে।

—কেন?

—কেমন দুঃখী দুঃখী। একমুখ দাড়ি, অপরিচ্ছন্ন পোষাক, কেন বলো ত?

অসিত শিউলীর দিকে ভরপেট ডবলডেকারের মত একটু কাত হয়ে বলে—বলতে পারি, কিন্তু ভবিষ্যতে তাপস যদি কখনও আসে তাহলে এ প্রসঙ্গ তুলবে না বল--

—কি দরকার, শুধু জানতে ইচ্ছে করছে—ব্যাস।

—আসলে ওর সংসারে তেমন শান্তি নেই। অন্তত এখন।

—কেন?

—আমাদের মত ওরাও দু'জন। তবে ওর বৌ নাকি রোজ সন্ধেয় এখন একজন পুরুষ মানুষ—ওদের বন্ধুটন্ধু হবে তাকে নিয়ে—

—তাপসদা বলেছে তোমায়।

—হ্যাঁ। অফিস থেকে ফিরে হাঁটতে হাঁটতে ধর্মতলার দিকে আসছি—ওকে দেখলুম ফুটপাতে দাঁড়িয়ে—

পিছন থেকে একটা চাঁটি মেরে বললুম কিরে—তাপস না। তারপর আস্তে আস্তে ও সব কথা বললে। তাই তো টেনে আনলুম, ও প্রথমে রাজি হয়নি আসতে।

—তাই নাকি।

হুঁ। রাত এগারোটার আগে নাকি বাড়ি যায় না। সেই লোকটা চলে গেলে তবে। একা একা রাস্তায় ঘোরে। আসলে ওর বৌ এখন তেমন মনোযোগী নয় ওর ওপর। তবে আমার মনে হয় তাপসেরও কিছু দোষ আছে, জানলে—শিউলীর দিক থেকে কোন সমর্থন নেই। অসিত দেখলো সে ঘুমিয়ে। অন্ধকারের মধ্যে শিউলীর জ্যোৎস্না মুখটি কুড়িয়ে নিয়ে নিজের বুকের কাছে টেনে সেও একসময়।

এরপর তাপস প্রায়ই আসতে থাকে অসিতের বাড়ি। প্রথম প্রথম অসিতের সঙ্গে অফিস ফেরতা, পরে একা একা। সারা সন্ধে জুড়ে গল্প। শিউলী প্রতি সন্ধ্যায় ফুটে ছড়িয়ে পড়ে ঘরময়। তার এখন আর একা লাগে না। অসিত তাড়াতাড়ি না ফিরলেও সে উদ্‌গ্রীব হয় না। তাপসও দাড়ি কামিয়ে। পরিপাটি পোষাক। সে এখন নতুন মানুষ।

সেইরকম এক অসিতহীন সন্ধ্যা কাটাচ্ছিলো শিউলী আর তাপস। গল্প নানা। চা। প্রতিদিন একই গল্প শুনলেও ওদের ক্লান্তি লাগে না। ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে একসময় শিউলী বলল—তাপসদা সাড়ে নটা।

—তাই নাকি, অসিত এলো ন ত।

—আমিও তাই ভাবছি।

—ও আজকাল এতো দেরী করে কেন?

—কি জানি, জিগ্যেস করতে বলেছিলো—অফিসে নাকি কাজ থাকে।

এ কথায় তাপস স্থির চোখে শিউলীকে। তারপর সাবান্ত শ্বাস ছেড়ে বলে—আজ উঠি রাত হচ্ছে।

—ও এলেই যাবেন, আমি একা—

—না, যাই। অসিত হয়ত আরও দেরী করবে। আপনি দরোজা বন্ধ করে দিন ভালো করে।

তাপস চলে যায়। অসিতের বাড়ি থেকে বাস রাস্তা অন্তত দশ মিনিট। সে উজ্জ্বল বা জলন্ত চারমিণারের সাথী হয়ে হাঁটে—একা।

তাপস যখন একা একা, অসিত তখন ধর্মতলায়। তার মুখে একমুখ দুঃখি দাড়ি, অপরিচ্ছন্ন এবং যত্নহীন চুল ও পোষাক। সেও একা একা ঘোরে। ঘুরতে ঘুরতে ভাবে কেউ কি পিছন থেকে চাপড় মেরে বলবে না—কিরে, তুই অসিত না!

রতনের গল্প শেষ। সে ম্যাগাজিন আবার যথাযথ ব্যাগে। টস্ করে একটা চারমিনার। ভুস করে প্রচুর ধোঁয়া ছেড়ে চেয়ার ছাড়ে। বলে—আমি আজ যাই রে—।

—রাত্রে না হয় খেয়ে টেয়ে যাবি।

—হ্যাঁ, তাই করুন, অসুবিধে হবে না।

রতন ম্লান হাসে। দরজার দিকে এগিয়ে যায়। সবিতা, মহিম দু'জনেই এগিয়ে আয়।

—মাঝে মাঝে আসবেন রতনদা, গল্প শোনা যাবে। রতন সবিতার দিকে তাকিয়ে আবার হাসে। তারপর মহিমের মুখের ওপর নিজের মুখ সামন্তরাল করে বলে—যাইরে—মহিম! সে হাঁটে। বিমর্ষ আলোয় একাকী। মহিম তাকে কি যেন বলতে গিয়েও থমকায়। শুধু স্থির চোখে তার চলে যাওয়া ভাখে। দুঃখী মানুষের হাঁটা কি এইরকম। সে চকিতে দরোজা বন্ধ করে সবিতার দিকে তাকায়।

সুজিত দাশগুপ্তের

খেয়ালী

কল্পলোকের গাড়ী
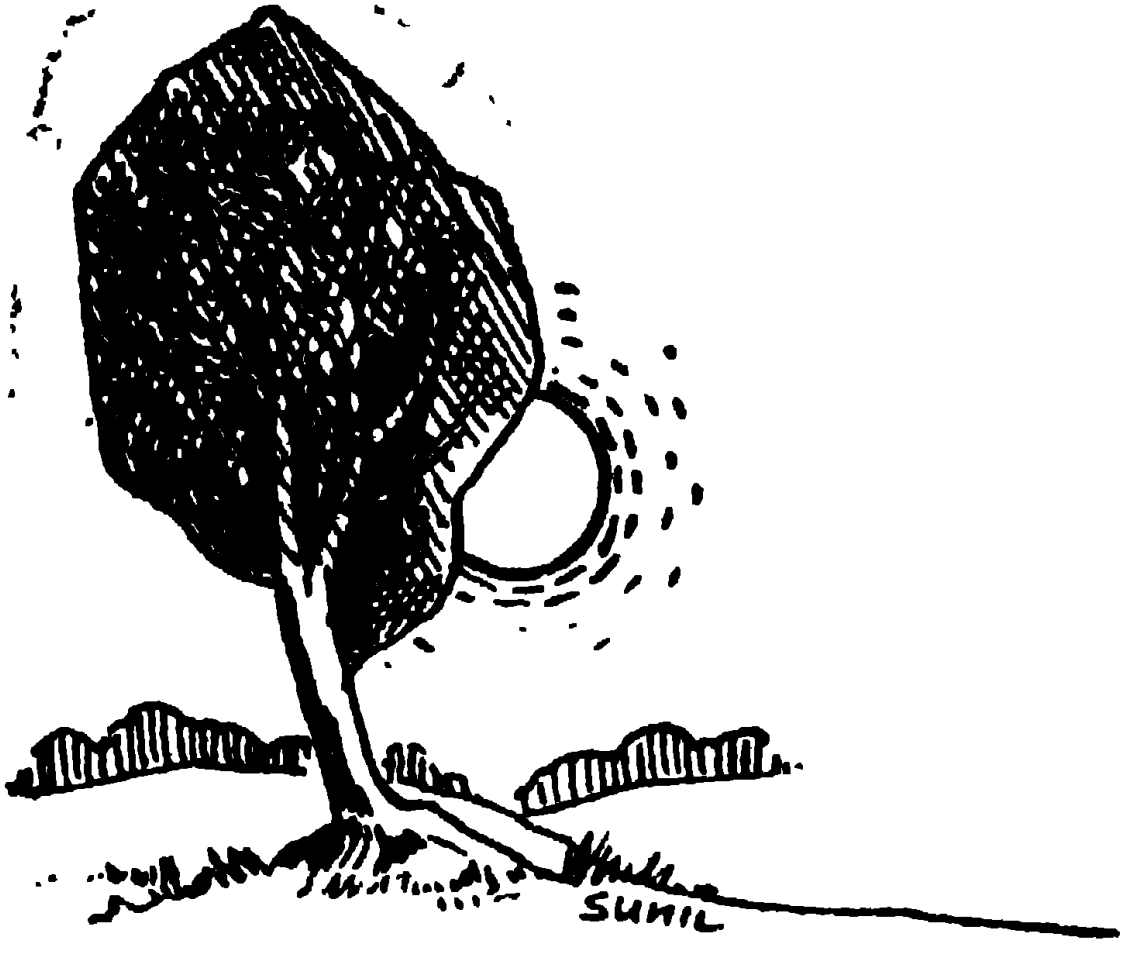
শেষ ট্রাম ঘরে ফিরে গেছে। সবাই গভীর ঘুমে পাশ ফিরছে। একটু আগে শ্রাবণের মেঘ বর্ষণ শেষে ছুটি পেয়ে চলে গেল। শান্ত পৃথিবীর ভিজে অ্যাসফল্টের রাস্তার ওপর তার চকচকে ছায়া সহ ক্লপ্, —ক্লপ্, ক্লপা—ক্লপ্ শব্দ তুলে একটা পুরোনো দিনের ল্যাণ্ডো দৌড়ে আসছে এই দিকে।

একবার আকাশের দিকে তাকালাম, দমকা হাওয়ায় সাদাটে মেঘ দ্রুত উড়ে যাচ্ছে। দিনের বেলায় সমস্ত কোলাহলের পর এই বৈদ্যুতিক আলোর শহরকে কেমন অলৌকিক বলে মনে হচ্ছে। চারিদিকের অপার্থিব নীরবতার ভেতর ঘোড়ার খুরে গভীর শান্তির শব্দ ক্লপ্—ক্লপ্, ক্লপা—ক্লপ্। ল্যাণ্ডোটা আমার সামনে দাঁড়াল। পাঁচঘোড়ার গাড়ী। এধারের ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেজের ঝাপ্টা মারা শুরু করল। গাড়ীটার দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কল্পলোকের গাড়ী কি?

আর্দালী দরজা খুলে দাঁড়াল, বলল হ্যাঁ, আসুন ভেতরে আসুন। একটুও দেরী না করে গাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়লাম। নির্জন সঙ্গীতের মত পাঁচ ঘোড়ার পায়ে শব্দতরঙ্গ তুলে গাড়ী ছুটে চলল।

ইদানীং ব্যথার ভিতর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এই ঘুম কবে ভাঙবে আমার জানা ছিল না। দেশে দেশে কী ভীষণ হানাহানি। বেকার সমস্যা। মাৎস্যন্যায়। তবু এই শ্রাবণের চাপা বর্ষণের ভিতর ক্লপ-ক্লপ শব্দ তুলে একটা আদ্যিকালের গাড়ী আমাদের ঘুমিয়ে পড়া পৃথিবীকে ছুঁয়ে যায়। আর কেউ না জানুক আমার কাছে তার খবর ছিল।

দেখলাম মৃদু আলোর ভিতর আমারই মত কয়েকজন বসে রয়েছে। বেশীর ভাগই বৃদ্ধ। যুবক আছে কয়েকজন। একজন জানালার ধারের জায়গা ছেড়ে আমাকে পাশে বসতে দিল। বলল, কল্পলোক কতদূর বলতে পারেন?

বললাম জানিনা তো।

লোকটা বিস্মিত স্বরে বলল, কেউ জানে না, কি আশ্চর্য!

একজন প্রায় বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ওঃ এ যাওয়ার যে কবে শেষ হবে জানিনা। আর কেউ কিন্তু কিছু বলল না। আর্দালীটা আমার কাছে এসে বলল, জানালাটা খুলে দিন। ভেতরটা গুমোট হয়ে আছে।

জানালা খুলে বাইরে তাকিয়ে দেখি শ্রাবণের উধাও মেঘের ভিতর পৃথিবীটা ডুবে গেছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। মনে হচ্ছে যেন কুয়াশার ভিতর দিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া। আর শুধু একটাই শব্দ ক্লপ-ক্লপ, ক্লপা-ক্লপ।

পৃথিবী তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আমরা কল্পলোকের গাড়ী চড়ে চলেছি। সাঁই শব্দে বাতাস কেটে চালকের চাবুক একটা ঘোড়ার পিঠে ঘা মারল। লোকটা সামনের আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের প্রতিবিম্বকে বলল, এক পাত্তর হলে বেশ হত, তাই না! এই দমকা হাওয়ায়।—

কেউ কোনো কথা বলছে না। চালক ওই একটা কথা বলেই চুপ, গাড়ী এত দ্রুত ছুটে চলেছে যে মনে হচ্ছে আমরা ভেসে চলেছি। একবার গাড়ীর ভেতরে সবায়ের মুখের দিকে তাকালাম। সব অচেনা মুখ। কেউ কাউকে চিনিনা। কোনোদিন দেখিনি। অথচ কি আশ্চর্য! একই সঙ্গে চলেছি আমরা একটাই দেশে যাব বলে। এরকম ও হয়! খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার। পরস্পরকে জেনে নেওয়া উচিত। একই সঙ্গে চলেছি যখন। এ কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পায়ে আওয়াজ উঠল পর-পর। পরস্পর। পর-পর পরস্পর। কিন্তু তা হয় না কখনো। সব মুখই চিরকাল অচেনা থেকে যায়। এসব ভাবছি যখন তখন পাশের লোকটা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা কল্পলোক কেমন জায়গা বলতে পারেন?

—বলতে পারা খুব মুস্কিল। আপনার কি মনে হয়?

—আমার!

লোকটা এদিক ওদিক তাকিয়ে আমার কানের কাছে এনে বলল, হাসবেন না তো?

না না হাসব কেন?

লোকটা গম্ভীর স্বরে চাপা গলায় বলল, আমার মনে হয় শূন্যে হাত বাড়ালেই আপেল পাব। আপনার আপনার কি মনে হয়?

সে কথার উত্তর না দিয়ে বললাম, আর সবায়ের কথা কিছু জানেন…ওদের কি মনে হয়?

লোকটি চোখ পিট্ পিট্ করে বাইরের দিকে তাকাল। বলল, দেখুন দেখুন মনে হচ্ছে না মেঘের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। বাইরের দিকে তাকালাম। সত্যিই যেন মেঘের ভিতর দিয়ে নক্ষত্রের দেশে উধাও হয়ে চলেছে আমাদের গাড়ী। কিন্তু ঘোড়ার খুরে ক্লপ্—ক্লপ্ শব্দ। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির সাথে দমকা বাতাস। লোকটা বাইরের থেকে চোখ গুটিয়ে এনে গাড়ীর ভেতরে মাথা ঘোরাল। বলল, ওই যে বুড়োটাকে দেখছেন, ও খুব চুপিচুপি কি বলছিল জানেন?

—কি?

—বলছিল সেখানে অন্তহীন যৌবন। সেখানে শুধু আনন্দ আর আনন্দ। নীল আকাশের পটে গোলাপী বোগেনভেলিয়ার মত অজস্র হাসিখুশী নারী। সেখানে গেলেই নাকি যুবক হয়ে যাবে ও।

বুড়োটার দিকে তাকালাম। লোকটা ঘুমে ঢুলছে। গাড়ীর দুলুনীর সঙ্গে ওর মাথা অল্প অল্প দুলে উঠছে। পাশের লোকটা আমাকে ছোট একটা কোঁৎকা মেরে বলল, আর ঐ যে ছেলেটা ও বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়েই বলল আমাকে যে সেখানে ও নিশ্চয় একজন মনের মত সঙ্গিনী খুঁজে পাবে। স্বাভাবিক জীবন যাপনের মত একটা ভাল চাকরী।

—এইসব।

আমাদের উল্টোদিকে ঠিক আমার সামনের সীটে বসা লোকটা হঠাৎ আমার দিকে তাকাল। বলল, আপনাদের কথা কিছু কিছু আমার কানে এসেছে। আমার কি মনে হয় জানেন?

—বলুন।

—আমি একটা সরকারী সংস্থার করণিক। জ্যোৎস্নারাতে আমার ভাড়া বাড়ীর উঠোনে যখন টুকরো রূপোলি আলো এসে পড়ে তখন অদ্ভুত নির্জন শব্দে একজোড়া পায়রা ডেকে ওঠে হঠাৎ। কখনো হয়ত সরু রেখায় জল গড়িয়ে পড়ে ট্যাপ ওয়াটারের কলের মুখ বেয়ে। আমার স্ত্রী জানালার ধারে সতরঞ্চী পেতে শরীর আলগা করে শোয়। আর বাইরের জ্যোৎস্নার

দিকে তাকিয়ে পুরোনো একটা গানের সুর গুনগুন করতে থাকে। তখন আমার মনে হয় সেই যে একজনের আসার কথা ছিল, যার অপেক্ষায় এতকাল বসে রইলাম, সে তো কই এল না। সে এলে দশদিক সুন্দর হয়ে যেত। নিশ্চয় হত। আমার মনে হয় আমাদের এই চলার শেষে তার দেখা আমি পাব।

লোকটা গভীর বিশ্বাসে নিয়ে কথাগুলো বলছিল। ওর কথা শেষ করে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকার পর বলল, আপনার কি মনে হয়, দেখা পাব না সেখানে?—নিশ্চয় পাবেন। নয়ত কিভাবে বাঁচবেন বলুন? লোকটা মাথা নেড়ে বলল, তা ঠিক।

বলেই মাথা ঘুরিয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল।

এতক্ষণ পরে আমার সত্যিই সন্দেহ হল, গাড়ী কোথায় চলেছে। এ যাওয়ার শেষ আছে তো! কল্পলোক কোথায়? কতদূরে সেই দেশ? আর্দালীকে জিজ্ঞেস করাতে ও বলল, জানিনা।

—তার মানে!

—আমি জানিনা। ওই চালক জানে। কিন্তু ও বলে না কখনো।

আমার পেছনের সীটের একজন বলল, কি দরকার জেনে। এই তো বেশ চলেছেন। এইভাবে যেতে যেতে পথ ফুরিয়ে আসবে।

হয়ত ফুরাবে। তবু সব কিছুই আগাম জেনে রাখতে ভাল লাগে। আমরা এতজন একসঙ্গে চলেছি। এ পথের কোথায় কিভাবে যে এক একজনের চলার শুরু তা আমরা জানিনা। কোথায় শেষ তাও জানা নেই। আমরা কেউ কাউকে চিনিওনা। তবু একসঙ্গে চলেছি। এ খুবই অদ্ভুত ব্যাপার। অবাক করা কাণ্ড।

দ্রুত ছুটে যাওয়ার সময় দু'একটা গর্তে পড়ে গাড়ী মাঝে মাঝে দুলে উঠছে। গাড়ীর ভিতরে সবাই একইভাবে চুপচাপ বসে রয়েছে। চালক লাগাম ধরে শিরদাড়া সোজা করে বসে। আকাশে শ্রাবণের মেঘ। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। দমকা বাতাস। পাশের লোকটা বলল, কই আপনি তো কিছু বললেন না কল্পলোকের কথা।

বললাম, তবে শুনুন, কোথা থেকে সুন্দর গানের সুর ভেসে আসছে। একটা সবুজ পাহাড়ের শরীর বেয়ে কুলকুল করে বয়ে চলেছে স্বচ্ছ ঝরণা। সেই ঝরণায় অবেলায় জল নিতে এল একজন মেয়ে। ধরুন কিনা আজ পুর্ণিমা তিথি, সন্ধ্যায় পাহাড়ের আড়াল থেকে দু'টো রূপোলী রঙের চাঁদ উঠবে তখন আরো কয়েকজন সুন্দরী এসে আগের মেয়েটাকে ঘিরে নাচবে। আর গাইবে সবচেয়ে ভাললাগা গান। দূরে মেঘের পথ বেয়ে একজন দেবদূতের রথ তখন উড়ে যাবে। মেয়েরা সেইদিকে তাকিয়ে গান থামিয়ে বলবে, ওলে কে গেল বলতো?

ওদের চোখ থেকে চোখে কৌতুক বিনিময় হয়ে যাবে। এক সখী সেই মেয়ের গাল টিপে বলবে, হ্যাঁ লো বসন্তসেনা যে চলে গেল। মেয়েটা অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বলবে, আমি তার কি জানি।

—ওমা সেকি কথা।

একজন বলবে, বসন্তসেনার রথ কোথায় গেল আমি জানি।

—কি জানিস লো?

—আজ হংসমণ্ডলীর দেশে রাজকন্যার বিয়ে না? এই বলে আমি লোকটার দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকি। লোকটা বলল, কি হল থামলেন কেন, বলুন।

হাসি থামিয়ে বলি, আর জানিনা।

—না না তা বললে শুনব না। বলুন।

—আমি বেশীক্ষণ গাঁজা মারতে পারিনা। হাঁপিয়ে যাই।

—তা হলে আপনি এসব বিশ্বাস করেন না ?···বলুন না তো কল্পলোক জায়গা কেমন বলে আপনার মনে হয় ?

বেশ কেমন খ্যাতিবান রাজনীতি পরায়নের মত ইণ্টারভ্যু দিচ্ছি এমন ভাব এনে বলি, যুদ্ধ কি মানুষ ভুলে গেছে। দেশে দেশে অনেক মা টেরেসা জন্ম নিয়েছেন। পৃথিবীর সব মাঠে হলুদ শস্য গতর ভারী করে উপচে পড়ছে। সব শিশুর মুখে অমলিন হাসি। সব যুবকের মুখে। যুবতীর মুখে। মানুষ মানুষের কাঁধে হাত রেখে ভাই বলে ডেকেছে সেই দেশে।

এই বলে আমি চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকি। লোকটা বলে, আর ?
—আর কি ? এই তো।

বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়া বন্ধ হল। সোঁ সোঁ শব্দের দমকা বাতাস থেমে এল। মেঘ ফুটে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। ভোর হয়ে এল। পাশের লোকটা হো হো শব্দে হেসে আপন মনে বলল, তা কি করে সম্ভব ? যদিও জীবনযাপনে নিয়ত সংঘাত তবু জানি সবই সম্ভব। সবই হতে পারে। গাড়ী ক্রমশ কুয়াশা পেরিয়ে আলোর রাজ্যে এসে ঢুকল।

কিন্তু এ আলো নয়। আমি জানি এ আলো নয়। ওপরে ঘোলাটে আকাশ। দূরের হোর্ডিংয়ে প্রায় নগ্ন নারী শরীর। বাজার চলতি নারকীয় নাটকের বিজ্ঞাপন। প্রায় উন্মাদের মত রাগে ফেটে পড়ে বলি, ও হে চালক এই বুঝি কথা ছিল ?

লোকটা মুখ ঘুরিয়ে তাকায়। মৃদু হেসে বলে, শান্ত হয়ে বসুন। এখনো কল্পলোক আসতে কিছুটা দেরী আছে।

চালকের কথায় আশ্বস্ত হয়ে নিজের জায়গায় ফিরে আসি। একজন কিন্তু চেঁচিয়ে বলল, ওহে গাড়ী থামাও। এখানে নেমে যাব।

একজন ঢুলছিল। সে জেগে উঠে নড়েচড়ে বলল, কল্পলোক এল নাকি ?

আগের লোকটা বলল, হ্যাঁ।
তার মানে। এই কি কল্পলোক নাকি। আমি তো এ চাইনি। কেউ চায় না নিশ্চয়। তাই ওদের বাধা দিয়ে বললাম, নামবেন না, এখনো দেরী আছে। কিন্তু মানুষ বড্ড হুজুকে। ওরা একে একে দিনের কলকাতার ভিতর নেমে যেতে লাগল। আর্দালী জিজ্ঞেস করল, আপনি নামবেন না ?
না। আমি কল্পলোকে যাব।
চালক সাঁই শব্দে চাবুক চালাল ঘোড়ার পিঠে। আমার সামনের সেই ক্লার্ক ভদ্রলোকও বসে রইলেন। গাড়ী ছুটল বড়বাজারের ভিতর দিয়ে। তারপর রবীন্দ্র সরণী। এই ভাবে দৌড়তে দৌড়তে রাজাবাজারের ভিতর দিয়ে ছুটে চলল। এখানে মানুষ পশুর মত বেঁচে অমূল্য জীবন বিনিময় করে। এরপরে গাড়ী খারাপ পাড়ার ভিতর দিয়ে দৌড়বে কি। একবার পাঁচ নম্বর কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটের পাশ দিয়ে গেল গাড়ী। ওটা বেকার অফিস। ভীড় লাগা হতাশ বেকার যুবকের মুখ দেখলাম যেন।

এইসব ছবির পাশ দিয়ে গাড়ী অনবরত ছুটে চলেছে। মানুষে মানুষে সম্পর্কের এই দূরত্বের ভিতর দিয়ে। আমি দাঁড়িয়ে উঠে হঠাৎ চেঁচিয়ে বললাম, কি হচ্ছে কি এসব। এই অভিশাপের ভিতর দিয়ে কেন দৌড়চ্ছো ?

চালক মাথা ঘুরিয়ে মৃদু হেসে বলল, এখনো কিছুটা দেরী আছে। শান্ত হয়ে বসুন।

তারপর থেকে এখনো গাড়ী ছুটছে। গাড়ী ছুটছে। আমরা দু'জন আমাদের কল্পলোকে যাব বলে বসে আছি। ●

গৌর বৈরাগীর

গল্প
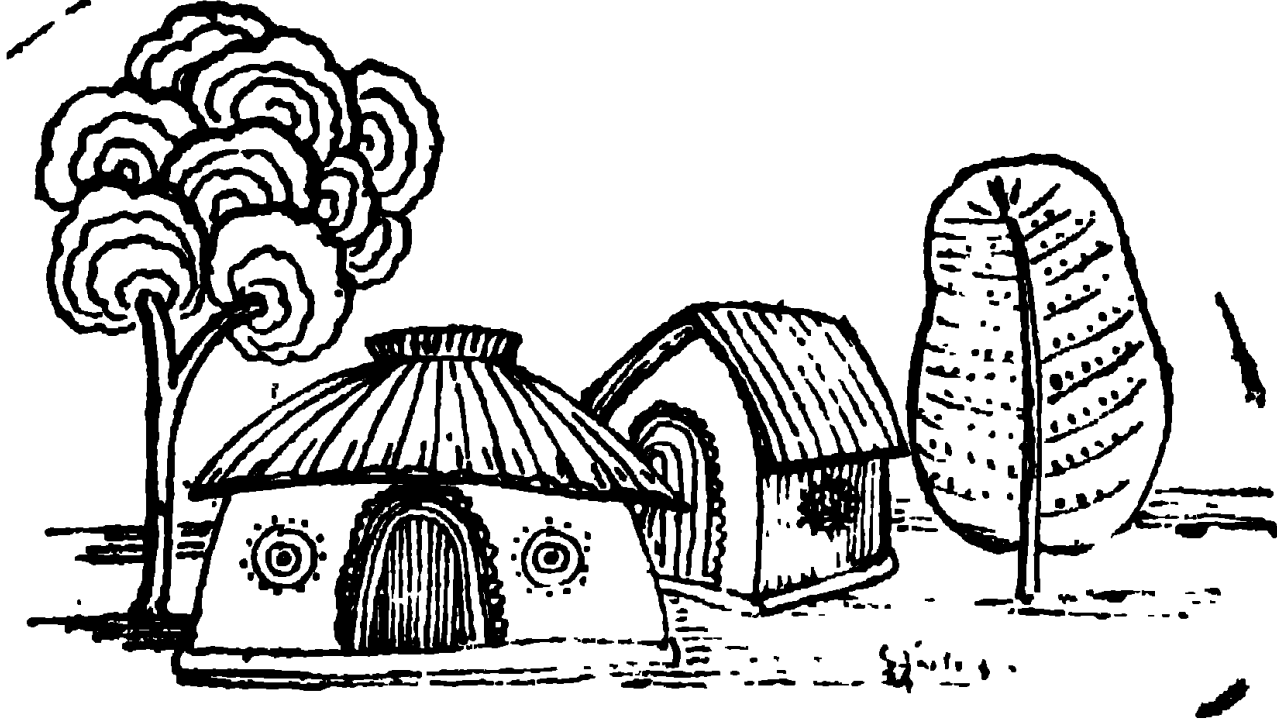
সেই লোকটা

পছন্দের মাছটা একপাশে সরিয়ে রাখতেই সেই পরিচিত হাতটা আস্তে আস্তে তার পাশ দিয়ে নেমে আসতে দেখল তারাপদ। সেই হাত। ভারি সুন্দর গড়ন। অল্প নরম লোম। চওড়া কব্জি। আর স্বাস্থ্যবান।

একটু আগে যে মাছটা তারাপদর খুব পছন্দ হয়েছিল সেটা হাতে তুলে নিল হাতটা। টাটকা ভেটকী। নধর চেহারা। দেখনসই। লেখা বলেছিল—মনে আছে তো আজ বাপ্পার জন্মদিন।

বাপ্পার জন্মদিনে একটু ভালমন্দ করার ব্যবস্থা হয়। একটু ভাল মাছ। টাটকা নতুন ওঠা সবজি। একটু পায়েস। সঙ্গে মিষ্টি। এইরকম আরকি। জন্মদিনে যেমন যেমন ইচ্ছে থাকে সব মায়েদের, লেখারও তেমনি। মাঝে মাঝে তেমন ব্যতিক্রমী ইচ্ছে তারাপদকেও ছুঁয়ে দেয়। সে বাজারে সবচেয়ে বড় মাছওলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। এই লোকটাই সব চাইতে ভাল আর দামী মাছ বিক্রি করে। যেমন গলদা চিংড়ি। নতুন ওঠা গঙ্গার ইলিশ। টাটকা নধর পারশে। কিংবা অল্প অল্প শীতের শুরুতেই ভেটকী।

—এটা ভাল হবে তো কৈলাশ! হাতে মাছ নিয়ে কথা বলল লোকটি।

কৈলাশ হাসল—ভাল হবে না মানে বলে ওজনে চাপাল। তারাপদ বসা থেকে উঠে দাঁড়াল এবার। তাকাল সেই লোকের দিকে। কি সুন্দর স্বাস্থ্য। রক্ত ফুটে বেরুচ্ছে এমন টকটকে গায়ের রঙ। পরণে দামী ফুলকাটা লুঙ্গি। গায়ে ফরসা আদ্দির ইস্ত্রি করা পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবীর কাঁধটা আবার ছেঁড়া। কিন্তু সেটাও এমন মানিয়ে গেছে। বোধহয় ছেঁড়াটা না থাকলেই খারাপ লাগত। কৈলাশ মাছ ওজন করছে আর সে অন্যদিকে তাকিয়ে। অন্যদিক মানে ঐ যে পাশে বড় বড় গলদা চিংড়ি সাজানো সেদিকেই নজর। চিংড়িগুলোও দারুণ উঠেছে আজ। বড্ড ইচ্ছে হয়েছিল তারাপদর। ওসব তো খাওয়াই হয় না। আজ বাপ্পার জন্মদিন উপলক্ষে একটু কষ্ট হলেও—এরকম যখন ভাবছে সে ঠিক সেই সময় লোকটি ভেটকীর দাম মিটিয়ে চিংড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আশ্চর্য কি করে যে তারাপদর ইচ্ছেগুলো আগেভাগে টের পেয়ে যায়। শুধু যে এই সময় তা নয়। যখনই তারাপদর এরকম বিলাসী কোন

ইচ্ছে হয় তখনই ঐ লোক ঠিক সামনে চলে আসে।

সেই যেমন একবার। লেখার বোনের বিয়ে। লেখারা আগেই চলে গেছে। সে যাবে অফিস করে। বিয়েবাড়ির জন্যে যা হয়। বেশ ফরসা ইস্ত্রি করা জামা। পকেটে রুমাল। জামার কলারে হালকা সেন্ট। চুলে শ্যাম্পু। চটিতে কালি। তো তাড়াতাড়ি যাব বলে অফিস থেকে তিনটেয় বেরুল তারাপদ। একটাই মাত্র বাস ওদিকের। তেমনি ভিড়। একটা বাস ছেড়ে দিল। দিয়ে ঘামতে লাগল। পরের বাসটাও ছাড়তে হল তাকে। রুমাল বার করে মুখ মুছল। ভুর ভুর করছে গন্ধ। নিজেকে দেখল সে। নিভাঁজ টান টান। বড় নিখুঁত পোষাক। এসব নিয়ে কি বাসে চড়া যায়; না মানায়। একটা ট্যাক্সি হলে বড় সুন্দর মানাত ব্যাপারটা। শ্বশুর বাড়ির দরজায় ট্যাক্সি থেকে নামছে তারাপদ।

এই রকম ভাবছে সে। সেই সময় লোকটি কোথায় ছিল কে জানে ফুটপাতের কিনারায় এসে গলা চড়িয়ে ডাকল—ট্যাক্সি, ট্যাক্সি।

সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্যাক্সিও হুস করে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ড্রাইভারকে কি বলতেই সে হেসে দরজা খুলে দিল। নরম গদির ভেতর নিজেকে ছেড়ে দিতেই তারাপদর সামনে দিয়ে সাঁ করে চলে গেল ট্যাক্সি। এরকম হলে সব বিস্বাদ হয়ে যায় না! বেশ রাগ হয়। ঐ লোকটার ওপর অজানতে হিংসেও হয়। কিন্তু হলেও কিছু করার থাকে না তারাপদর। কেননা লোকটা তো কোনদিনই সেরকম কোন খারাপ ব্যবহার করেনি। বরং খুইই অমায়িক তার আচরণ। সেই যেমন মাখনের ভেতর দিয়ে ছুরি চালিয়ে দেওয়া বলে একটা কথা আছে। ঠিক সেরকম ভাবেই তারাপদর ইচ্ছের ভেতর ছুরি চালিয়ে দেওয়া। তারাপদ যে রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে সেকথা টেরও পাচ্ছে না হয়ত। যেমন সেই একবার।

লেখাকে নিয়ে দোকানে গেছে তারাপদ। ছেলেমেয়েদের টুকটাক যা কিছু হয়েছে। বাকী ছিল লেখার শাড়ি। বেশ বড় দোকান। অনেক স্টক। লেখার ঐ দোকানটাই পছন্দ। কর্মচারীটি বলেছিল —কি রকম দামের বার করব।

—ঐ আরকি। বলে তারাপদ লেখার দিকে তাকিয়েছিল।

লেখা হেসে বলেছিল—বারে তুমিই বলে দাও না।

থতমত খেয়ে তারাপদ বলেছিল—আমি বলব, আমি। মানে—

ঠিক সেই সময় সেই লোকটি। চমকে তাকিয়েছিল সে। হাসি হাসি মুখ লোকটির। সারা মুখটাতে আনন্দ।

—আসুন আসুন। দোকানের মালিক হাত বাড়িয়ে দিল ওদিকে। সামান্য এগিয়েও গেল। বসুন, বলে মোড়া পেতে দিল সামনে। তারপর গলা বাড়িয়ে বলল —মধু শিগ্‌গির দুটো স্পেশাল চা।

দুটোর একটা লোকটার। আর একটা তার স্ত্রীর। আজ সঙ্গে স্ত্রীকে নিয়ে আসা হয়েছে। কি সুন্দর দেখতে। শাঁখের মত গায়ের রঙ। একমাথা ঘন কালো চুল। বড় একটা লাল টিপ। সারা শরীরে লাবণ্য। মুখে হাসি। ঠিক যেন কোন প্রতিমা।

—বসুন। লম্বা দামী সিগারেট বাড়িয়ে দিতে দিতে মালিক হাসল—বৌদির জন্যে বুঝি।

একথায় লোকটা হাসল হা হা করে—বুড়ো বয়েসে শখ হয়েছে তাঁত সিল্ক না কি—বলতে বলতে ঘর ফাটিয়ে আবার হাসি। হাসিটাও বেশ। হাসলে পরে হাত দুটো দু'দিকে ছড়িয়ে যায়। চওড়া কব্জিতে চওড়া ব্যাণ্ডের ঘড়ি। চোখে স্টিল ফ্রেমের চশমা। গায়ে টেরিকটের সাদা পাঞ্জাবী। চওড়া পাড় ধুতি। বেশ মানায়।

কথায় কথায় শাড়ির বাণ্ডিলটা এসে পড়ল। বাণ্ডিল খুলতেই ঝকঝকে দামী সেরা সেরা শাড়িগুলো চোখের সামনে। আলতো একটা কোলে তুলে নিল তার স্ত্রী। তারপর আর একটা। তারপর··· । এদিকে লেখা বোধহয় নিজেকেও ভুলে বসে আছে। শুধু লেখাই বা কেন। তারাপদও নিজের সীমা ভুলে গিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। একটা পিঙ্ক রঙের শাড়ি বড় পছন্দ হল তার। লেখা দুটি ছেলে মেয়ের মা। কিন্তু মাঝে মাঝে তার ঐ শরীরের দিকে তাকিয়ে বড় অবাক হয়ে যায় তারাপদ। এই বয়েসেও লেখার শরীর জুড়ে থরে থরে আহ্বান। কখনও কখনও তাই মনে হয় তার দেওয়া ছা পোষা শাড়িতে লেখাকে মানায় না। মনে মনে নিজেকে শুনিয়েও দেয়। এবার অন্তত শাড়ি কেনার সময় সাধ্যের বাইরে যাবে সে। সেই সেদিনও যেমন মনে মনে ইচ্ছেটা ছিল। তাই বোধহয় বউটার সামনে দামী শাড়ির বাণ্ডিলটা খোলা হলে চোখ ফেরাতে পারে নি তারাপদ। শুধু তাই বা কেন। ঐ পিঙ্ক রঙটাই পছন্দ হয়ে গেল তার। মনে মনে যখন ঐ শাড়িপরা লেখাকে কল্পনা করছে ঠিক সেই সময়ই তাকে দারুন চমকে দিয়ে অবাক কাণ্ডটা ঘটল। ঐটাই পছন্দ হয়ে গেল বৌটার। লোকটাও খুব খুসির গলায় যেন তারাপদর কথাটাই বলল—আমিও এটার কথাই ভাবছিলুম। বলতে বলতে লোকটা হেসে উঠল। তারপর মানিব্যাগ খুলে একখানা দু'খানা করে নোট বার করতে লাগল।

আচ্ছা, এরকম সময়ে কার না রাগ হয়। এরকম রাগের যথার্থ কারণও থাকে। অথচ সেটুকু প্রকাশ করা যায় না। না, হয়ত ঠিক বলা হলা না। রাগ ঠিকই বেরিয়ে আসে। বাজার এনে রাখতেই লেখা ব্যাগের ভেতর উঁকি দিল। তারপর ভুরু কুঁচকে বলল—তোমায় যে বলে দিলুম আজ বাপ্পার জন্মদিন!

খুব সামান্য কথা। অভিযোগও নয়। মানুষ তো ভুলে যেতেও পারে। কিন্তু ঐ কথাতেই সোজা ঘুরে দাঁড়াল তারাপদ। তারপর কপাল কুঁচকে বলল ওসব বিলাসিতা বাদ দাও।

—বিলাসিতা। অবাক গলায় বলল লেখা। একটিই তো ছেলে। আর জন্মদিন বছরে একবারই।

ঠিকই। খুবই যথার্থ। এমন দিনে ভেটকী না হোক, খানিকটা পাকা মাছও কি আনা যেত না। হয়ত যেত। এটুকু সামর্থ অবশ্যই আছে তারাপদর। কিন্তু কি যে হয়ে গেল বাজারে গিয়ে। হঠাৎ রাগটা ভেতরে ঢুকে তালগোল পাকিয়ে দিল যেন। এসময় সে নিজের মধ্যে থাকে না। এমনিতে সে শান্ত সরল সাধাসিধে। গলা তুলে কথা বলে না। মন দিয়ে অফিস করে। সংসারও করে মন দিয়ে। অথচ রাগ হয়ে গেলে সে অন্য মানুষ। তাই সে বলে ওঠে—বাজে বকো না। অর্ডার করতে তো পয়সা লাগে না।

—অর্ডার! বড় অবাক হয় লেখা। তার চোখে জল। ইচ্ছে, ইচ্ছে শান্ত নরম এক চাওয়া। তোমার ইচ্ছে হয় না।

হয়, হয়। তারাপদরও এক গূঢ় গোপন ইচ্ছা থাকেই। যেমন ছিল সেদিন।

বাপ্পার স্কুলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরিমনিতে গেছল তারাপদ। সেদিন অভিভাবকদেরও যেতে হয়। ফুল লতা পাতা দিয়ে সাজানো ডায়াস। নীচে সারি সারি পাতা চেয়ারে ফরসা জামাকাপড় পড়া বাবা মার পাশে হাসি মুখে তাদের ছেলে মেয়ে। চারিদিকে ফুলের গন্ধ। ধুপের গন্ধ। ভারি সুন্দর পরিবেশ। অন্য অনুষ্ঠান শেষ হলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন শুরু হয়েছিল। প্রথমে উঁচু ক্লাশ থেকে ডাকা শুরু হয়েছিল। যারা যারা র‍্যাঙ্ক করেছে একজন একজন করে ডায়াসে উঠে সভাপতির হাত থেকে প্রাইজ নিচ্ছিল। প্রাইজ নেবার সঙ্গে সঙ্গে হাততালি। দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে গেছল তারাপদ। দেখতে দেখতেই

ধীরে ধীরে এক উত্তেজনা শরীরে দখল নিচ্ছিল। খুব হালকা খুসির এক উত্তেজনা। একটু একটু ঘাম হচ্ছিল তার। তখন কোন দিকেই খেয়াল নেই। নাম ডাক হচ্ছে। নাম ডাকতে ডাকতে একসময় ক্লাশ থ্রি তে আসতেই চমকে উঠল তারাপদ। মাইকে সে স্পষ্ট নামটা শুনতে পেয়েছে। বাপ্পাদিত্য রায় স্টুড ফার্ষ্ট ইন ক্লাশ থ্রি। বাপ্পাদিত্য বাপ্পার পোষাকি নাম।

কোনদিকে খেয়াল নেই তখন তারাপদর। কিছু ভাবার আগেই সে দাঁড়িয়ে উঠেছে। পাশে বাপ্পা বসে আছে তো বসেই আছে। খপ করে ওর হাত ধরে টেনে তুলতে যেতেই চোখ পড়েছিল তার। সেই লোকটা পাশের চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। যেমন হয়। যেমন হয়ে আসছে। তারাপদর এই ইচ্ছার মুহূর্তেই লোকটা উঠে আসে। উত্তেজনায় রাগে ঠিক রাখতে পারে না নিজেকে। সেদিনও পারে নি। বাপ্পার হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে রাস্তায় নেমে তবে শান্তি।

সামনে লেখা দাঁড়িয়ে। ওকে কথাটা বলা যায়। বলতে পারে আগারও ভেতর থরে থরে ইচ্ছা সাজানো আছে লেখা। তোমার গলার মটর মালা হার। কাঁচ বসানো দেওয়াল আলমারি। বাপ্পার লাল টুকটুকে রেসিং সাইকেল। আর ভারত ভ্রমণের তিনটে রেল-গাড়ির টিকিট। এরকম যখন ভাবছে তখনই ঘটনাটা ঘটে যায়। বাপ্পা সামনে এসে দাঁড়ায়। গা ঘেঁষে আসে। তারাপদর হাতটা আলতো ছোঁয়। তারপর হাসতে হাসতে বলে—বাবা আমার সাইকেল।

কি যে হয় তারাপদর। ঠাস করে একটা চড় আছড়ে পড়ে বাপ্পার গালে। ছেলেটা আচমকা ভয়ে হাঁ হয়ে যায়। লেখা দ্রুত ছুটে আসে।

—ছিঃ ছিঃ। আজ ওর জন্মদিন। আর তুমি। তুমি [illegible] না পশু।

[illegible] একটুও কাজে মন বসে না তারাপদর। বাথরুমে [illegible] ঘন ঘন জল খায়। হাতের আঁজলায় জল নিয়ে থাবড়ে থাবড়ে ঘাড়ে গলায় ছিটে দেয়। রগ দুটো দপদপ করে। রবীনকে একবার জিজ্ঞেস করে একটা রেসিং সাইকেলের দাম। চড়টায় কি খুব জোর ছিল। বাপ্পার গালে কি আঙুলের দাগ বসে গেছে। লেখা ঠিকই বলেছে। সে মানুষ নয়। সে পশু। তার কোন ইচ্ছা থাকতে নেই। না: আজ বাপ্পার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। মার্জনা তো চাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ আঘাতে একটু আঙুলের স্পর্শও কি দিতে পারবে না তারাপদ। আজ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরয় সে। কিন্তু আশ্চর্য বাড়ির দিকে পা সরে না তার। উল্টোপাল্টা হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে ময়দানে গিয়ে বসে একসময়। সেখান থেকে গিয়ে বসে গঙ্গার ঘাটে। আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে আসে।

যখন বাড়ি ফেরে তখন বেশ রাত। খুব চুপ-চাপ চারদিক। লেখা একবার তাকিয়ে মুখ নীচু করে কি যেন করে। চট করে একবার তক্তপোষের দিকে তাকিয়ে নেয় তারাপদ। ছেলেটা ঘুমোচ্ছে। সমস্ত বিছানা জুড়ে ছড়িয়ে আছে শরীর। একটা হাত বিছানা থেকে বেরিয়ে ঝুলছে। আলতো হাতে সেটা ঠিক করে দেয় তারাপদ। একটু ঝুঁকে মুখটা দেখে সে। সেই গাল। বুকটা মুচড়ে ওঠে তার।

লেখা উঠে যায়। রান্নাঘরের দরজা খোলার শব্দ হয়। জামা ছাড়ার আগে আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় তারাপদ। তাকিয়ে চমকে ওঠে সে। আয়নার ভেতর সেই লোকটা। লোকটা তার দিকে স্থির তাকিয়ে আছে। রাগে ফেটে পড়তে চায় তারাপদ। তার চোয়ালে চোয়াল বসে। চোখের কোণে উঠে আসে আগুন। সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আয়নার ওপর। তন্নতন্ন করে খোঁজবার চেষ্টা করে লোকটার গালে চড়ের কালসিটে দাগ। যে চড়টা সে ছুঁড়ে মেরেছিল বাপ্পার গালে। ●

ঈশিতা ভাদুড়ীর

গল্প

দু' একটা প্রশ্ন

ধৃতিমান গতকাল চলে গেছে। যদিও যাওয়ার সময় বলে গিয়েছে, তবু কেন এবং কোথায় গিয়েছে, শাশ্বতী জানে না। সে ভাবতে চেষ্টা করল।

চাইবাসাতে গেল কি? সেখানে ধৃতির এক পিসী থাকেন। বিয়ের পর তারা গিয়েছিল একবার। তারপর আর কখনো সেখানে যায়নি। ধৃতিমান ছাড়া বাণী পিসীমার কেউ নেই, কোনদিনও ছিল না। বিয়ের সাতদিন পরে তাঁর স্বামী পুকুরে ডুবে মারা যান। শ্বশুরবাড়ীর লোক যথারীতি 'বৌ অলক্ষুণে' বলে পিসীমাকে তাড়িয়ে দিল। তারপর একা একা এতগুলো বছর কিভাবে থেকেছেন, কিভাবে তাঁর চলেছে শাশ্বতী জানে না। বিয়ের পর অবশ্য ধৃতিমানকে টাকা পাঠাতে দেখেছে। কিন্তু সে ক'টাই বা টাকা! তা এই পিসীর ওপর ধৃতির একটা ভীষণ দুর্বলতা সে লক্ষ্য করেছে, কিংবা বিপরীতটা। সে যাই হোক্, তবু চাকরী, সংসার, প্রিয় কোলকাতা সব ছেড়ে চাইবাসাতে যাবে না সে!

ইদানীং পণ্ডিচেরীর কথা বলত। শান্ত সমুদ্রের কথা বলত, আশ্রমের কথা নয়। সব ছেড়ে ছুড়ে সন্ন্যাস নেবে বলে মনেও হয় না। গৈরিক পোষাক ধৃতির জন্য নয়; ধৃতি নিজেই সে কথা বলে গিয়েছে: "ভাখো, এই যে আমি চলে যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি তা আমি নিজেও জানিনা, আসলে আমার আর এসব ভাল লাগছে না। ধরা যাক্, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণায় চলে যাচ্ছি। সে ক্ষেত্রেও ধর্মের দিকে নয়। আমি যাচ্ছি। ভাল না লাগলে ফিরেও আসতে পারি। তুমি যদি তখনো থাকো দেখা হবে। কিন্তু তুমি তাই বলে আমার জন্যে বসে থেকো না। প্রতীক্ষার ক্ষণ বড় অবিবেচক।" শাশ্বতীও জানে, প্রতীক্ষার ক্ষণ কি সাংঘাতিক হ'তে পারে। এ প্রসঙ্গে কবি পূর্ণেন্দু পত্রীর একটা কবিতার ক'টা লাইন মনে পড়ল:

যে টেলিফোন আসার কথা সে টেলিফোন আসেনি।/প্রতীক্ষাতে প্রতীক্ষাতে/সূর্য ভোরে রক্তপাতে/সব নিভিয়ে একলা আকাশ নিজের শূন্য বিছানাতে।/একান্তে যার হাসির কথা হাসেনি।/যে টেলিফোন আসার কথা আসে নি।......

বিয়ের আগে শাশ্বতী যখন কবিতা লিখে মাত-

মাতি করত। সেইসময় এক পত্রিকা সম্পাদকের সাথে পরিচয় হয়েছিল। সেই আঠাশ বছরের যুবক শাশ্বতীর জন্য তিনটে গোলাপ পাতা পাঠিয়েছিল। শাশ্বতী তাকে ছাখে নি কখনো। সে লিখেছিল—'তার সারা মুখে লাল দাড়ি, চুলের রঙ্ লাল। তার বাবা-মাকে এখনো প্রতিবেশীরা বলে, 'ও তোমাদের ছেলে নয়'। সে চারমাইল একটানা দৌড়াতে পারে, মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিটে ভ'রা গঙ্গা পার হয়। খুব জোরে হাঁটে। লম্বায় পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি, বুকের ছাতি উনচল্লিশ, মেদ নেই। কোনদিন ফুলপ্যান্ট পরে না, ধুতি পরে, রোজ সকালে গঙ্গায় সাঁতার কাটে। ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। নিজস্ব ঘরটা চারতলায়—ঘরে সব সময় হাওয়া, আর হাওয়া। বাবা ছিলেন সরকারী দুঁদে অফিসার…প্রচুর ঘুষ খেয়ে এই বাড়ীটা উনি করেছেন বলে সে মনে করে। সে সিনেমা ছাখে না…নাটক ছাখে…'আন্তিগোনে' দেখেছে। কোন রেকর্ড চালিয়ে ঘরময় কাপড় ছড়িয়ে নাচে; ছোটভাই ছিপছিপে চেহারার, দাদাকে বলে 'বিদেশী বুড়ো'।…' ইত্যাদি ইত্যাদি, সে এক দীর্ঘ চিঠি ছিল।

সেইসব দিন গিয়েছে একসময়। কবিতা নিয়ে মাতামাতি। ভাবলে আশ্চর্য লাগে কতই না বদলে যায় মানুষ। শাশ্বতী কি কখনো ভেবেছিল কবিতা ছেড়ে সে বেঁচে থাকবে, বাঁচতে পারবে! কিন্তু বেঁচে তো আছে। এটাকে কি বেঁচে থাকা বলে? কিছু-দিন আগে ধৃতিমানের সাথে 'পরমা' দেখেছিল। 'পরমা' একটা অত্যন্ত বিতর্কিত ছবি। তা সেই 'পরমা'তে ছিল পরমা অনেকদিন পরে এক রাতে শুতে যাওয়ার সময় সেতারের যন্ত্রপাতি পেয়ে পুরোনো দিনের কথা ভাবছে। সেরকম শাশ্বতী তার কবিতার খাতাটা যদি আজ পেয়ে যায় হঠাৎ, যদিও জানে পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই, তবু যদি পেয়ে যায় তবে কি নতুন করে বেঁচে উঠবে?

কিন্তু, এই যে শাশ্বতী কবিতাকে ছেড়ে সরে এসেছে, সেটাই বা কেন? ধৃতি তো তাকে কোন ব্যাপারে বাধা দেয় নি, অবশ্য উৎসাহও দেয় নি, কোনদিন শাশ্বতীর কবিতা পড়তেও চায় নি। শুধু সেইটুকু কারণেই…? এমনও তো হ'তে পারে কবিতার প্রতি ধৃতির উৎসাহ ছিল না। কে জানে। শাশ্বতীর ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটায় নি। কিন্তু সে যাইহোক, তার নিজের তো কবিতার কাছে কিছু প্রতিশ্রুতি ছিল। তবে? ভাবে। অনেক কিছু নিয়ে ভাবে। পৃথিবীর স্থবিরতা নিয়ে (পৃথিবী কি ক্রমে আরো স্থবির হয়ে যাবে?), ধৃতির চলে যাওয়া নিয়ে। কেন যে গেল? ইদানীং তার জীবনের প্রতি প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা প্রতি মুহূর্তে সে অনুভব করেছে।

শাশ্বতী ভাবল এই বাড়ীটা ছেড়ে দেবে। একা একা এত বড় বাড়ীতে থেকে কি-ই বা লাভ? কাল একটা হস্টেলের খোঁজ করতে হবে। অফিসের সেনগুপ্তদাকে বলতে হবে। ওনার এক শালী চাকু-রিয়ার দিকে কোন্ হোস্টেলে আছে, বলছিলেন।

বাণী পিসীমাকে একটা চিঠি লিখবে ভাবল। পরক্ষণেই ঠিক করল, লিখবে না; ওই বুড়ীকে ব্যস্ত করে কিই বা লাভ? অথচ, ধৃতির তো তেমন কেউ নেই, যাকে ও এগতে পারত (আসলে কোন মানুষেরই কি তেমন কেউ থাকে?)?

এখন রাত একটা। শাশ্বতী বিছানার ওপর চুপচাপ বসে আছে। জানলা দিয়ে বাইরের আকাশ দেখছে। শাশ্বতী ভাবছে, এই যে ধৃতিমান চলে গেল। আর হয়তো কখনো আসবেও না, এর জন্যে কি তার দুঃখ হচ্ছে? বুঝতে চেষ্টা করল। আসলে এই প্রশ্নটা গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে তার পেছনে তাড়া

করছে। সে ভেবেই পাচ্ছে না যে, ধৃতি চলে গেল বলে তার কতখানি কষ্ট হ'চ্ছে? আদৌ হ'চ্ছে কি? ধৃতি যদি আর কখনো না আসে, তবে কি সে বাঁচবে না? না, একথা সত্যি নয়। তার আঠাশ বছর বয়েস হয়েছে। এতদিনে ও সেটা বুঝেছে যে, কারো জন্য কিছু আটকে থাকে না। মানুষ চলে যায়, সাথে সময়ও তো। তাছাড়া, কবিতাকে ছেড়ে সে যখন এতকাল বেঁচে বর্তে আছে (জানেনা অবশ্য এটা বাঁচা কিনা)। তখন ধৃতির উপস্থিতি এমনই কি জরুরী? ধৃতির উপস্থিতি জরুরী হোক, অথবা, না হোক, ধৃতিকে সে ভালবাসত। এইটুকু ভেবেই আবার শাশ্বতীর কষ্ট হ'ল। মানুষ নিজেকে ভয়ানক মিথ্যে কথা বলে। ভালবাসা কি তা শাশ্বতী জানেই না। তখন সতেরো বছর বয়েস অভয় শ'খানেক চিঠি লিখেছিল—সাদা ফুলস্কাপ পাতায় শব্দের ঘরবাড়ী, আবেগের দরোজা-জানালা—শাশ্বতী একসাথে সের দরে বিক্রী করে দিয়েছে। সেগুলো আজ কোথায়? ঠোঙা হয়ে গিয়েছে? কোন ঝালমুড়িওয়ালা অথবা বাদামওয়ালার কাছে?

আসলে ভালবাসা যাই হোক না কেন, ধৃতিকে ভালবাসুক, অথবা না বাসুক, তবু ধৃতি নেই। এতে তার কষ্ট কে ঠেকাবে? সে যে একা হয়ে গেল, একথা তার চেয়ে বেশী আজ কে জানে? যদিও অল্পবয়েসে শাশ্বতী ভাবত, কোন মানুষই কোন মানুষকে একা করতে পারে না। আমৃত্যু তো আমরা একাই। আত্মীয় বন্ধুর আন্তরিকতাতে ভরপুর থাকলেও। অল্পবয়সের ধারণা সত্যি নয়। শাশ্বতী আজ উপলব্ধি করতে পারে। আসলে এই অনুভূতিগুলো সবসময় একরকম থাকে না, ধরণ বদলে যায়। এই যে ধৃতি নেই, শাশ্বতী কাকে বলবে তার সহকর্মী দ্বিজেন দাসের বোকামির গপ্পো, কাকে বলবে, 'জানো আজ বাসে কি মজা হয়েছে......!

ধৃতিমান চলে গেল এ' প্রশ্নের জবাব খুঁজতে, এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে শাশ্বতী ধৃতির নীল ডায়েরীটা হাত বাড়িয়ে কোলের ওপর তুলে নিল। যদিও এর আগে কখনো অন্যের ডায়েরী পড়েনি সে। আজ এই প্রথম, পাতা ওল্টালো। বিচ্ছিন্নভাবে ধৃতিমান তার সুন্দর হাতের লেখায় লিখেছে:

"সাতাত্তরে প্রতিদিন ডায়েরী লিখতাম। এছাড়া কোনদিন কখনো লিখি নি। তবুও প্রত্যেক বছর আমি একাধিক ডায়েরী পাই।...অকাদেমী থেকে 'খাঁরীচ সংবাদ' দেখে ফিরছিলাম, তিনটে নক্ষত্র গালাগালি করে বলে উঠল, 'ফিলিপিন রক্তাক্ত বিদ্রোহের মুখে'...'অমৃতসরে অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীর গুলিতে দু'জন আহত'·'কলকাতার নানা স্থানে শান্তি মিছিল'...নক্ষত্রেরা ডুবে গেল আকাশের গলা জলে।

...শরতের হিমলাগা ভোরে একজন অতিশয় সাধারণ মানুষকে তার বাড়ী থেকে সাড়ে চার মাইল দূরে একটা পুকুরের লাগোয়া সিঁড়িতে বসে থাকতে দেখি--আমার মনে হয়, সেই মানুষ প্রতিটি হিমলাগা ভোরে পুকুরের জলে বিন্দু বিন্দু শিশিরকণাকে মিলিয়ে যাওয়া অবধি দেখার জন্যে সাড়ে চার মাইল হাঁটে—পৃথিবীতে আশ্চর্যের শেষ নেই!

...মাঝে মাঝে কেমন আশার মত মনে হয় এই গাছপালা, ঝড়, বৃষ্টি, সুন্দরী ট্রামের চিৎকার এবং দু'চারটে মানুষ...মনে হয় কেমন এই অপরিমেয় এই ভোরের কুয়াশা এবং রাতের অন্ধকার পরক্ষণেই সেই মুখগুলো ভাসে...হাওড়া ষ্টেশনের ফ্লাইওভারের নিচে যে মানুষগুলো শুয়ে থাকে, বসে থাকে, যাদের চারপাশে দেওয়াল নেই, মাথার ওপরে ফ্লাইওভারে অসংখ্য গাড়ি চলে তারা কি শীতের কাঁপুনি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে নিজেদের মধ্যে ঘন হয়ে যায়? অথবা, তারা কি বর্ষার ভেসে যায়?...আকাশ জোড়া বিরাট

শূন্যতা—কিছু নেই—তবু সবই আছে হৃদয়ের কাছে··· নিবিড় কোনো নিশ্চয়তা আমাদের জীবনের পথে অথবা চেতনায় নেই, তবুও এই জীবন চের বেশী নিবিড়···যদিও দিনের আলো ভেদ করে শোনা যায় নিখুঁত অনুশীলন, এবং রাতে অন্ধকার খুঁড়লেই স্খলনের ইতিহাস—তবুও এক শতাব্দীর বিনাশ ঘটলে আর এক শতাব্দীর কথা জানতে আমাদের ক্রমেই জাগে প্রবল ইচ্ছে ···

প্রতিদিন সকালে আপিস যাওয়ার পথে একজন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ভিখারীকে বসে থাকতে দেখি···তবুও অনেক বিবর্ণতার পরে আমার মা-এর কথা ভাবলে আকাশটাকে কেমন ভাল বলে মনে হয়।"

আরো অনেক কিছু লেখা আছে। সব পড়েও শাশ্বতী জবাব পেল না, কেন ধৃতিমান চলে গেল ?

কেন ? কেন ? ডায়েরীটা সরিয়ে রাখল। আর ভাবতে পারছে না শাশ্বতী।

এই রাত ভোর হবে একসময়, আরো অনেক রাত পার হবে। এখনো এই সব প্রশ্ন তাড়া করে বেড়াবে শাশ্বতীকে।

ধৃতিমান কেন যে চলে গেল ? ও কি তবে অন্য কোন মেয়েকে···তাও তো মনে হয়নি কখনো।

ধৃতির মা মৃত্যুর আগে কি বলতে চেয়েছিলেন তাকে ?

ধৃতি কেন···?

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

O তিনটি গোধূলি-মন পেয়েছি। (শ্রাবণ সংখ্যা—১৩৯২) জঁ্যা-পল সার্ত্র স্মৃতি সংখ্যাটির জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রাপ্য। তাই এই চিঠি আজ লিখছি। অজিত রায়কে তাঁর অনূদিত গল্পটির জন্য বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। গল্পটি উত্তর প্রবাসীতে প্রকাশিত হ'তে পারে। তাঁর প্রবন্ধটিও আকর্ষণীয়। আর অমল হালদার মহাশয়কে ও তাঁর লেখা জঁ্যা-পল সার্ত্র ঃ সাহিত্য চিন্তা প্রবন্ধটির জন্য অনেক ধন্যবাদ। এঁদের লেখায় গোধূলি-মনের পাঠকরা বিশেষভাবে উপকৃত হলেন। ১৯৬৪ সালে সার্ত্র-কে নোবেল পুরস্কার দেবার পর (যদিও তিনি তা প্রত্যাখান করেন) দুই দশক পর এবার আর একজন ফরাসী লেখক (ক্লোদ সিমঁ) নোবেল পুরস্কার পেলেন। একটি প্রবন্ধে ক্লোদ-সিমঁর কথা লিখতে গিয়ে সার্ত্র-র প্রসঙ্গ এসে গেলো। প্রবন্ধটি উত্তর প্রবাসীর জন্য লিখেছি। ভাবছি সার্ত্রর অনূদিত গল্পটি (ইরোস্ট্রেটস) একই সংখ্যা উত্তর প্রবাসীতে প্রকাশ করব। আপনার মাধ্যমে অজিতবাবু এবং অমলবাবু উভয়ের লেখায় পুনর্মুদ্রণের জন্য সৌজন্যমূলক অনুমতি এই পত্রের মাধ্যমে চাইছি।

আশা করি পত্রের মর্ম তাদের কাছে পৌঁছে দেবেন। আপনারা আমাদের অভিনন্দন ও বিজয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

গজেন্দ্রকুমার ঘোষ
স্লুর্টে-২, সুইডেন

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়ের

গল্প

শেষ আবিষ্কার

বাসস্টপে একজন মাত্র লোক। এলাকাটা পুরোপুরি শহুরে নয়। আবার খুবই যে গ্রাম্য বলা যাবে, তাও হবে না। সময়টার ক্ষেত্রেও তাই। পুরোপুরি রাতও নয়, আবার সন্ধ্যে বললেও ভুল হবে মস্ত রকম। তো এরকম একটা এলাকা। এরকম একটা সময়। আর এরকম একটা নিঝুম-নির্জন বাসস্টপে সে রয়েছে একলা দাঁড়িয়ে।

ধোঁয়াটে, বেশ একটা গা-ছমছম পরিবেশ। দূরে, বেশ দূরে, কিছু দোকানপাট অবশ্য আছে। সেখানে কিছু লোকজনও আছে। তবে এখানে রয়েছে কেবল কানাগলি, নিমগাছ; আগাছার জঙ্গল। একটু তফাতে বট কিংবা অশ্বত্থ। নীচে চাতাল বাঁধানো শিব আর ত্রিশূল। ছড়ানো-ছিটানো কিছু ঘুম ঘুম একতলা বাড়ীও রয়েছে কাছে পিঠে। একটা দোতলা বাড়ী এমনভাবে মাথা উঁচিয়ে ঝুঁকে আছে, যেন ঠিক মাষ্টারমশাই। আর আশপাশের একতলাগুলো পিটিশ-পিটিশ তাকিয়ে থাকা ছাত্রের দল। নেই কাজ, তো খৈ ভাজ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকটা এইসব দেখছিল আর ভাবছিল। কখন যে বাস আসবে তার তো কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

এদিকে আবার ভোল্টেজ ফল ক'রে গেছে। রাস্তার যে ল্যাম্পপোষ্ট দুটো তফাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাতে অ্যাস্তুটো বাব যে লাগানো আছে, সেটাই কেবল বোঝা যাচ্ছে কোনোক্রমে। বাড়ীর সাপ্লাই পুরোপুরিই বন্ধ। মাঝে মাঝে তাই দেখা যাচ্ছে জানালা পার হয়ে হারিকেন চলে যাচ্ছে হেলে-দুলে এধার-ওধার।

মনে মনে বিড় বিড় করলো লোকটা, আমি যদি গল্প লিখতে পারতাম, তাহলে এমন একটা পরিবেশে কি করতাম? নিশ্চয়ই নিমগাছের ডালে আস্ত একটা ভুতকে বসিয়ে দিতাম। ভুতটা সরু ডালে ব'সে লিকলিকে ঠ্যাং দোলাতো। দোলাতে দোলাতে নাকিসুরে চিঁহিমিহি হাসতো। কথা কইতো। ভাবতে ভাবতে লোকটা যেই নিমগাছের দিকে তাকিয়েছে, অমনি গা-টা কেমন যেন ছমছম করে উঠলো। যত সহজে নিমগাছের দিকে তাকিয়েছিল, তত সহজে আর চোখ সরাতে পারলো না লোকটা। ঘাড়টা যেন কেমন শক্ত-শক্ত লাগছে। তাছাড়া খুড়ুস-খুড়ুস ক'রে কি-যেন শব্দ হচ্ছে একটা। নিমগাছের ডালে। কাঁপতে কাঁপতে দড়ির মত লম্বা আর সরু কি-যেন একটা জিনিস ঝুলেও পড়লো। ঝুললো আর দুলতে লাগলো। লোকটা কিন্তু এবার বেশ ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু সেটাকে সে আন্তরিকভাবে টের পেলেও বাহ্যিকভাবে স্বীকার করতে চাইলো না। মনে মনে সে বললো, আমি যদি গল্পকার হ'তাম, তাহ'লে এটিকেই আমি ভুতের একটি টিঙ-টিঙে ঠ্যাং বানিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু এ মুহূর্তে তা আমি ভাবতে চাইনা। তাছাড়া আমি গল্পকারদের মতন গাঁজাড়ে নই। আজগুবি কিছু বানিয়ে ফেলারও মানে হয়না। এই অবধি ভেবে লোকটা একটা বড় ক'রে ঢোঁক গিললো। আর নিজেকে নিজেই প্রবোধ দিল এই ব'লে যে ওটা নেহাতই একটা হনুমানের লেজ। গল্পকারেরা শেষকালে এইটিকেই তো অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। সবাইকে ভুতের ভয় দেখিয়ে পরে বোকা বানায়। তো, আমি যেহেতু গল্প গড়ে তুলতে মোটেই চাইনা; সেহেতু আমি হনুমানের লেজের কথাটা আর চেপে রাখতে চাইছিনা। এই অবধি ব'লে নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ালো লোকটা। সময়োচিত আবিষ্কার অনেক ভিত্তিহীন ভয়কে চিনিয়ে দেয়। ফলে এভাবেই এসময়টায় সে বেশ সাহসী হ'য়ে উঠলো। আর সাহস যখন এল, তখন হাততালি দিয়ে হনুমান তাড়ানোয় কোনো আপত্তি নেই।

কিন্তু দু'তিনবার হাততালির শব্দ হওয়া মাত্রই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। এতক্ষণ যে লম্বা লেজটি টালুমালু দুলছিল, সেটি হঠাৎ খসে পড়লো মাটিতে। থুস ক'রে। থুস ক'রে বললেও আসলে শব্দ তো আর হয়নি তেমন। থুস ক'রে পড়লো মানে আলগা ভঙ্গীতে, আলতো পড়ে গেল। গেল তো গেল, কিন্তু সেইসঙ্গে লোকটার পিলেটাও যে চমকে গেল। মস্ত হনুমানের প্রমান সাইজ লেজ, টুপ ক'রে কিনা খসে পড়লো টিকটিকির মত। তবে কি কোনো হরমোনের গণ্ডগোলে ক্ষুদ্র টিকটিকিও এক্ষণে বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে! আইডিয়াটা মাথায় আসতেই সে লাফিয়ে উঠলো। আর এ সময়েই তার ফের একবার মনে হ'ল, ইচ্ছে করলেই সে একজন কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর লেখক হ'তে পারতো। যুক্তি স্বরূপ সে সেই মুহূর্তেই খাড়া করলো তিনটি পয়েন্ট। প্রথম পয়েন্ট বোটানিক্যাল। এই পয়েন্টটির আওতায় আসছে একটি নিমগাছ। দ্বিতীয় পয়েন্ট জু-লজিক্যাল এবং সেটির আওতায় হনুমান কিংবা টিকটিকি। তৃতীয় এবং শেষ পয়েন্টটি হ'ল স্পিরি-চুয়াল। এটির আওতায় ভুত কিংবা ভৌতিকতা। মনে মনে এভাবে পয়েন্টগুলি সাজিয়ে ফেলতে পেরে

সে বেশ খুশিতে ডগমগ হ'ল। এবং গলা ঝেড়ে সর্দি সরিয়ে নিয়ে একটা বড়সড় ঢোঁক গিলে ফেললো গঁৎ ক'রে। ততক্ষণে সে টের পেয়েছে তার পা-দুটো তির-তির করে কাঁপছে। এবং তার হৃৎপিণ্ডও দ্রুত রক্ত সঞ্চালনে ব্যস্ত। সে মনে মনে বলল, এটি কিছুই নয়। স্রেফ একটি আবিষ্কারের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া মাত্র। আমি যে ইচ্ছে করলেই সায়েন্স-ফিকসন লিখিয়ে হ'য়ে উঠতে পারি, এটা তারই লক্ষণ। এবং অবশ্যই এটাও একটা পয়েন্ট। সে এই পয়েন্টটিকে ফিজিওলজিক্যাল আখ্যা দিল।

চার-চারটি পয়েন্ট এখন তার হাতের মুঠোয়। সুতরাং সে পড়ে থাকা লেজটি কুড়িয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখাটাই শ্রেয় ব'লে মনে করলো। এবং এই মুহূর্তে সে অবশ্যই একবার কপালে হাতটা ছুঁইয়ে ফেললো। হয়তো অভ্যাস বশে। নয়তো এটা তার মনের অবচেতন ক্রিয়া-কলাপ। পরবর্তী বিশ্লেষণে সে, ব্যাপারটিকে মোটেই প্রণাম ব'লে স্বীকার করতে চাইলো না। বরং মনে মনে এইটিই সিদ্ধান্ত নিল যে, আমি যখন বিজ্ঞান-বিষয়ক চিন্তায় ব্যস্ত, তখন এটি মস্তিষ্কের কার্যা প্রণালীতে খুশি হয়ে তাকেই বাহবা দেয়া ভিন্ন আর কিছু নয়। তার নিজের ভাষায়, আমি এইক্ষণে নিজ মস্তিষ্কের পৃষ্ঠদেশ চপেটায়িত করিলাম। চপেটায়িত অর্থে চাঁটানো নয়, সে চাপড়ানোর কথাই বলতে চাইল। এবং ভাষাপ্রয়োগে তার এই যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন এই কারণে যে, এই মুহূর্তে সে অন্য সমস্ত কল্প-বিজ্ঞান কাহিনিকারদের থেকে নিজেকে সাহিত্যিকতায় এক ডিগ্রী বেশি উত্তীর্ণ বলে মনে করলো।

অন্ধকার আরো বেশি ঘন হয়েছে এখন। কোনো দূর একতলা বাড়ীর জানালাতেও কোনো কিশোর বা কিশোরীকে দেখা গেল না পড়াশুনো করতে। দু'একটি বাড়ীর আধখোলা জানালা দিয়ে হ্যারিকেনের সামান্য আলোই কেবল আসছিল। দূরের দোকানপাট তো এখান থেকে প্রায় দেখাই যায়না। আর আশ্চর্য রাস্তা বটে! একটা লোকও কি এতক্ষণে হেঁটে যেতে পারতো না, এই রাস্তা ধরে। অন্ততঃ একটা নিরীহ নির্বিবাদী লোকও তো হেঁটে যেতে পারতো গুটগুট ক'রে। কাঁপতে থাকা হাঁটুকে ডান হাতে চেপে চারপাশ তাকিয়ে দেখলো লোকটা। নাঃ, চারিধার সুনসান। খাঁ-খাঁ করছে একেবারে।

লোকটার চোখদুটো ছল-ছল ক'রে উঠলো এ সময়। বাড়ীতে নিশ্চয়ই এখন হৈ চৈ পড়ে গেছে। সে তার বউয়ের মুখটা চট ক'রে এঁকে ফেললো চোখের সামনে। ভয়ংকর রাগী একটা মুখ। মুখটা হঠাৎ ব'লে উঠলো; কোন চুলোয় যাবে? গিয়েই দেখোনা একবার। একটা রাতও যদি কোথাও গিয়ে কাটিয়ে আসতে পারো। মুরোদ যে কত, তা তো আমার ঢের জানা আছে। ছেলে-মেয়েগুলোর মুখ মনে পড়ে গেল। মুখগুলো এমন, যেন হাত-চাপা দিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব হাসছে। অভিমান ডুকরে উঠলো বুকের ভেতর। পাতা ছাপিয়ে দু'ফোঁটা লোনা জল যেন গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। বাঁ-হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কাল্পনিক জলটুকু মুছে নিল সে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ালো। নাঃ ওসব কথা আর মোটেই ভাববে না সে।

বরং অন্ধকারে, এই মুহূর্তে একটা কাজের মত কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখবে সে। এ কাজে যদি মৃত্যুও আসে, তো সেওভী আচ্ছা। তার এই মৃত্যুর কথাটা ভেবে ফেলার একটা কারণ আছে অবশ্য। এখন যে সে রীতিমত দ্বন্দ্বে পড়েছে। দ্বন্দ্ব ঐ পড়ে থাকা বস্তুটাকে নিয়ে। ওটা যেমন ভূতের ঠ্যাং কিংবা হনুমান টিকটিকির লেজ হতে পারে, তেমনি অন্য কোনো সাপ-টাপ হওয়াও তো অসম্ভব নয়।

এইমাত্র ঠিক ঝাপা ছ'পা এগোলো সে। এবং অবশ্যই যেটা তার কথায়, আবিষ্কারের উত্তেজনা বশত: কাঁপতে কাঁপতে। তারপর থমকে থেমে দ্রুত একপাটি চটি তুলে নিল হাতে। তার ইচ্ছে হ'ল প্রথমটায় সে চটি ছুঁড়ে দেখবে, বস্তুটা সত্যিই সাপ-খোপ কিনা। এভাবেই তার পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ চলুক। চলতেই থাকবে. যতক্ষণ না সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে।

কিন্তু ঠিক এই মুহুর্তেই ঘটলো একটা অঘটন। যেই-না সে হাতে চটি তুলেছে, অমনি নিমডাল থেকে কে-যেন লাফিয়ে পড়লো ঝুপ ক'রে। সে চমকে চেঁচিয়ে উঠলো কাতর আর্তনাদে—কে...? কালো-কুঁদো ছায়াময় একটি শরীর তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। বললে, জুতা মাত মারিয়ে সাহাব। হামকো কুছ কসুর নেহী। ভুতটাকে জোড়হাতে অনুনয় বিনয় করতে দেখে লোকটা হঠাৎ ভয় ছাপিয়ে রাগ দেখাবার আপ্রাণ চেষ্টা করলো। বললো, কসুর নেহী। তুম কিঁউ গাছের ডাল পর চড়া থা?

সে বেশ টের পাচ্ছে তখন, তার পা-দুটো ভয়ংকর কাঁপছে। ফোকলা মুখে চোয়ালে চোয়াল, মাড়িতে মাড়ি লেগে যাবার অবস্থা। তবু সে ফের ঝাঁঝিয়ে উঠলো, চড়া থা, বেশ করা থা। কিন্তু লুকায় গিয়া কাহে?

ভুতটা তখন ভীষণ কাচুমাচু। ঘাবড়ানো গলায় কোনোরকমে বললো, হম ডর গয়া থা সাহাব। ডর? মানে ভয়! ভুতেরও ভয় লাগে তাহলে! বুক ধক-ধক, পা থর-থর, এসবও হয়! আশ্চর্য্য! কিন্তু আশ্চর্য্য লাগলেও সুযোগটা সে হাতছাড়া করতে চাইলো না। ভয়-ভীতিকে প্রাণপণে চাপতে চাপতে সে ব'লে উঠলো, ডর নহী ক্যায়। কোনো ডর নেহী হ্যায়। আর একথা বলতে বলতে সে প্রায় হাতটাকে বাড়িয়েই দিয়েছিল ভুতের কাঁধের দিকে। কিন্তু ভুতটা ততক্ষণে ঝুঁকে পড়ে তুলে নিচ্ছে সেই হতে-পারতো হনুমান-টিকটিকির লেজ কিংবা হ'তে পারতো সাপ-টাপ বস্তুটিকে। সে তখন আর সেটির ব্যাপারে একেবারেই মাথা ঘামাতে চাইল না। তখন তার ভারী আনন্দের সময়। যে ভুতেরা লোককে ভয় দেখিয়ে বেড়ায়, সেই ভুতই কিনা আজ তাকে দেখে ভয় পেয়ে গেছে। বোঝ কারবার। ভেতরে ভেতরে এ সময় এক ঝলক দমকা হাসি হেসে নিতে পারলে বেশ হ'ত। তার মনে পড়লো, রিটায়ার করার পর এই এতগুলো বছরে তাকে কারোর ভয় পাওয়া এই প্রথম। কিন্তু এরই মধ্যে ভুতটা উঠে দাঁড়িয়েছে। এইমাত্র কুড়োনো জিনিসটা কাঁধে ফেললো ঝপ ক'রে। লোকটা এবার আশীর্বাদী কায়দায় খুশি খুশি ব'লে উঠলো, তোমার ভবিষ্যত সুখের হোক।

এমন কথা শুনেও ভুতটা হাসলো না। অবাকও হল'না এতটুকু। বরং গদগদ স্বরে বললো, মেরে তরফ-সে ইয়ে ছোটাসী ভেট সাহাব। স্বীকার কীজিয়ে।

ভেট, মানে উপহার। লোকটা আপ্লুত। চোখ বুঁজে আবেগ চাপালো সে। তারপর চোখ খুলতেই দেখলো: চারপাশ অন্ধকার। কেউ কোথাও নেই। লোকটা থরপায়ে হেঁটে এল একটা একতলা বাড়ীর কাছে। সামনে আধখোলা জানালা। বেরিয়ে আসা হারিকেনের আলোয় সে মেলে ধরলো তার দুটো হাত। আজ, এই প্রথম, জীবনের এক পরম প্রাপ্তি তার। সে তাকালো অবাক চোখে। তাকিয়েই রইল। তার হাতে তখন চারগাছি নিমের দাঁতন।

শতদ্রু মজুমদারের

গল্প

একটি মৃতদেহ উদ্ধারের কুচকাওয়াজ

শানের ওপর বসে মেজাজে সাবান মাখছিল ফ্যালারাম। হঠাৎ খেয়াল হল, লোকটা যে ডুব মারল আর উঠল কই। দুপুর বেলা। চৌসীঘানায় জন–মনিষ্যি নেই। এরকম একা একাই চান করে যেতে হয় রোজ।

লেদের কারখানায় কাজ করে ফ্যালা। একটায় টিফিন। বাড়ি থেকে আসতে আসতে দেড়টা। রবিবার দিন তবু দু'চারজন থাকে। ছেলেদের হুড়ো-হুড়ি চলে বেশ বেলা অব্দি। অন্যদিন ধু–ধু পুকুর।

কিন্তু গামছা কাঁধে লোকটা যে ডুব গাললো, আর তো উঠতে দেখা গেল না। এটা ভাববার। তবে এই নিয়ে বেশি ভেবে সময় নষ্ট করাটা ঠিক হবে না এখন।

পাশেই বেচুদার বাড়ি। গা-হাতে সাবানের ফেনা নিয়ে ফ্যালা ছুটল।

বেচুদার ঘড়ির দোকান রামচন্দ্রপুরে। দুপুর বেলা বাড়িতেই থাকে। খাওয়া–দাওয়া সেরে গালে একটা কাঁচা সুপুরি পুরে সবে নস্যির ডিপেতে টোকা দিচ্ছিল বেচুদা, এমন সময় ফ্যালার টানা–হ্যাঁচড়া।

'চলো মাইরি, চলো একবার—'

বেচুদা বলল, 'তুই লোকটাকে চিনিস নাকি?'

কি ভেবে ফ্যালা বলে দিল, 'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে তুলসী ধাড়ার ছেলে।'

'কে রকম দেখতে বল তো?'

ফ্যালা যা বর্ণনা দিল, হুবহু বিশু মান্নার। বিশু দাস পাড়ায় থাকে। তাকে জন্মেও কেউ কোনোদিন বড় পুকুরে আসতে দেখে নি। বাপ–মায়ের আলুভাতে মার্কা ছেলে। শ্মশান ধার দিয়ে গেলে এখনো কড়ে আঙুল কামড়ে বুকে থুতু দেয়। সে আসবে বড় পুকুরে? তাও এই ভর দুপুরে! আর তুলসী ধাড়ার ছেলেই বা আসবে কোত্থেকে! বঙ্গোপসাগরে ইলিশ মাছ ধরতে গিয়ে সে ফেরেনি প্রায় দু মাস।

বেচুদা মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'হতভাগা—গাঁজা-কাজা খেয়েছিস, না কি?',

'না মাইরি কালীর দিব্বি বলছি—'

নস্যি টেনে লুঙিতে নাক মুছল বেচুদা।

'তুই তো ঠিক করে বলতেই পারছিস না—'

দাওয়ায় বসে পৈতের সুতো বানাচ্ছিল বেচুদার মা। নাকি সুরে বলল, 'ওরে অ বেচা, যা না একবার গিয়ে দ্যাখ না অত নাম–ধামের কী দরকার? এ তোর ক্যামন ধারা কথা, এ্যাঁ?'

বেচুদা আর কী বলে। গজগজ করতে করতে বেরিয়ে পড়ল। পুকুর ধারে দাঁড়িয়ে চোখে চশমা দিয়ে দৃষ্টি ছুট করাল ওপার বরাবর।

লম্বা ছিপ নাচিয়ে নাচিয়ে একটা লোক আও-লার মাছ ধরছিল। তাকে ডেকে জিগ্যেস করতে বলল, 'না বাবু, আমি তো এ্যায় এদু কয় কাউকে তো দেখি নাই—'

ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে ক্যালা বলল, 'কী হবে বেচুদা ? বেচুদা চুপ।

'সত্যি বলচি। এ্যায়—এই খানটায়—'

জলে একটা ঢিল ফেলে জায়গাটা দেখিয়ে দিল ক্যালা।

বেচুদা বলল, 'তাহলে আমি নামছি। তুইও আয়—'

'না মাইরি, আমি ভালো সাঁতার জানি না। তুমি তো জানো—'

'আরে আমি তো ডুব গেলে দেখব কিছু হলে তুই আমার হাতটা ধরবি শুধু—'

'না না মাইরি—অসুবিধা আছে—', ক্যালা বোধহয় এবার কেঁদেই ফেলবে।

বেচুদার হয়েছে বিপদ। একে দুপুরের ঘুম তো মাটি হলোই; তার ওপর কী ক্যাকড়া যে বাঁধতে চলেছে, ভগবানই জানেন। অথচ লোকটাকে না তোলা পর্যন্ত সরে পড়াটা ঠিক ন্যায্য হবে না।

ঘড়ির দোকানদার হলে কী হবে! নামডাক একটু আছে। আর, জি পার্টির সেক্রেটারি। খেলার মাঠে সাইকেল চোর ধরার জন্যে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির ছেলেরা পুরস্কার দিয়েছিল একবার।

আর একটা মানুষকে জলে ডুবিয়ে রেখে সেই বেচু সাঁতরা কেটে পড়ে কী করে।

ঘরে বসে অংক করছিল বেচুদার ছোট ছেলেটা। এই ফাঁকে সেও সাইকেলের চাকা চালাতে চালাতে বেরিয়ে পড়েছে।

ছেলেটা বলল, 'বাবা হারুদাকে ডেকে আনবো ?'

রায় পাড়ার থাকে হারু নস্কর। দুবেলা ব্যায়াম সমিতিতে বার্বেল চাগায়। এক চিলে নারকোল পেড়ে দাঁত দিয়ে ছাড়িয়ে মাথা ফাটিয়ে খেয়েছিল। এরকম আরো অনেক গুণই আছে। কিন্তু জলে ডোবা মানুষকে সে তুলতে রাজী হবে কিনা, চিন্তার বিষয়।

বেচুদা বলল, 'যা —'

জোরসে চাকা চালিয়ে সে ছুটল।

দুটো জেলে যাচ্ছিল পুকুরপাড় দিয়ে। তাদের ডেকে বলতেই একজন বলল 'না বাবু জলে ডোবা মানুষের শরীলে বড় বল হয়—'

বেচুদা সাহস দিতে লাগল এনতার। জেলেদের সেই একই কথা।

ততোক্ষণে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে খবর। বড় পুকুরে একটা লোক ডুব গেলে আর ওঠেনি। রাজাদের পুকুর। সেই কোন আমলের। পুকুর কাটার সময় দুটো কুমারী মেয়ে বলি দিয়ে জল আনা হয়েছিল। সারা পৃথিবীর জল শুকিয়ে গেলেও বড়-পুকুর টই-টম্বুর। পরে সেই মেয়েদুটো জটাবুড়ি হয়েছে।

এসব এক সময়ে লোকের মুখে মুখে ছিল। এখনকার অনেকেই বিশ্বাস না করলেও একা একা মাঝ-মধ্যিখানে যেতে বড় একটা সাহস করে না কেউ। একবার নাকি তেউরদের একটা বউকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। চোখে কেউ দেখেনি। শোনা কথা। তাতেই ভয়।

পুকুর পাড়ে পাড়ে ম্যালায় লোকজন। এ-পাড়া সে-পাড়া থেকে কাতারে কাতারে আসছে।

জটাবুড়ির কথা যারা বিশ্বাস করে না তারা

যেমন এসেছে, যারা করে তাদের ভিড়ও কম নয়।

বেচুদা আর ফেলাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে সবাই। বৃত্তান্ত শোনার জন্যে কান খাড়া।

ঘাটের কাছে ডুব মেরে আর ওঠেনি যখন, কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না, জটাবুড়ি টেনে নিয়ে গেছে। তেউরবউকেও নাকি ঠিক এরকম জায়গা থেকে টেনে নিয়েগিয়েছিল। অনুপক্ষের মত, লোকটা নির্ঘাত নেশা করে জলে নেমেছে। নেশা-গ্রস্ত লোক জলে ডুব গাললে আর ওঠে না। সেবার সরস্বতী নদীতে পঞ্চা কলুর যা হয়েছিল আর কী। নদীতে বুক জল। লোকটাকে বাঁচানো গিয়েছিল তাই। কিন্তু এটা বড়পুকুর। সিঁড়ি শেষ হলেই জল দুমানুষ সমান। গড়ানে পুকুর। তলায় গড়াতে গড়াতে কতদুর চলে গেছে কে জানে।

পাড়ার এক মাতব্বর নীলরতন মাষ্টারের ছেলে অনুপম। ফোপর-দালালি ওর কাছে মুড়ি-মুড়কি। জলে-ডোবা মানুষকে কী করতে হয়, এটা অনুপমের জানা ছিল। দু-এক জনের পেটের জলও সেই সব কায়দা-কানুনে বার করেছে। কিন্তু খবর গেছে এক রকম, এসে দেখে আর এক। লোকটাকে এখনো জল থেকে তোলাই হয় নি।

বেচুদার অনেক আশা ছিল। অনুপম হতাশ করল। সে, বলল ডুবুরি ছাড়া আর কেউ তুলতে পারবে বলে মনে হয় না।' রাজগঞ্জে গেলে একটা ডুবুরি যোগাড় হতে পারে। কিন্তু সে তো যাওয়া-আসাই এক ঘণ্টা।

ভিড় সরিয়ে এগিয়ে এল বেচুদার মা।

'যা করবি, সে বেঁচে থাকতে থাকতে কর বাবা—'

বেচুদা সরিয়ে দিল মাকে।

কেন ফ্যাচ ফ্যাচ করচো, তমি যাও তো—'

অনুপম রাজী হল জলে নামতে। তবে খানিকটা পাতকোর দড়ি লাগবে। নিজের কোমরে দড়ি বেঁধে অনুপম জলের তলায় চলে যাবে। সেই দড়ি থাকবে ওপরে কয়েকজনের হাতে। লোকটা যদি বেঁচে থাকে, তাহলে আর একজনকে যাতে টেনে নিয়ে যেতে না পারে তার জন্যে এই ব্যবস্থা।

অনুপম বুঝিয়ে বলল ব্যাপারটা।

তিনটে বাড়ি থেকে পাতকোর দড়ি এল। তার-মধ্যে একটা কাপড়ের পাড় বলে বাতিল করা হয়। বাকি দুটো দুফেলতায় কোমরে বাঁধার ব্যবস্থা হচ্ছে, এমন সময় হারু এল। তখন ভিড়টা আবার তাকে ঘিরে। যেন এখানে সে খেলা দেখাবে। শুনেই গায়ের জামা খুলল হারু।

একটা ছেলে আর একজনকে ফিসফিস করে বলল, হাতের গুলি দেখছিস—'

বেচুদা ধমকে উঠলেন, 'এ্যায় যা—যা সব · '
হারু জানতে চাইল, 'ঠিক কোন খানটায় ডুব গেলে-ছিল?' ফ্যালা আবার ঢিল ফেলল।

'এ্যায়, এই খানটায়।'

জেলে দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে হারু জলে নামতে যাবে, বেচুদার মা কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠল, 'ওরে আর কাকে তুলবি রে—সে তো এবার আপনিই ভেসে উঠবে!'

বুড়ি মানুষের কথা কে কানে নেয়।

অনুপম দড়ির বাঁধন খুলে ফেলল। হারু যখন জলে নামছে, তখন আর ভয় কী!

দেখা দেখি, আরো দু'চারজন জলে নেমে পড়ল। কী ভেবে, বেচুদাও।

পুস্তক সমীক্ষা

লেনিন অপেরার অর্কেষ্ট্রা/সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য

আন্তর্জাতিক ছোটগল্প/৭০ বি ভূপেন্দ্র বোস এভেন্যু/কলকাতা-৪/দাম-আট টাকা

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য কমিটেড গল্পকার। সেকথা 'বক্তব্যে' উল্লেখ করেছেন। এরকম কমিটমেণ্ট সকলেরই থাকে। কেউ বলেন শিল্পের প্রতি কারোবা কমিটমেণ্ট জীবনের কাছে। সুখেন্দ্রের কমিটমেণ্ট রয়েছে এই সময়, এই সমাজ, এই জীবনের প্রতি। গল্পগুলি পড়লেই সেকথা বোঝা যায়। রেখে ঢেকে কথা বলার পক্ষপাতী নন তিনি। খুব ডাঁটে কথা বলে যান। মুখে রাখ-ঢাক নেই। লেখার পরতে পরতে উন্মোচন হয় এই সমাজের ভেঙে পড়া ভ্যাদ-ভেদে গন্ধওলা ছবিটা। চারদিকের এই আবর্জনা দাউ দাউ জ্বালিয়ে দেবার জন্তে তাঁর বুকে বারুদ ঠাসা আর হাতে রয়েছে কলম। ফলে যা হবার তাই হয়েছে সমস্ত রাগ একমুখীন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে গল্পের পর গল্পে। রাগের প্রকাশ ঘটেছে তীক্ষ্ণ ব্যাঙ্গে। যেমন— 'আমি গোপনে···কাজ করি। ···ঘুষ গ্রহণ করি। ···মদ খাই···কুৎসিত হিন্দী বই দেখি···নগ্ন ছবি দেখি ···যুবতী কন্তাদের পটাতে চেষ্টা করি···' ব্যাঙ্গই শেষ কথা নয়। গল্পকার বলছেন 'এই দেখুন, রক্তের বিন্দু। ডানায় (পাখীর) শয়তানী কীটরা গোপনে বাসা করিয়াছে···শরীর কাঁপিতেছে···উড়িবার ইচ্ছায় ডানা মেলিতে চেষ্টা করিতেছে···এখনও সময় আছে বাঁচানো যাইতে পারে।' চারিদিকে ক্লেদাক্ত অবক্ষয়ের পরে উত্তরণের এই আলোক বিন্দু দেখতে পাচ্ছি 'আসামী' গল্পে। 'লেনিন অপেরার অর্কেষ্ট্রা' গল্পে পাঠককে গতির রথে চড়িয়ে দেন গল্পকার। এখানেও সেই গনগনে আঁচের মত ব্যাঙ্গ। 'মহিলা : লেনিনের উপর তোমার বক্তৃতা শুনে আমার রক্তে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছ। নাট্যকার : হুঁ: মদ খাবে একটু। বিপ্লবের ব্যবসা জমবে ভাল।' এরকমই ছড়িয়ে আছে 'খানাতল্লাসী' 'জনৈক অষ্টাদশীর আত্ম-বিশ্লেষণ' ইত্যাদি গল্পে। সাহিত্যে সুখপাঠ্য বলে যে কথাটা চালু আছে এই গ্রন্থের গল্পগুলি মোটেই সে ধার দিয়ে যায় না। সুখপাঠ্য করার চেষ্টাও করেন নি গল্পকার। কোথাও কোথাও তিনি কোলাজ ব্যবহার করেছেন। যেমন নাম গল্পে, জনৈক অষ্টাদশীর বিবরণ', 'আমরা চিন্তা করছি ওরা মারা যাচ্ছে' 'হৃদয়ের ঘর শূন্য নয়' ইত্যাদি গল্পে।—এবং এভাবেই কোন ধরাবাঁধা প্রথায় গল্প না বলে তাঁর বলা অন্যরকম। কিংবা বলা যায় তাঁর বলা সুখেন্দ্র ভট্টাচার্যের মত। বলতে বাধা নেই সুখেন্দ্রবাবু ইতিমধ্যেই নিজস্ব একটি ভঙ্গি তৈরী করে নিতে পেরেছেন। যা দিয়ে এক পলকেই গল্পকারকে চেনা যায়। এ বড় কম কথা নয়। এরকম রীতি ব্যবহার করে কোন কোন গল্পের কোন অংশ দারুণ সার্থক হয়ে উঠেছে। 'অংশ' কথাটা ব্যবহার করছি সচেতন ভাবেই। কারণটি পরে বলা যাবে। তার আগে 'খানাতল্লাসী' গল্পের সেই

অসাধারণ জায়গাটা বলতেই হচ্ছে। সেই রাত। স্বামী-স্ত্রী সুধাকান্ত আর অলকা বাইরের চিৎকারে খাট থেকে মেঝেয় নামে। উঁকি দিয়ে দেখে; বাইরে সশস্ত্র বিপ্লবীদের জন্যে রেড হচ্ছে পাড়ায়। এই সুধাকান্ত কলেজে পড়ায়। এরপর গল্পকার বলছেন—"সুধাকান্ত ১৯৭০ সালে মাও-সে-তুং-এর লাল মলাট দেওয়া কোটেশনের বই কিনে ফেলেছিল। প্রগতিশীল হওয়ার মোহে কি?" এই সুধাকান্ত এবং তার স্ত্রীর আচরণ একেবারে নগ্ন হয়ে পড়ে। রাত্তির বেলা যখন দেখা যায় তাদের পাড়া মিলিটারী ঘিরে ফেলেছে—"কথাটা শুনেই স্ত্রী অলকা চকিতে আদিম আদরের পিচ্ছিল জাল থেকে ছিটকে এসে···সেলফ থেকে লাল বইটা নামায়। তার সাথে বামপন্থী সমর্থন যুক্ত আর কিছু পত্র পত্রিকা।· সকল কাগজপত্র এবং লাল বই জড়ো করে দেশলাই আনতে যায়।"

এরপর দেশলাই খোঁজার পালা শুরু হয়। রান্নাঘর, শোবার ঘর, টেবিলের ড্রয়ার, ওয়ারড্রোব, অফিসের পোর্টফোলিও—কিন্তু কোথাও দেশলাই পাওয়া যায় না। কিন্তু খুঁজতে গিয়েই সুধাকান্ত এবং অলকা একে একে বার করে আনে—তাদের গোপন লজ্জা, অপমান, একে অপরের প্রতি ঘৃণা। ভেঙে যায় তাদের কাল্পনিক স্বর্গ, পলায়নী সুখ স্বাচ্ছন্দ—"সম্পূর্ণ ফ্ল্যাটটা···খানাতল্লাসী করেও একটাও দেশলাই কাঠি বের করতে পারল না। এক কৌটা আগুন···যে···আগুন দাবানল সৃষ্টি করতে পারে। একটা পচা সমাজকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে, সেই আগুন ওরা এখন হারিয়ে ফেলেছে। তাই···আত্মসমর্পণের জন্যে প্রস্তুত।" এই পর্যন্ত এসে সাবাশ না বলে পারা যায় না। এটাই তো গল্পের তীক্ষ্ণ বিন্দু। গল্পের পাত্র পাত্রীর এই যে হাহাকার তা চমৎকার ভাবে ছড়িয়ে পড়ে পাঠকের অনুভূতিতে। কিন্তু গল্পকার বোধহয় পাঠকের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন নি। এতক্ষণ যা নিঃশব্দে ক্রিয়াশীল ছিল যেখানে কলম হয়ে উঠেছিল তীক্ষ্ণ ফলার মত সেই কলমকে তিনি—'সুধাকান্ত সম্পর্কিত নোটের মন্তব্য' অংশে গদায় পরিণত করেছেন। এবং খুব কষ্ট হলেও একথা বলা বাহুল্য হবে না যে লগুড়ের আঘাত সরাসরি মাথায় নেমে এসেছে পাঠকের। এখানেই শুধু এই গল্পের নয় অন্য অন্য গল্পগুলিরই একই পরিণাম। প্রায় সমস্ত গল্পে এত বেশি কথা বলা হয়েছে যা মাঝে মাঝে পাঠকের বিরক্তিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। কোন কোন গল্পে লেখক গল্পের পাত্র পাত্রীদের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে নিজেই গায়ের জোরে গল্পে ঢুকে পড়েন। যেমন—"আজ এতদিন বাদে বুঝতে পেরেছি আজকের এই আধুনিক সভ্যতা এই পশুটাকে সৃষ্টি করেছে। বড়লোকদের কুকুর পোষার মতই এই সভ্যতার শহরে নাগরিকরা ঐ পশুটাকে পোষ মানিয়ে রেখেছে···' (জনৈক অষ্টাদশীর আত্মবিশ্লেষণ), "পেছনে একটা আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অশ্লীল কালো হাত রবারের মত বাড়তে বাড়তে আমাকে ধরতে আসছে—" (ঐ) "যারা এই সমাজে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করছে, তাদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়ে লড়ুন" (আমরা চিন্তা করছি ওরা মারা যাচ্ছে) সুখেন্দ্র বাবু, নিজের হাতেই এভাবে আপনি অন্য শিবিরকে স্লোগানের' হাতিয়ার তুলে দেবেন। একথা বলতাম না যদি না এই গ্রন্থেই 'দ্রৌপদীর বস্ত্র'-র মত গল্প না থাকত, বলতে দ্বিধা নেই শুধু এই গ্রন্থেই না, এরকম গল্প গল্পের সংসারে বিরল। অল্প পরিসরে নিখুঁত বর্ণনায় এক ভালবাসার গল্পের কথা বলা হয়েছে। এই ভালবাসা তথাকথিত শারীরিক ভালবাসা নয় মোটেই। দারিদ্র এমন জায়গায় যে একটি ইজের নিয়ে দু'বোনে ঝগড়া হয়। সেই ঘরেরই মেয়ে বংশ পরিবার যার নজর তখনও ছিল সমাজের তথাকথিত ভদ্র পরিজনের মধ্যে সে একদিন

রিক্সাওলা অবিনাশকে আবিষ্কার করে। মোহ ভঙ্গে দ্রৌপদীর বুকে একটু একটু করে জন্ম নেয় ভালবাসা ঐ অবিনাশের জন্তে। সব প্রেমিকার মতই দ্রৌপদীও আড়াল খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে তারা শহর ছাড়িয়ে নির্জন রাস্তা পায়, বৃক্ষের ছায়া পায়, টলটলে জলে পুর্ণ পুকুর পায়। অথচ গল্পের শেষে দ্রৌপদী ভালবাসার কথা বলে না। আবার বলেও। নায়িকা তার প্রেমিকের কাছে একটা ইজের চায়। সাবাশ সুখেন্দ্রবাবু। প্রেমের কাছেই মানুষ বুঝি এমন করে মহান হতে পারে। হয়ত যথার্থ প্রেমই পারে নগ্নতাকে ঢাকতে। এই গল্পের জন্ত আমার অভিনন্দন রইল।

প.ব. সরকারের অর্থানুকুল্যে বইটি প্রকাশ পেয়েছে। মোট দশটি গল্প। জানতে পারছি সব গল্পগুলিই সত্তর দশকে প্রকাশিত। এ থেকে আঁচ করতে পারি ঐ দশক লেখককে কিভাবে আলোড়িত করেছে। প্রচ্ছদ কিন্তু বিষয়ানুযায়ী হয়নি। বইটির বহুল প্রচার আশা করি।

গৌর বৈরাগী

গল্পের আলোচনায় আমরা আন্তরিক। প্রিয় গল্পকার আপনার প্রকাশিত গল্পের বইটি আজই আমাদের দফতরে পাঠিয়ে দিন।

পুস্তক নথীকরণ আইন ১৯৫৬ অনুযায়ী প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি

ফর্ম ৪ O রুল—৮

পত্রিকার নাম : গোধূলি-মন

প্রকাশ কাল : মাসিক

সম্পাদক/প্রকাশক/সত্বাধিকারী :
অশোক চট্টোপাধ্যায় (ভারতীয় নাগরিক)
ঠিকানা : নতুনপাড়া, চন্দননগর, হুগলী

মুদ্রাকরের নাম : রবীন্দ্রনাথ দে
(ভারতীয় নাগরিক)
ঠিকানা : দেপাড়া, বারাসত, চন্দননগর

উপরোক্ত তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য

স্বাঃ অশোক চট্টোপাধ্যায়
২০/৩/৮৫

সুনীল

সংবাদ

○ দুঃস্থ লোকশিল্পীদের সাহায্য

২৭-১-৮৬ তাং বৈঁচী হালদারদিঘী ও পোলবা ব্লকের বেলঘড়িয়া গ্রামে হুগলী জেলা তথ্য দপ্তরের উদ্যোগে ২৯ জন ওরাঁও আদিবাসী এবং সাঁওতাল আদিবাসী দুঃস্থ লোক শিল্পীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরন করা হয়, বস্ত্র বিতরন করেন জেলা তথ্য আধিকারিক জিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্ষেত্র তথ্য সহায়ক নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্ষেত্র কর্মী বিপ্লব দে।

○ পোলবা-দাদপুরে যুব উৎসব

পোলবা-দাদপুর ব্লক যুব করণের উদ্যোগে ১৮ই এবং ১৯শে জানুয়ারী '৮৫ ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয় পোলবা বালিকা বিদ্যালয়ে। উৎসব উদ্বোধন করেন বিধায়ক ব্রজ গোপাল নিয়োগী. উৎসবে ব্লকের ৬০০ ছেলে ৩০০ মেয়ে অংশ নেয়। উৎসবের বিশেষ অংগ ছিল ১০ মিটার দৌড়, জাম্প, ভলিবল। উৎসবের সমাপ্তিদিনে পুরস্কার বিতরন করেন প্রবীর সেনগুপ্ত, মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বক্তব্য রাখেন পোলবা-দাদপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শম্ভু টুডু, কর্মাধ্যক্ষ বরুণ ঘোষ এবং জেলা পরিষদের সদস্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং ব্লক যুবকরণ আধিকারিক সুভাষ দাস মহাশয়, পরিশেষে মহকুমা তথ্য দপ্তর কর্তৃক চলচিত্র প্রদর্শিত হয়।

○ কবি সম্বর্দ্ধনা

১২ই জানুয়ারী মেদিনীপুর শহরে জেলা পরিষদ বিরাম কক্ষে 'অমৃতলোক' পত্রিকা আয়োজিত "প্রতিবাদী সাহিত্য সম্মিলনে" এই সময়ের যোগ্য চারণ কবি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়কে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। কবির হাতে মানপত্র সহ উপহার দেওয়া হয়েছে দামী কলম, কাশ্মিরী শাল ও একসেট পুস্তক। ঐ দিন "অমৃতলোকের মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা" প্রকাশ ছিলো উল্লেখ-যোগ্য আকর্ষণ। বিশেষ সংখ্যায় কবি মোহিনী মোহনের সাহিত্য চর্চার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা পূর্ণ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী, প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ কৃষ্ণানন্দ দে।

সাহিত্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিমলকান্তি ভট্টাচার্য অধ্যাপক প্রভাত মিশ্র, সম্পাদক সমীরণ মজুমদার, অনিল আচার্য্য, সন্দীপ দত্ত, তড়িৎ চৌধুরী মৃণাল-কান্তি কালী প্রমুখ।

কবিতা পাঠে অংশ নেন মোহিনী মোহন গঙ্গো-পাধ্যায়, কল্যাণ দাশ, দেবাশিস প্রধান, মধুসূদন ঘাটি, ইত্যাদি বহু কবি। পত্রিকা প্রদর্শনী, প্রবিণ মিত্রের আধুনিক কবিতার গান সঞ্জয় বসুর কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠানকে মনোজ্ঞ করে তুলেছিলো।

প্রধান অতিথির সুচিন্তিত ভাষণ সকলের চিত্ত আকর্ষণ করে। সভাপতির ভাষনান্তে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

O সাহিত্য ও সঙ্গীত মেলা

১৬ই ফেব্রুয়ারী '৮৬ আধা মেঘ আধা রোদ্দুর পরিবেশে বর্ধমান জেলার পলসা গ্রামে কার্ত্তিক চন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মনোরম পরিবেশে এক সাহিত্য ও সঙ্গীত মেলা বসেছিল সকাল ৯টা থেকে। চলেছিল সারাদিন। সমস্ত দিনের অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গল্পকার দুলাল চট্টোপাধ্যায়।

প্রথমে শিশুদের আবৃত্তি-আসর, দ্বিতীয় পর্যায়ে সাহিত্য বাসর ও তৃতীয় পর্যায়ে গানের আসর ছিল অনুষ্ঠানের মূল বিষয়বস্তু। রাজেশ কোনার ও তিথি রায়ের আবৃত্তি মনে রাখার মত।

গল্প কবিতা পাঠে অংশ গ্রহণ করেন চুঁচুড়ার কোরক সাহিত্য গোষ্ঠী, কাটোয়ার ধুলানন্দির গোষ্ঠী, বর্ধমান থেকে গৌরী চট্টোপাধ্যায়, ধানবাদের 'মৌড়' পত্রিকার সম্পাদক সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, হাটগোবিন্দপুরের কস্তুরী সাহিত্য গোষ্ঠি, 'নগ্নতাপস' সম্পাদক কাশীনাথ বসু, শিশির রায়, শঙ্কর দাস আরও অনেকে। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। কবিতায় গানে সকলের মন ভরিয়ে দেন ত্রিসপ্তক পরিচালক ঋষিণ মিত্র।

O জলপ্রপাতের ষষ্ঠবর্ষ পূর্ত্তি উৎসব

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ বিকেল ৩টায় দুর্গাপুর শহরের বি-জোন অন্তর্গত রবীন্দ্র পরিষদ ভবনে 'জলপ্রপাত' পত্রিকার ষষ্ঠবর্ষ পূর্তি ও জীবনানন্দ স্মরণ উৎসব হয়ে গেল। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চাশজনের মতো সাহিত্য প্রেমিক মানুষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আমরা জানতে পারলাম, দুর্গাপুর অর্থকরী ও কারিগরী শহর কিন্তু সাহিত্য বা সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ তেমন নেই। এমন পাণ্ডব বর্জিত পরিবেশে জলপ্রপাত গত ৬ বছর ধরে অনলস প্রচেষ্টায় তার রূপদী চিন্তা-ভাবনার ফসল ছড়িয়ে অনেক সৎ সাহিত্য প্রেমী সৃষ্টি করেছেন। শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামলী রায়, দিশারী বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিভা বসু, সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায়, উদয়ন সরকার প্রভৃতি সবাই জলপ্রপাতের আত্মীয়। ঐদিন সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নিতা দে। বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণু সামন্ত, সোফিওর রহমান, শিখা সামন্ত, সমরেশ দাশগুপ্ত, মোহিনী গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

O সাহিত্যের আসর/কোন্নগর

কোন্নগর 'সাহিত্যের আসর'এর ৪র্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হোল গত ২৩ ফেব্রুয়ারী '৮৬ রবিবার বেলা ৩টায় শ্রী মণীন্দ্রনাথ মিত্রের আহ্বানে কোন্নগর টি, এন, মিত্র লেনস্থ বাড়িতে। সভা পরিচালনা করেন বাঙলা ভাষায় নেপালী কবি শ্রীনরবাহাদুর লামা। হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা এবং কলকাতা থেকে আগত ৪০ জন কবি সাহিত্যিকের উপস্থিতিতে সভায় এক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শ্রীমতী ঝরণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্বোধন সংগীতে সভার কাজ শুরু হয়। কবিতা আবৃত্তি করেন শ্রীমান ভাস্বর বন্দ্যো:, শ্রীসুধাংশু শেখর মুখো:, এবং শ্রীনিখিলেশ্বর বন্দ্যো:। স্বরচিত গল্প পাঠ করেন শ্রীনিখিলরঞ্জন ঘোষ। স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ গ্রহন করেন সর্বশ্রী সমীর মণ্ডল, নরবাহাদুর লামা, পাঁচুগোপাল হাজরা, বীরেশ্বর বন্দ্যো:, অশোক চক্রবর্তী অতীশ ভাওয়াল, শশাঙ্ক শেখর ঘোষ, জ্যোতির্ময় বসু এবং আরো অনেকে। আধুনিক কবিতা ও জীবনানন্দ বিষয়ে আলোচনা করেন শ্রীসত্যরঞ্জন ভট্টাচার্য। স্বরচিত কবিতা পাঠে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে সর্বশ্রী বীরেশ্বর বন্দ্যো:, সমীর মণ্ডল এবং জ্যোতির্ময় বসু। সভায় কোন্নগর উদয়াচল সঙ্ঘের সভ্যরা শ্রীমনীন্দ্রনাথ মিত্রের পরিচালনায় 'নবসূর্যোদয়ে' প্রভৃতি নাটক পরিবেশন করেন, রচনা শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সাহিত্যের আসর'এর পত্রিকা 'সমন্বয়ে'র প্রথম সংখ্যা এইদিন প্রকাশ হয়। পত্রিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন শ্রীমনীন্দ্রনাথ আশ।

O গল্পমেলা

প্রত্যেক মাসের এক রবিবারে গল্পপাঠ এবং তা নিয়ে তুমুল আলোচনার এক তুলকালাম আয়োজন। যে কেউ যে কোন ভূমিকায় চলে আসুন।
যোগাযোগ : গৌর বৈরাগী/এ. সি. চাটার্জী লেন/গোন্দলপাড়া/হুগলী।

আগামী ৬ই এপ্রিল গল্পমেলা হচ্ছে চন্দননগরের লাভ ঘাটায়, মণ্ডল আবাস। ট্রেনে মানকুণ্ডু স্টেশন অথবা বাসে জ্যোতি সিনেমা Stop-এ নেমে রিক্সায় সাত ঘাটা। শুরু বেলা ৩টে।

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

O 'গোধূলি-মন'এর আশির কবিতা সংখ্যা এখানে বসে পড়লাম। আশির কবি হিসেবে এই সংকলন এর পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে পুরস্কার অপেক্ষা তিরস্কারই বেশ মানানসই হবে বলে আমার ধারণা।

প্রথমত যে দশকটার মূল্যায়ণ আপনি করতে চেয়েছেন সেই দশক সম্পর্কে কোনরকম স্থির নিষ্ঠা বা ধ্যান আপনাকে নাড়া দ্যায়নি। তাহলে আশির কবিদের অধিকাংশেরই মধ্যে ষাট-দশকের ক্ষুধিত প্রজন্মের প্রভাবের উল্লেখ করতেন না। এটাকে সময় আশির তিন কবির জন্য সংখ্যা বলাটা বোধহয় ভুল বলা হবে না।

আমি আপনাকে সবশেষে একটু অনুরোধ করতে বাধ্য হচ্ছি যে বিশ্বাস অথবা তন্ময়তায় আপনি বলছেন বসন্তে এত ফুল ফুটেছে, খুব বেশি আগে। অথবা এরকম বসন্ত আগেও এসেছিল। বেঁচে থাক বসন্ত আগেরই মত যেমন দেখেছিলাম বিশ বছর আগে, সে ধারণাটা পাল্টাবে আপনি, এই সময়ের আরো কিছু কবির কবিতা পড়ুন। পড়ুন স্বপন রায়, আমার, অরূপ চৌধুরী, সত্যনারায়ণ মজুমদার, উত্তম মণ্ডল, পার্থসারথী ঘোষ, অমর চক্রবর্তী, রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রণব পাল, ধীমান চক্রবর্তী, সুমিত্রা দত্ত চৌধুরী, চৈতালী বন্দ্যোপাধ্যায়, পঙ্কজকুমার মণ্ডল, নরেশচন্দ্র দাস, অমিতেস মাইতি এদের কবিতা। মিলিয়ে দেখুন আমার বক্তব্য। আনন্দ পাবো। একজন সম্পাদকের কাছে এটাই কামা থাকে যে কোন পাঠক অথবা লেখকের। ভালো থাকুন।

কাজল চক্রবর্তী
শান্তিনিকেতন

O O O O

O গোধূলি-মন '৮৬-র বইমেলা সংখ্যা পেয়ে ধন্য হয়েছি। অদ্ভুত সুন্দর পত্রিকা। প্রত্যেকটা লেখা সুপাঠ্য।

লিটল ম্যাগাজিনের উপর আপনাদের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা স্মরণযোগ্য।

আপনার কাছে অনুরোধ করে পাঠিয়েছিলাম এর আগের সংখ্যাও পাওয়ার জন্য। থাকলে অবশ্যই পাঠাবেন বলে বিশ্বাস করি। কেননা ওটায় আমার পত্রিকা প্রজ্ঞার তীব্র সমালোচনা ছিল বোধহয়। যাক। লেখা পাঠালাম। মনোনীত নাহলে দুঃখ পাবার কিছুই থাকবে না। কেননা আপনাদের পত্রিকা অনেক বলিষ্ঠ। লেখার চেষ্টা করছি—আমার এ নবীনতায় উপদেশ দিলে খুশি হব।

মৃণালকান্তি মৃধা
হাটগাছা/চব্বিশ-পরগণা—৭৪৩৪৩৯

Member all India Small & Medium News Paper Association, Delhi.
GODHULI-MONE N. P. Regd. No. RN. 27214/75 Feb.-March '86 (ফাল্গুন-চৈত্র '৯২)
Vol. 28, No. 2 & 3 Postal Regd. No. Hys-14 Price—Rs. 2·00 only

তফসিলী ও আদিবাসী কল্যাণে বদ্ধপরিকর বামফ্রন্ট সরকারের আটটি বছর

সুস্থ-সাধারণ মানুষের জীবনধারা থেকে যারা অনেক পেছনে পড়ে আছেন-অর্থাৎ তফসিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা তাদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার গত আট বছর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়িত করে চলেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৮ শতাংশ হচ্ছেন এই দুই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। এদের মধ্যে ৩৮ রকমের উপজাতি আছেন। মোট উপজাতি জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ হচ্ছেন সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত। বামফ্রন্ট সরকার এদের উন্নতির জন্য বিভিন্নভাবে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও বামফ্রন্ট সরকার যেসব কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে আর্থিক সাহায্যদান, প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুটির শিল্প স্থাপন, মৎস্য চাষ, গবাদি পশু সংরক্ষণ, বনজাত দ্রব্য ইত্যাদি খাতে সরকার বিশেষভাবে আর্থিক অনুদান দিচ্ছেন। ছোট ব্যবসা ইত্যাদিতে যুবশ্রেণীকে নানাভাবে সাহায্য করছেন। স্থাপন করেছেন সমবায় কেন্দ্র। তফসিলী ও আদিবাসী শিক্ষার ব্যাপারেও বামফ্রন্ট সরকার বিশেষভাবে এগিয়ে এসেছেন। বিনামূল্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরণ করছেন বই-খাতা, জামাকাপড় এমনকি দুপুরের খাবার পর্যন্ত। এর সঙ্গে সহায়ক ভাতার একটি কর্মসূচীও চালু করা হয়েছে। সরকারীভাবে সাঁওতালী ভাষার অল্-চিকি লিপিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও সরকারের অবদান উল্লেখযোগ্য। উপজাতি সংস্কৃতির প্রচারের জন্য নির্মাণ করেছেন সিউড়ি'তে 'সিধু-কানু সংস্কৃতি কেন্দ্র', 'ঝাড়গ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্র', আলিপুরদুয়ার ও পুরুলিয়া আদিবাসী চর্চা কেন্দ্র। সর্বোপরি জলপাইগুড়ি জেলার 'টোটো' উপজাতির, যাদের সংখ্যা মাত্র ছ'শত (৬০০) কিছু বেশী, লোকসংখ্যা বাড়ানোর জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এইভাবে বিভিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার গত আট বছর ধরে অন্ধকার থেকে আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে চলেছেন তফসিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়কে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক নং ১৯১৩ (৩) এইচ/ডি/আই/সি/এ তাং ১৭/৩/৮৬

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পপুলার প্রিন্টার্স, বারাসত, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও নতুনপাড়া, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

গোধূলি মন

প্রচ্ছদ : শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়

বৈশাখ সংখ্যা ১৩৯০

O প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন O

O আপনার প্রেরিত নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা গোধূলি-মন আজ পেয়েছি। এবং সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে শেষ করলাম। নভেম্বর সংখ্যায় শ্রীবাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের টয়েনবীর দৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা একটি অপূর্ব সংযোজন। লেখক টয়েনবীর মতামত লিখেছেন। তাই সমালোচনার অবকাশ খুবই কম। গোধূলি মনের পাঠকদের আপনি এ এক অমূল্য উপহার দিলেন। শতক্র মজুমদারের লেখা গল্প—অজিত পানের খেলা, বেশ জমানো গল্প, তবে শেষটা যেন—কেমন ঠেকল।

কবিতার পৃষ্ঠায় গৌরাঙ্গদেব চক্রবর্তী, বাসুদেব দেব, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা শ্রেয়। সাহিত্য সমীক্ষায় অনেক পত্র পত্রিকা সম্বন্ধে অবগত হলাম।

ডিসেম্বর সংখ্যাটি তিনজন বিশ্বখ্যাত লেখকের পরিচিতি ও সাহিত্য আলোচনা একটি বিশেষ সংখ্যার মর্যাদা পাবার যোগ্য। সোফিওর রহমানের—দু'জন কবিতা লেখক এবং...একটি উৎকৃষ্ট বিভাগ। এই বিভাগটি গোধূলি মনে থাকলে খুবই ভাল। পাঠক আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে সহজ হবার সুযোগ পাবেন।

এবার আসি অন্য প্রসঙ্গে। বিগত ২৭ বৎসর একটি পত্রিকা একক চেষ্টায় মফঃস্বল সহর থেকে চালিয়ে যাওয়া একটা সহজ কাজ নয়। এদিক দিয়ে আপনি একটি দৃষ্টান্ত। সর্বপরি সমসাময়িক সাহিত্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আপনি এই অব্যাহত জয়যাত্রা বজায় রেখেছেন। তারজন্য আপনাকে প্রাণভরে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পত্রিকা চালাতে কি শুধু আর্থিক অসচ্ছলতাই বড় বাধা? তার চেয়েও অনেক বাধা প্রতিদিন প্রতিক্ষণে উৎরে যেতে হয়। এ বিষয়ে কমবেশী ভুক্তভোগী বলেই লিখছি, যা কিছু উৎরে যাওয়া তখনি সম্ভব—যখন থাকে একাগ্রতা, নিষ্ঠা আর সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি একান্ত ভালবাসা, এসব কিছু আপনার মধ্যে আছে বলেইতো ২৭ বছর গোধূলি মনকে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন। শুধু এগিয়ে নিয়েই আসেন নি সৃজনশীল কুশলতায় তাকে প্রকৃতই একটি ধ্রুপদী সাহিত্যপত্রের স্বরূপ দান করেছেন।

বাংলা দেশের যাঁরা সাহিত্য প্রিয়—তাঁদের চোখের সামনে অর্থভাবে গোধূলিমনের মত একটি সাহিত্য পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবে—এই আশঙ্কা সূচক মনে হয়।

গজেন্দ্রকুমার ঘোষ
স্যুর্টে/সুইডেন

* *

O আপনার পত্রিকা নিয়মিত পেয়ে আসছি চৈত্র-৯১ সংখ্যা থেকে। এমন নিয়মিত পত্রিকা বিশেষ করে লিটল্ ম্যাগাজিন-এর জগতে বিরল বলেই জানি। পত্রিকার প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা আমাকে পুলকিত করেছে দারুণভাবে। চিত্র শিল্পী ও লেখক অজিত রায়কে পেলেন কী করে, অমন গুণী মানুষ পাওয়া ভাগ্যের কথা।

আপনার কবিকুলের অনেকেই সুপরিচিত দেখলাম। আবার অনামী অল্পনামীরাও রয়েছেন সমাদরে গোধূলি মন-এর পাতায়। অভিজিৎ ঘোষ মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণ সাধন নন্দী, কল্যাণ মিত্র, সমীর মণ্ডল, বীণা চট্টোপাধ্যায় ঈশিতা ভাদুড়ী, সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় দের কবিতা পড়ে মন ভরে, কিছুটা খোরাক পাই।

গল্পে শতক্র মজুমদার ও গৌরবৈরাগী মনে দাগ কাটে। এঁদের হাতে রাখলে পত্রিকা, বলিষ্ট হবে সন্দেহ নেই।

জগৎ দেবনাথ
নাসিক/মহারাষ্ট্র

গোধূলি মন

২৮ বর্ষ/৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল/১৯৮৬
বৈশাখ/১৩৯৩

প্রতি সংখ্যা দুই টাকা
বার্ষিক সডাক কুড়ি টাকা

সম্পাদকীয়
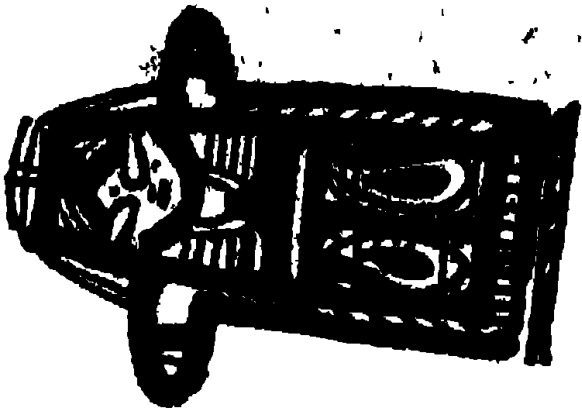
। সাম্প্রতিক বধূহত্যা ও মুসলিম তালাক আইন

আজকাল কাগজ খুললেই প্রথম পাতায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন বধু নির্য্যাতনের অমানবিক কাহিনী। দিনের শুরু এবং সকালের প্রথম চায়ের আস্বাদও আমাদের কাছে বিস্বাদ হয়ে উঠছে। ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে শুরু হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা দিন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখেরা অনেক প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে [illegible] নির্য্যাতন সহ্য করে হিন্দুমেয়েদের অকারণে জীবন্ত পুড়ে মরার হাত [illegible]চিয়ে ছিলেন—এতদিন বাদে কি সেই পুরাণো সতীদাহ প্রথাই ফিরে আসছে অন্যভাবে, অন্যনামে ?

সব ধর্মেরই মূল কথা, মানুষকে ভালবাসো। অসহায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াও। পরমপিতার কাছে সকলেই সমান। অথচ কিছু অশিক্ষিত মৌলবাদীর ভুল ব্যাখ্যার ফলে গ্রাম প্রধান ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে অসহায়া মেয়েরা পরিণত হচ্ছে ভিখারিণী অথবা দেহপজীবিনীতে। আর শুধুমাত্র মুসলীম ভোটের কারণে আমাদের তরুণ প্রধানমন্ত্রী যাঁর ওপর আমাদের ভরসা ছিল অপার : তিনি আইন করে মুসলিম মেয়েদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দেবার ব্যবস্থা পাকা করে দিতে চলেছেন। ভারতবর্ষের সমস্ত ধর্মের শিক্ষিত ও উদারমনা নারী-পুরুষ এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে মিছিলে সভা-সমিতিতে, সংবাদপত্রে বিবৃতি দিচ্ছেন। বিশ্ব মানবতায় বিশ্বাসী আমরা এই বিলকে ধিকার জানাচ্ছি।

কিন্তু শুধু কিছু লোককে ফাঁসী ও কিছুলোককে ধিকার জানালেই কি শেষ হয়ে যাবে আমাদের কর্তব্য ? আমাদের ভাবার সময় এসেছে—মেয়েরাও মানুষ, একজন পুরুষের সমান। তাদের শ্বশুরবাড়ী যাবার উপযুক্ত করে নয়—স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার শপথ নিতে হবে আমাদের সবাইকে।

কবিতার জন্য ঃ শামসুর ও সুনীল

নিভা দে
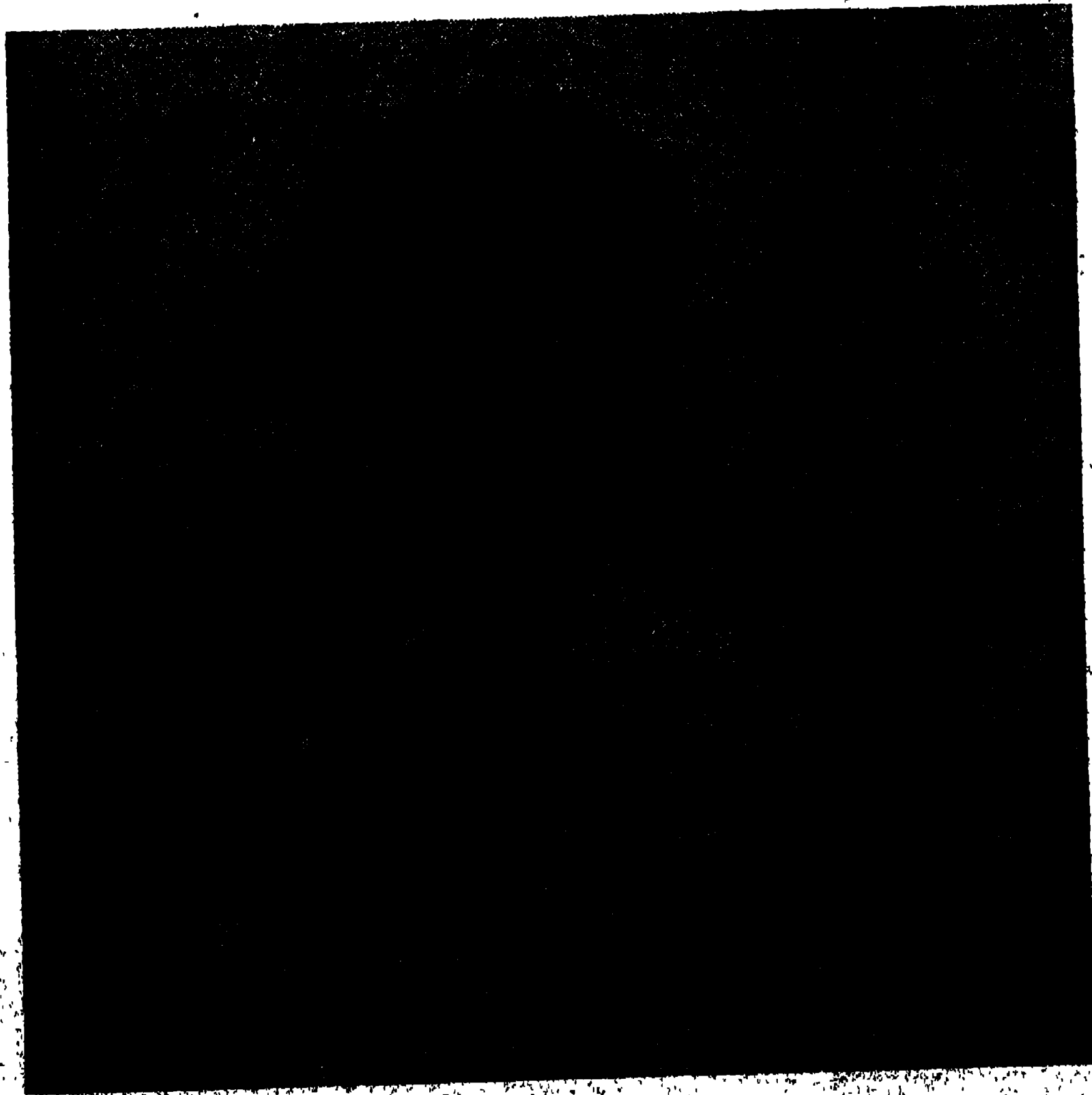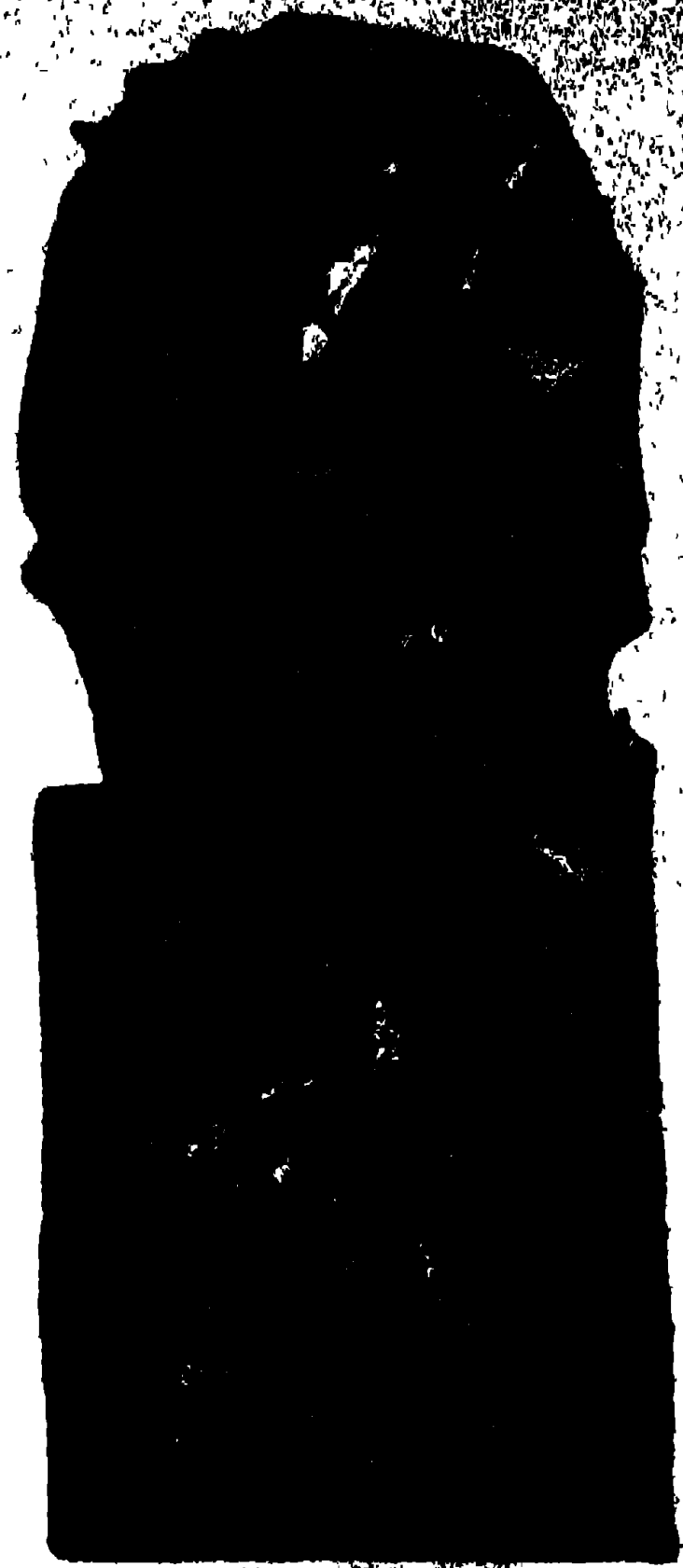
ওপার বাংলার প্রধান কবি শামসুর রাহমানের 'একটি কবিতার জন্য' আর এপার বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'যদি কবিতা লিখে' আর 'শুধু কবিতার জন্য'—এই তিনে মিলে বুঝি এক, একটি কবিতা।

সুনীল কবিতা লেখেন, কিন্তু তিনি জানেন এ সত্য—কবিতা লিখে মাঠভর্তি ধান ফলানো যায় না,—রুক্ষ পাটল আকাশ থেকে ধারাবর্ষণ নামানো যায় না। কবিতা লিখে কারো পেটের ক্ষুধার আগুন নেভানো যায় না, পৃথিবীর চারদিকে যে অবক্ষয়, ক্ষত, মানুষের সুন্দর জীবনকে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে—কবিতার দ্বারা সে সব বন্ধ করা যায় না। কারো দুঃখ কষ্টে ব্যথিত হ'য়ে রোদন করা যায় সহমর্মিতা বোধের পরিচয় দিয়ে—কিন্তু সুনীল জানেন কবিতা লিখে তার দুঃখ দূর করা যায় না। সমাজ সংসারের অন্যায় অবিচার দেখে ক্রোধে জ্বলে উঠতে পারেন তিনি কিন্তু তা কবিতা হ'য়ে উঠবে না। সুনীল ক্ষমা চেয়েনিয়েছেন কবিতা বিষয়ে তার সুস্থির মতবাদের জন্য—'এ এক মায়াদর্পণ, কবিতা এই নিয়ে বিরলে কিছু খেলা'—

অথচ তবু সুনীল কবিতা না লিখে পারেন না। কবিতার জন্যই যেন তাঁর এই জন্ম—এই বেঁচে থাকা। "শুধু কবিতার জন্য আরো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে লোভ হয়।" মানুষের এই কুৎসিত সংসারে ক্ষোভেদুঃখে কবি তবু বেঁচে থাকতে চান যেহেতু কবিতা আছে তাঁর জন্য "শুধু কবিতার জন্য আমি অমরত্ব তাচ্ছিল্য করেছি"। এ এক অপূর্ব ছত্র। এত সহজ শব্দ চয়নে তিনি এক মহৎ গভীর সত্য ব্যক্ত করেছেন যা কবিতার মতোই সুন্দর অথচ পংক্তিটির মধ্যে এক চতুর বাদকূটও লুকিয়ে আছে। কবিতার জন্য অমরত্ব যে তাচ্ছিল্য করতে পারে সে যে কবিতাকে কি দিয়ে কতখানি দিয়ে গ্রহণ করেছে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এ সত্যের পরও আরও এক গভীর সত্য এই যে কবিতার জন্য অমরত্ব তাচ্ছিল্য করলেও কবিতাই কবিকে অমরত্ব এনে দিতে পারে। বস্তুতঃ এ বিশ্বাস সুনীলেরও ছিল,—যখন গদ্য সাহিত্যের দিকে তিনি মুখ ফিরিয়েছিলেন তখন তিনি এরকম এক বিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন যে যদি বেঁচে থাকেন তিনি আদৌ সাহিত্যের জন্য তবে তা কবিতার জন্যই সম্ভব হবে। ইদানীং জানি না 'সেই সময়' ইত্যাদি গ্রন্থাদির জন্য এবং ওসবের জন্য পুরস্কারে ভূষিত হবার পর তিনি মনোভাব পাল্টেছেন কিনা। বস্তুত কবিতা তো এখনও তাঁকে কোন পুরস্কার এনে দিতে পারেনি। তবে আশা করি দেবে। এবং আজকের দশক বিভক্ত কবি ও কবিতার যুগে তেজী ক্ষুদ্র পত্রিকার ততোধিক তেজী বোদ্ধা আলোচকদের মতে সুনীল পঞ্চাশ দশকের কবি হয়েও এখনও দুর্দান্ত কবিতা লিখতে পারছেন ... অতএব আমরা আশা করতে পারি শুধু কবিতার জন্য যিনি অমরত্ব তাচ্ছিল্য করতে পারেন কবিতাও তার জন্য কিছু কি করবে না?

কবিতাকে নিয়ে সুনীল বড় বড় কথা কিছু বলেননি, কবিতাকে নিয়ে 'বিরলে কিছু খেলা' বা 'মায়াদর্পণ' বলেছেন—সেই মুহূর্তে কিন্তু সাম্যবাদী কবির দল ভ্রুকুঁচকে ধিক্কার জানাবেন তাঁর প্রতি (স্মরণীয়, জানুয়ারী '৮৫তে কলকাতায় অনুষ্ঠিত আবৃত্তিলোক আয়োজিত কবিতাবিষয়ক সাতদিনের উৎসবের এক সভায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেছেন—'এই বাংলায় কবিতার দু'টি ধারা ধর্মনিরপেক্ষ আর সাম্যবাদী)। এবং কেউ কেউ বলবেন কবিতা সুনীলের কাছে 'শৌখিন মজদুরি' মাত্র, জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রকাশ করে না তাঁর কবিতা। তিনি শুধু আজ art for arts sake মতবাদের লোক; তিনি কবিতা না লিখলেই বা কি।

ঠিক কথা কি? তিনি কবিতা না লিখলে আমরা পেতাম না 'কেউ কথা রাখে না', পেতাম না

'উত্তরাধিকারী', 'আথেনস থেকে কায়রো', 'ইচ্ছে' 'হঠাৎ নীরার জন্য'—ইত্যাদি বহু কবিতা যা পড়ে এক আশ্চর্য ঘন আনন্দ বুকের পরতে পরতে জমে ওঠে, তার কিছু মূল্য নেই! আর বস্তুত 'মায়াদর্পণ' কথাটি নিয়ে বিশেষ চিন্তার আছে। "কবিতা এক মায়াদর্পণ" সুনীল বল্লেন সেই মায়াদর্পণে জীবনের কোনদিক না উদ্ভাসিত হয়? কবিতা এক মায়াদর্পণ বলেই কবিতা কবির তৃতীয় নয়ন। আর তাই শামসুর রাহমান লিখতে পারেন 'একটি কবিতার জন্য'র মতো এক গভীর প্রজ্ঞার আর্তনাদ।

শামসুর রাহমান মনে করেন না কবিতা মাত্র কিছু সময়ের 'নির্জনের খেলা'—কবিতা হৃদয় মথিত বহু প্রতীক্ষার ফল। এর জন্য অপেক্ষা করতে হয় অনেক অনেক দিন…যেতে হয় জীবনের গভীরতম অন্তরে সেখানে গেলেই হয়ত কবিতা মেলে। শামসুর তা জানেন বলেই দয়াবান বৃক্ষের নিকট, জীর্ণ শ্যাওলাধরা প্রাচীন দেওয়ালের নিকট, বৃদ্ধের নিকট কবিতা প্রার্থনা করেন এবং উত্তর পেয়ে যান—বাইরের বাকল ফুঁড়ে মিশে যেতে হবে জীবনের গভীর মজ্জায় নিজেকে গড়িয়ে দিতে হবে জীবনের নিয়ত ঘূর্ণমান চাকায় বৃদ্ধ মানুষের মুখের রেখাবলী যেদিন কবির মুখে অঙ্কিত হ'য়ে যাবে সেদিনই হয়ত একটি কবিতা শামসুর পেয়ে যাবেন। শামসুর তাই আর্তনাদ করেন,

"কেবল কয়েক ছত্র কবিতার জন্য
এই বৃক্ষ, জরাজীর্ণ দেওয়াল এবং
বৃদ্ধের সম্মুখে নতজানু আমি থাকবো কতকাল
বলো কতকাল?"

এর উত্তর কে দেবেন? কে দিতে পারেন? কেউ না। কবি নিজেই এর উত্তর দেবেন, পেয়ে যাবেন, অপেক্ষার তিল তিল কষ্ট যন্ত্রণা আনন্দ বেদনার রসে রসসিক্ত হ'য়ে কবি পেয়ে যান অবশেষে কবিতা'। সুনীলও এইভাবে পান, শামসুরও পান।

এই তিনটে কবিতা মিলেমিশে যেন একটি কবিতা—। একুশ পংক্তির 'যদি কবিতা লিখে', নয় পংক্তির 'শুধু কবিতার জন্য' আর শামসুরের একুশ ছত্রের 'একটি কবিতার জন্য'—এই তিনটি কবিতার মধ্যে সুনীলের কবিতা দু'টি অনেক বেশী কবিতা—শব্দ প্রয়োগে, অর্থের ব্যঞ্জনায় এবং শব্দ অর্থ জাত ভাবের কুয়াশা মোহ রঙিন রামধনুর মতো মনের আকাশে ফুটে থাকে। তবে শামসুরের কবিতাটি থেকে সুনীলের কবিতা দু'টি অধিক কাব্যিক উৎকর্ষ লাভ করেছে। শামসুরের কবিতায় শব্দের উৎসব নেই, সেটি কবির নিবিষ্ট মননে গম্ভীর-গভীর, বিষণ্ণ। ●

পাঠকের চোখে পর্ণগ্রাফি

অমল হালদার

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশেই যুগে যুগে সাহিত্যে শিল্পে অশ্লীলতা নিয়ে বাদানুবাদের ঝড় উঠেছে এবং আবার তা শান্ত হয়ে গেছে। তবে সে শান্তির স্থায়িত্ব বেশীদিন হয়নি। আবার ঝড় উঠেছে, পুনরায় শান্ত হয়েছে। এমনিই চলেছে ক্রমাগত। এর কারণ আর কিছু নয় আসলে শ্লীলতা ও অশ্লীলতা সভ্য মানুষের একটা বিরাট নৈতিক সমস্যা বৈ আর কিছু নয়।

আমাদের দেশেও বিগত যুগ থেকে শুরু হয়েছে, এই নিয়ে বাদানুবাদ। কোন মীমাংসা আজো হতে পারেনি। আজকের এই নবযুগে যেন সে ঝগড়া আরো প্রচণ্ড। তবে এই ধরণের বিতর্কের পরিণাম, কিন্তু সকল যুগেই একইভাবে দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ ঝড় উঠেছে এবং ধুলোই উড়েছে বেশী, আর সেই ধুলোতে ইতরজনের চোখ অন্ধই হয়েছে।

এই নিয়ে, আজকের জগতের মণীষীরা যে পরস্পর বিরোধী বাক্যজাল বিস্তার করেছেন তাতে সমস্যাটা যেন আরো বেশী ঘোরালোই হয়ে উঠেছে। এটা ভাল কি মন্দ, ন্যায় কি অন্যায়, তা দৃঢ়ভাবে না বলেও ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সাহিত্যে শিল্পে ঠিক কতটা পরিমান অশ্লীলতা বরদাস্ত করা যেতে পারে এটা একটা বড় নৈতিক সমস্যা। সুতরাং এ ধরণের Normative (আদর্শমূলক) ব্যাপার বিশ্লেষণের প্রথমই আসে সংজ্ঞার কথা। অর্থাৎ প্রথমই দেখতে হবে শ্লীলতা অশ্লীলতার সম্বন্ধে এমন কোন বৈটালিক সূত্র পাওয়া যায় কি না, যাকে মান হিসাবে ধরে জগতের তাবৎ শিল্প সাহিত্যকে শ্লীল এবং অশ্লীল এই দুই ভাগ করা যেতে পারে।

১৯২০ সালে অশ্লীল পুস্তক ক্রয় বিক্রয় ও প্রচার বন্ধ করার জন্য জেনেভাতে এক বিশ্ব সম্মেলন আহুত হয়েছিল। তাতে পৃথিবীর বহু দেশের জ্ঞানী গুণী প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাঁরা একজোট হয়ে সাহিত্যের নৈতিকমান কি হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে ফতোয়া দেবেন। সে সম্মেলনে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছিল।

ক) 'গ্রীসের প্রতিনিধি প্রশ্ন করে বসলেন, অশ্লীলতা সম্বন্ধে ফতোয়া জারী করার আগে অশ্লীলতার একটা সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া দরকার।'

খ) 'বৃটেনের প্রতিনিধি তাঁর প্রস্তাবে বাধা দিয়ে বললেন, তা হয় না। অশ্লীলতার কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। তার কথার পোষকতায় তিনি আরো বললেন, ব্রিটিশ অশ্লীলতা আইনে অশ্লীলতার কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। ব্রিটিশ প্রতিনিধির প্রস্তাবই অবশ্য সব শেষে গৃহীত হয়েছিল, তবে সেটা সর্বসম্মতিক্রমে কিনা বলা যায় না।'...

কথাটা শুনতে সত্যিই বড় অদ্ভুত লাগে না কি যে, অশ্লীলতা নিয়ে এত আন্দোলন অথচ তার নিজস্ব কোন একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। পর্ণোগ্রাফির Pornography, কথাটার সঠিক বাংলা কি হওয়া

উচিত আমার জানা নেই। যতদূর জানি শব্দটির আদি উৎস গ্রীস দেশে, তাদের ভাষায় Prone মানে ইংরেজি Prostitute বা আমাদের কথায় বারবণিতা।

এক নজরে বা এক জাতির কাছে যা অশ্লীল না-ও হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয়, 'দি ওয়েল-অব-লোনলিনেস্' নামের সুবিখ্যাত গ্রন্থের প্রচার গ্রেট ব্রিটেনে বন্ধ করে দেওয়া হলো অথচ আমেরিকায় ও বইয়ের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হলো না, আবার এখনও একই জাতির কাছে এক সময়ে যা অশ্লীল বলে নিন্দিত হয়েছে, পরের যুগে-তা-সৎশিল্প বা সৎসাহিত্য রূপে বন্দিত হয়েছে। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে এর ভুরি ভুরি নজির পাওয়া যায়। যেমন সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি' উপন্যাস।

ফ্লবেয়ারের 'মাদাম বোভারী' এক সময়ে আইনে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বোদলেয়ার এর 'Les Fleurs du-mal' বা পাপের ফুল তদানীন্তন ফরাসী সরকার এই দুজন লেখকের বিরুদ্ধেই অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছিলেন প্রভাবশালী বন্ধু বান্ধবের হস্তক্ষেপের ফলে ফ্লবেয়ার অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন সহজেই এবং মাদাম-বোভারির জনপ্রিয়তা তার জীবিত কালের মধ্যে হয়েছে।

বোদলেয়ারের ভাগ্য ছিল বিরূপ। 'পাপের ফুল' প্রকাশের জন্য লেখক ও প্রকাশক দু'জনেরই জরিমানা হল, ঐ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি কবিতা বিচারক নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল! শার্ল বোদলেয়ার মৃত্যুর পূর্বে জেনে যেতে পারেননি, যে ভবিষ্যতে বিশ্বের কাব্যসাহিত্যে 'পাপের ফুল' কত বড় স্থান লাভ করল। সরকার ও সমালোচকের হাতে তার কাব্যকে লাঞ্ছিত হতে দেখে গিয়েছেন বোদলেয়ার। অবশ্য কয়েকজন অনুগত ভক্ত ছিল।

কিন্তু তাদের ভালো লাগা প্রতিষ্ঠাপন্ন সমালোচক ও সাহিত্যপত্রের সমর্থন লাভ করতে পারেনি, বলে ফরাসী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়নি। শুধু যে বোদলেয়ারের কাব্য সাধনা দীর্ঘকাল উপস্থিত ছিল না, তা-নয়, তার জীবনের নানা ঘটনার ভুল ব্যাখ্যা করেও তাঁর উপর অবিচার করা হয়েছে। Eend Starkic লিখিত Baudelaire পড়ে অনেক ভুল ধারনা দূর হবে। ইংরেজীতে বোদলেয়ারের সম্বন্ধে বইয়ের সংখ্যা বেশী নয়। বোদলেয়ারের এইরূপ সুবিস্তৃত তথ্য সমৃদ্ধ জীবনী ইংরেজীতে আর নেই।

ব্যাল্জাককেও অশ্লীল সাহিত্য রচনার অভিযোগে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। জেমস্ জয়েসের 'ইউলিসিস' দীর্ঘ বিশ বছর ধরে অশ্লীল গ্রন্থ বলে পরিচিত হয়ে অবশেষে ১৯৩৯ সালে বিশ্বসাহিত্যে পরিণত হলো। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের অমর গ্রন্থরাজিও এককালে অশ্লীল বলে উপেক্ষিত হয়েছিল।...

আবার এর বিপরীত ঘটনাও ঘটেছে। অর্থাৎ পূর্ব-যুগে যে সব শিল্পসাহিত্য সম্বন্ধে অশ্লীতার প্রশ্ন ওঠেনি, উত্তরকালে তাই চরম অশ্লীল বলে বিবেচিত হয়েছে।

বাংলাদেশের কবিগান, তরজা, খেউড় ইত্যাদিকেই ধরা যাক না কেন। এক যুগে এ-দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে এগুলোর একটা বড় রকমের স্থান ছিল। অথচ আজকের এই রবীন্দ্রোত্তর যুগে ওসবগুলো চরম অশ্লীল বস্তু, উপেক্ষণীয়। এসব কথার নজীর তুললে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থকেও চরম অশ্লীল গ্রন্থ বলে মেনে নিতে হয়।

১৮২০ সালে ছাপা বাংলা বইয়ের যে তালিকা

পাদ্রী লঙ সাহেব প্রস্তুত করেছিলেন, তার মধ্যে 'কামিনী' 'রতিমঞ্জরী' 'রতিবিলাস' ও 'রসমঞ্জরী' প্রভৃতি আদি রসের বইগুলি তখনকার লোকদের কাছে,—আজকের বাঙালীর কাছে রবীন্দ্র রচনাবলী যতখানি সমাদৃত, ঠিক ততখানিই আদৃত হতো।...

একটা যুগে এই ধরণের সাহিত্যকে বাদ দিয়ে বাঙালী কালচারকে ভাবা যেতোনা। কিন্তু আজ তা অশ্লীল বলে বিলুপ্ত হতে বসেছে। প্রসঙ্গত অশ্লীলতা আইনের আলোচনাও এসে পড়ে। বৃটিশ আইনে অশ্লীলতার কোন সংজ্ঞা নেই। পূর্ব্বে অশ্লীলতাকে আইনত বিচার করতে গিয়ে বিচারপতিদের কাপড়ে চোপড়ে হতো।...

১৮৬৬ বিচারপতি কক্‌বার্ণ রুলিং দেন: "I think the test of obscenity is this, whether the tendency of the matter charged as obscenity is to deprove and corrupt those whose minds are open to such immoral influences and into whosehands a publication of this sort may fall"... ......

" (অর্থাৎ-যাদের মন নীতিবহির্ভুত প্রভাবের অধীন, তাঁদের হীন ও দূষিত করার প্রবণতা অশ্লীল বলে অভিযুক্ত বিষয়বস্তু যদি থাকে, উক্ত বিষয়বস্তু যদি তাদের হাতে পড়বার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে উক্ত বিষয়বস্তুকে আমি অশ্লীল বলে মনে করবো" ।)

বিচারপতি কক্‌বার্ণের রুলিং এবং অশ্লীল আইনের সমালোচনা না করেও কেবলমাত্র বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারা যাবে এর অর্থ কত ব্যাপক. কক্‌বার্ণের রুলিং কে আরো সহজ ভাবে প্রকাশ করতে গেলে, এই দাঁড়ায় :—কোন বিষয়বস্তু কারো পক্ষে ক্ষতিকারক [illegible] বলে মনেকরতে হবে।

এইদিকেই বিচারের মান হিসাবে ধরলে 'রামায়ন, মহাভারত, বাইবেল, গীত-গোবিন্দ, শকুন্তলা, বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী, অথর্ববেদের উপর লেখা যাবতীয় পুস্তকাবলী, এমনি কি গুরুদেবের চিত্রাঙ্গদা, ও মহাত্মাজীর আত্মজীবনী বোধহয় বাদ পড়বে না। অতি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রন্থ, বুদ্ধদেব বসুর 'রাত ভোর বৃষ্টি' উপন্যাস। যৌন বিজ্ঞানের বইগুলি এই আওতায় পড়ে এবং এই ধরণের ব্যাপক আইনের প্রকোপে পড়ে। যৌন বিজ্ঞানী হ্যাভ্‌লক এলিসের 'স্যাক্সুয়াল-ইন-ভ্যারস্থান' গ্রন্থটিও যে ১৮৯৮ সালে অশ্লীল বলে পরিগণিত হয়েছিল, আশা করি ঐ কথা সম্বন্ধে বুদ্ধিজীবী মহল অবগত আছেন। কথা হচ্ছে, যাদের মন নীতি বহির্ভুত প্রভাবের অধীন কিংবা অপরিণত বয়স্ক শিশুর পক্ষে কোন গ্রন্থ ক্ষতিকারক হলেই, অন্যের কাছে তা যত মূল্যবান ও প্রয়োজনীয়ই হোক না কেন সে গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করে দিতে হবে, এটি আদৌ কোন যুক্তি নয়।

আরেক কথা, অশ্লীলতা আইনের ব্যর্থতার বীজ কিন্তু ওই আইনের মধ্যেই আত্মগোপন করে আছে। মানুষের চরিত্রের একটা সাধারণ ধর্ম্ম অনুসারে কোন বই অশ্লীল আখ্যা পেলে বা নিষিদ্ধ হলে সে বই পাঠের জন্য পাঠক এবং অপাঠক উভয় মহলেই একটা দারুণ প্রবণতা দেখা দেয়।

একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি। যে ছায়াছবি কেবলমাত্র প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ছাপ মারা তার টিকিট ধরে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ভীড় সব চাইতে বেশী। এর কারণ আর কিছু নয়, বোরখার আচ্ছাদনে যত বেশী বাঁধা যাবে আড়ালীর মোহ তত বেড়ে যাবে। এর জন্যই বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রমুখ চিন্তানায়করা ছিলেন সর্বপ্রকার অশ্লীলতা আইনের বিরোধী।

—হ্যাভলক এলিস বলেছেন, 'obscenity is a permanents element of human social life and corresponds to a deep need of the human mind.' একে সাহিত্যের ভাষায় পরিবেশন করলে দাঁড়ায় :—মানুষ যেমনি চায়, তেমনটি ভাবে। হ্যাভলক, এলিস বৈজ্ঞানিক। সুতরাং তিনি মানুষের এই সত্যটি বৈজ্ঞানিক ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

O ক্রমান্বয়ে বেশ ক'টি সংখ্যা 'গোধূলি মন' পেলাম। আমি লজ্জিত; কেননা এ পর্যন্ত কোনো প্রাপ্তি সংবাদ আপনাকে দেওয়া হ'য়ে ওঠেনি। এতো নিয়মিত এবং ঈর্ষণীয়ভাবে পত্রিকা প্রকাশ ক'রে চলেছেন কিভাবে, ভাবতে অবাক হ'তে হয়। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যায় অজিত রায় একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ করেছেন। প্রবন্ধটির সমস্ত শরীর জুড়ে শ্রম এবং নিষ্ঠা শীতল ঝর্ণার মতো বেজে চলেছে। কিন্তু সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অর্থাৎ উপসংহারে বসেই তিনি খেই হারিয়েছেন। শেষপর্যন্ত স্পষ্ট হ'লো না, তিনি হাংরি আন্দোলনকে পক্ষপাতিত্ব দিলেন নাকি বিরুদ্ধতা ক'রলেন। নকশাল আন্দোলনের প্রাথমিক উল্লাস হাংরি আন্দোলন কখনোই নয়। এই পর্যায়েই তিনি অত্যন্ত সরলিকরণের পথ ধ'রেছেন। নকশাল আন্দোলন আজ তাত্ত্বিক অর্থে ভ্রান্ত প্রমাণিত হ'লেও, তার শিকড় সমাজ অভ্যন্তরে প্রোথিত ছিলো। তাছাড়া তাঁদের সমাজের প্রতি দায়, ভালোবাসা, গভীর মমত্ব বোধ, আত্মোৎসর্গের কোনো তুলনাই হয় না, যা শ্রদ্ধার যোগ্য। কিন্তু হাংরিদের কি ছিলো? বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে আক্রমণ ক'রতে গিয়ে, প্রতিষ্ঠান বা বুর্জোয়া সংস্কৃতির গলাতেই তাঁরা মালা তুলে দি'য়েছেন। এটাই ইতিহাস। এদেশে হাংরি আন্দোলনের জন্য কোনো জায়গাই কোনোদিন থাকবে না, থাকতে পারে না।

এ সংখ্যার কোনো গল্পই তেমন দাগ কাটলো না। রচনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আরো কঠোর হলে আপনার অক্লান্ত পরিশ্রম আমাদের মতো ইতর সাধারণের কাছে আরো মূর্ত হ'য়ে উঠবে।

সমীরণ ঘোষ
৩ ডেনিয়াল্‌স্ লেন
বহরমপুর। মুর্শিদাবাদ। ৭৪২১০১

কবিতা

ঘরগেরস্থালি এবং কবিতা

শান্তি সিংহ

আমার এক বন্ধুর সাদামাঠা ঘরণী মনস্তত্ত্ববিদের অধীন,
তা নিয়ে উৎকণ্ঠার রকমফের হয়।
ভদ্রলোক কিন্তু বেজায় এনার্জিটিক—
নানা কাজে-অকাজে বাড়ীর বাইরেই তাঁকে হরদম থাকতে হয়।

হঠাৎ একদিন তিনি অভিযোগের সুরে আমাকে বললেন,
আপনার স্ত্রী ইস্কুল, ঘরকন্না আর একমাত্র পুত্র নিয়ে
কী এমন ব্যস্ত থাকেন যে আমার স্ত্রীর সঙ্গে
তাঁর সৌজন্যের মাত্রা ছাড়িয়ে মাখামাখি করার বেশী সময় হয় না ?
এ ব্যাপারে আপনার অবশ্যই কিছু করণীয় আছে।

কথাটি আমার ভীষণ শিক্ষণীয় মনে হল।
তিনি সহজেই আরো অভিযোগ রাখতে পারতেন—
এ পাড়ার অনেকেই একাধিক পুত্র কন্যার জনক
অথচ আপনি কেন আপনার স্ত্রীকে সে সুযোগ দেননি ?
কিংবা, অনেকেই আপনার পাশাপাশি ঘাম ঝরিয়ে ঢেঁড়শ-কুমড়ো-
শশা ফলান
অথচ আপনি কেন চাকরীর বাইরে অবসর মুহূর্তে ঘাম না ঝরিয়ে
শুধুমাত্র পড়াশুনা আর কবিতাচর্চা করেন ?

এ-সব কথা শুনে কোন কোন দুষ্টবুদ্ধি লোক
আমার বন্ধুকেও মনস্তত্ত্ববিদের কাছে পাঠানোর সুপারিশ করবেন,
কিন্তু আমি সে-সব কুবুদ্ধির কথায় নিশ্চয়ই কান দেব না।

সুজাতার প[illegible]

অশোক চট্টোপাধ্যায়

সুজাতার পা[illegible] খেয়েই
কিছু কি[illegible] বোধ জন্মায়
গভীরতা—জীবনের প্রকৃত দর্শন
সব কিছু জানা হয়ে যায়।

সে রকম সুজাতা কোথায় ?
যার স্তনে পুষ্ট হবে ক্ষয়ে যাওয়া
আমাদের রুগ্ন পৃথিবী
শস্য ভারনম্র হবে মাটি।

সবুজে লালিত হবে আমাদের
শিশুদের দল
তাদের কল্লোল-কোলাহল
ছুঁয়ে যাবে অসীমের সীমা :

ভয়ানক আকাল এখন।

* * * *

হাত লাগাও

রীণা চট্টোপাধ্যায়

শামুকের খোলের মধ্যে
শরীর ঢুকিয়ে নিয়ে
কেটে যাচ্ছে দিন।
এদিকে পড়শীর বাড়ি
আগুনের শিখায় কাঁপছে
শরীর বাইরে আনো
কাঁধ মিলিয়ে হাত লাগাও
আগুন নেভাতে।

ঘুম নেই রাতের চোখে

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুম নেই। ক্যানসার রোগের জ্বালায়
ছটফট করছে রাত,
ঘুম নেই রাতের চোখে দীর্ঘদিন ধরে।
অসহ্য যন্ত্রণা বুকে
আমারও রাতের ঘুম হারিয়ে গেছে
কোথায় কে জানে?
আধফোটা কুঁড়ির মতো
চোখদুটি মেলে
আগামী দিনের শিশু কাঁদছে।
নিয়ত কাঁদছে।
উপোসী মায়ের বুকে দুধের খরা
একি ভয়ঙ্কর জ্বালা।

আসুক সকাল,
যদিও সকাল ভোগে ক্ষয় রোগে
তবু তারো মাঝে আছে কিছু মুক্ত বাতাস,
আছে হা হুতাশ, দীর্ঘশ্বাস
আছে কিছু আলো
নিখাদ উত্তাপ কিছু।
আগামী কালের কাছে
রেখে যাবো এই সম্বলটুকু।

নির্মোহ পুরুষ

কৃষ্ণসাধন নন্দী

তাকে কিছু দয়া দেখাতে যাই
সূর্যরোষে তাকায় কিছুক্ষণ আমার দিকে
কাঠিন্য ফুটে ওঠে সমস্ত শরীরে
বিণীতভঙ্গি অন্তর্হিত প্রায়
ছিটকে পড়ে যেন আগুনের গোলক।

বুঝি, অনুমান মিথ্যে আমার
দু'হাতে জড়িয়ে ধরি সংশোধনে
আঘাত উদ্দেশ্য নয়, শান্ত হও
হে নির্মোহ পুরুষ
তুমি নও দীনহীন অন্ধআতুর
তুমিই আমার রাজা—আমি-ই ভিখারী
দান নিয়ে বেঁচে আছি
কতো মানুষের—
থাকো তুমি সিংহাসনে আমি নামি পথের ধূলোয়
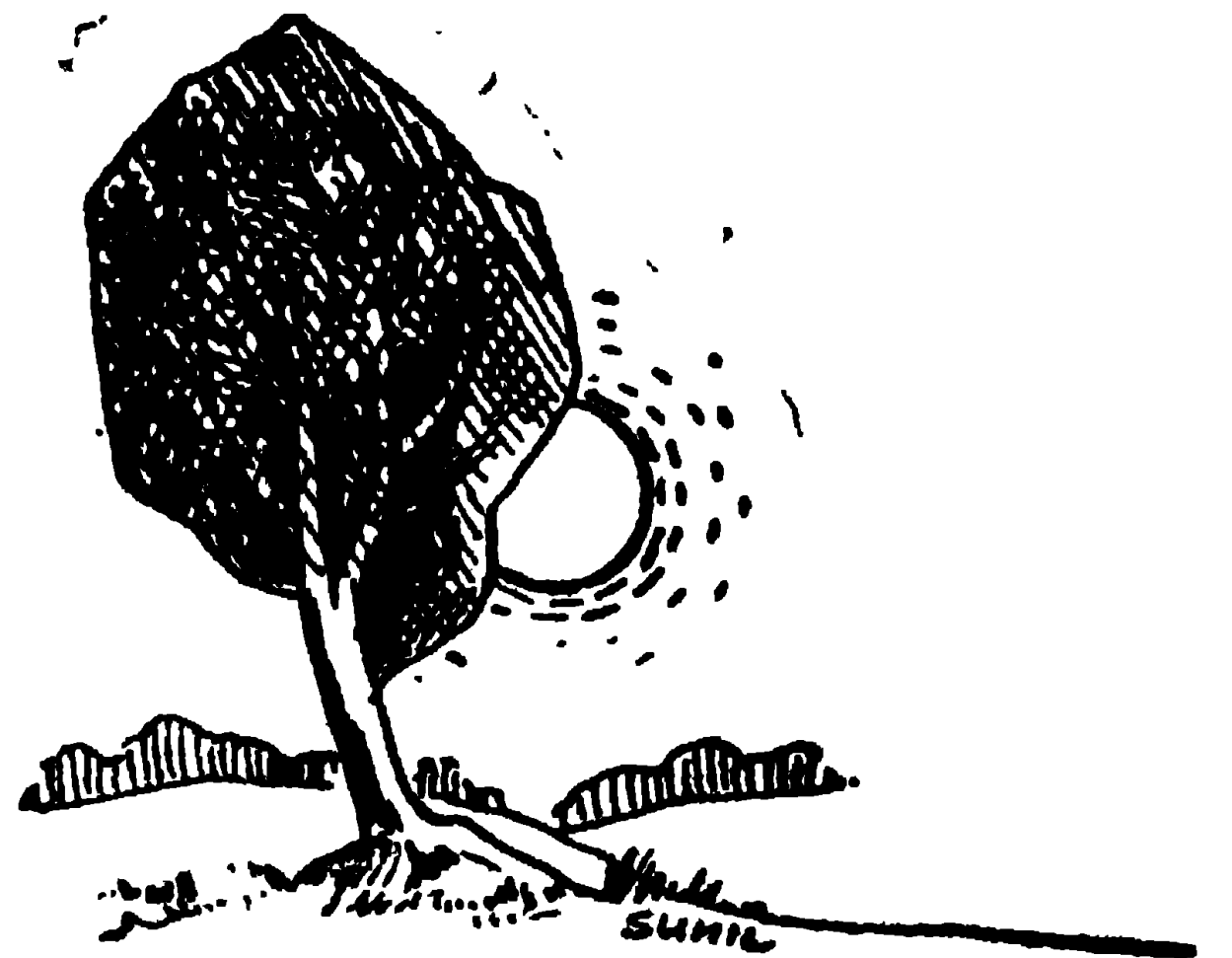
ভারতবর্ষ ঃ ১৯৮৬

মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

উপোসী চোখে আগুন
কেউ জ্বলে কেউ পুড়ে
মরতে মরতে হাড় পাঁজরে ভারতবর্ষ গড়ে

চামড়া ছিঁড়ে রক্ত ঝরে
রক্তে রক্তে ফুল ফুটে না
আগুন শুধু আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে সুখ

ভারতবর্ষ কোথায় পাবে
শিউলি সকাল ?
ভাত নেই ভাত শূন্য থালায়
আছড়ে পড়ে হাড়-হা-ভাতে বুক।

বেঞ্জামিন মোলোয়াজ স্মরণে
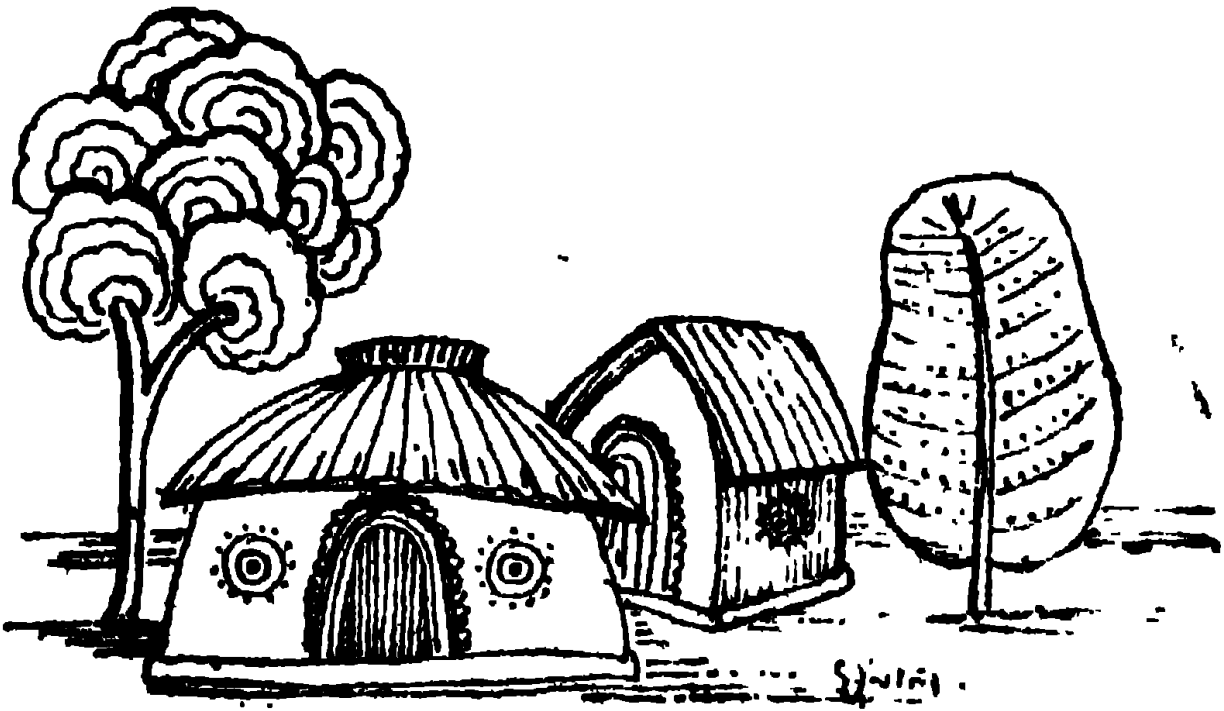
বিশ্বম্ভর নারায়ণ দেব

ও কাঁটার জঙ্গলে যখন
হাজার কণ্ঠ মিলিয়ে গেল
তুমি তখন কফিনে শুয়ে টানটান, নিষ্পলক।

তোমার কবিতার প্রাণ নিচ্ছে সূর্য্যের আলো
যে আলো কাঁটার জঙ্গল পুড়িয়ে
বসন্তের ফুল ফোটাবে।
তোমার গলায় পরাবো
ঐ ফুলের মালা—
আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী।

গুলজারের তিনটি নজ্‌ম

উর্দু থেকে অনুবাদ ঃ অনিন্দ্য সৌরভ

১

পৃষ্ঠভূমিতে বেজে চলেছে সেতার
কে সুখে আছে কোনখানে, কোথায়

এসো খুঁজি, আপন করি তাকে

২

এত লোকের মাঝে, বলে দাও চোখদুটিকে
অত জোরে যেন না ডাকে

লোকে আমার নাম জেনে যায়

৩

কালো তটভূমিতে গুলমোহরের গাছ
যেন লয়লার সিঁথিতে সিঁদুর

ধর্ম বদলে গেছে বেচারীর

যিনি পাথর ভাসান জলে

অরুণকুমার চক্রবর্তী

আজ তিনদিন যাকে খুঁজছেন তিনি আসবেন, গান গাইবেন
এই আল্‌ভাঙ্গা খোলা মাঠটায় তিনি হাঁটবেন
হাঁটুজল ভেঙে তিনি নাইবেন, ব্রজরজঃ মেখে তিনি নাচবেন,
আজ তিনদিন, শুধু তিনদিন তিনি অচিন্‌পাখায় উড়বেন

এই থৈ থৈ হিমবন্যায়, একতার বাঁধা লাউখোল্‌টায় সুর তুলবেন
তিনি শোলার জাহাজে ডুববেন
তিনি পাথর জাহাজে ভাসবেন,
যার চোখ আছে, তিনি চিনবেন
এই কেঁদুলীর রঙবাজারেই, রাজা আসবেন, গান গাইবেন

o o o o o o

এবার

প্রমোদ বসু

তাঁকে সকলেই চায়, গোঁয়ার অসুখও চায়।

আকাশ ওল্টানো এই পূর্ণিমায়
কার পাপে নিয়তি বদলায় ?

চাদরে শুয়েছে শুধু সাদা হাড় ;
যন্ত্রণা নিয়েছে এবার
স্মৃতি আর টুকিটাকি যা-কিছু দরকার।

পর্দা নাড়ছে আজ আকুটে বাতাসে,
চারদিক ম্লান করে দেহঋণ শেষ হয়ে আসে

গোপন ভালবাসা

শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়

ঘুম ঘুম চোখে
নিজের শব্দে আহত হলে
তারও আগে ভবিষ্যতের অগ্নিকুণ্ডে
গিয়েছিলাম ভোরের বাতাস ছড়াতে
মুহূর্তে লজ্জা এলো
সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেলে নীচে
অনেক নীচে তারও নীচে অন্ধকারে
তোমার এ লাজুক অভিমান
রোমাঞ্চ এনে দিলো সু উচ্চ চাতালে
তোমার গোপন ভালোবাসা
গোলাপ অহংকার নিয়ে
আজ এক সৈনিক অপেক্ষায় রইল
নেবে যাওয়া সিঁড়ির মুখে

অজিত রায়ের **ভঙ্গি**

নিহত বসন্ত ঃ ভ্রান্ত প্রজাপতি

সেদিনের রাত তেমন গরম ছিল না, ঠাণ্ডাও ছিল না; আবার বৃষ্টিও যে পড়ছিল তাও নয়। আসলে সেদিনের রাত ছিল একটি ব্যতিক্রমী রাত, স্বতন্ত্র রাত। রোজ যেমন থাকে তেমনি ছিল রাত ন'টার এসপ্ল্যানেড। হকারদের চিৎকার, যাত্রীদের ছুটোছুটি আর বাস-ট্যাক্সির ব্যস্ত আনাগোনা। শরীরে হাওয়া মেখে নেতাজীর স্ট্যাচুর সামনে দিয়ে হাঁটছিলাম। তখনই। ঠিক তখনই মার্কস-এঙ্গেলসের যুগল মূর্তির সামনে তেকোনা ফুটপাথের ওপর থেকে ভেসে এলো একটা মিঠে পুরুষকণ্ঠ :

'কেমন আছো সুপর্ণা ?'

যেন কোনো করুণ নাটকের বিদায়-পর্ব। অস্পষ্ট আলোয় চেনা গেল না নট-নটীকে। কিন্তু গলাটা খুব পরিচিত।

'তুমি কেমন আছো ?

অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন সাউণ্ড বক্স থেকে যেন ধ্বনিত হলো তদপেক্ষা মিষ্টি রমণীকণ্ঠ। অচেনা।

জবাবে নীরবতা।

আবার রমণীকণ্ঠ : 'আমি এখন যাই'—

'না সুপর্ণা, আমাকে ছেড়ে যেয়ো না, প্লিজ' - ব্যাকুল পুরুষকণ্ঠ।

'কোনো কথা শুনতে চাই না আমি। পথ ছাড়ো, আমাকে যেতে হবে।'

'সুপর্ণা প্লিজ'--

'মরে গেছে তোমার সুপর্ণা'—

পরমুহূর্তে অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো নটী। আবছা আলোয় বয়স বা চেহারা কিছুই বোঝা গেল না। আমার সামনে দিয়ে ফটফট করে হেঁটে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। দূরের জ্যো স্নালোকে মনুমেণ্টটা যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে আর তার ঠিক মাথার ওপরে তোবড়ানো থালার মতো চাঁদ ঠিক আমারই মতো অবাক ভাবে চেয়ে আছে। আশাহত করুণ মুখ নিয়ে এবার নট এগিয়ে আসে শ্লথ পায়ে। ক্রমে ক্রমে মার্কারি আলোর বৃত্তে। লঙশট থেকে ক্লোজ আপ। গায়ে কোটপ্যাণ্ট। রগের চুল-জুলপি কাঁচা পাকা, কপালে চড়াই শুরু হয়ে গেছে। কপালে, চোখের কোনায় নরম জমিতে কাদাখোচা পাখির নখের আঁচড়ের মতো ওগুলো কী—পোড়খাওয়া রেখা ? ঠিক ঠাহর হয় না। আরে, এ সেই সুমন্ত না।

'এই সুমন্ত !'—

চমকে তাকালো। চমকাবারই কথা। এত দিন বাদে কলকাতা মহানগরীর এক জনাকীর্ণ কোণে ওর কলেজের বন্ধু ওরই নাম ধরে ডাকছে, এ তো অবাক হবার মতোই কথা। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে আমার মুখে চোখ আছড়ে মারলো সে : 'সাত্যকি না ? তুই এখানে ?'

মুহূর্তে কী কেন কোথায় কবের ঝড় বয়ে গেল। একসময় আমারই মতো ফ্রিলান্স জার্নালিজম করতো সুমন্ত, এখন বম্বের ফিলমে গল্প লেখে। কলকাতায় দু-দিন হলো এসেছে একটা ছবির ইউনিটের সঙ্গে পাঁচতারা হোটেলে উঠেছে, আরও দু-দিন থাকবে, তারপর আবার উড়ে যাবে বম্বে। অতি সংক্ষেপে এসব জানিয়ে তারপর আমার সম্পর্কে যা জানবার জেনে নিয়ে সে বললো, 'চল্ আজ তোর ওখানেই উঠি, ঘুমিয়ে গল্প করা যাবে। কোথায় তোর বাড়ি?

'বাগনান।'

'বাগনান! আরেব্বাস, সে তো ট্রেনের ব্যাপার। ফ্যান্টাসটিক হবে! জানিস অনেকদিন ট্রেনে চড়িনি। আজ একটু মেরিমেন্ট করা যাবে।'

মিনিট দশের প্রতীক্ষায় একটা মিনিবাস এলো। ভিড়ে ভিড়াক্কার। একজন বাদুড়ঝোলা যাত্রী রাবীন্দ্রিক সুরে বললো, 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই, ছোটো এ তরী।' ছেড়ে দিলাম। সুমন্ত বললো—'থাক, আর তরীতে কাজ নেই; আয় জাহাজ ধরি।' ওর সাহেবিপনার মধ্যে একটা সারল্য, বেশ লাগলো।

ট্যাক্সির ফোমকুশনের মধ্যে গা ডুবিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আমরা মন খুললাম পরস্পর। প্রথম দিকে সুমন্তর কথাবার্তার ধরন দেখে মনে হলো যেন ওর সঙ্গে পরামর্শ না করে বিশ্ববিধাতা কোনো কাজ করেন না। কিন্তু পরে বুঝলাম, হাজার প্রসঙ্গের জট পাকিয়ে ও কী যেন লুকিয়ে ফেলতে চাইছে। যে-সব ব্যাপারে আমার জ্ঞান আট আনার বেশি তা নিয়ে চর্চা চালালাম, আর যা নিয়ে দ্বিধা সে-সবের গিঁট ছাড়ানো অসম্ভব বলেই বাদ দিলাম। তারপর মনের কৌতূহল ধরে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম: 'গল্পটা এবার বলবি?'

'কোন গল্পটা রে?'

'তোর স্বপ্নভঙ্গের গল্প।' অতর্কিতে কথাটা বলে মনে হলো ওর বুকের কোন সূক্ষ্মতন্ত্রীতে আঘাত দিয়ে ফেলেছি। তাড়াতাড়ি বল্লাম—'অন্যের গল্প তো কতো লিখিস, নিজেরটা আজ বল।'

'নিজেদের গল্পই তো আমরা বলি অন্যের জবানীতে।' কথাটা কেটে কেটে বললো সুমন্ত, কিন্তু ওরই মধ্যে একটা ছন্দপতনের সুর আমাকে মরীয়া করে তুললো। বললাম—'আজ তবে নিজের জবানীতে শোনা।'

সুমন্ত চুপ করে থেকে বাইরে সুবিশাল রহস্যময় অন্ধকারের পটে আঁকা স্কাইস্ক্র্যাপারগুলোর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলো, তারপর ফস করে একটা বড়োসড়ো দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে যেন আপন মনেই বললো—'হ্যাঁ, স্বপ্ন — স্বপ্নই তো—কিন্তু কারো স্বপ্নভাঙার ইতিহাস বলতে গেলে সে স্বপ্নের চেহারা, স্বরূপ, স্বপ্নের সঙ্গে স্বপ্নিকের অন্তর্বন্ধনের ইতিহাসটাও বলতে হয়'—আবার একটা দীর্ঘশ্বাস। নীরবতা। তারপর বললো—'কোত্থেকে আরম্ভ করবো ভাবছি। শেষটা তোর জানা হয়ে গেল আজ, এখন শুরুর ভাবনাটা আমার। তুই ছিয়াত্তরে ধানবাদ ছেড়ে চলে এলি আর আমাদের ত্রৈমাসিক 'প্রবাহ'টাও থমকে দাঁড়ালো। আমাকে তখন কাব্যরোগে ধরেছে, টুকটাক গল্পও ছাড়ছি, দশজনে পড়ে নাম করছে — এমনি চলছিল। এমন সময় এক গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতির সঙ্গে আমার যোগ ঘটলো।'

'রাজনৈতিক সমিতি!' আমি অবাক: 'সুমন্ত সোম আর রাজনীতি?'

'নিজের ওজন না বুঝেই আমি ওই সমিতির সভ্য হয়েছিলাম। পরে আত্মরক্ষার হেয় দুর্বলতায়' —

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'থাম, থাম। আমি ভাই তোর মতো বাংলায় এম-এ নই। অতি বিশুদ্ধ বঙ্গবাণী বুঝতে কষ্ট হয়। রিকশাপুলার হিন্দীর মতোই আমার কান ল্যাংচা বাংলা শুনতে অভ্যস্ত। সাদা বাংলায় বললেই পারিস রাজনীতিতে যাওয়াটাই তোর

ভুল হয়েছে, তুই আসলে কবি—ওই গুপ্ত সমিতি টমিতির পথ তোর পক্ষে স্বধর্মচ্যুতি। আর লেনদি করিস না; প্রদীপ জ্বালানোর আগে সল্‌তে পাকাবার কাজটা ট্যাক্সিতেই সেরে নে।'

গাড়িটা হাওড়া ব্রিজের ওপর চড়লো। ফাঁকা রাস্তা, তীর বেগে ছুটে চললো গাড়ি। সুমন্ত বলতে লাগলো: পার্টিকর্মীর পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধি হতে পারিনি। কেননা আমার পার্টির সঙ্গে যোগ ঘটেছিল মতাদর্শের টানে নয়—সুপর্ণা টেনেছিল আমাকে।'

'সুপর্ণা' শব্দটির উচ্চারণের সময় সুমন্ত মধুর কণ্ঠে যেন সমস্ত সঙ্গীত একেবারে উজাড় করে ঢেলে দিল। আমি নিঃশেষিত সিগরেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললাম, 'বাকিটা ট্রেনে শুনবো, জমবে মনে হচ্ছে'—টিকিট কাটিয়ে প্লাটফর্মে যখন পৌঁছলাম ট্রেন তখন ছাড়ো ছাড়ো। কোন্ দৈবনির্দেশে জানিনা একটা কামরা বেবাক ফাঁক পেয়ে গেলাম। বডটা জাপটে ধরতেই ঘসটাতে ঘসটাতে প্লাটফর্ম ছেড়ে দিল ট্রেনটা। সামনের সিটে পা তুলে বসে পকেট থেকে সিগারেট বের করে একটা সুমন্তের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে মৌতাত করে ধোঁয়া ছেড়ে বললাম, 'নে এবার চতুর গাল্পিকের মতো আনারসের তিনভাগ বাদ দিয়ে একভাগ শাঁসটা আমাকে শোনা দেখি। সাংবাদিকসুলভ পদ্ধতিতে। স্মৃতির মধ্যে অনেক ধানের কুঁড়ো থাকতে পারে—সব ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে চালুনিতে ছেঁকে মূল স্টোরিটা ছাড়।'

ট্রেন তখন অন্ধকার ছিড়েখুঁড়ে উদ্দামগতিতে ছুটে চলেছে, কামরার ভেতর ঝাপটা মারছে হিমেল বাতাস। সুমন্ত নিজের গল্প শুরু করলো—

"ভোজপুরের নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা আমার প্রথম হিন্দী উপন্যাস 'দস্তাবেজ' প্রকাশের মাস খানেক পরের কথা। একদিন সকাল দশটা নাগাদ স্নানের আগে মাথায় আর বুকে তেল মেখে পিঠের দুর্গম অংশগুলোতে তৈলসঞ্চারের পন্থা খুঁজছি এমন সময় দরজায় নক পড়লো। আই-হোল-এ চোখ রেখেই ধড়াস করে উঠলো বুকটা। ব্যাচেলরের বাড়িতে একজন তরুণী! তাড়াতাড়ি তৈললাঞ্ছিত কলেবর জামায় ঢেকে দরজা খুললাম। সেকেণ্ড ব্র্যাকেটের মতো ভুরু করে দাঁড়িয়ে ছিল ও। কিশোরী কিশোরী চেহারা। শালোয়ার কামিজের আউটলাইন স্পষ্ট, কাঁধে সাইড ব্যাগ, চোখে সরু ফ্রেমের চশমা, হাতে ঘড়ির ডায়াল, আর কলমের গোল্ডক্যাপ। মাঝারি হাইট, সপ্রতিভ চোখ মুখ।

'আপনি সুমন্ত সোম?'

একটা কৃত্রিম ভারিক্কী চাল ফুটিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ আমিই'—

যেন বিশ্বাসই হলো না আমার বয়স দেখে, বিস্ময়ে বড়ো বড়ো সরল চোখে তাকালো। আমার মনে হলো একটি চিত্রল হরিণ নির্জন বনের মধ্যে হঠাৎ পাতাখসে পড়ার সামান্য শব্দে চমকে মুখ তুলে তাকিয়েছে।

'আচ্ছা, দস্তাবেজের নায়ক কি আপনি নিজে?'

হো হো করে হেসে উঠলাম: 'গল্পের নায়কের সঙ্গে আমি এক হতে যাবো কেন?'

মেয়েটি কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বললো, 'আর নায়িকাটি কি আপনার মানসকন্যা?'

'কেন?' এবার আমার বিস্ময়ের পালা।

'ওর চরিত্র প্রসঙ্গে আমার একটা অভিযোগ আছে।'

'অভিযোগ?'

'হ্যাঁ বলছি, তার আগে একগ্লাস জল খাওয়ান।' জল খেয়ে সে দস্তাবেজের একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা পেশ করলো। প্রথমে ভোজপুরের কিষাণ সংঘর্ষের ওপর উপন্যাস লেখার জন্য আমার সাহসের তারিফ করলো, পরে যুক্তাক্ষরহীন সহজপাঠের মতো অতি সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিল যে দস্তাবেজের নায়ক-

নায়িকার বড়ো ত্রুটি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব। স্বর্ণ মিত্রের 'গ্রামে চলো' থেকে দস্তাবেজের যে অংশটি তর্জমা সে-অংশ দুর্দান্ত আর যে-অংশ আমার মৌলিক উদ্ভাবনার প্রকাশ সেটুকু একেবারেই রাবিশ। অতঃপর অন্বেষু গবেষিকার মতো স্থির সিদ্ধান্ত করলো, আমি ভোজপুর–রোহতাসে কখনো যাইনি এবং নকশালদের কর্মকাণ্ড স্বচক্ষে দেখিনি বলেই উপন্যাসটি সরকারি কাগজের বিবৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটির ধারণা—নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে একজন ভুঁইফোঁড় বিপ্লবীর মোহভঙ্গ ও বিষণ্ণ পরাভবের গল্প লেখার পেছনে আমার আসলে বর্তমান আন্দোলনের ওপর একটা আঘাত হানার উদ্দেশ্য ছিল, যা অত্যন্ত গর্হিত। আর নায়িকার চৈনিক জন্ম সম্পর্কে সে জানালো যে আমি যেন ধরেই নিয়েছি যে ভারতীয়দের মধ্যে ওরকম চরিত্র পাওয়া অসম্ভব, তাই তাকে চীন থেকে আনিয়ে নায়কের কর্মসঙ্গিনী সাজিয়েছি। পরিশেষে মন্তব্য করলো: অকৃত্রিম বিপ্লবের স্বপ্ন যে দেখেনি সে বিপ্লবী চরিত্র সৃষ্টিই করতে পারে না।

বাঙালি তরুণীর মুখে হিন্দী, তাও আবার রাজনৈতিক উপন্যাসের এমন চাঁচাছোলা সমালোচনা সত্যিই আমাকে বিস্ময়াভিভূত করেছিল। দস্তাবেজের প্রস্তুতিপর্বের কথা মনে পড়লো। আমাদের মধ্যে বেশ ক'জন রিটায়ার্ড নকশাল ছিল, ওরাই আইডিয়াটা দিয়েছিল। হঠাৎ বিপুল বেগে উপন্যাস লেখার ঝোঁকও আমাকে পেয়ে বসেছিল। প্রস্তুতি ছিল না—তথ্য, চরিত্র কিছুরই জোগাড় ছিল না। লিণ্ডসে লাইব্রেরী থেকে স্বর্ণ মিত্তিরের গ্রামে চলো, শৈবালের অজ্ঞাতবাস, শীর্ষেন্দুর শ্যাওলা, মহাশ্বেতার হাজার চুরাশির মা, আর ননী ভৌমিকের ধুলোমাটি আনিয়ে — এ থেকে একটু খাবলে, ও থেকে একটু খুবলে দিন পঁচিশের মধ্যে খাড়া করেছিলাম দস্তাবেজকে। কিন্তু যদি আগে জানতে পারতাম গল্পের এমন চুলচেরা টেকনিক্যাল বিচার হবে, তা হলে এখন মনে হচ্ছে তড়িঘড়িতে ছাপানোর লোভের ভেতর আমি আদতেই পা দিতাম না। মনের গয়ংগচ্ছ ভবটাকে ঝেড়ে ফেলে একটু অস্বস্ত হবার চেষ্টায় বললাম: 'আবাহনের দিনের শুচিবস্ত্রে বিসর্জনের কাদা তো লেগেই যায়'—

মেয়েটি এবার হাসলো। ভারি মধুর হাসি। বললো—'লাগে, কিন্তু এটা যেন গিমিক না হয় দেখবেন।' বলে চকিতে ঘড়ি দেখে 'আজ যাই, কলেজের সময় হয়ে গেল'—বলে নমস্কার সেরে বিদায় নেবার আগে আবার ঘাড় বেঁকিয়ে বললো—'আমার নাম সুপর্ণা, সুপর্ণা সেন। অজন্তা পাড়ায় চোদ্দ নম্বর বাড়ি। আসুন না একদিন'—

'তারপর তুই গেলি, দেখলি, জয় করলি।' আমি টিপ্পনি না কেটে পারি না—'এ তো বাবা সেই জিতেন্দ্র-শ্রীদেবীর ছেঁদা প্রেমকহানি!'

'না রে না' সুমন্ত ম্লান হেসে বললো, 'আমাদের উপাখ্যানটি আর পাঁচটা চেনাজানা আখ্যানের মতো নয়। একজন ইংরেজ লেখক বলেছিলেন to know her was itself a liberal education. কথাটা সুপর্ণা সম্পর্কে পুরোপুরি খেটে যায়।'

আমি বললাম, 'অত দূরে যাচ্ছিস কেন, আমাদের বাঙালি কবিই তো বলেছেন, তোমার উপমা তুমি প্রিয়ে এ মহীমণ্ডলে। তুই হয়তো এবার মান্না দে-র গলায় গেয়ে উঠবি, তোমার উপমা তুমিই তো মা— এ ডায়ালগ এখন পচে হেজে গেছে। সবাই নিজের লভার সম্পর্কে এইরকম ভাবে। প্লেন বাংলায় বললেই পারিস পথের দাবীর অপূর্ব ভারতীর প্রেমলাভে ধন্য হইয়াছে।'

সুমন্ত মাথা নেড়ে বললো, 'অপূর্বর মতো আমি দুর্বল বা ভীতু ছিলাম না রে সাত্যকি। আর ভারতীর সঙ্গেও সুপর্ণা তুলনীয় হতে পারে না। সেকালের রেনেশাঁস ছিল অপারচুনিস্ট মধ্যবিত্তদের, যারা পুরো-

মাত্রায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হতে পারে না; সর্বহারা না হলে বিপ্লবী হওয়া যায় না। বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ এঁরা সেই রেনেশাঁসেরই ফসল, তাই প্রগতিশীল হতে পারেননি। পারফেক্ট রেভ্যুলেশনারী ক্যারেক্টার সত্তর দশকের আগে সৃষ্টিই হয়নি।'

আমি বললাম, 'চুপ কর—আমাদের দেশে সত্যিকারের কোন বাঙালি নেই, থাকলে নির্ঘাৎ গুবাই করতো তোকে। আর পণ্ডিতি কপচাতে হবে না, নে ধর। দাশনগর পার হয়ে গেল।'

সিগারেট ধরিয়ে আবার বলতে শুরু করলো সুমন্ত: "জনতা আমলে রাজ্যে রাজ্যে যত নকশাল কর্মীকে জেল থেকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, সুপর্ণার বড়দা সুপ্রকাশ সেন ছিলেন তাঁদের একজন। সুপ্রকাশদা আসার সঙ্গে সঙ্গে জন্মলাভ করেছিল ওঁদের রাজনৈতিক পরিবার। সুপর্ণার মেজদা কয়েকজন তরুণকে নিয়ে গড়ে তুলেছিল গুপ্ত সমিতি। সমিতির কয়েকজন সভ্য একদিন আমাকে ঘিরে ধরল: 'আপনি তো মশাই আচ্ছা লোক। কার্ল মার্কসের প্রতি কবিতায় আপনি লিখেছেন—হে নবযুগস্রষ্টা/আমার জন্যে তুমি/একজন জেনি সৃষ্টি করে দাও/আমি আর একটা নবযুগ গড়বো—জানেন এই কথাগুলো যে লিখেছেন এসবের মানে কি? কতো বড়ো মিথ্যে কথা অবলীলায় বলে গেছেন আপনি! আসলে মার্কস বড়ো কথা নয়, পদ্য ছাপানোই আপনার একমাত্র লক্ষ্য। কবি হওয়ার চুলকানিই আপনার প্রেরণা, যা লেখেন তার সঙ্গে আপনার চিন্তাভাবনা বা জীবনচর্চার কোনো যোগ নেই। এটা আপনি অস্বীকার করতে পারেন?' আমার গলার কাছে কি যেন একটা ঠেকেছিল। উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে অ্যা অ্যা শব্দ ছাড়া গলা দিয়ে কিছু বেরোয়নি। ছেলেটির গলায় আমার কবিতার নির্ভুল আবৃত্তি আমাকে অবাক করেছিল সেদিন।

আর একদিন। সুপর্ণার উপস্থিতিতেই আমার 'অধুনা ক্লীব সংশয়' নামে একটি গল্পের পোস্ট মর্টেম শুরু করলো ওরা: 'আপনি লিখেছেন, জীবনে চলার পথে একটা সময় আসে যখন আমরা একান্ত নিঃসঙ্গ বোধ করি। নিজেকে বড়ো একলা মনে হয়। একজন সত্যিকারের সঙ্গীর অভাব বোধ করি। ভেতরে ভেতরে আমাদের বিশিষ্ট এক 'আমি' তৈরি হতে থাকে। বিষণ্ণতা, অমনস্কতা, চিন্তাশীলতা, একাকীত্ব বোধ, নিঃসঙ্গতার আমি—সেই আমি বড়ো অসহায়। বাড়ির কেউ সেই অসহায়তার সঙ্গী হতে পারে না, সে চায় নতুন ধরণের সঙ্গী, যে জীবনমার্গের সহযাত্রী হয়—এসব ছেঁদো কথা লিখে আপনি ছেলেমেয়েদের বিভ্রান্ত করছেন কেন? আজ ভারতবর্ষের হাজার হাজার সাহিত্যিক সাংবাদিক কলম ছেড়ে গ্রামে গিয়ে বন্দুক তুলে নিচ্ছেন। আর আপনি—'

সেদিনও কোনো জবাব দিতে পারিনি। কিন্তু স্বীকারে কুণ্ঠা নেই, সুপর্ণার সামনে ওই সমালোচনা আমাকে যেমন বিব্রত করেছিল তেমনি তৃপ্তিও দিয়েছিল। যে কথা মুখে বলা যায় না, অথচ যে অনুভূতি আমার বুকে দীর্ঘদিন তোলপাড় করেছে সেটাই কতো সহজে প্রকাশ হয়ে পড়লো।

পরদিন। দুপুর থেকেই বাদলছায়া, তারপর বিকেল থেকে টিপটিপ বৃষ্টি। আমাকে দেখে সুপর্ণা অবাক হয়ে বললো, 'আজি ঝর ঝর মুখর বাদল দিনে আপনি?' রসিকতায় কবিত্ব ছিল, আন্তরিকতার সুরও। জবাবের জন্য মনে মনে যুৎসই কলি খুঁজছি, সুপর্ণা বললো, 'ও মা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজবেন নাকি?'

ঘরে ঢুকলাম। কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। জানালা বন্ধ। সবাই গেল কোথায়! সুপর্ণা জানালো, মা রান্না ঘরে, বাবা অফিসে আর দাদারা গেছে জরুরী মিটিঙে। 'দাদারা না থাকলে বসতে নেই বুঝি?'

কথাট বলে হাসলো ও। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বৃষ্টির ঝরঝর আর বজ্রের কড়ক'ড়ব মধ্যে যেন চাপান-উতে'র বেধে গেল। ল্যাম্পটাকে মাঝখানে রেখে আমরা বসলাম টেবিলের দুই মেরুতে। সুপর্ণাই প্রথম সরব হলো: আপনি নিজেকে একলা ভাবেন কেন?'

এতো সরল প্রশ্নের জন্য তৈরি ছিলাম না। টিক-টিকির কাটা ল্যাজের মতো অন্ধভাবে ধড়ফড় করে উঠলো বুকটা। কাঁপা গলায় বললাম, 'কেউ এসে তো আমার একাকীত্ব ভাঙেনি এখনো।'

'আপনার দ্বন্দ্ব, প্রস্তুতি আর অন্বেষার যদি কোনো সাক্ষী পান?' প্রশ্নটা করে সুপর্ণা জিবটা ওপরের তালুতে ঠেকিয়ে, চোখে প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলো। জিবের এ-ধরনের ভঙ্গির সঙ্গে লাস্যের সম্পর্ক খুব নিবিড়। প্রচণ্ড এক নৈকট্যের উত্তাপ আমাকে মুহূর্তে উত্তেজিত করে তুললো। পরিবেশ বিস্মৃত হয়ে দু-হাতে তুলে নিলাম ওর একটা হাত। আপত্তি ছিল না। ছাড়ানোর জন্যে চটফটানিও ছিল না। বললাম—'আপনি হবেন আমার জীবনের সাক্ষী?'

চমকালো না, যেন কথাটার জন্যে তৈরিই ছিল। আমার স্থির দৃষ্টি ওর মুখের ওপর আছড়ে পড়ছে দেখেও চোখ নামলো না। প্রচণ্ড আবেগের মুহূর্তেও মেয়েরা যে এমন নিষ্ঠুর হতে পারে আগে ধারণা ছিল না। হাতটা আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে ফস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সুপর্ণা বললো, 'জীবনের সাক্ষী হওয়ার জন্যে আদর্শের মিল থাকা দরকার।'

'কেন কেন কেন?' হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো আমার মুখ দিয়ে: 'আদর্শটাকে বাদ দিয়ে কি ভালো-বাসা যায় না?'

'না যায় না। আদর্শটাকে বাদ দিলে পড়ে থাকে শরীরটা—একটা জড়বস্তু। ধরুন এই ল্যাম্পটায় তেল নেই, অথচ এটা জ্বলছে—এটা কি সম্ভব?'

আমার মতো শব্দালঙ্কারের প্রখ্যাত ঘোড়সওয়ারও থমকে গেল ওই একটি মাত্র উপমায়। কয়েকটি সেকেণ্ড নিঃশব্দে পার করে দিয়ে বললাম, 'হয়তো বন্ধুত্ব গড়তে তোমার আপত্তি নেই, সুপর্ণা?

কথাটা বলে আমি নিজের কাছে অবাক হলাম। কিন্তু প্রতিপক্ষের মুখ প্রতিক্রিয়াশূন্য। আমি সম্পর্কটা আপনি থেকে তুমিতে নামিয়ে এনেছি এক লহমায়, এতোও বিস্ময় নেই। শুধু মৃদু হাসলো। সেই হাসিতে লজ্জা আর তৃপ্তি যেমন ছিল তেমনি ছিল পরিহাসের খোঁচাটে তীব্রতা। বললো, 'হয়তো সেটা হবে স্বপ্নের বন্ধুত্ব!'

তর্ক তোলা যেত, কিন্তু ওই সুমিষ্ট সুতীক্ষ্ণ হাসির ভয়ে আমার মুখ থেকে আর কথা সরেনি সেদিন। চব্বিশ ঘণ্টা বাদে হঠাৎ প্রায় ছায়াছবির গল্পের মতো দেখা হয়ে গেল ওর সঙ্গে। কলেজ থেকে ফিরছিল। মোভ কালারের জামা আর নীলচে সালোয়ার। যেন কুজিকালার ছবি থেকে সদ্য নেমে এসেছে এমনই অলীক দেখাচ্ছিল সুপর্ণাকে। আমাকে দেখে স্বভাব-সিদ্ধ গলায় বললো, 'জরুরী কথা আছে।' কব্জিতে সময় দেখে নিয়ে বললো, 'চলুন ওই দোকানটায় বসা যাক।'

বসলাম। দু-কাপ চায়ের অর্ডার সুপর্ণাই দিল। তারপর চোখ থেকে চশমাটা নামিয়ে আমার চোখের মধ্যে দৃষ্টি ঢেলে এমন ভাবে তাকালো, যেন একটুও আমার চোখ উপচে বাইরে পড়ে নষ্ট না হয়। সেই ভাবেই তাকিয়ে থেকে বললো--'দেখুন, ছোটোবেলা থেকেই আমি অঙ্কের ছাত্রী, তাই জীবনের সব ঘট-নাকে টু দ্য পয়েন্ট ভাবতে ভালবাসি। আমি এতো-দিনের জীবনে কাউকে ভালোবাসার সুযোগ পাইনি তাই এখন বুঝতে পারছি না আমি ভুল করতে চলেছি কিনা।' চা এলো, চুমুক দিয়ে আবার বললো,

'আপনি যদি কলেজ পালিয়ে দু-ঘণ্টার জন্যে সিনেমা কিংবা পার্কে যাওয়ার জন্যে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন তাহলে কিন্তু এখানেই আমি সম্পর্ক শেষ করবো।' তারপর আনত মুখে খাতার ওপর কলম দিয়ে চক্রাবক্রা রেখা টানতে টানতে বললো, 'আর যদি আগামী দিনের সুন্দর সংসারের স্বপ্ন দেখেন আমাকে ঘিরে, তাহলে—আমি টাকা-পয়সা বড়ো পোস্ট এসব চাই না, শুধু ভালোবাসি সৎ। আমি মনে করি জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্যে বন্ধুর প্রয়োজন, ভেঙে ফেলার জন্যে নয়—'

এইখানে সুমন্ত থামলো। আমি নির্বাপিত সিগারেটে এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধ চিত্রাপিতের মতো বসেছিলাম। একটা স্টেশনে গাড়ি এসে থেমেছিল, মুখ বাড়িয়ে নামটা পড়ার আগেই ট্রেন ছেড়ে দিল। সুমন্ত আবার বলতে লাগলো : "সুপর্ণার সঙ্গে দলের যোগাযোগ কতটুকু, সমিতির দায়িত্ব কতটা সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা ছিল না। একদিন কোর্ট মোড়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছি, একজন আধ-প্রৌঢ় লোক আমাকে ডাকলো। গায়ে বেলকর্মীর জামা, গোটানো প্যাণ্ট, হাতে ঝোলা। চুল উসকো-খুসকো, খোঁচা দাড়ি। আমার মুখে জুলুজুলু চোখে কী যেন খুঁজলো, পরক্ষণে কাছে এসে বললো—'উহু, চেনবার কথা নয়। তুমি নিশ্চয়ই সুমন্ত? বেশ বেশ। এসো, ওদিকে একটু বসি'—হীরাপুরের মিউনিসিপ্যালিটি মার্কেটের ছই ঘেঁষে একটা শিশু-পার্ক আছে, তারই একটা গাছের নিচে দুজনে বসলাম। লোকটি নিজের সংক্ষিপ্ত কথায় জানালো, সুপর্ণা ওদেরই দলের ওয়াণ্টেড কর্মী এবং সুপর্ণার ওপর দলের দায়ভার অনেক। তারপর পর পর তিনটি প্রশ্ন :

'সুপর্ণা তোমাকে ভালোবাসে?'

'হ্যাঁ।'

'সুপর্ণাকে তুমি বিয়ে করবে?'

'হ্যাঁ।'

'সুপর্ণার মতাদর্শে তুমি বিশ্বাসী?'

'হ্যাঁ।'

শেষ 'হ্যাঁ' টার মতো মিথ্যে কথাটা আমার জীবনে আর কখনো বলিনি। আমি গুপ্ত সমিতির সদস্য হলাম। আমাদের রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয়ে গেল।'

আবার থামলো সুমন্ত। সন্দিগ্ধ চোখে একবার আমার মুখের দিকে তাকালো, তারপর দু-হাতে মাথা রেখে বসে থাকলো। আমিও চুপ করে থাকলাম। তীব্র বেগে ছুটছে ট্রেন। হাওয়ার ঝাপটা। এক বুড়ো সওয়ারি কোণের বেঞ্চিতে বসে ঝিমোচ্ছে। ওপরে হ্যালোজেনের আলো মিটমিট করে জ্বলছে। হঠাৎ মৌন ভেঙে সুমন্ত বলতে আরম্ভ করল : "আমাদের দাম্পত্যের ইতিহাসটা খুব সংক্ষিপ্ত। ভালোবাসার ইতিবৃত্তটা আরো সংক্ষিপ্ত। 'হৃদয়পানে হৃদয় টানে নয়ন-পানে নয়ন ছোটে' গোছের কিছুই ছিল না। তথাকথিত 'ক্রুড' প্রেমকে সুপর্ণা ঘৃণা করতো। আমার মুখেও তুমি কি মিষ্টি দেখতে, তোমার চোখ কি সুন্দর, মুখটা একটু তুলে ধরো—এসব ডায়লগ আসতো না। রাত্তিরে ঘুম-না-আসার আগে পর্যন্ত চলতো রাজনীতি সাহিত্য সমাজ নিয়ে কূটতর্ক। এর মধ্যেও সত্যিকারের প্রেম টিঁকে থাকে, কেননা তা জীবনের ভেতরে না ঢুকলেও, জীবনকে তার ভঙ্গিতে প্রবেশ করবার লোভ দেখায়। কিন্তু আমার প্রেম যতটা তীব্র ছিল, সুপর্ণার প্রেম তার নাগাল পায়নি। এটাই স্বাভাবিক। নারীর প্রেম পুরুষের প্রেমকে হারিয়ে দিয়েছে এমন একটাও দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নেই। তাছাড়া ব্যক্তিত্বের তীব্র সংঘাতে, পারস্পরিক মতাদর্শের বৈষম্যজনিত বিরোধে আমাদের দাম্পত্য-সূত্রের অন্তঃসারশূন্যতা বেশিদিন ঢাকা থাকেনি।

বিয়ের যৌতুক স্বরূপ সুপর্ণা মাও-সে-তুঙের একটি সুদৃশ্য রঙীন ফটো সঙ্গে করে এনেছিল। সেটার ওপর

ওর যত্ন ছিল ষোলো আনা। মাঝে মাঝেই দেওয়াল থেকে খুলে রুমাল দিয়ে ঝাড়পোঁছ করতো। আমি মাওয়ের চোখের দিকে চেয়ে বলতাম—'ওহে পরদেশী যোদ্ধা, ভারতবর্ষে কি কোনদিন বিপ্লব আসবে?' আর এটাই উপলক্ষ্য করে আমার আর সুপর্ণার মধ্যে চলতো সরল বাগযুদ্ধ। সুপর্ণা বিয়ে করেছিল আমাকে, কিন্তু প্রাণমন সঁপে রেখেছিল 'দল' নামে এক কঠিন শুষ্ক সংস্কার মধ্যে। ওর প্রেয়সী সত্তার সমস্তটাই জুড়ে ছিল দলীয় মতাদর্শ। ও মনে করতো ভারতে একদিন বিপ্লব আসবেই যদি গ্রামগঞ্জের চণ্ডাল সামন্তরা খোঁয়াড়ে প্রদর্শিত হয় সব বিনাশর্তে এবং কারাবন্দী কয়েদখানায়—তবে এমন দিন আসবেই যখন সবুজ মেঘে পাখনা মেলে উড়ে যাবে শ্বেত পারাবতের ঝাঁক, মাও আর সি-এম-এর গানে শুরু হবে এদেশের প্রভাত ফেরী।

দলের প্রতি আমি সৎ ছিলাম না, সংবেদনশীল যদি বা। বাল্যে প্রকৃত শিক্ষার অভাব আর ভুল আদর্শই আমাকে প্ররোচিত করেছিল ব্যক্তিগত ধান্দা-বাজিতে। আমার স্বর্গত পিতা ছিলেন কয়লার আড়তদার, আমিও উত্তরাধিকার সূত্রে টাকাকড়ি ভালোই বুঝি। সাহিত্য করতে গিয়ে একধরণের বাণিজ্য করি। মধ্যবিত্ত মানসের আমি একজন যথার্থ প্রতিনিধি। দলের এবং সশস্ত্র কৃষক-বিপ্লবের বিপক্ষে নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিতাম যে ভারতবর্ষে এমন কোনো দল নেই যারা সংঘ থেকে তুলে ধরবে মানুষের সংগ্রামী নিশান। সংসদীয় দলগুলির ক্রমাগত ব্যর্থতার পরিণামে সশস্ত্র কৃষিবিপ্লবের যে বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল সমস্ত কিছুই এক ভয়াবহ হঠকারিতায় পর্য-বসিত হয়েছে আজ। দলের প্রতি উপদলের ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতায় ওরা টুকরো টুকরো হতে হতে যেভাবে নিজেদের নিঃশেষ করতে উদ্যত হয়েছে তাতে বিপ্লবের প্রগতিধারাই হয়তো বানচাল হয়ে যাবে কোনোদিন। সুতরাং ওদের তরফে আমার সহানুভূতি থাকার যুক্তি নেই।

কিন্তু আমার এই ব্যক্তিগত সমঝদারি সুপর্ণার যুক্তির কাছে বরাবর পরাস্ত হয়েছে। আমার মতাদর্শে ওর তিলমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। ভেবেছিলাম, আমরা ভিন্ন বিশ্বাসের মানুষ হলেও, হয়তো পরস্পরকে দেখে ও পেয়ে মুগ্ধ থাকতে পারবো কিছুকাল। কিন্তু বাস্তবে আমাদের দাম্পত্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাসের ঘরের মতো, যার ওপর ঝুলে থেকেছে ডেমোকেলসের তর-বারীর মতো একটা ক্ষীণ আশঙ্কা। অথচ সুপর্ণাকে ঘিরে আমার সুখ-দুঃখ, বিবোধ ও শান্তি, উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না।

আমার মা থাকতেন মধ্যপ্রদেশে, বড়দার কাছে। পরিবারে সদস্য বলতে দুজন—আমি আর সুপর্ণা। বাবা যথেষ্ট টাকা রেখে গিয়েছিলেন, আমিও লিখে-টিখে রোজগারপাতি মন্দ করতাম না। তবুও সুপর্ণা চাকরি ধরেছিল। স্কুল মিস্ট্রেস। কিছুদিন বাদে ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসারের বিরুদ্ধে আন্দোলন খাড়া করে চাকরি খুইয়ে ঘরে এসে বসলো। রাতদিন ঘরের মধ্যে গুটি পাঁচছয় তরুণতরুণীর সঙ্গে কী যে এতো গুজগুজ ফিসফিস চলতো, জানি না। ওদের রাজনৈতিক মতবাদ কিংবা বিশ্বাসে আমার কোনো আগ্রহ ছিল না।'

সুমন্ত আবার একটু থামলো। আমি কোনো কথা বললাম না। কিছুক্ষণ পরে সে বললো, "এর পরের ঘটনা খুব জটিল। জট ছাড়িয়ে কিভাবে বলবো বুঝতে পারছি না। একদিন রাতে শুতে যাবার আগে নিত্য অভ্যেসমতো ডায়েরি লিখছি, এমন সময় সুপর্ণা ঘরে ঢুকে হাসি হাসি মুখে বললো, 'তোমার জন্যে একটা সুখবর আছে।' পরক্ষণে সে আমার চেয়ারের হাতলের ওপর বসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আদুরে সুরে বললো: 'তুমি বাবা হতে চলেছো।' কথাটা

বলে চৈত্রের পাখি ডাকা ভোরের মতো একমুখ হাসি নিয়ে আমার মুখের ওপর দৃষ্টিস্থাপন করলো। একটা সদ্যফোটা মালতীলতা যেন বিন্দু বিন্দু শিশিরকণা মেখে আমার চোখের সামনে ঝুলে ছিল।

সপ্তাহ দুই পরের কথা। সকালে উঠে প্রাতঃ-কর্ম সেরে খবরের কাগজ পড়ছি। পড়তে পড়তে হঠাৎ চমকে উঠলাম। সোজা হয়ে বসে আবার পড়লাম খবরটা—'অওরঙ্গাবাদে পুলিশ-উগ্রপন্থী সংঘর্ষে প্রবীণ নকশাল নেতা সুপ্রকাশ সেন সহ পাঁচ ব্যক্তি নিহত।' আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে এসেছিল। সুপর্ণাকেও পড়তে দিলাম খবরটা। আশঙ্কা করে-ছিলাম প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের। কিন্তু ও তেমন কিছু করলো না। হঠাৎ আমার বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

এর পরেই সুপর্ণা হোলটাইমার হিসেবে নাম লিখিয়েছিল দলের সেণ্ট্রাল কমিটিতে। একদিন ও বললো, দলের নির্দেশে ওকে অওরঙ্গাবাদ যেতে হবে। কারণ জানতে চাইলে সুপর্ণা বললো: 'ব্যাপারটা গোপনীয়। তোমার কৌতুহল নিরর্থক।'

ওর মুখ চোখের ভাব দেখে আমি তো অবাক: 'কৌতুহল কি বলছ সুপর্ণা! আমি তোমার স্বামী'—

'স্বামী হও আর যেই হও, তোমার সব কথার জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।' সটান ঘুরে দাঁড়িয়েছিল সুপর্ণা: 'ঘরের মধ্যে আরাম চেয়ারে বসে বসে দিন-রাত সাহিত্যের বেনিয়াগিরি করলে একজন কম্যুনিস্ট মেয়ের স্বামী হওয়া যায় না।'

বিস্ময়ের পরপর কয়েকটা ধাক্কা সামলে নিয়ে কী যেন বলতে গিয়েছিলাম, বলতে পারিনি।

আর একদিন। সেই দিনটির কথা বলেই আমি আমার গল্প শেষ করবো। ওই দিন সুপর্ণা বললো—'তুমি যদি আমার কোনো কাজে বাধা দাও, তবে আমি কোর্টে ডিভোর্সের মামলা তুলবো।'

আমি যদি মূক হতাম তবে সেই মুহূর্তে হয়তো কথা বলার শক্তি পেয়ে যেতাম। 'ডিভোর্স'—কতো সহজেই কথাটা উচ্চারণ করতে পেরেছিল সুপর্ণা! হঠাৎ হঠাৎই হু হু করে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল: 'দোহাই সুপর্ণা, তোমার ওই রূঢ় শব্দটা দিয়ে এখনই আমাদের ভালোবাসার সমাধি তৈরি করে দিয়ো না। অন্তত তার মরার জন্যে অপেক্ষা করো।' পরে সামলে নিয়ে বলেছিলাম, 'যে-বিষয়ে আমি আগ্রহী নই, সে বিষয়ে কিভাবে একমত হবো?'

'তবে তালাক হোক।'

'না সুপর্ণা'—আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম।

'তবে কি?' সুপর্ণার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার চোখের ওপর আছড়ে পড়েছিল।

আমার যেন বাক্‌রোধ হয়েছিল। পরে অনেক কষ্টে ধীরে ধীরে বলেছিলাম: 'আমি কখনো চিন্তা করিনি তোমার আমার অধিকার নিয়ে। এই মুহূর্তে চিন্তা করতে হচ্ছে। তোমার মতাদর্শ আর রুচির সঙ্গে আমার চিন্তাভাবনার ফাঁকটা আজ স্পষ্ট হয়ে গেছে। তা বলে স্বামিত্ব ফলাতে পারবো না আমি। কিন্তু তুমি যে বিষয়ে তালাক নেবে ভেবেছো, সেটা আমা-দের প্রেমের চেয়ে বড়ো নয়'—

'প্রেম! সুপর্ণার ঠোঁটে তাচ্ছিল্য ফুটে উঠলো: 'পরস্পরের রুচি নীতি-নৈতিকতার মিল না থাকলে প্রেম বেঁচে থাকে কি করে?'

'কিন্তু'—ওই কিন্তুর মধ্যে আকুতির সুর ফুটিয়ে আমি বুকের কোন উদ্বেগকে চাপা দিতে চেয়েছিলাম সেটা ধরতে পেরেছিল সুপর্ণা। তবুও নির্দ্বিধ গলায় বলেছিল: 'তবে আমাকে ছেড়ে দাও, সুমন্ত।'

ছেড়ে দিলাম। মুক্তি দিলাম ওকে। কোনো দাবি কোনো অধিকার রাখলাম না ওর ওপর।'

এই বলে সুমন্ত থামলো। আমি জনান্তিকে ঘাড় নাড়লাম; এখানে তো কোনো মতেই শেষ হয় না।

সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বেগম আখতারের গজলের একটি শের আউড়ালাম :

'অয় মোহব্বত তেরে অঞ্জাম পে রোনা আয়া
জানে ক্যুঁ আজ তেরে নাম পে রোনা আয়া।'

সুমন্ত হাসলো। বড়ো কষ্টক্লিষ্ট হাসি। বুঝলাম বেগম সাহিবা আমার সহায় হয়েছেন। সুমন্ত বললো—"পরের অংশটা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। আমি বুঝেছিলাম, কাল সন্ধ্যায় যে ফুল সৌরভ বিতরণ করেছিল, আজকের ক্ষররোদে তা শুকিয়ে ম্লান হয়ে গেছে। কিন্তু সেইটে যে সুপর্ণার কাছেও স্পষ্ট, তা বুঝিনি। আসলে ভালোবাসার রূপ আছে, গন্ধ নেই। সুপর্ণার খবর আমি প্রায়ই পেতাম। কিন্তু হাজার চেষ্টাতেও ওর দেখা পাইনি। একদিন ডাকপিওন দুটো খাম দিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে পড়লাম। একটা চিঠিতে বম্বের জনৈক নামজানা চিত্র পরিচালক আমার 'রাত কী কহানী' উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণের অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছেন আর দ্বিতীয় চিঠিতে···। বুকটা দুলে উঠলো—তড়াক করে উঠে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রতিবিম্বকে বললাম : 'তুমি বাবা হয়েছো'—

সুপর্ণা লিখেছে : 'কেমন আছো? আমাদের কন্যা সন্তানের নাম দিয়েছি সুমনা। পছন্দ হয়েছে তো? ঠিকানা দিচ্ছি। ওকে দেখে আসতে পারো কলকাতার মাতৃসদনে। ভালোবাসা নিয়ো। ইতি'—সুপর্ণা নিজের ঠিকানা দেয়নি। পোস্টমার্ক পাটনার। ছুটে এলাম কলকাতায়। দেখলাম সুমনাকে। আহা, এমন সুন্দর শিশুকে ছেড়ে···। আমি নিয়ে যেতে চাইলে পরিচারিকা বললেন, নিষেধ আছে। ওঁর মুখেই শুনলাম সুপর্ণাও মাঝে মধ্যে দেখতে আসে মেয়েকে।

একদিন হঠাৎ দেখা মাতৃসদনের সিঁড়ির কাছে।

'কেমন আছো সুপর্ণা?'

'দেখতেই পাচ্ছো'।

দেখলাম বটে। সুপর্ণা সেই সুপর্ণাই আছে। এই দু বছরে দশমিক দুই অংশও শ্রী নষ্ট হয়নি ওর। এটাই বুঝি স্বাভাবিক। যাদের মন পাথরে বাঁধানো, যাদের বুকে ভালোবাসার তিলমাত্র জ্বালাযন্ত্রণা নেই, তারাই বোধকরি সবসময় তাজা থাকে। তারা এমনই কৃপণ যে নিজের অপরূপ যৌবনশ্রী থেকে কণামাত্র খরচ হতে দেয় না। সেদিন আর দাঁড়ায়নি সুপর্ণা, সিঁড়ি দিয়ে তরতরিয়ে নেমে গিয়েছিল।

আরও বছর খানেক কাটলো। ইতিমধ্যে আমার দুটো উপন্যাস চিত্ররূপ পেয়েছে, একটাতে অভিনয়ও করেছি। চারদিকে আমার নাম আর কৃতিত্বের জয়ঘোষ। একদিন বম্বের বিমানবন্দরে পদার্পণ করা মাত্র সাংবাদিক আর অন্যান্য লোকজন আমাকে ঘিরে একটা তাণ্ডব শুরু করে দিল। সম্মান স্তুতিবাদ আর ফটো তোলা সাঙ্গ হলে ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন আধবুড়ো লোক এসে দন্তাগ্রভাগ উন্মুক্ত করে বললো—'স্যর, আপনার সঙ্গে একজন মহিলা দেখা করতে চান'—। ভাবলাম কোনো তরুণী আর্টিস্ট বুঝি আমার ছবিতে নায়িকা হবার আরজি নিয়ে এসেছে। ভিড়ের যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য আমিও তৎক্ষণাৎ বিকশিতদন্তে বললাম—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন'—

কিন্তু বাইরে এসে থমকে দাঁড়ালাম।—

'সুপর্ণা'—

'সুপর্ণা চোখ তুলে তাকালো। চুল উড়ছে হাওয়ায়, করুণ মুখ। বললো—'দু-দিন হলো এখানে এসেছি। সেণ্ট্রাল কমিটির মিটিংয়ে। তুমি বম্বে আসছো শুনে দেখা করতে এলাম। বেশ চলছে তোমার, এরোপ্লেন, চুরুট, ব্যস্ততা'—

'আর ব্যথা'—আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম : 'আমার সঙ্গে চলো সুপর্ণা, তোমাকে সব বলবো'—

আপত্তি করলো না। মিনিট বিশেকের ব্যবধানে আমরা একটি নিউ মডেলের হিলম্যান গাড়িতে চেপে এসে উঠলাম এক ভিন তলা হোটেলে।

একসঙ্গে পানাহার করলাম। ঘনিয়ে এলো রাত। ওকে আবেগে জড়িয়ে ধরে বললাম : 'তুমি ফিরে আসবে সুপর্ণা ?

'জানি না'—সেও আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল।

ওর ঘনায়িত কেশজাল দুপাশে সরিয়ে ওর শুচি-স্নিগ্ধ মুখপদ্ম দু-হাতে ধরে আমি সুপর্ণার আমীলিত ওষ্ঠাধরে একটা সশব্দ চুম্বন প্রদান করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বহুদিনের নিরুদ্ধ দেহাগ্নি অকস্মাৎ প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। হোটেলেই আমরা রাত্রিযাপন করলাম।

পরদিন সকালে উঠে সুপর্ণা বললো—'যা হবার হয়ে গেছে। এবার তুমি নতুন বিয়ে করো'—

'বিয়ে ? তোমাকে ছেড়ে ?'

'বাজারি ফিল্মের যে রসদ যোগায় তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। যার সঙ্গে আমার বিরোধ তারই সঙ্গে তোমার আপোস।' সুপর্ণা ফুঁসে উঠেছিল : 'তুমি শুনে রাখো, এই সামন্ততান্ত্রিক জীবনযাত্রাকে এবং তার প্রতিভূদের আমি ঘৃণা করি, মনেপ্রাণে ঘৃণা করি'—

আমার বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠেছিল। সুপর্ণা থাকেনি, চলে গিয়েছিল। তালাকের কথা উঠেছিল, আমারই অনুরোধে সেটা স্থগিত রাখা হলো। স্বামী-স্ত্রী-শিশুকন্যা তিনজন তিন দিকে পড়ে রইলাম।

বছর দেড়েক বাদে আবার দুজনের দেখা। রাঁচির এক জঙ্গলে আমাদের নতুন ছবির শুটিং চলছিল। সুপর্ণাকে দেখলাম অন্য রূপে, অন্য বেশে। সে তখন আদিবাসী সংগঠনে তৎপর। দুজনে দুজনকে গ্রহণ করলাম। কিন্তু দুজনেই বুঝলাম, নতুন করে ভাঙা সম্পর্ক জোড়া দেওয়া যায় না। একসময় দুজনে দুজনকে ছেড়ে দুদিকে চলে এলাম।

আজ আবার হঠাৎ দেখা হয়ে গেল কলকাতার এসপ্ল্যানেডে। ও এখন অ্যান্টি মেকানাইজেশন আর আনবিক বোমা বিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। আজ বিকেলে আমরা একসঙ্গে পানাহার করেছি। মাতৃসদনে সুমনাকে দেখতে গিয়েছি, গল্পও করেছি। আসলে ফুলের দিন অবসিত হলেও সুবাস কিছুটা রয়ে যায়, সেই সুবাস মনকে ব্যাকুল করে। তবু তবু তবু আমরা একে অপরকে ত্যাগ করে আজও আবার বিদায় নিলাম। রয়ে গেল পারস্পরিক ভালোবাসার রেশ··· না বলা প্রেম···অব্যক্ত ব্যথা···যন্ত্রণা···" সুমন্তর গলার স্বর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে গাড়ির তোলপাড় শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে গেল। ●

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

০ ১৩৯২ র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আপনার পত্রিকায় আমার কয়েকটি কবিতা প্রকাশ হওয়ার পর এবং গত বইমেলায় 'রক্তাক্ত ঘরাণার কবিতা' গ্রন্থটি প্রকাশ হলে এই বঙ্গের বিভিন্ন কর্ণার থেকে আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন 'ঘরাণা' শব্দে মূর্ধ 'ণ' ব্যবহার কেন করলেন। দন্ত 'ন' হওয়া উচিত। সাক্ষাতে কেউ কেউ, এবং চিঠিপত্রে একই প্রশ্ন বড় বিব্রত করে তুলেছে এখন। তাই আপনার পত্রিকার মাধ্যমে বিষয়টি এভাবে জানাতে চাই।

সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রীতি অনুযায়ী এখন ৬০% লেখক কবি সাহিত্যিকগণ 'ঘরানা'-তে 'ন' শব্দের ব্যবহার করলেও 'ন' এবং 'ণ' দুটোই ঠিক। 'ঘরানা' যেমন ঠিক বাংলা ভাষার ঋণ অনুযায়ী; তেমনি ঐতিহ্য অনুযায়ী 'ঘরাণা' লেখাও অভিজাতভাবে নির্ভুল। কেউ যদি 'ন' বা 'ণ' কোন একটিকে এক্ষেত্রে ভুল বলে বলেন তাহলে সেটি হবে অমার্জনীয় অপরাধের মতো। সুবল মিত্রের অভিধানে [যেটি আশুতোষ দেব করেছেন] 'ঘরাণা' 'ন' এবং 'ণ' উভয়ই নির্ভুল বলা আছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহনেও তাই। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যের অনেকানেক অগ্রজ স্বনামধন্য কবি সাহিত্যিক 'ঘরাণা' এই বানান লিখেছেন। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে "তোমার জন্য রাজসিংহ সর্বস্ব পণ করিবে কেন? বিশেষত মাড়বারের তুমি ঘরাণা···'ইত্যাদি। ১৭.৪.১৯৮৬

সোফিওর রহমান/ভেরপেখিয়া, মেদিনীপুর

সময়ের দর্পণে তিন কবি ঃ বিশিষ্ট তিন মুখ

জগৎ লাহা

কার্ডিগানে কুসুম প্রস্তাব

কৃষ্ণা বসু

প্রজ্ঞা প্রকাশনী

কলকাতা-১৭

O 'কার্ডিগানে কুসুমপ্রস্তাব' কৃষ্ণা বসুর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। নামটা প্রথম প্রথম ভালো লাগছিল না, এই লেখার সময় খারাপ লাগছে না। কবি 'কবিতা-আক্রান্ত মুহূর্ত ও মানুষজনের প্রতি' এই কাব্য নিবেদন করেছেন। কবিতা-আক্রান্ত মানুষজনের প্রতি কেন—বুঝি, কবিতা-আক্রান্ত মুহূর্ত কি তা-ও বোধগম্য, কিন্তু কেন দুর্বোধ্য। অথচ এই কবির কোনো কবিতাই দুর্বোধ্য নয়। সর্বত্র সুবোধ্য বা সব কবিতা তা ই, তা নয়, এরকমটা হওয়াও বা চাওয়াও অসম্ভব। ৬৩ পৃষ্ঠার কবিতার বইয়ে বেশ-কয়েকটা কবিতা সংকলনে স্থান না দিয়ে সরাসরি ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করা যেতে পারত। কিন্তু অনেকগুলি কবিতা ভালো, চমৎকার সুন্দর, হার্দ্য, বারবার পড়া যায়। এই ভালো ইত্যাদি কবিতাগুলি বুঝতে দেয় এই বন্ধ্যা সময়ে কিছু ভালো কবিতা লেখা হচ্ছে। কৃষ্ণা মূলত রোমান্টিক, সময় পরিস্থিতি পরিপার্শ্ব ও অবস্থান থেকে শিল্প প্রেম নিসর্গে—গভীর ব্যাপক,—ফিরে যেতে যান। তাই 'কালো নদীটির সুতীব্র জলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন' 'করুণ সন্ন্যাসীর দীর্ঘ হাতখানির ছোঁয়া' অনুভব করতে চান, জানেন—সংসারে 'স্বর্গীয় প্রেমের খব অনটন'—এইরকম। 'নবান্ন ও ফাঁকা মাঠ'কে যদি রূপক বলে ভেবে নিই, তবে সমস্ত কবিতাটি একটি মানব বা মানবীর রূপকল্প হয়ে ওঠে, ভারি স্বাদু মনে হয়

তখন কবিতাটি। কৃষ্ণা স্মৃতিবিহারিণী স্মৃতিবিরহি-নীও! তাঁর অনেকগুলি কবিতায় পরিপূর্ণ প্রাণ ও হৃদয়ের ছটফটানি ('ওগো মধ্যরাত, মনে রেখো' প্রভৃতি।) অনেকগুলো কবিতা নামে আলাদা-আলাদা, কিন্তু সবগুলো মিলে একটা। সেগুলো পড়তে পড়তে মনে হয় একটা কবিতাই পড়ছি। তবে কবিতা-গুলোয় একটা নিবিড় বিষণ্ণ, কখনো গাঢ়/নিগূঢ় আত্মনিবেশ পাঠককে আবিষ্ট করে ('ছিলে মাটি পাথর হয়েছ' প্রভৃতি)। যুবক জানে না' কবিতাটিতে এই ছবিটি আছে :

অস্নাত তৃষিত যুবা বসে আছে একা/ঠিক একা নয়, প্রতীক্ষার অধীরতা রয়ে গেছে তার/সঙ্গী হয়ে।/ সেই রমণীটি আসবে না,—/কিন্তু যুবক জানে না তা,/ সে শুধু মেরুণ মেঘের নিচে/অন্ধকার বৃক্ষটির কাছে বসে আছে।' খুব স্বচ্ছ, নিত্যঅভিজ্ঞতার একটি ছবি, কিন্তু মনে nostalgia আনে। রোমান্টিক, জীবনানু-রাগী, শুদ্ধতা ও সৌন্দর্যে আস্থাশীল কবি কিন্তু জীবনের কাছ থেকে যা চেয়েছিলেন, পাননি। কোনো শিল্পী পায় না। সে অর্থে নয়; সাধারণ অর্থেই জীবন তাঁর কাছে তিক্ত, কটু; অথচ জীবন পরিপূর্ণভাবে ভালো-বাসার, গভীরভাবে উপলব্ধি করার। আমি কৃষ্ণার কবিতাগুলো পড়তে পড়তে এইসব ভেবেছি—মানে, তাঁর কবিতায় পেয়েছি বলেই মনে হয়েছে। কয়েকটি শব্দের প্রতি কবির আসক্তি আছে, যথা: স্তুন, প্রস্তাব, ঝুঁকিয়ে ইত্যাদি। কিন্তু তেমন কোনো দ্যোতনা আসে নি, শব্দগুলো থেকে। 'রৌদ্রল' চলবে কি? আর 'হৃদপিণ্ডে' কি 'হৃদপিণ্ড' হলে নির্দোষ হয় না?
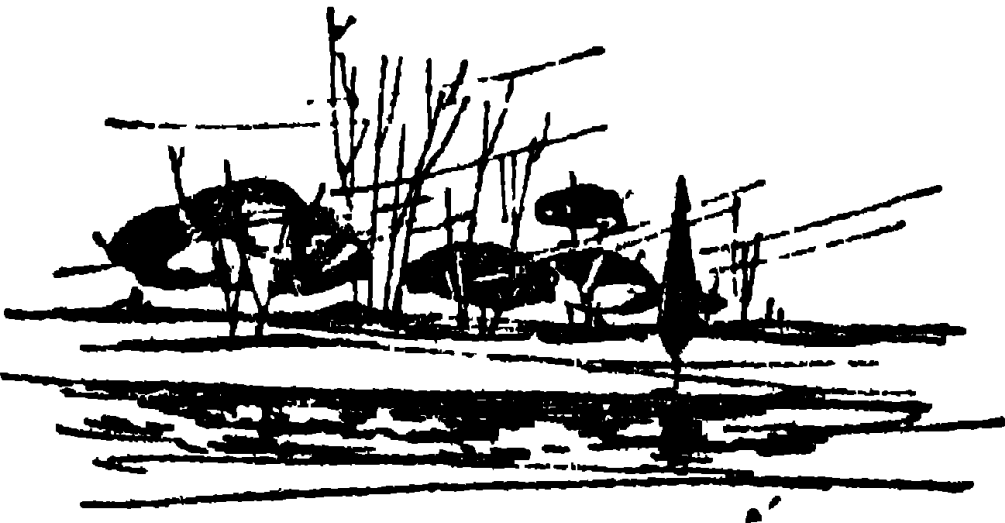
নীল সময়

সংযম পাল

সাহিত্য প্রকাশন

কলিকাতা-৭০০০৪৮

O সংযম বয়সে তরুণ, তাই বলে তার উচ্ছ্বাস অ-সীমায়িত বলা যাবে না; অথচ সে বেশ দাপটের সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে যায় হাতে বল্গা কষে ধরে। তার প্রভূত প্রাণশক্তি, অফুরন্ত কামনা-বাসনা, যা কেউ কেউ যৌনতা বলে অভিযোগ করতে পারে, আমি পারি না, কারণ আমি চাই কবিরা আরো সাহসী হোন, যেমন বিপ্লবের কথায় সোচ্চার, তেমনি জীবন এবং যার অন্যতম প্রধান বা প্রধান উপাদান যৌনবোধ —যৌনচেতনা, তার কথাতেও। বয়স্ক কবিরা সংযমকে ঈর্ষার চোখে দেখেন কি না আমার জানা নেই, তবে তাঁর নিজের কথাতেই স্বীকৃতি মিলেছে 'আমি খুব কৌশলী, প্রিয় শব্দকে রেখে ঢেকে/সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে দক্ষ, গভীরতা নেই কোন।'—বোধহয় অর্ধসত্য। কবিকে কৌশলী হতে হয় বৈকি। ভারতচন্দ্র ঐ একটি গুণেই এখনো আসর মাতিয়ে বিরাজ করেন। তবে 'গভীরতা' তো কবির সাধনার জিনিস। সংযম, ঠিক করে ভেবে বলুন তো, একালে কবি বা শিল্পীরা গভীরতার অন্বেষণ করেন? নাকি বুদ্ধি এবং আর্ষ জ্ঞানের পরিচর্যা করে তোলেন, অবশ্য সে বাদ্যযন্ত্র কিন্তু তারযন্ত্র নয়, চর্মবাদ্য। সমকালের অনেক বড়ো বড়ো কবিও এই খেলায় মেতেছেন, পুর-স্কৃত হয়েছেন, হচ্ছেন। তাতে কি? সংযমের কবি

তার বিষয় প্রধানত নারী : অপ্রধানত নিসর্গ ও মানুষ। কেননা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিসর্গ ও মানুষ এসেছে নারীর চালচিত্র হিসেবে। শুধু নারী কবিতার বিষয় হলে অতি কামুক কবিতাপাঠকও বহিঃপ্রকাশে রুষ্ট হন। কিন্তু সংযমের তার জন্য ভয় থাকার কথা নয়। যদিও তাঁর নারী ননীর/মাটির/সাজির পুতুল নয়, রক্ত-মাংসের—কিন্তু ভারি passive। সে কিছু করে না, করায়ও না বেশিকিছু। পুরুষই সব করে, শুষে নেয়। হাড়ির কথার মতো—পুরুষ নারীর সব নেয়, নারী ভোগ করে অশেষ যন্ত্রণা। কিন্তু সংযমের কবিতার নারীর সেই যন্ত্রণাভোগও নেই, থাকলে রক্ত-মাংসের নয়, মর্ম মাংসেরও হতে পারত। অথচ এই নারী এক আশ্চর্য সন্তানের জন্ম দেয় :

ওজনে মহান সেই শিশু উঠছিলো জেগে। আমি তার মুখ/এখনি দেখেছি এই ত্বকের বাইরে থেকে। নির্জনের সুখ/আছে তার সারা কোষে। মনে হয় সেহেতু আমার—নিশ্চয় নির্জন ছিল সেই রাত, যে রাতে সে পেটে এসেছিলো।/সংযমের কবিতাগুলো পড়তে পড়তে বারবার মনে হয়েছে, সংযমের নারী নিয়ে এতো কথা বেশিদিন তাকে তৃপ্তি দেবে না। নারী তার জীবনে ও কবিতায় ক্রমশই প্রতীক হয়ে এক নৈর্ব্যক্তিক আস্তিক্যবোধে উত্তীর্ণ করে দেবে। মেধা, বুদ্ধি, সততা, শব্দচাতুর্য, ছন্দ:-কৌশল - সংযমের কবিতায় এখনো ভূষণ হয়ে ওঠেনি, বহু-ক্ষেত্রেই ভারণ হয়ে রয়েছে। তবে আমি একথা বলতে পারি সংযমের মধ্যে আছে অসম্পূর্ণতার বেদনা —এই বেদনাই তাকে কবি সমাজে সুশোভন মর্যাদা জোগাবে।

যে মৃত্যু আসে না, তাকে বারবার অনুভব করি।

কেঁপে ওঠে সরাবুক (সারা বুক।), কাঁপে লাল ধমনী-জালিকা।

হে কাল, অনতিক্রম্য, আমি আজ অনুভব করি

আমার মৃত্যু, আর এই গ্রহে তার বিচরণ।

সে মৃত্যু আমার গম্য, তাকে আজ ধমনীতে পাই।

(অনতিক্রম্য)

আমি সংযমকে ছাড়িয়ে এবং হারিয়ে যেতে বারণ করি, বিশ্বাস—সে আরো সংহত ও আত্মস্থ হবে। কবি হওয়া মানে কবিতা-ছাপানো নয়। একটু মাস্টারি হয়ে গেল নাকি!

O সোফিওর রহমানের 'রক্তাক্ত যবাণার কবিতা,' মনে হচ্ছে, দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। ওর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মুহূর্তের মানচিত্র' পড়ার সুযোগ ঘটেনি। তবে অনেক সৃজনপটু কবিদের মতো ওঁর অনেক কবিতা পত্রপত্রিকায় দেখেছি, পড়েছি। সোফিওরের কথা বলার ভঙ্গিটি নিজস্ব, অনেক সময়ই বেশ দৃপ্ত, আবার ক্ষেত্রবিশেষে ভীষণ গদ্যময়—নিছক Statement-ধর্মী। বাক্য খুব সহজবোধ্য, বক্তব্য নতুন নয়, তবে পুনরু-চ্চারণ মন্দ লাগে না এমন অনেক কবিতা এই কাব্য-গ্রন্থে পেলাম। যেমন :

দু'হাতে কলঙ্ক মেখে প্রেম কাকে বলে

যে শিখিয়ে গেছে তার নাম রাধা। (রাধা).

অনেক পংক্তি আছে তাঁর কবিতার যা শব্দে চিত্রে বর্ণময়তায় চমৎকার মিশে গেছে।

রক্তাক্ত ঘরাণার কবিতা

সোফিওর রহমান

মহাদিগন্ত প্রকাশন সংস্থা

বারুইপুর/২৪পরগণা

ঘুমে তার শিল্প প্রভৃতির অহংকার

মাছরাঙা চোখে বাজে ভোরের সঙ্গীত

দেহে পশমের বল্লম, আর প্রজন্মের স্বরলিপি

কবিতা রমণী এভাবেই শুয়ে আছে

(একদিকে ফুল পাথর অন্যদিকে)

এই রকম নিবিষ্ট চিন্তা-ভাবনা-অনুভূতির সং-শ্লেষে আস্বাদ্য কবিতা আছে অনেকগুলি : রক্তাক্ত ঘরাণার কবিতা, আমার যন্ত্রণার শিবির, মৃত্যু দাও জন্ম দাও, তবুও স্নেহহীন আমি, ঘরণীর প্রাচীর প্রভৃতি। কয়েকটি কবিতায় স্তন, সঙ্গম ইত্যাদি শব্দ আছে, —শব্দগুলি যেন ফুল, ঝাউপাতা ধরণের দেহদাহহীন শব্দপ্রতিমা। এই কবি আত্মস্থ হয়ে কথা বলেন, বেশ নিঃশব্দ গভীরতায়, আপনমনে। বহু জায়গায় স্বগতোক্তি-প্রতিম কবিতা-এই কবি সম্পর্কে অনেক আশা জাগিয়ে তোলে।

দেহাবসানের পর মাটিতে কেন জেগে ওঠে ঘাস

উত্তরপুরুষের সবুজ আচ্ছাদন,

পতনের উত্থান—

সর্বত্র ছড়ানো দেখি পৃথিবীর এক অবধারিত প্রেম।

(টুকরো দুই শুভলগ্ন)

সোফিওরের কবিতায় একটি ত্রুটি চোখে পড়ছে : কবিতা পংক্তিতে একটি বা দুটি শব্দ। অক্ষরের অভাব ধরা পড়ছে। ছন্দোগত গঠনে যেন খানিকটা ঘাটতি। ওপরের 'সর্বত্র ছড়ানো…অবধারিত প্রেম' অংশটুকু পড়লেই আমার বক্তব্যটা বোধগম্য হয়। 'অবধারিত' শব্দটিই বোধহয় এখানে এইরকম ত্রুটি ঘটাল। কবিতায় 'শরত্তোৎসব' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তা কি হয়? (শরৎ + উৎসব ?) 'শারদোৎসব'ই শুদ্ধ, তা-ই লেখা উচিত। O

সংবাদ

O "হৈ হৈ করে গল্পমেলা হয়ে গেল"

ঘোষণা মত ৬ই এপ্রিল চন্দননগরে দারুণ উৎসাহে গল্পমেলা হয়ে গেল। চার ঘণ্টা ধরে ৬টি গল্প পাঠ এবং তা নিয়ে তুমুল আলোচনা। গল্প নিয়ে এমন হৈ চৈ কলকাতার বাইরে আর কোথাও হয় এ ব্যাপারটা প্রতিবেদকের এখনও অজানা। যেমন আলোচনা, তেমনি এক একটি ক্ষুরধার গল্প।

প্রথম গল্প পাঠ করলেন বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়। নাম 'ভুলের জায়গাটা'। গোধূলি-মন সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় বললেন। গল্পের বিষয়টি আন কমন। চমৎকার নির্বাচন। তবে গল্পের পাত্র-পাত্রীর কথোপকথন স্বাভাবিক না হওয়ায় গতি শ্লথ হয়েছে। বিজয় দাসের মতে গল্পটি সার্থক।

দ্বিতীয় গল্প পড়লেন গল্প মেলার আসরে চুঁচুড়া থেকে আসা তরুণ প্রশান্ত মাল। তার গল্পটি (আবিষ্কার) সভায় আলোড়ন সৃষ্টি করল। আশিস ভট্টাচার্য, অতীশ চট্টোপাধ্যায়, শতদ্রু মজুমদার ভাষা, আঙ্গিকের প্রশংসা করেও কিছু টেকনিক্যাল ত্রুটির সম্পর্কে বললেন। গৌর বৈরাগী বললেন—গল্পটি প্রথার বাইরে লেখার একটি প্রচেষ্টা। এবং সার্থক। গল্পের ভাষা চমৎকার। সম্রাট সেন বললেন—নতুন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আজকের গল্প যেদিকে এগোচ্ছে এই গল্পে তার একটি প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি। রসোত্তীর্ণ গল্প।

তৃতীয় গল্প পড়লেন সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য। উনি এসেছেন বেলুড় থেকে। গল্পের নাম-'শব্দ-যুদ্ধ'। অমল দাসের মতে নতুন আঙ্গিকে লেখা গল্পটি সার্থক। গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে গল্পের ভঙ্গিটি ভাল, তবে যা বলার তা যথার্থ উন্মোচন না হওয়ায় গল্পের স্বাদ পাঠকের কাছে পৌঁছয় না। সনৎ মান্নার মতে গল্পটি সার্থক। দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় বললেন—গল্পটি খুব সাধারণ পাঠকের জন্য নয়, বিষয়বস্তু এবং ভাষায় একটা অদ্ভুত মাধুর্য্য রয়েছে। বাক্য গঠন এবং শব্দের ব্যবহারে নতুনত্ব রয়েছে। প্রবীর বৈদ্য বললেন—প্রাথমিক পর্যায়ে শুনতে শুনতে গল্পটিকে প্রবন্ধ বলে মনে হয়েছিল। অথচ গল্পের পরতে পরতে তীব্র শ্লেষ। এবং উন্মোচন আমাদের ঠিক ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে।

চতুর্থ গল্প পড়লেন চুঁচুড়ার প্রদীপ মিত্র। গল্পের নাম—সমান্তরাল। মঞ্জুলা ভট্টাচার্য বললেন—অদ্ভুত গল্প, খুব ভাল হয়েছে। 'গল্পটি বুকের মধ্যে এখনও বাজছে'—এভাবে জয়ন্তী বৈরাগী তার অনুভব প্রকাশ করলেন। সম্রাট সেনের মতে—গল্পটির পরিমিতি এবং পরিমণ্ডল এক হয়ে মিশে গেছে। একদিকে মৃত্যু ভাবনা অন্যদিকে নতুন করে বাঁচার প্রেরণা চমৎকার তৈরী হয়েছে গল্পে। আশিস ভট্টাচার্য এ গল্পে নতুনত্ব খুঁজে পান নি। অতীশ চট্টোপাধ্যায়ের মতে গল্পের বিষয়বস্তু পুরনো।

এবার বিরতি। এই সময়ে গল্পমেলার প্রচলিত নিয়মে কিছু চা এবং টা-এর ব্যবস্থা থাকে। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। চা ঘুঘনি খেতে খেতে তাতা

(শেষাংশ তেত্রিশ পাতায়)

সংবাদ

O অনার্য্য সাহিত্য আয়োজিত আশির কবিতা-পাঠ ও আলোচনা

গত ৫ই এপ্রিল শনিবার কলকাতা কলেজ স্কোয়ারের ষ্টুডেন্টস্ হলে অনার্য সাহিত্য পত্রিকা আয়োজিত আশির দশকের উল্লেখযোগ্য কবিদের কবিতা পাঠ এবং আলোচনা সভা বসে। ঝড় ও বৃষ্টির হঠাৎ যেতে ওঠার ফলে অনুষ্ঠান শুরু হতে বিলম্ব হলেও একে একে বহু কবিতা পিপাসু মানুষ এসে জড় হন।

কবিতা পড়েন আশির দশকের সোফিওর রহমান, শুভব্রত চক্রবর্ত্তী, মণীশ সিংহরায়, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, ঈশিতা ভাদুড়ী, তাপস চক্রবর্ত্তী, আদিত্য মুখোপাধ্যায়, দেবযানী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীধর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

আশির দশকের কবিতার ওপর বিদগ্ধ আলোচনা করেন ধূর্জটি চন্দ। ধূর্জটি চন্দ তাঁর বিস্তারিত বক্তব্যের মধ্যে বলেন "আমি ১৯৮২ সালে 'এবং' পত্রিকার এক সম্পাদকীয়তে আশির পাঁচজন কবির সম্পর্কে লিখেছিলাম। এঁদের মধ্যে প্রধানতম সোফিওর রহমানের গভীর ভাবনা আর সুচারু শব্দ প্রয়োগ, মল্লিকা সেনগুপ্তের শরীর রহস্য নীলাঞ্জনের ছন্দ, তরুণ গোস্বামীর সরলতা এবং মণীশ সিংহরায়-এর নির্জনতা আজও আমার বক্তব্যকে সত্য প্রমাণিত করে চলেছে। অবশ্য ইতিমধ্যে শ্রীধর মুখোপাধ্যায়, বাসব দাশগুপ্ত, অরূপ চৌধুরী ও ঈশিতা ভাদুড়ী প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য ভাবে আমাদের আশা যোগাচ্ছেন। আমি আশা করব এরা একদিন সর্বকালের কবি হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন।"

অন্যদিকে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ও আশির দশকের কবিতার উপর বক্তব্য রাখেন। অগ্রজদের মধ্যে যারা সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর রায়, উত্তম দাশ প্রভৃতি আরও অন্য পঁচিশ কবি।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়।

O কল্লোল সাংস্কৃতিক সংস্থার একাঙ্ক নাটক

শীতল দাস—চুঁচুড়া কল্লোল সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত ২০ বর্ষ একাঙ্ক প্রতিযোগিতা (আমন্ত্রণ-মূলক) অনুষ্ঠিত হলো গত ২৫শে মার্চ ৮৬ থেকে ২৮সে মার্চ ৮৬ পর্যান্ত চুঁচুড়া রবীন্দ্র ভবনে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন প: বঙ্গ সরকারের তথ্য বিভাগের ড: প্রমোদ মুখোপাধ্যায় এবং হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষ ড: প্রশান্তকুমার ঘোষ। ঐ দিন বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণও করা হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল সমরেশ মজুমদারের "কালবেলা" অবলম্বনে প্রস্তুতি নাটক। শিল্পী উৎপল গাঙ্গুলী এব্যাপারে প্রশংসা পাবার যোগ্য।

সংস্থা আয়োজিত একাঙ্ক নাটক "নৈশভোজ" (রচনা—মনোজ মিত্র) দর্শকগণের ভাল লাগে। পরিচালনা ও অভিনয়ে বিশিষ্ট নাট্যকার শ্রীশচীন মুখোপাধ্যায় বাহবা পেয়েছেন।

এ বছর আমন্ত্রণমূলক নাটক প্রতিযোগিতায় মোট ১২টি সংস্থা অংশ গ্রহণ করে। এর মধ্যে কলকাতা গ্রীণলেজ ব্যাঙ্ক রিক্রি: সংস্থা কর্তৃক "শেষ কবিতা" (কবি বেনজামিন মোলায়েজ এর মৃত্যুকাহিনী অবলম্বনে), উত্তরপাড়ার সীমন্তক-এর "অপরাজিত", হালিশহরের সংলাপ কর্তৃক "কালের রাখাল", ব্যারাকপুরের নীহারিকা কর্তৃক "গুলশন" উচ্চমানের ছিল।

অন্যান্যদের মধ্যে বালীর নাটকীয় (শিকার), কাঁকিনাড়ার কম্পাস (তুরুপ), জাগরণের (তক্ষক), নৈহাটি আঙ্গিক (ধর্ষিতা), সপ্তর্ষির (পটভূমি), চুঁচুড়া ষ্টুডেন্টস্ এ্যাসো: (মালিনী), চিনসুরাকালচালের (চরণ দাস চোর)—দর্শকমনে বিশেষ দাগ কাটতে পারেনি। সারথী সংস্থার অভিনয় মোটামুটি।

নাটক আজ প্রয়োজন কেন? এর উত্তর রেখেছেন উত্তর পাড়ার "সীমন্তক" সংস্থা। এঁদের অভিনন্দন জানাই।

তবে সত্যিকথা বলতে কি একাঙ্ক নাটকে খরা দেখা দিয়েছে। মূল বক্তব্য হারিয়ে যাচ্ছে দিন দিন। এই সঙ্গে দর্শকগণের সাড়া না পাওয়াও ভাবিয়ে তুলছে বিভিন্ন নাট্য সংস্থাকে।

সুস্থ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য বর্ত্তমানে চারিদিকে একটা আলোড়ন জেগেছে। তবু কেন এই হাল?

O নাটক না প্রসেন?

সম্প্রতি উলুবেড়িয়ার হরিপদ মঞ্চে "শিক্ষক-শিক্ষণের" "চিরকুমারী সংসদ" নাটিকাটি প্রসেনিয়াম মুক্ত হল। আগাপাশতলা রৈবিক প্রভাব মর্মরিত এ নাটকটি শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হল রচনায় মূলত: এর প্লটের ডায়মেনসনের অভাব; প্রতিটি চরিত্র কমবেশী ফ্ল্যাট এবং নিন্দনীয়ভাবে নাটুকে। নাটকে না আছে ক্লাইম্যাক্স না পার্গেসান। সস্তা, এলেবেলে সংলাপে রীতিমত সিরিয়াস মুহূর্তগুলোতেও কমিক এফেক্ট চলে আসে! 'শ্রীশ', 'বিপিন', 'পরেশের বাবা', 'হেমনলিনী', 'নির্ঝর', 'অগ্নিপ্রভা' নামকরণগুলির মধ্যে দিয়ে যদিও সেই কবিত্রীক পরিবেশ এবং প্রতিবেশকে ধরে রাখার কোশিস করা হয়েছে তবুও নাটকের দোলাচলতা ও টানটান বুনটের অভাবে তামাম কল্পিত পরিবেশটি গেছে মাঠে মারা। তবুও মেয়েরা অভিনয় করেছে কমবেশী হৃদয় ঢেলে। নিবেদিতা গঙ্গোপাধ্যায়, সুপর্ণা সেন, সুচিত্রা বেরা, ছবি আখতার এর নাম শুরুতেই আসে। নেপথ্যের নির্দেশকদ্বয় রঞ্জন ভট্টাচার্য এবং সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এর চিরকুমার সদৃশ সাত্ত্ব লালন নির্দেশনও শীলন ও চর্যার অভাবে ভেস্তে গেল যা হোক। কবিতা, বৃন্দগান, গণসংগীত ও অন্যান্য পরিবেশনায় অবশ্য অনুষ্ঠানের মর্যাদা কৌলিন্য পেয়েছিল।

O বেঞ্জামিন মোলায়েজ স্মরণ

সম্প্রতি উলুবেড়িয়ায় ইন্সটিটিউট হলে ভারতীয় লোক সংস্কৃতি সংসদ-এর উদ্যোগে আফ্রিকান কৃষ্ণকবি বেঞ্জামিন মোলায়েজ এর শোকসন্তপ্ত বাসর অনুষ্ঠিত হল ঐকান্তিক শ্রদ্ধামগ্নতায়। ঋষিণ মিত্র, তপন সেন প্রমুখের আধুনিক কবিতায় কথায় গাঁথা সুরে তামাম অডিটোরিয়ামে বিদ্রোহের গুঞ্জন উঠল। কবিতা পাঠ করলেন দিলীপ মালিক, অনিল ঘোষাল চৌধুরী, শ্যামল মান্না, প্রসাদ মান্না, সুদীপ্ত বিশ্বাস, সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মানুষজন। একই যোগে অভিনয় চিত্রপ্রদর্শনীটি উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীর মুগ্ধবোধ আদায় করে নিল।

(ত্রিশ পৃষ্ঠার পর)

আলোচনা। এখানে সেখানে। টুকরো মন্তব্য। ওদিকে সম্রাট সেনের সঙ্গে চাপা গলায় আলোচনা করছেন প্রদীপ মিত্র আর প্রশান্ত মান। এদিকে বিজয় দাস এবং অশোক চট্টোপাধ্যায় গোধূলি-মন নিয়ে কথা-বার্তা বলছেন। আধঘণ্টাখানেক একটু ভাঙা চোরা হয়ে গিয়ে আবার গল্প পাঠ শুরু হল। এবার পড়লেন দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়—কুশীলব। সুখেন্দু ভট্টাচার্য বললেন—গল্পটি দীর্ঘ এবং বর্ণনাধর্মী। সম্রাট সেনের মতে গল্পটি পুরনো ধরনের। আশিস ভট্টাচার্য বল লেন—গল্পটি কাঙ্খিত জায়গায় পৌঁছেছে। এরকম বিষয়বস্তু নিয়ে গল্প একটু একঘেয়ে হবেই, তবে এই গল্পে তিনি নতুন কিছু পেলেন না বলে হতাশ হয়েছেন।

দিনের শেষ গল্পকার শুভ্র মজুমদার। তাঁর গল্পের নাম 'জয়যাত্রায় যাও হে'। অভীশ চট্টোপাধ্যায়ের মতে গল্পটি অসাধারণ, অবর্ণনীয়। দেবব্রত চট্টোপাধ্য য় বললেন—বিশ্লেষণ করে বলার কিছু নেই। সুন্দর গল্প। জয়ন্তী বৈরাগী বললেন—হাসির প্রচ্ছন্ন আড়ালে এমন এক রিয়েলিটি, ভাবা যায় না। প্রবীর বৈদ্য বললেন যে চরিত্রগুলি এসেছে তা যথাযথ এবং গল্পটি অসাধারণ।

প্রায় রাত ৮টায় সভা শেষ হলেও যেন আলোচনা থামে না। উৎসাহ উদ্দীপনা পরের গল্পমেলার জন্যে তুলে রেখে তবু সবাইকে যেতে হয়।

গল্পমেলায় সবাই আসতে পারে; সদস্য হওয়ার দরকার নেই। টাকা দেবার দরকার নেই। গল্পমেলায় আসবার সময় শুধু পকেটে করে গল্প আনতে হবে।

যোগাযোগ: গৌর বৈরাগী/এ.সি. চ্যাটার্জী লেন/গোন্দলপাড়া/হুগলী।

○ হজরৎ ওয়াসী পীর কেবলার শততম মৃত্যু বার্ষিকী

এ বৎসর আগামী ২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৯৩ ইং ৭ই ডিসেম্বর '৮৬ রবিবার এশিয়া মহাদেশের অন্যতম সুফী সাধক বিশ্ব বরেণ্য কাসী ভাষার বাঙালী মহাকবি রসুলে নোমাণীর হাফেজ শাহসুফী হজরত মওলানা সৈয়দ ফতেহ আলি ওয়সী (রঃ) শতবর্ষ তিরোধান দিবস (ওফাৎ) যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপিত হবে। এই সভাকে সাফল্য মণ্ডিত করতে মুক্ত হস্তে দান করুন ও সর্বধর্মের সহযোগিতা করে ফায়েজ হাসেল করুন।

যোগাযোগ:—সেখ আহমদ আলি, সাধারণ সম্পাদক
ওয়সী মেমোরিয়াল এ্যাসোসিয়েশন
৩৬, ডঃ সুধীর বসু রোড, কলিকাতা-২৩।

ব্যাঙ্ক চেক্, পোষ্ট মণিঅর্ডার ও নগদে সাহায্য পাঠাইতে পারেন।

○ চন্দননগর রোটারী ক্লাব ও আই. এম, এ চাঁপদানী-ভদ্রেশ্বর শাখার উদ্যোগে রক্ত দান শিবির

বিগত ২৭শে এপ্রিল চন্দননগর বয়েজ ক্লাব হলে অনুষ্ঠিত হোল এক রক্তদান শিবির। ঐ দিনের শিবিরে ৪৩ জন পুরুষ ও ২জন মহিলা রক্তদান করেন। ভলেন্টারী ব্লাড ডোনার্স এ্যাসোশিয়েশনের চন্দননগর, চুঁচুড়া ও শ্রীরামপুর শাখা রক্তগ্রহণ ও ও শিবির পরিচালনা করেন। রোটারী ক্লাবের অন্যতম তিন সদস্য ক্যাপ্টেন (ডা:) সমীর কুমার দত্ত, রোটারীয়ান ক্যামাখ্যা সি: ও রোটারিয়ান এস, এম, তেওয়ারী রক্তদান করেন। বয়েজ ক্লাবের অন্যতম কর্ণধার দীনেশরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও রক্তদান করেন। রোটারী ক্লাবের সভাপতি, সহ: সভাপতি ও সম্পাদক এবং আই, এম, এ ভদ্রেশ্বরে-চাঁপদানী শাখার সদস্যেরা ঐ দিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। ভদ্রেশ্বরের তরুণ সংঘ ব্যায়ামাগার ও চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্যেরা প্রধানত: রক্তদান করেন।

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

● 'গোধূলিমন' শারদীয়া যথারীতি কবিতায়-গল্পে-প্রবন্ধে তার উজ্জ্বল ঐতিহ্য বজায় রাখতে পেরেছে। বিশেষ করে শ্রদ্ধেয়, ড: হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের 'দেবী দুর্গা ও তাঁর বাহন' সম্পর্কীয় গবেষণামূলক প্রবন্ধটি আকর্ষণীয় হয়েছে। শ্রীঅজিত রায় 'ক্ষুধিত সম্প্রদায়' সম্পর্কে নানা তথ্য ও সংবাদের ভিত্তিতে অত্যন্ত খোলাখুলি ভাবে যে আলোচনা করেছেন, আধুনিক বাঙলা কবিতা ও গল্পের সচেতন পড়ুয়াদের কাজে লাগবে। শ্রীমলয় রায়চৌধুরী যার রূপকার সেই 'হাংরি-সাহিত্যের যে নোতুন ক'রে বিশ্লেষণ ও মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা চলছে তা' হয়তো উক্ত আন্দোলন সম্পর্কে অস্পষ্টতা দূর করতে পারবে। সাহিত্যে বরাবরই ভালো-মন্দ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। ধোপে টিকেছে কি টেঁকেনি। উত্তরকাল-ই একমাত্র তার সঠিক বিচার করতে পারে। অজিত রায়ের প্রবন্ধটি কিছু সূত্র ধরিয়ে দিতে চেয়েছে, যা আলোচকদের অবশ্যই প্রাণিত ও প্ররোচিত করবে। 'গোধূলিমন' এর আগেও সিরিয়াস ধরণের কিছু কিছু আলোচনা প্রকাশ করেছে। অতএব সম্পাদককে সেকারণে ধন্যবাদ। আরো কৃতজ্ঞতা এই কারণে যে, 'গোধূলি-মন' যেকোন তরুণের থেকেও তরুণতর শ্রদ্ধেয় কবি বিরাম মুখোপাধ্যায়ের 'ছত্রিশবাগিনী' পর্যায়ের একটি সুন্দর কবিতা প্রকাশ করতে পেরেছে।

মতি মুখোপাধ্যায়
কুলটি/বর্ধমান

● জাঁ পল সার্ত্র স্মৃতি সংখ্যা প্রকাশ করে আরো একবার সাহিত্যামোদী সুধীজনের কৃতজ্ঞ ভাজন হলেন। এভাবেই একটি ছোটো কাগজ বৃহৎ পৃথিবীতে পা রাখে। আমি দেখেছি, প্রথম মুহূর্ত থেকে আজ অব্দি গোধূলিমন-এর বয়স্ক হয়ে ওঠার বিনয় ও অহংকার। প্রতিটি পদক্ষেপকেই করেছে নিশ্চিত লক্ষ্যমুখী। বিশেষ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের দায়িত্বে নিজেও হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট।

ভবিষ্যত অবশ্যই একটি আসন সংরক্ষিত রাখবে এই পত্রিকাটির জন্য। কোনো গবেষক লিটিল ম্যাগাজিনের ওপর নিবন্ধ রচনা করলে, নির্দ্বিধায় বলা যায়, গোধূলি-মন সমাদৃত হবে।

২৭ বছরের আয়ু বড়ো কম সময় নয়। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কতো কাগজ ইতাবসরে পর্ণমোচী বৃক্ষের পাতার মতো পরে জন্মে আগে ঝরে গেল। কতোখানি নিষ্ঠা, ভালোবাসা আর নিঃস্বার্থ শ্রমে এটা সম্ভব, ভাবতেও আশ্চর্য হই।

এ দেশের চালচুলোহীন মানুষগুলোর মতোই ক্ষুদ্র পত্রিকার বেঁচে থাকা। তার দশা ঝড়ের ঝাপটা-খাওয়া জেলেডিঙির মতো। গোধূলি-মন নিজেকে বাঁচাতে পেরেছে এই বিপর্যয়ের হাত থেকে। তার অন্তরে বাহিরে শ্রীবৃদ্ধি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রেমিকদের দৃষ্টি এড়াবার নয়।

দেহাতী যুবকের কাঁধের মতোই এখন এই পত্রিকা মজবুত। কাজেই তাকে আরো কিছু বেশী ভার বহন করতে হবে। প্রাদেশিক সাহিত্যের অনুবাদ বড়ো বেশী জরুরী। আপাতত: এই কাজ দিয়েই একটি বিভাগের দ্বার উন্মোচিত হোক।

অনেক যোগ্য ও সম্পন্ন ব্যক্তি এখন গোধূলিমন-এর পৃষ্ঠাগুলিকে সমৃদ্ধ করছেন। এঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অজিত রায়কে বারবার স্মরণ করতে হয়। এই আশির দশকেও যাঁরা লেখা শুরু করেছেন, তাঁরাও গোধূলিমন-এর সম্মানিত লেখক কবি। আর এটাই গোধূলিমন-এর সবচে বড়ো গৌরব।

অজিত বাইরী
বিনোদবাটী, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া-৭১১২২৬

সপ্তাহেতে প্রতিবারে
১½ লক্ষ টাকা মিলতে পারে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী দিচ্ছেন

প্রতি সাপ্তাহিক খেলায়

প্রথম পুরস্কার	১	১,৫০,০০০ টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার	৩	১০,০০০ টাকা (প্রতিটি)
তৃতীয় পুরস্কার	১৫০	১,০০০ টাকা (প্রতিটি)
চতুর্থ পুরস্কার	১৫০০	৫০ টাকা (প্রতিটি)
পঞ্চম পুরস্কার	১৫০০	২০ টাকা (প্রতিটি)
ষষ্ঠ পুরস্কার	১৫০০০	১০ টাকা (প্রতিটি)

ষ্টকিষ্ট, এজেন্ট এবং বিক্রেতাদের জন্য আকর্ষণীয় কমিশন। এজেন্টদের ১ম হইতে ৫ম পুরস্কারের জন্য বোনাস এবং বিক্রেতাদের ১ম হইতে ৬ষ্ঠ পুরস্কারের জন্য বোনাস।

প্রতি টিকিট ১ টাকা | খেলা প্রতি বুধবার

বিস্তারিত বিবরণের জন্য টিকিটের অপর পৃষ্ঠায় দেখুন

ডাইরেক্টর অফ্ ষ্টেট লটারিজ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৬৯, গণেশচন্দ্র এভিনিউ
কলিকাতা-৭০০ ০১৩
ফোন: ২৬-৪৬৮৮, ২৬-৪৬৮৯
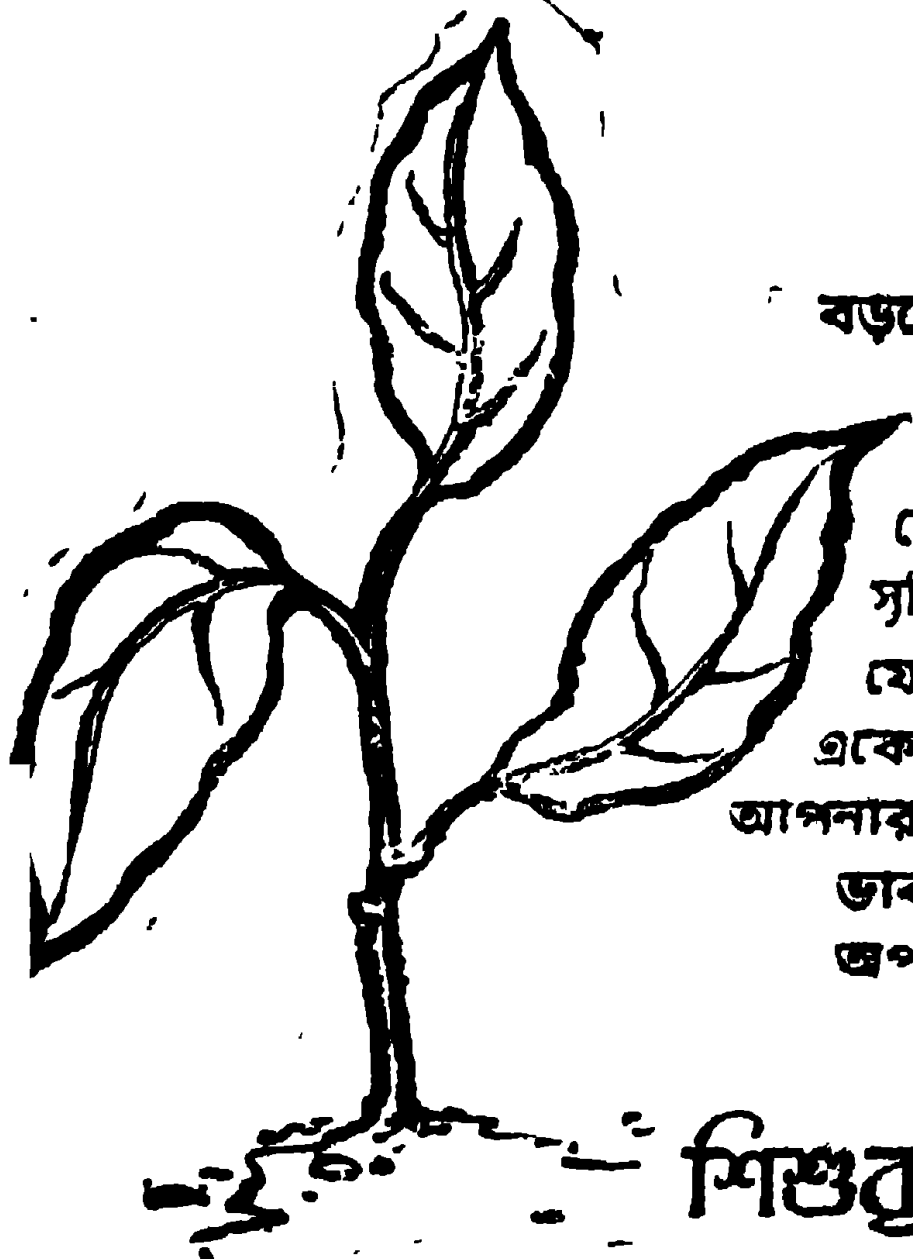
ব-SL-10

GODHULI-MONE N. P. Regd. No. RN. 27214/75
Vol. 28, No. 4 Postal Regd. No. Hys-14 Price—Rs. 2·00 only

ম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পপুলার প্রিন্টার্স, বারাসত, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও

গোধূলি মন

এই সংখ্যায় ঃ

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ।। ১৩৯৩

০ প্রসঙ্গ : গোধূলি-মন ০

০ আপনার পত্রিকা নিয়মিত পেয়ে আসছি চৈত্র-৯১ সংখ্যা থেকে। এমন নিয়মিত পত্রিকা বিশেষ করে লিট্‌ল ম্যাগাজিন-এর জগতে বিরল। আমার মতে 'গোধুলি-মন' ততখানি লিট্‌ল নয়—হেটো-মেঠো ভাষায় যেগুলোকে আমরা লিট্‌ল ম্যাগাজিন বলে থাকি। প্রসঙ্গত: বলতেই হয় যে লিটল ম্যাগাজিনের অপুষ্টিরোগ দুরারোগ্য প্রায়। যদিও সরকার কিছু বিজ্ঞাপন লিটল ম্যাগাজিনকে দিচ্ছেন—আজকাল। তবুও সাধারণ মানুষ, পথ চলতি মানুষ যদি নিজের গরজে লিটল ম্যাগাজিন না কেনেন তাহলে আর্থিক অভাব দূর করার উপায় নেই বললেই হয়।

আমার তো মনে হয় কিছু-কিঞ্চিৎ সাহিত্য যাঁরা করেন তাঁরাই লিটল ম্যাগাজিন কেনেন। অগ্রজ লেখক-সাহিত্যিক কবিরা কয়জনে কেনেন? তাঁদের 'সৌজন্য সংখ্যা' দিতে হয়। অথচ যে বিরাট সংখ্যক পড়ুয়া আছেন—তাঁরা নামকরা, জনপ্রিয় পত্রপত্রিকা কেনেন আভিজাত্য রাখতে, শিক্ষিত বলে পরিচয় দিতে, নয় তো অন্ধবিশ্বাসের টানে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে দু'হাজার কি. মি. দূরের অন্য রাজ্যের বাঙালী বাসিন্দারা আবার বাংলা পত্র পত্রিকা রাখার বদলে ইংরাজী/হিন্দি পত্র পত্রিকা রাখতে বেশী পছন্দ করেন। ইংরাজী পত্রিকা না রাখলে 'মান' থাকে না। বাংলা হাতের কাছে পাওয়ার উপায় ও নেই। ফলে এ ক্ষেত্রে 'দেশ'/'পরিবর্তন'-এর কদর ও খুব বেশী নয়। অন্যান্য পত্রপত্রিকার খবর রাখার কথা ভাবাও যায় না। 'গোধুলি-মন' পত্রিকা বছরাধিক কাল যাবৎ পেয়েছি, পড়েছি, অন্যান্যদের মতামত মন্তব্য ও নজরে পড়েছে। আমার পছন্দ মত অবশ্যই। গোধুলি মন ছাড়াও আটখানি পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক আমি।

গোধুলি-মন-এর প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা পুলক দায়ক। চিত্রশিল্পী ও লেখক অজিত রায়, শতদ্রু মজুমদার, গৌর বৈরাগী এঁরা নিয়মিত থাকলে পত্রিকা বলিষ্ঠ হবে নিঃসন্দেহে। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি বিষয়ে ও-ভাষায় বেশ পোক্ত ও সময়োপযোগী হচ্ছে স্বীকার করতে হয়। আপনার কবিকুলের অনেকেই সুপরিচিত দেখলাম। আবার অনামী-অল্পনামী রাও রয়েছেন সমাদরে গোধুলি-মন-এর পাতায়।

আমার মনে হয় কবিতা সমালোচনার জন্য একটি/দুটি পাতা বরাদ্দ রাখলে নবীন কবিরা উপকৃত হবেন, উৎসাহ পাবেন। একজন কবির 'কবিতাগুচ্ছ' দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কতখানি জানি না তবে, গুচ্ছের কবিতা'র বাবদে ধার্য্য জায়গাটুকুতে অন্য একজন 'হা-পিত্যেশী' কবির সুযোগ হতে পারে। কারও কারও খারাপ লাগলেও এ হেন মন্তব্য ভুক্তভোগীদের খারাপ লাগবে না বরং সমর্থন পেতে পারি বলে আশা রাখি। নমস্কারান্তে

জগৎ দেবনাথ
না'সিক/মহারাষ্ট্র

হুগলী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি মন

২৮ বর্ষ/৫ম সংখ্যা
মে/১৯৮৬
জ্যৈষ্ঠ/১৩৯৩

প্রতি সংখ্যা দুই টাকা
বার্ষিক সডাক কুড়ি টাকা
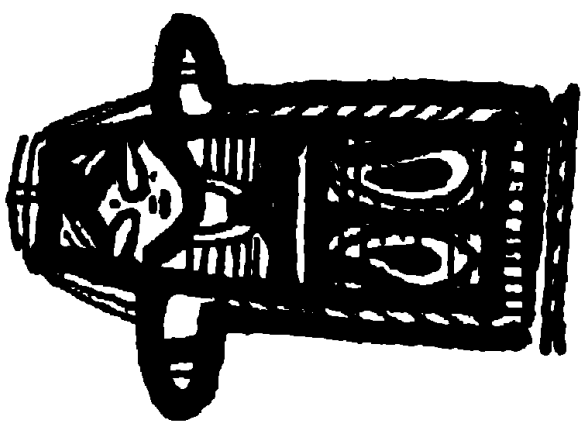
সম্পাদকীয়

সাড়ম্বরে পালিত হয়ে গেল সারা পৃথিবীর সঙ্গে একতালে আমাদের হুগলী জেলাতেও বিশ্বকবির ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উৎসব। দাড়িওলা মানুষটার ছবির সঙ্গে আমাদের আবাল-বৃদ্ধ অনেকেরই পরিচয় থাকলেও তাঁর সাহিত্যকৃতির সঙ্গে ঐ সব অনুষ্ঠানের তা-বড় কর্তাব্যক্তিদের কতটা সম্পর্ক আছে এ ব্যাপারে অনেকের মতো আমারও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোতে কতটা আন্তরিকতা আর কতটা ফাঁকি—এ মূল্যায়ণ করতে বসলে দেখা যাবে জমার ঘরে একটি বিরাট শূন্য। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফয়দা তোলার স্বার্থে কবির নির্বাচিত রচনাংশ ব্যবহৃত হচ্ছে দেওয়ালে ও সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়। অথচ তাঁর শিক্ষানীতি বিষয়ক প্রবন্ধাদি থেকে এই ১২৫তম জন্মজয়ন্তীতেও গ্রহণ করার মতো কিছুই পেলেননা আমাদের শাসন কর্তারা। এমনকি বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাজকর্ম বাংলার মাধ্যমে করার সে রকম আন্তরিক চেষ্টাও দেখতে পাওয়া গেলনা।

আরও মজার ও দুঃখের কথা হোল আমাদের জেলা তথ্য দপ্তর থেকে বিজ্ঞাপন প্রকাশের সরকারী আদেশ এতদিন বাংলায় প্রকাশ করা হচ্ছিল, হঠাৎ ১২৫তম রবীন্দ্র জয়ন্তীর মুখোমুখি এসে বাংলার বদলে ইংরাজীতে এল ঐ আদেশ। ধন্য জেলা তথ্য দপ্তর! ধন্য বামফ্রন্ট সরকার!

অশোক চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক

● সম্পাদকীয় কার্যালয় ॥ নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর-৭১২১৩৬ ॥ হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ

কবিতা

আমার বুকের বৃক্ষে/জগৎ লাহা

আমার বুকের বৃক্ষে দুঃখী এক পাখি
সারাদিন সারারাত গান গেয়ে যায়

আমি যখন সুখে ভাসতে চাই
তখনো
যখন দুঃখে বাসতে চাই ভালো
তখনো

আজীবন এইভাবেই আমি কেবল দুঃখের গানে
কেবল দুঃখের পানে
হৃদয় মেলে রাখি

এতোকাল ধরে জানি সেই পাখিকে
সে আমার জীবনের সুরকার কথাকার
তবু কিছুতেই সে চেনা দিল না
ধরা দিল না বস্তুরূপে
স্বপ্নবৃত্তে শুধু সুর শুনিয়ে সুর বুনেই কাটিয়ে দিল

আমি বলতে পারিনা তার গানের মানে কি
বুঝতে পারিনা তার সুরের কি নাম

যেদিন সে উড়ে যাবে, দূরে—সুদূরে
সেদিনও বুকের বৃক্ষে সেই পাখি কি
এমনই গান শুনিয়ে যাবে?

চোখে আটকে যাওয়া ছবি/শিবব্রত দেওয়ানজী

তুমি চলে যাবার পর পৃথিবী
সাতবার প্রদক্ষিণ করেছে আমাকে
তুমি চলে যাওয়ার পর
বাড়ীর উনোনের ঝলসানো আগুন
উত্তপ্ত করেছে আমাকে
তুমি চলে যাবার পর
আমি প্রতিবন্ধীর কক্ষপথে এখন।
যার জন্য ভালবাসা
আর প্রচ্ছন্নতা—
যার শরীরে ছিলো ঔজ্জ্বল রক্ত
আজ সেই রক্ত
হিংস্র হায়নার মুখে।

কোথায় যাবে তুমি/শ্যামলকুমার বিশ্বাস

প্রাচীন ক্ষতর বুক ছাপিয়ে হঠাৎ শোণিতধারা—
কোথায় যাবে তুমি?
আসমুদ্র চুমুক দিয়ে ফুসফুসে ফেরাব।

অমাবস্যার ছটা আমার যুদ্ধ-জয়ের ভেরী—
নিপুণ কারু চক্ষে ভাবো নরক ঢেকে রাখো?

প্রসূতিকোণ শূন্য কোরে ফাগ দিয়েছি ঢেলে;
গোপন বিষে ছড়ালে নীল ছাড়বোনা তোমাকে
চুপ-দেরাজে তেম্নি আছে নেউল-চিঠি দু'টি।

বৃষ্টিস্নানের কবিতা/শেখ মহরম আলি

বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে শীতের শান্তিনিকেতন।
এই গাছের দেশ, গেরুয়া কাঁকর ভেজা পথ
বৃষ্টির ভেতর ফিরে যাচ্ছি আমরা—
সাইকেল ক্রিং ক্রিং
সন্ধ্যার মায়াময় তমিস্রায় যুগলছায়া, এ সময়
আশ্চর্য রকম নড়াচড়ায় কথা বলে : মৃত শান্তিনিকেতন
তবু জাগে রহস্যময়, অস্ফুট ভাষায়, দীঘল নিরবতা ভাঙে
মৌন ইঙ্গিতে কাঁপিয়ে যায় উষ্ণ প্রহর! আহা,…
যেনবা বৃষ্টিভেজা পাখীদের মতন ঝেড়ে ফেলে হিমজল;
গাছের নীচে মুনিয়া ছাতার ভিতর কাছাকাছি আছে ওরা।

বিকালের প্রজাপতি-আলোয় ওরা পরস্পর বলেছিল :
ভালোলাগে, খুব ভালোলাগে এ রকম আসা চাই
নইলে কক্ষনো না—
বৃষ্টিফোটা, বৃষ্টিফুলের গানে গানে আদিপাপ
রাধাকুঞ্জের আশপাশে বৃষ্টিতে গলে যায়, হায়
পদাবলীর রাধা পূর্ব অভিসারে কতজল ঢেলেছিলে তুমি?
সেই জল এই জল তরল অনল হ'ল
ভালোবাসায় বেদনায় ভ্রূক্ষেপহীনতায় নারী তবু অদ্বিধাচিত্ত নয়;
বৃষ্টি মাতাল বাঙালী মেয়ে প্রেমের কী স্পর্দ্ধায়—
আশ্রম ছাড়া পথের আড়ালে
বেড়ার ধারে বেড়া ভাঙে, আগুন যুবতীর বুকে কত নীল ক্ষত
তবু, কিশোরীর মত হাসে প্রসন্ন কৌতুকে
রবীন্দ্রসংগীতের সুর-স্বর-বাণীতে জাগে-'আজি বরিষণ মুখরিত'….

তুমিও গোপনে আছো ঘরের ভিতর জলজ স্ফুটনে অস্থির।

বিষাদ/ভক্তিব্রত চক্রবর্তী

শীতঘুম ভেঙে গেলে
খোলস পাল্টায় সাপ—
উঠে আসে গর্ত থেকে
প্রবল জীবন ঘিরে তার
তীব্র ক্ষুধা—

শীত শেষে পাতা ঝরে
শোক নামে
শালিখের করুণ সংসারে—

কাল রাতে অন্ধকারে
শালিখের বাচ্চাগুলো
গিয়েছে হারিয়ে—
শূন্য নীড়
বিষণ্ণ দম্পতি।—

ভালোবাসার নিজস্ব অভাব/সমীরণ ঘোষ

ভালোবাসতে-বাসতেই তার বুক থেকে
আমি এখন পাথরগুলো সরিয়ে ফেলছি।
ভালোবাসতে-বাসতেই তার পা থেকে
বেছে ফেলছি একটি একটি ক'রে কাঁটা।

কিন্তু পাথরগুলো সরিয়ে ফেললেই তো আর
সব শেষ হ'য়ে যায় না। তখনও একটা কাজ বাকি থাকে,
অন্তত সেই ফাঁকা জায়গায় একটা কৃষ্ণচূড়ার চারা পুঁতে দেওয়া·
পায়ের নিচের জখমগুলোকে সারিয়ে তুললেই তো আর
যবনিকাপাত নয়। অন্তত যাতায়াত যোগ্য একটা পথ
গড়ে দেওয়া···
যাতে ক'রে ভালোবাসাকে আর কোনোদিন
বুকের পাথর। পায়ে কাঁটার মালা নিয়ে
ঘুরে বেড়াতে না হয়।

অন্তরাল বর্তিনীকে/দিশারী মুখোপাধ্যায়

জানালার আলোয় প্রতিদিন শাড়ী
মেলো কেনো ?
ওকি তোমার ঘর নাকি অপারেশন
থিয়েটর ?
ওখানে তুমি আকাশ মাখো, নাকি
হতচেতন প্রাণে ইথার চোখে যন্ত্রণার দই ?
বেছে বেছে যত শর করেছি নিক্ষেপ
বিশল্যকরণী বনে হয়ত গিয়েছে তারা
ফুল ফল হ'য়ে আছে ঝুলে।

আমার তু'হাতে এত অনন্ত আকাশ
তোমাকে একটুও তার দিতে কি
পারিনা ?

* * * * *

অক্ষিবিভ্রম/তাপস চক্রবর্তী

সন্তর্পণে আঁধার এগিয়ে আসে সম্মুখে ঘুমটিলা
আতুল শরীর-এলিয়ে-গৃধ্নু রাতের প্রত্যর্পণের অপেক্ষাতে,
আমি এগিয়ে যাই ; অদ্ভুত শূণ্যতা পায়ে-পায়ে
নিজস্ব সমাধিক্ষেত্রে।

অথচ একদিন তাপিত শরীর ছিল-প্রতিশ্রুত গহীন হাওয়া
লাস্যময়ীর সহস্র চুম্বনে বেজেছিল যৌবনমদিরা,
আর এখন, আঁধারে আলোহীন দিনসব-প্রদক্ষিত অক্ষিবিভ্রম।
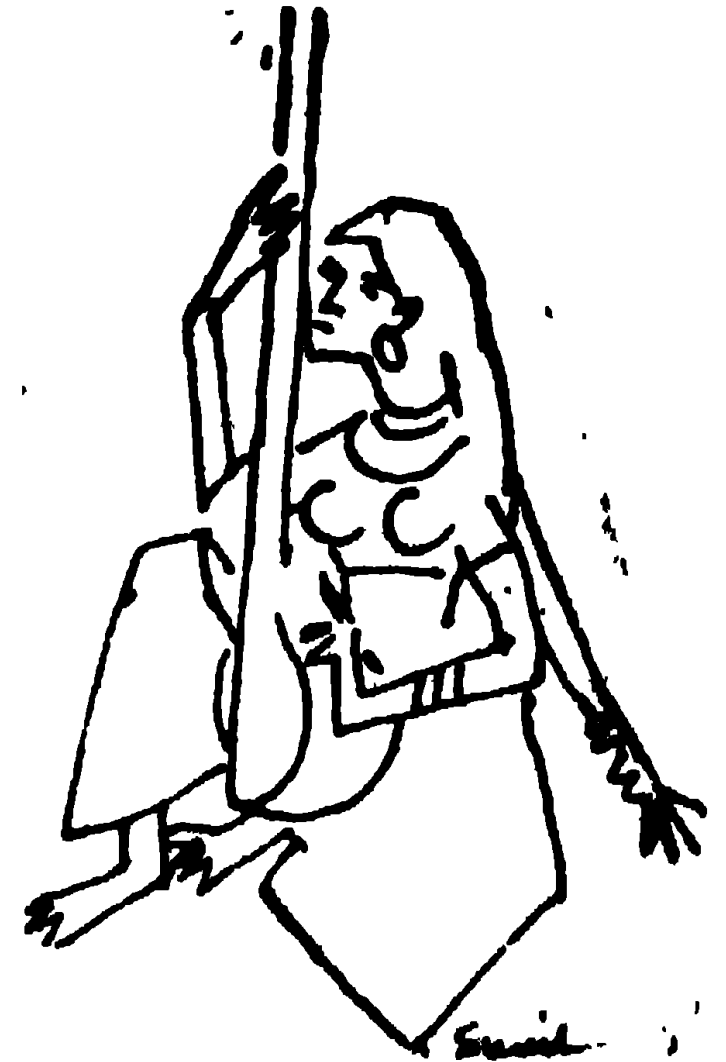
শহর এখন বেড়াতে যায়/অমিতকুমার আদক

অরণ্যের বাঘ মানুষের গল্প শুনেছে অনেক
মসৃণ রোদ পোয়াতে পোয়াতে তীব্র উচ্ছ্বাসে
শহরের বাড়িঘর পা ফেলে ফেলে
হেঁটে যায়
            হেঁটে যায়
                        হেঁটে যায়
শরীর চর্চায় দীর্ঘ অনুশীলন
ছবি হয়ে থাকে দেওয়ালে দেওয়ালে

প্রসারিত শহর ক্রমশ অরণ্যে আশ্রয় নেয়
অথচ চিরকাল—অরণ্যের ভেলায় ভেসেছে মানুষ

বাঘের প্রজ্বলিত চোখ প্রতিবিম্ব জাগায়
ফ্রিজ হয় মলিন আকাশ-বনানীর জড়োয়া ভাস্কর্য

শহর এখন ভ্রাম্যমান বাসে বেড়াতে যায়
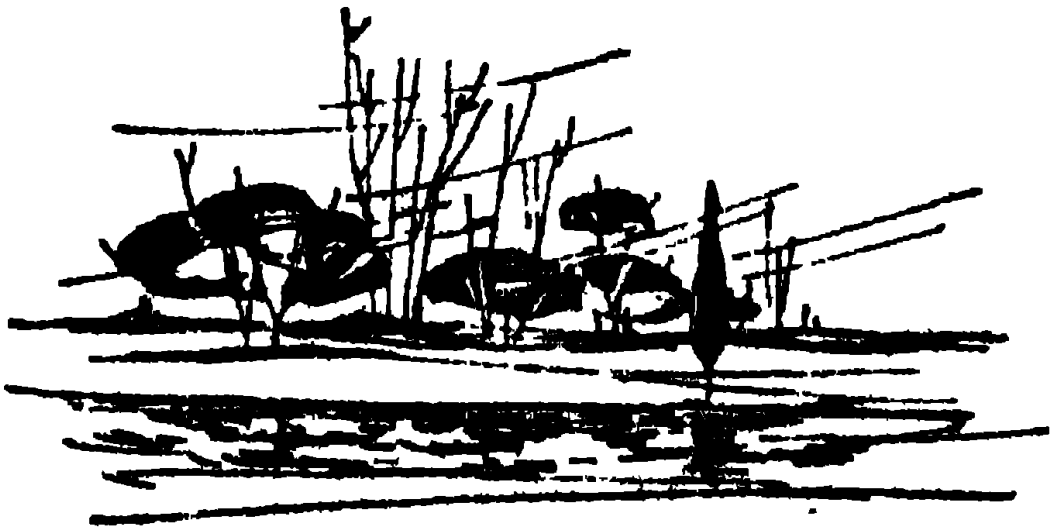
অমিয় চক্রবর্তী/জ্যোতির্ময় বসু

যে মার্কোপোলো শুধু কলম সম্বল করে
ভুবনডাঙ্গা থেকে যাত্রা করেছিল তিন ভুবনের পথে
'দূরযানী'র সেই যাত্রী আজ শ্রান্ত
অস্তরাগ রঞ্জিত দীর্ঘদেহী দেওদার সৈন্যদের বন্দী,
কত শত রঙের মেঘের আলোছায়া
লীন হল তুলি-নন্দিত লালবাঁধে।

তবু বার বার প্রশ্ন তাঁর অন্তরীক্ষে
কেমন রূপ সেই অদৃশ্য নীহারিকা লোকের ?
যুগে যুগে কত যাত্রী পার হয়েছে ঐ তোরণ
কেউ কোনদিন পাঠায়নি কোন ইশারা,
সোনালি দিন বা রূপালি রাতের ;
তবে কি সেখানে সবই অন্য মাত্রার ?
অতিমন্দ্র ধ্বনির চেয়েও বহুগুণ মন্দ্র
জোনাকীর আলোর চেয়েও কোটিগুণ মৃদু ;
এ দুয়ার পার না হলে
দেখা যাবে না খেয়াঘাটের সিঁড়ি ?

দেবব্রত দাশের

খেলা

বিকল্প

বেশ জাঁকিয়ে শীত পড়েছে আজ। হাওয়ায় কন্‌কনানি। কাশ্মীর কিংবা সিমলায় ভারী তুষারপাত হয়েছে নিশ্চয়ই। শীতের সূর্য পশ্চিমের টিলার আড়ালে ডুবতে না ডুবতেই কুয়াশার পুরু আবরণ ঘিরে ধরেছে ছোট্ট এই শহরটাকে চারপাশ থেকে।

ক্লাব-ঘর কিন্তু জমজমাট। বাইরের ঠিক বিপরীত চিত্র সেখানে। হই-হট্টগোল হাসি-হল্লায় মুখর।

অন্যদিনের মতো ঘরে ঢুকেই সমবয়সীদের আড্ডার আসরে গিয়ে ভিড়লেন না মজুমদার-দম্পতি। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন সেই দিকে, যেখান থেকে চীৎকার-চেঁচামেচির ঢেউ তুঙ্গে উঠে ছড়িয়ে পড়ছে হঠাৎ-হঠাৎ।

নাইনটীন্ অল্। এখন পাঁচ নম্বর সার্ভিস অরিন্দম বাসুর। ফেস্ করছেন নবাগতা করবী চৌধুরী। পাশে ব্যাট হাতে প্রস্তুত তাঁর সঙ্গী। মিস্টার অনিমেষ চৌধুরী। বয়সে তরুণ, স্পোর্টস্‌ম্যান-চেহারা। মেদবর্জিত সুঠাম শরীরের মাংসপেশীতে পুরুষালি রুক্ষতা।

মিস্টার বাসু সার্ভিস করার আগে একবার চারপাশে তাকিয়ে দেখে নিলেন। এই শীতেও দরদর করে ঘামছেন তিনি। চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ। পাশে তাঁর স্ত্রী অনিমা তুলনায় অনেকখানি সংযত। বয়সের ভারে শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন নি পুরোপুরি।

মিস্টার রজত মজুমদার বোর্ড-এর মাঝামাঝি জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি পিং পং বলের সঙ্গে মাঝে মাঝেই আটকে যাচ্ছে মিসেস করবী চৌধুরীর ছন্দিত শরীরের অন্ধি-সন্ধিতে। সত্যি অদ্ভুত গড়ন! তেমনি প্রাণোচ্ছল। পাহাড়ী স্রোতস্বিনীর মতোই আশ্চর্য উদ্দাম। প্লাক-করা ভুরুর নীচে একজোড়া মদির চোখ। সেদিকে তাকালেই বুকের ভেতরটা আন্‌চান্ করে ওঠে আপনা আপনি।

মিসেস তপতী মজুমদার স্বামীর গা ঘেঁষে সরে এসে নীচু গলায় বললেন, 'বেশ খেলেন তো ভদ্রমহিলা!'

সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে ঠোঁটের কোণে হাসির আঁচড় টেনে রজত বললেন, 'তবে তোমার মতো নয়, আই মীন্—তুমি যখন খেলতে আর কি'—

—'উহ্!'—উত্তেজনায় মিস্টার মজুমদারের হাত চেপে ধরলেন তপতী, 'কী চান্সটাই না নষ্ট করলেন ভদ্রলোক! স্ম্যাশ না করে আস্তে প্লেস করলেও পয়েন্ট পেয়ে যেতেন!'

নবাগত তরুণ চৌধুরী-দম্পতির বিরুদ্ধে প্রবীণ বাসু-দম্পতির এই খেলা ঘিরে মিইয়ে যাওয়া অফিসার ক্লাবের সভ্য-সভ্যারন্দ আজ যেন অস্বাভাবিক ভাবেই মেতে উঠেছে।

শাড়ির আঁচল শক্ত করে পেঁচিয়ে কোমরে গুঁজে নেট্-ঘেঁষা শর্ট-সার্ভিস করলেন করবী চৌধুরী।

মিসেস বাসুর হাই-রিটার্ন বোর্ডের বাইরে গিয়ে পড়ল। ডিউস্ হয়েছিল আগেই। এখন তেইশ-বাইশ ম্যাচ্ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আবার সার্ভিস করতে বোর্ডের এক কোণে গিয়ে দাঁড়ালেন করবী চৌধুরী। কপালে মুক্তোদানার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম। মুখের রেখায় আত্মবিশ্বাস।

র‍্যালিটা চলল অনেকক্ষণ। ব্যাকহ্যাণ্ড ডীপ্ রিটার্ণ—স্ম্যাশ—কাউন্টার স্ম্যাশ-রিটার্ণ…রজত মজুমদার আর বল দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁর চোখের সামনে দুলছে গতির তালে তালে হর্সটেল চুলের গোছা করবী চৌধুরীর, ওয়াল্ ক্লকের পেণ্ডুলামের মতো এদিক-ওদিক।… তপতীও কি এমন ছিল বয়েস-কালে? মিস্টার মজুমদার ভাবতে চেষ্টা করেন। এত নিখুঁত গড়ন? এমন স্বচ্ছন্দ সাবলীলতা? এমন উদ্দাম চলাফেরা? ঠিক সেই ছবিটা আজ যেন ধুলো-জমা স্মৃতির পাতা থেকে উঠে আসতে চাইছে না কিছুতেই। কিংবা হয়তো আজ সে-চোখই হারিয়ে ফেলেছেন তিনি।

একটা সহজ বল ফোর্-হ্যাণ্ডে পেয়ে গেলেন মিসেস চৌধুরী। শরীর বেঁকিয়ে দুর্দান্ত স্ম্যাশ এবং… সম্বিৎ ফিরে পেলেন মিস্টার মজুমদার অরিন্দম বাসুর ডাকে।—'এই যে দাদা—যাই বলুন, লড়েছি কিন্তু দারুণ।'

—'হ্যাঁ—এই বয়েসে যে চালিয়ে গেছ সমান তালে—রণে ভঙ্গ দাও নি, সেটাই বড় কথা।'

—'আচ্ছা—আলাপ করিয়ে দিই'—সহাস্যে পেছন ঘুরে চৌধুরী-দম্পতিকে কাছে ডাকলেন অরিন্দম বাসু।

আড্ডা জমল ভালোই। বড় একটা টেবিল্ ঘিরে তিনজোড়া মুখ। কেয়ার-টেকার রতন চা দিয়ে গেল।

এ-কথা সে-কথার পর মজুমদার বললেন, 'তা—এই নতুন জায়গা কেমন লাগছে আপনাদের?'

চোখাচোখি হল করবীর সঙ্গে।— 'মাই গড্, কোলকাতা থেকে তো অনেক দূর'—

—'ভালোই।' সপ্রতিভ জবাব দিলেন করবী চৌধুরী, 'কী সুন্দর খোলামেলা—ছিম্‌ছাম্, কোলকাতা আমার কোনোকালেই ভালো লাগে না।'

ঠোঁটের কোণে অর্থপূর্ণ হাসির ঝিলিক এঁকে মিস্টার বাসু বলে উঠলেন, 'তা—শীতকালটা একরকম ভালোই বলতে পারেন'—

—'আ—হা'—বাধা দেন মজুমদার, 'এই তোমার দোষ অরিন্দম, কেউ আসতে না আসতেই তার সামনে ডার্ক সাইডগুলো তুলে ধরো!'

—'আপনি নিশ্চয়ই গরমকালের ড্রাই-ওয়েদার এবং লু-য়ের কথা বলতে চাইছেন মিস্টার বাসু'—চোখেমুখে কৌতুক ফুটিয়ে তুলে বললেন, করবী, 'আমার ছেলে-বেলা কেটেছে দিল্লিতে আর ওঁর পাটনায়।'

—'মাই গুডনেস! তার মানে—মা'র কাছে মামা-বাড়ির গপ্পো!' টিপ্পনি কাটেন রজত মজুমদার, 'এবার যদি একটু শিক্ষা হয় তোমার অরিন্দম!'

চায়ে চুমুক দিয়ে মিটিমিটি হাসেন বাসু-গিন্নি, বলেন, 'আজ কি শুধুই কথা!' আসল জিনিসটাই তো বের করেন নি রজতদা!'

—'আসল জিনিস! কী বলুন তো?' রজত মজুমদার হঠাৎ যেন হোঁচট খান।

—'হ্যাঁ—ভুলে গেলেন!' স্ত্রীর কথার সুর অনুধাবন করে অরিন্দম লাফিয়ে ওঠেন, 'সত্যি দাদা—আজ যেন আপনার কী হয়েছে!' বলতে বলতে ড্রয়ার খুলে তাসের দু' দু'খানা প্যাকেট বের করে মিস্টার চৌধুরীর দিকে একখানা এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'দিন দাদা—সাফল্ দিন।'

ব্রিজ খেলা কিন্তু জমে উঠতে গিয়েও জমল না। কারণ মিস্টার এবং মিসেস মজুমদার। আজ একে-বারেই অন্যরকম। হঠাৎ যেন দু'জনে বিচ্ছিন্ন হয়ে

গেলেন আসর থেকে। খেলা খোঁড়াতে খোঁড়াতে থেমে গেল এক সময়। বিদায় নিয়ে চলে গেলেন সবাই। শুধু বসে রইলেন ওঁরা। দু'জনে অপরিচিতের মতন।...

মিসেস মজুমদারের চোখে অন্য এক ছবি। ঋজু দীর্ঘ সুঠাম শরীরের অধিকারী এক সুদর্শন পুরুষ। মাংসপেশীর গঠনে পুরুষালি রুক্ষতা।। চোখের তারায় ভালোবাসার আশ্চর্য দীপ্তি। বিকেলের কবোষ্ণ রোদ্দুরের মতো। দাহ আছে, অথচ পোড়ায় না। আহা—এমন পুরুষের বাহুপাশে আবদ্ধ হয়ে কত না সুখ। কিন্তু সুখের অনুভূতিটা ছিন্ন হয়ে যায় পর মুহূর্তেই। শরীর। শরীর তার বুড়িয়ে গেছে অকালেই। বাজতে চাইলেও আর কি সুরের ঝংকার উঠবে তার দেহ-মন্দিরায়? মরা গাঙে আর কি বান এসে দু'কূল ভাসিয়ে দেবে কোনোদিন? অজান্তেই তপতীর বুকের গভীর থেকে উঠে আসে দীর্ঘশ্বাস। হতাশা তাকে অক্টোপাশের মতো জড়িয়ে ধরে আষ্টেপৃষ্ঠে।... সব রাগ গিয়ে পড়ে একটা মানুষের ওপর। হ্যাঁ—রজত, রজতই দায়ী এজন্যে। অক্ষম পুরুষ। কেন?— কেন সে তলে তলে প্রশ্রয় দিয়ে মেনে নিয়েছে তার শীতলতা? কেন সে স্বামীসুলভ মমত্ব দিয়ে সাজিয়ে তোলেনি তাকে? অথচ বিয়ের পর? —হ্যাঁ—একটা বছর, কী সুন্দরই না কেটেছিল দিনগুলো। দেহমনের সব অর্গল মুক্ত করে অনাস্বাদিত এক অনুভূতির জগতে তাকে পৌঁছে দিয়েছিল সেদিন রজত। স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন—সুখ আর সুখ, জীবন যে অন্যকিছু তা বুঝতেই দেয়নি।...

হানি মুন এর সেই প্রথম দিনটা। দার্জিলিঙের ট্রয় ট্রেনে ঘুরে ঘুরে শুধু ওঠা আর ওঠা, শেষই হয় না যেন। কতবার জল নেওয়া, কতবার থামা। কত মুখ। পাহাড়ী সারল্যের পাশে শহুরে কপটতা। রজত কথা বলে গেছে অনর্গল, ঘিরে রেখেছে তার সমস্ত সত্তাকে।... কিন্তু আজ? আজ কেন তাকে ভরিয়ে তুলতে পারছে না রজত? রজত কি তবে মরে গেছে?...তপতীর ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে যায়। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঋজু দীর্ঘ সুঠাম শরীরের অধিকারী এক পুরুষের ছবি, যার বলিষ্ঠ মাংসপেশীতে পুরুষালি রুক্ষতা।...

স্মৃতির পথ ধরে রজত মজুমদারও এখন দার্জিলিঙে। হোটেলের কাঁচ-ঘেরা উষ্ণ শয়নকক্ষ। পালকের মতো নরম বিছানা। সেখানে দিন-রাত্তিরের কোনো হিসেব নেই, জগৎ-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন দুটি সত্তা। কী অদ্ভুত একাত্মতা—কী গভীরভাবেই না পেয়েছিল সে তখন তপতীকে।...

কিছু টুকরো কথা মনে পড়ে রজত মজুমদারের। তপতী তখন তাকে আগলে রেখেছে চোখে চোখে। দার্জিলিঙের এক ঘোড়া-ওয়ালি—নাম মনে পড়ছে না, ভারী মিষ্টি চেহারা ছিল মেয়েটার। ফোলা ফোলা চোখ দুটোতে আশ্চর্য কমনীয়তা। কথায় কথায় তার আপেল-রঙা গালের প্রশংসা করে ফেলেছিল রজত, ব্যাস্—আর যায় কোথায়। পারলে আস্ত গিলে খায় মেয়েটাকে তপতী।...মধুমিতাকে নিয়েও কী কাণ্ড। রজতের কলেজ-জীবনের বান্ধবী। ম্যালে ঘুরতে ঘুরতে দেখা। তারপর আর সঙ্গ ছাড়তেই চায় না। তপতীর মুখ ভার। একসাথে লেবং ঘুরে এসে মধুমিতা চলে যাওয়ার পর তপতী বলেছিল, 'যাই বলো—ন্যাকামিতে, তোমার বান্ধবীটির কিন্তু তুলনাই নেই।'

—'কেন—কেন।' খুনসুটি ভরা চোখে তপতীর দিকে তাকিয়েছিল রজত, 'কী আবার করল ও বেচারি?'

—'ঢঙ্।—মাসল্-ক্র্যাম্প না ছাই।' ফুঁসে উঠেছিল তপতী, আসলে, তোমার হাতের ছোঁয়াটুকু না পেলে উঠে দাঁড়াতে পারছিলেন না উনি।'

—'ধুৎ! কী যে বলো না তুমি।—মাসল্-এ অমন টান ধরতে পারে সকলেরই, বিশেষ করে এইসব পাহাড়ী রাস্তাঘাটে।' রজত কথা শেষ করার আগেই তপতী হোটেলের ব্যালকনি থেকে ছিট্‌কে গিয়ে দোর এঁটেছিল দড়াম করে।...

আচ্ছা—এখন আর জেলাস্ হয় না তো তপতী। এখন তো আগলে আগলে রাখে না তাকে! একরাশ জমাট বরফ যেন। কিছুতেই আর গলবে না।...

মিস্টার মজুমদার তপতীকে কোথাও খুঁজে পান না। আলোকিত পশ্চাদ্‌পটে সিল্‌হুটেড্ ছবির মতো কেবলই ভেসে ওঠে একটা ছবি। গতির তালে তালে দুলতে থাকে হর্সটেল চুলের গোছা ওয়াল-ক্লকের পেণ্ডুলামের মতো এদিক-ওদিক।...

—'বাবু?—বাবুজী'—রতনের ডাকে একসঙ্গে চমকে তাকান মজুমদার-দম্পতি।—'সব্বাই চলে গেছেন বাবু।' মুখ কাঁচুমাচু করে রতন।

—'ও হ্যাঁ—তুই তো এবার তালা লাগিয়ে বাড়ি যাবি।' চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ান দু'জনে। শূন্য ঘরে শুধু শূন্য চেয়ার-টেবিল। রতন রিক্‌শা ডেকে দেয়।

বিছানায় শুয়েই ঘুম আসে না রজত মজুমদারের। তপতী আজ মাঝের জগদ্দল পাথরের মতন কোল বালিশটাকে সরিয়ে দিয়েছেন আগেভাগেই। বিছানাটা কি ছোট হয়ে গেছে খুবই? গায়ে গা ঠেকছে কেন বারবার? বাইরে নাকি প্রচণ্ড শীত? তবে গা থেকে লেপ সরে যেতে চাইছে কেন কেবলই?

পাশ ফিরে তপতীকে কাছে টানেন মজুমদার। তপতী কি কেঁপে ওঠে ফুলশয্যার রাতের অতি সং-বেদনশীল মেয়েটির মতো? ঘরে বেডল্যাম্পের নীল আলো। তবু তপতীর মুখটা একেবারেই দেখতে পান না রজত মজুমদার। তাঁর সামনে এখন দুলিত শরীর, গতির তালে তালে দুলছে হর্সটেল চুলের গোছা...ওই শরীরের গভীরে ডুবে যেতে চান রজত। আর ঠিক তখনই দু'হাতে তাঁকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন তপতী। তিনি অসহায়, শীতলতা তাঁকে তিলে তিলে গ্রাস করেছে। শারীরিক ব্যর্থতার যন্ত্রণা অশ্রু হয়ে ঝরে পড়তে থাকে অবিরাম।...

ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে তিনি উঠে এসে দাঁড়ান জানলার ধারে। সার্সীর ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকান। একরাশ অন্ধকার। শিশির বিন্দু-গুলো আরো ঘন হয়ে জমে উঠতে থাকে কাঁচের গায়ে ক্রমশ। ●

সংযম পালের

মহামায়ার মাতৃত্ব

এ উত্তাল সুবর্ণরেখা। জুলাইয়ের শেষদিকে বৃষ্টি নেমেছিলো, টানা কদিন, কখনো জোরে, কখনো ছিপ্ ছিপ্। আকাশ সেই কদিন ঘন মেঘলা, দিগন্ত থেকে দিগন্তে যেন ছুটে বেড়াচ্ছিলো কালো এক ভূত। এত জল হলো যে জমিতে জমিতে সবে রোয়া আমন ধানের চারাগুলো অদৃশ্য, পুকুরের ঘাট গেছে ডুবে। বাইরের জল যাতে ঢুকতে না পারে, আর সেই সুযোগে নতুন মাছের পোনাগুলো যাতে বেরিয়ে না যায়, কালু দপ্তপাট তার পুকুরের নীচু দিকটার পাড়ের উপর মাটি ফেলে উঁচু করছে। ওদিকে হাটচালার কাছে গাঁয়ের টকাঝিরা এসে দাঁড়িয়ে দেখছে সুবর্ণরেখার মাতলামি। সেদিনের সেই সাদা জল কেমন ঘোলা হয়ে গেছে, যেন নেশা করেছে। আস্তে আস্তে জল বাড়ছে, আর কিছুটা বাড়লেই হাটচালার পুলের তলা দিয়ে ঢুকে পড়বে ধানবিলগুলোয়। তখন কোথায় নদী, আর কোথায় চাষ? মাঝখানের পাড়ের উঁচু রাস্তাটা ছাড়া সব জল, একাকার, টলটল, সাদা ফেনামাখা যমদূত।

মহামায়া অসহায়। তার বিপদ দু'দিকে। জলমহাপালের এদিকটা নীচু, উপরন্তু নদীর প্রায় পাড়েই বাড়ি তাদের। প্রতিবছর খেয়ে যাচ্ছে নদী এ'দিকটা আর এইবারেই বাড়ির একেবারে কাছে এসে পড়েছে জলের গর্জন। পিছনের বাগান মতো জায়গাটার বাঁশের বেড়ার ঠিক পিছনেই তার রহস্যময় গোঙানি। আর যদি একটু জল বাড়ে, যদি উঠে আসে বাগানে, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে তাদের। তক্তাপাঠের দিকে সুরেন শতপথীর বাড়ীতে উঠে যেতে হবে। আর সেখানেও যদি জল ওঠে, তবে—শেষতক স্কুলডাঙায়।

কিন্তু তার থেকেও বড় বিপদ মহামায়ার নিজের ভেতর। সকাল থেকে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে, চাপ চাপ রক্ত বেরোচ্ছে মাঝেমাঝে। যেন ফেটে যাচ্ছে ভেতরে কিছু, যেন চিৎকার করছে কেউ। সকালবেলা জড়িবুটি দিয়েছে দিদিমা, বুড়ি অনেক কিছু জানে। নীচ দিয়ে পেটের মধ্যে ওষুধ ঢুকিয়ে মুখ দিয়ে গরম জল খাইয়েছে। বলেছে, 'টুকু বথা হিবে। মূর্চ্ছা যাবুনি। সাঁঝ করি বাহারাই আসবে।'

কিন্তু কোথায় সেই সাঁঝবেলা? সবে মাঝদুপুর। বাতাস কেমন জোরে জোরে বইছে। মহামায়া কাঁদছে। তার সারা শরীরের সমস্ত জল যেন চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। খাটিয়ার ওপর শুয়ে আছে সে। কোমরের নীচের কাঁথা রক্তে লাল। পেতে দেওয়ার মতো ন্যাকড়া আর ঘরে নেই। খাটিয়ার পাশে মাটিতে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে তার মাও। রোগা শরীর কান্নার চাপে ধক্‌ধক্ করছে। মাঝেমাঝে মহামায়া যখন ডুক্‌রে উঠছে, মনে হচ্ছে এ কষ্ট সহ্য করা যায় না, তার মা চোখ বিস্ফারিত করে বিড়বিড় করছে, 'মর

বেধামড়া। মোর গা জুড়াই যাক। মর তুই। হায় ভগবান!'

'মরি যামু মুই। হে ভগবান, নি যা মোকে। আর বাঁচমুনি গো!' যন্ত্রণা অসহ্য হলে কখনো কখনো চিৎকার করে উঠছে মহামায়া। তার সারা শরীর কুঁচকে যাচ্ছে, পেটের মধ্যে কেউ যেন আগুনের কাঠি নেড়ে দিচ্ছে।

বুড়ি দিদিমাও পাশে ব'সে। তার চিৎকারে বিরক্ত হ'য়ে বলছে 'চেঁচাউঠু কেনা? নোকে জানি পারলে ভালা হিবে?'

চুপ ক'রে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে, কিন্তু পারছে না। অন্ধকার ঘরের মধ্যে শুয়েও বুঝতে পারছে, বাইরে এক চাপা গর্জন, বাতাস আর নদীর ফোঁসফোসানি। বাইরে তার বাবা আতঙ্ক সাউ আর দুলাল ব'সে আছে। কাল দুলালকে ঝাড়গাঁ থেকে ডেকে নিয়ে এসেছে বাবা। দুলাল এই ঘটনার সাক্ষী থাক, কারণ সে নিজেই দায়ী। বাড়ির সবাই না বলেছিলো, কিন্তু আতঙ্ক সাউ জোর ক'রে নিয়ে এসেছে। মহামায়া চায়নি দুলাল থাকুক, কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে ভালোই হয়েছে। তার এত কষ্ট সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে। দুলালকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন তার, বিয়ে হবে, ঝাড়গাঁয় গিয়ে ঘর বাঁধবে। তবু ভয় হয়, যদি দুলাল বিয়ে না করে, তাহ'লে কোথায় যাবে সে? গাঁ-দেশে এই ঘটনা একদিন সবাই জানবেই, তখন কেউ কি আর তার দিকে ফিরে তাকাবে?

আতঙ্ক সাউয়ের অসহায় কণ্ঠ ভেসে আসছে মাঝে মাঝে। মা যখন জিজ্ঞাসা করছে, 'পানি কদ্দুর?' বাবা বলছে, 'উঠেনি', তখন সে নিশ্চিন্ত। তার ভীষণ ভয় করছে, যদি এ'সময়ে উঠে আসে নদী, তাহলে কোথায় পালাবে সে, এই রক্তমাখা শরীর নিয়ে কোথায় নড়বে? নাকি তাকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাবে সবাই? লোকে জানতে চাইলে বলবে, 'আমি পারলনি, নদী টানি নিছে।' এরকম ভয়ংকর যন্ত্রণার মধ্যে তার সামনে আরো অসংখ্য ভয় বেড়ে যাচ্ছিলো, সে চোখ বন্ধ ক'রে নদীর কাছে কাতর প্রার্থনা জানাতে লাগলো, 'ওগো নদী, 'ওগো নদী, আর উঠোনাগ' দেবী, টুকু শান্ত হি রহ।'

বাবা আতঙ্ক সাউ গরীব। তার দুবিঘা জমির বিশ মণ ধানে বছর চলেনা। নদী থেকে দূরে জমি পানুয়ার কাছে, একবার চাষ হয় বছরে। খারিফের পর রবি লাগানোর মতো টাকা নেই তার, তাই চোখের সামনে অফলা পড়ে থাকে মাঠ। পাশের বিলে যখন লঙ্কা, বৈত্তাল চক্চক্ করে, আতঙ্ক সাউয়ের দু'বিঘা তখন বাগালদের নিশ্চিন্ত খেলার জায়গা।

বছর দুই আগে, মহামায়ার ষোলো বছরে, তাকে হাওড়ার দাশনগরে সি. টি. আই-তে কাজ করে তাদের গাঁয়ের যে সুনীল দাশ, তার কাছে পাঠিয়েছিলো আতঙ্ক। দাশনগরে বউ নিয়ে কোয়ার্টারে থাকে সুনীল দাশ, দুই বাচ্চা নিয়ে বউ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। আগে পাশের মহাপাল স্কুলে মাস্টার ছিলো, তিনবছর চাকরি ছেড়ে এই চাকরিতে গিয়েছে। গাঁয়ে বুড়ী মা, আর এক ভাই থাকে, জমিজমা আছে, দেখাশোনা করে। সেবারে গাঁয়ে এসে মহামায়াদের বাড়িতেও বসেছিলো কিছুক্ষণ। সম্পর্কে মামা হয়।

কথায় কথায় মৌসুমীমামির অসুবিধের কথা উঠতে বাবা আতঙ্ক বলেছিলো, 'তা' হিনে নি যাওনা কেনে মোর ঝিয়াড়ীটিকে? ভালা রইবে তুমার পাশ, তুমার বউয়েরও না হিনে কিছু সুবিধা হিবে।'

কোনো আপত্তি করেনি সুনীল দাশ, সব ঠিক-ঠাক ক'রে, আতঙ্ক-র হাতে আগাম বিশটা টাকা

দিয়ে, পরদিন সকালেই বড়ামারা ঘাটে বাস ধরে খড়্গপুর থেকে সবুজ লোকাল ট্রেনে সোজা দাশনগর। মহামায়ার আদৌ যেতে ইচ্ছে হয়নি, তলমহাপালের নদীর সান্নিধ্য আর গুটিকয় বন্ধুর সাথে কিত্‌কিত্‌ ও সাতঘরিয়া খেলার মায়া ছেড়ে তার দাশনগর যাওয়ার কোনো ইচ্ছে ছিলোনা। কিন্তু সে তো তখন বিক্রি হয়ে গেছে। উপরন্তু দু'বেলা দুটো ভালো-মন্দ খাওয়ার লোভের থেকে বড় লোভ আর কি আছে? তারা পৌঁছানোমাত্র মৌসুমীমামী খুব খুশী হয়েছিলো তাকে দেখে। তার ভালো লেগেছিলো। পরের দু'বছর আস্তে আস্তে তার গ্রামকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো মহামায়া।

প্রথম একবছর খুব ভালো ছিলো সে। মামী শিবপুরে স্কুলে পড়াতে যেতো। সে রান্নার কাজ করতো, দুই বাচ্চা টুনি আর মণিকে সামলাতো। মামা চলে যেতো সি. টি. আই.-তে, দুপুরে খেতে আসতো, আবার চলে যেতো। পুজোর সময় তাকে ও মামীকে একই রকম শাড়ি দিতো মামা। কোনো কষ্ট কখনো পেতে হয়নি তাকে।

সে যাওয়ার প্রায় বছরখানিক বাদে হঠাৎ একদিন দুলাল হাজির হ'লো তাদের ওখানে। তলমহাপালে বাড়ী, ঝাড়গ্রাঁয় শক্তি করের আড়তে কাজ করে। কলকাতায় আসতে হয় ঘন ঘন, মাল অর্ডার দিয়ে ট্রান্সপোর্টে বুক ক'রে যেতে হয়। সেই মঙ্গলবার উলুবেড়িয়ায় ট্রেনের কি গোলমাল ছিলো, সে দাশনগরে সুনীল মামার ওখানেই থেকে গেলো। মামার দুরসম্পর্কের আত্মীয় হয়, দিদির শ্বশুরঘরের পিসতুতো ভাইয়ের মতো কিছু একটা। কিন্তু মামা তাকে যতনা চেনে, মহামায়া তাকে অনেক বেশী চেনে। একই গাঁয়ের লোক, তার ওপর বয়সেরও পার্থক্য খুব একটা বেশী নয়।

দুলাল প্রায়ই গাঁয়ে যায় ঝাড়গ্রাঁ থেকে। তাকে পেয়ে অনেককিছু জিজ্ঞাসা করলো মহামায়া। 'বাবা কেমন আছে?' 'আজকাল হাটে হাটে গুড়মিঠা, মুড়িভাজার দুকান দ্যায়। দু'পয়সা হি যায়।' বললো দুলাল। তার বোন বেলা কি করছে? 'তলমহাপালের পাইমারী ইস্কুল ছাড়ি ইবার বড় ইস্কুলে পড়বে।' মা? 'মাউলি ভালা আছে। ছাগল পুষছে গটায়।' মহামায়া খুশী হ'লো। বাড়ির সম্বন্ধে একটা ভয় দুর্ভাবনা তার মনে প্রায়ই উঁকি দ্যায়। আতঙ্ক সাউ চিঠি লিখতে জানেনা, সুনীল মামাও গাঁয়ে আর যায়নি তারপরে। ফলে কোন খবর সে এতদিন পায়নি। মামাদের দু'টো ঘর। সে রাতে ভেতরের ঘরে শুলো মামা, মামি, আর দুই বাচ্চা। বাইরের ঘরে খাটের ওপর দুলাল, আর নীচে মহামায়া ও লক্ষ্মী, মামার ভাইঝি। খুব অস্বস্তি হচ্ছিলো তার, শাড়ি নিয়ে খুব বিব্রত হচ্ছিলো। আলো যতক্ষণ না নেভে, খুব লজ্জাও করছিলো।

পরদিন সকালে দুলাল চলে গেলো। কিন্তু প্রায়ই মঙ্গলবার সে থেকে যেতে লাগলো মামার ওখানে। মামা-মামী খুব একটা গুরুত্ব দিতে না চাইলেও মহামায়া বুঝতে পারতো, দুলালের কাজের জন্য থেকে যাওয়াটা একটা অজুহাত। তার সঙ্গে তখন খুব সহজ সম্পর্ক দুলালের, প্রায়ই বাড়ির খবর দিতো। কেমন আত্মীয়ের মতো হ'য়ে গিয়েছিলো তার কথাবার্তা। সে বুঝতে পারলো, দুলাল তাকে একটু অন্যরকমভাবে দেখছে, একটু বেশী চাইছে তার সঙ্গ। তারপর একদিন সে খুব ভয় পেয়ে গেলো, যদিও ভালোও লাগলো দারুণ, আর তখন সে কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, 'মামা জানি পারলে মারি ফেলবে মোকে।'

'জানবেনি', তাকে জড়িয়ে ধরে সাহস দিলো দুলাল।

'মোর ভয় করেঠে', ক্ষীণ প্রতিবাদ করলো মহামায়া।

প্রথম প্রথম এভাবেই চলছিলো। সে তখন গভীর প্রেমে পড়েছে দুলালের। সুযোগ পেয়েও দুলাল যদি তাকে জড়িয়ে না ধরে, কোনো অছিলায় বুকে বা মুখে হাত না লাগায়, সন্দেহ জাগে তার মনে। সে কাজ করতে করতে আকাশের তুলোর মতো মেঘ ছাখে, রেললাইনের ধারে বিড়ালের লোমের মতো কাশফুল দুলতে দেখে তার খুব আনন্দ হয়, পুজোর বাজনা শুনে মনে হয় এক্ষুনি দুলালের সাথে রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে মিশে যায়। বাইরে বেরোলে দূরে হাওড়া ব্রীজের মাথা ছাখা যায়, মনে হয় দুলালকে নিয়ে ওটা পেরিয়ে কলকাতায় গিয়ে সিনেমা দেখে আসে। তার সতেরো বছরের প্রতিটি দিনে আর রাতে তখন দুলাল, সূর্যোদয়ে এবং সূর্যাস্তে তখন শুধু দুলালের মুখই মনে পড়ে। কোনো মঙ্গলবার সে না এলে খুব কষ্ট হ'তো তার, সারা বুধবার ছটফট্ করতো।

দুলাল প্রায়ই আসাতে মামী একটু বিরক্ত বোধ করলেও মামা কিছু বলতো না। এইজন্যই মামাকে তার বেশী ভালো লাগতো। দুলাল এলে বাইরের ঘরেই শুতো তারা, আগের মতো। সেটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এইরকম একরাতে লক্ষ্মী ছিলোনা, বসিরহাটে মামার বাড়ি গিয়েছিলো। মহামায়ার এখন ভাবলে আশ্চর্য লাগে কি বিশ্বাসে মামা-মামী তাদের দু'জনকে একঘরে শুতে দিয়েছিলো। ভেতরের ঘরে আলো নেভার কিছুক্ষণ পরেই খাট থেকে নেমে এসে তার ছোট্টর মশারির মধ্যে ঢুকেছিলো দুলাল। মহামায়া আশা করছিলো, তবু ভীষণ ভয় লাগলো তার। সে অস্ফুটে বললো, 'কি করবঅ ?'

'তোর পাশে শুই করি নিদ যাবু,' হাসলো দুলাল।

'মামা দেখি ফেলনে ?'

'ধুর! ও নোক তো উনকার কাম করেঠে।'

'ভয় নাগেঠে মোর,' চোখ বন্ধ করে উচ্চারণ করেছিলো মহামায়া।

সে এক নেশা। এতদিন তারা যতটুকু এগিয়েছিলো, সেদিনের এগোনোর সাথে তার কোনো তুলনা হয়না। অজস্র ভয় এবং দ্বিধা থাকলেও দুলালের সাহসী কথায় সব চিন্তা দূরে সরে গিয়েছিলো। কাঁপছিলো দুলালও, তারও তখন জয়ের আনন্দ। এরপর সুযোগ পেলেই তারা একসাথে শুয়েছে। দু'একবার লক্ষ্মী ঘুমিয়ে পড়লে দুলালের খাটে উঠে যেতো সে।

কেউ তখন জানতে পারেনি। মহামায়ার ভেতরে কিন্তু অন্য একটা ভয় জেগে উঠতো, যদি বাচ্চা হয়। সে দুলালকে প্রায়ই সাবধান করতো, দুলাল বলতো, 'হিবেনি, অযুধ জানঅ মুই।' সে মহামায়াকে বলেছিলো, 'বাহা করমু তোকে। আরবছর পূজার পর শীতে তোকে মোর ঘর নি যামু। মাউসাকে বলমু। তারপর দু'নোকে মিলি করি ঝাড়গাঁয়, এ কাম ছাড়ি করি পালদের বাসে কণ্ডাক্টারি করমু।'

খুব খুশী হয় মহামায়া। তার স্বপ্নের রং ঘন হয়ে যায়। সুবর্ণরেখার হলুদ বালি, আর সাদা জলের কাছ থেকে তার সুখ উঠে আসে ঝাড়গাঁর উঁচু উঁচু সবুজ শালগাছগুলোর মাঝে। সে দুবার ঝাড়গাঁ গেছে। খুব ভালো শহর। দাশনগরের মতো এত ঝকমকে নয়, এত ঘিঞ্জি নয়। এই এত লোক আর ধুলো তার ভালো লাগেনা। সে তুলনায় ঝাড়গাঁর মধ্যে একটা গাঁ-গাঁ ভাব আছে, আর শহরও আছে। সেই শহরে দুলাল আর সে থাকবে, মহামায়া সাউ হ'য়ে যাবে মহামায়া জানা।

কিন্তু এই সুখ তার কপালে বেশীদিন সইলো না। একদিন দুপুরবেলা খেতে এসে মামা তাকে জোরে আঁকড়ে ধরলো। হকচকিয়ে গেল সে, নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করায় মামা বললো, 'সব জানঅ মুই।'

ভয় পেয়ে গেল সে, তখন মামা তাকে বললো যে সে রাতে উঁকি দিয়ে দেখেছে তারা কি করেছে রাতে। যদি মহামায়া তার সাথেও শোয়, তাহ'লে কাউকে কিছু বলবেনা, কেউ জানতে পারবেনা, দুলালও না। দুলালকে আসতে দেবে, পরে দুলালের সাথে বিয়েও দিয়ে দেবে। আর যদি মহামায়া না শোয়, তাহ'লে এ বাড়ীতে দুলালের আসা বন্ধ হবে, উপরন্তু গ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে আতঙ্ক সাউকে সব বলে দেওয়া হবে। তখন তার রাগী বাপ তাকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলবে। গ্রামে কাউকে সে মুখ দ্যাখাতে পারবে না, চারদিকে সবাই জেনে যাবে।

ডুকরে কেঁদে উঠলো মহামায়া, নিজেকে তার খুব অসহায় লাগলো। সুনীল দাশের ফর্সা মুখটাকে তার একটা নোংরা শুয়োরের মতো লাগলো। মামা হাসলো, শয়তানের মতো, তারপর বললো, 'ভাবি দ্যাখ। দুলাল আসবে কি আসবেনি—সব তোর উপর।'

এর মাস দুয়েক পরেই পেটে বাচ্চা এলো তার। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো সে, দুলালকে বলাতে সেও কি করবে ভেবে উঠতে পারলোনা। মহামায়ার প্রতি মামার বেশী উদারতা দেখে মাঝেমাঝে কেমন সন্দেহ হ'তো দুলালের, কিন্তু সে কিছু বললেই মহামায়া হেসে উঠতো, বলতো, 'তোমার মনে জ্বালা।' দুলাল সুনীল দাশকে ভালো ক'রে চেনে, সে বলতো, 'সাবধানে থাকবঅ, নোক সুবিধার নয়।'

বাচ্চার কথা মামাকে কিছু না বললেও একদিন দুপুরে তার বমি করা দেখে ধরতে পেরে গেলো মামী। সেইদিনই মামা জানলো, আর সব দোষ দিলো দুলালের ঘাড়ে। বাঙাল মামী চেঁচালো, 'এক্ষুণি বাড়ি পাঠাও ওকে। কে ওর ঝামেলা বইবে? যতো সব বাজে মেয়েছেলে!'

কাঁদলো শুধু মহামায়া। পরের মঙ্গলবার দুলাল এলে আড়ালে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মামা বললো, 'বাহা করতে হবে তোকে। গাঁয়ে নি যা, বলবুনি কাউকে। চের খাই করি নষ্ট করি ফেল জানবেনি কেউ। টাকা লাগলে বলবু, মোর ঠাঁই যখন এ দুর্ভাগ্য হিছে, মোরও তো কিছু দায়িত্ব আছে।'

তারপরদিনই দুলালকে দিয়ে মহামায়াকে তল-মহাপালে পাঠিয়ে দিলো মামা।

বাড়িতে আসল ব্যাপার দুলাল কিছু বললো না। সে শুধু বললো, মামা আর রাখবেনি'। আতঙ্ক সাউ রেগে গেলো, বললো, 'সুনীল দাশ নোক ভালা নি। কাম হই গেছে তার, খেদি দিলঅ'। মহামায়া চমকালো, কিন্তু চুপ করে থাকলো।

দুলাল একদিন এসে লুকিয়ে একটা ওষুধ দিয়ে গেলো মহামায়াকে। বললো, 'ভোর হিনে বাসি মুখে খাই নিবু'। সে খেলো, কিন্তু কিছুই হ'লো না। এমনকি একটু ব্যথাও না।

একেকটা দিন শত্রুর মতো আসছে তখন। সে দুলালকে বললো, 'বাহা করবনি? দেরী হি যায়ঠে। নোকে বুঝি পারবে'।

'অখনি কি করি করমু? কথা নাই, বসা নাই, নোকে কি বলবে? এ টকা নষ্ট হি যাউ, তারপর বাহা করমু তোকে।'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো মহামায়া। সে বুঝতে পারলো দুলাল এড়াতে চাইছে। সে কি কিছু সন্দেহ করছে? নিশ্চয়ই না তা'হলে রাগে ফেটে পড়তো। তার কাছে জবাবদিহি করতো। সম্পর্ক এত সহজ থাকতো না, তার জন্ম দুলালের এটুকু চিন্তাভাবনাও থাকতোনা। এইমুহূর্তে দুলাল ছাড়া মহামায়া আর কিছু ভাবতে পারছে না, তাকে ছাড়া এই জীবন অন্ধকার। যদি বাচ্চাটাকে সত্যিই নষ্ট করা যায়, তাহ'লে তেমনভাবে কেউ হয়তো বুঝতে পারবেনা। আর যদি বাচ্চা সত্যিই হয়, সবাই যদি জানতে পেরে

যায়, লজ্জায় তাকে আত্মহত্যা করতে হবে। তার বাবা আতঙ্ক সাট্টি নাহ'লে গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলবে তাকে। সে মরতে চায়না, সে চায় দুলালকে বিয়ে ক'রে ঝাড়গাঁয় সুখী জীবন কাটাতে। কিন্তু বাচ্চা যদি দুলালের না হয়? নিজের বাচ্চা হ'লে আপত্তি হবেনা পরে বিয়ে করবে, কিন্তু সুনীল দাশের সাথে মহামায়ার শোয়ার ঘটনা সে কি আদৌ ক্ষমা করবে? মহামায়ার প্রচণ্ড ভয়, বাচ্চা হ'লে হয়তো দ্যাখা যাবে, তার বাবা দুলাল নয়। তখন?

সে দুলালকে জোর করতে পারছে না। আরো দশটা মেয়ের মতো চালাক নয় সে, ভয় তার সবসময়। করুণভাবে কয়েকবার মিনতি ক'রেছে জড়িবুটি আনার জন্য। তার নিজের দিদিমা এ' ব্যাপারে নামডাকঅলা, কিন্তু সে তো জানাজানি হ'য়ে যাবে। বাচ্চাটাকে তাড়াতাড়ি নষ্ট ক'রে ফেলতে চায় মহামায়া, তার আশঙ্কা এ বাচ্চা একবার জন্মালে কি ভীষণ ঘোর বিপদ নেমে আসবে বুঝি তার জীবনে।

দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, মহামায়ার উদ্বেগ বাড়তে লাগলো। একটা ভুত যেন তার পেটের মধ্যে, আস্তে আস্তে বড় হয়ে একদিন তার ঘাড় মটকে দেবে। সে বুঝতে পেরে গেছে দুলাল তাকে এখন বিয়ে করবে না, তাই বাচ্চাটাকে নষ্ট ক'রে ফেলা প্রয়োজন। কিন্তু কিছুতেই কিছু ক'রে উঠতে পারছিলো না সে।

মহামায়া তখন অসুখের ভাণ করলো। পেট বড় হচ্ছে, বাপ না বুঝতে পারুক, মা বা দিদিমার চোখ এড়াবে না। সে সকাল থেকে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতো, মা যখন দুপুরে সম্পন্নগ্রাহীদের বাড়িতে ধান কুটতে যেতো, সেইসময় উঠে চান-টান ক'রে খেয়ে নিতো। দিদিমা খুব একটা খেয়াল করতো না, আর তাছাড়া পেটটা খুব একটা ফুলছিলো না তার। অনেকের যেমন ঢোলের মতোন হয়ে যায়, তার তেমন কিছু নয়, এটাই বাঁচোয়া।

কিন্তু অসুখ অসুখ ক'রে আর কতদিন চলবে? রহস্যময় অসুখ। পেটে ব্যথা, কিন্তু এমন ব্যথা নয় যে ছোট হাসপাতালে ছুটতে হবে। কেউ তেমন কিছু না বললেও, মা কেমন সন্দেহ করতো, বলতো, 'জোয়ান মাইয়াঝি, দিনরাত শুই আছু। কি হিছে তোর?'

'কুছু না, পেট কেমন গুড়গুড় করে,' বলে মহামায়া।

'অত গুড়গুড় করেঠে যে সারাদিন শুই রইতে হয়?'

চুপ ক'রে থাকে সে। মা ক'বার পেটে হাত দিয়েছে, বুঝতে পারেনি কিছু।

দিনদিন তার শরীর কঙ্কালসার হ'তে লাগলো। খুব টক খাবার সাধ, কিন্তু সে সাহস ক'রে চাইতে পারেনা। কেউ আশেপাশে না থাকলে উনুনের পোড়া মাটি সে কখনো কখনো মুখে তুলে দ্যায়, মিষ্টি লাগে, গেঁড়ির মাংসও খুব ভালো লাগে, কিন্তু কে আনবে? দাশনগর যাওয়ার আগে সেই-ই নদীর ধার থেকে তুলে আনতো ছোট গেঁড়িগুলোকে। এখন বিছানায় শুয়ে শুয়েই সে দ্যাখে ভোরের আবছা আঁধারে কিভাবে নদীর নরম ধারে আঠার মতো লেগে আছে গেঁড়িগুলো। একটু শব্দ হলেই তারা সুড়ুৎ ক'রে জলের ভেতর ডুবে যায়।

দেখতে দেখতে সাত মাস হ'য়ে গেছে। মহামায়ার ভয় এখন তাকে দিনেরাতে গোঁত্তা মারে। এমন একটা সময় নেই, যখন সে কালো ভুত দ্যাখে না। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে পাহাড়প্রমাণ এক ভুত তাকে যেন সবসময় তাড়া করে, একটু এতোল-বেতোল হ'লেই ঘাড় মটকে দেবে।

বাচ্চা তার হবেই। কিন্তু 'হে ভগবান, দুলালের তো?' সে দুলালকে ভালোবাসে, সে আশা করে দুলাল তাকে বিয়ে করবে। এখনই বিয়ে করতে

আপত্তি থাকলেও, বেইমান নয় সে, তাহ'লে প্রথমেই তাকে ফেলে পালাতে পারতো। কিন্তু যদি দুলালের না হয়, তাহ'লে?

একদিন আর পারলোনা মহামায়া। ধরাপড়ে গেলো। ঘরে তখন হুলুস্থুল। আতঙ্ক সাউ লাফিয়ে লাফিয়ে মারতে যায়, দিদিমা তাকে টেনে ধরে, 'এ আতঙ্কঅ, ছাড়ি দে। চুপ মার। ছাড়ি দে বাপ। মুই দেন অঠঅ।' মা রাগে চীৎকার ক'রে ওঠে, 'বেধামড়া! ওলাউঠা হি করি মারি গেলুনি কেনা? কে তোর টকার বাপ, বল?' চুলের মুঠি ধরে এলোপাথাড়ি মারতে থাকে তাকে। তারপরই নরম হয়ে যায়, যেন পা দিয়ে দাম্‌ড়ে দেওয়া আগগাছ, ঘরের কোনে ব'সে ফুঁপিয়ে কাঁদে, আর মাথা ঠোকে, 'এ মোর কি পাপ হিলা গো? এ ভুখার সংসারে ভাত জুটেনি, তা'পর একি শাপ গো?'

মহামায়ার ভেতরেও ভীষণ কষ্ট হয়। মায়ের করুণ মুখ দেখে ভেতরটা ঝল্‌সে যায় তার, সে দুলা-লের নাম বলে।

'দুলাল?' চমকে যায় আতঙ্ক সাউ, 'শালার পো! মুই দেশ ডাকমু, বিচার হিবে।' চেঁচায় সে।

'চুপ করঅ তুমি, নোকে জানি ফেলনে সে বড়অ নাজের। চুপ করঅ। এ আমকার ব্যাপার। দুখ্ বাড়াওনি আর।' মা বাবাকে ধমকালো।

সেই রাতে স্থির হ'লো, আতঙ্ক সাউ ঝাড়গাঁয় দুলালকে ডাকতে যাবে। বিয়ের কথা বলবে।

মহামায়া কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'বাহা করবেনি ও অখন। এ টকা নষ্ট না হিনে বাহা করবেনি।'

'কেনা করবেনি? ওর বাপ করবে!' চেঁচালো আতঙ্ক সাউ, তারপর পরদিন সকালেই দুলালকে ডাকতে চলে গেলো।

দুলাল এরকম একটা ঘটনা আগে থেকেই আন্দাজ করেছিলো। সে এলো, কিন্তু সরাসরি বললো, 'মহামায়াকে মুই ভালবাসও, কিন্তু অখন বাহা করি পারবুনি। দোষ মোর, মুই মানঅঠঅ, তবে ইবার নষ্ট হি যাউ, তারপর জরুর বাহা করমু। মোর গটায় কথা, মাউসা, খেলাপ হিবেনি।'

'কেমনে নষ্ট হিবে? আট মাস হি গেলা, যদি ঝি মোর মারা যায়?' মা জানতে চাইলো।

'কেনা মরবে?' দুলাল দিদিমার দিকে তাকালো।

বাড়ীর সবাই বুঝতে পারলো দুলাল এখন বিয়ে করবেনা। জোরজার করলে পাঁচকান হবে, কেলেং-কারী বাড়বে। সে তেজী ছেলে। বরং অপেক্ষা করলে, তার কথা শুনলে ফল ভালো হ'তে পারে।

দিদিমা বললো, 'হি যাবে, তবে বথা হিবে, বেদ্‌না হিবে খুব। মরবেনি।'

আতঙ্ক সাউ কেঁদে ফেললো, দুলালের দু'হাত জড়িয়ে ধ'রে বললো 'বাপ, পরে বাহা করবু তো?'

বাইরে চাপা শোঁ শোঁ হাওয়ার গোঙানি ঘরের ভেতর থেকেই শুনতে পাচ্ছে মহামায়া। নদীর জল নিশ্চয়ই বাড়'ছে, কিন্তু কত?

মাঝখানে আতঙ্ক সাউ একবার চেঁচিয়ে উঠলো, 'বাঁশের পোঙ্‌গা ডুবি গেলা গো মহামায়ার মা!'

'আই বাপ্! হে দেব্‌তা, আর উঠনি গো!' কান্নার মতো স্বর বেরিয়ে এলো মায়ের গলা থেকে।

মহামায়ার কি হবে? তার অসংখ্য ভয়। যদি উঠে আসে নদী? যদি টকাটা মামার হয়, আর দুলাল বুঝতে পারে? তবে দুলাল তাকে কখনো বিয়ে করবেনা, সে নিশ্চিত। রাস্তার পাগ্‌লী হ'য়ে ঘুরে বেড়াতে হবে তাকে, শিয়ালরা ছিঁড়ে খাবে। কে তাকে বাঁচাবে এত সমস্যা থেকে? 'হে ভগমান, হে মা শীত্‌লা, হে মা মন্‌সা, আরো হাজার দেবতাকে সে ডাকলো, 'দয়া করঅ এ পোড়ামুহা অভাগীকে।'

বিকেল গড়িয়ে কাল্‌চে সন্ধ্যে নামছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঘোলা, ফেনামাখানো জল মাঠ থেকে মাঠে ছড়িয়ে পড়েছে, ডুবিয়ে দিয়েছে ভীরু মাথা উঁচু শেষ

কয়েকটা ধানচারাকে। ভেজা কাকগুলো প্রাকৃতিক এই দুর্যোগে ভয়ে চুপ মেরে গেছে বোধহয়। কয়েক বছর আগে এরকম একটা বান এসেছিলো। সেবার মহাপালের মা দুর্গা অষ্টমীর দিনে তার মতো একটা মেয়েকে গিলে ফেলেছিলো। মেয়েটির গর্ভ হয়েছিলো কুমারী অবস্থায়, বাচ্চাও হ'য়েছিলো। ভূপতি পৈড়ার মেয়ে। কার বাচ্চা জানা যায়নি। অষ্টমীর দিন সকালে দ্যাখা গেলো মায়ের মুখে মেয়েটার শাড়ির আঁচলের টুকরো। সেই হতভাগীরও নাম ছিলো দুগ্‌গা। বামুনমশাই ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। অনেকে বলে বামুনের ছেলে ননীগোপালের জন্যই নাকি পৈড়ার মেয়ের গর্ভ হ'য়েছিলো। তাকে মেরে, বালির মধ্যে পুঁতে দিয়েছিলো পাচুয়ার উঁচু ঢিপিতে, পরে কাপড়ের টুকরো গুঁজে দিয়েছিলো মায়ের মুখে! যদি মহামায়ারও সেরকম হয়? যদি তাকে সত্যিই গিলে ফেলে মা দুর্গা, অথবা…

দুলাল বাইরে বাপের সাথে ব'সে আছে। দায়িত্ব আছে তার, এটা জেনে মহামায়ার খুব ভালো লাগছে। তার আশা, শেষপর্যন্ত তেমন খারাপ কিছু হবেনা, এবং কয়েক মাস বাদে দুলালের সাথে তার বিয়ে হবে। এত কষ্ট হচ্ছে তার, যে মনে হচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে সে মরে যেতে পারে। পেটের মধ্যে ধক্‌ধক্‌ দপ্‌দপানি, নাইকুণ্ডলীতে যেন কেউ কোপ্‌ বসাচ্ছে। প্রাণটা বেরিয়ে যাবে মনে হচ্ছে, হৃদ্‌পিণ্ডে আস্তে আস্তে মোচড় পড়ছে। সে আর পারছে না, ঘোলা বন্যা যেন তখন তার নিজেরই ভেতর।

সন্ধ্যের একেবারে মুখে এক ভীষণ পাক খেলো মহামায়ার শরীর। 'মরি যামু, মরি যামু মুই। উরে বাপ্‌রে! ও মাগো। চিৎকার ক'রে উঠলো সে। ঘরে তখন লম্ফ জ্বলেছে। মা আর দিদিমা তার ওপর উৎকণ্ঠিত মুখে ঝুঁকে আছে। এক ভয়ংকর চিৎকার ক'রে সেইমুহূর্তে, সেই দিন আর রাত্রির হিসেব নিকেশের গোধূলিতে, গোঁত্তা খেতে খেতে মাতৃত্বের দায় ঘুচিয়ে দিলো মহামায়া।

রাত্রিবেলা একটু নির্জনতা পেয়ে দুলাল তার কাছে এলো, স্থির দুই চোখ মেলে প্রশ্ন করলো, 'মামার মুহ–র ছাপ কেনা টকার মুহে?'

মহামায়া কেঁপে উঠলো। নদী তখন অনেক দুর উঠে এসেছে, বাগানের বেড়া পার হ'য়ে উঠোনে আছড়াচ্ছে তার ফোঁসফোঁসানি। ●

একটি প্রতিবাদী প্রতিবেদন ঃ

শ্রীকমল চক্রবর্ত্তীর "মুক্তচিন্তা" এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অচল মফস্বল প্রসঙ্গে।

দ্রষ্টব্য ঃ সাপ্তাহিক "দেশ", ১০ই আগষ্ট, ১৯৮৫

অরুণ সরকার

'দেশ' যা ছাপে ছাপুক, কারণ তার ছাপার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মুনাফার প্রশ্ন, সুতরাং সেখানে প্রতিবাদ করে লাভ নেই। তাছাড়া এই লেখার মধ্যে আমি কোনও 'তরজা আসরের' আহ্বান জানাচ্ছি না। কিছু লেখা মানেই বিতর্ক, এটা কখনও যদিও অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে, তবু ব্যক্তিগতভাবে মনে করি লেখার সময় লেখকের (বিশেষত কোলকাতাপ্রেমী লেখকের) বক্তব্য সবসময় বাহুল্য-বর্জিত এবং অর্বাচীনতা মুক্ত হওয়া উচিত। তা যদি না হয়, তবে লেখাটি মাঠে মারা যায়, লেখক হারায় তার পারিশ্রমিক তথা সম্মান।

আমরা যারা মফস্বলের অতি নিম্নমানের কবি-লেখক অথবা সাহিত্য-পাঠক, তারাও মুক্তচিন্তা করি, তবে চিন্তার সময় আমাদের উত্তরীয় মাটিতে ছুঁয়ে থাকে। কারণ, এখানে কিছু ছুঁতে গেলে আগে মাটিকেই ছুঁতে হয়, কংক্রীট নয়। সেই মুক্তচিন্তা করতে গিয়ে আমরা মাঝেমধ্যে অবসন্ন হই, কিন্তু কখনও ভেঙে পড়ি না। এবং সেই প্রেক্ষাপটে কতকগুলি সত্য আমাদের কাছে ধরা পড়ে, যেমন—

(১) মফস্বলের কবি/লেখক ও প্রতিবেশী বৌদি :

এটা সত্যি যে মফস্বল শব্দটার শরীরেই জড়িয়ে কেমন মেঠো, অশিক্ষা, অজ্ঞানতা ইত্যাদির গন্ধ। এখানকার মানুষ মুক্ত আকাশ রং-এর ফুলশার্ট পরে কব্জির বোতাম আঁটে, নগর কোলকাতায় যেখানে সেখানে বিদেশী গেঞ্জী (যা অসৎ উপায়ে আনা ফুটপাতের দরাদরির সামগ্রী) ও ঘড়ি। সুতরাং তফাৎ থাকতে বাধ্য। এখানকার বৌদিরা স্বভাবত ভীরু এবং লজ্জাতুরা। তাদের অনেকেরই শিক্ষা কম। কারও বা নেই। তারা বড়জোর শরৎচন্দ্র-তার বেশী নয়। কবিতা বোলতে বোঝে রবীন্দ্রনাথ (দু'চারটে)। জীবনানন্দের মায়ের লেখা পদ্য বা ছড়া মুখস্থ, কিন্তু জীবনানন্দের নাম হয়ত অনেকেই জানে না—এমন অন্ধকার এখানে। সেই অন্ধকারের মধ্যে কুলবধূ, পোষা বিড়ালের মত নতমুখী বৌদিরা যাদের স্নানের ঘাট থেকে রান্নাঘর, এবং শোবার ঘর-এইটুকু পৃথিবী, যারা পড়শীর গর্বের টেলিভিশনে বাংলাছবির (তাও প্রায়ই বস্তাপচা) দেখতে যাবার আগে স্থূল স্বামী বা জটিল শাশুড়ীর পরামর্শ বা অনুমতি নেয় তারাই পাড়াতুত তথাকথিত কবি লেখকদের (যা আবার সচরাচর মেলে না) সঙ্গে বসে গল্পের ছলে তাদের পদ্য শুনবে—এ ধারণা করা এক নিকৃষ্ট বোকামি। অপরদিকে একবার কোলকাতার কথা ভাবুন। সেখানকার বৌদিরা কত স্মার্ট, কালচারড্। তাদের একটা কালচারাল এবিলিটি আছে। এবং সেই এবিলিটি যোগায় কোলকাতার

অণু-পরমাণু। ধোয়া, ধুলো এবং ঐতিহ্যবাহী কর্পোরেশন থেকে শুরু করে নয়া সন্তান 'যুবভারতী' ক্রীড়াঙ্গন পর্যন্ত তাদের মধ্যে প্রেরণা তথা শিক্ষার খাঁটি দুধ যোগায়। তাই তাদের কবিতা পড়তে, বুঝতে, শুনতে অসুবিধে হয় না। কোলকাতার কবিদের সুবিধে এইখানে। তাদের বৌদিরা চায়ের কাপ নামানোর সঙ্গে খসিয়ে ছায় অবিন্যস্ত হাসির বিদ্যুৎ যার মধ্যে দিয়ে কবিদের মনে জেগে ওঠে বিন্যস্ত শব্দবাহী পদ্যর পংক্তি। সেই সব মধ্যদিনের সূর্যের মত বিদগ্ধা, গার্গী-মনস্কা, পালতোলা নৌকার মত মৃদু ও মায়াময় সঞ্চরণশীলা রমণী মফস্বলে দুর্লভ, তাই এখানকার অ-কবিরা তাদের অ-কবিতা শোনাবার মত রমণী পায় না। আর এটাই হয়ত সঠিক, কবিতা বিচারের মাপকাঠি হল রমণীয় হাততালি ও সোহাগ। নাহলে, কালিদাসের প্রতিষ্ঠা হোত না। এক্ষেত্রে হয়ত সহজাত প্রতিভা, নিষ্ঠা, শ্রম, আসক্তি—এসব মিথ্যা। একজন সত্যিকারের লেখক/কবি সৃষ্টির পিছনে অন্যান্য প্রেরণাগুলি অকিঞ্চিৎকর! সেজন্যই গ্রামীণ বা মফস্বলীয় মহিলাদের কোন কোলকাতীয় পুরুষ জোটে না! কারণ, ইদানীং বোধকরি কোলকাতার সব বরাহ পুরুষও সেখানকার খনা রমণীদের মত বোদ্ধা হয়েছেন, কবি ত তাঁরা জন্ম থেকেই!

(২) মফস্বলের লেখক/কবি ও তার ম্যাগাজিন :

মফস্বলের কবি লেখকরা কাগজ করতে জানে না। নাকি, তাদের প্রেসগুলির এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞতাই দায়ী? তাদেরও হয়ত দোষ নেই, একই টাইপ (মূলত 'পাইকা') বছরের পর বছর চালাতে বাধ্য হয়, কারণ তাদের পুঁজি কম, খদ্দেরেরও একই হাল। বছরের প্রায় সব সময় তারা 'রেশন সপের,' পুজোর ইত্যাদি বিলবই, এবং কতিপয় স্কুলের প্রশ্নপত্র ছাপে। তারজন্য তাদের নান্দনিক জ্ঞানের উন্মোচন হয় না। ফলত, মফস্বলের পত্রিকাগুলির শরীরে তেমন চটক থাকে না। অর্থের ব্যাপারটা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু এ কথা কি সত্যি যে, মফস্বলের হাজার পত্র পত্রিকার সবই খুব নিচুমানের? চেহারার চটকই সব? ভেতরের বারুদ কি বিবেচনার বাইরে? তা যদি সত্যি হয় তবে কোলকাতা তোমাকে হাজার আদাব! কারণ তোমারই বুকের রক্তচোষা অধিকাংশ অবিমিশ্রকারী কবি/লেখক পুষ্ট হয়েই এইসব পত্র/পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'অবিমিশ্রকারী' শব্দটি প্রয়োগে বাধ্য হলুম এইজন্য যে, এখানে একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাহল, যেসব পদ্য/গদ্যকার (কোলকাতার) লেখা দিয়ে মফস্বলের সম্পাদকদের সম্মানিত করেন, তাঁরা তাঁদের ভালো লেখাটি গোপন করেন ইচ্ছাকৃতভাবে। এক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে সেই চিরদিনের মিথ্যাচারই প্রকাশ পায়, এবং 'মফস্বলের সম্পাদকরা পত্রিকা করতে জানে না'—নগর মনস্ক কবি/লেখকদের এই অপরিণত প্রচারকেই পুষ্ঠ করে। বোধহয় তাঁরা ইচ্ছাকৃত ভাবে এই বিকৃত পন্থা নিয়ে থাকেন।

তাহলে ভালো কাগজ বেরুবে কি করে? তবু ত বেরুচ্ছে। মফস্বলের আমার জানা অন্তত এক'শটি পত্র/পত্রিকা যাদের বয়স পাঁচ-দশ-বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ এবং নিয়মিত। এযাবৎ-কাল তারা বহুমূল্যবান লেখা ছেপেছে, যা হয়ত কোলকাতার কবিরা "মলমুত্রবৎ" মনে করে উল্টে দ্যাখেনি। অথবা অপ্রয়োজনীয় কাগজ ভেবে, সেই পত্রিকার ওপরেই নোনতা রেখে নেশা করেছে। এইরকম সামাজিকতা নিয়ে, সাহিত্য-দরদ নিয়ে মফস্বলের [illegible] সাহিত্য করে না। তারা কোলকাতাকে যথে[illegible] ও সম্মান করেই চলে। কিন্তু তবু তাদের [illegible] তা [illegible] দিয়ে সামান্য ঘোমটা সরে যায়, তাহলে কে[illegible] অভ্যু[illegible] চণ্ডীমণ্ডপে বসে থাকা সাহিত্য-সমাজসেবী[illegible] তে পা[illegible] হায় হায় ওঠে। হতেই পারে, কারণ তারা আদি [illegible] নেই-[illegible]।

(৩) মফস্বলের কবি/লেখক ও তার সাহিত্যের আড্ডা ঃ

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভালো লিখতে গেলে ভালো আড্ডা চাই। মফস্বলে এটা কম। কিন্তু একেবারে নেই তা নয়। আছে। আর যে আড্ডাগুলি জমে তা যে একান্ত ভেড়ার গোয়াল হয়ে ওঠে মুষ্টিমেয় অপরিণত বুদ্ধির লেখকদের 'ব্যাক ডেটেড্' লেখা দিয়ে তাও নয়। আসলে যেমন প্রচলন আছে (বিশেষত কোলকাতায়) (১) মফস্বলের পত্র/পত্রিকা পড়ার অযোগ্য (২) মফস্বলের লেখকরা অযোগ্য (৩) ওদের পড়াশুনা নেই ইত্যাদি। এটাও ঠিক সেইরকম এক অতিরঞ্জিত এ্যালবার্ট-হলিয় তথা কফি হাউসিয় প্রচার। তাছাড়া কি বলব? নিজের কোলো ঝোল টানার দরকার নেই, প্রমাণ দিলেই কথাটা পরিষ্কার হয়। যেমন, 'গোধূলিমন' পত্রিকার সম্পাদককে শ্রেষ্ঠ পত্রিকা সম্পাদনার জন্য কোলকাতায় পুরস্কার-প্রদান, তাঁরই পত্রিকার প্রচ্ছদ শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেল এ বছরই সরকারীভাবে। পত্রিকাটি কিন্তু কোলকাতার নয়। তাহলে? উদাহরণটি খুব তাজা বলেই লিখলাম। তবে অপ্রয়োজনীয় নয়। এবার আসুন আড্ডার কথায়। আমরা যারা আড্ডার ব্যবস্থা করি, মজলিশ বসাই তাতে যাঁরা আসেন, তাঁরা কোনও বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা করতে পারেন না- এমন কখনও দেখিনি। হতে পারে আমাদের পড়াশুনার পরিধী কম বলেই তাঁরা 'বনদেশে' শেয়াল রাজা বনে যান। অথচ [illegible] মফস্বলেরই বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত, অর্ধ-প্রতিষ্ঠিত [illegible] প্রতিভাবান (সবই কোলকাতার বিচারে) যারা [illegible] কোলকাতার তাবড় মননশীল, পরিমার্জিত, [illegible] লেখক [illegible] বিখ্যাত পত্র/পত্রিকায় অনেক দিন লি[illegible] [illegible]দের মধ্যে অনেকেই সেই আড্ডায় জমেন। [illegible] [illegible]মে। একটু চেষ্টা করলে উন্নাসিক কোলকাতাবাসী কবি/লেখকরা এইসব আড্ডাতে জমতে পারেন। আর তাঁরা তাঁদের অচলায়তনীয় মতবাদের একটা পরীক্ষা নিতে পারেন, যাচাই করতে পারেন। তা না করে শুধুমাত্র নিজস্ব মনগড়া কাহিনীভিত্তিক মতবাদ প্রচার একধরণের কমপ্লেক্স। হীনমন্যতা। এই মফস্বলেই কোথাও কোথাও কেবল পদ্য পাটির আসর বসে (গল্পমেলা) যেখানে পড়ার চেয়ে আলোচনাই বেশী হয়, চুল-চেরা বিশ্লেষণ চলে। শুধুমাত্র লেখকরা নয়, বোদ্ধা পাঠকরাও যোগ দ্যায়। এবং সেখানে কখনও কখনও দ্যাখা গেছে যে সত্যিই লেখকদের থেকে পাঠকরা অনেক পরিশীলিত! এই মফস্বলের এমন জায়গা আছে যেখানে নিয়মিত আড্ডা বসে। আসল কথা হল, তারা যতই নিজেদের নিয়ে মাজা-ঘষা করুক, কাটুক-ছিঁড়ুক, বাছুক, বাদদিক- তাদের পিছনে যে ষ্ট্যাম্প! "ওরা অপরিণত"। তাই এখানের প্রতিটি পত্রিকা ও তার আড্ডা কোলকাতা-কবিদের। হাইপথিক্যাল' চিন্তায় ও বিশ্লেষণে সর্বদাই পিছিয়ে। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে বইমেলায় কোলকাতার লিটিল ম্যাগাজিন কেন অন্তরালে চলে যায়? তাদের একটু জায়গার জন্যে লড়াই করতে হবে কেন? আমরাও মাঝেমধ্যে কোলকাতার আড্ডায় যাই (যখন কোলকাতা করুণা করে ডাকেন) তখন সেখানেও আলোচনার মধ্যে, লেখার মধ্যে তেমন কোনও বুদ্ধিদীপ্ততা দেখিনা, যা মনে রাখার মত! কারণ আমরা সবাই একই স্রোতের নৌকো, কি করে একজন অন্যজনের থেকে দ্রুতগতি পাবে? আসলে কোলকাতা কখনও মনে রাখেনা যে একজন মানুষ শুধুমাত্র হৃদপিণ্ড নিয়েই বাঁচে না, তার চাই বাতাস ও রক্ত। কোলকাতাকে সেইটুকু দ্যায় মফস্বল। আমরা যদি তাকে হাতি উপহার দিই, তারা আমাদের দেয় আলপিন্।

(৪) মফস্বলের কবি/লেখক, তার শাক-কলমী ও কোলকাতার আধুনিকতা।

কথাটা সত্যি যে কোলকাতার রাস্তায় সত্যজিত রায় হাঁটেন। একসময় রবীন্দ্রনাথও হেঁটেছিলেন। কিন্তু পাঠক, আপনার মনে পড়ে সত্যজিত রায়ের প্রথম ছবিটির কথা? সেই কাহিনীর লেখক কে? যেখানে শাক-কলমীর, মরা ব্যাঙ্, বাস্তু সাপ, ঝুনো নারকোলের একটা মস্তবড় ভূমিকা ছিলো। এতদ্-সত্বেও ছবিটি কিন্তু এখনও আধুনিকতার মর্যাদা পায়, ভবিষ্যতেও পাবে। তারপর তাঁরই 'অশনি সংকেত'? সেখানেও শাক-কলমী, ফড়িং-প্রজাপতির ভূমিকা ছবিটির চরিত্রের, তার সূক্ষ্ম উপস্থাপনার মাধ্যম হিসেবে। এইসব চিত্রগুলি কখনও কিন্তু আমাদের জবুথুবু করেনা, বরং মেরুদণ্ড টান টান করে তোলে। আর ছবিগুলির ঐগুলি প্রাণ হলেও এখনও আধুনিক। একটা মানুষকে চোখে দেখে ইলিউশন ভেঙে যেতে পারে? নাকি তার সৃষ্টি মানুষের ইলিউশন ভাঙতে সাহায্য করে? তাহলে, লেলিন, মার্কস, মাও-এঁদের দেখলেই সবাই কম্যুনিষ্ঠ হয়ে যেত। আমাদের দেশেও গান্ধীবাদ প্রতিষ্ঠিত হোত। হয়নি।

আজকাল 'আধুনিক' শব্দটাই দেখছি বেশ সস্তা হয়েছে। এবং সাম্প্রতিক সাহিত্য সেই তকমা এঁটে বাজার মাত করতে চাইছে। এখনকার সব লেখাই যেমন আধুনিক নয়, কোলকাতা দাবী করলেও নয়, তেমনি সব পুরোণ লেখা পুরাতনী নয়। এখনকার কমল চক্রবর্ত্তী যদি আধুনিক হন, তাহলে কালিদাসকে পুরোন বলব কি করে? অর্থাৎ কালিদাসও কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন আধুনিক তেমনি আমরাও। আধুনিক শব্দটি দাবী করার আগে আত্মসমীক্ষা করতে হবে যে, আমরা বাংলা গদ্য/পদ্যকে কতগুলি নতুন শব্দ উপহার দিতে পেরেছি। কোলকাতার কবিদের মধ্যেও ত দেখি অতিকথন, জাবরকাটা এবং নষ্টামি। সেই নষ্টামি শব্দের জালিয়াতি যদি আধুনিকতার মাপ-কাঠি হয়, তাহলে কিছু বলার নেই। কারণ, আমা-দের কফিহাউস নেই, যু বা মিউজিয়ম, সংস্কৃতি মেলা, ডগ শো, বায়ুদূষণ, বেশ্যালয়—ইত্যাদি শব্দ আহরণীয় কোন 'শব্দডাক' নেই। তাই আমরা পুরাণ শব্দকেই মেজে ঘষে দেখি এবং সেহেতু আমরা বোধহয় অচল।

তবে এটা সত্যি আমাদের পড়াশুনার সুযোগ কম। ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী একটাই। আর ঐ একটি জায়গা ছাড়া ত পড়াশুনার অন্য স্থান নেই! কিন্তু জানতে বড় সাধ হয়, তাত্বিক জ্ঞানই কি সেরা লেখক হওয়ার রসদ? অভিজ্ঞতার বিচারে বলা যায় কথাটার আশিভাগ সত্যি নয়। ভালো বই আমাদের বুদ্ধিকে শাণিত করে, চেতনাকে মার্জিত করে সত্যি, কিন্তু পঠন অভ্যাস যদি কারও থাকে তাহলে সে পড়বেই, এবং সে লেখক হোক বা না হোক। পরিষ্কার করে বলা ভালো-একজন কবি/লেখক, উক্ত পর্য্যায়ে যাবার আগে কি কেবল বই পড়ে কাটাবে, যা সে কবি/লেখক বলে সামান্য স্বীকৃতি পেয়ে তার মূল্যবান পড়াশুনা শুরু করবে? কালিদাস, এ্যারিস্টটল, সেক্সপীয়র থেকে শুরু করে আজকের নূনতম দীপ্ত কবিটির পড়াশুনা কিরকম তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই কি? আসলে কবির জ্ঞানের মাপকাঠি হল তার অর্জিত অভিজ্ঞতা। আর মফস্বলে সেটা কি একেবারেই দুষ্প্রাপ্য? এখানেও ত দেখি, প্রচণ্ড শীতে বছর চারেকের শিশু সাতসকালে পান্তা নিয়ে বসে, কুমারী কিশোরী রক্তাক্ত হয় অন্ধকারে বা দিনের আলোয়, সমগ্র পরিবার খুন হয়ে যায়। নবজাতক শুয়ে থাকে মাঠের আলে, পিঁপড়ে কুরে খায় তার কচি আঙুল, মৃত সন্তানকে বুকের দুধ দিতে চায় অভুক্তা মাতা। এইসব কি কারও ইলিউশন ভেঙে দিতে পারে না! তবে কোলকাতার মত বিচিত্রতা তার নেই-সত্যি। কিন্তু সেটুকু নিয়ে

কোলকাতা কতদিন। আমাদেরও স্থূলবুদ্ধি মাঝেমধ্যে আচ্ছন্ন হয়, যখন দেখি, দক্ষিণ ভারতের বা পাশ্চাত্যের কিছু অপরিচ্ছন্ন, অনিয়ন্ত্রিত ছবি কোলকাতার বোদ্ধা জনগণ গোগ্রাসে খায়, অন্য দিকে গর্বের সত্যজিত, মৃণাল, গৌতম, বুদ্ধদেব, উৎপলেন্দু, তেণ্ডুলকর হন্যে হয়ে ঘোরে তাদের ছবির ছাড়পত্রের এবং হল মালিকের করুণার জন্যে। তাও মাত্র একটি কি দুটি এবং ২/৩ সপ্তাহের চুক্তি। তাঁদের বইগুলি কি বুদ্ধিদীপ্ত নয়। আবার ঐ কোলকাতাই কত নিম্নমানের ছবি করছে দেখুন। কেন বইমেলা তার প্রাতিস্বিক চরিত্র হারিয়ে এখন কোলকাতার 'ললিপপ' মেয়েদের এবং সগোত্র ছেলেদের বিনোদনের স্থান? কেনই বা কেউ কেউ লিটিল-ম্যাগাজিনের ধুয়ো তুলে সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় বোতল খোলে অথবা পুরিয়া? ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চত্বরে প্রকাশ্যে আজ পর্যন্ত যত চুমু খাওয়া হয়েছে তার শব্দ রেকর্ড করলে '৭৮ সালের ঐতিহাসিক বৃষ্টির শব্দকেও হার মানাত। ইত্যাদি ঘটনার প্রেক্ষাপটে কি করে বলি কোলকাতার মানুষের মাথায় চবি কৈশোরেই, আর গ্রাম কেবল কি কোলকাতার পাপ আর তুচ্ছতাই নেয়? তাহলে মফস্বল থেকে এতো কবি/লেখক নিজেদের পায়ের তলার মাটি কোলকাতায় খুঁজে পাচ্ছে কি করে? আজ পর্যন্ত কোলকাতার মাটি/জলে তৈরী ক'জন কবি/লেখক বাংলা সাহিত্যকে শাসন করেছে? বা করছে?

ইত্যকার প্রশ্নের পরেও আরও কতকগুলি সত্য স্বীকার করতে হয়, যেমন—(এক) মফস্বলের কবি/লেখকরা কিছুটা শ্রম বিমুখ (দুই) তাদের লেখায় জৌলুস বা চাতুর্য্য কম (তিন) তারা প্রতিষ্ঠা-লোভী নয় (চার) পড়াশুনায় ব্যাপ্তি কম, বিশেষত টেবিল চাপড়ে কাম্যু-কাফ্‌কার কোটেশন বমন করতে পারে না (পাঁচ) তাদের জন্য সত্যিকারের সাহিত্য-শিক্ষক বা অভিভাবকের অভাব (ছয়) মফস্বলের ম্যাগাজিন কিছু কিছু অপরিণত/অপরিচ্ছন্ন ইত্যাদি। এজন্য আমরা কোলকাতাকে সমীহ ও শ্রদ্ধা করি। তাদের প্রাণস্পন্দনকে ছুঁতে চাই, সেই মুক্ত-মানসিকতা আমাদের আছে। সত্যি, কোলকাতা না'লে আমাদের চলে না, কারণ সে পীঠস্থান।

এরকম মুক্তকণ্ঠ আমাদের। বিতর্কিত লেখা লেখকের একধরণের প্রচারে সাহায্য করে ঠিকই, সেইসঙ্গে সস্তাও করে। এক্ষেত্রে প্রমান হয়, লেখক যতখানি 'ধনুর্ধর', তার বেশী ধুরন্ধর! সে অর্জুন না হোক, শ্রীকৃষ্ণ ত বটেই! পরিশেষে একটা কথা বলি, সাহিত্যকে কখনও ভৌগলিক সীমাবদ্ধতায় আটকানো যায়? উত্তরবঙ্গ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলাগুলি কোলকাতার অনেক দূরে, কিন্তু সেখানকার কবি/লেখকরা আধুনিক সাহিত্যের পসরা নিয়ে কি করে কোলকাতার সিংহদুয়ারে লাথি মারছে?

প্রায় ১৭/১৮ বছর আগে আমার এক মফস্বলীয় অ-কবি বন্ধু তার একটি "অ-কবিতায় লিখেছিলো—কাব্য ত নয় দাঁত-ভাঙা বুড়ো। বিধবা সে হতে পারে। ভূগোলে ত নয় ইতিহাসে ব্যাপ্তি/চিন্তায় চুপিসারে"। তা ক্রমাগত কংক্রীট কামড়ে এখন কোলকাতার কাব্য কি সেই দাঁত-ভাঙা বুড়োর অবস্থায় পৌঁছয় নি? ইতিহাস বলবেই, কারণ সেই-ই একমাত্র সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ বিচারক। চলুন, তার কাঠগড়ায় দাঁড়ান যাক। ●

পুস্তক সমীক্ষা

শেষ প্রহরের মুহূর্তে ও নবজীবনের গান

O সমীরণ মুখোপাধ্যায়

জটিল সমস্যায় জর্জরিত পৃথিবী। প্রাকৃতিক বিপর্যয় তো আছেই তারপর আবার অন্য সংকেত। সে সংকেত তুষার যুগের। যে যুগ বয়ে আনবে চরম বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা আর অনিয়ম, গাণিতিক হিসেবে এর সমস্যার জটিলতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয় তবু চলছে হিসেব নিকেশ।

টেলিস্কোপের দৃশ্যপটে ফুটে ওঠা আলোকবিন্দু অথবা দুর্যোগের অস্পষ্ট ছায়াছবি ক্রমশঃ বর্ধমান তবুও খুঁটি আঁকড়ে পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ নেওয়ার যে তীব্র আকাঙ্খা তার যেন সমাপ্তি নেই।

দেবব্রত দাশ বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ খুব মুন্সীয়ানার সঙ্গে স্বচ্ছ সাবলীল ভঙ্গীমায় উচ্চারণ করতে পারেন। এ কাহিনীও তার ব্যতিক্রম নয়, ধূমকেতু আর পৃথিবীর আর্তনাদের উপাখ্যান। তবু একথা বলা যায় চরিত্র চিত্রণের গভীরতা রয়েছে লেখায়। বিশেষ করে অধ্যাপক শঙ্খনীল চৌধুরীর অসামান্য চরিত্রটি নিঁখুত তুলিতে দৃশ্যমান।

গোটা সভ্যদুনিয়ার কাছে যে সঙ্কটময় পরিবেশ তার থেকে যে কারোর রেহাই নেই এই আগাম বার্তাটুকুই বয়ে এনেছে গ্রন্থটি। তবে শঙ্কা, দুশ্চিন্তার চেয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে, যথার্থ যুক্তিতে বাঁচার গীতটুকুকে কোথাও অস্বীকার করা হয়নি, এখানেই লেখকের সাফল্য, কাহিনী কোথাও গতিময়তাকে রুদ্ধ করেনি। তবে আবেগ প্রবণতাকে আরো থামিয়ে রাখার দরকার ছিল।

ছাপাখানার ভূত-পেত্নী গ্রন্থে একেবারেই দুর্লভ, এজন্য ধন্যবাদ, প্রচ্ছদ সাদাসিধে হয়েও বিষয়টিকে মূর্ত করছে।

পৃথিবীর শেষ প্রহর

দেবব্রত দাশ

প্রাপ্তিস্থান :
রামকৃষ্ণ আর্ট প্রেস,
চন্দননগর, হুগলী,
দশ টাকা

সংবাদ

○ সংবাদ, সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্র

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

জনস্বার্থে সংবাদপত্রের কর্মকান্ড নিয়োজিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা সংবাদপত্র মানবজীবনের দর্পণ। তাতেই প্রতিফলিত হয় বিভিন্ন ঘটনা ও তার বিশ্লেষণ--হুগলী জিলা পরিষদ ভবনে রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং জেলা তথ্য দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বৃহস্পতিবার (১৫ মে) সংবাদ, সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্র শীর্ষক এক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে একথা বলেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী প্রভাস ফদিকার। চক্রে পৌরহিত্য করেন হুগলী জিলা পরিষদের সভাধিপতি শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

তথ্যমন্ত্রী শ্রী ফদিকার ঘোষণা করেন, আলোচনাচক্রে উপস্থিত সাংবাদিক ও ছোট পত্রিকার সম্পাদকরা বিষয়বস্তুর ওপর বক্তব্য রাখুন। এতে পারস্পরিক চিন্তা-ভাবনা ফুটে উঠবে।

জিলা পরিষদ সদস্য অধ্যাপক সলিল ভট্টাচার্য সংবাদ ও সংবাদপত্রের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে আধুনিক সাংবাদিকতা কিভাবে এগোচ্ছে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন।

প্রাবন্ধিক কৃষ্ণধন গঙ্গোপাধ্যায় দূরদর্শন ও তার প্রভাব সম্পর্কে সজাগ করে দেন।

ছোট সংবাদপত্রের গুরুত্ব ও কয়েকটি জরুরী সমস্যার ওপর সুচিন্তিত আলোকপাত করেন হুগলী জেলা পত্র-পত্রিকা সম্পাদক সমিতির পক্ষে কৃষ্ণচন্দ্র ভড়, শিবরাম কুণ্ডু, মনজুর মল্লিক, পারুল ভট্টাচার্য। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের দায়িত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

আলোচনাচক্রে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আশুতোষ মুখার্জী, অতিরিক্ত জেলাশাসক দীপক সান্যাল, গ্রামীণ তথ্য বিভাগের উপ-অধিকর্তা কৃষ্ণেন্দু সান্যাল, জেলা তথ্য আধিকারিক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহকুমা তথ্য আধিকারিক শান্তনু দত্ত চৌধুরী, বিভূতিভূষণ রায়, দুলাল মজুমদার ও দিলীপ মুখার্জী। ●

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

○ বহুদিন আপনার কাছে কোন চিঠি লিখিনি—সেজন্য সামান্য অপরাধ বোধ জাগে। আপনাকে বহু সাহিত্য প্রেমীক ও সাহিত্যিকই চিঠি দেন সেজন্য আপনার টেবিলে চিঠি কম এলেই সম্পাদকীয় কাজে বেশি মন দিতে পারেন বলে মনে হয়। তবুও "চিঠির সাহিত্য (? সাহিত্যে) ধরা দেয় লেখকের কাছ-ঘেঁষা জগতের দৈনিক ছায়া প্রতিচ্ছায়া, ধ্বনি প্রতিধ্বনি, তার ক্ষণিক হাওয়ার মর্জি, আর তার সঙ্গে প্রধানত মিলিয়ে থাকে সদ্য প্রত্যক্ষ সংসার পথের চলতি ঘটনা নিয়ে আলাপ প্রতিলাপ" (ভূমিকা, লাইন ১৩-১৬, পথে ও পথের প্রান্তে, রবীন্দ্রনাথ) অবশ্য আমার মতন সীমাবদ্ধ-মন ও জগৎ এর লেখকদের চিঠি সম্বন্ধে ওপরের উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিকময়।

প্রথমেই জানাই গল্প সংখ্যার প্রাপ্তির কথা। এর আগে "জাঁ-পল-সাত্রে" সংখ্যার জন্য অভিনন্দন।

দ্বিতীয়তঃ একটি প্রশ্ন। আমার স্বগ্রামের বিখ্যাত শিল্প-ঐতিহাসিক পণ্ডিচারীর ৺শিশিরকুমার মিত্রের একটি ইংরেজী লেখার অনুবাদ আমি করছি "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কিছু স্মৃতি"। আমার অনুবাদ কেমন হয়েছে সে বিচার আপনার কিন্তু প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিভিন্নদিক নিয়ে স্বল্প-পরিসরে যে সুন্দর আলোচনা আছে তা মূল্যবান। শিশিরকুমার আট বছর শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাটিয়ে শ্রীঅরবিন্দের কাছে চলে যান। যাই হোক অনুবাদ প্রবন্ধটি কিছুদীর্ঘ প্রায় ১২/১৩ পৃষ্ঠা। আপনি যদি অনুমতি দেন তো আমি পাণ্ডুলিপিটি আপনার কাছে পাঠাতে পারি।

জ্যোতির্ময় বসু
ফ্ল্যাট নং—২, ব্লক-ডি
৮১, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৭০০০৩৭

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

০ আপনার সম্পাদিত 'গোধূলি-মন'-এর একটি সৌজন্য সংখ্যা পেলাম সম্প্রতি পেয়ে, পাতা উল্টে, আপনার সম্পাদকীয় ও আরও কয়েকটি রচনা পড়ে অন্যান্য লিটল্ ম্যাগাজিনের সঙ্গে এর নান্দনিক ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন পার্থক্য লক্ষ্য করে ভালো লাগলো। আজকের অবক্ষয়ে আত্মসমর্পিত সবকিছুর বিচার করে সহজেই বুঝতে পারি, উচ্চমান তো দূরের কথা, চলনসই স্ট্যাণ্ডার্ডের মাসিক সাহিত্যপত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করে যাওয়ার ব্রত কতো কঠিন।

বিরাম মুখোপাধ্যায়

ডিসি ৯/৪ শাস্ত্রীবাগান
(ফ্যাসিং ভি, আই, পি, রোড)
পো: অ: দেশবন্ধুনগর
কোলকাতা-৭০০ ০৫৯

Member all India Small & Medium News Paper Association, Delhi.
GODHULI–MONE N. P. Regd. No. RN. 27214/75 MAY '86 (জ্যৈষ্ঠ '৯৩)
Vol. 28, No. 5 Postal Regd. No. Hys–14 Price—Rs. 2·00 only

"আমি পৃথিবীর কবি

"....আমি এসেছি এই পৃথিবীর তীর্থে, আমার পথ আমার তীর্থ দেবতার বেদীর কাছে। মানুষের দেবতাকে স্বীকার করে এবং প্রণাম করে যাব, আমার জীবনদেবতা আমাকে সেই মন্ত্র দিয়েছেন। যখন আমি সেই দেবতার নির্মাল্য ললাটে প'রে যাই তখন সব জাতের লোকই আমাকে ডেকে আসন দেয়, আমার কথা মন দিয়ে শোনে। যখন ভারতবর্ষীয়ের মুখোস পরে দাঁড়াই তখন বাধা বিস্তর। যখন আমাকে এরা মানুষরূপে দেখে তখনই এরা আমাকে ভারতবর্ষীয়রূপেই শ্রদ্ধা করে, যখন নিছক ভারতবর্ষীয়রূপে দেখা দিতে চাই তখন এরা আমাকে মানুষরূপে সমাদর করতে পারে না।....আমার পৃথিবীর মেয়াদ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে ; অতএব আমাকে সত্য হবার চেষ্টা করতে হবে, প্রিয় হবার নয়।"

(৪ অক্টোবর, ১৯৩০, রাশিয়ার চিঠি)

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মজয়ন্তীতে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক সংখ্যা ২০২১(১৫) এইচ ডি/আই সি এ তাং ৫/৫/৮৬

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পপুলার প্রিন্টার্স, বারাসত, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও নতুনপাড়া, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।
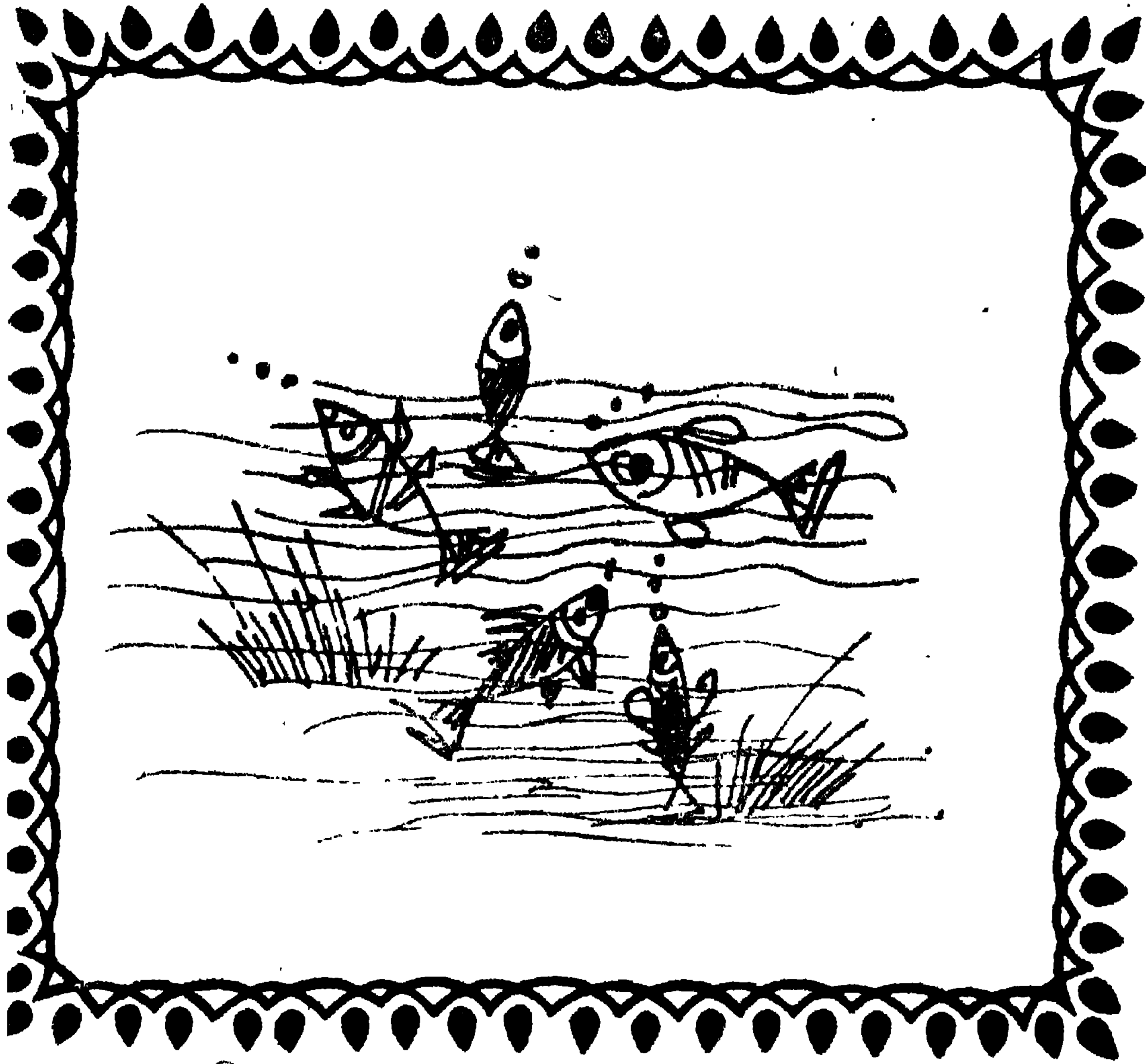
গোধূলি মন

আষাঢ়/১৩৯৩ সংখ্যা

O প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন O

O এক বিশেষ সূত্রে 'গোধূলি-মন' আমার কাছে আসে এবং বিগত পাঁচ বছর ধরে আমি এর নিয়মিত পাঠিকা। লিটল ম্যাগাজিনের সব ক'টি শর্ত পূরণ করে বলেই গোধূলি-মন আমার কাছে অদ্বিতীয় প্রিয় পত্রিকা। আজকের চিঠির কারণ অবশ্য এর প্রবন্ধ বিভাগ এবং নির্দ্বিধায় স্বীকার করবো, এই বিভাগটির জন্যেই আমি পাগল ব'নে গেছি। গোধূলি-মনই একমাত্র কাগজ, যার প্রবন্ধগুলি আমাকে ভাবায়, চিন্তা করায় আর শ্রদ্ধা কাড়ে। বলা বাহুল্য এই বিভাগের নব্বুই শতাংশ আকর্ষণ শ্রীঅজিত রায়। বর্তমান চিঠি সেই শ্রদ্ধারই প্রতিফলন। আপনার কাগজের এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার—অজিত রায়। বাঙালি পাঠকের কাছে তাঁকে টেনে আনার বারো আনা কৃতিত্ব আপনার এর জন্য সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাই।

হঠাৎ এমন দুম্ করে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে অঘটন ঘটবে কে সেটা আন্দাজ করতে পেরেছিল! মাত্র আশির দশকে যাঁর আবির্ভাব, তাঁরই সমকক্ষ বাঙালি গদ্যকার প্রবহমান কালে আর নেই—তিনিই "মরা গাঙে বান" আনলেন! "অদ্বিতীয়" কথাটিতে ঐতিহাসিক দিক থেকে আপত্তি হতে পারে কিন্তু তবু, আমার বিবেচনায়, বঙ্কিম থেকে আজ অবধি বাংলায় প্রবন্ধ যেভাবে বিবর্তিত, রূপান্তরিত হয়েছে, এবং আজ যে উপত্যকায় এসে ভিড়েছে —সেখানে দাঁড়িয়ে "আশির দশকের অন্যতম প্রধান গদ্যকার অজিত রায়" এমত ঘোষণা যে অতিশয়োক্তি নয়-সেটা বৈজ্ঞানিক যুক্তিতেই সকালে স্বীকার করবেন। বাংলা প্রবন্ধের চিরাচরিত জীর্ণ-শীর্ণ, শবদেহ চিতা আর নর্দমার চেয়ে পূতিগন্ধময় গঙ্গাপ্রবাহে বর্তমান সময়ে একমাত্র তিনিই টেনে-হিঁচড়ে "প্রাণ" নামক বস্তুটিকে খুঁজে আনতে পেরেছেন ভালবাসার তাগিদে—এটা বড়ো কথা।

এখন অজিত রায় নিঃসঙ্গ, অনন্য।

সমীপকালীন বা পূর্বসূরীদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ বা মলয় রায়চৌধুরীর প্রভাব কখনো কখনো এসে পড়লেও—তিনি স্বক্ষেত্রে অনন্য। তাঁর গদ্য তাঁর অলংকার—অহংকারও বটে। তাঁর প্রচ্ছদ বা অন্যান্য আঁকার মতোই তাঁর লেখা আবর্তনীয়। আমরা এবার তাঁর গল্প কি দেখতে পাবো না গোধূলি-মনের পাতায়?

যূথিকা দাশগুপ্ত
বাগনান, হাওড়া

O O O O

O আশা করি ভালো আছেন। দীর্ঘদিন পরে যোগাযোগ করছি। কার্তিক সংখ্যা গোধূলি-মনের পর বৈশাখ সংখ্যাটি বেশ কয়েকদিন আগে হস্তগত হয়েছে।

বৈশাখ সংখ্যার সম্পাদকীয়টি সময়োচিত এবং মুসলিম মহিলা বিলের বিরুদ্ধে মানবিক ধিক্কারের প্রতিফলন/সম্পাদকীয়তে এরকম বিশেষ ঘটনাগুলিকে জায়গা দেওয়া দরকার।

বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়
পোঃ—মটুকবনী, ভায়া—শালতোড়া
জেলা—বাঁকুড়া

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি

২৮ বর্ষ/ষষ্ঠ সংখ্যা

জুন/১৯৮৬

আষাঢ়/১৩৯৩

প্রতি সংখ্যা দুই টাকা
বার্ষিক সডাক কুড়ি টাকা

অশোক চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক
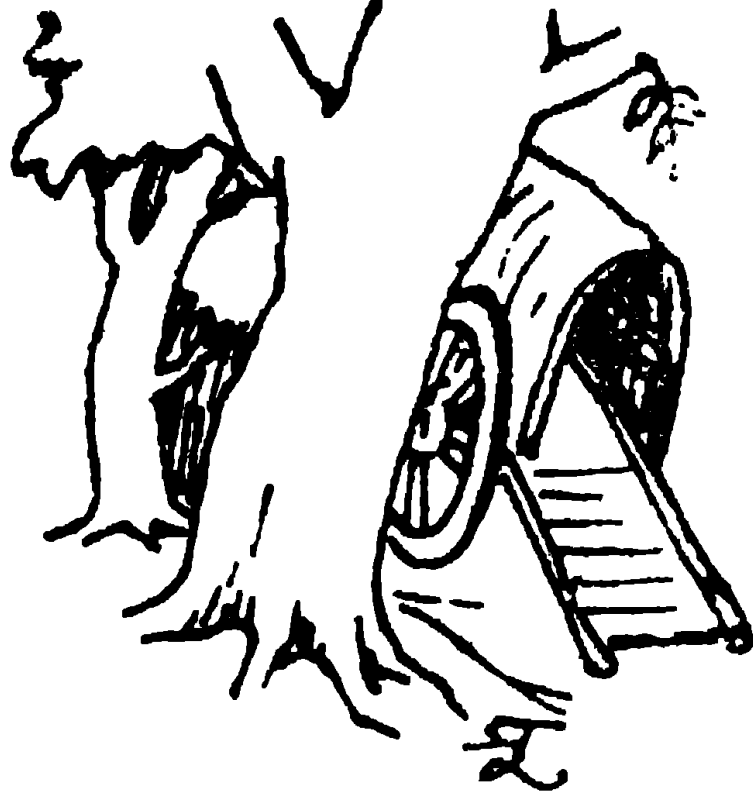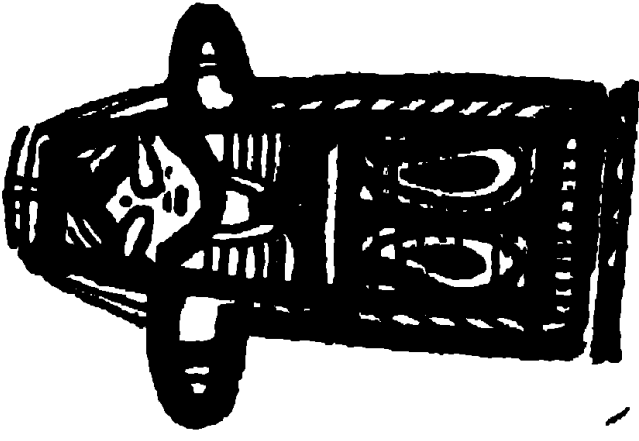
সম্পাদকীয়

প্রিয় পাঠক, ইতিপূর্বে বেশ কিছু দিন আগে এক সম্পাদকীয়তে যে সমস্ত গ্রাহকদের চাঁদা বাকী পড়েছে তাঁদের কাছে, আর যাঁদের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি বা খুবই স্বচ্ছল তাঁদের কাছে আবেদন রেখেছিলাম। 'পঞ্চমা' সম্পাদক তরুণ কবি সোফিওর রহমানও 'প্রসঙ্গ : গোধূলিমন' বিভাগে এক সুন্দর চিঠির মাধ্যমে একই আবেদন রেখেছিলেন। সে আবেদনে সাড়া যে আসেনি এমন নয়। বেশ কিছু গ্রাহক-চাঁদা এবং এককালীন সাহায্য পাওয়া গেছে। এমনকি অন্য ভাষাভাষী—যাঁরা বাংলা পড়তে জানেন, এমন কেউ কেউ সাহায্য পাঠিয়েছেন অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে।

কিন্তু সে সাহায্যের মিলিত আর্থিকমূল্য আমাদের যে কোন একটি সাধারণ সংখ্যা প্রকাশের খরচের এক ভগ্নাংশ মাত্র।

প্রিয় পাঠক, তাই পুনরায় আবেদন রাখছি আপনাদের মনস্ক মননের কাছে, সহৃদয় সহানুভূতিশীল সংরাগী হৃদয়ের কাছে।

কবিতা

কল্পর/ফারুক নওয়াজ

কিছুই দিতে পারিনি তোমাকে
ভ্যালভেট কিংবা কলাপাতি সিফন
সাতরঙা লিপিষ্টিক, মোহনীয় গোলাপ কুমকুম্
কান্তা-ইন্টিমেট, আকাশী জর্জেট ব্লাউজ, নিউ
মডেলের চপ্‌পল, ব্রেসলেট, মণিপুরী চুড়,
কিংবা খুব নামী-দামী রিষ্টওয়াচ
ওসব কিছুই দিতে পারিনি তোমাকে সুস্মিতা !
খুব সুন্দর মোজাইক ভালো বাসা ;
যার পাশেই শোভন ঝর্ণার রিম্‌ঝিম্। যেখানে
ফুলবনে প্রজাপতি আর পাখীদের কলস্বর।
এই সব সুষম প্রাপ্য থেকে রীতিমত বঞ্চিত তুমি !
সোনার ক্লীপ, কমলার খোশার মতো নাকফুল ;
জামরঙ টয়োটা, শেম্পু, হেয়ার স্প্রে, ম্যানোলা রুজ
এই সমস্ত বিলাসী দ্রব্য তোমাকে দিতে পারি নি।

তবু ও তুমি যা পেয়েছো সুচরিতা
সেই সব কোনো দিনই দিইনি কাউকে !
সেই সব গোপনীয় সুন্দর কাউকেই
দেবো না কখনো।
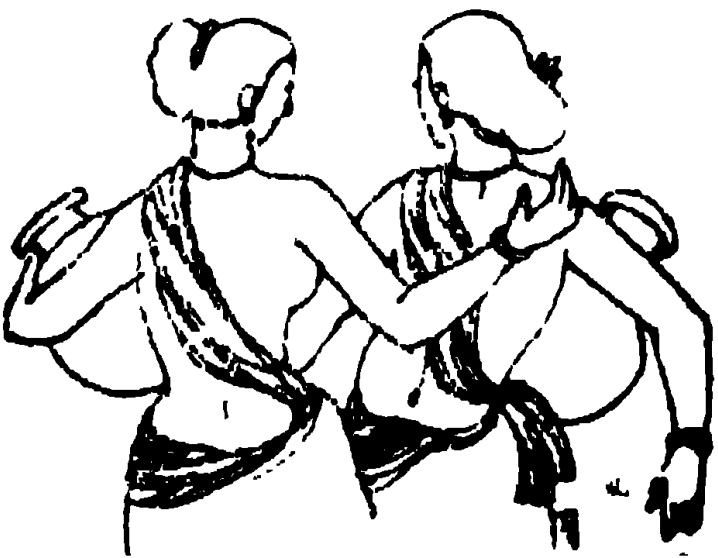
নতুন স্বপ্ন দেখাও আকাশ/ঈশিতা ভাদুড়ী

প্রতিদিন এক স্বপ্ন দেখে
আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি ;
আমার এই ক্লান্তি ঢেকে দাও আকাশ
সেই একরাশ ক্লান্তি।
যদিও সেই মুখ, সেই ছবিই
একদা প্রিয় ছিল, তবু আজ
আমাকে নতুন স্বপ্ন দেখাও।

ভীষণ প্রিয় ছবি ও একঘেয়ে
হয়ে যায় মাঝেমাঝে, তুমি জানো না ?

বুকের মধ্যে/মৃণালকান্তি মৃধা

বুকের সাগরে টালমাটাল ব্যথার তুফান
গহ্বরের ফাটল ধরে উঠছে ফেনা অহরহ
যাযাবর পাখির মতন পলাতক চোখে
নিগৃহীত বিভৎস যন্ত্রণা
কুয়াশার বন্দর হারিয়ে ফেলে ফেরারী নাবিক
বুকের মধ্যে তিরতিরে ভাসন্ত তড়িৎ
স্থাপকতাহীন
অলৌকিক অনুভূতি যার প্রকাশ কঠিন।

উলুবেড়িয়ান যুবকের সিগন্যাল/সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৫০)

কাল সারারাত তুমি ভয়ঙ্কর শব্দ নিয়ে বুকে
শরীরের সমস্ত আড়াল তুলে রেখে,
একান্তে ভাবতে সেইসব মেঘমালা, অভিমানী নদীর
চণ্ডতাপ, চোরা স্রোত, অনুষ্টুপ তান।

আমার নিজস্ব মুগ্ধ চেয়ে থাকা
শব্দের সশব্দ পৌরুষে তোমাকে ঠিক তখন
লালন করবে বল্কলের মতো নিশ্ছিদ্র অধিকারে।
আমার চিত্রকল্পের পৌরুষ ভেঙেগড়ে
দরোজা-ঝরোখা দিয়ে এক লক্ষ চোখে
আমি নিরন্তর দেখে যাবো তোমার উপমা।

ক্রমশঃ রাত্রি যৌবনবতী হলে,
সুনীল মাঠ ডেকে নেবে "সৌমিত্র ফিরে এসো।
এই নাও কবচ কুন্ডল, এই নাও মৃগয়ার রথ।"
পৃথিবীর সমস্ত পাখী ও জ্যোৎস্নাকে
আমি তোমায় ভার দিয়ে এবার সকাল হয়ে যাবো ॥

পর্যটন থেকে/অমল দাস

পর্যটনে সুখ আছে জেনে
পৃথিবী গড়িয়ে যায় দীর্ঘতম পথে
আর যে কুশলতা ব্যাপ্ত এই
গমন ছায়ায়
সেখানে চরিত্রস্থির
সাপ্তাহিক ছুটির মতন।

এ ভাবে যে পরিশ্রমে
পর্যাপ্ত সূর্য উঠে আসে
এ ভাবে যে জীবন বাস্ত রেখে
নাগরিক শব্দটুকু চিনি
আরো কিছু সৌজন্য সঞ্চয় ক'রে
সুদূর যে কাছে চলে আসে
তাতেই জেনেছি এই
চিত্রিত দ্রাঘিমা জুড়ে
টেরাকোটা সেই ভাবে
নৈঃশব্দের শব্দ এনেছিল।

O O O O O

নির্ভেজাল মানুষের কবিতা/সুব্রত মণ্ডল

আমার যা কিছু আছে, সব নিয়ে নাও
বদলে দাও, একটা নির্ভেজাল মানুষের ছবি
যাকে দেখে, ঐশ্বর্যের সরলতা শিখে নিতে পারি।
এই নাও কানা বাড়ি, খোঁড়া রাস্তা, অসুস্থ সমাজ
এদের তাড়াতে পারলে,
একদিন
মানুষের পৃথিবী হবে, ব্যস্ত জীবনের পূর্ণ আলোর অধ্যায়।

পিছুটান/বিকাশ সরকার

সুদূর নক্ষত্র থেকে ডাকছে তাকে। আর
কেউ, তাকে যেতে দিচ্ছেনা। শেকড়বাকড়ে সে
বাঁধা পড়েছে
এর নাম পিছুটান হয়তবা ; সন্তানকামনা…

সে যাবে অসীম গর্ভের ভিতর। যাবে নক্ষত্রমণ্ডলীর
কাছে, মহাজরায়ুতে। সে খুলে দেবে
শূন্য কৌটো ; খুলে, সে
ছড়িয়ে দেবে অসীমের প্রতি প্রান্তে। খাদে। শূন্যতা ও
শৈত্যে, নীলের সুদীর্ঘ উরুর ভিতর

পেছনে রয়েছে যে চৌম্বকক্ষেত্র, তেজস্ক্রিয়তা ; সে এইসব
ফেলে রেখে যাবে
শুধু একজন, নিরাকার কেউ
তাকে যেতে দিচ্ছে না। শেকড়বাকড়ে সে
বাঁধা পড়েছে

○ ○ ○ ○

তোমার স্পর্দ্ধা ঃ আমাদের লজ্জা

প্রয়াত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে

সমীরণ মুখোপাধ্যায়

পাথরের বুক চিরে
গুহার আগল বানিয়েছিলে
মানুষের অস্তিত্ব
সুরক্ষিত করার অদম্য আকাঙ্ক্ষায়

যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ—
মানুষের পাঁজরে আলতো হাত
মেলে বলেছিলে, ধৈর্য্য ধরো

কুয়াশা অস্পষ্ট হতে আলোকে ডাকবে
আমরা কথা দিয়েছিলাম,
পাথরের অকাল ক্ষয়ে
যেতে দোব না
কথা ছিল, মৃত্যুঞ্জয়ী সুর
সবাই একসাথে কোরাস গাইবো

তুমি পাঁজর ফাটানো ঔদ্ধত্য নিয়েই
কলম ধরতে।
আমরা দেখতাম—
শহীদের আধপোড়া কাঠও কেমন
গনগনে হয়ে উঠত
কবিতার কথায়।

কথা ছিল, আগল আটকাবার,
দুঃসাহসী সব কর্মকাণ্ডকে
নিশান তুলে এগোবার
অথচ তুমি এক বুক স্পর্দ্ধা নিয়ে
মানুষের স্নায়ু-মজ্জায়
মিশে গেলেও
আমরা কথা দিতে দিতে
ফুরিয়ে যাচ্ছি ;
স্পর্দ্ধার আগলে
হাত রাখতে পারছি না,

এ মৃত্যু আমাদের বসন খোলার মতই
লজ্জা!

গোধূলি-মন/আষাঢ় ১৩৯৩/[illegible]

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার কবিতা

নরওয়ের সুপরিচিত আধুনিক কবি

পাল হেলগে হাউগেন।

Paal Helge Haugen

O কবি হাউগেন মনে করেন কবিতার বৃত্তে আজ পারিপার্শ্বিক যা কিছু জড়ানো ছড়ানো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তার সব কিছুই বর্ত্তমান। তাঁর কবিতায় প্রেম, ভালবাসা, মৃত্যু, ক্ষমতা, প্রতিরোধ সর্বপরি এমন এক ভাষার জন্য সংগ্রাম, যার মধ্যে স্বপ্নের আলবোনা যায়—

কবি হিসাবে পরিচিত হবার আগে ১৯৬৭ সালে চীন ও জাপানী কবিতার একটি অনুবাদ সংকলন প্রকাশ করে পাঠক সমাজের প্রশংসা অর্জন করেন। প্রাচ্যের প্রতি তার এই অনুষঙ্গ তাঁর মূল কবিতায় ধরা পড়ে। বর্ত্তমান নরওয়েজিয়ান আধুনিক কবিদের মধ্যে পাল হেলগে হাউগে একজন সুপরিচিত কবি। তাঁর ২টি কবিতার অনুবাদ দেওয়া হলো।

অপরিচিত হাত

তা ছিল একটি হাত
স্পষ্ট আর প্রসারিত
আমার কেশের প্রতি
অথবা কাঁধে
মুহূর্ত মাত্র
ঠিক যখন
নিতান্তই একা

অনেক বারেই ঘটেছে---
বছরে

আমি কখনো নিশ্চিত ছিলাম না
সে কে
কার সেই হাত
অথবা কি চায়
তবু তা ছিল প্রশান্ত নিশ্চয়তা

তারপর কোন দিন সেই হাত
আসেনি আবার।

ঘরে বাইরে

ছড়িয়ে থাকা সব কিছুই
এখন চোখে পড়ে
টেবিল চেয়ার মেসিন আর
হাতগুলো
তুমি

চোখে পড়ে আলো
আর যা কিছু পড়ার
পড়ে যায়
সঠিক জাগায়

এগিয়ে যাও

বাঁ দিকে
উড়ন্ত দোয়েল পাখি
বাইরে।

অনুবাদ : প্রণিতা প্রেন
(STEIGJERDE (1979) থেকে)

গোধূলি-মন/আষাঢ় ১৩৯৩/সাত

আমাকে ভাসাও শুধু/রাখাল বিশ্বাস

একটু জড়িয়ে গেছে লবঙ্গ স্বাদের দাঁত, কিছুটা বিস্বাদ
হলুদ গাছের ফাঁকে ঠিকরানো আলো
ঠিক আলো নয়, তবু তার দিকে ক্রমশ এগিয়ে যেতে যেতে
একদিন কোথাও হয়তো সেই থেমে যেতে হবে
পারে, যার বুকের ভিতরে জল, শুধু জল
ছুটে যায় জলের কল্লোলে
আমি কতোটুকু পারি ? এখনো ভাবিনি, তবু জানি
অন্ধকারে এলোমেলো করে দেয় ওষ্ঠভাঙা শিস
নবীন রঙের শিখা এখনো কি ঝর্ণার মতই
ঘর ও বাহির কিংবা আজো তার সব কিছু
জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে দেয় আনত সুখের ছেঁড়া গান ?
ভালোবাসা তুমি পারো, যদি পারো আমাকে ভাসাও শুধু
কাঁটা ও গুল্মের দিন আশ্চর্য আঁখির লোনা জলে ।
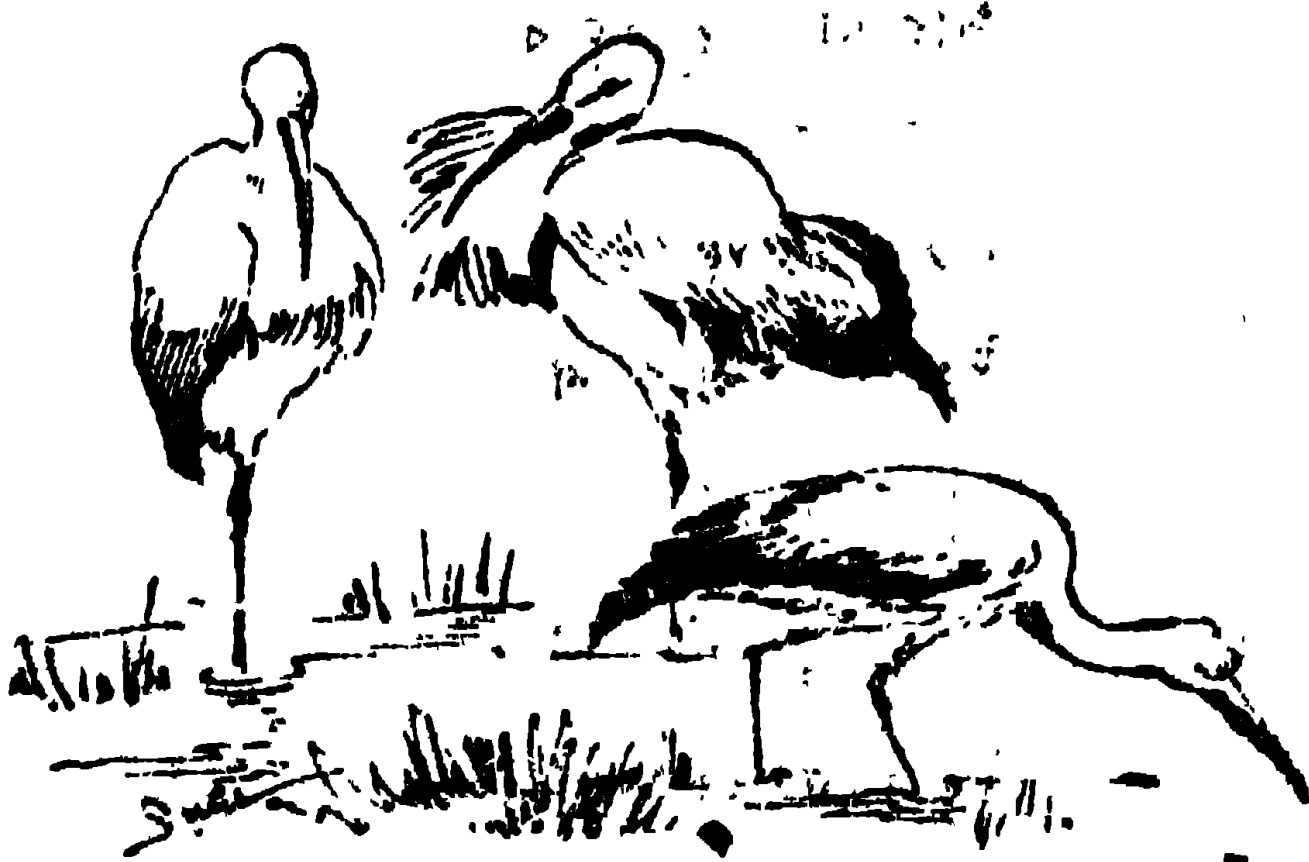
একজন হত্যাকারীর জন্য
দিলীপকুমার ঘোষাল

বাঁচব বলে নিজেকে ফিরিয়ে এনেছি কাল
স্বেচ্ছাচারী মৃত্যুর হাত থেকে ।
মরবার জন্য আজ
খুঁজে এনেছি শুকনো ডালপালা
নিজেকে তুলে দেব
সর্বভুক আগুনের হাতে ।
কাল আমার হাতে সে দিয়েছিল
তার বাগানের ফুল
আজ অনেক ফুলে মালা গেঁথেছে সে
গলায় পরাবে বলে সেই লোকটার
এতদিন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল যে আমার
ভালবাসার মাঠটাতে !
নিজেকে ফিরিয়ে এনেছিলাম কাল
বাঁচব বলে
আগুনের কাছে নিরাময় হতে
আজ ॥

সোফিওর রহমানের গল্প প্রথম যুবক

মেচেদা ষ্টেশান, নতুন প্রজন্মের বাসষ্ট্যাণ্ডের বুক দখল করে গতিমুখে দাঁড়িয়ে সুসজ্জিত বড় বড় বাসগুলি।

শতাব্দীর প্রৌঢ়ত্বরা আকাশ ছুঁয়ে তরুণ সূর্য, নাভিকুণ্ড থেকে যেন জেগে উঠছে নতুন মানুষ।

কলকারখানার আগ্রাসিক গরল, যান্ত্রিক তর্জমায় মানুষের অলসতাকে বিদ্রূপ করছে।

প্রতিদিনের ছবির মধ্যে উঠকো কয়েকটি ভাবনা আজ অনুরাগকে চেপে ধরেছে। টিফিন করে ফেরত পয়সা নিতে ভুলে গেছে। চায়ের পয়সা দোকানটিতে না দিয়েই চলে এসেছিল। চার্মসের বদলে ফিল্টার চারমিনারের প্যাকেট…এসবই তার তৎক্ষণাৎ ভুল, অন্যমনতার শীতল পদক্ষেপ। বাসটি হর্ণ দিয়ে মুভ নিচ্ছে, তবু ছাড়ছে না। অন্যদিন হলে নিত্যযাত্রী পার্টনারদের মতো সেও চিৎকার করত, দু কথা শুনিয়ে দিত ড্রাইভার–কনডাকটরদের। আজ তৃষ্ণা অন্যখাতে, সূক্ষ্ম চিন্তার অনন্ত আবহ তাকে জড়িয়ে ধরেছে।

কবিতা বা সাহিত্য টাহিত্য জীবনে করা হয়ে ওঠেনি। তারবন্ধু অঞ্জন কৈশোর থেকেই কবিতাপ্রেমিক। একসময় রবীন্দ্রনাথ নজরুলের কবিতা চুটিয়ে পড়ত। পরে পাড়ার ফাংশনে জীবনানন্দের 'কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে/সে এক নারী এসে ডাকিল আমারে' কবিতাটি আবৃত্তি করে প্রশংসা কুড়িয়েছিল। ভরাট গলা স্পষ্ট উচ্চারণ স্বরের ভাঁজ তাকে সমগ্র মহকুমা জুড়ে পরি[illegible] এনে দিয়েছে। কিন্তু বারবার কলকাতা করেও আবৃত্তিকার হিসেবে মহানগরের স্বীকৃতি পেলনা। সেই অভিমান জেদ হয়ে আজ তাকে 'তরুণ কবি' বিশেষণ পাইয়ে দিয়েছে।

অনেক ঘটনার বিশ্লেষণ শুনেছে সে অঞ্জনের মুখে। নিজের এবং অন্যমানুষের অনুভূতিকে অমন দরদী শব্দে আর মোহময়ী ভাষায় বলতে সে অন্য কাউকে দেখেনি। কোন বড় কবি সাহিত্যিক বা শিল্পীর সঙ্গে তার পরিচয় নেই। অঞ্জন তার কাছের বন্ধু এবং কবি।

এক বিকেলে রহিম ভীষণ মুষড়ে পড়েছিল। সারাবুক তোলপাড় হচ্ছিল তার, বুকের ব্যাকুল ওঠা-নামার সে ছবি স্পষ্ট মনে আছে এখনও। কে যেন বিশ্বাসযোগ্যভাবে ওকে জানিয়েছিল অনুরাগ ম্যারেজ রেজিষ্টার্ড অফিসে আজ পারমিতাকে বিয়ে করে নিয়েছে। দিনটি ছিল পঁচিশে বৈশাখ, রাজ্যসরকারের এমন সব অফিসই সেদিন বন্ধ। তা সত্ত্বেও কথাটি রহিমার বিশ্বাস করা ছাড়া কোন উপায় ছিলনা।

এত গভীর ভালোবেসেও সংশয় ছিলই। বাড়ু-বাবুদের নিষ্ঠাবান ছেলে অনুরাগ চাপের ভয়ে বা সং-

স্কারের মোহে মুসলিম রহিমাকে যে কোন সময় রিফিউজ করে বসবে। আসলে যা ঘটতে পারে বা ঘটে ওঠা স্বাভাবিক সেটাই মানুষের মনে দানা বাঁধতে থাকে, বীজের মত অঙ্কুর সুখে মাথা তুলতে চায়।

রহিমা সেদিন কেমন ভাবে কাঁদছিল ব্যাখ্যা করা যাবে না। সন্তানহারা সম্বলহীন এক অসহায় নারীর মত নিজের ঘরে খাটের ওপর চুপচাপ বসেছিল। টপ টপ ঝরছিল দু এক ফোঁটা অশ্রু। গৌরীবর্ণের দেহে শোকের কালসিটে দাগ। প্রতিবাদহীন আহত এক দেবীমূর্তি—নিমাইয়ের গৃহত্যাগের পর বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহেরও অধিক, সেই সৈনিক-স্বামীর মৃত্যুর সংবাদে তার স্ত্রীর ষ্ট্যাচুরত প্রতিক্রিয়ারও তুলনা হয় না সেদিনের রহিমার সঙ্গে। অঙ্কন বলেছিল 'দু চোখে বৃষ্টি লুকোনো, ঘন ঘনায়মান মেঘ/বাদলঘরে অঙ্কের তীব্র ব্যাকুলতা···

বন্ধুস্থানীয় এক পরিচিত তরুণ রহিমা ও অনুরাগের সম্পর্কে ঈর্ষান্বিত হয়ে সেদিন মিথ্যে সংবাদ দিয়েছিল। অনুরাগ ঠিক সময়ে না এলে রহিমা আরও কত কষ্ট পেত কে জানে।

মানুষকে প্রতিদিন এমনি কতো অহেতুক কষ্ট বুকে ধরতে হয়। প্রযুক্তি বিস্তার ঘন উত্তরণের যুগে বিজ্ঞানলালিত সভ্যসমাজে অনুরাগ আজও ঈশ্বর বিশ্বাসী। প্রতিদিন প্রতিটি পদক্ষেপেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নেয়। তার জন্মগত সংস্কার, ধর্মলালিত পরিবেশ দেহের প্রতি রক্তকণিকাকে পুষ্ট করেছে। বন্ধুর উপদেশ রহিমার গভীর প্রেম তার সংস্কার ভেঙে দিতে পারেনি। প্রতিদিন অফিসের সতীর্থ, রাস্তার লোকজন সকলের কাছেই জীবনের কার্যকরণ ব্যাখ্যা শুনেও সে বধির। অঙ্কন বলে ঈশ্বর নেই। কোন দিন কোন কাজেই ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রমাণ অনুরাগ তাকে দিতে পারেনি। তিয়াত্তর বছর পর হ্যালির ধূমকেতু দেখা দিল সৌরজগতের অনিবার্য কারণে। এ দেশে মার্কসীয় আদর্শে মানুষ বিশ্বাসী হয়ে উঠছে জীবন ধারণের তাগিদে, অসুখে চিকিৎসাহীন থাকা দেহকে নিষ্ক্রীয় করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। সে উপলব্ধি করে এমনি হাজার প্রয়োজনে কাজ ও কারণ মানুষের নর্মসহচর।

অনুরাগ পৈতেয় হাত দিয়ে দেখল ঘামে চ্যাটচেটে অন্ধ বিশ্বাসে স্যাঁতস্যাঁতে একটি পদার্থ মাত্র।

এবছর পাড়ায় চিকেন পক্স ঘরে ঘরে। গতবছর বহু অর্থ ব্যয়ে শীতলাপুজো করেও রেহাই হয়নি। একমাত্র অঙ্কনদের বাড়ীতে পক্স হয়নি। ডাক্তার বা বিশেষজ্ঞরা বলছেন অঙ্কনদের বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া ভাল। ওরা সিজন্ ভেজিটেবিলের প্রতি গুরুত্ব দেয়। ঠিক সময়ে প্রিভেনশন নিয়ে রাখে। কথাটা অনুরাগের পছন্দ। শীতলা পূজোর জন্য অঙ্কনের বাবা এক পয়সাও চাঁদা দেয়নি। পুজোর প্রসাদ নোংরা হাতে মাখানো বলে ডাষ্টবিনে ঘৃণায় ছুঁড়ে ফেলেছে। কই দেবী বিরূপ হলেন না তো।

আসলে ভাইরাসঘটিত সব কিছুই অনিবার্য কারণে মানবদেহে বাসা বাঁধে। সেখানে দেবদেবীর অস্তিত্ব অসৎ ও অলসদের কষ্টকল্পনা ছাড়া আর কি! পক্স একধরণের ঘামাচি, প্রিক্‌লি হিট। শরীরে এ্যানটিজেন্-এর অভাব থাকলেই সংক্রমিত হয়। আর এ্যানটিজেন্ বা খাদ্যগুণ ইত্যাদি বিষয়ে সজাগ থাকলেই যে কোন সংক্রামক ব্যাধি এড়ানো যায়।

মাষ্টার ডিগ্রী পাওয়া এই অত্যাধুনিক যুগের কোন তরুণ, দেবীর অভিশাপকে রোগের হেতু—এই ধারণা যদি মনের মধ্যে পুষে রাখে পরিবেশের কাছে সে নিজেই ক্রমশ ছোট হয়ে যায়। অন্ধ বিশ্বাস ছায়াভীত করে তোলে। রজ্জুতে সর্পের ভ্রম করে পিছিয়ে আসা লণ্ঠন হাতে হিমযুগে প্রবেশ করা ছাড়া আর কিছু নয়।

অঙ্কন বলে, শরীর পুড়বে, হৃদয় পুড়বে তবু যুক্তিহীন কোন কিছুকে প্রামাণ্য বলে ভাবার দরকার নেই।

জীবনের সব ব্যাপারেই অঙ্কনের কথাগুলি উপদেশের মতো মনে হয় তার। বিদ্যাসাগর থেকে সুভাষচন্দ্র এদের সবাইকে অনুরাগ শ্রদ্ধা করে। রবীন্দ্রনাথকে পুজো করে। কেন যেন মনে হয় অঙ্কনও এদের সমান। এইসব মহাপুরুষদের পাশাপাশি ওরও একটি ভাবমূর্তি ভেতরে ভেতরে তৈরী করে নিয়েছে। অর্থাৎ নিজের অজান্তেই অঙ্কন তার ওপর প্রভাব ফেলেছে।

অফিসের বন্ধুদের কাছে অঙ্কনের কথা বললে তারা অনুরাগকেই পাগল ভেবে নেয়। বলে, 'পাগলে পাগলের প্রশংসাই করে। সংসারে কবিতা লেখা ছাড়াও অনেক মহৎ কাজ আছে।'

কিন্তু কবিতা যে কতবড় অধিক মহত অনুরাগ বুঝেছে। অনেকে বলেন শ্রেষ্ঠ শিল্প মাধ্যম। চর্চা করতে থেকে মানুষ পাগল হয়ে যায়। সে পাগল ক্রমশ ধনী হয়ে ওঠে।

নিজেই জানে, অঙ্কন প্রয়োজনে অনেক মিথ্যে কথা বলে। কিন্তু জ্ঞানত অন্যায় করেনি কোনদিন। তার মূল্যবোধ স্বতন্ত্র। চাঁদা তুলে একটি মেয়ের বিবাহের বন্দোবস্ত করে; কিন্তু কোনদিন একটি ভিক্ষুককে দশটা পয়সা ছোঁয়ায় না।

রাজনীতি করেনা প্রত্যক্ষ ভাবে। তবু আন্তর্জাতিক খবরাখবর তার মুঠোয়। স্যাটেলাইটে মেঘের ঘনত্ব দেখে এবং তার গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করে আবহাওয়া অফিসের খবর প্রচারিত হওয়ার আগেই অঙ্কন অনেকবার বলে দিয়েছে বর্ষা হবেই। আর বজ্রবিদ্যুতের প্রভাব কম কি বেশী থাকবে তাও অনেক সময় আন্দাজ করে নেয়।

রহিমাকে অনুরাগ ভালোবাসেনা বা বিয়ে করবে না কথাটা ঠিক নয়। বরং রহিমাই তাকে ভালোবাসা শিখিয়েছে। বাড়ীতে যেদিন ভালো কিছু রান্না হয় অনুরাগ খেতে পারেনা। ঘুরে কোথাও বেড়াতে গেলে মনে হয় আহা রহিমার এ জায়গাটা দেখা হল না। এম. এ-র প্রতিটি পরীক্ষার সময় প্রয়োজনীয় সাজেশান এবং নোট নিজের তাগিদেই সে রহিমাকে দিয়ে এসেছে।

গজল-র ভালো ক্যাসেট নিজেই পছন্দ করে কিনে পাঠিয়েছে। আজই সকালে সুচিত্রা মিত্রের 'নহমাতা নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসী হে নন্দনবাসীনি উর্বশী...' রবীন্দ্রসংগীতটির রেকর্ড কিনে ফেলল। রহিমার পছন্দ এ গানটি সংগ্রহ করে দিতে পারল বলে একটা পূর্ণতার তৃপ্তি তাকে ভরিয়ে তোলে। সেও বোঝে, বিজাতীয় এই মেয়েটির জন্যই তার যতো কিছু। অন্য কোথাও যদি রহিমাকে বিয়ে করতে বাধা হতে হয় তাহলে তার কষ্ট চিরজীবন কাঁদাবে নিজেকেই।

একসময় দাদু রেলের চাকরিকে ঘৃণা করতেন। বলতেন, জাত চলে যাবে। কিন্তু বাবাতো সেই চাকরীর অর্থেই ওদের প্রতিপালন করছেন।...

বাগনানে তাদের বাড়ীতে সন্ধ্যারতির সময় প্রতিদিনই মসজিদের আজান ভেসে আসে। ঈদের ছুটিতে বিশ্রাম নিতে কারও বাধেনি। নজরুলের গান শুনতে বাবা কতোবার কলকাতার বৈঠকী আসরে গিয়েছেন।...

বেচেদা ষ্টেশন চত্বরে আজ যেখানে বড় বড় বাসগুলি দাঁড়িয়ে সেখানেই একদা সাহাদের কালীমন্দির ছিল। লোকে বলে ঐ মন্দির একরাত্রেই উঠেছে। কে বা কারা করেছে কেউ দেখেনি। অথচ সেখানেই আজ পরবর্তী প্রজন্মের নতুন দাপাদাপি। এই কালীমন্দিরের সেন্টিমেন্ট নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না। অঙ্কনের কথাই ঠিক, ভালোবাসার পূর্ণতা আছে। সুখ আছে। অশুচি বা জাত বলে কিছু নেই।

চলন্তি বাস থেকে চকিতেই নেমে পড়ল অনুরাগ। আজ অফিস যাবে না। অঙ্কন কে গিয়ে বলবে নিঃশর্তভাবে সে রহিমাকে বিয়ে করতে চায়। ●

একাংকিকা

॥ বন্ধু ॥

সুখেশ নাথ

[ঘর অন্ধকার। ধীরে ধীরে ভেজান দুয়ার খুলে যায়। এক ব্যক্তি নিঃশব্দে প্রবেশ করে। পরনের কালচে প্যাণ্ট ও জামা অন্ধকারে ছায়ার মত মনে হয়। তার হাতের পেনসিল টর্চের আলো এদিক ওদিক ঘুরে টেবিলের ওপর পড়ে। টেবিলের ওপর রাখা সোনার হাতঘড়িটা টিক্ টিক্ করে ওঠে। লোকটি সন্তর্পনে টেবিলের কাছে এসে হাত বাড়াতে যাবে, এমন সময় একটা গোঙানীর শব্দ তাকে বাধা দেয়। লোকটি এবার শব্দ লক্ষ্য করে টর্চের আলো ফেলে। দেখা যায় এক যুবক শয্যার ওপর বসে হাঁপাচ্ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। লোকটির টর্চের আলো সুইচ খুঁজে ফেরে। তারপর সুইচ দেখতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে যায়। একটু পরে টিউবের আলোয় ঘর ভরে যায়। লোকটি সুইচ টিপে ফ্যানটাও চালু করে দেয়। তারপর পেনসিল টর্চটি প্যাণ্টের পকেটে রেখে যুবকের কাছে এসে দাঁড়ায়।]

আগন্তুক। দারুণ হাঁপের টান। ওষুধ পত্র কিছু আছে কি? (যুবক মাথা নাড়ে) এখখুনি ওষুধের দরকার। আমার কাছে অবিশ্যি ওষুধ আছে। সব সময় সংগে থাকে। আমারও ওই রোগ আছে কিনা। (পকেট থেকে ট্যাবলেটের একটা পাতা বের করে দুটো ট্যাবলেট খুলে) যে রকম অবস্থা দেখছি এক সঙ্গে দুটো ট্যাবলেটই দরকার। (শয্যার পাশে টিপয়ে রাখা জলের গেলাস তুলে নিয়ে যুবকের মুখের কাছে এনে) নিন, খেয়ে নিন। এক্ষুনি টান কমে যাবে। (যুবক জলের সঙ্গে ট্যাবলেট দুটো গিলে নেয়) এবার এই টফিটা মুখে রেখে চুষুন। (একটা টফি মোড়ক খুলে যুবকের হাতে দেয়। যুবক মুখে পুরে নেয়।) বড্ড বেয়াড়া রোগ আর বড্ড কষ্টদায়ক। জলের মাছ ডাঙায় তুললে যেমন হয় এ রোগে মানুষের দশাও সে রকম হয়। বাতাস আছে অথচ শ্বাস নেয়া যাচ্ছে না। কী যে কষ্ট তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না। আর কখন যে শুরু হবে তারও ঠিক নেই। সেজন্য সব সময় আমাকে সঙ্গে ওষুধ রাখতে হয়। খাওয়া না জুটলেও ওষুধ চাই-ই ওষুধ ছাড়া এক মুহূর্তও চলবে না। (যুবক সোজা হয়ে বসে) এবার একটু কমেছে মনে হচ্ছে।

তরুণ। হাঁ। অনেকটা কমেছে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আগন্তুক। ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই। আপনার যে উপকারে লাগতে পেরেছি তার জন্য খুব

ভাল লাগছে। এর আগে এ রকম কোন-
দিন হয়েছে, না এই প্রথম।

তরুণ। সর্দিটর্দি তো মাঝে মধ্যে হয়, আবার ভাল হয়ে যায়। এবার কেন যে এমনটা হোল বুঝতে পারছি না।

আগন্তুক। ডাক্তার দেখেছেন ?

তরুণ। ডাক্তার দেখানর যে দরকার পড়বে সেটা তো আগে বুঝিনি। আচ্ছা, আপনি বলছিলেন আপনার ও রকম হয়—কি ব্যাপার বলুন তো ?

আগন্তুক। ছেলেবেলা থেকেই আমার সর্দির ধাত। মাঝে মাঝেই বুকে সর্দি বসে এমন হয় যে শ্বাস নেয়া যায়না। ইদানিং ঘন ঘন ওই রকম হচ্ছে। ডাক্তার বলেছেন, ওটা হাঁপানিতে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

তরুণ। ওষুধ নেই ?

আগন্তুক। ওষুধ আছে। খেলে আরাম পাওয়া যায়—শ্বাসকষ্ট আর থাকে না। তবে ডাক্তার বলেন, এ রোগ একেবারে সারে না। সে রকম ওষুধ এখনো বের হয় নি। সে'জন্য সব সময় সতর্ক থাকতে হয় আর সঙ্গে ওষুধ রাখতে হয় যাতে রোগের সুরুতেই ওষুধ খাওয়া যায় আর কষ্টের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

তরুণ। (অ ড়মোড়া ভেঙে খাটের গায় হেলান দিয়ে) একটা কথা বলব ?

আগন্তুক। নিশ্চয়ই বলবেন। ওতে কিন্তু-কিন্তু করবার কি আছে ?

তরুণ। আপনাকে যে ডাক্তার দেখেন আমাকেও সেই ডাক্তারকে দিয়ে দেখাতে পারেন ? তার আগে চেয়ারটা একটু টেনে নিয়ে বসুনতো। তখন থেকে আপনি দাঁড়িয়েই রয়েছেন।

আগন্তুক। (একটা চেয়ার টেনে বসে) না পারার তো কিছু নেই। তবে কথা হচ্ছে ও সব গরীব মানুষের ডাক্তার কি আপনাদের পছন্দ হবে ?

তরুণ। (একটু হেসে) প্রয়োজন হচ্ছে চিকিৎসার। ডাক্তার যখন, তখন ওই কাজটি নিশ্চয়ই পারবেন।

আগন্তুক। পারলেও একটা কথা থেকেই যাচ্ছে। যাদের খাওয়া জোটে না—যাদের প্রকৃত রোগ হচ্ছে অপুষ্টি—তাদের চিকিৎসাই বা কি হবে আর ডাক্তারই বা কি করবে ? তবু ডাক্তারকে দেখতে বললে দেখতে হয়—ওষুধ দিতে হয়। তাতে কেউ বাঁচে, কেউ বাঁচেনা। এদের কাছে ওষুধও যা, ঠাকুরের চরণামৃতও তাই। তবে এটা ঠিকই যে, এই সব ডাক্তারদের অনেক বেশী রোগী ঘাঁটতে হয়।

তরুণ। (সোজা হয়ে বসে) ওই সব রোগী ঘাঁটা ডাক্তারই আমার প্রয়োজন। কেন প্রয়োজন তাও বলছি। নামী দামী ডাক্তারই আমাদের হাউস ফিজিশিয়ান। আমাদের বাগে পেলেই হোল। সম্ভাব্য সব রকম রোগের ওষুধই চালিয়ে দেবেন। কোনটা না কোনটা লেগে যাবেই। এতে ক্ষতি কিন্তু রোগীরই হচ্ছে। অর্থের দিকটা না হয় বাদই দিলাম। বিনা প্রয়োজনে যে সব ওষুধ আমাদের গিলতে হয় তার খারাপ দিকও তো একটা আছে ফলে রোগ ভাল হলেও অন্য উপসর্গ দেখা দিতে থাকে। তখন আবার চিকিৎসা। আবার ওষুধ। এত ওষুধের ধাক্কা সামলাতে গিয়ে শেষে দুর্বল হয়ে পড়ে দেহের মূলযন্ত্র, হার্ট। তবে

ওষুধ কোম্পানীগুলি এর ফলে চালু থাকে। কারণ দেশের বেশীর ভাগ মানুষেরই ওষুধ কিনবার ক্ষমতা না থাকলেও ওষুধের বিক্রী বন্ধ হয় না। বিজনেস চালু থাকে। তাই বলছিলাম যখন অযাচিতভাবে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েই দিয়েছেন—

আগন্তুক। (লজ্জিতভাবে) আমাকে আর লজ্জা দেবেন না।

তরুণ। (উঠে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে এসে) লজ্জিত হবার কথা আমাদের—আপনাদের নয়। আপনাদের সব নিয়েই তো আমরা বড়লোক। আপনারা যত গরীব হচ্ছেন, আমরা ততই বড়লোক হচ্ছি। কিংবা আমরা যত বড়লোক হচ্ছি, আপনারা ততই গরীব হচ্ছেন। আপনাদের সর্বস্ব নিয়েই তো আমরা বড়লোক। তাই আমাদের চেয়ে বড় চোর আর কে আছে? তবে আমাদের চুরিটা অনেক বড় ধরণের তাই অনেক মার্জিত--লোকের চোখে পড়ে না।

আগন্তুক। (উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে) ব্রেস্টকিন রিংকিলটন এর এক-জন দক্ষ ফিটার আমি। দশ বছরের অভিজ্ঞতা আমার। তবুও ছাঁটাই হয়ে গেলাম আমি। দশ বছর যাদের কাজ করলাম তারা কেউ ভেবে দেখলে না ছেলে মেয়ে বউকে কি খাওয়াব আমি।

তরুণ। (দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে) আপনি নিশ্চয়ই একাই ছাঁটাই হননি।

আগন্তুক। দফায় দফায় অনেকেই ছাঁটাই হয়েছে। অনেকে দিন গুনছে।

তরুণ। (সেই ভাবেই) ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় যে অর্থনৈতিক সংকট চলছে তারই কোপ এসে পড়ছে আপনাদের ঘাড়ে। মুদ্রাস্ফীতি আর মূল্যস্ফীতি মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে। প্রোডাক্শন বাজার পাচ্ছে না—সারপ্লাস হয়ে যাচ্ছে। লে অফ, লক আউট, রিট্রেঞ্চমেণ্ট ক্রমাগত বেড়ে চলেছে তার সংগে পাল্লা দিচ্ছে আন-এমপ্লয়মেণ্ট। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা আরও সংকুচিত হচ্ছে। প্রোডাকশন আরও বেশী সারপ্লাস হচ্ছে। আরও বেশী লে-অফ, লক আউট, রিট্রেঞ্চ-মেণ্ট। ওদিকে জন সংখ্যা সমানে বেড়ে চলেছে। আনএমপ্লয়মেণ্ট সর্বগ্রাসী রূপ নিচ্ছে। দেশে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিচ্ছে। কোথাও হয় তো মরীয়া মানুষ রাষ্ট্র-বিপ্লবের পথ ধরছে। ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্র টিকিয়ে রাখার তাগিদে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাদের ওপর। আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রবাদও নিষ্ক্রিয় থাকতে পারছে না। দুনিয়া বারবার বিশ্ব-ধ্বংশী বিশ্ব-যুদ্ধের প্রান্তরেখায় এসে দাঁড়াচ্ছে।

আগন্তুক। আপনার কথা শুনতে খুব ভাল লাগছে।

তরুণ। কথা বলতেও আজ খুব ভাল লাগছে। যেন মনে হচ্ছে আবার সেই কলেজ জীবনে ফিরে গেছি।

(ব্যস্তভাবে পরিচারকের প্রবেশ)

পরিচারক। দাদাবাবু উঠে পড়েছেন; (আগন্তুককে দেখে সবিস্ময়ে চেয়ে রয়)

তরুণ। হাঁ করে কি দেখছিস। তাড়াতাড়ি চা খাওয়া। একটু বেশী করেই আমাদের দু'জনেরই চা খাওয়া দরকার। সংগে স্ন্যাক্স দিবি। (আগন্তুকের প্রতি) আপনি তত-ক্ষণ হাত মুখ ধুয়ে আসুন। ওর সংঙ্গে যান।

সব দেখিয়ে দেবে। (দুজনে প্রস্থান করে। যুবক এসে শয্যায় শুয়ে পড়ে। একটু পরে আগন্তুকের প্রবেশ।)

আগন্তুক। ঘুম পাচ্ছে? তা আর ঘুমের দোষ কি। রাতে তো আর ভাল ঘুম হয়নি। চা টা খেয়ে ভাল করে ঘুমিয়ে নিন।

তরুণ। (বালিশের পাশ থেকে নিয়ে কতগুলি নোট বের করে) এগুলো রাখুন। চা খেয়ে একটু বিশ্রাম করে ওবেলায় আপনার পরিচিত ডাক্তারকে নিয়ে আসবেন। আপনি বরঞ্চ আপনার ট্যাবলেটের পাতাটি রেখে যান। প্রয়োজন হলে খাওয়া যাবে আপনি আর একটা পাতা কিনে নেবেন। (পরিচারক ট্রে হাতে প্রবেশ করে ও সবিস্ময়ে নোটগুলির দিকে চেয়ে রয়) নে, চা দে। (আগন্তুককে) ধরুন ;

(আগন্তুক নোটগুলি নিয়ে প্যাণ্টের পকেটে রাখে। পরিচারক দু'জনকেই বড় কাপে চা ও প্লেটে করে স্ন্যাক্‌স এগিয়ে দেয়। দু'জনেই খেতে থাকে।)

আগন্তুক। (চায়ের কাপ নামিয়ে পকেট থেকে ট্যাবলেটের পাতা বের করে টেবিলের ওপর রেখে) আমি তাহলে আসি এখন।

তরুণ। হ্যাঁ, আসুন।

(আগন্তুক প্রস্থান করে। পরিচারকও কাপ প্লেট ট্রেতে তুলে নিয়ে প্রস্থান করে। যুবক আবার শয্যায় শুয়ে পড়ে। ত্রস্তপদে একজন তরুণীর প্রবেশ। তরুণী এসেই হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে যুবকের কপালের তাপ পরীক্ষা করে। যুবক চোখ মেলে চায়।) এসে গেলে! এত্ত সকালে!

তরুণী। আসব না? তোমাকে অসুস্থ রেখে যাওয়া। কিছু ভাল লাগে? মা বাবাও তোমার জন্ম চিন্তিত। পরে হয়তো আসবেন।

তরুণ। বোনের বিয়ে ভালয় ভালয় হয়েছে তো?

তরুণী। হয়েছে। সবাই তোমার] কথা বলছিল। তোমার সংগে দেখা না হওয়ায় নতুন জামাই দুঃখ করছিল।

তরুণ। (একটু হেসে) তার জন্ম দুঃখ কিসের। বিমলের সংগে আগেও দেখা হয়েছে, পরেও দেখা হবে। প্রীতি কি বললো?

তরুণী। তোমাকে না দেখে বেচারীর চোখ দিয়ে জল পড়তে সুরু হোল। তোমার ওপর ওর খুব টান।

তরুণ। কার যে কম তা তো বুঝিনে। (খানিকক্ষণ তরুণীর প্রতি চেয়ে থেকে) আচ্ছা রাণু, তুমি তো ইতিহাসের ছাত্রী ছিলে। ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুশন কোন দেশে হয়েছিল বলতে পারো?

তরুণী। (একটু অবাক হয়ে) কেন, ইংলণ্ডে। জেমস ওয়াটের স্টিম ইঞ্জিনের আবিস্কার উৎপাদন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনে দিল। হস্তচালিত যন্ত্রের চাইতে এর উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেশী। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

তরুণ। (সোজা হয়ে বসে) এমনই। স্টিম ইঞ্জিনের হাই-প্রোডাক্‌টিভিটি সংগে সংগে নতুন একটা শ্রেণীর সৃষ্টি করল। প্রলেতারীয়া।

তরুণী। (একটা চেয়ারের হাতলে ভর করে) চারদিকে কলকারখানা গড়ে উঠতে থাকল। মুনাফার লোভে সামন্তপ্রভু, মহাজন, ব্যবসায়ী যে যেখান থেকে পারলো অর্থ সংগ্রহ করে কারখানা গড়ে তুলতে সুরু করলো। ফলে সৃষ্টি হোল নতুন অভিজাত শ্রেণী—

বুর্জোয়া। অপরদিকে খেতখামারে যারা বাড়তি হয়ে পড়ছিল তারা গিয়ে জুটতে সুরু করলো কারখানায়। জমি জমার সঙ্গে এদের সম্পর্ক থাকল না। শ্রমই এক-মাত্র মূলধন। শ্রমের বিনিময়ে মজুরী সং-গ্রহ করেই এরা দিনপাত করতে থাকল। কারখানার শ্রীবৃদ্ধির সংগে সংগে এদের সংখ্যাও অতি দ্রুত বেড়ে চলল। এরাই হোল সর্বহারা বা প্রলেতারীয়া। ইনডা-স্ট্রিয়াল রেভল্যুশন একটা নয় দুটো নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি করলো—বুর্জোয়া আর প্রলে-তারীয়া। আর তার সংগে সমস্ত পুরানো ধ্যান ধারণার নতুন মূল্যায়ণ।

তরুণ। আর প্রলেতারীয়ান রেভল্যুশন কোন দেশে হয়েছিল?

তরুণী। রাশিয়াতে ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে। তার আগে অবশ্যই ফেব্রুয়ারী মাসে জার-তন্ত্রের উচ্ছেদ হয় বুর্জোয়া ডেমক্রাটিক রেভল্যুশনে।

তরুণ। রাশিয়া নিশ্চয়ই তখন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালী ডেভে-লপ্‌ড রাষ্ট্র ছিল না।

তরুণী। বরং বলা যায় সেদিক দিয়ে অনেক রাষ্ট্রের চেয়ে অনেক পেছিয়ে ছিল।

তরুণ। তবু সেই রাশিয়াতেই কেন সবার আগে প্রলেতারীয় রেভল্যুশন হোল?

তরুণী। বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বরং জার্মানীতেই অনেক রাইপ ছিল। তবু জার্মানীতে ক্রমে ফ্যাসিস্ত শক্তির অভ্যুদয় ঘটল।

তরুণ। আর যে দেশে প্রলেতারীয়ার আবির্ভাব ঘটেছিল সবার আগে সেই ইংলণ্ডে প্রলে-তারীয় রেভল্যুশন তো দূরের কথা প্রলে-তারীয়ার বিপ্লবী সংগঠন আজ পর্য্যন্ত দানা বাঁধল না। অথচ কার্ল মার্কস ইংলণ্ডে বসেই 'ক্যাপিটাল' রচনা করেছিলেন। ইতিহাসের এই রসিকতার কারণ কি?

তরুণী। (যুবকের কাছে এগিয়ে এসে) তোমার কি হয়েছে বল তো? এসব নিয়ে এমন সিরিয়াস ভাবনা চিন্তা করতে তো কোনদিন দেখিনি। ডাক্তার ব্যানার্জিকে খবর দেব?

তরুণ। (তার হাত ধরে পাশে বসিয়ে) না, না, সে সব হবে'খন। তুমি বরং একটু কাছে বসো। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে। (উঠে পাইচারী করতে করতে) আমার মনে হয় এর প্রধান কারণ ইংলণ্ডের মানুষ সাধারণ ভাবে যুক্তিবাদী। বুর্জোয়াদের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে তারা যেমন দেশ শাসনে তাদের আধিপত্য মেনে নিয়েছে, বুর্জোয়ারাও প্রলেতারীয়ার জন্য কনশেশনের পথ খোলা রেখে দিয়েছে। সমাজজীবনে বিবর্তনের রাস্তা যেখানে খোলা রয়েছে। অন্যদিকে রাশিয়ার জার ও অভি-জাতরা সাধারণ মানুষকে কোনদিন মানুষ বলেই মনে করেনি। নীচের তলার মানুষের ঘৃণা আর ক্রোধ থেকেই সেখানে বিপ্লবের জন্ম।

তরুণী। কলোনীয়াল এক্সপ্লয়টেশন ও কনশেসনের নীতিকে উপযুক্ত সহায়তা দিতে পেরেছে।

তরুণ। (চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে) সেটা ঠিক। কিন্তু কলোনিগুলো হাতছাড়া হয়ে গেলেও এখনো সেখানে প্রলেতারীয়ার বিপ্লবী সংগঠন দানা বাধছে না কেন? বুর্জোয়াদের দূরদর্শিতা তাদের কনশেসনের নীতিকে অবিচলিত রাখতে পারছে বলেই তা সম্ভব হচ্ছে না কি? আমার তো মনে

হয় ওরা বিবর্তনের পথে মাথার ওপর রাজা-রাণীকে নিয়েই সমাজতন্ত্রে পৌঁছে যাবে।

তরুণী। (উঠে দাঁড়িয়ে) তা অসম্ভব নয়। তাদের কথা তারা ভাবুক। বেলা হয়ে যাচ্ছে। এবেলা তুমি কি খাবে?

তরুণ। আর একটু থাক। আমার মনে হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনার সময় এসে গেছে। (ধীরে ধীরে পাইচারী করতে করতে) ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার অর্থ-নৈতিক সংকট আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে। একদিকে মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যস্ফীতি অন্যদিকে লে অফ, লক আউট, রিট্রেনচ্‌-মেণ্ট। আন-এমপ্লয়মেণ্ট ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি সামান্যই রোধ করা সম্ভব হচ্ছে। দারিদ্র সীমার নীচে যে হারে মানুষের জীবন যাত্রা নেবে যাচ্ছে তা যদি রোধ না করা যায় তবে এই সব বঞ্চিত মানুষের সঞ্চিত রোষ একদিন বিপ্লবের আকারে ফেটে পড়ে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করবে না কি?

তরুণী (মুচকি হেসে) তা আমি কি ভাবে তা রোধ করতে পারি!

তরুণ (তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে) হাসির কথা নয়। তোমাকে আমাকে সবাইকেই ভাবতে হবে। ভাববার সময় এসে গেছে। আমাদের কৃষি উৎপাদন মোটের ওপর চলনসই অবস্থায় এসেছে যদিও তা বাড়াবার স্কোপ যথেষ্ট আছে। সেদিক দিয়ে আমাদের শিল্প উৎপাদন অনেক পেছিয়ে রয়েছে। খনিজ সম্পদের অভাব নেই—প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিলে প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ আমরা আহরণ করতে পারি—অভাব শুধু তাকে কাজে লাগাবার মত পুঁজি আর উদ্যোগের। এ উদ্যোগ তো আমাদেরই নিতে হবে—নতুন নতুন প্রকল্প গড়ে তুলতে হবে। এদিক দিয়ে আমরা বিদেশী পুঁজিও আহ্বান করতে পারি—অবশ্যি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রনাধীনে। মোট কথা নতুন নতুন প্রকল্প গড়ে তুলতে না পারলে আমরা কর্ম সংস্থানের প্রসার ঘটাতে পারব না—মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে পারব না—পারব না অর্থ-নৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতে। পাবলিক সেক্টার ও প্রাইভেট সেক্টার উভয়কেই একযোগে কাজ করতে হবে। আমার মনে হয় বিভিন্ন চেম্বার অব্ কমার্সে এই সব নিয়ে আমাদের ফলপ্রসূ আলোচনা চালাতে হবে। পথ আমাদের বের করতেই হবে।

তরুণী। তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠে সেই চেষ্টাই কর। আর তুমি যাতে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠ আমি সেই চেষ্টাই করি। (প্রস্থানোদ্যত)

তরুণ। আর একটু বস। আমি চট করে বাথরুম থেকে আসছি।

(যুবক প্রস্থান করে। তরুণী ঘরের এদিক ওদিক একটু ঘোরাঘুরি করে এসে খাটে বসে। আগন্তুক ও ডাক্তার প্রবেশ করে। আগন্তুক ডাক্তারের ব্যাগটি টিপয়ের ওপর রাখে। ডাক্তারের গলায় স্টেথোস্কোপ ও বাঁ হাতে প্রেসার মাপার যন্ত্র। ডাক্তার চেয়ার টেনে নিয়ে তরুণীর সামনে বসে।)

ডাক্তার। দেখি আপনার হাত।

(তরুণী ডান হাত বাড়িয়ে দেয়। ডাক্তার পাল্‌স দেখতে থাকেন। আগন্তুক ফ্যাল ফ্যাল করে ঘরের চারিদিক দেখতে থাকে।)

শুয়ে পড়ুন। (তরুণী শুয়ে পড়ে। ডাক্তার তার বাহুতে প্রেসার মাপার যন্ত্র লাগিয়ে প্রেসার পরীক্ষা করেন। তারপর প্রেসার মাপার যন্ত্র বাহু থেকে খুলে গুটিয়ে রাখতে রাখতে।) বয়স তো তিরিশের নীচেই নিশ্চয়। প্রেসার তো দেখছি নর্মাল। (স্টেথোস্কোপ কানে লাগাতে লাগাতে) আপনার কি ট্রাবল হচ্ছে বলুন তো। (তরুণ প্রবেশ করে)

তরুণ। (সহাস্যে) ট্রাবল ওর নয় ডাক্তারবাবু। ট্রাবল আমার। (তরুণী উঠে বসে। ডাক্তার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আগন্তুকের প্রতি চায়)

আগন্তুক। যাক বাঁচা গেল। আমি তো ভাবছিলাম বাড়ি ভুল হয়ে গেল না কি!

তরুণ। (আগন্তুকের প্রতি) আপনি যে এখুনি ডাক্তারবাবুকে নিয়ে আসবেন ভাবিনি। যাক ভালই হোল। ওরও প্রেসারটা চেক্-আপ হয়ে গেল। এবার তাহলে আমাকে—(তরুণী সরে দাঁড়ায়। তরুণ তার জায়গায় এসে বসে। ডাক্তার তার পাল্‌স পরীক্ষা করেন। তরুণ ডাক্তারের ইঙ্গিতে শুয়ে পড়ে। ডাক্তার প্রেসার মাপার যন্ত্র তার বাহুতে লাগিয়ে প্রেসার পরীক্ষা করেন।)

ডাক্তার। বয়স?

তরুণ। চৌত্রিশ।

ডাক্তার। (প্রেসার মাপার যন্ত্র খুলে নিয়ে গুটিয়ে রেখে কানে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে বুক পরীক্ষা করেন) জোরে জোরে শ্বাস নিন। হ্যাঁ, এবার পাশ ফিরে শোন। (পিঠের বিভিন্ন জায়গায় স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে পরীক্ষা করেন) জোরে জোরে শ্বাস নিন। হ্যাঁ, হয়েছে। (কান থেকে স্টেথোস্কোপ খুলে গলায় ঝুলিয়ে নেন। যুবক উঠে বসে।) ব্রংকিয়াল প্যাচ রয়েছে দেখছি। তেমন কিছু নয়। ক'দিন রেস্টে থাকুন। ওষুধ দিচ্ছি। দু'দিনেই ভাল হয়ে উঠবেন। (ব্যাগ থেকে প্যাড বের করে প্রেসক্রিপশন লেখেন) কি নাম?

তরুণ। আনন্দকুমার রায়।

ডাক্তার। সকাল দুপুর সন্ধ্যা আর রাতে একটা করে ট্যাবলেট খাবেন। আর একটা টনিক দিলাম। আফটার মিল দু'চামচ করে খাবেন। ওতেই ভাল হয়ে যাবেন।

তরুণ। শেষ রাতের দিকে প্রচণ্ড শ্বাস কষ্ট হচ্ছিল। (টেবিলের ওপর থেকে ট্যাবলেটের পাতাটি তুলে) এই ট্যাবলেট দু'টো খাওয়ায় কয়েক মিনিটের মধ্যে ট্রাব্‌ল দূর হয়ে গেল।

ডাক্তার। এ রোগে এ'রকমই হয়। ঠিক সময় ওষুধ পড়েছে। নইলে ফেটাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। (ডাক্তার উঠে দাঁড়ান। আগন্তুক ডাক্তারের ব্যাগটি তুলে নেয় তার-পর উভয়ে প্রস্থান করে।)

তরুণী। (চিন্তিতভাবে তরুণের নিকট এসে) তোমার এ'রকম অবস্থা হয়েছিল। আর কোনদিন তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

তরুণ। (ম্লান হেসে) তুমি থাকলে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে রোগের কাছে মানুষ কী রকম অসহায় হয়ে পড়ে। অনেক রাত পর্যন্ত জগা আমার কাছেই ছিল। আমি তাকে নিজের ঘরে গিয়ে শুতে বললাম। তখন কি ভেবেছিলাম আমার ওই অবস্থা হবে। ও লাইট আর ফ্যানের সুইচ অফ করে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে

গেল। আমিও একটু পরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

তরুণী। দরজা দাও নি?

তরুণ। ভেবেছিলাম একটু পরে উঠে দরজা দিয়ে দেব। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ায় তা আর হয়-নি। শ্বাসকষ্টে ঘুম ভেঙে গেল। সমস্ত শরীর দিয়ে ঘাম ঝরছে। বুকে কি যেন চেপে বসে আছে। কিছুতেই স্বাভাবিক শ্বাস নিতে পারছি না। শেষে উঠে বসতে হোল। দু'হাতে ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে শ্বাস নেবার চেষ্টা করছি। কে একজন ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো। তার পেনসিল টর্চের ফোকাস এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে তোমার বাবার দেয়া সোনার হাতঘড়িটার ওপর গিয়ে পড়লো।

তরুণী। কী সর্বনাশ! আমিও পাশে নেই।

তরুণ। প্রচণ্ড শ্বাস কষ্টে আমার গলা দিয়ে একটা গোঙানীর শব্দ ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিল। পর মুহূর্তেই আমার মুখের ওপর পেনসিল টর্চের ফোকাস পড়লো।

তরুণী। তোমার ওই অবস্থায় ও তো নির্বিঘ্নে সোনার ঘড়ি সমেত সব দামী জিনিষপত্র টাকাকড়ি নিয়ে—

তরুণ। ও কিন্তু তা না করে টর্চের আলোয় ঘরের সুইচ দেখে লাইট জেলে দিল। তারপর ফ্যান চালিয়ে দিল।

তরুণী। তারপর?

তরুণ। আমার কাছে এসে আমার অবস্থা বুঝে নিল।

তরুণী। তারপর?

তরুণ। তারপর পকেট থেকে একটা ট্যাবলেটের পাতা বের করে তা থেকে দুটো ট্যাবলেট নিয়ে টিপয়ের ওপর রাখা জলের গ্লাস আমার মুখের সামনে ধরে বলল, খেয়ে নিন। এখুনি কমে যাবে।

তরুণী। খেলে?

তরুণ। ডাক্তারের মুখেই তো শুনলে সময় মত ট্যাব-লেট না পড়লে ফেটাল হয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। ট্যাবলেট দু'টো খেলাম। তার-পর ওর দেয়া একটা টফি চুষতে চুষতেই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেলাম। ও বললো, ওরও এ রোগ আছে। তাই সব সময় ট্যাব-লেট পকেটে রাখে। কোন সময় যে রোগের আক্রমণ হবে তার কোন ঠিক নেই।

তরুণী। ও যদি সে সময় না এসে পড়তো—

তরুণ। (ম্লান হেসে) তবে এতক্ষণ কী অবস্থায় যে আমাকে দেখতে কে জানে। (পাইচারী করতে করতে) আমাদের চোখে এরা ছোট-লোক। আমরা এদের মানুষ বলেই গণ্য করি না। অথচ এই সব মানুষেরা যে প্রয়োজনে কত বড় হয়ে উঠতে পারে তার কোন ধারণাই আমার ছিল না। জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য আজ আমার চোখে ধরা পড়লো। ওদের বাদ দিয়ে আমরা বাঁচতে পারিনে। কিন্তু আমাদের ঝেড়ে ফেলে ওরা দিব্বি মানুষের মত বাঁচতে পারে। কিংবা আমরা রয়েছি বলেই ওরা মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত। আমরা যদি এখনো সজাগ না হই—যদি এদের কর্ম সংস্থান করতে না পারি—তবে মরতে মরতে একদিন এরা মরীয়া হয়ে উঠে দাঁড়াবেই। আমাদের আবর্জনার মত ঝেড়ে ফেলে ওরা বাঁচার রাস্তা খুঁজে বের করবেই। তাই সময় থাকতেই আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে—পুঁজি সংগ্রহ করে নতুন নতুন শিল্প গড়ে তুলতে হবে। উৎপাদন না বাড়াতে পারলে আমরা মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে লড়াই করতে পারব না—

মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে পারব না—অর্থ নৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারব না—পারব না নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে। ইংলণ্ডের বুর্জোয়ারাই হোক্ আমাদের পথ প্রদর্শক। কন্‌ক্রনটেশন নয় কনশেশন দিয়েই আমাদের টিকে থাকতে হবে। আমরা—

(আগন্তুকের প্রবেশ। টেবিলের ওপর ট্যাবলেট ও টনিকের শিশি রাখে।)

আগন্তুক। ডাক্তারের ভিজিট ও ওষুধের দাম দেবার পর এইগুলি বেঁচেছে। টেবিলের ওপর নোট ও খুচরোগুলো রাখে) এবার আমি যেতে পারি?

তরুণ। (একটু হেসে) ওগুলো তো আমি ফেরৎ দিতে বলিনি।

তরুণী। (নিজের পার্শ খুলে কিছু নোট বের করে) এগুলোও আপনি রাখুন। আপনি আমাদের পরম বন্ধু।

আগন্তুক। (আহত কণ্ঠে) ছাঁটাই শ্রমিক—উপোসী পরিবার—জীবনের ঝুঁকি নিয়েও চুরি-ছিনতাইয়ের পথে জীবন বাঁচানর আপ্রাণ চেষ্টা করছি। তবু তাতেও খানিকটা পৌরুষের স্বাদ থাকে। কিন্তু তাই বলে একেবারে ভিখিরির মত—

তরুণ। আপনাকে আমার ভীষণ দরকার। আপনার মত বিশ্বস্ত একজন সহকর্মী পেলে আমি অসম্ভবও সম্ভব করতে পারব। ওগুলো আপনি নির্দ্বিধায় রাখতে পারেন—অ্যাডভান্সও গণ্য করতে পারেন। ওবেলায় যদি সময় হয় আসবেন। নইলে কাল সকালে আসুন। আমাদের সামনে অনেক কাজ—অনেক কাজ। মানুষ অনেক আছে; কিন্তু একজন বিশ্বস্ত বন্ধু মেলা মহাভাগ্যের কথা।

তরুণী। (সহাস্যে) এবার আর নিশ্চয়ই—

আগন্তুক। না। (নোটগুলি নিয়ে পকেটে পুরে) জীবিকার নিশ্চয়তা যে আমাদের জীবনের সব চেয়ে বড় নিরাপত্তা তা আমার চেয়ে বেশী আর কে বুঝবে? (সহাস্যে) এবার আসি তবে।

তরুণী। (সহাস্যে) আসুন।

(আগন্তুক হাসি মুখে প্রস্থান করে। তরুণ সেদিকে চেয়ে রয়। মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে।)

দামাল শিশুর
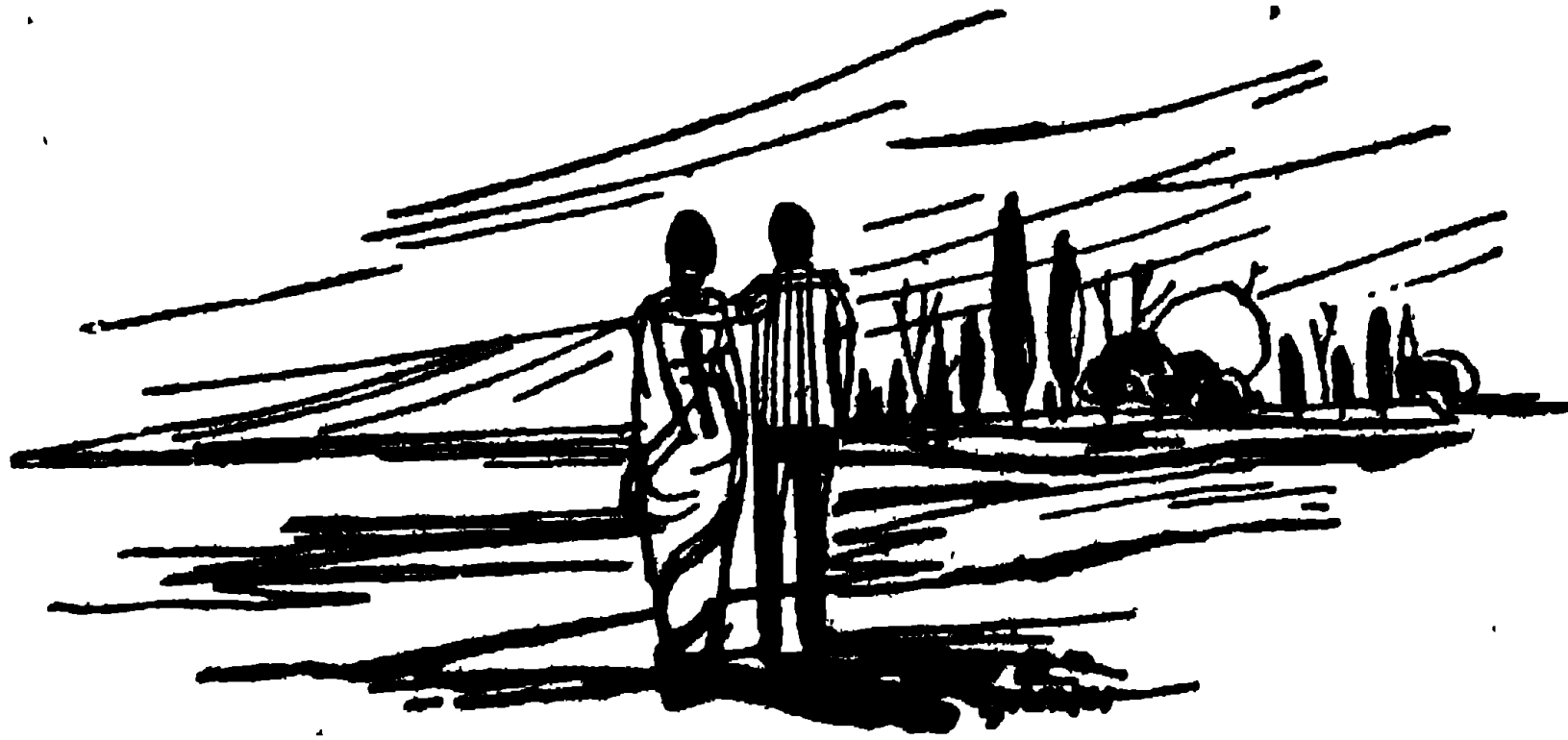
এবং মৃদু, আত্মগত উচ্চারণ

জগত লাহা

হ্যাল্লো ক্যালকাটা

অভিজিৎ ঘোষ

ইয়ং রাইটার্স
ব্লক বি ৫ ফ্ল্যাট ৩
পূর্বাশা হাউসিং এস্টেট
১৬০ মানিকতলা মেন রোড.
কলি-৫৪

অভিজিৎ ঘোষের 'হ্যাল্লো ক্যালকাটা' সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত। কবিতাগুলি ১৯৭১ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত লেখা বলে অনুমান করা যায়, প্রথম কবিতা-টিতে ('একদিন স্বপ্নে জাগরণে') সালের উল্লেখ নেই। ১৯৭১-এর ঝোড়ো রক্তাক্ত ভয়ংকর দিনগুলো যেমন এই গ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় প্রখর ভাষায় ভাষাচিত্র ও ভাষণে ফুটে উঠেছে, তেমনি পরবর্তী বৎসর-গুলির ক্লেদ গ্লানি ক্লীবত্ব ক্লান্তি ঘৃণা প্রেম ও নির্বেদ প্রভৃতি। কবিতা-গুলি দীর্ঘ ; এ ধরণের কবিতা দীর্ঘ হবে তা ধরেই নেওয়া যায়। অবিচ্ছিন্ন ভাষণ বা Statement কবিতাগুলির প্রধান চরিত্ররীতি হলেও ভনিতা বা বক্তব্যভঙ্গীর বিশদতা তির্যকতা এবং ব্যঙ্গ পরিহাসের তীক্ষ্ণতার জন্য যথেষ্ট স্বাদু, অনেকক্ষেত্রে মর্মস্পর্শী। কবি সম সময়ের দেশ কাল সমাজকে ধরতে সফল হয়েছেন কবিতায়, সর্বত্র ও সর্বথা না হলেও, অনেকসময় ও অনেকক্ষেত্রে। আবার মনে হয়, কবিতাগুলোর চর্চায় কবির আরো বেশি অনুধাবন অভিনিবেশ ব্যয় করার প্রয়োজন ছিল ; স্নিগ্ধ ও মার্জিত প্রসাধন-কলা এসব কবিতায় অলঙ্কার আনে না, ঠিক ; তথাপি কবিতা—যে বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি হোক, তাকে সর্বাগ্রে art হয়ে উঠতে হবেই। নজরুলের কবিতা সম্পর্কে 'কল্লোল'-এ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যে বলে-ছিলেন নজরুলের কবিতায় স্নোপাউডার অর্থাৎ প্রসাধনের চর্চা ছিল না, অর্থাৎ কবিতাগুলি ছিল অমার্জিত এবং এলোমেলো—সেই অভিযোগ অভিজিতের হ্যাল্লো ক্যালকাটার কবিতাগুলো সম্পর্কেও খাটে। তাই বলে আমি অভিজিতের এই তেজী সাহসী বলিষ্ঠ প্রতিবাদী উচ্চারণকে কোনো-রকমেই খাটো করতে চাচ্ছিনা। এরকম অকপট, ঠোঁটকাটা, ক্রুদ্ধ ও কর্কশ স্বরে সময় ও স্বদেশের স্বরূপ ও সংকট তীরের ফলার মতো তুলে ধরে দেশবাসীকে দেখানোর প্রয়োজন আছে বৈকি! তবু। হ্যাল্লো ক্যালকাটার কবিতাগুলো থেকে দু-এক পংক্তি তুলে দেখানোর লাভ নেই, তাই বিরত থাকলুম; কেননা একটা গোটা কবিতার সমস্ত পংক্তি এক নিঃশ্বাসে একই বক্তব্যে অঙ্গীকারবদ্ধ।

ঈশিতা ভাদুড়ীর 'পুনর্জন্ম' সম্ভবত দ্বিতীয় কাব্য (নাকি কবিতা সংকলন।) এই বইটির একটু আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, কবিতাগুলি দুই, তিন বা চার পংক্তির মধ্যে সীমায়িত। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া আছে। কবিতাগুলি খুবই ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকে

লেখা। একান্ত নিজস্ব আত্মগত ভাবনা ভারি সহজ উচ্চারণে একটি বা দুটি উপমা বা চিত্রকল্পে এক-একটি কায়ামূর্তি গড়ে নিয়েছে। মানবিক প্রেম-ভালোবাসার অনুভূতিই কবিতাগুলিতে জলতরঙ্গের মতো টুংটাং শব্দে বেজে উঠেছে। বেশ লাগে, বেশ ভালো লাগে। যেমন :

পুণর্জন্ম

ঈশিতা ভাদুড়ী

সাংস্কৃতিক খবর

২০/ওয়াই, কে. পি রায় লেন

কলকাতা-৭০০০৩১

১। প্রকাশ্য জনপথে দাঁড়িয়ে
কোনো পিঁপড়ে অথবা মশা
তোমাকে ছুঁতে পারে,
আমি পারি না।

২। মেঘ তোমার জন্যে
সারা পৃথিবী তোলপাড় করে
আমাকে একটু ভালোবাসবে বলে।

৩। গোপন স্পর্শটুকু পাওনা যার,
সে জানে নিগ্রহীতা হতে
তাই নীরবতা এসে দাঁড়ায় মধ্যিখানে।

'পুনর্জন্ম' কবিতাটি একটি নিটোল মুক্তার মতো। আমি বেশ কয়েকবার মনে মনে পড়ে নিলাম।

ব্রহ্মকমল ফুল ছুঁইনি,
ফুলের মুখে মুখ রাখিনি আজো…
সেইটুকু কারণেই শুধু
চাই, পুনর্জন্ম সত্য হোক।

এইসব কবিতার যিনি জনয়িত্রী, তাঁর মগ্নচৈতন্যে অনেক ধ্যানের কবিতা আছে—আমার বিশ্বাস। তিনি লিখুন, আরো। কবিতাগুলি যাঁরা অনুবাদ করেছেন—গৌরী দে সরকার, শ্রীমতী কাশ্যপ, মীরা রায়, জনা রায়চৌধুরী, তাঁদের সাধুবাদ। তাঁদের অনুবাদকর্ম সার্থক হয়েছে।

মনের দুয়ার খুলবো কেন

দীপালি দেসরকার

প্রকাশক :
পি. কে. দে সরকার
হরিপাল, হুগলী

দীপালি দে সরকারের দ্বিতীয় কাব্য 'মনের দুয়ার খুলবো কেন' পড়ে হতাশ হইনি। কবির ব্যক্তিগত স্বাদু অনুভবগুলি খুবই অকৃত্রিম, হার্দ্য। কিন্তু তার প্রকাশ ভারি শাদামাটা, কোথাও কোনো মেঘ-রৌদ্রের আলোছায়া নেই, নেই মায়াবী বর্ণসম্পাত। আমার মনে হয়, কবি আরো চর্চা করুন, সেই অশরীরী কৌশল আয়ত্ত করুন যা 'শুষ্ক কাষ্ঠ'কে 'নীরস তরুবর' বলতে শেখায়। যিনি মনের দুয়ার খুলে রাখতে চান না, তিনি এত স্পষ্ট বর্ণনায় ও ভাষণে কথা বলবেন কেন?

সংবাদ

○ হুগলী জেলা পরিষদ ভবনে প্রেস কাউন্সিল সভাপতি

হুগলী জেলা পরিষদ হলে ২০শে জুন বিকেল ৪টায় জেলা তথ্য দপ্তরের সহযোগিতায় এক সভায় প্রেস কাউন্সিল সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ সেন জেলার পত্র-পত্রিকা সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হলেন। সভার শুরুতে শ্রীসেন তাঁর ভাষণে ভারতীয় সংবাদপত্র জগতে প্রেস কাউন্সিলের ভূমিকা ব্যাখা করেন। তিনি তাঁর ভাষণে আরও বলেন—প্রেস কাউন্সিল একটি স্বাধীন সংস্থা এবং কুড়ি বছর আইনের জগতে কাটাবার পর বিগত অক্টোবর'৮৫ থেকে তিনি এই সংস্থায় যোগ দিয়েছেন। তিনি সমস্ত ধরনের সংবাদপত্রকে প্রেস কাউন্সিলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে অনুরোধ করেন।

হুগলী জেলা পত্র-পত্রিকা সমিতির সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র ভড় কেন্দ্রীয় সরকারের নিউজ-প্রিন্ট বণ্টন-নীতির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, সারা বছরের কাগজ একসঙ্গে কেনার সঙ্গতি কোন ছোট কাগজের নেই। তিনি এ ব্যাপারে প্রেস কাউন্সিল সভাপতিকে হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ জানান। শ্রীভড় কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপণ-নীতিরও তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, মুখে বা লিখিতভাবে বিজ্ঞাপণের শতকরা ষাট ভাগ ছোট ও মাঝারী সংবাদপত্রকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে তা রক্ষিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে জানুয়ারী '৮৬-র পর থেকে এখনও পর্য্যন্ত কোন বিজ্ঞাপণ না দেবার ঘটনা শ্রীসেনকে জানান। সম্প্রতি পঃ বঃ সরকার এক নির্দেশ জারী করে সংবাদ পত্রকে বিবৃতি না দেবার জন্য প্রশাসনকে জানিয়েছেন—ঐ নির্দেশ তুলে নেবার জন্য শ্রীভড় প্রেস কাউন্সিল সভাপতিকে নির্দেশ দেবার অনুরোধ করেন।

'পঞ্চায়েত' সম্পাদক শ্রীসুশান্ত সরকার তাঁর ভাষণে বলেন, সরকারের পক্ষে যাঁরা লেখেন আর সরকারের বিরূপ সমালোচনা যাঁরা করেন পঃ বঃ সরকার তাঁদের সঙ্গে দু'রকমের ব্যবহার করছেন। এই ব্যবস্থার প্রতিকার প্রার্থনা করেন শ্রীসরকার। তিনি মুর্শিদাবাদ নিউজ সম্পাদকের ওপর পুলিশী অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করে এ ব্যাপারে প্রেস কাউন্সিলের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রভাসলাল দাস, শিবরাম কুণ্ডু (বর্ত্তমান ভারত), পারুল ভট্টাচার্য্য (চরাচর), জগবন্ধু মহান্তী (পরিবর্ত্তক), অশোক চট্টোপাধ্যায় (গোধূলি মন), প্রবীণ সাংবাদিক কৃষ্ণধন গঙ্গোপাধ্যায় ও তরুণ সাংবাদিক সমীরণ মুখোপাধ্যায়।

○ ভাষা শহীদ তর্পণ

সম্প্রতি বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটের 'ত্রিসপ্তক' কার্যালয়ে বরাবরের মতোই এবারো বাংলা ভাষা আন্দোলনে অর্পিত-প্রাণ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হল গানে, গল্পে, আলোচনায় ও কবিতা পাঠে। বিভিন্ন জেলায় হরেক সাহিত্যপ্রেমী এসে ভিড় করেছিলো এই কাব্যমন্দিরের আলোছায়ায়। রানা বসু, পার্থ বসু, সন্দীপ দত্ত ছাড়াও কবি কৃষ্ণধর এর উপস্থিতি আলোচনা ছিল হৃদয়গ্রাহী। কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন উত্তম মণ্ডল, সুদীপ্ত বিশ্বাস, ধীরাজ দে, স্বর্ণলতা ঘোষ (মিত্র), সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সুনীল

পাঁজা, শম্ভু রক্ষিত, সুনীল মান্না, প্রদীপকুমার দত্ত, পাঁচুগোপাল হাজরা প্রমুখ সাহিত্যপ্রেমী মানুষদের অনুষ্ঠান অঙ্গনে মুগ্ধতায় বিভোর লক্ষ্য করা গেল। দরাজ, উদাত্ত কণ্ঠে ঋষিণ মিত্র মহাশয় সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারু প্রয়োগ এবং নিয়ন্ত্রন করলেন সহযোগীবৃন্দসহ সংগীতে, আতিথ্যে।

O একটি রবীন্দ্রস্নান শুচিতার অনুভূতি

সম্প্রতি হাওড়া জেলার নতিবপুরে "নতিবপুর সাংস্কৃতিক সংসদ" আয়োজিত এক মনোজ্ঞ সাহিত্য-শিল্প মগ্ন বাসর অনুষ্ঠিত হল, যার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথাছুট্ ভিন্ন মেজাজে রবিঠাকুরের স্কেচ 'রোগীর চিকিৎসা' হল। সুদীপ চ্যাটার্জী, অভিজিৎ ভট্টাচার্য মঞ্চায়ণে ওতপ্রোত হয়ে গেলেও কিছু শ্রুতিকটু স্বরক্ষেপণ নাটিকাটিকে ভারাক্রান্ত করে তুলল। সবুজ, শিউলি শিশু কিশোরদের তুখোড় তালিমে মঞ্চে হাজির করা হয়েছিল এবং ঠিক পরেই, তোতাকাহিনী রূপক নাটিকাতে। টিমওয়ার্ক, মাইম ব্যবহার, কোরিও-গ্রাফিক করিস্মায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল। স্বাতী দত্তগুপ্ত, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, অর্পিতা ঘোষ, স্বচ্ছন্দ, স্মার্ট অভিনয় করল। পোশাকে-আসাকে, প্রয়োগে শ্রদ্ধেয় হারাধন ঘোষ, রবিপ্রসাদ ঘোষ সফলতায় উষ্ণিস ও শিরোপা দখল করলেন। নাট্যালেক্ষ্যা, নৃত্য ও গীত সহযোগে যাঁরা প্রসাদ নৈপুণ্যে জমিয়ে দিলেন তন্মধে। সুমিতা চ্যাটার্জী, শ্রাবন্তী সেন, শতাব্দী সরকার, রমা মেউর, বিন্দু ভট্টাঃ, কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌসুমী চৌধুরীর ভূমিকা ভূমিকাবিহীণ সোচ্চার, সীমিত সরঞ্জামে আলোছায়া ও আবহের সংযত ভেলকি দেখালেন শুভব্রত বসু ও শেখর দত্তগুপ্ত। সুপ্রিয় ধর দুখানি রবীন্দ্রকবিতাকে নিয়ে বহুক্ষণ ড্রিবল করে সরাসরি বাইরে মারলেন অসফল পোস্টের। সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ দত্ত, গৌরাঙ্গ ঘোষ, দেবপ্রসাদ নাথ এর মৌন মুগ্ধতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে শেষ হল অনুষ্ঠান॥

O ক্ল্যাসিকের ক্ষুধিত পাষাণ

নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির ও চন্দননগর পুস্তকাগার অছি পরিষদের ১২৫ তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী শেষ হল রবিবার। পঁচিশে বৈশাখের প্রত্যুষকালে রবীন্দ্র প্রণামের মাধ্যমে যার সূচনা হয়েছিল চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠান হাজার হাজার দর্শকমনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে সঙ্গীত, নৃত্যনাট্য, যৌথ আবৃত্তি, আলোচনা ও নাট্য প্রযোজনার মাধ্যমে। ১১মে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীর চতুর্থ-দিনে সৌরেন্দ্র নাথ দাসের রবীন্দ্রসংগীত ছাড়াও তিমির ভট্টাচার্য, সুশান্ত ব্যানার্জীর দরাজ কণ্ঠের গান শ্রোতার মন জয় করেছে। এদিনের মূল আকর্ষণ ছিল চন্দননগর ক্ল্যাসিক প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণ নাটকটি। সমর চ্যাটার্জীর নাট্যরূপে, কুশীলবদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায়, সুচারু দাসের সু-পরিচালনায় রবীন্দ্রনাট্যের সার্থক রূপায়ণ ক্ষুধিত পাষাণ। বরীচের বাদশাহী প্রাসাদের যৌবনচঞ্চলা রমণীদের মায়াজাল, সম্রাট দ্বিতীয় শা-মামুদের অদমন নারীবিলাস, বাঁদীর হাটে নারী কেনা বেচার প্রতিটি দৃশ্য কুশীলবদের আন্ত-রিকতায় পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছিল, ক্ষুধিত পাষাণের অন্তরালে ক্রন্দসী রাত্রি ও রমণীয় গল্পের মেজাজটি মঞ্চ-সজ্জায় বেশ স্পষ্ট।

প্রায় আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত নায়কের ভূমিকায় সমর চ্যাটার্জী বেশ স্বচ্ছ ও বলিষ্ঠ অভিনয় করেছেন, বরীচ প্রাসাদের বৃদ্ধ কেরাণী করিম খাঁর রূপসজ্জায় ইন্দ্রজিৎ বসু, মেহের আলির ভূমিকায় সুচারু দাস প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন। আর মেজাজ মর্জির দিক থেকে দ্বিতীয় শা-মামুদ চরিত্রে অমিতাভ মুখার্জীর মধ্যে পরিণতির ছাপ লক্ষণীয়, যুবক মেহের আলির রূপ-সজ্জায় ভাস্কর মুখার্জীর আরো অনুশীলন দরকার, স্বপ্ন-সুন্দরীদের ভূমিকায় মধুমিতা দাস, রুবি দে, মৌসুমী বিশ্বাস, শ্রাবন্তী মিত্র ও মৌসুমী মুখার্জী সবাই মোহ-জাল ছড়িয়েছেন।

দর্শকমনে, অন্যান্য ভূমিকায় বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী, নীলরতন কুণ্ডু, মধুসূদন ব্যানার্জী, রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, রঞ্জিত দাস, প্রণব শীল যথাযথ। সংগীত পরিচালনায় মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন কার্ত্তিক বাগ। সামগ্রিকভাবে ক্লাসিক একটি সার্থক প্রযোজনাকে নবরূপে দর্শককে প্রীতি উপহার দিয়েছে।

O প্রমিলা অঙ্গনের বাৎসরিক অনুষ্ঠান

৩১শে মে রবিবার চন্দননগরের 'প্রমীলা অঙ্গন' তাদের প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে এ. সি. চ্যাটার্জী লেন যোগীপাড়ায় একটি নাটক মঞ্চস্থ করে। সঞ্চিতা ভট্টাচার্যের উদ্বোধনী সংগীত দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু। এরপর লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মঞ্জুলা ভট্টাচার্য্য। শেষে নাটক। প্রায় প্রত্যেক সদস্যারাই বলতে গেলে এই প্রথম অভিনয়। আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার অভাব না থাকায় অভিনয় দর্শক ধন্য হয়েছে। এরই মধ্যে চৈতালী মোহন্ত, নমিতা কোলে, দেবশ্রী ব্যানার্জী, চৈতালী রায় ও জয়ন্তী বৈরাগী অভিনয়ে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছেন।

O রবিবাসরের কবি প্রণাম

২৬শে বৈশাখ সন্ধ্যায় নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে 'রবিবাসর', নৃত্যগোপাল অছি পরিষদের সহযোগিতায় গীতিআলেখ্য, কবিতা আলেখ্য ও নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে নিবেদন করল ১২৫তম রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে তাদের কবি প্রণাম।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি অরুণ চক্রবর্তী।

মিতা মুখোপাধ্যায় পরিচালনা করেন গীতি-আলেখ্য। প্রস্তুনায় ছিলেন তরুণ আবৃত্তিকার স্বপন আঢ্য। শ্রীআঢ্য ছোটদের নিয়ে একটি আবৃত্তি আলেখ্যও পরিচালনা করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল শম্ভু বরাটের পরিচালনায় নৃত্যনাট্য 'সামান্য ক্ষতি'। রাজা ও রাণীর ভূমিকায় যথাক্রমে রূপা ও রিন্টু সুন্দর অভিনয় ও নৃত্য পরিবেশন করেন। ছোটদের মধ্যে অদিতি চট্টোপাধ্যায় বর্ণালী ঘোষ, সুমিত্রা ঘোষ, মৌসুমী প্রামাণিক নৃত্য ও অভিনয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন।

প্রগতি ও সমৃদ্ধির নয় বছর

পশ্চিমবাংলা এগিয়ে চলেছে এক নতুন পথে

বামফ্রণ্ট সরকার ভারতবর্ষে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামের এক অগ্রবর্তী ঘাঁটি। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলির সর্বপ্রকার চক্রান্ত এই সরকার ব্যর্থ করে'ছ পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতায়। সীমিত ক্ষমতা ও অপ্রতুল আর্থিক সহায় সম্বলের ওপর নির্ভর করেও রাজ্য সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী রূপায়িত করে চলেছে। বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় জনগণের অবস্থার মৌলিক কোনও পরিবর্তন সম্ভব নয়।

পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খল পরিস্থিতি মোটামুটি সন্তোষজনক। জাত-পাত, ভাষা বা ধর্মের প্রশ্নে এ রাজ্যের মানুষ কোন অসহিষ্ণু আচরণে লিপ্ত হয়নি। জনগণ স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করছেন। রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতি আধুনিক ও বৃহৎ শিল্পের বিকাশের ওপর নির্ভরশীল। বৃহৎ শিল্পের ক্রমবিকাশে কেন্দ্রীয় সরকারের বিনিয়োগ ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা খুবই জরুরী। পশ্চিনবঙ্গ এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রত্যাশিত সুবিচার পাচ্ছে না। হলদিয়ায় পেট্রোকেমিক্যালস কারখানা ও বিধান নগরে ইলেকট্রনিক শিল্প স্থাপনে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিনিয়োগের প্রত্যাশা করছিল। বহু টালবাহানার পর কেন্দ্র দুটি ক্ষেত্রেই তাদের হাত গুটিয়ে নিয়েছে। রাজ্য সরকার বে-সরকারি শিল্প সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই কাজগুলি করছে। যৌথ উদ্যোগ ও বেসরকারি উদ্যোগ উভয় মাধ্যমেই কাজ শুরু হয়েছে। বে-সরকারি বিনিয়োগকারীরা যাতে এ রাজ্যে অধিকতর লগ্নী করেন সেজন্য পরিকাঠামোগত ও অন্যান্য সুবিধা দানের দিকে সরকার নজর রেখেছে।

কৃষি উৎপাদনে এ রাজ্যের অগ্রগতি বিশেষ আশাপ্রদ। বিদ্যুৎ পরিস্থিতির মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টার সুফল পাওয়া যাচ্ছে। বামফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে রাজ্যের শিক্ষা জগতে নৈরাজ্য নেমে এসেছিল। সরকার গৃহীত ব্যবস্থাবলীর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে আন্তরিক প্রচেষ্টা জন সমর্থন লাভ করেছে।

রাজ্য সরকার জনগণের ব্যাপক অংশের গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটানোর কাজ করে চলেছে। আত্মবিশ্বাসের বলে বলীয়ান হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ক্রমশঃ এগিয়ে চলবেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

O প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন O

O রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখতে বলেছেন — কিন্তু এত অসংখ্য লেখা হয়েছে এ বিষয়ে যে যেমন তেমন করে একটা কিছু লিখে দেবার কোনো অর্থ হয় না। তবু একটা লেখার দায়িত্ব নিয়ে ১০ দিন ধরে হাবুডুবু খাচ্ছি। শিমলার Advanced Studies Institute একটি সর্বভারতীয় সেমিনারের আয়োজন করেছে। ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আইয়ুবের কিছু সুখস্মৃতি জড়িয়ে আছে বলে ওখানে আর একবার যাবার লোভে একটা Paper লিখতে রাজি হয়েছি। সেই Paper এখন দিবসের স্বস্তি রাত্রির নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। এটা শেষ করে আমি শিমলা চলে যাবো। ১লা কি ২রা জুলাই ফিরবো - তখন যদি কিছু তৈরী করে দিতে পারি তাহলে দেব। কিন্তু সম্পূর্ণ ভরসা দিতে পারছি না। আমার অবস্থা বিবেচনা করে ক্ষমা করবেন।

গৌরী আইয়ুব
5 Pearl Road, Calcutta-17

O O O O

O পত্র ও কবিতা পেয়েছি। বর্ত্তমানে অবস্থত। এককের জন্যে প্রেসের দেনা শোধ করতে পারছি না. তাই একক বৈশাখ আষাঢ় এখনো বের করতে পারছি না। রবীন্দ্র সংখ্যা করছি! পুজাসংখ্যায় আপনার কবিতা যাবে।

গোধূলি-মন নিয়মিত বের হচ্ছে, কাগজও ভালো হচ্ছে। এখন একটা লক্ষ্যপথ ঠিক করে চলার দরকার।

আমি ছিন্নপত্রাবলীর ওপর একটি সংক্ষিপ্ত লেখা দিলাম। বর্ত্তমানে ঠিক করেছি - গদ্য লেখা বিনা দক্ষিণায় দেবনা, শুধু দু-একটি কাগজ বাদে ; যেমন একক, গোধূলি-মন প্রভৃতি কাগজ কারণ এই কাগজগুলোর প্রতি আমার কৃতজ্ঞ হওয়ার কারণ আছে। গোধূলি-মন আমার ওপর একটি সংখ্যা করেছে, সে কথা কখনো ভুলবো না।

যখনই দরকার বলবেন, সময় পেলে লিখে দেব। একটা স্মৃতিমূলক রচনা শুরু করেছি; সেটি কি প্রতিসংখ্যায় কিছু কিছু ছাপা যেতে পারে?

ছিন্নপত্রাবলীর ওপর এই লেখাটি অতিদ্রুত লিখতে হ'লো, যদি অসুবিধে মনে করেন— জানাবেন, অন্য লেখা দেবার চেষ্টা করবো: মুক্তধারার ওপর আর একটি লেখা করতে হবে — অন্য এক কাগজের জন্যে!

শুদ্ধসত্ত্ব বসু
10/3c, Nepal Bhattacharya Street,
Calcutta-26

O O O O

O গরমের ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিলাম ফিরে এলাম দিন পঁচিশেক পরে পেয়ে গেলাম একসঙ্গে দু'দুটি সংখ্যা গোধূলি মনের—৯৩র বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। ভাবা যায়, ক্ষুদ্র পত্রিকার এরকম দুরন্ত মসৃণ সময়মাফিক গতি! পড়ে ফেললাম সব। আমি অবাক হ'লাম— আমার ছোট ২ পাতার নিবন্ধটি আবার ছবি সহ সযত্নে ছাপা হয়েছে প্রথমেই। এরকম উদার মনোভাবের জন্যই গোধূলিমন আমাদের পত্রিকা হ'য়ে উঠেছে—এখানে যেন হৃদয়ের প্রধান্য বেশী বুদ্ধি তার পাশে পাশে।

নীতা দে
২৮ ভাবা রোড, দুর্গাপুর

Member { Press Council of India
All India Small & Medium News Paper Association, Delhi.

GODHULI-MONI N. P. Regd. No. RN. 27214/75 JUNE '86 (আষাঢ় '৯৩)
Vol. 28, No. 6 Postal Regd. No. Hys-14 Price—Rs. 2·00 only

শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কীয় লেখা নিয়ে
প্রকাশিত হচ্ছে

গোধূলি মন

শ্রাবণ ১৩৯৩ সংখ্যা

কবিতায় আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ/প্রভাস চৌধুরী

ছোটগল্পের রবীন্দ্রনাথ/অজিত রায়

ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রনাথ/ডঃ শুদ্ধসত্ব বসু

রবীন্দ্রনাথ, জালিয়ানওয়ালা বাগ ও বাঙালী মানস/গজেন্দ্রকুমার ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ : স্মৃতির আলোয়/শিশিরকুমার মিত্র/অনুবাদক :
ডাঃ জ্যোতির্ময় বসু

এছাড়াও লিখছেন : অমিতাভ বাগচী, গৌরী আইয়ুব,
সৌমেন অধিকারী, সেফিওর রহমান ও ঈশিতা ভাদুড়ী

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পপুলার প্রিন্টার্স, বারাসত, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও নতুনপাড়া, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

গোধূলি মন

১২৫তম রবীন্দ্র জয়ন্তী সংখ্যা।

শ্রাবণ/১৩৯৩

॥ উত্তর প্রবাসী সাহিত্য পুরস্কার ১৯৮৫ ॥

সুইডেন থেকে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকা উত্তর প্রবাসী ১৯৮৫ সালের জন্য পুরস্কার দিচ্ছেন গল্পকার উদয়ন ঘোষকে। উত্তর প্রবাসীর ৫ম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ পুরস্কার পাচ্ছেন বাংলাদেশের গল্পকার আবুল হাসানাত।

উক্ত দু'টি পুরস্কার ছাড়াও কবি দেবী রায় ও কবি সোফিওর রহমানকে 'কবি স্বীকৃতি' মানপত্র দেবার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে।

প্রতি সংখ্যা দুই টাকা
বার্ষিক সডাক কুড়ি টাকা

প্রগতি
সাহিত্য
মাসিক

গোধুলি মন

২৮ বর্ষ/৭ম সংখ্যা।
জুলাই/১৯৮৬
শ্রাবণ/১৩৯৩

অশোক চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক

সম্পাদকীয় ঃ
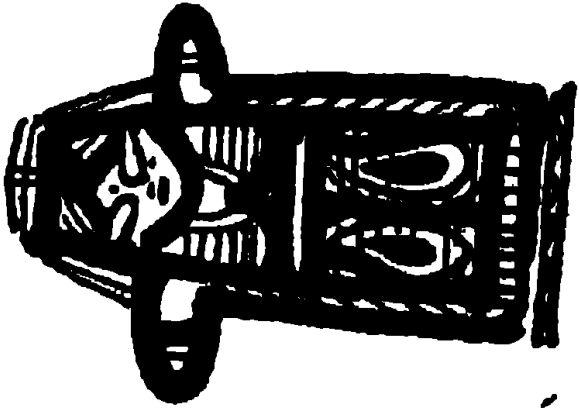
গতানুগতিকতায় বিশ্বাসহীন আমরা শ্রাবণ কেই বেছে নিলাম কবি প্রণাম-এর শ্রেষ্ঠ সময় হিসাবে। যিনি মৃত্যু সম্পর্কে বলতেন, 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।' তিনি এখন অমৃতলোকের বাসিন্দা। আর তাঁকে হারাণোর পর দিনে দিনে আমরা একটু একটু করে আন্দাজ করতে শিখেছি—তাঁর বিশালত্বের পরিমাপ। তবে শ্রাবণে শুরু হলেও শেষ নয়। কবিগুরুর একশত পঁচিশতম জন্মবার্ষিকী স্মরণে আমাদের এ বছরের বাকি সমস্ত সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কীয় লেখা রাখার ইচ্ছা রইল। তবে ছোট পত্রিকার সাধ ও সাধ্যের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান কবিগুরুর ভাষায় হয়তো শেষে বলতে হবে—

'সাধ ছিল যত সাধ্য ছিল না'।

● সম্পাদকীয় কার্যালয় ॥ নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর-৭১২১৩৬ ॥ হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ

কবিতা

তার সমুদ্রবাগান সভায়/অরুণকুমার চক্রবর্ত্তী

তোমার কাছে আসতে আমার লজ্জা করে ;
কবি আমার,
তোমার কাছে আসতে আমার লজ্জা করে

চিনিয়ে দিলে জীবনযাপন, চিনিয়ে দিলে আনন্দ
আকাশবাড়ীর বারান্দাতে, বইছে বাতাস সুমন্দ

কবি আমার
বিশ্ব আমার,
তোমার কাছে আসতে আমার লজ্জা করে
লজ্জা করেই, অন্ধজানা,
সিঁড়ি নামাও, উঠবো তোমার আকাশঘরেই

সেই তো তোমার স্নেহ এবং সেই তো তোমার চাবুক
দুঃখ যদি নামে তবে আকাশ ফুঁড়েই নামুক

শেকড় থেকে আকাশ এবং
আকাশ থেকে শেকড়, নৌকো তোমার
গহণউজান সমান বাহির-ভেতর

লজ্জা ভাঙাও, ভেতর জাগাও,
থাকবো না আর আড়ালে ;
বিশ্ব আমি পেতেই পারি ছোট্ট দুহাত বাড়ালে ;
কবি আমার, সখা আমার
তোমার সমুদ্রবাগান সভায় আমার শেকড় জড়ালে।

দেওয়ালের ছবি ঃ একশো পঁচিশ বছর/ রবীন সুর

এই মেঘ এই বৃষ্টি তবুও আকাশ
কতোকাল আগে যেন জেনে গেছে ঠিক
নিজেকে নিজের মত থাকতে হয় চারিত্র্যে অটুট।
নশ্বর শ্মশানে পোড়ে অর্ধদগ্ধ শরীরী জঞ্জাল
চেটেপুটে পরিতৃপ্ত শিবা ও শকুন যথাকালে কেটে পড়ে।
যতদুর নিজেকে ছড়াবে সমুন্নত অন্বেষায়
দিগ্বিদিকে বিস্তারিত ডালাপালার সহিষ্ণু সংসারে
ঝড়ের ধকল, পোকামাকড়ের প্রবল উৎপাত
পাখি ও ফলের পাশে মৌচাকের মধু, যা একান্ত সুদুর্লভ
প্রতিকুল অত্যাচারে গানহীন পরিমণ্ডলের
টোকো গন্ধ, গেঁজলে ওঠা রসের ভাঁড়ার।

বনস্পতি প্রতিভায় ছিল দুঃখ, মৃত্যু শত শত—
জীবন কি থেমেছে তাতে ? শিল্পিত আঙুলে
রোদকে জ্যোৎস্নার তাঁতে কত নক্সা নিঃশব্দে ফোটালে,
কপাল ভ্রূকুটি থেকে ঝুলে থাকা জিজ্ঞাসা চিহ্নের
টিকলো নাকের কাছে কে দিয়েছে প্রকৃত উত্তর ?
উত্তরের এ-মুড়ো ও-মুড়ো ধ্যানমগ্ন হিমালয়
ব্যাপ্তি, সৃষ্টি ঋজুতার নমুনায় যথাযোগ্য রবীন্দ্র-প্রতীক।
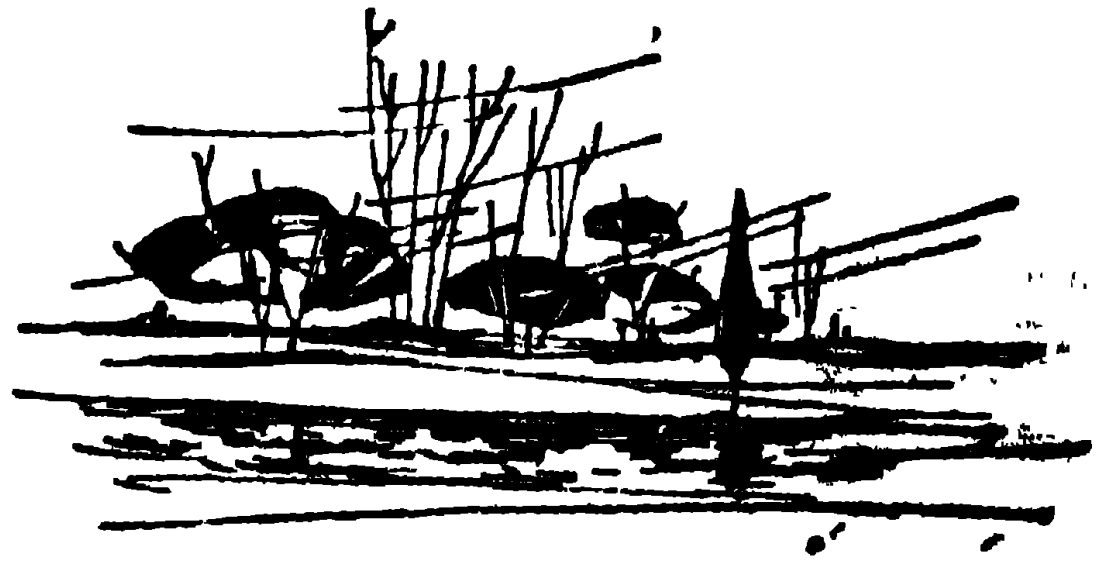
রবীন্দ্রনাথ প্রিয়বরেষু/সোফিওর রহমান

এই উপমহাদেশের সব রশ্মিজুড়ে তোমার গান
আমার আনন্দের পারফিউম্ আর বেদনার সাম্রাজ্যের
প্রিয় অভিমান, নাভিস্তম্ভে আদিতম সেই শব্দগুঞ্জন
অঙ্গারচূর্ণের পাশে কতো মায়াযুগ অভিসার—
কোরাণ শুনবো না, সুচিত্রা মিত্রের মতো কেউ যদি
আমাকে মৃত্যুলগ্নে তোমার গান শোনায়। ক্ষতস্থানে
ওষধি, দীবোন্দু প্রদীপের আভায় প্রজন্মের সুধা ছড়িয়ে
হিমোগ্লোবিনে দিয়ে রেখেছো খাদ্যগুণ। বন্ধু হে,
জন্মেরও প্রিয়, মৃত্যুর অধিক মহান—যেন পিঠেপিঠে
সহোদর তুমি-আমি, সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণে।
রোমরাশি জুড়ে
আমাদের প্রিয় সখ্যতার স্বেদ, কালভোরে
আবার জেগে উঠবো
তোমারই সাথে—টেপে যখন 'লবণ্য'
বাজাবে তোমার গান;
অই সুরে যুদ্ধজয়ের নেশা পেয়ে বসে,
সামাজিক সব বৈষম্যের প্রতি
সঞ্চারিত হয় বুকের যতো ঘৃণা।
ঈশ্বর দেখিনি কোনোদিন,
তোমাকেও নয়, তবে মহাজাগতিক অঙ্ক-সংসারে
একদিন
দেখেছিলুম তোমাকে, দুরত্বহীন মুখোমুখি;
সত্যলোকের তরুণবৃক্ষে বসে
অমৃতফল ভাগ করছি দু'জন—তবু তোমার সখ্যতায়
আমার
তেমন বিশ্বাস নেই গো ললিতসখা।
কারণ, তুমিই শেষ কথা নও আমার,
জীবনে কিংবা মরণের পর এই বন্ধন ছিঁড়ে দিতে
পারি।
তখন হয়তো নিজেই নিজের বন্ধু অথবা অন্য কেউ,
কিন্তু আজও
লালরক্তের মৃদঙ্গে তুমিই আছো, আপাত বিকল্পহীন।

কবিগুরু শ্রদ্ধাস্পদেষু/ঈশিতা ভাদুড়ী

স্বতঃসিদ্ধ নিয়মে
আমার পঁচিশ বছর বয়েস
তোমার 'একশো পঁচিশ' স্থাপে;
উৎসবে উৎসব, অক্ষরে অক্ষর মাতামাতি…

তোমার দু'চোখে কি অশ্রু আসে কবি?
ক'জন অন্ধমানুষ আজ
তোমার সহিষ্ণু মূর্তিকে সাক্ষী রেখে
নিজেরা এলোমেলো হয়ে যায়।

কবি, ক্ষমা কোরো এইসব
নির্বোধ উত্তরপুরুষের উন্মাদনা।

প্রসঙ্গ ঃ ছিন্নপত্রাবলী

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

পৃথিবীতে পত্রসাহিত্যের স্বীকৃতি কিন্তু খুব বেশীদিনের নয়, কিন্তু এরই মধ্যে সাহিত্যের একটি বিশেষ প্রদেশ হিসাবে—এর স্বাতন্ত্র চিহ্নিত হয়েছে; এবং বিশিষ্ট ব্যক্তির পত্রাবলীর সৌগন্ধ এবং বর্ণাঢ্যতা পাঠক-সমাজে মুগ্ধতার আমেজ সৃষ্টি করেছে। আগে এই পত্রাবলীকে স্বয়ংস্বতন্ত্র রূপকল্প হিসাবে সাহিত্যের এলাকায় কোনো ভৌম অধিকার দেওয়া হয়নি, কারণ হিসাবে স্পষ্ট কোনো যুক্তির কথা তেমন জোরের সঙ্গে উল্লিখিত না হলেও শোনা যেত যে ব্যক্তিবিলোপী বিষয়মুখিনতার জন্যেই পত্র-সাহিত্যকে সাহিত্যীয় এলাকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হত না।

কিন্তু একালের চিন্তায় প্রাগ্রসর ঔজ্জ্বল্যবসত: পৃথিবীর বেশ কিছু ব্যক্তিক চিঠিকেও সাহিত্যীয় মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে। ব্যক্তিজীবনের প্রাত্যহিক মুহূর্তের মধ্যে নিজের একান্ত উদ্ঘাটন এবং রচয়িতার হৃদয়ের উষ্ণ সান্নিধ্য লাভ করাকে উপরিপাওনা হিসাবে এখন গণ্য করার রেওয়াজ হয়েছে। সুতরাং সাহিত্যকর্ম ছাড়া লেখক বা কবির ব্যক্তিক পত্রের মধ্যে যদি কিছু উষ্ণতা পাওয়া যায়—তা খোঁজ করতে উদ্যোগ নিন্দনীয় বলে এখন আর গণ্য নয়; বরং উল্টে বলা যায় যে বিশিষ্ট লেখক ও শিল্পীর ব্যক্তিক পত্রেও যে শিল্পসুষমা ও সাহিত্যগুণ আছে—তা খুঁজে পেতে ভাণ্ডারে জমা করতেই হবে।

পত্রসাহিত্য হলো জীবন-ছোঁয়া শিল্প, এখানে দৈনন্দিন কাজকর্মের ফাঁকে ঘরোয়া মানুষটার একটা হদিস পাওয়া যায়। বিশেষ করে রবীন্দ্র-নাথের মতো কবি-সার্বভৌমের চিঠিগুলিতে ঐ বিরাটপুরুষের জীবনের একটি দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিশ্বে পত্রসাহিত্যের স্বীকৃতি এবং কদর শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের পত্র যেদিন থেকে প্রকাশিত হতে শুরু হয়—সেদিন থেকেই সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করেছে। তাঁর অজস্র পত্র এখনো অপ্রকাশিত, এবং শান্তিনিকেতনে গিয়ে শুনেছি যে সংগ্রহের কাজ এখনো

চলছে, একদা এগুলি প্রকাশিতও হবে। তবু চিঠি-পত্রের যে খণ্ডগুলি বেরিয়েছে—তা থেকে নিশ্চয়ই বলা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়—ভানু-সিংহের পত্রাবলী, রাশিয়ার চিঠি পত্রের সঞ্চয় প্রভৃতি বইগুলির কথা স্মরণ রেখেই বলছি। প্রাচুর্যের দিক থেকে বোধ হয় ভলটেয়ার কিছুটা এগিয়ে থাকতে পারেন, তবে তাঁর সুবিশাল পত্রসাহিত্যের ভ ণ্ডারে কল্পনার প্রসারতা নেই। রবীন্দ্রনাথ যেমন অনেক চিঠিতে তাঁর কবি মানস এবং কাব্যজীবনের কোনো কোনো অধ্যায়ের উন্মেষ ও লালন পর্বের ব্যাখ্যা করেছেন তেমনটি অনেকের চিঠিতেই দেখা যায় না। অবশ্য কীটসের পত্র সাহিত্যের কথাটা এখানে একবার উল্লেখ করতে হয়; কীটসের কয়েকখানি চিঠিতে তাঁর সৃষ্টিশীল মানসের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। রবীন্দ্র-নাথের পত্রেও সৃষ্টিশীল মনটির পরিচয় আছে, তার সঙ্গে আছে আরো কিছু। রবীন্দ্রনাথ পত্রে সাধারণীকরণের মাধ্যমে পাঠকের মনোলোকের সঙ্গে একটা যোগসূত্র গড়ার প্রয়াস পেয়েছেন—তাঁর চিঠিপত্রে। পত্রের প্রাপকের জন্যেই মৌল আবেদন, তবু সাধারণও তা থেকে রসাহরণ করতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্রের বিষয়কে এমন করে প্রকাশ করেছেন যাতে তাঁর লেখার বিষয়টি সাধারণ পাঠকেরও মানসিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র বা ছিন্নপত্রাবলীর চিঠি-গুলির একটা বাড়তি বৈশিষ্ট্যের কথা আগাম বলে নিই। এই সব পত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং পাঠক ছাড়া--অদেখা কোন্ এক তৃতীয় ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। তৃতীয় সত্তার ব্যঞ্জনা মনে অনুভূত হয়; হয়তো প্রকৃতি চেতনা এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতির যোগফলে পত্রের মধ্যে একটি অবিনাশী কণ্ঠের ধ্বনি শ্রুতিতে না হোক—পাঠকের মনে ব্যঞ্জিত হয়, তাই খুব প্রাসঙ্গিক কিছু না বলেও আলাপচারিতার ভঙ্গীতে তিনি পরমতম এবং গভীরতমের সাধনাকে মূর্ত করে-ছেন খুব সামান্য কথার উল্লেখে।

রবীন্দ্রনাথ বিরাট পুরুষ। বিরাট প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির পত্রে ব্যক্তিগত জীবনের প্রাত্যহিক খুঁটিনাটির কথা যতটা থাকে, তার চেয়ে বেশী থাকে—তার অন্ত-র্জীবনের গভীর গোপন রহস্য। তাঁর প্রতিভা বিকা-শের ধারা, তাঁর মনন ও অভিব্যক্তির পথরেখা—এক কথায় মণীষী ব্যক্তিত্বের মানস-বিকাশের রহস্যটুকু—তাঁর পত্রে ধরা পড়ে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের পত্রে তাঁর কবিমানসের এবং মনোলোকের সূত্রসন্ধান ধরা পড়ে।

১৮৮৭ থেকে ১৮৯৫ সালের মধ্যে কবি রবীন্দ্র-নাথকে অনেক সময় পূর্ব এবং উত্তর পূর্ববঙ্গের জমি-দারি দেখাশোনা করতে হয়েছিল, এই উপলক্ষে তাঁকে পদ্মাতীরে বা পদ্মাবেষ্টিত গ্রামাঞ্চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকতে হয়েছিল। প্রকৃতির অপরূপ মাধুর্য, আশ্চর্য সৌন্দর্যেভরা পটভূমি যেমন তাঁর প্রতিদিনের জীবন-যাত্রাকে মধুময় করে তুলেছিল, তেমনি সাধারণ মানুষের দুঃখসুখে ঘেরা ছোট ছোট জীবনচিত্রও অপ-রূপ রহস্যে, বিস্ময়ে কবিকে মুগ্ধ করেছিল।

এই সময়ে কবি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে যে সব পত্র লেখেন—সেগুলির ব্যক্তিগত অংশ ছিন্ন করে সে সব পত্রের সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—তার নাম 'ছিন্নপত্র'। এখানে প্রায় দেড়শ'র কিছু বেশী চিঠি ছিল। রবীন্দ্রনাথের লোকান্তর প্রাপ্তির পর বিশ্বভারতী ছিন্নপত্রের কিছু চিঠির ছিন্ন অংশ পুনরায় যোগ করেন ঐ সব চিঠির পূর্ণাঙ্গরূপ দান করে এবং আরো কিছু নূতন চিঠি সংযোজন করে 'ছিন্নপত্রাবলী' নামে এক নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন। ছিন্নপত্রের চেয়ে এই গ্রন্থটি আয়তনে অনেক বড়। ছিন্নপত্রাবলীতে আড়াইশোরও বেশী চিঠি আছে।

আগেই বলেছি পূর্ব, উত্তর পূর্ববঙ্গে এবং উড়িষ্যার

কিছু অংশে বিস্তৃত ঠাকুর পরিবারের জমিদারী পরিদর্শন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঐ সব অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান। তখনকার দৈনন্দিন জীবন যাপনের এবং সেই অঞ্চলের ও পরিবেশের প্রভাব তাঁর অন্তর্লোকে কি রকম পড়েছে—ছিন্নপত্রাবলীর চিঠিতে মূলত: তারই ছবি আঁকা হয়েছে।

ঐ সময় তাঁর দিনগুলি বেশীরভাগ সময় জলপথেই কেটেছে। অনন্ত বিস্তৃত নীল আকাশ, আদিগন্ত বিস্তীর্ণ জলরাশি, তরঙ্গসঙ্কুল নদনদী, শ্যামল শস্যক্ষেত্র, ছায়া সুনিবিড় গ্রাম, সুখদুঃখমর্মরিত জীবনযাত্রা—কবির মনে যে মাধুর্য এনেছিল, তারই একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই পত্রগুলিতে ধরা পড়েছে। এই সব পত্রে কবির দিনযাপনের ডায়েরীকল্প ছাঁদটি যেমন আছে, তেমনই প্রকৃতি সম্ভোগের আনন্দ-স্মৃতিও রূপায়িত হয়েছে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের সঙ্গে দিনরাত্রির এমন নিরন্তর নিবিড় নিশ্ছিদ্র সম্পর্ক কবি জীবনে এক নূতন অভিজ্ঞতার জন্ম নিল। সেই অভিজ্ঞতার অভিনবত্বে, নদী পুলকিত প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে কবি-প্রাণ অভিভূত হয়ে পড়েছিল। পল্লীর এই পরিবেশে এসেই কবি প্রথম অনুভব করলেন—"পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দরী।" "এই যে ছোট নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে, এবং এই অনন্ত ধূসর নিঃশব্দ চরের উপর প্রতিরাত্রে শত সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে—" জগৎ-সংসারের এই মহৎ ঘটনাটিকে নানাভাবে প্রকাশ করাই কবির কাজ হয়ে দাঁড়ালো—ছিন্নপত্রাবলীর অধিকাংশ চিঠি পড়লেই তা বোঝা যাবে।

জলপথে ভ্রমণ করতে করতে কবির অন্তরে নদী চেতনা স্পর্শরূপ লাভ করে এবং পত্রাকারে তা লিখিতও হয়। পদ্মার বুকে অবিশ্রাম ভেসে চলা, এবং সঞ্চরমান তীর তরু লোকালয় দেখতে দেখতে অভিভূত হওয়াই দিনরাত্রির সবচেয়ে বড় কর্তব্য হয়ে উঠলো কবির কাছে। জ্যোৎস্নাপুলকিত পদ্মা, দ্বিপ্রহরের স্তব্ধ নদী, তটপ্রান্তের কর্মকলরব, সূর্যাস্তকালের সোনার রঙ মাখা জলরাশি, ঘুমন্ত গ্রামের আবেগ ও উত্তাপ স্পর্শ করে বয়ে যাওয়া মানুষ-ঘেঁসা ছোট ছোট নদী,—আবার বর্ষায় দুকূল প্লাবিত প্রমত্ত পদ্মা—কতরূপে নদীকে দেখে কবির মন নদী চেতনায় ভরে গেছে। অবিরত নদীর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কখনো কবির মনে হয়েছে, মানুষও নানা শাখা-প্রশাখা নিয়ে নদীর মতোই চলেছে। তার একপ্রান্ত জন্মশিখরে, আর একপ্রান্ত মরণ-সাগরে; দুই দিকে দুই অন্ধকার রহস্য, মাঝখানে বিচিত্রলীলা এবং কর্ম ও কলধ্বনি।

পদ্মালালিত ভূ-খণ্ডের শ্যামলিমা, ঋতু-রঙ্গশালার এমন বৃহৎ আয়োজন, প্রভাত সন্ধ্যার এমন অপরূপ বর্ণসমারোহ, শস্যক্ষেত্র প্রান্তরের এহেন বিপুল বিস্তার, নশ্বর দিবসের পাত্রে অসীমের এমন আনন্দরস কবির পক্ষে সেদিন অভাবনীয় ছিল। কবির "পথচলা মনে সেই সকল গ্রামদৃশ্যের নানা নতুন পরিচয় ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগাচ্ছিল। তখনই তাই প্রতিফলিত হচ্ছিল চিঠিতে"। সূর্যোদয় সূর্যাস্তে রাঙা দিনগুলি, ঘনঘোর মেঘে স্নিগ্ধ নীল দিনগুলি, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় শুভ্র প্রফুল্ল দিনগুলিকে কবি তাই পত্রের দর্পণে প্রতিবিম্বিত করে রেখেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে রহস্যমধুর প্রীতিসঘন, সৌন্দর্যব্যাকুল সম্বন্ধের প্রতিটি সুরই যেন নিত্যকালের ভাষায় ছিন্নপত্রাবলীতে লিখিত হয়ে গেছে। অজিত চক্রবর্তী মশাই-ও এই মর্মে লিখেছেন যে প্রকৃতির সঙ্গে এই নিগূঢ় সৌন্দর্য-উপযোগ—এর মধ্যে যে রস কবি পেয়েছেন—তা ছিন্নপত্রের চিঠিতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ছিন্নপত্রের চিঠিগুলি পত্র হিসাবে রচিত হলেও এগুলি প্রায় অন্তরঙ্গ দিনলিপি হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ ইন্দিরা দেবীকে লেখা এই চিঠিগুলিতে সংবাদ আদান-প্রদানের অবকাশ কম। প্রকৃতি-নিসর্গ, ভূদৃশ্য, নদী-

প্রান্তর, আকাশ-মৃত্তিকা আর বিশ্বের সোনার মায়া ভ্রাম্যমান কবির চোখে যে অমৃত মাধুরী বিকীর্ণ করে গেছে, ছিন্নপত্রাবলীর তাই হলো বৃহত্তম সংবাদ। সে কথা কবিও বললেন—"আর কতবার বলব, এই নদীর উপরে, মাঠের উপরে গ্রামের উপরে সন্ধ্যেটা কী চমৎকার কী প্রকাণ্ড কী অশান্ত কী অবাধ!" আর একটি পত্রে তিনি জানাচ্ছেন—"কতবার বলেছি কিন্তু সম্পূর্ণ কিছুতেই বলা যায় না।"

বারবার এই বিস্ময়ের খবরই কবি পত্রে পত্রে বলে গেছেন। তাই 'ছিন্ন পত্রাবলী' পত্র হয়েও সংবাদ-সর্বস্ব নয়, ছিন্ন পত্রাবলী সৌন্দর্যের মণিমুকুর। "এই যে ছোট নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে, এবং এই অনন্তধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপর প্রতি রাত্রে শতসহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে"—জগৎসংসারের এই আশ্চর্য মহৎ ঘটনাটি ছিন্নপত্রাবলী যুগের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার। প্রকৃতির সঙ্গে কবির রহস্যমধুর ও সৌন্দর্য ব্যাকুল একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে—সেই সম্পর্ক সৃষ্টির ইতিহাসই হলো ছিন্নপত্রাবলীর উপজীব্য বিষয়। অবশ্য তদানীন্তন কালের প্রত্যাহিক জীবনে যে উল্লাস ও বিস্ময়বোধ—সে কথাও দিনযাপনের খবর দেবার ভঙ্গীতে বলা হয়েছে। কবি যেন ,তাহের আনন্দস্রোতে ভেসে বেড়িয়েছেন, প্রতি দিবসের মর্মকোষের মধ্যে মধুলুব্ধ ভ্রমরের মতো আটকে পড়েছেন, প্রতিদিনের স্বাভাবিক মণিকণাগুলিকে পত্রের মালিকায় গেঁথে রেখেছেন। জ্যোৎস্না রাত্রির বর্ণনা, অপরূপ সূর্যাস্তের দৃশ্য পত্রের পর পত্রে বর্ণিত হয়েছে। কবি লিখেছেন—"আমি এক এক সময় ভাবি এই যে আমার জীবনে প্রত্যহ এক একটি করে দিন আসছে, কোনোটি সূর্যোদয়-সূর্যাস্তে রাঙা, কোনোটি ঘনঘোর মেঘে স্নিগ্ধ নীল, কোনোটি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় শাদাফুলের মতো প্রফুল্ল, এগুলি কি আমার কম সৌভাগ্য?" এই সৌভাগ্যের বর্ণনাই ছিন্নপত্রাবলীর সৌন্দর্য। জীবনের প্রত্যেক সূর্যোদয়কে কবি সজ্ঞানভাবে অভিবাদন করেছেন, এবং প্রত্যেক সূর্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মতো বিদায় দিয়েছেন, পৃথিবীর নশ্বরতার পটভূমিকায় প্রকৃতির দিকে অবিনশ্বরভাবে চেয়ে থাকার যে আকুলতা—সেই আকুলতার সংবাদই ছিন্নপত্রাবলীতে পত্রাকারে লিখিত হয়েছে।

ছিন্নপত্রাবলীর কয়েকটি পত্র অবশ্য শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা। সেই কয়েকটি পত্রেও কিছু হাসিতামাসা আছে, মস্করা ও রসিকতার লঘু ছন্দ আছে, কিন্তু নতুন পরিবেশে চলন্ত বৈচিত্র্যের নবীনতায় কবি যে মশগুল সে খবরও বিবৃত আছে।

ছিন্নপত্রাবলীর রচনাকাল হলো রবীন্দ্রনাথের মধ্যযৌবনের সবচেয়ে সমৃদ্ধ সৃষ্টিশীলপর্ব। গ্রাম বাংলার জীবনযাত্রা, নদী কল্লোলিত ভূখণ্ড, রৌদ্র ও জ্যোৎস্নার বিচিত্র বর্ণ সমারোহ, চর ও শস্য প্রান্তরের দিগন্তবিস্তৃত ঔদার্য—কবিকে বিশ্বের আত্মীয় করে তুলেছে কেমন করে—সীমার মধ্যে অসীমের অভিব্যক্তি কি করে উপলব্ধিলোকে রূপলাভ করে, ছিন্নপত্রাবলীর চিঠিতে সেই নেপথ্যলোকেরই ইতিহাস আছে। আর সমস্ত চিঠিতেই নন্দনগন্ধ পাওয়া যায়। নন্দনতত্ত্বের ভূমিকা হলো ব্যক্তিজীবনের ভাল লাগাকে বিশ্বলোকের সম্পত্তি করে তোলা। রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রের চিঠিগুলি লিখেছেন—তাঁর ভাললাগাকে কেন্দ্র করে, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত ভালোলাগাকে তিনি বিশ্বগত করে তুলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছিন্নপত্রাবলীর চিঠিগুলিতে প্রকৃতি নরনারী; আত্মপ্রসঙ্গ—সবকিছুকেই সহজভাবে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কোনো কিছুই জীবন থেকে পৃথক করে দেখেন নি। তাই এখানকার চিঠিগুলিতে তাঁর শিল্পীসত্তা এবং ব্যক্তিজীবনকে যেমন পাই, তেমনি এর সঙ্গে কবি বৃহত্তর জীবনেরও সমন্বয়

সাধন করেছেন। তাই তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতির পরিচয়ও রয়েছে এই গ্রন্থের পত্রাবলীতে।

ছিন্নপত্রাবলীর চিঠিগুলি একসঙ্গে পড়লে দেখা যাবে যে এইসব চিঠি ভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা হলেও কবির শৈল্পিক সৌন্দর্যে এবং বর্ণনার সৌরভে কেমন একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় পত্রগুলিতে। বিশ্বের অনেক গুণীজনের পত্রসাহিত্যে ধারাবাহিকতা থাকে, কিন্তু ছিন্নপত্রের ধারাবাহিকতা কোন বিশেষ বক্তব্য বা প্রসঙ্গ ধরে পরপর সজ্জিত হয়ে উপস্থিত হয় নি, তা উপস্থিত হয়েছে কবির স্বগত কথনের মধ্যে দিয়ে, কেমন একটা মাদক রসে জারিত হয়ে। প্রত্যেকটি পত্রের আত্মনিষ্ঠ স্বয়ংসম্পূর্ণতার মধ্যে দিয়ে কবি যেন আত্মআবিষ্কারই করতে চেয়েছেন। এই আত্ম-আবিষ্কারের সুপ্ত ইচ্ছাই পত্রের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করেছে।

রবীন্দ্রসমালোচকদের কেউ কেউ এমন কথা বলেছেন যে তাঁর ছিন্নপত্রের চিঠিতেই তিনি নিজের অন্তরঙ্গ মানসের অনুভবকে সোচ্চার করেছেন। পত্রে মানুষ নিজের মনকে মুক্ত করতে পারে সহজে। সামনে যাকে যে কথা বলতে বাধে, পত্রে অনায়াসে তার কাছে সে কথা হাজির করা যায়। ছিন্নপত্রের বহু চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের যে ব্যক্তিসত্তাকে উদ্ঘাটিত করেছেন, তা কিন্তু শিল্পী ও রসিক রবীন্দ্রনাথ। এই চিঠিগুলি লেখার সময় কবির শিল্পবোধ এক বৃহত্তর সত্যের অভিমুখে চলছিল। কবি এক মহাশিল্পীর পদসঞ্চার তাঁর অন্তরের অন্তস্থলে অনুভব করেছেন—জীবনের এক প্রগাঢ় সত্যের অনুভূতি কবিকে নতুন জীবন-জিজ্ঞাসাকে প্রান্তসীমায় অগ্রসর করিয়ে দিয়েছেন। এদিক দিয়ে ছিন্নপত্রাবলীকে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ কবি-চরিত বলে চিহ্নিত করা চলে। এই গ্রন্থের একটি পত্রে কবি এই সত্যানুভূতি প্রকাশ করেছেন—"আমার জীবনের অন্তস্তলে ক্রমশই যেন একটা নূতন সত্যের উন্মেষ হচ্ছে।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবির পরিচয় যেভাবে হয়েছে, তার বর্ণনাও এখানকার চিঠিতে আছে। কবির সামনে নিসর্গ লোকের রূপময় আবেষ্টন যেন উন্মুক্ত হয়েছে। আনন্দতন্ময় কবি জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এক উদার উন্মুক্ত সৌন্দর্যের আনন্দলোকে জন্মগ্রহণ করতে চেয়েছেন। এভাবে আত্মপ্রকাশের জন্যে ছিন্নপত্রাবলীর এক একটি চিঠি যেন এক একটি স্বগতোক্তি-ধর্মী কবিতা হয়ে উঠেছে। শেষের দিকের একটি চিঠিতে সন্ধ্যার যে অপরূপ বর্ণনা কবি দিয়েছেন, তার মধ্যে সন্ধ্যার সমস্ত ক্লান্তি ও কবিচিত্তের নির্জন একাকীত্ব একটি স্বপ্নমুগ্ধ রূপলোকের সৃষ্টি করেছে। এই জাতীয় চিঠি কবিমনের এক একটি মুডকে (mood) আশ্রয় করে উদ্ভাসিত হয়েছে। সেই জন্যেই সম্ভবত: গীতিকবিতার জন্মলক্ষণগুলির সঙ্গে এই পত্রাংশগুলি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

ছিন্নপত্রাবলীর চিঠিগুলিতে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-চেতনার উন্মেষের খবর আছে, আছে তাঁর আত্মোদ্ঘাটনের সত্যপরিচয়। প্রতিটি পত্র ধরে বিশ্লেষণ করে এইসব দেখানো যেতে পারে—কিন্তু বিস্তার ও দৈর্ঘ্যে খুব বড় হবে বলে আপাতত: এইখানে থামলাম। জানি 'ছিন্নপত্রাবলী' গ্রন্থের আলোচনায় এই প্রবন্ধটি ভূমিকাস্বরূপ, কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ততার জন্যে এইখানেই ইতি জানাই। ●

কবিতায় আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ

প্রভাসচন্দ্র চৌধুরী

আধুনিক কাব্য-আন্দোলন যখন বেশ জোরদার হয়ে উঠেছে তখনই 'পরিচয়' পত্রে প্রকাশ পায় রবীন্দ্রনাথের "আধুনিক কাব্য" শীর্ষক প্রবন্ধটি (বৈশাখ, ১৩৩৯)। প্রবন্ধটি প্রকাশ পেল এমন একটি পত্রিকায় যার সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্বয়ং একজন আধুনিক কবি। পত্রিকাটি আধুনিক কাব্য আন্দোলনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষকও। আধুনিক কবিতা সম্পর্কে এটি প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ হলেও আধুনিক সাহিত্যের অবক্ষয় ও আধুনিক লেখকদের রুচিবিকার ও চিত্তবিকৃতি সম্পর্কে বিশ্বকবির প্রাক্-কথন শোনা গিয়েছিল "সাহিত্য নবত্বে" এবং ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু মন্তব্যে। আধুনিক শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন কবিগুরু। তাঁর মতে, পাঁজি মিলিয়ে 'মডার্নের সীমানা নির্ণয় করা যায় না, যেহেতু "এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা।" নদী সোজা পথে চলতে চলতে হঠাৎ যে বাঁক নেয়, সেই বাঁককে বলে আধুনিকতা। "এই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।" যে-কোন কবিতার আধুনিক হতে বাধা নেই, যদি কবির থাকে মোহমুক্ত অনাসক্ত দৃষ্টি। ইংরেজ কবি ডে ল্যুইসও বলেছেন,

Modern poetry is every poem, whether written last year or five centuries ago, that has meaning for us still.

এই অর্থেই রবীন্দ্রনাথের সহস্র বর্ষ পূর্বের চীনা কবি লি-পোকে মনে হয়েছে আধুনিক।

সমস্ত কবিরই আধুনিক হবার একটা মোহ আছে। কালিদাসও তাঁর যুগে নিজেকে আধুনিক বলে প্রচার করতে গিয়ে "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকের নান্দীতে বলেছেন, 'পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং ন চাপি সর্বং নবমিত্য-বদ্যম্।' প্রকৃতপক্ষে আমরা যাকে আধুনিক অভিধা দিই তা' হোল সমকালীন। সমকালীনতাকে আধুনিক বললে সেকসপীয়র, গ্যেটে, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথকে বাতিল করে দিতে হয় অনাধুনিক আখ্যা দিয়ে।

কোন কবিতাই মহৎ হয়ে উঠতে পারে না যদি না তা রচিত হয় বর্তমানের পটভূমিতে—সমালোচক ব্রাডলির এই উক্তিটি গভীর অর্থবহ। কিন্তু বিস্মৃত হলে চলবে না যে বর্তমানকে অতিক্রম করার মধ্যেই নিহিত আছে কবির জীবনবোধের গভীরতা এবং অনাগত ভবিষ্যতের অদৃশ্য লিপি-পাঠের অসাধারণ ক্ষমতা। ক্ষণিক মত্ততার তুফান তুলে মাতামাতিকে আধুনিকতা বলতে রবীন্দ্রনাথ নারাজ। একে বলেছেন তিনি 'ছাঁটা কাপড় ছাঁটা চুলের খট্‌খটে আধুনিকতা'। এতে সাজের বাহার আছে। সেটাও আবার গোপনে নয়, প্রকাশ্যে, 'উদ্ধত অসঙ্কোচে'।

আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে কবিগুরুর মনে যে ধারণা গড়ে উঠেছে তা এই। আধুনিক সাহিত্যে বস্তু চাই যেহেতু মনকে আর ভুলিয়ে রাখা যাচ্ছে না মায়াজাল বিস্তার করে। আধুনিক কবিতার প্রধান গুণ নৈর্ব্যক্তিকতা। ব্যক্তিগত অভিরুচি, নিজস্ব ভাললাগা-মন্দলাগা বলতে কিছু নেই আধুনিক কবির। এঁদের কাছে ফুলও সুন্দর, চটি জুতোও সুন্দর। "কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দী-তে বিষয়ের আত্মতা।" ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটস প্রমুখ কবিরা প্রথাসিদ্ধ কৃত্রিমতা থেকে কাব্যকে উদ্ধার করে স্থান দিয়েছিলেন কবি-চেতনার অন্তঃ-পুরে। আধুনিকদের নিকট বস্তুসত্য বড় হয়ে উঠেছে কাব্য-সত্যের চেয়েও। দু'ধরণের বস্তুনিষ্ঠ আধুনিক কবির কথা বলতে গিয়ে কবি রবার্ট ফ্রস্টের কলমে ফুটে উঠেছে তীর্যক ব্যঙ্গ—

There are two types of realist—the one who offers a good deal of dirt with his potato to prove that it is a real one ; and the one who is satisfied with his potato scrubbed clean.

অর্থাৎ এক ধরনের বস্তুবাদী সত্যিকারের আলু প্রমাণ করার জন্যে মাটি মাখিয়ে রাখেন আলুর সঙ্গে। আর এক ধরণের বাস্তববাদী চান আলুকে ঝেড়ে মুছে রাখতে। আধুনিক কবিদের স্থান প্রথম শ্রেণীতে। রবীন্দ্র-তুল্য প্রতিভাধরদের কাছে শিল্পীর কাজ হোল জীবনকে পরিষ্কার রেখে আকারকে প্রকট করা—"the thing that art does for life is to strip it to form." বাস্তবতার নামে আধুনিকেরা যা আম-দানি করছেন পাশ্চাত্যের সাহিত্য থেকে তার নাম দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 'রিয়ালিটির কারি পাউডার'। ওর মধ্যে দুটি জিনিষ প্রকট—একটা হলো 'দারিদ্রের আস্ফালন,' অন্যটা 'লালসার অসংযম'। এ কথা তো ঠিকই যে 'জল যাদের ফুরিয়েছে তাদের পক্ষে আছে পাঁক'।

আধুনিকেরা বলেন, 'অয়মহং ভো'—আমাকে দেখো। লালিত্যে মন ভবাতে চান না তাঁরা। তাঁদের জোর হোল 'আপন সুনিশ্চিত আত্মতা', রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কারেকটার'। বিশ্বকে আধুনিকেরা দেখেছেন নির্বিকার তদ্‌গত দৃষ্টিতে। লাল চটি জুতোর দোকান নিয়ে লেখা এমি কোয়েলের কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে একটা ছবির আত্মতা। এই যদি হয় আধুনিকতার লক্ষণ তা হলে তাতে সায় নেই রবীন্দ্রনাথের। কীটসের Truth is beauty পংক্তিটির পুনঃ পুনঃ উক্তিতে অক্লান্ত কবি বলেছেন যে সত্য যখন সৌন্দর্য রসাশ্রিত হবে, তাকেই বলা হবে বাস্তব। কেবল বাস্তবকে নিয়ে কাব্য লিখলেই তা 'রিয়েলিজম' পদ-বাচ্য হয় না, যদি না তাতে থাকে রচনার জাদু। যে বাস্তব প্রাত্যহিকতার তুচ্ছতায় মলিন, বৈষয়িক সং-কীর্ণতায় অবরুদ্ধ তার মধ্যে সুন্দর নেই। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা তাতেই রয়েছে সুন্দর। মানুষের গৌরব ও ঐশ্বর্য সেখানেই যেখানে সে অতিক্রম করে প্রয়ো-জনের সীমা। ভাঁড়ার ঘরের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু তাকে রাখা হয় দৃষ্টির আড়ালে। কারণ তাতে

সুন্দর নেই। ড্রইংরুমের প্রয়োজন অল্প। কিন্তু সেখানে আছে সুন্দর। আনন্দদান ব্যতিরেকে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে সাহিত্যের এ কথা মানতেন না রবীন্দ্রনাথ। যে-বস্তু ভোগের সামগ্রী, যাতে আছে লোভের স্পর্শ তা' আনন্দদানে অক্ষম। যে সব ফুল ভোজন লোভের দ্বারা লাঞ্ছিত, হাটের রাস্তায় যাদের চরম গতি, সাহিত্যের আসরে তারা অবাঞ্ছিত। সজনে ফুল, চালতা ফুল ভোজ্য বস্তু। অন্য কোন আবেদন নেই এদের। সাহিত্যের বিষয় হতে পারে না এরা, যেহেতু বাস্তবাতিরিক্ত কিছু নেই এই অ-কুলিন ফুলগুলির।

আধুনিক বাংলা কবিতার আর একটা জিনিষ পীড়া দিয়েছে রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর মনে হয়েছে যে বর্তমান সাহিত্য শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। পরিমিতি-বোধের অভাবে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণ করেছেন একালের কবিরা। সৃষ্টির কাজকে অবজ্ঞা করে ইন্টেলেকচুয়াল হবার দুর্নিবার মোহে তাঁরা দিশেহারা। গ্রহণ-বর্জনের চিরাচরিত সাহিত্যিক রীতিটিকে লঙ্ঘন করে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন উপকরণের বহুলতায়, বিস্মৃত হয়েছেন এই তত্ত্বটি—'অমৃতের সার্থকতা তার অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যে'। কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে যা 'tease us out of thought as doth eternity.' যেমন সন্ন্যাস ধর্মের মুখ্যতত্ত্ব নিহিত নেই গৈরিক উত্তরীয়ে, আছে সাধনায় সত্যতায়। যে-রস পরিবেশন করা হবে তাতে চাই জীবনের স্পর্শ। লক্ষ্য রাখতে হবে, বিশেষ কালের বিশেষত্ব বা কলাকৌশলের অভিনবত্ব প্রদর্শনে যেন না বিকৃত হয় কাব্যরস। কবিগুরু স্বীকার করেছেন যে রসের সৃষ্টিতে অত্যুক্তির স্থান আছে। কিন্তু তাকে নিষ্কৃতি পেতে হয় জীবনের পরিমাণ রক্ষা করে। রূপ আর রসের মধ্যে প্রভেদ থাকবেই। আপন সীমার মাঝে রূপের প্রকাশ। বাস্তবকে উপেক্ষা করে আসন পায় রস। কবি হলেন রসের ভাণ্ডারী।

আধুনিক কবিতার ত্রুটি অনেক। একই বিষয়ের পৌনঃপুনিকতায় ও ক্লান্তিকর ছন্দের পরীক্ষা নিরীক্ষায় বিবর্ণ এ যুগের কবিতা। আধুনিক কবিতা কেবল তাড়াতাড়িত নয়, উপলব্যথিতগতি। নেই এতে ভাগিরথীর নীলধারার পরিচ্ছন্ন পবিত্রতা, নেই কবি-মনের স্বাভাবিক স্ফূর্তি। কবিতা এখন 'spontaneous overflow of powerful feeling' নয়, একটা craft মাত্র। প্রাচীনদের মতো আধুনিক কবিরা আর বিশ্বাস করেন না যে কবিরা কেবল জন্মান (Poets nascitur fit)। তাঁদের ধারণা কবিরা জন্মান আবার গড়ে পিটে তৈরীও হন (Poets nascitureted fit)। আগে ছিল স্বপ্নের সঙ্গে লুকোচুরি। এখন শব্দই স্বপ্ন। চৌমাথার ভিড় থেকে কোনমতে শব্দকে ফুসলিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘরে তুলতে পারলেই হোল। কবিতা লিখতে inspiration এর কোন প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শব্দের। কবি দু'জাতের। কোন কোন কবি স্বভাবতই মাতাল। তাঁদের কবিতার উৎস আবেগ। যাঁরা বুদ্ধিনির্ভর তাঁরা নিতান্তই প্রকৃতিস্থ। আধুনিকেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর। তাঁদের কবিতার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হোল, বুদ্ধির প্রাখর্য কেড়ে নিয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও সূক্ষ্ম অনুভূতির মহিমান্বিত সিংহাসন। ফলে একালের বহু কবিতাই টবে রোপিত ফুলগাছ। মৃত্তিকার গর্ভ থেকে রস সংগ্রহ করে না এদের কবিতা। কোন কোন কবিতায় সৌন্দর্য থাকলেও গন্ধহীন। দুঃখ করে রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয়েছিল, "কিছুকাল থেকে ভাষার বিকৃতি, ছন্দের স্খলন, ভাবের দুর্বোধ্য অসংলগ্নতা নিয়ে অকবির পথে কবিযশঃ প্রার্থীর সংখ্যা অবাধে বেড়ে চলেছে।"

কাব্য-আন্দোলন যুগে যুগে হয়ই। কাব্যের একটা বিশেষ ধারা দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকলে হাঁপিয়ে উঠবে পাঠককুল। কবিরাও চাইবেন বিবর্ণ

পৌন:পুনিকতায় ফিরে যেতে। তাই উনিশ শতকে রোম্যান্টিক সুর মিলিয়ে যেতে না যেতেই আবির্ভূত হলেন চিত্রল প্রি-র‍্যাফালাইটরা। তাঁদের যুগাবসানে শোনা গেল জর্জিয়ান কবিদের নকল ভাটিয়ালী। তাও চাপা পড়ল। সিম্বলিস্ট ও ইমেজিস্টদের কলরোলে। আধুনিক বাঙ্গালী কবিদের নিকট রবীন্দ্রনাথকে মনে হয়েছিল মারাত্মকরূপে প্রতারক। কবি-গুরুর মায়াবী আসঙ্গ নিরাপদ নয় জেনেই এই চিত্রল পতঙ্গের দল রেহাই পেতে চেয়েছেন তাঁর সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের মনে হয়েছিল একান্তরূপে ভারতীয়, তা তিনি যেখানে বসেই কবিতা লিখুন না কেন। তাঁর কাব্যে না আছে জীবনের জ্বালা যন্ত্রণা, না সংরাগের তীব্রতা, না বাস্তবের ঘণিষ্ঠতা। সর্বোপরি তিনি উপেক্ষা করেছেন মানুষের অনতিক্রান্ত শরীরটাকে। কাব্যের উপাদান সংগ্রহে বাধ্য হয়ে তাঁরা পাড়ি দিয়েছেন বিদেশে। দ্বারস্থ হয়েছেন হাইনে, হেল্ডার্লিন, রিলকে, বোদলেয়র, মালার্মে, র‍্যাবোঁ, ইয়েটস, স্পেণ্ডার, এলিয়ট, ডিলান. টমাস প্রমুখ শ্রুতকীর্তি কবিদের। এভাবেই তাঁরা সচেষ্ট হয়েছেন "পুর্ব পুরুষের বিত্ত শুধু ভোগ না করে তাকে সুদে আসলে বাড়াতে" (বুদ্ধদেব বসু)। তাঁরা বিশ্ব নাগরিক, কিন্তু স্বদেশে পরবাসী। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যে তাঁরা যেন বেমানান।

আধুনিক কবিদের কাছে কবিতার প্রথম ও শেষ কথা কবিতাই। তাতে ভালও নেই, মন্দও নেই। শ্লীল-অশ্লীলের কোন বালাইও নেই। যা কোন দিন কাব্যের বিষয় হতে পারে না তাই হোল র‍্যাবোঁর কাব্যের বিষয়। চোখ আর দৃষ্টবস্তুর মধ্যে যে পর্দা আছে তাকে সরিয়ে দিয়ে নগ্ন বাস্তবকে দেখতে এবং ব্যক্ত করতে বলেছেন তিনি। অশ্লীলতা সম্পর্কিত আলোচনায় বোদলেয়রের মনে পড়ে যায় পাঁচ সিকে দামের বেশ্যা লুইজ ভিইদিওর কথা। কবির সঙ্গে একদিন ল্যুভর মিউজিয়মে গিয়ে নাকি এই বারাঙ্গনা লজ্জা পেয়েছিল নগ্নচিত্র ও ভাস্কর্য দেখে। নারী সম্পর্কে কোন লজ্জা ছিল না বোদলেয়রের। গোটের মানবতাবাদ ও মঙ্গলবোধের প্রতি ছিল তাঁর বিরূপতা। তাঁর কাব্য ছিল শয়তান ধর্মের নারকীয়তায় ভরপুর। রবীন্দ্রনাথের মঙ্গলবোধে আস্থা হারিয়ে সুধীন দত্ত শূন্যবাদী। মালার্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল মূলত: উন্নাসিকতা, নেতিবাদ ও বিষণ্ন জীবনাদর্শের জন্যে। তিনি বুঝেছিলেন, কাব্যের সংসর্গ আর শিবার সদ্ভাব এড়িয়ে চলা অসম্ভব। রোমান্টিক কবিদের বৈশিষ্ট যদি হয় সমাজ বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্ব (ফ্রাঙ্ক কারমোড), তাহলে আধুনিকদের অনেকেই রোম্যান্টিক। আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট হোল বৈদগ্ধ্য। রবীন্দ্রশিষ্যদের হাতে পড়ে কবিতা সাতদফা পরিশ্রুত হতে হতে ঝুমঝুমি কিম্বা লজেঞ্চুষের মতো পণ্য রচনায় পরিণত হচ্ছে দেখেই আধুনিকেরা কাব্যে আনলেন বৈদগ্ধ্য। প্রেরণা বলতে তাঁরা বোঝেন পরিশ্রমের পুরস্কার। শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি রচনার পুর্বে দশ বছর গণিত চর্চা করেছিলেন ভ্যালেরি। এতেই তাঁর উপর শ্রদ্ধা বেড়ে যায় রিলকের। মননশীল হবার জন্যে আধুনিক কবিরা মার্কস, ফ্রয়েড এবং ফ্রেজারের দুরুহ তত্ত্বকে পরিবেশন করেছেন কবিতার আধারে। প্রশ্ন হোল, পাণ্ডিত্য কবিতাকে গুরুত্ব দেয় ঠিকই, কিন্তু মহত্ব দিতে পারে কি?

কোন সামাজিক পরিবেশে আধুনিক কবিকুলের আবির্ভাব সে সম্পর্কে কোন সহানুভূতিশীল আলোচনায় না গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিদ্রূপ করেছেন তাঁদের হতাশা, নৈর্ব্যক্তিকতা ও যৌনসর্বস্বতাকে। আধুনিক কবিতার অনুরাগীরা তাই "আধুনিক কাব্য" প্রবন্ধটিতে লক্ষ্য করেছেন নিরপেক্ষতার অভাব। যে-সামাজিক সুস্থতার মধ্যে গড়ে উঠেছিল বিশ্বকবির কবি-মানস যে পরিবেশ আধুনিকদের নিকট এক সুদূরতম কিম্ব-

দন্তী। রবীন্দ্রনাথ আলোকের দূত। তাঁর কবি-মানস গড়ে উঠেছিল (আই. এ. রিচার্ডসের ভাষায়) 'at the most conscious point of the age', পক্ষান্তরে আধুনিক কবিদের আবির্ভাব 'at the most crucial point of the age', তাঁরা অন্ধকারের বাসিন্দা। কোথায় পাবেন তারা রবীন্দ্রনাথের জীবন-বোধের গভীরতা? মহাসমর বিধ্বস্ত করেছে তাঁদের সেই প্রতিষ্ঠাভূমি যার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল একালের মানুষ। কবিদের শান্তির নীড় ভেঙে গেছে সর্বনাশা যুদ্ধের ঘূর্ণিঝড়ে। এই ঝড় কেবল ঘরই ভাঙেনি, মনকে করেছে পঙ্গু। পঙ্গুমনের ক্লেদপঙ্কিলতা প্রকটিত হয়েছে তাঁদের সৃষ্টিতে। এটাই তো স্বাভাবিক। এ না হলে বুঝতাম কবিরা সমাজ সচেতন বা যুগ সচেতন নন। তাঁরা ঠিকই উপলব্ধি করেছেন, 'এ জীবন নয় রাতের বাসর ঘর'। আজ আর কবিরা শুনতে পান না কুসুমিত পল্লব মর্মর। ঝিল্লী ঝনকিত লতা গুল্মের ফাঁকে আর চোখে পড়ে না জোনাকির দীপাবলি। বজ্র তরঙ্গিত অন্ধকারে তাঁরা প্রত্যক্ষ করেন কৃমি কঙ্কালের বীভৎস মিছিল। অশান্ত চৈতালী ঘূর্ণির নিষ্ঠুর আঘাতে ধূসর ধুলায় লুটিয়ে পড়েছে শত শত পাপড়ি। অন্ধকারে দীর্ঘ-লম্বিত সুরে শোনা যায় অক্ষমের অসহায় গোঙানি। ঘাতকমূর্তিতে প্রকাশ পাচ্ছে বণিক সভ্যতার সশস্ত্র কুটিল পরাক্রম। সংসার-শর্বরী শান্তিহীনা। বাসন্তী ফাল্গুন মরে গেছে অসহ্য অপমানে। কবি এখন শোনেন 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি আর কামান মর্টারের একটানা ভেরিনিনাদ। তাঁদের দৃষ্টিতে ভূমি বন্ধ্যা, মানুষ ফাঁপা যারা "Shape without form, Shade without colour, paralysed force, gesture without motion." জীবন সম্পর্কে তাঁদের মনে এসেছে হতাশা ও বিতৃষ্ণা। তা ছাড়া আধুনিক জগৎ (স্টিফেন স্পেণ্ডারের ভাষায়) যত 'Spiritually barren' হয়ে যাচ্ছে, কবিদের মধ্যেও তত প্রকাশ পাচ্ছে excessive inwordness'। সুতরাং যুগ-চরিত্রকে অনুধাবন না করলে বিরক্তিকর ঠেকবে কবিতার রসচর্বণা।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা, আবু সয়ীদ আইয়ুবের ভাষায়, 'at once traditional and original, assimilative and creative.' কিন্তু গোয়ালা আর হরিপদ কেরাণীর জীবনযাত্রা বর্ণনা করার পর তিনি সিন্ধু বারোয়াঁর সুরে সব কিছু অতিক্রম করে সচ্ছন্দে চলে যান সৌন্দর্যের জগতে। তিনি কোন প্রভেদ দেখতে পান না হরিপদ কেরাণী ও আকবর বাদশার মধ্যে। পেঁকো নর্দমার মধ্যে বাস করেও তিনি নির্দ্বিধায় নিজেকে ঘোষণা করেন 'জন্ম-রোমান্টিক' বলে। নোঙরহীন নৌকোর মতো ভেসে বেড়াচ্ছে একালের মানুষ। সে, হারিয়েছে তার মূল্যবোধ, সত্য ও সুন্দরের প্রতি নির্ব্যূঢ় শ্রদ্ধা। আধুনিক কবিরা এ কালেরই সৃষ্টি। যুগ-ধর্মকে তাঁরা অস্বীকার করবেন কেমন করে? যুগকে অস্বীকার করে কাব্যসৃষ্টি অসম্ভব। একথা তাঁদের অজানা নয় যে

> All living poetry is contemporary,
> Shakespeare along side of
> Eliot, Shelley along side of Spender.
> If Spender modelled himself on
> Shelley, he would not exist.
> (ফ্রান্সিস স্কাফ)

রবীন্দ্র বৃত্তের বাইরে যেতে না পারলে আধুনিকদের কাব্যসৃষ্টি আচ্ছন্ন হতে পারে তাঁর মোহন প্রতিভার আলোয়। কবিগুরুকে তাঁরা এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন অবজ্ঞায় নয়, শঙ্কায়। তাঁদের রচনাও তাই প্রচলিত ধারার মূর্তিমান প্রতিবাদ। পংক্তিভোজে হয়ত ডাক পাবেন না তাঁরা। তাঁদের ডাক পড়বে বিদ্যুতবাতির আলোকে উদ্ভাসিত ভোজন কক্ষে। তাঁদের সঙ্গীরা হবে সংখ্যায় অল্প, কিন্তু সুনির্বাচিত।

রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধটি জনৈক আধুনিক কবি-সমালোচকের মতে, "নিতান্তই ছোট একটি সংকলনের পরিচয়, ভারি রকমের গ্রন্থ সমালোচনা মাত্র।" আধুনিক ইংরেজ কবিদের যে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাতে কবি-কৃতির সামগ্রিক পরিচয় নেই। এলোমেলো কয়েকটা কবিতা বাছাই করে তাৎক্ষণিক মন্তব্য করায় কোন কবিই তাঁর নিকট সুবিচার পান নি। কোন কবি সম্পর্কে বিশেষ একটি ধারণায় স্থিত হতে তাঁকে দেখা যায় না। 'প্রিলুড' পড়ে যে-এলিয়ট সম্পর্কে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে এরা কেবল কাদার ওপরই অনুরাগ প্রকাশ করেছে, পোকায় খাওয়া শুকনো ফুল এরা বাছাই করেন কেবল, সেই কবির 'জার্নি অফ দ্য মেজাই' অনুবাদ করে দুঃখ প্রকাশ করেন তাঁর প্রতি অবিচার করেছেন বলে। অমিয় চক্রবর্তী প্রেরিত আধুনিক কবিতা থেকেও রসের সন্ধান পাচ্ছিলেন তিনি। আসলে সাহিত্য পাঠের ব্যাপারে তাঁর বাছবিচার ছিল। নির্বিচারে সবাইকে গ্রহণ করেন নি তিনি। প্রত্যেক শিল্পীর মানসিক ধাত আছে। সেই ধাত অনুযায়ী বই বাছাই বা লেখক বাছাই হয়। রবীন্দ্রনাথ তার ব্যতিক্রম নন। আনাতোল ফ্রাঁস, রোলাঁ তাঁর ভাল লাগে। অথচ টলস্টয়ের আনা কারেনিনা তাঁর না-পসন্দের তালিকায়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটস, ব্রাউনিং, টেনিসন তাঁর প্রিয় ছিল, অথচ প্রিয় বন্ধু ইয়েটসের কবিতা পড়ার ফুরসৎ হয়নি তাঁর। স্বাভাবিক কারণে আধুনিক কবিতা সম্পর্কে তাঁর মতামতকে নিরপেক্ষতার ফতোয়া দিয়ে নির্বিচারে গ্রহণের পক্ষপাতী হবেন না কেউ। প্রকৃতপক্ষে আধুনিকতার বিরোধী তিনি ছিলেন না। বরং অসতর্ক মুহূর্তে প্রকাশিত তাঁর অনেক মন্তব্যই আধুনিকতার সমর্থক। আধুনিক কবিতার প্রাণখোলা প্রশস্তির ব্যাপারে তাঁর দ্বিধা ছিল। সে দ্বিধা শৈল্পিক নয়, সামাজিক। তিনি পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন এমন কিছু সাহিত্য ব্যবসায়ীর, আধুনিকতার প্রতি যাঁদের বিজাতীয় মনোভাব কবিকে সোচ্চার হতে দেয় নি। একই বিষয়ে তার নানা পরস্পরবিরোধী মতামত আমাদের এই বিশ্বাসকেই দৃঢ় করে। ●

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

O গোধূলি মন এর চারটি সংখ্যা (Jan 86–May 86) এক সাথে পেলাম, আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

পত্রিকার গেট আপ যেমন সুন্দর, রচনাগুলির সুরও তেমন প্রশংসনীয়। পত্রিকার প্রতি আপনার সমর্পণ আর পরিশ্রম দেখে পত্রিকা দীর্ঘায়ু হোক, এই কামনা না করে থাকতে পারছি না।

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় জগৎ লাহা, শিবব্রত দেওয়ানজী, ভক্তিব্রত চক্রবর্তী, সমীরণ ঘোষ, দিশারী মুখোপাধ্যায় এবং অমিতকুমার আদক-এর কবিতা বার বার নিজের দিকে টেনে নেবার ক্ষমতা রাখে। এই রচনাগুলিকে পত্রিকার শ্রেষ্ঠাংশ বললে, আমার মনে হয় অতিরঞ্জিত হবে না। দেবব্রত দাশ-এর গল্প 'বিকল্প' আরম্ভ আর মধ্যের দিকে সাধারণ, কিন্তু শেষের দিকে নিজের সমস্ত আকর্ষণ নিয়ে এ্যাটাক করে। 'একটি প্রতিবাদী প্রতিবেদন' একটি বিশিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত কবি ও লেখকগণদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

শ্যাম সুন্দর চৌধুরী
H-61/4 Sahaney Colony
Tagore Road, Cantt.,
Kanpur-208004

রবীন্দ্রনাথ-জালিনওয়ালাবাগ ও বাঙালী মানস

গজেন্দ্রকুমার ঘোষ

বছর কয়েক আগে অ্যাটেনবোরর গান্ধী ছবিটি সুইডেনের ছবিঘরে বসে দেখেছি। বিদেশে বসে স্বদেশের উপর অবিস্মরণীয় ছবি দেখে বিমুগ্ধ হয়েছিলাম।

কলকাতায় গিয়ে নানা বিরূপ মন্তব্য শুনি অ্যাটেনবোরব গান্ধী ছবির। এমন কী নগরীর দেওয়ালে, ট্রেনের কামরায়, রেল স্টেশনে অসংখ্য গান্ধী (ছবি) বিরোধী প্রচাব পত্র চোখে পড়ে। যে ছবিতে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের নাম নেই, সেই গান্ধী ছবি বয়কট করার দাবি উঠেছে। এসব দেখে শুনে নিজের এবং বিদেশীর বিচারবুদ্ধির উপর আমার মনে নতুন করে প্রশ্ন জেগেছে। কলকাতার বিশিষ্ট দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার বোদ্ধা লেখক ও সাংবাদিকরা একটি বিষয়ে এক মত যে, ছবিটি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের বিকৃতি এবং প্রকৃত সত্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করার সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা।

গান্ধী ছবিটির মুক্তির প্রাক্কালে এই প্রবাসে প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে ছবিটিকে কেন্দ্রকরে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়। ছবিটির আলোচনা প্রসঙ্গে— ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, গান্ধীর জীবনী, আদর্শ,

সত্যাগ্রহনীতি এবং কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধীর সত্যি-কারের কী ভূমিকা ছিল এসব বিষয় আলোচিত হয়। এমন কী টেলিভিশনে গান্ধীজীর উপর তোলা নানা ডকুমেণ্টারীসহ অ্যাটেনবোরর ছবিটিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

এসব পত্রপত্রিকা পড়ে এবং টেলিভিশনের প্রোগ্রাম দেখে দর্শকের মন আগে থেকেই এইভাবে প্রস্তুত ছিল যে, অ্যাটেনবোরর গান্ধী ছবি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস নয়, এমন কী গান্ধীর ধারাবাহিক জীবন উপক্রমণিকাও তাতে তুলে ধরার চেষ্টা হয় নি। পরিচালক এই ছবিতে তুলে ধরেছেন গান্ধীজীর জীবন দর্শন ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন—যার মাধ্যমে এক শক্তিশালী গণ প্রতিবাদ তোলা যায়—যা হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথিবীতে আজ গণ প্রতিবাদের অমোঘ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তার নিদর্শন আজ জঙ্গী শাহী ল্যাটিন আমেরিকায়, মার্কিন মুলুকে স্বাধিকার আন্দোলন এমন কী পোলাণ্ডের কমিউনিস্ট শাসকের বিরুদ্ধে সলিডারিটির জন্য সংগ্রাম।

১৯৮৩ সালে পোলাণ্ডের সলিডারিটি আন্দো-লনের নেতা লেস ভালেন্সার বিশ্বশান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি তো গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনেরই পরোক্ষ স্বীকৃতি। এমনকী ১৯৮৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিশপ-টুটোর শান্তি পুরস্কার এই অসহযোগ আন্দোলনেরই স্বীকৃতি ঘোষণা করে।

প্রসঙ্গক্রমে বলে নেওয়া ভাল যে গান্ধী ছবির পরিচয় দিতে গিয়ে এখানে কোন কোন সংবাদপত্রের ক্রোড়পত্রে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর যুগ্ম ছবিও প্রকাশিত হয় এবং মহাত্মা পদবীটি যে রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া তার উল্লেখ থাকে। রবীন্দ্রনাথ নৃশংস জালিনওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। গান্ধী ছবিতে তার উল্লেখ না থাকা একটি প্রধান ত্রুটি বলে অনেকে মনে করেন। এই ত্রুটিটি বাংলায় এমন কী বিদেশেও অনেক সংবাদপত্রে বড় করে দেখানো হয়েছে। এ জন্যে বাঙালী মাত্রেই খুব বেশি মর্মাহত হয়েছেন।

সুভাষচন্দ্রকে গান্ধী ছবিতে না দেখানোর সপক্ষে অনেক যুক্তি আছে। সুভাষ প্রসঙ্গটাই অ্যাটেন বোরর গান্ধী ছবির মূল থিমের পরিপন্থী। গান্ধী ছবির মূল বিষয় ছিল অহিংসা ও অসহযোগ আন্দো-লনের একটি চিত্ররূপ তুলে ধরা। গান্ধী ছবিতে জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড যেখানে এত বড় করে দেখানো হয়েছে, সেখানে রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড ত্যাগ করার ঐতিহাসিক ঘটনাটি কেন বাদ গেলো। গান্ধী ছবিকে কেন্দ্র করে বিদেশী একজন চিত্র পরি-চালককে এ বিষয়ে—রবীন্দ্রনাথ ও নাইটহুড—দোষা-রোপ করার আগে নিরপেক্ষভাবে যদি আমরা বিষয়টির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সেদিন ভারতের রাজনৈতি মঞ্চে কতটুকু গুরুত্ব পেয়েছিল তার অবতারণা করি—তবেই অ্যাটেনবোরর প্রতি অভিযোগটা বাঙালীর পক্ষে অনেকটা হাল্কা হবে বলে মনে করি। অ্যাটেন-বোরর স্বীকৃত ঐতিহাসিক নজীর দিয়েই ছবিটির উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। বিতর্কমূলক ঘটনা যথাসাধ্য পরিহার করতে চেয়েছেন। পাঞ্জাবে ইং-রেজের বর্বরতার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড পরিত্যাগের ঘটনা নিয়ে বাঙালী মাত্রেই আজো গর্ববোধ করেন। সত্যি কথা বলতে কী সারা ভার-তের শিক্ষিত সমাজ ঘটনাটি আদৌ অবগত নন। এ বিষয়ে পাঞ্জাব থেকে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত বহু শিক্ষিত প্রবাসীকেই প্রশ্ন করে আমি নিরাশ হয়েছি।

জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের কয়েক মাস পরে ১৯১৯-এর ডিসেম্বর মাসে অমৃতসর কংগ্রেসে তৎকালীন বাংলার প্রতিনিধি অমল হোম (কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সভ্য ও রবীন্দ্রভক্ত) শত চেষ্টা করেও রবীন্দ্রনাথের সবীর্য দেশাত্মবোধের প্রতি শ্রদ্ধা

নিবেদন করে কংগ্রেস মঞ্চ থেকে সেদিন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করাতে পারেননি। তাঁর সে চেষ্টা সেদিন ব্যর্থ হয়েছিল। (এ বিষয়ে অমল হোমের 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) অথচ সেই কংগ্রেস অধিবেশনে পাঞ্জাবে সামরিক শাসনের প্রতিবাদের জন্য স্যার শঙ্করণ নায়ারকে অভিনন্দন জানানো হয়। তিনি স্যার পদবী ত্যাগ করেননি। শুধু প্রতিবাদ জানান। কংগ্রেসের সভাপতি তখন মতিলাল নেহেরু। জহরলাল, মদন-মোহন মালব্য, আর. রঙ্গ, মহঃ জিন্নাহ্, সৈয়দ হুসেন, আর বাংলা থেকে চিত্তরঞ্জন দাশ ও বিপিন পালের নাম উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা শ্রেয়, চিত্তরঞ্জন, বিপিন চন্দ্র প্রমুখ বাংলার নেতারা চিরদিনই রবীন্দ্রবিরোধী ছিলেন। চিত্তরঞ্জন রবীন্দ্রনাথকে 'নিরন্তর আঘাত' করেছেন। সুধীন্দ্র দত্তকে চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"কুশ্রী ভাষায় অক্লান্তভাবে স্বরবর্ষণ" করেছিলেন, যদিও কবি চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর লিখেছিলেন সেই বিখ্যাত দু'টি পংক্তি—

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

বাংলার রাজনীতি ও তার নেতাদের প্রতি রবীন্দ্র-নাথের কোনদিন আস্থা ছিলনা। তাঁদের সুযোগ সন্ধানী নীতিকে চিরদিন তিনি অনাস্থা জানিয়ে-ছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন কবি, সত্যের পুজারী। কর্মে ও কথায় এক না হওয়াটাই যখন রাজনীতির নেতাদের ধর্ম তখন তিনি তার প্রতিবাদ করেছেন; আর হয়েছেন নেতাদের শত্রু। "মনে আছে সেই প্রথম স্বদেশী যুগে নেমেছিলুম তো কাজে, কিন্তু টিকতে পারলুম না। গদগদ Sentimentalism-এ ভারাক্রান্ত সেই আবহাওয়া ক্রমে আবিল হয়ে উঠল। ধিক্কার এলো মনে। সব বক্তৃতা দিতে উঠছেন—মাটি তো নয় যেন মা'টি কেঁদে ভাসায় আর কি। অসহ্য হয়ে উঠতো আমার। কিছুতেই মেনে নিতে পারলুম না।... সে সময় আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল যখন দেখলুম কত ব্যর্থ এসব গদগদ বক্তৃতা।" (মংপুতে রবীন্দ্র-নাথ) চিত্তরঞ্জন ও বিপিনচন্দ্র পাল সুযোগ পেলেই রবীন্দ্রনাথকে জাতীয়তাবিরোধী ব্যক্তি হিসেবে চিত্রিত করতে চেষ্টা করতেন। এজন্য এসব শ্রেষ্ঠ বাঙালী সন্তানেরা সেদিন রবীন্দ্রনাথের সবীর্যের প্রকাশকে প্রচ্ছন্ন রাখতে মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন—এটা ঐতিহা-সিক সত্য।

অনেক পরে হেমন্তবালাকে এক চিঠিতে রবীন্দ্র-নাথ লেখেন—"তারপর জালিনওয়ালাবাগ ব্যাপারে আমি ছাড়া আর সকলেই নীরব ছিলেন, দেশবন্ধু এবং মহাত্মাজীও।..." রবীন্দ্রনাথ সামরিক আইন অমান্য করে গান্ধীজীর সঙ্গে পাঞ্জাবে প্রবেশ করবেন। এই প্রস্তাব তিনি গান্ধীজীকে পাঠালে গান্ধীজী সম্মত হননি। কলকাতায় প্রতিবাদ সভার আয়োজন করার জন্য চিত্তরঞ্জনকে অনুরোধ করলে তিনিও পিছিয়ে যান। পলিটিসিয়ানদের পলিটিক্সে রবীন্দ্রনাথ বীত-শ্রদ্ধ হয়ে অবশেষে নিজের যা কর্তব্য তাই করলেন। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' থেকে কিছুটা তুলে দিচ্ছি। যদিও চিত্তরঞ্জন বা গান্ধীর নাম সেখানে উহ্য আছে। "সেই সময়ে আমি···কে বললুম যে এ ব্যাপারে (জালিনওয়ালাবাগ হত্যার বিরুদ্ধে) নিয়ে আপনি একটা দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করুন, কিন্তু তিনি তখন রাজী হলেন না। তখন···তাঁর সঙ্গে কোন একটা সুবিধার পরামর্শ চলছিল, সেটা নষ্ট করতে চাইলেন না, পরে অবশ্য এই ব্যাপারটাকেই প্রধান প্লাটফর্ম করে অনেক বক্তৃতা দিয়েছিলেন, আমার কী আশ্চর্য লেগেছিল বলতে পারি নে। তারপর···কে বললুম যে একটা প্রটেষ্ট মিটিং-এর ব্যবস্থা কর, আমিও বলব, তোমরাও বলবে। সে বল্লে, আপনিই করুন, আমরা না হয় সভায় উপস্থিত থাকব। একে কি

বলতে চাও? এসব হলো পলিটিশিয়ানদের পোলে-টিক্স্। সুবিধে বুঝে চলতে হবে; এর সঙ্গে কখনো মেনে নিতে পারি নি।...

যখন প্রতিবাদ মনের মধ্যে উদ্বেল হয়ে উঠেছে তখন চুপ করে থাকব, কারণ সেইটেই সুবিধের, তারপর দরকার মত, সুযোগমত প্রতিবাদ করব, এ আমারদ্বারা হবার নয়। সেই জন্য সেই রাত্রেই ওই চিঠি না লিখে (ভাইসরয়ের কাছে চিঠি লিখে নাইট-হুড বর্জন) আমার পরিত্রাণ ছিল না। নিষ্ফল বেদনা আমার মনকে চেপে ধরেছিল, তা থেকে উদ্ধারের আর কোন উপায়ই ছিল না।" রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড বর্জনের পূর্বে বাংলার এবং ভারতের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে প্রতিবাদের যে আলোচনা হয় তাতে গান্ধী এবং চিত্তরঞ্জন, বিপিন পাল প্রমুখ বাংলার নেতারা রবীন্দ্র নাথের সঙ্গে সায় দেন নি। অগত্যা একক ভাবেই প্রতিবাদটি জানান। বাংলা এবং ভারতের নেতাদের (চিত্তরঞ্জন ও গান্ধীপন্থীরা) কাছে রবীন্দ্রনাথের এই সবীর্য ঘোষণা তখন অভিনন্দিত হয় নি। কারণ একদিকে তাঁরা এটি ব্যক্তিগত আঘাত হিসাবে গণ্য করেছিলেন। যেহেতু রবীন্দ্রনাথের ডাকে প্রতিবাদ করতে তাঁরা এগিয়ে আসেন নি, অন্যদিকে তাঁরা আতঙ্কিত ছিলেন ইংরেজ রাজশক্তি যদি তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন, তাহলে হয়তো আরো সর্বনাশ ঘটতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তা সত্বেও আজীবন গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। গান্ধীজীর প্রতি জনগণের আস্থা ও জনগণের উপর গান্ধীজীর প্রভাব সর্বোপরি তাঁর আদর্শের প্রতি দৃঢ় চেতনাবোধ গান্ধীজীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাকে কোন দিন খাটো করতে পারে নি। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব শেষ পর্যন্ত ছিল অশ্রদ্ধাপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ বহুবার ক্ষোভ করে বলেছেন, "বাংলাদেশে আমাকে অপমানিত করা যত নিরাপদ এমন আর কাউকে না।" রবীন্দ্রনাথ অসহযোগপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি অসহযোগপন্থী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তাত্ত্বিক বিতর্কে বিরোধিতায় অংশ নিয়েছেন কিন্তু তা ছিল তার ঘরের সমালোচনা। ঘরের বাইরে বিদেশে তা তিনি প্রকাশ করেন নি। ১৯২০ সালে জালিনওয়ালাবাগের ঘট-নার এক বছর পরে, ন্যুয়র্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "অসহযোগ আন্দোলন আদর্শাত্মক, আমি আইডিয়ার শক্তিতে বিশ্বাসবান্...এই আন্দো-লনের গুরু মিঃ গান্ধী, আমার বিশ্বাস আছে তাঁর নেতৃত্বের শুভফল হবে।" রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আদর্শ প্রচারে গান্ধীর চরিত্রে যে মহত্ব উপলব্ধি করে-ছিলেন—তা বাংলাদেশের নেতাদের মধ্যে হয়তো দেখতে পান নি। তাই তাঁরা রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেন নি। অমল হোম ছিলেন বাংলা থেকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি; কিন্তু তার চেয়ে বেশি ছিলেন রবীন্দ্রভক্ত। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের সবীর্য ঘোষণার স্বপক্ষে কংগ্রেস মঞ্চ থেকে প্রস্তাব পাশ করতে বৃথা চেষ্টা করেন। পাঠকের অবগতির জন্য অমল হোমের প্রবন্ধ থেকে একটু উদ্ধৃতি দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি।

"জালিয়ানওয়ালা হত্যাকাণ্ডের লীলাক্ষেত্র অমৃতসরে ১৯১৯-এর ডিসেম্বরে কংগ্রেস মঞ্চে রবীন্দ্র-নাথের এই ত্যাগের, দেশাত্মবোধের ও জাতীয় বেদনা-বোধের মহিমা প্রসঙ্গে একটি কথাও শুনি নি কারুর মুখে। পাঞ্জাবে ডায়ারী বর্বরতার, ইংরেজের অমানু-ষিকতার তীব্র প্রতিবাদে সভামণ্ডপ কাঁপিয়ে বক্তৃতার পর বক্তৃতা হলো সমানে, কিন্তু সে দিন সমগ্র দেশের আতঙ্ক বেদনা রুদ্ধকণ্ঠে বাণী দিয়েছিলেন এক মাত্র রবীন্দ্রনাথ—সেদিনের কথা কেউ একবার বললে না। কংগ্রেস থেকে একটা রেজোল্যুশন পাশ করে যাতে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর দেশাত্মবোধের এই সবীর্য প্রকাশকে তার স্বদেশবাসীর পক্ষথেকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হয়, সে চেষ্টা সেদিন ব্যর্থ হয়েছিল।"

সেদিন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে দেশ-বরেণ্য নেতৃবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের এত বড় ত্যাগকে ও দেশাত্মবোধের সবীর্য প্রকাশকে স্বীকৃতি দান করেননি। আজ আমরা কী করে আশা করি একজন বিদেশী চিত্রপরিচালকের এ এক মহান দায়িত্ব পৃথিবীর সামনে রবীন্দ্রনাথের সেই পৌরুষকে তুলে ধরা। অ্যাটেন-বোর গান্ধী ছবিতে এমন সব ঘটনার নজীর তুলে ধরেছেন যা ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে সর্বভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে অবিসংবাদিত এবং স্বীকৃত সত্য। মৃদুলা সরাভাই সম্পাদিত Gandhiji : His Life and Work পুস্তকে আছে, ১৯২০ সালের ১লা আগষ্ট গান্ধী কাইজার-ই-হিন্দ এবং বোয়ার যুদ্ধ মেডেল এবং রবীন্দ্রনাথ নাইট পদবী ফেরৎ দেন। রবীন্দ্রনাথের এই মস্ত ঘটনাটি একটি বিখ্যাত জীবনী গ্রন্থে যদিও একটু স্থান করে নিয়েছে তা ভুল ভাবে পরিবেশিত।

জালিনওয়ালাবাগ ও রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড বর্জনকে কেন্দ্র করে আজ আমরা গর্বিত। কিন্তু সেদিন ভারতের এমন কী বাংলার নেতারাই বা রবীন্দ্রনাথের এ সবীর্য ঘোষণাকে কী ভাবে নিয়েছিলেন—তা ইতি-হাসের সত্যতা নির্ণয়ের স্বপক্ষে অনেক অপ্রিয় সত্য প্রকাশের দাবি রাখে।

তাই অ্যাটেনবোর বিশ্ববরেণ্য এই মহাপুরুষকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর ছবিতে বাদ দিয়েছেন। কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ তাঁর ছবিতে আনলেই জালিন-ওয়ালাবাগের প্রসঙ্গে তাঁকে অগ্রসর হতে হত। অন্যান্য নেতাদের ন্যায় গান্ধীও জালিনওয়ালাবাগের হত্যা-কাণ্ডের প্রতিবাদের জন্য রবীন্দ্রনাথের মতে সায় দেন নি। অগত্যা রবীন্দ্রনাথ এককভাবে যা করেছিলেন, তা দেশাত্মবোধের এক গৌরব উজ্জ্বল স্বাক্ষর। এটা প্রকাশ করলে গান্ধী ছবির মূল থিমটি তুলে ধরা পরি-চালকের পক্ষে কঠিন হয়ে যেত। অথচ এই ঘটনার আসল ঐতিহাসিক সত্যকে প্রকাশ না করে কলকাতায় গান্ধী ছবিটির প্রতিবাদ ও প্রচার হয়েছে পত্র পত্রি-কায়—এমন কী প্রাচীর পত্রেও। তার ভাষা ও যুক্তি ছিল খুবই নিম্নমানের। মিথ্যা অভিমানের বশে যাঁরা ছবিটি দেখেন নি, তাঁরা একটি সার্থক জীবনী-কেন্দ্রিক আর্ট ফিল্ম দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ●

স্বীকৃতি :—প্রবন্ধের মূল প্রেরণা—অমলহোমের লিখিত পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ।

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

O আপনার 'গোধূলি-মন' জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পেলাম। 'একটি প্রতিবাদী প্রতিবেদন' লেখার জন্য অরুণ সরকারকে এবং ছাপানোর জন্য আপনাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন রইল।

শ্রীকমল চক্রবর্তীর 'মুক্তচিন্তা' এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অচল মফস্বল, প্রসঙ্গে (সাপ্তাহিক 'দেশ' ১০ই আগষ্ট ১৯৮৫) অরুণবাবুর প্রতিবাদ বাস্তব যুক্তিপুর্ণ, অতি সত্য এবং আন্তরিক। শ্রীকমল চক্রবর্তী 'মুক্তচিন্তা'র ছত্র ছায়ায় বেশ কিছু বদ্ধচিন্তা পাঠকের কাছে পরিবেশন করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কিছু বক্তব্য রেখে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আমি যেদিন (১০ই আগষ্ট ১৯৮৫) 'দেশ' হাতে পেয়েছি সেইদিনই চিঠি লিখে 'চিঠিপত্র' দপ্তরে ('দেশ') পাঠিয়ে ছিলাম। এত উন্নাসিকতায় ভরা, আত্মম্ভরিতায় গড়ানো কোন লেখা 'দেশ' পত্রিকায় কিভাবে প্রকাশিত হয়? তার প্রতিবাদ জানানোর নৈতিক দায়িত্ব অনুভব করেছিলাম। সে চিঠি আজও ছাপানো হয় নি। হবেও না কোনদিন। কারণ যাই হোক্, সেটা মফস্বলের গেঁয়ো ছোটলোকের প্রতিবাদ তো। অরুণবাবুর কথাটাই তুলে দিই—"আমরা যারা মফস্বলের অতি নিম্নমানের কবি লেখক অথবা সাহিত্য পাঠক, তারাও মুক্তচিন্তা করি। তবে চিন্তার সময় আমাদের উত্তরীয় মাটিতে ছুঁয়ে থাকে।"

দীপালি দে সরকার/হরিপাল

রবীন্দ্রনাথ ঃ স্মৃতির আলোয়

শিশিরকুমার মিত্র

[A marvel of cultural fellowship নামক ইংরেজী বই-এর প্রথম প্রবন্ধ। টোকিও থেকে ইংরেজী ও ফরাসী উভয় ভাষার পত্রিকা "FRANCE-ASIE" তে এই প্রবন্ধ ১৯৬১ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :— কোন্নগরের বিখ্যাত মুখা কুলীন বংশে ৫ই ডিসেম্বর ১৯০১-এ জন্ম। পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র ও মাতার নাম ভানুমতী মিত্র। মাতা ধর্মপ্রাণা ও আদ্যাপীঠের প্রথম যুগের সন্ন্যাসিনী। পড়াশোনা—কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। শ্রীরামপুর কলেজ ও গৌড়ীয় সার্ব্ব বিদ্যায়তন। ১৯২৬ সাল থেকে ভারতীয় চিত্রকলা ও সংস্কৃতির ইতিহাস নিয়ে প্রবন্ধ রচনা সুরু—"রূপম" "শিল্পী" "মডার্ণ রিভিউ" "প্রবুদ্ধভারত" "ত্রিবেণী" "বম্বে ক্রনিকল" ইত্যাদি পত্রিকায়; ১৯৩১ সালের শেষভাগে শান্তিনিকেতনে যোগ দেন এবং আটবছর থাকার পর পণ্ডিচেরিতে আশ্রমবাসী হন। সেখানে শ্রীঅরবিন্দের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে প্রায় ১৮/১৯ খানি বই প্রকাশ করেন—যার অন্যতম উপরে উল্লেখিত বইখানি। রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ, এই দুই মহাজীবনের যুগ্ম সান্নিধ্য খুব কমলোকের ভাগ্যেই ঘটে যা শিশির কুমারের জীবনে ঘটেছে।
মৃত্যু পণ্ডিচেরীতে, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯।
অনুবাদক—জ্যোতির্ময় বসু]

বিশের দশকের মাঝামাঝি ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে দেশের বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাগুলিতে আমি লেখা দিতে আরম্ভ করি। কল- কলকাতার একটি জনপ্রিয় পত্রিকায় আমার লেখা প্রকাশিত হবার পর সম্পাদক খুব প্রশংসা করেন ও আমাকে ম্যাগাজিন বিভাগের প্রধান করতে চান। আমার পরম কল্যাণকামী হিতৈষী স্বর্গগত চারুচন্দ্র দত্ত (আই; সি এস) মশায়ের সঙ্গে এই ব্যাপারে পরামর্শ করি। তিনি উপদেশ

দিলেন যে বরং শান্তিনিকেতনে গিয়ে সেখানকার শান্ত ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার মধ্যে আমার বাস করা উচিৎ। কলকাতার সাংবাদিক জীবনের হৈ-হট্টগোল ও ভীষণ খাটুনির কায না নেওয়াই ভালো। সে সময় চারুবাবু ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য। এই উপদেশের মধ্যে যে কতখানি স্নেহ, সহানুভূতি ও সমবেদনা ছিল তা বলার নয়—সেজন্যই সেদিন আমি সঠিক পথের হদিশ পেয়েছিলাম।

১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসের এক সকালে শ্রীদত্ত আমাকে টেলিফোনে তাঁর বাড়ীতে সন্ধ্যার সময় যেতে বল্লেন। সেখানে গিয়ে চারুবাবু ছাড়াও, বিশ্বভারতীর কর্ম্মসচিব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও দেখলাম। কবিপুত্র রথীবাবু আমার সঙ্গে এমনভাবে কথাবার্তা বল্লেন যে মনে হল তিনি আমাকে অনেক আগে থেকেই চেনেন। তিনি তাঁর পড়া আমার কয়েকটি লেখার কথা উল্লেখ করলেন। তাছাড়া একথাও বল্লেন যে যদি আমি শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সেখানকার জীবনের সুখ-দুঃখের অংশীদার হই তো তিনি খুবই আনন্দিত হবেন। বাস্তবিক, খুবই আন্তরিক ছিল তাঁর আমন্ত্রণ এবং যতদিন আমি শান্তিনিকেতনে ছিলাম—তার শেষমুহূর্ত্ত অবধি তিনি তাঁর এই প্রথমদিনের সৌজন্য অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন যে আমার শান্তিনিকেতনে থাকার আসল তাৎপর্য্য হ'ল সেখানকার কর্ম্মযজ্ঞের মূলধারার সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশেযাওয়া কাযের বা কাযে ব্যস্ত থাকার পরিমাণ মাপার কোন বিশেষ ব্যাপার নেই। চারুবাবু যখন রথীবাবুর কাছে প্রথম আমার কথা তোলেন তখন তাঁর অন্তরেও সেই ইচ্ছাই ছিল।

এই অনন্য প্রতিষ্ঠানের জগদ্বিখ্যাত প্রতিষ্ঠাতার মূল লক্ষ্যই ছিল শিশুদের জন্য এমন একটি নীড় রচনা করা যেখানে শিশুরা শুধু বাসস্থানই পাবে না পরন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রকৃতির আপনকোলে বেড়ে উঠবে। যাঁরা এই বিশেষ ব্যাপারে সহায়ক হয়ে আসবেন তাঁরাও এখানে একই 'পরিবারের' লোক হিসাবে এখানকার সকলের সঙ্গে অভিন্ন জীবন যাপন করবেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হওয়ার মাত্র দু-সপ্তাহের মধ্যেই আমি নিজেকে শান্তিনিকেতনে ঐভাবে 'পরিবারের' একজন হয়ে যেতে দেখলাম। এর আগে কবির দর্শন আমি কয়েকবার পেয়েছি, কিন্তু তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করার সৌভাগ্য এই আমি প্রথম পেলাম। 'পরিবারের' এক নূতন সভ্য হিসাবে কবি আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন ও বল্লেন যে যখনই আমার ইচ্ছা হবে তখনই আমি তাঁর কাছে যেতে পারি ও দেখা করতে পারি। আরো বল্লেন যে পরের সন্ধ্যাতেই তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করবেন।

বাস্তবিক তাঁর সঙ্গে সেই প্রথম ও পরের কয়েকটি সাক্ষাৎকার আমার জীবনের অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

সে সময় আমার পড়াশোনার ও গবেষণার প্রধান বিষয় ছিল সংস্কৃতির ইতিহাস। আমার বিশ্বভারতীতে যোগ দেওয়ার জন্য চারুবাবুর আগ্রহের প্রধান কারণই ছিল এই যে শান্তিনিকেতনেই আমি ঐ বিষয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করার সুযোগ সুবিধা বেশি পাব। গিয়ে দেখলাম এ বিষয়ে কবিকে আগেই জানানো হয়েছে। কবিও জানালেন আমার গবেষণার বিষয়ের এই নির্ব্বাচনে তিনি বিশেষ আনন্দিত। আগ্রহের সঙ্গে আমাকে সচেতন করেও দিলেন যে মানুষের সৃজনধর্মী সমস্ত ক্রিয়াকলাপই যেন আমার লেখার মধ্যে অর্ন্তভুক্ত হয়। আমার এই সামান্য গবেষণা যে সেদিনের শ্রেষ্ঠ মণীষির প্রশংসা ও অকুণ্ঠ সমাদর পেয়েছে তা দেখে আমিও খুশী হলাম। এরপর সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক ও তাদের প্রকাশ সম্বন্ধে কবির স্পষ্ট ধারণাগুলি শোনার ও বোঝার সৌভাগ্য আমার হল। তাঁর বক্তব্যের মূল

বিষয় ছিল কেমন করে স্তরে স্তরে মানুষের ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবন ক্রমবিবর্ত্তিত হয়ে আজকের শিখর চূড়ায় পৌঁছেছে। এরপর তিনি শান্তিনিকেতনে স্কুলের ছেলেমেয়েদের ইতিহাস কী করে পড়াতেন তার বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেন।

রবীন্দ্র-চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য বারবার লক্ষ্য করবার সুযোগ আমার হয়েছিল। নিজের ইচ্ছা বা ধারণা কখনোই তিনি অন্যের ওপর চাপাতে চাইতেন না-এমন কী যদি কেউ তা সাগ্রহে নিতেও চাইত। কোন নির্দ্দেশ দেবার সময়, কোন বিশেষ পরিবেশে তিনি নিজে কী করতেন বা করেছেন শুধু সেইটুকুই বলতেন। সুতরাং ইতিহাস কীভাবে পড়ানো উচিৎ সে সম্বন্ধে সোজাসুজি আমাকে কিছু না বলে, ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকতার সময়ে শিক্ষক হিসাবে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা তিনি আমাকে শোনালেন। শিশুদের ইতিহাস পাঠে অনুরাগ সৃষ্টির জন্য তিনি তাদের যেভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন সেই পদ্ধতি যে শুধু মৌলিক তাই-ই নয়, সবচেয়ে সফলও বটে। রবীন্দ্রনাথের মতে, শিশুদের কাছে অতীতকে জীবন্ত বর্ত্তমানরূপে তুলে ধরাই এই শিক্ষাপদ্ধতির সাফল্যের আসল চাবিকাঠি।

অতীতে যখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা, তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছিল. তখন ঐ বিবর্ত্তনে তাদের নিজস্ব অঞ্চলগুলির প্রত্যক্ষ ও গভীর প্রভাব ছিল ; বিশেষতঃ তাদের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে। এ কথা ভুললে চলবে না যে আঞ্চলিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা এই সব ছোটছোট গোষ্ঠীগুলি ভারতের জাতীয় জীবনের বহুমুখী সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিকাশে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কবি যখন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছিলেন যে ভারতের আত্মিক সত্য ও গৌরব তথা ইতিহাস ও ভূগোলের অখণ্ডতার দিকে নবীন ছাত্রদের মনকে সচেতন করার জন্য কেমনভাবে তিনি চেষ্টা করেছিলেন তখন ভারত ইতিহাসের সেই প্রাসঙ্গিক অংশগুলি যেন আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে উঠছিল। এই ধরণের সমন্বয়ী শিক্ষা পদ্ধতিই যে শিশুদের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী এ বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস খুবই দৃঢ় ছিল। আমাদের মনশ্চক্ষে তিনি বস্তুনিষ্ঠ অথচ মনোরম একটা ছবি মেলে ধরলেন। এই ছবিতে ছিল মানুষের কর্মধারার বিচিত্র দৃশ্যাবলী—নানা রঙে রঙীন, নানা আকারে আঁকা যেন প্রকৃতির গড়া মঞ্চে মানুষের অপূর্ব্ব জীবননাট্যের অভিনয়। কবি জিজ্ঞাসা করলেন "মঞ্চ ছাড়া কোন নাটকের অভিনয় তোমরা কল্পনা করতে পারো? ভৌগোলিক প্রেক্ষিত ছাড়া ইতিহাসের কল্পনা সম্ভব? ইতিহাসের পুর্ণজীবিকরণ করা যায় কেবলমাত্র ভুগোলের মাধ্যমেই। জাতির স্মৃতিপটে ঐতিহাসিক ঘটনার পুর্ণদর্শন করান যায় যদি সেই ঘটনার ভৌগোলিক উৎপত্তিস্থানের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করা যায়।"

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের পড়ানোর সময়েই কবির মনে ইতিহাস শেখানোর এই পদ্ধতি জন্ম নেয়। Lucien Febvre তাঁর বিখ্যাত বই Geographical Introduction To History (যা ১৯২৫ এ প্রকাশিত হয়) তাতে রবীন্দ্রনাথের এই মতের প্রতিধ্বনি ও সমর্থন করেছেন। এই লেখক ভুগোলকে ইতিহাস শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে স্থান দিতে চান। যখন আমি এই কথাগুলির দিকে কবির মনোযোগ আকর্ষণ করি, তখন তিনি বল্লেন "এই পদ্ধতির আবিস্কারক বলে হয়তো আমার দাবী গ্রাহ্য হবেনা কারণ আমি ঐতিহাসিক নই—কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আমার মতের সঙ্গে যে আরেকজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক পণ্ডিত একমত হয়েছেন—আমি তাতেই খুশী" এই ভাবে ইতিহাস পড়ানোর সর্ব্বাধুনিক পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমার শিক্ষক জীবনের প্রথম দীক্ষা হল।

রবীন্দ্রনাথের পড়ানোর অভিজ্ঞতা থেকে ধারণা হয় যে সাধারণভাবে ছোটছোট ছেলেমেয়েদের বোঝার বা কল্পনা করার শক্তি সম্বন্ধে বড়দের যে সব ধারণা আছে,তা ভ্রান্ত (অর্থাৎ তাদের শক্তি অনেক বেশি)। মহৎ কবিতার রস যখন তাদের কাছে যথাযথভাবে পরিবেশন করা হয় তখন তারা সেটা খুব সহজেই গ্রহণ করতে পারে। বারো বছরের ছেলেমেয়েদের ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের কবিতা পড়ানোর সময়েই তিনি এটা বুঝতে পেরেছেন। খুব ছোট ছেলেদের পাটিগণিত শেখাবার সময়ে তিনি সংখ্যায় না লিখতে শিখিয়ে তার বদলে তেঁতুলের বীজ দিয়ে শেখাতেন।

একবার ৺পুজার ছুটিতে বাড়ী না গিয়ে কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে আমিও শান্তিনিকেতনে ছুটি কাটাই। বাংলার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আমরা বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় কবিকে প্রণাম করতে যাই। কবি প্রথমে আমাদের সকলকে মিষ্টি খাওয়ালেন, পরে শান্তিনিকেতনে শরৎ ঋতুর আবির্ভাবের একটি বর্ণনা দিলেন। শরতের আত্মার রূপকে তিনি প্রকাশিত করলেন অননুকরণীয় ভাষায়—কেমন করে শরৎ ছুঁয়ে যায় মানুষের আত্মাকে। এমনভাবে তিনি কথাগুলি বল্লেন যে মনে হল তিনি শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ায় শরতের সৌন্দর্য্য ও রূপের মধ্যে ডুব দিয়ে এসেছেন। আমরাও আমাদের অন্তরে তাঁর কবিমনের স্পর্শ পেলাম।

আরেকবার কবি আমাদের সকলকে কী করে বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ তার এই আধুনিক রূপ পেল তার চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছিলেন। তাঁর বর্ণনার সেই উজ্জ্বল ছবিটি আজও আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। যখন প্রধানত গাছে-বাস-করা চার পেয়ে মানুষ প্রথম দুপায়ে দাঁড়াল তখন সে কী দেখল? সামনের দিকে তাকানো মানেই দূরের দিকে চাওয়া। দূরের দিকে চাওয়া মানেই দূর দিগন্তের দিকে তাকান। সেখানেই তো যত অজানারহস্যের ভীড়, যে গুলির ক্রমোন্মোচন ও আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই মানুষের ইতিহাসের সুরু। চারপাশের সব কিছু সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জানতে গিয়েই এম-বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের মস্তিষ্ক দারুণভাবে বেড়ে উঠল। মানুষের দুপায়ে দাঁড়ান ও চলার জন্য তার হাতদুটি মুক্ত হল। এবারে সেই মুক্ত হাত দুটি দিয়ে মানুষ তার সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রেরণাকে রূপ দিল। আদিম মানুষের হাতে আঁকা গুহাচিত্রগুলি সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে স্থান পেয়েছে। মানুষের শিল্প-সৃষ্টির আদিমতম চিহ্ন এই গুহাচিত্রগুলি। কবি যখন তাঁর এই অভিমত অপরূপ বাক্‌ভঙ্গীতে প্রকাশ করলেন তখন তাঁর বক্তব্যই শুধু নয়, বলার ভঙ্গীও আমাদের মনের গভীরে আলোড়ন তুলল।

আরেকটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার কথা শোনাই। যথাযথ আবেগের সঙ্গে ও নির্ভুল উচ্চারণে যদি গল্প পড়া যায় তাহলে খুব সহজেই আকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। সে সময় কবি বাংলা কবিতার কাঠামো ও গঠন সম্বন্ধে পর পর কয়েকটি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। একটি বক্তৃতায় শব্দের শক্তি সম্বন্ধে উল্লেখ করে তাঁর নিজের লেখা থেকে উদাহরণ স্বরূপ "ঝড়ের বর্ণনা" পড়লেন। তাঁর বর্ণনা এমন জীবন্ত ও সাড়াজাগানো এবং পাঠের ধরণ এত সুন্দর প্রভাব বিস্তার করেছিল যে আমাদের মনে হচ্ছিল ঠিক যেন একটা ভয়ঙ্কর ঝড় তার ক্রুদ্ধ তাণ্ডব নিয়ে আমাদের মাথার ওপর আছড়ে পড়ছে। ঝড়ের পর এল শান্ত চারপাশের বর্ণনা। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যেন আমাদের মনে সেই শান্তি অনুভব করলাম। বলাই বাহুল্য যে রবীন্দ্রনাথ কথ্যভাষার যাদুকর ছিলেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

এটা সুবিদিত যে অভিনয়ে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাঁর অভিনয় দেখার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে,

তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন যে তাঁর যাদুস্পর্শে মঞ্চ যেন একটি স্পন্দনশীল মাধ্যম হয়ে বর্ত্তমানকালকে প্রসারিত করত। "বর্ত্তমানে"র সমস্ত আবেগ নিয়ে সুদূরের ঐশ্বর্য্যকে জয় করাই ছিল তাঁর অধিকাংশ নাটকের বক্তব্য।

'শারদোৎসব' নাটকে তাঁকে 'ঠাকুরদাদার' ভূমিকায় নামতে দেখেছি। এই অভিনয় শান্তিনিকেতনে হয় এবং মঞ্চে এই তাঁর শেষ অভিনয়। কী আশ্চর্য্য ব্যাপারই না তিনি ঘটালেন! এতই স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত ছিল সব কিছু যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমাদের মনে হয়নি তিনি মঞ্চে অভিনয় করছেন; শুধু তাই নয়। তাঁর সঙ্গে যে সব ছোট ছেলেমেয়েরা অভিনয় করছিল তাদের হাল্কা ও সতেজভাব, হাসি, গান, আনন্দ যেন মঞ্চ থেকে উপ্‌চে পড়ছিল। এ সবই পৌঁছে গেল দর্শকদের কাছে—তাঁদের মনে হল যে তাঁরাও যেন অংশ নিচ্ছেন নাটকে। আনন্দে ভরা শরৎ শিশুদের যেমন করে বেপরোয়া ও অবাধ খুশীর ডাক দিয়েছে, কল্পনা করুন সত্তর পেরিয়ে তিনিও তেমনি করে শিশুদের সব কাজে তাদের মত একজন হয়ে সমান আনন্দে যোগ দিচ্ছেন। তাছাড়া কবি ঐ অভিনয়ের বছর খানেক কি দু বছর পরের এক জন্মদিনে যা বলেছিলেন তা কী কেউ ভুলতে পারে? "আমার জন্মদিন পালন করে আমার বয়সের কথা তোমরা আমাকে বারবার মনে পড়িয়ে দিও না। আমি বিশ্বাস করি না যে আমার জীবনের সঙ্গে আমার বয়সের কোন সম্বন্ধ আছে। আমার জীবন কেবল মৃত্যুহীন যৌবনকেই জানে; তার মাধ্যমেই আমি আমার জীবনদেবতার সঙ্গে একাত্ম"।

পৃথিবীতে শুধু বেঁচে থাকাই মানুষকে যে কত আনন্দ ও সৌন্দর্য্যবোধ দিতে পারে তার স্বাদ পাওয়াই রবীন্দ্রনাথের মহান জীবনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাটানর একটি পরম প্রাপ্তি। মানব ইতিহাসে তাঁর মত বহুমুখী প্রতিভা বাস্তবিকই দুর্লভ। কাছ থেকে তাঁর জীবনকে দেখলেই বৈচিত্রে অবাক হতে হয় কিন্তু শুধু বাইরে থেকে দেখলে তাঁর প্রতিভার মূল উৎস কোথায় তা কী করে জানা যাবে? এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তাঁর প্রতিভার মূল উৎস ছিল তাঁর পরিশ্রম করার অসম্ভব ক্ষমতা। পৃথিবীর খুব কম বিখ্যাত লেখকই তাঁর মত নানা বিভিন্ন বিষয়ে অপরূপ রচনার বিপুল সম্ভার রেখে গেছেন। এই বিস্ময়কর সৃষ্টির পিছনে যে অমানুষিক দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম এবং জীবনীশক্তির পরিচয় ছিল, সেটা কল্পনা করা শক্তনয়। ব্যক্তিগত জীবনে এই ব্যাপারের কিছুটা পরিচয় আমি পেয়েছি এবং আশ্চর্য্য হয়েছি। বাস্তবিক দীর্ঘসময় ধরে কী কঠোর পরিশ্রমই না তিনি করতেন!

একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে ওঁর কর্মসচিবকে কোন কাযের জন্য শান্তিনিকেতন থেকে দূরে যেতে হয়েছিল। পরের দিন কবি আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁর কিছু কায আমি করে দিতে পারব কি না। আমি বল্লাম "আমার পক্ষে ঐ কায খুবই আনন্দের"। তখন তিনি তাঁকে লেখা কিছু কিছু চিঠির জবাব দিতে ও অন্যান্য কয়েকটি কায করে দিতে আমাকে নির্দ্দেশ দিলেন। সকালে প্রায় দুঘণ্টা ও বিকেলে একঘণ্ট (৩টে থেকে ৪টে) ধরে ঐ কাযগুলি আমি করছিলাম। কিন্তু কয়েকদিন পরে যখন বিদেশী চিঠির তাড়া এল তখন তিনি আমাকে বিকেলে একটু আগে আগে আসতে বল্লেন। শান্তিনিকেতনে তখন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের প্রকোপ চলেছে। আমি ভাবলাম কবি হয়তো "আগে-আগে" মানে বেলা আড়াইটা বুঝিয়েছেন। তাই যখন প্রায় সওয়া দুটা নাগাদ আমি কবির কাছে পৌঁছালাম নিশ্চিন্তই ছিলাম যে যথাসময়েই পৌঁছেছি। গিয়ে দেখি শান্তিনিকেতনের "দারুণ অগ্নিবাণের" মত গরম হাওয়ায় সমস্ত দরজা

জানলা হাট করে খুলে পড়ার টেবিলে কবি বসে আছেন। তাঁর টেবিল স্তপাকার চিঠি ও প্যাকেটের তাড়ায় ঢাকা পড়েছে; সারা পৃথিবী থেকে ঐ চিঠি ও প্যাকেটগুলি এসেছে এবং উনি নিজের হাতে তার জবাব দিচ্ছেন। আমি অত্যন্ত লজ্জা পেলাম কিন্তু তখনো বুঝতে পারলাম না যে ঠিক কখন ওঁর "বিকেল" আরম্ভ হয়। তাঁর বিখ্যাত সেবক বনমালীকে জিজ্ঞাসা করলাম দুপুরের বিশ্রাম থেকে ঠিক কখন তার "বাবুমশায়" ওঠেন। বনমালী আমার অজ্ঞতায় অবাক হল এবং বলল যে বাবুমশায় দুপুরে খাবার পর এক-ঘণ্টাও বিশ্রাম নেন না। উপবীত ধারণের সময় প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বালককে প্রতিজ্ঞা করতে হয় যে সে কখনো দিনের বেলা ঘুমোবে না। রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিজ্ঞা সারা জীবন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। সেদিনও তাঁর অভ্যাসমত তিনি ১/১৫তে তাঁর ডেস্কে এসে বসেন; যখন আমি ভিতরে গিয়ে আমার দেরীর জন্য ক্ষমা চাইলাম, তিনি বল্লেন "ঠিক আছে আমি তোমার কাযের ভার লাঘব করবার সামান্য চেষ্টা করছিলাম"।

সাহিত্যের ও অন্যান্য বিষয়ের নানা শাখাতে ভুরি পরিমাণ লেখক হিসাবে শুধু তাঁর নিজের কালের নয় সর্ব্বকালেরই তিনি অনতিক্রম্য অদ্বিতীয়। যখনই তিনি কোন লেখা—সে গল্প, উপন্যাস, দীর্ঘ কবিতা বা কবিতাগুচ্ছ যাই হোক না কেন আরম্ভ করতেন তখনই তিনি ক্রমাগত দিনরাত ধরে লিখে যেতেন, যতক্ষণ না সেটা শেষ হত। একটা লেখা যেই শেষ হত, অমনি আর একটা যেন তাঁর কলমের জন্য তৈরী হয়েই থাকত। এ কথাটা বোধহয় অনেকেই জানেন না যে কবিতা রচনা করার জন্য অন্যান্য ঋতুর চেয়ে গ্রীষ্ম-কালকেই রবীন্দ্রনাথ সব চেয়ে বেশি পছন্দ করতেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে বেশির ভাগই রচিত গ্রীষ্মের মাসগুলিতে এবং গদ্য রচিত হত বেশিরভাগ শীতের সময়। ইওরোপ ভ্রমণের সময় পদ্যের চেয়ে গদ্যই তিনি বেশি লিখতেন।

একবার কবি, শিক্ষাদানের মধ্যে আনন্দের ভূমিকা কী তা আমাকে ও আরো কয়েকজন শিক্ষককে বোঝাচ্ছিলেন। তাঁর মূল ধারণা তিনি এইভাবে প্রকাশ করলেন। শিশুদের কাছে খেলার মাঠ, বা কোন হবির (যেমন ছবি আঁকা বা গান) মতই সমান আকর্ষক হয় যদি কোন শিক্ষাপদ্ধতি, সেই পদ্ধতিকেই তিনি সার্থক ও সফল বলে স্বীকার করবেন। ক্লাসে বসতে বা যোগ দিতে এসে শিশু এমন আনন্দ পাবে যে সেই আনন্দ আবার জন্যই সে ক্লাসে আসবে। শিক্ষাকে শিশুদের কাছে আনন্দের (অন্যতম) উৎস করতে হবে। তাঁর নিজের কথায় "শিক্ষাকে আনন্দের ক্ষেত্র করতে হবে"। শ্রীঅরবিন্দও একবার ঠিক এই ধরণের মত প্রায় একই রকম ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, স্কুলঘরের বদ্ধ আবহাওয়া ছেড়ে প্রকৃতির কোলে ও খোলা আবহাওয়ায় যখন ছেলেরা নিজেরাই নিজেদের শিক্ষিত করার সুযোগ ও সাহায্য পায় তখনই এই আনন্দ ছেলেদের নিজস্ব হয়ে ওঠে। শিক্ষাপ্রদ (অথচ আনন্দময়) এমন সব কাযকর্ম্মতে ছেলেরা অংশগ্রহণ করবে, যা তাদের অফুরন্ত জীবনী-শক্তিকে একটা সুনির্দিষ্ট পথে স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত করবে; শুষ্ক বা সীমাবদ্ধ শিক্ষাক্রমের ভিতর দিয়ে তা সম্ভব নয়।

শিশুদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির ব্যাপারে অন্যান্য যে কোন শিক্ষাপদ্ধতির চেয়ে তাঁর পদ্ধতি অনেক বেশি সফল। সেজন্যই যখনই তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলতেন, তখন লেখাপড়ায় তাদের অগ্রগতির কথা তত জানতে চাইতেন না যত চাইতেন তারা নিয়মিত শিক্ষামূলক ভ্রমণে (Excursion) যাচ্ছে কিনা এবং তাদের সাহিত্য সভা-গুলি নিয়মিত বসছে কি না। যদি তারা সভাগুলি

নিয়মিত বসূছে না বলত, তিনি সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্তদের কাছে কৈফিয়ৎ চাইতেন। শান্তিনিকেতনের জীবনে এই সাহিত্য-সভাগুলির একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। প্রত্যেকটিতে বিচিত্র অনুষ্ঠান থাকত—শিশুরা নিজে-দের রচিত লেখা পড়ত, গান গাইত, আবৃত্তি করত এবং নাটকের নির্বাচিত অংশ অভিনয় করত।

একবার ছোটদের ঐরকম একটি সাহিত্যসভা ছেঁটে ছুঁটে খুব ছোট মাপের করে তাড়াতাড়ি ও দায়-সারাভাবে শেষ করা হয়। পরের দিন কবি সেই সভার ছাত্র-সেক্রেটারীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন যে আগের দিন সন্ধ্যায় তাদের সাহিত্যসভা আরম্ভ হবার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল কিনা। বার বছর বয়সের ছেলেটির কয়েক মিনিট লাগল কবির কথার ও মৃদু ভৎসনাকে চাপা দেওয়ার জন্য তাঁর ঐ কৌতুকের অন্তর্নিহিত মানে বুঝতে। গুরুদেব কী চাইছিলেন সে এবার বুঝলো এবং ভবিষ্যতে সাবধান হবে বলে কথা দিল। আমার বেশ মনে আছে, পরবর্তী সভাটি খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

ক্লাসে পড়াশোনার চেয়ে এক্সকারসানে যোগ দেওয়া কোন অংশেই কম নয় এই ছিল তাঁর মত। একবার যখন জানতে পারলেন যে আমি ছেলেদের সঙ্গে এক্সকারসনে সঙ্গী হতে ততটা ইচ্ছুক নই, তখন তিনি আমাকে তাঁর ঐ মতটি ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বল্লেন, এক্সকারসনের নানা ব্যাপারে মাষ্টারমশায়রা ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করতে পারেন। শান্তিনিকেতনের চারপাশ সম্বন্ধে তাদের জানার পরিধি বাড়াতে পারেন। ইতিহাস ও ভূগোলের মাষ্টারমশায়রা দেশের বৃহত্তর প্রেক্ষিতে স্থানীয় ভূগোল ইতিহাস সম্বন্ধে ছেলেমেয়ে-দের ঔৎসুক্য জাগাতে পারেন। কাছাকাছি জায়গার গাছপালা ভূতত্ত্ব ও অন্যান্য বিষয়ের সম্বন্ধে আলো চনা করে। বিজ্ঞানের শিক্ষকরা আশপাশের প্রাকৃতিক জগৎ সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের অনুসন্ধিৎসু করে তুলতে পারেন। এই কায সুষ্ঠুভাবে করার জন্য আমাকে বীর-ভূমের ইতিহাস সম্বন্ধে নিজের জ্ঞান বাড়াতে হল। বীরভূমের আক্ষরিক অর্থ বীরেদের ভূমি বা স্থান। সত্যিই অতীতে এটা তাই ছিল। রামায়ণ ও মহা-ভারতেও বীরভূমের উল্লেখ আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় বীরভূমের যে গৌরবময় ভূমিকা ছিল তা ইতিহাসেও স্থান পেয়েছে। বহু সাধু ও মরমীদের জীবন সাধনায় বীরভূম পবিত্র হয়েছে। তন্ত্র ও বৈষ্ণবধর্মের উন্নতির জন্য তাঁদের অমূল্য দান বহু শতাব্দী ধরে বীরভূমকে ঐ দুই ধর্মের একটি সর্বজনস্বীকৃত কেন্দ্র করেছে। এই জিলাতেই শান্তি-নিকেতনের অবস্থান।

শিশুদের শিক্ষার উন্নতির জন্য তাঁর অন্তরের ব্যাকুলতা সকলেরই জানা। কিন্তু বয়স্কদের শিক্ষার ব্যাপারেও তাঁর অপরিসীম উৎসাহ ছিল। একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন যে অনেকদিন থেকেই তাঁর ইচ্ছা ছিল যে ব্রিটিশ হোম ইউনিভারসিটি লাই-ব্রেরী সিরিজের মত বাংলায় একটি জনপ্রিয় সিরিজ প্রকাশ করবেন। তাতে এমন সব বিষয় থাকবে যা পড়লে একজন বয়স্ক তার নিজের দেশ, জগৎ ও জীব-নের নানা সমস্যার কথা জানতে পারবে। ঐ সিরিজে ইতিহাসের একটি বই কবি আমাকে দিয়ে লেখাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাংলায় লিখিনা বলে যখন আমি ঐ কাযটির ভার নিতে ইতঃস্তত করছিলাম তখন তিনি আমাকে উৎসাহ দিয়ে বল্লেন কেবল ঘটনা, চিন্তা ও আদর্শের সূত্রগুলি আমার মুখের ভাষায় একটি কাগজে লিখে ফেলতে। এরপর তিনি নিজে আমাকে লেখাটি শেষ করতে সাহায্য করবেন। চিরকালের জন্য আমার দুঃখ রয়ে গেল যে এই দুর্লভ সুযোগের সদ্ব্যবহার আমি করতে পারিনি। তার প্রধান কারণ তখন নিজের কায শেষ করে হাতে খুব

অল্পই সময় থাকত। এর কয়েক বছর পরেই আমি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে চলে যাই। পরবর্তীকালে কবি ঐ সিরিজ আরম্ভ করেছিলেন সম্ভবতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় বইটি নিজেই লিখে। তাঁর নির্দ্দেশিত পথেই ঐ সিরিজে নিয়মিতভাবে নতুন নতুন বই সংযোজিত হচ্ছে। এই সিরিজ বিশ্বভারতীর প্রকাশনের একটি বিশিষ্ট অবদান বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আরেকটি অসাধারণ কল্পনাকে কবি রূপ দিয়ে গেছেন যার নাম লোকশিক্ষা সংসদ তাঁর নির্দ্দেশে সংসদ হিউম্যানিটিজের প্রধান প্রধান শাখাগুলির পঠন-পাঠনের জন্য একটি শিক্ষাক্রম তৈরী করেন। একজন বয়স্ক যাতে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক নিজের বাড়ীতে পড়ে সংসদের দ্বারা পরিচালিত স্বাধীনতাপুর্ব বাংলাদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে গৃহীত পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে পারে। সফল পরীক্ষার্থীরা বিশ্বভারতীর কাছ থেকে কবির সই করা প্রশংসাপত্র পেত। ডঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেন (বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য) তখন বিশ্বভারতীর স্কুল ও কলেজ বিভাগের প্রিন্সিপ্যাল ও সংসদের কর্মসচিব হিসাবে ঐ পরীক্ষাগুলির সংগঠনের জন্য ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে তাঁর অন্যান্য কাযে ও পরীক্ষার কাযে তিনি আমাকে সাহায্যকারী হিসাবে নির্বাচিত করলেন। কবির ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসার এবং বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে তাঁর মতামত জানার এই আরেকটি সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। শুধু এই ব্যাপারেই নয়, কবি ও তাঁর বিরাট প্রতিষ্ঠানকে সেবা করার অন্যান্য সুযোগের জন্যও ডঃ সেনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। একসময় সংসদের শিক্ষাক্রমের জন্য বই এর তালিকা তৈরী করা হচ্ছিল। তখন আমাকে প্রস্তাবিত বইগুলির সম্বন্ধে কবির সম্মতির জন্য প্রায়ই তাঁর কাছে যেতে হত। তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য বর্ত্তমানে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সেক্রেটারী, বিখ্যাত মণীষী পণ্ডিত ও সাহিত্যিক নলিনীকান্ত গুপ্তর কয়েকখানি বই-এর নাম আমি প্রস্তাব করি। কবিকে যখন জানাই যে বইগুলি আমার দ্বারাই প্রস্তাবিত তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে আমি নলিনীকান্ত গুপ্তকে চিনি কিনা। আমি বললাম "ব্যক্তিগত পরিচয় নেই, তবে লেখার ভিতর দিয়ে পরিচয় আছে"। কবি বল্লেন যে শ্রীগুপ্তকে একজন অনন্য সাধারণ ক্ষমতাশালী সাহিত্যিক বলে তিনি মনে করেন। বাংলাসাহিত্যে মৌলিক ও বিশিষ্ট কিছু দান তাঁর আছে। তাছাড়া, সাহিত্য সমালোচনায় নতুন ধারা প্রবর্ত্তনের জন্যও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান থাকবেই। আমার আরেকটি প্রস্তাবিত বই-এর দিকে কবির মনোযোগ আকর্ষিত হয়েছিল—সেটি শ্রীঅরবিন্দের The Renaissance In India'র নলিনীবাবু কৃত বাংলা অনুবাদ।

তিনি বল্লেন দুটি কারণে এই বইটির নির্বাচন তাঁর ভালো লেগেছে; প্রথমতঃ এটি শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন, দ্বিতীয়তঃ নলিনীকান্তর অনুবাদের চেয়ে মূলানুগ আর কোন অনুবাদ হতে পারে না। উপরের ঐ দুটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছাড়াও কবি যেখানেই যোগ্যতার পরিচয় পেয়েছেন সেখানেই উদার ও অকুণ্ঠভাবে প্রশংসা ও সমর্থন জানিয়েছেন।

কবির আরেকটি দিক। শান্তিনিকেতনে যোগদেবার তিনবছরের মধ্যেই আমি তখনকার জাতীয় সংবাদ সংস্থার (United Press of India) কাছ থেকে খবর পেলাম যে তাঁরা আমাকে তাঁদের নিজস্ব সংবাদদাতা করেছেন। সাধারণভাবে শান্তিনিকেতনের ও বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা, ভাষণ ও কার্য্যাবলীর খবর আমাকে পাঠাতে হবে। পরে জানতে পারি যে যখন ইউ, পি আই-এর ম্যানেজিং এডিটর কবিকে চিঠিতে একজন অধ্যাপকের নাম ঐ

পদের জন্য সুপারিশ করতে লেখেন, তখন কবি আমার নামই দিয়েছিলেন। যদিও এটি খুব সম্মানের পদ, তবুও এর দায়িত্ব যে কতখানি তা পরে অনেকগুলি ঘটনায় ভালোভাবে বুঝতে পারি।

কবি প্রায় সব সময়েই বাংলায় নিজের ভাষণ দিতেন। (Long Hand) অদ্রুত লিপিতে দু-তিন জন অধ্যাপক ভাষণগুলির অনুলিখন করতেন। বেশি প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি আমি ইংরেজীতে লিখে নিতাম এবং তারপর একটি সংক্ষেপিত রচনা টেলিগ্রামে ভারতের নানাস্থানে ইউ. পি আই এর প্রত্যেক কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতাম। বিদেশে যে খবর পাঠান হত তা কলকাতার হেড অফিস থেকে টেলিগ্রামে যেত। সাধারণত: আমি আমার রচনা অন্যান্য অধ্যাপকের অনুলিখনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতাম। একবার খবরের কাগজে আমার পাঠানো ঐ ধরণের একটি রচনা পড়ে কবি আমাকে বল্লেন যে তাঁর বক্তৃতার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশটিই আমি বাদ দিয়েছি। এই মৃদু ভর্ৎসনাকে তিনি অবশ্য মৃদুতর করলেন এই বলে যে যখন তাঁর সঙ্গে সব সময়েই আমি দেখা করতে পারি, তখন সংবাদগুলি পাঠাবার আগে তাঁকে দেখিয়ে না নেবার কোন কারণই ছিলনা। যখন অন্যান্য অধ্যাপকেরা তাঁকে তাঁদের বাংলা অনুলিখনটি দিলেন, তিনি সেগুলি সমস্তই আবার গোড়া থেকে লিখলেন। এর ফলে লেখাটি যা দাঁড়াল তাকে তাঁর বক্তৃতার অনুলিখন না বলে তাঁর বক্তৃতার মূল বা কেন্দ্রীয়তত্বের সম্প্রসারিত রূপ বলা চলে। ব্যাপার-টাকে বোঝাতে গিয়ে তিনি বল্লেন যে যখন তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন তাঁর তাৎক্ষণিক প্রেরণাই শুধু নয় উচ্চারিত শব্দগুলিও স্বতঃস্ফূর্ত ছিল এবং তাঁর উচ্চারণের বিশিষ্ট রীতি বা ভঙ্গীতেই ভাষণের ধ্যান-ধারণাগুলি মূর্ত্ত হয়ে উঠছিল সুতরাং অনুলেখকদের মনে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর শব্দগুলিতে অনুষঙ্গ ও আবেগের পার্থক্য সঞ্চারিত হয়েছে। তিনি যে উদা-হরণগুলি দিলেন তাতে আমাদের কাছে ব্যাপারটা খুবই স্পষ্ট হল।

মন্দিরে যখন তিনি উপাসনা করতেন সেই সময়ই বেশির ভাগ ভাষণই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যেত। শান্তিনিকেতনে আমার যোগ দেওয়ার ছ সাত বছর আগে ১৯২৪ কি ১৯২৫-এ শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে আমি যোগ দিয়েছিলাম। এই প্রসঙ্গে সে সভার কথা বলতে পারি। ওখানকার রীতি অনুযায়ী সভা সুরু হয় একটি গান দিয়ে। গানের প্রথম লাইনটি ছিল

প্রথম আলোর চরণ ধ্বনি
উঠলো বেজে যেই,
নীড়-বিবাগী হৃদয় আমার
উধাও হল সেই।

সেদিন তাঁর উপাসনার ভাষণের সমস্তটাই ছিল ঐ গানটির অন্তর্নিহিত মূলভাবের ব্যাখ্যা ও বহিঃপ্রকাশ। গানটি তিনি তাঁর নিজস্ব ধ্যান ও অনুভূতি থেকে পেয়েছিলেন এবং যখন তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন তাঁর সমস্ত মুখমণ্ডল সেই অনুভূতির আলোকে উদ্ভাসিত ও জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছিল—যেন তিনি আবার সেই জ্যোতিকে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করছিলেন। তাঁর প্রত্যেক কথাতেই ছিল সেই অভিজ্ঞতার অনুরণন। শুধু আমারই যে এই ধারণা হয়েছিল তা নয়, আমার যে সব বন্ধুরা সেদিন আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁদেরও তাই হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ যদিও তাঁর মাতৃভাষাতেই খুব বেশি লিখতেন তবুও তাঁর জীবৎকালেই সারা বিশ্বের শ্রদ্ধার্ঘ্য পাবার দুর্লভ গৌরব তিনি পেয়েছিলেন। এর সব চেয়ে বড় প্রামাণ্য-সাক্ষ্য তাঁর সত্তর বছরের জন্মতিথি উৎসবে প্রকাশিত 'দি গোলডেন্ বুক অফ টেগোর' গ্রন্থটি। শান্তিনিকেতনে আট বছর কাটানর

কালে তাঁর মহাজীবনের এই বিশ্বজনীন স্বীকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আজ আমি সে কথা স্মরণ করার ও লেখার সুযোগ আনন্দের সঙ্গে নেব। সেদিন তাঁর প্রতি পৃথিবীর মণীষিবৃন্দের ভালোবাসা ও স্বীকৃতির রূপ প্রত্যক্ষ করেছি। আরো দেখেছি কীভাবে তাঁরা শান্তিনিকেতনে এসে তাঁদের মনের ঐ আবেগগুলি তাঁর ওপর শতধারে বর্ষণ করতেন।

একবার তিনি যখন জানতে পারলেন যে কয়েকজন বিদেশী অতিথিকে ঠিকভাবে আপ্যায়িত করা হয়নি তখন তিনি প্রিন্সিপ্যালের কাছে এই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে যদি শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের কয়েকজন ঐ বিদেশী অতিথিদের দেখা-শোনার জন্য কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করেন তো তিনি খুশী হবেন। কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে আমার নামও তিনি বলাতে আমাকে প্রায়ই বিদেশী অতিথিদের অভ্যর্থনার কাযটি করতে হত।

বহুবার তিনি আমাদের বলেছেন "বিশ্বভারতী হচ্ছে জগতের কাছে পাঠান ভারতের নিমন্ত্রণ। মানুষের চরম সত্যের কাছে ভারতের নিজেকে উৎসর্গ করা। যখন কোন মানুষ সেই ডাকে সাড়া দিয়ে আসেন তখন কি তাঁকে সম্মানিত অতিথির মত গ্রহণ করবে না?"

তিরিশের দশকে বহু পণ্ডিত, চিন্তাবিদ, শিল্পী, কবি ও জাতীয়নেতা পৃথিবীর নানা দিক থেকে শান্তিনিকেতনে আসতেন রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য; অনেকে আবার এটাকে তীর্থযাত্রা হিসাবেও দেখতেন। তাঁদের মধ্যে অনেককে অভ্যর্থনা করার ভার আমার ওপর পড়েছিল। কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি যে তাঁদের মধ্যে অনেকেই আমাকে তাঁদের দেশ ও প্রতিষ্ঠান দেখতে ও তাদের বৈশিষ্ট্য জানতে আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ করেছিলেন; উদ্দেশ্য, যাতে তার ফলে আন্তর্জাতিক ও সাংস্কৃতিক ভ্রাতৃত্ববোধ বেড়ে ওঠে। তাঁরা বলতেন "আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের শ্রেষ্ঠ ও গৌরবময় প্রতীক হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ"। আমি কবির বহু অনুরাগীদের মধ্যে মাত্র দুজনের নাম করব। প্রথম—জগদ্বিখ্যাত জ্যোতিবিদ অধ্যাপক কার্ল হুজের—প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের য়্যাসট্রোনমির বিভাগীয় প্রধান। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করা মানেই ভারতের জ্যোতিকে প্রণাম করা।

দ্বিতীয় হলেন পোল্যাণ্ডের ক্র্যাকাও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক এম, ক্রেজেনস্কি। অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় তিনি আমাকে বলেন যে কবির বাণীতে এবং ব্যক্তিত্বে এমন কিছু আছে যা এই পৃথিবীর নয়। পশ্চিমের বহু অতিথি ও —তার মধ্যে কয়েকজন ইংরেজও ছিলেন—উইল ডুরাণ্টের (বিখ্যাত য়্যামেরিকান দার্শনিক ঐতিহাসিক) মতের প্রতিধ্বনি করেন। "একজন রবীন্দ্রনাথই স্বাধীন জাতিগুলির মধ্যে ভারতের স্থান পাওয়ার (অর্থাৎ ভারতের স্বাধীন হওয়ার) পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি।"

রাত্রি দশটায় শান্তিনিকেতনে পৌছেই একজন পোল্যাণ্ডের লেখক—য়্যালেকজাণ্ডার জুনটা রবীন্দ্রনাথ যে ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন সেই ঘরটি দেখতে চান ও প্রথমেই সেখানে গিয়ে তাঁকে নীরবে প্রণতি জানান। পোল্যাণ্ডের আরেকজন অবসর প্রাপ্ত স্কুল পরিদর্শক আমাকে বলেছিলেন যে তিনি সমস্ত জীবন ধরে অর্থসঞ্চয় করেছেন দুটি জিনিষ দেখার জন্য—রবীন্দ্রনাথ ও তাজ।

বিবেকানন্দর বিশ্বখ্যাতির পরেই রবীন্দ্রনাথের উত্থান অধ্যাত্মজগতের নেতা হিসাবে ভারতের স্থানকে সুদৃঢ় করেছিল। একজন ভারতীয় হিসাবে আমি এইজন্য আনন্দিত যে পশ্চিমের এই সব ভারতবন্ধুরা রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব যে একটা পরমাশ্চর্য্য ঘটনা,

তার কিছুটা তাৎপর্য্য বুঝতে পেরেছিলেন। মরমী সাধকদের অনুভূতিতে যাকে তাঁরা মানুষের বিবর্ত্তনে মহালক্ষ্মীশক্তির একটি প্রকাশ বলেন—রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভগবানের সেই বিভূতিরই একটি অংশ। মহালক্ষ্মী হচ্ছেন পরমাশক্তির চারটি প্রধান অংশের একটি। মহাজননী, যিনি সৌন্দর্য্যের আত্মা ও সৃষ্টির সামঞ্জস্য বিধান করেন। তিনিই স্বর্গীয় অমৃতের মোহময় মাধুর্য্য বিস্তার করেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই সৌন্দর্য্য, এই সামঞ্জস্য ও এই জীবনের আনন্দ সমস্ত কিছুতেই আত্মার আনন্দের প্রতিফলন সম্বন্ধে জগৎকে আগে থেকে সচেতন করা হয়েছে। প্রকৃতির বিবর্ত্তনে তাঁর জীবন সাধনার এইটি ছিল আংশিক তাৎপর্য্য।

সকৃতজ্ঞ চিত্তে আমার এই স্মৃতিচারণ শেষ করছি। যে স্নেহময় ভাষায় তিনি আমাকে তাঁর আশীর্ব্বাদ জানিয়েছিলেন তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। সে সময় আমি তাঁর অনুমতি নিয়ে শান্তিনিকেতন ছেড়ে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যোগ দিতে ও তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলাম। তাঁর হৃদয় স্পর্শ করা প্রশংসা-বাণী, শুভেচ্ছা এবং উৎসাহ যা আবেগময় ভাষায় তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন তা আমার আত্মাকে স্পর্শ করেছিল এবং আমার মনের উৎসাহ উদ্দীপনাও বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই পাথেয় নিয়েই আমি পণ্ডিচেরীর দিকে যাত্রা শুরু করছিলাম। ছাব্বিশ বছর আগে যখন আমি শান্তিনিকেতন ছেড়ে আসি তাঁর সেই বিদায়বাণী সেদিনও যেমন আজও তেমনি আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

১। লালভাণি পাবলিশিং হাউস—এই প্রবন্ধের অনুবাদ করার অনুমতি দানের জন্য।

২। দেবপ্রসাদ রায়, ৺শিশিরকুমারের মাতুল কোন্নগরের বিশিষ্ট সন্তান ৺যতীন্দ্রনাথ রায়ের পুত্র—তাঁর লেখা জীবনী থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য—"শিশিরদার আশ্রমজীবনের পূর্ব্বকথা" 'পুরোধা' এবং জুলাই ১৯৭৭ পৃ ৭০ ; অক্টোবর ১৯৭৭ পৃ ৪৫।

৩। সুসাহিত্যিক মুরারীমোহন মিত্র ও সাহিত্য রসিক বন্ধু পুত্র কল্যাণীয় অরুণদেব—অনুবাদের ব্যাপারে—সমালোচনা ও আন্তরিক সাহায্যের জন্য।

অনুবাদক : ডাঃ জ্যোতির্ম্ময় বসু

প্রসঙ্গ : গোধুলি-মন

O আপনার প্রেরিত বইমেলা—'৮৬ এবং গল্প সংখ্যা '৮৬ পেয়েছি। খুব ভাল লেগেছে। তবে গল্প সংখ্যার চেয়ে কবিতা সংখ্যাটি বেশি ভাল লেগেছে। বহুদিন বিদেশে বলেই হোক, বা গল্পের বিবর্ত্তনের ধারাটা বাংলা ছোটগল্পে অনুপস্থিত বলেই হোক, ইদানিং বাংলা ছোটগল্প খুব কমই আকর্ষণ করতে পারে। গল্প হলো পারিপার্শ্বিক সমাজ ও তার জীবনের প্রতিফলন। সমাজ এদিকে খুবই দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের গতিও তদরূপ। এ দুটো গতিই স্বদেশের মাটিতে হয়তো—এতোটা চলমান নয়। তাই আমার কাছে অধিকাংশ বাংলা গল্পই মনে হয় একটু পিছিয়ে থাকা কারিগরী। হয়তো বা আমার মনের নির্বাসনই তার জন্য দায়ী। তবু গোধুলি-মনের গল্প সংখ্যায় অরুণ সরকারের সংক্রামক গল্পটি পড়ে ভাল লেগেছে।

গজেন্দ্রকুমার ঘোষ/সুইডেন

ছোট গল্পের রচনারীতি ঃ রবীন্দ্রনাথ

অজিত রায়

নয় নয় করে শ বছর উৎরে গেল বাংলার ছোটগল্প।[১] শতকোত্তীর্ণের গর্ব শুধু কালব্যাপ্তির কারণে নয়, বস্তুত আয়তনে ছোটো হয়েও বাংলা ছোটগল্প কয়েকটি বিশেষ গুণে এতদিনে বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে। এর কৃতিত্ব কার? জবাবটা সর্বজন জানে।

এ কথা নিন্দুকেরাও জানে যে বাংলা ছোটগল্প আজ যত দূর এগিয়েছে, রবীন্দ্রনাথ না এলে ততটা সম্ভব ছিল না। কিন্তু উদ্যোগী উপাধ্যায়বৃন্দের জ্ঞানঠাসা বইগুলিতে বাংলা ছোটগল্পের আদিপুরুষ হিসেবে 'রবীন্দ্রনাথ' চিহ্নিত থাকুন; আমরা, হালের নভিসেরা জানি, তিনি এর জন্মদাতা নন— নবজাতককে সুতিকাগার থেকে লালন করে কৈশোরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র ('মাত্র' কথাটা দ্ব্যর্থ-বোধক)। আদিপুরুষ নন, যথার্থ পৃষ্ঠপোষক, রক্ষক। পক্ষান্তরে, রবি ঠাকুর ছিলেন বাংলা ছোটগল্পের বর্ষীয়ান প্রতিপালক। না, এই পয়েন্টে সাক্ষী সবুদ হিসেবে রামায়ণ-মহাভারতের ক্ষুদে উপাখ্যানগুলি, জাতক কথা, মিথ, লিজেণ্ড প্রভৃতিকে টানার পক্ষপাতি আমি নই। বলতে চাই, এ-ব্যাপারে রবি ঠাকুর সম্পূর্ণ পূর্বসূত্রহীন ছিলেন না। বাংলা গল্পের প্রথম প্রকৃত রূপকার বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়ে'র দ্বিতীয়
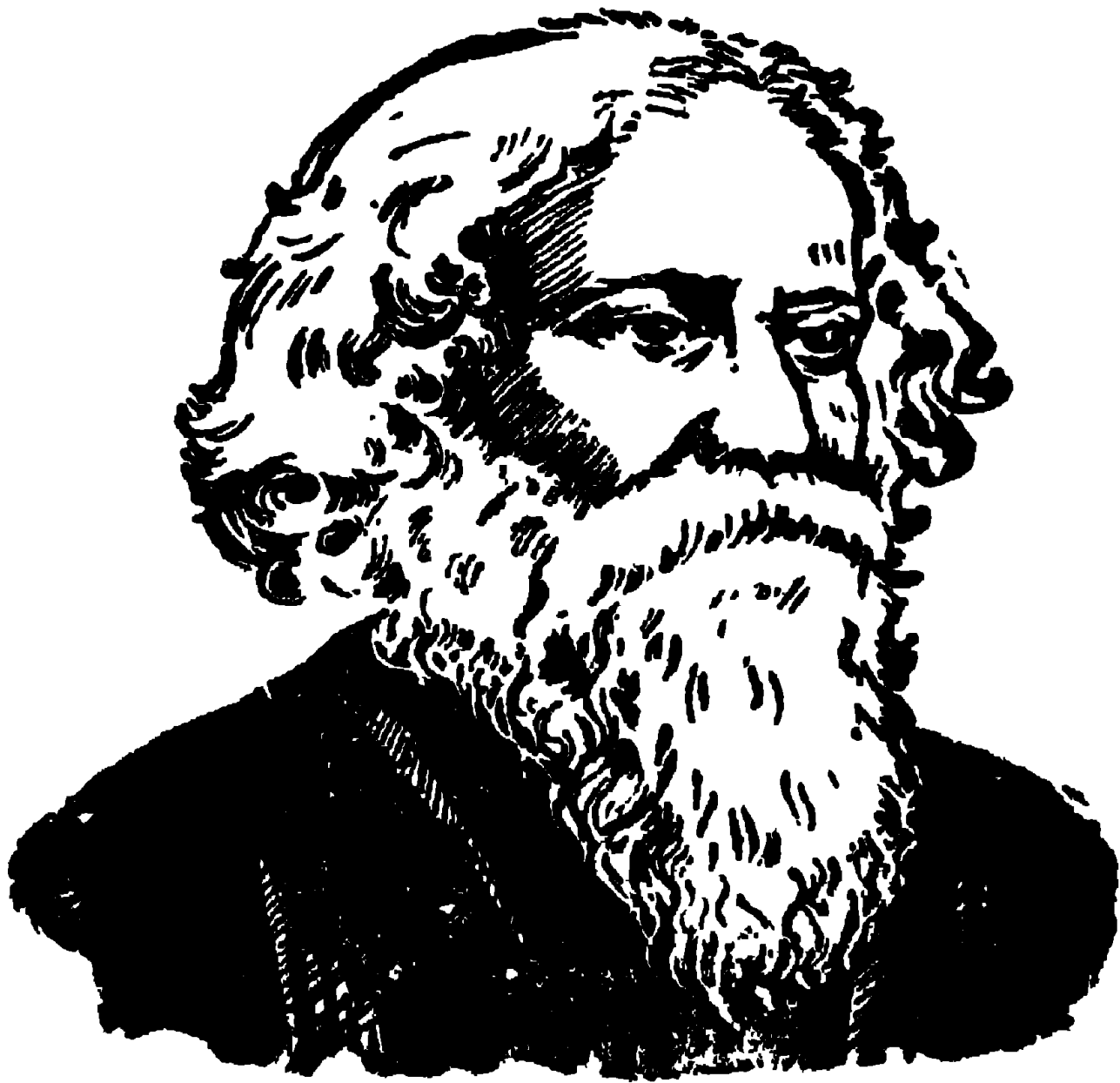
ভাগে (এপ্রিল ১৮৫৫) ভুবনের গল্পটিকে বাংলা ছোট গল্পেরই ভ্রূণ বললে পণ্ডিত প্রবররা নাকে নস্যি টিপে তাকে নস্যাৎ করতে পারবেন কি ?—

'যতদিন বিদ্যালয়ে ছিল, সুযোগ পাইলেই,
চুরি করিত। এইরূপে
ক্রমে ক্রমে সে বিলক্ষণ চোর হইয়া উঠিল।'

এটিই কি সেই মোক্ষম টেকনিক নয় যাকে আশ্রয় করে এডগার অ্যালেন পো থেকে শুরু করে হাল-ফিলের গল্প-লিখিয়েরা ক'রে খাচ্ছেন ?[২] মাত্র দু-একটি শব্দে নায়কের ব্যাকগ্রাউণ্ড তুলে ধরে 'ক্রমে ক্রমে' শব্দ-জোড়া দিয়ে বর্ণনাবাহুল্য পরিহার করে ভুবনের 'চোর হইয়া উঠা'কে প্রাঞ্জল করে তোলা হয়েছে মাত্র দুটি বাক্য। এ কি 'গল্পরস' নয় ? যদি না-ই হয়, তবু কেন শ্রীপূ (বঙ্কিমভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র ?) রচিত 'মধুমতী' (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮০) বা স্বয়ং বঙ্কিমের 'যুগলাঙ্গুরীয়' প্রাক্ রবীন্দ্রযুগের ছোটগল্প হিসেবে চিহ্নিত হবে না ? আমি এবং আমার সগোত্ররা বলবে, বাংলা ছোটগল্পের যখন নাড়ি ছেঁড়েনি, সেই সময় বিদ্যাসাগরের ভুবনের গল্পটি, পূর্ণচন্দ্রের 'মধুমতী' এবং 'পুজার গল্প' (১২৯১) ও 'বড় গল্প নয়' (ঐ)—এগুলিই রবীন্দ্র-ছোটগল্পের প্রতিমা নির্মাণে কাঠ খড় কাদা জুগিয়েছে। এবং স্বীকারে দ্বিধা নেই, কবিতা গান নাটক উপন্যাস প্রবন্ধ ছবি রচনার পাশাপাশি তিনি সমান গুরুত্ব সহকারে সাহিত্যের এই নবীন আঙ্গিকটি রেওয়াজ করেছেন এবং তাকে নাবালকত্ব দিয়েছেন। আর বহির্বিশ্বে যেখানে তাঁর কবিখ্যাতিই প্রধান, গল্পকার হিসেবে সেখানেও রবীন্দ্রনাথকে মোপাসাঁ, অ্যালেন পো বা চেকভের পাশে স্থান দিতে রুখবে কোন্ হিটলার ?

॥ ২ ॥

প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর কাজটা ওপরে সেরে নিলুম। আর-একটু বাড়তি কচকচি বক্ষমাণ অনুচ্ছেদে। আমি চন্দনকাঠের দেশে ঘুঁটে বেচতে আসিনি। নস্য-সেবনকারী পণ্ডিতদের চেষ্টা অফুরান এবং খোঁড়াখুড়ি হয়নি এমন জমি দুর্লভ। আমার দুঃসাহসের জোর এইটুকু যে জমি ঠিকমতো কাটা হয়েছে কিনা তা পরখ করার বিদ্যেটা একটু-আধটু জানি। লোভের অংশটা এই যে এই সুযোগে পড়া গেল বিস্তর, আলোকনের একটা স্ট্যাণ্ড-পয়েণ্ট পেয়ে গেলুম। এবং পুরনো পাঠক মাত্রেই জানেন, গড়ার বদলে বাটালি হাতুড়ি নিয়ে ভাঙার দিকেই ঝোঁকটা আমার বেশি। মা বঙ্গঠাকুরাণী, এমন ডেঁপো অজিত রায় দ্বিতীয়টি আর জন্ম দিও না গো। দিলেই সব্বোনাশ্।

ওপরে বললুম বটে রবি ঠাকুর বাংলা ছোটগল্পের আদি পুরুষ নন, কিন্তু এতে যাঁরা গ্ল্যাকসো বেবির মতো রবীন্দ্রনাথ ভাঙিয়ে জীবন-ধারন করছেন, তাঁরা চটতে পারেন। আমি কিন্তু, বিশ্বাস করুন, ভুবনের গল্প, মধুমতী ইত্যাদিকে অঙ্কুর বা ভ্রূণের বেশি মর্যাদা দিচ্ছি না। আমিও তো মনে করি, 'দেনা পাওনা' (১২৯৮)-র আগে বাংলায় প্রকৃত ছোটগল্প লেখাই হয়নি।

'প্রকৃত' কথাটি সাধারণ অর্থে নয়। 'প্রকৃত' বলতে 'ব্যাকরণানুগ' বোঝাচ্ছি, তা-ও নয়। ছোটগল্পের গঠন, বৈচিত্র্য, ভাবৈক্য ইত্যাদি যা যা জরুরী উপাদান সব ক'টির একসঙ্গে দেখা মিলেছে ১২৯৮ সনে। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথেরই ভিখারিণী (১২৮৪), 'ঘাটের কথা' (১২৯১) 'রাজপথের কথা' (ঐ) বেরিয়েছিল বটে ; কিন্তু যাকে বলে পারফেক্ট টোন—সেটা 'দেনা পাওনা'র আগে কোথায় ? এই পারফেকশন বলতে, নো ডাউট, তাত্যার্থকে বোঝাচ্ছি। সাহিত্যের ফ্যামিলিতে ছোটগল্পের ঘনিষ্টতম জ্ঞাতির নাম সনেট। দুটির ক্ষেত্রেই অলক্ষ্য নির্দেশ : 'বড় যদি

হতে চাও ছোট হও তবে'। ছোটগল্প কী, তা নিয়ে বাড়ুজ্জে সেন বিশী চৌধুরী রায় প্রমুখ উপাধ্যায়বৃন্দ বিস্তর লেখনীপাত করেছেন; তথাচ পার্টিকুলার একজন স্রষ্টার রচনা-ব্যবচ্ছেদ করার সময় আলং-কারিকের সব ক'টি শর্ত বা ফতোয়া তামিল করলে চলে না। সুতরাং পছন্দসই একটা ধারণা গড়ে নেওয়া ভালো। অবশ্যি, চক্ষুদানের ধরণ পাল্টে বা চাউনিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে, মায় দেহের রঙ বদল করলেও, দেবীর রূপভঙ্গিমার খাস বদল হয় না।

মহা ফ্যাসাদ। ছোটোও হবে গল্পও হতে হবে—তাও শুধু পরিসরে কৃশ হলেই চলবে না। ব্রাণ্ডার ম্যাথুজ সাহেব ফতোয়া দিয়েছেন, ছোটগল্পে অপরিহার্য হলো ভাবের ঐক্য।[৩] আবার যে জিনিসকে ফুটিয়ে তুলতে একশো পাতা লাগে তাকে দশ পাতায় বিধৃত করলে উপন্যাসের সিনপসিস হয় মাত্র, ছোটগল্প হয় না। উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের তফাৎ শুধু দৈর্ঘ্যে নয়—তৎসহ উদ্দেশ্যে, পদ্ধতিতে আর নির্মাণে।[৪] জীবন তো সবটাই, তবু প্রণীত হবে তার একাংশ; তবেই ছোটগল্প। সবটা ধরার ঠিকেদারি উপন্যাস করে করুক, কিছু কিছু যদি ধরতে হয় তার জন্যে ছোটগল্প। ভাসাবে নিশ্চিত, কিন্তু কোথাও খানিক ডাঙাও পাইয়ে দেবে। যা শেষ হয়ে গেল বলে আপাতদৃষ্টে মনে হবে, আসলে কিন্তু তা শেষ হবে না। থেকে যাবে একটা রেশ। ওই রেশটুকুর নাম দিলুম ছোটগল্প। ব্যাপারটা এমনই যে সাহিত্যের অন্যবিধ প্রকরণগুলির সঙ্গে ছোটগল্পের ব্লাড-গ্রুপও ঠিক মেলে না। জীবনের আর তার যাপনের ছবি তো অনেকখানি। কিন্তু ছোটগল্প ধরবে তার একটুখানি। একটুখানিই হয়ে উঠবে অনেকখানি। সেই বস্তুই বিশ্বনিখিল, যা ছিল স্রেফ দুই বিঘা জমি।

না, আমি খেই হারিয়ে ফেলিনি। কথা হচ্ছিল প্রথম বাংলা ছোটগল্প নির্ধারণ প্রসঙ্গে। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে 'ভারতী'-র শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভিখারিণী'কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্প বিবেচনা করে কেউ কেউ সেটিকে 'প্রথম বাংলা ছোটগল্প' হিসেবে বর্ণনা করেন। বস্তুত 'ঘাটের কথা' (১২৯১) তাঁর প্রথম ছোটগল্প হিসেবে স্বীকৃত। এহো বাহ্য। বড়ো বেশি নিষ্ঠুর হলে বলতেই হয়, 'দেনা-পাওনা'-র আগে বাংলায় ছোটগল্প আসেইনি। সাহিত্যের নতুন কোনো রীতি উদ্ভাবনের পেছনে একটা ধারাবাহিক ইতিহাস থাকবেই, এ তো জানা কথা। তাই 'মধুমতী' 'ভিখারিণী' ইত্যাদি সত্ত্বেও আমরা 'দেনা পাওনা'কে মৃন্ময়ী প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা জাতীয় বলতে চাইছি।

যা হোক। আদা-ব্যাপারীর এতো রেফারিগিরি সাজে না। আমার প্রতিপাদ্যের যোগানকারী অনুষঙ্গ নিয়ে এর বেশি আলোচনা বিরক্তিকর। এ আবার পূর্ণদেহী আলেখ্য নয়—সাদামাটা একখানা প্রোফা-ইল। তা-ও একপেশে। কেননা আলোকোণের যে-দৃষ্টিকোণই গ্রহণ করা হোক, তা লেখক 'আমি'র একক চোখ। মিলুক আর না মিলুক, বলে রাখলুম, উপপাদ্যটি আপনার জন্যে।

॥ ৩ ॥

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের কথা উঠলে সেগুলিকে 'নিছক কাব্যধর্মী' বলে একটা নষ্টালজিক ধারণার প্লেগ ছড়িয়ে দেওয়ার হীন মানসিকতা আজও ঘুচল না। যদি কোন অলৌকিক দুর্ঘটনায় রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি খুইয়ে যায়, তবে তাঁর ছোটগল্পগুলি পড়েই আগামী যুগের পাঠক ঠাহর করে নিতে পারবে যে রবীন্দ্রনাথ এক মহাকবির নাম। টিকিধারী-মঞ্চে অদ্যাপি প্রচলিত ধারণাই এই। গদ্যে বঙ্কিম ও প্রমথ চৌধুরী দ্বারা অংশত 'প্রভাবিত' রবীন্দ্র-ছোটগল্পের ভাষার প্রাণমূল উত্থিত হয়েছে মূলত কবিহৃদয় থেকে।

এ-মন্তব্য কি প্রশস্তির ? না। বরং এতে এ-ইঙ্গিতটাই বলবৎ যে ছোটগল্পের পক্ষে কাব্যধর্মী হওয়াটা ন্যক্কার-জনক। 'পূজারিণী' বা 'দেবতার গ্রাস' পদ্যে লেখা হয়েছে বলে দুঃখ নেই, কিন্তু 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' বা 'ক্ষুধিত পাষাণ' গদ্য হয়েছে বলে দুখীরামরা ক্ষুব্ধ। তাঁরা বুদ্ধদেব বসুর এই মন্তব্যটা ভেবেই দেখতে চান না যে, 'রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির পাশা পাশি জায়গা ছিল, একজন খাঁটি কবি, আর একজন খাঁটি গল্পলেখক। তাঁর গল্পে যে-গুণগুলি প্রকাশ পেয়েছে সেগুলি বিশেষভাবে গল্পেরই গুণ, কবিতার নয়; গল্প-লেখকের স্বাভাবিক ক্ষমতায় তিনি মোপাসাঁ, চেখভ প্রভৃতি বিশ্ববরেণ্যদের সমকক্ষ।'[৫] এর সপক্ষে উদ্ধৃতি প্রমাণে পরে আসছি। এখানে শুধু এইটুকু বললেই হবে যে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির 'রচনারীতি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, যে-সময়ে তাঁর বেশির ভাগ গল্প লেখা, রবীন্দ্রনাথের সেই সময়কার কাব্যরীতির সঙ্গে এর সাদৃশ্য নেই।'

সাদৃশ্য নেই, কেননা একুশ নয় বাইশ নয়, রবীন্দ্রনাথ গল্প লেখা যখন শুরু করেন তখন তাঁর বয়স তিরিশ। বলা বেশি, কবিচিত্ত তখন অশান্ত। 'রাজ-নৈতিক পরিস্থিতির উচ্চাবচতায় সংক্ষুব্ধ কবির নাগ-রিক মন আশ্রয় নিল পদ্মার বুকে, প্রকৃতির আশ্রয়ে। কিন্তু প্রকৃতির অকৃপণ সৌন্দর্য ও কৃপণ পৃথিবীর দুঃখ দৈন্য কবিহৃদয়ে এক নতুন ভাবের সঞ্চার করল।... উত্তরপর্বে...এক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছেন। এ দ্বন্দ্ব কবির অবস্থান স্বাভাবিকতার সঙ্গে উদার আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব, পরিবেশ থেকে হয়ে ওঠার সঙ্গে হতে চাওয়ার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বই স্রষ্টারূপে রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্বের ভিত্তিভূমি। আর এই ভিত্তিভূমির উপরই রবীন্দ্র নাথের ছোটগল্প রচনার শুরু।'[৬]

শুধু শুরু বললেই ল্যাঠা চুকে যায় না। শুরুর অবস্থাটা কী ছিল সেটি বিবেচ্য। কথকতার সহজ রাস্তাটাই রবি ঠাকুর নিয়েছিলেন বেছে। যা দেখেননি, সেখানে যাননি। অদেখার বর্ণনা অতি লোভের; সুখের কথা, তিনি তার খপ্পরে পড়ে তাঁতী ডোবাননি। রীতির ব্যাপারে কোথাও মোপাসাঁ[৭], কোথাও প্রমথ চৌধুরীর রোদ্দুর ঝল্‌কে উঠলেও, রবি-রশ্মির প্রাখর্যে সব নবোজ্জ্বলা গঙ্গা। যে-সময়ে তিনি লিখতে এলেন, সে-সময়ে পাশ্চাত্যের ছোটগল্প খুব যে উন্নত ছিল, তা নয়; তবে তার ধারার অনুগমন যথেষ্ট লক্ষ্য করি রবীন্দ্রনাথের রচনায়। একথা ঠিক যে সংস্কৃতের সঙ্গে দাদা-কাঁচকলা সম্বন্ধ রেখেও আমরা সংস্কৃত কাব্যগুলি পড়ে ফেলেছি রবীন্দ্রনাথের দরুণ, তথাচ রবীন্দ্র-গল্প পড়লে কোথাও ভ্রম হয় না যে কথাসরিৎসাগর পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ বা দশকুমারচরিত পড়ছি। বরং একটু দুঃসাহস করে বলবো, রবীন্দ্রনাথ ফ্রেনের কোর্তা-পরা মেমকে শাড়ি শাঁখা সিঁদুর পরিয়ে বাংলার ঘরের বউ করে আনলেন। এবং যেভাবে যে-শিক্ষায় বউটি বড়ো হলো, তা বাঙালির অতি আদরের।[৮] এবং সেই সময় বাংলা গদ্যের অসন্দিগ্ধ আদর্শ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ভাষার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথও তাঁর দ্বারা আংশিক আক্রান্ত হয়েছেন বলা গেলেও, কালক্রমে বঙ্কিম থেকে সরে এসে তিনি কোন্ কৌশলে 'সাধু থেকে চলতি ভাষায়, ঋজু থেকে বঙ্কিম ভঙ্গিতে, সরলতা থেকে সমৃদ্ধ কারুকলায়—বিবর্তনের সবগুলো ধাপই 'পোস্টমাস্টার' থেকে 'পাত্রপাত্রী' পর্যন্ত ধাপে ধাপে চিহ্নিত' করেছেন, সেটা গবেষকদের ভাতের সওয়াল। আমরা এখানে একটি মাত্র নমুনা উদ্ধৃত করলুম :

'নবাবজাদীর ভাষামাত্র শুনিয়া সেই ইংরাজরচিত আধুনিক শৈলনগরী দার্জিলিঙের ঘন কুজ্‌ঝটিকাজালের মধ্যে আমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে মোগলসম্রাটের মানসপুরী মায়াবলে জাগিয়া উঠিতে লাগিল—শ্বেত রচিত বড়ো বড়ো অভ্রভেদী সৌধশ্রেণী, পথে লম্বপুচ্ছ

অশ্বপৃষ্ঠে মজলন্দের সাজ, হস্তিপৃষ্ঠে স্বর্ণঝালরখচিত হাওদা…'

[দুরাশা]

বাহুল্য বিবেচনায় বেশি উদ্ধৃরণ দিলুম না। প্রবল অনুপ্রাস, সন্ধি-সমাসের অতিরেক আর আধা-সংস্কৃত বঙ্কিমি বাংলার নিরন্তর বর্ষণেও গল্পের রাস্তাকে ঢেকে দিতে পারেনি। ভাষার বৃষ্টি কোনো বাধ সাধে না, বরং কাহিনীর গতি আরো মসৃণ আরো স্বচ্ছ করে। এখানেই রবীন্দ্রনাথ লঙ জাম্প দিয়েছেন বঙ্কিমের বিস্তীর্ণ আখাড়া থেকে। কেটে কেটে সোজা এগিয়ে গেছেন লক্ষ্যের দিকে। এগিয়ে গেছেন, এগিয়ে দিয়েছেন।

মহৎ স্রষ্টার লক্ষণই এই। তাঁর জিভ সময়ের হাত থেকে দশ হাত এগিয়ে থাকবে, যাতে ভবিষ্যতের সময় তার পিঠে আরূঢ় হতে পারে। অবশ্যি রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব এই এক-ছটাক উপমায় বোঝানো যায় না। আমার সে-ক্ষমতাও নেই। আমরা বরং একটি মাত্র তাকে বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিতে ছুদামের দেহের মতো 'একটি পরিমিত পারিপাট্য, একটি অবলীলাকৃত শোভা প্রকাশ পায়'। বুদ্ধদেব বসু এই গুণটির নাম দিয়েছেন 'সাত্ত্বিকতা', এবং এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্বরূপ উনি 'নষ্টনীড়'কে পয়েন্ট আউট করেছেন। —'যেখানে লেখক প্রায় কিছুই বলেননি অথচ সবই বলেছেন'।

॥ ৪ ॥

তিন খেপে ভাগ করে নেওয়া যাক রবীন্দ্র-ছোটগল্পের রচনাকালকে। ১৮৯১ থেকে ১৯০১ দার্শনিক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'হিতবাদী' আর সুধীন ঠাকুরের 'সাধনা'য় লেখার কালটিকে বলবো প্রথম পর্যায়। এ-সময় পাশাপাশি বইছে সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী। তথাচ এই পর্বের ছোটগল্পের বস্তু হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন সামাজিক-পারিবারিক সমস্যা, নিসর্গ-আশ্রিত জীবন, অতিপ্রাকৃত রোমাঞ্চ আর রাজনীতিকে। 'দেনা পাওনা' 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' 'হৈমন্তী' ইত্যাদি তার উদাহরণ। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হলো প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্রে', ১৯১৪ থেকে। এই পর্বে কবিমানস নগর—কেন্দ্রিক। 'স্ত্রীর পত্র' 'পয়লা নম্বর' 'হালদার গোষ্ঠী প্রভৃতি সাকুল্যে দশটি গল্প এই পর্বের। পল্লীজীবন থেকে বেরিয়ে, বিশ্ব-নিখিল তখন আনাগোনা করছে চিন্তায়। মানব-মনের কিছু মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাকে বাস্তব পরিমণ্ডলে ধরবার চেষ্টা দেখা যায় এই দশটি গল্পে। এর পর তাঁর গাল্পিক লেখনী স্তিমিত হয়ে আসে। শেষ জীবনের কয়েকটি ছোটগল্পকে যদি ধরি—সেগুলিই তৃতীয় পর্যায়ের। এখানে তিনি 'পাকা' লেখক। নিছক গুরু ভাবের জটিল নগর-মন নিয়ে পরীক্ষাধর্মী গল্পের হাত ধরে প্রাত্যহিক আটপৌরে জীবনযাত্রাকে ছন্দোবদ্ধ করেছেন এই পর্বে 'তিন সঙ্গী'র গল্পত্রয়ীতে। এই তিনটিতে ভাবপরিমণ্ডলের সামগ্রিকতা লক্ষ্য করি।

এই তিনটি পর্যায়ে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের নয়, বরং গোটা বাংলা ছোটগল্প-ধারার ধারাবাহিক বিবর্তন, মতান্তরে উত্তরণ দেখতে পাই। যেমন মহত্তম প্রতিভা ছিল তাঁর, তেমনি তার স্ফুরণ। গদ্যভাষা তখনও অপেক্ষাকৃত কাঁচা, অথচ তা-ই দিয়ে সমগ্র বাংলা ছোটগল্প-সাহিত্যের ভগীরথের দায়িত্ব তাকে বহন করতে হয়েছিল। আর, কী আশ্চর্য, পুরো একটা যুগ তাঁর দখলে থেকে গেল। আর আমার ধারণা, স্কুল-কলেজের পড়ুয়া এবং আবৃত্তিকারদের বাদ দিলে, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের পাঠক আজও অপেক্ষাকৃত বেশি। এখানেই গল্পলেখক রবীন্দ্রনাথের জিৎ।

রবীন্দ্রনাথ যে জিতে গেছেন তার সবচেয়ে বড়ো কারণ ভাষা নয়—ভঙ্গি। স্টাইল বা রীতি যা তখনো

অব্দি ছিল অনন্য, স্বতন্ত্র। 'গল্পগুচ্ছে'র রচনারীতি সম্পর্কে বুদ্ধদেব যথার্থই বলেছেন, 'সরল ও সুমিত, কোথাও জমকালো নয়, কোথাও চমক লাগাবার ইচ্ছে নেই, লেখকের গলা কোথাও চড়ে না, গল্পের বিশেষ কোন অংশে বিশেষভাবে জোর দেবার প্রলোভন থেকে তিনি মুক্ত, পাত্র-পাত্রীর মধ্যে হঠাৎ নিজে আবির্ভূত হ'য়ে মন্তব্য করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।'[৯] আবার 'গল্প তিনি সরাসরি আরম্ভ করেন এবং মুহূর্তের মধ্যে পাঠকের মনকে ঘটনাস্রোতে মগ্ন করেন, ভূমিকা করেন না, দম নেবার জন্য থামেন না, পরোক্ষভাবে উপদেশ দেন না, ঠিক মুখে-বলা গল্পের মতো সহজ স্বচ্ছন্দ স্রোতে ব'য়ে চলে তাঁর কাহিনী।'[৯] এই মন্তব্যের সপক্ষে ডজন-ডজন দৃষ্টান্ত হাজির করা যেতে পারে, কিন্তু লোভ সংবরণ করে দুটি মাত্র এখানে উদ্ধৃত করছি :

'বাহিরেও অত্যন্ত গুমট। দু প্রহরের সময় খুব এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনো চারিদিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই। বর্ষায় ঘরের চারিদিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে...

(শাস্তি)

'ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় রুদ্ধ গম্ভীর গর্জনে বলিয়া উঠিল, 'কী বললি।'—বলিয়া মুহূর্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না-ভাবিয়া একেবারে স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল। রাধা তাহার ছোট জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মুহূর্ত বিলম্ব হইল না।'

(শাস্তি)

যন্ত্রণা কষ্ট দুঃখ মৃত্যু হত্যা ইত্যাদির এমন 'নির্লিপ্ত' বর্ণনা একা রবীন্দ্রনাথই দিতে পারেন। কিংবা ধরা যাক 'শাস্তি' গল্পের শেষ অংশে 'দয়ালু' শব্দের মোলায়েম শ্লেষ থেকে শুরু করে 'মরণ' শব্দটির বহুমুখী ব্যঞ্জনা পর্যন্ত 'যেন তীরের ফলকের মতো ক্রমশ সরু হ'য়ে, সংহত হ'য়ে বুকে এসে' বেঁধার কৌশলটি। রবীন্দ্রনাথের গল্প-বলার এমন বহু ছোটো-বড়ো কৌশল 'গল্পগুচ্ছে'ই প্রাপ্তব্য। এমন ঢের গল্প তাতে আছে যেগুলি যন্ত্রণা না হোক, একটু ছোপ একটু দাগ অবশ্যই রেখে দেবে সহৃদয়ের বুকে। এটা, এবং এমনি আরো কিছু কারণ আছেই—যার সম্মিলিত পরিণামে দশকের পর দশক রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের দিশারী হয়ে থেকেছেন।

বিদ্যাসাগর রামমোহন বঙ্কিমকে প্রণিপাত। যে-কারণে গদ্য নাম্নী প্রকরণ-গঠনে রবি ঠাকুরকে খুব বেশি কেঁচে গণ্ডূষ করতে হয়নি। কিন্তু ছোটগল্পে? তিনি যে পাশ্চাত্য ছোটগল্পের ধারানুগমন করে বাংলায় গল্পের বান ডেকেছিলেন, তার ঋণ শুধবে কে? এবং একথা বললে কি অত্যুক্তি হবে কি যে, উনিশ শতকে ছোটগল্পের প্রকৃত আবির্ভাব পাশ্চাত্য দেশে ঘটলেও তার জমি ভারতবর্ষে—বঙ্গভূমেই তৈরী হয়েছিল? কবিতার কথা বাদ। ছোটগল্পে যে শব্দের র‍্যাশনিং, বাক্যের ইকনমি, ভাবের ঐক্য—এসব থাকে তা কি আর-সব প্রকরণের চেয়ে শক্ত নয়? আজও, যখন কম্প্যুটরাইজেশনের যুগ, যখন দম ফেলার শ্বাস নেবার ফুরসৎ নেই, এবং লেখকও অগণন—তখন কি শুধু রচনারীতির গুণেই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের জনপ্রিয়তা বাড়ছে না?

দেখতে দেখতে আমার আলোচনার ন'টে গাছটি মুড়িয়ে এলো। যত কথা বলবো ভেবেছিলুম, তার সিকি ভাগও এইটুকু পরিসরে ধরাতে পারিনি। তাই, রবি ঠাকুরের গল্পের রচনারীতি প্রসঙ্গে আমার শেষ কথা, 'শাস্তি' গল্পের ছিদামের দেহের বর্ণনাটি পাঠক মিলিয়ে দেখতে পারেন।

১। এবং আশ্চর্যের, 'ইংল্যাণ্ডে যখন ছোটগল্প নামের প্রকরণটি নিয়ে হাতেখড়িও হয়নি, তখন ফ্রান্স আর রুশ দেশে এর অঙ্কুর মাথা তুলেছে।...প্রায় তখনই... আমাদের দেশে মোটামুটি প্রায় একই সময়ে।'

[কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ছোটগল্প নিয়ে ১৯৮৩ সালের নভেম্বরে কথিত সন্তোষকুমার ঘোষের আলোচনা থেকে]

২। 'Short story writers should always bear in mind, while writing a short-story that they must not use a single word in their writing, which is irrelevent from their main topic.' —Edger Allan Poe.

৩। 'A true short story is something other and something mere than a mere chiefly in short which is short. A fine short story differ from the novel its essential unity of impression. A short story has unity, as a novel cannot have it. The short story fulfils the three unities of of the French classical drama ; it shows one action in one place, on one day.—Brander Matthews. [The Philosophy of the short story]

৪। 'A short -story deals with a single character, a single event, a single emotion or the sereies of emotions, called forth by a single situation.' (Matthews-do)

৫। বুদ্ধদেব বসু : গল্পগুচ্ছ' : প্রবন্ধ সংকলন, পৃ ৬৫

৬। অনুনয় চট্টোপাধ্যায় : 'ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ' : পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্র সংখ্যা ২৫ বৈশাখ ১৩৮৭

৭। বুদ্ধদেব বসু : ঐ, পৃ ৬৬ : 'এই মুখে-বলা ভাবটা মোপাসাঁর গল্পের বৈশিষ্ট্য।'

৮। কল্পনার বেগ সামলাতে না পেরে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবকে অতিক্রম করেছেন—এ ধারণার বিপক্ষে অনেক যুক্তি আছে। আগ্রহী পাঠক রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, পৃ ৫৩৮ ; বুদ্ধদেবের প্রবন্ধ সংকলন, পৃ ৬০ ; সন্তোষকুমার ঘোষের আলোচনা ইত্যাদি পড়ে দেখতে পারেন।

৯। বুদ্ধদেব বসু : ঐ, পৃ ৬২-৬৩

Member—All India Small & Medium News Paper Association, Delhi.

GODHULI-MONE | N. P. Regd. No. RN. 27214/75 | JULY '86 (শ্রাবণ '৯৩)
Vol. 28, No. 7 | Postal Regd. No. Hys-14 | Price—Rs. 2·00 only

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পপুলার প্রিন্টার্স, বারাসত, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও

গোধূলি-মন

এই সংখ্যায় ঃ

প্রচ্ছদ : অসীম চক্রবর্ত্তী

ভাদ্র সংখ্যা ১৩৯৩

O প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন O

O অদ্ভুত প্রচ্ছদে ছাপা কভারের মাঝখানে সুন্দর ছাপায় ততোধিক মননশীল লেখায় পূর্ণ পত্রিকা হাতে পেয়ে এক নিমেষেই পড়েছি। আপনার নিষ্ঠার ফসল হাতে পেয়ে দারুণ খুশি হই সবাইকে ডেকে দেখাই-পড়াই। লিটল ম্যাগাজিন বিভাগ বৈচিত্রে যে কত সুস্বাদু হতে পারে তা আপনার পত্রিকা যারা না দেখেছে তাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হতে পারে।

কবিতা ছেপেছেন সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ জানিয়ে তা শেষ করতে চাই না। কবিতার উপর আপনি খুবই নির্মম। এটা অবশ্যই ভাল। এ জন্যে আপনাকে অভিনন্দন জানাই। সোফিওরের গল্প খুবই ভাল হয়েছে। যুথিকার লেখা "প্রসঙ্গ গোধূলিমন" ভাললাগলো—তবে কিছু অতিশয়উক্তি তোষামদের নামান্তর। অজিত রায় ভাল লেখেন ঠিকই—আমি ওর লেখার সঙ্গে এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগে পরিচিত। একজন লেখককে শ্রদ্ধা করা ভাল। উৎসাহ দেওয়া অনুপ্রাণিত করা উচিত। কিন্তু অতিশ্রদ্ধায় একজন তরুণ লেখককে এভাবে আত্মতুষ্টিতে ডুবিয়ে নিরুৎসাহ করার মত শত্রুতা আর নেই বলেই মনে হয়। আমি অজিত রায়কে ভালবাসি বলেই এ কথাগুলো বললাম। কাউকে আঘাত করার জন্য নয়।

মৃণালকান্তি মৃধা

হাটিপাড়া, উ: ২৪-পরগণা/৭৪৩৪৩৪

O O O O O O

O আষাঢ় সংখ্যা কয়েকদিন হল পেয়েছি। জানিনা কেন—নিজের মনের কোন বায়াস (Bias) থাকলেও থাকতে পারে—এক নিশ্বাসেই শেষ করেছি।

প্রসঙ্গ গোধূলিমনে দুজন স্বনামে পরিচিতা ও পরিচিতের চিঠি দেখে খুব ভালো লাগল—শ্রীমতী গৌরী আইয়ুব ও কবি সাহিত্যিক শ্রীশুদ্ধসত্ব বসু। সমালোচনা বিভাগটিও ক্রমশ:ই ভালোর দিকে যাচ্ছে। নাটকের নাট্যকারকে অভিনন্দন তাঁর তাত্ত্বিক নূতনত্বের জন্য।

'প্রথম যুবকের' গল্পকার বোধহয় এখনো সংখ্যের পুবার্ধ হতে পাবেন নি—নিজস্ব জগৎ ও পারিপার্শ্বকে ছাড়িয়ে। কয়েকটি মারাত্মক ভুলও চোখে পড়ল যথা "পক্স এক ধরণের ঘামাচি, প্রিকলি হিট।" তাই কী? এটির সম্বন্ধে Welester বলছেন (1) A disease characterised by skin eruptions as Small Pox (2) Syphilis. বলা বাহুল্য, আমাদের বাংলায় 'পক্স' বলতে স্মল পক্স বা চিকেন পক্স বোঝায় এবং দুটিই ভাইরাস দ্বারা ঘটে যথাক্রমে ভেরিওলা (Variola) ও ভেরিসেলা (Varicella) এই দুটি ভাইরাসের সংক্রমণে। তাছাড়া "শরীরে এ্যান্টিজেনের অভাব থাকলেই সংক্রমিত হয়" এটিও তথ্যের দিক দিয়ে সঠিক নয়। বেশির ভাগ এ্যান্টিজেন স্বভাবে বা জাতিতে প্রোটিন—এরা শরীরে প্রবেশ করে এ্যান্টিবডির সৃষ্টি করে; প্রতিরোধ বা ইমিউনিটির একটি প্রধান সর্ত্ত ও অস্ত্রই হচ্ছে শরীরে এ্যান্টিবডির যথাযথ উপস্থিতি। টিকা দিলে ঠিক এই এ্যানটিবডিরই সৃষ্টি হয়। সবশেষে "এ্যান্টিজেন বা খাদ্যগুণ ইত্যাদি বিষয়ে সজাগ থাকলেই যে কোন সংক্রামক ব্যাধি এড়ানো যায়" এর মধ্যে ত্রুটি আছে। এ্যান্টিজেন'কে খাদ্যগুলির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে দুটি সমার্থ নয়।

এবারে আমার একটি অন্যায় আবদার। শিশির কুমার মিত্রের ছবি পাঠাচ্ছি। ভালো কাগজে তাঁর ছবি ও রবীন্দ্রনাথের ছবি একসঙ্গে দিয়ে, রবীন্দ্রনাথের কবিতার উদ্ধৃতিসহ যথা—

"চেনো কিম্বা নাই আমায় চেনো,
তবু তোমার আমি।
সেই সেদিনের পায়ের ধ্বনি জেনো
আর যাবে না থামি'।

এছাড়া স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার কবিতা খুবই ভালো লেগেছে—গুনিলা ব্রেণ কোন দেশের মেয়ে? তিনি কোথায় ও কি করে বাংলা শিখলেন সে পরিচয় দেওয়া উচিৎ ছিল।

জ্যোতির্ময় বসু

ফ্ল্যাট-২, ব্লক-ডি, ৮২ বেলগাছিয়া রোড
কলকাতা-৭০০০৩৭
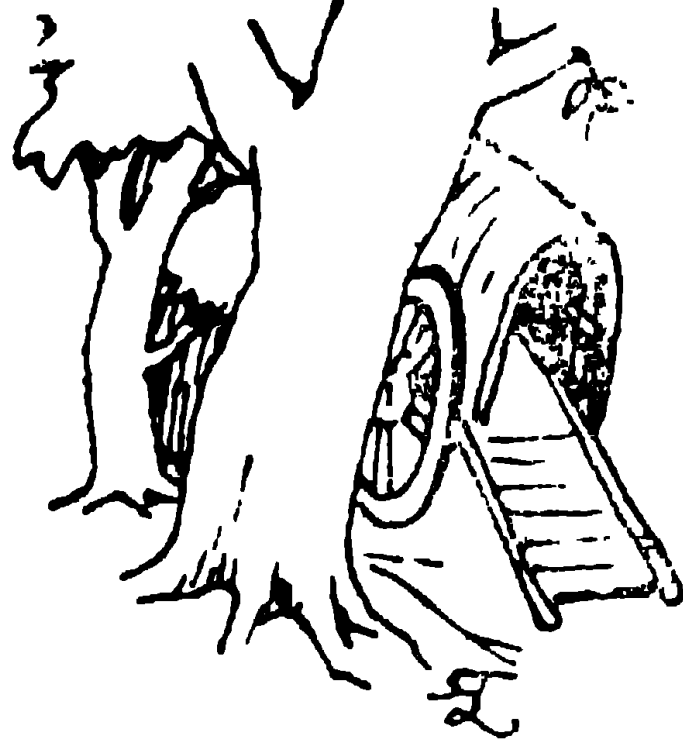
ধ্রুপদী
সাহিত্য
মাসিক
গোধূলি মন

২৮ বর্ষ/৮ম সংখ্যা
আগষ্ট/১৯৮৬
ভাদ্র/১৩৯৩

প্রতি সংখ্যা দুই টাকা
বার্ষিক সডাক কুড়ি টাকা

অশোক চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক

সম্পাদকীয়
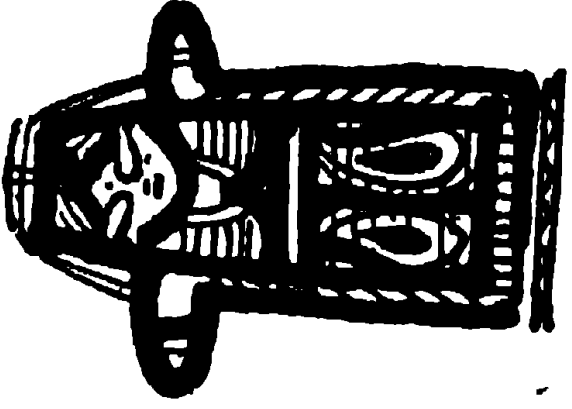
দেখতে দেখতে আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির বয়স আটত্রিশ বর্ষ উত্তীর্ণ হয়ে উনচল্লিশে পড়ল। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, প্রফুল্ল চাকী, প্রীতিলতার মতো হাজারো শহীদের আত্মদানে রঞ্জিত এ স্বাধীনতার প্রকৃত মর্য্যাদা রাখতে পারিনি আমরা। প্রত্যাশা ছিল দিনে দিনে হিমাচল থেকে কন্যাকুমারীকা পর্য্যন্ত গড়ে উঠবে সম্পর্কের এক নীবিড় বন্ধন। পরিবর্ত্তে বিদেশী শক্তির মদতে গড়ে উঠেছে অশুভ শক্তির নির্মম শক্তি প্রদর্শনের মহড়া। এ হাওয়া ছড়িয়ে পড়ছে আসাম, নাগাল্যাণ্ডের মতো পাহাড়ী অঞ্চল থেকে শুরু হয়ে আজ পাঞ্জাব পর্য্যন্ত।

রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের এই মহান দেশ; যে দেশ রবীন্দ্রনাথের গানে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল 'ভারত ভাগ্য বিধাতা' রূপে, আমরা কি শেষ হতে দেবো আমাদের সেই মাতৃপ্রতিম সোনার দেশকে? আসুন, এই উনচল্লিশতম ভারতমাতার জন্মদিনে নতুন করে শপথ নিই দেশ গড়ার। হাতে হাত মেলাবার। জয়হিন্দ।

কবিতা

তোমার কবিতা/যোগিনীকে/অরূপ চৌধুরী

ঘন, গভীর জঙ্গলের আড়ালে ক্রমশই হারিয়ে যায় তোমার স্বপ্ন ও পরিচয়
হারিয়ে যায় তোমার ভাষা আর গান
অদ্ভুত এক স্তব্ধতা ও পুরনো বাড়ীর জানলার ভিতর থেকে নিষ্পলক
তুমি শুধু চেয়ে চেয়ে দ্যাখো
তোমার চোখের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে গড়িয়ে যায় পাতাঝরা আরও একটি
শীতের দুপুর···দুদিনের পিকনিক সেরে শহরের দিকে ফিরে যায়
ভ্রমণার্থী তিনজন যুবক
তখন কিছুতেই নিজেকে আর গোপন করে রাখতে পারোনা তুমি
তখন খুব চাপা এক কষ্ট হয় তোমার···অসহ্য এক গ্লানি ও ব্যর্থতার ভেতরে
ভেঙে পড়ে তোমার সবটুকু স্বপ্ন ও অবরোধ···
তোমার অসুস্থ মাকে জড়িয়ে অসহায় তুমি কেঁদে ওঠো বেদনায়
আর তোমার কান্নার সেই ধ্বনি রিন্‌রিন্ করে ছড়িয়ে পড়তে থাকে
কুয়োতলায়···
পুকুরঘাটে···নিস্তব্ধ দুপুরের পোড়োবাড়ীর আনাচে কানাচে·· ॥

নস্টালজিয়া/কল্যাণ দে

ছেলেবেলার গালে কে করেছে চাষ
কালো কালো গাছ
অসহ্য কাঁপন নিয়ে
যোগ বিয়োগের ঝড়ে
বড় নড়বড়ে এই বাঁশের খুঁটিতে
এই দেহ আবাস
এখন মন্দিরে গেলে দেখি ছিঁড়ে যায়
লাটাই এর সুতে
প্রস্তরময় শব সরস্বতীর প্রিয় হাস

আমার কোন পাপ নেই
বিশ্বম্ভর নারায়ণ দেব

তোমার সঙ্গে মিশেছি
একান্ত বৃষ্টির মতো ;
সমস্ত বেদনা ঢেকেছি
চাঁদনী পেলবতায় ;
সাক্ষী আছে ফলিত সন্তান
আমার কোন পাপ নেই ।

অন্তরের চোখে হাসি ফুটেছিল
শ্যামসুন্দর চৌধুরী

ওর পায়ের চাপ যেদিন
আমার জীবনকে
একটি নতুন অর্থ দিয়েছিল
আমার
অন্তরের চোখে হাসি ফুটেছিল
চিনচিনে রোদে
নোনা ঘামের দুর্গন্ধে
বাসস্টপের ভিড়ে
অসংখ্য মুখুর
সেই ভয়ানক জংগলে
বা
সমস্ত ছোটাছুটি ভরা
অনুত্তরিত জীবনচক্রের
একটি ছোট অংশকে
শীতল শান্তিময় আর
সুগন্ধিত করে যেত
তখন আবার আমার
অন্তরের চোখে হাসি ফুটেছিল
কিন্তু সেদিন
রঙিন কাগজের গাউন পরে
সে ঝড়ের মত আসলো
আর নিয়ে গেল তাকে
যে যাবার সময় অনেকবার
পেছন ফিরে হেসেছিল
আয়নায় নিজের মুখ দেখে
সেদিন ও কিন্তু
আমার
অন্তরের চোখে হাসি ফুটেছিল ।

সুখ/তপন সৈয়দ

সাদা পোষাকের গায়ে ডুবে যায় ঠোঁট···অকৃপণ
অকাতরে সময়ের গাছ তাকে
ফুল, ফল বিলিয়ে দিতে থাকে
প্রাণভরে এমন সমুদ্রে সাঁতার······
গর্ভধারিণীর দিকে জ্বল জ্বল করে ওঠে তার চোখ
আরও পেতে চায় —বাড়ায় হাত
সমস্ত কিছু এড়িয়ে সে একা-ই ডুবে যেতে চায়
নিজস্ব ইচ্ছার গহ্বরে।

o o o o

স্ফুলিঙ্গ/সমীর মণ্ডল

নরক থেকে উদ্ধার করেছি স্ফুলিঙ্গ।
ধ্বংসোন্মুখ উন্মুক্ত পোতাশ্রয়ে
খুঁজেছি ভ্রমণসঙ্গিণী।
সুদীর্ঘ সাগরের স্খলনে
অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
দেখেছি নির্দোষ নারীর হৃদয়।
প্রতীপগামী ঈশ্বর এখনো
অনুসন্ধিৎসায় সমিদ্ধ জাগ্রত।
দাঁতে দাঁত ছুঁয়ে
পায়ের গোড়ালি আজ স্থির
কিছু শব্দ ডুবে যাচ্ছে কণ্ঠে,
রক্তের মধ্যে ময়ূরের নৃত্য গভীর।
নিজস্ব দর্পণে দেখি
সামাজিক তক্ষক মৃত্যুর কোলে
শূল বিদ্ধ।
মুক্ত আকাঙ্খা, ভ্রমণসঙ্গিনী
বন্দী, নির্জন ক্ষীয়মান অগ্নির গহ্বরে।

একটি শিকারের গল্প/অমিতকুমার মুখোপাধ্যায়

দল্মার ডাইনী সবুজের
সোপানে—
সোপানে—
অন্তরীণ
স্টোনওয়াশ আর করৌঞ্জের খোঁপা।
সরীসৃপ দুটি ছায়া গাঢ় হয়ে
নাবছে—
নাবছে—
সামনেই
শ্যাওলার সুতো বোনা হান্টিং স্পট।
ঝরে যায় প্রাচীন বল্কল
শিকার—
শিকার—
খেলা শুধু
ঝাঁক ঝাঁক হাসি মুখ তিলাই অবাক।
ওয়াচ টাওয়ার চেয়ে দেখে
শ্রান্তি—
শ্রান্তি—
ঘাম মেখে
শিকারী দুজনে, দুজনে শিকার হয়ে ফিরে যায়।

শৌখিন রবিয়ানা
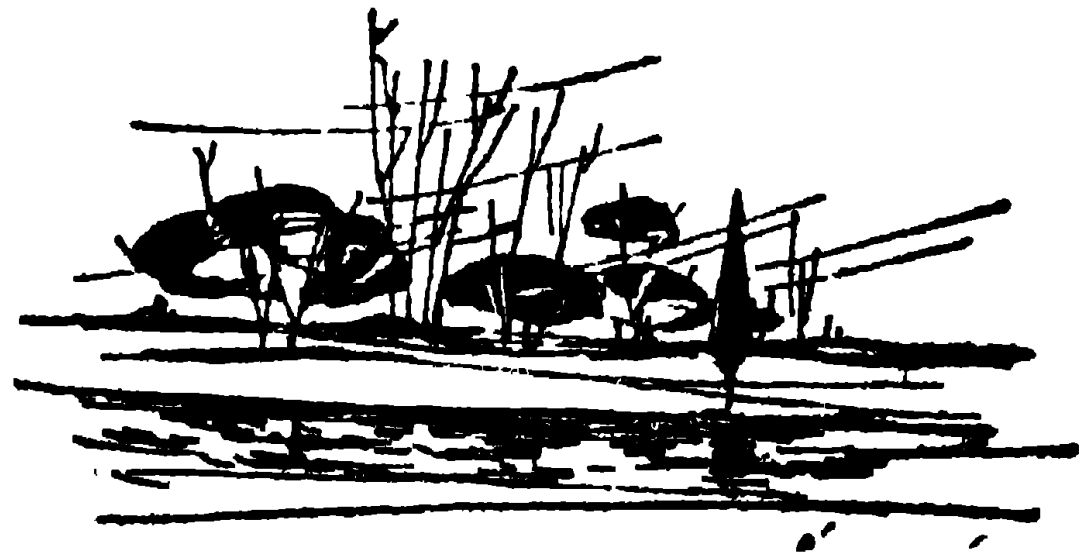
সৌম্যেন অধিকারী

২৫শে বৈশাখকে উপলক্ষ্য করে অন্ধের হস্তী প্রদর্শনের মতো এবারও আমরা রবীন্দ্র দর্শনের চারপাশে উঁকি মেরে এলাম। এবং ১২৫ তম রবীন্দ্র জয়ন্তীর স্মারক বৎসর হিসাবে গোটা বছর জুড়েই (অবশ্য ১২৫ তম জয়ন্তী স্মারকবর্ষের কারণটা আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয় বলে ক্ষমাপ্রার্থী) উঁকি মারতে থাকবো। আর অন্ধ বলেই সরকারী বে-সরকারী সকল স্তরে অনুষ্ঠান আড়ম্বরের আতিসয্যে নিজেদের দৈন্যকে গোপন করতে চাইলাম। দৈন্য বলাতে হয়তো কোনো কোনো মহল উত্তেজিত হয়েও উঠতে পারেন। কারণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজনই যদি মহৎ-স্মরণ ও শ্রদ্ধার পরিমাপক হয় তাহলে আমাদের শ্রদ্ধা তো অপরিমেয়।

কিন্তু অপরিমিত বলেই ওই শ্রদ্ধা আশংকজনক এবং সেই হেতু আপত্তিরও কারণ। কেননা অভিব্যক্তি মাত্রা ছাড়ালে, সন্দেহ জাগে, শ্রদ্ধায় নিশ্চয়ই খাদ মিশেছে। লক্ষ্যটা আর নজরে নেই, উপলক্ষটাই বড়ো;—দুশ্চিন্তার কথা ২৫শে বৈশাখ আমাদের কাছে তেমনি এক উপলক্ষ হতে চলেছে। শ্রদ্ধা যখন এমনি নিষ্ঠা হারায়, তখন আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর আসে দুটি বিপরীত প্রবণতা এবং মনোভাব থেকে : একটি হুজুগ, দ্বিতীয়টি ধান্দাবাজী ও ব্যবসাদারী। হুজুগে যাঁরা মাতোয়ারা হন তাঁরা অংকে কাঁচা। লাভ-লোকসানের পরোয়া বড়ো একটা তাঁরা করেন না। কিন্তু দ্বিতীয় দল সব কিছুকেই নিক্তির পাল্লায় ওজন করে নিতে জানেন। অনুষ্ঠান তাঁদের কাছে 'ইনভেষ্টমেণ্ট'। দুঃখের হলেও, একথা রূঢ় সত্য যে, ২৫ বৈশাখ আজ এই উভয় বীজাণুতেই আক্রান্ত।

কথাটা স্পষ্ট করে খুলেই বলি। রবীন্দ্র জীবন সাধনার মূল বানীটি যে এখনও আমাদের অনায়ত্ব, এ সত্য আমাদের চাইতে বেশী বোধ হয় আর কেউ জানে না এবং এর চাইতে বড়ো লজ্জা যে আর কিছু হতে পারে না সে সম্পর্কেও আমরা খুবই সচেতন। কিন্তু, সে লজ্জাকে আমরা ঢাকবো কি দিয়ে?

প্রথম দল তাই হুজুগে মাতে। এতে নিজের মনকে অবশ্য চোখ ঠারা যায় না, তবে কেলেঙ্কারীর হাত থেকে 'আত্মরক্ষা' করা চলে। তাছাড়া নির্ভেজাল বিশুদ্ধ হুজুগের ভেলকি আর আনন্দ-টুকুতো উপরি পাওনা।

তবু এদের বিরুদ্ধে অভিযোগের অবকাশ কম। কারণ এরা করুনার পাত্র, অজ্ঞান পাপী এবং নিজেদের দৈন্য সম্পর্কে এদের সংকোচের অন্ত নেই, আড়ম্বরের আতিশয্যে এরা সেই সংকোচকে কাটিয়ে উঠতে চায় মাত্র কেননা, এরা আনন্দের ভিখারী, সুধাপাত্র সামনে থেকেও যাদের নাগালের বাইরে। এরা নিজের ভাবনাস্তর ও ক্ষমতার মধ্যে আনন্দ সৃষ্টির চেষ্টা করে।

কিন্তু, মার্জনা নেই তাদের, যাদের খোলসটা রবীন্দ্রভক্তের, ভাবখানা পণ্ডিতমন্যের, অথচ রবীন্দ্র প্রীতি যাদের কাছে একান্তভাবেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী-কেন্দ্রীক ধান্দাবাজী ও ব্যবসাদারীর উপকরণ। এরা জ্ঞানপাপী, ক্ষমা-অযোগ্য।

কিন্তু, এই দুই দলের মধ্যিখানে আছেন ভিন্ন-তর। একটি গোষ্ঠি। এঁরা রবীন্দ্রস্তাবক। রবীন্দ্র-ভঙ্গীর অনুকৃতি, শান্তিনিকেতনী বিশেষ ঢং-এ (তেমন কিছু আছে কি ?) চলন বলন, সর্বদা 'অসীম' 'অনন্ত' নিয়ে ভাবনা এঁদের প্রায় স্বভাবে এসে দাঁড়িয়েছে, অন্তত: স্বভাব করে তুলতে তাঁরা চাইছেন। রবীন্দ্র কাব্য এঁদের কাছে ধর্মগ্রন্থের সামিল, ভক্তির সিন্দুর লেপনে কুলুঙ্গীতে তুলে রাখবার জিনিষ। ধর্মগ্রন্থ অতীতে মানুষকে কোনো মোক্ষলাভের সন্ধান দিয়েছে কিনা জানিনে, কিন্তু রবীন্দ্রকাব্য মাথায় ঠেকালেই যে আমাদের মোক্ষলাভ ঘটবে, সে বিষয়ে ওঁদের কোনো সংশয় নেই। এই সংশয়হীন আত্মসমর্পনকে ওঁরা বলেন শ্রদ্ধা নিবেদন এবং এমনি শ্রদ্ধা নিবেদনেই যে তাঁদের অন্তর (শুধু তাঁদের কেন, সমগ্র জাতীর) একদিন উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এই বিশ্বাসও তাঁরা পোষন করেন।

শ্রদ্ধানিবেদনের এই বৈষ্ণবী মার্গ সম্পর্কে এই গুরুবাদের দেশে অবশ্য সাধারণভাবে আপত্তি তোলা উচিত নয়। কারণ, সাধনার এই ধারাটি একান্তভাবেই ব্যক্তিকেন্দ্রীক। কিন্তু তবু এঁদের সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন থাকার প্রয়োজন আছে। কারণ, নির্বিশেষ আত্মসমর্পণের ক্লীবত্ব অন্তত: রবীন্দ্রনাথের কোনোদিনই কাম্য ছিলো না।

এই স্তাবকদের দলে কিছুকাল যাবৎ কিছু সাহিত্যরথীকেও দেখা যাচ্ছে। যাঁরা এককালে ঘোরতর কালাপাহাড় (এঁদের মধ্যে একাংশ দ্বিতীয় দলে হুকো তামাক পাচ্ছেন) ছিলেন। ইদানীং রবীন্দ্রনাথের নামোচ্চারণেই তাঁরা অতিমাত্রায় গদগদ হয়ে পড়েন। এঁদের অতিভক্তি অবশ্য অনুশোচনা প্রসূত। এককালে অশোভন লাগামহীন রবীন্দ্র বিদূষণে যে এরা অগ্রগামী ছিলেন তারই প্রতিক্রিয়া। কিন্তু সৃজনধর্মী মনের পক্ষে এমনি প্রশ্নহীন আত্মসমর্পন যা নিতান্ত মারাত্মক সে সম্পর্কে সজাগ হওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্র প্রভাব আমাদের জাতীয় জীবনে পরিব্যাপ্ত হোক, এ শতবার কাম্য হলেও, আমরা যেন রবীন্দ্র-নাথকে অতিক্রম করার সুকঠোর সাধনা থেকে বিচ্যুত না হই। যে রবীন্দ্রনাথ চিরদিন স্থবিরত্বের বিরোধী ছিলেন, তাঁকে উপলক্ষ্য করেই নূতনতর স্থবিরত্ব আমাদের সৃজনক্ষমতাকে অসাড় করে দেয়, তাহলে এর চাইতে দুঃখের আর কি হতে পারে ?

কিন্তু ধান্দাবাজ যারা, ব্যবসাদার যারা, তাদের শৌখিন রবিয়ানা তো কোনদিনই কাটবে না। কারণ, অনেক আঁক কষে ইনভেষ্টমেণ্টের নূতন পদ্ধতিটি ওর আবিষ্কার করেছেন, যতক্ষণ 'ডিভিডেণ্ট' না মিলবে, ততক্ষণ তা থেকে ওদের সরাবার জো নেই। এক হিসাবে ওঁরা ধন্য। বাঙালীর অব্যবসায়ী অপবাদ তাঁরা ঘুচিয়েছেন। মূলধন যে হাতের এত কাছেই ছিলো, সেটা ওঁরা না

দেখালে আমরা অধমেরা জানতেই পারতাম না।

অথচ, এ-বড় আশ্চর্য কথা, সংস্কৃতিগর্বী বঙ্গ দেশেও রবীন্দ্র জন্মতিথি, রবীন্দ্র মেলা, সম্মেলন, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্যের বৃহৎ আয়োজনগুলির ভার মূলত: এঁদের কুক্ষিগত। এমন কৌশলে আটঘাট বেঁধে একচেটে প্রচার যন্ত্রগুলিকে সক্রিয় করে এঁরা রবীন্দ্র প্রচারের ব্যবস্থা করেন যে আশ্চর্য হতে হয়। এঁরা এই সব অনুষ্ঠানের প্রায়শ সভাপতি, বিশেষ অতিথি প্রভৃতি পদে মাননীয় সব মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সংবাদ ও সংবাদপত্র ব্যবসায়ী। বড়ো বড়ো সরকারী আমলা, সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীন বাঘা বাঘা এ্যাকাডেমিক পণ্ডিত (এই শ্রেণীর মধ্যে কিছু ব্যক্তি পূর্বে রবীন্দ্রবিদ্বেষণের অগ্রচারী ভূমিকায় ছিলেন) প্রভৃতিদের বরণ করেন। ওতে শ্রদ্ধা নিবেদন হোক বা না হোক, বৃহত্তর মানুষের মধ্যে প্রকৃত রবীন্দ্র পরিচয় ঘটুক বা না ঘটুক অন্তত: উদ্যোক্তাদের আখেরে সুবিধা হবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়। সরকারী উদ্যোগে এবং অর্থে বিগত রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসবে আমরা অবাক বিস্ময়ে কি দেখেছি? আমরা দেখেছি, সরকারী আমলাবাহিনী, একদা রবীন্দ্র স্নেহধন্য ও ধন্যা কিছু লেখক বুদ্ধিজীবি, কিছু ধান্দাবাজ এ্যাকাডেমিক হৃৎপিণ্ডহীন পণ্ডিত ব্যক্তি, ভাগ্যান্বেষী সাংবাদিক, রাজনীতিক, রেডিও এবং এদের সঙ্গে এই ব্যবসাদারেরা স্বদেশে ও বিদেশে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ফুটবল খেলেছেন। সবাইকে এঁরা বুঝিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথ গান এবং নৃত্যনাট্যের একজন স্পেশালিষ্ট, তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, তিনি বিশ্বভারতী তৈরী করে গাছতলায় ইস্কুল করেছিলেন, এবং তিনি বিশ্বকবিও ছিলেন, শুধু তাই নয় গান্ধীজি ও জওহরলাল রবীন্দ্রনাথকে খুব ভক্তিছেদ্দা করতেন এবং তাঁরা কবিকে প্রশংসা করতেন। রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীতে আমরা দেখেছি রবীন্দ্র সঙ্গীতের জলসা, নাটক ও নৃত্যনাট্যকে ঘিরে সরকারী অর্থে দেশের অভিজাত উচ্চকোটি স্বচ্ছল সমাজের ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাদের আনন্দোৎসব। এবং তাকে ঘিরে বেনিয়াতন্ত্রের রমরমা রবীন্দ্র ব্যবসা। বৃহত্তর সৃজনশীল মানুষ কিন্তু শতবার্ষিকী উৎসবের ধারে কাছেও যেতে পারেনি, তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের মতো একটি মহৎ যুগব্যক্তিত্ব অপরিচিতই থেকে গেছে বেনিয়াতন্ত্রের কলুষিত কর্মকাণ্ডে।

এঁদের কৃপায়, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নাটক ও নৃত্য-নাট্যের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন স্কুল গজিয়ে উঠেছে এবং সেই সঙ্গে সুরু হয়েছে তাদের মধ্যে পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং কখনো শ্রেষ্ঠত্বের, কখনো তত্ত্বের কচকচানি। ফলস্বরূপ রবীন্দ্রসৃষ্টির বিনাদৃশ্য রূপায়নেও বেনিয়া-তন্ত্রের,—অর্থাৎ ব্যবসাদারীর কালোহাত প্রতিমুহূর্তে রবীন্দ্রনাথকে নিহত করছে। রেডিও'র ভূমিকা এতই পীড়াদায়ক যে, সমালোচনারও যোগ্য নয়।

রবীন্দ্রনাথকে যদি কারো খপ্পর থেকে উদ্ধার কাজে উদ্যোগী হতে হয় (দুর্ভাগ্য, এদেশে রবীন্দ্র-নাথকেও উদ্ধার করতে হয়।) তবে তা' এই ব্যবসা-দারদের কবল থেকে। নতুবা ওদের কল্যাণে বাস্তব ও মনোজীবনে বৃহত্তর মানুষের সঙ্গে তাঁর বিন্দুমাত্র সংযোগ থাকবে না।

রবীন্দ্রসাধনার বহিরঙ্গ দিকগুলি যেহেতু বেনিয়া ও ব্যবসাদারী আক্রমনের লক্ষ্য, সেইহেতু, এই মুহূর্তে উদ্যোগী না হলে অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র জাতির পক্ষে সেটা ক্ষতি ও ক্ষোভের কারণ হবে। অথচ, দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে কোনো আগ্রহ বা উদ্যোগ আজও লক্ষ্যগোচর নয়। এদেশের সৃজনশীল তারুণ্য,—যারা রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী, তারা কিন্তু আজও 'একটা নিঃশ্বাস ফেলবার জায়গায়' এসে দাঁড়াতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী বিরাট শূন্যতা এই সব বলিষ্ঠ তরুণদের চিন্তিত করে না, কঠিন মানসিক শ্রমের মধ্য

দিয়ে ফসল তোলায় উৎসাহিত করেনা। এই প্রজন্মের এইটেই বোধহয় ট্রাজেডি। প্রধানদের মধ্যে আজও যাঁদের এ বিষয়ে পথিকৃত হবার যোগ্যতা আছে,—তাঁরা বোধহয় রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বা খেতাবের মোহে অথবা সংগ্রামী মনের মৃত্যুতে অহেতুক গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসমান।

লুব্ধ ব্যবসাদারীর কবলেই যদি রবীন্দ্রজীবন-সাধনার অমর্যাদা ঘটে, তাহলে রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী হিসাবে সংস্কৃতিগর্বী বঙ্গসন্তানেরা পরিচয় দেবো কোন্ মুখে?

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

O আশাকরি সর্বাঙ্গীন কুশলে আছেন। সম্প্রতি শ্রী জ্যোতির্ময় বসুর একটি চিঠিতে জানতে পারলাম যে 'গোধূলি মন' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় তাঁর রচিত 'অমিয় চক্রবর্তী'- শীর্ষক কবিতাটি তিনি আমাকে উৎসর্গ করেছেন। ব্যাপারটি আসলে আমার প্রতি প্রীতিরই নিদর্শন; কেননা, বছর দুই আগে, আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয়পর্বে যখন তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচিত হতে, তখন আমিই এই দুই কবির মধ্যে যোগাযোগের সেতুবন্ধন রচনা করেছিলাম। আলোচ্য কবিতাটি সেই ঘটনারই স্মারক। স্বাভাবিকভাবেই 'গোধূলিমনে'র এই সংখ্যাটি পেতে আমার বড়ো ইচ্ছা হচ্ছে। অতএব, বুঝতেই পারছেন, উক্ত সংখ্যার একটি কপি যদি আমাকে সত্বর ডাকে পাঠিয়ে দেন' খুশী হবো।

'পঞ্চমা' (১৬)-য় আপনার ব্যক্তিগত চিঠিটি এবং 'কবি ও কর্মীর জবানবন্দী' অংশে আপনার বক্তব্য পড়লাম। চিঠিটির কথা কিছু লিখছি না; কিন্তু 'কবি ও কর্মীর জবানবন্দী' অংশের ৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আপনার 'যদিও সত্য রবীন্দ্রোত্তর যুগেও সমর সেন, বিষ্ণু দেরা কবিতাকে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে যবার আয়োজন করে রেখেছিলেন।' বক্তব্যের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু এই পংক্তির আগের পংক্তিতে আপনার মন্তব্য 'ষাটের দশক থেকেই কবিতায় আরোপিত জটিলতা এনে ফেলেছিলেন অনেকেই।' আমি বিনা বিতর্কে কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। পঞ্চাশের দশকের অন্তিম পর্বে আমার লেখক জীবনের সূত্রপাত হ'লেও আমার লেখালেখির ব্যাপ্তি প্রকৃতপক্ষে ষাটের দশকের প্রারম্ভ থেকেই। ফলে এই দশকের প্রায় সমুদয় কবিই যে আমার মাত্র পরিচিত কিংবা বন্ধুপ্রতিম, শুধু তা-ই নয়; দশক হিসেবে ষাটের বৈশিষ্ট্য এবং এই দশকের অন্তর্গত প্রত্যেক কবির ব্যক্তিগত ও কাব্যিক ঝোঁক ও প্রবণতা সম্পর্কেও আমি সম্পূর্ণ সচেতন। এবং প্রধানত এই কারণেই এই দশকের কবিদের কাব্যপ্রয়াস সম্পর্কে আমি অত্যন্ত sensetive. খুশী হবো যদি আমাদের সাহিত্যের বর্তমান শতকের ষাটের দশকের কবিদের বিষয়ে ষাটের দশকের (এবং আপনি নিজে তো অবশ্যই) কবিদের দিয়েই 'গোধূলিমন' পত্রিকায় আলোচনার সূত্রপাত করেন। ব্যাপারটিকে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে করি ব'লেই আপনাকে আপনজ্ঞানে এ-প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানালাম।

হঠাৎই মনে পড়লো, 'উত্তর প্রবাসী' পত্রিকার পুরস্কার বিতরণ সভায় দেখা হওয়ায় আপনার পত্রিকায় কখনো না লেখার দরুণ অনুযোগ জানিয়ে আমার কাছে কবিতার জন্য আপনি দাবি জানিয়েছিলেন। নানা কারণে আপনার দাবি এতদিন পুরণ করতে পারিনি, কিন্তু আপনার দাবির কথা কখনো বিস্মৃত হই নি। এবং সত্যিই যে আমি 'গোধূলিমন' পত্রিকাকে মনে রেখেছি, তারই নিদর্শনস্বরূপ এই সঙ্গে পাঠালাম আমার সাম্প্রতিক রচনার সামান্য নিদর্শন। 'গোধূলিমন' দীর্ঘজীবী হোক।

পরিমল চক্রবর্তী
'নিরালা' ৪৩৪ পূর্ব সিঁথি রোড, কলিকাতা-৭০০০৩০

উপসলা দৈনিক U. N. T. পত্রিকা থেকে

ট্যাগোরের নোবেল বক্তৃতা

স্টকহলম ২৬শে মে (TT). রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর আজ বিকেলে চিকিৎসক সমিতির (Lakare-sail Skapets) বৃহৎ সভাকক্ষে তাঁর নোবেল ভাষণ দান করেন। বিজ্ঞান এবং সাহিত্য জগতের প্রতি-নিধিদের দ্বারা সভাকক্ষের প্রতিটি আসনই পরিপূর্ণ ছিল।

ট্যাগোর তাঁর বক্তৃতার শুরুতেই বলেন যে তিনি এখানে এসে আজ খুবই আনন্দিত। তাঁকে আর তার দেশকে যে সম্মানের মানপত্রে সম্মানিত করা হয়েছে তার জন্য ধন্যবাদ প্রকাশের সুযোগ পেয়ে তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

যখন তিনি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির খবর পেলেন, তখন তিনি এতটুকু গর্বিত উচ্ছ্বাস বোধ করেন নি। সেই মুহূর্তে তিনি নিজেকে তার বিপরীত অর্থে অতিক্ষুদ্র জ্ঞান করেন।

তারপর কবি বর্ণনা করেন কেমন করে তিনি তার শিক্ষা নিকেতন গড়ে তুলেছেন যেখানে সাধিত হয়েছে পাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়। তাঁর একাত্মবোধ চিন্তা ও তার সম্প্রসারণের কথাও তিনি বলেন। অতীতে ভারতবর্ষ বিশ্বের একীভূত করণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ছিল। তাই ট্যাগোর যে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছেন, তার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত। তিনি এই ভাবে বলেন—"আমি আপনাদের আমন্ত্রণ করছি, আপনারা আসুন, আপনাদের হাত এসে আমাদের শিক্ষা নিকেতনকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনতীর্থ করে তুলুন। আসুন এবং আমাদের সজীব করে তুলুন। এ জন্যই আজ আমি এসেছি আপনাদের মাঝে।

বক্তৃতার পর রোজেনবাডে, সুইডিস আকাদেমী কবিকে সান্ধ্যভোজনে আপ্যায়ন করেন। উপস্থিতদের মধ্যে ট্যাগোর ছাড়া ছিলেন তাঁর পুত্র এবং তাঁর সেক্রেটারী, তাছাড়া নয়জন আকাদেমি সদস্য।

বক্তৃতার পরে ভোজসভায় আকাদেমির সেক্রেটারী ভাষণ দেন, ট্যাগোর এবং আর্চ বিশপ তার উত্তরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

(পত্রিকার প্রতিবেদনের মর্মানুবাদ। সংবাদ উপসলা UNT-র অর্কিব থেকে প্রদীপ দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত)

অনুবাদক: গজেন্দ্রকুমার ঘোষ

১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন সুইডেন ভ্রমণে আসেন তখন এই খবরগুলো উপসলার দৈনিক কাগজে ছাপা হয়। মর্মানুবাদ দেওয়া হল।

U. N. T. দৈনিক পত্রিকা উপসলা থেকে

ভারতে সুইডিসের মহত্ত্ব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে একটি আলোচনা থেকে নোবেল ভাষণে সুইডিসদের তাঁর শিক্ষা নিকেতন দর্শনের আমন্ত্রণ।

ট্যাগোর তাঁর অডিটরিয়ামের ভাষণে হামারগ্রেন নামক জনৈক সুইডিসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ইনি ভারতের প্রতি অদম্য আগ্রহ ও ভাল-বাসার টানে সেখানে গিয়ে চরম দারিদ্র্য স্বচ্ছন্দে বরণ করে নেন, কিন্তু ভালবাসা দিয়ে ভারতের দরিদ্রের প্রতি সেবা দ্বারা সকলের হৃদয় জয় করেন।

সেই উল্লেখিত সুইডিস হয়তো পুরনো দিনের ৭০/৮০ সালের উপসলার ছাত্রদের মধ্যে সুপরিচিত। তিনি ছিলেন কার্ল এরিক হামারগ্রেন, জন্ম অঙ্গার মানল্যাণ্ড-এ, ১৯৫৮ সালে। তিনি ১৮৭৭ সালে ছাত্রত্ব লাভ করেন। ভারতের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতি তাঁর অদৃশ্য আগ্রহ ছিল সুবিদিত। তাঁর লণ্ডন যাত্রার পেছনে আসল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে আসা।

ইতিমধ্যে পাঁচ বছর সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তাঁর আকাঙ্খিত উদ্দেশ্য এবং স্বপ্ন সার্থক করতে। ১৮৯৩ সালে তিনি ভারতের কলকাতায় অবতরণ করেন। সেখানে তিনি ফরাসী এবং ইংরেজি ভাষার শিক্ষক হিসেবে জীবিকা অর্জন করেন। জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা ছাড়া সবকিছু তিনি দরিদ্রদের দান করেন। তিনি হয়ে উঠেছিলেন তাদের বন্ধু ও সান্ত্বনাদাতা।

হামারগ্রেনের এক নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে ট্যাগোরের আলাপ হয়। যা থেকে নিম্ন রূপ বর্ণনা আমরা পেতে পারি।

ট্যাগোর অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সেই সাক্ষাৎ প্রার্থীকে তাঁর স্টকহলম প্রাণ্ড হোটেলের বসতগৃহে অভ্যর্থনা করেন। তিনি গভীর আগ্রহ নিয়ে সেই বিখ্যাত সুইডিসের কথা বলতে শুরু করেন। গরীবের জন্য হোমারগ্রেনের মহৎ আত্মত্যাগ তাঁর (ট্যাগোরের) দেশবাসীর কাছে দৃষ্টান্তের কারণ হয়ে উঠেছে। ইনি কখনো বিশ্রামকে স্বাগত জানাননি। বিশ্রামহীনভাবে তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধবদের আশ্রয়ের জন্য কাজ করে যেতেন। এই কঠোর কর্ম উদ্যোগের দরুণ তাঁকে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনদান করতে হয়। কিন্তু তিনি তাঁর স্বল্পকালীন কর্মজীবনে ভারতে সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন আর রেখে এসেছেন এক মর্যাদাপূর্ণ মহান স্মৃতি। ট্যাগোর কলকাতায় হামারগ্রেনের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্র, একজন শিল্পী, হামারগ্রেনের ছাত্র ছিলেন।

এই ভারতীয় কবি আরো বলেন, তাঁর স্টকহলমের মেয়র লিণ্ডগ্রেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল; যিনি উপসলা যুগে হামারগ্রেনকে খুব ভাল চিনতেন। তাঁরা একসঙ্গে ভারতীয় দর্শন পড়েছেন। এ একটি কৌতূহলজনক তত্ত্বসন্ধান। মেয়র লিণ্ডগ্রেন তাঁর পরবর্তী জীবনে নয়, ছাত্রজীবন থেকেই প্রাচ্য দর্শন সম্বন্ধে কৌতূহলী ছিলেন। ট্যাগোর জনসাধারণের মধ্যে খুবই সহানুভূতিপূর্ণ ভাবরূপ সৃষ্টি করেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করছিলেন। তাঁর সচিব তাঁকে সতর্ক পাহারায় রেখেছিলেন, যাতে প্রতীক্ষা-উপস্থিত সাক্ষাৎপ্রার্থীরা কবির সঙ্গে অতিরিক্ত সময় ব্যয় না করেন। ট্যাগোর বিদায় নেবার আগে তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত প্রতিকৃতি দান করেন। এবং প্রতিশ্রুতি দেন এই অডিটরিয়ামে হামারগ্রেনের উপর সুললিত বক্তৃতার একটি অনুলিপি পাঠিয়ে দেবেন। ●

মর্মানুবাদ : গজেন্দ্রকুমার ঘোষ

প্রসঙ্গ : গোধূলি-মন

O গোধূলি মন আষাঢ় '৯৩ সংখ্যা পেয়েছি। সুচিন্তিত পরিচ্ছন্ন পত্রিকা। ইচ্ছা করে অনেক লিখতে। দীর্ঘদিন ধরে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করাকে একটি বিশেষ মহৎ কাজ বলে মনে করি। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন, তাদের মধ্যে গোধূলি-মনের নাম কেউ শোনেননি বলে আমার মনে হয়না। আমাদের সমকালীন পত্রিকার দশম বর্ষে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। কবি সমসুর রহমান ও অরুণ মিত্রের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার থাকছে। ঐ সংখ্যার জন্য আপনার একটি কবিতা আশা করছি। প্রণামসহ।

সুব্রত মণ্ডল
৪, অভয়পদ বন্দ্যোপাধ্যায় লেন,
হাওড়া-৭১১১০১

আলোচনা ঃ পত্র-পত্রিকা

[এই সংখ্যায় কেবলমাত্র কবি-পক্ষে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা নিয়ে আলোচনা করা হল।

কবি পক্ষে প্রকাশিত হয়েছে "বেণুকা", সম্পাদক : মনোরঞ্জন খাঁড়া। মূলত কবিতারই কাগজ। এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে কয়েকটি কবিতা এবং একাধিক কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ। 'রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা : মুক্তিতত্ব, লিখেছেন পরিমল ঘোষ। একমাত্র এই লেখাটি বাদে কোনো গদ্য রচনাই উৎকর্ষ লাভ করতে পারেনি।

লিটল ম্যাগাজিনের জন্যে কম জায়গাই বরাদ্দ থাকে। সেখানে বাজে কথা একটু কম লিখলে ভাল হত নাকি—সম্পাদক ভেবে দেখবেন।

উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন কেদার ভাদুড়ী ও মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

O একগুচ্ছ কবিতা ও একটিমাত্র নিবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে প্রণব মাইতি সম্পাদিত "সাহিত্য সম্প্রতি"র কবি প্রণাম সংখ্যা। নিবন্ধটি ভালো। লেখক পুলিন দাস। তবে কিছু কবিতা কমিয়ে নিবন্ধ লেখককে আর একটু জায়গা দিলে ভাল করতেন।

O অমিতা দাস সম্পাদিত এই সংখ্যার "ডুগডুগি"কে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হচ্ছে এই কারণে যে, শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা কোনো ছোটদের কাগজ বড় একটা চোখে পড়েনা। সবকটি লেখা ছোটদের উপযোগী হয়েছে। সেখানে কোনো ভারী কথা নেই, নেই তত্ত্বের কচকচানি। উল্লেখ করতে হয় সুধীরকুমার রায়ের 'পরিহাস প্রিয় রবীন্দ্রনাথ' ও শৈলেনকুমার দত্তের 'সেই স্কুল পালানো ছেলেটি' নিবন্ধ দুটি। সুন্দর ছড়া লিখেছেন সুখেন্দু মজুমদার, সঞ্জীবকুমার দে এবং অশোককুমার দে।

O সাঁইথিয়া, বীরভূম থেকে প্রকাশিত হয়েছে বিজয়কুমার দাস সম্পাদিত 'রাণার'। রবীন্দ্র বিষয়ক একাধিক লেখার মধ্যে চিরপ্রশান্ত বাগদীর 'রবীন্দ্র পাঠক এবং কিছু রবীন্দ্র ভাবনা' নিবন্ধটি ভাল লাগল, রবীন্দ্র-স্মরণে কবিতা লিখেছেন রবীন সুর, দিলীপ মিত্র, অমিয়ধন মুখোপাধ্যায় এবং সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

O অলক ভড় সম্পাদিত 'চক্রব্যুহে' ড: চণ্ডীচরণ ঘোষের প্রবন্ধের নাম "গ্রামীণ চিত্রকল্প ও গীতাঞ্জলি। পাঠককে নতুন কিছু দেওয়ার ইচ্ছে ছিল প্রবন্ধকারের। কিন্তু লেখাটি কিছু হয়ে উঠল না।

সুন্দর কবিতা লিখেছেন সোফিওর রহমান, বিশ্বনাথ গরাই, সত্যেন্দ্র আচার্য এবং ঈশিতা ভাদুড়ী।

O অশোক মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শাব্দিক' পত্রিকায় প্রকাশিত ছটি কবিতার মধ্যে চারটি পুর্ণমুদ্রিত। এবং একটি মাত্র গদ্য রচনা 'রবীন্দ্র-টুকিটাকি'তে যা লিখেছেন, বহু পঠিত। পত্রিকাটির সার্থকতা কোথায় ?

O প্রবীণ ও নবীণ কবির কবিতা নিয়ে প্রকাশিত শেখ মহরম আলি সম্পাদিত কবির ডায়েরীতে উল্লেখ করার মত কবিতা লিখেছেন কবিরুল ইসলাম, অমিত্র সুদন ভট্টাচার্য তরুণ সান্যাল, পিনাকী বসু, সত্তীন্দ্র ভৌমিক, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত এবং আরো অনেকে।

O জগৎ রঞ্জন মজুমদার সম্পাদিত 'সাহিত্য ভারতী'তে প্রকাশিত অনেকগুলি নিবন্ধই উল্লেখ করার মত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখাটির নাম 'সুরের আড়ালে',

দীর্ঘদিন পর প্রবীণ কথাসাহিত্যিকেরা ভাল লেখা একটি ছোট কাগজে পড়ে ভাল লাগল। অন্যান্যদের মধ্যে সুধীরকুমার দাস, সুপর্ণা বসু, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সম্পাদক স্বয়ং।

O শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত, রঞ্জিত শর্মা সম্পাদিত 'প্রতিদিন' এর কবি সংখ্যায় কবিতা আছে ১৭টি, সাক্ষাৎকার ১টি, গল্প ১টি। এবং রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক প্রবন্ধ একটিও না।

O সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কমব্যাট' পত্রিকাটি চমক সর্বস্ব। অনেকগুলি কবিতা ছাপা হয়েছে। ভাল কবিতা লিখেছেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক ও মৃদুল দাশগুপ্ত।

O দুর্গাপুর থেকে প্রকাশিত নিভা দে সম্পাদিত 'জলপ্রপাত'এ শুদ্ধসত্ত্ব বসুর প্রবন্ধের নাম 'চতুরঙ্গ প্রসঙ্গে দু-এক কথা'। প্রবীণ লেখকের এই লেখাটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর বলতে পারছি না। কিছুটা যেন রচনা ধর্মী বলে মনে হয়।

নিভা দে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ : কিছু অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। রবীন্দ্রনাথের কিছু গল্প উপন্যাসকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছেন লেখিকা—কোথাও পৌঁছতে পারেন নি। এমন লেখা খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় মানায়, লিটল ম্যাগাজিনে নয়।

একই কথা বলা যায় 'একটি সাক্ষাৎকার : রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে' লেখাটি প্রসঙ্গে। লিখেছেন, মহালক্ষ্মী রূপল। ব্যতিক্রম, শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোহিনী : এক ঋজু ব্যতিক্রম। স্বল্প পরিসরে চমৎকার লিখেছেন। 'খুচরো কথা' কী জন্যে ছাপা হল? শুধুমাত্র পৃষ্ঠা পুরণের জন্যে? লিটল ম্যাগাজিনে লেখেন এমন ভালো লেখকের সংখ্যা আজও পশ্চিমবঙ্গে কম নয়, সম্পাদিকা মনে রাখবেন।

O অমিতা দাস সম্পাদিত 'বঙ্গোপসাগরে'র মে '৮৬ সংখ্যায় ঈশ্বর ত্রিপাঠী লিখেছেন গ্রাম বাংলার সাহিত্য চর্চা। বিষয়টি ভালো। কিন্তু লেখক এখানে নতুন কিছু বলেন নি, যা বলেছেন, তার সব মেনে নেওয়া যায় না।

ঈশ্বর ত্রিপাঠীর কাছ থেকে আরো ভালো প্রবন্ধ আশা করেছিলাম। ভালো কবিতা লিখেছেন, অজিত ভড়, রমা ঘোষ, সমীরণ মুখোপাধ্যায় এবং দীপক হালদার। একটি মাত্র গল্প ছাপা হয়েছে এই সংখ্যায়। কবিশেখর দাস অধিকারীর 'পবিত্র পাদোদক'। নিঃসন্দেহে চমৎকার গল্প।

O নির্মল বসাক সম্পাদিত 'ইন্দ্রাণী'র রবীন্দ্র জয়ন্তী সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন অলোক সরকার, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, অমরনাথ বসু, অরুণকুমার চক্রবর্তী, নিভা দে, অভিজিৎ ঘোষ এবং আরো অনেকে, পরভীন শাকিরের কবিতার অনুবাদ করেছেন অনিন্দ্য সৌরভ অনুবাদ স্বচ্ছ।

মূলত রবীন্দ্রনাথের চিঠির ওপর নির্ভর করে একটি ভালো প্রবন্ধ লিখেছেন বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রবন্ধের নাম : শান্তিনিকেতনেরা শিক্ষা : প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রকৃতি। পুস্তক আলোচনা বিভাগে লেখকরা যত্ন নিয়েছেন, বোঝা গেল। ছাপার প্রতি সম্পাদকের একটু যত্নবান হওয়া উচিত ছিল।

O একটি কবিতা ত্রৈমাসিকের নাম : আমাদের ছুটন্ত ঘোড়াগুলি। সম্পাদক : চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত হয় আসানসোল থেকে।

আলোচ্য পত্রিকার এটি 'তারক সেন' সংখ্যা। প্রচ্ছদে তারক সেনের কবিতা। শেষ মলাটে তারক সেনের কবিতার ওপর প্রবন্ধ। লিখেছেন বিকাশ গায়েন। ভেতরের পাতায় গদ্যে এবং কবিতায় প্রয়াত কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন অসিত বিশ্বাস, জয়া মিত্র, উদয়ন ঘোষ, হর্ষদেব মুখোপাধ্যায়, অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়, সমরেশ দাশগুপ্ত, চণ্ডীচরণ

মুখোপাধ্যায় এবং তারক সেনের আরো অনেক প্রিয়জনেরা।
কিন্তু সম্পাদকীয়তে যে শ্লোগান ছিল, শেষ অবধি সব লেখকরাই দায়িত্ববাহী যোগ্য ঘোড়া হয়ে উঠতে পারল কি?

O দীনেশচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত 'কৃশানু'র বইমেলা সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, জয় গোস্বামী, ব্রত চক্রবর্তী, শান্ত রায়, সুভাষ মজুমদার, অশোক চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে ভালো গ্রন্থ সমালোচনা করেছেন প্রমথ সেনগুপ্ত ও অনুপকুমার ভট্টাচার্য।

O শুদ্ধসত্ত্ব বসু সম্পাদিত 'একক'এর কার্তিক-পৌষ সংখ্যায় অজস্র ভালো কবিতা ছাপা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য, চির মিত্র, অরবিন্দ ভট্টাচার্য, কমলেশ পাল, মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত বাইরী, জহর সেন মজুমদার, গোপা আচার্য, আলী ইদরীস এবং আরো অনেকে।

এতগুলো নতুন কবির কবিতা প্রকাশ করেও 'একক' তার মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেছে।

O শুভ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রৌরব'এর এপ্রিল-জুন সংখ্যায় সমরেশ বসুর শেষ কথা গল্পটি পুণর্মুদ্রিত হয়েছে। এছাড়া গল্প লিখেছেন বিশ্বজিৎ মণ্ডল। গল্পের নাম 'ব্যবধান'। এর আগেও এই পত্রিকায় আমরা অনেক উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প পেয়েছি। আলোচ্য গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়। কবিতা লিখেছেন: সমীর রায়, স্বপন রায়, সত্যজিৎ ভট্টাচার্য, শতদল মিত্র এবং আরো অনেকে। আই কিং এর একটি দীর্ঘ কবিতার সুন্দর অনুবাদ করেছেন অসীম দাশ। এই সংখ্যায় পাবলো নেরুদার আরো একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদক: সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

কবিতার জনগ্রাহ্যতার প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন শুভ বসু। আরো একটি নিবন্ধ: জ্যঁ-পল সার্ত্র এর 'ফ্যাসিবাদে লেখকের মুক্তি নেই'। লেখাটিতে অনুবাদকের নাম নেই কেন?

সব দিক দিয়েই 'রৌরব' একটি প্রথম শ্রেণীর লিটল ম্যাগাজিন হয়ে উঠতে পেরেছে। ●

শতদ্রু মজুমদার

প্রসঙ্গ: গোধূলি-মন

● আষাঢ় সংখ্যা 'গোধূলি-মন' পেলাম। লিটিল ম্যাগাজিন পত্রিকার মধ্যে সম্ভবত গোধূলি-মন' পত্রিকাই এমন নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

লেখাগুলিও নির্বাচন পরিকল্পনা এবং প্রস্থনা বেশ ভালো। পত্রিকা হাতে পেলে আনন্দ লাগে।

আপনার সংগে সাক্ষাৎ পরিচয়ের আশায় রইলাম। 'এবারের শিল্প ও সাহিত্য' পত্রিকা প্রতিযোগিতার পুরস্কার উৎসবে আসার জন্য আগাম আমন্ত্রণ জানালাম। সম্ভবত সেপ্টেম্বরে শিশির মঞ্চে অনুষ্ঠান হবে। আশাকরি ভালো আছেন। ভালো থাকুন।

অনিলকুমার দত্ত/সম্পাদক
'শিল্প ও সাহিত্য'

O O O O O O

● জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যা 'গোধূলিমন' পেয়েছি। দুটি সংখ্যায় 'সংযম পাল ও সোফিওর রহমানের গল্পের বক্তব্য ভালো, কিন্তু গল্পরস তেমন নেই। বেশ কিছু ভালো কবিত পড়া গ্যালো। অরুণ সরকারের গল্পটি ভালো লাগলো। সুখেশ নাথের 'বন্ধু'র মধ্যে বন্ধুত্বের অন্বেষা কালোপযোগী। অন্যান্য বিভাগগুলিও যথাযথভাবে গোধূলিমনের পরিপূরক।

বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়
পো: মটুকবনী, ভায়া—শালতোড়া, বাঁকুড়া

কবিতা

উলুবেড়িয়ান যুবকের সিগন্যাল (৮৯)

সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এই যে আমি তোমার চোখের উর্ণা দেখে,
স্বরলিপির পবিত্রতায় দুহাত জুড়ে,
বেঁচে থাকার সংজ্ঞা মানেই "পর্ণা" বুঝি।
হঠাৎ আবার স্বেরাচারী লুন্ঠতরাজে,
বাত-বিরেতে বুকের দুটি জমাট পাথর,
সরিয়ে কাতর ঐ হাতেতেই ঝর্ণা খুঁজি…।
সেই আমি কি এই আমি হই, হই কি আদৌ?

সেই আমি কি এই আমি যায় বুকের মধ্যে
জন্মভূমির স্তনের বৃন্ত শিশুর শাদায়,
ভোর আজানের ভৈরো হয়ে মিলিয়ে যাবে,
হঠাৎ আবার কালবোশেখীর চন্দ্রতাপে,
প্রজন্ম-ক্রোধ যুবক প্রতিনিধির গলায়,
খুন-খাকী এই স্বদেশ ছেঁড়ে ইনকিলাবে।

বুকের মধ্যে সাত সাগরের তুমুল ত্রিতাল।
চোখ থৈ থৈ ক্লান্তিকালের আলোয়-কালোয়।
সেই আমি যে অনিচ্ছাতেও এই আসরে।
টুকরো টুকরো স্মৃতির মতো সঙ্গে আলোয়।
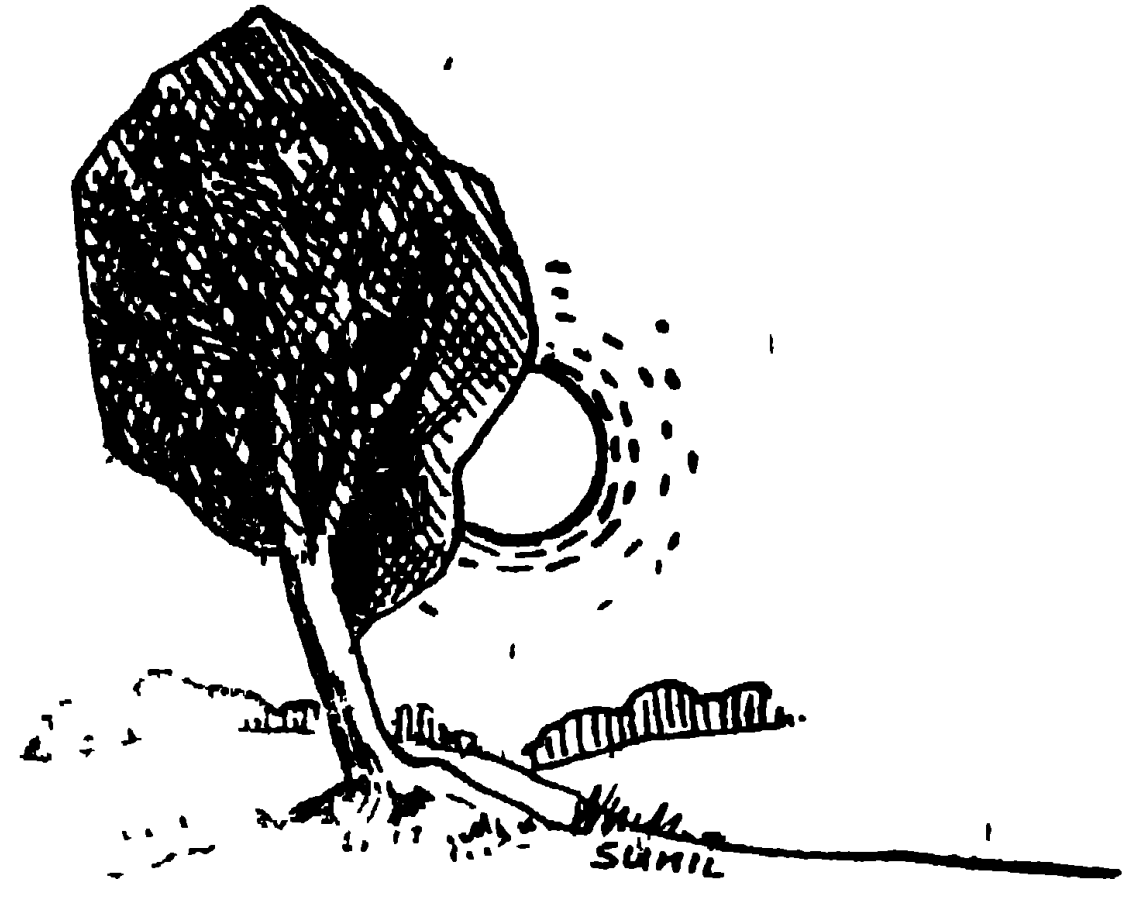
যেহেতু/শুভাশিস্ চৌধুরী

চাঁদ কেন মাঝরাতে সহসা আঁচলে চোখ ঢাকে
জ্যোৎস্নার বুকে তুমি কান পেতে—
ভেবে দেখেছ কি?
কিংবা—
আকাশের খণ্ড বুকে রক্তে তার
ব্যক্ত কেন আততায়ী মেঘের শরীর?
চন্দ্রমুখী সূর্য-অস্ত শেষে—
যখন, মৌনী চাঁদ দিশেহারা হ'য়ে কাঁদে—
মাথার ওপরে বসে সপ্তঋষির ক্যাবিনেট।

পূর্ণিমা পিয়ালী বুক—
উৎসুক ছিঁড়ে নিতে জ্যোৎস্নার আশা
ভালোবাসা।

ভা-লো-বা-সা।
ভালবাসা ভরে দূর আকাশে বুক—
চাঁদের পল্লবে হিম,
স্থবির শিশিরে জাগে চাঁদের অসুখ।
যেহেতু—হৃদয় জেগে—
তটের আঙুল ছুঁয়ে গেলে
চাঁদের আঁচল ভেজে, তৃষ্ণা মেটে না।

গোধূলি-মন/ভাদ্র/১৩৯৩/পনের

শিবির/খোকন বসু

তুমি আমাদের তাঁবুগুলো খাটাতে নিয়ে গিয়েছিলে কাল
অফুরন্ত মাঠ, বালিমাটি, ট্রেকিংয়ের পাহাড় ছুঁয়ে যেতো
গলা ভাঙা আকাশ
কুলি লাইন, শেরপা বস্তি, ছিমছাম মিলককলোনীর গাঁ ঘেঁষে
নতুন দম্পতির মতো ফারনেস
কখনো মেয়েরা দেখতো মোষের পিঠের মতো অন্ধকার আকাশ
কখনো বাবুরা দেখতো মোষের পিঠের মতো কারিগরী আকাশ
এক সকালের জন্য মাটিগাড়া ডেয়ারির সামনে লাইন দেওয়া
তখনো প্রথম সকাল কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায়
তুমি আমাদের তাঁবুগুলো খাটাবে বলে নিয়ে গিয়েছিলে কাল
আমাদের নিয়ে গাইতি নিয়ে পাহাড়ে চড়া
দুধে জল মেশানো
তরাইতলিতে আজো
তাঁবুর ত্রিপলগুলো পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

বাথান/বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মা বাপকে বাথান কারে
বেটাটো শুনে য,
চুলের মুঠী খামছে ধরে
মায়ে বলে—সত্যি ক,
রাত বিরেতে কার লগে
খাড়া রচিস ব।
সরমে মরে বললে বাপে
ঝুঁটিটো ছাড গ
টুবাডু চেখো দেখ্যাচি ত
তাতেই গাটো ম—ম,
আর কখুনো যাবো নাই
মারিস নাক হ।
ঘরকে সিধা চ।

o o o o o

একটি প্রত্যয়/রামজীবন আচার্য্য

পৃথিবী! বিষণ্ণমুখ তোমার দেখেছি বার বার।
এখানে যন্ত্রণা আছে, মৃত্যু আছে, আছে দুঃখশোক
সুখ হেথা মোর কাছে মোহময়ী মায়ামাত্র সার।
তবু ভালবাসি তোমা ভাললাগে তোমার ধূলিকে
যেখানে আমার অঙ্গ মিলেমিশে একাকার হবে।
ব্যথার তিলক নিয়ে ললাটফলকে ওগো বসুন্ধরা
প্রণতির চিহ্ন যবে স্থান পাবে চরণে তোমার
সেদিন প্রসন্নমুখ দেখে যাবো : এ মোর প্রত্যয়
তোমাকে জানাই আজ। সেই হবে সুগভীর সুখ
তোমা ভালবাসি বড়ো, ভালবাসি তোমার ধূলিকে।

মুখাগ্নি/অশোক মণ্ডল

কার মুখ পোড়াতে এসেছি আজ শ্মশানে?

ব্যক্তিগত কুনকের চোরা অহঙ্কারে
দিনকে ভাগ করতে করতে
দীর্ঘতর করেছি রাত্রি।
মাদুরের মতো গোটাতে গোটাতে স্নেহশীল ছায়া
হাতের মুঠোয় এনেছি।
পিতা, কার মুখ পোড়াতে এসেছি
আজ শ্মশানে?

আমাদের নির্বাচিত মুখগুলি পুড়ে যায়…

শরৎ যখন পার্কে পাথরে/ধনঞ্জয় মল্লিক

শরতের সোনা ঝরা রোদ্দুর
তারের বেড়া ভেঙে ভেসে বেড়ায় বাতাসে
অস্থায়ী অন্ধকার প্রতিশ্রুতি ফিরে দিয়েছে
যেন দায় ধান্ধা ভুলে।

পাথুরে রাস্তায় কি অদ্ভুত সাপ হাঁটে
নগ্ন মাংসল পুতুল ও এক সৌখিন বস্ত্র
সব কিছুই প্রকৃতির হাতে গড়া যেন বড়ই অদ্ভুত ॥
মুখে আঙুল ভিজিয়ে প্রতিদিন
বিশীর্ণ বটের তলায়-অতৃপ্ত আত্মার চিন্তায়
মগ্ন ছিলাম যখন দেখেছি।
সামনে দিয়ে হেঁটে গেল অতীতের অন্ধকার
বিকেলের এক ঝলক রোদে এক ঝাঁক পাখী।
এদিকে আমি চুপি-চুপি
স্বপ্নময় গুঞ্জনের ধ্বনি শুনতে-শুনতে
ফিরে পেলাম অভ্রভেদী গভীর আজান ॥

O O O O

কবিকে মানায়/বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়

কবি যদি প্রজাপতি, কাদামাখা তাহাকে সাজেনা,
কিংবা ছুঁড়ুক কাদা, কখনো ফুলের কাম্য নয়—
কবির কঠিন কাজ পাঁকে নয়, অমল কমলে
আগুন চাপিয়ে দেওয়া, দাহহীন, শুভ্র আলোময়

সত্যের বৃক্ষলগ্ন আনন্দের শাখা প্রশাখায়
ছায়া ও বাতাস ঢালতে নির্বিষ বদ্ধ পরিকর—
অক্ষম বমনে আর শব্দের অবৈধ গমনে
যাত্রা যার, তার নাম, কবি নয়, খেউড়ে তস্কর

সফেন চাতুরি নয়, কবিতাই কবিকে মানায়—
প্রবৃত্তির রূপেরঙে ঋদ্ধ হয় অরূপ জীবন,
তাকে যে জাগিয়ে তোলে, সে-ই কবি, সেই প্রজাপতি—
কবিকে মানায় ফল, দাহহীন অগ্নি, সঞ্জীবন ॥

মানুষ এত একা/প্রফুল্ল পাল

আগুনের মধ্যে হাঁটতে শেখেনি যারা
তারাই তো ভয় পায় মধ্যাহ্ন সূর্যের কিরণ
যাদের ঘরে একটিও জানালা নেই
তাদের কাছে আকাশের খবর অজানাই থেকে যায়,
ভুল রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে যারা এখন ক্লান্ত নয়
তাদের মুখে কখনও বেমানান নয় পথের দাবীর কথা
না ঘুমিয়েও চোখ যাদের রাঙাজবা হয়না
তাদের চোখেই নতুন ভোরের স্বপ্ন লেগে থাকে।

ভয়ঙ্কর আত্মপ্রবঞ্চনার শাণিত ছুরিতে
কেবলই ফালা ফালা হচ্ছে যারা
তাদের বুকের গভীরে খুঁড়লে পাওয়া যাবে
অমল ভালবাসার গোপন অনেক সুড়ঙ্গ।

শতাব্দীর শেষের দিকেও মানুষ এত একা ভাবাই যায়না
ভাবাই যায়না মানুষ আজও আগুনকে এখন ভয়
পায় কেন?
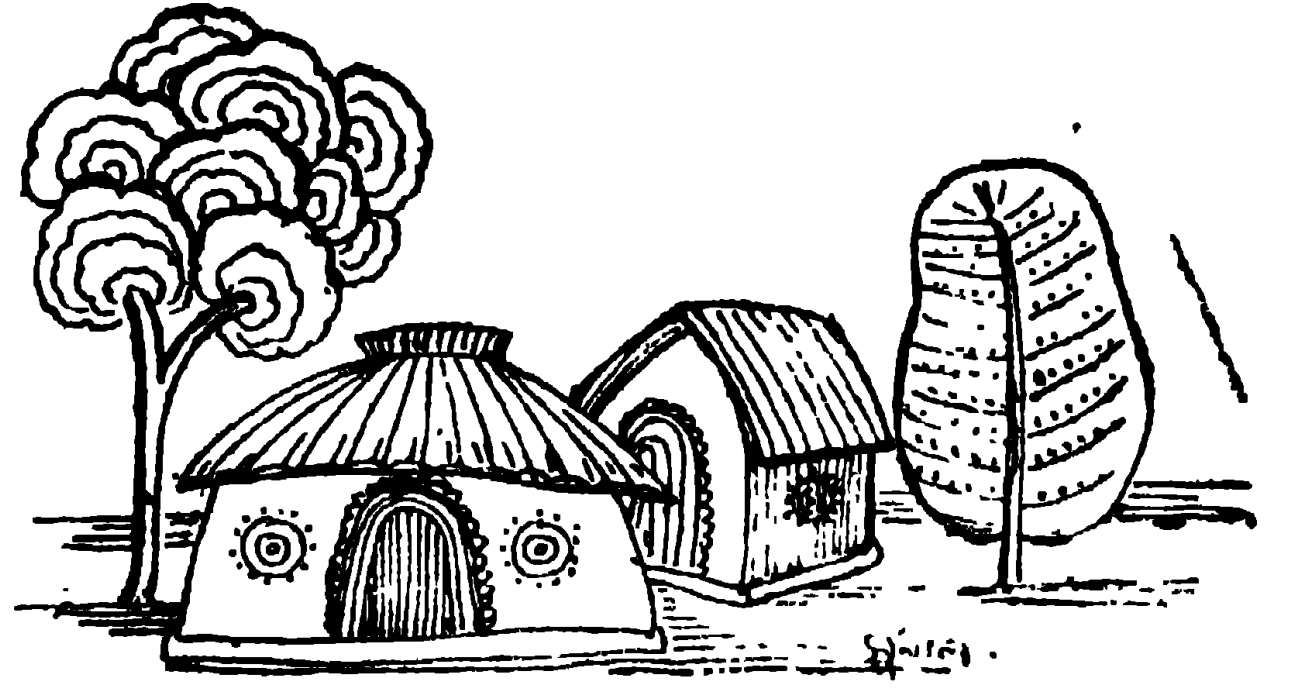
আজ/কাজল চক্রবর্তী

নেমতন্ন চাইনি শুধু ছুটি চেয়ে
ভাষণ প্রবণ নদীর বুকে ভেসেছি বিশ্বাসে
সাদা কিছু বোধ বুঝি তখনো সাদা ছিলো
আজ সেটা ব্যর্থতার রোদে পুড়ে তামাটে হয়েছে।

গোধূলি-মন/ভাদ্র ১৩৯৩/সতের

সংবাদ

○ সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, চিত্রকলা, ভাস্কর্য এবং কারুশিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রতিভা অনুসন্ধান বৃত্তি

১৯৮৭-১৯৮৮ সালের শিক্ষাবর্ষে সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, চিত্রকলা, পুতুলনাচ, মুখোশ তৈরী, ভাস্কর্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশেষ শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে 'প্রতিভা-অনুসন্ধান বৃত্তি'র জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

১ জুলাই ১৯৭৩ থেকে জুন ১৯৭৭ এর মধ্যে জন্ম এবং অনুমোদিত বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রিরা আবেদক হতে পারবেন।

১৯৮৭-৮৮ সালের জন্য ৩০০টি বৃত্তি প্রদান করা হবে। এই বৃত্তির স্থায়িত্বকাল প্রাথমিক ভাবে এক বছরের, পরে বছর বছর তা বাড়ানো হবে।

যাঁদের বাসস্থান ও বিদ্যালয় একই স্থানে তাদের জন্য এই বৃত্তির বার্ষিক মূল্য ৬০০, (ছয় শত টাকা) এবং যাঁরা নিজেদের বাসস্থানের বাইরে অন্যত্র থেকে পড়াশুনা করেন তাঁদের জন্য বার্ষিক ১২০০ (বারশত টাকা)। শিক্ষালাভের জন্য প্রকৃত মাসিক বেতন অথবা প্রশিক্ষকের জন্য দক্ষিণা বাবদ খরচের একটা নির্দিষ্ট অংশ বৃত্তি প্রাপককে দেওয়া হবে X বিষয়টির-বিস্তারিত বিবরণ এবং আবেদনপত্র পাওয়া যাবে ডিরেকটর, সেণ্টার ফর কালচারাল রিসোর্সেস এণ্ড ট্রেনিং, ভাওয়ালপুর হাউস ভগবান দাস রোড, নিউ দিল্লী-১১০০০১ অথবা সচিব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য, নাট্য সঙ্গীত ও দৃশ্যকলা আকাদমি, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৭০০০০৭। আবেদনপত্র যথাযথ পূরণ করে আগামী ৩১শে অক্টোবর ১৯৮৬ তারিখের মধ্যে সেণ্টার ফর কালচারাল রিসোর্সেস এণ্ড ট্রেনিং, ভাওয়ালপুর হাউস, ভগবান দাস রোড, নিউ দিল্লী-১ এর নিকট পৌঁছানো চাই।

○ জাতীয় সাহিত্য সংস্থার সাহিত্য অনুষ্ঠান

গত ২৯ জুন '৮৬ রবিবার বেলা ৩টায় কোন্নগরে শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে জাতীয় সাহিত্য সংস্থার সাহিত্য পাঠের আসর বসে। সভায় বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ৩০ জন কবি সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন সর্বশ্রী মতি মুখোপাধ্যায়, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, নরবাহাদুর লামা, রেবা ঘোষ, শিবদাস খান প্রমুখেরা। সর্বশ্রী পাঁচুগোপাল হাজরা, নিরুপম দাস ছোটগল্প পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীমণীন্দ্রনাথ আশ। রবীন্দ্র কবিতা, ছড়া ও নাটক পাঠ করেন সর্বশ্রী নিখিলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্র মিত্র, ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও রিঙ্কু ধাড়া। সভায় কোন্নগর উদয়াচল সঙ্ঘের সভ্য সভ্যারা শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "মেঘমেদুর বরষা" সংগীতালেখ্য পরিবেশন করেন। সংগীত পরিচালনা করেন শ্রীমতী ঝর্না বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমনু ধাড়া। সংগীতাংশে ছিলেন সর্বশ্রী ঝরণা বন্দ্যোপাধ্যায়, পুতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, রুণা ধাড়া, ডলি ধাড়া, সীমা চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চক্রবর্তী ও চঞ্চল মুখোপাধ্যায়।

সংবাদ

○ উত্তর প্রবাসী পুরস্কার ১৯৮৫

সেদিন কোলকাতা জলে জলময়। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা ছিল পাঁচটায়। কিন্তু পাঁচটায় মহাবোধী সোসাইটি হল একদম ফাঁকা। বৃষ্টি থামার পর একে একে লোক আসতে শুরু করল। ছটা নাগাদ প্রায় ভর্তি হলে অনুষ্ঠান শুরু হোল শর্মিলা শীলের রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে। অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন দুই কবি কবিতা সিংহ ও কৃষ্ণ ধর।

'উত্তর প্রবাসী' সম্পাদক গজেন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর দু' পর্য্যায়ে বিভক্ত ভাষণে বলেন —ভৌগলিক সীমারেখা অতিক্রম করে দু'বাংলার সাহিত্যকে তুলে ধরার মহান দায়িত্ব নিয়েছে 'উত্তর প্রবাসী'। শ্রীঘোষ 'উত্তর প্রবাসী' প্রসঙ্গে এদেশের মানুষের কৌতুহলের জবাবে জানান, প্রায় তিন হাজারের মতো বাঙালীর বাস সুইডেনে। তার মধ্যে উত্তর প্রবাসী গ্রাহক সংখ্যা তিনশতের মতো। শ্রীঘোষ আরো জানান সুইডিশ সাংস্কৃতিক বিভাগ থেকে যে দুইশত বিভিন্ন ভাষার পত্রিকা অনুদান পেয়ে থাকে, 'উত্তর প্রবাসী' তাদের মধ্যে অন্যতম। শ্রীঘোষ জানান প্রতি কপি জেরক্স অফসেটে ছাপাতে তাঁদের খরচ হয় প্রায় বিশ টাকার মতো। এর রেজেষ্ট্রীডাকে পত্রিকা পাঠাতে কপি প্রতি খরচ পনের টাকার মতো। অর্থাৎ ভারতে এক একটি সংখ্যার দাম পড়ছে প্রায় পঁয়ত্রিশ টাকার মতো। এতো টাকা দিয়ে গ্রাহক হওয়ার মতো মানুষ খুবই কম আছেন। উৎসাহী পাঠকদের শ্রীঘোষ টেমার লেনের লিটিল ম্যাগাজিন গ্রন্থাগারের শ্রীসন্দীপ দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন।

গল্পকার উদয়ন ঘোষ এবং কবি দেবীরায় উপস্থিত থাকলেও বাংলাদেশের গল্পকার আবুল হাসান এবং কবি সোফিওর রহমান অনুপস্থিত ছিলেন। উদয়ন ঘোষ সম্পর্কে পরিচিতি দেন সন্দীপ দত্ত। দেবী রায় প্রসঙ্গে ও সোফিওর রহমান প্রসঙ্গে পরিচিতি দেন দুই অশোক চট্টোপাধ্যায়। 'ঈগল' সম্পাদক ও ১৯৮২ সালের 'উত্তর প্রবাসী' পুরস্কার জয়ী অশোক চট্টোপাধ্যায় ও গোধুলি-মন সম্পাদক ও ১৯৮৪ সালের 'উত্তর প্রবাসী' পুরস্কার জয়ী অশোক চট্টোপাধ্যায়।

কবিতা সিংহ ও কৃষ্ণধর উভয়েই 'উত্তর প্রবাসীর' নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রসঙ্গে গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। কবিতা সিংহ বলেন এখানের যে কোন পুরস্কারের নেপথ্যে যে খেলা চলে সেটা জানা থাকায় কোলকাতার এ সমস্ত তথাকথিত পুরস্কার সাধারণ মানুষের কাছে হাসির উপকরণ ছাড়া আর কিছুই হয়ে ওঠেনা।

অনুষ্ঠানে এস, আবুল হোসেন, দেবী রায়, সোফিওর রহমান ও সন্দীপ দত্তের কবিতার গীতিরূপ পরিবেশন করেন আধুনিক কবিতার সার্থক গীতিরূপকার ঋষিণ মিত্র।

○ গোধূলি-মনের 'কবিতার দিন'

আঠাশ বছরের যে পত্রিকাটি যাঁদের বয়স আশি, আর যারা আশির দশকে লিখতে শুরু করেছেন সকলেরই প্রিয় পত্রিকা। গোধূলি-মন সংশ্লিষ্ট সেই সব মানুষকে নিয়ে এবারের 'কবিতার দিন' ১৫ই সেপ্টেম্বর '৮৬ বিকেল ৪টায় মানকুণ্ডু স্পোর্টিং ক্লাবের মঞ্চে। কবিতায়-গানে-আলোচনায় ভরা এই অপরাহ্নে চলে আসুন না গতানুগতিকতার গণ্ডী ভেঙে। অনুষ্ঠানে সুইডেনের 'উত্তর প্রবাসী' সম্পাদক গজেন্দ্রকুমার ঘোষ সহ বিভিন্ন দশকের বেশ কিছু কবি উপস্থিত থাকছেন।

○ পথ নির্দেশ : হাওড়া থেকে ব্যাণ্ডেল অথবা বর্দ্ধমান (মেন) লোকালে মানকুণ্ডু ষ্টেশনে নেমে হেঁটে ২/৩ মিনিট। রিক্সা নেবার প্রয়োজন নেই।

Member—All India Small & Medium News Paper Association, Delhi.
GODHULI-MONE N. P. Regd. No. RN. 27214/75 August '86 (ভাদ্র '৯৩)
Vol. 28, No. 8 Postal Regd. No. Hys–14 Price—Rs. 2·00 only

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পপুলার প্রিন্টার্স, বারাসত, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও নতুনপাড়া, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

প্রতি সংখ্যা দুই টাকা
বার্ষিক সডাক কুড়ি টাকা

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

২৮ বর্ষ/৯ম সংখ্যা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর/১৯৮৬ * আশ্বিন/১৩৯৩

সম্পাদকীয় ঃ—

যখন এ সম্পাদকীয় লিখতে বসেছি তখনও জানিনা এবারের পূজায় মা আমাদের বন্যায় ভাসাবেন কিনা ? রেল লাইনের ধারে ধারে কয়েকদিন আগেই দেখেছিলাম শাদা শাদা কাশফুলের দল হাওয়ায় আনন্দে মাথা দোলাচ্ছে। আশ্বিনের নীল আকাশে মাঝে মাঝে শাদা মেঘ এবং প্রচণ্ড রোদ্দুরে কালঘাম ছুটছিল। তার পরই শুরু হয়েছে এই অকাল বর্ষণ। অকাল বোধনের আগেই। শাড়ি জামা কাপড় কেনার যতটা ধুম পত্রিকার কেনার আগ্রহ সাধারণ মানুষের মধ্যে তার হাজার ভাগের একভাগও নেই। বছর দশ/পনের আগেও আলোচনা চলত বাজারী পত্রিকার মধ্যে কোনটা কার চেয়ে ভাল হবার সম্ভাবনা। কোন পত্রিকায় নামী কোন লেখক একমাত্র উপন্যাসটি লিখছেন ইত্যাদি। তবে একথাও ঠিক ছোট কাগজের ভাল লেখা সম্পর্কে আগ্রহ সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড বেড়েছে। বিগত পূজায় আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত অজিত রায়ের প্রবন্ধ ও অরুণ চক্রবর্ত্তীর দীর্ঘ কবিতা সম্পর্কে আগ্রহান্বিত শতাধিক মানুষকে ফিরতে হয়েছিল শূন্যহাতে। কারণ পূজাসংখ্যা তখন নিঃশেষিত।

ভাল ছোট কাগজের বৈশিষ্ট তাঁরা লেখক তৈরী যেমন করেন বেশ কিছু ভাল পাঠকও তেমনি, গোধূলিমন তার এই সুদীর্ঘ আটাশ বছরে দুটোই করতে পেরেছে। ছোট কাগজতো কখনই বাণিজ্যিক সফলতা প্রত্যাশী নয় তাই এই সাফল্যে আমরা আনন্দিত।

তবু আমাদের কিছু অনুযোগ সরকারের বিরুদ্ধে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উভয়েরই। বড় কাগজের মতো নথীভুক্ত ছোট কাগজকেও হিসাব পরীক্ষা ইত্যাদি যাবতীয় নিয়মকানুন মেনে চলার পরও ভিক্ষার দানের মতো ছিটে ফোঁটা যে সামান্য বিজ্ঞাপন দেন আমাদের মতো পত্রিকার মাসিক বাঁধাই খরচ ও তার তুলনায় বেশী। আর কেন্দ্রীয় সরকারতো বিগত জানুয়ারী '৮৬-র পর থেকে এখনও পর্য্যন্ত হাত গুটিয়ে বসে আছেন। হয়তো ভুলে গেছেন ছোট পত্রিকা বলে কিছু আছে, না হয়তো চাইছেন ও গুলো উঠে গেলেই ভাল হয়। ওদিকে আমাদের সর্বভারতীয় সংস্থাগুলি এবং প্রেস কাউন্সিল নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছেন।

অশোক চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

● সম্পাদকীয় কার্যালয় ॥ নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর-৭১২১৩৬ ॥ হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ

সূচীপত্র

কবিতা

কেটে গেল কতদিন/বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব দিকে মুখ রেখে
কেটে গেল কতোদিন, কতোকাল।
পালতোলা নৌকা নিয়ে
কোন গোধূলিতে অথবা প্রভাতে
কেউ তো বলল না এসে,—
ত্থাখো, প্রতীক্ষার দিন শেষ হয়ে গেছে।

সেই একই সূর্য।
বহমান তিরতির নদী
মিটিমিটি রাতের তারা,
নীড়ে ফেরা শ্রান্ত পাখি,
দিনান্তে, ঘনঘন দীর্ঘশ্বাসে
আমাদের চাওয়া এবং পাওয়ার হিসাব।
কতোগুলো বছর কেটে গেলো
সীমাহীন ধৈর্যের কাল গুনে গুনে।

এবার ফেরার পালা,
আর পূবে নয়, পশ্চিমে এবার।
ঘরে ফেরা সূর্যের সাথে
আমাদের সব কিছু হিসাব নিকাশ।
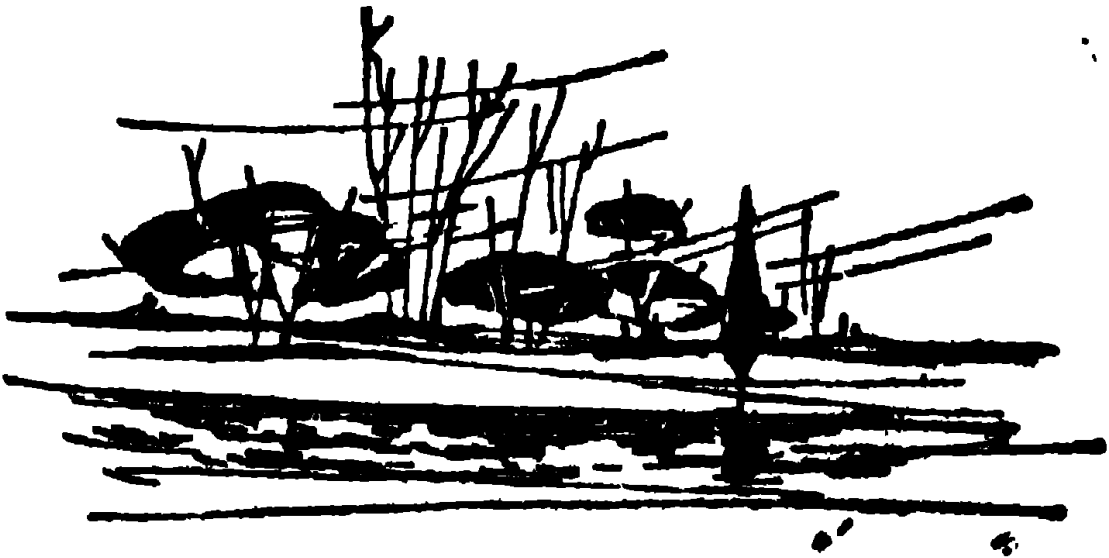
চোখ/গোপাল চক্রবর্ত্তী

শিল্পীর চোখ নিয়ে
অমন ক'রে কি দেখছ?
অনেক দেখার পর এখন কি
দেখা হয়নি, তবে দেখ।
একদিন ওদের মত ছুটেছি
এখন হাঁপিয়ে পড়ি—
তাই একটু জিরিয়ে দম্ নিচ্ছি
তুমি হাঁপিয়ে যেও না।
অনেক পথ চলতে হ'বে
বুক্ ভরে দম্ নাও।
দেখবে পৌঁছে গেছ যা
দেখার জন্য অপেক্ষায় ছিলে।
কত মুখ, কত চোখ, শুধু কথা
কথার সাগরে ভেসে দেখ।

বোধি/জ্যোতির্ময় বসু

যে শব্দ প্রতিমা, যে গভীরতাকে খুঁজছি
সে কী লীন এই বর্ষারাতের সেতারে?
ছাদ থেকে নল বেয়ে জল পড়ার মুদারা,
জলময় উঠোনের ওপোর বৃষ্টির ঝালা।

ওদিকে লালচে আকাশের দক্ষিণ দিগন্তে
গাছেদের সারি-দেওয়া কালো কালো মাথা;
সব চেয়ে এগিয়ে সামনের দিকে
নৈঋৎ কোণের ছুটো নারকোল গাছ।

দিক বলয়ের কালো সবুজ পাড়ে
অসমান দূরত্বে তিনটি আলোর বিন্দু:
জাপানী 'জেন' ছবির মাঝখানে যেন
লাল ওপেলের মত স্তব্ধ আকাশের শূন্যতা।
শাশ্বত মহিমার যে কবিতাকে খুঁজছি,
অধরা সে এই ইন্দ্রিয়ে, ধরা যাবে কেবল বোধির
আলোতে।

সে আছে/সমীর মণ্ডল

খুঁজে দেখো, সে আছে নিশ্চয়
বুকের আড়ালে কিংবা
আশা প্রদীপের ছায়ায়।
খুঁজে দেখো, সে আছে নিশ্চয়
বাতাসে কিংবা নদী সমুদ্রের জলে
অতল গভীরতায়।
ক্ষুধা-ভয়-অন্ধতা তাড়িত
কিলবিল দিশাহারা ধূলি মধ্যে
জর্জর হৃদয় তবু বিশ্বাসে
আকাশ বধির তবু প্রাঞ্জল অন্বয়
নাম ধরে ডাকো
স্বজনেই চিরন্তন মগ্ন স্বপ্নে
ভয়ঙ্কর অবসাদে মুগ্ধ করুণাময়।

কবিতা

মুগ্ধের ব্যাকরণ/কৃষ্ণা বসু

রিলিফ ক্যাম্পের থেকে বার হয়ে এসে
দাঁড়িয়েছ ঐ দৃশ্যের সামনে,
বন্যায় বিপন্ন গ্রাম, গেরস্থালী,
ন্যাংলা ময়লা ছেলে, রোগা মেয়ে মানুষের সারি,
সন্ধ্যা হয়ে এল টিলার ওপরে উঠে তুমি
ওদের সংসার, ওদের গেরস্থালী দেখো,
দেখো যে ঐ নিরন্ন মানুষ কিভাবে খুঁটে খায়
শেষ খাদ্য কণা, দেখো অস্থায়ী সংসারে কত মায়া,
কিরকম হাঁটুর কাছে জড়ো করে আনা বুক
বসে আছে কৃষক পুরুষ, একদিন ধান বুনেছিল !
স্বভাবত দৃষ্টির নরম মায়া তুমি কিছুটা বিলিয়ে দাও
ওইদিকে, ওইদিকে নিরন্ন মানুষ আর বন্যার সংহার,
টিলার ওপরে উঠে আসো তুমি,
সূর্যাস্তের কিছু পর, শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদ মেঘ ভেঙে
অথৈ জলের ওপর রহস্য জ্যোৎস্নার মধ্যে রয়েছে জেগে,
যতদূর চোখ যায় শুধু গেরুয়া জলের ঢাল,
আর তার ওপর মায়াবী জ্যোৎস্নার যাদু
তুমি মুগ্ধ হও, বলে ওঠো 'আহা' !
পর মুহূর্তেই তীব্র অপরাধ বোধ অধিকার করেছে তোমায় ।
এই জল, এই জলের মোহন দৃশ্য দেখে মুগ্ধতা !
ঠিক নয় মুগ্ধের বিস্ময়, এই বুদ্ধি তোমাকেও কষ্ট দেয়
তবু মুগ্ধ হও, কেননা মুগ্ধের ব্যাকরণ
মানে না সমাজ শাসন !

শেষ সূর্যোদয়/অমল দাস

অথচ তেজ তার রুদ্রাক্ষ জড়ানো ছিল
কঠোরে কঠিন
ক্রমশ কিসে হয় ক্ষীণ
অ ভিন বলেই সে অভ্যস্ত থাকে
পাছে না জড়ায় কোন ঘোর দুর্বিপাকে ।
শোভন রঙের কিছু
শেষ সূর্যোদয়
হয় হয় তারও মনে হয়
জীবন গদ্য জেনে মাত্রাটুকু তার
সীমানা ছুঁয়েই আছে
প্রিয়ম্বদার
রূপে রসে গন্ধে বর্ণে
স্পর্শটুকু চিনে
অঙ্গনে রেখেছে দান
শিশির অচিনে ।

শান্তির যুদ্ধ চাই/বরুণ মজুমদার

এক যুদ্ধ শেষ করে আর যদি যুদ্ধ করো তবে
তোমাকে ঘাতক বলে অনায়াসে মেনে নেওয়া যায়।
দেশকে রক্ষার জন্য যদি তুমি যুদ্ধ করে থাকো
তাহলে এসব কিছু অপবাদ দেবোনা তোমাকে।

হে আহত প্রসন্নতা সময়ের বহমান স্রোতে
হানো তীব্র কশাঘাত অনভিজ্ঞ বালকের মত।
স্বর্ণাভ প্রান্তরে আমি বসে আছি, আহত প্রেমিক
আনন্দ, দুঃখ, স্মৃতি হৃদয়ে ভাসছে অবিরত।

অনেক যুদ্ধের জয়ে শিহরিত প্রেমিকের মত
সৈনিকের জয় চাই, তা না হলে শুধু পরাজয়
মনের গোপন কোণে দুঃখটা বাড়ায় কেবল।
সাম্রাজ্যবাদের জন্য যুদ্ধটাকে তাই ঘৃণা করি।

এখন যে যুদ্ধ চাই যে যুদ্ধ মানুষ স্বপ্ন দেখে,
শান্তির পৃথিবী তাতে অনায়াসে গড়া যেতে পারে।

কোজাগরী/অরুণকুমার চক্রবর্ত্তী

নীলাভ স্তনের বোঁটায় আজ
সারারাত শুধু সারারাত
অফুরান্ দুধ বিলি হবে

নিমন্ত্রণ পেয়েছে সবাই, কে কে যাবে
কারা যাবে, পেট পুরে খেয়ে যেও,
দুধ, শুধু দুধ, সারারাত
শুধু দুধ বিলি হবে

শাইলি কাইলি আর বুধোন মুখিয়া
সেদ্ধ পলাশের পাতা, শিয়াকুল, তাড়ি
আর কাঠবেড়ালের মাংস খেয়ে ওরা আজ
এখানে এসেছে, ওরা দুধ খাবে।

স্তনের রূপোলী বোঁটার থেকে আজ সারারাত
অফুরান দুধ বিলি হবে

o o o

সাগর বালিকা/ভাস্বতী চক্রবর্তী

বাঁকা চাঁদ জেগে আছে
নীলাভ আকাশে,
পদ্ম কোরক থেকে
অবিরত ঝরে পড়ে
শিশিরের স্বেদ,
ফেনায় উঠেছে দুলে
ঝড়ের সাগর
পাথরে পাথরে অবিরত
বয়ে যায় জীবনের গান।

স্মৃতির ফলক ঢাকে
ঐ চাঁদ, ঐ মেঘ
ফেনার নূপুর পরা
কল্লোলিনী সাগরের স্রোত।
নীলাঞ্জনা সাগর বালিকা
তোমার আঁচলে তবু
মেঘ কেন রেখে যায়
বিলম্বিত বেহাগের সুর।

মনে পড়ে ?/আনা চক্রবর্তী

তোমার নিজেকে মনে পড়ে
সবুজে-মোড়া একফালি নরম সকাল ?
সৌন্দর্যপ্রেমিকের দল কি প্রগাঢ় করেছিল তোমাকে !
প্রত্যূষ, ঊষা, গোধূলি
এমন কি গহন তিমিরের তারকারাজির দীপ্তিও ছিল তোমাতে।
কখনো বেণী করে, কখনো চুলগুলোকে সহজ শাসনে বেঁধে রাখতে
মহুয়া আর হিজলের সুবাস তোমাকে ভরে থাকত
নর্তকী, কিন্নরীরা তোমার বন্দনা করত
মৃদঙ্গের তালে তালে তুমি নেচে যেতে,
—মনে পড়ে সে-সব ?

অথচ ছ্যাখো, একটু একটু করে তুমি কেমন দ্বিপ্রহর হয়ে গেলে!
তুমি হেমাঙ্গী, কি প্রয়োজন ছিল পীতাভ বসনে,
কি প্রয়োজন - আভরণে ?
তুমি আর কস্তুরি মাখোনা লোধ্ররেণু,
তুমি কেবল রৌদ্র মাখো রৌদ্র ঃ
একবার নিজেকে ফিরেও ছ্যাখো না,—কেন ?

তুমি অন্তত একটিবার ঘাস হও ঘাসফড়িং বা পাখি
একটু সবুজ হও সহজ ও সবুজ ··
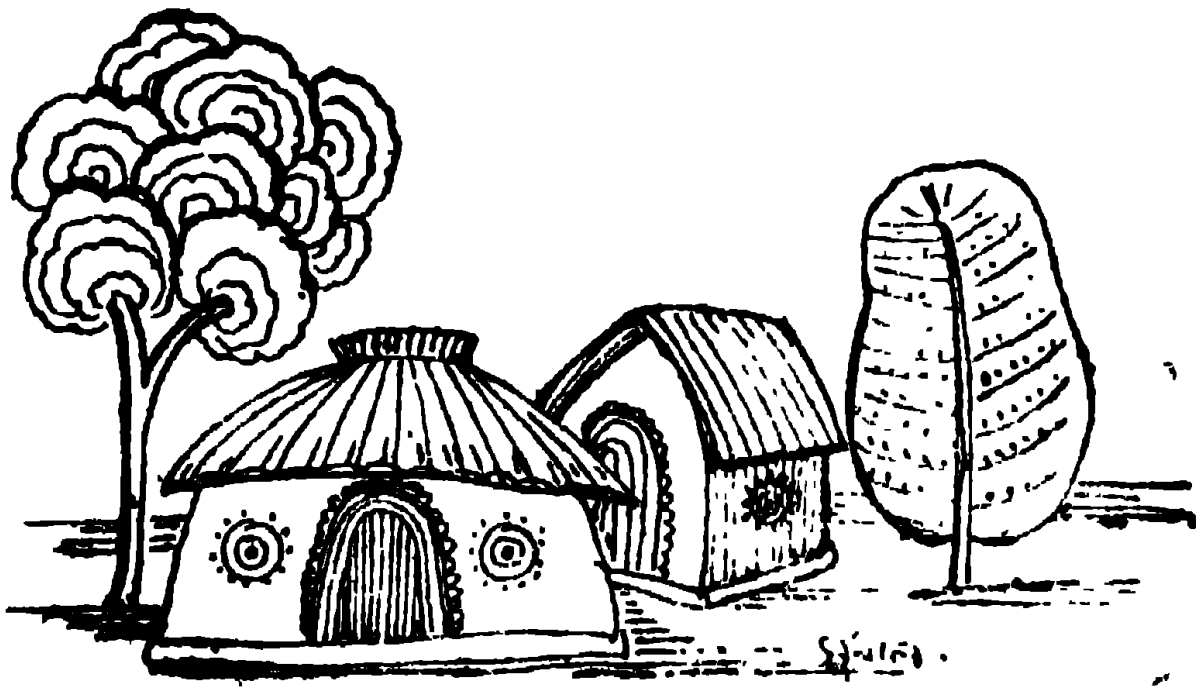
মাদল বাজছে/অশোক চট্টোপাধ্যায়

এখনও তার সলাজ হাসি
এখনও তার চঞ্চলতা
আমায় টানে গভীর ভালবাসায়।
শরীর নামক বদ্ধ জলার
তীর ছাড়িয়ে অনেক দূরে
অচিন গ্রামের ইষ্টিশনে
নামতে বলে
আলের মধ্যে হাত ছড়িয়ে
ধরতে বলে বাতাস
এবং আকাশটাকে।
আমার পাশে যখন থাকে—
সেই কিশোরীর চোখের তারায়
বৃষ্টি ভেজা আকাশ দেখি।
মাঠ পেরিয়ে সাঁওতালী গ্রাম
সন্ধ্যা নামছে শাল-মহুয়ায়
রক্তে এবং মাটির বুকে
দামাল মাদল বেজেই যাচ্ছে
দ্রিদিম-দ্রিদিম, দ্রিদিম-দ্রিদিম।

যে দুঃখে গোলাপ/জগৎ লাহা

যে মরে যাচ্ছে তাকে আরো মারো কেন ?
যে সারাক্ষণ জতুগৃহে, তাকে কেন পোড়াও ?

একি অনাময় তোমার প্রেম, রমণী ?
নাকি নিরাময় ঘৃণা তোমার, আমাকে ?

আমি তামাম পৃথিবী ঢুঁড়ে আবিষ্কার করলাম ঋতুবৃক্ষ
তোমাকে চেনালাম অন্তরীক্ষ্য, পৃথিবী ও পাতাল
কিন্তু এখনো তুমি চিত্রনীল ঘূর্ণাবর্তে
কেবলি ঘুরপাক খাচ্ছো ।

আমি জীবনদ্বীপের ঢাকনা খুলে কতোবার দেখেছি মৃত্যুকে
সেখানে আলো নেই—অন্ধকার ।
তুমি অন্ধকারই ভালবাসো নাকি ?
আলো চাইনা তোমার ?

আমি কবি-দেবদূত লেরমনতভকে ভালোবাসি
তার বিরহ ভালোবাসি, ভালোবাসি তার বেদনা
তাই বলে মনে করোনা আমি তার পরাজয় কিম্বা পীত মৃত্যুর
শরিক হতে চাই ।

আমি সেই কষ্ট ভালোবাসি যে কষ্টে করুণা নেই
আমি সেই দুঃখ ভালবাসি যে দুঃখে গোলাপ ফুটে ওঠে :
জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যেন জেনে যাই
দুঃখের সাধনাই শিল্প
আর, শিল্পের সাধনাই ভালবাসা ॥
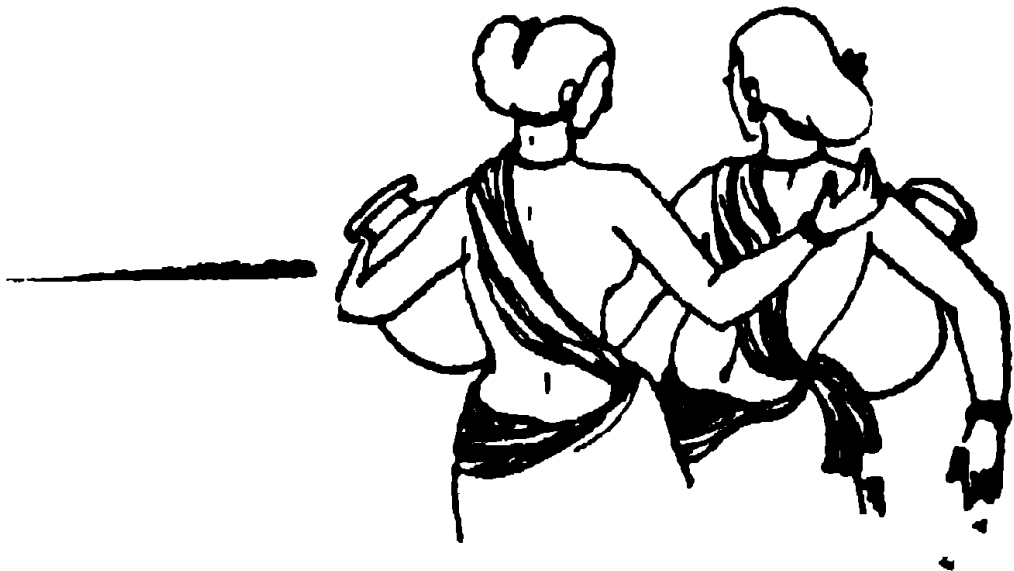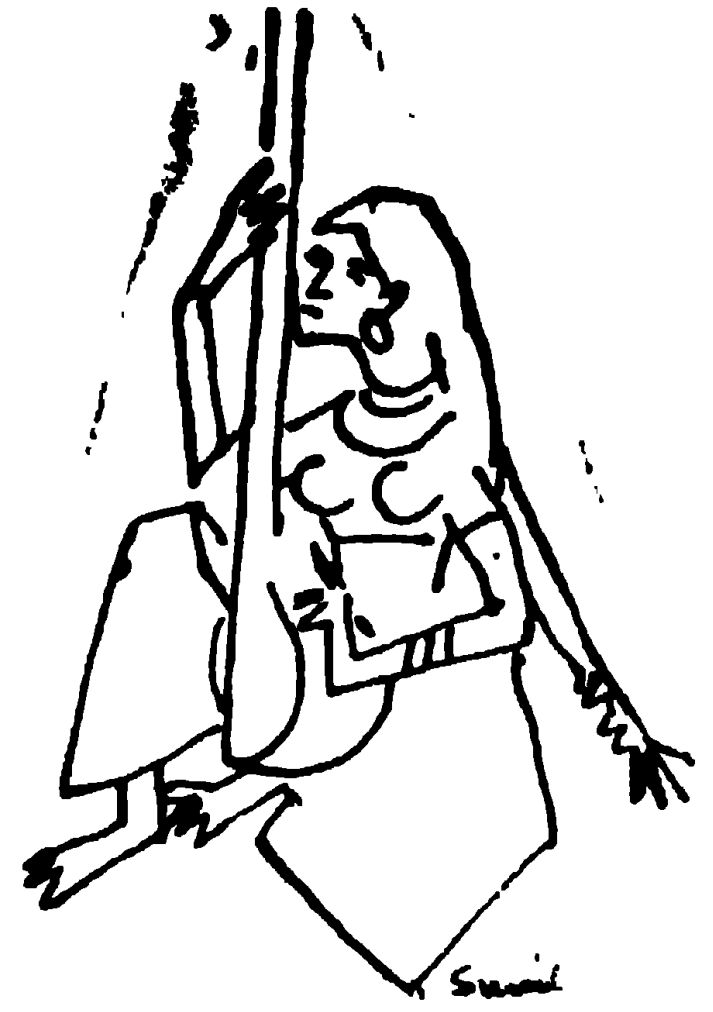
স্বভূমিতে একা/ঈশিতা ভাদুড়ী

প্রিয় দেবতার খোঁজে শিশিরে শিশিরে
যাই আর ফিরি,
পুণরায় যাই ।

মেঘের সাদা শরীর ছুঁয়ে
আমি মুগ্ধ চেয়ে থাকি ।

আমি বাগানে বাগানে ফুলেদের পাশে
খুঁজেছি তাকে,
একটি প্রিয় দেবতার মুখ ।

শেষাবধি ক্লান্ত, নির্জন আমি
স্বভূমিতে ফিরেছি একা ।
মেঘ পাঠায়নি সেই দেবতার ছবি,
নাক-মুখ-চোখ এঁকে ।
ফুলও দেয়নি কোনো পরম আশ্বাস
নিভৃতে ।

কবিতা

ভিড়/রণজিৎকুমার সেন

এখন সর্বত্র ভিড়,
যাত্রার আসর থেকে ঘরের বাসর,
যানবাহন, অফিস-আদালত, পথ-ঘাট, বিদ্যামন্দির,
প্রমোদ কক্ষ, খেলার মাঠ, হাঁসপাতাল, শ্মশান,
অজস্র জনস্রোতে সর্বত্র ভরাট ;
শুধু জোড়া জোড়া পায়ে এক-একটি মাথা
এগিয়ে চলেছে পরস্পরের স্কন্ধলগ্ন হয়ে,
তাদের নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ছড়িয়ে পড়ছে ভাইরাস,
এখন আর কেউ সুস্থ নয়, সকলেই রোগ-বীজাণুর শিকার।
ভিড়ের ভিড়ে এসে এখন ভিড়ে পড়েছে জন্তুরাও,
তারা ভেটেরেনারীর খোঁজ রাখে না, তোয়াক্কা করে না মানুষের,
দিন-রাত্রীর অক্লান্ত বিচরণে তারাও পদযাত্রী।
সর্বত্র ঠাসাঠাসি রেষারেষি গুঁতোগুঁতি ভিড়।
কেউ তারা কারুর নয় কেউ কাউকে চেনে না, সবাই নিজের,
প্রত্যেকেই একা আজ একক সওয়ার।
কার সঙ্গে দাঁড়িয়ে এখানে দু'দণ্ড কথা বলবো ?
কাকে স্পর্শ করে চোখে চোখ রেখে বলবো ; আমি তোমার !
পৃথিবী আজ বড় ব্যস্ত,
তাই সে কেবলই রুদ্ধশ্বাসে উধাও হয়ে ছুটছে ;
অপেক্ষমানের অপেক্ষায় সে বসে নেই,
অগণিত প্রাণীকুলকে সে কেবলই টেনে নিয়ে চলেছে ;
তার শেষ নেই, সীমা নেই, সমাপ্তি নেই,
তার বিচার নেই, বিশ্লেষণ নেই, ভবিষ্যৎ নেই,
অসম্ভব ভিড়ে কেবল একটা জট পাকিয়ে দেওয়াই
তার ইতিহাস।
সেই ইতিহাসের কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে
আমি কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ দেখতে প্রস্তুত নই।
তাই আমি সমস্ত ভিড় ঠেলে
নিভৃতে এসে আমার ঘরের আর্শিতে দাঁড়াই,
তার স্বচ্ছতায় অন্ততঃ একবার চেষ্টা করি নিজেকে চিনতে,
অন্ততঃ একবার ভাবতে চেষ্টা করি ;
ব্যস্ত পৃথিবীর জন-অরণ্যে আমি এখনও হারিয়ে যাইনি॥

গোধূলিমন/রবীন সুর

এখন গোধূলি মন। শান্ত শুদ্ধ নিরঞ্জনের
অতীন্দ্রিয় ঢাক বাজে অন্তর্গত নদীটির ধারে।
ফরাসডাঙার স্ট্যাণ্ডে অতীতের উদাসীন হাওয়া
তেলিনিপাড়ার ঘাট ঘুরে বন্ধ চটকলের জেটিক্রেন বোট
ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভাটপাড়ার স্মৃতিগন্ধ নোনা টেরাকোটা
মন্দিরের চূড়ালগ্ন অশ্বথের ক্রমশ বাড়ন্ত ডালপালায়
কেবল পিছন দিকে নিয়ে যাচ্ছে স্বপ্ন-রোমন্থনে।
এখন গোধূলি মন। অয়নান্ত। বাসা বাঁধা নেই—
দিনের কাজের ক্ষতি হিসেবের অঙ্ক মিলহীন।
এতদিন যতো খেলা পড়ে রইলো ঢের বেশি বাকি।
অবগাহণের নদী আজ বড় দূষণ গ্রাসের
অত্যাচারে শয্যাশায়ী, দু'একটা অন্তিম প্রার্থনা
এখনও ফুলের মত ধরে আছি কলুষবিহীন করতলে ;
শৈশবের ভাগীরথী, আজীবন গঙ্গা বলে জানি
মহাদেব জটাজালে জন্ম তার, নিঃশর্ত অঞ্জলি
এখন গোধূলি মনে দিয়ে যাবো কবিতার নামে।
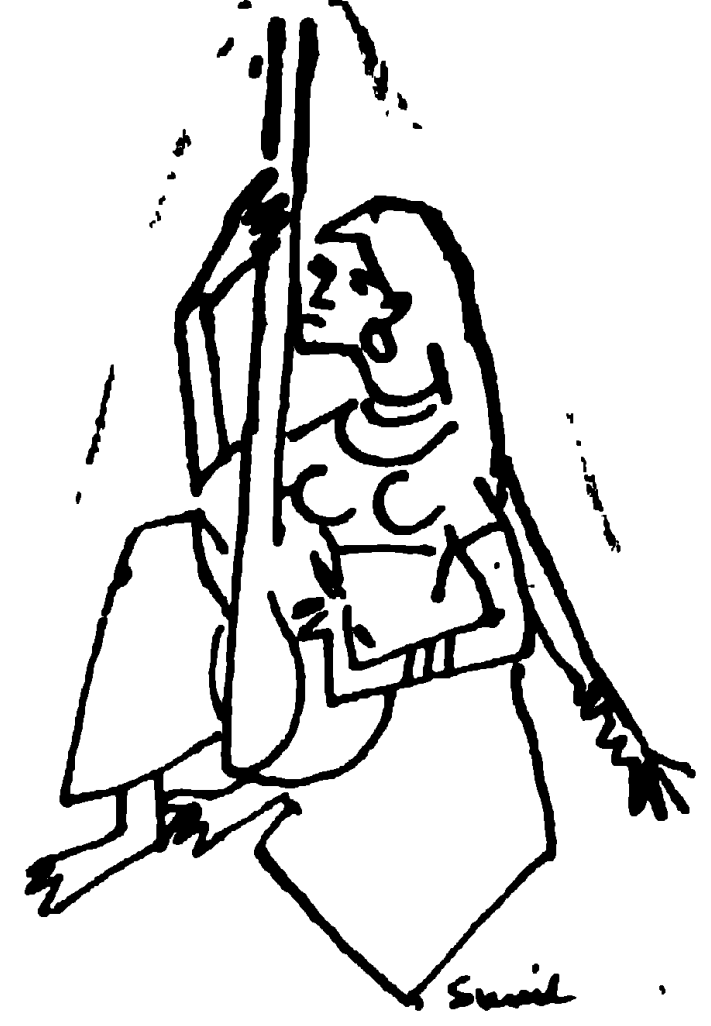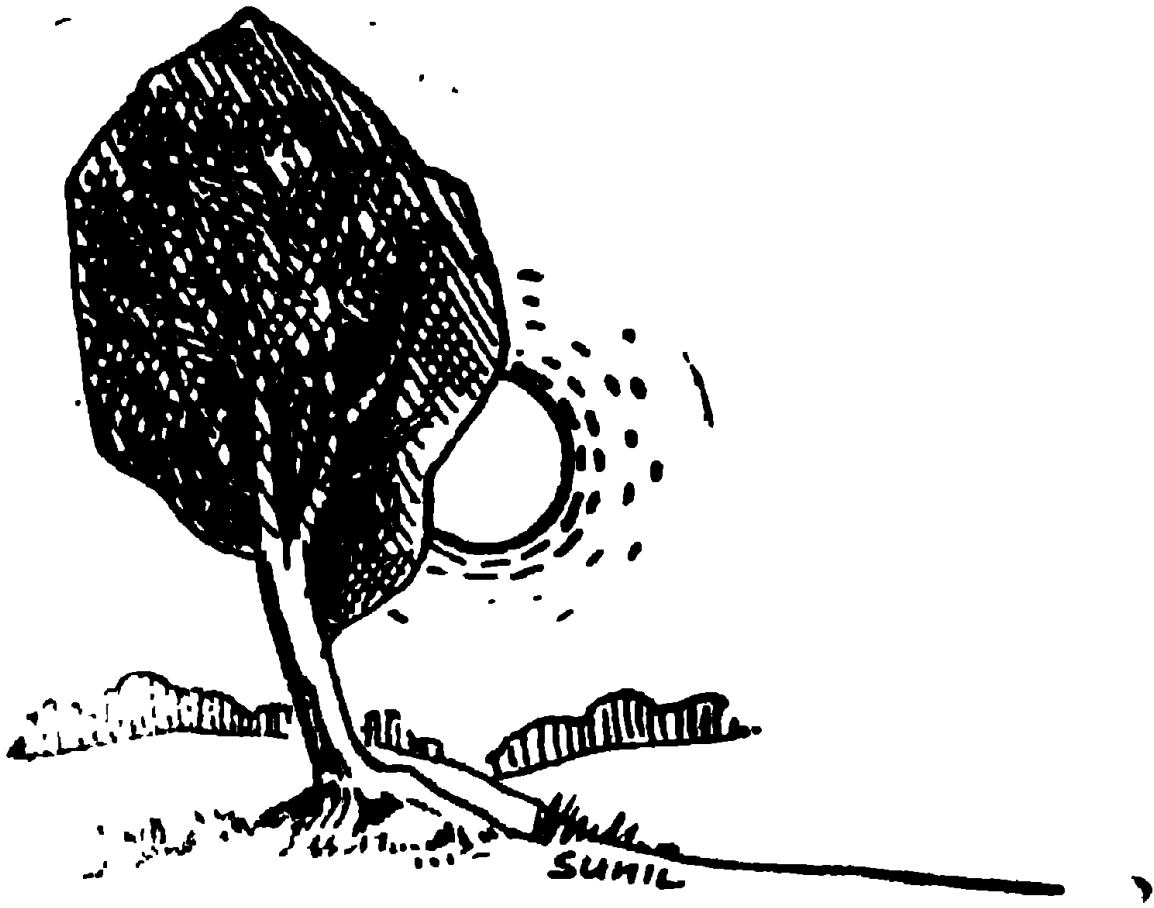
তার প্রেক্ষাপটে/হিমাংশু দে

সব মানুষের বুকের মধ্যে
তোমার মধ্যে আমার মধ্যে
চলছে আসা যাওয়া
তার

তাকে ঘিরেই তোমার সব
ভয় ভক্তি ভাবনা খেলা
সত্যি মিথ্যা নিয়ম নষ্ঠা সব একা-
কার।

তার জন্যে তোমার দুয়ার
নাইতো আঁধার আটো সাটো
সাজিয়ে রাখা উজ্জল বাতি
দান

তার জন্যেই-তো রাত্র ভাঙো
ভাঙো উজান আজান ঢেউ
বালুচরে সাগর বেলার
স্নান।

হে নমস্য জটিলতা/কমলেশ পাল

হে নমস্য জটিলতা, আপনার পাঠশালা থেকে
ধুন্ধুমার মানসাঙ্ক ব্যাকরণ থেকে
অব্যাহতি দিন।

আপনার বেত্রবান প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার কাছে
বহু যোগ্য ছাত্র আছে, যারা
একটু ইঙ্গিত পেলে
অপরের স্লেট বই হৃদয় মাড়িয়ে
চেয়ারের কাছে পৌঁছে যেতে পারে, য র।
নির্দ্বিধায় আমাকে টপকে তারা
অশ্ববেগে চলে গেছে পতাকার দিকে।
আমার কেবলই বিস্মরণ।

কেবলই সাপলা বিলে তেচোখো মাছের
মন্থরতা নিরীক্ষণ কোরে কেউটে পানার ফুলে
রামধনু দেখে…দেখে…দেখে…
আমার কেমন যেন সব পাঠ ভুল হ'য়ে যায়।

* * * *

মাটির গন্ধে/প্রভাত লাহা

মাটির মধ্যে যখন আঁতুড়-আঁতুড় গন্ধ পাই
তখন ফুল ফোটানোর বেলা আসে,
ঋতুমতী গাছেরা জ্যোৎস্নার মতন উদ্ভাসিত হয়
আর বুকে ডুবে থাকা গভীর ভালবাসা শিরশির ক'রে
ওঠে।

প্রার্থিত ঈশ্বর/তপনকুমার মাইতি

এই অস্থির সময়ের ভেতর থেকে
তুমি তোমার হাতগুলো সরিয়ে নিচ্ছো
সরিয়ে নিচ্ছো পুরনো চিঠিপত্র, প্রেম ও
প্রেমের অধিক আলো।

গোলাপী পলস ঢেকে ছিল যে হাতের রেখা
এখন ছুটন্ত ট্রেনের হাতল ছুঁয়ে আছে সেই হাত
আমি উলঙ্গ হয়ে তোমার দিকে যতই এগিয়ে যাই
পেছন থেকে পোশাক আমাকে টেনে রাখে
আমি দু'হাত দিয়ে ঘরের দেওয়াল যতই ভেঙ্গে ফেলি
আসবাবপত্র ততই এগিয়ে আসে।

কার্ণিশে কার্ণিশে বেজে ওঠে ঝড়ের সংকেত
সারারাত বুকের ভেতর আগুন নেভানোর আয়োজন
জন্মনিয়ন্ত্রনের প্রচারপত্র ছিঁড়ে ফেলে মধ্যরাতে দেখি
বন্ধনীর মতো যোনির ভেতর লুকিয়ে আছে
আমার প্রার্থিত ঈশ্বর।

অন্য ভ্রমণ/কাশীনাথ বসু

ইচ্ছে করলেই পারি
যা কিছু জড়িয়ে আছি
সব ছেড়ে হাল্কা হতে পারি।

জানি, এই টান, হাঁফানি বয়সে পুরোনো
অনায়াশ নয় আজ শিকড় উপড়ানো।

তাহলেও পারি
এই আহত উপত্যকা থেকে পরচুলা খুলে
বোকা-সোকা বোবা সেজে
অন্য ভ্রমণে যেতে পারি।

মধ্যরাতের জ্যোৎস্নার প্রতি/নিভা দে

তারপর চাঁদ উঠল ধীরে ধীরে
খুব ভীরুতার সঙ্গে-দ্বিধার সঙ্গে
মোলায়েম হাল্কা নীলাভ আলো ছড়িয়ে দিল
পৃথিবীর শরীর তখন ঘুমন্ত।
দুর্দম মেঘ আর লাজুক চাঁদের খেলা দেখার জন্য
তখন কোন ঘরের কোন জানলায়
কোন কবির চোখও খোলা নেই
পূর্ণিমার চাঁদ এতক্ষণে
নিলাজ দস্যুকে ছিন্নভিন্ন করে
মধ্য আকাশে আলোর বিপণি খুলে বসল
যদিও ক্রেতা নেই কোন
দর্শক বা ক্রেতা নাই থাক
তবুও অপার্থিব নীল আলোর স্রোতে
পৃথিবী তখন রহস্যময়ী, অলৌকিক
সারি সারি বৃক্ষদল সাথী তার
নিঃশব্দ বিস্ময়ে ওরা দাঁড়িয়ে থাকে
অপার অনন্ত বিশাল চোখ মেলে।
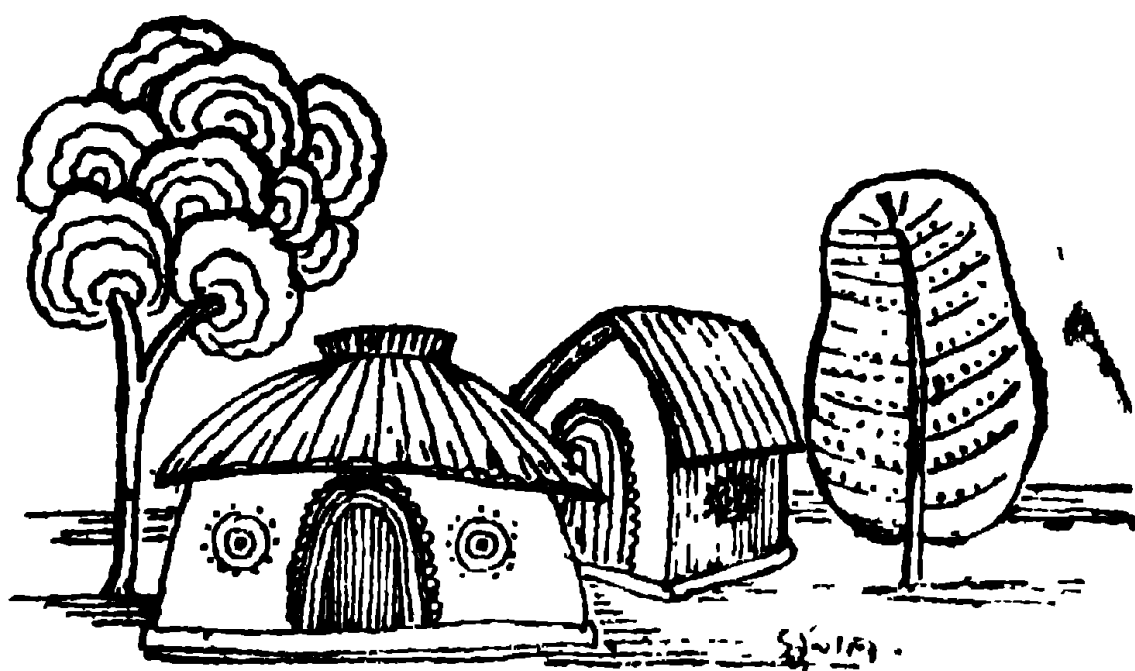
সরলতার ভেতর থেকে/শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

সূর্যের বাসরে আসবে আগামী দিনের খবর
পারিবারিক চৌহদ্দির মধ্যে হার্দ্য অনুরাগে
কাঁচপোকা টিপ পরে আমার বালিকা-কন্যা
আলো-ধোওয়া সকালের মুখোমুখি হয়ে বলবে,
'বাবা, ছাখো কেমন সেজেছি।'

সরলতার ভেতর থেকে স্নিগ্ধতায় ফুটবে জীবন
মাটির আসনে ঝরবে শ্বেত কপোতের পালক
চৈতন্যে শুদ্ধ বোধ, বাহুল্য মেলে না বাহু
বিশ্বচিরাচরব্যাপী অনন্ত সরলতার মধ্যে
ফুটে থাকবে কন্যা আমার প্রাণের বিন্দু হয়ে।

বিপন্ন হাওয়ার মধ্যে/দ্বিজেন আচার্য

বিপন্ন হাওয়ার মধ্যে কাটে দিন, রাত্রি কোলাহল
আসমুদ্রহিমাচল নীল হয়ে রয়েছে হৃদয়ে
হৃদয়ে উত্তাপ নেই—দীর্ঘ ঘুম হাহাক র, আর
খেজুর ফুলের ঘ্রাণ—নগ্ন মরিচীকা!

পার হয়ে যেতে হবে—কতদূর – কার কাছে, কেন
জানিনা, এই দীর্ঘ ক্যারাভানে কোনখানে
সঠিক আশ্রয়!

বসে আছি মধ্যরাতে—কেউ যদি নাম ধরে ডাকে

শরীর/বিশ্বনাথ গরাই

রাত্রি কিছু বলেনি, তার
অস্ফুট এক ভাষা
আমার কোষে পল্লবিত করছে সর্বনাশ।
মৃত্যুঘন গাঢ় রঙিন মূঢ় চঞ্চলতা :

আমিও খুব নেশাগ্রস্ত, রোমশ তার হ্রদে
অবগাহন শেষে তুলি অলসতম শ্বাস---
অসম্পূর্ণ, ভেঙেছি শুধু জলেরই বাহুপাশ
এখন ত্রাস আমাকে ছেঁড়ে বিপন্ন এক বোধে :

রাত্রি কথা বলে না, শুধু জ্বালায় এবং জ্বলে
শরীরভরা তার নিরুপম সঘন ছয় ঋতু---
একটা জীবন শেষ হয়ে যায়, পারিনে হতে থিতু
বুঝিনি তার পলাশ, শিমূল কিসের কথা বলে !

এখন, এ সময়/সমীরণ ঘোষ

তুমি যা ভাবছিলে
ঠিক তার উল্টোটাই একটা কাগজে
ছবি ক'রে আঁকছিলাম।
তুমি যা গাইছিলে
তার বিপরীতটাই
সুরের খাঁজে খন্দে মুক্তোর মতো বসাচ্ছিলাম।

আর হঠাৎ ই একটা পাজী নচ্ছার হাওয়া
কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসার মতো
আমার ছবি আঁকার কাগজ আর গানগুলোকে,
চিলের মতো ছোঁ মেরে উঠে গেল শূন্যে !

এখন উঠতে-বসতে কেবল তোমার ভাবনাগুলো
আমার হতবাক ঘরের ভেতর ডাকাত হ'য়ে ঢুকে
সবকিছু লণ্ডভণ্ড ক'রছে। আর
তোমার ভয়ঙ্কর গান, আমার শান্ত সুখী সময়গুলোকে
দু'হাতে লুফতে লুফতে ক্রমশ ঢুকে পড়ছে
এক নির্বিকল্প ঘটনাস্রোতের দিকে।

মেঘ ঘরে এলে/শিখা মল্লিক

গান করতে হবে টেনেটুনে আনমনে মেঘ ঘরে এলে
ঘনিষ্ঠ বাতাস এলে ফিরে চলে যাবে
চরলে চরবে চরে উপায়ান্ত নেই
শুধু দেখে নিতে হবে কি করে অসংলগ্ন হয়
সমস্ত রদ্দুর
সুর সুরাশ্রয়ী নূপুর ঃ
আর সিঁড়ি ধরে নেমে যায় ঘটনা পরম্পরায়
স্মৃতিছড়া সুখ
বাকি কিছু থাকে যদি সেকি আমরা নই
নয়নের নীলমণি মণিরা আজো রাতে জেগে ওঠে
জল নিয়ে বর্ষাজল মেঘ, জখমের কোন কোন স্থানে।
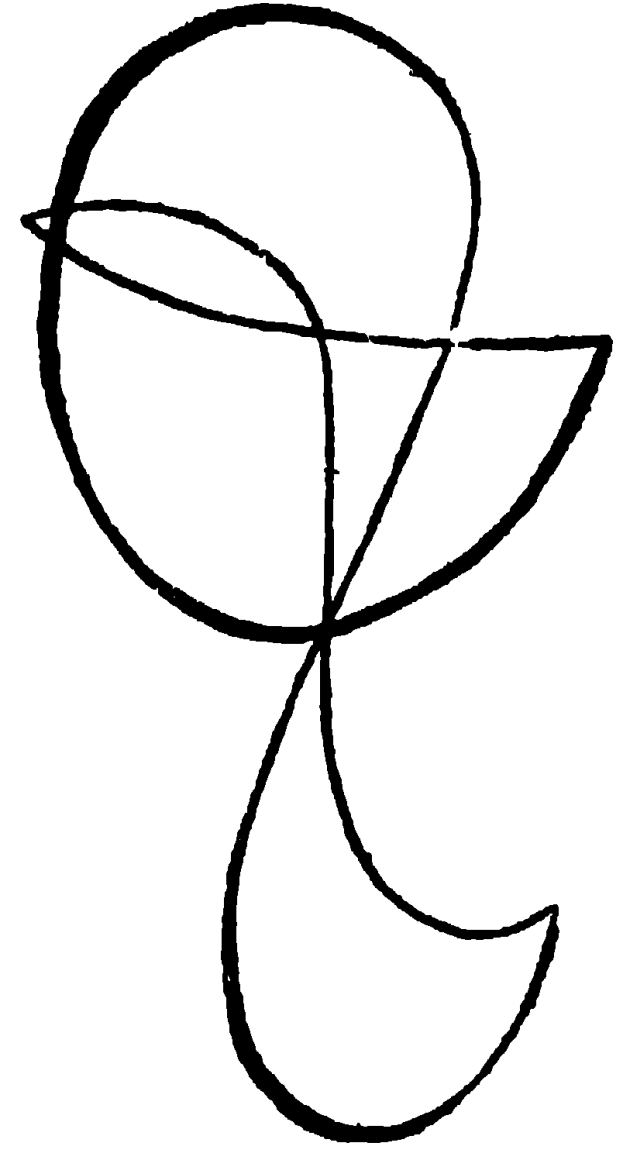
আদিত্য মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

১) মানুষ-ঈশ্বর

দু'চোখ বিস্তারে দেখা বাইরের ঘরব ড়ি সাজানো প্রত্যয়
অন্তরের প্রিয় কোণে প্রতিমা'র মেদমজ্জা নয় সেতো নয়,
যেখানে মানুষ শুধু মানুষের পরিচয়ে বানায়েছে ঘর
সেখানেই ভালোবেসে পাথর এসেছে উঠে ঈশ্বরের 'পর।

নতুবা ম ন্দর ঘরে দেবতা ছুঁয়েছে মাটি হয়েছে পাথব
ভক্তির-কুসুমে ফুটে গাছতলে মানুষের পাথরে ঈশ্বর,
আসলে মানুষ হয়ে মানুষেরই পুজো করা মানুষের ঘরে
হিংসাহীন-প্রেমময়-পরিশ্রমী-জ্যোতির্ময় মানুষ ঈশ্বরে।

২) প্রার্থনার গ্রাম

কাকে খোঁজে জানা নেই। খোঁজে দিনরাত।
লাঠিতে লণ্ঠন বেঁধে পথে পথে ঘোরে এক বুড়ো.
স্বদেশের বৃত্তে তার প্রার্থনার মতো
খোঁজে এক গ্রাম।

যেখানে দেশের-ই হাটে বিপন্ন মানুষ করে আত্মার নীলাম !!

শয়তান/নির্মল বসাক

সন্ধ্যা হলেই শয়তানটা আমার পিঠে সুরসুরি দেয়
আস্তে আস্তে হাত বাড়ায় সারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে
আমার নার্ভ নাড়ী স্নায়ু-পায়ু আমার সব অস্থি সন্ধি আর
রক্ত নিয়ে খেলে বড় উত্তেজক সে খেলা বড় ভয়ঙ্কর

ভোরে যখন আমি প্রায় নিস্তেজ হয়ে থাকি
সে আমার মুখে দ্রুত একটা মুখোস পরিয়ে
সপাটে চুমু খায় আর যেতে যেতে বলে
এবার তোমাকে কেউ আর চিনতে পারবে না
বুক ফুলিয়ে সারা শহরটা ঘুরে বেড়াও শয়তান

সুন্দর, তোমাকে ঘিরে/রাখাল বিশ্বাস

আমাকে অদ্ভুত ভাবে ঘিরে রাখে জ্যোৎস্না রাতের দীর্ঘ মায়া
বেদনার নীল ওষ্ঠ, তার সব কিছু
কাছে যাই, কতো কাছে যাবো, যাওয়া যায় ?
এক ঋতু, পাশে দেখি আরেক ঋতুর খেলা, ঠিক খেলা নয়
জানালার কাছে হাওয়া ওলোট পালোট করে রাখে
ওই পৃথিবী কি জানে কোনো কোনো মানুষের শূন্যে ভাঙা বুক
তোলপাড় করে দেয় আরেক শূন্যতা
আছি এখনো তো আছি, সুন্দর তোমাকে ঘিরে আছি
মাঝে মাঝে শুধু মাতাল বসন্তে কেঁপে ওঠে
এক পিপাসার্ত নদী, আর কেউ নয়।

ভ্রষ্ট তরবারি/তাপস চক্রবর্তী

নীল শরীর নেমে যাচ্ছে বিষতিক্ত জলের ভেতর
জলতল থেকে উঠে আসছে অশ্রুতস্বর,
আপাততঃ রক্তহিম, অবরুদ্ধ চিতা'গ্নি, তন্দ্রাভূক দিনরাত্রি।

নিরুপায় টেলিগ্রাম তবে কে শোনালো ?
নিঃশব্দ তার পদশব্দ, পীতবর্ণ জলস্তম্ভ, ক্ষুধার্ত হাঁমুখে
ক্ষয়া চটি। তুমি ভ্রষ্ট তরবারি হাতে ছুটে যাও…দূর
অভিলাষী।

দর্শনার শরীর ১৮/মঞ্জুভাষ মিত্র

আমার হৃদয়ের খাদ্য ! হে সুন্দর কুসুমিত বৃক্ষ তোমাকে বন্দনা করি। শাদা
শাদা ফুলগুলি কাল গোধূলিলগ্নের ঈষৎ আগে তুলিয়েছিল আমার নয়নের
সম্মুখভাগে শুদ্ধ আবেগের মত উষ্ণ ও অন্তর্লীন। সবুজ পাতার কোলে কোলে
সৌন্দর্যের প্রাচীন সমারোহ আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি তোমাকে অন্বেষণ
করছি যে হে পরমা পরিতৃপ্তি, বৈশাখের ভোরবেলার মত তুমি সুগন্ধবহ। পৃথিবীতে
তোমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য বলে জেনেছি। রাত্রিবেলা যখন একা থাকি
তখন মানুষের অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানের সন্ধানে নব নব দেশে অভিযানের
প্রাচীন ইতিহাসগুলি আমাকে অধিগত করে। আমি চোখের সামনে দেখতে
পাই পার্বত্যপথ দিয়ে অন্ধকার এবং তুষার অতিক্রম করে চলেছে অশ্ব
এবং উষ্ট্রপাল, রঙীন তাঁবুর ঝলকানি ও রমণীপুঞ্জ; অতঃপর দিনের শেষে ভাজা
শস্য, নম্র ফলের সুরা এবং কমনীয় অগ্নিপক্ক মাংসের বিলাস। বর্ণময়ী
উপত্যকার দিকে এক সুন্দর সোনালী যাত্রা পুরুষের সমস্ত হৃদয় নিবেদিত
এবং পান্না-মরকত-মুক্তা প্রভৃতির স্তূপ। অথবা নদীসেবিত সমভূমির বুকের
উপর দিয়ে পতঙ্গের মত মানুষের সার চলেছে; সময় নরনারীর চিত্ত
বিনোদন করবে ব'লে ফল-মাংস শস্য ঘৃত-দুগ্ধের ভাঁড়ার উন্মুক্ত করে। সবচেয়ে
প্রিয়চিত্র নীলসমুদ্রের ধারে প্রাচীনদিনের কাষ্ঠনির্মিত তরণীসমূহ স্বপ্নময়
পুরুষদের হাতে দাঁড়, তরুণীরা সঙ্গীতকারিণী ও ঈষৎ দ্বিধাগ্রস্ত; সুগন্ধ
বাতাসে মহানীলজল রঙীনপালসমূহ ফুলের মত নৃত্য করছে। হে
হৃদয় নব্য-মহাদেশে চলো; কবিতা ও সৌন্দর্যের বধূ, আমাকে অজ্ঞান।
দেশের পরিপক্ক ফলসমূহ প্রদান করো। স্পষ্ট অনুভব করছি আমি আমার
আবেগসমূহের দ্বারা মাতাল হয়েছি। কাল ম্যুজিয়মে গিয়ে একটি দুশ
বৎসর পূর্বে মৃত বনবিড়ালের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছিলাম
জীবনের পরম সৌন্দর্য। তার রোমের ভাঁজে ভাঁজে রক্ষিত ছিল বেঁচে
থাকার অসীম সুখের প্রবর্তনা। সারাদিন ধরে আমি আমার কাজটিকে
প্রার্থিত পূর্ণতা দিয়েছি এখন অত্যন্ত আনন্দ ভোগ করছি। যে কাজ বা
কাজগুলি প্রিয় একমাত্র সেইগুলি প্রাণমন ঢেলে করবো। অতীতের নদীজল
কাল পান করে দেখলাম তিতো, পর্যুসিত খাদ্যপানীয়ের মত তিতো। বর্তমানের
প্রতিটি বিন্দুই স্বাদু, আমি মধুর মত তিলে তিলে তাদের লেহন করছি;

প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে আজ আনন্দদায়ক অপূর্ব কিছু ঘটবে! আমার ভবিষ্যৎ যখন আসবে তখন আমি যেন প্রস্তুত থাকি। ঘুমিয়ে পড়বার আগে এক অপূর্ব সুন্দর রমণীকে সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি। তার বাহুডালের ফুলগুলি আমার অনুভূতির প্রত্যেক বাতাসে ঝরে পড়ে, সুগন্ধ ছড়ায়। তার নগ্ন দেহঢালের উপর দিয়ে প্রবাহিত নিম্নমুখী কালোচুলের রেশমকোমল জলস্রোত।

ভ্রান্তি/আবদুর রব খান

তুমি কাকে চাও ফিরে?
শৈশবে মায়ের মুখ
যৌবনে প্রিয়ার বুক
বার্ধক্যে সংসার-সুখ

দেখ, তারা সব নীলের বৃন্তে পাক খায়
শব্দহীন পৃথিবীর মত।

কেউ কারো কথা শুনে হবে নাকো স্থির
শুধুই বাড়বে বেগ তীব্র অশান্তির।

বল, তুমি কাকে চাও ফিরে?
নির্জলা মাঠের 'পরে বড় বোকা তুমি—
ফিরে কেউ পায় নাকো কিছু
জেনে রেখো মরীচিকা, কাছে গেলে ধুধু মরুভূমি।

ভাঁটার বিপরীত স্রোতে/দীপালি দে সরকার

লাবণ্যকে আমার চাইই চাই, ফাটা মাঠে
ছেঁড়া ব্রা, চিলতে রক্তাক্ত শাড়িতে লুণ্ঠিতা
অচৈতন্য দেহেও।

ক'টা পশু খুবলে নিয়েছে ওর রমনীয়তা

ভয়ঙ্কর স্থির ওর বাপমার চোখের নড়ন হৃদস্পন্দন!
বিখ্যাত বিশ্বাস বিশ্ব চরাচর পরিক্রমায়
কটা বাঁশ অটুট দাঁড়িয়ে দূরে—
অন্তহীন দিনের কীর্ত্তি প্রচারে ব্যস্ত কিছু কাক
পাখিরা ভিন্‌দেশমুখী. পাখিরে,
একবার তোর ডানা এদিকে ফেরা
তোর ডানার ফ্রেম নিয়ে পরুষ হাত দু'টো
পুরুষ করে তুলি
রক্তাক্ত লাবণ্যকে বুকে করে উঠে দাঁড়াই
ভাঁটার বিপরীত স্রোতে॥
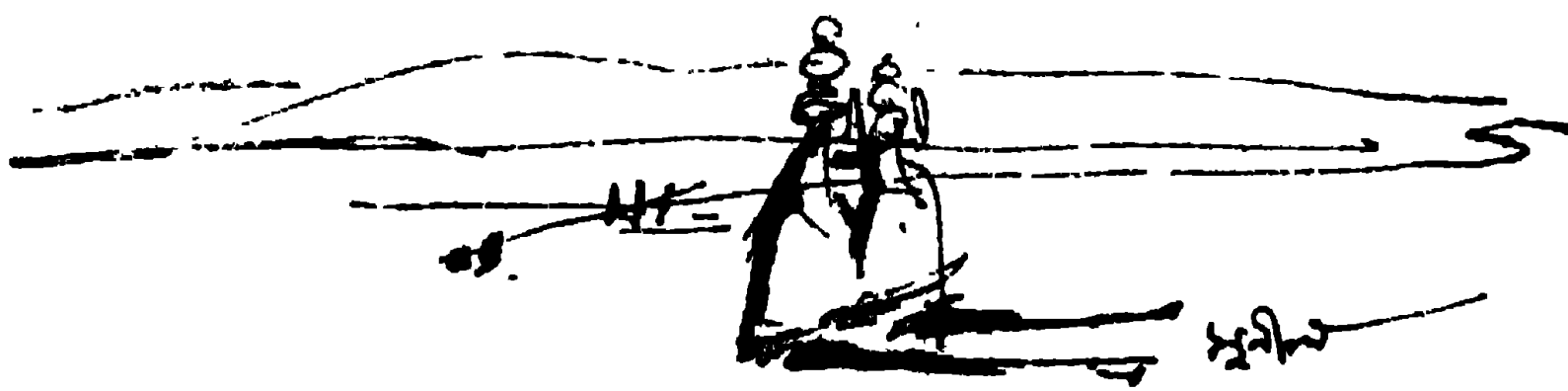
পরিমল চক্রবর্ত্তীর ॥ কবিতা কণিকা ॥

১) দহন

সারাজীবন তোমার প্রাণে আগুন,
সারাজীবন আমার প্রাণে আগুন,
ধূপের মতো জ্বলছি যেন দু'জনায়।

ধূপের মতোই জ্বলতে হবে দু'জনায়।

২) আয়না

সমস্তরাত তোমার চোখে আয়না,
সমস্তদিন আমার চোখে আয়না,
সমস্তক্ষণ দু'য়েরই চোখে আয়না।

হঠাৎ আহা, করুণ স্মৃতি তীব্র হ'য়ে আয়না ভাঙে কেন?

৩) দ্বৈত

সারাটিদিন স্মৃতির কানে কথা বলা,
সারাটিদিন স্মৃতির বুকে কথা শোনা,
দিনে ও রাতে স্মৃতিকে নিয়ে স্বপ্ন বোনা।

জীবন যেন দ্বৈত স্মৃতির নরম মাটি মাড়িয়ে চলা।

৪) পুরোনো

আকাশ বাতাস নদী,
পৃথিবীর আবর্তন,
সুখ-দুঃখ-ঘৃণা-প্রেম,
সবই পুরোনো—
বহু লক্ষ বছরের পুরোনো।

আবার এরাই কিন্তু নতুন, চিরনতুন।

তাই আজ মাঝে-মাঝে মনে হয়ঃ
পরিচিত পৃথিবীতে
পুরোনো ব'লে কিছু নেই ;
না, পুরোনো ব'লে কিছুই হয় না ॥
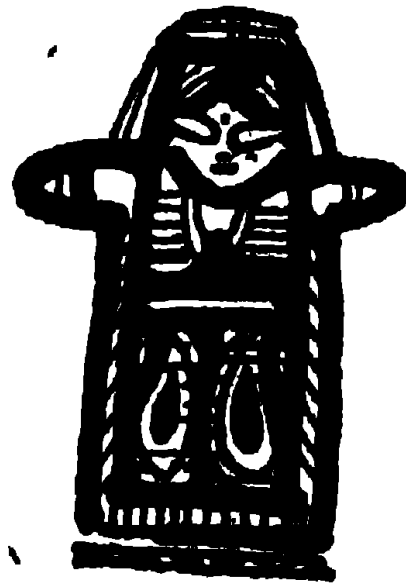
রেখো কয়েকটি রক্তকরবী/অজিত বাইরী

রেখো কয়েকটি রক্ত করবী
সেই মানুষটির সমাধি 'পরে।
ঘরে তার ছিলো না শান্তি, সুখ ছিলো না হৃদয়ে।
সারাজীবন যন্ত্রণার আগুনে জ্বলেও
ছিলো সে সুন্দরের কাঙাল ;
বুভুক্ষু দু চোখে নিসর্গকে গিলতো।
মানুষের প্রতি হারায়নি আস্থা,
ভালোবাসায় থেকেছে বিশ্বাসী।
তবু নির্বোধ অপবাদে
কপালে তার জুটেছে নিন্দা। দুর্বল-চিত্ত
ব'লে লোকে দিয়েছে গঞ্জনা।
কেউ ভেবেছে উন্মাদ, কেউ ভেবেছে মাতাল।

বলা বাহুল্য লোকটা ছিলো কবি।
লোকটা ছিলো সহৃদয়, সরল, বিশ্বাসী।
এখন সব বিতর্কের ঊর্দ্ধে।

রেখো কয়েকটি রক্তকরবী
সেই কবির সমাধি 'পরে ॥

( ) ( ) ( )

ডাক নাও/শেখ মহরম আলি

তোমার কাছেই এলাম আমি
সরল বৃক্ষ তুমি নও, জানি—
বাতাস তোমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

তোমার ছায়ায় বিশ্রাম চাই
সবুজ মায়ার অরূপ আঁচলে রৌদ্র
সেই তো গলে গলে যায়।

আমাকে ধুয়ে-মুছে কাছে ডেকে নাও।

প্রিয় সংকটের সামনে/মহম্মদ মতিউল্লাহ

আমারও ঘর আছে সংসার মধ্যবিত্ত স্ত্রীর মানঅভিমান রক্ষার আন্তরিক প্রচেষ্টা আছে
রৌদ্রের ভেতরে দুঃখিত প্রতিলিপি থাক কবিতা শব্দ আমাকে মুক্তি দে ! স্বেচ্ছায়
অনাহার মানবেনা আমারও সন্তান অপুষ্ট হাতদু'টো সম্পদ রেখে
আমার প্রিয় নারীর সহবাসে থুতু দেবে বছর পনেরো পর। কবিতা নিরপরাধ
নয়।

গভীর শরীরের স্বাদ নিঙড়ানো বাজারী মেয়ে আমাকে মুক্তি দে আলিঙ্গন থেকে
সাপিণী পাঁজরের প্রতিকুণ্ডলী খুলে শ্বাসবায়ু টেনে ফিরে যাব আপন সংসারে।
বৃষ্টির মত অভাবী মানুষেরা স্বাচ্ছন্দ্য ছারের রক্ত খাওয়ার মত
আনন্দে থাকে আনন্দে থাকি অবসর সময়ের পাশাপাশি
গেলে।
সর্বনাশী মোহিনী তোর আব্রু নে।

মদ্যপেরও সংসার আছে। মাস গেলে উপরি ইনকামের পথ খোঁজা আছে।
ফ্লাটের অবস্থার উন্নতি হবে না তোর শরীর বন্ধক রেখে। অভাবী আবহাওয়ায়
বেড়ে ওঠা অক্ষম মানুষ আমাকে মুক্তি দে জাঁহাবাজ মেয়ে
মাতালেরও বৌ আছে ঘরে। সুস্থির ভদ্র। আত্মমর্যাদার মুখোমুখি রাত্রি আছে
গভীর নিকশ।

কালবৈশাখী/চন্দ্রশেখর ঘোষ

অনন্ত নীল চোখে কাজল দিয়েছো ঘন
গভীর নিকষ ভ্রূ, জমেছে আদিম ক্ষোভ
হয়তো দোষ ছিল, গুণও কি ছিলনা একটুকু
অমৃতের অভিমান না যদি পারো দিতে
ফিরিয়ে নাও ক্ষোভ

কেন দাও উলোট পালোট করে
গৃহস্থের সাজানো উঠোন !

বন্ধন ঃ জোছনা ও শূন্যতা/চিত্তরঞ্জন হীরা

এভাবে বন্ধনে রেখ না আমায় মেঘময়ী জোছনায়,
তোমার গোপন শব্দের ভেতর দেখ সন্ধ্যা-সকাল
উচ্চারিত হয় পরবাসী পাখীদের সরল সঙ্গীত।
তোমার গভীরে আছে আরেক তুমি
সারাক্ষণ বাজায় রোদ্দুর সুর উত্তাল নৃত্যশীল তালে।
বড় সাধ হয় তার সাথে ঘর করি কিছুকাল।

একদিন পাহাড়ে গিয়েছিল মন অজানা সন্ধানে,
উচ্চাঙ্গ শিখর বুঝি ছুঁয়ে আছে আকাশের কায়া,
কথা দিয়েছিল নাকি নীলিমার চোখের তারা—
সব ক'টি অস্বচ্ছ কথার মানে বলে দিয়ে যাবে একদিন,
প্রাণোৎসবে মেখে নিয়ে যাবে প্রত্যাশার সবুজ আবীর।

ভ্রমণের শেষ কাল এসে গেলে নিভে গেছে মৃগাঙ্ক শেখর
পাহাড়ের উচ্চাঙ্গ শিখরে মন পায়নি দিগন্তের অসীম আঁচল।
পথ ভোলা নিগূঢ় সঙ্গমে শরীরে ধরেছে ঘুনপোকা।

এভাবে চতুর্পল বেধ না শূন্যতায়,
আমার ভাষায় ভাষায় তোমার আকাঙ্খাতি শব্দরা ঘোরে ঘোরে,
তোমার ইন্দ্রনীল সমুদ্র নিয়ে এস আমার কবিতার অন্তরে,
শূন্যতার পাকস্থলী ছিঁড়ে ভরে আন বিশ্বাসের আলাপন।
আমি অনুর্বর প্রেমের মাটিতে ফোঁটাব আকাশী রঙ্গন,
আমার সকল তন্ত্রী জুড়ে দোল খাবে ফাল্গুন বারোমাস।
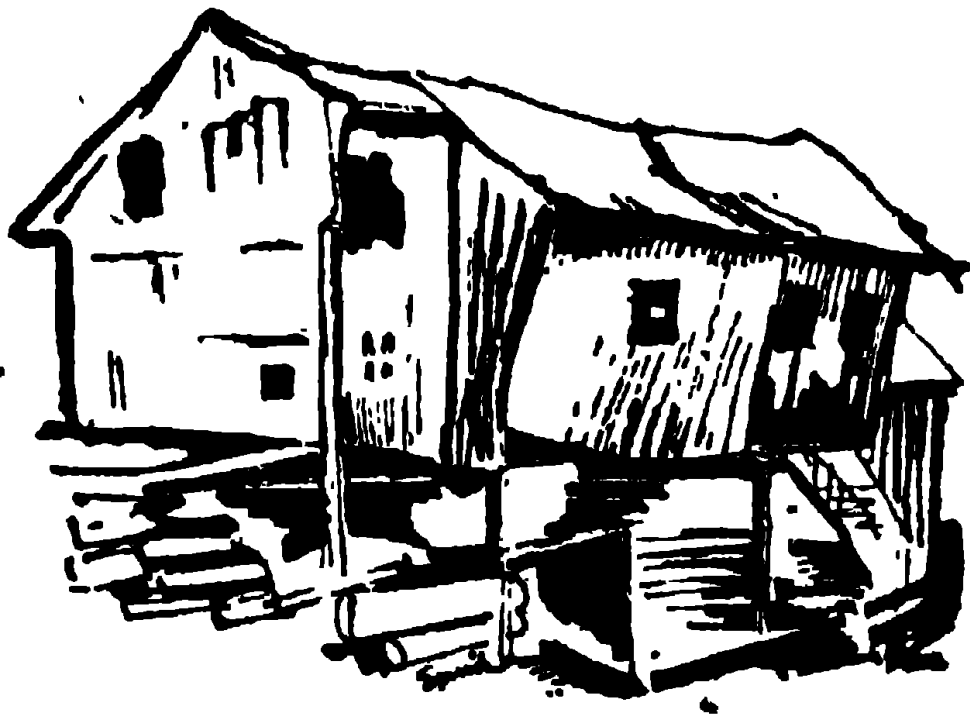
আজও রক্তক্ষরণ কৃষ্ণসাধন নন্দী

আজও রক্তক্ষরণ হয় দেখি
সেই সূক্ষ্ম সূচে ফোটা শরীর ছুঁইয়ে।
টান মেরে ফেলে দেবো ঐ
যেমন তুমি দিয়েছো এককথায়
আংশিক নয়, সম্পূর্ণ।

মানায় না সত্যি আর
অনেকদিন হ'ল।

ভয় পাই নাড়াচাড়ায়
প্রদাহ শুরু হয় কোষের ভিতরে
হাঁটু মুড়ে বলি
আর কেন—
এবার ভুলতে দাও

আমাদের মা/মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

রান্নাঘর থেকে শোবার ঘরের দূরত্ব হিসেব করতে করতে
চৌহদ্দির বাইরে যে পৃথিবীটা
আমাদের মা তাকে দেখতেই পেলো না।

প্রতিদিন সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে
মায়ের আঁচলে দুঃখ উড়ে
আগুনের আঁচে ঝলসে যায় শরীর।

একথালা ভাতের সঙ্গে আমরা মাংস পোড়ার গন্ধ পাই।

আমাদের মা পুড়তে পুড়তে প্রতিদিন
আমাদের জন্যে রান্নাঘর সাজায়
শোবার ঘরে অন্ধকারে আমাদের মুখে
বিশাল পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে দেখে ঘুমায়
প্রতিদিন আমরা আমাদের ঘুমন্ত মায়ের চোখে
দেবদূত হয়ে যাই।

মায়ের মাংস পোড়ার গন্ধে বাতাস ভরে যায়
ভারতবর্ষের মানচিত্রের মতো আমাদের সামনে
আমাদের মা দাঁড়িয়ে থাকে

আমাদের রক্ত ক্ষরণের মধ্যে নীরব ধৃষ্টতা বুক কাঁপায়।

যেদিকেই যাই/গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃষ্টি থেমে গেলে রোদ্দুরের অভিমান
লেগে থাকে মুখে
পাতায় পাতায় কার দীর্ঘশ্বাস
যেদিকেই যাই কাউকে বলেও যাবো না
সামান্য দেওয়ার ছিলো তবু যেতে হয়
হয়তো চোরাপথে আছে কোন ঘর
স্তম্ভিত কৌতূকে ফেরাও হবে না কোনদিন

অনেক মুহূর্ত কাছে আসে
চারিদিকে উদ্ভিদের নিবিড় সমতল
বিষাদের কোন সর্ত্ত নেই আজ
যেদিকেই যাই কাউকে বলেও যাবো না।
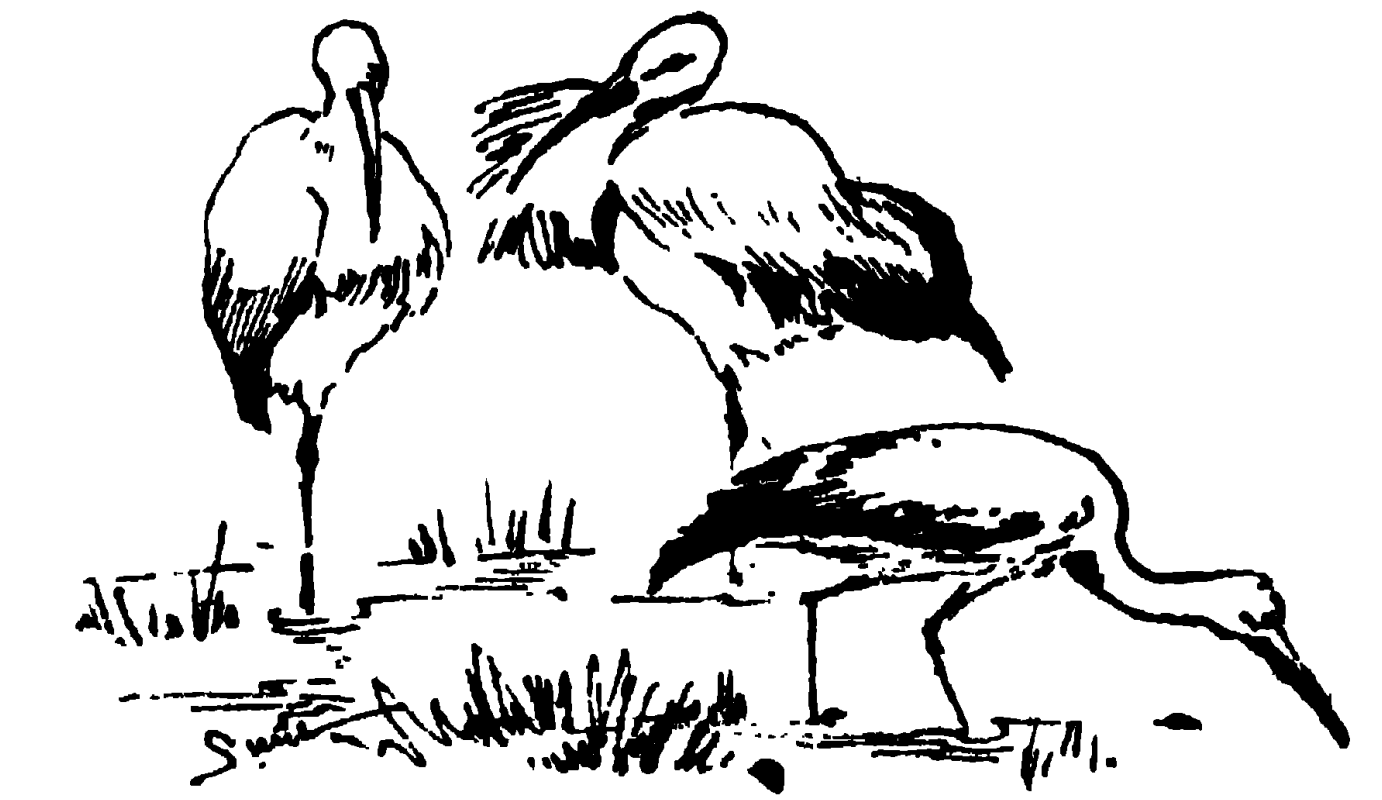
ভুল ঠিকানার চিঠি/অমলেন্দু দত্ত

এত আড়াল গড়ে' কোন্ পণ্যের মহার্ঘ বেসাতি সাজাও
কে নেবে? কার অনুপুঙ্খ প্রয়োজন
সিদ্ধ হবে ভাবো··· ?
এই সব জলরঙ ছবি নিভৃতে আঁকার এত সযত্ন আয়াস
কে তুলে রাখবে মনের নিদাগ দেয়ালে!

অনুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও যে-সঠিক মনের ঠিকানায়
চিঠির হয়না বিলি.
খেয়ালি পিওন এসে ঘুরপথে চলে যায়
অনুপম জনারণ্য ছেড়ে
দুরূহ সীমার দিকে···অন্ধকারে
অস্তিত্বের ক্ষীণ রেখা ধরে'
প্রতিবার ভুল খেয়া ঘাটে···বেনামী বন্দরে!

আশ্চর্য সোহাগ কিছু ছিল নাকি মিলে মিশে
আলোতে আঁধারে?
হয়তো বা ছিল কিংবা ছিলনা কিছুই
সাদামাটা কথা আর হিজিবিজি মেয়েলি আঁচড়—
কি করে জানবো তাকে সে চিঠি হয়নি বিলি;
দিশারী পথিক কেউ ছিলনা পথের বাঁকে
প্রিয় কোনো বৃক্ষের ছায়ায়··· !

এমন নিরেট আড়াল রেখে শূন্যতার অহংকারে
জলরঙ নিঃস্ব ছবি আঁকো···কে নেবে,
কার অনুরক্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হবে ভাবো··· ?

মনের ঠিকানা সে কি সকলেই জানে!

কেউ বলেনি/নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ঘুম শিয়রে বৃষ্টি নিয়ে ফেরার সময় যখন এল
আমায় ডেকে কেউ বলে নি, আবার এসো পূর্ণপ্রাণে
মধ্যদিনের শ্রাবণ শিখে বালক থেকে যুবক হলাম
সন্ধানী শৈশবের ভূমি হারিয়ে গেল হৃদয়পুরে

শূন্য শাখা লজ্জা ভুলুক শ্রাবণঘন গহন স্নানে
রাত্রিকাতর পরিত্রাণে আমার সাথী পাগল রাজা
আমায় ছুঁয়ে কেউ বলেনি, আমি তোমার জন্য বাঁচি
পঁচিশ টাকায় বিকোয় আমার পুনর্জন্ম, মহাশ্বেতা

অতিথিকে ডাকবে যখন, ডেকো সহজ সগৌরবে
ভিখিরি মন ফিরবে যখন মুকুটহারা রাজ্যপাটে
বাজবে ইমন রঙিন আলোর আশীর্বাদে. আঁধারবতী
মরণ বাসর সাজিয়ে ডেকে বলবে, শোনো,
এই তো শুরু
মধ্যদিনে শ্রাবণ, যখন বালক থেকে যুবক হলাম
হাতটি ধরে কেউ বলেনি, তোমার হাতে
আমারই ত্রাণ

করবী ও ঘোড়সওয়ার/জহরলাল বেরা

পৈতৃক বাস্তুভিটেয় এখন
রক্ত করবী ফোটে
আপনার ঋজু পল্লবের খেয়া ডুবে
আমাদের প্লাবিত মোহনার একাকী লোনা চরে।

অশিক্ষায় অমার্জিত
দরিদ্র ছায়াটি এখন
পৈতৃক বাস্তুভিটেয়
খোলস ছাড়তে চায়।

আমার সর্পকুলেরা নাও
আমার করবীর প্রশাখা
শেকড়ের তুক-তাক সৌরভ
জাহাজ মাস্তুলে ওড়াও করবীর নীল শাড়ি।

O O O O

যাদুকাঠির স্পর্শে/দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

চমক লাগে যখন শুনতে পাই
চিরাচরিত পরিচিত কণ্ঠস্বর
মৃদুশাসিত স্নিগ্ধ কর্কশ।
যাদুকাঠিতে যে রহস্য ও আকর্ষণ যুগপৎ
মনকে সম্মোহিত করবার স্পর্দ্ধা রাখে
হুবহু সে রকম।
কি বলতে চায় মাটি, জল, বাতাস
বা পৃথিবীর রকম সকম
কি বলতে চায় ঐ কণ্ঠস্বর ?
স্পষ্ট শুনি, বলছে : এ জীবনটা সংক্ষিপ্ত
কে বা কার ?
মানুষ ভাবে এক, ঈশ্বর করেন আর এক।
যাদুকাঠির স্পর্শে তাই জেগেছে
এতকালের জীবনে
একটি সকাল।

পরিবেশ ভেঙেছ তুমি/শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়

সবুজ গাছের নীচে
ভয় আসে
কোন এক শীতের সাঁঝে
হঠাৎ ঝড়ের মতো এসে
গতবার তুফান ছোটালে
বাগিচার ফুলফল
সমস্ত সম্ভাবনা ভেঙে নিয়ে গেলে
যতোটা সরল ভাবে বীজ বুনি
তার চেয়ে ঢের বেশী
পরিবেশ ভেঙেছ তুমি
একদিন শীতের সকালে এসে বলেছিলে
একদিন আশা ছিলো প্রেম ছিলো
আর ছিলো বিরাট আকাশ
এবার যখন এলে শীতের সাঁঝে
জলকে বিষালে তুমি
বায়ুতে বিষাদ ছড়ালে
সোম বছর খাদ্য নেই জল নেই মানুষের ঘরে
আমি জানি সেই মন সেই গর্জন
যতোটা সরল মনে বীজ বুনি
তার চেয়ে ঢের বেশী নির্জন
পরিবেশ ভেঙে গেছো তুমি

কবিতার রাজকীয় সিংহাসনে/দেবী রায়

"It seems that every tree is temple."

Faiz Ahmed Faiz.

রাত্রি যে খুব একটা গভীর—ঠিক তা নয়
দু'হাত কাটা-কবন্ধ রুখুসুখু
গেটের মুখে বয়সী ঐ আমগাছে
কেন যে
নিত্য-ই এসে বসেন লক্ষ্মীর বাহন !
যার মন ভারি তার চলন-ও ভারি কে যে কাকে এসব-ও শোনায়,
সাত কাহন !

এক দুবার ডানার সকাতর ঝপপটানি
বার কয়েক ঘাড় ফিরিয়ে
প্রাণান্তকর কাকে ডাকাডাকি ? কার ফোঁপানি ?
—কে এই অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে পথ !

প্রকৃতি ছড়িয়ে রেখেছে সূক্ষ্মভাবে এক নিবিড় সম্মোহিনী জাল !
তীক্ষ্ণ চোখে যদি একটু দেখি, তা ধরা-ও পড়ে ..
ঠিক এসময় রাস্তায় নিশ্চুপ ধুলোয় ফেনিল ধোঁয়ার আস্তরণ
বাতাসে বাতাস ঘন হতে থাকে

আমি, ওঁকে কবিতার রাজকীয় সিংহাসনে
এনে বসাতে চাই

আর ঠিক তক্ষুনি অলপ্পেয়ে--এক চোখো বিধ্বংসী ঝড় ওঠে,
সাঁই সাঁই !
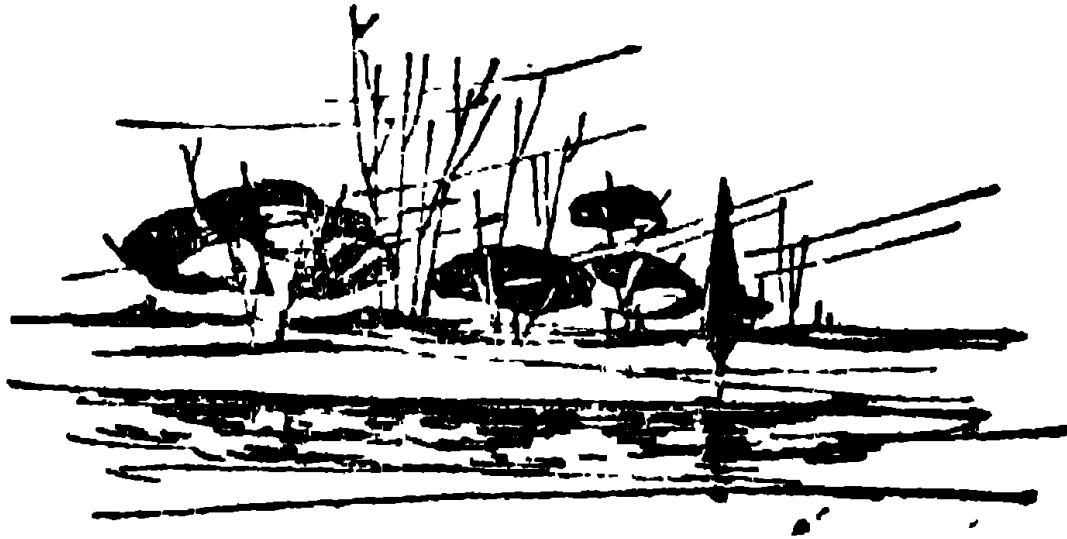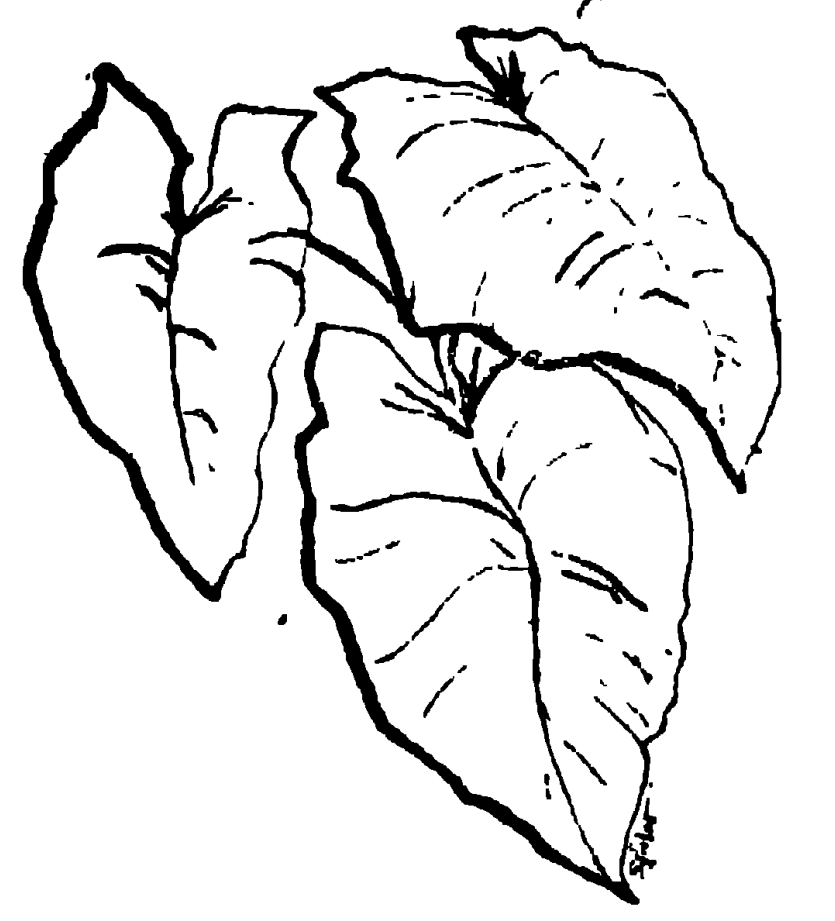
কবি আমার/রীণা চট্টোপাধ্যায়

আমার আঠাশ বসন্তের
একতারায় তোমারই সুর বাজে

উচ্ছলতায় কাটিয়ে সময়
বেলা গেলে তোমার ছায়ায়
বসে বসে তোমার জানার
চেষ্টা শুধু—
কবি আমার।

তোমার জানার চেষ্টা নিয়ে
তোমার প্রিয় ছাতিমতলায়
একা একা
বিজন দুপুর কাটিয়ে শেষে
ভুবন ভাঙার মাঠ পেরিয়ে
নদীর ধারে শ্মশান ঘাটে

কবি আমার
তুমি আছো অনন্ত নীল
আকাশ জুড়ে।
দুরন্ত এই ঝড়ো হাওয়ার
কবি আমার। কবি আমার।

মিথ, মূর্তি ও ইতিহাস

নিরঞ্জনপ্রসাদ চৌধুরী

(অর্দ্ধনারীশ্বর)

ফেমিনিনিস্টস্ মুভমেন্টের চাপে পড়ে পশ্চিমে চার্চের নেতাদের একটি প্রশ্নের জবাব নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। প্রশ্নটি হচ্ছে : ঈশ্বরের লিঙ্গ কি? তিনি কি পুরুষ না নারী? পৃথিবীতে প্রধান ধর্মমত বলতে গেলে চারটি—হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ও ইসলাম। এদের মধ্যে ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কোরাণে ঈশ্বরকে পুরুষরূপে বর্ণনা করেছেন। খ্রীস্টানদের বাই-বেলেও তাই। বুদ্ধের ঈশ্বর কল্পনা সদাচার—Moral or ethics ভিত্তিক হওয়ায়। তাঁর কাছে এই প্রশ্ন অবান্তর।

১৯৮৫ সালের ২০শে এপ্রিল, গ্রীনিচমান সময় ০৪৫৫-এ বি-বি-সি-র 'রিফ্লেকশন' প্রোগ্রামে এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে এক পাদরি সাহেব বেশ হিমশিম খেয়েছেন। বাইবেলকে সামনে রেখে এই প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে পাদরি সাহেবকে হিমশিম খেতেই হবে। কারণ বাইবেলে God এর সর্বনাম He. ঈশ্বরের এই সর্বনাম ফেমিনিনিস্টস মুভমেন্টের সদস্যদের মনঃপুত নয়। নারী আন্দোলনের ঢেউ এখনও মুসলমান সমাজে গিয়ে পৌঁছয়নি। কাজেই মোল্লাদের এখনও এই প্রশ্নের মোকা-বিলা করতে হচ্ছেনা।

এই প্রশ্নের হিন্দুর জবাবটা কি। উপনিষদের ঈশ্বর কল্পনা 'তত্ত্ব মাত্র' ঈশ্বর কোন ব্যক্তি-বিশেষ নন। আজ আমরা হিন্দু ধর্মকে যেরূপে পাই তা হচ্ছে পৌরাণিক যুগের ধর্ম এখানে হিন্দুরা মানুষের আদলে গড়ে-ছেন তাঁদের দেবতাকে। সেই আদল নারীপুরুষের যুগলমূর্তি—রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম, গৌরীশঙ্কর, লক্ষ্মীনারায়ণ ইত্যাদি। আর এই ভাবনার এ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্পরূপ হচ্ছে 'অর্দ্ধনারীশ্বর' মূর্তি। ঈশ্বর পুরুষও, ঈশ্বর নারীও। তিনি পিতাও, তিনি মাতাও।

হিন্দুর ঈশ্বরের এই রূপ কল্পনা কোন নারী আন্দোলনের ফলশ্রুতি নয়, ধর্ম সাধনারই অভিব্যক্তি।

(হরিহর)

নিবিড় বন্ধুত্বকে আমরা 'হরিহর' আত্মতাও বলি। 'হরিহর' মূর্তির একাংশ 'হরি', অপরাংশ 'হর'। হরি ও হর এই শব্দ দুটির উৎপত্তি সংস্কৃত 'হৃ' ধাতু থেকে, যার অর্থ হরণ করা। যিনি অনুগত ভক্তের দুঃখ-দৈন্য ও পাপ হরণ করেন তিনিই হরি, তিনিই হর। হরি আবার বিষ্ণু-কৃষ্ণের এবং হর শিব-মহেশ্বর এর প্রতিশব্দও। বিষ্ণুর ভক্তরা বৈষ্ণব, শিবের ভক্তরা শৈব নামে পরিচিত। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে জানা যায় সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংস হয়েছিল খ্রীঃ পূঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এই সময়টা আর্যদের ভারত অভিযানের সময়ও। এইখান থেকে ভারত-ইতিহাসকে দুভাগে চিহ্নিত করা হয়—আর্য ও প্রাগার্য ভারত। শিব অনার্যদেবতা। বিষ্ণু আর্যদেবতা। পৌরাণিক যুগে (খ্রীঃ পূঃ ৬০০) এই দুই দেবতার ভক্তদের—শৈব ও বৈষ্ণবদের-মধ্যে ধর্ম ও সমাজ বিরোধের অবসান হয়। সেই সমঝোতারই শিল্পরূপ হচ্ছে 'হরিহর' মূর্তি। আজ হিন্দুর ঘরে ঘরে শিব ও বিষ্ণুমূর্তি পাশাপাশি বিরাজ করে, দুই দেবতা একই ভক্তের পুজো নেন। ইতিহাসের গোড়ায় এমন ছিলনা। আজ আমরা শৈব-বৈষ্ণবের বিরোধের কথা শুধু ভুলি নাই নয়, জানিও না যে কখনও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ছিল। এটা হিন্দুর ধর্ম-সাধনার একটা বড় দান। সেই ধর্ম-সাধনা আজও চলছে নীরবে। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তির পশ্চাদ চিত্রপটে বুদ্ধ, নানক, চাঁদ-তারা ও ক্রস ভারতের প্রধান চার ধর্ম-সম্প্রদায়ের উপাসনার প্রতীক। এমনি করে একদিন অমর-আকবর-এন্টনিও মিলে মিশে যাবে। হিন্দুর ধর্ম-সাধনার বৈশিষ্ট্য অনুকরণ নয়, সাঙ্গীকরণ, ইতিহাসের এই প্রক্রিয়া মন্থর হলেও স্থায়ী ফলপ্রসূ হয়। রাজনৈতিক জোড়াতালির চেয়ে আরও গভীরে ঘটে সংস্কৃতির এই মিলন।

(কালীমূর্তি)

শিবের বুকে দাঁড়িয়ে আছেন কালী, শান্ত সমাহিত শিব। রণচণ্ডী কালী। কী এই কালীমূর্তির তাৎপর্য ? এর ব্যাখ্যায় পপুলার মেয়েলি গল্পটা হচ্ছে : শিবের বউ কালী, উগ্রচণ্ডী কালী স্বামীর বুকে পা পড়তেই সম্বিৎ ফিরে পেয়েছেন। তাই লজ্জায় জিভে কামড় দিয়ে আছেন। এই গল্পের মধ্যে আমরা জানতে পারি কিছু সামাজিক রীতিনীতির কথা। বস্তুতঃ মূর্তিটি হচ্ছে symbolic art—এক গভীর দার্শনিক তত্ত্বের শিল্পরূপ।

বেদান্ত নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের কথা বলেন। ইহা একটি তত্ত্বমাত্র। আর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, জীব-জগৎ—এ-সব হচ্ছে শক্তির খেলা। বিচার করতে গেলে এসব স্বপ্নবৎ। ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু। শক্তিও স্বপ্নবৎ, অবস্তু।

তন্ত্র বেদান্তের এই মতের সঙ্গে একমত নন। তন্ত্র শক্তিকে মিথ্যা বলেন না। ব্রহ্ম যেমন সত্য, শক্তি ও তেমনি সত্য। এই তত্ত্ব—দুই রূপে অভিব্যক্ত। বেদান্ত বলেন—দু-ই সত্য হলে দ্বৈতাপত্তির কারণ হয়। তন্ত্র বলেন—দ্বৈতাপত্তি হয় না। কারণ, ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন-একই তত্ত্ব। শুধু সেই ব্রহ্মাভিন্ন ব্রহ্মশক্তি কখনও সক্রিয়, কখনও নিষ্ক্রিয়। 'কখনও' বলতে এখানে সময়ের কথা নয়। 'কোন অবস্থায়'—এই বুঝতে হবে। এই অবস্থার একটি সুন্দর উদাহরণ হচ্ছে—জল, বরফ ও বাষ্প—একই বস্তুর তিন অবস্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—"নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্যকে ভাবা যায় না।" লীলা মানে পরিবর্তন। পরিবর্তন বললে তার পিছনে একটি

অপরিবর্তিত সত্তার কথা ভাবতে হয়, যার অপেক্ষায় এই পরিবর্তন ঘটে।

এই জটিল দার্শনিক তত্ত্ব-পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব-এর শিল্পরূপ হচ্ছে কালীমূর্তি। শিব নিত্য পুরুষ—ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয় অবস্থা। কালী লীলা প্রকৃতি—ব্রহ্মের সক্রিয় অবস্থা। মিথ্ ও মূর্তির সাহায্যে এই দার্শনিক তত্ত্বকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার চেষ্টাই হচ্ছে—কালীমূর্তি।

(কালীকৃষ্ণ)

বৈষ্ণব সাহিত্যে আছে কৃষ্ণ কালী হয়েছিলেন। তারই শিল্পরূপ আমরা দেখি 'কালীকৃষ্ণ' মূর্তিতে। 'হরিহর' মূর্তিতে যেমন ঘটেছে শৈব ও বৈষ্ণবের Co-existence, কালীকৃষ্ণ মূর্তিতে তেমনি হয়েছে হিন্দু সমাজের আর দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতা। এর পিছনের পপুলার গল্পটি হচ্ছে: কৃষ্ণের বাঁশী শুনে জল আনবার ছলনা করে রাধা বেরোয় অভিসারে। জটিলা ও কুটিলা, রাধার শাশুড়ী ও ননদ, রাধার এই ছলনা বুঝতে পারে। তারা একদিন রাধার স্বামী আয়ান ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয় পুকুর-ঘাটে রাধার এই সমাজ বিরোধী কাজ হাতেনাতে ধরে দেওয়ার জন্য। কিন্তু গিয়ে দেখে কোথায় কৃষ্ণ? রাধার এই সমাজ বিরোধী কাজ হাতেনাতে ধরে দেওয়ার জন্য। কিন্তু গিয়ে দেখে কোথায় কৃষ্ণ? রাধার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কালী, কৃষ্ণ অদৃশ্য! গল্পটির তাৎপর্য হচ্ছে; যিনি কৃষ্ণ তিনিই কালী। আর এই সত্যেরই শিল্পরূপ হচ্ছে 'কালীকৃষ্ণ' মূর্তি। অন্যদিকে কালীকে শিবের ভার্যা কল্পনা করে বোঝা-পড়ার সেতুবন্ধন হয়েছে শৈব ও শাক্তের মধ্যেও। এমনিভাবে মিথ্ ও মূর্তির মাঝে লুকিয়ে আছে ভারতের ইতিহাস। "রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে, ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত এসেছিল যারা সবে" মিথ্-এর মাকড়শার জালে আবদ্ধ হয়ে তারা একাত্ম হয়ে গেছে।

(দুর্গাপ্রতিমা)

হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা। যত মানুষ তত দেবতা। ভারতের এক এক প্রান্তে এক এক দেবতার প্রাধান্য। হিন্দিভাষী উত্তর ও মধ্যভারতে রাম, মহারাষ্ট্র-কর্ণাটক ও পশ্চিম উপকূলে গণেশ, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ু প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতে বিষ্ণু, হিমালয়ের কোলে শিব, পূর্বভারতে শক্তি বা দুর্গা প্রধান দেবতা। এর কারণও ঐতিহাসিক। এক এক জনগোষ্ঠির এক এক দেবতা। মিথ্ এর ইন্দ্রজালে জড়িয়ে পড়ে এই সব দেবতারা একসময় একাকার হয়ে গেছে। কোন জনগোষ্ঠির কোন দেবতা এখন আর বোঝা ভার। এক দেবতার পাশে স্থান হয়েছে আর এক দেবতার। কোথাও কোথাও একদেবতা আর এক দেবতার নাম গ্রহণ করেছেন। যেমন অন্ধ্রে বিষ্ণু হয়েছেন ভেঙ্কটেশ্বর, তামিলনাড়ুতে শ্রীনিবাসন উড়িষ্যায় জগন্নাথ।

ইতিহাসের আদিকালে বাংলার সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। মা ছিলেন বাঙালী পরিবারের কেন্দ্র-বিন্দু। বাংলার এই মাতৃতান্ত্রিক পরিবার পিতৃতান্ত্রিক হয়েছে পরবর্তীকালে আর্যপ্রভাবে। বাঙালীর অবচেতন মনে আজও সেই আদি সমাজের প্রভাব ক্রিয়াশীল। আজও বাঙালী বাবার আজ্ঞা পালন করে, মার কথা শোনে। কথায় বলে,—"যেখানে বাঙালী, সেখানে মা কালী, সেখানে পাঁঠা বলি, সেখানে দলাদলি;" এই প্রবচনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে বাংলার আদি দেবতাকে। সেই দেবতা মা কালী। আর্যীকরণে সেই কালী হয়েছেন দুর্গা। সেই দুর্গা শক্তিভূতা সনাতনী, মহিষাসুরমর্দিনী। এই নামের মধ্যেও লুকিয়ে আছে বাঙালীর ইতিহাস।

বায়ু ও মৎস্য পুরাণে একটি অর্থবহ গল্প আছে। এই গল্পে অসুর রাজ বলির স্ত্রীর গর্ভে বৃদ্ধ অন্ধঋষি দীর্ঘতমসের পাঁচটি পুত্র হয়। এই পাঁচ পুত্রের নাম— অঙ্গ (উত্তর বিহার), বঙ্গ (পুর্ববঙ্গ), কলিঙ্গ (উড়িষ্যা), পুন্ড্র (উত্তর বঙ্গ) এবং সুহ্ম (দক্ষিণ রাঢ়)। এদের নাম থেকে পাঁচটি কৌম জনপদ এর উদ্ভব। আর্য প্রভাবের আগে এসব জনপদের লোকদের আর্যরা "দস্যু", "ম্লেচ্ছ", "পাপ" "অসুর" ইত্যাদি নামে অভিহিত করতো। আর্যদের কাছে এদের ভাষা ছিল 'পাখীর কিচির মিচির'।

উত্তর ভারতে দশেরা উদ্‌যাপিত হয় রামের রাবণ-বিজয়কে স্মরণ করার জন্য। বাংলাদেশে বিজয়া দশমী উদ্‌যাপিত হয় দুর্গার মহিষাসুর বধকে স্মরণ করার জন্য। এই মহিষাসুর, চণ্ডীতে যাঁকে অসুরেশ্বর বলা হয়েছে, তিনি আদিম বাঙালী নরগোষ্ঠীর রাজা। এই নর-গোষ্ঠীর অনার্য অস্ট্রিক জাতিভুক্ত। দুর্গার মহিষাসুর বধ শুধু এক রাজার পরাজয় নয়। এই পরাজয় সুদুর প্রসারী ও গভীর অর্থবহ। ইহা অনার্য বাংলার ধর্ম সংস্কৃতি ও ভাষার আর্যীকরণের পথ পরিষ্কার করে দেয়। এর সাক্ষ্য আমরা পাই দুর্গার চালচিত্রে—দেবীর বাহন সিংহে, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচায়, সরস্বতীর বাহন রাজহাঁসে, গণেশের বাহন ইঁদুরে, কার্তিকের বাহন ময়ূরে। এইসব বাহন পশুপক্ষীরা হচ্ছেন বাংলার আদিম মানুষদের দেবতা। পৌরাণিক দেবদেবীর রূপকল্পনায় যাঁদের একেবারে বাদ দেওয়া সম্ভব হয়নি। আর আমাদের শুভানুষ্ঠানে যে আম্র-পল্লবের ঘটের প্রয়োজন হয় যে ধানের ছড়ার প্রয়োজন হয়, যে কলাবৌ এর পুজা হয়, যে ধুপ-দীপ-নৈবিদ্যের আয়োজন হয়, যে আলপনা আঁকা হয়—এক কথায় বাঙালী-জীবনে যা কিছু শিল্প ও সুষমাময়—এ সমস্তই সেই অনার্য আদিবাসীদের দান।

আজও লোকচক্ষুর অগোচরে চলছে এই সমন্বয় সাধনা। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠে' দেশ ও দুর্গাকে একাত্ম করেছেন 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রে। আজীবন বৈদান্তিক বিবেকানন্দ মৃত্যুর আগে নাকি 'মা, মা' করে গড়াগড়ি দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ শ্রীরামকৃষ্ণ সারা-জীবন কালী সাধনা করেছেন। আর বিশ্বমানবের জন্য বাণী রেখে গেছেন—"যত মত তত পথ"। ●

প্রসঙ্গ গোধূলি-মন ঃ

O শ্রাবণ সংখ্যা গোধূলিমন পেয়ে খুব ভাল লাগল, এর আগের সংখ্যাটিও পেয়েছি, চিঠি-সহ। ভাবতেই পারিনি যে বিজ্ঞাপনের জন্য একটি পত্রিকা পাঠিয়ে দেবেন! ভাইকে বলে রেখেছি নিয়মিত 'পাতিরাম'-এ নজর রাখতে যাতে বেরলেই সংগ্রহ করে।

যাইহোক, ক্রমে গ্রাহক হবার ইচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে। পুজোর আগে থেকে গ্রাহক হলে, বাড়তি একটি পুজো সংখ্যা পাবো তো? গ্রাহকত্বের দাবীতে নিশ্চয় কখনো কোনো লেখা প্রকাশিত হয় না, তবু, ভবিষ্যতে, একেবারে নিজের মতন করে কিছু গল্প লেখার আমার ইচ্ছে আছে।...যেমন এ সংখ্যায় অজিত রায়ের রচনাটি, বেশ ঢাকঢোল পিটিয়ে শুরু হলেও কোথাও পেঁৗছে যায়নি। বিষয়টি ধরেছিল ভাল, কিন্তু যা সামলাতে পারবে না, অমন বিষয় ধরে চর্বিত চর্বণ করা কেন! তবে প্রবন্ধগুলো দেখে মনে হচ্ছে নিশ্চয় সমৃদ্ধ হব

সোফিওর ঈশিতা উভয়েই আমার বন্ধু, কিন্তু এ সংখ্যায় দুজনে পাল্লা দিয়ে বাজে কবিতা লিখেছে। সোফিওরের কবিতাটি যেন আরেকটি হাওড়া এলাকার কাগজে দেখলাম।

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়
রহড়া/২৪ পরগণা

পদ্মাপারে জোড়াবট

অমিতাভ বাগচী

পদ্মা অবিভক্ত বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বঙ্গের বিশাল নদী, এর একুল ওকুল নেই। গভীরতায় বারোমাস সমান, সদা জল থৈ থৈ। তীব্র স্রোত-ধারা বইয়ে জোয়ারে ফেনারাশি ঢেউ খেলিয়ে চারিদিকে লাবণ্যতা সৃষ্টি করে চলেছে। পদ্মার অপরিমেয় দান আমরা ভোগ করে এসেছি তা হ'ল তৈলাক্ত পাকা ইলিশ। তারি নামে নদী ধন্যা। তাই পদ্মার মহিমা দূরে থেকেও বরাবর উপলব্ধি করে এসেছি ঐ মাছ খেয়ে। তবে ছেলেবেলায় আমার পদ্মা দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল যখন পাকিস্থানের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম জলপাইগুড়ি। ওর মত প্রশস্ত সেতু আর হয় না। ইহা ঐতিহাসিক বিশেষত্ব মূলক বটে। ব্রিটিশ আমলে লর্ড হার্ডিঞ্জ সাহেবের আনুকূল্যে গড়া খাঁড়া ব্রিজ নামে খ্যাত। তার মধ্য দিয়ে ট্রেন চলেছে। গভীর রাতে নিদ্রাচ্ছন্ন নিস্তব্ধ ভঙ্গ করা গমগম শব্দ কম মোহনীয় নয়। সে যে কি অপরূপ দৃশ্য। সেতুর উচ্চতার সঙ্গে জলের উচ্চতা পাল্লা দিচ্ছে। তীরে নোঙর করা পালতোলা নৌকার ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে টিমটিমে আলো। ঘুমন্তপুরী থাকলেও মাঝিরা কিনারে বসে লণ্ঠন পাশে রেখে মৎস্য শিকারে রত। নদীর দুরন্ত প্রবাহে শীতল হাওয়া কম আরামদায়ক নয় বা কম উপভোগ্য নয়। সেই হল প্রকৃত 'গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি'। পদ্মার পুরো ছবি মানস নেত্রে স্পষ্ট হয়ে আছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' গ্রন্থে। এক জেলে কুবেরকে কেন্দ্র করে মাছ ধরার জীবিকা নিয়ে নদীর আগাগোড়া কাহিনী। এতে অনুভূত হয়ে পদ্মার অনাবিল বৈচিত্র্য। কাজেই এপার বাংলা ওপার বাংলা বিশেষত্বে পদ্মা আমাদের কৌলিন্য দান করেছে। এক অনির্বচনীয় সুন্দররূপে বঙ্গভূমি আলোকিত।

পদ্মার তীরবর্তী শিলাইদহ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের খাস জমিদারি অঞ্চল। জমিদাররূপে কর্তব্যবশে রাজকার্য্য দেখাশোনা করতে হত বটে, তবে কাব্যিকতায় এস্থান ছিল তাঁর মোহমুক্ত। এসূত্রে পদ্মার সঙ্গে ছিল তাঁর মধুর সম্পর্ক। পদ্মাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসে ছিলেন। তাঁর কবিমন

ডুবিয়ে দিয়েছিলেন পুরো। তাঁর কথাই ছিল 'ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মা'। বাস্তবিক পদ্মাকে তিনি বাহন স্বরূপ আপন সঙ্গী করে ফেলেছিলেন। সে ছিল প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র। সজল পরিপূর্ণ শস্য-শ্যামলা ভূমি, যাকে বলতে সার্থক সোনার বাংলা। প্রকৃতির এমন সরস পরিবেষ্টনে কবিমন আপনি দোলায়িত। তাই পদ্মাকে সর্বান্তকরণে আঁকড়ে ধরেছিলেন। পদ্মার প্রীতি সোহাগ নিয়ে বহুদিন কাটিয়েছেন। জলতরঙ্গে উন্মত্ত প্রবাহে পদ্মার প্রকৃতি-লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'। অধিকাংশ সময়ে বাস করতেন তাঁর পিতামহ আমলে নির্মিত বজরায়। হাওড়ার গঙ্গাতীরে ছিল। রবীন্দ্রনাথ উহা পদ্মায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সে কারণে নাম দিয়েছিলেন 'পদ্মা বোট'। ওতে তিনি থাকতেন। দালান 'কুঠিবাড়ী'তে অতটা থাকতেন না। পদ্মা বোটেই তাঁর নিজস্ব ঘরবাড়ী। সংসারের জটিলতা অশান্তি কলরবের হাত থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে নির্জনতা বেছে নিয়েছিলেন। এবং সেই সঙ্গে প্রকৃতি প্রেমিকতায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এখানে থেকে অধিকাংশ কবিতা গল্প প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বিশেষত: ছোটগল্পের উৎপত্তি এইখান থেকে। জনারণ্য বহির্ভূত, নদীচর, ধু ধু বালি, জলচর পাখি এখন তাঁর প্রতিনিয়ত ছোটগল্প লেখার প্রকৃত উপাদান ছিল। এখানে থেকে পদ্মার নরনারী তাদের জীবনযাত্রা সবই দেখেছেন শুনেছেন। তা থেকে কল্পনাশক্তিতে গড়েছেন এক একটি বিচিত্র কাহিনী। পদ্মার বৈচিত্র্য তিনি অন্তরে আহরণ করতে পেরেছিলেন। ফেনপুঞ্জিতে জলস্ফিতির সমপরিমাণে নিজ চিত্তের স্ফুরণ ঘটিয়েছেন। উহা তাঁর লেখনের সর্বপ্রকারের সহায়ক হয়েছিল। ফলে তিনি দিবারাত্রি বোটে বাস করে নদীবেষ্টিত অঞ্চল সমূহের সৌন্দর্য্য মহিমা ভোগ করে ইহার যথার্থতা উপলব্ধি করেছিলেন।

পদ্মার প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে তন্ময়তার গুণে রবীন্দ্রনাথের জমিদারি দেখাশোনা গৌণ হয়ে গেল, মুখ্যত: হয়ে দাঁড়াল কাব্যিক চর্চা। যা কিছু কার্য্যকরী করেছেন বোটে বাস করে। কোন কোনদিন ঐ বোটে করে চলে যেতেন সুদূর গ্রামান্তরে। কাজেই পদ্মা বোট রবীন্দ্রনাথের যান ও বাস দুয়ের কাজ করল। এর মাধ্যমে মাটি ও মানুষের যুগপৎ স্বাদ পেয়েছেন। ওখানে মধুরাস্বাদন শুধু প্রকৃতি থেকে পাননি, পল্লী থেকেও পেয়েছেন। বোটে করে বিভিন্ন গ্রামে যেতেন, প্রত্যেকটা স্থানই তাঁর কত চমৎকার লাগত। পদ্মা তীরবর্তী গ্রামকে অন্য জায়গার তুলনায় অতুলনীয় বলে বলেছেন। প্রেমিকতায় প্রকৃতি ও পল্লীকে যুগ্মভাবে নিয়েছিলেন। বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ গ্রামকে বেশী ভালবাসতেন। জোড়াসাঁকোর মত বিরাট দরদালানে বাস করেও শহুরে জীবন তাঁর মনপ্রাণ হাঁপিয়ে তুলত। বলতেন শহুরে বাস, যান্ত্রিকতার মধ্য দিয়ে চলা এ বড় পীড়াদায়ক। সেইজন্য তিনি অবিভক্ত বাংলার পল্লী অঞ্চলের অনেকাংশে ঘুরেছেন এবং সেখানকার উপাদানকে আলঙ্কারিক মূল্য দিয়েছেন। পদ্মা যেমন কাব্যোপযোগী বলে রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশেষত্বের স্থান পেয়েছিল। তেমনি রবীন্দ্রনাথ ওখানকার পল্লীবাসীর আপনজনতুল্য স্থান লাভ করেছিলেন। কাজেই পারস্পরিক হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ফলে পদ্মায় শিলাইদহ থেকে আরম্ভ করে কুষ্ঠিয়া সমুদয় অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথের প্রতিপত্তি একচ্ছত্র বিস্তার করেছিল। বিশেষ করে পল্লীর সহজ মানুষরূপে পল্লীবাসীর বল ভরসা ছিলেন তিনি। ওদের সুখে যেমন প্রফুল্ল থাকতেন, দুঃখে তেমনি সমব্যথী হতেন। তবে রবীন্দ্রনাথ ওখানে রত্নমানিক্য উদ্ধার করেছেন জহুরি মুক্তা আবিষ্কার করার মত করে। যাঁরা জীবিকার দায়ে সেরেস্তারি কাজের জন্য ছিলেন তাদের মধ্য থেকে বার

করেছেন তদানীন্তন জ্ঞানীগুনীজন। সেই সাহায্যে শান্তিনিকেতনে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আশ্রমতীর্থ গড়তে পেরেছেন। শিলাইদহ থেকে যাঁদের শান্তি-নিকেতনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নাম করলে পাওয়া যায়—সতীশচন্দ্র রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায়, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী প্রমুখ। এঁদের অবদান বাস্তবে অনেক। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ হয়ে গিয়েছিলেন ওখানকার স্তম্ভস্বরূপ।

'জমিদার রবীন্দ্রনাথ' 'পল্লীবাসী রবীন্দ্রনাথ' বলতে পরিচয়ের তীর্থক্ষেত্র শিলাইদহ। গল্পকার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে কম প্রতিভাত হননি। গোটা অঞ্চলটায় তিনি প্রজা থেকে আরম্ভ করে ফকির স্থানীয় নরনারী সকলের হৃদয় জয় করেছেন এবং এখেকে স্ব মহিমায় বিকশিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল্যে সে দেশ প্রভাবান্বিত। সেই স্থানে একই নদীর মোহনায় মিলনস্বরূপ প্রকৃতি প্রেমিকতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন আচার্য্য জগদীশ-চন্দ্র বসু। উভয়ের মধ্যে ঘটল রাজযোটক যোগসূত্র। প্রেমিকতার দিক দিয়ে একদিকে প্রকৃতি-কবি রবীন্দ্র-নাথ অন্যদিকে প্রকৃতি-বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র দুজনে হলেন এক মতাবলম্বী। সেইজন্য একদা শিলাইদহে যৌথবাস ছিল।

একথা সর্বজন জ্ঞাত যে, জগদীশচন্দ্র একজন প্রতিভাদীপ্ত বিজ্ঞানী। তিনি প্রখ্যাত পদার্থবিদ বলতে নিঃসন্দেহ। যার জন্য মার্কনীয় রেডিও আবি-ষ্কারের ব্যাপারে তাঁর বৃহৎ অবদান আছে। তারি সঙ্গে আর একটি বিষয় প্রযোজ্য যে, তিনি বিশ্বের এক ঐতিহাসিক আবিষ্কার করেছেন মানুষের সঙ্গে গাছপালার প্রাণ সম্পর্কে। এরি সূত্র থেকে প্রকৃতি প্রেমিকতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। জানতেন রবীন্দ্র-নাথ প্রকৃত কাব্যপ্রেমিক এবং কবিতার রসস্রষ্টা। সেই সুবাদে আগ্রহে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন। উভয়ের প্রকৃতি ও প্রতিভার সাদৃশ্য ছিল। সৌন্দর্য্যের আলোকে বিজ্ঞানকে সাজাবার জন্য জগদীশচন্দ্র সুষমার উপলব্ধি ও রসানুভূতির প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। ফলে প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরের গভীর যোগ সম্ভব হয়েছিল। তাঁর মধ্যে ছিল সত্তা কবিচিত্ত। এই কবিচিত্তের বলে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনা প্রসারলাভ করেছিল, মূল প্রেরণাই জনকোলাহল বহি-ভূত শুচিস্নিগ্ধ নির্জন স্থান। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিলাইদহের প্রতি মোহে আকৃষ্ট হন, ফলে সেখানে কবির সঙ্গে বসবাস শুরু করেন। প্রতি সপ্তাহে শনি-বারে যেতেন আর সোমবারে ফিরতেন

সেই পদ্মাবোটে উভয়ের মহামিলন ঘটেছিল। কবির সঙ্গে জগদীশচন্দ্রও বোটে থাকা পছন্দ করে-নিয়েছিলেন। মণীষীদ্বয়ের একত্র অবস্থান স্থানীয় বাসিন্দাদের আকর্ষণীয় লেগেছিল। সেই সময় জগদীশচন্দ্র হয়ে গেলেন কাব্যপ্রেমিক। জ্ঞান ও ভাব দুয়ের সামঞ্জস্য একই। কাব্যপ্রেমে তাঁর গবেষণা নিবিড় ও গভীর। জগতের ও জীবনের ঐক্যদৃষ্টিতে বিজ্ঞান পূজায় তিনি হলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি। কবির চোখে এ সভ্যতা প্রথম দৃষ্ট হয়েছিল। কবি অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনা তাঁর কাব্য সংসারের কাজে লাগবে। আবার জগদীশ-চন্দ্রও মূল্যবোধ করেছিলেন প্রাকৃতিক সম্পদে ভূষিত কবির কাব্যসৃষ্টি বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অবদান। পারস্পরিক উপলব্ধি নিয়ে শিলাইদহে কবি ও বিজ্ঞানীর সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়েছিল। সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে পর-স্পর পরস্পরকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। এমন দেবপ্রতিষ্ঠ বন্ধুত্ব উভয়ের মহাকীর্তির পথ সম্প্রসারণ করেছিল এবং নৈসর্গিক মহিমায় সিদ্ধিবিকাশ সম্ভব হয়েছিল।

জগদীশচন্দ্রের শিলাইদহে কবির সঙ্গে বাস সম্বন্ধে মৌখিকভাবে জানতে পেরেছিলাম তাঁর যোগ্যতম শিষ্য বিজ্ঞানাচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মাধ্যমে যখন শান্তি-

নিকেতনে ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য রূপে। ঐ সময়ে (১৯৪৮) জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হয়। উনি শ্রদ্ধা স্মরণে অচিরে শান্তিনিকেতনে ছুটি ঘোষণা করলেন। ওনার আনুষ্ঠানিক বক্তব্যে আমি বিশদভাবে জানতে পাই কবির সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের আত্মিক যোগ সম্পর্কের কথা। মর্মকথায় অবগত হই—জগদীশচন্দ্র শুধু বৈজ্ঞানিক বলে পরিচিত নন, তিনি একাধারে প্রাবন্ধিক দার্শনিক শিক্ষাবিদ সমালোচক প্রভৃতি সবিস্তারে বলা যায়। শুধু কবি ছিলেন না। যেহেতু তিনি উদ্ভিদ জগতের বিজ্ঞানী, বিশেষত: জীবের সঙ্গে তুলনা করে জড়ের আবিষ্কর্তা, সেই কারণে রুচিবোধ নিয়েছিলেন শিল্পী মনোভাব। সেই শিল্পী মন নিয়ে তিনি বিজ্ঞান চর্চা করেছিলেন। তাই পদ্মাপারে কবির নাম দেখে মোহিত হয়েছিলেন। বারম্বার পদ্মা যাতায়াত করে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন। ওটাই ছিল জগদীশচন্দ্রের প্রকৃতি অনুশীলনের সার্থকতা। পদ্মার দিগন্ত বালুচর ও গাছপালার ছায়াঘেরা অঞ্চল তাকে কম তৃপ্তি দেয়নি। বোটে বাস করে দিবারাত্র জলের বৈচিত্র উপভোগ করতেন। কবিকে সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে পদ্মার বালুচরে কত দূর দূরান্তরে ঘুরেছেন। দিগন্ত বিচরণের সঙ্গে পিপাসাও অনন্ত হয়ে থাকছে। পথ চলার সঙ্গে কবিকে কত কি জিজ্ঞাসাবাদ করে নিজের কৌতুহল নিবৃত্তি করতেন। কবির পিঠে হাত রেখে কত ঘন জঙ্গল এলাকা পরিক্রমা করেছেন। তাঁর সঙ্গে কত বর্ণনা করেছিলেন গাছপালার সহজাত প্রকৃতি সম্বন্ধে। তারি ফাঁকে কবিকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতেন সত্যতা কতখানি। সেই খাঁটি সত্যের উপলব্ধি নিয়ে তিনি বিজ্ঞানচর্চা করে গিয়েছেন। বৈজ্ঞানিকতার সঙ্গে কাব্যিকতা মিশিয়ে নিজস্ব সাধনাকে ক্রমবিকশিত করেছেন। যার জন্য পরবর্তীকালীন বৈজ্ঞানিকগণ যথার্থতা বোধে অনুরূপ অনুশীলনে বিজ্ঞানে রস সঞ্চার করেছেন। বাস্তবিক জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের পাঠক্রম সূত্র না ধরে প্রকৃতিগত ভাবরস সংযোগ করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশেষত: গাছপালার ব্যাপারে কবিকে প্রকারান্তরে বুঝিয়েছেন ভগবৎ প্রদত্ত সামগ্রী নিয়ে বৈজ্ঞানিক বিচারের তাত্বিকতা সম্পর্কে। প্রত্যেকটা গাছের লতাপাতার কি গুণ কি রূপ কি প্রকৃতি সমুদয় ব্যক্ত করেছেন ঘুরতে ঘুরতে। প্রসঙ্গত: বলেছিলেন—প্রকৃতিকে চিনতে গেলে শরৎকালে। ঐ সময় বেশ ঝরঝরা ভাব থাকে। সিক্ততা হ্রাস পায়। সোনালী আলোকমাখা রোদ ও মৃদুমন্দ হাওয়ায় গাছের প্রতিটি গাছপালা সোহাগে নড়েচড়ে। তারা সেই সময় উদার হয়। তখন প্রশস্ত ভাবে মনের কথা বলে। তৃণ গুল্ম লতা থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটা গাছ বাহু প্রসারিত করে পথপার্শ্বে হেলে নুয়ে পড়ে এবং পথিকদের স্পর্শ করে। এর অর্থহল মানুষের সঙ্গে মেশবার আগ্রহ। পথ চলতে কোন গাছ হেলে থাকলে উনি বুকে ধরে নিতেন। কিছুক্ষণ রেখে তারপর বলতেন—'দেখেছিলাম এর স্পন্দন কতটা।' এই রকম ছিল তাঁর অনুভূতি। এইভাবে শেষ অবধি চলেছিল জগদীশ বাবুর বিজ্ঞান চর্চার কাজ ঐ শিলাইদহ উপকূলে।

বলতে পারা যায় শিলাইদহ শুধু কবির নয় বৈজ্ঞানিকেরও পীঠস্থান। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও বৈজ্ঞানিক জগদ শচন্দ্র উভয়ের সংমিশ্রণে পদ্মাপারের তটভূমি আলোক বিস্তারিত। কবির পদ্মাবাসের কথা চিন্তা করলে জগদীশবাবুর কথাও স্মর্তব্য। অঙ্গাঙ্গী জড়িত থেকে কবি–বৈজ্ঞানিকের সহাবস্থান ঐতিহাসিক ঔজ্জ্বল। পারস্পরিক উপলব্ধি ছিল অতুলনীয়। পদ্মার উপকূলে ওনাদের মধ্যে দেওয়া নেওয়া ঘটেছিল হৃদয়তার আদান প্রদানে। উভয়ে সারবস্তুতে বুঝে নিয়েছিলেন কার কত গুণমহিমা। বৈজ্ঞানিক রস ক্রিয়ায় জগদীশচন্দ্র জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ কাব্যিয় বিজ্ঞানী। প্রকৃতি প্রেমিকতার গুণে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে কাব্যসাধক আখ্যা দিয়ে ধন্য হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ অনুজ প্রতিম হলেও জগদীশচন্দ্র কবিত্বে যশোস্বীকার্য্যে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধাবাসে বরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন সত্তরে উপনীত হল জগদীশচন্দ্র সাড়ম্বরে কলকাতায় বিরাট সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করেছিলেন উক্ত উৎসব সমিতির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করে। মানপত্রে শ্রদ্ধার্ঘ্য লিপি দরদভরে অঙ্কন করেছিলেন কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র।—'কবিগুরু তোমার প্রতি চাহিয়া বিস্ময়ের সীমা নাই...' কথাটি আজও ঐতিহাসিক স্মরণযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য মূল্য দিয়ে "স্বদেশ ও সঙ্কলন" গ্রন্থে জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে দুইটি কবিতা রচনা করেছেন। তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছিলেন বিজ্ঞানলক্ষ্মী বলে। মহামানবদ্বয়ের এমন গুণমুগ্ধতা বিনিময় জাগতিক সম্পদরূপে গড়ে উঠেছে। পদ্মাপারের রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্বের সম্পর্ক আসছে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে। সেখানকার কবি-বৈজ্ঞানিকের একত্র মিলন গোটা দেশের বুকজোড়া ঐশ্বর্য্য। ভাবলে মন পুলকিত না হয়ে যায় না। ●

প্রসঙ্গ গোধূলি-মন ঃ

O গোধূলিমনের রবীন্দ্রসংখ্যা পড়লাম। ভাল হয়েছে সংখ্যাটি। কবিতাগুলি সবই ভাল—, খুব ভাল। সোফিওরের কবিতার শব্দের স্বাদ বড় স্বাদু যদিও ইংরাজী কণ্টকিত। ছিন্নপত্র নিয়ে এত আলোচনা, ভাবছিলাম কি আর লিখবেন, কিন্তু তৃপ্তি পেয়েছি শুদ্ধসত্ত্ব বসুর লেখাটি পড়ে, নতুন কিছু পেয়েছি। ওঁকে ধন্যবাদ গজেন ঘোষের লেখাটিও ভাল। প্রভাস চোধুরী, শিশিরকুমার মিত্র সবার লেখাই আকর্ষণীয়। সবচেয়ে আকাঙ্খা ছিল অজিত রায়ের লেখাটির জন্য। কিন্তু সন্তুষ্ট, তৃপ্ত হতে পারিনি ওঁর লেখাটিতে। রচনারীতি নিয়ে বিশেষ কি বললেন শুধু ওঁর তীব্র চাঁছাছোলা ভাষায় কিছু তীব্র বাক্যাবলী উপহার দিয়েছেন মাত্র। ভাষায় ওর দখল অনস্বীকার্য। কিন্তু সর্বত্র একই ভাষা কি প্রযোজ্য ?

নিভা দে

২৮, ভাবা রোড, দুর্গাপুর-৫

O O O

O আপনার বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় হুগলীর তথা মফঃস্বল লিটল ম্যাগাজিনের গর্ব 'গোধূলি-মন' নিয়মিত হাতে পাচ্ছি। এবারের ১২৫তম রবীন্দ্রজয়ন্তী সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৯৩ হাতে পেয়েছি।

এটি একটি এ বছরের বলিষ্ঠ সংযোজন। আলাদা করে আলমারীতে জমিয়ে রাখবার মতো সংখ্যা।

সম্পাদক মহাশয় কে ধন্যবাদ তিনি যেভাবে যত্ন সহকারে রবীন্দ্রজয়ন্তী সংখ্যাটি প্রকাশ করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। শুভেচ্ছা রইল

মানব বিশ্বাস

শঙ্খনগর সাহিত্য সংসদ

বাঁশবেড়িয়া/হুগলী

O O O

O ১২৫তম রবীন্দ্রজয়ন্তী সংখ্যা পেয়েছি। অরুণকুমার চক্রবর্তীর 'তার সমুদ্রবাগান সভায়' কবিতাটি এতো ভালো লাগলো। তাঁকে আমার তরফ থেকে অভিনন্দন জানাবেন। সংখ্যাটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। আমার কাছে এটি সযত্নে সংরক্ষিত থাকবে।

নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়

৪৬ বি, রিচি রোড,

কলিকাতা-১৯

টকটক ঝালঝাল নুননুন উপন্যাস প্রসঙ্গে

অজিত রায়

[প্যারালাল নিউওয়েভ ভিন্নধারা নয়া ধাঁচ ব্যতিক্রমী পরম্পরা-রহিত শাস্ত্রবিরোধী অ্যান্টি উপন্যাস ইত্যাদি একই প্রকরণের গতিক চরণ-বিন্যাসের ভিন্ন ভিন্নতর প্রতিনাম। বস্তুত এতাদৃশ উপন্যাস সেই উপন্যাসেরই একটি গৎ, যাকে পাঠকের হৃৎপিণ্ড থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে হয় অপরাধ। অজিত রায় এই নাতিক্ষুদ্র নিবন্ধ মার্ফৎ তাঁর অচলিত গদ্যে নিজস্ব কায়দায়, দৃষ্টান্তের উপস্থাপনায়, উপমায়, দুমদাম শব্দে, চিত্তহারী ভাষায় উক্ত অপরাধেরই ক্ষালনে নিযুক্ত। শাস্ত্রবিরোধী বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের বিকাশ ও আন্দোলন, তার বিষয় ও ফর্ম আনন্দ-বাজারী গঙ্গাজল সাহিত্য থেকে তার ফারাক, অ্যান্টি-নভেলের ভাবনা ও কমিটমেণ্ট নিয়ে মদীয় ভাষায় গবেষণা এই প্রথম। এখন ভাবা যেতে পারে বাংলা সমালোচনা সাহিত্য একটা নতুন দুর্গ জয় করল। বলা বেশি, বক্ষ্যমাণ আলোচনায় অপরিহার্য হয়েছে এতাদৃশ সাহিত্যের 'এই মুহূর্তে'র দেহভঙ্গির স্থিরচিত্র এবং সেই চিত্রের তাৎপর্য-বিচার। পাঠকের উদ্গিরণের সুযোগ অবাধ।]

॥ এক ॥

সংস্কার অতি দুর্মর। এমনই দুর্মর, যে, একবার বাসা বাঁধলে মনে তাড়ায় কার সাধ্যি? গুঁজে-দেয়া বা ঢুকে-পড়া ওই সংস্কারকে লাফিয়ে যিনি বেরিয়ে আসতে পারবেন, তিনিই শাস্ত্র-বিরোধী। কিন্তু মা বঙ্গঠাকুরাণীর দুঃখের কপাল এমনই যে সেই শক্ত দুটো পা দেড়শো বছরে তিনি পেলেনই না। উনিশ শতকে ভাষা আর ভাব রহস্যের ম্যাজিকে বঙ্কিমবাবু বাংলা কথাসাহিত্যকে আদর্শের যে শিকেয় তুলে দিয়েছিলেন, সেখান থেকে তাকে পেড়ে আনতেই ডজন তিন-চার বছর পাস হয়ে গেল বাঙালি সাহিত্যরথীদের। উনিশ শতকী বিশ্বাসের দুর্গ চুরচুর হলো বিশ শতকের বাস্তবানুভূতির হাতুড়ির ঘায়ে। আদর্শায়ন সুড়সুড় করে নেমে এলো বাস্তবায়নে, ক্রমে ক্রমে। উপন্যাসের বিবর্তনরেখায় ফুটে উঠল বাঙালি

চিন্তনের বহর। আদর্শের গোমুখী থেকে যাত্রা-শুরু-করা উপন্যাসের চাঁদমুখ থেকে খসে পড়তে থাকলো রহস্যের ঘোমটাজাল। উপন্যাস হয়ে উঠল বক্তব্যধর্মী, ভাবনাপ্রধান। কিন্তু পা-দুটো আর জুটল না।

বিবর্তনের এই স্বাভাবিক ধারায় অনিবার্য প্রোডাক্ট হালবাংলার সিদ্ধিদাতা গণেশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর জীবিতকালেই তাঁর চেলা-চামচার আমদানি এমন বীজগণিতীয় হারে বেড়ে গেল যে মনে করা হতে লাগল যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলাদেশে আর কোনো লেখক নেই। তাঁরা বললেন, সাহিত্য-এমন-কী শিরোপো আছে যার প্রাপক রবি ঠাকুর নন। কবিতা ছোটগল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ চিঠিপত্র গান ইত্যাদি এমন কোন্ মজলিস আছে যেখানে তাঁর জায়গা পেছন-বেঞ্চিতে? এবং বৈষ্ণবের আখড়ায় যেহেতু চাকু-ভালা চলেনা, সুতরাং তাঁরা যদি শাস্ত্র-বিরোধী লেখক-সূচির একেবারে আদিতে রবীন্দ্রনাথের নামটা বসান,—কোন্ আহাম্মক দেবে তাঁদের শো-কজ নোটিশ?

বলে রাখি, অন্তত আমিও চাঁদসদাগর সেজে রবি-মনসাকে 'প্রথম অশাস্ত্রীয় লেখক' হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর পুজো করেছি। কিন্তু তার প্রাউণ্ড ছিল ভিন্ন। আমি বলতে চেয়েছি, নিজের জীবনচর্চায় যিনি অশাস্ত্রীয় ব্রাত্যজনের অন্যতম হিসেবে স্ব-পরিচয় রেখেছেন, তিনি নিছক প্রতিষ্ঠানিক আস্ত্রাচারে আটকে থাকতে পারেন না। তিনি গোড়া থেকেই সজাগ ছিলেন: 'যে কালে এসেছি আজ, সে কালটা সিনিকাল'। এ-অসূয়া প্রবৃত্তি ভাবালুতার বোতল-বদলই বটে, তথাচ এতেই ছিল সেদিন বিদ্রোহের সুর। কেননা, বাবুবিলাসের স্বপ্নিলতা সময়ের চোরাবালিতে খানচাল হয়েছে তখুনি। আমি জানি, রবীন্দ্রনাথের এমন কিছু উপন্যাসও আছে। যেমন 'ঘরে বাইরে' 'চার অধ্যায়' 'চতুরঙ্গ' মালঞ্চ' আর 'শেষের কবিতা', যেগুলো প্রচলিত প্যাটার্ণের বিরুদ্ধাচরণ করার দরুণ শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় তাত্ত্বিকদের কাছে 'উপন্যাস' বলেই শনাক্ত হতে পারেনি। তথাচ আজ যাকে আমরা হাড়ে-মাংসে আত্মায়-অগ্রন্ততে শাস্ত্র-বিরোধী উপন্যাস বলে জানি তার সঙ্গে রবীন্দ্র-উপন্যাসের কোনো তুলনাই বৈজ্ঞানিক হবেনা। এদেশীয় উপন্যাস সাহিত্যের ট্রাডিশনে বঙ্কিম, তারক গঙ্গো:, রমেশচন্দ্র মুখো: চারু বন্দ্যো:, প্রভাত কুমার মুখো:, শরৎচন্দ্রের ধারায় রবি ঠাকুর একটা বিবাদী সুর ফোটাতে পেরেছিলেন মাত্র—এর বেশি কিছু নয়।

রবীন্দ্রনাথই কেন, শাস্ত্রবিরোধী বা নয়া ধাঁচের উপন্যাসের রূপ বা ফর্ম, রচনা কৌশল আর ক্যারাক্টার বিল্ডিং-এর বৈশিষ্ট্য তাঁর সমীপকালীন কোনো সাহিত্যিকের পক্ষেই সম্ভব ছিলনা আয়ত্তে আনা। রবীন্দ্রনাথ তো ছিলেন ছকেরই মানুষ। সাহিত্যের কোনো সাজানো বাগান নষ্ট করবার পক্ষপাতি উনি ছিলেন না। তিনি বলতেন: 'গদ্যের অতিনিরপিত ছন্দের বন্দন ভাঙাই যথেষ্ট নয়; ভাষায় ও প্রকাশ-ভঙ্গিতে যে একটা সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে, তাকে বজায় রেখেই ও বিদ্রোহটা আয়ত্তে আনতে হবে।' কিন্তু আমরা তো জানি থাপ্পড় মেরে ভাষার মুখ ঘুরিয়ে দিতে না পারলে প্যারালাল কিছু সৃষ্টি সম্ভব নয়। যে কারণে ওয়ালীউল্লাহ, জীবনানন্দ, সন্তোষ ঘোষও বর্তমান আলোচনায় নিজেদেরকে গুঁজে দিতে পারছেন না।

নিছক আখ্যানিক পরিনাহের গুণে বা কথন বৈশিষ্ট্যের চটকদারি দিয়ে নিজেকে নিউ ওয়েভ বা নয়া ধাঁচের ঔপন্যাসিক বলে চালানো যাবেনা। কেননা আমি যে-ধরনের লেখালেখিকে 'নয়া ধাঁচ' বলছি, তাদৃশ উপন্যাসে গল্পাংশ ন্যূন, চিন্তাধারার সূক্ষ্ম কারুকাজই আসল। তা-নাহলে বিভূতি মানিক

তারাশংকর শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমই যথেষ্ট ছিলেন। অধিকন্তু হালফিলের সমরেশ বসু বুদ্ধদেব গুহ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় দেবেশ রায় অমিয়-ভূষণ মজুমদার ইত্যাদির তুল্য কথক আমাদের গর্বই। তথাচ, উপন্যাসের নামে ভস্মাচ্ছেন বাহান্ন তাসেরই গপ্পো সুতরাং পরিত্যাজ্য।

॥ দুই ॥

এখানে আমি টকটক ঝালঝাল নুনমুন উপন্যাস বলতে, হালফিলের বহুল হারে উৎপাদিত ফচকেমি ন্যাকামি আর গালগপ্পে ঠাসা মননবিমুখ লেখাগুলোকে পয়েন্ট-আউট করছি না। বলতে চাইছি সেইসব উপন্যাসের কথা যেগুলি জাতে আলাদা; শৈলী আর টোনে তো বটেই, চরিত্র চিত্রণ, পরিবেশ সৃষ্টি, সংলাপ-ব্যবহার; ইত্যাদি সব দিক থেকেই নয়া ধাঁচের। এবং আশ্চর্যভাবে মননধর্মী ও জীবনমুখী। এর জন্ম দেশভাগের আগে সম্ভবই ছিল না। রেনেশাঁসের চুনসুরকি বাঙালির মন থেকে খসে যাবার পর, একেবারে আধুনিক যুগে, শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্যের আন্দোলনকালে, উপন্যাসের অখণ্ড ধ্রুপদী আদর্শকে পরিহার করে বস্তু ও আত্মার যেদিন গাঁঠছড়া বাঁধা সাঙ্গ হলো, সেই দিনই এ-ধারার উপন্যাসের যাত্রা শুরু।

এইসব উপন্যাসের লেখকরা, গাব্রিয়েল গর্সিয়া মার্কেজের মতো, বিশ্বাস করেন পৃথিবীটাকে উন্নত করার সম্ভাবনার মধ্যেই সাহিত্যের কারুকাজ। এঁদের ইণ্টেলেকচুয়াল বলতে আমি নির্দ্বিধ। কেননা, সমাজ-জীবনের সঙ্গে সৃষ্টিশীল আনন্দে নিজেকে যুক্ত করতে পারার অকৃত্রিম অপারগতার যে কষ্ট মানুষকে সমাজের সঙ্গে একই ভাবের তৃপ্তিবোধ থেকে বঞ্চিত করে তার স্বস্তিহারক, অন্তর্পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতা এঁদের আছে। এঁরা রাজনীতি ও প্রশাসনের দুর্গদ্বার থেকে নিছক অপরিগৃহীত হয়ে অন্যান্যদের দেখাদেখি স্বরচিত একটি সুচারু এলিটিস্ট-একান্তে অপসৃত হবার পক্ষপাতি নন। বস্তু ও গুণের সমন্বয়ে নিখাত সত্যের অন্বেষণই ইণ্টেলেকচুয়াল লেখকের ধর্ম এবং ইণ্টেলেক্ট বা ধীশক্তির কারণেই আমাদের মনে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা। বুদ্ধির সাধারণীকরণে বস্তুজগৎ ও বস্তু সম্পর্কে শাশ্বত সত্যকে খুঁড়ে বের করা, তার মাধ্যমে বিচার করা, বিচারের মধ্যে দিয়ে সত্যকে জানা, সত্য দেখা—এবং সত্যের আলোকে ভালোমন্দ যাচাই করে চিরন্তন মূল্য-বোধকে আয়ত্ত এবং ব্যক্ত করাই তো বুদ্ধিজীবীর কাজ। এবং, এক্ষেত্রে, উপন্যাসের গঠন, শৈলী, চরিত্রসৃষ্টি, ভাষা, লিপৈদ্ধত জ্ঞান—এ-সবই এঁদের ইণ্টেলেকচুয়াল পদক্ষেপে ক্রমিক সাক্ষ্যের ধারক ও বাহক।

ভূমিকা ইনকমপ্লিট রেখে এবার উল্লেখ করা যাক নামগুলো, যাঁদের কথন-সিদ্ধি নিয়ে আমি দীর্ঘদিন ভাবিত এবং কেতু বা রাহুর চাপে আজ যাঁরা ব্যতিক্রমী বা ভিন্ন ধারার কথক বলে নিন্দিত বা চিহ্নিত। রমানাথ রায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সুবিমল মিশ্র, সুব্রত সেনগুপ্ত, শেখর বসু, অমল চন্দ প্রমুখ শব্দের ঘোড়সওয়াররা সেই বিরল লেখকদের তালিকায়। সময়ের ক্যানভাসে পেন্টিঙে আমাদের উপন্যাস-গল্পকে অন্যরকম অলঙ্কার পরিয়েছেন এঁরাই। এইসব লেখকরা দিনে দিনে লিপিচাতুর্য দেখিয়ে উপন্যাস-সাহিত্যকে সাধারণের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দিচ্ছেন না, ধরে নিলেও, শিক্ষিত ও লেখক-পাঠকদের কাছে এঁরা সবিশেষ স্মরণীয়, কেননা সুখপাঠ্য। উদ্ভাবনা-শক্তিই শুধু নয়, আছে সত্যনিষ্ঠাও। এবং উপন্যাসের সবচেয়ে বড়ো গুণ—লরেন্স যাকে বলেন 'থট অ্যাড-ভেঞ্চার'—দুঃসাহসিক ভাবুকতা এঁদের লেখার ছত্রে-উপছত্রে। আহা, এঁদের নৈর্ব্যক্তিক বিজ্ঞানস্বারূপ্য দেখে মনে হয় পঞ্চাশটা বছর এগিয়ে গেল আমাদের প্রাণের সাহিত্য।

॥ তিন ॥

ক : গল্পে আমরা আমাদের কথাই বলব
খ : আমরা এখন বাস্তবতায় ক্লান্ত
গ : অতীতের মহৎ সৃষ্টি অতীতের কাছে মহৎ আমাদের কাছে নয়
ঘ : গল্পে এখন যারা কাহিনী খুঁজবে তাদের গুলি করা হবে

বাংলার ১৩৭২ ফাল্গুন মানে খ্রীস্টের মার্চ ১৯৬৬-তে জন্ম-নেয়া 'এই দশক' পত্রিকার আবির্ভাব-সংখ্যার কভারে এই চারটি সংকল্প-ঘোষণার মাধ্যমে যে 'শাস্ত্র-বিরোধী সাহিত্য আন্দোলনের' সূচনা ঘটেছিল, তারই রিনভাং প্রোডাক্ট রমানাথ রায় সুব্রত সেনগুপ্ত অমল চন্দ্র শেখর বসু আশিস ঘোষ বলরাম বসাক প্রমুখ ভিন্ন ঘরানার কথা-লেখক। রবি ঠাকুরের মোড়লগিরি আর সমরেশ-সুনীলের ন্যাকাচিত্তির ধুপ-ধুনোর পর, সম্ভবত এঁরাই প্রথম, বাংলার কথাসাহিত্যকে হা রে রে ভাবে ডিসটার্ব করতে পেরেছেন। এঁদের উপন্যাসের লেখক ও নায়ক দুটি ভিন্ন সত্তা নয়, একই জন। এঁরা প্রায় প্রত্যেকে 'অন্তর্জগতের লোক'। এঁরা জীবনকে দেখতে ও দেখাতে চেয়েছেন বাস্তব-পরা-বাস্তবের সুমেরু-কুমেরু মাত্রায়। রহস্যাবদ্ধ জীবনের সংকট, বাহান্ন তাসের ঘেরে বন্দী আত্মার হাঁসফাঁস এবং তা থেকে নিদান লাভের উপায় আর্টের খাঁটি সত্তায় উত্তরণ—জীবনের এই বহুমাত্রিকতা, এটাকে দেখতে চাওয়া দেখতে শেখা দেখতে পারা দেখা আর দেখা-নোই এঁদের শৈল্পিক দায়বদ্ধতা। ষাট দশকের ছটফটে কিছু যৌন-লেখকের এই দায়বোধেই গড়ে উঠেছিল শাস্ত্রবিরোধী হাঙ্গামা।

এর অনেক পরেই, সময়ের বালি হাঙ্গামার জল চুষে-বুষে নিয়েছে যখন আশির দশকে রমানাথ রায়ের প্রথম উপন্যাস 'ছবির সাথে দেখা' বেরিয়েছে বটে; তথাচ রমানাথ উপন্যাসটির ব্যাপারে পূর্বসূত্রহীন ছিলেন না। আশির দশকের উত্তর-আধুনিক গল্পের যে স্বতন্ত্র শৈলী ও টোন তার সঙ্গে কোনক্রমেই তুলনীয় হতে পারেনা 'ছবির সাথে দেখা'। বরং বলবো, উপন্যাসটি শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।

আমি মানি, রবীন্দ্রনাথে এসে বাংলা কথা-সাহিত্য—স্পেশালি উপন্যাস—একটা মার্কেবল টার্নিং পেয়েছে। কিন্তু রমানাথ সরাসরি বলেন, 'বঙ্কিমের পর আর কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়নি', আর যা চলে আসছে 'তা শুধু একশ বছরের পুরানো নয়, রীতিমত বিরক্তিকর।' রমানাথের প্রথম ও প্রধান আপত্তি—উপন্যাস ও গল্পের শরীরে কাহিনীর ঘোড়লিপনা আর চরিত্রের ঠিকুজি কুষ্টি তৈরির বিরুদ্ধে। এটা সত্যি বিরক্তিকর, যে আজকের দিনেও উপন্যাসে কাহিনী বা প্লট থাকবে। আমরা লেখায় কী জানতে চাই কী তুলে ধরতে চাই কী আঁকতে চাই?—জীবন। আর জীবন কখনই কাহিনীর মতো কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত ঘটনাসমষ্টি নয়। রমানাথের প্রশ্ন: 'জীবন কি অনেক বেশি একঘেয়ে, এলোমেলো এবং যুক্তিবিরোধী নয়?' রমানাথের কাছে, চরিত্র হচ্ছে 'বাইরের সফলতা ও ব্যর্থতার তথ্যসমষ্টি।' আমরা অবাক হয়ে যাই ভেবে, যে, একজন লেখকের পক্ষের, নিজের বাইরে, অন্যের জীবনের এ তো ঘটনা, প্রত্যেকটি চরিত্রের আলো অন্ধকার কোণ কি করে জানা সম্ভব! লেখক কি সর্বজ্ঞ পুরুষ—ঈশ্বর? নাকি কথকঠাকুর? তিনি সব্বাইকার মনের কথা জানবেন কি করে? রমানাথ বলেছেন, 'আধুনিক সাহিত্যে লেখককে ঈশ্বরের ভূমিকা থেকে সাধারণ মানুষের ভূমিকায় নেমে আসতে হবে। তিনি শুধুমাত্র একজনের দৃষ্টি ও অনুভবের জগতকে প্রকাশ করবেন। আর সাহিত্যে মানুষের প্রকৃত পরিচয় আসবে ঘটনায় বা তথ্যে নয়; আসবে জটিল, যুক্তিহীন, পরস্পর-বিরোধী মান-

সিকতার উন্মোচনে।' বিষয় হবে নায়কের একান্ত গোপন অস্পষ্ট জটিল মানসিকতা। সবার শেষে মনে রাখা দরকার সব আঙ্গিকেব নির্দিষ্ট পরমায়ু আছে।'

রমানাথের ঘোষণা-অনুযায়ী—কাহিনী বা প্লটের ধার দিয়েও না গিয়ে, বাস্তবের একটি গন্ধের সূত্রে বাস্তব ছিঁড়ে পরবাস্তবে বা শুধুমাত্র একজনের, 'আমি'-র অন্তর্লোকে চলে যাওয়া এবং সেই 'আমি'-র দৃষ্টি ও অনুভবের প্রকাশ এবং তার একান্ত গোপন ধোঁয়াটে জটাজালময় মানসিকতার বর্ণনা—সবই 'ছবি সাথে দেখা' উপন্যাসে কৃত্য হয়েছে। অবশ্যি, নিজস্ব চিন্তাভাবনা প্রক্ষেপনের এই পদ্ধতি বা আঙ্গিক বহু আগেই তৈরি করে নিয়েছিলেন রমানাথ। 'এই দশক'-র একাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত 'গোগা' গল্পটিই সেই ভ্রূণ : 'উপন্যাসের চারিদিকে গোগা থাকবে না। উপন্যাসের চারদিকে কলকাতা থাকবে। মানে কলকাতার মানুষ থাকবে। উপন্যাসের মাঝখানে থাকবে গোগা। গোগার মানুষ। কিভাবে থাকবে? যেভাবে থাকবে। যেভাবে আমার মধ্যে দিনের পর দিন মাসের পর মাস···আমি কলকাতায় আছি। কোনদিন যেন গোগায় যাই নি। গোগা দেখিনি। অথচ আমার চারপাশে গোগা, গোগার গন্ধ।' বলা বেশি এই গোগারই, যা রামানাথের মানসসৃষ্টি এবং আশ্রয়, বিকাশ, দেখি 'ছবির সাথে দেখা' উপন্যাসে।

'তখন আমার বয়স পনের অথবা ষোল। শ্রীমন্তপুরে থাকতাম। কলকাতা নিয়ে কোন মাথাব্যথা ছিল না।'—এমনভাবে শুরু করেছেন লেখক যেন এখুনি তারিয়ে তারিয়ে ভজাতে আরম্ভ করবেন নীল-কমল লালকমল গপ্পো। কিন্তু গল্পকাতর পাঠক ভাঁহা ঠকবেন যখন বুঝবেন কৈশোরাবস্থা, শ্রীমন্তপুর আর কলকাতা কোনো ব্যাপারই নয়—ও-তিনটে আসলে উপন্যাসের খুঁটি, ত্রিভুজের তিনটি জোড় যেমন। আর জোড়টা বেঁধে রেখেছে 'আমি' অর্থাৎ নায়িকা। 'আমি'র কৈশোর যাপিত হয়েছে ছবির সঙ্গে, শ্রীমন্তপুরে ছবি-ই রমানাথের নায়িকা, আছে অথচ-নেই যার অস্তিত্ব। প্রথম পর্বের পর ছবির আর দেখা নেই। সে কলকাতায়। 'আমি কলকাতা যাচ্ছি।'—এই বাক্যে শেষ হচ্ছে শ্রীমন্তপুর পর্বের প্রথম অধ্যায়। এর পর ছবির খোঁজে আমি কলকাতায়। ছবির পাত্তা নেই। ছবির বদলে আমি পেয়ে যায় তুলিকে। আমি ফিরে আসে শ্রীমন্তপুরে। এবং সেখানেই আমির প্রথম আবিষ্কার : এখন জগৎ ছবিময়'। আমি ফের কলকাতায় যায় ছবির খোঁজে। ছবিকে পায় না। বদলে দেখা হয় লিপির সঙ্গে। নতুন উপলব্ধি : 'লিপির মধ্যে ছবি।' দ্বিতীয় আবিষ্কার : কলকাতার সব যুবকই ছবির জন্যে পাগল। সবারই বুকে ছবি, ছবি আর ছবি। আবার শ্রীমন্তপুর। শ্রীমন্তপুরও এখন 'ছবিময়'। সেখানেও তামাম যুবকের বুকে ছবি। ছবিকে পায়না। আমির সঙ্গে দেখা হয় শম্পার। সবার বুকে ছবি মুছে গিয়ে হয় শম্পা। তৃতীয় আবিষ্কার : 'ছবি নিখোঁজ'। আমি ছবিকে খুঁজতে ফের কলকাতায়। ছবির, সঙ্গে, দেখা। ছবি আমিকে বলছে, 'শ্রীমন্তপুরে তো দেখা করার কথা ছিল না। আমাদের কলকাতায় দেখা হওয়ার কথা ছিল।' এবং এই দেখা শ্রীমন্তপুরের ছোট্ট পরিসরে নয়, কলকাতার বৃহত্তর জগতে। তথাচ, উপন্যাসের শেষে, একেবারে শেষ বাক্যবন্ধে, 'বড় জগৎ' অর্থাৎ কলকাতা 'ক্রমশ পেঁচিয়ে পড়তে লাগল '

'ছবির সঙ্গে দেখা' পরীক্ষামূলক গল্প নয়। সাহিত্য আর যা হোক, ল্যাবরেটারি নয়। অন্তরাত্মার বিশ্লেষণ যে সাহিত্যে, তা গবেষণাগার নয়। বক্তৃতা-সুলভ বাচনে, ছেদচিহ্ন বর্জিত সংক্ষিপ্ত বাক্যবন্ধ, কবিতার প্রায় কিন্তু সংলাপাত্মক, একজন 'আমি'র কথনে, সরল অলংকারহীন আবেগবর্জিত মুখের বলার অনুগত ভাষায় সেই অন্তরাত্মা বিশ্লেষিত, প্রকাশিত।

রমানাথের 'ছবি'র মধ্যে আমি নিজের 'সুপর্ণা'কে দেখতে পাই। সুপর্ণা, সুপর্ণা আমার; তুমি কি সবার মধ্যেই থাকো?—রমানাথের ছবি, অমলের লীলা সুব্রতর ইভেট, সন্দীপনের ভগ্নী, সুনীলের নীরা মলয়ের শুভা, সোফিওরের সুচেতা কি আলাদা আলাদা রক্তেমাংসের নয়—? তবু তাদের আত্মার সঙ্গে এক-সূত্রে বাঁধা কেন তোমার আত্মা? তোমার শরীর, তোমার হাইট, বুকের মাপ, স্তনের পরিমিতি, ঠোঁটের আচড়, নাকের বেড়, চিবুকের পায়েস সব সব সব পৃথক হয়েও, তোমার হৃদয়টা অবিকল ছবির সঙ্গে জোড়া কেন?...আসলে বুঝি, সব একজন অস্তিত্বের মনেই একজন সুপর্ণা সবার মনে একজন ছবি থাকে—একাগ্র হতে হতে সব নারীই এই 'ছবি' হয়ে যায়, শুধু নারী নয়, বিশ্বচরাচরে। তাই রমানাথের 'আমি' শেষপর্যন্ত না বলে পারে না: 'আমার চার-পাশে ছবি ছাড়া আর কিছু রইল না। ছবি ছাড়া কিছু দেখতে পেলাম না। সর্বত্র ছবি ছবি আর ছবি।'

॥ চার ॥

আমার দ্বিতীয় অন্বিষ্ট শেখর বসুর 'অন্তরকম'। এটি শেখরের প্রথম উপন্যাস হতে পারে, কিন্তু আক-স্মিক নয় কদাচ। ধীরে ধীরে এগিয়েছেন শেখর। এর সূচনা ষাটের দশকে। 'এই দশকে' গল্প লিখতে এসে শেখর বললেন, 'রুমাল কুড়ানো প্রেমের গল্প আজকাল চলে না। তবে কি নিয়ে গল্প? শুধু রুমাল নিয়ে? হয়তো তাও নয়, তবে? হয়তো কলে চাপানো রুমালের ওই চৌকো নিয়ে, আর যদিও রেখার অস্তিত্ব আদপেই না থাকে, তাহলে হয়তো তখন ওই রুমালের সুতো নিয়ে, কিংবা তা থেকে শিমুল ফুলের সান্নিধ্যে পৌঁছে।'

এরই রূপায়ণ দেখি 'অন্তরকমে'। গল্পের হ্যারি-কেনটা জ্বালিয়ে তা থেকে পুরো কেরোসিন বের করে নেন শেখর। যে উৎকণ্ঠা দিয়ে উপন্যাসের শুরু, মনে হতে পারে একটা তারাশংকর কি বনফুল আয়েশ করে শোনাবেন তিনি। চারপাশের নিপুণ চিত্রগ্রহণ, পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা ও সেগুলির অর্থবহ অ্যাডজাস্ট-মেণ্ট সবই আছে। কিন্তু কিছুদূর এগোতেই দেখা গেল, শেখর পারিপার্শ্বের চেনা-জগতের বর্ণনা থেকে ক্রমে ক্রমে চরিত্রের অন্তর্মূলে চলে গেলেন। তাঁর চরিত্রদের নিজস্ব নাম আছে। 'আমি'-ও হাজির। কিন্তু সুব্রতর 'সে' বা রমানাথের 'আমি'র সঙ্গে শেখরের 'আমি'র তুলনা চলে না। কিছুটা এগিয়েই শেখর কাহিনীকে ছেড়ে দেন। শুধু সচল সরল জীবন্ত নিরা-ভরণ গদ্যে গড়িয়ে যেতে থাকে উপন্যাস—ক্রমে বেগ-বান ও তীব্র সংবেদনময় হয়ে উঠতে থাকে। একটা উৎকণ্ঠা শুধু টান টান করে রাখে 'কাহিনী'র সম্ভাবনা। কিন্তু সম্ভাবনাই সার, কাহিনী নয়। রমানাথের 'কিছু বলার আছে' অথচ বলতে না পারার ছটফটানি, জ্বালা আর অসহায়তার মতোই, শেখরের কাহিনীমুখী এই সম্ভাবনা নিছক আখ্যানবস্তুর লোভে 'অন্তরকম' খুলে বসলে পাঠকের গল্পানুরাগ অচিরে তর্কসূত্রে খুইয়ে ফেলতে বাধ্য।

'অন্তরকম'-এর শুধু আর শেষটা দারুণ সুপ্রাশ। ঝুম করে একটা উৎকণ্ঠা শুরু হয়ে যায় একেবারে গোড়াতেই: 'দৈত্যের মতো দেখতে ওসি তখন থেকে লাল পেন্সিল দিয়ে ফাইলের ডানদিকে খসখস করে কি সব যেন লিখে যাচ্ছিল। লেখা হয়ে গেলে পড়ল, ছুটো টি এর মাথা কাটল, তারপর আমার দিকে তাকা-তেই ওর চোখের কোণ থেকে চোখের সাদায় লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত। বললাম—হিরণ্ময়, হিরণ্ময় রায়ের কেসটা...'মনে হলো এই বুঝি গল্পের ক্লাইট বোঁ করে উড়িয়ে নিয়ে গেল পাঠকের মনটাকে। কিন্তু আঃ-হা, গল্প কোথায়? শুধু তার সম্ভাবনাটা জিইয়ে রাখলেন শেখর আগা থেকে গোড়া অব্দি।

আর শেষটা। 'ও ওপরে উঠে এসে আমার মুখোমুখি বসবে, কিন্তু আমি কি বলব তখন?' ব্যস, এই সংশয় দিয়ে উপন্যাস খতম্। ও-হো, এর চেয়ে মস্তিষ্কের উৎপীড়নের আর কী। উৎকণ্ঠায় শুরু আর সংশয়ে ইতি। মাঝে রইলো রুদ্ধশ্বাস টেনশন, জিজ্ঞাসা আর জরুরী-অজরুরী সব সংবাদ। আর নামে-মাত্র কাহিনী। তিন বন্ধু, একজন হিরন্ময় গ্রেপ্তার, তাকে জামিনে খালাস করবার চেষ্টা করছে দুই বন্ধু। মজার ব্যাপার হলো, কেন এই গ্রেপ্তার, পাঠকের সে-কৌতুহলকে পাত্তাই দেন নি শেখর—যেন জরুরীই নয় খবরটা। বদলে, হিরন্ময়ের হবু বউ প্রতিমার রিপার্কেশনটা জানানো বেশি জরুরী মনে করেছেন তিনি। এবং এই 'জানানো'র খপ্পরে পড়ে বা খুঁজতে গিয়ে শেখর অন্য এক প্রতিমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিয়েছেন, যে প্রতিমা অন্যরকম, পকেটে মানিব্যাগ থাকলে যার সঙ্গে বিছানায় ন্যাংটো শোয়া আর কেলি করা যায়। খবরটা ফাঁস করতে গিয়ে শেখর হিরন্ময় গ্রেপ্তারের উৎকণ্ঠা একটু ফিকে করে আনলেও, মূল সুরে ফিরে আসতে দেরি করেন না। একটা-মাত্র ঘটনাকে পুঁজি করে বেশ কয়েকটা চরিত্রের খোলস উপড়ে দেখাচ্ছেন শেখর। প্লটহীন উপন্যাসে চরিত্রের 'গোপন'কে উন্মোচন করাই যেহেতু লক্ষ্য।

অসতর্ক বুদ্ধ পাঠকের মনে হতে পারে কাহিনীই বুঝি তাকে টানছে; কিন্তু চালাক দীক্ষিত পাঠকের অন্বেষণে ধরা পড়ে, কাহিনীর হাড়ও এখানে নেই যার ওপর গল্পের রক্তমাংস চাপবে। প্রথাবিরোধী উপন্যাসের লক্ষণই এই। স্বাদে হবে টকটক ঝালঝাল নুনমুন কিন্তু কড়াইয়ে কাহিনীর কোনো মশলা পড়বে না। এটা সুখের, যে, শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের শরিক হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা নিজস্ব কায়দা বা ছাঁদই পেয়ে গেলেন শেখর বসু এবং নিছক প্রথাসিদ্ধ ও প্রথাবিরোধী গল্পরীতির সমন্বয় মাত্র থাকলেন না তিনি।

॥ পাঁচ ॥

'আমি শুধু আমার কথাই বলতে পারি—' এটা শাস্ত্রবিরোধী প্রায় সকলের কথা। কিন্তু এর পরিস্ফুটন একা অমল চন্দের লেখাতেই দেখতে পাই বেশি করে। তাঁর 'নিজের কথা' ফুরিয়েও ফুরোয় না। সর্বত্রই আমি, আমি আর আমি। কী গল্পে কী উপন্যাসে—আমির দেখা আমির চিন্তা আমির সমস্যা আমির সংকট। অমল আক্ষরিক অর্থেই 'একক'। তাঁর গল্পে উপন্যাসে অনবরত একটা অসহায়বোধ কাজ করে, যেখানে তিনি একক ও নিঃসঙ্গ, সহায়হীন, নিজেকেও নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। 'লেখার আগে' নিজস্ব অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে অমল বলেছেন, 'এখন এই ঘরে আমি আমার বর্তমানকে নিয়ে বাস করি। ঘুরে ফিরে কেবল আমি আর আমার বর্তমান।...আমি কেবল আমার কথাই বলতে পারি। অথচ আমার অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই, বিশ্বাস নেই, অবিশ্বাস নেই।...গল্পের চরিত্র হবার যোগ্যতাও আমি হারিয়েছি। ঘরে বসে যা দেখি, যা শুনি তাই কেবল বলতে পারি। কাউকে যে বলাতে চাই, দেখাতে চাই বা শোনাতে চাই তাও নয়। তাই আমার গল্পে কেবল রাম, শ্যাম নয়, তুমি নয়, আমি চরিত্রের উল্লেখ করাও অবান্তর হবে। চরিত্রের ছায়া হয়তো থাকবে, গল্পের মেজাজও থাকবে, কিন্তু কোন সুস্পষ্ট বিশ্লেষিত চরিত্র বা নিটোল কাহিনী থাকবে না। লিখতে বসে এই ব্যক্তিগত জগতের কথাই আমার কাছে সবচেয়ে বাস্তব হয়ে উঠেছে। বক্তব্য কিছু নয়, আমার চিন্তার মধ্যে একটা সমস্যা হয়তো আছে, আমি আমার কাছে তার একটা সমাধান চাই মাত্র।'

ছোটগল্পের বাঁধাবুঁধি আওতা থেকে উপন্যাসের বড়ো প্রেক্ষাপটে সাহিত্য সম্পর্কে অমল চন্দের নিজস্ব ধারণা-চিন্তা কতদূর অর্থবহ হয়েছে, তার ইসারা মিলবে অমলের প্রথম উপন্যাস 'অভিযোগ'-এর বিচার-বিশ্লেষণে। ভূমিকা মারফৎ জানতে পারি 'ঈপ্সিতার মৃত্যু' গল্পের মাধ্যমে অমল যে শাস্ত্রবিরোধীতার সূচনা করেছিলেন, তারই পরিণতির দ্বিতীয় পর্যায় সূচিত হয়েছে এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। প্রসঙ্গত, অমল এ-কথাও জানাতে ভোলেননি যে, 'এটা শাস্ত্রবিরোধী উপন্যাসের নমুনা নয়।' কেননা সাহিত্যের কোনো নমুনাই হয় না।

অমল চন্দের আলোচ্য উপন্যাসেও 'আমি' হাজির। তিনি এই উপন্যাসে একজন 'আমি'কে তার ভালোমন্দ গোপনাগোপন সমেত সটান দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন পাঠকের সামনে। এই আমি নিছক একজন 'আমি' মাত্র নয়—তামাম 'আমি'র একজন। মানে, তাঁর এই আমিত্বে অল্প বেশি সব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আমির চারিত্র্য বিদ্যমান। মানে, অমল শেকড়হীন, পরিচয়হীন শুধু বিশেষ-এক আমিকে চিনিয়ে দিচ্ছেন, এমন নয়; চিনিয়ে দিচ্ছেন আমাদেরকেও—স্থাখো, তোমরা কী;—এইভাবে।

কাহিনীটা—মুড়ি, গল্পটা বলবো কি? তবে কম কথায় শুনুন, মন্তব্য করবো না, আমার পূর্বোক্ত কথনের সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন পাঠক। তো, শুরুটা এইরকম: 'বিনয় বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এখনও সে বুঝতে পারল না কেন সে এখানে এসেছে। কারণ আছে দুটো, এক, লীলার সঙ্গে দেখা করা। দুই, জে: ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করা। কিন্তু কোনটে যে আসল কারণ তা সে কিছুতেই বুঝতে পারল না।' উক্ত অফিসের বিরুদ্ধে বিনয়ের অভিযোগ—হাজার চিঠি চালাচালি সত্বেও এই অফিস তার কিছু নির্দিষ্ট অভিযোগের সুরাহা করেনি। আর লীলা এই অফিসেরই এমপ্লয়ি। এক বছর ধরে লীলার সঙ্গে দেখা নেই, অথচ এই লীলার জন্যেই বছরের কতো সন্ধে বিনয়ের কেটেছে একটি নির্দিষ্ট রেস্তোরায় অপেক্ষায় অপেক্ষায়। অফিস ও লীলার বিরুদ্ধে বিনয়ের অভিযোগ দুটো ঘেঁটে দেখলে, মনে হবে, দুটো দুই মেরুর—একটা বৈষয়িক, অন্যটা আত্মিক। কিন্তু উপন্যাসে ঢুকে পড়লে দেখি, দুটোর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। ব্যক্তিরই বা বিনয়েরই বা আছে কি? চারদিকের ঘটনাচক্র তাকে পরিচালনা করে মাত্র। উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশে, তাই, বিনয় আর 'বিনয়' থাকছে না - সে 'আমি' হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ অমল 'আমি'কে দেখছেন দুটো স্তরে—বাইরে থেকে ভেতর থেকে। আর নিজেরই অসহায় অস্তিত্বের স্বরূপ স্পর্ধাভরে দেখিয়ে দেন: 'আপনার পারসোনাল মার্ক আর আইডেন্টিফিকেশন নেই। দেখুন তো খুঁজে, একটা তিলটিল বের করতে পারেন কিনা।'

॥ ছয় ॥

বাস্তবের পথে উল্লঙ্ঘন চলেনা, সেখানে প্রতিটি ধূলিকণা শিরোধার্য—'পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে'। শাস্ত্রবিরোধী কথকদের মধ্যে সে টেনডেন্সিও নেই। তাঁরা বাস্তবের কাছিতে পরবাস্তবের ডোর যেমন বেঁধেছেন, অনঙ্গের মধ্যে অঙ্গের অস্তিত্বকেও তেমনি মাথা পেতে নিয়েছেন। 'দেহ' একটা কোশ্চেন-মার্ক হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁদের কাছে। 'অর্থহীন জীবনে শরীর কী আনন্দের উৎস?' —এ প্রশ্ন রমানাথ বারবার তুলেছেন, যেমন তুলেছেন সুব্রত সেনগুপ্ত। অধিকন্তু এই ধারার উপন্যাস লেখকদের মধ্যে সুব্রত-এই যৌনগমন বা দেহগমনের ভাগ বেশি। ক্কচিৎ মনে হয়, বিবিধ মর্ষকাম ও যৌন অভিমানময় এলানো বাক্যবৃত্তকেই সুব্রত গল্পের নিয়তি বলে ধরে নিয়েছেন।

তা যদি হয়ও, সে-যৌনতা আমার কাছে সমর্থেয়। ক্যাননা যৌনতাই হলো সেই বিন্দু যেখানে সামাজিক সব প্রাণী গরীব মূর্খ ধনী চালাকে ভেদ মিটে গিয়ে একশেষ। সাহিত্যে সুশ্লীল অশ্লীল বলে কোনো শ্রেণীভাগ আমি মানি না; শ্রেণী গোষ্ঠী গোত্র এলাকা বিশেষে শব্দ দুটো ভিন্ন ভিন্নার্থে প্রযুক্ত হচ্ছে মাত্র। অতএব যৌনতাকে লাগামমুক্ত করে ভাষার মধ্যকার দ্বন্দ্ব ধ্বংস করা প্রয়োজন। সুব্রত সেনগুপ্তের উপন্যাসে যৌনধর্মের কামশাস্ত্রীয় বা ভারতচন্দ্রীয় বিবৃতি নেই, আছে হার্দ্য আবেদন মাত্র। এখানেই সমরেশ-সুনীলের যৌন-সাংবাদিকীর থেকে শাস্ত্রবিরোধী যৌন-প্রক্ষেপের দগাদগে ফারাক। এখানে নিচক সোনা-বউদিদিদের রিরংসা বর্ণনা নয় এবং পাঠক আমদানির হীন স্বার্থে ম ম যৌন-বর্ণনায় সুব্রত আস্থাবানও নন। দৃষ্টান্তের তাগিদে আমি সুব্রতর 'এ জীবনের বদলে' উপন্যাসটিকে আশ্রয় করছি:

'ট্রেন চলতে সুরু করল। আমরা জানালার পাশে দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসেছি। ইভেট পা তুলে কিভাবে বসেছে! বাতাসে ওর একরাশ চুল উড়ছে। একরাশ চুলের মধ্যে ওর ভারি সুন্দর মুখখানা। আমার চোখের সামনে ওর দুটো চোখ, পাতলা ঠোঁট দুটো। ইভেট ইভেট ইভ ইভা। ইভা আমার। ওর সাদা চমৎকার হাতদুটো আমার। ওর মুখ, সমস্ত শরীর আমার জন্য।'

উপন্যাসের শুরু এভাবে। গোড়ায় ভ্রম হবে নবোকভের 'লোলিটা'র বাংলা সংস্করণ পড়ছি কিন্তু পরে ভ্রম টুটে দেখি এ অন্য জাতের। গল্পো বাদ দিয়ে পড়লে যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, এখান থেকে একটু খুবলে ওখান থেকে একটু খাবলে, এইভাবে তুলে ধরা যায়: 'চলতে চলতে ট্রেনটা দুলছে তার সঙ্গে সঙ্গে ইভেটের শরীরও দুলছে।...মুখ বাড়িয়ে ওর মুখে অন্তত একবার চুমু খেতে ইচ্ছে করছে। খাবো? ...আমার চোখের সামনে ওর ভেজা ঠোঁট, জ্যান্ত দুটো স্তন, ঢালু পেট—সমস্ত শরীর।...একটু দূরে লেভেটরির দেয়ালে ঠেস দিয়ে একটি আদিবাসী মেয়ে বসে আছে। তার নাকের নোলক দুলছে। ট্রেন চলছে।...ইভেট শুভ্রার থেকে অনেক সুন্দরী ইভেট আমাকে কামার্ত করে, মোহে অ চ্ছন্ন করে ওকে নিয়ে কলকাতার বাইরে আসার উদ্দেশ্য ছিলো, ওকে একা পাওয়া। একটানা অনেকক্ষণ ওর সঙ্গে পাওয়া। কলকাতায় ভাল করে প্রেম করার জায়গার এতো অভাব।... ঘরে ঢুকে দেখি, ইভেট তক্তপোষের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে।...ওর পিঠের ওপর হাত রাখলাম। ও একইভাবে শুয়ে থাকলো। সোফার সামনে গিয়ে ওকে দু হাতে শূন্যে তুলে নিলাম।...ব্লাউজ আর মিনি স্কার্টে সামান্য ঢাকা সম্পূর্ণ শরীর নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো।...আমার চোখের সামনে ওর হালকা স্কার্ট মসৃণ দুই উরু। মেয়েটা আমাকে অফিসের মধ্যে এরকম শাস্তি দিচ্ছে কেন?...ও মাথা কাত করলো। উঠে ওর কোলে মাথা রেখে সোফার ওপর শুয়ে পড়লাম। ওর একটা হাত আমার বুকের ওপর। আমার কপালে ইভেটের উষ্ণ ঠোঁটের স্পর্শ অনুভব করলাম।... ওর মাথাটা আমার বুকের ওপর টেনে নিলাম। এই মাথাটা ইভেট পিটারের আর এই হাত দুটো—এই বুক আমার। আমার। আমরা এইভাবে বসে থাকার জন্য কলকাতা থেকে এখানে ছুটে এসেছি! নিজেকে বলতে শুনলাম, আমি তোমার কতো নম্বর প্রেমিক? ...আমার কি একথা বলা ঠিক হয়নি?...কেন চুপ করে আছি আমি? আমার তো উচিত এখন ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে ভালবাসি ভালবাসি ভালবাসি বলা। কিন্তু আম র কেমন মনে হতে লাগলো, ওভাবে বলাটা বড় নাটকীয় হবে। এ সময় হঠাৎ কেন শুভ্রার কথা মনে পড়লো?—মনে পড়ুক। শুভ্রার কথা এখন ভাববো না। ইভেটকে আমার চাই। ইভেটের দিকে

এগিয়ে গেলাম।…আমার চোখের সামনে ইভেটের মুখ, গলা, খোলা কাঁধ, মসৃণ উরু। আমি ওর সামনে গিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরতে গেলাম। ও নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো। আমি নীচু হয়ে ওকে চুমু খেতে গেলাম। ও একটা হাত তুলে আমার মুখ সরিয়ে দিলো।…ও আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ব্রা ব্লাউজ, শাড়ি কুড়িয়ে নিলো। আমার চোখের সামনে ওর শরীর ঢাকা পড়ে গেল।…'…

পাঠককে মনে করিয়ে দিচ্ছি সেইখানটা, দ্রোণাচার্য যেখানে টার্গেট-প্র্যাকটিস যাচাইয়ের জন্যে প্রথমেই যুধিষ্ঠিরকে ডাক দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলে, 'কী দেখছো?' যুধিষ্ঠির ইনোসেণ্টলি জানালো: 'আশেপাশের সবকিছু দেখছি বনজঙ্গল পাহাড় নদী, গাছের ওপর পাখি, আমার ভাইদের, ইভেন আপনার শ্রীচরণ দুটি পর্যন্ত—স-অব।' শুনে দ্রোণ তাকে 'তোর কিস্সু হবে না' বলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেন। আমার ধারণায়, শাস্ত্র-বিরোধীদের মধ্যে একমাত্র সুব্রতই, যৌনগমন ব্যাপারে অর্জুন—বাদবাকি সব যুধিষ্ঠির। পাঠকের যৌনাঙ্গ ঠাঠিয়ে তোলার ষড়যন্ত্র সুব্রতর নেই। বুর্জোয়া ছেনালিতে পা দেননি তিনি। যৌন-বিবরণ সুব্রতর অমোঘ পুঁজি হতে পারে, কিন্তু রাজনীতি ধর্ম সং-স্কৃতির মতো ক্ষুদ্রতা নীচতা তাতে নেই। মলয় রায়-চৌধুরী যেমন বলেছেন, 'যৌনমাংসের তেলতেলে গন্ধ ছাড়া এই সমাজে কোনো বিজ্ঞাপন সফল নয়'—এমত অবধারণায় সুব্রত আস্থাশীল, তা ও নয়। আসলে, যা না লিখলে পাঠকের অবচেতনার টুঁটি চেপে ধরা যায়না এবং যা অবান্তর টিকিহেলন সাহিত্য—সেই লেখা লিখে, 'এ জীবনের বদলে' লিখে সুব্রত একটা 'প্রতিবাদ' গড়ে তুলেছেন। সেখানে প্রচলিত ফর্ম অবশ্যই ভাঙা। কোনো গল্প বলা নয়, অদ্ভুত চরিত্র উপস্থাপন নয়, বিশেষ মনস্তত্ত্ব বা সামাজিক সমস্যার কচকচির মুখে ঝাঁটা। আমার লেখার মূল চরিত্র 'আমি'। আমার বিষয় 'আমি'। আমি যা বুঝি তা নয়, যা করি আমি তা-ই।

॥ সাত ॥

জেনে কেউ যদি হাসেন আমার কিছু করণীয় নেই, যে, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি' রচনাটি না-কম চল্লিশ বার পড়েছি আমি, খুবলে খাবলে। পড়েছি, পড়তে পারা গেছে, কেননা এতে কাহিনী নেই। আছে একটা চিন্তাস্রোত। চালাক পাঠকের আবার মনে পড়বার কথা ধূর্জটি প্রসাদের উক্তিটি। যে, ভালো উপন্যাসে কাহিনী থাকবে না, থাকবে শুধু চিন্তাস্রোতের বিবরণ। সন্দীপন শাস্ত্রবিরোধী লেখকদের তালিকভুক্ত নন, বরং কিছুটা হাংরিয়ালিস্ট, তথাচ তিনি বিশেষ-ভাবে 'অন্তর্জগতের লোক'। ঘোষণা করেন না বটে, কিন্তু, লেখায়, তিনিও, 'নিজের কথাই' বলেন। এবং যিনি নিজের কথা অর্থাৎ মনোভাবের ইঁট পাঠ-কের বুকে গাঁথবেন, তিনি যে গপ্পো কাঁদবেন না, সে তো রফা হয়েইছে।

'আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি'-তে কাহিনী নেই-ই, তা নয়; আছে। কিন্তু তাকে ঠিক কাহিনী বলবো না। একটা সূক্ষ্ম লাইন যেন, গল্পের একটা ফিনফিনে আভাস চাপানো আছে আগা থেকে গোড়া ওব্দি। সেই বনিয়াদ, ওতেই উপন্যাসের ইমারৎ। 'জীবনের আর সবকিছু যেন পিছনে, করিডোর দিয়ে সামনে হেঁটে গিয়ে সে লিফটের সামনে দাঁড়ায়'। গল্পটা তেমনি, মানে, ফ্লাসব্যাক; এবং মাঝেমধ্যে ছিটেফোঁটা 'এখন'। রেজিস্ট্রি বিয়ের দিনক্ষণ একেবারে যখন ঠিকঠাক, তখুনি হেবাজ ছ মাসের জন্য আমেরিকা চলে গেলেন। 'যাবার

আগের দিন জয়ন্তী ওঁর গরচা রোডের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। 'বুকে মাথা রেখে কেঁদেছিল...। হেমাঙ্গ সস্নেহে 'দেখতে দেখতে কেটে যাবে' এর বেশি কিছু তাকে বলে যেতে পারেননি।' তারপর জয়ন্তীর বাড়িতে টেকা দায়। ব্যাজার মনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। 'ঘুরতে ঘুরতে, ঘুরতে ঘুরতে, সেদিনই দুপুরবেলা প্রথম মিউজিয়মে গিয়ে বসে।' সেখানেই রানার সঙ্গে আলাপ। ক্রমে বন্ধুত্ব, সান্ধ্য-সাথী। এবং...। রানার এক কামরা ফ্ল্যাটে জয়ন্তী এসেছিল এবং সেখানেই, 'না-না, প্লীজ, রানা, আই অ্যাম এনগেজড' হাউমাউ কান্না সহ জয়ন্তীর বাধা উপেক্ষা করে, একটানে ছিঁড়ে ফেলেছিল রানা তার ব্লাউজ আর ব্রেসিয়ার—'আ-খাওয়া মড়ি যেন বাঘের, রানা ঝোপের কোপের মধ্যে টুঁটি ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।' এবং অতঃপর? 'কামসূত্রে এমন কোন পোজ আছে যা জয়ন্তী দেয়নি, এমন কোন পারভার্সান যা সাদ-এর মার্কুইস ভাবতে পেরেছিল আর রানা পারেনি'। জয়ন্তীর পেটে বাচ্চা এসেছিল। 'ডোণ্ট কিল মাই বেবী': রানার কাতর অনুনয়কে হেয় করে প্রেতনীর হাসি হেসে জয়ন্তী বলেছিল, 'সে জন্মালে, নিজের হাতে গলা টিপে তাকে খুন করব।'...কিন্তু বাচ্চাটাকে বাঁচাবার জন্যে অন্তত একটি মরীয়া চেষ্টা কি জয়ন্তীও করেনি? 'হেমাঙ্গ ফিরে এসেছেন জেনে, সে তাঁর গরচার ফ্ল্যাটে একা গিয়েছিল।...দরজা খোলামাত্র সে চুমায় চুমায় ভরিয়ে দিয়েছিল হেমাঙ্গর মুখ, নিজের হাতে ছিটকানি তুলে দিয়েছিল ও শার্টের বোতাম খুলেছিল, এবং বিছানায় নিয়ে গিয়েছিল। রানার পরামর্শ পাবার আগেই, হেমাঙ্গ ফেরামাত্র, সে এ-ভাবে রানার সন্তানকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল—এ-ভাবে একদিন বেহুলাও নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়, বাংলার ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো হয়ে জয়ন্তীর পায়েও কেঁদেছিল।' রানা সবটা জানে না। তাকে সব কথা বলতে পারেনি জয়ন্তী। কিন্তু হেমাঙ্গকে কিছু লুকোয়নি, বলেছিল স-ব। উনি বললেন, 'আমি তোমাকে বিয়ে করব জয়ী, তোমার কৌমার্যকে তো নয়।' এমন-কি, জয়ন্তী বাচ্চা রাখতে চাইলে, উনি তাতেও রাজি ...তবু তবু তবু, জয়ন্তী বিয়ে করল না হেমাঙ্গকে। রানাকেই স্বামী হিসেবে বেছে নিল। কেন? তার জবাব সন্দীপন দিয়েছেন উপন্যাসের একেবারে শেষ বাক্যে। সেখানে আমরা রানাকে পাই, নার্সিং হোমের রোগশয্যায় লোটানো অবস্থায়। 'জয়ন্তী তার মাথার কাছে বেডের রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়েছিল'। সেখানেই, রানা, একটাই কথা ভাবতে পেরেছিল। যে, 'জুতো থেকে খুলে-নেওয়া পথিক পায়ের ওপর মেয়েদের মূল্যবোধগুলো পথের ধুলো বৈ কিছু তো নয়।'

উপন্যাস শেষ। যদি গল্প বলি, তবে, ওইটুকুই। পর্যায়ক্রমে বললে, মনে হয়, সমরেশ কি সুনীল শুনছি। কিন্তু গল্পটা ও-ভাবে বলাই হয়নি। ধারা-বাহিকতা একেবারেই নেই, হেলায় সে-পথ পরিত্যাগ করেছেন সন্দীপন। ভাষা অন্বয়জটিল তো নয়ই, চিত্রময়তাও দুর্লক্ষ্য। যাকে বলি stream of consciousness, তেমন কোনো ইণ্টেলেকচুয়াল কৌশলও ব্যবহার করেননি সন্দীপন। তবে, কী দিয়ে কোন্ উপায়ে তিনি চল্লিশ বার পড়িয়ে নেন এই উপন্যাস? শুধু যে কাহিনীহীনতার জন্যে, নয়, তা স্বীকার্য; হলে, সেই একই গুণে অমল তাঁর 'অভিযোগ' আর সুবিমল তাঁর 'রামায়ণ চামার' অন্তত একশো দফায় পড়িয়ে নিতে পারতেন।

আসলে আমি সাদামাটা গল্পের জাত-পোকা। এমন গল্প, যা কারো সঙ্গে মেল খায় না—যা শুধু এক-জনের অলংকার হতে পারে, অহংকার তো বটেই। বাংলা গল্পের চলে-আসা ফাঁকিচিত্তির, পিলপিলে, সাংবাদিকী আর কোঁচো ভাষার মুখে থাপ্পড় মারার

তাকৎ আছে অনেকের, কিন্তু তার পেছনে এমন জোর? এ: হে, খুব কম করে বললেও, সন্দীপনের গল্পের কাছে ষাট-সত্তর-আশির গল্পিকরা অন্তত নুইয়ে যান। নমুনা? তুলে দিলুম কয়েক টুকরো—

ক) 'চাকরি নিয়ে তো তোমাদের টানাটানি। আমার ঘণ্টা, আমার বড় জোর লাইসেন্সটা যাবে। ব্ল্যাক-লিস্টেড হব। এস-ডি মানিটা ফরফিট করবে; আর কী। আরে বাবা, রানা তো কুঁচো চিংড়ি। সেই যে সেবার তিস্তায় বন্যা হল। রোজ ১00 লরি করে বোল্ডার ফেলার কথা, এক মাস। নাডু দত্ত ৭0 লরি করে ফেলে গেল। এক মাসে ৯00 লরি পাথর হজম। পার লরি ২000 করে ধরলেও ১৮ লাখ টাকা। সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ার থেকে এক্সিকিউটিভ, এস-ই, মন্ত্রী কে টাকা খায় নি। নাডুর কি হল! ঘণ্টা। তোমার ডিপার্টের কুচ্ছো আর না বলালে গুরু!'

খ) 'রানা ভাবছিল হয়ত ট্রেনেই এক রাউণ্ড সেক্স হয়ে যাবে। হলে ট্রেনে—সেক্স হতো এই প্রথম। বালেশ্বরেই তাদের কুপেতে দুজন উঠবে না? বাইরে ঘন-ঘন বিদ্যুৎ, জগবন্ধুর কৃপায় শালাদের মাথার চাঁদিতে এক জোড়া আ-ভাঙা বাজ পড়ে না?'

গ) 'শাড়ির ওপর পাড়হীন সাদামাটা তুষের চাদরটা সে এমনভাবে তার শুধু-শরীরে জড়ালো যে দেখে মনে হল হয় তার এখুনি খুব শীত পেল, নতুবা, ছোটখাটো শরীরটাকে সে ঢেকে-ঢুকে রাখতেই ভালোবাসে।'

এমনিই, যে, একটুখানি পিছলে গেলেই, পাঠকের চোখ, বিশ্বরূপ-দর্শন থেকে বঞ্চিত হবে। আমি জানি সন্দীপন কিছুদিন হাংরি করেছিলেন, নকশাল পন্থায়ও তাঁর আলগা যোগ ছিল—অন্তত এ-দুটির দ্বারা তিনি জোর-প্রভাবিত; অথচ তাঁর গল্প তাঁর ফুল পারসেন্ট স্বতন্ত্র, নিজস্ব। অন্তত, তাঁর সমীপকালীন ও স্বধার্মিক মলয় রায়চৌধুরী, সুবিমল বসাক, সুভাষ ঘোষ ইত্যাদির মতো পাকা গল্প-লিখিয়ের চেয়ে তিনি, কয়েক অংশে, বেশি।

'আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি'-র ভালো-লাগার পেছনে আরো কতকগুলো পয়েন্ট আছেই, যা আমাকে কেড়ে নিয়েছে কাছে। তারই মধ্যে একটি কথন-পদ্ধতি, আর-একটি চরিত্র-অঙ্কন শেষোক্ত পয়েন্টেই আমি কাৎ হয়েছি বেশি, অপেক্ষাকৃত। সন্দীপনের নায়ক, রমানাথ শেখর সুব্রত ইত্যাদির নায়কের মতোই, আমি'। অর্থাৎ স্বয়ং লেখক। কিন্তু তার নিজস্ব নাম আছে। এখানে, সন্দীপনের রাণা ওরফে হর্ষেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল, তাঁর নিজেরই মতো, প্রচল-নগরসমাজের এক অবিমিশ্র ট্র্যাজিক চরিত্র; তার সমস্যা বা রোজকার কাজকর্ম আজকের গড় বা অ্যাভারেজ যুবকের সমস্যা ও কাজকর্ম। তার বেদনা অলুনি ছটফটানি সবই 'আমার। সে বড়ো অসহায়। আমারই মতো নিঃসঙ্গ আর আমারই মতো চলা-ব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং রাগী এবং সবচেয়ে বড়ো কথা তার চিন্তাজগৎ মূল্যবোধ ধ্বংসের ডাস্টবিন, কেননা সে শেষোক্ত এই নিষ্কর্ষে পৌঁচচ্ছে যে, 'মেয়েদের মূল্যবোধগুলো পথের ধুলো বৈ কিছু তো নয়।' এদিক দিয়ে সন্দীপন হের্মান ব্রখ-এর সমতুল এবং 'আমি আরব গেরিলাদের…' ব্রখের 'দ্য স্লিপ-ওয়কর্স'-এর সমকক্ষ বললে আমার গলায় জুতোর মালা ঝুলবে না নিশ্চিত। অবশ্যি সন্দীপন ব্রখ-এর মতো অমৃতের নীলকণ্ঠ নন, সে অন্য প্রসঙ্গ।

আবির্ভাবটা ষাটে, এবং হাংরি হাঙ্গামার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নামটা, তাই বলবার মতো সাহসী লোক পাওয়া যায় না, যে, একালের উপন্যাস সাহিত্যের পাইপগানটা সন্দীপনের হাতেই ফিট। তাঁর চেয়েও শক্ত-মুঠো গল্পকার আছে, মানি; কিন্তু সন্দীপন

সন্দীপনই। রবি ঠাকুরের কালে জন্মালে ইনি, নিবারণকে আমরা রক্তে-মাংসে পেতুম। সে কথা আপশোষের। আমার বলার একটাই কথা, যে, ভিন্ন ধারার উপন্যাসের গল্পটা ঠিক এইখানে বাঁক নিল সস্ত জোবাই-করা পাঁঠার রক্তের মতো টকটকে রঙে। ফিনকি মেরে ছিটে ছড়াচ্ছে এখন।

॥ আট ॥

আলোচনার শেষ ধাপে, তালিকার নটে গাছটা মুড়োবার আগে, এখানে, আমি বিশিষ্ট অথবা স্বল্পজন-শ্রুত একটি সুমিষ্ট নাম উচ্চারণ করছি : সুবিমল মিশ্র। ইতিমধ্যেই যিনি মৌলিক, প্রতিভাবান, রাগী ও অ্যান্টি-উপন্যাসের জনক হিসেবে সার্টিফিকেট পেয়েছেন। সুবিমল পূর্বোক্ত কোনো লেখকের ঘরানার নন। তাঁর মুঠো অসম্ভব রকমের বড়ো এবং আলাদা। সম্প্রতি, বিজ্ঞাপন থেকে জেনেছি, উনি ছোটো কাগজ ছাড়া লেখেন না। র‍্যাডিক্যাল আর নন-কমার্শিয়াল —যে দুটি শ্রেণীভাগ আমাদের উপন্যাসের ক্ষেত্রে করা হচ্ছে, তার কোনো খোপেই সুবিমলকে চাপানো যায় না। তিনি বিশিষ্ট মনোযোগ ও অভিনিবেশের দাবিদার।

সুবিমল মিশ্রের প্রথম উপন্যাস 'আসলে এটি রামায়ণ চামারের গল্প হয়ে উঠতে পারতো' শুধু তাঁরই কেন, গোটা বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রথম অ্যান্টি-উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। আমি মানি, কোনো প্রকরণের বিশেষণ হিসেবে চিহ্নিত Anti কথাটা যিনি ব্যবহার করবেন, তিনি আলবৎ কমিটেড (বিশুদ্ধ ?) এবং অল্পবিস্তর বা সর্বাংশে মার্কসবাদী ; যদিচ শিল্পে কমিটমেন্ট মানেই মার্কসবাদী দলে নাম লেখানো নয়। মার্কসবাদী না-হয়েও, প্রয়োজনের তাপে গরম হয়ে কিংবা মানবধর্মে উদ্বুদ্ধ হয়েও যে সরাসরি চোট মারার ব্যাপারটা লেখায় আসতে পারে, তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ সুবিমল মিশ্র। কোনো খাস সময়ে, বিশেষ কোনো প্যাটার্নে লড়াই চালাতে গিয়ে মানবতাবাদী লেখক মাত্রেই anti-poetry, anti-novel ইত্যাদির শরণ নিতেই পারেন। অ্যান্টি-উপন্যাস মানে 'যা উপন্যাস নয়' বা 'উপন্যাস-বিরোধী' নয়। অধিকিন্তু, এর পৃষ্ঠপোষকেরা 'উপন্যাসে'-র আগে 'অ্যান্টি' উপসর্গ জুড়ে দিয়ে বোঝাতে চান, যে উপন্যাস 'পরম্পরা-রহিত', যা গতানুগতের বিরোধী, অশাস্ত্রীয়। আজ যেখানে পৃথিবী ধুঁকছে, জর্জর মানব সমুদায়, হাজার হাজার বছর ধরে একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষের দ্বারা লুণ্ঠিত ও ধর্ষিত এই পৃথিবীর জন্য, মানুষের পক্ষে কিছু লিখতে হলে পোশাকি শব্দ, প্রচল ফর্মের প্রসাধন ঝেঁটিয়ে ফেলতেই অ্যান্টি উপন্যাস প্রয়োজন। ওঠাতে হবে ধারালো চকচকে শব্দ, কর্কশ বাক্যবিন্যাস এবং কামানদাগার ব্যঞ্জনাস্পৃহা। অ্যান্টি-উপন্যাসের পক্ষে আর কিছু বলার নেই আমার।

বলার আছে সুবিমল মিশ্র সম্পর্কে। একটি নয় দুটি নয়—তাঁর তিনটি উপন্যাস প্রসঙ্গে। সুবিমলের পেছনে 'রাগী' বিশেষণটি চালু করে দিয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্ভবত তাঁর তেজ নিষ্ঠা আর ক্রোধ দেখেই। অনেকের বিশ্বাস, 'তাঁর কাছাকাছি দাঁড়াবার মতো আর কোন ব্যক্তিত্ব নেই।' মোদ্দা কথা, প্রগতিক অ-প্রগতিক দুই মহলেই সুবিমল সমান বিতর্কিত নিন্দিত প্রশংসিত।

সুবিমলও তাঁর উপন্যাসে 'কাহিনী' বলেন না। টানা ফ্যাদলানো গপ্পো তো নয়ই। কেন? মার্ক টোয়েন নিজের একটি বইয়ে ইনজাংশন জারি করেছিলেন : 'Persons attempting to find a motive in this narrative will be prosecuted, persons attempting to find a moral in it will be banished, persons attempting to find a plot in it

will be shot.' মর্যাদার ঘোষণা 'এই দশক' কাগজেও করা হয়েছিল, উল্লেখ করেছি আগেই : 'গল্পে এখন যারা কাহিনী খুঁজবে তাদের গুলি করা হবে'। মানে একটাই যে, ঘোষকেরা নিজেদেরকে প্রখরভাবে 'অন্তর্জগতের লোক' মনে করেন। কিন্তু আগরবাতি সাহিত্যের পড়ুয়া মাত্রেই গল্পলোভী, যারা লেখকের অন্তর্বিশ্বের চাইতে বহির্জগৎটাকেই চায় বেশি করে। মধ্যবিত্ত আর্থ-পীড়ায় জর্জরিত মানসবৈকল্যে লাট-খাওয়া লেখক যেখানে আত্মাবিষ্কারে আত্মখননে মগ্ন—সেখানে গল্প দিয়ে বোঝানো যায় কতটুকু ? সেইজন্যেই, অন্তর্জগৎ পর্যায়ে পাঠকের মনকে সেঁদিয়ে দিতে লেখা থেকে গল্পটাকে লোপাট করে দেওয়া। চিন্তা, চিন্তা, চিন্তাই আসল, ওটা ছড়াতে পারলেই ঠাহর মিলবে রক্তের সঙ্গে মিশতে পেরেছে কিনা খাঁটি জিনিসটা। সুবিমল তাই চটকদার রগরগে গপ্পো ফাঁদেন না, তিনি চান প্রেক্ষাপট, স্রেফ প্রেক্ষাপট—যাতে চড়িয়ে দেয়া যাবে চিন্তাধারার সূক্ষ্ম আঁকিবুকি।

কী সেই প্রেক্ষাপট ? আমরা দেখছি, আগেই বলেছি, এটা বিতর্কহীন সিদ্ধ কথা এবং শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের নেতারাও মানতেন. যে, সাহিত্যের কোনো নমুনা হয় না। একজন সৎ লেখকের যাবতীয় রচনাবলী তাঁর বিশিষ্ট আন্তরিক ভাবনা ও অস্থিরতার স্বাক্ষ্যবাহী হতে পারে কিন্তু একটি অপরটির ভাষণান্তরে পুনরাবৃত্তি নয় ; কোনো প্রকৃত লেখাই অন্য লেখার নকল নয়। সুবিমলের 'রামায়ণ চামার' আর 'হারাণ মাঝির' মধ্যেও ভাবনাগত সাদৃশ্য আছে আলবৎ কিন্তু একে অপরের ব্লু প্রিণ্ট নয়। এক মধ্যবিত্ত লেখকের রামায়ণ চামারদের মতো মানুষগুলোর গল্প লিখতে না পারার গল্প 'আসলে এটি রামায়ণ চামারের গল্প হয়ে উঠতে পারতো' মধ্যবিত্ত শ্রেণী, অর্থাৎ ধরুন আমরাই, আমাদের যাবতীয় মূল্যবোধকে মাটির ধুলোতে নামিয়ে এনেছি কিন্তু আমাদের এই অধঃ-পতনকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে গেলেই আমরা ফোঁস করে উঠি। কিন্তু সুবিমল আর পাঁচজনের সমান নন, তিনি তাঁর স্বকীয় বাক্য-গঠনে—যে বাক্যবন্ধে রয়েছে সুরিয়ালিস্টিক প্রবণতা, রয়েছে সাং-বাদিকের সাটায়ার, স্লোগান, কোথাও যা চিত্রল, বাঁকা আর বিধ্বংসী—তাঁর বলার কথা বে-হিচক বলে যান।

কী বলার আছে সুবিমলের ? দেখছি, তিনি কোথাও বলছেন—'যখন সাধারণ মানুষের বাঁচার লড়াইকে গণতন্ত্রের মুখোশে রোখা যায় না তখন এরা বুলেটের সাহায্য নেয়'—কোথাও বলছেন, 'লোকটা গাধা। লোকটা স্বপ্ন দেখে না।' আবার কোথাও বলছেন—'গোটা দেশের সমস্যাগুলো, জটপাকিয়ে এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছে যে স্তোত্রবাক্য যোগ হঠযোগ ক্যারাটে সমাজতন্ত্র গান্ধীবাদ এম-এল জ্যোতি বসু সাঁইবাবা এসব দিয়ে আর কিসুস্যু হইবো না। জনতা দিন দিন···একটু ভেবে দেখুন...সবকিছুর ওপর খিঁচিয়ে উঠছে···উঠতে চাইছে।' এবং বলেন—'আমাকে গুলি করে মারতে পারো কিন্তু আত্মসমর্পণ করাতে পারো না। আমি শোষিতদের জন্য লড়াই করি, আমি মেয়েদের ইজ্জত বাঁচাই। এই জমি এক-দিন যে চাষ করতো তার হবে। যদি আমাকে তোমরা মেরেও ফেল তবু এ ঘটবেই।' এবং তাঁরই হাত মারফৎ পাই : 'দঃ বোম্বাইয়ের চৌপট্টির অদূরে আরব সাগরে সাংবাদিক বোঝাই একটি নৌকা উল্টে যায়। সঞ্জয়ের চিতাভস্ম বিসর্জনের অনুষ্ঠানের বিবরণ লিখতে সাংবাদিকরা সেখানে গিয়েছিলেন। সুখের খবর তীরের কাছেই ঘটনাটা ঘটে এবং জলও খুব অল্প ছিল। সাংবাদিকরা সবাই নিরাপদে পৌঁছান। তবে লেখালেখি সব জলে ধুয়ে গেছে।' এসব উদ্ধ-রণের পর আর মন্তব্য চলে না কোনো।

বাঞ্ছিত জীবনের দিকে ধাবনের অভীপ্সা, হাজার

পাঁকের ভেতর দিয়ে সাঁতার কেটে, সুবিমলের 'রঙ' যখন সতর্কীকরণের চিহ্ন'-র উপজীব্য। বস্তুবাদী চেতনা না হলে এই প্রবণতা আসেনা। উপন্যাসের তাৎপর্যময় শেষভাগে লেখককে একটি নির্দিষ্ট রঙে—আশ্রয় নেবেন না নেবেন না করেও শেষোক্তি—আশ্রয় নিতে হয়। সেই রঙ লাল। কিন্তু গেরুয়া বা ঝাড়-খণ্ডী লাল নয়, সতর্কীকরণের রঙ—লাল। 'রঙ'-এর হিরো সম্ভবত 'এই সময়'। এবং এখানে সুবিমলও 'সময়ের' অবিচ্ছিন্ন চরিত্র হয়ে ফুটেছেন। ধারালো, অসম্ভব ঝাঁঝালো আর রাগী কলম তাঁর—যার দরুণ মধ্যবিত্ত পাঠক তাঁর ওপর খাপ্পা। রাজনীতিক চোখ বেশ ঝরঝরে, চোখা।

সুবিমলের প্রবাদপ্রতীম প্রথম বইটি, আন্টি-উপন্যাস নয়, 'হারান মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া বা সোনার গান্ধী মূর্তি'-র দ্বিতীয় দফায় ছাপাই হয়ে গেল চুপিচুপি। এমনই প্রচার-উদাসীন তিনি, যে, বিশিষ্ট ক'জন ছাড়া বইটা চোখেই ছাখেনি কেউ। কমল-কুমার মজুমদার বলেন, 'আমার কাছেতে তোমার (সুবিমলের) দেখার ভঙ্গীটি যারপরনাই সাহসের মনে হইল।' বিলকুল সত্য, যে, আমরা অনেকেই এই সত্য দেখি কিন্তু ফোটাতে পারিনা এমনতর অনন্যতায়। জেমস জয়েস যেমন বলেন, উপন্যাসিকের প্রধান গুণ হওয়া উচিত 'স্পষ্টরেখ হওয়া' সেটা সুবিমলে পুরো মাত্রায় মজুত। এর পরেও আমাদের অবাক হবার কোশচেন থাকেনা যখন তিনি বলেন: 'মানুষের কাজে না লাগলে এতসব লেখালেখি, ইন-টেলেকচুয়্যাল পোঁদ-ঘষাঘষির মানে কি?' আমরা অবাক হই না, কেননা, তিনিই বলেছেন, 'মানুষই বলতে পারে আমি কনফিউজড।' বার বার তিনি নিজেকে কোশচেন মেরেছেন, উপন্যাসের মধ্যেই, নিজেকে তিনি ঠিকমতো উপস্থাপিত করতে পারছেন কি—কারণ তিনি আদৌ কনফিউজড নন, লেখার এক ধরণের গ্র্যান্ড ভায়োলেন্স চালিয়ে যাওয়ার তিনি পক্ষপাতি।

॥ নয় ॥

প্রাবন্ধিকের পক্ষে লেখার শেষে একটা অধিকার সংরক্ষিত। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর ফাঁসির আগে 'শেষ ইচ্ছা' পূরণের অধিকার যেমন। আমার সেই অধিকার 'উপসংহার অধ্যায়ে সীমিত। হ্যাঁ, প্রবন্ধে বা আলোচনায় আত্মজৈবনিক নিমপাতার ঝোল পরি-বেশন নিষিদ্ধ, আমি জানি—কিন্তু আত্মোপস্থিতি দোষের নয়। তথাচ এবং সুতরাং অতএব মমত্ববোধের মাদকতা কাটিয়ে এই পর্যায়ে আমি শুধু 'শেষ ইচ্ছাটি' জাহির করতে পারি মাত্র।

উপরিধৃত আলোচনায় আমি বারবার ছাখাতে চেয়েছি, এতাদৃশ রচনায় গল্পভাগ উপলক্ষ্যমাত্র; যোদ্ধা পারপাস কথকের বিশ্ববীক্ষার রশ্মিপাত; সেজন্য এমত প্যারালাল উপন্যাসে নায়ক-চরিত্রের ব্যক্তিত্ব-সীমার চেয়ে আদর্শ-প্রক্ষেপণই আসল। ক্বচিৎ তারা 'চরিত্রই' কিনা সন্দেহ। কিন্তু তাতেও ব্যক্তিত্বস্বরূপ্য ঢাকা থাকে কি? মনে হয়, ওই ব্যক্তিসীমা-রহিত ধূসর চরিত্রটি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল মূর্তিমান অভিজ্ঞান হয়ে।

নতুন প্রতিমানের প্রতিষ্ঠা আব্দার-মাত্রে হবে না জানি, তবু পরানুকরণের বাতিক আমাদের রক্তে যখন মিশেই আছে, তখন আনন্দবাজার-জাত ঐতিহ্যনির্দিষ্ট আখ্যানশিল্পে পাঠসক্ষমতা না খুইয়ে, পাঠক, আসুন না, অশাস্ত্রীয় ভিন্নধারার মননজাত জীবনমুখী টকটক ঝালঝাল নুনসুন এক একটা সত্যাবিষ্কৃত নিকষে আমাদের সিদ্ধ চরিত্রগুলিকে পরখ করে নিই। এবং আমরা আমাদের কাছে, কয়েক মুহূর্তের জন্যেও অন্তত, পুরোপুরি উজ্জ্বল হয়ে উঠি। হ্যাঁ উজ্জ্বল, রুশ চীন বা ভিয়েতনাম স্বাধীন-হয়ে-ওঠার মুহূর্তটুকুর মতো উজ্জ্বল।

না পাঠক, আপনাকে ধর্মান্তরে টানার তাগিদ আমার থাকলেও, আপনার কল্পনাকে আপনার আত্মাকে প্রপঞ্চসীমায় বাঁধার তরফদার আমি নই। আমি শুধু বাজারচড়া পদ্মপটল আর 'গন্ধআলুর বস্তাগুলোকে টেনে হিঁচড়ে বের করে দ্যাখতে চাই, দ্যাখো কী খেয়ে বাঁচছো তোমরা! জানতে চাই গণদেবতার বুকের অন্ধকার ঘনতর করার জন্যেই আদাজল খেয়ে ধুতির কোঁচা মেরে যেখানে ব্যভিচারী সাংবাদিক, দগদগে ঘাওলা নেতা, কুটচক্রী বুর্জোয়া ক্লাস আর শুধু সি আই এ এজেন্টদের মতো বাদ গড়ার কাজে নিযুক্ত লেখকদের কাছ থেকে আর কতদিন 'জীবনমুখী সাহিত্য' চাওয়া হবে??? বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। ধারালো ছোরা কিংবা বর্শাটা নেই? ফাটা বাঁশটা আছে তো, ওটাই নিয়ে এসো— রুখে দাঁড়াও।

সুবিমল সন্দীপন সুব্রত অমল শেখর রমানাথ এঁরা সবাই এক একটা ফাটা বাঁশ। এঁরা সাহিত্যকে কোথাও নিয়ে যাবেন না—বেহেস্তে কিংবা জাহান্নামে। কিন্তু বাঁশটা নিয়ে শয়তানের মুখে দাঁড়িয়েছেন দেখে এটুকু তো আশা করবই, যে, আমাদের ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারীরা একদিন ছোরাটা বর্শাটা তৈরি করে নিতে পারবে? এঁরা পাঠক-সমাদর না পেয়ে সরে দাঁড়াক সেটা আমি চাই না। ফাটা বাঁশটায় ঠিক-মতো কাজ হচ্ছে না ভেবে মরে যাক, তাও না। শালা, ফুল স্পীডে হাগা পেলে সুইসাইডের ভাবনাও টঙে উঠে যায়। আমার ইচ্ছে, বাতিটা জলতে থাকুক।

কে জানতে চাইছে কী জানতে চাইছে কীভাবে জানতে চাইছে বড়ো কথা না। জানাতে হবে। জানাতে হবে আমি যা জানাতে চাই যেভাবে জানাতে চাই। এবং চোট্ মারতে হবে একেবারে দুম্ করে, পাঠকের ঠিক মুখোমুখি এবং আলবৎ বিপক্ষে—নিজের ভাষা, ফর্ম আর মনোভাবের গাঁইতি দিয়ে পাঠককে ঘায়েল করতে বা ভয় দ্যাখাতে না পারলে তার ওপর ছেয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সাহিত্য এভাবে হিংসাত্মক হোক, নাশক হোক কিন্তু কদাপি অরাজক নয়। স্বাধীনতা ভোগ করতে হলে নিজেকে ভাসিয়ে তুলে পাঠকের বুকে জমানো নর্দমা-কদ মার কোঁপানো বেলুনে ছুঁচলো আলপিনটা চেপে ধরতেই হবে।

এটা যদি ধর্ষণ—আমি ধর্ষণের পক্ষে। আমি সাবাড় করতে চাই তানপুরা-পাছা ফুলছাপা গোলাপি শাড়ি পরিহিত মেয়েদের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে গিবস চাঁদ দেখে মধু-লয়ে লজ্জারুণের কবিত্ব। ইউ-নিভার্সিটি আকাদেমির পয়দা-করা প্যাঁকর-পোঁকর, কবিতোৎসবের গ্যাঁদাফুল ছিঁড়ে—ও সব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ ডিটাচড্ করে দ্যাখানোর নাম ধর্ষণ? তবে তাই সই। আমি। ধর্ষণের। পক্ষে। আমার পেছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়ে বলতে পারো ধর্ শালাকে খুবলে নে পোঁদের মাংস। কিন্তু তবু, বাঞ্চোৎদের হাতে আমি আত্মসমর্পণ করবো না করবো না করবো না। আমি জানি, এইভাবে, একদিন ডেফিনিটলি ওরা ওদের বুকের কলেজা রক্তজবা চন্দন আর নকুলদানা নিজেরাই নিজেদের হাতে সাজিয়ে দেবে অর্ঘ্যের রেকাবিতে। সেই দিনই এই ধর্ষণের সমর্থন। বাঞ্ছিত ধর্ষণের কপালে জয়টীকা।

টকটক ঝালঝাল নুনমুন সাহিত্য শুরু হয়ে গ্যাছে। ওরা লিখছে। এরা লিখছে। আমি আমরা অনেকে লিখছি। ততোদিন লিখবো যতোদিন না আমাকে তোমার মধ্যে পুরো ঢুকে যেতে দিচ্ছো। জানি, সেটা এখুনি সম্ভব নয়। এও জানি, আমাকে কেন, তুমি তোমার পুরো জীবনে আরেকজন মানুষকে এ-টু জেড গ্রহণ করবার মতো ছাতির পাটা পাবে না। মানুষ কেন, রোজ তোমার পাশে শোয় যে বেড়ালটা, মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে তাকে দেখে আঁৎকে ওঠাই তোমার ঘোচেনি। আমি চাই তোমার মতো একটি

লোক, সকালে প্রতিদিন খবরের কাগজ খুলে আমার এক একটা লেখা ছাপার অক্ষরে দেখে পড়ে অপমানিত বোধ করুক। গোটাকতক স্কুল–লেভেলের বই রিডিং দিয়ে তুমি 'জীবন' খুঁজে পাও, গ্রাহক হবার জন্যে ৯৬ টাকা জমা দাও এক কিস্তিতে—আমি তোমার মুখোস খামচে তোমারি সামনে তোমাকে ঘাড় ধরে দাঁড় করিয়ে তোমার ভেতরের মালকড়ি ফাঁস করতে চাই।

না, আজিকের কথা নয়। আমি জানি, এক ছাঁচ ভাঙতে গিয়ে আমি ঢুকে পড়বো অন্য এক ছাঁচে সবান্ধব। আমি গলার ভেতরে ভিজ ভিজ করে গুঁজে-দেয়া পাঁউরুটিটাকে আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে টেনে তুলে নিতে প্ররোচিত করছি। কিসের তুমি লেখক যদি না পারো বাঁধানো ফ্রেমটাকে হাতুড়ি চালিয়ে চুরচুর করে দিতে! আমার সাহিত্য পৌঁছনোর আগে আগের স-অব লোপাট করে দাও। ধরো, তুলে আনো, তারপর ঠ্যাঙ ফেড়ে চারিয়ে দাও—ওতেই বোঝা যাবে রক্তের সঙ্গে মুলতে পেরেছে কিনা হানড্রেড পারসেন্ট খাঁটি দাওয়াইটা। এনি কাইণ্ড অফ ন্যাকামি ফচকেমি থেকে সাত গজ দূরে থেকে গুলতির ঢিলটা ছোঁড়ো অ্যাক্কেবারে কেতাবি শুঁয়োপোকাদের ফিরিফিরে লাইনে।

একদিন হঠাৎ

সুদীপ্ত সেনগুপ্ত

একাংকিকা

[কোন মঞ্চের প্রয়োজন নেই। দর্শককে সামনে রেখে যে কোন পরিবেশে অভিনয় করা চলবে। প্রয়োজন শুধু মাঝারী Size—এর একটি Table—যা কোন বাড়ীর রোয়াক হিসাবে ব্যবহৃত হবে।]

তিনটি যুবক দাঁড়িয়ে/বসে গল্প করছে, ছুটীর দিন।· সময় সকাল

কুমার ॥ এমনিই হয়, তুমি শালা যতই Plan করো। আসল চাবিকাঠি তো আর তোমার কাছে নেই। কখন সবকিছু অন্ধকার হয়ে যাবে, তুমি টেরও পাবেনা।

বিমল ॥ মাইরি বলছি, আমি এখনও ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না, কেমন যেন সব—নে, একটা সিগারেট ছাড়।

(প্রিয়র দিকে হাত বাড়ায়। সিগারেট নেয় এবং ধরায়)

প্রিয় ॥ আমি অনেক ভাবলাম। বুধবারের Programme টা কিন্তু হচ্ছে।

বিমল ॥ কি বলছিস তুই—

কুমার ॥ তোর কি মাথা খারাপ হোলো না-কি

প্রিয় ॥ তোরা না যাস, আমি একাই যাবো। আমি দেখতে চাই পাল্টে যাওয়া পরিবেশটা কতখানি অন্যরকম।

বিমল ॥ Plan টা ওর মাথা থেকেই বেরিয়েছিলো, আর ও ছাড়া—মানে—

কুমার ॥ কত উৎসাহ ছিলো ওর।

দুর্, শালা সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

প্রিয় ॥ কুমার, মালবিকাকে একটা খবর দিতে হবে।

কুমার ॥ হ্যাঁ। কিন্তু কি খবর দেবো? গিয়ে বলবো যে, ও—আমি পারবো না।

বিমল ॥ মালবিকারা যখন এ পাড়া ছেড়ে চলে যায়, আমরা সবাই ওদের Seaoff করতে গিয়েছিলাম। আমি, তুই, সত্য, আমরা সবাই। ওই শুধু যায়নি। মালবিকা কিন্তু ওর কথাই বারবার জিজ্ঞেস করছিলো।

প্রিয় ॥ আর তখনই আমরা ওদের সম্পর্কটা আঁচ করতে পারলাম।

কুমার ॥ ভীষণ অন্তর্মুখী ও। কোনোদিনই নিজেকে সম্পূর্ণ জানতে দেয়নি।

প্রিয় ॥ কিন্তু কিসের এত দুঃখ ওর? কিসের হতাশা? ওযে এতোখানি Selfish আমি জানতাম না। বিশ্বাস কর, আজ যদি ওকে আমি হাতের কাছে পেতাম তো ওর কলার ধরে জিজ্ঞেস করতাম—আগে বল্ আমরা তোর বন্ধু কিনা। আর যদি বন্ধু বলেই যানিস, তবে এতো লুকোচুরি কিসের? কিসের সংশয়? Problem টা তো তোর একার নয়। আমাদের সকলের। তবে কেনো তুই এমন করবি। কেনো?
জানিস্ আমি সব মেনে নিতে পারি। কিন্তু কেউ আমাকে ফাঁকি দেবে এ আমি সহ্য করতে পারি না, আর ওই কিনা এরকম করে বসলো। Coward!

(সত্য প্রবেশ করে। চুপচাপ এসে পাশে দাঁড়ায়)

সত্য ॥ কি হয়ে গেলো বল্‌ত? Duty থেকে বাড়ী ফিরে ব্যাপারটা শুনলাম।
তোরা কি আগে কোন Hint পেয়েছিলি?

কুমার ॥ (সত্যর উপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে)
শালা! ন্যাকামো হচ্ছে তাই না, Acting করছো বাস্কোৎ। তুই শালা সবসময় ওর পেছনে লাগতিস। কেনো, ও তোর কি ক্ষতি করেছিলো? কেনো তুই প্রতি কথায় ওকে Pinch করতিস?

প্রিয় ॥ থাম্, তোরা কি শুরু করলি!

কুমার ॥ না প্রিয়, তুই ওকে এখান থেকে চলে যেতে বল্। ওকে দেখলেই আমার মাথায় খুন চেপে যাচ্ছে। শালা চাক্‌রী পেয়ে একেবারে লাঠসাহেব বনে গেছো তাই না—

বিমল ॥ সত্য তুই এখন যা।

প্রিয় ॥ সেই ভালো, Night duty দিয়ে ফিরেছিস, Tired, বাড়ী যা সত্য।

সত্য ॥ না, যাবনা, তোরা কি ভেবেছিস বলত আমি কি একটা জানোয়ার? কবে কি ঠাট্টা করেছি, সেটাই আজকে বড় হয়ে দাঁড়ালো? --না আমি যাবোনা। কিছুতেই যাবোনা। তোরা বললেই আমি চলে যাবো। কেনো ও আমার বন্ধু নয়। আমি যাবোনা, কিছুতেই না,

(সত্য কেঁদে ফেলে)

(সবাই অসহায় দৃষ্টিতে সত্যকে লক্ষ্য করে। কিছু সময়ের নিরবতা)

কুমার ॥ সত্য। Please! কিছু মনে করিস না, বুঝতেই তো পারছিস অবস্থাটা। Please---

[বয়স্ক এক ভদ্রলোক প্রবেশ করে, নাম অবিনাশ বাবু]

অবিনাশবাবু ॥ আচ্ছা ভাই, এটা চক্রবর্তী বাই লেন তো?

প্রিয় ॥ হ্যাঁ—

অবিনাশবাবু ॥ (কাগজে লেখা একটি ঠিকানা দেখিয়ে বলে)
এই বাড়ীটা ভাই কোনদিকে হবে?
[প্রিয় ঠিকানা লেখা কাগজটা হাতে

নেয়। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কুমারকে দেয়, কাগজটা সবাই দেখে। ক্রমশঃ কাগজটি সত্যর হাতে পৌঁছয়]

সত্য ॥ (হঠাৎ বলে ওঠে) যাঃ বাবা। সে কি আমার সক্কালবেলাই ভুলঠিকানা নিয়ে ভুল পথে হাটচেন? দাদু এই ঠিকানায় তো কোনো বিবাহযোগ্যা রূপসী তরুণী নেই—যাকে আপনার ছেলের বৌ হিসাবে মানাবে। যে আছে সে হ'ল গিয়ে নিতান্তই—

বিমল ॥ কালো এবং বেঁটে—

কুমার ॥ না, খোঁড়া ঠিক নয় তবে কেমন যেন একটু হয়ে—

(অভিনয় করে দেখায়)

অবিনাশ ॥ না—না, অন্য ব্যাপার ভাই।

প্রিয় ॥ কি ব্যাপার?

অবিনাশবাবু ॥ আসলে উনি আমার—

প্রিয় ॥ ওসব আসল নকলে আমাদের দরকার নেই, পাড়ার মেয়ে বে পাড়ায় যাওয়া চলবে না—

কুমার ॥ এটা আমাদের সীদ্ধান্ত।

বিমল ॥ বুঝলেন দাদু

সত্য ॥ যাঃ, দাদু কিরে, ওনাকে ঠিক দাদু দাদু মানায় না, কি বলিস বিমল?

বিমল ॥ না, উনি হচ্ছেন গিয়ে ইয়ে, মানে "কাকু",

প্রিয় ॥ Yes "কাকু", তা-কাকু, আপনার নাম?

অবিনাশবাবু ॥ অবিনাশ লাহিড়ী,

প্রিয় ॥ তা কাকু ছুটির দিন, সকালবেলা হঠাৎ এ পাড়ায় কি Case?

অবিনাশবাবু ॥ তোমরা বোধহয় বাড়ীটা সঠিক চেনোনা। ঠিক আছে আমি অন্যত্র যাচ্ছি।

প্রিয় ॥ না-না, আপনার "অন্যত্র" যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি আপনাকে সঠিক ঠিকানা বলে দিচ্ছি।—সোজা রাস্তা ধরে কিছুটা এগোলেই দেখবেন পরপর দু'টো দুতলা বাড়ী তারপর একটা দোকান, আর দোকানটার ডান দিকে দেখবেন একটি রাস্তা—

সত্য ॥ খেয়াল রাখবেন, বাঁয়ে দোকান আর ডানে রাস্তা

কুমার ॥ দুর্ শালা, ডানে দোকান আর বাঁয়ে রাস্তা

সত্য ॥ বাজে কথা বললেই হলো! বাঁয়ে দোকান আর— (দুজনে ঝগড়া করে)

বিমল ॥ No interruption! Please no interruption!

অবিনাশবাবু ॥ কি হচ্ছে কি! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

প্রিয় ॥ আপনি ওদের কথা ছাড়ুন তো, আপনি কাকু এগোন। কিছুটা এগিয়েই সামনে পাবেন একটা লাল রং-এর বাড়ী। আর সেই লাল বাড়ীর পাশ দিয়েই সরু একটা রাস্তা—

অবিনাশবাবু ॥ আবার রাস্তা!

বিমল ॥ হ্যাঁ, রাস্তা। এবং এই রাস্তা ধরেই এক মিনিট হাঁটলেই "সম্মুখে তব প্রশস্ত রাজপথ", সরকারী বেসরকারী Bus। আর পকেটে রেস্তো থাকলে সুন্দরী Taxi। চাপুন এবং সোজা বাড়ী চলে যান।

কুমার ॥ যান মশাই ফুটুন তো! Bore করবেন না। শালা, রোববারের সক্কালটা মাঠে মারা খেলো।

অবিনাশবাবু ॥ (লজ্জায়, অপমানে, রাগে কাঁপতে থাকেন)
—এ'রকম ভাবে কথা বোলছো কেন তোমরা। আমি তোমাদের বাবার বয়সী।

কুমার ॥ বাবা তো নন—

সত্য ॥ কাকু— (সকলে হেসে ওঠে)

অবিনাশবাবু ॥ কাগজটা আমাকে ফেরৎ দাও।

প্রিয় ॥ না, দেবোনা।

অবিনাশবাবু ॥ দেবোনা মানে? কি ভেবেছো তোমরা? আমি কি তোমাদের মস্করা করার পাত্র? সব একেবারে অধঃপাতে গেছো,

সত্য ॥ কোথায় গেছি?

বিমল ॥ অধঃপাত? সে জায়গাটা কোথায় কাকু? বাসে চড়ে যেতে হয়—না ট্রেনে?

অবিনাশবাবু ॥ যতসব Uncultured। বাউণ্ডুলে ছেলে সব

প্রিয় ॥ কি বললেন? ucultured—বাউণ্ডুলে— (সকলে হেসে ওঠে)

কুমার গান গায়

সখি, সংস্কৃতি কাহারে বলে
সখি, কৃষ্টি কাহারে কয়
তোমরা যা কিছু আঁকড়ে আছো
সে তো কৃষ্টি নয়

(সকলে হেসে ওঠে)

(রাজীববাবু প্রবেশ করে)

রাজীববাবু ॥ কি ব্যাপার এতো হৈ চৈ কিসের? কি হয়েছে?

অবিবাবু ॥ দেখুনতো মশাই, আমি একটা ঠিকানা জানতে চাইলাম। না জানলে বলে দিলেই হয়। তা-নয় অসভ্যতার চূড়ান্ত করে ছাড়ছে—

রাজীববাবু ॥ কি ঠিকানা? আমায় বলুন মশায়, এ পাড়ার তিন পুরুষের বাসিন্দা আমরা। কার বাড়ী।

সত্য ॥ আপনি জানতো মশাই এখান থেকে।

রাজীববাবু ॥ তুমি কে হে ছোকরা, আমাকে চলে যেতে বলার তুমি কে?

প্রিয়। দেখুন, আপনাকে request করছি আপনি চলে যান। আপনি পাড়ার লোক। আপনাকে কিছু বলতে চাইনা—Please, আপনি চলে যান।

রাজীববাবু ॥ চলে যাবো কি-হে? আমায় বলুন তো মশাই, কোন বাড়ী যাবেন? কার বাড়ী? কত নম্বর?

অবিবাবু ॥ হরকিঙ্কর মজুমদার, ৩৭/২ নম্বর।

রাজীববাবু ॥ অ্যাঁ! ও! হরকিঙ্কর বাবুর বাড়ী। তা, এরা কিছু বলেনি আপনাকে? এদেরই তো বন্ধুর বাড়ী। Very Sad। একটা young ছেলে! কি যে হয়ে গেলো—কাল একরকম, আজ অন্য রকম। এই আছে—এই নেই— (চলে যায়)

অবিবাবু ॥ ব্যাপারটাতো কিছুই বুঝতে পারছি না।

প্রিয় ॥ বুঝতে পারছেন না, তাই না, আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। হরশঙ্কর বাবু, যার ঠিকানা আপনি খুঁজছিলেন, তিনি অরুণাংশুর বাবা, অরুণাংশু আমাদের বন্ধু। মানে ছিলো—কিন্তু, আজ নেই

অবিবাবু ॥ সেই মানে?

কুমার ॥ গতকাল রাতে অরুণাংশু Suicide করেছে।

প্রিয়। না-ভুল! (চেঁচিয়ে ওঠে, ওর কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মত শোনায়), ভুল বলছিস তোরা। অরুণাংশু খুন হয়েছে। হ্যাঁ খুন হয়েছে ও। হতাশা ওকে খুন করেছে। প্রবঞ্চনা ওকে খুন করেছে। ওকে খুন করেছে এই ব্যবস্থা এই গোটা সমাজ ব্যবস্থাটা অরুণাংশকে তিলতিল করে খুন করেছে।

সত্য+বিমল ॥ অরুণাংশুটা বড় ভালো ছেলে ছিলো। শান্ত, স্থির, নির্লোভ।

কুমার ॥ শুধু একটা চাকরীর লোভ ছিলো ভীষণ

সত্য ॥ অরুণাংশু মালবিকাকে ভালো বেসেছিলো

বিমল ॥ ওরা পরস্পরে মিলিত হওয়ার স্বপ্ন দেখতো

কুমার ॥ শালা, কোনো Security-ই নেই, কিসের ভালোবাসা কিসের স্বপ্ন ?

প্রিয় ॥ আপনি যাবেন অরুণাংশুর বাড়ী ? ওর retired বৃদ্ধ বাবা, মা আর ছোটো বোনটার সামনে দাঁড়াতে পারবেন আপনি ? পারবেন ? আমরা কিন্তু পালিয়ে এসেছি। ওরা কেউ কাঁদছেনা, জানেন, কেমন অদ্ভুত একটা অসহায় দৃষ্টি নিয়ে আমাদের লক্ষ্য করছে। ওঃ কি ভয়ঙ্কর সে দৃষ্টি

কুমার ॥ চলুন, আপনাকে ওদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

প্রিয় ॥ আপনি আমাদের ক্ষমা করবেন, আসলে, অরুণাংশুর হঠাৎ এই চলে যাওয়াটা আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিনা।
আচ্ছা বলতে পারেন ও কেন এমন হেরে যাবে ? কই আমরা তো হেরে যাইনি। ও তো আমাদের সাথে, আমাদের মধ্যেই ছিলো, কোথায় পালিয়ে গেলো বলুন তো ? Sorry, আপনি বোধহয় বিরক্ত হচ্ছেন। চলুন, আপনাকে ওদের বাড়ী পৌঁছে দিই।

অবিবাবু ॥ না ভাই, আজ আমি আর ওখানে যাবো না, অন্য কোনো দিন আসব। ওরা ব্যাপারটা একটু সামলে উঠুক।

প্রিয় ॥ কে সামলে উঠবে ? ওর বাবা, ওর মা, ওর ঐ ছোটো বোনটা ? না-কি আমরা ? সামলে উঠবে ? কি বলছেন আপনি ?
একটা তাজা ছেলে, দুটো সবল হাত মেলে ধরেছিলো—কিছু কাজ চাই তার—কাজ। পায়নি। শান্ত, ভীরু মানসিকতা নিয়ে গুমরে গুমরে মরেছে, এবং ক্রমশ শেষ হয়ে গেছে, ও রোজ-রোজ, একটু-একটু করে মরেছে
কি বলছেন আপনি ? এ কি সামলে ওঠার ?

কুমার ॥ আমরা কিন্তু অরুণাংশুর মতো মরে যাবোনা।

সত্য ॥ অরুণাংশুর এই চলে যাওয়াটা অনেকটা যেন পালিয়ে বাঁচার মত।

বিমল। আমরা পালিয়ে যেতে রাজী নই।

প্রিয় অরুণাংশু কিন্তু হারিয়ে যায়নি, ও ঠিক আছে আমাদের সাথে, আমাদের পাশে—

অবিনাশবাবু ॥ আমি তোমাদের ভুল বুঝেছিলাম। সম্ভব হলে আমাকে ক্ষমা কোরো। তোমাদের সাথে কিন্তু এখনো পরিচয়-টাই হোলোনা।
তোমার নাম কি ভাই ?

সত্য ॥ অরুণাংশু।

অবিনাশবাবু ॥ তোমার ?

বিমল ॥ অরুণাংশু।

কুমার ॥ অরুণাংশু !

প্রিয় ॥ অরুণাংশু মজুমদার ! ! !

(নেপথ্যে গম্ভীর কণ্ঠস্বরে আবৃত্তি হবে। সকল চরিত্র স্থিরচিত্রের মত দাঁড়িয়ে)

যদিও এখন ঘন রাত্রি
লক্ষ্য দিশাহারা—
তবুও এগিয়ে চলা—
পাবার তাগিদ নয়
বেগবান হবার তাগিদ
জানি পথ সম্মুখীন।
আমরা প্রতিশ্রুত, ভবিষ্যতের কাছে
প্রজ্জ্বল চেতনায় গড়া স্বপ্নের সমাজ
যদিও সুদূর ঠিকানা
তবে জানা আছে পথের নিশানা
আজকের ক্ষীণ জলধারা
হবে মত্ত তরঙ্গিনী
অবশেষে সমুদ্রকে পাওয়া
ব্যাপকতার মাঝে মৌন হয়ে যাওয়া ॥

দুলাল চট্টোপাধ্যায়ের গল্প

কেন হে অর্জুন

অন্ধকারের বুক চিরে দু একটা জোনাকি এলোপাথার্রি চলে বেড়াচ্ছে। হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে অজস্র কয়লার গুঁড়ি মেশানো ভ্যাপসা মাটির তল চেপে ওঠা সোঁতা গন্ধ। যে গন্ধ বিলীন হবে এখান থেকে কেন্দুয়া ওখান থেকে কাতরাসগড় এমন কি কনকনি কোলিয়ারীর কোল ঘেঁষে তোঁপচাঁচি পর্যান্ত চলেও যেতে পারে। ছিয়ানব্বইটি কলিয়ারীব মালিক কুমার অর্জুন স্মৃতি রোমন্থনের অপুর্ব সুযোগ পেয়েছেন আজ।

একাই বসেছিলেন শেষ বারান্দার কোল ঘেষে, যেখানে খুব প্রয়োজন ছাড়া কোন আপনজনেরও যাবার অনুমতি নেই। এখন অবশ্য আপনজন কেউ নয় বলেই মনে করেন কুমার অর্জুন. একটা সিগারেট ধরালেন। বাংলোর ঠিক পেছনটায় ইব্রাহিমের বাড়ী। ইব্রাহিমের কচি বৌটা ছুটন্ত মুরগীগুলোকে বাংলোর সামনে থেকে টপাটপ্ তুলে নিয়ে গেল। সত্যি খুব চটপটে মেয়েটা। কুমার অর্জুন ভাবছিলেন ইব্রাহিমও সুখী। মাত্র কয়েকটা টাকা হপ্তা পেয়েও দিন গুজরানের জন্য প্রচণ্ড কষ্ট পেলেও এক সুখী পরিবার। এ'দের বর্তমান নেই, অতীত নেই, ভবিষ্যত নেই শুধু একটার ওপরে বিশ্বাসী "খাটলে মাখন নইলে দাঁতন"।

শেষ সিগারেটের টানটা মুখের ভেতরটাকে একেবারে জ্বালিয়ে দিল। হঠাৎ জোরে টেনেছিল বলে কিনা কে জানে—ছুঁড়ে ফেলে দিল সিগারেটটা। মনের ভেতরটায় যেন এক আদিবাসী ছেলে নিপুণ হাতে গুলটি চালালো। এক-দুই-তিন ঠিক একটা একটা করে কত দিনের, কত রাত্রের, কত অজানা সময়ের বীভৎস, স্বচ্ছ, সুন্দর, কুৎসিত কত রকমের জ্যান্ত ছবিগুলো ভেসে উঠলো। একবার, হাতজোড় করে কুমার অর্জুন শুধু বললেন—দোহাই তোমাদের, তোমরা চলে যাও আমি আর সইতে পারছি না।

এই সেই কুমার অর্জুন। এককালের ময়ূর ছাড়া কার্ত্তিক আজও অম্লান। চুল পেকেছে, মুখের ভাঁজগুলো বলির শিথিলতায় বোঝা যাচ্ছে যদিও তবুও মনে হয় এককালের বহু বিতর্কিত ঘটনার নায়ক এই কুমার অর্জুন পুরোপুরি একজন সুদর্শন যুবক ছিলেন। সুন্দর ছিলেন ঠিকই কিন্তু ধনী ছিলেন না, এমন কি মধ্যবিত্তও ছিলেন না। মা ছিলেন এক বিদেশী সংস্থা পরিচালিত সেবাধামের সেবিকা। বহুকষ্টে একমাত্র সন্তান কুমার অর্জুনকে বুকে নিয়ে হাড়মজ্জা শিরা উপশিরার ভেতরে সাতরাজার ধন এক মানিক আমাকে লুকিয়ে নিয়ে বসেছিলেন কখন অর্জুন বড় হবে—তখন— লেখাপড়া শিখলেন অর্জুন, কিন্তু বড় হলেন না। এমন সময় মা চলে গেলেন। অর্জুন সবেমাত্র তখন ডল্ সাহেবের মাইনিং মেশিনারীর সেলসম্যান হয়ে ঢুকেছেন এবং মাঝে মধ্যে ডল্ সাহেবের পার্সোনাল এ্যাসিসটেন্ট অলোক সুন্দর সহায়ের বাড়ী যাতায়াত শুরু করেছেন। ঘুঘু অলোকসুন্দর জমিয়ে গল্প করতেন, করাতেন পরিবারের সকলের সঙ্গেই এমন কি গৌরভীর সঙ্গেও। সেই দেখা, সেই কথা, সেই নেশা একদিন, বহুদিন করে কুমার অর্জুনকে গ্রাস করলো। এই সেলসম্যান কুমার অর্জুন একদিন কলিয়ারী মালিক হয়ে দেখা দিলেন। প্রথম কলিয়ারী খাস বাজনা আজ ছিয়ানব্বইটি কলিয়ারীর মালিক করেছে তাঁকে। এই সব ভাবনা তাঁকে ভাবাতে লাগলো, এই আজকের সন্ধ্যা। কত টাকা, কত গাড়ী, কত পার্টি, কত স্ফূর্তির তুফানে চাপা পড়ে গেছে অনেক স্মরণীয় ক্ষণ স্নেহমাখা ভুল ও বোকামির তালিকা।

—বাপি।

—অ্যাঁ।

—একটা কথা বলছিলাম। আগামী-কাল বান্ধবীরা মিলে তোপচাঁচি যাব। সকলের বাবা মা যাচ্ছে। তোমরা যদি একটু হাসলেন অর্জুন। আমি যাব? সম্ভব নয় টুসকি। বরং মাকে বলো ওরতো অনেক জায়গা যাওয়ার অভ্যাস আছে—গেলেও—।

ঘ্যারর্যাং-রিং-রিং

—হ্যালো, মিষ্টার অর্জুন স্পিকিং

—মিসেস অর্জুন হ্যায় কি নেহী ?

—ইয়েস সি ইজ হিয়ার। হোল্ড অন্। মাকে ডেকে দাও টুসকি। বলো কে একজন ফোনে ডাকছে।

কুমার অর্জুন একটু এলিয়ে দেয় শরীরটাকে। আরও আপন করে এলিয়ে দেন একবার পিটটপের দিকে তাকান। মিঃ অর্জুনের সঙ্গে কোন প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন—একটু হাসেন। ইব্রাহিমের মেয়ে দুটো একটা ইজেরকে ধরে টানাটানি করতে করতে বাংলোর সামনে এসে দাঁড়িয়ে আধো আধো গলায় বললো—বাবু সাব দেখিয়ে মেরা প্যাণ্টুলুন নেহি হে রহা বলিয়ে তো ম্যায় ক্যা পঁহনু। হায়রে হতাশা আমাকে ঘিরে কেন? ওদের ঘরে যা।

নাঃ একটু বেরোন, যাক। বালাকৃষ্ণাণ হয়তো বাসাতেই আছে। কুমার অর্জুন উঠলেন। প্রথম সিঁড়িটায় পা দিয়েছেন, চৈতন্য এসে দাঁড়ালো। অন্ধকার আরও গভীর হলো। পিটটপের বাতিটি নিভে গেল। মারকারিটা যদিও লোডিং পয়েন্টে জ্বলছে কিন্তু বড় ভ্যাপসা রংয়ের আলো। কারও মুখ ভাল করে—

—ইয়েস মাই ইন্টারনাল ফাদার—

—কেঃ ওঃ চৈতন্য? তুমি মদ—

রাখো ওনার ওসব রাখো। আসছে কাল সকালেই কলকাতা যাবো। প্রিন্সেস প্রাণ্ডে বাংলা দেশ থেকে কে যেন এক মহা শিল্পী স্বকণ্ঠে—

—ভনিতা রেখে কি চাও বলো? আমার দাঁড়ানোর সময় নেই।

ওঃ ভুলে যাচ্ছি তুমি আবার বিজিয়েষ্ট ওয়ান। কিছু রূপাইয়া কা—

—মায়ের কাছে নিয়ে নিও।

—থ্যাঙ্কস্। বাবা আমার দয়ার সাগর, কে বলে তারে—সুর টেনে চলে গেল চৈতল। চলে যাওয়া পথের দিকে কুমার অর্জুন বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রই-লেন। ভাবলেন অন্ধকার আমাকে গ্রাস করেছে কি? হ্যাঁ করেছে। নইলে অর্থ, প্রতিপত্তি, সম্মান সব পেয়েছে কিন্তু সব থেকে একটা জিনিষ যেটা জীবনে চাই-ই সেটা—

ভাল লাগে না। যাই একটু রাজেন্দ্র মার্কেট দিয়ে ঘুরে আসি। ফারুক, যাও গাড়ী লে আও।

নীলাভ মার্ক-২ সামনে এসে দাঁড়ালো। চলো সোনে কা লছমী নারায়ণ মন্দির। হামকো উতার দেকে তুম চলা আনা।

—হে নারায়ণ, তোমাদের অশেষ আশীর্ব্বাদতো দিয়েছ কিন্তু মা লছমী লছমতো দিলে না?

গাড়ীটা নিজেই চালিয়ে নিয়ে এলেন কুমার অর্জুন। মিত্র প্যাথলজিক্যাল লেবরেটরীর কাছে ষ্টাণ্ড করে গাড়ীর ভেতরে বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলেন। অশোক নগরের নীচেকার অংশটা দারুণ সাজানো হয়েছে। কারও কোন অনুষ্ঠান আছে বোধহয়। বোধহয় কেন নিশ্চয়ই। ঐতো মি: এণ্ড মিসেস সুর—ঐতো মি: এণ্ড মিসেস লায়েক, ঐতো-ঐতো অনে-কেই চেনা। ম্যানেজারে ভরা অশোকনগর। অনেক মালিকও তো রয়েছে। তাহলে নিশ্চয়ই আমারওতো থাকার কথা, তাহলে কি কার্ডটা ঐতো মি: সদরূপী, পাশে হাস্য, লাস্যময়ী মিসেস অর্জুন। খুব তাড়া-তাড়ি গাড়ীর দরজা বন্ধ করলেন কুমার অর্জুন। ঐ-ঐজন্যেই ফোন। সেতো বললেই হতো। এরা ফোনে ফোনে কথা কয় মুখে কিছু বলে না। কেমন জব্দ করলো আমায়। গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে একেবারে 'রে টকীজ' বইট সুন্দর হচ্ছে। 'এ চার্জ অন দি সার-কমস্ট্যান্সেস'। একটা গান চাই। গলাটা বেশ কিছু-ক্ষণ ভিজে থাকতে চাইছে। একটু আধটু নেশার অভ্যাস ছিল। এখন নেই। একদম না। এখন শুধু অবচেতন মনে খেলা, শুধু ভালবাসার রোলে অভিনয় করা। শুধু নৈকস্য কুলীন পন্থী কবিতা আবৃত্তি করা। দূরে বহুদূরে নীলাভ আকাশের দিকে তাকানো। নিজেকে কোন সন্দেহের জালে আবদ্ধ করা। পানটা নিয়ে টিকিটটা পকেট থেকে বের করে নিজের সিটের কাছে পৌঁছতেই এক বিপত্তি। কুমার অর্জুন একটু এদিক ওদিক দেখছিলেন। সাজানো হল। এ রকম হল ধানবাদে আর একটাও হলো না। মি: অর্জুন—ডু ইউ থিঙ্ক টু হ্যাভ মি? এক নারীর কণ্ঠস্বর। কুমার অর্জুন রাগে টং হয়ে গেলেন। সাটআপ সিলি গার্ল। ইউ আর ইন দি এজ অফ মাই ডটার। হল থেকে বেরিয়ে এসে টিকিটটা ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। গাড়ী ষ্টার্টকরে সোজা বাড়ীর দিকে। ইয়ং মেন্স খৃশ্চান এসোশিয়েশনের সামনে কিছু নতুন বই নেমেছে। একবার গাড়ীটা দাঁড় করালেন কুমার অর্জুন। নামলেন, কিছু বইয়ে হাত দিলেন, নাড়-লেন, বাছলেন, নেবেন বলে আলাদা করলেন—

স্যার। কোথায় এগোচ্ছিলেন?

—এই তো একটু এদিকে। তুমি? হঠাৎ ব্যক্তিগত সচিব মিস সুচরিতার সঙ্গে দেখা হলো। তোমাকে তো অনেকটা যেতে হবে—চলো লিফট্ দিই। হঠাৎ একটা চেতনা মনে ধাক্কা দেয়। ঠিক করছি তো? যদিও কন্যাসমা, কিছু ভাববে না তো? ততক্ষণে গাড়ী চলতে শুরু করেছে

—কদিনই অফিসে আপনি কেমন যেন উদাস, যেন ছাড়া ছাড়া কোন ভাবের মধ্যে—কিসের যেন একটা অবহেলা—

—হ্যাঁ, ওটা অবশ্য সম্পূর্ণ মনোজাত, সামলে নেব।

—প্রয়োজনে আমি আপনাকে-

—না না কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই। এইতো এসে গেছো।

—ধন্যবাদ।

ভারি ভাল মেয়ে। অপরের জন্য কিছু ভাবে।

একটু শীত শীত করছে। গাড়ীর জানালার কাঁচটা তুলে দেন অর্জুন। ভরাটি রাত। পুর্ন যৌবনা শর্বরী আপন মদালসায় বিভোর। মাথার পাশের ফ্যানটা একটু দ্রুত চলছে। একটু আস্তে করে দেওয়া প্রয়োজন। তাতে হবে না একেবারে বন্ধ করে দিলেন অর্জুন। এই সেই অর্জুন। কোলিয়ারীর সকলের এবং মালিক মহলের প্রতি আপনজন এই অর্জুন। গাড়ীর ষ্টিয়ারিং-এ হাত দিলে মনে হয় এক চুড়ান্ত পর্যায়ের নিস্তিতে ওজন করা যুবা যার জুড়ি মেলা ভার। এই সেই অর্জুন। যিনি ঠিক সময়ে রবীন্দ্র সঙ্গীতের কলি ধরেন, বাউলেও পিছ পা নয়। সুন্দর শ্রুতিনাট্যকার। একটাই ব্যতিক্রম, মনে জমাট বরফ। সংসারে তীব্র ঘূর্ণি ঝড়ের খেলা। মুখে বিশাল পাঁচ-সেরী ওজনের তালা, যতক্ষণ পরিবার বর্গের মাঝখানে ততক্ষণ। যুক্তি আছে, বক্তব্য নেই, বক্তব্য রাখতে গেলে সময় সীমা বেঁধে দেওয়া আছে। ওর বাইরে নৈব নৈব চ।

এসেছে, এসে পড়েছে নিজের বাংলোয়। কখন গাড়ী ঢুকে গেছে শান্তিকাননে মনে পড়ছে না কুমার অর্জুনের। ওপাশে জড়ানো স্বর্ণলতা গাছগুলো আকুল আবেদন দিয়ে সাড়া দিচ্ছে কিন্তু সে সাড়া কে শুনবে? শান্তিকাননের মালিক। এতো কাননই নয়। এতো একটা বিলাসবহুল বাংলো। এখানে জরা আছে, বার্দ্ধক্য আছে, শোক আছে, নির্লিপ্ততা আছে—একি! টুসকি আর চৈতল না? কিন্তু এটাতো ছটু সংহের বাসার বারান্দাটা। তাহলে ছটু-কি নেই? কিন্তু চৈতল ও টুসকি বটে তো? পকেট থেকে চার্জ দেওয়া টর্চটা বের করে সোজা রশ্মি ফেল-লেন ওদিকে। চৈতল-টুসকি তোমরা? সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ধরে যায় কুমার অর্জুনের। একি! ওরা যে ভাই বোন ওদের যে একই মায়ের গর্ভে জন্ম। আমিই যে ওদের বাবা।

তোমরা শেষ হয়ে গেছ চৈতল। তোমরা শেষ হয়ে গেছ। কিন্তু কেন? তোমরা যে ভাই বোন? চৈতল!

ও: সিলি ফাদার। এটা এমন কি অপরাধ? ইট ইজ ন্যাচারাল ইমপ্রেশন অফ বডি এণ্ড মাইণ্ড। টুসকির চঞ্চল প্রশ্ন—এতে অবাক হওয়ার কি আছে বাপি?

টুসকি—স্যাটআপ। আমি এর জবাব দিতে পারবো না। সাংঘাতিক রকমের ছুটো চড় পড়লো টুসকির গালে। চীৎকার করে কেঁদে উঠলো টুসকি। মা, বাপি দারুণ মার মারলো আমায় সৌরভী ত্রস্ত পদে এসে দাঁড়ালো। ঘটনা দেখলো, বুঝলো কিন্তু অবাক হলো না। একটু সামলে নিয়ে বললো কি ব্যাপার! এত বেশী মাত্রায় ইরিটেটেড হওয়ার কারণটা জানতে পারি কি?

—কি জানবে? কি বলবো তোমায়? তোমার ছেলে, তোমার মেয়ে এসব কি? ওহো আমারইতো ভুল হচ্ছে। এ প্রশ্ন তোমাকে করা উচিত নয়। তুমিও তো অশোকনগরে—অশোকনগরে। আমি, থেমে গেলে কেন? চৈতল-টুসকি আজ—কেন? কিসের জন্য বলো? আমার কাছে কিছু বলার আছে তোমার? লজ্জা করে না? এই সমগ্র পরিস্থিতির জন্য দায়ী কি সৌরভী, চৈতল টুসকি? তুমি নও? আজ পয়সা খেয়ে, পয়সা পেয়ে, পয়সার ওপর শুয়ে পয়সাকে স্বপ্ন করে নিয়ে সেসব দিনের কথা ভুলে গেছ? আজ সৌরভীই তো তোমার পয়সা। সেইতো কলিয়ারী, সেইতো তোমার বিলাসবহুল প্রাসাদ, সেইতো শান্তি-কাননের পরী মিসেস অর্জুন। এত তাড়াতাড়ি

ভুললে চলবে কেন? বলো এতে ওদের অপরাধ কোথায়?

শান্তিকানন মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়েছে কুমার অর্জুনের। চৈতল, টুসকী, সৌরভী, অজস্র সাপ বুকে গলায় জড়িয়ে নিয়ে তাকে তাড়া করেছে। হ্যাঁ তাইতো। সৌরভী ঠিক বলেছে এতো ভুলে যাবার নয়। পাতা উল্টোলেই মানুষ দেখতে পাবে পয়সা লোভী কুমার অর্জুন কি করেছে অতীতে। মিঃ অরিজিত, মিঃ সরণ, মিঃ পুরী, মিঃ চাকলাদার, ওঃ কত তাস কুমার অর্জুনের হাতে। আজ তুমি অর্জুন বৈরাগী হয়ে আমি কাশী যাচ্ছি বললে তো কেউ শুনবে না মাণিক। বালতি বালতি জল ঢালো অতীতের ঢিপি থেকে ঐ মুখগুলো বেরিয়ে আসবে। ওরাইতো কলিয়ারী, ওরাইতো শান্তিকানন, ওরাইতো প্রতি-পত্তি। চৈতল টুসকি ওদেরইতো কেউ। কেন হে অর্জুন এত বোকা কেন? পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কি? বল চৈতল ঠিক করেছে। টুসকী ঠিক করেছে। সৌরভী ভুল করেনি। কেননা প্রতিটি ঘটনার প্রতিটি অবলুপ্ত চেতনার তুমি যে সাক্ষী হয়ে আছ। কোথায় পালাবে অর্জুন?

ঘরে এলেন অর্জুন। খুব জোরে পাখাটাকে খুলে দিয়ে বসলেন। কোথা থেকে একটা চড়ুই এসে পাখাটার তৃতীয় ব্লেডটার ভেতর ঢুকে গেল। খ্যাট-খ্যাট-টপ্। শেষ হয়ে গেলো তো? হ্যাঁ চড়ুইটা শেষ হয়ে গেল। কুমার অর্জুন উঠলেন। বসলেন। জামাকাপড় খুললেন স্নানের ঘরে চলে গেলেন অত রাত্রেই।

খ্যারাং—খ্যারাং—রিং—

মিঃ সরণ বলছি। কি বললেন? কুমার অর্জুন। ইয়েস মিঃ পুরী স্পিকিং—হোয়াট মিঃ অর্জুন? বাট হোয়াই—ইয়েস ইয়েস মিঃ অরিজিৎ ইজ হিয়ার কুমার অর্জুন কমিটেড সুইসাইড? মাই গড।

বিশাল কক্ষের ঠিক মধ্যিখানটা। বিশাল জন-তায় ভরে গেছে। অতীত বর্তমান, ভবিষ্যতের বহু হিতাকাঙ্খী হাজির হয়েছে ঐ কক্ষটায়। একটা ইন্দ্রপতন ঘটলো কলিয়ারী সকলের এক মহীরুহ ছায়ার হাত গুটিয়ে আলানী হতে চলেছে। আত্মার শান্তিকামনা করে ম্যাসেজ এলো। শবাধারে ও তাঁর দেহের ওপরে মালা দেওয়ার জন্য কত রং বেরংয়ের মালা এলো। সুন্দর ভেলভেটের কফিন এলো। কিছু চোখ তার দিকে তাকিয়ে বললো আচ্ছা। কেন এমন করলো? কিছু চোখের জল বাষ্প হয়ে তার শরীরের এদিক ওদিক ঘুরে, বলতে লাগলো কেন করলে? চৈতল একবার মুখটার দিকে তাকালো, টুসকি একবার গালে হাত বুলিয়ে দিল, সৌরভী। হ্যাঁ বুকে হাত রেখে বললো—কিছু খারাপ বলেছিলাম কি অর্জুন, যে এমনিভাবে চলে গেলে? ছটুসিং পাখার ব্লেডে নিহত চড়ুইটাকে তুলে নিল। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বহুদিনের বাবুর দিকে একবার চাইলো—জড়ানো গলায় বললো—বহুৎ আচ্ছা আদমী থা। কাঁহাসে ক্যা হো গিয়া উপরবালেই…।

এর উত্তর একমাত্র অর্জুনের নিথর দেহটাই দিতে পারে।

গৌর বৈরাগীর **গল্প**
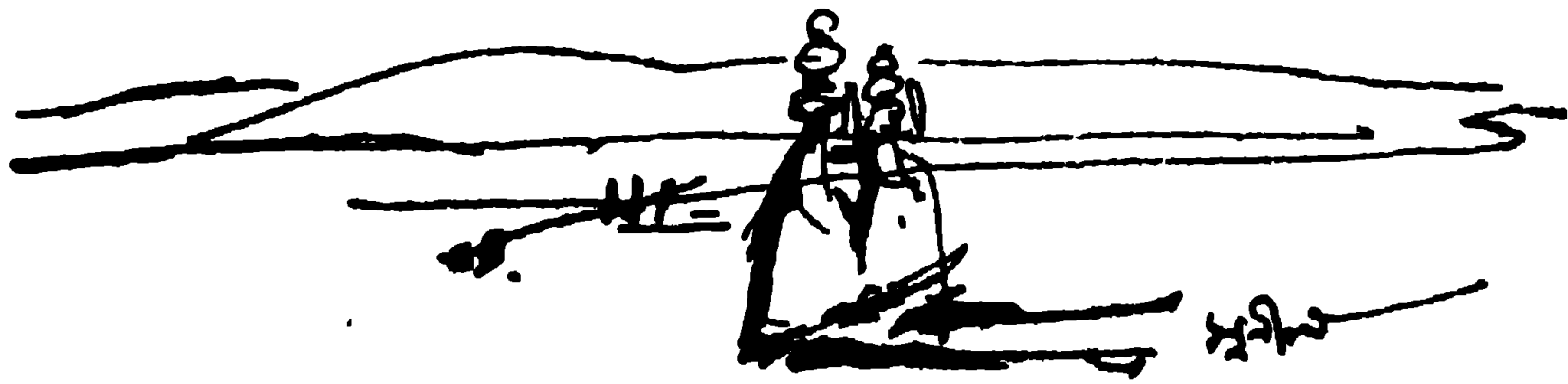
আজ বড় গরম

ঘটনাটা চোখের সামনে ঘটে গেল।

একজন বলে উঠল—আপনার কি শরীর খারাপ করছে।

শরীর খারাপ না করাটাই অস্বাভাবিক। একে গরম তার ওপর চাপাচাপি ভিড়। বাসে দাঁড়িয়ে গায়ে গা দিয়ে এক দঙ্গল মানুষ। ভেতরটা ভ্যাপসা গরম। অক্সিজেনের অভাব তো হবেই।

এর মধ্যে ঐ কথাটা। শুনে মুখ ঘোরাতে হয়। আর তারপর যা চোখে পড়ল তাতে আরও অবাক হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় রইল না। কথাটা যাকে বলা হয়েছে সেই মানুষটি দু'হাতে মুখ চেপে থরথর করে কাঁপছে। এরকম অবস্থায় যা হয়। আশপাশ থেকে সবাই ঠেলে এগিয়ে আসে। সেই লোকটির পাশের সিট ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে সবাই তাকে জানলার ধারে বসার সুযোগ করে দেয়। তখনও দুহাতে মুখ তার ঢাকা। শরীরটা থরথর করে কাঁপছে।

—কি ব্যাপার। সবাই একসঙ্গে বলে ওঠে।

—একটু সরে দাঁড়ান না সবাই। পাশ থেকে একজন বলে ওঠে। একটু হাওয়া আসতে দিন।

—জল, জল, বলে একজন চীৎকার করে ওঠে। কারো কাছে জল আছে। না কোন জলটল পাওয়া যায় না। হঠাৎ যেন সবাই একসঙ্গে বিমূঢ় হয়ে যায়। কি করবে। কি করা উচিত। এসময় কেউ বোধহয় ঠিক করতে পারে না। সবাই অপলক তাকিয়ে থাকে।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক। আধময়লা জামা কাপড়। পুরনো প্যাটার্ণের বুক পকেটওলা জামা। জামার পকেটে কালো রঙ-এর কমদামি একটা কলম।

চোখে কালো মোটা ফ্রেমের চশমা। সরু সরু শিরা বেরুনো রোগা হাত পা।

কিন্তু কি হয়েছে ওর। খুব শরীর খারাপ। ভেতরে কোথাও যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে শরীরটা। কিন্তু মুখে হাত কেন।

আশ্চর্য কেউ কোন কথা বলছে না। কি করা উচিত, কি বলা উচিত হয়ত ভেবে নিচ্ছে সবাই। হু হু করে গাড়ি ছুটছে, পরের ষ্টেশনে গাড়ি না থামা পর্যন্ত—

ঠিক এই সময় ভিড়ের ভেতর থেকে কেউ বলে উঠল—সিটে শুইয়ে দিন না ওকে।

হ্যাঁ প্রস্তাবটা মন্দ নয়। তাই হয়ত একজন দুজন ওদিকে এগিয়েও যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় মুখ থেকে হাতটা সরাল মানুষটা।

আর একবার চমকে উঠতে হল সবাইকে। মানুষটি এতক্ষণ কাঁদছিল। চশমার কাঁচ ঝাপসা। হাতের পাতায় জল। দু'গাল ভিজে সপসপে। কান্নার দমকে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে শরীর।

—কি ব্যাপার। একজন নরম গলায় বলল, আপনার কি হচ্ছে। পাশ থেকে আর একজন তার হাতটা ধরল। আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে।

মানুষটি তাকাল। আস্তে আস্তে এপাশ ওপাশ ঘাড় দোলাল। তারপর ধুতির খুঁট হাতে নিয়ে চোখে চাপা দিল।

চারিদিক আশ্চর্য রকম উদ্বেগে থমথম করছে তখন। কেউ একটাও কথা বলছে না। হয়ত নড়া-চড়াও হচ্ছে না। শুধু চুপচাপ তাকিয়ে আছে। এর মধ্যে আর একজন বলে উঠল—কি হচ্ছে আপনার।

মানুষটি এবার তার দিকে তাকাল। এক সেকেণ্ড দু সেকেণ্ড। তারপরেই ভেঙে পড়ে বলল—সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার।

—কি রকম সর্বনাশ। ভেতরে ভেতরে সবাই অবাক। কোন প্রিয়জন মারা গেছে কি। কোন উপযুক্ত সন্তান। কিন্তু একথা তো জিজ্ঞেস করা যায় না। চুপচাপ থাকতে হয়। সর্বনাশের কথায় শুধু এটুকু বোঝা যায় এখন তার শারীরিক কোন অসুস্থতা নেই। হয়ত এমন ভেবেই যারা যারা সিট ছেড়ে দিয়েছিল তারা টুকটাক করে বসতে থাকে। একটু নড়াচড়া শুরু হয়। টুকটাক কথা। ভিড়ের ভেতর থেকে 'ইস', 'আহা' এরকম শব্দ ছিটকে আসে। কিন্তু তার মুখ থেকে চোখ সরায় না কেউ। হয়ত ভাবনায় ডুবে যায় সবাই।

নিশ্চয়ই খুব কষ্টে মানুষ করতে হয়েছে ছেলে-টাকে একমাত্র ছেলে। সারা জীবনের পরিশ্রম। একটু একটু করে গড়ে তোলা একটা সুন্দর স্বপ্ন। হঠাৎ যদি কোন কারণে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

ঠিক এই জায়গায় বুকের ভেতর ধ্বক করে শব্দ হয় সবাইকার। কেউ বলে ওঠে 'ইস' কেউ বলে 'আহা', তাহলে, কি হবে দুজন অসহায় মানুষের। অবলম্বনের জন্যে যারা অপেক্ষা করে থাকবে কথা ছিল। কি হবে তাদের। হয়ত নিজেকে শেষ করে মানুষ করতে হয়েছিল ছেলেটিকে। তার চিহ্ন সারা শরীরময়। মাথার চুল সাদা, কপালে ভাঁজ। চাম-ড়ায় অজস্র কাটাকুটি। সব ইচ্ছা, সব শ্রম, আর সমস্ত সময়টুকু ছেলেটার মানুষ হওয়ার পেছনে খরচ হয়ে গেছে। সেই ছেলে হয়ত কোন এ্যাকসিডেন্টে···

এরকম ভাবনা সকলের। কেননা এখনও ঠিক-ঠাক জানা যাচ্ছে না—কি সর্বনাশ। কতখানি গভী-রতা তার।

মানুষটি চোখের ওপর আলতো হাতটা বুলিয়ে নেয়। হয়ত চোখের কোলে জমে ওঠা কোন দুঃখ। এক টুকরো দুঃখ মুছতে গিয়ে পরপর দুঃখেরা বেরিয়ে আসে। অন্য অন্য সবাই অপলক তাকিয়ে। সকলের চোখে মুখে ভয়ানক কাতরতা, কষ্ট আর অস্বস্তি।

যেহেতু সবটা একসঙ্গে জানা যাচ্ছে না। এ অবস্থায় প্রশ্ন করে করে জেনে নেওয়াটাও অশালীন। অথচ জানার বড় ইচ্ছা। কেননা শোকের সামনে মানুষ অন্তত তার সান্ত্বনার হাতটুকুও তো বাড়িয়ে দিতে পারে।

হয়ত তেমন ভেবেই পাশের লোকটি তার হাতটা ভদ্রলোকের হাতের ওপর রাখে। তারপর ফিস ফিস করে নরম গলায় বলে ওঠে—একটু শান্ত হোন।

—এখন আমি কি করব। মানুষটি এভাবেই কথা বলে ওঠে। এক অসহায় কণ্ঠস্বর। কণ্ঠস্বরে এক আর্ত প্রশ্ন। যার কোন উত্তর হয় না। শুধু প্রশ্ন শুনে চুপচাপ থাকতে হয়। শুনতে শুনতে মাথা নামাতে হয়। পাল্টা প্রশ্ন করাটা এসময় সত্যিই অশোভন। তাই চারদিক এত চুপচাপ। স্তব্ধতার ভেতর থমথমে শোক।

মানুষটি আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসছে। সেই সময় একজন খুব নরম গলায় বলে ওঠে—কি হয়েছে আপনার।

মানুষটি একথায় চমকে তাকায়। শোক সামলাতে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে। মুখের খাঁজে খাঁজে এক অসহায় চাউনি নিয়ে চুপচাপ তাকিয়ে থাকে। শুধু তাকিয়েই থাকে। তারপর একসময় ডান হাতটা ডান দিকের পকেটে ঢুকিয়ে দেয়। সবাইভাবে এবার হয়ত হাতে রুমাল উঠে আসবে। রুমালে চোখ মুখ ভাল করে মুছে নেওয়া হবে। কিন্তু সেসব কিছুই হয় না। তার বদলে পকেট সমেত হাতটা সকলের সামনে এগিয়ে আসে। সেটা দেখিয়ে ভাঙা খড়খড়ে গলায় মানুষটি বলে ওঠে—দেখুন আমার সব টাকা কটা।

আবার সবাই চমকে তাকায়। এবার পকেটের দিকে। আশ্চর্য পকেটের মাঝামাঝি সুন্দর করে কাটা। সেই কাটা জায়গাটা দিয়ে ডান হাতের আঙুলগুলো বেরিয়ে এসেছে। তাহলে এই ব্যাপার।

পাশ থেকে কেউ একজন বলে ওঠে—পকেটমার। পকেটমার।

আবার গুন গুন শব্দ ওঠে। একটু আধটু নড়াচড়া টের পাওয়া যায়। দু' একজন চোখ সরিয়ে নেয়। কিন্তু অনেকেই এখনও স্থির তাকিয়ে। হয়ত পকেটেই সর্বস্ব ছিল মানুষটির। হয়ত মেয়ের বিয়ে। সারা জীবনের টুকরো টুকরো সঞ্চয়। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, কো: অপারেটিভ লোন। হয়ত আজই ঐ পকেট বাহিত হয়ে বাড়ি আসছিল। আর সেই সময়।

এখন কি হবে। বরপক্ষ কি একথা বিশ্বাস করবে। যদি না করে তাহলে বিয়েটা কি আটকে থাকবে। বিয়ে আটকে যাওয়া মানেই একটা কাঁটা। জীবনের বাকী সময়টুকু জুড়ে ক্ষত করে যাবে সেটা।

হয়ত এসব ভাবনায় সবাই। ভাবতে ভাবতে কেউ বলে ওঠে 'ইস' কেউ বলে 'আহা'।

মানুষটি কিন্তু নির্বাক। চোখের দৃষ্টি শূন্যে। কি করা যাবে হয়ত বোধগম্য হচ্ছে না। প্রথম আঘাতটুকু সয়ে গেছে। কিন্তু অল্প অল্প কাঁপা বেশ টের পাওয়া যায়। শারীরিক বৈকল্য ঘটা তো স্বাভাবিক। শুধু এতগুলি টাকাই নয়। টাকার সঙ্গে একটা আস্ত জীবনও তছনছ হয়ে যাওয়া।

—টাকাটা যত্ন করে রাখতে হয়। পাশে বসা একজন আস্তে করে বলে ওঠে।

—ওঁরই তো ভুল। আর একজন কথা বলে। পাশ পকেটে কেউ টাকা রাখে।

মানুষটি ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। হাতটা ধীরে ধীরে মাথার চুলে একবার বুলিয়ে নেয়। একটা দীর্ঘশ্বাস।

—কত টাকা ছিল! খুব সাবধানে পাশ থেকে এবার প্রশ্ন করে একজন।

—মাসের মাইনে। কথাটা শেষ করে মানুষটি

চুপ করে যায়।

ফস করে নিশ্বাস পড়ে পরপর বেশ কটা। আস্তে আস্তে জমাট ভিড়টা ফাঁকা হয়। ফুরফুর করে হাওয়া ঢোকে কামরায় ওপাশে কে যেন এইমাত্র বলে ওঠে আমি ওয়ান ক্লাব ডেকেছি। কয়েকটা মুখ সেদিকে ঘুরে যায়। তবু কটা মুখ এখনও এদিকে।

মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি। পুরনো কাটিং জামার বুক পকেটে একটা কমদামি কলম। চোখে কালো সরু ডাঁটিওলা ঝাপসা চশমা। গলার কাছে ঘামাচি। চুবচুবে ঘাম। খাঁজে খাঁজে ময়লা। ডান হাতের দু' আঙুলে পলা আর গোমেদ। পায়ে সস্তা কমদামি চটি।

আসলে এসব তখনও দেখতে থাকে কটা চোখ। শুধু দেখতেই থাকে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেনা। হয়ত জিজ্ঞেস করার দরকারও হয় না। কেননা যার জামার কলার ফাটা। গলায় বিজবিজে ঘামাচি তার মাসের মাইনে পকেটকে. কতখানি ওজনদারি করতে পারে এটা আন্দাজ করা যায়।

তাই একজন পঁচিশ পয়সার তিনটে আমলকির চাটনী কেনে। আর একজন ফলওলার সঙ্গে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দরাদরি শুরু করে দেয়। ঠিক সেই সময় মানুষটি ডুকরে ওঠে যেন। আবার কি নতুন করে ভাবনায় ফিরে যাচ্ছে সে। খিদে নিয়ে অপেক্ষা করা কটা পেট। ভাবতে গিয়ে মুখটা থমথমে হয় তার। চোখ দুটো ছলছল করে। সবাই একপলক তাকায়। মানুষটি জোর করে 'সামলায় নিজেকে, তারপর কাউকে না শুনিয়ে ফিসফিস করে বলে—একটা মাস, একটা আস্ত মাস—

একথা সবাই শোনে। কিন্তু উত্তরে কেউ বলে না কিছু। ধীরে ধীরে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ঠিক সেই সময় একজন বলে ওঠে—ওফ্, বড্ড গরম পড়েছে আজ।

শতদ্রু মজুমদারের

ঝাঁপী

আগাছার জন্ম বৃত্তান্ত

১। খোকামল্লিক ও ছেঁড়া ইতিহাস

দেউড়ি পেরোলেই ডান হাতি বিশাল ঘরটা। চারদিক ভাঙাচোরা, নোংরা জিনিসে একাকার। সূর্য উঠলেও, ঝুলঝাপ্পির সংগে অন্ধকারের জড়াজড়ি।

এখানে পাগলি আস্তানা গেড়েছে। ক'দিন আগেও আগান বাগান, মাঠ-ঘাট চষে বেড়াত। এখন শরীর ভার-ভারন্ত। ঢাউশ পেট নিয়ে নিজেকে আর টানা-হ্যাঁচড়া করা যাচ্ছেনা। এই ঘরটায় তাই দিনরাত।

এ-ও এঁটো-কাঁটা, পাত-কুড়োনি দিয়ে যায়। পাগলের খেয়াল—কখনো খায়, কখনো খাদ্য নিয়ে খেলা করে।

সকালে ঝালাই বুড়োর মেয়ে সরা ভরতি ভাত আর ডাঁটা চচ্চড়ি সামনে রেখে চলে গিয়েছিল। পোয়াতি মানুষের বড় খিদে। নিজের, আবার পেটের বাচ্চারও। কিন্তু পাগলি খায়নি। দুটো নেড়িকুত্তা কামড়া-কামড়ি করে সব সাবাড় করে দিয়ে গেছে কখন। হুঁশ নেই তাতে। বেলার দিকে ব্যথা উঠেছে। সুরকির গাদায় মাথা রেখে পাগলি সটান্ চিৎ। হাঁটুর ওপর বরাবর এলোমেলো কাপড়ের প্যাঁচ। বুক-পেট উদোম।

দেউড়ির বাঁদিক দিয়ে কাঠের সিঁড়ি। এই সিঁড়ি ভেঙে, আজ, এখন পর্যন্ত অন্তত পঁচিশজন ওপরে উঠেছে, নেমেছে। কেউ তো আর কানে তালাচাবি লাগিয়ে রাখেনি—সুতরাং ঝিঁঝির মিশেল দেয়া পাগলির গোঙানি বাবুদের কান এফোঁড়-ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু খোকা মল্লিকের বুকের কোথায় যেন সেই আর্ত-চীৎকার টুস্কি মারে। বেলা দুটোয় বাড়ি ফেরেন। 'মা করুণাময়ী' সিনেমার ছোট ম্যানেজার। ভাদ্রমাসের ছাতি ফাটানো বিজ্বিরি রোদ্দুর গায়ে মাথায় মাখামাখি করে,

খেলার মাঠ পেরিয়ে দেউড়িতে ঢোকার পর বুক ভরতি ঠাণ্ডা বাতাস টেনে নিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। সেই সময় ভাঙা ঘরের মেয়েলি অশ্লীল চিৎকার তাঁকে থামিয়ে দেয়। জানেন, ওখানে পাগলি আছে। জানেন, পাগলির বাচ্চা হবে। তবু 'যাবো কী যাবো না ভাবটা ঝট্‌পট কাটিয়ে ঘরের দিকে এগোন। ঠিক তখনই ওপরের একটা ঘরের খড়খড়ি খুলে যায়। সেই জানলা থেকে এক সরল রেখায় এই ঘরটা। সেখানে দয়াময়ী। সরাসরি ছুঁড়ে দিলেন, ওখানে কী আছে দেখার? কোনো দরকার নেই—সোজা চলে এসো—ছিঃ ছিঃ কী লজ্জার। ভরদুপুরে চৌহদ্দি জুড়ে নিস্তব্ধতার জাল। তবু মল্লিক বাড়ির দেয়াল তো কথা বলতে পারে! অবাধ্য অথচ ভীরু বালকের মত খোকা মল্লিক তখন গুটিগুটি সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন। পঞ্চাশে পা দিয়েও তিনি ভেবে পাননা, কে কার বশে। স্ত্রী, স্বামীর? না এর উলটোটা? পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবনে দয়াময়ীর পেটে একটা সন্তানও দিতে পারেননি। এই অপরাধের বোঝা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বয়স হতে খোকা মল্লিক আরো ম্যাদামারা। বউয়ের হাতে দড়ি-বাঁধা একটা গৃহপালিত পশু। অথচ নিজে তো দেখেছেন, বাবা নতু মল্লিকের দাপট। সেই ব্যক্তিত্বের কাছে সারা তল্লাট জুজু। জমিদারী ধোয়া-মোছা হলেও অভাব টলাতে পারেনি। একসময় সাহেবদের সংগে দাবা খেলতে বসে দশ টাকা পাঁচ টাকার নোটের ভেতর সিগারেটের মশলা পুরে বাবুয়ানার ধোঁয়া আকাশে-বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছেন কত। রাজগঞ্জে পেল্লায় মুদিখানার দোকানে টাকার বস্তা ওঠ-বোস করাতেন নতু মল্লিক। আর এই অপদার্থ উত্তর পুরুষকে নিত্য ওঠ-বোস করাচ্ছে বাড়ির প্রথম ম্যাট্রিক পাশ বউ।

হুট বলতেই নতু মল্লিক থ্রম্বসিসে মারা গেলেন একদিন। তখন দু'ভাই খোকা মল্লিক আর হাঁদা মল্লিক জুয়া-মদ-মেয়েছেলেতে দোকান ছকড়া-নকড়া করে ছেড়ে দিল রাতারাতি। হাঁদা মল্লিক খুন হল রাজার পোলের তলায়, জুয়ার আড্ডায়। তার একটা মাত্র ছেলে ছ বছর বয়সে নিখোঁজ। আগে থেকেই হাঁদা মল্লিকের বউয়ের মাথার কল-কবজা একটু ঢিলে-ঢালা। এসব ঝড়-ঝাপ্‌টায় একেবারে উন্মাদ। হাঁদা মল্লিক মারা যাবার পর আগের পক্ষের ছেলে ফাটা এসে ঘর দখল নিল। সৎমা তখন পাগল হয়ে পথেঘাটে ছেলে হাসাচ্ছে। ধুম-ধাড়েক্কা একটা বাগদীদের মেয়েকে সে বিয়ে করে আনল। তাই দেখে বাড়ির মেয়ে-বউয়েরা রণচণ্ডী। মল্লিক বাড়ির মান-সম্মান খোয়া যেতে দেবেনা কিছুতেই। এই নষ্ট মেয়েকে বাড়িতে রাখা চলবে না। ওপরের ঘর থেকে নামিয়ে দেওয়া হল। ফাটাও ছেড়ে দেবার নয়। শুন্তে কোমরের বেল্ট ঘুরিয়ে বলেছিল, দেখা যাবে কোন শালা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়ায়!

অগত্যা ঠিক হয়, পুকুরধারে খিড়কির একটা ঘরে থাকার যোগ্যতা ফাটার আছে। ঘরটা আগে ছিল আস্তাবল।

বিয়ের পর, শ্বশুরের পয়সায় রথতলার বাজারে একটা গমকল দিয়েছে ফাটা। উপর-অন্ত খাটে আর তলা থেকে ওপরে উঠে আসার মতলব ভাঁজে।

কিন্তু কথা হচ্ছিল খোকা মল্লিককে নিয়ে।

মাথার ওপর ফ্যান। মানা গেঞ্জি খুলে বুকের খাঁচা মেলে ধরলেন খোকা মল্লিক। আরো কিছু ধাতানির জন্যে মনে মনে নিজেকে শক্ত করে নিতে হয়। দুহাত কোমরে রেখে সামনা-সামনি দয়াময়ী। মুখের সামনে মুন্ডু নেড়ে বললেন 'অসভ্যতামির একটা সীমা থাকে সকলের। তোমার তাও নেই—' কে, কার অসভ্যতামি দেখে। দিনে-দুপুরে ক্লাবের ছেলে-ছোকরা ঘরে ঢুকিয়ে কত ফস্টি নষ্টিই না

দয়াময়ী করেছেন। খোকা মল্লিক কিছু বলেননি, যদি বউটার পেটে একটা বাচ্চা ফাউ দিয়ে যায় কেউ। 'না মানে—', ঢোক গিললেন তিনি। 'মানে আবার কী? বাচ্চা হওয়া দেখবে—' খোকা মল্লিক দরদর ঘামছেন। রেগুলেটারটা আরো একটু ঘোরাতে গিয়ে হাত থেমে গেল। ফ্যান ফুল স্পীডেই।

খোকা মল্লিক চুপ। দয়াময়ী আবার বললেন, 'বয়সটা খেয়াল রেখো—

তারপর সিনেমার পত্রিকা হাতে নিয়ে বিছানায় দেহ ফেলে দিলেন।

২। গৃহহীনে গৃহ দিলে

ঠাকুর দালানে একটা ঘর নিয়ে থাকে ঝালাই-বুড়ো। সঙ্গে এক বিধবা মেয়ে। নতু মল্লিক বেঁচে থাকতেই এই উদ্বাস্তু পরিবারকে আশ্রয় দিয়ে ছিলেন। তারও একটা ইতিহাস আছে। সে কথা পরে।

লম্বা দালানের এক কোণে ছোটমত উনুনটা সারাক্ষণ জ্বলে। দু ফুটো তাতাল তেতে-পুড়ে লাল। ঠুক-ঠাক ঝালাইয়ের কাজ করে যায় বুড়ো এক মনে।

দিন কতক দুপুরের দিকে নলীন গায়েন আসতে শুরু করেছে। ডাক পিয়নের কাজ করত। অবসর নিয়েছে গেল বছর। বাড়িতে দিন ভোর মা-মেয়ের চুলোচুলি—পাগলা করে মারে। এখানে এলে কিছুটা স্বস্তি। গল্প গুজবে সময় কাটে যা হোক।

উনুনের আগুনে বিড়ি ধরিয়ে গায়েন বলল, 'পাগল-ছাগলের পেটে কী ভাবে বাচ্চা আসে আমি তো ঠিক বুঝি না—'

ফুটো হেরিকেনের পাছায় এক চিলতে রাং ঘসে দিল বুড়ো। লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে রসাল জবাবের আশায় গায়েন চুপচাপ। তখন ভেতর পুকুর থেকে চান করে ফিরছিল মীরা। ঝালাইবুড়োর মেয়ে। জল পায়ের ছাপ ফেলতে ফেলতে দ্রুত ঘরের দিকে চলে যাবার পর বুড়ো বলল, 'ক্যান? না বুঝনের কি হইল? কথা হইল কী ভালো মাইনষের বাচ্চার বাপের ঠিক নাই, আর এ হইল গিয়া পাগল। মাই-নষের যে কুত্তার হাল হইছে, তা কী জানো না গায়েন?

গম্ভীর সে ঘাড় নাড়ল গায়েন, 'হুঁ, তাই তো দেখছি—কিন্তু কার কীর্তি বলো দিকিনি—'

'আমাগো দরকার কী গায়েন? আমরা হলাম হা ভাতে গরীব-গুর্বো মানুষ—'

গায়েন বলল, আমার মনে হয় '

হেরিকেন থেকে মুখ তুলল ঝালাইবুড়ো। উনুন থেকে তাতাল বদল করে বলল, 'থাক। মনের কথা মনেই থাক ঝামেলা বাড়াইয়া কাম কী—'

ভেতর থেকে খ্যান খেনে গলা ছাড়ল মীরা, 'বাবা তোমার ভাত বেড়েছি—'

'বোসো গায়েন, খেয়ে আসি।'

উনুনে চাট্টি কয়লার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে ঝালাই-বুড়ো চলে গেল।

৩। অশ্লীল কবিতা

ভাঙা ঘরে উদোম শুয়ে/হে উন্মাদিনী
আসন্ন শিশুর জন্মদানে তুমি কাতর
এই পৃথিবীর কী আলো দেখাবে তাকে
তোমার শেষ যৌবন ছুঁয়ে চলে যায়/শৌখিন বাবুদের
কামুক দৃষ্টি—

এটা রাজকুমারের কবিতার কটা লাইন।

সে হল নতু মল্লিকের এক ভাইপোর ছেলে। বি. এ পার্টওয়ান পাশ করে তিন বছর বেকার। সকাল সন্ধে টিউশনি আর দুপুরে বাংলা টাইপ শেখে।

বাড়ির ভাড়াটেদের এক মেয়েকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে কবি হয়ে গেল হঠাৎ। কিন্তু কাব্যের খাঁচায় চিড়িয়া আটকানো গেল না। হঠাৎ এক ব্যাংকের পিয়নের সঙ্গে চুমকির বিয়ে হয়ে গেল।

কবিতার দফা রফা করে কিছুদিন ঘরবন্দী হয়ে রইল রাজকুমার। এখন আবার নতুন করে সৃষ্টির উল্লাসে মেতেছে। প্রেমের কবিতা আর নয়। মাটির কাছা-কাছি আসতে চায় সে। দিনে একটা করে জীবনধর্মী কবিতা লেখে। নিজেই টাইপ করে লিটল ম্যাগাজিনে পাঠিয়ে দেয়। আজ সকালে পাগলি কাব্যপ্রবাহ উস্কে দিয়েছে হঠাৎ। কাঠের চেয়ারে শিরদাঁড়া সোজা করে বসে কটা মাত্র লাইন লিখতে পেরেছিল। কিন্তু মায়ের হাতে কীভাবে কাগজটা যেতেই সব হচপচ পাকিয়ে গেল।

শক্ত গলায় মা বললেন, 'এসব কী লিখেছিস তুই?' রাজকুমারের সাহসী জবাব, 'কেন, কবিতা।'

'ছিঁড়ে ফেলে দে ওরকম কবিতা।'

'তুমি কবিতার কী বোঝো?'

'দরকার নেই বোঝার। এসব নোংরা না ঘেঁটে চাকরির পরীক্ষার জন্যে তৈরী হও - কবিতা লিখে পেট ভরবে না।' এরকম দমিয়ে দেওয়া কথাবার্তা শুনতে কোন উঠতি কবির ভালো লাগে? কিন্তু এ ধরনের কথা মা তো বলে নি আগে কখনো। বরং কলেজ ম্যাগাজিনে 'যখন যন্ত্রণা' কবিতাটা পড়ে বেশ তারিফই করে ছিলেন। সাহিত্য যে একেবারে বোঝেন না, তা নয়। আসলে কারণটা অন্য। নিজেদের ফ্যামিলির কথা কবিতায় এসে যাচ্ছে। আপত্তিটা সেখানেই।

মা রান্নাঘরে। পাণ্ডুলিপিটা পকেটে পুরে রাজকুমার বেরিয়ে পড়ল কোথায়।

৪। ছিন্নকথা

ঘণ্টা খানেকের একটা ঘুম দিয়ে খোকা মল্লিক বেরিয়ে পড়েছেন। ফিরতে ফিরতে সেই রাত এগা-রোটা। নাইট শো ভাঙলে। দয়াময়ী তখনো কোঁস কোঁস নাক ডাকাচ্ছেন।

লম্বা দড়ির লম্ফর মালা হাতে ঝুলিয়ে ঝালাই-বুড়ো হাঁটা দিল। দোকানে দোকানে দিয়ে আসতে হবে। রোজের কাজ এটা। পাগলি কিছুটা থেমেছে। 'এতক্ষণে প্রসব হয়ে গেছে' ভেবে মীরা একবার ঘরের দিকে ঢুকল। ভাঙা জানলা দিয়ে শেষ বেলার রোদ সোজাসুজি ঘরের মধ্যে। আলো আঁধারিতে পাগলির মূর্তি স্পষ্ট। বুকের ওঠানামা বেশ দ্রুত। সুরকিতে মাখামাখি মুণ্ডুটা এদিক-সেদিক নড়ছে। বন্য জন্তুর মত স্বর বেরুচ্ছে নাক-মুখ দিয়ে। নিরিবিলিতেও এমন দিগবসনা শরীর মীরাকে লজ্জা দেয়। পাশে পুঁটুলি পাকানো কাপড়টা আলতো হাতে বুক থেকে পা অব্দি ঢেকে দিতেই খিস্তি দিয়ে পাগলি চীৎকার করে উঠল, 'বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা শিগ্‌গির—ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবো সব—' কিছুটা পিছু হটে দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়াল মীরা। এবং তখনই রাজকুমারের মায়ের মুখোমুখি। কলতলায় জলভরতি ঘড়া কাঁকালে তুলে বললেন, 'অতই যদি দরদ, যাও না ঘরে নিয়ে যাও না—কাঁচা কাঁচা খিস্তিগুলো শুনতে ভালো লাগছে তো? এটা ভদ্রলোকের বাড়ি—কলোনি নয়—'

কথা শেষ করেই হন-হন পা চালালেন তিনি।

বলতে অনেক কিছুই পারত মীরা। সে যাই বলুক একটা কথায়, থামিয়ে দেয় সবাই, 'মনে রেখো তোমরা এ বাড়ির আশ্রিত। তবে একেবারে মুখ বুজে থাকার নয় মীরা প্রায়ই বলেছে, অতই যদি আশ্রিত বলে ঘেন্না, তাহলে আশ্রিতদের মেয়ের সঙ্গে বাড়ির ছেলেরা ইতরামি করতে আসে কেন?' তখন সব বোবা। রবির বাবাও কি কম লুকোচুরি খেলেছে? আশ্রয় দেবার নাম করে, নন্তু মল্লিক তার মাকে রক্ষিতা করে নিয়েছিল, একথা আজ আর অজানা নয়। এবাড়ির আনাচে-কানাচে কেচ্ছা। তবু বলবে, ভদ্রলোক। গ্রামের লোকেরা মল্লিকদের উঠতে

দেখেছে, আবার জমিদার বংশের শেষ ইজ্জত ধুলো-কাদা হলো চোখের সামনেই।

গজগজ করতে করতে মীরা চলে যায়।

৫। একা কুম্ভ রক্ষা করে

সূর্য ডুবতেই দেউড়ি অন্ধকার। অগ্রদূত ক্লাবের ছেলেরা আসতে শুরু করেছে একের পর এক। এরপর শুরু হবে হল্লাবাজী, যার নাম রিহার্শাল। পুজোর সময় থিয়েটার হবে। আবার মাথায় চূড়ামণি খোঁপা, চোখে লাল-নীল চশমা লাগিয়ে রবিবার রবিবার হিরোয়িন আসে। তখন ভিড়-ভাট্টা দেখে কে। যেন মল্লিক বাড়িতে উৎসব লেগে গেছে। হাজার বলেও ক্লাবঘর ওঠানো যাচ্ছে না। মুশকিল হল, রাজকুমারের বাবা ক্লাবের সেক্রেটারি।

ক্লাবঘরের পাশেই ভাঙা ঘরটা। সেখান থেকে একটা মেয়েলি গোঙানি শুনে একজন টর্চ মারল। আলো পড়ল সরাসরি মীরার মুখে। চোখে হাত আড়াল করে সে বলল, 'আপনাদের লজ্জা করে না? ভদ্রলোকের ছেলে—'

টর্চের আলো নিভে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কী দেখল, তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা জমে উঠল বেশ।

৬। ফাটার সংসার

বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়িয়ে আলতা বেরিয়ে গেছে কখন। চান করে এসে রুটির গোছা আর কুমড়োর তরকারি নিয়ে বসল ফাটা।

মাথায় অনেক চিন্তা। কাল একবার রাজগঞ্জে যেতে হবে। তিনবস্তা গম দরকার। শুধু গম ভাঙা-নোর ব্যবসা করলে শুকনো রুটিও জুটবে না। গেল মাসে দু বস্তা গম তুলেছিল। দিন দশেকের মধ্যেই শেষ। আলতার বাচ্চা হতে বাজারে বেশ কিছু দেনা। এখনো শোধ করে যাচ্ছে। লাইটের টাকা দুমাস বাকী পড়তে খোকা মল্লিক তার কেটে দিয়েছেন। ফাটা জানে, কাকা মাটির মানুষ। ঐ ধুমসী মাগীটারই কারসাজি। এখান থেকে তাড়াবার ফন্দি আঁটছে দিনরাত। মেরে ফেললেও ফাটা নড়বে না। যতোই হোক, সে যে মল্লিক বাড়ির ছেলে, এটা তো আর বুজরুকি নয়।

খাওয়া শেষ করে পাতে বসে জিরোচ্ছিল ফাটা। এমন সময় আলতা ঢুকল।

'তোমার খাওয়া হয়ে গ্যাছে?'

উঠে দাঁড়িয়ে ফাটা বলল, 'কোথায় গেছলে রাত দুপুরে?'

'ঐ মীরা ডাকলো একটু—'

মীরারও আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, ওখানে যাবার দরকারটা কী আছে?

আলতা ঘুরে দাঁড়াল, 'কেন ক্ষতিটাই বা কী? ঐ ঘরে আমাদেরই তো যেতে হবে—নোংরা মেয়েমানুষ আমরা—বাড়ির সতী সাধ্বী বউ তো নয়—'

ফাটা ধমকে উঠল, 'এসব আমাকে বলে কী হবে?'

আলতা পালটাই বলল, 'তবে বলছোটাই বা কেন? নোংরামি করে বাবুরা সব মজা দেখবে আবার দেমাক কত!' কথা কানে না নিয়ে ফাটা কলতলার দিকে গেল। যাদের উদ্দেশ্যে এসব বলা, তারা ঘরের দরজা দিয়ে শুয়ে পড়েছে। এখন রাত অনেক।

৭। নবজাতক হইতে সাবধান

আঁচলে টাকা গেরো দিয়ে ধাইমা চলে গেল। সারারাত্তির জেগে বসে বসে, দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে মীরা এখন চোখ বুজেছে। দালানে শুয়ে মশা মারছে বালাইবুড়ো। পাগলি এখন তার ঘরে।

সকাল হতেই খবরটা চাউর। পাগলির একটা ছেলে হয়েছে। এবং সেটা জ্যান্ত। ঝালাইবুড়োর ঘরে আঁতুড়।

ভাণ্ডারঘর এবং পাগলির সন্তান প্রসব নিয়ে একটা জরুরি আলোচনা হয়ে গেছে মল্লিক বাড়িতে।

একটু বেলায় ঘর থেকে ঝেঁটিয়ে বের করা হল, টিনের ফুটো মগ, ছেঁড়া কাঁথা-কানি, একটা বাখারি (যেটা মাটিতে আছড়ে আছড়ে শত্রুর বংশ নির্বংশ করত পাগলি)। আজই ঘরে তালা পড়বে।

৮। পুনশ্চ

গল্প এখানেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু রাজকুমারের কবিতার খানিকটা আমরা জেনেছি। আজ সকালে বাকীটা সে লিখে ফেলেছে। সেটুকু থেকে পাঠককে বঞ্চিত করাটা ঠিক হবে না, হয়ত।

জন্ম মুহূর্তে বিভাড়িত।
এ কোন শিশুকে ধারণ করেছিলে, হে ভিখারিণী মা।

তুমি কি জানো না/তোমার গর্ভের শিশুর জন্ম
অশ্লীলতার ঔরসে

এ শিশু তাই অচ্ছুৎ/সভ্য সমাজ কোনদিন গ্রহণ করবে
না একে।

প্রসঙ্গ ঃ গোধুলি-মন

O শ্রাবণ সংখ্যা পেয়েছি। বিশেষভাবে শিশিরকুমার মিত্রের লেখাটির অনুবাদ পড়লাম। রবীন্দ্রনাথের চরিত্রেও একটা Bossism ছিলো, তবে অনেক Refined।
আপনার পরিকল্পনাগুলো সুন্দর, এর জন্য ধন্যবাদ অবশ্য প্রাপ্য।
বাংলা দেশের নামী তরুণ কবি খোন্দকার আশরফ হোসেন গোধুলিমনের বইমেলা সংখ্যায় অজিত রায়ের প্রবন্ধটি তাঁর পত্রিকা একবিংশ'তে পুণর্মুদ্রন করছেন। আপনি নিশ্চয় কিছু মনে করবেন না। উনি আপনাকে বোধহয় চিঠিও দিয়েছেন।

সংযম পাল
বোলপুর

O আপনার সম্পাদিত গোধুলিমন পত্রিকাটি নিয়মিত পাচ্ছি। পত্রিকার মান সম্পর্কে বলার কিছু নেই। ছোট পত্রপত্রিকার মধ্যে এই পত্রিকাটি নিঃসন্দেহে উঁচু মানের পত্রিকা বলে দাবী করতে পারে, ছাপা খুবই সুন্দর, প্রচ্ছদের আঙ্গিকের দিকে আর একটু নজর দিলে ভাল হয়। এটাকে আদৌ সমালোচনা বলে মনে করবেন না একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে আমার একটা গঠনমূলক প্রস্তাব বলে ভাবলে খুশী হবে।

বরুণ মজুমদার (সংবাদপাঠক)
আকাশবাণী, কলকাতা

O আন্তরিক প্রীতি জানাই। 'গোধুলি মন' অবিশ্বাস্য ভাবে নিয়মিত পাচ্ছি। ভাবলেও অবাক হতে হয়, নাম মাত্র বিজ্ঞাপন ছেপে এমন পরিচ্ছন্ন, রুচিশীল পত্রিকা কি করে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়! পত্রিকার পাতায় পাতায় সম্পাদনার মুন্সীয়ানা সত্যি অনুকরনীয়। 'গোধুলিমন গ্রামীণ সাহিত্যের গর্ব।

অরুণ মিত্র
সম্পাদক/কবিতাপত্র
টিটাগড়/২৪ পরগণা

সংবাদ

০ গোধূলিমনের কবিতার দিন

বেশ কয়েকদিন ধরে অকাল বর্ষণ শুরু হয়েছে। মনে হচ্ছিল ১৫ই সেপ্টেম্বরও হয়তো বৃষ্টি ধুইয়ে দিয়ে যাবে গোধূলিমনের 'কবিতার দিন'কে। কিন্তু কি কারণে জানিনা, সেদিন সকাল থেকেই ঝকঝকে হয়ে উঠেছিল শরতের নীল আকাশ। মঞ্চ সজ্জার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শিল্পী শরদিন্দু অধিকারী। বেলা একটার মধ্যে মঞ্চ প্রস্তুত। তারপর থেকে শুধু প্রতীক্ষা। চারটে থেকে শুরু করার কথা থাকলেও পাঁচটার আগে অনুষ্ঠান শুরু করা গেলনা। আধুনিক কবিতার গীতিরূপকার ঋষিণ মিত্র প্রথম পর্য্যায়ে পরিবেশন করলেন তিনটি গান। স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর শুরু হোল অরুণ চক্রবর্ত্তীকে দিয়ে। অরুণ চক্রবর্ত্তী তার আবৃত্তিতে জমিয়ে দিলেন আসর। প্রবীণ কবি জ্যোতির্ময় বসু তাই আসরে এসেই স্বীকার করে নিলেন—অরুণবাবুর কবিতার পর আমার কবিতা ঠিক জমবেনা। জ্যোতির্ময়বাবুর তিনটি কবিতার পর কবিতা শোনালেন বাঁশবেড়িয়ার কৃষ্ণসাধন নন্দী, হরিপালের দীপালি দে সরকার ও ভদ্রেশ্বরের শিবশঙ্কর রায়চৌধুরী। সেদিনের আসরের দুই আবৃত্তিকার দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অদিতি চট্টোপাধ্যায় যথাক্রমে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের কবিতা আবৃত্তি করে উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করেন।

অরুণ চক্রবর্ত্তীর সাঁওতালীভাষায় লেখা কবিতায় সুর দিয়েছেন বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ের সুভাষ চক্রবর্ত্তী। শ্রী চক্রবর্ত্তী তার অনুপম কণ্ঠের যাদুতে মুগ্ধ শ্রোতাদের শোনালেন পরপর পাঁচটি গান।

আলোচকদের মধ্যে ছিলেন লিটিল ম্যাগাজিন সম্পাদক সমিতির সম্পাদক নবকুমার শীল, লিটিল ম্যাগাজিন পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ সন্দীপ দত্ত এবং ছিলেন সেদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণীয় মানুষটি সুইডেনের 'উত্তর প্রবাসী' সম্পাদক গজেন্দ্রকুমার ঘোষ।

গজেনবাবু শোনালেন কি ভাবে সুইডেনে দশ বছর ধরে খোঁজ করে করে আবিষ্কার করেন ওখানের লিটিল ম্যাগাজিন। উনি বলেন ওদেশে লিটিল ম্যাগাজিনের লেখকরা সমাজে তথা-কথিত বাজারী সাহিত্যিকদের থেকে বেশী সম্মান পেয়ে থাকেন।

তিনি আরো বলেন ওদেশে লিটিল ম্যাগাজিনকে কালচুর বা কালচারাল ম্যাগাজিন বলা হয়ে থাকে। সুইডিশ সরকারের সাংস্কৃতিক বিভাগের মান অনুযায়ী বেশ কিছু লিটিল ম্যাগাজিন আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে। খুবই আনন্দের বিষয় 'উত্তর প্রবাসী' বেশ কয়েক বছর ধরে সরকারের আর্থিক সহায়তা পেয়ে আসছে।

ওদিনের অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কবিরা ছিলেন কৃষ্ণা বসু, দ্বিজেন আচার্য্য, অপূর্বকুমার সাহা, সমীর মণ্ডল, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল পাঁজা, অমল দাস ও অশোক চট্টোপাধ্যায়। সনৎ মান্না ঋষিণ মিত্রকে নিয়ে একটি সুন্দর ছড়া শোনান।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দর ভাবে পরিচালনা করেন 'গোধূলিমন' সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায়।

গোধূলি মন

এই সংখ্যায়

কার্তিক সংখ্যা/১৩৯

O প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন O

O প্রথমেই "গোধূলি-মনের" শারদীয়া সংখ্যার উঁচুমানের জন্য অভিনন্দন। এত বেশি সংখ্যায় ভালো কবিতা বহুদিন পড়িনি। প্রত্যেক কবিই অত্যন্ত আন্তরিক তাঁদের কবিতায়। আমার ব্যক্তিগত পছন্দের শীর্ষে কবি বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কেটে গেল কতদিন।" আমার কবিতা বোধির ১১ লাইনে একটি ভুল ছাপা। "জাপানী জৈনের" পরিবর্তে "জাপানী জেন" হবে।

এরপর প্রাবন্ধিক অজিত রায় প্রসঙ্গে। যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পৃথিবীর নানা দেশে নানা গুণীজন গবেষণায় ব্যাপৃত। সেই রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে উনি নিজের খেয়ালখুশীমত বিকৃত উক্তি দিয়েছেন কোন কোন জায়গায় অশালীন মন্তব্যও করেছেন। ওঁর প্রবন্ধের শেষে গ্রন্থঋণ' উল্লেখকরার কথাও ভুলে গেছেন। ওঁর উক্তি "পুনশ্চের" ভূমিকা থেকে যথা এই উপলক্ষে একটা কথা বলবার আছে। গদ্যকাব্যে অতি নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙ্গাই যথেষ্ট নয়। পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি (তাং ২রা আশ্বিন ১৩৩৯,"।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে "তাকে বজায় রেখেই ও বিচ্ছেটা আয়ত্তে আনতে হবে" এই প্রক্ষিপ্ত অংশটুকু অজিতবাবুর। রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে উক্তি নিয়ে এই ধাঁচের স্পর্দ্ধা কোন সৎ প্রাবন্ধিকের হতে পারেনা। সাহিতিক সদাচার (Ethics) এর ধার যদি উনি ধারেন তো নিঃশর্ত্ত ক্ষমা চাওয়া উচিত শ্রীঅজিত রায়ের। এ সম্বন্ধে সম্পাদকের অভিমত জানাতে পারলে বাধিত হব।

জ্যোতির্ময় বসু
ফ্ল্যাট ২, ব্লক ডি
৮২ বেলগাছিয়া রোড,
কলিকাতা-৭০০০৩৭

O O O

O 'গোধূলি-মনে'র প্রতিটি লেখাই উন্নত মানের। পরিচ্ছন্ন রুচির প্রকাশ প্রতিটি পৃষ্ঠাতেই। গোধূলির মন প্রসন্ন-করা রাঙা রোদের মতোই উজ্জ্বল 'গোধূলি মন'। লেখাগুলোর সাহিত্য-রস মনকে যেমন আপ্লুত করে, তেমনি বিশ্বাতীত এক বর্ণময় পরিমণ্ডলে মনকে বিচরণশীল করে তোলে। কবিতাগুলি মনে স্থায়ী আবেদন রাখে। অজিত রায়ের বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ মগজে নাড়া দেয়। এমন একটি শারদ সংখ্যা উপহার দেবার জন্য আপনাকে অভিনন্দিত করি।

শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
বাণপুর/নদীয়া

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি মন

২৮ বর্ষ/১১শ সংখ্যা
নভেম্বর/১৯৮৬
কার্ত্তিক/১৩৯৩

প্রতি সংখ্যা দুই টাকা
বার্ষিক সডাক কুড়ি টাকা

সম্পাদকীয়
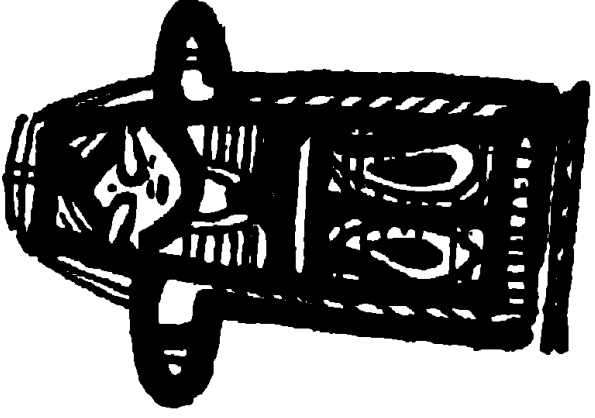
পূজাসংখ্যায় প্রকাশ করতে না-পারা উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু লেখা নিয়ে আমাদের এই বর্ত্তমান সংখ্যা (কার্ত্তিক সংখ্যা)। এখন থেকে প্রতিটি সংখ্যাতেই একাধিক ভাল প্রবন্ধ রাখার চেষ্টা রয়েছে আমাদের। তবে কিছু কিছু প্রবন্ধকার এত বড় মাপের লেখা পাঠান, যে আমাদের সাধারণ সংখ্যার সবটুকু তাঁদের জন্য বরাদ্দ করলেও স্থান সঙ্কুলান হবেনা।

পরবর্তী পর্য্যায়ে (বইমেলা '৮৬) বুদ্ধদেব বসুর ওপর একটি বিশেষ সংখ্যার পরিকল্পনা নিয়েছি আমরা। ঐ সংখ্যাটিতে শ্রীমতী গৌরী আইয়ুব, কৃষ্ণা বসু, অজিত রায়, প্রভাস চৌধুরী গদ্য লিখছেন। হয়তো তার আগেই বা পরে আমাদের দপ্তরে আসা সমালোচনার জন্য ইতিপূর্বে পাওয়া বেশ কিছু পুস্তক নিয়ে প্রকাশিত হবে 'পুস্তক সমালোচনা সংখ্যা'। এই সংখ্যায় আলোচনা করবেন দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক জগৎ লাহা, কবি-অধ্যাপিকা কৃষ্ণা বসু, উশীনর চট্টোপাধ্যায় ও অরুণ রক্ষিত।

এ ছাড়াও প্রত্নতত্ত্বের ওপর একটি সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি আমরা! পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব দফতরের কয়েকজন ঐ সংখ্যায় লেখা ও ছবি দিতে সমমত হয়েছেন। বাংলা ভাষায় এ ধরণের সংখ্যা ইতিপূর্বে হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। আশাকরা যায় এ ধরণের একটি সচিত্র সংখ্যা বোদ্ধা পাঠককে তৃপ্তি দিতে সমর্থ হবে।

অশোক চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক

সম্পাদকীয় কার্যালয় ॥ নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর ৭১২১৩৬ ॥ হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ

কবিতা

লিখতে হবে চিঠি : প্রযত্নে মানুষ/অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়

শহর পেরিয়ে – নদীতীর অরণ্যের সরু রাস্তা ধরে
আমরা যাত্রাশুরু করেছিলেম ; অতীতের দিকে।
চড়াই উৎরাই শালবন, গুহা—বর্ণময় অপরাহ্ন
নারী ও নদী – এ ভাবেই পেরিয়ে এসেছি
সেই এক অদৃশ্য দৃঢ় শেকলের খোঁজে।
আমাদের কোনও ফেরার তাগিদ ছিল না
কেবলই পায়ে পায়ে যেতে হবে অতীত।
পেলেই গাঁথতে হবে শক্ত কড়াগুলো।
লিখতে হবে চিঠি, প্রযত্নে মানুষ
ঠিকানা পৃথিবী।
একের পর এক কৌতূহল এসে
আমাদের যোগ্য করে তুলেছে ক্রমশ,
তাই ধুলায় ধূসর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা
টুকরো পাথর, চিনতে হয়নি ভুল।
স্বপ্নের প্রত্যয় থেকে উঠে আসে নিওলিথ নারী।
লোপামুদ্রা। বিম্বিসার। বিদর্ভনগর।
ঠকাঠক গেঁথে যায় শক্ত কড়াগুলো অনেকটা
এগিয়ে যায় অদৃশ্য শেকল।
আমাদের কোনও ফেরার তাগিদ নেই।
পায়ে পায়ে আরও যেতে হবে অতীত।
কেবল লিখতে হবে চিঠি, প্রযত্নে মানুষ
ঠিকানা পৃথিবী।
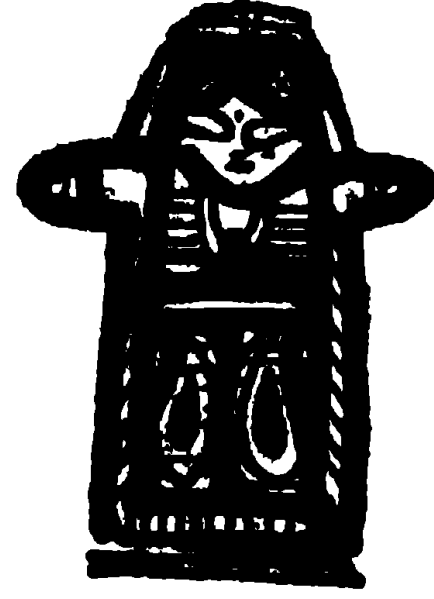
দুর্বার/শুভাশিস চৌধুরী

চলে এসো ভেঙে বুক
পাঁচিলের ;
ঝরে উজ্জ্বল রোদ উঠোনে,
ক্ষয়ে প্রাণ সপ্রতীপ
আঁচিলের ;
চেতনার শুভ উৎ-বোধনে।
নও কেন উজ্জ্বল —
নির্মেঘ ?
স্বাক্ষর বুকে স্থাণু মরণের ?
নিষ্ফল ভীতি, গায়
উদ্বেগ —;
আয়োজন করো স্মৃতি স্মরণের
দ'লে বুক মৃত্যুর
দুর্বার ;
আনো প্রাণে জীবনের স্পন্দন,
সংশয় ভেঙে করো
চুরমার ;
করো শুভ কৃষ্টির বর্ষণ।

হস্তীযূথ/সংযম পাল

গাছপালা নেমে আসে হস্তীযূথের মতো, শাখাদের শুঁড়
বুকের মাংস থেকে তুলে নেয় শোকম্লানা। আকাশের বুকে
ধূসর ফেনার মতো জমে থাকে বহু মেঘ, তাদের কোমল
করুণ বিলাপ আমি দিনরাত শুনি আজ। এই বোলপুরে
একটি কয়লা ট্রেন চলে গেলে মনে হয় তখন বিলাপ
দ্বিগুণ শরীর নিলো, বিশাল শরীর যেন ভাঁজগুলি তার
যে কোনো শিশুর কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান। আমি বারবার
প্রকৃতি ও মেশিনের এমন অন্বয় দেখি, তারপরে ঘরে
নিজের বিছানা জুড়ে আমার কান্না রাখি টগরের মতো।

ক্ষত/তপতী চক্রবর্তী

বাতাস ধাক্কা দেয় মনের গভীরে
লুকানো অনেক কথা ভেঙে যায়
তালা খুলে ঘরে আসে ভ্যাপসা গন্ধ
উৎকট জ্বালা ধরে বুকের ভেতর।

বৃদ্ধ বৃক্ষের প্রশাখা আন্দোলিত হয়
সব পাতা শাখা ঝরে গেছে
তবুও সে জানতে পারে না
দাঁড়িয়ে থাকে অতীত স্মৃতি নিয়ে।

বড় মাপের মানুষ/অমর নাথ ভদ্র

সহসা আকাশ থেকে খ'সে উজ্জ্বল নক্ষত্র
বিষণ্নতার ঝড়ো হাওয়ায় চাপা দীর্ঘশ্বাস
জীবনের সীমান্ত পার করে অসীম শূন্যের দিকে
মৃত্যু এসে অতর্কিতে ছিনিয়ে নেয় মহামূল্যবান জীবন
চতুর্দিকে বেদনার স্রোত দুঃখের আকাশে অনেক কালো মেঘ
শোকে স্তব্ধ হয়ে আছে বিদির্ণ হৃদয়ে—
জনারণ্যে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি এখনো আলোড়িত হৃদয়ে
অসীম দূরত্ব থেকে প্রতিটি মুহূর্ত্ত ছুঁয়ে যায়—
তাঁকে দেখার শেষ ইচ্ছা,—বিধূর সংবাদ ছাপিয়ে
বিষণ্নতার ঝড়ো হাওয়ায় চাপা দীর্ঘশ্বাস
বুকের মধ্যে অব্যক্ত শব্দ আটকে যায় স্মৃতিটুক শুধু রয়
জীবনের সীমান্ত পার করে অসীম শূণ্যের দিকে
সহস্র সূর্যের রোদে উত্তপ্ত স্মৃতি আজও বহন করে
তাঁকে ছুঁতে পারিনি কোনোদিন
কেননা তিনি ছিলেন বড় মাপের মানুষ।

স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে যে কবিতা

মলয় রায়চৌধুরী

[আ]ধুনিক কবিতার দিগবলয় গ্রন্থে 'ত্রিশের দশক : আদিম দেবতারা' নিবন্ধে ডক্টর অশ্রুকুমার সিকদার লিখেছিলেন "জীবনানন্দ গদ্য-ছন্দের খুব চর্চা করলেনই, তাছাড়া এমন শব্দ ব্যবহার করলেন যারা কবিতায় দূরে থাক ভদ্রসমাজে পর্যন্ত অচল।" ভদ্রসমাজ বলতে এখানে যা বোঝাবার চেষ্টা, তা বেশ পরিষ্কার। ওটা বুর্জোয়া ব্যবস্থার দুধ-ঘী খাওয়া স্তরটা, যাদের কাজ হল নিজেদের সুবিধেগুলো টিকিয়ে রাখা, বর্তমান কাঠামোটা যে-কোনো-রকম ঠেকনো দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা, ফাঁক ফোকর তৈরি করে লোটা আর আসল সমাজটা থেকে নিজেদের আলাদা করে ভদ্দরলোক সেজে থাকা। যাঁরা নিচুতলার, তাঁরা ছোট-লোক। তাঁদের ভাষা ইতরদের ভাষা। ইতরদের শব্দ, অতএব, ভদ্র-সমাজে অচল। ভদ্রসমাজে অচল বলে তারা কবিতায় অচল। কেন? কেননা, ইতর শব্দেরা, কবিতার মধ্যে দিয়ে ভদ্রসমাজে ঢুকে যাবে। তারপর ভদ্রসমাজকে কলুষিত করবে। বুর্জোয়া সমাজ কলুষিত হলে তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে স্থিতাবস্থা টিকিয়ে রাখা মুশকিল হবে। তাই সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্যে তার ছোটোখাটো খুঁটিনাটিতেও স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে। ফলে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার কবিতার কাছে চাহিদা হল এই, যে, ভাষার শ্রেণী-বিভাজন বজায় রাখতে হবে। উঁচু তলার লোকেদের ভাষাতে কবিতাকে সীমাবদ্ধ রাখাটা বুর্জোয়া কাব্যসাহিত্যের প্রথম শর্ত। আর শুধু ভাষা নয়, বুর্জোয়ারা চায় তাদের কবিতার ইমেজ সিম্বল এসবও তাদের পছন্দসই হতে হবে। মানে, মিষ্টিক ভাববাদী তাত্ত্বিক অ্যাপোক্যালিপটিক হতে হবে। এই ভাববাদকে এমন পর্যায়ে টেনে নিয়ে যেতে হবে যে, হিটলারের হৃদয়ে ভালোবাসা খুঁজে পাওয়া যাবে, সিদ্ধার্থ রায় রঞ্জিত গুপ্তদের মনে হবে রামকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব জুটি। বুঝিয়ে বলতে হবে না

নিশ্চই, যে, প্রতিক্রিয়াশীল তাত্ত্বিকদের মতে এটা হল প্রগতিবাদ, এসব হল আশাবাদী ওরফে ইতিবাচক।

বুর্জোয়া লিবারালদের আরেকটা তত্ত্ব হল যে, স্থিতাবস্থা ভাঙার কথা হচ্ছে তা হতে থাকুক। এই এসট্যাবলিশমেণ্টকে উপড়ে ফেলার গালগল্প হোক। তাই বলে কবিতার মাধ্যমে কবিতার স্থিতাবস্থা ভাঙার কথা বলা চলবে না। স্থিতাবস্থা ভাঙার কথাবার্তা চলুক—চলতি কবিতার মাধ্যমে, ভদ্দরলোকেদের কবিতার মাধ্যমে, উঁচু বর্ণ-উঁচু পয়সাঅলার ভাষা আর শব্দের মাধ্যমে। কবিতা ভদ্দরলোকদের জন্যে। অতএব কবিতায় স্থিতাবস্থা চলুক। আসলে, কবিতারও এক নিজস্ব এসট্যাবলিশমেণ্ট তৈরি হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের সময় থেকেই। ভদ্দরলোকের ভাষার বীজ ছিল রেনেসঁসে, যা আসলে হিন্দু বড়লোকদের ব্যাপার–স্যাপার ছিল—মুসলমানদের বাদ দিয়ে, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বাদ দিয়ে। একদিকে ধর্মতে ঠ্যাসান দিয়ে মহাকাব্য লেখার হিড়িক, অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজকে ঘিরে বাঙালী বড়লোকদের সামাজিক হামবড়াই। তখন থেকেই বাঙলা কবিতার ঘাড়ে চেপে যায় উচ্চবিত্ত–মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মূল্যবোধ ও মূল্যমান।

নবাবদের দরুণ সঙ্গীত পৌঁছে গিয়েছিল কিন্তু নিচুতলায়। এমনকি বেশ্যালয়ে। সঙ্গীতে নীচুতলার অনেক কিছু এসে তাকে নানান শাখাপ্রশাখায় ছড়িয়ে দিয়েছিল। ভাষাসাহিত্যে তা হয়নি। শিক্ষার হকদার ছিল, এখনও রয়েছে, ভদ্দরলোকেরা। সেখানে গরীবের ঠাঁই নেই। তাই নিচুতলার মানুষকে বাদ দিয়েই গড়ে ওঠে বাঙালী বুর্জোয়ার শব্দকাঠামো। তৈরী হতে থাকে ওই শব্দকাঠামো বজায় রাখার জন্যে তার নিজস্ব আলোচক পণ্ডিত অধ্যাপক লেখক। এই সমস্ত আলোচকের কাছে গরীবের শব্দ কাঠামোটা ইতরের। বুর্জোয়াদের শব্দকাঠামোটা তাদের নন্দনতত্ত্বের তারিফ পাওয়া। আর নিচুতলার মূল্যবোধ যখনই এসেছে, তখন তাকে বলা হয়েছে অশালীন অশ্লীল নোংরা ইত্যাদি। ওভাবেই, বুর্জোয়া ব্যবস্থার পেটোয়া আলোচকরা সেইসব কবিতাকেই অনুমোদন দিয়েছেন যা তাঁদের মৌরসী পাট্টাকে চ্যালেঞ্জ জানায় না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির বদলে মিষ্টিসিজম পায় তাঁদের পিঠচাপড়ানি। পুঁজিবাদের প্রিয় জিনিস, ভাববাদ, হয়ে ওঠে তাঁদের আদরের বিষয়। যত ঘোলাটে বিষয় তত তাঁদের আনন্দ।

রেনেসঁসের বাঙালী হিন্দু সায়েবনুবোরা, রবীন্দ্রনাথ, তিরিশের কবিরা, বিলেতে আসাযাওয়া থেকে আঁচ করতে পেরেছিলেন, যে ইংরেজদের কেতা কায়দার মধ্যে ভাষার শ্রেণী বিভাজন রয়েছে। তিরিশের একাধিজন কবির যে দাঁতকড়মড়ে শব্দ ঠুসে কবিতা লেখার চেষ্টা, তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবে গজিয়ে ওঠা নতুন পুঁজিবাদী মানুষের বোম্বাষ্টিক শব্দাবলীতে সাহিত্যকরার চহলপহল। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ওই দাঁতকড়মড়ে ভাষার পৃষ্ঠপোষক হলেন এক ধাঁচের অধ্যাপক-আলোচক, যাঁদের রুজিরুটি নির্ভর করে কেতাবী আলোচনার ওপর। যারা বা যে-চক্র এই আলোচকদের খোরপোষ দেয়, এরা তারই স্তাবক। গরীবদের নিজস্ব শব্দকাঠামো বা ভাষাবিন্যাসের অস্তিত্ব জানা থাকলেও, সাহিত্যে তার চলন ফরাসী উপনিবেশের লেখকরা এবং মার্কিনদেশের কৃষ্ণকায়রা আরম্ভ করে থাকবেন। বাঙালী কবিরা এসব করেননি। এক ধরনের বিশেষ শব্দ ঝোঁকে বসে গেছে বাঙলা কবিতার শরীরে। এই শব্দভাড়ারকে ধ্বংস করে একেবারে নতুন শব্দ ও ভাষাবিন্যাস তেমন কোনো কবির পক্ষেই আনা সম্ভব যিনি রবীন্দ্রনাথের মতন প্রতিভাবান অথচ নিম্নবর্ণের এবং বিত্তহীন শ্রেণীর। কবিতার মাধ্যমে কবিতার স্থিতাবস্থা তাহলেই চুরমার করা সম্ভব হবে। কেননা একমাত্র তিনিই পারবেন ভদ্দরলোকদের সমাজে অচল

শব্দের চাবকানি দিয়ে বুর্জোয়া কবিত্বের ছাল ছাড়াতে।

বাঙলা ভাষায় কবিতার সমালোচক হিসেবে যাঁদের রমরমা, তাঁরা প্রথমত অকবি। দ্বিতীয়ত, তাঁরা কবি হন বা অকবি, সকলেই বুর্জোয়া বা পাতিবুর্জোয়া শ্রেণীর হবার ফলে, তাঁদের নিজস্ব বাবুক্লাসের মূল্যবোধ জোর-জবরদস্তি কবিতার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করেছেন ও করেন। স্কুল-কলেজগুলি এঁদেরই দখলে। এঁদের বানানো মানদণ্ড না মানলে সে সব ছাত্রকে হেনস্থা করা হবে। কবিতার মাপ-কাঠির এঁরা এক অদ্ভুত অ্যাবসল্যুট গড়ে তুলেছেন যা পুঁজিবাদী স্ট্রাকচারে খাপ খায়। আর এই আলো-চকদের নিজেদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর যতই অমিল থাকুকনা কেন, নিজেরা নিজেদের সমর্থন করেন গোপন কোডের মাধ্যমে একে অারেকজনকে স্পনসর করে বাজারে তাঁদের দর ঠিক রাখেন। এঁরা বাজারি প্রতিষ্ঠানিক বামপন্থী প্রগতিবাদী যাই হননা কেন, নিজস্ব বাবুক্লাসের মূল্যবোধ ও নন্দনতত্ব একই থাকে। ফলে শব্দবিন্যাস বা ভাষা কাঠামোয় শ্রেণীগত তফাত হয়না। এঁদের সমর্থনপুষ্ট কবিত্বের বিরোধীতাকে এঁরা যে-কোনও উপায়ে নষ্ট করবেন। নিজেদের আলোচনার চাপতো তাঁরা দেবেনই নানান স্বদেশী বিদেশীর উক্তি তুলে-তুলে, এছাড়া সরাসরি বাধা দেবার চেষ্টা করবেন, যেমন, অন্য মতের লেখা ছাপতে দেবেননা। প্রকাশক সম্পাদকদের ভয় দেখাবেন, ছোটছোট কবিগুলিকে লেলিয়ে দেবেন, ফৌজদারি ঝামেলায় ফাঁসিয়ে দেবেন, লেবেল মেরে দেবেন, কোনঠাসা করে দেবেন, হুইসপারিং ক্যাম্পেন চালা-বেন ও সবশেষে শারীরিক কষ্ট। যেভাবেই হোক, স্থিতাবস্থার কবিত্ব ও কবিতায় স্থিতাবস্থা বজায় রাখবেন ওঁরা।

অধ্যাপক কবি বা সমালোচকের জন্যে স্থিতাবস্থার পক্ষে আরেকটা সুবিধে তাঁদের বিরাট ছাত্রসেনা। এটা বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের প্রডাক্টদের সমীক্ষা থেকে ঠাহর হবে। স্থিতাবস্থার কবিত্বের মধ্যেই এ আরেক বিদঘুটে মাফিয়া চক্র। রবীন্দ্রনাথের সময়ে তাঁর শিষ্যদের নিজস্ব শ্রেণীর যে-ভাষাকাঠামো ছিল, তাকে জিইয়ে রাখার কি অসহায় চেষ্টা। ভাষায় এক বিশেষ কাব্যিক চেতনাকে টিকিয়ে রাখার নাজেহাল প্রয়াস। এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মকে দিয়ে যাওয়া কিছু গোপন টোটকা। বাঁচিয়ে রাখা বংশ-পরম্পরায়। পাতিবুর্জোয়া বাঙালী অনেককাল আগেই ওই শান্তিনিকেতনী কাব্যিকে ন্যাকামি বলে মেনে নিয়েছে। আটপৌরে বাঙালীর কাছে সেটা ঠাট্টা-মস্করার ব্যাপার। তবু, উঁচুতলার দয়ায়, তা বহাল। তাঁরা তাঁদের নিজেদের নিয়েই মশগুল। মূল সমাজের প্রতি তাঁদের যেন কোন দায় নেই। তাঁদের নাচ তাঁদের গান তাঁদের বাজনা তাঁদের পদ্য তাঁদের গদ্য তাঁদের থাকা খাওয়া ওঠা-বসা সবকিছুর জন্যেই তাঁরা তাঁদের নিয়ম বানিয়ে নিয়েছেন।

স্থিতাবস্থার কেল্লারক্ষাকারী আলোচকরা ভাষার অল্‌আউট ব্যবহারের বিরোধী। অনর্গল শব্দ তাঁরা পছন্দ করেন না। কিছু শব্দের বিরুদ্ধে তাঁরা চান খিল তুলে দিয়ে একঘরে অস্পৃশ্য ব্রাত্য করে রাখতে। তাঁদের পোষমানানো অভিধান থেকে তাই অনেক শব্দ বাদ। শব্দদের বেমালুম ছাঁটাই করার পর এঁরা এক ভাববাদী অধ্যাপকীয় তত্ব চাউর করতে চাইবেন: কবিতা হল রিফলেকটিভ ডিসিপ্লিন অব দ্য ইম্যাজি-নেশন। ছোটলোকরা তো আর রিফ্‌লেকটিভ ডিসিপ্লিন-এর ধার ধারেনা, ওতো ভদ্দরলোকদের আয়েসের ফসল, অতএব থিওরিটা তাঁদের পক্ষে বেশ যুৎসই। আর গরীবলোকতো রিঅ্যালিটিতে আটক, ইম্যাজিনেশনের পায়রা ওড়াবার তার কাছে সময়

কোথায়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ইম্যাজিনেশনকে তুলে ধরা হয় রিঅ্যালিটির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে। যখন কিনা আমরা জানি রাসায়নিক অস্ত্র কোনো ইম্যাজিনেশন নয়, নকশাল দমনের নামে প্রতিভাবান কিশোরদের খুন করাটা ইম্যাজিনেশন নয়, নকল ওষুধের কারখানা ইম্যাজিনেশন নয়, প্রজেক্ট বাজেটিতে ঘুষের অঙ্ক জুড়ে দেয়াটা ইম্যাজিনেশন নয়, বিপ্লবের ধোঁয়া দেখিয়ে গদি আঁকড়ে থাকাটা ইম্যাজিনেশন নয়। তাহলে ইম্যাজিনেশন কী? সারা দেশে রেলশ্রমিক কর্মচারীর ধর্মঘট চলছে আর ঠিক তখনই পুঁজিবাদের আতুরে কবি লিখছেন "শূন্যতাই জানো শুধু? শূন্যের ভেতরে এত ঢেউ আছে সেকথা জানোনা?" ওই হল গিয়ে বুর্জোয়া ভাববাদী সমালোচকের রিফ্লেকটিভ ডিসিপ্লিন অব দ্য ইম্যাজিনেশন। যার সঙ্গে রিঅ্যালিটির, বিজ্ঞানের, সম্পর্ক নেই। যা ভদ্দর-লোকদের খিলতোলা শব্দ সাজিয়ে ছন্দের পর্দা টাঙিয়ে পাঠককে স্থিতাবস্থায় আটক রাখার নিছক নমুনা। ক্ষমতাবান কবির ভাবোচ্ছ্বাস, সন্দেহ নেই। কিন্তু ওই যে বললুম, রিঅ্যালিটির সঙ্গে সম্পর্কহীন ভিজে ভিজে প্যানপেনে স্যাঁতসেতে ইম্যাজিনেশনের গাঁজা। 'আমি দায়বদ্ধ, আমি দায়বদ্ধ' কথাটা বারবার ব্যবহার করলেই স্থিতাবস্থা ভাঙার কবিতা হয়না। কবির আমিত্বকে ছাপিয়ে রিঅ্যালিটিকে ধরতে পারে না বা চায়না এসব কবিতার ধোঁয়া। এই আমিত্ব নিখাদ আমিত্বের নগ্ন উন্মোচন হয়ে ওঠেনা বলে, নৌটাংকির স্তরে থেকে যায়। অর্থাৎ কবি একজন ফ্রড। জ্ঞানপাপী। ধোঁকাবাজ। জীবনানন্দতো দেখিয়ে দিয়েছিলেন কবিতার আমি ব্যাপারটা অনেক জটিল। সে আমি "কবির ব্যক্তিগত সত্তা মোটেই নয়, কবি মানসের কাছে সমাজ ও কালের রূপ যে-ভাবে ধরা পড়েছে তারই প্রতিভাসত্তা।" অবশ্য আরেকজন ভাববাদী কবি আলোক সরকার আগেই সাবধান করে দিয়েছেন যে, জীবনানন্দ কিছু বললেই সেটাকে কবিতার শেষ কথা মনে করার দরকার নেই। জীবনানন্দের উক্তিটা আমি তুলে দিলুম এই জন্যে যে, এই নিবন্ধের শুরুতেই ডক্টর অকুন্সি-র লেখা থেকে আমি দেখিয়েছি, জীবনানন্দ কবিতার এসট্যাবলিশমেণ্টে ভদ্রসমাজে অচল শব্দ ঢুকিয়ে দিয়ে সজনীকান্তদের বুর্জোয়া ব্যব-স্থার খুঁটি কেমন নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমি এই সুযোগে আরেকটা সন্দেহ উসকে দিতে চাই: সমাজ আর কালের রূপ ফ্যাংকো হিটলার মুসোলিনির মানসেও ধরা পড়ে থাকবে নিশ্চই আর তাই দিয়ে যে-কবিত্ব তার চেহারা আমরা মনে করতে গিয়ে ভয় পাই।

কবিতার এসট্যাবলিশমেণ্টকে জলজ্যান্ত শক্তসমর্থ রাখার জন্যে স্থিতাবস্থার সমর্থনকারীরা আরেকটা ভড়কো দেবার চেষ্টা করেন। কথায় কথায় তাঁরা অভিযোগ তুলবেন নৈরাজ্যবাদের সন্ত্রাসবাদের। প্রচণ্ড এক ত্রাসকাঠামোয় মুখ শুকিয়ে থেকেও কবিতার মাধ্যমে তা ক বোঝাবার চেষ্টাকে ওঁরা বলবেন নৈরাজ্যবাদ সন্ত্রাসবাদ। এই ভয়াবহ অবস্থার খাঁচায় আটক থাকা মানুষের কাছে তাঁরা নদী গাংচিল পাহাড় ঢেউ সমুদ্র ফুল জল পাখী হংস পূর্ণিমা ডানা পালক স্মৃতি নিশি মেঘ আকাশ ইত্যাদির জেনানা কবিত্ব চান, যার সঙ্গে এখনকার মানুষের বলতে গেলে মুখ দেখা-দেখি শুদ্ধি বন্ধ। অবস্থার মোকাবিলা করতে চাননা তাঁরা। যে লোক জীবনে কখনও হাতে হাতকড়া পায়ে কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় সাতজন চোরডাকাত চোরাকারবারী পকেটমার গুণ্ডার সঙ্গে চেনা শহরের রাস্তায় চার কিলোমিটার পথ হাঁটেনি, জেল হাজতে রাত কাটায়নি, পুলিশের জেরার সামনে দাঁড়ায়নি, খুনীদের পেচ্ছাপে ভেজা শতচ্ছিন্ন কম্বলে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করেনি, আদালতের খাঁচায় দাঁড়ায়নি, মাসের পর মাস চাকরিহীন অবস্থায় আদালতে

নানান ঘোরপ্যাঁচে দৌড়োয়নি, বিরাট শহরে ঠাঁইহীন অভুক্ত অবস্থায় একবার এর বাড়ি একবার ওর বাড়ি করেনি, একই জামাকাপড়ে চামউকুন-ভরা শরীরে একা-একা রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করেনি—কেবল, কেবল কবিতার জন্যে, কবিতার স্থিতাবস্থা কবিতা দিয়েই ভাঙার জন্যে—সে লোকেবাইতো বলবেন নৈরাজ্যবাদ আর সন্ত্রাসবাদের কথা, কেননা, সাহিত্যের অপারেশন বর্গায় তাঁদের মালিকানা যাবার ভয়। এই সমালোচকরা চাইবেন এক গালে চড় খেলে আরেকগাল এগিয়ে দেওয়া হোক। মারের পালটা মারকে তাঁরা বলবেন উন্মার্গগামীতা হিস্টিরিয়া হিংসা ঘৃণা বীভৎসতা। অথচ স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে মারের পাল্টা মার দেওয়াটাই নিয়ম। অস্বাভাবিক হল ল্যাজগুটিয়ে পালানো। অস্বাভাবিক হল ওই আমিত্ব বর্জন। অস্বাভাবিক হল উদাসীন থাকা। অস্বাভাবিক হল প্রহারকারীর হৃদয়ে ভালোবাসা খুঁজে পাওয়া। অস্বাভাবিক হল ক্ষতিকারক অমানবিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা। অস্বাভাবিক হল স্থিতাবস্থার কবিত্ব। অস্বাভাবিক হল উঁচুশ্রেণীর দাঁতকড়মড়ে ভাষায় লেখা কবিতা। অস্বাভাবিক হল শব্দের আগ্নলারি অস্বাভাবিক হল জনসাধারণ থেকে কবিতাকে আলাদা করে তাকে অধ্যাপকীয় জিমন্যাসটিক করে ফেলা। অস্বাভাবিক হল দেশে জরুরী অবস্থার পিটুনি-শাসন আর কবি চালাচ্ছেন তাঁর নিসর্গকেতন। অস্বাভাবিক হল কমপিউটারের যুগে মিসৃটিসিজম ও ব্ল্যাক ম্যাজিকে আবিষ্ট ও অবশ হওয়া।

এবার আসল সমস্যা সামলানো যাক। তাহল এই যে, আমি, যে কিনা এই গল্পের লেখক, সে কি নিজে চলতি ব্যবস্থার বাইরে? বুর্জোয়া-পাতিবুর্জোয়া শ্রেণীর বাইরে? ছোটলোক সমাজের? নিচুতলার বাসিন্দা? পুঁজিবাদের অসুখ থেকে সেরে-ওঠা? নিম্নবর্ণের? গরীব গুর্বো? ডিক্লাসড? ব্রাত্য? সাহিত্য-এসট্যাবলিশমেন্ট বহির্ভূত? সর্বহারা? বাবুয়ানিমুক্ত মূল্যবোধের লোক? এই সময়কার কাব্যসাহিত্যের করাপশান থেকে ছাড়ান্ পাওয়া নিষ্কলুষ? নিখাদ আমিত্বের বিজ্ঞানসম্মত ভাষ্যকার? জীবনের সমগ্রতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল?

নাঃ। তবে?

তবে এই যে, আমার চেতনা সৎ। আমি আমার চৌহদ্দি জেনে, নগর ও নিসর্গবাদ দিয়ে সাধারণ আক্রান্ত মানুষের দলে। আর আমার প্রাইমারি কনসার্ণ হল কবিতা। কবিতার মাধ্যমেই সমাজ অর্থনীতি রাজনীতি ইত্যাদির সঙ্গে আমার যোগাযোগ। আমি আমার কবি। আমি রাজার কবি বা প্রজার কবি নই। মানে, আমার আমিত্বটা নিখাদ। আমার কবিতা আমার অ্যাকশন প্রোগ্রাম। আমি কামারের বা ছুতোরের কবি নই। কবিতায় আমি শোনরে মজুতদার বলে ঝাঁপিয়ে পড়বনা। চাষার ব্যারেষ্টারি নয় আমার লেখালেখি। আমি কারুর হয়ে লিখিনা। ইন্সটিংক্টিভলি শ্রেণীস্বার্থে আবদ্ধ সামাজিক মানুষ আমি। বাল্যের নিম্নবিত্ত জীবন থেকে ক্রমশ মধ্যবিত্ত হয়ে ওঠার যে প্রক্রিয়া আমাদের শোষণজীবী সমাজে তা আমি চিনি। ভদ্দরলোক আর ছোটলোকের ভাষাবিভক্ত শ্রেণীসমাজ। এই শ্রেণীবিভক্ত ব্যবস্থার ভিত ভেঙে দেয়ার জন্যে কবিতাকে হতে হবে হিংসাত্মক ও নাশকতামূলক সৃজনশীলতা। যেমন বিপ্লবের জন্যে বিপ্লব নয়, তেমন কবিতার জন্যেই কবিতা নয়। কবিতায় হিংস্রতা, হিংসার জন্যে নয়। স্টার ওয়ার্স-এর কলকব্জা ভরা আকাশের তলায় বসে গীতিকবিতা লেখাটাই রোলপ্লেইং। রাজনীতিক যেমন সমাজের সেবা করার কথা বলে সংসদীয় রোলপ্লেইং করে। খবরের কাগজের সম্পাদকীয় যে লেখে সে যেমন সবজান্তার রোল প্লেইং করে। দুপাতা মার্কস পড়ে পাতিবুর্জোয়া যেমন সর্বহারার রোলপ্লেইং করে। মাইনে বাড়াবার মিছিল বের করে মধ্যবিত্তের ট্রেড ইউনিয়ন যেমন বিপ্লবীর রোলপ্লেইং করে। ছন্দের

বাঙালায় ঠ্যাঙ নাচিয়ে বা কবিতায় ক্যাপে নাক-ফোলানো মাস্টারি করে এই স্নোবারি হতে পারে যখন কিনা জীবন হয়ে উঠেছে ছন্দহীন শৃঙ্খলাহীন। কার জীবন যে বিকৃত নয় এমন কাউকে আমি জানিনা।

ভদ্রলোকদের এই শ্রেণীসমাজে, অতএব, একজন কবির প্রধান সমস্যা সে কবি হিসেবেই শ্রেণীচ্যুত হতে রাজি কিনা। নাকি কেতাবি আলোচকের বাছাইকরা বিত্তবান শ্রেণীর ভাববাদী কবিদের সঙ্গে তার নাম উচ্চারিত হবার আবদারে লালায়িত। ভদ্রলোক কবিদের থেকে নিজেকে আলাদা করার মতন বুকের পাটা আছে কি তার? তা না হলে, কবিতা দিয়েই স্থিতাবস্থার কবিত্বকে কী করে ভাঙবে সে? কবি হিসেবে শ্রেণীচ্যুতি না ঘটালে তো চেতনার বদল সম্ভব নয়। মুক্তি সম্ভব নয়। চলতি কবিত্বের নিরাপদ আশ্রয় ছিঁড়ে তাকে বেরোতেই হবে। তবেব তক্ষেই তাকে অনুশীলন করতে হবে হিংস্র কবিত্ব। সংঘাতের দরুণ হিংসা। এতেই পরিষ্কার হয়ে যায়, যে, আপাদমস্তক নিজেকে ব্যবহার করাটা অস্বচ্ছতা নয়। কেননা কবির শ্রেণীচ্যুতি, হলেই বা তা নান্দনিক, তার সুরাজ টের পেতে হবে। সুরাজ টের পাবার অক্ষমতা থেকে মনে হতে পারে যে, স্থিতাবস্থা বিরোধী কবিতার মেজাজ অথেনটিক নয়। এমনকি, একজন অকবির এও মনে হতে পারে যে কবির ওই সংঘাতময় আবির্ভাব বুঝি অথেনটিসিটির শত্রু। এ যেন কানা বেগুন বেঁকা হওয়ার ভক্ষণকারীর দোষ ধরা। এই অবস্থায়, বেগুনের মধ্যে পোকা নেই বললে বোধহয় প্রগতিবাদী পাঠকের পছন্দ হবে, কেননা, তা হয়ে উঠবে আশা-বাদ। উনিশ শতকের ফুলফিলমেন্টের ভাববাদী স্বপ্নের মৌতাতকে তাঁরা আশাবাদ মনে করছেন। তাই সবেতেই তাঁরা আশাবাদী। অথচ বেগুনটা যিনি বিক্রি করছেন, তাঁকে বলতেই হবে ওতে পোকা নেই, ওটা কানা নয়। তাহলে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে, সমাজ-জীবনের কথা তো ছেড়েই দিন, কবিতাতেও শ্রেণীচ্যুতি ঘটানো আর তাকে মেনে নেয়া, প্রত্যেক পাঠকের পক্ষে, সম্ভব নয়।

আসলে, অপরাধের মানবচরিত্র একটা বৈজ্ঞানিক তথ্য। এর বাইরে কোনও আশাবাদ-টাশাবাদের দরকার আছে বলে আমার মনে হয়না। অযথা চিন্তার প্রক্ষেপ ঘটিয়ে সমস্তরকমের কবিতাকে যাচাই করার চেষ্টায় গোড়াতেই গলদ। নিজের মানসিক স্থিতি অন্যের অবস্থানে ঢুকিয়ে পরখ করার চেষ্টা। কবি তো ইতিহাসের গতির সঙ্গে মেলাতে চাইবে নিজেকে, সে যেভাবে গতিটাকে বিশ্লেষণ করছে সেভাবেই। কবিতার যিনি আলোচনা করবেন, তাঁকেও ওই ছেঁদো আশাবাদ-টাশাবাদ বাদ দিয়ে প্রথমে মেলাতে হবে ইতিহাসের গতির সঙ্গে। কবি ওই মিলের মধ্যে একজন কারিগর। তাকে কর্মী বলাটা ঠিক হবেনা। ভদ্রলোকরা কর্মী হয়, যখন কিনা ছোটলোকরা হয় কারিগর। এইজন্যেই যেসব কবিরা নিজেদের শ্রমিক-কৃষকদের একজন মনে করেন তাঁদের উপলব্ধি মার খায়। নকল হয়ে যান তাঁরা। আমরা তো দেখেছি, পার্টিকর্মী বাঙালী কবিরা আজ অব্দি একজনও নিজের ভাষার আভিজাত্য ফেলে দিয়ে জনসাধারণের ভাষার সুরাজ আনতে পারলেন না কবিতায়। শব্দ-বাছাইয়ে নিজের শ্রেণীর গণ্ডিটাই টপকাতে পারলেন না। জনসাধারণের পক্ষে বোঝা মুশকিল এমন দাঁতকড়মড়ে বাংলায় তাত্ত্বিক কপচানি ঢুকিয়ে আশাবাদ ভাঁজলেন। বাংলা কবিতায় ইতি-হাসের সঙ্গে তাঁরা নিজেদের মেলাতে পারলেন বটে, কিন্তু মানবসমাজের ইতিহাসের ভেতর যে গতি তার সঙ্গে তো মিল খেলোনা। এ এক নান্দনিক দুর্গতি। স্থিতাবস্থার কবিত্ব, যা কিনা ওই নান্দনিক দুর্গতি থেকে চাগিয়ে ওঠা, বাবু সমাজের অঙ্গে বাবুশ্রেণীর

দ্বারা, বামপন্থী-ডানপন্থী দুরকম এসট্যাবলিশমেন্টের ধোঁয়ার আড়ালেই, ফেনানো। আগের প্রজন্মের কোনো-কোনো কবি পরের প্রজন্মের জন্যে কিছু কাজ যেমন সহজ করে দিয়ে যান তেমন অনেকে আবার স্থিতাবস্থার গাঁথুনিটাকে মজবুত করে দিয়ে যান। অত্যন্ত ক্ষমতাবান ও অবিশ্বাস্য প্রতিভাসম্পন্ন কবিও এমন ক্ষতি করে যেতে পারেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ।

স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে যে কবিত্ব, কবির যে বোধি-প্রয়োগ, তাতে সমষ্টিগত অ্যাপ্রোচ বা সংঘের অভিজ্ঞতার দরকার হয়না। কারিগর কবির নিজস্ব যুদ্ধই যথেষ্ট। আমি রোমান্টিক হাতাহাতির কথা বলছিনা। এই প্রসঙ্গে সংঘগুলোর পারস্পরিক লেনদেনের কথা বলা যায়। উঁচুশ্রেণীর সাহিত্যসংঘ, তা সে বামপন্থী হলেও, নিজেদের মার্কসবাদী কবুল করলেও, উঁচুশ্রেণীর সংঘের কথাই লেখালিখি করবে, তারা নিচুশ্রেণীর লোকেদের নিয়ে গড়ে ওঠা সংঘকে হয় উপেক্ষা করবে নয়তো নানান তত্ত্বো ফেঁদে তার বিরোধীতা করবে। উঁচুশ্রেণীর বস্তুবাদীর আগ্রহ উঁচুশ্রেণীর ভাববাদীর জন্যে যতোটা, তার চেয়ে কম নিচুশ্রেণীর বস্তুবাদীর জন্যে। যে সংঘ তৈরী হয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কবিলেখকদের নিয়ে, তারা স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের আইডেনটিফাই করে উঁচুক্লাসের কবিলেখকদের সঙ্গে। সমাজের নিচুতলা থেকে আসা কবির আবেগ ও উপলব্ধিকে গ্রাহ্য করতে না পেরে, উঁচু আর মাঝতলায় জন্মানো আলোচক অনেক সময় কেতাবিমাস্তানি ঝাড়েন, যা তাঁদের দিক থেকে সৎ মনে হলেও, মানুষের ইতিহাসের দিক থেকে অসৎ। পরিষ্কার করে দেয়া দরকার যে আমি এখানে শোষিত-দলিতর কনসেপ্ট ঢোকাচ্ছি না। আমি বলছি আলোচকের ভুল বোঝা, অক্ষমতা, চোখ ঠারা, অবহেলা, অবজ্ঞা, তামাশাকরা, ধাপ্পাবাজি, বিদ্বেষ, ভেদবুদ্ধি, অপাঙক্তেয় করা, উপেক্ষা এই সবের কথা। তাই, ছোটলোকদের স্ফূর্তি যদি ভদ্দরলোকদের সমাজকে ইনভেড করে তাহলে তা হয়ে দাঁড়ায় অপসংস্কৃতি। তখন নাচে গানে লেখায় আঁকায় পোষাকে খাবারে চারদিকময় অপসংস্কৃতি খুঁজে পাবার ধুম পড়ে। এখনও অব্দি আমরা এমন কোনও ছোটলোক খুঁজে পাইনি, যিনি সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতির ফারাক দেখিয়ে দেবেন। অপসংস্কৃতির ভয় দেখিয়ে নিজেদের কালচার ওপর থেকে চাপিয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার স্কীম। ওপরতলার অনুমোদন না পেলে গরীবের নাচ, গান লেখা আঁকা সহজে ঢুকতে পারেনা সংস্কৃতিতে।

আরেকটা ভয় দেখান ভদ্দরলোকের সাহিত্যিকরা। ডানমার্গী বাঁমার্গী দুদলই সামিল তাতে। ছোটলোকদের বেশ কিছু জিনিস তাঁদের কাছে অসুস্থতা। যে লেবেল তাঁরা এঁটে দেবেন তা হল 'অসুস্থ সাহিত্য'। গদিনসিনদের ফ্রেমওয়র্ক ভাঙতে চাইলেই তা হয়ে যায় অসুস্থতা। ফলে, স্টেথোসকোপ কানে, কবিতার প্রেসক্রিপশনে তাঁরা ওষুধ বাতলান। নিখাদ আমিত্বের নগ্ন উন্মোচন না করার দরুণ নিজের ক্রস নিজে ধরতে পারেননা কলাকৈবল্যবাদী এইসব আলোচক।

তবে, আলোচকদের মতিগতি যা-ই হোক না কেন, তাঁদের আমরা বাদ দিতে পারিনা। তাঁরাই ক্যাটালিস্ট। কবিকে তাঁরা ভাবতে সাহায্য করেন। সমালোচকের নিজস্ব চিন্তাভাবনা সত্বেও, তাঁর শ্রেণী-কাঠামোর চৌহদ্দি সত্বেও, কবি নিজেকে বুঝতে পারেন, নিজেকে যাচাই করতে পারেন, নিজের আমিত্ব পরখ করতে পারেন। একজন কবির কাছে তাই কোনও আলোচক উপেক্ষণীয় নয়। ●

অসীম রায় আর নেই

দেবী রায়

অসীম রায় এমন একজন লেখক, যিনি গতানুগতিক, তরল ও সস্তা-জনপ্রিয়তার পথ এড়িয়ে সম্পূর্ণ এক নতুন পথের দিশারী। তিনি ছিলেন লেখকদের লেখক। বস্তুতপক্ষে, তাঁর প্রত্যেকটি লেখাই লেখকের এক অবিচ্ছিন্ন ডায়েরী। ডায়েরীর পৃষ্ঠায় নগ্নভাবে স্বয়ং নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার আন্তরিক প্রয়াস ইদানীংকালে কচিৎ দেখা যায়! বা কদাচিৎ! আমরা তাঁর লেখাতে পাই সময়কে অতিক্রম করে আরেকটা ধাপে পৌঁছানোর এক শৈল্পিক দক্ষতা। যিনি প্রকৃত অর্থে-ই—প্রথাবিরোধী, একক ও স্বতন্ত্র। পারিপার্শ্বিক জটিল সময়ের 'হার্ট-বিট' তাঁর লেখায় পাওয়া যায় অর্থাৎ উপন্যাসের পশ্চাৎপটে ঠিক গল্প বানানোর তাগিদ নেই। তাঁর ভাষায়, উপন্যাস মানে একটা জমাট গল্প নয়। যদি আমরা উনিশ ও বিশ শতকের উপন্যাস চর্চার দিকে একটু ফিরে তাকাই! সর্বত্রেই দুটি ধারার প্রসঙ্গ টেনে আনা যায় (এক) জমজমাট ম্যাগিনেশন-চুম্বক গল্প, (দুই) চৈতন্যের আলোড়ন। অসীম রায় নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় ধারার শিল্পী ও সাহিত্যিক। প্রতিটি পথের শেষে পুনর্বার পথের ক্রন্দন। যে শিল্প সমস্ত অস্তিত্বের শিকড় ধরে ঝাঁকি না দেয়, তাকে কে শিল্প বলবে? তাকে বলা যায়, বড়ো জোর ভালো লেখা—সুন্দর লেখা। তিনিই জানিয়েছেন, আমি শিল্পের কাছে যাই অস্তিত্বের তল পর্যন্ত দেখতে পাব বলে। এই সিনসিয়ারিটি, শিল্পের প্রতি দায় ও দায়িত্ব আজ কোথায়? এখন তো সকালে-দুপুরে-বিকেলে-রাত্রে সমস্ত ঋতুতে লিখে যাও। এ এমন এক দেশ যেখানে মতান্তরের অর্থ মনান্তর। আর, কীল হিয় বাই সাইলেন্সের নজির সম্ভবত একমাত্র এদেশেই মেলে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেরাটোপের, রিভলভিং চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোনো মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি যে সব সময় সমতা রক্ষা করে চলে তা বলা যায় না। প্রকাশক ও পাঠককে নানাবিধ প্রক্রিয়ায় বোঝানোর চেষ্টা চলে 'আমি বিনা এ বঙ্গে আর কে!' রয়ালটির টাকায়, শোনা যায় আলোক-বিজ্ঞাপনের কেরামতি। একজন

লেখক যদি সকলের অজ্ঞাতে তাঁর নিজের মুখাগ্নি না করেন তাহলে তার লেখা শুধুই ভালো বা ফিনিশ লেখা। চিন্তা যে কাজের সূক্ষ্ম শরীর। বিপ্লবের অর্থ তো ধ্বংস নয়, পুনর্গঠন। সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ছাড়া কি রাজনৈতিক অগ্রগতি কোথাও হয়েছে? সাহিত্যে বা শিল্পে 'অনেকখানি' নিজেকে 'পাত' করতে হয়। মোটামুটি, উৎরে-যাওয়া ফিনিশ লেখার সঙ্গে শিল্পের সাহিত্যের কোনো সম্পর্ক নেই। একজন লেখক-কবি শিল্পীকে নানান সাতে-প্যাঁচে সব জায়গায় যেতে হয়, থাকতে হয়—সমস্ত রকম দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেকে যাচাই করে নিতে হয় তাঁর অস্তিত্ব। অসীম রায়ের প্রতিটি লেখায় তাঁর নিজের মুখাগ্নি তিনি নিজেই করেছেন—আহুতি দিয়েছেন যজ্ঞে! তাঁর লেখায় মিশে'ছে প্রতিভার সঙ্গে প্রবল প্রতাপ। পারিপার্শ্বিক ক্ষুদ্রতা, নীচতা, গোষ্ঠী সংকীর্ণতা সরিয়ে তিনি মাথা উঁচু করে নিজেকে দীর্ঘকায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রণম্য একারণেই যে তিনি জানিয়েছেন: সাহিত্যের বাজারে —ফোড়েরা চিরটাকাল রাজত্ব করে যায়। এতে ক্ষুব্ধ বা উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই। বহু কিছু সহ্য করতে হবে, হয় এজন্যই তো একজন লেখক। মনে পড়ছে, রবীন্দ্রনাথ একবার তারাশংকরকে লিখে-ছিলেন: সহ্য করার অশেষ শক্তি না থাকলে লেখক হওয়া যায় না। জীবন মানে'ত আর ফাঁকা মাঠ নয়। সাধারণ মানুষ সমস্যা থেকে দূরে সরে যায়, পালিয়ে বাঁচতে চায়। একজন প্রকৃত লেখক সমস্যার গভীরে প্রবেশ করেন, কখনো বা সৃষ্টি করেন এক একটা নবতম সমস্যা। এইসব ঘিরেই লেখকদের বেঁচে থাকার রসদ, এনার্জি। অসীম রায়ের লেখায় তাঁর অবশ্যম্ভাবী নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ও জীবন। আপনার কি 'অনি' ও 'আরম্ভের রতি' গল্প দুটির কথা মনে পড়ছে? সমাজ চিন্তার পাশাপাশি যদি না থাকে একজন লেখকের আত্মজিজ্ঞাসা তাহলে তো সমাজবাদ নিছক ডুবন্ত-মানুষের দিকে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকা। এখানে উপন্যাসের জগতে এক ভয়ংকর নাবালকতার প্রশ্রয় পাচ্ছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একটু ফুঁ-দিলেই শরৎ-চন্দ্রের আদল আত্মপ্রকাশ করে। কিছু বা কয়েকজন অন্যতম প্রধান গল্পকার আছেন কিন্তু ঔপন্যাসিকের কাছে একজন পাঠকের যা আন্তরিক প্রত্যাশা সেই creative vision নেই। হ্যাঁ, আমি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই বলছি—নেই। এক দু'জন ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই তাঁরা হয়তো মরমে মরে আছেন চারপাশের আকাশের চেহারা লক্ষ্য করে। অসীম রায়ের ভাষায় সবচেয়ে বড়ো বাধা লেখক নিজে। আমরা যদি তিতো না হয়ে যাই, লোভ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারি, যদি এই দীর্ঘ তীর্থ যাত্রার বন্ধুর পথে ঝড়ের মাঝ-খানেও নিভু নিভু দীপশিখা নিয়ে বছরের পর বছর হাঁটতে পারি এবং হেঁটে আনন্দ পাই তাহলে কোনো ভয় নেই। কারণ আমাদের কাল সম্বন্ধ মানসিকতার এক আশ্চর্য বাহন। মনে রাখতে হবে: উপন্যাস, আধুনিক লেখক ও পাঠকের কাছে এক চ্যালেঞ্জ। বস্তুত পক্ষে, সাহিত্যের যে কোনো শাখাই তাই। লেখক-কবি-শিল্পীরা এদেশে ক্বচিৎ কখনো সামাজিক দায় ও দায়িত্বের প্রসঙ্গ মাথায় রাখেন। ফলে, সমাজও সে অর্থে তাঁদের 'শ্রদ্ধায়' অপারগ। হোর্ডিং, টি. ভি. বিজ্ঞাপনের যা রমরমা সে অর্থে কিছুকাল যে কোনো রামা-শ্যামাকেই রাতারাতি সুপার ষ্টার বানিয়ে দিতে পারে। মনে রাখবেন, অন্তত কিছুকাল - অনন্তকাল নিশ্চয়ই নয়। অসীম রায়ের প্রত্যেকটি লেখায় এমন এক দক্ষতা পেয়েছি, যা আমাদের ঠোক্কর-খাওয়া জীবনে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

সম্প্রতি উড্ল্যাণ্ডস নার্সিং হোমে, তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি একজন সফলকাম সাংবাদিকও, আমৃত্যু স্টেট্সম্যান পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, জীবিকাসূত্রে। অল্প কিছু সময় অবশ্য

অমৃতবাজার পত্রিকা ও দি টাইমস অব ইণ্ডিয়ায় চাকরী করেছেন। ১৯২৭ সালে বরিশালে তাঁর জন্ম। ইংরাজী সাহিত্যে রেকর্ড নাম্বার লাভ করা বলতে যা বোঝায় তা তিনি অর্জন করেছিলেন। বর্তমান প্রতিবেদককে, বেশ কয়েকবছর আগে এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন সুধীন্দ্র ও বিষ্ণু দে তাঁকে নাড়ায়।

রচনা নির্ঘণ্ট : ফুটপাতে ফুলের গন্ধ (কবিতা), একালের কথা (উপন্যাস) প্রকাশক, নতুন সাহিত্য ভবন। ১৩৬০॥ গোপাল দেব (উপন্যাস)। প্রকাশক, বিহার সাহিত্য ভবন। ১৩৬২॥ দ্বিতীয় জন্ম। (উপন্যাস) প্রকাশক, বাক-সাহিত্য ১৩৬৪॥ রক্তের হাওয়া (উপন্যাস), কথাশিল্প, ১৩৬৯। দেশদ্রোহী (উপন্যাস)। প্রকাশক, সুবর্ণরেখা (১৯৬৭)॥ শব্দের খাঁচায় (উপন্যাস) প্রকাশক, মনীষা। ১৯৬৮॥ আমি হাঁটছি (কবিতা) প্রকাশক, অধুনা। ১৯৭১॥ অসীম রায়ের গল্প॥ প্রকাশক অধুনা॥ ১৯৭২॥ অসংলগ্ন কাব্য। প্রকাশক, প্রাইমা পাবলিকেশনস। ১৯৭৩॥ একদা ট্রেনে (উপন্যাস) প্রকাশক অধুনা। ১৯৭৪॥ আবহমানকাল (উপন্যাস) প্রকাশক, বইঘর (চট্টগ্রাম) ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি।

অ-প্রকাশিত : গৃহযুদ্ধ (উপন্যাস) গল্প কবিতায়' প্রকাশিত। ঈপ্সিতা (ঐ) 'সমতট' পত্রিকায় প্রকাশিত। অর্জুন সেনের জিজ্ঞাসা (ঐ) 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় প্রকাশিত।

অজস্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে পরিচয়, সাহিত্যপত্র, এক্ষণ, দেশ, সমতট, অনুষ্টুপ, মানব মন প্রভৃতি পত্রিকায়। নাটক, তিন লেনিন (শারদীয়া দর্পণ), জার্নাল, কর্ম, কল্পনা জল্পনা (শারদীয়া সত্যযুগ, ১৯৭৬)।

গল্প অনূদিত হয়েছে Dust and Smoke and Stars (The Illustrated weekly of India) 135 (The Illustrated weekly of India), The Thief (The Statesman), The Minute Man (Press Club, Souvenir), Tarashankar and the Indian Novel (The Statesman), Tagore's Impact on writers of East Pakistan (The Statesman), Cultural Resurgence in East Pakistan (The Statesman), Bangladesh's literature (The Times of India), From a Reporter's Note Book (The Statesman), Poets Search for identity, Poetic tradition, The Prize for a curious Melange, Trumpet and the Silence : on Nazrul Islam : শেষোক্ত লেখাগুলির প্রতিটি The Statesman পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো।

অসীম রায়ের একটি কবিতার অংশ : (আমি হাঁটছি)।

'শব্দকে বড়ই ভয়
শব্দের খাঁচায় বন্দী মানুষের ডানা ঝাপটানো
অভিনব আওয়াজেই মনীষার অন্তিম আশ্রয়

কথার পেছনে কথা শব্দের ওপারে ঐ নৈঃশব্দের যতি
নিরবধি।

যেমন কমিক লাগে সাংবাদিক শব্দের বিলাস
শব্দের পেছনে সেই নৈঃশব্দের গতি কই কথার পিছনে
সেই কথা

শব্দ কি অনড় প্রতিমা ?'

শব্দ আর কিছুই নয় একজন কবি বা লেখকের মিডিয়াম। শিল্পীর তুলি ও রং…। তাঁরই ভাষায় 'ভাষা নিয়ে কি কেচ্ছা! কি যাচ্ছেতাই ব্যাপার! অথচ মানুষের এমন অসহায় অবস্থা, সত্যকে ধরার জন্যে সে হাজার হাজার বছর ধরে এই যন্ত্র নির্মাণ করেছে, তারপরে সেই যন্ত্র এখন বিরাট রাক্ষস হয়ে সত্যকে গ্রাস করে ফেলেছে'।

অসীম রায় এক জায়গায় বড়ো বেশি সত্যি করে জানিয়েছেন : 'বাংলা উপন্যাস আলোচনায় যে সচরাচর নৈরাজ্য সেদিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যপাঠ এমন প্রথাগতভাবে প্রাণহীন যে তার প্রভাব কোনোকালেই স্পষ্ট বর্তায় নি সমালোচনার ক্ষেত্রে। আমাদের অনেক শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশাই উপন্যাস আলোচনায় সবাইকে চল্লিশ নম্বর দিয়ে পাশ করিয়ে দিয়েছেন। ভালো মন্দের নিরিখ বিশেষ প্রতিষ্ঠিত হয়নি।'

না, পুরস্কার কমিটির কর্মকর্তারা সম্ভবত অসীম রায়ের নাম জানেনও না। কিন্তু, পাঠকরা তাঁকে চিরটাকাল শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন। একটা দেশ যখন সর্বনাশা পথ ধরে তখন প্রথমেই লোপ পায় কর্মক্ষমতা, তারপর বিবেক ও বুদ্ধি এখন তো এলোমেলো-লণ্ডভণ্ডেরই সময়…।

এখন, সব জায়গায় 'কানেকশান' ব্যাপারটিই প্রধান। এখানে আমাদের ইচ্ছাপূরণের কোনো স্থান নেই? ●

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

O আপনার পাঠানো ভাদ্র সংখ্যা ১৩৯৩ 'গোধূলি-মন' পেলাম। আমার কবিতাটি ছেপেছেন দেখে খুশী হলাম। এই পত্রিকাটির সর্বাঙ্গে আপনার উচ্চাকাঙ্খী মনের ছাপ। সুতরাং অনিবার্যভাবেই পত্রিকাটির কোনও পৃষ্ঠা থেকেই চোখ ফেরানো গেল না।

এই সংখ্যায় সৌমেন অধিকারীর 'শৌখিন রবিয়ানা' প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে পড়লাম। প্রবন্ধটির প্রতিবাদী শিরোনাম আকর্ষণীয় হলেও বিষয়বস্তুতে ততটা দৃঢ় নয়। সামগ্রিকভাবে শৌখিন রবিয়ানা সম্পর্কে লেখক সংক্ষেপে আলোচনা করলেও গতানুগতিকতার বাইরে বেরিয়ে এসে তাঁর নিজস্ব কিছু মৌলিক চিন্তাভাবনার ফসল সংযুক্ত করতে পারতেন। শৌখিন রবিয়ানা প্রসঙ্গে লেখকের যে ক্ষোভ, তা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে রবিঠাকুরকে নিয়ে ব্যবসাদারী মনোভাব সত্যিই আমাদের ক্ষোভের কারণ হয়েই দাঁড়ায়। কিন্তু সেই ব্যবসাদারী মনোভাবের কারণটি কি, ব্যবসাদারী মনোভাবের আচার আচরণের বিশেষত্ব কোথায়—এই প্রশ্নের উত্থাপন এই প্রবন্ধে অত্যন্ত জরুরী ছিল। তাঁর এই নিজস্ব চিন্তাভাবনা যুক্ত হলে আমাদের ক্ষোভ আরও প্রকট হতে পারত এবং আমাদের যুক্তিবাদী মনে তাঁর সাহসী উপকরণেরও নিশ্চিত প্রয়োজন ছিল।

· তপন সৈয়দ/খোশবাসপুর। পোঃ-গোকর্ণ। জেলাঃ-মুর্শিদাবাদ

সমালোচনার মানদণ্ড প্রসঙ্গে

অমল হালদার

সমালোচনার যথার্থ মানদণ্ড কি ? এ-প্রশ্নের আজো নিঃ সংশয় মীমাংসা হয়নি। হওয়াও সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। নোতুন সৃষ্টির পাশাপাশি অভিনব সমালোচনা পদ্ধতি যে দেখা যাবে...এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

লেখকের পাশাপাশি সমালোচক থাকুন, এতে কারো আপত্তি করার কী আছে। কিন্তু সমালোচক যখন আরক্তলোচনে পাঠশালার পণ্ডিত-মশায়ের লাঠিগাছটি তীক্ষ্ণধার কলমের নামে সঞ্চালন করেন, তখনি বিপদ ঘটে। সাহিত্যের ইতিহাসে এমন নজীর আছে যে,- সমালোচন-শরাহত লেখক চতুর পণ্ডিত ব্যক্তির মতো অর্ধাংশ ত্যাগ করেও রক্ষা পায়নি। সমালোচক তাকে সশরীরে বিনাশ করতে চেয়েছেন।

লেখকের মসি-ই অসির চেয়ে ধারালো, কিন্তু সমালোচকের প্রাণহীন উদ্ধত শরখড়্গ আরো ভয়ঙ্কর। সমালোচকদের রূঢ় বাস্তব রূপটিকে কবিতায় চমৎকাররূপে প্রকাশ করেছেন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্বের তিনজন কবি। মাইকেলমধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ।

যে-ইংরেজি সাহিত্যের এতো নাম ডাক, সেখানেও বায়রণ বলেছেন, ...'ক্রিটিক্স অল আর রেডিমেড।'

চিরকাল কবি সাহিত্যিকের চিন্তা প্রাগ্রসর ; সুতরাং সমালোচকরা পদে পদে ভুল ধরতে গিয়ে নিজেদের সীমিত জ্ঞানের ভুলের মাত্রাকেই বাড়িয়ে তোলেন। নীরব ভবিষ্যৎ-ই এর একমাত্র বিচারক। রোমান্টিক ইস্কুলের কবি হয়তো তথাকথিত সনাতনপন্থী সমালোচকের চক্ষুশূল।

কোলরিজ, ড্রাইডেন বলেছেন, আরো কৌতুহলোদ্দীপক কথা। তাঁদের মতে সমালোচকগোষ্ঠী হচ্ছে কবি, ঐতিহাসিক ও জীবনীলেখক-দেরই ব্যর্থ পরিণতির অপভ্রষ্ট ফল। বেঞ্জামিন ডিসরেলীর মন্তব্যের অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে আমাদের উৎসাহ তীব্রতর হয়।

গোধূলি-মন/কার্ত্তিক/১৩৯৩/মুঙ্গের

তিনি বলেছেন, —'ইউ-নো-হু-দি ক্রিটিক্স আর...?...দি মোন হু হাভ ফ্লেড ইন লিটারেচর এণ্ড আর্টস।' হয়তো, সমালোচক হিসেবে ব্যর্থ হওয়ারও অন্য কারণ আছে।

বিশেষ বিশেষ মতবাদ সমালোচকদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রাখে। কিংবা লেখকের মতবাদ সমালোচকের বিপরীত হয়ে থাকে। প্রবীন দল যেমন নবীনকে, নবীন দল তেমনি প্রবীনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিতে অনেক সময় কুণ্ঠিত হন। তাছাড়া আছে, যথার্থ জ্ঞানের অভাবজনিত অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য প্রকাশের মোহ কিংবা প্রলোভন।

...দলীয় পত্রিকা। সর্বশাস্ত্রবিদ হয়েও সমালোচনার ক্ষেত্রে অনেকের ব্যর্থতা। সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে সমানদক্ষ সমালোচক হওয়ার অক্ষমতা। স্বার্থপ্রণোদিত সমালোচকের উদ্দেশ্যমূলক সমালোচনা...!

অবশ্য আরো বিভিন্ন কারণ আবিষ্কার করা যেতে পারে। সমালোচনার ক্ষেত্রটি এজন্যে আজো কণ্টকিত হয়ে আছে। এই কণ্টক দূর করার যে চেষ্টা হয়নি তা বলাও ঠিক নয়। ইংরেজি এবং বাংলা সাহিত্যের কবিরাই এ কাজে নেমেছেন। তাঁদের সমালোচনা, সাহিত্যের অন্যদিক। তা থেকে জানার ও শেখার অনেক কিছু আছে। সমালোচকরা সহজেই নিজেদের সংশোধন করতে পারেন।

কিন্তু আজো তা সম্ভব হোল না হয়তো তাদের গোঁড়ামি ও ছদ্ম বৈশ্যবৃত্তির জন্যেই। আশ্চর্যের ব্যাপার...! এই সমালোচকদের প্রভাবও কম নয়। সাধারণ পাঠকদের কপাল বড়ই মন্দ। এমন অনেক পাঠক আছেন, যারা ভালো সমালোচনার ওপর নির্ভর করে মূল গ্রন্থ পাঠের ক্লেশ স্বীকার করেন।

প্রভাবে সমালোচনা ..মূলগ্রন্থ ও মন্দভাগ্য মধ্যবিন্দুতে অবস্থান করে তাছাড়া মূলগ্রন্থ অনেক সময় দুর্বোধ্য হয়ে উঠলে সমালোচনার ওপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা। এমন অনেকে আছেন, বিভিন্ন কারণে, যাঁরা শুধু সমালোচনাই পড়েন। তাই অভিসন্ধিমূলক সমালোচনা বন্ধ করা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, বর্জনেই বন্ধন ছিন্ন হতে পারে।

অন্য কোনো সমার্জণীর সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন নেই। অবশ্য গ্রন্থ প্রয়োজন আছে। লোচন—বিমোচন...সৎ সমালোচনা অপরিহার্য।

টি এস এলিয়ট বলেছেন...ক্রিটিসিজম্ ইজ এজ ইনএভিটেবল এ্যজ ব্রীদিং।

আমাদের দেশে অনেক নিরক্ষর ব্যক্তি রামায়ণ মহাভারত মুগ্ধ হয়ে শোনেন, পারস্পরিক আলোচনার সাহায্যে তার গভীরতর রস গ্রহণ করেন। খঞ্জনীর ধ্বনিই নয়, রামায়ণের দলে গায়েনের মুখে রামায়ণের ব্যাখ্যা নিরক্ষর ব্যক্তিরা শোনেন। গায়েন ও শ্রোতার মধ্যে একটা ভাব-বিনিময় হয়, বলেই বয়স্ক নিরক্ষর শ্রোতাদের মধ্যে আনন্দের অধিকৎ ঘটে। রসের স্ফুরণ হয় অনন্ত। কিন্তু কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থাকলে, প্রথমেই পাণ্ডিত্যের প্রয়োগ দেখিয়ে তিনি রসাভাস সৃষ্টি করেন।

নিরক্ষর ব্যক্তিরাও নির্বিচারে সব কিছুই গ্রহণ করেননা। কেননা তাঁরা শিশু নয়। এই দু'শ্রেণীর কেউ-ই বিদ্বান নয়। কিন্তু নিরক্ষর ব্যক্তিরা অভিজ্ঞতায় বড়। অনভিজ্ঞ শিশুদের জগৎ সম্পূর্ণ পৃথকজাতীয়। তাদের মনে প্রশ্ন আছে,, অবিশ্বাস নেই। অন্যপক্ষে বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিদের অভ্যাসজাত রসোপলব্ধির সঙ্গে অভিজ্ঞতা সজ্ঞাতবোধের মিশ্রণ ঘটে বলেই তাদের বিচারশক্তি বৃদ্ধি পায়। আবার রীতিমতো একজন বিদ্বান ব্যক্তির বিচারশক্তি আরো প্রখর।

কিন্তু সমালোচকের যুক্তিজালও সহজে ছিন্ন করা যায় না। তাই বিপদ বাড়ে তখনি, যখন একই বিষয়বস্তুর ওপর সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুই বা-ততোধিক

সমালোচনা পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার ভাগ্যে যশ-অপযশ দুই জুটেছিল?… একজন নিরক্ষর ব্যক্তি এবং একজন শিক্ষিত শহরের ভদ্রলোক কিভাবে গ্রহণ করবেন ঐ কবিতার সমালোচনাগুলির মাধ্যমে… ?

কোনো শিশু কোনো ছবি, সুর কিংবা গল্পরস ছেড়ে দেবে না এবং সমালোচনার পরোয়াই করবে না। নিরক্ষর ব্যক্তি হয়তো অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করতে চাইবেই। বিপদে পড়বেন শিক্ষিতজন। এমনকি সমালোচনাগুলি পড়ে সমালোচকরা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করবেন।

তাই সমালোচনার উদ্দেশ্য মহৎ হওয়া উচিত। কেননা সমালোচনার ক্ষেত্রে অজস্র এবং সমালোচিত বিষয় ও বস্তু অগণ্য। পাঠক সাধারণ সমালোচনার থেকে যেন কিছু পায় … এটাই সমালোচকের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

অধুনা সাহিত্য সমালোচনা কাজটি সহজ নয়। বরং বিপদজনক। সাহিত্যিকের সাহিত্যই শুধু বিচার্য নয়, সাহিত্য তার স্রষ্টার অন্তর্ভুক্ত… ? …এ, ই হেসম্যান বলেছেন … পোয়েট্রি ইজ নট দি থিং সেইড, বাট এ ওয়ে অব সেয়িং ইট! …

বিভিন্ন কবি একই বিষয়কে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপস্থাপিত করেন। যে-যে কবি যে-যে যুগে মানস পরিমণ্ডলে কাব্য রচনা করেছেন, সে সবের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের প্রকাশভঙ্গী পৃথক হতে পারে।

কিন্তু আসল কথা হোল যাই-ই সৃষ্টি হোক না তা যুগোত্তীর্ণ হওয়া চাই। তারি মধ্য থেকে সমালোচক নোতুন কিছু আবিস্কার করে পাঠকের কাছে তুলে ধরবেন। এই তুলে ধরার আগে যে সমালোচনা, তারো আগে কাব্যপাঠে প্রাথমিক আনন্দ পাওয়াটাই সবচেয়ে বৃহৎ ঘটনা। কাব্য-পাঠ করে আগে আনন্দলাভ, তারপর সমালোচনা।

'সংবেদনশীল মাত্রই কি কবি? মনে হয় না; কিন্তু সংবেদনশীল মানুষদের মধ্যে কেউ কেউ কবি, কবি…কেননা তাদের হৃদয় কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে…; নানা রকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করার অবকাশ পায়।'

'কবিতার কথা' (তৃতীয় সংস্করণ, পৃ-১) জীবনানন্দ দাশ।'

একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে কোনও সমালোচকই কোন গ্রন্থ সম্পর্কে শেষ কথা বলতে পারেন না। তাই সুসমালোচকের উদ্দেশ্য হবে কাব্যের পাঠক যা-দেখতে পায়নি তা দেখিয়ে দেওয়া। অন্যান্য সমালোচক যা দেখিয়েছেন, তার বেশি একটা আবিষ্কার করা এবং দেখানো।

সুসমালোচকের অজ্ঞাত সৌন্দর্য আবিস্কারের নৈপুণ্যে পাঠকের আনন্দ বর্ধন করবেন। তিনি সহযোগিতা দিয়ে পাঠকচিত্তকে স্বাধীন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করবেন। এইভাবে পাঠোন্মুখ ব্যক্তি ধীরে-ধীরে আবিস্কারের আনন্দে নিজেই সুসমালোচকের আসনে অধিষ্ঠিত হবেন।

তখন…লিটারেচর হেল্‌পস্‌ আপ-টু আণ্ডারস্ট্যাণ্ড লাইফ, এণ্ড ক্রিটিসিজম্‌ হেল্‌পস্‌ আস-টু আণ্ডারস্ট্যাণ্ড লিটারেচর… ? এই কথাই শুধু সত্য হবে না, সমালোচকের বিরাট দায়িত্বও আমাদের বোধগম্য হবে। ●

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের [illegible] নিকেতন

বাড়িটাতে ঢুকতেই সামনের নেমপ্লেটে চোখ পড়ল। লেখা—'নিকেতন'। আগে আরও একটা কিছু শব্দ ছিল। এখন নেই। প্রায় উঠেই গেছে বলা যায়। ভাবলাম—'কি হবে'? শান্তিনিকেতন? অথবা আরোগ্য নিকেতন?

আসলে কোন কিছুর অপূর্ণতা আমাকে কেমন যেন কামড়ায়। মনটা বড্ড বেশী উসখুস্ করছিল কোন কিছু একটা বসিয়ে নেবার জন্য।

'বসিয়ে নেবার জন্য!'—এই আমার দোষ। সে যে কোরেই হোক। এই একটা কিছু বসিয়ে নিতেই হবে। সেটা ভাববাহী হল কিনা অথবা ছান্দিক রেশের মধ্যে একটা পুর্ণতা এলো কিনা, সে সব দিক বিচার বিবেচনার বোধ আমরা ক্রমশঃ কেমন করে যেন হারিয়ে ফেলছি।

যাই হোক অধৈর্যকে বেঁধে রেখে মনের তাড়নায় সেই বোধে পৌঁছবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ততক্ষণে বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। —একটু মধুর আপ্যায়ণ। কিছু চেনা শাব্দিক অনুরণন।

আসলে আমার এ বাড়িতে আসার একটা উদ্দেশ্য ছিল। আবার উদ্দেশ্য বিহীনও বলা যায়। সারি সারি ঘর নিচের তলায়।

—থাক্ থাক্ বেঁচে থাকো সুখে থাকো বাবা। তোমার নামটা যেন—

—শ্যামল।

—এই প্রথম তাই না?

ততক্ষণে তার দুটো আঙুল আমার চিবুক ছুঁয়ে তার ঠোঁটে। এ ঘরের গৃহকর্ত্রী ইনি।

গৃহকর্তা তক্তপোষে বসে। যিনি আমার নামটা তার বিস্মৃতির অতল থেকে তুলে আনার চেষ্টা করছিলেন। ছোট ঘরে ঠাসা জিনিস, ঠাসা

মানুষ, ঠাসা ভাবনা, ঠাসা মমতা এবং সর্বোপরি একটা টিভি। টিভিতে সিনেমা হচ্ছিল। আমি বসলাম একটা তক্তাপোষে। পাশে বসে গৃহকর্ত্রীর এক ছেলে। আমায় দেখে মিটি মিটি হাসছিল।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে তো- ?

ছেলেটি হাসছে। গৃহকর্ত্রী কিছুটা চঞ্চল। বয়েস হলেও বুদ্ধিতে অপরিণত বাবা। গৃহকর্ত্রীর চোখ দুটো ছলছলে। আমি চমকে উঠলাম। আমার সারা শরীরে রোমাঞ্চ খেলে গেল। দেখলাম তার চোখে সনাতনী বাংলা মায়ের এক অলৌকিক মমতার গন্ধ।

কথায় কথায় উঠতে চাইলাম। গৃহকর্তা বললেন ছোটটার ব্যাঙ্কে চাকরি। কাছাকাছি বদলি হয়ে এসেছে। কঠিন গ্রীষ্মের চাঁদনী রাতের ফুরফুরে হাওয়ায় আমি বেহালায় বেহাগের সুর শুনতে পেলাম।

পুরোনো আভিজাত্যের একটা নিদর্শন এ বাড়িটার দেওয়ালে না বলা কবিতার মত লেগে আছে। কবিতা - উজ্জ্বলতায় ভরপুর একরাশ কবিতা কলকলিয়ে উঠল দোতলায় ওঠার সিঁড়ির ঠিক বাঁকটার মুখে।

—বাবা এই কি সময় হল ?

'সময়'—মনে মনে ভাবলাম সময়ের হওয়াটাতো সময়ের ওপরই নির্ভর করে। সময় থেকেই ঘটনা। ঘটনার আঙ্গিকেইতো সময় আত্মসমর্পণ করে। সময় ঘটনা সর্বস্ব হয়ে ওঠে।

কবিতারা আমার কাছে কবিতা হয়ে আমাকে ওপরে নিয়ে গেল। ঘর। পাশাপাশি সারি সারি ঘর। কবিতাদের জন্য ঘর। ঘরের জন্য কবিতারা।

—শ্যামলদা দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কবিতা এক এর চোখে মুখে পাওয়ার তৃপ্তি। নিটোল মুখে শান্তিনিকেতনি স্নিগ্ধতা। জিজ্ঞেস করলাম কার কোথায় ভালো লাগল সবচেয়ে।

কবিতা দুই বেশ কিছুটা সপ্রতিভ হয়ে উঠল, বিবেকানন্দরক'। সেই কি হাওয়া। সমুদ্রের মাঝখানে তো। আর সেই বিবেকানন্দের মূর্তিটা একেবারে কি দারুণ। আর হাওয়া। হু হু করে হাওয়া।

—হাওয়া। এক ঝলক হাওয়ার দক্ষিণ ভারতীয় ধ্রুপদী স্থানের ধ্রুপদী গন্ধমাখা রেশ তখনও যেন চোখে মুখে লেগে কবিতা দুইয়ের।

—আর সেই ধ্যানঘর। কি হাসি যে পেয়েছিল। বড্ড অন্ধকার। কবিতা চার তার সেই ধরে রাখা হাসি এখানে এক লহমায় উগরে দিল।

—ইড্‌লি ধোসা খেয়ে খেয়ে ইস্‌ কি যে কষ্ট শেষের দিকে। কবিতা চার এর হাত ধরে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল তাদের ছোট ভাইটি। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার ?

ও বলল, পণ্ডিচেরীর ঘরবাড়িগুলো সবই যেন একই রকম। কোনটা কোনটার চেয়ে বড়ও না ছোটও না। কি রকম যেন। সারি সারি ভুলভুলাইয়া। মনে মনে বললাম, তোমার শিশুমন তো, তাই সার্বিক প্রচ্ছন্নতায় টান বেশী।

—সার্বিক প্রচ্ছন্নতা। যা একক নয় অথচ সমষ্টিগত ভাবে একক। আসলে খুঁজছিলাম বাড়িটার নাম। নিকেতনের পাশে উঠে যাওয়া জায়গায় কি বসানো যায়। জানলার বাইরের আকাশ ঘন অন্ধকারে তখন গাঢ় নীল। বাইরে শহরে কোলাহল। ঘরে বসে বাইরের গল্প শুনতে শুনতে ঘরে বাইরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এখন এই বাইরের আকাশ এই আবাজীর্ণ প্রাচীন বাড়িটার মধ্যে ঘটনার কবিতার মূল সূত্রের সঙ্গে মিলতে চাইছে যেন।

ভাবতে ভাবতে আর একজনের ডাকে অনড় পা দুটো নড়ে উঠল যেন।

"কি হল বাকি ঘরগুলোর জন্যে ? বিজয়ার শুভেচ্ছা কি তোলা রইল পরের বছরের জন্য ?"

চলতে লাগলাম। সামনে ঘর। কেমন যেন ঘর ঘর খেলায় মেতেছি। ভদ্রলোক ঘরে শুয়েছিলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, এ অবেলায় সন্ধ্যেবেলায় শুয়ে?

বললেন, অম্বোল সারাদিন চোয়া ঢেঁকুর।
জিজ্ঞেস করলাম, খাওয়া দাওয়া? বললেন, প্রায় অর্ধেক করে ফেলেছি।

চমকে উঠলাম, প্রায় অর্ধেক?
মসৃণ চামড়ায় ঢাকা চোয়াল দুটো উঁচু হতে চলেছে। চোখের কোলে অবসাদ কথা বলছে। বললেন, এই এক অবস্থা। সুখ আছে তো শান্তি নেই।

ঘরেতে সাবেকী আমলের বিশাল খাট। একটা ঝকঝকে তকতকে আলমারি। সোফাসেট। ঘরের বাসিন্দাদের গায়ে পরিচ্ছন্ন পোষাক। কাঁচের আলমারিতে তেমন কোন বই-টই নেই। সাবেকী আমলের টেবিলটার ওপরে একটা হারমোনিয়াম।

ভদ্রলোকের বার বছরের মেয়েটির গান শুনেছিলাম কিছুদিন আগে। নরম গলায় সুপ্ত প্রতিভা কেমন যেন উপসুর হয়ে বেজেছিল সেদিন আমার কানে। বললাম, গানটা শিখছতো? ঘাড় নাড়ল সে। মাথায় হাত বুলিয়ে ওর মাকে বললাম, প্রতিভা আছে, সুযোগ দেবেন ভাল করে।

গান? এ বাড়িতে ঐ নিচের হলঘরে জলসা হত তখন। কত বড় বড় সব গাইয়ে বাজিয়ে। তখনকার বিরাট অভিনেতা নাট্যরসিক অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী আসতেন।

ভদ্রলোকের চোখ দুটো কিছুটা গভীরে বলে মনে হল। হাড়সার শরীরটার তলপেটে তখনও আমাশার কনকনানি। গৃহকর্ত্রীর উজ্জ্বল মুখটার ওপর চোখ দুটোয় কেমন যেন ক্লান্তির ছাপ।

শুয়ে থাকা ভদ্রলোককে বললাম যোগব্যায়াম করে দেখুন না কেমন থাকেন। ভদ্রলোক হাসলেন। ঘরেতে সুসজ্জিত বিছানা, টি ভি, দামী আলমারি সেলফ, ফুটফুটে দুটি মেয়ে ইত্যাদি মেলিয়ে ভদ্রলোকের বিমর্ষ হাসিটা বড্ড স্পষ্ট লাগল যেন। ঘরেতে টিউব ল্যাম্পের উদ্ভাসিত আলোয়।

রসভঙ্গের পালায় এ বাড়িতে গন্ধরূপের একটা মানে খুঁজছিলাম। নিকেতন তো বটে। এক পুরুষের প্রজন্মে ছোট ছোট পাতলা ইতিহাসের গাথামালায় রূপকের অভাব নেই। কিন্তু একটা মূল সুর আমার কানে স্বগোতোক্তির মত বড় চেনা একটা বৃত্ত রচনা করছিল। ঐ যে বললাম এ বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা না বলা কবিতার একটা মূলসূত্রে আকাশের সঙ্গে মিলতে চাইছে। নিচের ঘরে মাতৃত্বের পূর্ণতা, ওপরের ঘরে কবিতাদের দেখার তৃপ্তি থেকে উজ্জ্বলতা, ছোট ছেলেটার সার্বিক প্রচ্ছন্নতায় আকর্ষণ, এ ঘরের আপাত সুখের উপস্থিতিতে শান্তির জন্য আক্ষেপ—কতগুলো উপসুর এ বাড়ির গন্ধরূপের আঙ্গিকে মিশে একটা ছোট্ট ভাবনার অবাধ বিচরণ। ঘরের মধ্যে ঘর। বাড়ির মধ্যে ঘর, ঘরের জন্য ঘর।

ছোট ছোট সংসার দ্বীপ। যখন এ দ্বীপে ঢুকলাম, দেখলাম, দ্বীপের রাজা একজন দার্শনিক। জিজ্ঞেস করলাম কি পড়ছেন? দেখলাম বিবেকানন্দের দর্শন।

জিজ্ঞেস করলাম, জীবনের সম্যক উপলব্ধি খুঁজছেন? বললেন, না এই শুধু জানা আর কি।

জিজ্ঞেস করলাম পথ প্রকরণ? বললেন, খুঁজছি। আসলে জানা থেকেই তো পাওয়া।

ঘরের মধ্যে নিতান্ত মধ্যবিত্তের ছাপ। কাঁচা পাকা চুলে চুলচেরা বিশ্লেষণী গন্ধ অথচ উদাসীন চোখদুটিতে কিছুটা নির্লিপ্ত ভঙ্গীমা।

বললেন, আসলে এটা তো সংসার; আর তোমার কথায় ঐ যে প্রকরণ, বিশ্লেষণ করতে করতে প্রকরণ কেমন করে যেন হারিয়ে ফেলেছি। তাই ক্ষণিক শান্তি এলেও কেমন করে যেন হারিয়ে যায়। ভারী কথায় মনটা কেমন যেন ভার ভার লাগল। এ ঘরের গৃহকর্ত্রী হেসে বললেন, আপনা কেন বাবা?

বললাম, সময় পাই কোথায়? মনে মনে বললাম, সময়কে সঠিক করে খুঁজে নেবার সাহসইবা কোথায়?

লম্বা বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সিঁড়ির বাঁকটার মুখেই দেখলাম এক বয়ঃবৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। প্রণাম করতেই একমুখ হেসে বললেন, এসো বাবা এসো। এ বাড়ির বিচ্ছিন্ন সংসারে দেখলাম তিনিই প্রাচীন। পেছনে পেছনে হাঁটতে হাঁটতে ঘরে এসে পৌঁছলাম। এই বৃদ্ধের সম্বন্ধে আগে শুনেছি বহুবার।

এ ঘরে বসে ভাবতে ভাবতে একটা গল্প মনে পড়ে গেল আমার। সেই 'সন্ন্যাসী আর রাজার গল্প'। কোন এক দেশের এক রাজার মনে একটা প্রশ্নের উদয় হয়েছিল। —'কে বড়'? সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী না স্বধর্মপরায়ণ গৃহস্থ। বহু সন্ন্যাসী, বহু গৃহস্থ এসেছিলেন এ প্রশ্নের উত্তর দিতে। কিন্তু রাজা সন্তুষ্ট হলেন না। অবশেষে এলেন এক তরুণ সন্ন্যাসী। প্রচণ্ড দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলেন "হে রাজন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়"। রাজা বললেন, এ কথা প্রমাণ করুন। তরুণ সন্ন্যাসী বললেন, কিছুদিন আপনাকে আমার মত চলতে হবে এবং আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে হবে বাইরে। রাজা রাজী হলেন এবং বহুদেশ ঘুরে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করে ঐ তরুণ সন্ন্যাসীর কথার উপলব্ধিতে পৌঁছলেন। এ বৃদ্ধকে দেখে আমারও তাই মনে হয়েছিল। সঠিক স্বধর্মপরায়ন গৃহস্থ।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি দর্শন-টর্শন পড়েন না? বললেন, সময় কোথায়? দেখছ না পাশের ঘরে অমুক অম্বোলে জরাজীর্ণ। নীচের তমুকের অমুক ছেলেটাকে নিয়ে কি যে ভাবনা। তারপর কারও কিছু হলেই তো এই বৃদ্ধের কাছে।

প্রাচীন বৃদ্ধা বসেছিলেন। ঘরেতে সাদামাটা সুখ একটা নিশ্চিন্ত শান্তি। বৃদ্ধ বৃদ্ধার দুই ছেলেই বাইরে চাকরি করে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, একা একা বড্ড মনকেমন করে তাই না? বৃদ্ধা বললেন, একা একা? বাব্বা এই অ্যাত্ত সবাই রয়েছে।

সারা বাড়ির প্রাণকেন্দ্র যেন এই ঘরটা। ঘরেতে উচ্ছ্বাস নেই। চাহিদার গরম হাওয়া নেই। আবার কষ্টের চাপ চাপ অন্ধকার নেই। আসলে ওসব কিছুই থাকতে পারে না এ ঘরে। এ ঘরের বাতাসে উদাসীন অথচ প্রচণ্ড বলিষ্ঠ মানসিক প্রশ্বাসের গন্ধ ঘোরে ফেরে এ দেওয়াল থেকে ও দেওয়াল।

বৃদ্ধা রোজ সন্ধ্যেয় মোটা লেন্সের চশমা চোখে লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়েন। বৃদ্ধ জানলা দিয়ে নীল আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টি না রেখে এ বাড়ির মাটির গন্ধ নেন প্রাণ ভরে। প্রত্যেক ঘরে ঘরে গিয়ে ঘটনার শব্দ শোনেন। সময় তার থেকে দিন ঘড়ির কাঁটার শব্দে টিক টক টিক টক এগিয়ে যায়।

সন্ধ্যা এখন রাতের পর্যায়ে। পর্যায়ক্রম ঘর পেরিয়ে এখন আমি নেমপ্লেটের তলায়। পেছনে বিদায় জানাতে অনেকে। বিক্ষিপ্ত দীপগুলোর অনেকে। আছে বাচ্চা ছেলেটি, বাচ্চা মেয়েরা, কবিতারা, মধ্যবয়স্কারা, প্রাচীন বৃদ্ধ বৃদ্ধা—। ঘর থেকে বাইরে এখন আমি। বড় রাস্তায় নিরবচ্ছিন্ন গাড়ী, মানুষ, ল্যাম্পপোষ্ট, দোকানপাট, কোলাহল। পেছনে পুরোনো আভিজাত্যের নিদর্শন বহন করা এই বাড়িটা। অনেক না বলা কথার কবিতা। বিদায় নিতে নিতে পেছনে ফিরে তাকালাম আরও একবার। চোখ পড়ল নেমপ্লেটের ওপর। হঠাৎ থামলাম কয়েক মুহূর্ত। মনে হল যেন স্পষ্ট লেখা—"সংসার নিকেতন"। ●

এবারের কয়েকটি শারদ সংখ্যা

গৌর বৈরাগী

O জলপ্রপাত সাহিত্য ২৪/উৎসব সংখ্যা/সম্পাদক—নিভা দে/দুর্গাপুর।

ভারি সুন্দর মলাট। দেখলেই হাতে তুলে নেবার ইচ্ছা জাগে। পরিপাটি সাজানো গোছানো, চোখ বোলালে আন্তরিক নিষ্ঠা টের পাওয়া যায়। তবু কেন মন ভরেনা। মন ভরেনা। অকৃত্রিম চেষ্টা সত্বেও। কলমে জ্যোৎস্না এবং শ্যামলের জোর আছে। কিন্তু 'ছিনতাইকারী'র সনাক্ত করণে জ্যোৎস্নাকে মোটেই নিষ্ঠাবান বলে মনে হয়না। শ্যামলের গল্প কবিতার মত সুন্দর। কিন্তু কেন যে গল্পের মত নয়। চমৎকার ঈশ্বর ত্রিপাঠী—আকাশে ছুঁড়িনা দোষ/নিজেই নিজের মাথা পাতি—শুধু অনুতাপ নয়। হয়ত গভীর গোপন কোন অভিমান। ভাল কবিতা। ভাল লেগেছে অশোক চট্টোপাধ্যায়, সংযম পাল আর নিভা দে-র কবিতা। 'একটি আলোচনা' শীর্ষকে দুর্গাপুরের গল্পকারদের নিয়ে আলোচনা, খুব সময়োপযোগী। কবি/কবিতা নিয়ে বাংলাদেশে বড় হৈ চৈ হয়। সে তুলনায় গল্প/গল্পকারদের নিয়ে বড় নীরবতা। অথচ আমাদের গর্ববোধ নাকি ছোটগল্পের কারণে। তবে আলোচকদের কারো কারো গল্প এই সংখ্যায় থাকা উচিত ছিল। 'খুচরো কথা' 'দৃষ্টিপাত' বেশ মুচমুচে তাজা। ভাল লেগেছে।

O আরণ্যক/শারদ সংকলন-৯৩/সম্পাদক—শোভন সামন্ত।

শুধু গল্প এবং গল্প সংক্রান্ত প্রবন্ধের কাগজ শুধু এ জন্যেই প্রশংসা প্রাপ্য। গল্পের কাগজ মুষ্টিমেয় তাও কলকাতার বাইরে থেকে। কবিতার কাগজের সঙ্গে শতকরা হিসেবে ধারে কাছে আসেনা। তবু ইদানিং গল্প নিয়ে মাতামাতি দেখতে পাচ্ছি। লক্ষণ শুভ সন্দেহ নেই। তবে চেষ্টাটা যেন যেমন তেমন/যাহোক তাহোক পর্যায়ে না চলে যায়। 'যেমন ভাবছে আরণ্যক'-এ টগবগে উত্তাপ টের পেলাম। কিন্তু হায় ততখানি উত্তাপ গল্পগুলি আমাকে দিতে পারে নি! ঋতেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ভাল লেখেন। মুদ্রিত লেখাটিও ভাল। তবে আকাঙ্খিত পরিসমাপ্তির জন্যে আরও পরিসর দরকার ছিল। ভাল লেগেছে শোভন সামন্তের গল্প 'আবাদ' গল্পের উল্লাসটি বড় চমৎকার।

দুই গল্পকার : এই আলোচনায় রাজকুমার পাণ্ডার সে মূল্যায়ন 'হত্যাকাণ্ডে' তাঁকে লেখক হত্যাই করলেন। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে। 'শৈলেন চৌধুরী : গল্প-কথার অন্তধারায়'—মূল্যায়নটি চমৎকার। সব মিলিয়ে সম্পাদক অবশ্যই ধন্যবাদ পাবেন। আগামী সংখ্যাগুলিতে বলিষ্ঠ চিন্তাভাবনার জোয়ার দেখার অপেক্ষা থাকবে আমাদের।

O প্রচ্ছায়া/৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা/সম্পাদক—শৌনক বর্মণ/বারাসাত।

পরিসর অল্প হলেও 'ডি. এইচ. লরেন্সের উপন্যাসে শিল্পশৈলী' এবং 'ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ' লেখাদুটি উল্লেখযোগ্য। কবিতায় কমলেশ

পাল চমৎকার। সনৎ বসুর গল্পে বিষয়বস্তুতে নতুনত্ব আছে। কিন্তু ঘটনাটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। স্বল্প পরিসরে সম্পাদকের প্রচেষ্টা অবশ্যই অভিনন্দন যোগ্য।

○ আমাদের ছুটন্ত ঘোড়াগুলি/সম্পাদক—চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়/কবিতা ত্রৈমাসিক/আসানসোল।

বড় কাগজে অপাঠ্য কবিতা ছাপা হয় শুধু এই যুক্তিতে ছোট কাগজে বাজে কবিতাকে জায়গা দেওয়া কি আর এমন! এরকম একটা সিদ্ধান্ত। না; মানা যাচ্ছে না। কাগজের নামের মত টগবগে তাজা কিছু লেখা পাব এরকম আশা ছিল। 'পুরোপুরি ব্যর্থ হতে হয়েছে' এরকম অবশ্যই বলা যাবেনা এর গল্প অংশের কথা ভেবে। গল্প লিখেছেন উদয়ন ঘোষ। যদিও বলা হয়েছে 'উদয়ন ঘোষের গল্প' তবু এটিকে একটি চমৎকার গল্প ভাবতে আমার আরও বেশি ভাল লাগছে। সমরেশ দাশগুপ্তকে ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। তবু শুধু গল্পের জন্যে পড়তে হয়েছে। ভাল লেগেছে নীলিমা গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প। 'কাশ ফুল সংখ্যা'। বাঃ। সংখ্যাকে এই নামে এর আগে কেউ চিহ্নিত করেছেন কিনা আমার জানা নেই।

○ কৃশানু/শারদীয় ১৩৯৩/সম্পাদক—দীনেশ চন্দ্র সিংহ/কলকাতা।

শুধু সময়োপযোগী বলে নয় সম্পাদকীয়টি নিজস্ব গুণেও চমৎকার। কোথাও ধোঁয়া ধোঁয়া ব্যাপার নেই। যা বলার তা পরিষ্কার উঠে এসেছে লেখায়। এমন ধারালো বিদ্রূপ আজকাল আর দেখা যায়না। শুধু এই সম্পাদকীয় লেখাটির জন্যেই আমার অভিনন্দন জানাই। 'কৃশানু' মানে ইতিহাস। ১৯ বছর ধরে লিটল ম্যাগাজিনের এক ধারাবাহিকতার ইতিহাস। এই আক্রাগণ্ডার বাজারে নামমাত্র বিজ্ঞাপনে ১২২ পাতার ম্যাগাজিন বার করা চাট্টিখানি কথা। অজস্র ভাল কবিতা সেই সঙ্গে প্রবন্ধ ৩টি। ভাল লেগেছে 'নোয়াখালির রক্তমালা' এবং 'দক্ষিণের উৎসব'। সেই তুলনায় গল্প কিন্তু আমাকে বেশিকিছু দিতে পারেনি একমাত্র সুভাষ বিশ্বাস বাদে। 'ডাকাত' গল্পটি চমৎকার। অমন জ্যান্ত বর্ণনায় মাঝে মাঝে চমকে উঠতে হয়েছে। গল্পকারকে আমার অভিনন্দন। শেষে ছোট্ট একটা অভিযোগের কথা জানাব। লিটিল ম্যাগাজিনে অল্প স্বল্প প্রুফের ভুল থাকবে এটা জানা কথা। কিন্তু ছাপাখানার ভূত যদি পাতার পর পাতায় হামলা চালায় তবে কাঁহাতক সহ্য করা যায়। এদিকে একটু নজর দেবেন এই বিনীত আশা।

○ স্বদেশ/ত্রয়োদশ বর্ষ ৩৯ আশ্বিন ১৩৯৩/সম্পাদক—পান্নালাল মল্লিক/বসিরহাট।

ধারাবাহিক স্মৃতি চিত্রটি (প্রসঙ্গ: তাঁতড়ের বাগবাড়ি) এক অমূল্য উপহার। উৎসাহ নিয়ে পড়তে গিয়ে হোঁচট খেতে হল। ভেতরে ঢোকার পর ভুলে গেছলুম লেখাটি ধারাবাহিক। ৪৮ পাতার রোগাসোগা স্বদেশের শরীরে তিন তিনটে ধারাবাহিকের ধকলদারি সহ্য হয়! এ ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখবেন আশাকরি। কবিতাগুলি চমৎকার। প্রায় সবগুলিই। এ ব্যাপারে সম্পাদকের সচেতন নির্বাচনের প্রশংসা করতেই হয়।

সংবাদ

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীপূজা '৮৬

গোধূলি মন এর প্রতিবেদন

প্রথম দিকে মনে হয়েছিল বৃষ্টি বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সমস্ত আয়োজন। অনেক প্যাণ্ডেলের কাপড়ের রঙ সপ্তমীর বৃষ্টি ধুয়ে দিয়েছিল। অষ্টমীর সকাল থেকেই কিন্তু বৃষ্টি তার ঝরা বন্ধ করেছিল। তবুও অন্যান্য বছরের মতো ট্রেনে-বাসে নৌকায় সে ভীড় এবারে ছিলনা। অষ্টমী ও নবমীর রাত্রে অবশ্য রাস্তায় রাস্তায় মানুষের ঢল নেমেছিল। আর দশমীর রাত্রে প্রচুর জনসমাগম হবে সেতো জানা কথাই। চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটি, পুলিশ এবং প্রশাসনের সহযোগিতায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন সমস্ত পূজা কমিটিগুলিকে।

এবারের পূজায় বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের বিচারে মণ্ডপে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারী যথাক্রমে তেমাথা, যুগ্মভাবে খলিসানী ও হাটখোলা মনসাতলা এবং বৌবাজার শীতলাতলা। মুখশ্রীতে ১ম হয়েছে বারাসত দক্ষিণ চন্দননগর, ২য় পালপাড়া ও ৩য় যুগ্মভাবে দীঘিরধার ও মনসাতলা।

এ বছর থেকে প্রতিমার মুখশ্রীর জন্য মৃৎশিল্পীকে চন্দননগরের প্রখ্যাত ব্যবসায়ী শিবচন্দ্র দাস (মডার্ণ ডেয়ারী) পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করেছেন। ১ম পুরস্কার ১০০১ টাকা পেয়েছেন চুঁচুড়ার নিমাই পাল ২য় পুরস্কার ৫০১ টাকা পেয়েছেন ভদ্রেশ্বরের সুনীল নাথ এবং ৩য় পুরস্কার ৩০১ টাকা পেয়েছেন চন্দননগরের জয়দেব পাল। শোভাযাত্রার আলোক সজ্জার জন্য হুগলীর পুলিশ সুপারের দেওয়া দু'টি কাপ দেওয়া হয় হাটখোলা দৈবকপাড়া ও বিদ্যালঙ্কা সার্বজনীন পূজাকমিটিকে।

পূজামণ্ডপে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ১ম পুরস্কার বর্তমান ভারত চ্যালেঞ্জকাপ দেওয়া হয় গৌরহাটি তেঁতুলতলাকে, ২য় পুরস্কার বিনোদিনী স্মৃতি চ্যালেঞ্জকাপ খলিসানীকে এবং ৩য় পুরস্কার শ্রীবাসচন্দ্র গোস্বামী চ্যালেঞ্জকাপ হাজিনগর লিচুতলাকে। শোভাযাত্রায় শান্তি শৃঙ্খলার জন্য ১ম পুরস্কার তারাপদ স্মৃতি চ্যালেঞ্জকাপ পালপাড়াকে ২য় পুরস্কার অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি চ্যালেঞ্জকাপ গোন্দলপাড়া মরাণ রোডকে এবং ৩য় পুরস্কার সদানন্দ সুর স্মৃতি চ্যালেঞ্জকাপ ফটকগোড়াকে দেওয়া হয়।

প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুতে শোভাযাত্রা বন্ধ ছিল ঐ বছর। এবারেও বিসর্জনের দিন পুকুরে লরি পড়ে কলুপুকুর সার্বজনীনের নিতাই বারিকের দুই পুত্র সুজিত (১২), খাতেশ (১০) ও শ্যালক অমিত সাঁতরা (২৪) ও ওঁদের প্রতিবেশী সোমনাথ দত্ত (১২) মারা যায়। দলে দলে মানুষ ছুটতে থাকে ঘটনাস্থলের দিকে। একসময় মনে হয়েছিল শোভাযাত্রা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু শোভাযাত্রা তার আগেই পথে বেরিয়ে পড়েছে। যদিও কেন্দ্রীয় কমিটি ১৬ই নভেম্বর পুরস্কার বিতরণী উৎসবে নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ১ মিনিট নিরবতা পালন করেছেন, তবু মনে হয় মনুষ্যত্বের দাবীতে শোভাযাত্রার প্রকট বাজনা ইত্যাদি বন্ধ রাখা উচিৎ ছিল।

O প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন O

O গোধূলি মন আবারো বিরতিহীন ভাবে তার স্বরব মূর্তির প্রকাশ ঘটিয়ে আমার এই দীন হাতে এসে পৌঁছেছে। খুশীতো হবার কথাই, কিন্তু তার চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হই এই লিটিল ম্যাগাজিনের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি আর টিকে থাকবার দুর্দমণীয় অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার কথা ভেবে।

আমাদের এখানে বরিশাল শহরের পাদ-প্রান্তে একটা মাতৃমন্দির আছে। সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। একডাকে সবার নিকট পরিচিতা 'বিপ্লবী মাসিমা' মনোরমা বসু প্রতিষ্ঠানটিকে হৃদয়ের সবটুকু অর্ঘ্য দিয়ে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন। তার এই গড়ে তোলা ছিল একটি কিংবদন্তীর কর্ম প্রয়াস-এর মত। তৎকালীন পাক সরকার বেশ কয়েকবার প্রতিষ্ঠানটির চিহ্ন পর্যন্ত বিলোপ করে দিয়েছিল কিন্তু ঐ যে বললাম হৃদয়ের অর্ঘ্য যেখানে সেখানে শত অত্যা-চার, বাধা, বিপত্তি দাঁড়াবে কোন সাহসে?

সমসাময়িক কালে সাহিত্য সাধনায় লিপ্ত অনেকেই, কিন্তু অর্ঘ্য কোথায়? মুষ্টিমেয় অথবা গুটিকয়েক কয়েকটির মধ্যেই তা আছে। যেমনটি গোধূলি মনে।

তাইতো গোধূলি মনের কাছে আশা অনেক, প্রত্যাশা দ্বিগুণ। সব শেষেব সেই কথাটিই বার বার করে তাই তো বলতে হয়, গোধূলি মন আছে বলেইতো আমরা থাকি, আমরা আছি, আমরা থাকবো।

স্বপন ঘোষ
শান্তিধাম, খুলনা।

O অশোকবাবু কবিতা পেলেন কি পেলেননা, এ ভাবনায় যখন প্রায় আরেক চিঠির প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছি সে মুহূর্তে পেলাম আপনার মনের প্রতিফলন 'গোধূলি মন'। পড়লাম এবং আজই বসলাম আপনার সামনে এসে।

সাহিত্য যে সুন্দরের বাহক হয়েছে সে শুধুমাত্র সত্যকে নির্ভয় প্রকাশের মধ্য দিয়েই, আপনার পত্রিকা সেকথার অকুণ্ঠ ঘোষণায় সক্ষম। ভালো লাগলো। ভালো লাগলো নিজ কবিতারও প্রকাশ দেখে।

আপনার সম্পাদকীয় আবেদনে সাড়া ছন্দে পাঠালাম। পূজো সংখ্যার আশা রেখে শেষ করছি।

শ্রীশুভাশিস চৌধুরী
শ্যামাকুটীর/শিবযজ্ঞ রোড
খাগড়াবাড়ী/কোচবিহার
৭৩৬১০১

O O O

O আমরাও পত্রিকা করছি মো সত্তর সাল থেকে। অর্থাৎ ষোল বছরের অভি-জ্ঞতা, তো এমন বিজ্ঞাপনহীন কাগজ অথচ ভিতরে অসংখ্য ব্লকের সমাহার, 'দেশ'-এর মতো কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া শুধু অসম্ভবই মনে হচ্ছে না কষ্ট কল্পিত।

সমরেশ মণ্ডল
পোঃ- কেন্দ্রগড়িয়া,
বীরভূম ৭৩১১২৫

গোধূলি মন

এই সংখ্যায় ঃ

অগ্রহায়ণ সংখ্যা/১৩৯৩

O প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন O

O 'গোধূলি-মন' এর শারদীয়া সংখ্যা যথা-সময়ে পেয়েছি। প্রাপ্তিসংবাদ জানাতে বিলম্বের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী।

একগুচ্ছ বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল কবিতা গল্প এবং প্রবন্ধের উপাচার নিয়ে গোধূলি-মন পাঠকের সামনে হাজির হয়েছে পূর্ব বৈশিষ্ট্যের যথার্থতা বজায় রেখে।

এ ধরণের একটি উজ্জ্বল লিটল ম্যাগাজিন নিঃসন্দেহে আমাদের গর্ব। আপনাকে আর একবার ধন্যবাদ জানাই।

প্রবন্ধের মধ্যে অজিত রায়ের মননশীল আলোচনা ভাললেগেছে।

একটি ব্যক্তিগত অনুরোধ জানাচ্ছি। পত্রিকার ক্রমোন্নতি আমাকে গ্রাহক হতে আগ্রহী করে তুলচে, একটি সংখ্যাও যাতে না পাওয়া হইনা, এজন্যই বলছি গ্রাহক চাঁদাটি দু'বারে পাঠাবার ব্যবস্থা নিচ্ছি। পত্রিকা নিয়মিত পাঠানোর অনুরোধ।

মহম্মদ মতিউল্লাহ
রাজুয়া, চুরপুণি, বর্ধমান

O আপনাদের 'গোধূলি মন' পত্রিকাটি জানিনা কোন সৌভাগ্য ক্রমে, নিয়মিত পাই। পড়তে খুবই ভালো লাগে। বিশেষ করে অজিত রায়ের শাণিত রচনাভঙ্গি বেশ আকর্ষণীয়। চন্দননগরে বসে এরকম একটি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করার যে সমস্যা, তা বুঝি বলেই আপনাদের জেদ ও নিষ্ঠায় অবাক হই।

পবিত্র সরকার
২১ কেন্দুয়া মেন রোড
কলকাতা-৭০০ ০৮৪

O 'শারদীয়া গোধূলি-মন' পেয়েছি। অশেষ ধন্যবাদ। আপনার পত্রিকার যে-খ্যাতি শুনেছি তা অতিশয়োক্তি নয়। 'আগাছার জন্ম বৃত্তান্ত' কিছুটা নতুন আঙ্গিকে লেখা গল্প। ভালো লাগলো। লেখকের বর্তমান সমাজ-চরিত্র-বিশ্লেষণের তথা তাকে গল্পের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখেও কীভাবে স্পষ্ট অনুভবে পৌঁছানো যায়—সে শৈলী জানা আছে। কবিতাগুলি কিন্তু তুলনামূলকভাবে অনেকটা দুর্বল। কবি সম্পাদকের কাছে প্রত্যাশা অনেক।

'গোধূলি মনের কবিতার দিন' পড়ে বড়ো লোভ জাগে— যদি আপনাদের মধ্যে যাওয়ার সুযোগ হতো।

অমলেন্দু দত্ত
৩৯ এ, গোপাল মিশ্র রোড
বেহালা, কলকাতা-৭০০০৩৪

O সংগ্রামী ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা জানবেন। আপনার ৩টি কবিতাসহ চিঠি পেয়ে আমি সপ্তাহ খানেক আগে তার উত্তর পাঠিয়েছি 'নতুন কথা' সহ পেয়েছেন? আজো পাঠালাম। ৩টি কবিতাই প্রকাশ করা হবে। আপাততঃ শ্রাবণ ১৩৯৩ ছাপানোর জন্যে নির্বাচিত করে ফাইলে রেখেছি আগামী সংখ্যায় যেতে পারে।

ভারত থেকে প্রকাশিত সাহিত্য, সাংস্কৃতিক বিষয়ক পত্র/পত্রিকা পাঠানোর অনুরোধ রইলো। গোধূলি-মনও পাঠাবেন। বিনিময়ে এপারের পত্রিকা পাঠানোর প্রতিশ্রুতি রইলো।

জহুর দরদী
সাপ্তাহিক নতুন কথা
৩১/ই, তোপখানা রোড
ঢাকা-২, বাংলাদেশ

O 'গোধূলি-মন' পাচ্ছি নিয়মিত। ধন্যবাদ। শারদ সংকলনে অজিত রায়ের লেখার জন্য পত্রিকাকে না-আবার ধোপা-নাপিত খুঁজতে হয়। সাবধান।

সুবিমল বসাক

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি মন

২৮ বর্ষ/১২শ সংখ্যা
ডিসেম্বর/১৯৮৬
অগ্রহায়ণ/১৩৯৩

প্রতি সংখ্যা দুই টাকা
বার্ষিক সডাক কুড়ি টাকা

অশোক চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক

সম্পাদকীয়

অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর 'রাজনগর' উপন্যাসের জন্য এবছরই বঙ্কিম পুরস্কারে ভূষিত হবার পর বাংলা সাহিত্যে যে ঢেউ উঠেছিল, সে ঢেউ মিলিয়ে যাবার আগেই আরো বড় আকারের ঢেউ উঠলো। ঐ একই উপন্যাসের জন্য অমিয়ভূষণের এবারের সাহিত্য একাদেমী পুরস্কার জয়কে কেন্দ্র করে। বাংলা শিল্প সাহিত্যের যাবতীয় বিষয়ের ইজারা নিয়ে বসে আছে কোলকাতা। সেই কোলকাতার প্রাতিষ্ঠানিক জগতের কেউ না হয়েও এবং কোলকাতা থেকে এতদূরে বসে কেউ এ ধরণের পুরস্কার জয় করে নিতে পারেন—এ যেন আমরা এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছিনা। তবু এটাই সত্য। মূলতঃ ছোট কাগজের লেখক হয়েও বড় পুরস্কারে ভূষিত অমিয়ভূষণ তাই আমাদের গর্বের—অহংকারের।

সম্পাদকীয় কার্যালয় ॥ নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর-৭১২১৩৬ ॥ হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ

কবিতা
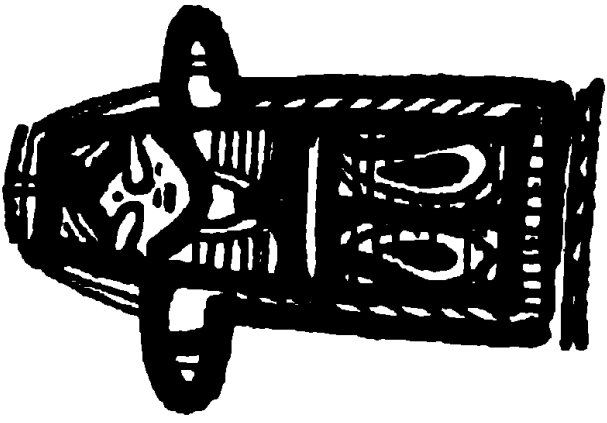
জেলেদের মেয়ে/অশোক চট্টোপাধ্যায়

তুমি জেলেদের মেয়ে
পূর্ণকুম্ভ জল নিয়ে বসে আছ
সমুদ্র কিণারে ;
শুধু কিছু গাঙ চিল ওড়ে
ঢেউদের দেয়ালের পারে।

পালতোলা নৌকার মাস্তুল
যা তোমার অন্বেষণ
তার কোন চিহ্নমাত্র নেই।

তুমি জেলেদের মেয়ে,
তবু তুমি প্রতীক্ষায় পূর্ণকুম্ভ নিয়ে।

O O O

যদি ফিরে আসো/সৌম্যেন অধিকারী

যাবে যাও। যদি ফিরে আসো
দেখে এসে বোলো
গভীর উদ্দাম সেই তুফানী নদীর বুকে
বাজ নিয়ে কালো মেঘ জমে
ছিলো কিনা।

ঝাঁপ দিও। রক্ত কমল পাবে।
যদি ফিরে আসো,
শুধু একটি রক্ত কমল দিও।

শরীরে জ্বর নিয়ে কতোদিন শুয়ে আছি.
দিন গুনছি
যদি ফিরে আসো।—
শুধু একটি রক্ত কমল দিও।
যাবে যাও। যদি ফিরে আসো।

প্রবাস/জগদীশ চতুর্বেদী
হিন্দি থেকে অনুবাদ : সুবিমল বসাক

কালো পাহাড়ে সূর্য ওঠে না, হয়তো তা নার্ভের
ভুতুড়ে কোণ। আমি তোমাকে উঁচু চুড়া থেকে ঠেলে ফেলে
সেখানে চলে যাবো।

মহাসমুদ্র আমার কাছে শুধু ধূ-ধূ চাদর—
জাহাজের অমিল
নারী সময় নষ্ট করার ব্যাপার। আমি সময়কে পকেটে
রেখে বরফ-শীর্ষ থেকে পিছলে যাবো।
স্তন উন্মুক্ত করে ওষ্ঠ স্পর্শ, বা
হামলানো ভঙ্গিতে আদর হাস্যাস্পদ মনে হয়। টেবিলের
ওপর
তোমাকে পোর্টেট সাজিয়ে আমি নিরাবরণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
শুধু দেখবো, স্পর্শ করবো না।

স্পর্শকালীন প্রেমের নাটক করা নপুংসক প্রক্রিয়া। আমি
প্রেমের নাটক করতে চাইনা। নপুংসক হয়ে আমি ঢাক
পিটিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াবো না।

আমাকে ডাকে কালো পাহাড়, শ্বেত বায়স, গুহাপথ
একটা তোবড়ানো মুখ রাস্তার মাঝে আমাকে জিভ ভেঙ্গায়
আমি এনে দেবো দেয়ালে ভ্যানগগের লালসা ও দালির
ঘড়ি। পিকাসো যদি নগ্ন অবস্থায় বাজারে চেঁচায়
তাতে আমার কি ? প্যারিসের নামেও আমি ঘৃণা বোধ করি।

দিল্লীতে আমার বাড়ি। আমার স্ত্রী প্রত্যহ উবু হয়ে
তার সাড়ি কাচে। একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে
আমার কমবয়সী প্রেমিকা বই কেনার ফাঁকে স্কুটারে
যুগল আরোহীকে লক্ষ্য করে।

লজ্জিত বোধ করা এখন আমার হয়না। স্ত্রী বা প্রেমিকাকে
ঘর থেকে বার করার আগে আমি নিরাবরণ করে দেব।

কালো পাহাড়ে আমায় যেতে হবে। নুলো হাতের
ভর দিয়ে টেনে-হেঁচড়ে হাজির হব কোনো নির্জন ভুতুড়ে স্থানে।

সেই নির্জনতাই আমার ঘর। নির্বাসিত আমি, এই সব পরিচিতের
মাঝে থাকতে-থাকতে ক্লান্ত শ্রান্ত।
আমি এখন দীর্ঘ যাত্রায় চলেছি।
বিদায়।

সনিয়া/হেম বরুয়া অসমীয়া থেকে অনুবাদ : অনিন্দ্য সৌরভ

তাকে আমি দেখেছিলাম কোন এক
জ্যোৎস্না-ম্লান ফাল্গুনের রাতে ; না দেখিনি।
কোথাও দেখিনি এটি আমার উদভ্রান্ত কল্পনা।

তাকে আমি দেখেছিলাম
মেঘ ঘন, ঘন ছায়া কোন এক বর্ষার
দিনে বহুদূর অন্য কোথাও।

ইন্দো-পাক সীমান্তের মদনপুর বাগিচার
সে দীপ-শিখা
গায়ে কাঁচাপাতা কাঁচা-কাঁচা মত
সবুজাভ মৃদুঘ্রাণ,
এমন লাবণ্যময়ী সে, এমন চিকন।

শ্রান্তিম্লান চোখদুটি তার
কোন এক অজানা দেশের, না বোঝা ভাষার
কথা আঁকার মত বহুকথা বলে।

আকাশের একখণ্ড নীল সেই
আর চোখের প্রকাশ ;
মেঘাচ্ছন্ন দিনের কণা-কণা ঢেউ তার
সেই চুলের মাঝে।

তাকে আমি দেখিনি কলেজের বারান্দায়,
তাকে আমি দেখিনি শহরের পুকুর
পারে নাইতে।

কোন এক নিস্তব্ধ প্রহরে
কোন এক নিরালা গাঁয়ের কোন এক
চিকন বুকে :
দেখিনি তাকে আমি নদীর পারে দেখিনি
মাঠে, দেখিনি জ্যোৎস্নায় ; দেখেছিলাম
কোন এক প্রখর রোদে তপ্ত মদনপুর
বাগিচায়, যত শ্রম আছে ক্লান্তি আছে
আর আছে প্রতিটি সন্ধ্যার একমুঠো শ্রান্তি
এক বাটি প্রেম, আঙিনা ভরা নাচ আর গান
আর : যৌবন ছলকানো হাসি, রঙঢালা প্রাণ।

কবিতার ভাবনা

কবিতা আমার আত্মরক্ষার তাবিজ

সোফিওর রহমান

পরমাণু যুদ্ধের শঙ্কায় বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রেই জুজু, কুঁকড়ে আছে বিবেক, প্রতিবাদের তেমন কোন পথ নেই, মীমাংসাসড়ক পিচ্ছিল। সাদাকালোর বিভাজনে মার্কিনী উল্লাস, তৃতীয় বিশ্বের ব্যর্থ চেষ্টা—এর পাশাপাশি গণতন্ত্র ধনবাদী সমাজ, শ্রমিক শ্রেণী, দ্বান্দিক বস্তুবাদ ইত্যাকার রাজনীতি-গন্ধী শব্দগুচ্ছ বড় ব্যথা দেয়। তারই মধ্যে কবিতা: নিরক্ষরপ্রধান ভারতবর্ষে সংগ্রামী কিংবা তথাকথিত সমাজ সচেতন (বা জীবনধর্মী (?)) কবিতা লিখে, ঠিক এই মুহূর্তে ইতিহাস স্থান করে নেওয়া কঠিন ব্যাপার। বিশেষত, রাজনীতির কুচো-কর্ণার থেকে প্রয়োগ-শিল্পের ভেজাল যন্ত্রাংশ—সর্বত্রই পরিত্রাণহীন ভীড় আর মূর্খ রাজপুরুষদের দাপাদাপি।

ভারতীয় শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির এমন কোন নিঃশুদ্ধ মাটি নেই যেখানে আতঙ্কহীনভাবে দুদণ্ড দাঁড়ানো যায়, পবিত্র নিঃশ্বাস নেওয়া যায়। স্বাধীনতাত্তোর কাল থেকেই এ জিনিষ প্রকট, প্রকটতর। অভিজ্ঞতার এহেন সঞ্চয় সভ্যতারও আগে প্রথম ঋকোচ্চারী সেই মানুষটির মধ্যেও ছিল, জল ও আগুন থেকে বন্যপশু আর প্রকৃতির তাণ্ডবের জন্য। তবু কবিরাই অগ্রদূত, যুগ থেকে নতুন যুগের—আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের।

১। এ পথেই সময় ও সমস্যা, নানা ঘটনা এবং চরিত্ররাশি, আর অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার অভিসারী রশ্মিগুচ্ছের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তি হয়ে ওঠার নির্মম সত্য আমাদের জীবনে সঞ্চিত। কবিতার জন্য সহোদর কিংবা প্রিয়ধর্মিনীর মত কল্পনা ঐ অভিজ্ঞতাকে উত্তরিত করে সুকুমার শিল্পে। বাস্তবের তাবৎ টানপোড়ন আর কল্পনার মধ্যবর্তী হাল্কা পর্দাটিকে সরিয়ে জঠরমুক্ত ফসলই কবিতা। হ্যাঁ, এমন স্বীকারোক্তি গর্বিত করে তোলে আমাকে—বলতে দ্বিধা নেই, কবিতা আমার বেঁচে থাকাকে

জীবনধারণকে কখনই অসমতল করে তোলে না। বিপরীতে, খাদ্যসংগ্রহ থেকে আরম্ভ করে ঘুমানোর বাঁধাবৃত্ত ওগুলিই ক্ষতি করে নিজের কবিতা মনস্কতার।

পুরুষ মাত্রেই দুরাবস্থার শেষ নেই। মৃত্যু-মুহূর্ত পর্যন্ত নানান জাগতিক কাঁটাস্পর্শ অনুভূতির সুকুমার প্রবৃত্তিগুলিকে নিহত করার চেষ্টায় মুখর; কিন্তু কবিতা ডিমাণ্ড করে সহনশীলতা—নির্মম আঘাতের মুখোমুখি তার আবাদী জমি, নির্মাণ সত্যের। ক্ষত-বিক্ষত শরীরে কোথাও না কোথাও উপলব্ধির নিরাবয়ব এবং অনিবার্য এক অদৃশ্যভূমি। তা আত্মপ্রতারণাহীন, চৈতন্যআশ্রিত, অন্তর ইন্দ্রিয় ঘনত্বের মর্মর। তাই কবিতা আমার রক্তাক্ত লড়াই, কান্নার আশ্রয়।

২। কখনো এমনও মনে হয় কবিতা এক কাওয়ার্ড প্রেম, ঘুমের ভিতরও জাগিয়ে তোলে দিনের গভীর সমস্যা। পুরুষের সব অসম্পূর্ণতার প্রতীক, অতৃপ্তির এসরাজ কিংবা আত্মভুক পাখির ঠোঁটের ধার। গভীর কষ্টের ভিতরও জ্বালিয়ে দেয় কষ্টের বসতি—জ্বলবে জীবনের শেষ স্তবক পর্যন্ত। আমি পুড়তে পুড়তে তবু আগুনের কাছে ছুটে যাবো নিজেকে পোড়াতে আরও। তাই কখনো কখনো কবিতা যৌবনের ভুলে ভরা ইতিহাস……

৩। অথচ ভুলের স্বরলিপি থেকে আমি সচেতন। এক শ্রেণীর পাঠক যারা—সাধারণ, অ শিক্ষিত, কবিতাকে জীবনের দর্পণ মনে করে কিংবা মনোরঞ্জনের জন্য পড়ে, তারা কবিতার মৌলিকতা সম্পর্কে অজ্ঞ। আমাদের দেশ সুদীর্ঘকাল ভিন্নজাতীর শাসনে থাকায় স্বাধীনতার পরপরই জীবনযাপনের ভয়ংকর নান্দীমুখ সমাজ ও সংস্কৃতিকে আত্মবিনাশের যজ্ঞে আহুতি দিতে চলেছে। তার শিকার সাম্প্রতিক বাংলা কবিতাও, একধরণের পশ্চিমী পারমিসিভনেস এসে গেছে—আমুদে বিস্ফোরণ, হিংস্র, অযৌক্তিক এবং নির্বোধ ব্যক্তি দলাদলি আর পদ্য ও মদ্যের শঙ্কর আলসেমি। জীবনের নঙর্থক আকর্ষণগুলি তাতে প্রকট হচ্ছে। বলতে দ্বিধা নেই ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের বিচ্ছিন্নতাবোধ তখন উৎস ছাড়িয়ে এগিয়ে যায় বহুদূর। ফলে কবিতা (?) হয়ে ওঠে খণ্ডিবন্ধ, স্থলে স্থলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হীন আবাস। 'বৃহত্তম সংখ্যার জন্য গভীরতম অভিজ্ঞতার প্রকাশ' তখন যেন অন্তবিন্দু। কবিতার কল্যাণধর্ম তাতে মার খায়। অবশ্য সচেতন পাঠকের দল শ্রম করে বেছে নেন আত্মবিশ্লেষণের, ধ্রুপদী মনন ও সমাজ সংবেদী কবিতা। জীবন বিন্যাসের আনন্দবেদনার গভীর উচ্চারণ ও সময়ের মানচিত্র জোড়া এই প্রসঙ্গটিতে পরে আসবো।

৪। জীবনযাপনের সবকিছুই আমার কবিতা নয়। কারণ, কবিতা কখনও আমার সবাক মনের কখনোবা জাগরিত মনের—দু ধারাতেই বস্তুনিষ্ঠ ব্যাপ্তি, সংঘাত ও কঠোর শ্রমের যোগাযোগ। শুধু উপস্থাপনায় স্থান-কাল-বিশেষ চরিত্র বা প্রসঙ্গ পাল্টে যায় বারবার। নিজে কিংবা কল্পিত কোন অস্তিত্ব, একটি নারী কিংবা প্রকৃতি যে যে-মুহূর্তে যে ভাবেই আসুক জীবনের সত্য ও সময়ের অস্তিত্বের বাহক তাকে হতেই হয়। সেজন্যই আমি স্থির যে—একমাত্র কবিতাই আমাকে সুস্থ রাখে। সামাজিক হাজার সমস্যা ও গ্লানির মধ্যেও স্বাধীনতার আনন্দ দেয়। এর জন্য পেয়ে গেছি কষ্ট ও অপমান সহ্য করার অদম্য শক্তি, আনন্দ উপভোগের সুখ এবং প্রিয় সান্নিধ্যের মুহূর্তগুলি। এ সত্যগুলি কি জীবনের বাইরে?

আমার সেই একটি কথাই বারবার ঘুরেফিরে আসে, পরম সত্য জানে যা আমি জেনেছি কবিতার পথে—জীবন ও জগতের সবকিছুই কবিতা থেকে, অথচ সবটাই কবিতা নয়। সবার জন্যই কবিতা, অথচ

কবিতায় স্থান না পেয়ে আপাঙতেয় হয়ে মরে যাবে অনেক অনুভূতি।

৫। আসলে, কবিতা এক অবিনাশী শক্তি, প্রতিনিয়ত উত্থান ও পতন গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে সে আরও শক্তিশালী হচ্ছে, আজও বলছি পিতৃত্বের জন্য বীর্যবন্ত করছে আমাকে। সমুদয় রুচি ও শিক্ষার সুস্থতাকে বাঁচিয়ে রাখছে কবিতাই। তা না হলে ঐ পারমিসিভনেস—হিপি ও বীটনিক, টুইষ্ট নাচ, রক এ্যাণ্ড রোল কিংবা সাট্টা জুয়া মদ মাগী যৌনতা হিংস্রতার বিকৃত পথে…। ভাগ্যিস্ গণপাঠকের অধিকার মেনে নিইনি!

৬। আমি হলফ করে বলছি আমার দায় প্রথমত আমার কাছে এবং যাবতীয় অ-কবি বন্ধু থেকে শুরু করে এয়ার হোষ্টেস্ সুচেতা কিংবা বাঁকুড়ার লবণা-যে রুক্ষ মাটির বুকে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। সামাজিক দায় আমার ততখানি, আমার কবিতাভুবনে সমাজভাবনার বা পরিকল্পনার যেটুকু কাঠামো আছে। কারণ সমাজকর্মী বা রাজনীতির লোক আমি নই। ওদের ক্ষেত্রে যতটা ঐ 'দায়' বর্তায় ততটা আমার নয়। আমি কবিতার খাতিরে সূক্ষ্ম ও গোপন, এবং অন্তচারী [অথচ সমাজের আপামর মানুষ আমার আত্মীয়, প্রিয় পরিজন]।

সত্যি কথা বলতে কি কবির দায় ঠিক এখনি উচ্চস্বরের নয়, সম্পূর্ণ ভাবে নির্জনতায় তা হয়ে ওঠে। এই সময়টা জটিলতর হলেও গোবিন্দচন্দ্র দাস, নজরুল ইসলাম বা সুকান্ত ভট্টাচার্যের আবেগের ঘেরাটোপে বন্দী নেই। ওদের মত একটি ভাবকে বিভিন্ন কবিতায় প্রতিবাদের সমধ্বনিতে ফেলে আমি বা আমরা কেউ কবিতার শিল্পবাঁধন হাল্কা করতে রাজী নই। জীবনের নানা উন্নতি নানা অবনতি, দু ধারাতেই উৎস কিংবা গতি বিভিন্নমুখী, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা কবিকেও নতুন শব্দ ইঙ্গিত মাধুর্য নিয়ে ডাক দেয়। নতুন দ্যোতনায় জীবন চলেছে অন্যরকমভাবে। পুরোণো ঋতুগুলি কেউ আর নতুন স্বাদে আসছে না, বহুলাংশেই তারা প্রত্যেকে নিজেদের খর্ব করেছে। আর সেজন্যই আমার 'সপ্তম ঋতু'র প্রসঙ্গ ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গ সহঅস্তিত্বের সঙ্গে আমার বোধের নৈকট্য। শোষিত, ধর্ষিতা, বিরহে কাতর কিংবা আনন্দে উত্তেজিত, বৈধ এবং অবৈধ সময়ের সব ক্যাপসুলের সঙ্গে মানুষকে ছুঁয়ে থাকতে চাই যা তার চৈতন্যের গভীরতম জায়গায় স্থান পাবে। বেশী করে অনুভূত হওয়ার জন্য ব্যাকুল করবে অথচ পাবে না—এখানেই আমার এবং আমার কবিতার নির্জন অন্বেষণ। ঠিক এখানটাতেই সৃষ্টির জন্য আমার নির্মম আনন্দ এবং পাঠকের বুকফাটা কান্না।

৭। বয়স্ক কবিদের সঙ্গে এখানেই আমার দ্বন্দ্ব, জেহাদের শুরু হয়েছে। কারণ, আজকের বয়স্ক কবিরা যারা জীবিত আছেন আরও কিছুকাল বেঁচে থাকার চেষ্টা করবেন তারা চিনিতে চিনি মিশিয়ে আনন্দ পান, অথচ আমার ভূমিকা মিশে যাওয়ার নয়, স্বাদ গ্রহণের। পূর্বে যে 'দায়'–এর কথা বলেছি এ জায়গা থেকেই তার প্রকৃত শুরু বলা চলে। বয়স্ক কবিদের মত বৈষ্ণবীয় অভিভাষণ বা সখা-চাতুরীকে আমি ঘৃণা করি। ভাবলেই ভিতর থেকে বমি উঠে আসে। অথচ ঐ সব সংখ্যালঘু সেজে-থাকা-গুরু সম্প্রদায় প্যাকেটি: কায়দায় একপ্রকার নতুন টেকনোফিউডাল শ্রেণী তৈরী করতে ওস্তাদ। তরুণ ও নতুন কবিদের শোষণ করছেন ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, মগজ ধোলাই করে নিজেদের হুকুমলা ব্যবহারে বাধ্য করেন। নইলে চলবে কেমন!

কবিতার ইতিহাস এই শিক্ষাই দিয়েছে—ওয়ার্ডসওয়ার্থ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ সকলেরই কবিতার জন্য ঐ ধনতন্ত্রের পক্ষপাত অগ্রমুখী ছিল। এদের বৈভব ও আনুগত্য আদায়ের কথা ভাবুন।

আসলে এই সব Enlightenment-এর ফলশ্রুতি কবিতার মধ্যেও ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সূচনা করে দেয়, তেমনি সমাপ্তিও আছে। তারপরই শুরু হয় বিকৃতি এবং শোষণের হাতিয়ার। আমি বলতে চাইছি, পরস্পর সহ্য করতে পারে না এমন দুই ধাতুর আত্মীয়পনা। একটু ব্যাখ্যা করলে এরকম দাঁড়ায় উত্তরসূরী স্বাতন্ত্রকে নতুন জ্ঞানে আসন ছেড়ে না দিয়ে আত্মীয়জন সেজে দলে আনা। এখন বাংলা কাব্য-জগতের ধুন্ধুমার বাজীকররা এভাবেই কবিতা চাপছে। আর তাকেই Communication জ্ঞানে নতুনরা ডুবছেন পুরোনো কুয়োয়, সেখানে ক্রমে ব্যাধি ও মৃত্যু অনিবার্য। এই বশ্যতার শৃঙ্খল আমাদের কাটতেই হবে···

৮। শৃঙ্খল শুধু অগ্রজরা পরাননি। নোতুনরা নিজেদের পায়ে পরে আছেন নিজেরাই। শালীনতা-বিশিষ্ট স্বেচ্ছাচার (স্বাধীনতাঅর্থে) কবির অদৃশ্য অলঙ্কার, কিংবা শোভন উন্মাদনা তাকে সৃষ্টিসচেতন করে, আর সহিষ্ণুতাহীন উদ্দাম নিজেকেই নষ্ট করে অন্ধ করে দেয়। এ সময়ে যে হারে তরুণ এবং নোতুন কবিরা নিজেদের শ্রম এবং রুচির অপচয় করে চলেছেন তাতে অচিরেই বাংলা কাব্যজগতে গৌণ কবিদের কিংবা কবিতা লেখকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। সখ্যতা ও ভদ্রতা মানুষের পবিত্র সম্পর্ক। অথচ প্রায় ষাটের দশক থেকেই অ-সহনভাব এবং তৎজাত নোংরা টেবিলবৈঠক আমার কামনাকে রক্তাক্ত করে আসছে। সখ্যতাকে তীব্র আঘাত করেছে। এমন পরচুলা রোগ বা অসংসদীয় কালোস্নান থেকে রেহাই পেতে চাই বলে আজ থেকে আমি আরো বেশী অংশে কবিতার নির্জনতায় আশ্রয়প্রার্থী। জীবনের লঘু অনুভূতির গুরুত্ব কখনই কবি ও কবিতায় আশ্রয় পেতে পারেনা, তেমন দাবীও অসামাজিক।

৯। অথচ কবির সামাজিকতা প্রশ্নাতীত। জাগ্রত বিবেক ও সূক্ষ্ম চিন্তায় সে সর্বদাই প্রগতিশীল। বর্তমান বিশ্বের জন্য কল্যাণস্পৃহায় কম্যুনিজমের প্রতি আস্থাবান। তাই দলে নাম না লেখালেও আমরা মার্কসবাদী—পরিশুদ্ধির প্রশ্নে, আত্মীকরণের সূত্রেও ওতে বাঁধা।

আসন্ন পরমাণু যুদ্ধ আমাকে ভীত করে, যখন দেখি মার্কিনদের সংকীর্ণ যাজক মনোবৃত্তি, সাদা কালো ভাগ করে তারা যখন আনন্দ পায়, রেইক-জাভিকের ব্যর্থতা বা জেনিভাতে যখন ব্যর্থ পৃথিবীর দুই শক্তিমান নেতা, মানুষের কথা ভেবে কেঁপে উঠতে হয়। ভয় আর-শঙ্কায় বুক দুরদুর করে। শুধু মানুষের ভুলের জন্য নয় কম্পিউটারের ভ্রান্তির ফলেও মারণযজ্ঞ শুরু হয়ে যেতে পারে কারণ আমরা তো স্বেচ্ছায় আমাদের দায়িত্ব কম্পিউটারের ঘাড়ে চাপিয়েছি। অন্যদিকে প্রকৃতির নির্মম বিনাশ, পরিবেশ দূষণ মানুষকে কতো অসহায় করে তুলেছে ২০50 সালে তা ব্যাপকভাবে বোঝা যাবে। অরণ্য মরে যাচ্ছে নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, আমরা মানুষেরা আমাদেরই পরিবেশের শেষকৃত্যে যোগ দিয়েছি। অন্য উদাহরণ—এর পাশাপাশি তৃতীয় বিশ্বের ক্রমবর্ধমান দুর্দশা। আজ পৃথিবীজুড়ে মারণাস্ত্র উৎপাদনের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে তার একাংশও যদি এশিয়া, আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার জনগণের স্বার্থে বিনিয়োগ করা যেত, ক্ষুধা ও দারিদ্র হয়তোবা মুছে যেত পৃথিবী থেকে। এসব ভাবনা কোন পাটোয়ারী প্রদর্শনী নয়—বোধ-সঞ্জাত বিবেকের তাড়না, অনেক সময় মনে হয় এসব যাবতীয় সমস্যা কেবল কবিকেই জর্জরিত করছে। আদিগন্ত এই ব্যাধি হতাশ করে তীব্রভাবে, কবিতার কাছে ফিরে যেতে হয় শান্তির জন্য। কবিতা তখন হয়ে ওঠে আমার জীবনের ধর্ম, প্রার্থনা করি কবিতাতেই যেন মরণ হয়। ●

১৯৮৬ সালের সাহিত্যে নোবেল জয়ী

ওলে সোইংকা (Wole Soyinka)

গজেন্দ্রকুমার ঘোষ

পুরস্কার ব্যক্তিকে সম্মানিত করে। কিন্তু নোবেল পুরস্কার এমন একটি পুরস্কার যা শুধু ব্যক্তিকেই স্বীকৃতি জানায়না তার সঙ্গে তার জাতীয় মর্যাদাও বৃদ্ধি করে। নোবেল পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা হতে শুরু হয় শরতের প্রারম্ভে। আর পুরস্কার বিতরণী সভার অনুষ্ঠান শীতের শুরুতে। ১০ই ডিসেম্বর। সেই দিনটি সুইডিস ক্যালেণ্ডারে নোবেল দিবস হিসাবে চিহ্নিত। জাতীয় পতাকা ওড়ে সুইডেনের আকাশে। মহামতি আলফ্রেড নোবেলের তিরোধান দিবসে বিশ্বের গুণীজনকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় স্টকহলম কনসার্ট গৃহে। সুইডেনের রাজার হাত থেকে পুরস্কৃত গুণীজনেরা গ্রহণ করেন নোবেল পুরস্কার। এবার নোবেল উৎসবের আলোকউজ্জল পুষ্পশোভিত কক্ষে কালো আফ্রিকার একটি মানুষ রাজার হাত থেকে গ্রহণ করবেন ১৯৮৬ সালের সাহিত্য পুরস্কার, তিনি হলেন ওলে সোইংকা (Wole Soyinka) বয়স মাত্র ৫২, নোবেল পুরস্কার সাহিত্যে যাঁরা পান, তাঁদের বয়সের তুলনায় তিনি যুবক। সোইংকার জন্ম নাইজেরিয়ায়। কিন্তু সোইংকার পুরস্কার শুধু তাঁর দেশের গৌরব বাড়ায়নি, তার নামের সঙ্গে জড়িত হয়েছে একটি মহাদেশ। নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে এই প্রথম একজন আফ্রিকার মানুষ এই সম্মানের গৌরব অর্জন করল। সোইংকা একজন সুইডিস সাংবাদিককে কথা প্রসঙ্গে বলতে ভোলেননি; "দীর্ঘ পঁচাশী বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে বিরাট একটি মহাদেশকে··· আফ্রিকা যদি বিরাট অঙ্কের একটি বড় পুরস্কার থেকে এতো দিন ইউরোপকে বঞ্চিত রাখতো?··· যা হোক, এ আনন্দের দিনে এসব আলোচনা বৃথা" হেসে প্রসঙ্গটা লঘু করে দেন সোইংকা। সোইংকা এই পুরস্কারের জন্য নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে একজন প্রতীক হিসাবেই মনে করেন। তিনি মনে করেন, এই পুরস্কার দিয়ে আফ্রিকার সাহিত্যকে সম্বরণ ও সম্মানিত

করা হয়েছে। তিনি এই পুরস্কার গ্রহণ করবেন আফ্রিকার লেখক লেখিকাদের প্রতিনিধি হিসাবে। ১৫ই অক্টোবর, সাহিত্য অ্যাকাডেমির নব নির্বাচিত সম্পাদক স্টুরে অ্যালেন ঠিক দুপুর ১টায় (প্রতি বছরেই) যখন চারটি ভাষায় ছোট্ট যুক্তি দিয়ে ঘোষণা করেন ১৯৮৬ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন ওলে সোইংকা তখন উপস্থিত সাংবাদিকরা অত্যন্ত প্রত্যাশিত সংবাদ হিসাবেই তা গ্রহণ করেন। আফ্রিকার দুটি নাম নোবেল পুরস্কারের জন্য বহুদিন থেকেই নোবেল কমিটির আলোচনায় আসছিল। অন্য নামটি হলো সিনেগাল-এর প্রখ্যাত কবি সিংহোর।

নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পর নোবেল কমিটির দায়ীত্ব টেলিফোনে পুরস্কার প্রাপকের সঙ্গে যোগাযোগ করা। সোইংকা তখন প্যারীতে ইউনেস্কো ভবনে। পুরস্কারের সংবাদ তখন সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়ে গিয়েছে। সোইংকা ইউনেস্কোয় আন্তর্জাতিক থিয়েটার ইনষ্টিটিউটের সভাপতি। তাছাড়া প্যারীতে তখন তাঁর একটি নাটক চলছে। খবর পেয়ে সাংবাদিকরা হাজির হয়েছেন ইউনেস্কো ভবনে। সোইংকা প্রথমে ভেবেছেন গুজব, অতঃপর সুইডিস রাষ্ট্রদুতের উপস্থিতি ও সুইডিস সাংবাদিকদের দেখে উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলেন - "এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, আফ্রিকার সৃজনশক্তির প্রথম স্বীকৃতি সে আসবে সুইডেন থেকে।" তিনি আরো বলেন, "আমার মনে হয় পশ্চিমী দেশগুলোর মধ্যে সুইডেনেই প্রথম আফ্রিকার প্রগতিশীল শক্তিকে জানার এবং বোঝার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।…আর একটি বিষয়ে তাঁরা অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক বেশি উদ্যোগী — তা হলো, মানবিক স্বাধীকার আন্দোলনের প্রতি সক্রিয়তা।"

সোইংকার নিজের ভাষায়; সেদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে যা বলেন: "আমি মূলতঃ … নাট্যকার, নাটক হলো আমার আসল সাহিত্য ক্ষেত্র। নাটকই আমার প্রধান প্রকাশ মাধ্যম। কিন্তু অন্য প্রকাশ, রীতিও আমি গ্রহণ করে থাকি যা অনেক সময় লেখক • হিসাবে আমার ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরতে জটিল মনে হয়।"

সোইংকার সাহিত্য সাধনা আজ ত্রিশ বছরের উৎকর্ষতায় উর্বর। বলতে গেলে আফ্রিকার সাহিত্যের সত্যিকারের সূচনা ও সমৃদ্ধির যুগ বিগত ত্রিশটি বছর। আফ্রিকার প্রথিত যশা সৃজনশীল প্রতিভাবান সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে চারভাগের তিন ভাগ জন্মেছেন ১৯৩০ সালের পরে। ওলে সোইংকার জন্ম ১৯৩৪ সালে। শুধু সোইংকার নয়, বলতে গেলে সমস্ত আফ্রিকার … সাহিত্যই নবীন। সেই হিসাবে নোবেল কমিটি অন্যকথায় সুইডিস সাহিত্য অ্যাকাডেমি শুধু নবীন একজন সাহিত্যিককেই পুরস্কৃত করেননি; পরন্তু নবীন এক সাহিত্যকে স্বীকৃতি দান করেছেন। চীনের ঐতিহ্যপুর্ণ সাহিত্য এখনো নোবেল পুরস্কারের সম্মান থেকে বঞ্চিত। সেদিক দিয়ে বিচার করলে ১৯৮৬ সালের নোবেল পুরস্কার (সাহিত্যে) অনেক তাৎপর্যপুর্ণ।

আফ্রিকা একটি মহাদেশ। বহুস্বতন্ত্র রাষ্ট্র ও ভাষাভাষী মানুষের এই মহাদেশ। গরমিল আছে অনেক। একটি মহাদেশের সবমানুষ ও তার সংস্কৃতির স্বরূপ এক হতে পারেনা। অবশ্য আফ্রিকার যে অংশে আরব সংস্কৃতির প্রসার ও ব্যুৎপত্তি সে অংশকে সাধারণতঃ কালো আফ্রিকার সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হয়না। সোইংকার নোবেল পুরস্কারে যে আফ্রিকার সাহিত্যকে স্বীকৃতির কথা বারবার উচ্চারিত হচ্ছে, এবং স্বয়ং সোইংকাও যে কথা বলছেন—তা হলো সেই কালো আফ্রিকা। সেই কালো আফ্রিকার মধ্যে কি শুধু নৃতাত্ত্বিক ও বর্ণমূলক সাদৃশ্যই প্রধান? সাংস্কৃতিক ঐক্যের জন্য তা কি

যথেষ্ট? এ প্রশ্নের আড়ালে অনেক উত্তর খুঁজে নিতে পারি। আফ্রিকার গোষ্ঠী সভ্যতার স্বাভাবিক বিকাশের ভাঙ্গন ধরিয়ে ইউরোপীয় ঔপনিবেশীয় শক্তি আফ্রিকাকে ভাগ করেছিল একদিন। গোষ্ঠি সভ্যতার ক্রমবিকাশমান সংস্কৃতির প্রতি ইউরোপীয় উপনিবেশ-কারীদের মাথা ব্যথা ছিলনা। তাঁদের স্বার্থছিল প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর। প্রাকৃতিক সম্পদের ভাগবাটোয়ারা করে তারা উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। গোষ্ঠি সংস্কৃতির ভাঙ্গন ধরিয়ে, ইংরেজ, জার্মান, হল্যাণ্ড, ইতালী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পর্তুগীজ, স্পেন প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা ও আচার-ব্যবহার একদল মানুষের ওপর চালিয়ে দিয়ে শতাধিক বৎসর রাজত্ব করেছে।

ইউরোপে তাঁরা সবাই স্বতন্ত্র—কি ভাষায়, কি সংস্কৃতিতে। ইউরোপের ইতিহাসে তাদের লড়াইয়ের অন্ত নেই। তবু তারা ইউরোপীয়। যে অর্থে তারা ইউরোপীয়—সেই অর্থেই ইউরোপীয়দের পরিত্যক্ত উপনিবেশ আফ্রিকার সংস্কৃতি আজ কালো আফ্রিকার একক সংস্কৃতি। কালো আফ্রিকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি আজ ঔপনিবেশীয় মিশ্র সংস্কৃতি। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির ছত্রছায়ায় বর্দ্ধিত এক দল Euri-African নব্যশিক্ষিতের সংস্কৃতি। তাঁদের সংস্কৃতি চেতনা ও জাতিত্ববোধ পরিপুর্ণতা লাভ করেছে ঔপনিবেশিক মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে। ২য় মহা-যুদ্ধের পরে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর এই আফ্রিকান গণজাগরণের স্বুবর্ণ সুচনা। পরস্পরের প্রতি মুক্তি আন্দোলনের সহানুভূতি ও সহযোগিতা এই আফ্রিকাবোধকে আরো জাগ্রত ও সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলেছে। তাই দক্ষিণ আফ্রিকার ঔপনিবেশিক অবিচারের বিরুদ্ধে আজ কালো আফ্রিকার সমবেত প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের সংকল্প। কালো আফ্রিকার রাষ্ট্রনেতারা তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থকে বড় করে দেখলেও কাল আফ্রিকার বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদে দ্বিধাহীন। ওলে সোইংকা তেমনি একজন বুদ্ধি-জীবী। জন্ম নাইজেরিয়ায়। নাইজেরিয়া ও বিয়াফ্রার গৃহযুদ্ধের সময় নাইজেরিয়া সরকার সোইংকাকে বিয়াফ্রার পক্ষ সমর্থনের সন্দেহবসত: প্রায় দুবছর কারাগারের অন্ধকার সেলে বন্দী করে রাখেন। তখনই তিনি লেখেন, The man deid : Prison notes. এই বইটিতে সোইংকার সত্যিকারের সাহিত্য প্রতিভা ও জীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতার সুন্দর বিবরণ খুঁজে পাওয়া যায়। একজন বুদ্ধিজীবীকে কি ভাবে এবং প্রাথমিক কি কি উপায় অবলম্বন করে নির্যাতন করতে হয়, তার পাঠ পৃথিবীর সমস্ত কারা-কর্তৃপক্ষ একই স্কুলে নিয়ে থাকেন। সে চিত্র সর্বত্রই এক। নি:সঙ্গ সেল, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। সংবাদপত্র, বই পুস্তক, কাগজ কলম সব কিছুকে অস্পৃশ্য বলে গণ্য করতে বাধ্য করা। তার ওপর মানবিক নির্যাতন। এই বইটি নিতান্তই আত্মজীবনীমূলক। সোইংকাকে জানার জন্য এই বইটি অত্যন্ত মূল্যবান। ক্ষমতার নির্দয় এবং সজ্ঞান প্রচেষ্টা কেমন করে বন্দী আত্মাকে তিলে তিলে নিশ্চিহ্ন করে, হত্যা করে, তার জলন্ত সাক্ষী এই বইটি। কারাজীবনের বাইরেও অনেক স্মৃতি, অনেক চিত্র ও বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনায় সমৃদ্ধ The man deid : Prison notes. প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, নাইজেরিয়া ও বিয়াফ্রার গৃহযুদ্ধের সময় যুদ্ধ বিরতির জন্য (সোইংকা) আবেদন জানিয়ে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। নাইজেরিয়া সরকার সোইংকার প্রতি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ দাঁড়করিয়ে তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। সোইংকা তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন এমন সব চিত্র যা যথার্থই আজ কালো আফ্রিকার সমস্যা। এ যেন এক আইনহীন অরাজকতার যুগ। ক্ষমতা-বানের হাতে প্যারা মিলিটারী, অন্য দিকে আদিম বিশ্বাসের অধিকারী গোষ্ঠিতন্ত্রের পূজারী সরল মানুষ। এর মধ্যেই ক্ষমতার দম্ভে উদ্ধত ডিক্টেটর। আজীবন

সম্রাট। সোইংকার লেখায় যেমন এই সব মোটা মস্তিষ্কের ডিক্টেটরদের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্রূপ আছে তেমনি আছে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

সোইংকার ইতিহাস দ্যোতনা বোধ···সঠিক অর্থে মোটেই মার্ক্সীয় নয়। তিনি বিষাদময় দুঃখবাদী এবং একজন একনিষ্ঠ স্বাবলম্বী বিদ্রূপাত্মক লেখক। কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সর্বক্ষেত্রেই তাঁর কলম সচল। কিন্তু নাটকে তাঁর আপন বৈশিষ্ট্য বিশ্ববিদিত। তিনি শুধু নাট্যকারই নন, পরিচালক ও অভিনেতা হিসাবে তাঁর দক্ষতার কমতি নেই। সোইংকার নাটকে যাঁদের প্রভাব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, বেলজিয়ামের প্রসিদ্ধ প্রতীকধর্মী নাট্যকার ম্যাটারলেঙ্ক (MEATERLINCK) (১৮৬২-১৯৪৯), তিনি রবীন্দ্রনাথের দুই বৎসর আগে ১৯১১ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। তাছাড়া আরো দুজন নাট্যকার যাঁদের প্রভাব সোইংকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেন, যথাক্রমে সিঙ্গ (Synge) আইরিশ কবি ও নাট্যকার এবং ব্রেখট যাঁর নাটকে এখনো তিনি অভিনেতা ও পরিচালক হিসাবে কাজ করে থাকেন, সোইংকার মাতৃভাষা "উরুবা"—এ ভাষায় তিনি খুব কম লেখেন। তাঁর ভাব প্রকাশের প্রধান ভাষা ইংরেজি। নাইজেরিয়ায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করে বিশবৎসর বয়সে আসেন ইংল্যাণ্ড, সেখানে লীড্স বিশ্ববিদ্যালয়ে তার শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে পি এইচ ডি অর্জন করে। গবেষণার বিষয় ছিল তুলনামূলক সাহিত্য।

লীডস এ শিক্ষা গ্রহণকালে তাঁর প্রকৃত নাট্যপ্রতিভার বিকাশ ঘটে। ছাত্রদের নাট্যসঙ্ঘের সঙ্গে তিনি ভীষণ আগ্রহ নিয়ে জড়িয়ে পড়েন। সেখানে নাট্য-গবেষক ও সমালোচক জি, উইলসন নাইটের সঙ্গে পরিচিত হোন। তখন তিনি যে কবিতা লিখতেন তা ব্যঙ্গাত্মক এবং কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক নাটক ও লেখেন, শুধু তাই নয়, তাঁর প্রতিভার গুণে রয়েল কোর্ট থিয়েটারে লেখক হিসাবে একটি চাকরীও জুটে যায়। তখন তিনি এক ইংরেজ দুহিতার প্রেমে পড়েন, পরিণয় এবং একটি পুত্রসন্তান সবকিছুই একের পর এক ঘটে যায়। সোইংকা তখন যৌবনের পূর্ণ-উদ্দমে সৃষ্টির প্রেরণায় ব্যাপৃত। তখনি তাঁর সার্থক নাটক "The Swamp Dwellers" অভিনীত হয়। নাটকটির সার্থকতার কথা কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে অতি তাড়াতাড়ি। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় তার অভিনয় হতে থাকে। সুইডিস রেডিওতে, রেডিও নাটক হিসাবে অভিনীত হয় ১৯৭০ সালে।

১৯৬০ সালে নাইজেরিয়ার স্বাধীনতা দিবসে লাগোসে অভিনীত তার নাটক "A Dance of the forest", নাটকটি একটি গ্রীষ্মকালীন রজনীর অভিনয়। নাচ, গান, রাজনীতি ও পরিবেশ নিয়ে বিতর্ক। এ সবকিছু নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক ব্যঙ্গনাটক।

সোইংকার ইংরেজস্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্যজীবন বেশি-দিন টেকেনি। বিবাহ বিচ্ছেদের পর নাইজেরিয়ান এক শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তিনি নাইজেরিয়ার বিভিন্ন বিশ্বিবিদ্যালয়ে সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। সেই বছরেই লণ্ডনে ফিরে গিয়ে 'The Road' নাটক 'থিয়েটার রয়েল'-এ মঞ্চস্থ করেন। এটি তার সবচেয়ে লম্বা নাটক। আরো তাৎপর্যময়, এই নাটকটি নাইজেরিয়ান ইংরেজি ডিয়ালেক্ট-এ লেখা। প্রতারণা থেকে দার্শনিকতা। ব্যঙ্গাত্মক নাটক। অদৃশ্য নায়ক পথ নিজেই। কখনো এই পথ ত্রাসের কারণ, ভীত গাড়িচালকের কাছে, বিনে পয়সার পথযাত্রীর কাছে, কখনোবা এইপথ তাদের পায়ের নীচের আশ্রয়। সোইংকার সাহিত্যে, মানুষের মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণা এবং কি করে মৃত্যু জীবন সম্বন্ধে নতুন এক চিত্র

এঁকে দিতে পারে, যা হয়ে উঠবে জীবনের এক যথার্থ অর্থ। যেমন আত্মত্যাগ, শহীদ, আত্মাহুতী এসব হলো তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মূল ভাবনা।

সোইংকার বর্ণিত জগতের কেন্দ্রবিন্দু আফ্রিকার পুরাণ বা মাইথোলজি।

নাইজেরিয়ার উরুবা ভাষার '...পৌরণিক দেবতা লোহা ও যুদ্ধের প্রতীকি এই পৌরণিক দেবতা—ওগুন (OGUN)। যাঁর সঙ্গে গ্রীক পুরাণ দেবতা প্রোমেথিওস, আপেলো এবং ডিউনিসস (যাঁরা সৃষ্টি ও ধ্বংশের প্রতীক) ওগুন এর তুলনা চলে তেমনি তুলনা করা চলে হিন্দু পুরাণে শিবের সঙ্গে। সোইংকার নাটকে আফ্রিকার ধ্বনি সর্বতভাবে উপস্থিত থাকে যেমন ঢোল, দামামা, শিঙ্গা, নৃত্য এবং গীত প্রভৃতি।

দু চারটি কথা উল্লেখ করে সোইংকার নাটক সম্বন্ধে পাঠককে ধারণা দেওয়ার বৃথা প্রচেষ্টা। তা না করাই শ্রেয়। তবু তার বিখ্যাত কয়েকটি নাটকের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা ভাল। Death and the Kings Horse বইটি সম্বন্ধে থিয়েটার সমালোচক মার্টিন এস্‌লিন বলেন, শ্রেষ্ঠকাব্য নাট্যকার হিসাবে যাঁরা ইংরেজিতে লিখেছেন তাঁদের মধ্যে (সোইংকা) অন্যতম।...

সোইংকার রাজনৈতিক বিদ্রুপ নাটকগুলোর মধ্যে 'Season of Ano.my'. এই নাটকের মধ্যে সোইংকা তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তা ও ভাবী সমাজের বা রাষ্ট্রের চিত্রকল্প ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই রাষ্ট্রে ছোট ছোট আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ং শাসিত ইউনিট থাকবে। খানিকটা উইলিয়াম মরিসের চিন্তিত সমাজতন্ত্র। যেখানে ব্যক্তির সৃজনী শক্তির স্বাধীনতা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রথার গ্রাস থেকে সমাজকে রক্ষা করবে।

সোইংকার রাজনৈতিক বিদ্রুপ নাটকগুলোর মধ্যে A Play of giants এর Kingi's Harvest বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাটক দুটি পৃথিবীর ডিক্‌টেটরদের বিরুদ্ধে এক ঘৃণ্য প্রতিবাদ। তাদের মিথ্যা অহমিকাকে ঢেকে রাখার জন্য যে গণঅত্যাচার ও গণনির্যাতন এর বিরুদ্ধে নির্মম প্রহসন হিসাবে নাটকদুটি শ্রেষ্ঠ।

Kingi's Harvest এ ডিকটেটর রাজ্যের বেশ্যাদের বেশ্যাবৃত্তি থেকে তুলে এনে পুণর্বাসনের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার আয়োজন করেন। পরে মহিলা ত্রাণ ও সাহায্য সমিতি গড়ে তোলেন।

আর A Play of Giants এর মধ্যে তৎকালীন সেন্ট্রাল আফ্রিকার বুকাসা, উগাণ্ডার আমিণের ছায়া খুঁজে নিতে কষ্ট হয়না নির্মম নিষ্ঠুর অশিক্ষিত এই সব ডিকটেটরদের ভাষা অকথ্যভাবে গ্রাম্য, নিজেই বিচার করেন, নিজেই পিস্তল তুলে দোষীকে গুলি করেন। সর্বত্র তার আমিত্বের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য সতর্কতা। এঁরা আর্তের ক্রন্দনকে বিলাস সংগীত হিসাবে ব্যবহার করে।

কবিতায় সোইংকার ব্যক্তিত্ব একটু নতুন ধরণের স্বাতন্ত্র্যতার আলোকপাত করে। তিনি তাঁর বক্তব্যকে বর্ণনা মুখর করে তোলেন, অথচ ভাষার সংযম এবং শব্দের গুরুভার তাঁর কবিতাকে দেয় এক পরম গাম্ভীর্য। তাঁর এই প্রকাশ রীতির দক্ষতার সঙ্গে 'যদি পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে সাযুয্য খুঁজতে হয়, তবে ইংরেজ কবি ডোনে (Donne), মার্ভেল (Marvell) এবং সেক্সপীয়রের নাম উল্লেখ করা শ্রেয়'—এই কথা বলেন' সুইডেনের (স্টকহলম) ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক যোইয়ান মিউব্যার্গ। তার কবিতা সংকলনের মধ্যে নাম করা যেতে পারে Idanre, Poems from Prison, A shuttle in the crypt, এবং Ogun Abibiman.

Idanre—এক তীর্থভ্রমণ—ভগবান ওগুন এর পর্বত শৃঙ্গে। পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে কবি জনজীবনে উৎপাদন, সমৃদ্ধি, দুঃখ, আনন্দ ধ্বংশ ও মৃত্যুর বর্ণনা করেছেন। এই বইটিতে একটি কবিতা আছে,

যার বর্ণনা একটি মোরগের চলন্ত গাড়িতে ধাক্কা খেয়ে মৃত্যুকে নিয়ে। 'মোরগ' আফ্রিকার লোক সংস্কৃতির এক উৎসর্গকৃত প্রাণী। অর্থাৎ দেবতার নামে বলি দেওয়া হয় মোরগ। এ যেন আধুনিক যন্ত্র সভ্যতায় দেবতা ও গুণের ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রতীক।

কারাগারের কবিতা (Poems from Prison) কবিতাগুলো সোইংকার কারাবাসের সময় লেখা, চোরাপথে কারাগার থেকে বেরকরে নিয়ে এসে প্রকাশ করা। কবিতাগুলির মধ্যে রাজনৈতিক রূঢ় সত্যের বর্ণনা। শাস্তি ও প্রতিবাদের কবিতাও আছে সেই বইটিতে। একটি কবিতায় আছে—'এখানে ফুলের বদলে মৃত্যুর বীজ বপন করে। বন্দীদের উপর অত্যাচার, জীবন্ত কবর দেওয়া হয় মানুষকে তাঁর নিঃসঙ্গ কারাকক্ষে।

Ogun Abibiman—একটি ঐতিহাসিক কবিতার বই। বইটির প্রচ্ছদে অঙ্কিত আছে গণদেবতা ওগুন এর কুঠারের চিত্র। এই বইটি সোইংকা লেখেন মোসম্বিকের (১৯৭৬) তৎকালীন শ্বেতাঙ্গ রোডেসিয়া সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকে স্মরণ করে।

ওগুন সেখানকার যুদ্ধের দেবতা। কালো আফ্রিকার স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার যুদ্ধের স্বপক্ষে লেখা সোইংকার এই বইটি সেদিন অনেক প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল।

তাই সোইংকা মনে করেন, নোবেল পুরস্কার তাঁর কাছে আজ অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ।—এই পুরস্কার তাঁর কণ্ঠকে আফ্রিকার স্বাধীকার অর্জনের আন্দোলনে আরো জোরদার করে তুলবে।

পুরস্কার বনাম অমিয়ভূষণ মজুমদার

দেবী রায়

সহৃদয় অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত একদা লিখেছিলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কবিতায়: 'আরো উঞ্চতা রাখুন, আমায় পাঠক হিসেবে বেছে নিন'—যদি তাঁর লেখা নতুন উপন্যাসে/পঁচিশ পাতার পরেও মন না আসে ইস্তফা দিয়ে মননের সন্ন্যাসে/আদিবাসীদের সঙ্গে সহজ যুক্তাক্ষরে মেতে যাবো ঝুমচাষে (সহৃদয়)।' এ স্পষ্ট স্বীকারোক্তি, বোধ করি তাঁর-ই পক্ষে মানায়। একি ছিলো শুধুই স্বীকারোক্তি? না, পাঠকের প্রতি তাঁর কোনো তির্যক-খেদ? কিংবা আবছায়া নিরন্তর কোনো সুতীব্র অভিমান?

অমিয়ভূষণ একদা জানিয়েছিলেন যে, তিনি বাংলা পড়লে কবিতা-ই পড়েন। তাঁর ধারণা বহু ধারণার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে যে, সত্যি-ই খুব ভালো উচ্চাঙ্গের কবিতা লেখা হচ্ছে বাংলাভাষায়, যা নিয়ে গর্ব করা যায়, সাহিত্যের এই একটি মাত্র শাখাকে নিয়ে বেদনাদায়ক হলেও একথা সত্য। এমন নয় যে, অমিয়ভূষণ গল্প কবিতা পড়ার চেষ্টা করেন না বা করেননি, কিন্তু তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ যে, টানে-না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। পরিবেশ দূষণ মুক্ত শিল্প-সাহিত্যের সমঝদার—এই কংক্রিট শহরের এরিনার বাহিরেও রয়ে

গেছে এক সুবিশাল দেশ, যা অনেকাংশে-ই অনাদৃত, অবহেলিত এটা আমরা মাঝে মাঝেই বিস্মৃত হতে চাই; কিন্তু আমাদের এই বৈসাদৃশ্য-আচরণ কেন? এটা কি আমাদের এক ধরণের স্বার্থান্ধ - একলষেঁড়েপনা নয়? অমিয়ভূষণ মজুমদার অমুক পত্রিকায় কি তমুক নিত্য-প্রভাতীর সঙ্গে জীবিকাসূত্রে যুক্ত নন অথচ লাভ করলেন অভাবনীয় বঙ্কিম পুরস্কার। এতো বুকে শেল। বহু নেত্র ই তাই বঙ্কিম হয়ে যায়! রক্তিম হয়ে যায়! যেন কেউ ছুঁড়ে দিলেন ভীমরুলের চাকে কাঠি। আমরা ক্রমশই হারিয়ে ফেলছি সত্য-কথনের সাহস বা অভ্যাস। কারো বইয়ের সমলোচনা করার অর্থ-ই, কোনো কোনো লেখক ঠাওরে নেন যে, তাঁকে সমালোচনা করা হচ্ছে। বাংলা সমালোচনার ক্ষতিকর আরো একটা অন্যতম দিক হচ্ছে তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতম বিষয়গুলিকে বড়ো বেশি ফাঁপানো হয়। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মাঝের পর্দাটা উড়িয়ে দেওয়াও এর এক অন্যতম কারণ হতে পারে। এ এক বিপজ্জনক পথ। [কিছু সাহসী ব্যতিক্রমও নিশ্চয় আছেন, তাঁরা শ্রদ্ধেয় নিশ্চয়] হতেই পারে কোনো কোনো সম্পাদকের একটা হলুদ প্রবণতার প্রতি পরোক্ষ উৎসাহ, থাকা-ও সম্ভব ঐকান্তিক কোনো গূঢ়-উদ্দেশ্য! নচেৎ, বহুজনের-ই আজকাল ধারনা একটা শক্ত-ভিত্ পাচ্ছে উপন্যাসের নামে বাজারে যা হড়হড়িয়ে বেরোয় তা তো একধরণের ফোলানো-ফাঁপানো-ওড়ানো কাহিনীর স্কীমেটিক খবর ই। সন্তোষকুমার ঘোষের ভাষায় বলতে পারা যায় এতো উপন্যাস প্রসবের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। অবশ্য, এটা এক ব্যতিক্রম দৃষ্টান্তও হতে পারে।

দেবেশ রায় যথার্থ-ই লেখেন 'অমিয়ভূষণ এতটাই বিরল চরিত্রের লেখক যে তাঁকে উপন্যাসিক বললে অনেক-কে বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করতে হয়, হ্যাঁ, তিনিও উপন্যাস লিখেছেন বটে, বা কেউ কেউ একটু বিহ্বলও হয়ে পড়েন।' আবার কেউ কেউ ভাবতে বা বলতে আরম্ভ করেন এভাবে যে 'বিক্রীর সংখ্যা...' একটা কথা আমরা যেন বিস্মৃত না হই যে, কয়েকটি শহর বেড়িয়ে, দেখে একটা পুরো দেশের উন্নতির বিচার ভুল, প্রহসন। দৃষ্টি ঘুরিয়ে রাখার এ এক অপ-কৌশল! আর এক সময়ের তুখোড় বিজ্ঞাপন বা আর্থিক বা চেয়ারের-খ্যাতি কি ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে হেঁটে যাওয়া নয়? বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায় একটা সময় তারকা বিশেষ, জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ছিলেন—কিন্তু আজ কোথায় দামোদর মুখোপাধ্যায়? বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর সংস্করণ কেন আজো আমরা সংগ্রহ করি? কেন শরৎচন্দ্র তাক থেকে নামিয়ে, লাইব্রেরী থেকে এনে পড়তে থাকি গৃহদাহ, শ্রীকান্ত চরিত্রের এ্যাডভেঞ্চার বা বোহেমিনিয়াজিম কেন? কেন? কেন দেবদাসের পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করি মনে মনে বলিল, মুখে কহিল... এসব আমাদেরি ভেবে দেখতে হবে বৈকি। মিডিয়া যাকে বাঘ বানাচ্ছে, পোষাকের আড়ালে সে নিছক ভু'পেয়ে। নাভানা-র প্রয়াত গোপালচন্দ্র রায় যে দুঃসাহস দেখিয়ে ছিলেন 'গড় শ্রী খণ্ড' প্রকাশ করে, নতুন লেখক সৃষ্টির কথা মনে রেখে আমাদের প্রিয় প্রকাশকগণ দু'চারটি নজির স্থাপন করবেন এ আশা আমরা আজো মনে মনে লালন করি। পঞ্চাশটি অধিক বিক্রীর পাশাপাশি ব্যতিক্রম-পাঁচটি বইয়ের কাটতি না হয় একটু দীর্ঘস্থায়ী-ই হলো। তৈরির দায়িত্ব যদি আমরা না নিই, তবে ভবিষ্যৎ-প্রজন্ম আমাদের কি চোখে দেখবে সেকথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। সামাজিক দায় ও দায়িত্বের প্রসঙ্গও রয়ে যায়! ধরা যাক, অরুণা প্রকাশনীর বিকাশ বাগচী যদি অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'রাজনগর' উপন্যাসটি ছাপার জন্য এগিয়ে না আসতেন? ভাবতে বড়ো ভয় হয়। একজন কবি বা লেখক বা শিল্পী

শুধুমাত্র মহাকালের কথা স্মরণ রেখে তাঁর সমস্ত কাজ নিশ্চয় ড্রয়ারে চাবিবদ্ধ করে রেখে যেতে পারেননা। তাঁকেও অন্বেষণ করে ফিরতে হয় পৃষ্ঠপোষক, সম্পাদক ও সহৃদয়-প্রকাশক। একজন কবি-লেখক-শিল্পী জীবনের সঙ্গে রিফ্যুজিজীবনের খুব একটা ফারাক নেই। উভয়কে-ই খুঁজে বেড়াতে হয় কোনো নির্ভরশীল আশ্রয়, একথা বেদনা-দায়ক হলেও নিষ্ঠুর সত্য। কিন্তু, এই নির্ভরতা যেন গলার ফাঁস না হয়ে ওঠে! খবরের কাগজ, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করুন ভালো কথা, তাঁদের বহুৎ বহুৎ শুক্রিয়া—কিন্তু, বাংলা সাহিত্যের সে অর্থে কোনো অভিভাবক নেই, ফলে এই শূন্যচেয়ারটির প্রতি দৃষ্টি বহু জনের-ই—কিন্তু, দিক নির্দেশক-অভিভাবকত্বের-চেয়ারে সবাইকে নিশ্চয় মানায়না।

সুদূর কুচবিহারে বসে অমিয়ভূষণ মজুমদার কিভাবে যে এতকাল লিখে গেলেন এই একটি মাত্র কারণে-ই তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। ●

সংবাদ

○ লিটল ম্যাগাজিনের শারদ প্রদর্শনী

৮ই নভেম্বর থেকে ১১ই নভেম্বর পর্যন্ত চারদিনব্যাপী লিটল ম্যাগাজিনের শারদীয়া সংখ্যা, রবীন্দ্র ও বিশেষ সংখ্যার একটি সুন্দর প্রদর্শনী জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রভারতীর প্রদর্শনী কক্ষে ও প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজক লিটিল ম্যাগাজিন সম্পাদক সমিতির এটি তৃতীয় বার্ষিক আয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের যে.লটি জেলা থেকে ৫০০'র বেশি লিটল ম্যাগাজিন প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। আসাম, উড়িষ্যা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও বাংলা দেশ থেকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনগুলিও প্রদর্শনীতে দেখা যায়। পত্র পত্রিকা ছাড়া ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য পত্রিকা ও আধুনিক কালের পত্রিকার ধারাবাহিক ১০০টি মূল কপির ছবি প্রদর্শনীর আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। এর মধ্যে দিগদর্শন, সমাচার দর্পন, সংবাদ প্রভাকর, বঙ্গদর্শন, বামাবোধিনী প্রভৃতি থেকে সবুজপত্র, কল্লোল, কালিকলম, চতুরঙ্গ, কৃত্তিবাসের মত পত্রিকাও আছে। অতীতদুর্লভ দর্শনীয় বস্তু হিসেবে দর্শকদের আকর্ষণ করে।

৮ই নভেম্বর শনিবার প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রী শ্রীপ্রভাস ফদিকার প্রদর্শনীর আয়োজনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, সুস্থ রুচি ও চিন্তা চেতনার ব্যাপক প্রসারে এই ধরনের প্রদর্শনীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এই প্রদর্শনী বিশেষ সহায়ক হবে আমার বিশ্বাস। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সৌজন্যে রবীন্দ্রনাথের পূজারিণী, দুই বিঘা জমি ও শুভা চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

৯ই নভেম্বর রবিবার প্রদর্শনী প্রাঙ্গণে কবিতা পাঠের আসর বসে। কবি গৌরাঙ্গ ভৌমিক সভাপতিত্ব করেন। ৫০ জন কবি স্ব-রচিত কবিতা পাঠ করেন।

১০ই নভেম্বর সোমবার প্রদর্শনী প্রাঙ্গণে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীঅনিলকুমার দত্তের পৌরোহিত্যে লিটল ম্যাগাজিনের নানান সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকেরা আলোচনায় তাদের বক্তব্য রাখেন। সমিতির পক্ষ থেকে অপূর্বকুমার সাহা সকলের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ দেন

ও জনসাধারণ এবং ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহে প্রদর্শনীর মেয়াদ একদিন বাড়িয়ে মঙ্গলবার ১১ নভেম্বর পর্যন্ত খোলা রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

এবারে প্রদর্শনী প্রাঙ্গণে একটি বিক্রয় কাউণ্টার খোলা হয়, তাতে প্রতিদিন বহু ক্রেতাকে আগ্রহের সঙ্গে পত্রিকা কিনতে দেখা যায়।

সমিতির সম্পাদক নবকুমার শীল সমাপ্তি দিবসে জানান যে, এই প্রদর্শনী আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে আসানসোল ও দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত হবে। পরে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় প্রদর্শনীটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে।

○ পিতাম্বরের স্বর্গলাভ : ডাক্তারদের অভিনয়

শত ব্যস্ততার মধ্যেও ভদ্রেশ্বরের ডাক্তারেরা মহৎ কিছু কাজের ডাক পেলেই এগিয়ে আসেন। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা: জ্ঞানাঞ্জন দাস তাঁর স্বর্গত: পিতৃদেব মন্মথনাথ দাসের স্মৃতি-রক্ষার্থে যে শিশু হাসপাতালটি করার উদ্যোগ নিয়েছেন তারই অর্থ সাহায্যের জন্য ভদ্রেশ্বর অঞ্চলের ডাক্তার এবং তাঁদের শ্রীমতীরা সম্প্রতি ভদ্রেশ্বর রবীন্দ্র মঞ্চে অভিনয় করলেন 'পিতাম্বরের স্বর্গলাভ'।

নাটকটি বহু বোদ্ধা ও সাধারণ মানুষকে তৃপ্তি দিতে পেরেছে—এ কথা সেদিনের নাটকে উপস্থিত মানুষদের আলোচনা থেকে জানা যায়। বিভিন্ন চরিত্রে সফল অভিনয় করেন ডা: সমীর দত্ত, ডা: বৈদ্যনাথ শ্রীমানী, ডা: জ্ঞানাঞ্জন দাস, ডা: অখিল মজুমদার, ডা: বলাই দাস, ডা: অমিত মিত্র, শিখা মিত্র, বীণা দত্ত, ভারতী দাস, রঞ্জনা দাস, লতা মিত্র, কুসুম মজুমদার ও হরেণ দাস।

অনুষ্ঠানে গানে ও সঙ্গতে ছিলেন : শ্রীমতী জলি দত্ত, কুমারী কাকলী মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, সুখেন ব্যানার্জী ও কুমারী কুসুম ত্রিপাঠি।

○ নিখিলবঙ্গ লিটল ম্যাগাজিন প্রদর্শনী

গত ১৬ থেকে ২২শে নভেম্বর ধনিয়াখালীর দীপন গোষ্ঠির পরিচালনায় স্থানীয় মামুদপুর রাসমেলায় নিখিলবঙ্গ লিটল ম্যাগাজিন প্রদর্শনী (৫ম বর্ষ) আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীটিতে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রকাশিত সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষি, বিজ্ঞান বিষয়ক মোট চারশত পত্র-পত্রিকা প্রদর্শিত হয়। এ ছাড়াও দীপন গোষ্ঠির পক্ষ থেকে স্থানীয় ঘনরাজপুর রাসমেলায় জাতীয় সংহতি, পরিবেশদূষণ, জনস্বাস্থ্য, সমাজভিত্তিক বনসৃজন প্রভৃতি বিষয়ের আকর্ষণীয় পোষ্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য উক্ত প্রদর্শনী দুটি স্থানীয় জনমানসে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করে।

○ হুগলী জেলা বইমেলা এবার শ্রীরামপুরে

হুগলী জেলা বই মেলা (১৯৮৭) মহকুমা শহর শ্রীরামপুরে আয়োজিত হবে বলে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। আগামী ২১শে জানুয়ারী থেকে ২৯শে জানুয়ারী শ্রীরামপুর গান্ধী ময়দানে এই বই মেলা অনুষ্ঠিত হবে।

○ শরৎ স্মৃতিধন্য হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে সার্ধ-শত বার্ষিকী উৎসবের প্রস্তুতি

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের কৈশোরের বিদ্যালয় হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উৎসব আগামী বর্ষের ফেব্রুয়ারী মাসে উদ্‌যাপিত হবে। বিগত ১৯৮৪ সালেই বিদ্যালয় সার্ধশতবর্ষের গণ্ডী অতিক্রম করেছে। কিন্তু অনিবার্য কারণে ঐ সময় কোন উৎসবানুষ্ঠানের আয়োজন করতে সক্ষম হননি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এগিয়ে চলার নয় বছর

শিক্ষা ও সংস্কৃতির নতুন পথ

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষার প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্বলাভ করল। ৪২,৮৮১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৫৯ লক্ষ ৯১ হাজার ছাত্র সংখ্যা থেকে গত নয় বছরে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে ৪২,৮৮১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ছাত্র সংখ্যা ৮০ লক্ষ ৪১ হাজার। এই সময়ে তফসিলী ও আদিবাসী ছাত্র বেড়েছে যথাক্রমে ১ লক্ষ ২০ হাজার ও ৪৪ হাজার। ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্য-পুস্তক বণ্টন করা হচ্ছে। বিনামূল্যে জলখাবার পাচ্ছে ৩২ লক্ষ ছাত্র ছাত্রী। গ্রামীণ এলাকায় সকল তফসিলী ও আদিবাসী ছাত্রী ও শতকরা ২৫ ভাগ অন্য ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পোশাক বিতরণ করা হচ্ছে। গত নয় বছরে ২৫00টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে অথবা জুনিয়ার বিদ্যালয়কে হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়েছে। ১৯৭৭ সালে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের সুযোগ ছিল ৭৪১টি বিদ্যালয়ে এবং ১৪৬টি কলেজে। বর্তমানে ১১১৯টি বিদ্যালয় ও ২৬৮টি কলেজে এই সুযোগ রয়েছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতিসাধন করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষায় বঞ্চিত শিশুদের জন্য ১৮,২৬০ট বিধিমুক্ত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। উচ্চ-শিক্ষা প্রচারের জন্য খোলা হয়েছে ৫টির ওপর নতুন কলেজ এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৮৬-৮৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের জন্য শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করেছেন ৬৩৬ কোটি টাকা। প্রতিবছর শিক্ষার জন্য মাথা-পিছু ব্যয় পশ্চিমবঙ্গে—১০৮ টাকা, কেন্দ্রীয় সরকারের—৮·৭৫ টাকা। বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের ২৩ শতাংশ রাজ্য সরকার শিক্ষাখাতে ব্যয় করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই বরাদ্দ বাজেটের মাত্র ১·২ শতাংশ।

এছাড়া শিক্ষালাভের সুযোগ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রসারিত করার জন্য গত নয় বছরে ১৭৬১টি নতুন গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হয়েছে। ১৯৭৭ সালে ৭৬২টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে রাজ্যে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ২৫২৩টি। উৎসাহী ক্রেতার কাছে ভাল বই পৌঁছে দেবার জন্য সরকারী সাহায্যে রাজ্য পর্যায়ে ১৬টি গ্রন্থমেলা হয়েছে সম্পূর্ণ, সরকারী উদ্যোগেও একটি বইমেলা হয়েছে। গবেষক উৎসাহী পাঠক এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রেখে সরকার একটি আধুনিকতম গ্রন্থপঞ্জীর মুদ্রণ ও প্রকাশনের কাজে হাত দিয়েছেন।

সুস্থ সংস্কৃতি প্রসারে ও লোকসংস্কৃতির ধারাকে চলিষ্ণু রাখার স্বার্থে অনেকগুলি প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে। দুঃস্থ শিল্পীদের আর্থিক সাহায্যদান ও সাহিত্য প্রকাশনায় অনুদান প্রদান এগুলির অন্যতম। শিল্প সঙ্গীত ও নাটকের ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে অবনীন্দ্র, আলাউদ্দিন ও দীনবন্ধু পুরস্কার। নেপালী সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে ভানুভক্ত পুরস্কার। এছাড়া স্থাপিত হয়েছে নেপালী, বাংলা ও উর্দু আকাদেমী এবং সঙ্গীত আকাদেমী। আদিবাসী মানুষের কৃষ্টিকে রক্ষা করতে গড়ে তোলা হয়েছে উপজাতি সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র—সিউড়ি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও আলিপুরদুয়ারে। চলচ্চিত্রকে উন্নতমানের করার জন্য স্থাপিত হয়েছে একটি কালার ফিল্ম ল্যাবরেটরি এবং প্রেক্ষাগৃহ ও কৃষ্টিকেন্দ্র "নন্দন"। উত্তর কলকাতায় স্থাপিত হয়েছে গিরিশ মঞ্চ।

সবাইকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির অঙ্গনকে কলুষমুক্ত রাখার জন্য আজ আমাদের একতাবদ্ধ হবার দিন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

4057 (4) HD/ICA dated 9.12.86 (জেলা তথ্য দপ্তর, হুগলী কর্তৃক প্রচারিত)

Member—All India Small & Medium News Paper Association, Delhi.
GODHULI-MONE N. P. Regd. No. RN. 27214/75 December '86 (অগ্রহায়ণ '৯৩)
Vol. 28, No. 12 Postal Regd. No. Hys-14 Price—Rs. 2·00 only
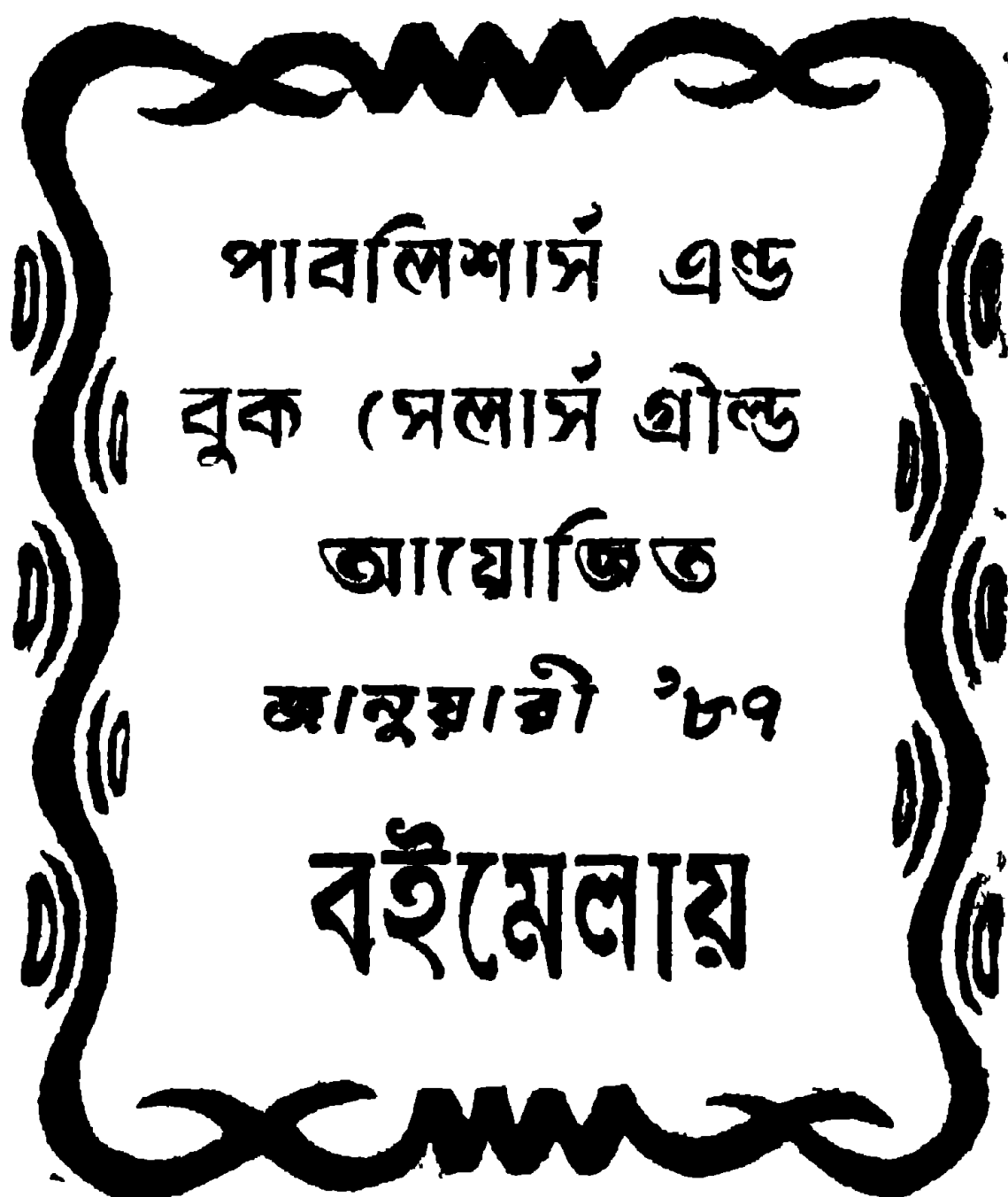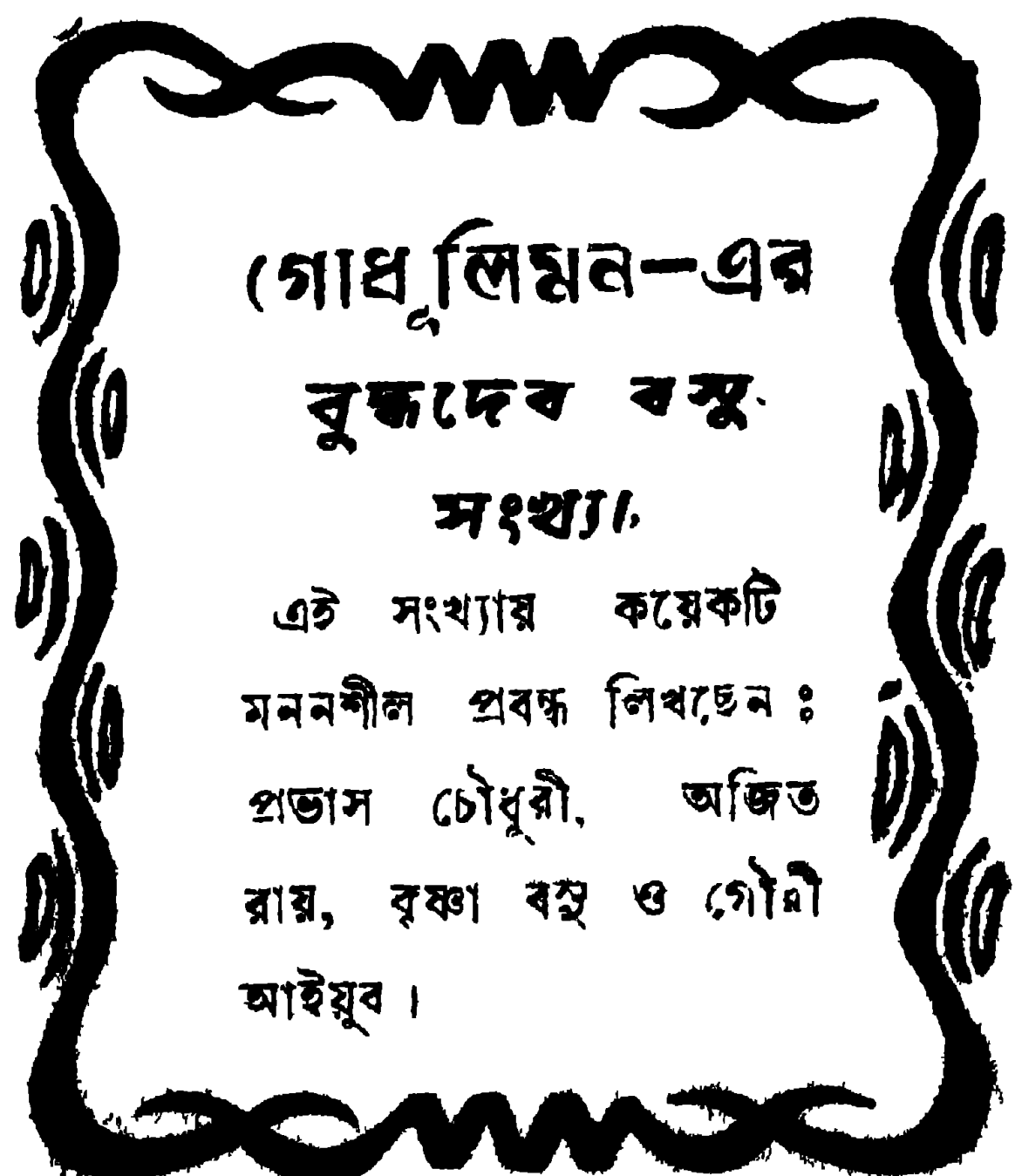
সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পপুলার প্রিন্টার্স, বারাসত, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও

গোধূলি মন

এই সংখ্যায় :

প্রচ্ছদ শিল্পী : সৌম্যেন অধিকারী (শান্তিনিকেতন)

বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা

পৌষ-মাঘ/[illegible]

O প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন O

O আমার বিভিন্ন রচনা নিয়ে 'গোধূলি মনের চিঠিপত্র বিভাগে একাধিক বার বিতর্কের ঝড় দেখা দিয়েছে। এর ওপর যথোচিত গুরুত্ব দেওয়ার জন্যে আমি গোধূলিমনের কর্মঠ, যোগ্য সম্পাদক, শ্রদ্ধেয় কবি শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ এবং অপামর বোদ্ধা পাঠক-পাঠিকার কাছেও সমরূপ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি। তাঁদের ভালোবাসা ও সহমর্মিতার কথা আমি হয়তো আর বিস্মৃত হতে পারবো না।

একটা গণ্ডগোল আমি সেই 'পরিবর্ত্তনে' লেখার সময় থেকেই টের পাচ্ছি, যে, বেশির ভাগ পাঠক সমালোচকই আমার বক্তব্য-বিষয়ের মূল ধরে টানাটানি করেন না। মাংসটা বাদ দিয়ে শুধু ছাল চামড়া-লোম নিয়ে হম্বিতম্বি। এই ভুল বিজ্ঞ বোদ্ধা পাঠকও করে ফেলছেন। সম্প্রতি আমার একটি রচনায় 'রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে স্পর্দ্ধা' দেখে মাননীয় জ্যোতির্ময় বসু আমাকে 'নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার' রায় দিলে আমি উপর্যুপরি বিস্মিত ও দুঃখিত হয়েছি।

প্রথমেই বলি, রবীন্দ্রনাথ আমার পরমশ্রদ্ধেয়ই শুধু নন—পরমপ্রিয় লেখকও বটে। বিশেষত তাঁর গদ্যে আমি নতমস্তক। 'গদ্যকাব্যে অতি নিরূপিত ছন্দের ··' ইত্যাদি উদ্ধৃরণ আমি তাঁর 'অধ্যাপক' গল্পে পেয়েছি। এবং আমি মনে করি - এটা আমার প্রতিপাদ্য বিষয়ের নিরীখে খুব একটা অসঙ্গত বা বিকৃত নয়। 'তাঁকে বজায় রেখেই...' ইত্যাদি আমার বক্তব্য নয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। জ্যোতির্ময় বাবুর রবীন্দ্রপাঠ কতদূর তা আমি জানি না কিন্তু তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিই অন্যত্র এবং এই পত্রিকায় একাধিক গদ্যে আমি রবি ঠাকুরের প্রতি প্রয়োজনবোধে শ্রদ্ধাই জ্ঞাপন করেছি, ঘৃণা বা অবজ্ঞা নয়। ঔদ্ধত্য যদি কোথাও প্রকাশ পেয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে, সেটা একান্ত সজাগ ও সচেতনভাবেই পেয়েছে; এবং তার জন্যে আমি অনুতপ্ত নই। আর তাতে সাহিত্যিক সদাচার' লজ্জিত হবে বলে মনেও করি না।

মনে করি, শ্রীবসু আমার রচনারীতির দ্বারা পরিচিত নন। সবিনয়ে তাঁকে অনুরোধ সেটা একটু খতিয়ে দেখুন। কোনো মন্তব্য করার আগে চালুনিতে খুদ-কুড়ো বাদ দিয়ে এবং যথেষ্ট পরিমাণ যুক্তি ও তথ্য মজুত রেখেই যে তা করি এটা বোধ করি আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের অনেকদিন আগেই জানা হয়ে গেছে।

গোধূলি মনের পাঠক-পাঠিকা ভুল করে আমার পুরনো ঠিকানায় আর যেন চিঠি না দেন। নতুন ঠিকানা দিলুম।

অজিত রায়
ZERO-POINT
Etwari Nagar, Telipara, Hirapur
Dhanbad-826 001

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি মন

২৯ বর্ষ/১ম সংখ্যা
জানুয়ারী/১৯৮৭
পৌষ/১৩৯৩
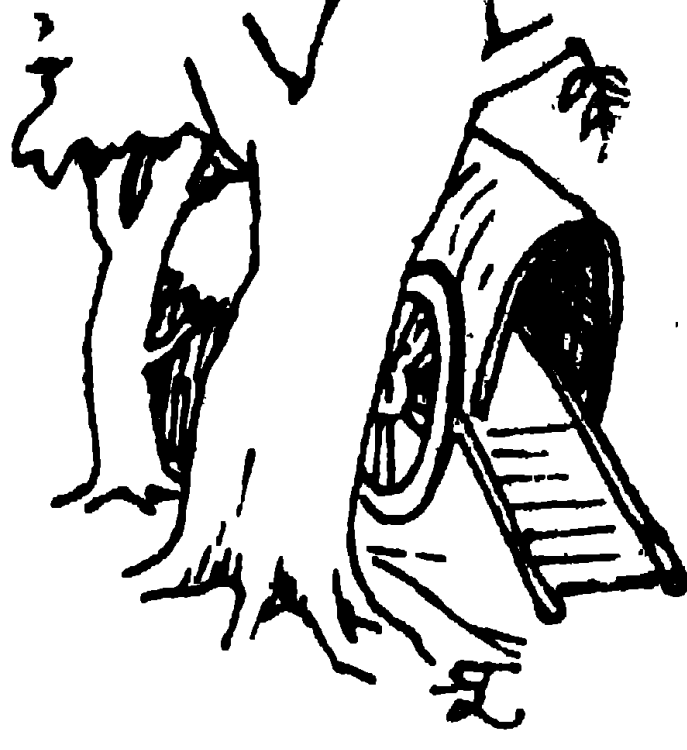
প্রতি সংখ্যা দুই টাকা
বার্ষিক সডাক কুড়ি টাকা

অলোক চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক

সম্পাদকীয়

॥ বুদ্ধদেব বসু সুজনেষু ॥

একদিকে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা
তাই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ থেকে
উঠে এসেছে তোমার কবিতার মানব মানবী ;
অন্যদিকে বিদেশী সাহিত্য থেকে আত্মিকরণ করে
সমৃদ্ধ করেছো তুমি আমাদের ভাষার সাম্রাজ্য
স্ব-নির্বাসিত নির্জন দ্বীপের মধ্যে তুমি আর
অগাধ চুলের মধ্যে ডুবে থাকা তোমার নায়িকা
স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে কেটে গেল একটা জীবন ।
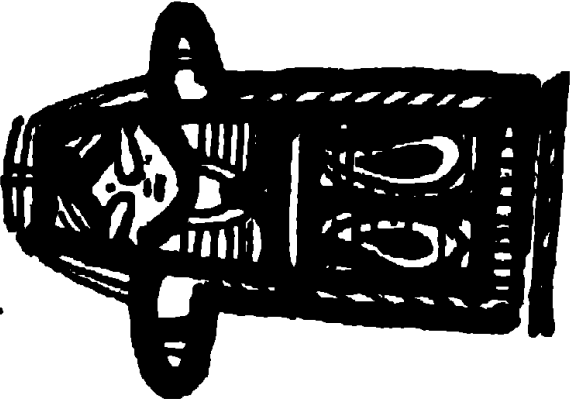
বুদ্ধদেবের কবিকৃতি

প্রভাসচন্দ্র চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমনা, বাক্‌পতি। তিনি বিশ্বকবি। তাঁকে কিন্তু আধুনিকদের মনে হয়েছে একান্তরূপে ভারতীয়। প্যারিসে বা বুয়েনার্স আয়ার্সে বসে কবিতা লিখলেও তাঁর ভারতীয়ত্বের অবসান ঘটে না। আধুনিকেরা স্বীকার করেন রবীন্দ্রের উত্তরাধিকার। তাঁরা এও জানেন যে 'The poem which is absolutely original is absolutely bad... True originality is merely development. তাঁরা বিশ্বাস করেন যে প্রচলিত কাব্য-সংস্কারকে নতুন তাৎপর্য দানের মধ্যেই আছে কবিতার মৌলিকত্ব। রবীন্দ্রনাথকে 'ট্রাফিক আইল্যাণ্ড' বা 'আলো-জ্বলা অন্তিম রেস্তোরাঁ' মনে হলেও তাঁরা দূরে সরে থাকতে চেয়েছেন কবিগুরুর মোহময় হাতছানি থেকে। তাঁদের ধারণায় রবীন্দ্রনাথ বড্ড বেশী গতানুগতিক। তাঁর জীবন যেন 'gig lamps symetrically arranged, a semi-transparant envelope'। তাঁর কবিতার পটভূমিতে আছে ঔপনিষদিক অরণ্য, কিংবা নদী-মাতৃক বাংলার অতি পরিচিত নিসর্গ। জীবনের জ্বালা যন্ত্রণায় ব্যথিত হননি তিনি। দারিদ্র স্পর্শ করেনি তাঁকে। সমাজের প্রচলিত রীতিনিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি তাঁর জীবনে। যা সবচেয়ে পীড়িত করেছে আধুনিকদের তা হোল তাঁর নিরুত্তাপ নিস্তরঙ্গ জীবন। সংরাগের তীব্রতা তাতে অপ্রত্যক্ষ। তাঁর কোন পংক্তি আঘাত করেনা হাতুড়ির মতো। আধুনিকদের বাধ্য হয়ে অন্বেষণ করতে হয়েছে নতুন আর্ট ফর্ম যা রাবীন্দ্রিক নয় অথচ তন্বী বাংলা কবিতার কমনীয় দেহকে করে তুলবে পেশল। রোম্যান্টিকদের ভাল লাগেনি বলে এলিয়ট আশ্রয় নিয়েছিলেন পোপ ও ড্রাইডেনে। আধুনিক বাঙ্গালী কবিরা কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করলেন বোদলেয়র, রিলকে, মালার্মে, হেল্ডার্লিন থেকে। রবীন্দ্রনাথের আওতা থেকে বাংলা কবিতাকে যাঁরা নতুন আলোকে নিয়ে এলেন বুদ্ধদেব বসু তাঁদেরই সহযাত্রী। উত্তর-রৈবিক কাব্য-আন্দোলনের সারথি তিনি। 'কবিতা' তাঁর গাণ্ডীব। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সুতীক্ষ্ণ শায়কগুলি সবচেয়ে বেশী নিক্ষিপ্ত হয়েছে তাঁরই ধনুক থেকে। সুতরাং

কাব্যালোচনার প্রাক্কালে উপযুক্ত আলোচনা স্মরণ রাখা অত্যন্ত জরুরি।

বুদ্ধদেবের প্রথম কাব্য "মর্মবাণী"। নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এই কাব্যটি নষ্ট হয়েছে কৈশোরিক আবেগে। সে কারণে তাকে আমাদের আলোচনার বাইরে রাখতে চাই। "বন্দীর বন্দনা" তাঁর প্রথম সার্থক সৃষ্টি। এটি কবির নব-যৌবনের প্রথম প্রেম-কাব্য। বুদ্ধদেব প্রেমের কবি। দেহকে বাদ দিয়ে দেহাতীতের জয়গানে মুখরিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কামের ভিত্তিতে বুদ্ধদেব প্রতিষ্ঠা করলেন প্রেমের—দেহ হোল প্রেমের আলয়। ওয়াল্ট হুইটম্যান ডি, এইচ, লরেন্সের মহিমান্বিত যৌনতা মুগ্ধ করেছিল তাঁকে। তিনি কখনো লরেন্সের 'Crystalisation of sex', কখনো বা হুইটম্যানের পেশল দেহচেতনা—'The love of the body of a man or woman balks account, the body itself balks account, That the male is perfect, that the female is perfect'—এর দ্বারা প্রভাবিত। ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাস বলেছিলেন, 'আমি ভালবাসি অস্থিমাংস সহ'। মোহিতলাল বলেছিলেন 'দেহই অমৃত ঘট', উপলব্ধি করেছিলেন সৃষ্টির মূলে কামের অস্তিত্ব। ক্লাসিক 'ডিকশনে'র চাপে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে মোহিতলালের দেহতত্ত্বের গান। অন্যদিকে, আধুনিক কাব্যে—আন্দোলনের পুরোধা বুদ্ধদেব চমৎকার করে ফুটিয়ে তুলেছেন দেহকেন্দ্রিক নিলনরত্তস, কায়াকান্তির আসবমত্ততা। লরেন্সের মত তিনি হয়ত ভেবেছিলেন—

> Sex isn't sin, ah no! Sex isnt' sin,
> nor is dirty, not until the dirty mind
> pokesin.

'মানুষ' শীর্ষক সনেটে কবি স্পষ্ট বলেছেন—

> যেখানে পেতেছে কাম আপনার স্বর্ণ-সিংহাসন
> রক্তবর্ণ পঙ্কফুল ফুলে রয় যে-কল্প উদ্যানে ;—
> যেথায় স্ফুরিছে নাসা কটিলগ্ন স্বেদের আঘ্রাণে,
> বাতাসে ভাসিছে যেথা জন্মবীজ, রতি-সম্মোহন :
> আমি সেথা গিয়েছিনু সন্ধ্যাবেলা—প্রলুব্ধ,
> অস্থির।

আসঙ্গ-বাসনা পঙ্গু আমি সেই নিলজ্জ কামুক। তরঙ্গিত দেহগঙ্গানীরে অবগাহন করলেন তিনি। সেখানে আকাশ নেই, সেখানে তারা ফোটে না। কটুগন্ধ অন্ধকারে কবি শুধলেন বিধাতার দেনা। কিন্তু দেনাশোধের পর কবির চিত্তে জাগে অনুশোচনা। ধিক্কার দেন তিনি নিজেকে ঘৃণারজনক কদর্যতাকে আলিঙ্গন করার জন্য। বলেন—

> মোরে দিয়ে বিধাতার এই শুধু ছিলো প্রয়োজন ;
> স্রষ্টা শুধু এই চাহে, এ বীভৎস ইন্দ্রিয়মিলন—
> নির্বিচারে প্রাণী সৃষ্টি ক'রে থাকে যেমন পশুরা।

মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কেবলমাত্র কাম চরিতার্থ করে বংশবিস্তার করার মধ্যে নেই তার কর্তব্যের পরিসমাপ্তি। সারস্বতকুঞ্জের মালাকার সে—'বিধাতারও চেয়ে বড়ো—শক্তিমান, আরো সে মহান'। জীর্ণপাতার স্পর্শে আছে নারী মাংসের চেয়েও সুখ, প্রেমের অক্ষয় গ্রন্থিতে আছে পরিপূর্ণতা। সৃষ্টিলীলাকে অস্বীকার করেন না কবি। কারণ এই লীলার মধ্যেই মানুষ আবিষ্কার করে প্রেমের সৌন্দর্য্য। প্রবৃত্তির দাস কবি যে কাব্য রচনা করবেন—এ ইচ্ছা বিধাতার ইচ্ছাকে অবজ্ঞা করে। এটাই কবির বিদ্রোহ, এটাই কবির মৌলিকত্ব। নির্মম বিধাতা কবিকে চিরতরে বন্দী করে রেখেছে 'প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে'। কোথাও নেই মুক্তির ইসারা। চতুর্দিকে অদৃশ্য বাধা নিশিদিন রোধ করেছে কবির জীবনের গতি। জীবনের নিত্য অভিসারে সে বন্ধন চলে কবির সাথে 'সুন্দরের মন্দিরের পানে'। এই বন্ধন দশায় কবির অবস্থা—

বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বাসনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষ বর্ষ উপবাসী
শৃঙ্গার কামনা

রমণীরমণ-রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি ;—আনন্দনন্দিত দেহে কবি অনুভব করেন কামনার কুৎসিৎ দংশন। প্রেমের জ্যোতির্ময় রূপের উপাসক তিনি। নিজের জ্যোতিহীন অন্ধকারা থেকে তিনি গেয়ে ওঠেন প্রেমের বন্দনা সংগীত। কৃমিঘন সাগরে অবস্থান করেও তাঁর আছে সুধার তৃষ্ণা ক্ষুদ্র হস্ত শৃঙ্খলিত হলেও মাঝে মাঝে তা' 'উধাও আগ্রহভরে উর্ধ্বনভে উঠিবারে চায়। অসীমের নীলিমারে জড়াইতে ব্যগ্র আলিঙ্গনে'। কুৎসিৎ কামকে কবি পবিত্রিত করেছেন জ্যোতির্ময় প্রেমে। পংক থেকে জন্ম নিয়েছে পংকজ। কবি 'অমৃতাভিলাষী' অর্থাৎ কবির সেই রবীন্দ্র প্রেমতত্ত্বে আত্মনিমজ্জন। যৌবনের উচ্ছ্বসিত সিন্ধুতটভূমে বসে আছেন তিনি। প্রভাত সূর্যের রশ্মিতে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন কামনার বহ্নি' 'স্বপনের সলজ্জ বিকাশ'। পরিপার্শ্বের কুশ্রী আবেষ্টনী পীড়িত করেছে তাঁকে। তিনি লক্ষ্য করেছেন, নিত্য নব অমঙ্গল নিভিয়ে দেয় পুজার প্রদীপ, তার হিম স্পর্শে ঝরে পড়ে অস্ফুট শেফালিকা। কবি এই কদর্য আবেষ্টনীর মাঝে নিজেকে পাশব সত্বার সম্মুখীন হয়েছেন। শূন্যতায় হাহাকার করে কবির দৈন্যভরা গৃহ তিনি উপলব্ধি করেন—'যৌবন আমার অভিশাপ'। জৈবিক কামনার কুৎসিৎ দংশন ও পরিপার্শ্বের সৌন্দর্যহীনতায় সাময়িকভাবে পীড়িত হলেও অসুন্দরের মধ্যেই তিনি সন্ধান করেন সৌন্দর্যের জগৎ। তিনি অনুভব করেন—'শাপভ্রষ্ট দেবশিশু আমি'। তাই আকাশের উদার নীলিমা আকণ্ঠ পান করার দুর্নিবার আগ্রহে কবির নয়ন দেহের বন্ধন ছিঁড়ে উড়ে যেতে চায় বন্দী-যুগ বিহঙ্গের মতো।

কোন কোন কবিতায় প্রবল হয়ে উঠেছে খৈয়ামীয় দেহাত্মচেতনা, গভীর হয়েছে মোহিতলালের প্রভাব। দেহই সৌন্দর্যের অধিষ্ঠান। আর কামনা আছে বলেই দেহের এই আকর্ষণ। তাই বুদ্ধদেব বলেন 'এই দেহ সত্য শুধু, সত্য এই রক্তের পিপাসা'। মোহিতলাল বলেছিলেন, 'সত্য শুধু কামনাই', বুদ্ধদেব বললেন, 'একমাত্র কামনা অমর'। নগ্নদেহা নারীকে কবির বিস্ময় মনে হয়না, মনে হয়

কবির কল্পনা নহ, চিরন্তন অশ্লীলতা
তুমি বিধাতার,
অনঙ্গবিহারভূমি, তুমি মূর্তি মর্ত কামনার।

তান্ত্রিক মোহিতলালের চোখে নারী 'স্বৈরিণী' হলেও 'নিত্যশুদ্ধা'। সে সতীও নয়, অসতীও নয়। বুদ্ধদেবের নারী 'জন্ম অসতী'। নারীর দেহসুরা পান করার আহ্বান জানিয়েছিলেন মোহিতলাল। তাঁরই অনুসরণে বুদ্ধদেব বললেন—

এসো কাছে, পৃথিবীর সকল সুন্দরী,
বিষতৃষ্ণা নিবারিবো তোমাদের
তীব্র দেহমদ্য পান করি।

নারীর কাছে তিনি পেতে চেয়েছেন ক্ষণিক উত্তেজনা। এক গণ্ডুষে দেহকে পান করে নেবার বাসনা তাঁর। নারীর কিছুই দেবার নেই তাঁকে, কারণ নারী 'শরীর সর্বস্ব'। কবি চতুর্দিকে প্রত্যক্ষ করেছেন নির্বোধ নারীর পাল

চর্ম সাথে চর্মের ঘর্ষণ
একমাত্র সুখ যাহাদের, সন্তানের স্তন্যদান,
উচ্চতম স্বর্গলাভ……

বুদ্ধদেব প্রেমের কবি। সে প্রেম কল্পযুক্ত ফলে। ভাল বাসতে পারেন এমন নারী জগতে দেখেননি তিনি। অসিতের লাবণ্য, সুচরিতা, গড়ুইনদুহিতা, আবেলার্দ-প্রিয়া বা ব্যাবেট স্বপ্নলোকের সৌন্দর্যময়ী নারী। বাস্তবে তাদের অন্বেষণ বৃথা।

বাস্তব জগতে কবি যাদের দেখেন তারা স্থূল মাংস সর্বস্ব। বাস্তবে প্রেমময়ী নারীকে প্রত্যক্ষ না করতে পারাটাই হোল কবির 'রোম্যান্টিক এ্যাগণি'। তিনি চান না

> বিম্বাধর, কৃশ কটি, করভোরু, প্রশস্ত জঘন,
> আশ্চর্যযুগল স্তন, কৃষ্ণকেশ আমধ্যলুণ্ঠিত,
> কুসুমকোমল ত্বক আরক্ত মাংসের আচ্ছাদন,
> মধ্যরাত্রে রতিক্রীড়া জ্যোৎস্নাধৌত পুষ্পশয্যা—
> 'পরে—

এই সব নারীর দেহ-বিপণীতে কবি চান না ক্রেতা হতে, দেহ শ্মশানের ভষ্ম অঙ্গে মেখে চান না অনঙ্গের স্তব করতে। কারণ কবির প্রিয়তমা হোল 'অগ্নিকল্পা কবিতাকল্পনা'। দেহ সর্বস্ব নারী কি তাহলে হতে পারেনা ভালবাসার পাত্রী? সৌন্দর্য তো নিরালম্ব নয়। দেহকে আশ্রয় করেই তো তা' অবস্থান করে। তাই সৌন্দর্যমুগ্ধ কবি সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী নারীকে ভালবেসেছেন দূর থেকে, যেমন ক'রে টিপটিপ শিশির ঝরা নীরবে ভালবাসে 'রাতের ধূসর মাঠে নিরিবিলি বটের পাতারা'। কবিতা হোল কবির প্রিয়া। কবির আশা তিনি তপস্যাবলে সৃষ্টি করতে পারবেন এক নতুন পৃথিবী। নিজেকে তিনি তুলনা করেছেন সিন্ধুবিহঙ্গমের সঙ্গে যার বাসা সমুদ্রের তুষারধবল গিরিশৃঙ্গে। বাস্তবের কুশ্রীতা থেকে বিমুক্ত হয়ে রোম্যান্টিক কল্পলোকে অধিষ্ঠান—কবির রোম্যান্টিক বিলাস মাত্র।

জীবনানন্দের প্রেমিকা যেমন 'বনলতা সেন' অজিত দত্তের যেমন 'মালতী' বুদ্ধদেবের প্রেমিকারা তেমনি বিভিন্ন নামে অভিহিত—' 'কঙ্কাবতী', 'অমিতা', 'অপর্ণা', 'মৈত্রেয়ী', 'রমা' প্রভৃতি। কঙ্কাবতীর ননীর শরীরের অন্তরালে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন কুৎসিৎ কঙ্কাল। ধার করা বিত্তে কবির লোভ নেই। তাতে ঋণের বোঝা বেড়ে চলবে প্রতিদিন আর সেই ঋণ শোধের জন্য খুলে ফেলতে হবে দ্রৌপদীর সব শাড়ি। কবি জানেন যে লজ্জার আবরণে ঢাকা সুন্দর নারী মূর্তির অন্তরালে লুকানো দেহসৌন্দর্য লাবণ্য হারিয়ে ফেলবে, যেদিন কবি মুক্ত করে নেবেন আপনার কটিতট 'পার্শ্বস্থ জানুর দৃঢ় আকুঞ্চন থেকে'। অপর্ণার জীবনে কবির আবির্ভাব শত্রু রূপে। সরল হৃদয়ে অপর্ণা প্রেম নিবেদন করেছিলেন তাঁকে। বুঝতে পারেনি সে তাঁর গোপন বাসনা। কবি উন্মোচিত করেছেন তাঁর মানস অভিসন্ধি। কবির কায়াহীন বুভুক্ষু অধরে নিঃশেষিত হবে তার হৃদয়ের রক্ত। তার বসন্তভুবনে সঞ্চারিত করবেন কবি শত শত অমঙ্গল জীব। তার ফুল হবে ভষ্ম, শস্যের ভাণ্ডার হবে শূন্য। কবি হবেন তার মৃত্যুর কারণ। নির্মম আশ্লেষ নিপীড়নে তাকে কবি নিষ্পেষিত করেন—

> শীতান্তে বসন্ত যথা দীর্ঘ-উপবাসী অজগর
> চূর্ণ চূর্ণ করি, ফেলে অরণ্যের ভীরু হরিণীরে
> ক্ষুধিত বেষ্টনে।

কবির ক্ষুধিত আবেষ্টনী থেকে মুক্তি নেই অপর্ণার। যুগ যুগ ধরে তাকে নিপীড়িত হতে হবে কবির বলিষ্ঠ আলিঙ্গনে। মৈত্রেয়ীকে কবি সর্বসমক্ষে বধূরূপে বরণ করতে চেয়েছেন। ক্ষণিকস্পর্শে তাকে দিয়েছিলেন 'ইন্দ্রতুল্য অনিন্দিত জ্যোতি' তিনি জানেন যে কেবল তাঁর ভালবাসাই সুন্দর করে তুলবে তাঁকে। প্রেমিকাকে কবি টেনে আনতে চেয়েছিলেন প্রাত্যহিকতার তুচ্ছতায়। কিন্তু বাস্তবের রূঢ় স্পর্শে, নিকটতম সান্নিধ্যের ক্লান্তিতে মরে যেত প্রেম, প্রেমিকার অপরূপ সৌন্দর্য প্রতিমা হোত অন্তর্হিত, প্রেমিকা কেবল চেয়েছে তাঁর কল্পনা ও তারকার জ্যোতি হয়ে বিরাজ করতে। তাতেই কবি-হৃদয়ে চির-অমলিন হয়ে থাকবে তার ভাস্বতীরূপ। চিরকালীন 'প্রিয়া' হয়ে বেঁচে থাকতে চান তিনি, চান না হাজার প্রয়োজনের পুঞ্জিত জঞ্জালে মিশে থাকতে। 'অমিতার প্রেম'-এ

কবি সামান্য একটু ভালবাসার কাঙাল। কিন্তু কবির হেন জ্যোতি নেই যা' দিয়ে তিনি জয় করতে পারেন অমিতাকে, যদিও তিনি জানেন, পাপের সমস্ত দাগ ধুয়ে মুছে যাবে প্রেমের শুচিস্নানে। অমিতার ভালবাসার স্পর্শে কবি লাভ করবেন নবজীবন। হীন জন্মা পঙ্ককীট রূপান্তরিত হবে সহস্রদল পদ্মে। মিথ্যে করেও যদি অমিতা একবার কবিকে বলে, 'ভালোবাসি', তাহলেও ধন্য হবেন তিনি, ফিরে পাবেন নিজেকে। একটি অস্ফুট মিথ্যা বাঁচিয়ে দেবে তাঁকে, একটি অণৃত ভাষণই সত্য হয়ে থাকবে তাঁর জীবনে, আর তাকেই পাথেয় করে নতুন করে বাঁচবেন তিনি। যে প্রেম ছিল 'জীবনঅধিক' তা আজ প্রৌঢ় হয়ে গেল। বসন্তের মাতাল করা বাতাস একদিন পরাজিত করেছিল কবিকে। তিনি ধরা দিয়েছিলেন নারীর বাহুপাশে। বসন্তের অবসানে আজ কবি বসে আছেন ক্ষুদ্র বাতায়নে। মদনের তীক্ষ্ণ শায়কে আজ আর মদনের জ্বালা নেই। বাদল আঁধারে তাই জ্বলে কবির স্বপ্ন—দীপান্বিতা। বিজয়িনী প্রিয়া আজ পরাজিত।

"বন্দীর বন্দনা"র কবি বুদ্ধদেব ক্ষণবাদী—ক্ষণকেই অমর করতে চেয়েছেন তিনি। প্রিয়ার সঙ্গে তাঁর ক্ষণিক মিলনকে চিরন্তন করেছেন তিনি মিথ্যা দিয়ে, মোহ দিয়ে। ক্ষণিকের স্বর্গসুখ ছিন্ন করে এনেছেন তিনি দেবতার ভাণ্ড হতে'। আশাবাদী কবি পোষণ করেছেন ঘর বাঁধার সীমাহীন আকাঙ্খা। অসীম কালস্রোতকে তিনি চেয়েছেন একটি মুহূর্তের মধ্যে বন্দী করে রাখতে। কিন্তু কলস্বনা তটিনীর প্রবাহকে স্তব্ধ করে দেবার মন্ত্র জানা নেই তাঁর। কাল বয়ে চলবে তির তির করে আর কবি একা বেদনার কূলে পড়ে থেকে পদ্মগুলি ভাসিয়ে দেবেন একে একে। তবে বেদনায় কবিচিত্ত আর্তনাদ করেনি, বরং ক্ষণিক যৌবন বেলার সঙ্গীদের প্রতি কবি প্রকাশ করেছেন অফুরন্ত ভালবাসা। না পাওয়ার ব্যথা নেই তাঁর মনে। 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না'—এমন এক রাবীন্দ্রিক ক্ষোভ, অশ্রুত "বন্দীর বন্দনা"য়। অচিন্ত্যনীয় প্রশংসা পেয়েছিল পাঠকের। রবীন্দ্রনাথকেও বলতে হয়েছিল—'এই রচনাগুলি জলভরা ঘন মেঘের মতো যার ভিতর থেকে সূর্যের আলোর রক্তরশ্মি বিচ্ছুরিত'।

"কঙ্কাবতী" কবির তৃতীয় কাব্য। বন্দীর বন্দনা'য় কবির বাহন ছিল তার প্রধান পয়ার ছন্দ। "কঙ্কাবতী"তে কবি আশ্রয় করলেন ধ্বনি প্রধান ছন্দকে। এখানেও কবি প্রেমের অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী ('সেরিনাড')। তিনি বিশ্বাস করেন যে মৃত্যুর পরেও থাকে প্রেমের অস্তিত্ব, স্মৃতি। আবার তাঁর কখনো কখনো মনে হয়েছে প্রেমে বঞ্চনাও আছে। তাই তাঁর 'সদুপদেশ'—

প্রেমের মতো জীবনে আর বিড়ম্বনা নাই,
এমন হৃদিরঞ্জনও নেই, এই কথাটাও মানি।
অনেক দেখে অনেক ঠকে' বুঝেছি নিশ্চয়
দিন-রজনীর সকল সময় প্রেমের সময় নয়।

প্রেমিকাকে একান্ত সান্নিধ্যে কামনা করেছেন কবি। সাদা আকাশে যখন আঁধার নামবে, কালো আঁধার নামবে লাল আকাশ ছেয়ে, সন্ধ্যা তারা চেয়ে থাকবে কবির মুখের পানে, উতল গানে যখন জাগবে রাতের হাওয়া, তখন আসবে কবির প্রিয়া ঘন নীলাম্বরী গায়ে জড়িয়ে। দয়িতের উষ্ণ সান্নিধ্যে কবির জাগবে ইন্দ্রিয়ানুভূতি। প্রবল চুম্বনে, রূপের মোহে, গভীর স্নেহে, ভরা যৌবনে কবিকে সে ভালবেসেছে তার জন্য কবি আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছেন ঈশ্বরের নিকট। সকল মেয়ের প্রেম যার মাঝে সেই ভালবেসেছে কবিকে। সে নারীর নয়নে কামনা, অধরে অমৃত, পরশে মিনতি, আঁখি-কোণে বাসনার গুঞ্জরণ, দৃষ্টিতে দুরাশা। ভালবাসা তার করতলে, পদতলে, বাহুতে, আঙুলে। এহেন নারীর বক্ষের যুগ্ম আগ্নেয়গিরিকে কবি চেকে

দিয়েছেন চুম্বনের ছাপে, যেখানে মৃত্যুহীন প্রেম কাঁপে রাত্রিদিন, দেহজ প্রেমকে স্বীকার করেননি কবি। কামের ভিত্তিতে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন প্রেমকে।

> লাল ঠোঁটে, কালো চুল, তুষারের মতো শাদা বাহু,
> মর্মর-মসৃন জানু, মুঠি-ভরা ছোটো দুটি স্তন,
> শরীরের পাত্র ভরি' শরীরের উচ্ছ্বসিত সুরা—

এ সব কিছুই নয়। এ সব তুচ্ছ হয়ে যায় প্রেমিকের কাছে, যখন সে প্রিয়ার চকিত স্পর্শে অনুভব করে 'অসহ্য বিদ্যুৎ' আর বিরহের মধ্যে অনুভব করে 'শৃঙ্গারের উন্মাদনা'। 'শরীরের সংকীর্ণ সীমায়' অসীম তৃষ্ণার কান্না দেখে কবি অপরিসীম বাসনা, তৃপ্তিহীন তৃষ্ণাকে বলেছেন, 'মৃত্যু' আর স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন 'কিছুই প্রেমের মতো নয়'। তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন প্রেমকে উপহাস করার জন্য। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে বিদ্রূপই প্রেমের স্তবগান। কারণ, প্রেমে বঞ্চিত ব্যক্তি মেতে ওঠে বিদ্রোহের উন্মত্ত উল্লাসে। তাই পরাজিত শত্রুর অসুস্থ আত্মায় অমৃতের স্পর্শ দেবার প্রার্থনা করেছেন তিনি।

কঙ্কাবতী কবির মনোলোকের প্রিয়া। কঙ্কাময় হয়ে গেছে কবির জীবন। নিয়ত তিনি স্বপ্ন দেখেন তার। মনে হয়, রাত্রির মত, মৃত্যুর মত কঙ্কার চুল জড়িয়ে গেছে তাঁর হৃদয়ে। তিনি আহ্বান জানিয়েছেন কঙ্কাকে—সে যেন শঙ্কাহীন চিত্তে চলে আসে কবির কাছে—'যেখানে সময় সীমাহীন, সময় ছিন্ন বিরহে কাঁপেনা রাত্রিদিন'। কবির রিক্তপ্রাণে মৃত তটরেখায় কূলভাঙা বন্যার অকল্পিত কলোচ্ছ্বাসে আবির্ভূত হয়েছিল কঙ্কা। কবি-জীবনের স্তম্ভিত শূন্যতা ভরে গিয়েছিল ছন্দের ললিত মাধুর্যে। তরঙ্গের শীর্ষভাগে জ্বলে উঠেছিল লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের বিচূর্ণিত রজোকণা। আজ আশ্বিনের দুর্বার আকর্ষণে অন্তর্হিত হোল শ্রাবণের মত্তস্রোত। যৌবনের ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি ঢাকা পড়ল প্রৌঢ়ত্বের শুষ্ক ত্বকে। কিন্তু স্মৃতি তো মরেনি। কঙ্কার আবির্ভাব ঘটেছিল বলেই না এত আকাশজোড়া নক্ষত্র ঝংকার, গানের এত বিচিত্র সমারোহ! তার গোপন প্রাণবীজ রিক্ততাকে রাঙিয়ে দিয়েছে বাণীর মঞ্জরী হয়ে। "কঙ্কাবতী" কাব্যটির বিভিন্ন স্থানে পুণরুক্তি দোষ ধরেছেন সম-সাময়িক কবি জীবনানন্দ। একথা অনস্বীকার্য যে "কথায় অজস্র ডালপালার ভিড়ে আবেগ চাপা পড়ে পাখা মেলতে পারেনি"। আর শুধু 'কঙ্কাবতী' কেন, বুদ্ধদেবের বহু কবিতা রসসৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে কেবল ঐ ডালপালার বাহুল্যে। এর কারণ হোল—কল্পনা যখন কবিকে ত্যাগ করেছে তখনো তিনি থামতে দেননি তাঁর লেখণীকে। তাঁর শেষ পর্যায়ের কাব্য-গুলির নীরসতার কারণই হোল ঐ কলমের ওপর অত্যাচার।

"কঙ্কাবতী"র প্রেমের মায়াকুহেলি অন্তর্হিত "নতুন পাতা"তে। এখানে কবি প্রেমের স্বপ্নলোক থেকে নেমে এসেছেন দেহজ প্রেমের অভ্যর্থনায়। রক্তমাংসের মিলনেই ঘটে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক পরিচয়। নর-নারীর সংগম ক্রিয়ার মধ্যেই কবি খুঁজে পেলেন প্রেমের চরম পরিতৃপ্তি। সংগমের মধ্যে ঘটে পুরাতন সত্বার অবলোপ, নতুন সত্বার আবির্ভাব। পৃথিবীর অন্তর্লীন আগুনের চাপে যেন ভেঙে যাচ্ছে। আর কবি উপলব্ধি করেছেন—'একি আশ্চর্য মৃত্যু। একি আশ্চর্য নতুন জন্ম'। অন্যত্রও বলেছেন, 'একি অসহ্য মৃত্যু একি উজ্জ্বল, অলজ্জ নব জন্ম!' প্রকাশ পেয়েছে কবির দেহসম্ভোগের সংযমহীন কামনা—

> তোমার উত্তাপ সঞ্চারিত হোক আমার রক্তে।
> তোমার অন্ধকারের নির্মম নিষ্পেষণে
> আমি যে উষ্ণ সুরার মতো ঝ'রে ঝ'রে পড়ি
> তোমার নিভৃত পাত্রে
> বিন্দু বিন্দু ক'রে
> নিঃশেষে।

গোধূলি-মন পৌষ/১৩৯৩/নয়

এছাড়া উল্লেখযোগ্য কবিকৃতি নেই কাব্যটিতে। অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে পারি—"হৃদয় বৃত্তির ঝাঁঝ লক্ষ করেছি বুদ্ধদেব বাবুর অন্য কবিতার বইয়ে, শরীরমনের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে তীব্র বলবার চেষ্টা, এতে শোনা যায় কম। সূক্ষ্ম মন প্রতিহত হয় আহুত না হয়ে—অর্থাৎ বাস্তবিকতা রোধ করে অব্যবহিত বোধকে যা ব্যঞ্জনার ভিতর দিয়েই প্রকট হওয়া সম্ভব'। "নতুন পাতা"র স্থূলতায় আধিক্য পীড়া দেয় রসিক মাত্রকেই।

রবীন্দ্রনাথের "পুনশ্চ" কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গদ্যকাব্যের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছিল আধুনিক কবিদের। কবিগুরুর গদ্যকবিতায় ঋজু উপস্থাপনা ও সমৃদ্ধ প্রকরণ মুগ্ধ করে বুদ্ধদেবকেও। প্রকট হয়ে ওঠে গদ্যছন্দের প্রতি তাঁর মোহজনিত দুর্বলতা। ১৯৩৫ সালে লেখা একটি চিঠিতে গদ্যছন্দ সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে, "এর অবাধ মুক্তি—এবং সেই মুক্তির সঙ্গে-সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম তাল ও মাত্রা অনেককেই আকর্ষণ করে।" ছন্দমিলের সীমাবদ্ধতা থেকে কাব্যকে মুক্ত করে বুদ্ধদেব গদ্য কবিতা রচনায় ব্রতী হলেন "দময়ন্তী"তে। তিনি আশ্রয় করলেন কথ্যভাষা ও কাব্যছন্দের। বাক্‌ছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দের মিলন ঘটানো ছিল তাঁর সাধনা। ছয়টি অনুশাসন তিনি মেনে চলতে চেয়েছিলেন বর্তমান কাব্যটি রচনা কালে। সেই নিয়ম সূত্রগুলি হোল—

১। বাক্য বিন্যাসের মৌখিকরীতি থেকে তিনি বিচ্যুত হবেন না ;

২। সাধু ভাষার ক্রিয়াপদ ব্যবহার করবেন না ;

৩। 'ফুটি', 'চলিছে', 'হতেছে' প্রভৃতি কাব্যিক ক্রিয়াপদ বর্জন করবেন ;

৪। কাব্যিক শব্দকে (যেমন 'মম', 'মোদের', 'তব', 'আঁধার' ইত্যাদি) কবি বয়কট করবেন।

৫। চলতি বাংলা শব্দের তৎসম প্রতিশব্দ (যেমন 'হস্ত', 'তরু', 'পুষ্প' ইত্যাদি) এড়িয়ে চলবেন ;

৬। উপভাষার পদ (যেমন, 'এণু', 'নারি' ইত্যাদি) অচল।

অবশ্য কবি যে সর্বক্ষেত্রে এই নীতিগুলি অনুসরণ করতে পারেননি, সে কথা স্বীকার করেছেন নির্দ্বিধায়। তাঁর মতে, 'দময়ন্তী'র বেশীর ভাগ কবিতা পয়ার জাতীয় ছন্দে রচিত, গদ্যকবিতা একটিও নেই কাব্যটিতে। প্রথম কবিতা 'দময়ন্তী'তে আছে প্রেম ও স্নেহ এবং বাৎসল্য ও শৃঙ্গার রসের যুগপৎ উপস্থিতি। কবি এতে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর প্রেমতত্ত্ব। কবি আজ প্রৌঢ়, বিগত যৌবন। তাঁর যৌবন ফিরে এসেছে তাঁর কন্যার দেহে। এইভাবে যৌবনের রূপান্তর ঘটে অতীত থেকে বর্তমানে, বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে। পুরাণের দময়ন্তীর পাণিপ্রার্থী ছিলেন স্বয়ং মহেন্দ্র, অযোনিজ অগ্নি এবং কালান্তক যম। কবির কন্যার যৌবনেও উপস্থিত হবে দেবতার আহ্বান, যেদিন তার শরীর মুঞ্জরিত হবে পুঞ্জ, পুঞ্জ বসন্তের মথিত অমৃতে। যৌবনবতী কন্যা দময়ন্তী স্বর্গকে প্রত্যাখান করে' বরণ করে মর্তকে। কারণ সে জানে—'যে প্রনয়/বিবসন, বিশুদ্ধ জান্তব/মৃত্যু নেই তার'। প্রেমের শুধু রূপান্তর আছে, আছে আয়ুর সর্পিল সোপানে নব-জীবনের অঙ্গীকার।

যে-মুহূর্তে বাসনা বিহ্বল নীবি
খ'সে পড়ে, দেখা দেয় কালের প্রলয়-জলে
সর্বঘ্ন তিমির-তলে অলজ্জ ব-দ্বীপ,
অমনি থমকে কাল।......

প্রেমের 'আদিম মহিমা' দময়ন্তীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কবি। তাঁর দাম্ভিক যৌবন সূর্যকে মনে করেছিল তার 'সম্ভোগের পথের প্রদীপ'। কবি তাকে অপেক্ষায় বিনীত হতে বলেছেন, শিখিয়েছেন 'ধৈর্যের নীরবতা'। 'হে কাল' কবিতায় কবি যৌবনের ব্যাকুল বৈকালকে স্তব্ধ করে দিতে বলেছেন কালের

'নির্মম প্রহরে' ঘনস্মৃতিমেদুরভাবে 'স্তম্ভিত বিষন্ন ছায়া' আনতে বলেছেন 'উচ্ছ্বলিত হৃদয়-হ্রদের' পরে। প্রৌঢ় বয়সেও কবির 'শরীর যেন মুঞ্জরিত হ'তে চায় আকাশে জ্যোৎস্নাতে'। তাঁর মনে হয়েছে যৌবন 'নির্মম'। কারণ কুৎসিৎকেও মনোরম করে' তোলে যৌবন। আবরণহীন, আভরণহীন ভিখারিণী, আবর্জনার স্তূপে যার বাস, কামনাবাসনা যার বিলাস মাত্র, তারও দেহে জাগে যৌবনের জোয়ার। সে যুবতী—এই তার অভিশাপ। "দময়ন্তীর"র যুগে আমরা পাই মহাযুদ্ধের বিভীষিকার চিত্র। মহাযুদ্ধের সার্বিক ধ্বংসস্তূপের চিত্র রচনা করেছেন টি, এস, ওলিয়ট তাঁর "পোড়ো জমি"তে—

A heap of broken images, where the sun
beats,
And the dead tree gives no shelter, the
cricket no relief
And the dry stone no sound of water.

বুদ্ধদেব বসুও তাঁর প্রেয়সীকে অন্বেষণ করেছেন

উন্মত্ত মৃত্যুর
শানিত কুক্কুর দন্তে ; বিষবাষ্পে দুর্গন্ধ আবিল
অন্ধকারে ; নির্বীজ পাষাণে, প্রান্তরের
অকর্ষিত শূন্যতায়, সংঘ হিংসার
লেলিহান ধ্বংসে।

ধ্বংসের তাণ্ডবরূপ কবির মানস–ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল যুদ্ধের প্রাকমুহূর্তেই। সমালোচক ঠিকই বলেছেন, "দময়ন্তী'তে বুদ্ধদেব বহির্জগতের সমস্যায় উদ্বিগ্ন, শ্রেণী-বৈষম্যে ব্যথিত, কল্পনাকে কর্মরথে যুক্ত করতে উৎসুক"। [৫]

পরবর্তী কাব্য "দ্রৌপদীর শাড়ি" বৈশিষ্টে উজ্জ্বল। আকাশের গায়ে দ্রৌপদীর শাড়ির মত মেঘের আবরণ হরণ করে' নেয় ঝটিকা-দুঃশাসন। এই ব্যঞ্জনার অভিব্যক্তি 'দ্রৌপদীর শাড়ি' কবিতায়, চল্লিশের প্রান্তে এসে কবির ধ্যান ভেঙেছে যে তাঁর প্রেমপাত্রী আদৌ আসেনি তাঁর কাছে। তিনি দেখলেন, তাঁর বাসা ভেঙেগেছে, আছে কেবল ভাষা আর ভালোবাসা। শিলার বলেছেন যে 'নাইভ' লেখকেরা প্রকৃতির সমধর্মী। আর বৈদগ্ধ্য প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র করে রাখে 'সেন্টিমেন্টাল' লেখকদের। বুদ্ধদেব 'সেন্টিমেন্টাল' কবি। প্রকৃতির বস্তুকণাকে শিল্পমণ্ডিত করেছেন তিনি। 'রূপান্তর'এর উৎসর্গ কবিতায় কবি এক বস্তুকে কল্পনার অভিব্যঞ্জনায় রূপান্তরিত করেছেন আরেক বস্তুতে। তিনি বলেছেন—

ধাতুর সংঘর্ষে জাগো, হে সুন্দর, শুভ্র অগ্নিশিখা,
বস্তুপুঞ্জ বায়ু হোক, চাঁদ হোক নারী,
মৃত্তিকার ফুল হোক আকাশের তারা।

ক্ষণিকার অম্লান ক্ষমায় কবি মুক্তি দিতে চেয়েছেন চিরন্তনকে। ব্রাউনিংয়ের মত তিনি চেয়েছেন ক্ষণিককে চিরন্তন করতে। তাঁর কামনা—

দেহ হোক মন, মন হোক প্রাণ, প্রাণ হোক মৃত্যুর
সংগম
মৃত্যু হোক দেহ, প্রাণ, মন।

শিল্পতাত্ত্বিক বুদ্ধদেব সংকীর্ণ আলোর চক্রে মগ্ন হতে বলেছেন মায়াবী টেবিলে'। আবার 'কার্তিকের কবিতা'য় অস্বীকার করেছেন এই শিল্পতত্ত্বকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, "দ্রৌপদীর শাড়ী"তে প্রেম নারী–দেহের আশ্রয় ত্যাগ করে রূপান্তরিত হয়েছে একটি বিশুদ্ধ ভাবনায়, প্রকাশ ঘটেছে কবির শিল্প নৈপুণ্যেরও। "দ্রৌপদীর শাড়ি" থেকেই তাঁর কাব্যে মিতব্যয়ী ভাবভাষার নিগূঢ় সামঞ্জস্য দেখা দিয়েছে, সঙ্গীতময় প্রবহমানতার সঙ্গে মিলিত হয়েছে রেখাচিত্রময় ভাষার আশ্চর্য সংহতি গুণ। [৬] ১৯৪৪ থেকে ৪৭–এর মধ্যে লেখা এই কাব্যের কবিতাগুলি আত্মমুখী, রোম্যান্টিকতায় ভরপুর। সত্যি কথা বলতে কি তাঁর ভাল কবিতা লেখা হয়েছে এই পর্বেই।

"শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর" কবির যৌবন প্রান্তের কাব্য। কবির এখন মধ্যতিরিশ। যৌবন ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে, কপালের বলিরেখায় স্পৃষ্ট হচ্ছে কালের প্রহার। কবির সবই সুন্দর মনে হয়েছিল যখন তিনি ভেসে গেছলেন উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উন্মত্ততায়। মোহাঞ্জন আচ্ছন্ন করেছিল কবির দৃষ্টিকে। বন্যা যখন প্রশমিত হোল, পলি যখন থিতিয়ে এল, তখন স্বচ্ছ সলিলের মধ্যে কবি অবলোকন করলেন জীবনের গভীরতা। যৌবনের উদ্দাম চাঞ্চল্য আর নেই, প্রৌঢ়ত্বের প্রশান্তিতে কবির চোখে ধরা পড়েছে—

যৌবন রাজ্যের সবই যে ভালো তা নয়।

সমসাময়িককালে রচিত "উত্তর তিরিশ" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "বেঁচেছি। যৌবনের জলরাশি পার হ'য়ে এসেছি, প্রৌঢ়ত্বের শান্ত দিগন্ত দেখা যাচ্ছে চোখের সামনে"। অথচ তাঁকেই আবার বলতে শুনি—

বার্ধক্যভূমি চোখ ভোলায়ণ,
সে রিক্ত, সে শুভ্র, সে অকিঞ্চন।
তাঁর গৌরব গিরি চূড়ার স্তব্ধতায়
ঠাণ্ডা আকাশের কঠিন নির্লিপ্ত নীলিমায় তার মহিমা।

'মৃত্যুর পরে : জন্মের আগে' বর্তমান কাব্যটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা। প্রথম জীবনে কবি বন্দনা করেছেন যৌবনের। ভরা যৌবনকে অভ্যর্থনা করেছেন তিনি, আবার বিদায়কালীন যৌবনের বন্দনাতে তাঁর আলস্য আসেনি। আজ প্রৌঢ় জীবনের আগমণে কবি অস্তগামী যৌবনের স্মৃতি-গুঞ্জরণে ব্যস্ত। 'দময়ন্তী'তে কন্যার যৌবনের মধ্যে নিজেকে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন আর এখানে কবি বললেন—

সন্তানের যৌবনের তাপে রোদ্দুর পোহায় পিতা
তরুণী নাৎনির তাতে মাতামহী হাত সেঁকে নেন।

কবি যৌবনের পুরোহিত, জননশক্তির নন। তাঁর কোন পৌত্তলিক কামনা নেই। যৌবনের তৃপ্তিহীন স্তব আছে তাঁর কবিতায়, নেই স্তাবকতা। তাঁর প্রার্থনা—

যা-কিছু লিখেছি আমি—হোক যৌবনের স্তব, অন্ধ জৈব
আনন্দের বন্দনা হোক না—
যা কিছু লিখেছি, সব, সবই ভালোবাসার কবিতা,...

কবিতাকে ভালবেসে তিনি ভালবেসেছেন নারীকে, তাঁর হৃদয়ে কবিতা হয়েছে প্রেম, প্রেম হয়েছে কবিতা। যৌবনের অস্তগমনে কবির ভ্রষ্টস্বর্গের অনুশোচনা। অকালবার্ধক্যপীড়িত তারুণ্যের একটা হাহাকার শ্রুত হয় "শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর" কাব্যটিতে। কবি চিরকালই যৌবনের উপাসক। যৌবন যেন যেতে গিয়েও যায় না, থমকে দাঁড়িয়ে গেছে তাঁর জীবনে। তাই 'পঞ্চাশের প্রান্তে' ("যে আঁধার আলোর অধিক") গিয়েও কবির মনে হয়েছে 'কয়লা শেষের ফুলকি থামেনি তো'।

জীবনানন্দ চেয়েছিলেন জীবন থেকে যোনির অন্ধকারে যেতে, বুদ্ধদেব যোনির অন্ধকারে দেখেছেন নবজন্মের সম্ভাবনা, বীজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন পুষ্পের প্রচ্ছন্ন মহিমা। একদিন আবিভূত হবে কোন দেবদূত যে কবির খণ্ডজীবন পাখিটাকে মুঠোর মধ্যে ধরে' তুলে আনবে আবর্জনার স্তূপ থেকে। ভ্রূণ অবস্থান করে অন্ধকার মাতৃগর্ভে। কিন্তু সে আঁধার আঁধার নয়, আলোর অধিক। কারণ ভ্রূণের আবির্ভাব হবে নব-জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে। তাই কবির বন্দনীয় বিষয় "যে আঁধার আলোর অধিক"। এই কাব্যে কবি সহজে লক্ষ্যভেদ করে' সহজকে অসহ আত্মীয় জেনে কেবল অন্বেষণ করেছেন 'মায়াবন বিহারীণি নিমিত্তচেতন হরিণী-রে'। কিন্তু সে কবিকে

দেয়না 'আশ্রয়, পৃমিতি, প্রজ্ঞা'। ক্ষুধা আর শ্রম ছাড়া অবিরা কিছু আছে এ জগতে—একথা উল্লেখ করেছেন কবি 'মুক্তির মুহূর্ত' এ। কবি অনুরোধ জানিয়েছেন যে ফুটপাতের নোংরা মানুষটা নৈরাশ্য আর কলেরা জয় করে উজ্জ্বল আধুলিটাকে নিয়ে যদি কখনো আসে কোন নারীর কাছে, তাহলে সেই নারী যেন সব দেয় তাকে—

উদার, উন্মুক্ত বাহু, অনায়াস বাহুর বিস্তার,
আর ব্যাপ্ত বিতর্করহিত এক আঁধার গহ্বর ;—
কারণ সেই গহ্বরে প্রবেশ করে' শিখে নেবে
এ জীবনে ক্ষুধা আর শ্রম ছাড়া আরো কিছু আছে,
আছে মৃত্যু, মুক্তির মুহূর্ত আর আছেন ঈশ্বর।

মায়াবী টেবিলের রূপকল্পে যে-শিল্পতত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন কবি "দ্রৌপদীর শাড়ী"তে, তার পুণরুক্তি ঘটেছে "যে-আঁধার আলোর অধিক"এ। ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কবি সচেতন, তাই তিনি স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে আহরণ করতে বলেছেন কবিতার উপাদান, দরকার নেই তাঁর বাইরে তাকানোর।

প্রান্তরে কিছুই নেই ; পর্দা টেনে দে।
ওরা তোকে কেবল ভোলাতে চায়—ঘাস, মাটি,
পুকুর, আকাশ,
ফেলে দে পুতুল, ফুল, পোষা পাখি, শৌখিন
ক্যাকটাস ;
ডুবে যা নিরভিমান, একতাল, বিশ্বস্ত নির্বেদে।

প্রান্তর ও প্রাঙ্গণের ওপর পর্দা টেনে দিয়ে হৃদয়ের মধ্যে ঘর বাঁধতে বলেছেন কবি। রুশ কবি প্যাস্টারনিকের মত তাঁরও 'field of action was the size of a jewller's or a watch maker's work table." [৭] "বিচিত্রিত মুহূর্ত" এর 'ছন্দ' কবিতার ছন্দ ছিল নটিণী, বর্তমান কাব্যে ছন্দ নিরঞ্জন গণিত। এখানে আবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মনন। 'যে আঁধার আলোর অধিক' রচনাকালে কবির বয়স ৫০-এর কাছাকাছি। পূর্বের কাব্যটি থেকে এই কাব্যের ব্যবধান দীর্ঘ পাঁচ বছরের। বয়সের গুরুভারে পীড়িত কবির রোম্যান্টিক উন্মাদনা এখানে অনেকটা স্তিমিত। সে কারণেই বোধহয় কবিতাগুলি এত সংহত ও চিন্তাঋদ্ধ।

"মরচে পড়া পেরেকের গান" রচনাকালে কবির ধারণা হোল—সৌন্দর্য নেই বহুরূপী পঞ্চভূতে বা চিত্রল উদ্ভিদে বা সূর্যাস্তের বর্ণসমারোহে, তা' আছে কবির অহমিকায়। তাঁর বিশ্ববীক্ষায় ধরা পড়ল

আমিহীন বিশ্ব নেই, চরাচরে আমিই বিম্বিত :

অর্থাৎ সৌন্দর্য নেই পরিদৃশ্যমান বিশ্বে, কবিমনের সৌন্দর্যই বাস্তবে প্রতিফলিত। "দ্রৌপদীর শাড়ী" কাব্যের 'বৃষ্টি' কবিতায় বৃষ্টি ছিল নব-জীবনের প্রতীক। তাকে কবি আহ্বান করেছিলেন

এসো মগ্ন কল্পনার মূলে, এসো তুমি সত্তার শিকড়ে,
মুক্ত করো সৃষ্টির উদ্দাম বীজ,
ছিন্ন করো স্তব্ধতার পাষাণ-শৃঙ্খল।

কবিতাটিকে "মরচেপড়া পেরেকের গান" কাব্যের নাম কবিতার উপক্রমণিকারূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। রামায়ণের আদিপর্বের সুবিখ্যাত ঋষ্যশৃঙ্গ মুণির কাহিনী উপজীব্য হয়েছে কবিতাটির। অঙ্গদেশের অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটানো যেতে পারে, যদি তরুণ তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজধানীতে নিয়ে আসা যায়। কখনো তিনি নারীমুখ দর্শন করেননি, রতিসুখ অনুভব তো দূরের কথা। তাঁর ব্রহ্মচর্যের কঠিন লৌহজাল ছিন্নকরে' কৌমার্য নষ্ট করতে আগ্রহী হোল এক বৃদ্ধা বারাঙ্গনা রাজমন্ত্রীদের আজ্ঞায়, বৃদ্ধার নির্দেশে তাঁর রূপসী কন্যা নিপুণভাবে তপস্বীকে ভ্রষ্ট করল ব্রহ্মচর্য থেকে। পরে রাজা লোমপাদ-কন্যা শান্তার সঙ্গে হয়, তার শুভ পরিণয়। ইউরোপের 'হোলি গ্রেইল' উপাখ্যান গড়ে উঠেছে নাকি ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে'। নতুন দৃষ্টিতে বাঙালী কবি

উপস্থাপিত করেছেন প্রাচীন তাপসকে, যে তৃপ্তি পায়নি শান্তার বাহুবন্ধনে। সে বলে

আমার কাছে রাজপুরী বিস্বাদ, বিস্বাদ আমার
পরিণীতা রাজকন্যা
বিবর্ণ দিন, প্রেমহীন তিক্তকাম রাত্রি,
তিক্ত আমার মন্ত্রপুত মিলন, উৎপীড়িত আমার
বীজস্রোত
যার তেজে বৃষ্টি নামে, ফসল ফলে, সে দেশে আমি
হর্ষধারা নামিয়েছি,
একা আমি শুকনো।

বারবার তাঁর মনে পড়েছে সেই নারীকে যে তাঁকে স্পর্শ করতে এগিয়ে এসেছিল—

জলের স্রোতে জ্যোৎস্নার মতো চঞ্চল
পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে যেমন সৌরকণা, তেমনি তার
কঙ্কণের রশ্মি,
শঙ্খের মতো গ্রীবা, দুটি কান যেন উজ্জ্বল কমণ্ডলু,
বুকের দুটি মাংসপিণ্ড নৈবেদ্যের মতো বিদগ্ধ ও
বর্তুল,
শরতের বৃষ্টির মতো স্বচ্ছ ও আর্দ্র তার দৃষ্টি,
তার আননে চৈত্রপূর্ণিমার আকাশের আনন্দ,
মন্ত্রোচ্চারণের ছন্দ তার জানুতে ও জঙ্ঘায়—

তার আলিঙ্গণের উষ্ণ স্পর্শে লুপ্ত হয়ে গেছল সব দ্বৈত। তিনি স্থান পেয়েছিলেন ব্রহ্মলোকে। তারপর এই সংসার-খাঁচায় বন্দী করা হোল তাঁকে যাতে সবাই সন্তানের জন্ম দিতে পারে 'অনাহত অভ্যাসে'। সেই স্বপ্ন এখনো তাঁর জাগ্রত তন্দ্রায় এসে দেখা দেয় বার বার। যুগযুগান্তরে তাঁর কামনা ছিল স্বর্গ। তাই শাস্তি দিয়েছেন দেবতারা। আর তিনিও পড়ে আছেন নিঃসাড়, জড়। ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী নিয়ে অতৃপ্ত কবি একটি নাটকও রচনা করেন। নাম 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'। নাটকটির তিনটি কবিতা প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে সংকলিত হয়েছে আলোচ্য কাব্যটিতে। প্রাচীন কাহিনীর নবীনিকরণে এলিয়টের প্রভাব সুস্পষ্ট। এলিয়টের "ওয়েস্ট ল্যাণ্ড" যৌন ক্ষমতা ফিরে পাবার কাহিনী। Tammuz, Osiris ও Adonis এর উর্বরতা থেকে সংগৃহীত হয়েছে কাহিনী। ধীবর রাজার পৌরুষ মুক্তির জন্য Pure Knight যাত্রা করেছিলেন Lance ও Grail এর সন্ধানে যা' লিঙ্গ প্রতীক (Phallic Symbols) বা জীবনের প্রতীক। শেষ পর্যন্ত রাজার পৌরুষ উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে দেশও হয়ে উঠেছে শস্যশ্যামল। এলিয়ট প্রথম জীবনে গ্রহণ করেছিলেন পৌরাণিক fertility myth। পরবর্তীকালে তিনি প্রতীক গ্রহণ করেছেন বাইবেল থেকে। দৈহিক কামনা-বাসনার অবসানে আত্মিক আনন্দের কথা বলেছেন তিনি। "মরচে পড়া পেরেকের গান" এর কাহিনী আরো বিস্তৃত করে ব্যাখ্যা করেছেন বুদ্ধদেব।

অক্ষম আমি অঙ্গরাজ, বীর্য তাঁর নিঃশেষ,
শুষ্ক তাই মৃত্তিকা, রিক্ত নভোতল।
পৃথিবীর যিনি পতি, তাঁর কোষে নেই বীজবিন্দু।
রুদ্ধ তাই ঋতু, নেই শস্য, গোবৎস, সন্তান।

রাজার বিকল পৌরুষের জন্য দেশের মাটি আজ অহল্যা। কবি লুণ্ঠন করতে বলেছেন ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য! কারণ তাতে ব্যক্ত হবে 'মৃত্তিকার প্রতিভা'। মৃত্তিকা এখানে পৃথিবীর মাটি, আবার নারীর গর্ভও বটে। বুদ্ধদেবের কামতত্ব, যা' তিনি তাঁর সারা জীবনের কাব্যচর্চায় প্রচার করেছেন, আর একবার নতুন করে পরিবেশিত হোল একটি প্রচলিত কাহিনীর আধারে। "যৌনতা এখানে কামাচারে আবদ্ধ নয়, মহিমায় উর্দ্ধগ"। (সঞ্জয় ভট্টাচার্য)

মহাভারতের প্রতি কবি বুদ্ধদেবের আকর্ষণ আত্মিক। জীবনানন্দের রচনায় মহাভারতের আদৌ উল্লেখ না দেখে মনে ক্ষোভ জন্মেছিল বলেই মনে হয় কবি বুদ্ধদেব তাঁর সারা জীবনের কাব্যচর্চায় নানা

স্থানে এনেছেন মহাভারতের প্রসঙ্গ। কীটসের কবিতায় গ্রীক পুরাণের প্রচুর পরিমানে উল্লেখ দেখে শেলি তাঁকে বলেছিলেন 'He was born a Greek ? আমরাও বলতে পারি, বুদ্ধদেবের কবি-মন পুষ্ট হয়েছে মহাভারতের জারক রসে। রিলকের নতুন ইন্দ্রিয় চেতনা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল মহাভারতের কাহিনীগুলিকে ইন্দ্রিয়ময় করে তুলতে। মহাভারতের একই চরিত্র বার বার এসেছে। তাঁর কাব্যে, বিভিন্ন রূপ নিয়ে। কচ ও দেবযানীর কাহিনী হয়েছে তাঁর বিভিন্ন কবিতার আলম্বন। দময়ন্তী ও নলের কাহিনীও বার বার নাড়া দিয়েছে কবিকে। "স্বাগত বিদায়" কাব্যে তারা আবর্ভিত হয়েছে ভিন্ন রূপে। স্বেচ্ছাচারিতার দাবি ছেড়ে দিয়ে মহান বিনয়ে দেবতাদের সাধারণ প্রতিযোগিতায় প্রার্থী হতে দেখে সরে দাঁড়িয়েছেন নল। স্বয়ম্বরা দময়ন্তী এগিয়ে এসেছে মালা হাতে। আর বর্ণস্পৃহা ও জয়ের উল্লাস ভুলে গিয়ে পরাক্রান্ত রাজার।

মর্মরিত নিশ্বাসে নিলেন টেনে সব সদ্য-ফোটা
যুবতীর
নূতন স্তনের স্পর্শ, পুষ্পসার অঙ্গের সুঘ্রাণ।

দময়ন্তী কিন্তু সেদিকে না তাকিয়ে শাপগ্রস্ত নলের (বাহুক) হাতে 'পৌঁছে পরিত্রাণ'। আর সে কারণে সে

মণ্ডপের মণিদীপ্ত সংশয় ছাড়িয়ে
দায়িত্বকে বেঁধে নিলো আলিঙ্গনে—প্রেমিকার
স্পন্দমান হৃদয় বাড়িয়ে।

"স্বাগত বিদায়" এ এসে কবি ভুল বুঝতে পেরেছেন। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে নতুন কাব্য ধারার সৃষ্টিতে মেতে উঠলেও তিনি নিশ্চিত জানতেন যে শতবর্ষ পরেও কবিগুরু

কবিরূপে রহিবেন কুমারীর প্রথম প্রেমিক,
প্রথম ঈশ্বর বালকের, বৃদ্ধের যৌবনধাতু,
সকল শোকের শান্তি, সব আনন্দের সার্থকতা,
শক্তির অশেষ উৎস, জীবনের চিরাবলম্বন।

আর আধুনিক কবিদের রচনা ততকাল দংশন করবে 'কালের কীটের দন্ত'। তবুও বালখিল্যতায় কবি একদিন ভেবেছিলেন যে তাঁদের তপস্যায় নবজন্মলাভ করবে পৃথিবী। যৌবনের প্রথম প্রহরে কবিতাকে ভালবেসে কবি ভালবেসেছিলেন নারীকে, কবিতাকে তাঁর মনে হয়েছিল প্রেম। আর আধ জীবনের শেষলগ্নে কবির মনে হয়েছে কবিতাও প্রবঞ্চনা। তাঁর কাম্য শুধু নারী অঙ্গের মধু।

পাশ্চাত্য যে-কয়জন কবির প্রতি বুদ্ধদেব দুর্ণিবার আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন, বোদলেয়র তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান। 'একটা নতুন কিছু করো'র আনন্দে বিভোর হয়ে তিনি বোদলেয়র অনুবাদ করেন এবং তাঁর স্বপক্ষে সাফাইও গান। রোম্যান্টিক কোন কবির আলোচনা আদৌ নেই তাঁর সাহিত্যালোচনায়। রোম্যান্টিক বলতে তাঁর নিকট উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বোদলেয়র যার জীবনবিকার অজানা নয় কারো। এই ফরাসী কবির কিঞ্চিৎ পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। "ফ্লার দ্যু মাল" এর ভুমিকায় কবি বলেছেন যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরা কাব্যরাজ্যের সমস্ত বিভাগ অধিকার করে' নিয়েছে বলে তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে অন্য পথ। মানুষের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন দুট পৃথক কক্ষ—Ecstacy of life এবং Horror of life। রোম্যান্টিক কবিরা যেহেতু প্রথমটির প্রবক্তা, সেইহেতু তিনি গ্রহণ করেছেন দ্বিতীয়টি। আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে রোম্যান্টিক মনে হলেও তিনি ছিলেন Counter-romantic বা রোম্যান্টিক বিরোধী (বলেছেন এলিয়ট)। অবশ্য রোম্যান্টিক বলতে বুদ্ধদেব বোঝেন—শুধু একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন নয়, মানুষের একটি মৌলিক স্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য চিত্তবৃত্তি। তারই নাম রোম্যান্টিকতা

যা' ব্যক্তি মানুষকে মুক্তি দান করে, স্বীকার করে' নেয়—শুধু ইস্ত্রি করা, এটিকেট মানা সামাজিক জীবটিকে নয়, নির্ভয়ে মানুষের অবিকল ও সমগ্র ব্যক্তিত্বকে ; তার মধ্যে যা কিছু অযৌক্তিক বা যুক্তির অতীত, অনিশ্চিত, অবৈধ, অন্ধকার ও রহস্যময়, যা· কিছু গোপন, ঐশ্বরিক ও অনির্বচনীয়—সেই বিশাল ও স্বতোবিরোধময় বিস্ময়ের সামনে, সন্দেহ নেই, মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তির নামই রোম্যান্টিকতা। [৮]

বোদলেয়রের ব্যক্তিগত জীবন আদৌ আদর্শনিষ্ঠ নয়। একাধিক নারীর সঙ্গ কামনা করে' তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন দুরারোগ্য সিফিলিস রোগে। এলিয়ট 'Perfect health' এর প্রতীক গ্যেটের সঙ্গে তুলনায় 'বোদলেয়রকে' বলেছেন 'Symbol of morbidity' জীবনের অন্য কোন সৌন্দর্য তাঁর দৃষ্টিপথে পতিত হয়নি প্রকৃতি ও নারী ছাড়া। তাই এলিয়ট বলেছেন

Baudelaire was throughly perverse and insufferable ; a man with a talent for ingratitude and unsociability, intolerably irritable, and with a mulish determination to make the worst of everything ; if he had money, to squander it ; if he had friends, to alienate them, if he had any good fortune, to disdain it.

অাকারজনক পৃথিবীর স্রষ্টা এহেন কবির হাত থেকে বেরিয়েছে পঙ্কজাত পুষ্প (?) "ফ্লার দ্যু মাল"। বোদলেয়র মূলত: প্রেমের কবি তাঁর প্রেম চেতনা সম্পর্কে সমালোচক জে, এম, কোহেন বলেছেন তাঁর "পাশ্চাত্য সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থে—

Love offered him nothing but sexual excitement, সে সেক্সও আবার 'evil in itself ? এহেন কবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বুদ্ধদেব বললেন,

কোন দৈব বরপ্রাপ্ত রাজপুত্রের মতো, তিনি যেন সহজেই কবিতাকে সব শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন : গ্যেটের দার্শনিকতা, হাইনের কৌতুক, গোতিয়ের চাপল্য, উগোর গুরুমশাইগিরি—এই সব সংকট কাটিয়ে তিনি কবিতাকে ক'রে তুলেছেন যুগপৎ নির্ভার ও ভাবনামগ্ন, গম্ভীর, সহৃদয় এবং সুপ্রবেশ্য। তাঁর তুলনায় ভের্লেন কোমল, র‍্যাঁবো উদ্বেল এবং মালার্মে নিস্তাপ।

অবশ্য বোদলেয়রের কবিতাকে কেবল অসুস্থ মনোবিকারের বা বৈবশ্যের অবক্ষয়ের চিহ্নবহ বলে মারিও প্রাজ যে ফতোয়া জারী করেছেন তাও স্বীকার্য নয়। ফরাসীবিদ আধুনিক কবি দেখেছেন তাঁর কোন কোন কবিতায় "গাম্ভীর্যে এক ক্ষণিক প্রশান্তির সুর। আর এটুকুই আলো। নইলে তাঁর কাব্যের আবহাওয়ায় হাঁফ ধরে আসে"। (অরুণ মিত্র) উত্তরবৈবিক কবিদের মতো বোদলেয়রও বিদ্রোহী। তিনি যে-যুগে জন্মেছেন সে যুগ সব অর্থে পচনের কাল। রোম্যাণ্টিকদের ভাবপ্রবণতা, কল্পনার আতিশয্য বীতশ্রদ্ধ করেছিল তাঁকে ভ্যালেরীর মতো। তাঁর বিদ্রোহতাই সব তুচ্ছতার উর্ধে। তিনি পাড়ি জমাতে চেয়েছেন ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে, সীমা থেকে অসীমে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন জটিল ও রহস্যময়। যথাদৃষ্ট জীবনের পরিচিতিই আছে তাঁর কাব্যে। তাঁর কবিতা তাই কবি-মনের স্বাভাবিক স্ফূর্তির প্রকাশ। বুদ্ধদেবের অনেক পংক্তিই তাঁর প্রতিভার সহজাত ফসল নয়, বাইরের আমদানি। বোদলেয়র, রিলকে, হেল্ডার্লিন অনুবাদ করতে গিয়ে তাঁদের অনেক শব্দ ও চিত্রকল্প তিনি ধার করেছেন যা এদেশের মাটিতে বেমানান।

ইউরোপীয় সাহিত্যকে মাইকেলের মনে হয়েছিল মানব সাধনার কেলাসিত রূপ। বুঝেছিলেন বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে হাজির হতে হলে বাংলা ভাষার দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে। বিদেশী সাহিত্য

থেকে মন্থন করা অমৃত হবে বাংলা ভাষার পক্ষে বলকারক। অর্থাৎ বাংলা ভাষার দুর্বল শরীরে তিনি আনতে চেয়েছিলেন ঋজুতা ও Smartness. চাননি বিদেশী ভাষা ও ভাবের নির্বিচার প্রয়োগ। চেয়েছিলেন বাঙালীর কাব্য-বধূকে জড়োয়া গহনার কবল থেকে মুক্ত করতে। সঙ্গত কারণেই ইউরোপীয় সাহিত্যের masculine quality র আমদানি নতুন করে নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন তিনি বাংলা কাব্য-ভাষায়। আধুনিক কবিরা যে বিদেশী ভাবসম্পদ আহরণ করেছেন তাঁর পেছনে কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই। রবীন্দ্রনাথের ছোঁয়াচ বাঁচাতে তাঁরা উপস্থিত হয়েছেন কণ্টিনেণ্টাল সাহিত্যের অঙ্গনে। ব্যবহার করেছেন এমন কিছু ভাব, ভাষা, চিত্রকল্প যা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সহজাত নয়,—মাঝে মাঝে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে বুদ্ধদেবের বোদলেয়র প্রীতি। রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'তে তিনি অন্বেষণ করেছেন বোদলেয়রের 'The Drunken Boat' এর সাদৃশ্য এবং ভিক্টোরিয়া ওকাম্পের কাছ থেকে অনুবাদে বোদলেয়র শুনে রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হ'তে পারেননি বলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি। প্রকৃতি ও নারী সম্পর্কে বোদলেয়রের 'মর্বিড' দৃষ্টি আচ্ছন্ন করেছে বুদ্ধদেবকে। এ কথা মনে রেখে বুদ্ধদেবের কাব্যপাঠ করতে হবে আমাদের। কেবলমাত্র অশ্লীল শব্দ প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হননি তিনি, তাঁর রূপকল্প ব্যবহারেও প্রাধান্য পেয়েছে যৌন চেতনা। এটা ফরাসী কবির প্রত্যক্ষ প্রভাব। বোদলেয়রের 'সুন্দর জাহাজ' কবিতায় আছে—

মহান জঙ্ঘার আঘাতে বসনের আলোড়ন
জাগায় যাতনায় আঁধার বাসনার আবেদন।
যেনরে ডাকিনীরা দু-জনে
গভীর খলে নাড়ে কালিমাঘন এক পাঁচনে।

কিংবা 'দানবী'তে

হ'তে চাই তোর ফুলতণুর হন্তা
ক্ষমাশীল স্তনযুগলে আঘাত ক'রে—
এবং উরুর বিস্মিত অন্তরে
দীর্ঘ, কঠিন, ক্ষমাহীন এক খন্তা (বু, ব-র অনুবাদ)

এবার বুদ্ধদেবের কিছু যৌনচেতনামূলক চিত্রকল্প উদ্ধার করা যাক—

ক) যদিও একত্রে ছোটে জীবনের কোটি সম্ভাবনা,
পথে সবে ম'রে গিয়ে, খুঁজে পায় জরায়ুর দ্বার
শুধু এক-শ্রেষ্ঠ নর, বলীয়ান আগ্রহে স্বাধীন।

খ) দূতের মতো হাওয়া
সিক্ত করে স্মৃতির স্তনের বৃন্ত-দুধের কৌটায়।

গ) আর ঘুম যখন গরম করে, মনে হয় যেন মাতার
মমতা,
তাপসী মাতার নির্জন করুণ যোনি…

প্রাচীন সাহিত্যেও যৌনতাদুষ্ট চিত্রকল্প দুর্লভ নয়। "মেঘদূতে"র পূর্বমেঘ থেকে উদ্ধৃত শ্লোকটি স্মরণ করা যাক—

তস্যাঃ কিঞ্চিৎ করধৃতমিব প্রাপ্তবাণীরশাখং
হৃত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বম্
প্রস্থানংতে কথমপি সখে। লম্বমানস্য ভাবি
জ্ঞাতাস্বাদো বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুং সমর্থঃ॥ ৪২॥

[গম্ভীরার স্রোতের উপরে হেলিয়া পড়িয়াছে সুনীল বেতসলতাগুলি স্রোতের টানে তাহারা নড়িতেছে; তটদেশ উন্মুক্ত (সেখানে জল শুষ্ক), তোমার মনে হইবে গম্ভীরা সুন্দরী তাহার নিতম্ব হইতে স্খলিত সলিলরূপ বসনখানি কোনপ্রকারে, দুই হাতে টানিয়া ধরিয়াছে; তাহার উপর লম্বমান হওয়ায় ঐস্থান হইতে তোমার প্রস্থান সহজ হইবে না। কোন পূর্ব রসজ্ঞ ব্যক্তি ঐরূপ 'অনাবৃত জঘনা' নারীকে উপেক্ষা করিয়া যাইতে পারে? ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীকৃত অনুবাদ] যৌন সঙ্গমের প্ররোচনা নয়, নদীর রূপ বর্ণনাই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই আমরা

মুগ্ধ হই কবির সৌন্দর্যবোধের গভীরতায়। বোদলেয়র বা বুদ্ধদেবের নির্দ্বিধায় নারীর যৌনাঙ্গের উল্লেখ পীড়িত করে আধুনিক কাব্য পাঠককে। 'আফ্রিকা' বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে বহুভোগ্যা গণিকা। বোদলেয়রের কাব্যে 'চুলত যৌন চেতনার প্রতীক। বুদ্ধদেবের কাব্যে চুলের আত্যন্তিক ব্যবহার লক্ষণীয়; প্রিয়ার চুল তাঁর কাব্যে তুলিত হয়েছে কখনো অন্ধকারের সঙ্গে, কখনো ঘুমের সঙ্গে, কখনো ঘনকৃষ্ণ মেঘের সঙ্গে। তাঁর রং আবার একরকম নয়—তা' কখনো সোনালী, কখনো হলুদ, কখনো রেশমি লাল। একটি নারীর চুল দেখে কবির ইচ্ছা জাগে—

দন্তাগ্রে কেশর গুচ্ছ, কাটি তাকে তৃণের মতন,
উরজ পুষ্পের মতো চুল ছানি দুই হাত দিয়ে ;
খশখশে চুলগুলি, তার স্পর্শে নাসিকা স্ফুরিছে,
চুলগুলি পান করে মোর তপ্ত, সতৃষ্ণ নিঃশ্বাস ;···

'চুল' শব্দের ন্যায় 'স্তন' শব্দের ব্যবহারে একটু বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যায় বুদ্ধদেবের কবিতায়, রবীন্দ্রকাব্যে 'স্তন' হোল পবিত্র সুমেরু'। কালিদাসের কাব্যেও শব্দটির প্রয়োগবাহুল্য আছে: কিন্তু তাও ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ। ধরা যাক মাতৃত্বের সম্ভাবনায় সুদক্ষিণার শারীরিক পরিবর্তনের সেই অপূর্ব ছবিটি—

দিনেষু গচ্ছৎসু নিতান্ত পীবরং তদীয়মানীলমুখং
স্তনদ্বয়ম্।
তিরশ্চকার ভ্রমরাভিনীলয়োঃ সুজাতয়োঃ পঙ্কজ-
কোশয়োঃ শ্রিয়ম।

সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ :

কিছুদিন গেলো পীনস্তন দুটি হোলো তাঁর স্থূলতর।
সুনীল বরণে রঞ্জিত হোল স্তনমুখ দুটি তাঁর,
যে মোহন শোভা যবে অলি বসে বিকচপদ্মপর।
সুদক্ষিণার স্তনদুটি পেলো সে শোভা চমৎকার।

অকারণে অনেক সময় স্তনের আমদানী ঘটিয়েছেন বুদ্ধদেব। রবিকল্প এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যেন তা প্রিয়ার কেশরাশিতে হস্তসঞ্চালনের মত স্বাভাবিক ও রসসমৃদ্ধ হয়। বুদ্ধদেবের অধিকাংশ বাক্-প্রতিমা অনেক সময় অস্বাভাবিক ঠেকে। কষ্ট কল্পনা আহত করে পাঠক মনকে।

বোদলেয়রের মতো বুদ্ধদেব বিশ্বাস করতেন যে বিশ্বজগতের অন্তরালে লুক্কায়িত সম্বন্ধসমূহের (Correspondences) আবিষ্কর্তা হলেন কবি। আবার তিনি কবিতার বিশুদ্ধতা রক্ষায়ও আগ্রহী ফরাসী কবির মতো। তিনি কলাকৈবল্যবাদী। কলাকৈবল্যবাদীদের মতে, আর্টের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই কেবলমাত্র আনন্দদান ব্যতিরেকে। এই মতবাদের প্রথম প্রতিধ্বনি শোনা যায় কাণ্টে। তারপর থিওফিল গোতিয়ের বোদলেয়র, কীটস্, টেনিসন, সুইনবার্ণ, অস্কার ওয়াইল্ড প্রমুখ সাহিত্য কেশরীদের রচনায় তার ব্যাপকতা। তাঁরা বলেন আর্টের বিনাশ নেই। গোতিয়ের তো বলেছেন—দেবতাদের মৃত্যু হলেও কবিতার মৃত্যু নেই। স্বপ্নলোকের অধিবাসী অস্কার ওয়াইল্ড আর্টকে বলেছেন 'Supreme reality' আর জীবনকে বলেছেন 'mere mode of fiction'। আর্টের একটা নিজস্ব জগৎ আছে। এই জগৎটি কবি সৃষ্টি করেন তাঁর নিজের স্বার্থে। জীবনযুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্যে পীড়িত হয়ে তিনি আশ্রয় নেন এই জগতে। বিশ্ব-সংসারের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে সৌন্দর্যের লীলা-ভূমিতে বসে থাকেন তিনি বুঁদ হয়ে। সমাজ থেকে এই বিচ্ছিন্নতাই কলাকৈবল্যবাদীদের বৈশিষ্ট্য। প্যারী কম্যুনের পতনের কালে নির্বিকার ছিলেন ফ্লবেয়র। প্যারীর বিদ্রোহ কোন সাড়া জাগাতে পারেনি গঁকুরের শিল্পী মনে। কবি ওয়াই বুদ্ধদেবের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। জগতের দুঃখকষ্ট বেদনার হাহাকার উপেক্ষা করে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন আপন স্বপ্নস্বর্গে। "বন্দীর বন্দনা"র সর্বত্র পরিলক্ষিত হবে এমনি এক

প্রবণতা। অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত চিঠিতে কবি স্বয়ং বলেছেন "আপনি যোগ দিয়েছেন মিছিলে আর আমি স্বভাবত বিবরবাসী" তিনি "treats the universl as if it were his own private room." [৯] সংসারের তুচ্ছ উৎপীড়নকে হাসিমুখে উপেক্ষা করে' আনন্দের মহান মহিমার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি। "বকুল বীথির ছায়ে গোধূলির অস্পষ্ট মায়ায়, অমাবস্যা পুর্ণিমার পরিণয়ে" পুরোহিত তিনি। অন্তরের নিরুদ্ধ বেদনাকে নিত্য উৎসবের প্রদীপের মত তিনি সাজিয়ে রাখেন আনন্দের মন্দির সোপানে। তিনি মুক্তি খোঁজেন প্রকৃতি সম্ভোগে। ইন্দ্রিয়ের বাতায়ণকে তিনি অর্গলমুক্ত রাখেন আর সেখান দিয়ে তাঁর অন্তরে প্রবেশ করে আকাশের অকুল আলোক। তিনি কেবল চেয়েছেন কবিতার কল্পলোকে নিরুপদ্রব সুখী জীবন। বেদনা বারিধি মন্থন করে' জীবনের বন্ধ্যা উপকূলে তিনি জয় করতে চেয়েছেন কলালক্ষ্মীকে কারণ তাতে ভোলা যাবে জীবনের দুঃখ কষ্টকে। রুঢ় কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াবারও সময় নেই তাঁর। কারণ

জানালার বাইরে আকাশের নীল টুকরো,
আছে সমস্ত দিন ভ'রে মনের মধ্যে কবিতার গুঞ্জন,
আছে, কোনখানে, একটি মেয়ের কালো চুল।

জগতের কোন পরিবর্তন ঘটাতে চাননি তিনি। জগৎ সংসারের নিপীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দনরোল স্পর্শ করেনি তাঁকে। রুশকবি পুশকিন বলেছিলেন—

No, not for worldy agitation,
Nor worldly greed, nor world strife,
But for sweet song, for inspiration,
For prayer the poet comes to life.

ঠিক এ-কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যাবে বুদ্ধদেবের কণ্ঠে—

শেফালি সৌরভ আমি, রাত্রির নিশ্বাস,
ভোরের ভৈরবী।

সংসারের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কণ্টকের তুচ্ছ উৎপীড়ন
হাস্যমুখে উপেক্ষিয়া চলি।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,—শুধু তা-ই পবিত্র, যা' ব্যক্তিগত'। যীশুকে পরোপকারী বা বুদ্ধদেবকে মোহগ্রস্ত সভাপতি মানতে রাজি হননি তিনি বরং

উদ্ধারের সত্বাধিকারী
ব্যতিব্যস্ত পাণ্ডাদের জগঝম্প, চামর, পাহারা
এড়িয়ে আছেন তাঁরা উদাসীন, শান্ত, ছন্নছাড়া।

তাই বুঝি কবি বলেছেন, 'জগতেরে ছেড়ে দাও, যাক্ সে যেখানে যাবে'। অন্যত্র বলেছেন—

ঘুম না এলে ল্যাম্পো জেলে
বসি লেখার যজ্ঞে,
বাঁচতে হ'লে বাঁচি আমার
মন-বানানো স্বর্গে।

বুদ্ধদেব আবার শিল্পীর স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। শিল্পকলা তাঁর নিকট কোন তত্ত্ব নয়, জীবনের অংশ। রবীন্দ্রনাথ শিল্পকে বলেছেন প্রয়োজনের অতীত। গোতিয়ের বলেছেন 'Les choses sout belles en proportion inverse de leur utilite' অর্থাৎ বিনা নিছক প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্ত বস্তুই সুন্দর। আর বুদ্ধদেব রিলকে উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, 'সেই শিল্পই ভালো, যার জন্ম হয়েছে প্রয়োজন থেকে'। তাঁর মতে, "শিল্পী স্বভাবতই ব্রাত্য; কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ে ভর্তি হওয়া, কোনো সঙ্ঘবদ্ধ মতবাদ গ্রহণ করে' সেই মতেই নৈষ্টিকতা বাঁচিয়ে চলা এটা তাঁর প্রকৃতির পক্ষে অনুকূল"। বুদ্ধদেব মনে করেন যে কবি যদি কোন গোষ্ঠীভুক্ত হন তাহলে তাঁর দৃষ্টি হবে খণ্ডিত। 'জীবনের অবিকল চেতনা' হবে তাঁর নিকট অপ্রত্যাশিত। প্রকাশ্যত: তিনি বিরুদ্ধাচরণ করেছেন সাম্যবাদী কবিগোষ্ঠির। একথা ঠিক যে সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটে না যদি ব্যক্তি-স্বাধীনতা পেয়ে বসে শিল্পীদের, তাহলে সাহিত্যে সৃষ্টি হয়

বিশৃঙ্খলা, এমন কি বমনোদ্রেক সৃষ্টিকারী সাহিত্যের জন্ম দিতেও আর শিল্পীদের বাধেনা। তা' ছাড়া "প্রাণহীনতার নীরস আঙ্গিকে ভাববিচ্ছিন্ন ছন্দরিক্ত জীবন কাব্যধারা শ্রেণীসর্বস্ব অহংপুবিকার মরুপ্রান্তরে হা হা করে। সেখানে রূপ বিহঙ্গ ময়ূর শিল্পিত সৌন্দর্যময় পেখম তুলে সজল মেঘমৃদঙ্গের তালে তালে নাচেনা' তৎপরিবর্তে সেখানে কুশ্রী বেঢপ অতিকায় উটপাখী মরুশিখায় পিঙ্গল শরীরের বোঝা টেনে রুক্ষ বালুকা-রাশির মধ্যে ঠুকরে-ঠুকরে কাঁকর চিবোয়"। [১0] কলাকৈবল্যবাদী বুদ্ধদেব ভুলে যান 'Art is not only a reflection of life : it is a recreation of life' (মায়াসণিকভ)। সুধীন দত্তের মতো তিনি ছিলেন বৈদগ্ধবিলাসী, এড়িয়ে গেছেন 'জনতার জঘন্য মিতালি'। তিনি বিশ্বাস করতেন যে কবিতা হোল কবির স্বগতভাষণ। বলেছেন—

মনে-মনে কথা কই বিবাহের রাতে
বাসর ঘরেতে।
তোমরা সে-কথা শোনো দুয়ারের কাছে
বুঝি আড়ি পেতে।

কবির এই মন্তব্যটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বার্ণাডশ'র সুবিখ্যাত উক্তি 'All poets speakt o themselves, we only over hear.' কবিজীবনের অন্তিম পর্বে বুদ্ধদেব ঘোষণা করলেন, "কাব্যলক্ষ্মী আমাকে ত্যাগ করেছে" কবি প্রেরণার উৎস শুকিয়ে গেছে বুঝতে পেরেই বুঝি কবি মেতে ওঠেন পুরাণ ব্যাখ্যায় বা পুরাণাশ্রিত কাব্যনাট্য রচনার অমিত উৎসাহে। আধুনিকদের মধ্যে বুদ্ধদেব অতিপ্রজ (prolific) কবি। ফসলের অজস্রতায় ভরে উঠেছে তাঁর কাব্য—মরাই, যদিও অনেক কবিতাই কবির সুনাম বজায় রাখতে পারেনি। একথা অপ্রিয় হলেও সত্য যে বুদ্ধদেবের কাব্য সৃষ্টিতে যত ফেনা তত স্রোত নেই। ক্ষণিকের আনন্দ তাতে পাওয়া গেলেও তা' গভীরভাবে দাগ কাটেনা হৃদয়ে। "বন্দীর বন্দনা"র 'মোহমুক্ত' কবিতায় কবি স্বয়ং বলেছেন—

আমি জানি কিছুই থাকেনা,
পলকে শুকায়ে যায়—সবই যেন সাবানের ফেনা,
রঙিন বুব্বুদ উঠি' ক্ষণিকে ভাঙিয়া পড়ে, চকিতে
মিলায়—
হাত ধরে রাখা নাহি যায়।

তাঁর নিজের কবিকৃতি সম্পর্কে উপরিউক্ত পংক্তিগুলি সর্বাংশে প্রযোজ্য। তাঁর সম্বন্ধে আধুনিক কবি। সমালোচক হরপ্রসাদ মিত্র যা' বলেছেন তা' প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে উদ্ধৃত হচ্ছে—

প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো তীক্ষ্ণ নন তিনি, জীবনানন্দ দাশের মতো গভীরও নন, অজিত দত্তের মতো সহজ-বিস্ময়ে নিশ্চিত আবেদনময় নয় তাঁর অধিকাংশ কবিতা,

বুদ্ধদেবের 'অবাধ, অনায়াসও সমান্তরাল ভাবনা-বেদনা' সুধীন দত্তকে বিস্মিত করলেও তাঁকে পীড়া দিয়েছে বুদ্ধদেবের 'একাধিক ত্রুটি—যথা, উচ্ছ্বাসের পশ্চাদ্ধাবন, গদ্য-পদ্যের বিরোধ-ভঞ্জনে ঔদাস্য, অথবা ইংরাজী বাচণিক পদ্ধতির হুবহু অনুবাদ'। বুদ্ধদেবের সমসাময়িককালের দু'জন খ্যাতনামা কবি—জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথের যুগপৎ ভক্ত ছিলেন তিনি, অথচ এই দু'জন কবির সঙ্গে তাঁর কবি-দৃষ্টির আশমান-জমিন ফারাক। সম্পূর্ণ বিরোধী দুই কবির সাহিত্য সৃষ্টির প্রতি আকর্ষণই নষ্ট করে দিয়েছে। তাঁর মহৎ কবি হ'বার সম্ভাবনা—এ ধারনা অনেক তরুণ কবি সমালোচকের। সমালোচকের মন্তব্যটি কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা, এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম।

ইংরেজ কবি কীটস্ বিনীতভাবে বলেছিলেন, 'I think I shall be among the English poets after my death.' উক্তিটি উদ্ধৃতি দিয়ে সমালোচক ম্যাথু আর্ণল্ড মন্তব্য করেছিলেন, 'He is ! he is

with Shakespeare.' এহেন যশের মুকুট চাননি কবি বুদ্ধদেব। রজনীর সুনীল অঞ্চলে যেখানে বিশ্বের খ্যাতিমান কবিরা জলছেন নক্ষত্র হয়ে সেখানে যে তাঁর স্থান হবেনা সে বিষয়ে তিনি অবহিত। মানবের চিত্তাকাশে স্থায়ী আসন পেতে চাননি তিনি। তিনি জানেন, একবিংশ শতাব্দীর কোন সপ্তদশী জ্যোৎস্না-ধৌত বাতায়নতলে দাঁড়িয়ে পড়বে না তাঁর কবিতা। তবু সে কবির কবিতা রচনার প্রয়াস তা' কেবল তাঁর প্রেমিকার স্মৃতিকে অমরত্ব দেবার জন্য। 'বিরহের স্পন্দমান অন্ধকারে' 'মিলনের অতন্দ্র বাসরে' ভরে' গেছে কবির দেহমন আর সেই পরিপূর্ণতার ভার বহনে অক্ষম কবি সে কথা শোনাতে চান 'আকাশেরে, বাতাশেরে, নিদ্রাহীন নিশীথের কানে।' কবির অন্য কোন পার্থিব কামনা নেই। তাঁর একমাত্র কামনা 'গানে-গানে আপনারে দান করে' যেতে চাই শুধু'। তাঁর সে-কামনা পূর্ণ হয়েছে অনেকখানি।

পাদটীকা :—

১) ৩) ৪) সাহিত্যচর্চা পৃ: ১২৫, ১১৮, ২১৫
২) কবি রবীন্দ্রনাথ ; পৃ: ৩১-৩৩।
৫) রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী ; কবিতা, বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৩, পৃ: ১৫৫।
৬) নরেশ গুহ ; কবিতা, বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৪।
৭) ৯) Zelinsky : Soviet Literature : Problems and people P. 113
৮) কবিতা, বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৩, পৃ: ১৮৬।
১০) বিমলচন্দ্র ঘোষ ; 'এষা' বর্ষ ২, সংখ্যা ৪, পৃ: ৫৩৬।

প্রসঙ্গ : গোধূলি-মন

O বেশ কয়েকটি 'গোধূলি-মন' গত কয়েক মাসে হাতে এসেছে। প্রিয় বন্ধু অজিত রায়, প্রিয় লেখক সোফিওর রহমান, জগত লাহা, সমীরণদের লেখায় সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটির বিষয়ে কিছু জানাতে পারিনি এই লজ্জাস্খলনের জন্য এই বিলম্বিত পত্রাঘাত। শ্রাবণ '৯৩ সংখ্যার দিপালী দে সরকারের চিঠি প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ। সকলের সামনে উন্মোচিত করা উচিত প্রতিষ্ঠানের এই ভূমিকা। আর গোধূলি মনই অরুণবাবুর কলমে সময়োচিত প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে লিটিল-ম্যাগের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। প্রভাস চৌধুরী ও অজিত প্রচলিত রবীন্দ্রপূজার স্রোতের বাইরে দাঁড়িয়ে কিছু শুনিয়েছেন, ধন্যবাদ। ঈশিতার কবিতার শেষ দুটি লাইন কি একান্তই জরুরী ছিল? ঈশিতা ভাবুন। সোফিওর ও অরুণ চক্রবর্তীর ভালো। আমাদের এই রাঢ়ভূমে পত্রিকার বড়ই অভাব। তবু তারমধ্যেই মাঝে-মাঝে ডাকপিয়নকে প্রিয় মনে হয়। 'গোধূলি-মন' হাতে। অনেকগুলো গোধূলি মনতো বিনা বিনিময়ে পড়লাম। আর নয়। তাই গ্রাহক চাঁদা পাঠাচ্ছি অবিলম্বে। অন্তত আমি বুঝি এমন একটি পত্রিকা কি চিরকাল বিনা বিনিময়ে পড়া যায়? লজ্জা, লজ্জা।

কুন্তল হাজরা
বি, বি, রোড, আসানসোল—৭১৩৩০১

O 'গোধূলি-মন' পেয়ে বিশেষ ভাল লাগলো। দেবী রায় লিখিত অসীম রায়ের লেখাটা বিশেষ ভাল।

স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে যে কবিতা—যা মলয়ের লেখা—লেখাটা পড়ে জীবনের অন্য একটা দিক খুলে যায়।

প্রকাশ কর্মকার/এলাহাবাদ

কবিতা
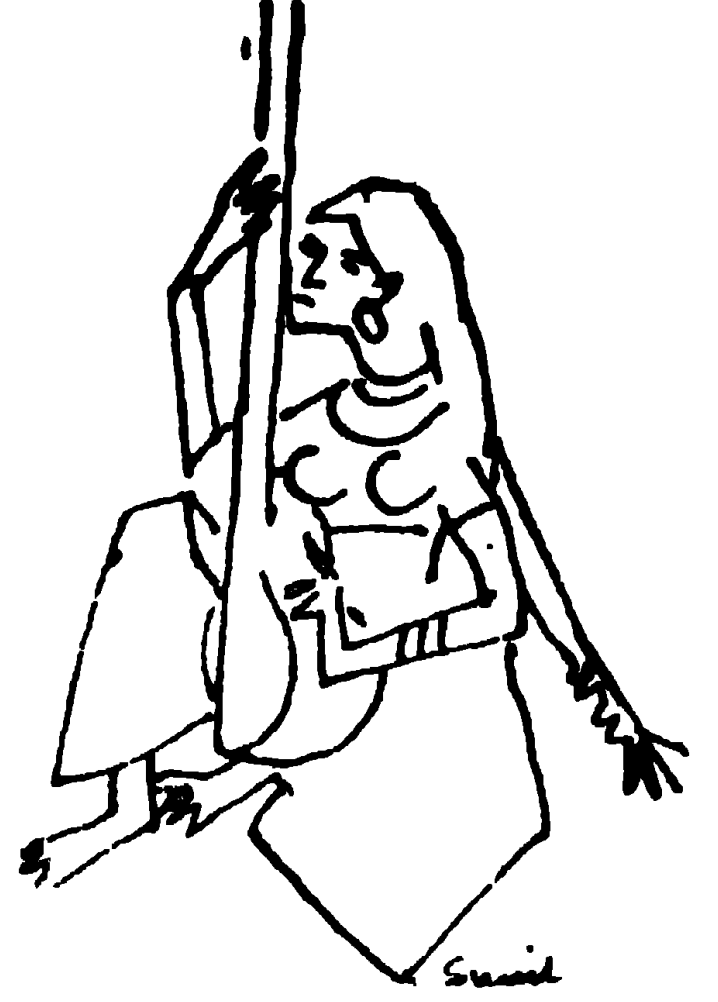
এ-বড়ো আশ্চর্য কথা

(বুদ্ধদেব বসুকে নিবেদিত) / সৌম্যেন অধিকারী

এ-বড়ো আশ্চর্য কথা,
চোখ বুজে স্তনে মুখ রেখে
এখনো মায়ের বুকে নির্ভয়ে ঘুমোয় শিশু।

এ-বড়ো আশ্চর্য কথা,
উদয়াস্ত শ্রমণের পরে
এখনো যুবতীর নিটোল উষ্ণ বুকে
মাথা গুঁজে নির্ভয়ে ঘুমোয় যুবক।

এ-বড়ো আশ্চর্য কথা,
এখনো বৃদ্ধেরা বৃদ্ধাকে পাশে নিয়ে
নীরব নিথর রাতে মুখোমুখি
নীলকণ্ঠ পাখীর গান শোনে।

এ বড়ো আশ্চর্য কথা,
এখনো সূর্যালোকে আকাশের ডাকে,
চড়ুই শাবকের কণ্ঠে
কী আশ্চর্য প্রশান্তির গান॥

বুদ্ধদেবের দ্বিতীয় মানুষ অথবা নিছক প্রেমের কবিতা

অজিত রায়

'জানো নাকো চিরদিন
প্রেমই শুধু কীর্তনের অভীষ্ট বিষয়'
—শামসুর রাহমান

কবিতাকে দেখবার দুটো ভঙ্গি আছে। একটা মাইক্রো, অন্যটা ম্যাক্রো। দুটোই স্ব স্ব ক্ষেত্রে ঠিক। টার্গেটে তীর বেঁধাতে হলে শুধু পাখির চোখটুকু দেখলেই হবে, সত্যি কথা; কিন্তু তার মানে এই নয় যে আশেপাশের অন্য কিছুর অস্তিত্বই নেই। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় এই দুটো ভঙ্গিকেই আমি আশ্রয় করছি।

বাংলা কবিতা যে-ভাবে বিবর্তিত হতে হতে ক্রমে আজ যে একটা 'নির্দিষ্ট' অবয়ব পেয়েছে, সেখানে কবিতা থেকে শুধু 'প্রেমের কবিতা'কে ছেঁটে বের করা এক অবান্তর চেষ্টা। কোন্‌টা প্রেমের কবিতা, আর কোন্‌টা নয়—তার হিসেব নিকেশ হবে কি দিয়ে? বস্তুত, আমি মনে করি, কবিতার কোনো শ্রেণীভাগ হয় না—হওয়া উচিত নয়। অন্তত প্রেমের কবিতা, 'আমিষান্নের ফাঁকে ফাঁকে চাটনির মতো পরিবেশন' নয়। কবিতা মাত্রেই প্রেমের উদ্ভিদ, যা তার আধারও বটে। কেননা এর জন্ম ব্যক্তির দ্বিতীয় মানুষের বাঁশীতে।

হাঁা, দ্বিতীয় মানুষ। ব্যক্তি মাত্রেই দুটো ক'রে মানুষ পুষে রেখেছে নিজের মধ্যে। প্রথমটি কেজো মানুষ, বিষয়ী মানুষ—অন্যকে টপকে ফাঁকিফুঁকি দিয়ে কিংবা অন্য উপায়ে যে শুধু নিজের আখের গোছাতেই ব্যস্ত। আর একটি স্বপ্নচারী পথিক।—সুরের মদে মন মাতিয়ে দেওয়াই যার লক্ষ্য। এই দ্বিতীয় মানুষটি কারো মধ্যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটায়, কারো মনে ঝিমিয়ে মরে, আবার কারো মনে শুধু বাজিয়ে চলে বাঁশি। আর যাদের মন সেই বাঁশির সুরে দোলে—তারাই তো শিল্পী।

তাদের মনের মাটিতে হরদম প্রাণজল থৈ থৈ করছে, সোনা রোদ উপচে পড়ছে, লাবণ্যবেহুঁশ জ্যোৎস্না উঠছে ফুটে। তামাম বিশ্ব তাদের কাছে আকারে-আভাসে ভরপুর। আমাদের বুদ্ধদেব বসু নিছক প্রথম মানুষটির খপ্পরে পড়ে ইাপানিনি ব'লে কিছু ঝুনঝুন-কবি আগরওয়াল-লেখকের দলে মিশে যাননি। পক্ষান্তরে, সেই দ্বিতীয় মানুষটির বাঁশির সুরে অনন্তকে রূপে বাঁধবার জন্যেই বুদ্ধদেব আমাদের নমস্য, প্রণম্য, শ্রদ্ধেয় কবি।

(২)

বৈষ্ণব পদাবলী থেকে বাংলা প্রেমের কবিতার যে-প্রবাহ, রবীন্দ্রনাথে এসে একটি স্থির বিন্দুতে তার পরিণতি। রবি ঠাকুরকে মদীয় সাহিত্যে একটি সুউচ্চ চুড়া ভাবার একজাতীয় বিশেষ মানসিক প্রবণতা কম-বেশি আমাদের প্রায় সকলের আছে। বস্তুতই, বাংলা কবিতা ভুগোলের তিনি স্রোত-বিভাজক। পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করেছেন, যে-সময়ে একদিকে আলো-আনন্দ আস্তিক্য চেতনা আমাদের পুর্বসুরীদের উর্ধ্বমুখী এবং অন্যদিকে একটা আপাত-অস্পষ্ট নেতিবাদী সুর তাঁদের অধঃপতিত করে চলেছে—রবীন্দ্রনাথই তখন স্থিতির দৌত্য করেছেন ওই দুই কোটীর মাঝখানে। অর্থাৎ তিনি এই দু'য়ের মধ্যে স্থিতিরূপী সীমাসন্ধি।

'নিজের কথাটা নিজের মতো ক'রে বলবো'—এই ইচ্ছেটা সেদিনের বাংলা দেশে প্রবল হয়েছিল, আর এ-কথাই অমিত রায় বলেছে, 'এ কথা বলবো না যে পরবর্তীদের কাছ থেকে আরো ভালো কিছু চাই, বলবো অন্য কিছু চাই।' কিন্তু নিবারণ চক্রবর্তীর দুর্ধর্ষ ওকালতি সত্ত্বেও মামলাটি শেষ পর্যন্ত টেঁশে গেল তার কারণ বক্তৃতার পর কবিতাটা যথেষ্ট পরিমাণে অ-রাবীন্দ্রিক হয়ে উঠতে পারেনি। রবি ঠাকুরকে ছাড়িয়ে যেতে হলে যে তাঁর ভগ্নাংশ মাত্র ধার করা যায়না—এটা ধরা পড়েছিল তাঁরই উত্তরসাধকদের কাছে। ভাগ্যগুণে নজরুল গীতিকার ও সুরকার না-হলে তিনি যে 'রবীন্দ্রবিরোধী' বলে পুজিত হতেন, এতে অনেকে সন্দিহান। শুধু নজরুল কেন, আমার মতো অনেকেই স্বীকার করবেন, বাঙালি কবির পক্ষে চলতি শতকের প্রথম দু দশক বড়ো সংকটে গেছে। যতীন্দ্রনাথ, করুণানিধান, কিরণধন, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল, মোহিতলালের পর, সমসময়ে যাঁরা আবির্ভুত হলেন তাঁদের রচনা পরস্পর থেকে এমনই অভিন্ন যে আলাদা করে কাউকে টেনে দাঁড় করিয়ে বলতে পারিনা—'এই স্যাখো অরাবীন্দ্রিক'। আবার বলি, এ-বিপর্যয় রোখবার উপায় ছিলনা, ঐতিহাসিক কারণেই যো ছিলনা। বুড়ো বাঙালিদের কাছে প্রভাবের সেই কারণগুলো ব্যাখ্যা না করলেও চলে। এটাই বাংলা কবিতার পরিণতির চিহ্ন। এতো-সব বলবার পেছনে একটাই কারণ, যে, আমাদের আলোচ্য বুদ্ধদেব বসুর মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ উঁকিঝুঁকি মেরেছেন অহরহ—এবং তা তর্ক ও বৈজ্ঞানিক ভাবেই সম্মত। অতি মাত্রায় আধুনিক হয়েও বুদ্ধদেবের পক্ষে রবীন্দ্র-নাথের প্রিয়শব্দ, বর্ণবিন্যাস—বিশেষত রাবীন্দ্রিক প্রেমের কবিতার যথানির্দিষ্ট ছক ছেড়ে পুরোপুরি বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়নি।

(৩)

তথাচ বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের নিছক বোতল-ফের নন। বুদ্ধদেবের কাব্যে শব্দপ্রয়োগের যে বাহার, বাক্যনির্মাণের যে অন্বয়রীতি, আধুনিকতাবাদ ও কাব্য-দর্শনের স্বরূপে যে দেহধর্মিতার আশ্রয় ও আরোপের যে বিশেষ ভঙ্গি—তা কোনক্রমেই পুর্ববর্তী কোনো অগ্রজের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে না। বিশেষত প্রেমের কবিতা সৃষ্টিতে তাঁর স্বকীয়তা ৭০% নিজস্ব। ভুলে গেলে চলবে না যে কালে তিনি এসেছিলেন

এবং যে-যে পরিবেশে তাঁর মনোদেহ লালিত হয়েছে তাতে তাঁর কবিতার ভাবরূপ ও প্রকরণ বা শৈলীকে প্রভাবিত করার অন্যবিধ উপকরণও মজুত ছিল। এক কথায়, আধুনিক বাংলা কাব্যভাবনা ও কাব্যান্দোলনের ইতিহাসে বুদ্ধদেব এক স্বয়ংস্বতন্ত্র অধ্যায়। অনৈক সমালোচকের ভাষায়, 'আধুনিক কাব্যযজ্ঞে নিষ্ঠাবান ঋত্বিকের মতো অগ্নিচয়ন এবং তার পবিত্রতারক্ষার গুরুভার বুদ্ধদেব বহন করেছিলেন।'

বাংলা কাব্যাকাশে তখন রবির অনল গনগনে, বেরিয়ে গেছে 'পুনশ্চ', এলিয়টের The journey of the Magi-র অনুবাদ, নজরুল যতীন্দ্রনাথ মোহিত-লালের আসর তখন সরগরম এবং 'রাতি হেনু গেনু পিয়া সনে মোরো' গোছের পঞ্চশব্দ ত্যাগের অভীপ্সাবহ্নিও তখন লেলিহান—এমতাবস্থায় লিখতে এলেন বুদ্ধদেব। 'এলেন' কথাটায় কারো কারো আপত্তি থাকতে পারে কেননা ইতিমধ্যে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বন্দীর বন্দনা' (১৯৩০) বেরিয়ে গেছে। কিন্তু আমি বলতে চাইছি, সেই বিশেষ টার্নিং পয়েন্ট—যখন একদিকে 'পরিচয়' অন্যদিকে নবোদিত 'দেশ'-এর দাপানি—তার সন্ধি-রেখার বিশেষ এক বিন্দুতে 'কবিতা' সহ বুদ্ধদেব নামক সূর্যের মধ্যগগনে অভিষেক সমাধা হচ্ছে। সমকালের এক সুন্দর বর্ণনা পাই তাঁরই হাতে—'ততদিনে ইংরেজি সাহিত্যে 'টোয়েনটিজ'-এর রঙিন দিন অস্তমান; অল্ডস হক্সলি ও লিটন স্ট্রেচির ব্যঙ্গ, লবেন্সের সংরাগ; ভার্জিনীয়া উলফের অতি সূক্ষ্ম ভাবনা-জাল—এই সবের উপর দিয়ে পোড়ো জমির হিম হাওয়া বইতে শুরু করেছে।' বলা বেশি, প্রেম-মূলক কবিতাসৃষ্টির স্বতোৎসারিত রসের উৎস হিসেবে এগুলিই কবি বুদ্ধদেবের শিল্পচেতনার সঙ্গে সমন্বিত।

আমরা আলোচনার তাগিদে বুদ্ধদেবের সেই সমস্ত কবিতাগুলি চয়ন করতে পারি—যেগুলিতে তাঁর 'প্রেম'-সংক্রান্ত ভাবনা দৈবপ্রেরিত নিয়তির মতো 'জেগে' উঠেছে। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে, বাছাইয়ের লগ্নে 'ভালো লাগার শেষ যে না পাই' গোছের অসু-বিধের মোকাবিলা করতে আমি অপারগ। ওই যে বললুম, একজন কবির সমগ্র কবিতানিচয় থেকে বেছে-বুছে 'প্রেমের কবিতা' খুঁজে বের করতে বুদ্ধিমান পাঠক কবুল করবেন না রাজি হতে। প্রেম-পুজা-প্রকৃতি কথাগুলো রবীন্দ্রনাথের কাছেও কি পরস্পর-বিযুক্ত বা ছন্নছাড়া ভাব-প্রকরণ ছিল? আমার তো মনে হয়, অন্তত বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে এভাবে, কতকগুলো কবিতাকে 'প্রেমের কবিতা'-র তকমা এঁটে সীমাবদ্ধ করতে চাওয়া গোঁয়ার্তুমি।

বলতে চাইছি- বুদ্ধদেব বসুর কবিসত্তায় মানব, পুজা কিংবা প্রকৃতি ইত্যাদি অন্য কোনো সত্তার প্রাবল্য প্রকাশ পেয়েছে সেটা বড়ো কথা নয়। তাঁর ব্যক্তি-সত্তার দিকটি নিছক অবহেলার নয়,—এবং সেখানে শুধুই প্রেমের অবস্থান। সেই সত্তা কেবলই প্রেমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত। তাঁর মনের মূল ধর্মই হলো—প্রেম।

এমনিতে, আমিও মানি, প্রেম এক ধরনের বানানো, সিউডো, অহংশাসিত, মাংসল, ফ্যান্টাসিজম ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু কবির মনোভূমিতে প্রেম ওরফে যে-বিশেষ 'মমতা'র জন্ম ও লালন তা নিছক 'কল্যাণকামী' বা অন্যের প্রতি 'কোমল উদ্বেগ' নয়—তাতে যৌনতাও মিশেল থাকে। যার কারণে একদিন বলে বসেছি 'সুপর্ণাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না' 'সুপর্ণাকে আমার চাই-ই'। এটা কিন্তু বানানো বা সিউডো নয়। এর ভিত্তি আছে, অস্তিত্বও। এ হলো শ্রেষ্ঠতম অনুভূতি—শ্রেষ্ঠ ধন। মনে পড়ে, রবি ঠাকুর বলেছিলেন, 'সীমার মধ্যেই অসীমের বাস'। অবশ্যি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন অন্য প্রেমের কথা—আনন্দ-চেতনা বা অতীন্দ্রিয় প্রেমের কথা। আমি বলি, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির কোনো 'সম্পূর্ণ সম্পর্কই' আসলে

শারীরিক সন্নিধি ছাড়া গড়েই উঠতে পারে না, এটা সব থেকে টোটাল রিলেশন। মানতেন বুদ্ধদেবও।

কালিদাসের নিরন্তর অনুকরণে 'বর্ষা' ও 'বিরহ' সংস্কৃতকাব্যে প্রধান বিষয় হয়ে আছে। তেমনি 'বৈষ্ণবীয় প্রেম' প্রধান হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের আবহমান প্রতিপত্তির কারণেই। অধিকিন্তু বাঙালির কাব্যসাহিত্য বারো আনাই প্রেম নিয়ে গড়ে উঠেছে বললে আমার নামে জুতোর মালা গাঁথবে কোন একচক্ষু আহাম্মক! আরো জোর দিয়ে বলবো, উত্তর-রবীন্দ্র-কালে এই প্রেম কামুকতারই নামান্তর হয়েছে। পক্ষান্তরে নিরাবয়ব প্রেম পেয়েছে ধরার ধুলোর স্পর্শ। এবং সতর্ক চিত্তে এর পথিকৃত হিসেবে তো বুদ্ধদেব-কেই চিহ্নিত করতে হয়। হ্যাঁ, বুদ্ধদেব। কেননা এই যৌনজ প্রেমই তো জুগিয়েছে তাঁর সাহিত্যের তেল-জল। 'বন্দীর বন্দনা'র সনেটগুলি যাঁদের অধীত, আশা করি তাঁরা আমার সঙ্গে একমত হবেন, যে, বুদ্ধদেব এখানে দেহজ কামনা ও রূপজ উষ্ণ প্রবৃত্তির কয়েদখানায় বন্দী। এখানে তাঁর প্রেম কোনো ক্রমেই রাবীন্দ্রিক বা অতীন্দ্রিয় নয়—বরং অতি মাত্রায় শরীরী। মানুষের জৈবলীলাই এখানে স্পন্দমান—

> 'সন্তসুপ্তোত্থিতজন দেখে যদি গাঢ় চক্ষু মেলি
> অপরূপ রাজকন্যা ব'সে আছে তার শয্যা 'পরে ;—
> গুণ্ঠনে নয়ন ঢাকা, হাসি রেখা ভাসিছে অধরে
> চীনাংশুক উদ্ভাসিয়া সিত অংসে ফুটেছে চামেলি।'

বন্দীর বন্দনায়, 'প্রেম ও প্রাণ' সনেটগুচ্ছের মধ্যে কোনো কোনো অংশে দৃশ্যত মোহিতলাল মজুমদার ও অজিত দত্তের ছায়া এসে পড়লেও, তা দশমিক এক অংশও রবীন্দ্র-অনুসারী নয়। কেন নয়? যেহেতু রবীন্দ্রনাথে 'বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই' বুদ্ধদেব স্বয়ং উপলব্ধি করেছেন—'তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) জীবন দর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়-ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন'। তাই বুদ্ধদেব বাসনা-বিহ্বল স্বরে বলে ওঠেন—

> 'বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
> দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
> রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ-উপবাসী শৃঙ্গার কামনা,
> রমণী-রমণ-রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি।'

বন্দীর বন্দনা থেকেই বুদ্ধদেবের কবি-মানসে জাগে আধুনিক মানসের অন্তর্দ্বন্দ্ব—'আসঙ্গ-বাসনা-পঙ্গু আমি সেই নির্লজ্জ কামুক।' শ্রীযুক্ত প্রদ্যোত সেনগুপ্ত লিখে-ছেন, 'এই অন্তর্দ্বন্দ্বের মূল ঐতিহ্য ও শিক্ষার উপনিষ-দিক মন্ত্রের পবিত্র সংহতির ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের মধ্য ভিক্টোরীয় নীতিবাদী ক্রিয়াশীল ঐতিহ্যের। যৌবনের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার মত্ততায় তখন কবি বুদ্ধদেবের সত্তার ভিত্তিমূল বিপর্যস্ত—দুর্মদ অপ্রতি-রোধ্য কামনার আগ্নেয়গিরি খুলে গেছে। দেহজ কামনায় এখানেই বুদ্ধদের কাছে 'যৌবন অভিশাপ' বলে মনে হয়েছে এবং আধুনিক মানসের অন্তর্দ্বন্দ্বে ঐতিহ্য ও শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব অনুভূতির সংঘাত সমগ্র মানবজাতির হয়ে নিজেকেও…'নির্লজ্জ কামুক' বলে চিহ্নিত করেছেন।'

কিন্তু পরে, তার রূপ বদলে গেছে—মোহিতলাল ও অজিতের ছায়াও গেছে হাপিস হয়ে। রবীন্দ্রনাথের 'সীমার মধ্যে অসীমের বাস' স্বীকার করলেন না বটে, কিন্তু কামনার পরিতৃপ্তির মধ্যেই তিনি ব্যক্ত করলেন—'অমৃতের অপার পিপাসা'। পক্ষান্তরে, প্রেমের শরীরী রূপকে হাড়ে-মজ্জায় 'সত্য' বলে অনুভব করলেও, বুদ্ধদেবের অনুশীলিত মার্জিত শৈল্পিক মন ও রুচি তাঁকে নিছক 'দেহবাদী'র কোঠায় বন্দী করে রাখেনি। আন্তরিক নিবিড়তায় তাঁর আত্মা স্ব-সৃষ্ট অমিতা, রমা, মৈত্রেয়ী, কঙ্কাবতী, অপর্ণা প্রভৃতি দেহী—নায়িকাদের মধ্যে উষ্ণ আদিম শরীরী ঘ্রাণ আকণ্ঠ পান করেছেন যথার্থ—কিন্তু তাদের দেহী রূপের পরমাশ্চর্য যাদু বলে তারা বুদ্ধদেবের কাছে নিছক ভাবলোকবাসিনী হয়েই

থাকেনি। এক দিকে নারীদেহ-সৌন্দর্যের তীব্রতার উপলব্ধিতে মানসিক দুর্বলতা ও তার খেলাপে আয়াস-ক্ষম বিদ্রোহ এবং অপর প্রান্তে আত্মবিরোধ ও অনিকেত মন নিয়ে শরোপম বেদনাকে ডিঙিয়ে চেতনা ও কল্পনাকে জুড়ে অহর্নিশ রোমান্টিক স্বপ্ন সৌধ নির্মাণ করেছেন বুদ্ধদেব। এ তো মহৎ কবিরই লক্ষণ।

(৪)

কবি যে—সে থাকবে বেঁচে। এ রসায়ণের মতো প্রমাণসিদ্ধ। বুদ্ধদেব বেঁচে আছেন তাঁর অনন্যোপম রসিকভাবনার দ্বারা, অসমান্তরাল ঋত্বিক স্বকীয়তার। আমরা তো জানি, বোদলেয়রের কতিপয় কবিতার অনুবাদ দিয়ে যে-কবির কাব্যজীবনের সম্পর্কের সূচনা, —তা তাঁর পরবর্তী জীবনে নিছক 'অন্দ'লগ্নতা' হিসেবে পরিগণিত হয়নি। কেননা 'বোদলেয়রের কবিতা' নামের তর্জমা-গ্রন্থটির মাধ্যমে সেদিনের বাংলা দেশে যে বোদলেয়রী আবহাওয়া তরুণ ও নবজাত কবিদের এক অংশকে ড্রাগের নেশার মতো আতপ্ত আচ্ছন্ন করে রাখতে পেরেছিল, তা প্রকারান্তরে 'বুদ্ধদেবেরই নবজাত প্রভাব' বলে সমালোচক প্রবররা স্বীকার করেছেন। সেই সময়কার বাংলা কবিতার চেহারা বোঝাতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন— 'আত্ম অস্তিত্বের গূঢ়মূল আবিষ্কার, মৃত্যুর বোধ, অসুন্দর শয়তান আর পাপের ধ্যান একদল কবিকে একটি বিচ্ছিন্ন কুঠুরির মধ্যে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এখন। এবং ঐ বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করে বিগত বৎসরে বুদ্ধদেব বসুর বোদলেয়র অনুবাদ প্রকাশকে অন্যতম প্রধান একটি ঘটনারূপে চিহ্নিত করতে হয়।'

বোদলেয়রই শুধু কেন, বাংলার পাঠক-পাঠিকাকে উদ্বোধিত করবার জন্য তিনি এজরা পাউণ্ড, রাইনের মারিয়ার রিলকে, ই ই কামিংস, বরিস পাস্তেরনাক, বাসেন টিভেল, হোল্ডারলিন প্রমুখেরও কিছু কিছু অনির্বচনীয় অনুবাদ করেছেন—যা পূর্বসূত্রহীন নয় মোটেই। বুদ্ধদেবের প্রেমমূলক কবিতার গঠন, মনোভাবের উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্যে এঁদের দানও অন্যান্য। কবিতার শরীরে প্রেমের রঙ ছড়াতে এঁরাও তাঁকে সহায়তা করেছে। বলা বেশি, এইসব বিজাতীয় ভাষার কবি তর্জমাকালে বুদ্ধদেবের মানসপ্রক্ষেপকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উদ্দীপিত করলেও—বুদ্ধদেবের প্রেম-কবিতার যে-বৈশিষ্ট্য তা বাংলায় তৎপূর্বে অন্য কোনো কবির রচনায় পাওয়া যায় না। নানান বর্ণের ছোঁয়া পেয়ে পেয়ে বুদ্ধদেব ক্রমশ কবিকর্মের বিশুদ্ধতার চরম স্তরে পৌঁছে যাবার চেষ্টা করেছেন, এবং সেই বোধ, যা আহৃত হলে নতুন সঞ্জীবনী প্রাণবন্যার দৃপ্ত ভাষণে তিনি শোনাতে পেরেছেন—

> 'পৃথিবী উঠিবে জেগে
> চির অজানা।'

কবিতার অবয়বে, ভাব-ভাবনায় কবি নিজেকে আমৃত্যু ব্যাপৃত রেখেছিলেন সেই অজানা পৃথিবীর আবিষ্কারে। তিনি এ-সত্য অবহিত ছিলেন, যে, একদিন ভস্মীভূত হয়ে যাবে এই পঞ্চভৌতিক শরীর। কিন্তু মিলিয়ে যাবার সেই প্রতীকগুলোও তাঁর অন্তরোত্থিত ও একান্ত অভাবনীয়রূপে মৌলিক। গভীর নিদাঘ যন্ত্রণায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেও সত্যের সেই অনন্য শক্তিকে বুদ্ধদেব অনুভব করেছেন স্বকীয় অনুভূতিতে। এবং তার প্রকাশনাও অননুকরণীয় :

> 'শুধু এই কথাটুকু হৃদয়ের নিভৃত আলোতে
> জ্বেলে রাখি এই রাত্রে—তুমি ছিলে, তবু তুমি
> ছিলে।'

(৫)

কবিজীবনের গোড়ার দিকে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র-মগ্ন হলেও, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুভূতিতে আচ্ছন্ন থাকলেও, মাঝে-মধ্যে তারই সঙ্গে নজরুল-প্রভাব

তাঁকে আচ্ছন্ন করলেও—সমন্বয়ের প্রশ্নে বুদ্ধদেবের স্বতোৎসারিত রসের উৎস হিসেবেই যে শিল্পচেতনা পুষ্ট হয়েছে, তা উপরিধৃত আলোচনাতে স্পষ্ট করা গেছে বলে ধরে নিতে পারি। এখানে বলবার কথা একটাই, যে, অর্বাচীন বঙ্গ-কবিতা আন্দোলন বিষয়ে নানাবিধ গবেষণার নেতৃত্ব দিয়েও, উপলব্ধির প্রক্ষেত্রে বুদ্ধদেব সম্পূর্ণ কেন্দ্রানুগ। উগ্র রবীন্দ্র বিরোধিতা সত্বেও— 'জীবনদেবতা' 'যাত্রী' 'অরূপ' প্রভৃতি কবিতার বিশ্লেষণে ধরা পড়ে—ভাব ভাষা, ছন্দ, পদ-বিন্যাসপ্রকরণ ও প্রকাশভঙ্গিতে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রানুভব থেকে দূরে থাকতে পারেননি। পারেননি, কেননা তিরিশ-চল্লিশ দশকে পারা সম্ভবও ছিল না।

তথাচ, রবীন্দ্রানুসরণে বাংলা কাব্যের মুক্তি নেই—এ-সত্য তিনিই সম্ভবত প্রথম উপলব্ধি করে-ছিলেন। তবু তিনি যে বেরিয়ে আসতে পারেননি সেই আমোঘ রবীন্দ্রালয় ছেড়ে, তার কারণ, তিনি বুঝেছিলেন 'সেই মোহিনী মায়ার প্রকৃতি না বুঝে বাঁশি শুনে ঘর ছাড়'ল ডুবতে হবে চোরাবালিতে।' এদিক দিয়ে বুদ্ধদেবের প্রেম-কবিতার বৈশিষ্ট বিশ্লেষণ খুব তাৎপর্যবহ। ওপরের আলোচনায় দেখতে পাই, বুদ্ধদেব প্রবলভাবে রবীন্দ্র-মগ্ন হলেও, তাঁর প্রেম মূলত বাস্তব, মতান্তরে দেহানুগামী। শুধু কবিতাই নয়, তাঁর গল্প উপন্যাসেরও বিষয়বস্তু হলো কামজ প্রেম ও রূপজ মোহ। ('একদা তুমি প্রিয়ে,' 'সানন্দা', 'অনেকরকম', 'মনের মত মেয়ে' প্রভৃতি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ) এর প্রধান কারণ, তিনি মূলত প্রেমিক কবি। কাব্যের খেয়ালে তিনি হাত দিয়েছিলেন গদ্যে। যে-কারণে রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'কে কাব্য-ধর্মী বলা হয়েছে, সেই একই কারণে গল্প-উপন্যাসে বুদ্ধদেবের কাব্যায়নই পেয়েছে জয়মালা। ফ্রয়েড আর এলিস যুগিয়েছে এর প্রাণ-তত্ব। ফলে যেমন গল্পায়ন তেমনি চরিত্রায়ণও খোলেনি তাঁর। বুদ্ধদেব নিজেই স্বীকার করেছেন: 'খুব সম্ভব আমি স্বাভাবিক গল্প লেখক নই। আমার উদ্ভাবনীশক্তি দুর্বল। ঘটনার চাইতে বর্ণনার দিকে আমার ঝোঁক; নাটকীয়-তার চাইতে স্বগতোক্তির দিকে, উত্তেজনার চাইতে মনস্তত্বের দিকে।...' অর্থাৎ কাব্যধর্মিতাই হলো বুদ্ধদেবের আন্তর-বৈশিষ্ট্য—অনুভূতির উপলব্ধির সত্তাই যেখানে তীব্র। যৌনবোধ উদ্দীপনে ও কাব্যিক ভাষায়ণে তাঁর কৃতিত্ব সর্বজনস্বীকৃত।

অবশ্যি, রূপবর্জিত সুর ও সুর বর্জিত রূপের অস্তিত্ব অলীক ভাবসর্বস্বতা বই তো নয়। এই সুরের বিকাশ তাই হয়েছে শরীরী রহস্যে। 'কল্লোলে' প্রকাশিত বুদ্ধদেবের 'শাপভ্রষ্ট' কবিতাই প্রথম সেই ভগীরথ, যে আনলো 'রজনী হ'লো উতলা'র কাব্যিক সংস্করণ। এই বীজেরই পরিক্রমা পাই দেখতে 'প্রগতি'—যার আধার সম্পূর্ণত কামজ প্রেম। প্রেম কামজ বা যৌনজ না হলে যে প্রাণনের সব লীলা প্রকাশই পেতে পারেনা! তাই বুদ্ধদেব খুঁজে ফিরে-ছেন শরীরী রহস্যের অসীম আকাশ। সমাজ এতটা লাগামছাড়া খেয়াল বরদাস্ত করতে পারেনা ঠিকই—কিন্তু প্রেমের মূল উৎসে পৌঁছনো যায় এরই ডানায় চড়ে।

অবশ্যি বুদ্ধদেব এই পরিক্রমায় সঙ্গী করেছেন এই বিশ্বকেই। নইলে বাস্তবের ছোঁয়া পড়বে কি করে ধরা? এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বুদ্ধদেবের ল্যাজ-মুড়োর ফারাক। প্রেমায়ন ধাক্কা দিয়েছে রহস্যের দোরে। এবং যেহেতু এই দরোজা পুরোপুরি খোলে না, তাই বুদ্ধদেবের দ্বিতীয় মানুষ আশ্রয় নিয়েছে কামনা-বাসনা-আকাঙ্খা-উৎসাহ মথানো যৌবনের জোয়ারে। একথা ঠিক যে 'যৌবনের দৃপ্ত প্রাণের হর্ষকে বুদ্ধদেব বসু অভিশাপ বলে মনে করে-ছেন— সেখানে 'সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে, অসহ্য লজ্জায়'—কিন্তু সৃষ্টিশক্তির এই সজাগতা বুদ্ধদেবের মধ্যে

আধুনিক কবিতার নবোন্মেষিত আর একটি নতুন পর্বকে সূচিত করেছিল, সেটা ভুলে গেলে অন্যায় হবে।

তীব্রতম অনুভূতি জৈব ও যৌব স্পন্দনে বুদ্ধদেবের প্রেমের কবিতা বেয়ে ঝরে পড়েছে যৌবনের উদ্বেলতায়। শ্লীলতার গণ্ডিতে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি এঁরা আর ওরা এবং আরো অনেকে' এবং 'রাতভোর বৃষ্টির' লেখক। স্থায়িত্ব পেয়েছে চিরন্তন নর ও নারীর যৌন-প্রেম। প্রকৃতি ও মানবের সংসান্নিধ্যে প্রেমের অনন্যোপম উপস্থিতি এভাবেই আমাদের চমৎকৃত করে। উত্তর-চল্লিশ কালে এসে বুদ্ধদেবের প্রেম-চেতনা বাস্তবের ধরা স্পর্শ করেছে, বস্তুনিষ্ঠা হয়েছে আরো পাকা। জীবন হাত খুলে মিতালি গেড়েছে রহস্যের সঙ্গে। সুর রূপ ধরেছে এই যুগে। ভাষা-ভঙ্গি জয়েসের ঢঙে, টানা ঝড় বয়েছে এলোমেলো শব্দের এবং এখানে ধরা পড়েছে কামিংস, অ্যালেন, বোদলেয়রী প্রভাব। উত্তর-রৈবিক যুগের বাংলা কবিতার বুক এভাবেই ধরা পড়েছে।

(৬)

বৈশিষ্ট্য-বিশ্লেষণের পরেও বুদ্ধদেবের প্রেমের কবিতা নিয়ে আর কী লেখার থাকতে পারে—পাঠকের মনে বুঝি এই আশঙ্কা বা প্রশ্ন উঠলো। আসলে, এতদিনে আমার বুদ্ধ-পুজোর তথ্য যে ফাঁস হয়ে গেছে সেটা ঠাহর করতে পারি। অনেকেই হয়তো এ-প্রবন্ধে পক্ষপাতিত্বের পুঁজরসও দেখিয়ে দেবেন। তথাচ, ঐ যে গোড়ায় বললুম, 'ভালো না লাগার শেষ যে না পাই!' টনটন করে মনটা। এইটুকুতেই শেষ করে দেবো বুদ্ধদেব বসুর দ্বিতীয় মানুষটার কথা? আরো ছিল যে লেখার! উদ্ধৃত-বাহুল্য থেকে নিজেকে বিরত থেকে, সব কি গেল ধরানো—যা ছিল অভীপ্সা?

বুদ্ধদেব বসু উত্তর-রবীন্দ্র পর্বে এক সুউচ্চ গিরি-চূড়া, যা থেকে বিগলিত হয়েছে মদীয় যুগের উপজীব্য বহু বিচিত্র কাব্যধারা। অর্বাচীন বাংলার রথযানের চাবুক ও লাগাম পরিচায়নের ভার যে-কবি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নিয়েছিলেন—তাঁর মূল্যায়ণ কি সামান্য এই মুষিক-অঙ্গুলিতে সম্ভব। তার চেয়ে বরং এই আলোচনাকে তাঁর 'প্রেমের কবিতা'র বিশ্লেষণের প্রাথমিক খসড়া বলেই পরিগণিত করা হোক—এইটুকু আব্দার করবো। আজকের পাঠক-পাঠিকার জ্ঞান-বৃত্তের পরিধি এর মাধ্যমে যদি সামান্যতমও বৃদ্ধি পায়—তবে জানবো, সে-ই আমার চরিতার্থতা। ●

সংবাদ

O উৎসব : পরিবেশ '৮৬

ভারত সরকারের জাতীয় পরিবেশ চেতনা কর্মসূচী অনুযায়ী সেণ্টজন্স এ্যাম্বুলেন্সের হুগলী জেলা শাখার পরিচালনায় এবং পশ্চিমবঙ্গ ভলান্টারী হেলথ এ্যাসোসিয়শনের উদ্যোগে ও পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশ মন্ত্রক, রাসবিহারী হেলথ ইনষ্টিটিউট, চন্দননগর পৌর প্রতিষ্ঠান ও চন্দননগর লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায় ২৫শে ও ২৮, ২৯ ও ৩০শে ডিসেম্বর চার দিনব্যাপী এক উৎসবের মাধ্যমে পালিত হোল পরিবেশ '৮৬ অঙ্কন ও পোষ্টার প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে ২২৮ জন ও ১৩ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। অঙ্কনে ৪৬টি পুরস্কার ও ৫০ জনকে মানপত্র প্রদান করা হয়।

পরিবেশ চেতনা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় হুগলী জেলার ছটি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। তারমধ্যে পারদর্শিতার জন্য রৌপপদক পান ভদ্রেশ্বরের সাইন্টিফিক্।

চারদিনব্যাপী এই উৎসবানুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন চন্দননগরের মহকুমা শাসক রঞ্জনা মুখোপাধ্যায়।

২৮ ও ২৯ তারিখের আলোচনা চক্রে অংশ গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় ডঃ শঙ্কর সেবক বড়াল, হুগলী জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জেড হোসেন, ডাঃ ডিঃ চক্রবর্ত্তী, এ, রায়, ডাঃ ডি, রায়, লোকসভার সদস্য ডাঃ আর, এন পোদ্দার, ডাঃ কে, পি, সেনশর্মা, ডঃ বি. সেনগুপ্ত, ডাঃ পি কে ঘোষ, ডাঃ এ, সরকার প্রমুখ।

৩০শে ডিসেম্বর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চন্দননগরের পৌর প্রশাসক শ্রীঅমিয় দাস। পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রী কে, বিশ্বাস।

O মাননীয় তথ্যমন্ত্রীর সাথে এইচ, ডি, ই, এ-র প্রতিনিধিদের আলোচনা বৈঠক।

হুগলী জেলা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা সমূহের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে হুগলী জেলা পত্র-পত্রিকা সম্পাদক সমিতির পক্ষে এক প্রতিনিধিদল মহাকরণে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রভাস ফদিকারের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উল্লেখ্য সম্প্রতি এইচ ডি, ই,এ-র পক্ষে জেলার সম্পাদকবৃন্দের স্বাক্ষরিত যে দাবী সনদ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে পাঠানো হয় তার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি এই প্রতিনিধিদের আহ্বান জানিয়েছিলেন মহাকরণে তাঁর কক্ষে। সমিতির পক্ষে প্রতিনিধিদলে ছিলেন সাধারণ সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভড়, অন্যতম সহঃ সভাপতি শ্রীশিবরাম কুণ্ডু ও অন্যতম সহযোগী

সম্পাদক শ্রীপ্রবীর মুখোপাধ্যায়। সরকারের পক্ষে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ছাড়াও জয়েন্ট ডিরেক্টর শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনায় প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড প্রদান সম্পর্কে বর্তমান তথ্য বিভাগের নীতি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, জেলা তথ্য দপ্তর থেকে প্রতি পত্রিকা পিছু অনধিক দু'টি কার্ড দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া আছে। মন্ত্রী বলেন, প্রেস কার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পত্রিকাকে বিজ্ঞপন তালিকাভুক্ত হতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

সান্যাল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জেলার বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তরের পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যের টেণ্ডার বিজ্ঞপ্তি জেলার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের ব্যাপারে সমিতির প্রতিনিধিদের বক্তব্যের সাথে মন্ত্রী মহাশয় একমত হয়ে জানান, এ সম্পর্কে তথ্য বিভাগের নির্দেশ ইতিমধ্যেই জেলার বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তরে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। প্রতিনিধিবৃন্দের অনুরোধে মন্ত্রী মহাশয় এই বিজ্ঞপ্তি জেলা তথ্য আধিকারিকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিতে পুণরায় পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেন এবং তার অনুলিপি সমিতির সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠানোর আশ্বাস দেন।

বিজ্ঞাপনের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে মন্ত্রী মহোদয় কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপনমূল্যের চেয়ে রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপনমূল্য অধিক বলে দাবী করলে সমিতির পক্ষে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞাপন মূল্য ডি. এ. ভি. পি-র তুলনায় কম। মাননীয় মন্ত্রী এরপর প্রতিনিধিবৃন্দকে বিজ্ঞাপনমূল্য পুনর্বিবেচনার আশ্বাস দেন।

জেলায় প্রেস কর্ণার স্থাপন ও জেলার উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সম্পর্কে জেলার সাংবাদিকদের সরেজমিন দেখানোর বিষয়টি সভাধিপতি ও সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকদের ইতিমধ্যেই তথ্য বিভাগের পক্ষে অবগত করা হয়েছে বলে মন্ত্রী জানান।

পুলিশ সুপারের অধস্তন মহল থেকে সংবাদ সংগ্রহের বাধা স্বরূপ স্বরাষ্ট্র বিভাগের নির্দেশটি সংবাদপত্রের অধিকারের ওপর সরকারী হস্তক্ষেপ—প্রতিনিধিদের এই বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, একমাত্র 'ল এণ্ড অর্ডার' ক্ষুণ্ণ হতে পারে কেবল এই জাতীয় সংবাদ ছাড়া অন্যান্য সংবাদের ক্ষেত্রে ঐ অর্ডার প্রযোজ্য নয়। ঐ সার্কুলারের যাতে অপব্যাখ্যা না হয় সে সম্পর্কে যথাযত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে মন্ত্রী জানান।

বিজ্ঞাপনের আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি, সরকারী উদ্যোগী সংস্থার বিজ্ঞাপন প্রদান, ছোট সংবাদপত্রকে সহজশর্তে ঋণদান ইত্যাদি অন্যান্য কয়েকটি দাবী সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী তেমন কোন আশ্বাসবাণী দেন নি।

পরিশেষে, সাম্প্রতিক পত্র-পত্রিকা প্রেরণের ডাকমাশুল বৃদ্ধির নির্দেশ বাতিল করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ সৃষ্টি করার জন্য তথ্যমন্ত্রীর হাতে সমিতির পক্ষে আজ একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

মাননীয় মন্ত্রীর সাথে সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দের এবারের আলোচনা বৈঠক ফলপ্রসূ হয়।

প্রতিনিধিবৃন্দকে মন্ত্রী অভিনন্দন জানান কেননা তাঁর ইচ্ছেমত হুগলী জেলাই প্রথম একসাথে বসে নিজেদের সমস্যা নিয়ে পরস্পর আলোচনা করে পরে সম্পাদকদের স্বাক্ষরিত দাবীসনদ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পেশ করে।

O যথোচিত মর্যাদায় আটত্রিশতম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন

দেশের অন্যান্য স্থানের মত হুগলী জেলার সর্বত্র আজ আটত্রিশতম প্রজাতন্ত্র দিবস যথোচিত মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়। জেলার সরকারী পর্যায়ের মূল অনুষ্ঠানটি হয় চুঁচুড়া ময়দানে। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর সেখানে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন বর্ধমান বিভাগীয় কমিশনার মিঃ এল, বি, পারিয়ার। এছাড়া শ্রীরামপুর, চন্দননগর ও আরামবাগ মহকুমা আদালত প্রাঙ্গণেও প্রজাতন্ত্র দিবসোপলক্ষে সরকারী পর্যায়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। এই সব অনুষ্ঠানে অসামরিক প্রতিরক্ষাবাহিনী, অগ্নিনির্বাপকবাহিনী, হোমগার্ড-বাহিনী জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী ছাড়াও স্থানীয় বহু সাংস্কৃতিক সংস্থা কুচকাওয়াজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে।

O পত্র পত্রিকার সমিতির সভা

১৮ই জানুয়ারী পল্লীডাক পত্রিকা সম্পাদক ও সমিতির অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা শ্রীইন্দুভূষণ মুখার্জীর নওগার বাড়ীতে হুগলী জেলা পত্র পত্রিকা সম্পাদক সমিতির এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি অধ্যাপক তারাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মুখপত্র সম্পাদক। সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভড় (সত্যলোক ও শিশুপ্রিয়) আলোচ্য বিষয়গুলি সভায় উপস্থাপিত করেন। সমিতির পক্ষ থেকে ২১শে জানুয়ারী রাজ্য তথ্যমন্ত্রী প্রভাস ফাদিকারের নিকট এক ডেপুটেশন দল দেখা করবেন এবং নানারূপ দাবি দাওয়া উপস্থাপিত করবেন বলে স্থির হয়। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ছোট পত্রিকার ডাকমাশুল ৫ পঃ থেকে ১৫ পয়সায় বর্ধিত করায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং এর বিরুদ্ধে রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার প্রস্তাব নেওয়া হয়। শ্রীরামপুরে হুগলী জেলা বই মেলায় সমিতির পক্ষ থেকে একটি স্টল খোলার প্রস্তাব নেওয়া হয়। সভায় স্বপ্ন সবুজ সম্পাদক শ্রীগোঁসাইলাল দে, চিকণ সম্পাদক শ্রীমেঘনাদ দাস, বন্দনা সম্পাদক শ্রীঅমরনাথ পাশী, যোগাযোগের সম্পাদক শ্রীসমীর ঘোষ এবং শ্রীরামপুর সমাচারের শ্রীসনৎ প্রামাণিক উপস্থিত ছিলেন। পল্লী ডাকের প্রবীর মুখার্জী সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন।

O শঙ্খনগর সাহিত্য সংসদ-এর শারদ সংকলন প্রতিযোগিতা

গ্রামীণ শঙ্খনগর সাহিত্য সংসদ-এর ১০ম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে গ্রাম বাংলার ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার 'শারদ সংকলন প্রতিযোগিতা'। পত্রিকা পাঠানোর শেষ তারিখ ১লা মার্চ, '৮৭।
যোগাযোগ : **মানব বিশ্বাস**

সম্পাদক/শঙ্খনগর সাহিত্য সংসদ
বাঁশবেড়িয়া-৭১২৫০২
হুগলী/পশ্চিমবঙ্গ

○ 'শিল্প ও সাহিত্য' পত্রিকা পুরস্কার ১৯৮৬ (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক এবং সংশ্লিষ্ট সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে 'শিল্প ও সাহিত্য' পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত যে কোন লিটল ম্যাগাজিন অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

প্রতিযোগী পত্রিকাগুলির ১৩৯৩ বঙ্গাব্দের শারদ সংখ্যা/১৯৮৬ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা এবং এইসব সংখ্যায় প্রকাশিত গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধগুলির ভিত্তিতে বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী—

প্রকাশন সৌকর্যের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্পাদক,
শ্রেষ্ঠ প্রচ্ছদের জন্য প্রচ্ছদশিল্পী,
শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য প্রবন্ধকার,
শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য কবি
শ্রেষ্ঠ গল্পের জন্য গল্পকার

প্রত্যেককে একটি পুরস্কারে সম্মানিত করা হবে।

প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের ১৩৯৩ বঙ্গাব্দের শারদ-সংখ্যার/অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮৬ বিশেষ সংখ্যার পাঁচটি কপি আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ তারিখের মধ্যে আমাদের দপ্তরে জমা দিতে হবে।

কোন প্রবেশ মূল্য নেই। তবে সম্পাদক/পত্রিকার নাম ও ঠিকানা লিখিত দুইটি পোস্টকার্ড (১৫ পয়সার ডাকটিকিট যুক্ত) এবং একটি খাম (৫৫ পয়সার ডাকটিকিট যুক্ত) এবং সাদা কাগজে নিম্নোক্ত বিবরণাদি সহ পাঁচ (৫) কপি পত্রিকা জমা দিতে হবে :

পত্রিকার নাম, রেজিষ্ট্রেশন নম্বর (যদি থাকে) প্রকাশনবর্ষ ও সংখ্যা, সম্পাদকীয় দপ্তরের ঠিকানা।

যুগ্মসম্পাদক/সহকারী সম্পাদকসহ সম্পাদকদের নাম ও ঠিকানা, প্রচ্ছদশিল্পীর নাম ও ঠিকানা।

উপরোক্ত আবশ্যিক তথ্যাদির সঙ্গে প্রতিযোগী পত্রিকার সম্পাদক/সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধের নামের তালিকা, ঐ পত্রিকার যে পৃষ্ঠায় রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছে সেই পৃষ্ঠাগুলির সংখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট/লেখক কবিদের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা সহ পৃথক ভাবে জমা দেওয়া যেতে পারে।

তবে 'শিল্প ও সাহিত্য' পত্রিকার বিচারকমণ্ডলীই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তর (৩/২এ, চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৫) ব্যতীত নিম্নলিখিত ঠিকানাতেও প্রতিযোগিতার জন্য পাঁচকপি পত্রিকা (প্রয়োজনীয় তথ্যাদী ও খাম পোস্টকার্ড সহ) ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ তারিখের মধ্যে জমা দেওয়া যাবে—

অরিন্দম ঘোষ
পি ৩, সি. আই. টি, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৩

পুস্তক পর্য্যালোচনা

বিশেষ পেলাম, নির্বিশেষও কিছু

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

আলোচ্য গ্রন্থ :

১। বালক ও নেবু ফুলের গল্প/মনোরঞ্জন খাঁড়া ইন্দ্রাণী প্রকাশন, ২২/৩ বালিগঞ্জ ষ্টেশন রোড, কলি-১৯ দাম ৮ টাকা

২। এই মেঘ ও জ্যোৎস্না জহরলাল বেরা মহাপৃথিবী ১১ ঠাকুর দাস দত্ত ১ম লেন, হাওড়া-১, দাম—৫ টাকা

৩। রূপময়ী বাংলার আঙিনায়/দুর্গাদাস ব্যানার্জী বারাসত, দশভূজাতলা, চন্দননগর, হুগলী, দাম—১২ টাকা

৪। হিন্দোলের পাণ্ডুলিপি/গজেন্দ্রকুমার ঘোষ উত্তর প্রবাসী প্রকাশনী, স্যুটে, সুইডেন অথবা, এম. এল. ঘোষ, পি—২৭ গড়িয়া পার্ক কলি—৮৪, দাম— ?

প্রাক কথন :

চার কবির চারটি স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থ পড়লাম। অথচ কোথায় যেন আশ্চর্য একটা মিল রয়ে গেছে। চারটির তিনটিতে কবিতার মূল বিষয় নারী-প্রেম। অপরটিরও প্রেম, তবে মূলতঃ জন্ম ভূমি কিংবা প্রকৃতির প্রতি। চারটি কাব্যগ্রন্থকে পৃথকভাবে আলোচনা করতে ইচ্ছে হ'লনা। তাই আলোচনাটিকে একটু ভিন্ন-ভাবে সাজালাম।

জং ধরা কবিতার ভাঙচুর খেলা

নির্বাচিত উক্তি :

মেঘনা ও মেঘনা
মুখ তুলে কথা কও, কথা কও
কেন হায়! মোহনা—
দ্বীপের ভিতর এক হও
তাকি তুমি বুঝনা ?

(মেঘনা/জহরলাল বেরা)

(২)

ভাত ছাড়া প্রেম হয়না কভু
সত্যি কি তাই ? হয়তো বা প্রেম নেই
এসব কেবল অপদার্থের বুলি

(প্রেম/গজেন্দ্রকুমার ঘোষ)

(৩)

আমি মেদিনীপুর আমার রক্তের ঘুলঘুলিতে
ক্ষুদিরাম চোখের আগুন
হাহাকারে ভয়াল করব পৃথিবীর আকাশ
যন্ত্রীর মায়াধরা পিঠে রাখবো কাল-কেউটে
অভিশাপ
একদিন এখানে এই কাঁসাই এর চরের মাটিতে
এই স্কিরাই-এ
দেখাবো সিজন ফ্লাওয়ার

(জলে ভাসে মেদিনীপুর/মনোরঞ্জন খাঁড়া

(৪)

বণিকের মানদণ্ডে কেমন করে রাজদণ্ড দৃঢ় হ'ল
এই বাংলায়—বোঝাও—বোঝাও

সব ফুল রক্তজবা যেন, সব দিকে অতীতের রক্ত
ঝরে—
মনে হয়ঃ অত্যাচার পাপ শোষণ অনাচার
প্রগলভতায় সৃষ্টি করে নয়
(২৩ নং কবিতা/দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)

প্রাসঙ্গিক মন্তব্য ঃ

চার কবির চারটি কাব্যগ্রন্থের প্রতিটিতেই এ ধরণের কিছু ছত্র পাওয়া যাবে। এবং সেগুলি পড়লেই বোঝা যাবে কাব্যমান কোন স্তরে পৌঁছেছে। কবিতা ভেদে কিংবা একই কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে মানের উত্থান-পতনও লক্ষ্য করা যায়। বোঝা যায়, অনুশীলন চলছে। চলুক, চলাই দরকার। গাছে না উঠতে-কাঁদি কোথায় হয়, কিসে হয় জানিনা, অন্ততঃ কাব্য-সাহিত্যে হয়না, হওয়া উচিতও নয়। বর্তমান অংশের শিরোনাম, জহরলাল বেরার কবিতা থেকে নিয়েছি।

আমরা শুধু ভান করি অজুহাতে ডোবাই লেখণী

'উপবীতে মন্ত্রে যেমন ধর্মধ্বজী ব্রাহ্মণ বাঁচে'। শিরোনাম সমেত উদ্ধৃতিটি মনোরঞ্জন খাঁড়ার 'কবি' নামক কবিতা থেকে নিলাম। খুবই সত্যিকথা উচ্চারণ করেছেন মনোরঞ্জন। প্রায় এক দশক ধরে কবিতা লিখছেন তিনি। সমকালকে ছুঁয়ে-ছেনে দেখার পক্ষে সময়টুকু তো তেমন অল্প নয়। উনি ঠিকই বুঝেছেন। ব্যক্তিগত প্রেম-অপ্রেমের কবিতায় যদিও বা কিছুক্ষেত্রে কবিকে পাওয়া যায়, ছোঁয়া যায় কিন্তু যখনই দেশ-জাতি, মানুষের প্রতি কমিট-মেণ্ট, তখনই যেন কত দূরের তিনি। গতানু-গতিক উচ্চারণই হয়ত এই দূরত্ব-সৃষ্টির জন্যে দায়ী। তবে আজকালকার কবিতায় পোয়েটিক এ্যাবসেন্টিজম-ও যথেষ্ট। প্রকৃতই অনুভ ভাষণে ভারাক্রান্ত আজকের অধিকাংশ কবিতা। সেক্ষেত্রে মনোরঞ্জন আত্ম সমালোচনা বা অন্যের সমালোচনা, যা-ই করে থাকুন না কেন, উভয়ই গ্রাহ্য হ'তে পারে।

লেখা হয় পেঁচার বিষয়, শিশির উজ্জ্বলতা

নির্বাচিত উদ্ধৃতি ঃ

'বৃষ্টি হয় তারপরও বৃষ্টি হয় বৃষ্টি থামে গাছ থাকে
আর
ভিতর থেকে কারুর বিরহী দুপুর বহুদূর চন্দ্রাকার
বিঁধে ফ্যালে
এরকম গল্প আর থাকেনা—এরকম গল্পের মাঠ,
মাঠের কাহিনী
কাহিনীর পালক কিম্বা দাঁড়কাকের অবিরাম উড়ে
যাওয়া'
(ভাঙাপোল/মনোরঞ্জন)

(২)

তবু ঃ তারপর—কাল কিছু গেলে—দূরে
নিরুদ্দেশে কোথায়
সে হারিয়ে যায়—কথায় কথায়—
সাঁঝের বাতি ঘরে ঘরে জ্বলে—লক্ষ্মী শাঁখ বাজে
তখন, বাংলার গ্রাম ছেড়ে মন চলে যায়—
আকাশের ঘন অন্ধকারে—দূর দ্রাঘিমায়
(১৫ নং কবিতা/দুর্গাদাস)

(৩)

তাই আজ বিংশ শতাব্দীর অবশেষে
তোমার খোঁজে যাযাবর হ'য়ে ঘুরি
ভারত থেকে রোম আর মিশরে
এথেন্স লণ্ডন আর
প্যারিসের চিত্রশালায়

(তোমার খোঁজে/গজেন্দ্র ঘোষ)

(৪)

দাঁড়াবো এবার ম্লানতর নদীটির তীরে
যেখানে যেমনভাবে ক্ষয়ে যায়, ভেঙে যায় তীর
জলের লবণতা, বালুকার চর
সেভাবেই টেনে নেব তাকে নিকটে আমার।

(তাকে/জহরলাল বেরা)

প্রাসঙ্গিক মন্তব্য :

প্রথমেই বলি বর্তমান অংশের শিরোনামটি নিয়েছি দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি কবিতা থেকে। ভূত মানে যদি 'অতীত', এটুকুও মনে রাখি তাহলে অনায়াসে বলতে পারি, আলোচিত চারটি গ্রন্থের বহু কবিতাই লিখিত হয়েছে জীবনানন্দের ভৌতিক প্রভাব ও প্রেরণায়। কোনোটাতে বেশি, কোনোটাতে কম—এই-যা। জহরলাল বেরা তো মায়ামৃগ' নামক একটি কবিতা জীবনানন্দকেই উৎসর্গ করেছেন। তাও এইভাবে – "৺কবি জীবনানন্দ দাশকে"। অতিরিক্ত মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

জলের রঙ নেই জেনেও নানা রঙে····

নানা রঙে, কি? 'তাঁকে আঁকতাম'। হ্যাঁ এরকমই লিখেছেন 'কবিতায় বৃত্ত' কবিতাটিতে গজেন্দ্রকুমার ঘোষ। তাঁর মূল কাব্য-ভাবনা যেহেতু নারী-প্রেম কেন্দ্রিক, তাই কবিতাগুলির সব কটি প্রেম-সম্পর্কিত না হ'লেও, তিনি তাঁর গ্রন্থে একটি তকমা দিয়েছেন 'প্রেমের কবিতা' ব'লে।

দেশীয় চিরাচরিতের প্রতি অনুরক্ত, সমর্পিত এই কবির প্রবাসজীবন, নগরজীবন থেকে উঠে আসা বিষাদ, তাঁকে বিপাকে ফেলে এক অদ্ভুত বৈপরীত্য নিয়ে হাজির হয়েছে তাঁর কবিতায়। শরীরকে অস্বীকার করেনা তাঁর প্রেম। জীবন-যাপনের অনেক অনুষঙ্গও উঠে এসেছে তাঁর কবিতায় অবলীলায়।

মুখবন্ধ থেকে জানলাম তাঁর কবিতায় আধুনিক সুইডিস কবিতার আঙ্গিক ও প্রকাশ পদ্ধতির সুর স্পর্শ ঘটেছে। আমার কিন্তু বেশ অবাক লাগলো। জাপানী হাইকু-সেনরির্ড, উর্দু শায়েরী, ছড়া, পঞ্চাশের দশকের বাংলা কবিতার ছাঁদ ইত্যাদির প্রভাব বেশ চোখে পড়ে। তবে কি আধুনিক সুইডিস কবিতার সুরটি এইরকম?

বাংলা মুদ্রণ যন্ত্রের অভাবে সুদূর সুইডেন থেকে হাতের লেখার মুদ্রিত রূপ দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গ্রন্থখানি। এ এক ব্যয়সাধ্য, পরিশ্রম সাধ্য, সৎ ও প্রশংসনীয় প্রয়াস নিঃসন্দেহে। তাঁকে অভিনন্দন। তবে আগামী প্রকাশনায় বানান ভুলের দিকে সতর্ক নজর দিতে হবে।

সংক্ষেপে আরও কিছু কথা, অবশেষে

মনোরঞ্জনের জীবনবোধ, প্রেম বিরহ, সুখ-দুঃখ এমন কিছু বাক-প্রতিমায় প্রকাশ পেয়েছে, যা সত্যিই সুন্দর এবং অবশ্যই পরিণতির প্রতিশ্রুতি রাখে। তবে সামাজিক দায়বদ্ধতার থেকে

তাঁর আত্মগত ভাবের প্রকাশেই স্বতঃস্ফূর্ততা বেশি লক্ষ্য করা যায়। জহরলাল বেরার কবিতার আঙ্গিক ক্ষণে ক্ষণে পাল্টে যায়। বোঝা যায় তিনি নিরীক্ষারত। কয়েকটি কবিতা বেশ ভালো লেগেছে। কিন্তু যা লিখবো, তাই গ্রন্থভুক্ত করবো এমনটা হওয়া বোধহয় উচিত নয়। তাই নয় কি?

অনেকগুলি উজ্জ্বল পংক্তি উপহার দিয়েছেন গজেন্দ্রকুমার ঘোষ। তাঁর স্বাতন্ত্র সেখানে পরিস্ফুট। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের এটি চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থও বেরিয়েছে ব'লে শুনেছি। তিনি কবিতায় প্রবীণ, বয়সেও তেমন নবীন নন। তাঁর কবিতায় প্রবীণতার পরিণতির ছাপ স্পষ্ট! প্রকৃতি প্রেম, বিশেষ ক'রে এই বাংলার রূপ-অরূপ নিয়ে একটি পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ রচনা, তাঁর মাতৃভূমিকে ভালোবাসার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আলোচিত চার গ্রন্থপাঠে আশাকরি পাঠকবর্গ আগ্রহী হবেন; কেননা এর কোনোটিতেই দুর্বোধ্যতার কোনো মোড়ক নেই।

প্রসঙ্গ : গোধূলি-মন

ওদেশে এসে অবধি আপনাকে বোধহয় লিখে উঠতে পারিনি। তার জন্য খুবই দুঃখিত এবং লজ্জিত। এবার দেশে এসে আপনাদের যতটুকু সহায়তা ও সহযোগিতা পেয়েছি, তার জন্য আমি চির কৃতজ্ঞ। গোধূলি মন যে কবিসভার আয়োজন করেছিলেন তার জন্যও আমার তরফ থেকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একটা পাঠক ও লেখক গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিতি হওয়াতো সৌভাগ্যের বিষয়। এর জন্য আপনার কাছে আমি বন্ধুত্বের বন্ধনে আরো বাধিত হলাম।

গত সংখ্যা উত্তর প্রবাসী সময় মতই প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতায় পত্রিকাগুলো জাহাজে পাঠিয়েছি। পেতে পেতে জানুয়ারীর মাঝামাঝি। তখন সন্দীপ বাবুর কাছ থেকে এক কপি সংগ্রহ করে নেবেন। গোধূলি-মন থেকে অনেক খবর ও লেখা ছাপানো হয়েছে।

গত ৪ঠা অক্টোবর দেশ পত্রিকায় উত্তর প্রবাসীর সাহিত্য পুরস্কারের সংবাদ ছবিসহ প্রকাশিত হয়েছে দেখে থাকবেন। তা ছাড়া ১৮ই অক্টোবরের 'দেশে' সুভাষ মুখোপাধ্যায় চিঠির দর্পণে; ১৯৫২ সালে তাকে লেখা আমার একটি চিঠি প্রকাশ করেছেন।

গজেন্দ্রকুমার ঘোষ
বক্স-২০৬১, সুর্টে সুইডেন

আমরা ভারতবাসী
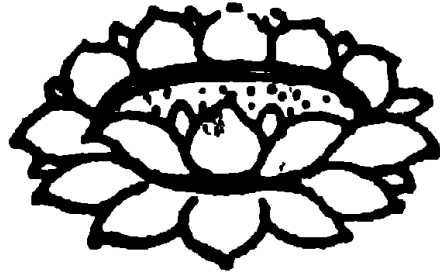
আমাদের আদর্শ হল

গণতন্ত্র

সমাজবাদ

ধর্মনিরপেক্ষতা

ন্যায়বিচার

স্বাধীনতা

সাম্য

সৌভ্রাতৃত্ব

সম্প্রীতি

একতা

অখণ্ডতা

শান্তি

প্রগতি

আমাদের সাধারণতন্ত্রী দেশে এগুলি বাস্তবায়িত আদর্শ।

চিরদিন এই আদর্শ সমূহের জন্যই আমরা কাজ করব।

davp86/404

Member—All India Small & Medium News Paper Association, Delhi.
GODHULI-MONE N. P. Regd. No. RN. 27214/75 January-Feb '87 (পৌষ-মাঘ '৯৩)
Vol. 29, No. 1 & 2 Postal Regd. No. Hys-14 Price—Rs. 2·00 only

জাতীয় সংহতি ও অগ্রগতি অব্যাহত রাখুন

প্রজাতন্ত্র দিবসের আহ্বান

স্বাধীনতার আশীর্বাদ ও দেশ বিভাগের অভিশাপ মাথায় নিয়েই ভারতের অন্যতম অঙ্গরাজ্য এই পশ্চিমবঙ্গের যাত্রা শুরু। অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে আজ তার অগ্রগতি দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। বিগত দশ বছরে সেচ ব্যবস্থা কৃষি উৎপাদন, সুষম খাদ্য বণ্টন, ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার, স্বাস্থ্য রক্ষা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, মৎস্যচাষ, বনজ সম্পদ বৃদ্ধি, সমাজ কল্যাণ, পরিবহন প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য। নতুন শিল্পনীতির ফলে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত হয়ে রাজ্যের অর্থনীতি ও কাজের সুযোগ বৃদ্ধির উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার অঙ্গনে এই রাজ্যের অর্থ সংস্থান ও সাফল্য সমগ্র ভারতে প্রথম সারিতে। তফশিলী ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়নে অগ্রগতিও গর্ব করার মতো। প্রধান প্রধান ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাফল্য নজিরবিহীন।

পশ্চিমবঙ্গকে ক্ষুদ্র ভারত বলা যায়। এখানে সমস্ত ধর্ম, সম্প্রদায় ও সব ভাষাভাষী মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত এবং তাঁরা সকলে এরাজ্যে সম মর্যাদায় সুখে শান্তিতে বসবাস করছেন। সম্প্রতি জনগণের এই ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করে রাজ্যের শান্তি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে অস্থিরতা সৃষ্টির অপচেষ্টা চলছে। সেই অশুভ শক্তি সমূহের প্রতিরোধে সকল অংশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। প্রজাতন্ত্র দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৬১ (২৫) এইচ, ডি/আই, সি. এ তাং ২৭/১/৮৭

হুগলী জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পপুলার প্রিন্টার্স, বারাসত, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও নতুনপাড়া, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

গোধূলি মন

ফাল্গুন—চৈত্র সংখ্যা/১৩৯৩

০ প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন ০

০ কলকাতা থেকে ফিরে এসে শারদীয়া সংখ্যা পেলাম। হাতে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিলাম খুবই। তবে টেমার লেন এ শ্রীসন্দীপ দত্ত'র লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরীতে পূজা সংখ্যা গোধূলি মন এর দেখা পেয়েছি প্রথমবার। ছুঁয়ে অনুভব করার সুযোগও ছাড়িনি।

এবারের শারদীয়ার কলেবর ভরা হয়েছে ৪২টি কবিতা ৩টি করে গল্প ও প্রবন্ধ এবং একটি একাংকিকা নাটক দিয়ে। একেবারে নির্জলা সাহিত্য পত্রিকা। সাহিত্য ব্যতিত অন্য উপকরণ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কবিতায় যাঁরা আমার বুকে ঝড় তুলেছেন তাঁরা হলেন অরুণকুমার চক্রবর্তী, নির্মল বসাক, শিবনারায়ণ, ঈশিতা ভাদুড়ী, অশোক চট্টোপাধ্যায়, মোহিনী মোহন। ভাল লিখেছেন—ভাস্বতী আনা চক্রবর্তী (না, এ্যানা, সঠিক জানি না) আবদুর রবখান। আলাপে বিস্তারে শাস্ত্রীয় সংগীতের স্বাদ পাওয়া যাবে মঞ্জুভাষ মিত্র মহম্মদ মতিউল্লাহ ও রণজিতকুমার সেনের কবিতায়। বীণা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাটি 'রবীন্দ্র সংখ্যায় ভাল মানাতো মনে হয়।

রীতিমত শক্ত হাতে কলম ধরে যিনি গোধূলি-মনে প্রবন্ধ লেখেন সেই নির্ভীক অজিত রায় এবার তাঁর আলোচনার বিষয় নিয়েছেন অ্যান্টি উপন্যাস বা শাস্ত্র বিরোধী অথবা বলা যায় উপন্যাস লেখার রীতি-নীতি না মেনে লেখা—কয়েকটি উপন্যাস। এ উপন্যাসগুলির লেখকরা জনপ্রিয় নন—সুখপাঠ্য উপন্যাস লেখকদের মত। তবে ওই আলোচিত লেখকরা কী লিখেছেন, কেন লিখেছেন, কী উদ্দেশ্যে লিখেছেন তা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন প্রবন্ধকার। সাড়ে ষোল পৃষ্ঠার সুদীর্ঘ নিবন্ধটি তৈরী করতে লেখক কী পরিমাণ ধৈর্য্য ও কষ্ট স্বীকার করেছেন তা ভাবতেই আমার মত মিনমিনে পত্র লেখকের শরীরে 'ম্যালেরী'র কাঁপন শুরু হয়ে যায়। গত বছরও অজিত রায় হাংরী আন্দোলন ও তার পরিণতি নিয়ে এ হেন একখানা আ-চাঁছা আলোচনা উপহার দিয়েছিলেন—যা গোধূলি মন-এর নবীন-প্রবীণ পাঠকদের বুকে কাঁপন তুলেছিল বোধ করি আমারতো উঠেছিল।

এবারে 'গল্প নিয়ে' একটু গল্প করা চাই—। তিনটি গল্পের মধ্যে দুলাল চট্টোপাধ্যায় দারুণ উতরেছেন। রচনার ধারাবাহিকতা মাঝে মাঝে ব্যাহত হয়েছে মনে হলো। দু'টো চরম ধাক্কাই গল্পটি পাঠকের মনে থাকার পক্ষে সহায়ক হবে। 'গৌর বৈরাগী' কী 'ধনঞ্জয় বৈরাগী'র মত ছদ্ম-নাম ? এ পত্রিকার পাতার ইতিপূর্বে গৌরবাবুর একাধিক গল্প প্রকাশ পেয়েছে। তবে এটি তেমন জমল না ঘটনায়। পুরানো কাহিনী শুধু বর্ণনার কৌশলে ভালো। শতদ্রু মজুমদারের 'আগাছার জন্মবৃত্তান্ত' বেশ লাগল। গল্পটি লেখক যেন দুভাবে বলেছেন—প্রথমতঃ ১-৮টি ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদে বর্ণিত কাহিনীবদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ 'রাজকুমারের কবিতা' টি, যা নাকি মূল গল্পের নির্যাস।

শারদীয়া গোধূলি-মন হাতে নিয়ে যে কোন সৎ পাঠক মনের খোরাক পাবেন আশা রাখি।

জগত দেবনাথ
নাসিক, মহারাষ্ট্র

ধ্রুপদী সাহিত্য মাসিক

গোধূলি মন

২৯ বর্ষ/৩য় সংখ্যা
মার্চ/১৯৮৭
ফাল্গুন-চৈত্র/১৩৯৩

প্রতি সংখ্যা দুই টাকা
বার্ষিক সডাক কুড়ি টাকা

অশোক চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক

সম্পাদকীয়

আধুনিক কবিতাকে সাধারণ মানুষের আরো কাছে নিয়ে যাবার সাময়িক প্রচেষ্টা অনেকেই করেছেন। কিন্তু পরিকল্পিত ভাবে এবং পুরো সময়ের জন্য নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করেছেন এমন মানুষের সংখ্যা মাত্র এক। আর সেই একমাত্র মানুষটির নাম ঋষিণ মিত্র।

ভাল মাইনের সরকারী চাকরী ছেড়ে তথাকথিত এই পাগল মানুষটি ছুটে যাচ্ছেন শহর থেকে গ্রামে, এক প্রদেশ ছেড়ে অন্য প্রদেশে। তরুণতম কবিদের উল্লেখযোগ্য কবিতা হাতে পেলেই সুর বসিয়ে শোনাতে ছুটছেন মানুষের মাঝে। কত অখ্যাত তরুণ কবি তাঁর কবিতার গীতি রূপায়ণের ফলে ছড়িয়া যাচ্ছেন কবিতাপ্রিয় সাধারণ মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে। মাত্র ১৫ বছরের মধ্যে তাঁর সুরারোপিত কবিতার সংখ্যা সহস্রাধিক। শুধুমাত্র কবিতার গীতিরূপায়ণ-ই নয় শ্রীমিত্র লিটিল ম্যাগাজিন ডাইরেক্টরী প্রকাশনার আর এক মহান দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন নিজের কাঁধে। কিন্তু একজন মানুষের কাঁধে কত বোঝা চাপাবো আমরা। কবিতা প্রিয় তরুণরা এগিয়ে আসুননা সহযোগিতায়।

● সম্পাদকীয় কার্যালয় ॥ নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর-৭১২১৩৬ ॥ হুগলী ॥ পশ্চিমবঙ্গ
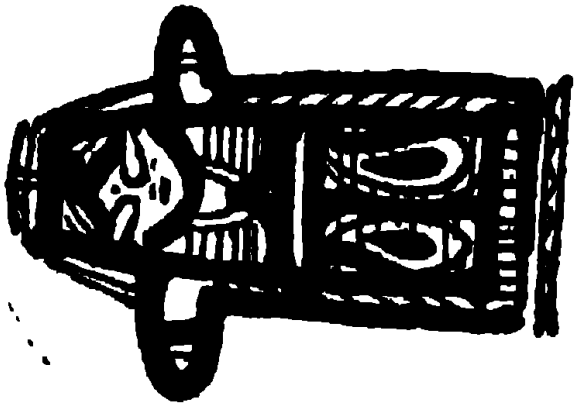
কবিতা

ইতিহাসের সত্য ॥ জগদীশ চতুর্বেদী

হিন্দী কবিতা

অনুবাদ : সুবিমল বসাক

তুমি সৌন্দর্যকে মনে করো আগুন
আমি মনে করি পাখী
তুমি সৌন্দর্যকে মনে করো প্রেরণা
আমি মনে করি সময়ের অপব্যবহার

একদিন তুমি তাবৎ যুক্তি দিয়ে ঘোষণা করেছিলে
কবিতা দেশ পাল্টায়
নারী পাল্টায় ইতিহাস।

এ কথা শুনে আমি চুপ করে গেছি
কবিতা ও স্ত্রী, আমার মনে হয়
সমাজ ও ইতিহাসের পক্ষে একেবারে অর্থহীন।

খুব বিচলিত হয়েছিলে তুমি তখন !
শতাব্দীর বিশাল পরম্পরা
সংস্কৃতির বৈভব
এবং পৃথিবীর মানবিক পক্ষ তোমার
চিন্তিত করেছিল।

তখন তুমি আমায় ধমক দিয়েছিলে
আমি তা সহ্য করেছিলাম

তুমি গালাগাল থুতু ছিটিয়ে দিয়েছিলে
আমি চুপ ছিলাম।

অনেক-অনেকদিন পর তুমি এসেছিলে
গম্ভীর সংযত এবং চিরকালীন বিষণ্ণ
কিছু বলার ভঙ্গিতে তুমি
আমার কানের কাছে মুখ এনেছিলে।

হয়তো মাঝে তুমি কিছুটা বিব্রত ছিলে
বইয়ের ফাঁপা ব্যাপার তুমি বুঝে ফেলেছ
জীবনে অনেক বিষ পান করেছ
মুখে গভীর রেখাই ছিল তার প্রমাণ।

তুমি বিড় বিড় করছিলে
আমি হতভম্ব কিছুটা
তুমি বলছিলে—
কবিতা আমায় আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন
করে ফেলেছে
স্ত্রীকে সমাজ থেকে।

উদ্ভিদ/অভিজিৎ ঘোষ

সৌরলোকের ভয়ংকর বিক্ষোভে ছিটকে বেরিয়ে এলো একটি গোলক
দাবদাহে উল্কাগতিতে সে ছুটে চলে চক্রাকারে, তার প্রচণ্ড উত্তাপ
ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হ'য়ে প্রস্তরীভূত হ'তে থাকে, ঐ লাভা
রাসায়নিক জটিল মিশ্রণে ক্রমাগত স্তরে বেড়ে চলে, জল হ'য়
কিন্তু সে ঘোরে মাধ্যাকর্ষণ অদৃশ্য বন্ধনের টানে
প্রদক্ষিণ করে চলে গ্রহপুঞ্জ মহা জাগতিক অদ্ভুত নিয়মে

পৃথিবীর যতগুলি আবরণ আভরণ তার মধ্যে তুমিই প্রথম
আনলে সবুজ গান শিখরের ব্যপ্তিতে, উচ্চাশার মহান নিশানে
ঢেকে দিলে সামগ্রিক এই চরাচর

বহুরূপে সম্মুখে রয়েছ তুমি, তোমার মহিমা
আদিতম সৌরলোকের সঙ্গে গূঢ় যোগাযোগ কে জানে ?
বিজ্ঞানের পাঁচ হাজার বছরেও তার হদিস মেলেনি—

সংযত হৃদয়ে/ঈশিতা ভাদুড়ী

(প্রিয়তমা সেই নারীর জন্যে)

ঝড়ের রাতে একটি সূর্যোদয়ের সকাল
মনে করে
তুমি আরো স্থির, আরো শান্ত হও।
বুকের মধ্যে হাতুড়ির শব্দে
নিজেকে নির্লিপ্ত রাখো সখি।

ধানের শিষে, কচিঘাসের মধ্যে
রয়েছে একটি নারীর মুখ ;
তার আঙুলে সবুজ পাথর…

সখি সংযত হৃদয়ে আঁকো
সেই ছবি।

SUNIL
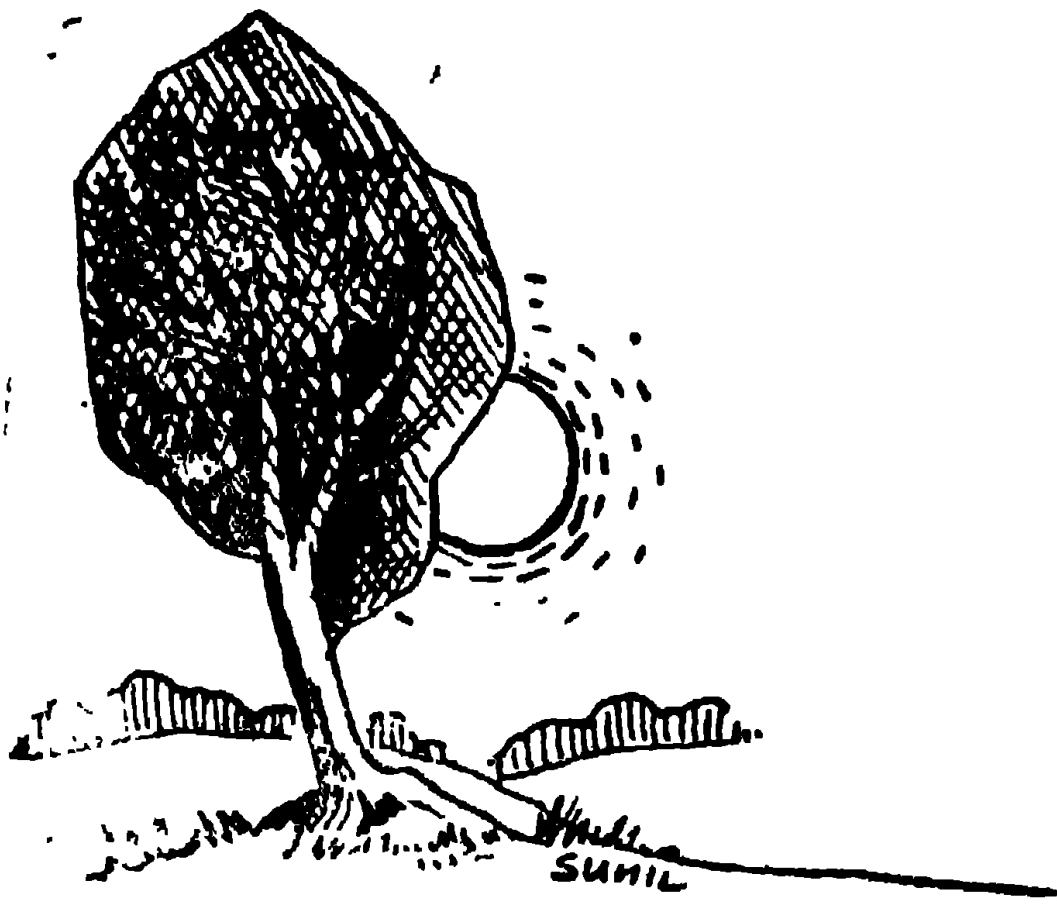
সুখ !/অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়

কখনো স্বপ্ন থেকে উঠেই আমি
হয়তো বা রাত শেষ লাচেও পাহাড়ে
হেসাডি বাংলোর ধারে
ক্ষীণ জ্যোৎস্না মেঘাতুর পথ
খুঁজিতে গিয়াছি সুখ—
খুঁজেছি বিস্তর,
শহরের পথে পথে
সন্ধ্যায় বিশেষ পাড়ায় কখনো গিয়েছি বা
চিৎকার করেছি—'সুখ'।
মেরেছি বিস্তর ধাক্কা এ ওর দরজায়
মেলেনি মোটেই।

তবে ফের চলা করেছিনু শুরু
পীচকালো সাঁওতাল মেয়ে—মহুয়া বিভোর
সর্বাঙ্গ জড়ানো ঘামে,
হাঁসফাঁস বুক ওঠা নামা,
ধমসার বোল।
বনে বনে গন্ধ নেওয়া
হঠাৎই ক্লান্ত আমি।
অন্ধকার জঠর থেকে ক্রমাগত যাত্রা চিতামুখী
মরে যাই সুখ এত সোজা!
পেয়ে যাবে তুমি! কে যেন বলেছিল।
মরে যাই সুখ।
সে কি টিভি টয়টা
ভাড়াখাটা তরুণীর জোড়া বুক!
ফিরে দাঁড়িয়েছি।
মুঠো করা দুহাতের আঙুলের ফাঁকে
জীবন পিছলে গেছে
জীবনই যায়—
এখন খালি হাত মধ্যরাতে ব্যঙ্গ করে
মাথায় রূপালী রেখা
অবিন্যস্ত আমার আমাকে।

তার দিকে চেয়ে দেখো/শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়

ব্রহ্মময়ীর চাতাল আর কতো দূর
ভোরের আগেই তার মন, তার মন নির্জনে
প্রতিদিন স্বর্গ ভাঙে প্রতিদিন গড়ে

অফুরন্ত জীবনের মিছিল ছুঁয়ে
খয়ের বরণ শাড়ী সোনালী রোদ্দুর মেখে
পদচিহ্ন এঁকে যায় ধানঝাড়া রাঙা মাঠ বেয়ে

আমার অবাধ প্রজাপতি
আবেগে বিভাগে ধ্বনি শোনে
পাথরে নদীর মুখে বসে
আবার কী দুর্গ রচনা হবে
শীতল জলের ছায়ায় নির্জন ভোরে

এখন মাটির বুকের পরে বসে
স্মৃতির পাহাড় ভেঙে স্বর্গ গড়তে চায়
এই চাঁদ ঝোলা রাতে

এ মেয়ে দেখেনি সেদিন
যঠেশ্বর দক্ষিণপাড়ার পথ কতো দূর
দেখেনি সেদিন চেয়ে অভিমানী মুখ
দীর্ঘ রাঙা পথ ভেঙে এসে
নিবিড় ছায়ারতলে দেয়নি প্রেমের পূজা
দেখেনি ব্রহ্মময়ীর প্রসন্ন মুখ

সময়ের ব্যবধানে এতো পথ এসে
সরল হয়নি মন, ভাঙেনি সেদিন এই তুচ্ছ নিয়ম
মুহূর্তে ছড়িয়েছে আকাশ বাতাস আর
তারই কণ্ঠস্বরে অশুভ আগুন

কার প্রতি রাখো তবে
কোমল হৃদয় আর এদুটি চোখ

এই মাটির স্পর্শে চেয়ে দেখো
অফুরন্ত রৌদ্রের মিছিল ছুঁয়ে
তবে কোথায় যাবার কথা ছিলো

প্রত্যাশায়/রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
(শ্রদ্ধেয় শিল্পী সৌমেন অধিকারী-কে নিবেদিত)

যা-কিছু উত্তেজক আরক, বেহিসাব
আমাকে দিনের পর দিন
কেবল মিথ্যা বলে বানিয়েছে ;
নিজের ঘরে ঘুমুতে ভুলে গেছি,
শীতের কাঁথাটি পর্যন্ত আসল সময়ে
আশপাশের রাজ্যে খুঁজে পাওয়া যায়নি···

এখন দিন শেষের ফিকে রঙ-ও যেন
করুণা করতে এগিয়ে আসছে এধারে····
অনাদর, এতো অপমান আমাকে ঘাড় মটকে দিয়ে
কোন কবিতা বানাবে পাথরে, জানিনা ;
তবে, পেল্লায় কারখানার যে আলোটা
বাইরের এই জমাট আন্ধার-কে রহমানের মতন
হাসতে হাসতে গালি পাড়ে, এক ছিটে আলো,
শুধু, একছিটে আলো দিতেই গলে যায়
কবিতা লিখবো ব'লে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াই—

যন্ত্রণা বিষ হ'য়ে বাঁয়ে, ঘাড়ে জমলো বুঝি ;
রাজ্য-জুড়ে ভয় নেমে আসছে ভাবনায়
হয়তো, যদি আর মাথা কখনো সোজা না হয়,
সেই কবিতা অন্ধ হ'য়ে ভিক্ষে ক'রে রাস্তায় ;
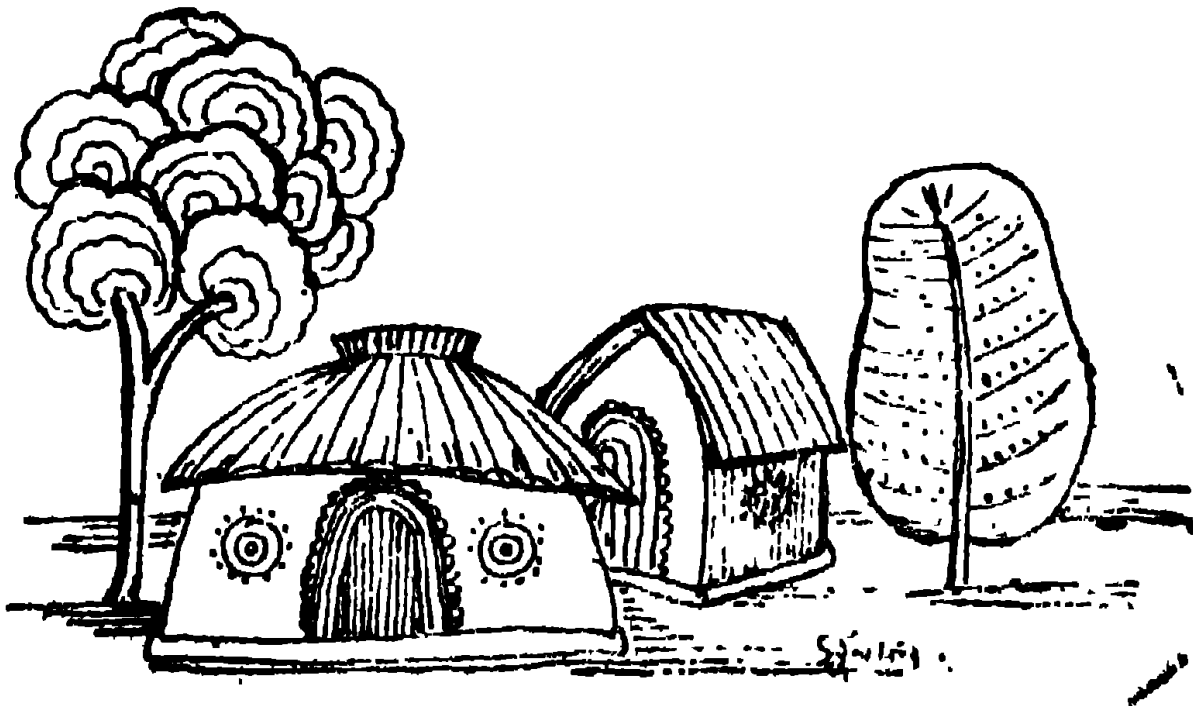
সেই থেকে/কমলকৃষ্ণ ঘড়া

হাওয়ার মধ্যে তুমি আমার মধ্যেও তুমি
ঘৃণাতে তুমি আবার ভালবাসাতেও তুমি
একবার
নিষ্ঠুর-পাপে তুমি যখন পুড়ছিলে
আমি দৈবাৎ দুঃখের মুখোমুখি স্থির
সেই থেকে তুমি শরীর খুইয়ে
এখানেই রয়ে গেলে

O O O O

তুমি/শীতল দাস

হংসেশ্বরী মন্দিরের কাছেই বুঝি
তোমাকে দেখেছিলাম।
তোমার আঁকা ছবিটাই
মন্দিরগাত্রে সযত্নে রক্ষিত আছে।
তুমি কবি।
তোমার ছবিগুলি
তোমার মতই জীবন্ত।
তোমার তারুণ্য আমাকে দোলা দিয়েছিল
যৌবন টল-মল, ঢল ঢল দুটি চোখ
আর চিকন কালো ভ্রূ
আমাকে আকৃষ্ট করেছিল।
পীনোদ্ধত রমণীর মতো
আজও কি পথের পরে
দাঁড়িয়ে থাকবে ?

সখি এবং মরা বাওড়ের সংলাপ/জহুর দরদী

তোমাকে ভুলিনি। ভুলিনি সেই প্রিয় কলসের রঙ
প্রতিদিন বিকেলে তুমি
যে কলস কাঁখে হরিহর বাওড়ে যেতে। তোমার
হাতের ছোঁয়ায় চৈতালি জল
তার দুখের বার্তা শোনাতো—"সখি আর ক'টা
বসন্ত পার হলেই আমি ফুরিয়ে যাবো ক্ষত থেকে (!)
মাটি আমাকে তার ধৈর্যের পরিমাপ জানিয়েছে,
পাখি শুনিয়েছে নব্যপুরুষের গান ;
আকাশ বাতাস আর ঋৈতিক জলবায়ু
তাদের বিশ্বাসের প্রাগার্ঘতা গুঁজে দিয়েছে আমার
নীল বেণীতে॥"

তোমার কলস আর বেণীতে ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে
একদিন তুমি নদী হলে—হরিহর
নদী হয়ে নব্যপুরুষের
পথের ঠিকানা মেখে নিলে তোমার তাবদ শরীরে।

এভাবেই তুমি নদী হতে হতে, প্রেম হতে হতে, আমাদের
বিশ্বাসের সর্বোচ্চ ঢেউ হতে হতে—একদিন
মহাপ্লাবনই ডেকে দেবে যথারীতি। সেদিন
হরিহরদের আর দুঃখ থাকবেনা কোনো, সাগরের কাছে
আর নতজানু হয়ে
যেতে হবেনা কর দিতে। ছোট হয়ে
বেঁচে থাকার গ্লানিভরা ভৎ'সনা সইতে হবেনা।

সখি, ভুলিনি তোমাকে। ভুলিনি
তোমার সেই
প্রিয় কলসের লাল স্বপ্ন, রূপালী বিকেলে বিশ্বাস।

•

কৌরব পক্ষের মুখোমুখি/
অমিত মুখোপাধ্যায়

স্বপক্ষে কিছু বলার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।
অন্যপক্ষ অবিরাম।
আমি অচঞ্চল।

উষ্ণ বুনোট শব্দ চাদর আশ্রয়ে
খুলতে পারি লোপামুদ্রার অন্তর্বাস।
রাতকেন্দ্রিক মানসিকতা দুই পায়ে
হেঁটে যায় চোখে গ্রীক রমণীর কেশবিন্যাস।

গ্রীক পাথরের ঐতিহাসিক শীতলতায়
সঙ্কেত দেয় অলজ্জিতা ভিনাস।
অপেক্ষিত সময় কোনো মুক্ত জানালায়
নিরুচ্চারে শূন্য করে অলীক টার্মিনাস।

স্বপক্ষে ভূমি নেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।
কুরুপক্ষ অচঞ্চল।
আমি অবিরাম।

বৃষ্টির দু'টি নজম/পরভীন শাকীর
উর্দু থেকে অনুবাদ : অনিন্দ্য সৌরভ

১.

কি মুশকিলে ছাড়িয়েছিলাম
আর তারপর উগ্র সুগন্ধির
কত যে বিনতী করেছিলাম
'লক্ষ্মীটি ধীরে বলো
সারা বাড়ি জেগে উঠবে'
কিন্তু যখন তার আসবার সময় হলো
ভোর থেকে এমন বৃষ্টি শুরু হলো
জীবনে প্রথম আমার
বৃষ্টি খারাপ লাগল।

২.

বৃষ্টি আগেও বহুবার হয়েছে
এবার কি বার্নিক চুনরী কাঁচা রাঙ্গিয়েছে
নাকি শরীরের কথাই ঠিক
রঙ্গতো তার ঠোঁটে ছিল!

☐ কবি পরিচিতি : পরভীন শাকীর পাকিস্তানের বিখ্যাত মহিলা কবি। জন্ম ১৯৫২ সালে করাচি শহরে। করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী ও ভাষাতত্ত্বে এম. এ। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে জনপ্রিয় 'খুশবু' (১৯৭৭) এবং 'সদবর্গ' (১৯৮০)।

নিজের বাড়ি কোথায় আছে/নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

অন্ধকারের অন্য কূলে ঘুম রাঙানো শিউলিফুলে
তুমিই ছিলে জন্মদিনে একা
চোখ দুটিতে কাতর প্রণাম, ভুলেই গেছি তোমার কী নাম
কাছেই ছিলাম, হয়নি তবু দেখা

রয়েছে ঘিরে চোর ভিখারী, সহস্র মোম পুতুল নারী
বাণিজ্যসফল হাসিমুখ, কথা
জীবন বুঝি এমনি মাপে বারুদ গন্ধ আলোর তাপে
ফুরিয়ে যাবে ভীড়ের নীরবতায়

বলব যে তোমাকে জানি, সাহস পাব কোথায় আমি
যৌনকাতর, গরীব, অভিমানী
আমার কথার প্রাত্যহিকে সোনায় মোড়া আরাম শিখে
দুঃখিনী মুখ দেখলে বলি, রাণী

আমরা সবাই কথাই বলি, কথাতে ঘর ভরিয়ে তুলি
কেউ বুঝি না অন্য কারুর ভাষা
হঠাৎ কেন এই প্রবাসে শিউলি দিনের গন্ধ আসে
জন্মদিনের আগামী প্রত্যাশায়

এসো, আমায় প্রণাম করো. দেখাও ভুবন বৃহত্তর
থাকুক পড়ে পোশাক অসভ্যতা
চোখের জলের আলিম্পনে খুঁজব আগুন আলিঙ্গনে
নিজের বাড়ি কোথায় থাকে, কোথায়
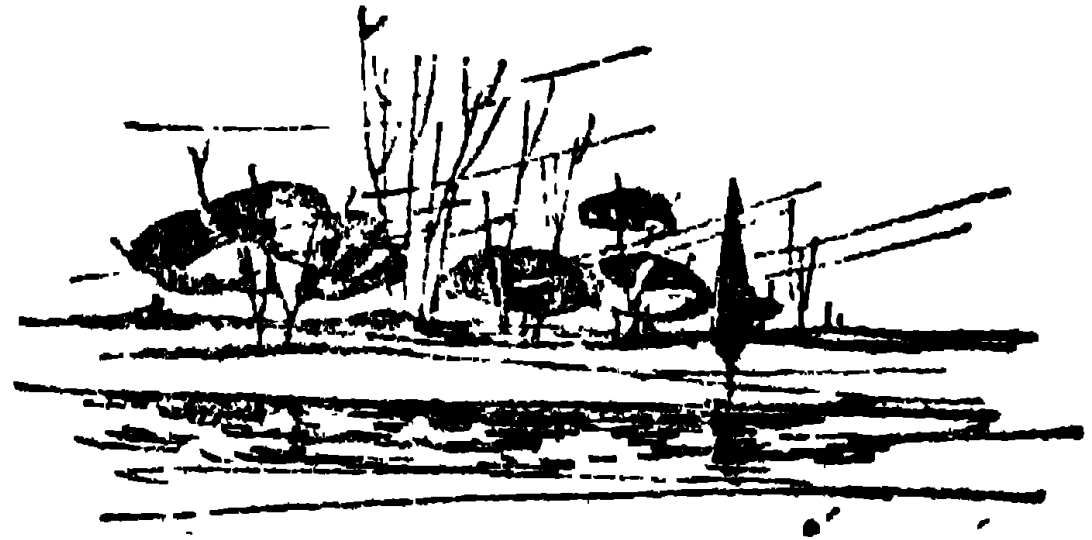
বিশ্বতীর্থ পূজারী সত্যেন্দ্রনাথ বসু

অমিতাভ বাগচী

বিগত ১লা জানুয়ারী ১৯৮৪, নবনবতিতম জন্মোৎসব পালনের মধ্য দিয়ে আমরা দেশময় শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছিলাম বাংলার মহাবিজ্ঞানী আচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে স্মরণ করে। তদুপলক্ষ্যে মহৎ প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল। সি. আই টি পার্কে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পার্ক (উক্ত পরিষদের বিশেষত্ব স্বরূপ) নাম দেওয়া ইত্যাদি। ইহা জেনে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। জোড়াসাঁকোয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্লাটিনাম জয়ন্তী অনুষ্ঠানে মিলিত হতে পেরেছিলাম তাঁর সতীর্থ শ্রদ্ধেয় জীবনতারা হালদার মহাশয়ের (সম্মিলন সভাপতি রূপে) সঙ্গে, যিনি পরিচয় হওয়া মাত্র আমাকে আদেশ করেছিলেন কিছু লিখতে। এই সঙ্গে তাঁর "ছড়াকাটা" বই আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। তাতে আমি দেখেছিলাম সত্যেন্দ্রদম্পতির নববিবাহের ফটোখানি। ফলে আমি আগ্রহী হলাম তাঁর সম্পর্কে কিছু স্মৃতিচারণ করতে।

আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম না বটে, কিন্তু ছাত্রকালে প্রবন্ধ সাহিত্য ইত্যাদিতে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিভঙ্গী বিশদভাবে সংযুক্ত থাকত যাতে ভবিষ্যতে আমরা একটা বিশেষ দিক নিয়ে নিজেকে আদর্শান্বিত করতে পারি। আমি অনুশীলনের দ্বারা জ্ঞাত হই মণীষীদের সম্বন্ধে এবং সেই সুবাদে শ্রদ্ধাবনত হই। তখন থেকে অবগত আছি সত্যেন্দ্রনাথ বসু একজন বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী। একথা সর্বজনবিদিত, আপেক্ষিকতাবাদ গবেষণায় বসু-আইনষ্টাইন তত্ত্বনিরূপণ তাঁর বিশ্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি বৈজ্ঞানিক প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন। বাল্যকাল থেকে তাঁর বিজ্ঞানের স্পৃহা ছিল প্রবল। ওটাকে জীবনের অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করে সমগ্র ছাত্রজীবন বিজ্ঞান চর্চা করে গেছেন। দেশোন্নতিতে বিজ্ঞানের আবশ্যকতা আছে এই চেতনা জেগেছিল তাঁর অন্তরে। তাই বিদ্যার্জনের সাথে সাথে নতুন কিছু হোক্ যা দিয়ে দেশের কাজে লাগে এই প্রবণতা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিজ্ঞানের প্রতি সহজাত অনুরাগ নিয়ে ছাত্রজীবনে

যেমন গভীর অধ্যায়ন করেছেন কর্মজীবনেও তেমনি একনিষ্ট সাধনা করে গিয়েছেন।

বিদ্যালয় জীবন শেষ করে যখন উচ্চশিক্ষা পথে অগ্রসর হলেন চন্দ্র সূর্য্য স্বরূপ দুই বিজ্ঞান জ্যোতিষ্ক পেলেন। তাঁর জীবনের আলোকপথ দেখিয়েছেন পদার্থবিদ্যায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও রসায়ণ বিদ্যায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। উভয়ের দিগ্‌দর্শনে এবং নিজের ঐকান্তিক নিষ্ঠার বলে তিনি জ্ঞান তপস্যার শীর্ষ মার্গে উঠেছিলেন। অবশ্য শিক্ষক হিসেবে ডক্টর দেবেন্দ্র মোহন বসুর কম অবদান নেই, তিনি ছিলেন বিজ্ঞান কলেজে স্নাতকোত্তর বিভাগের। সেই সময় একদিকে যেমন বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ঘটেছিল অন্যদিকে তেমনি অনেক সাধক বিজ্ঞানীও গড়ে উঠেছিলেন। তাই সত্যেন বসুর সঙ্গে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, নীলরতন ধর, পঞ্চানন নিয়োগী, শিশির কুমার মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, প্রাণকৃষ্ণ পারিজা প্রমুখ এক এক দিক্‌পাল। সাধনায় সিদ্ধিলাভের পরই সত্যেনবাবু উদ্দেশ্য করলেন বিজ্ঞান শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রয়োগ করা সম্পর্কে। সকল নরনারীর কথা ভেবে এই সার কথাটি বুঝেছিলেন প্রত্যেকের ঘরে বিজ্ঞানের আলো পৌঁছে দিতে হবে। সকলের দ্বারা ইংরেজি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। এতে জ্ঞান সীমাবদ্ধ থেকে যাবার সম্ভাবনা। তাই মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার বিকীরণের সহজ উপায় এবং এদ্বারা উক্ত শিক্ষা সার্বজনীনতালাভ করবে। এমন সজীব মনোভাব নিয়ে তিনি এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন? এর মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠা করলেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। ইহা তাঁর অমর স্মৃতি বহন করছে। এর মর্ম্মবাণী স্বরূপ খোদিত বাক্য: "মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সহজ বোধ্যরূপে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে, তাদের মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি গড়ে তুলতে হবে। যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা সম্ভব নয়, তাঁরা হয় বাংলা জানেননা, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না।..." এ কথায় তিনি দেশাত্মবোধক ভাব জাগিয়েছেন। এ সঙ্গে দেশোন্নতির সহজ পথও দেখিয়েছেন। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলনে তিনি অদ্বিতীয়।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পর্কে বর্ণনা করতে যাওয়া আমার পক্ষে বাতুলতা মাত্র। ইতিমধ্যে কত বিদগ্ধ ব্যক্তি তাঁর গুণাবলীর উল্লেখ করে গেছেন। কাজেই তাঁকে বৈজ্ঞানিক সূত্রে না দেখে কবিগুরুর আশ্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাধিপতি রূপে দেখে তাঁর মূল্যায়ণে প্রবৃত্ত হই। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী নামে বিশ্ববিদ্যালয় না হলেও তখনও দেশবাসীর কাছে তীর্থক্ষেত্র বলে গণ্য হত 'বিশ্ববিদ্যা তীর্থ প্রাঙ্গণ কর মহোজ্জ্বল আজ হে' গানের আদর্শে। তাই আমরা বিজ্ঞানাচার্যকে পেলাম আশ্রম পূজারী রূপে। তখন তিনি হলেন কাছের মানুষ।

সে ১৯৫৬ সালের কথা। বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য্য ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মৃত্যুর প্রাক্কালে বলেছিলেন—'আমি যদি জীবন ছেড়ে চলে যাই আমার জায়গায় যেন সত্যেন বসুকে রাখা হয়। আমার যাবতীয় অসমাপ্ত কাজ তাঁর দ্বারা পুর্ণ হবে।' তাঁর শেষ ইচ্ছা পুর্ণ হবার জন্য সত্যেন বসুকে উপাচার্য্য নিয়োগ করা হল। তখনই জানলাম পরিচয় ছিল বহুদিন আগে প্যারিসে। উনি আইনষ্টাইনের আহ্বানে জার্মানী যাবার পথে প্যারিসে কিছুদিন থেকে মাদাম কুরীর ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করেন। এই সময় ডঃ বাগচী সিলভান লেভীর অধীনে গবেষক ছিলেন। ফলে উভয়ের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। এই ঘনিষ্টতা হবার পর উনি চলে গেলেন জার্মানীতে আপন কাজে। সেই বরেণ্য

পুরুষের পদস্পর্শ পড়েছিল এই তীর্থভূমিতে।

অতি সাধারণ মানুষ। বিশ্বে নাম ডাকে যাঁর পরিচয় সেই মানুষ এমনভাবে দেখা দিলেন যেন কবির লালমাটির ধুলায় মিশিয়ে দিতে চান। তাঁর সব সময়-কার মনোভাবটা ছিল রবীন্দ্রনাথের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ। তিনি এসেছেন কবির কাছে ঋণ স্বীকার করে। একদা কবিগুরু তাঁকে গুণমহিমায় যথোচিত মর্যাদা দান করেছিলেন 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থ তাঁর নামে উৎসর্গ করে। তিনি ইহাকে শ্রেষ্ঠ দান বলে গণ্য করেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট পি, আর, এস-এ জাতীয় উচ্চ পদবীর মোহগ্রস্ত ছিলেন না। একমাত্র বিজ্ঞান সাধনাকে বৃহদার্থে গ্রহণ করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে আখ্যা দিয়েছিলেন "বৈজ্ঞানিক গুরু"।

আমাদের বাড়ীর কাছে আওগার রাওবাড়ী ছিল উপাচার্য্য আবাস। প্রথম দেখেছিলাম মটরে উত্তরায়ণ থেকে আসছেন ড্রাইভারের পাশে বসে। বাঁ হাতটা বাইরে লম্বা করে ভর দিয়ে রাখা। সেই থেকে ক্রমাগত দেখে আসছি আটপৌরে ভাবে। দেখতে লাগত কেমন উদাসীন প্রকৃতির মানুষ। ধবধবে ঘন সাদা চুল হাওয়ার বেগে উড়ছে। অতি মোটা সোটা। তবে তাতে কষ্ট ছিল খুব। য র জন্য অফিসে চেয়ার টেবিল সরিয়ে তক্তা পেতেছিলেন বালিশ তাকিয়া লাগিয়ে। বাড়ীতেও ঐভাবে। তাও নড়তে চড়তে কি কষ্ট। কতবার এঁকে বেঁকে বসছেন ঠিক নেই। মুখশ্রী অতি উজ্জ্বল। চোখে প্রশান্তির ছায়া, দেখতে শুভদর্শন যুক্ত। বয়স হয়েছিল ৬২, তখনও তাঁর বাবা বেঁচে। ওনার বাবার নাম ছিল সুরেন্দ্রনাথ বসু, ছিলেন বিদ্যানুরাগী। অবকাশে বই পড়তে ভাল বাসতেন। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ গুণ পেয়েছিলেন। এখানে বৈঠকখানা ঘরে পড়াশোনা করতেন বইপত্র বিছিয়ে আধা বসা আধা শোওয়া করে। ওনার সাধনোচিত কাজের সময় ছিল রাতে। এমন হত ঐ অবস্থাতে ঘুমিয়ে পড়তেন। উঠতেন উষাদয়ে। তারপরে আছে অফিস।

তিনি ছিলেন প্রকৃত বঙ্গদরদী। শান্তিনিকেতনে এসে বীরভূমের কৃষিজীবী গ্রামাঞ্চলকে বিশেষ ভাল-বেসেছিলেন 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানের সার্থকতা অনুভব করে। এর আগে ঢাকায় 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানের আদর্শে বাংলা ভাষায় অধ্যায়ণ করিয়েছেন এবং 'বিজ্ঞান পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় প্রতিভার সাড়া জাগিয়েছেন এবং জনগনকে জ্ঞাত করিয়েছেন কবির আগমন দিক্ সম্বন্ধে। সেই দিগ্‌দর্শন শান্তিনিকেতনবাসীর কাজে লেগেছিল।

বিশ্বভারতীর গুরুভার হাতে নিয়ে নিমেষে হয়ে গেলেন আশ্রমিক এবং কবিগুরু আমলের রেওয়াজ মতে শান্তিনিকেতনে অভিহিত হলেন সত্যেন দা। অমন দেশজোড়া খ্যাতনামা ব্যক্তি এখানে ধরা দিলেন সর্ব জনের সঙ্গে একাসনে মিলিত আশ্রমবাসী। নিজেকে বৈজ্ঞানিক বলে ভাবপ্রকাশ করতেন না। বরং কাজে কর্মে বিশ্বভারতীর কর্মী বলে পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের একটি মুখ্য বস্তু গ্রহণ করেছিলেন তা হল শিশুভক্তি। শিশুদের ভালবাসতেন খুব। শিশুদের নিয়ে মাঝখানে বসতেন। খাবার ভাগ করে দিতেন। এরকম মিলিত হতেন আনন্দ পাঠশালায় আর ঘরে। ক্ষণিকের জন্য নিজে শিশুভাবাপন্ন হয়ে যেতেন। তাঁর মন ছিল কত শিশু বাৎসল্যে ভরা। তবে একটু বড়দের প্রতি ছিল অন্যরূপ, সেটা ছিল পড়াশুনার জীবনের ভিতটা সুদৃঢ় রাখার উদ্দেশ্য। তার জন্য একটু উপদেশের বোঝা চাপত। তা'বলে নির্মমতার পরিচয় নয়। অন্তঃকরণ ছিল দেবাত্মায় ভরা।

শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠানপর্বে ওনার ছিল সাগ্রহ উপস্থিতি। মুক্ত অঙ্গনে উৎসব বেশী পছন্দ করতেন। আম্রকুঞ্জ, শালবীথি, বকুলবীথি, ছাতিমতলায় তাঁর উপস্থিতি ধ্যানীযোগীর সাদৃশ্যযুক্ত। মৌখিক বাণী ছিল পরম রসাস্পদ। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞান ছিল। তিনি যা ব্যাখ্যা করে যেতেন অসাধারণ। এখানে কখনও বিজ্ঞানের গুরুত্ব দেন নি। প্রসঙ্গান্তরে বলতেন—'মহামতি আইনস্টাইনের স্নেহধন্যতা লাভ করেছি। গুরুর আদর্শে জ্ঞান শিক্ষায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছি এজন্য গর্ববোধ করি। তবু রবীন্দ্রনাথের বিশাল ভূমণ্ডলে আমি এককোণে। বিশ্বের মানচিত্রে তাকালে যেমন দেখা যায় যেখানে আছি সেখান বাদ দিয়ে সাড়ে তিন ভাগ পড়ে থাকে খালি। আমি মনে করি আমার জ্ঞান গরিমা সবই পরিমাণে ঐটুকু। রবীন্দ্রোত্তর কালে গুণীদের স্বীকার করতেই হবে প্রত্যেকে রবীন্দ্রনাথের শিশু। শুধু কবিত্বে নয় অন্য বিষয়েও।' উনি যে ভুলতে পারতেন না রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ ভালবাসা আর ভালবাসার ভিতর দিয়ে নিয়েছেন ঐশ্বরিক প্রতিভা। সব চেয়ে বড় কথা তিনি বিজ্ঞানের বহির্ভূত বহুবিষয়ে বিশদ জানতেন। অনুষ্ঠান বিশেষে যে প্রসঙ্গ প্রযোজ্য তাই ব্যক্ত করেছেন। আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে শুনেছি কত ব্যাখ্যা। এমনকি, চণ্ডী থেকে উদ্ধৃতি করেছেন কত উপমা। শাস্ত্রীয় দিক দিয়ে কম অভিজ্ঞ নন। একটা জায়গায় তাঁর ঠেকে যেত, সংস্কৃতে। বিশেষ করে দেবনাগরী অক্ষর পড়তে পারতেন না। ওটা হয়েছিল চর্চার অভাবে। তা বাদে ছিল অনেক। আশ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধি কল্পে কত মণীষী সাধকের কথা সংগ্রহ করে দিয়েছেন স্মরণ করার প্রয়োজন বোধে। বুঝতে হবে তাঁর কতদিকে দৃষ্টি ছিল। এক কথায় তাঁকে বলা যায় জ্ঞান তাপস।

চিন্তা করলে দেখা যায় সত্যেন বসু শুধু বিজ্ঞান জগৎ নিয়ে আবদ্ধ থাকেননি। কাব্য সাহিত্য সংস্কৃতি সঙ্গীতেও কম ছিলেন না। সঙ্গীত প্রিয়তা ছিল তাঁর চরম। রবিশঙ্করের সেতার বাজনা তাঁকে তন্ময় হয়ে শুনতে দেখেছিলাম। গভীর রাতেও এতটুকু অতন্দ্র ছিলেন। তারের প্রতিটি ঝঙ্কারের সঙ্গে সমতালে মাথা দুলিয়ে যাচ্ছেন। সঙ্গীতে সমজদারও ভাল ছিলেন। আইনষ্টাইনের কাছ থেকে কিছুটা নিয়েছিলেন বাকীটা স্ব-ইচ্ছায়। গল্প বলেছিলেন আইনষ্টাইনের ঘরে ছিল দুইটি জিনিষ। একদিকে গাদা বই ও বিজ্ঞানের সরঞ্জাম, অন্যদিকে বাদ্যযন্ত্র বেহালা। বেহালাবাদক হিসেবে জার্মানিতে প্রচুর নাম ছিল। কলকাতার বাসায় সত্যেনবাবু এস্রাজ বাজাতেন। এখানে সঙ্গীতভবনে যেতেন। গান শুনতে শুনতে ঢুলে পড়তেন। সুরের রেশ ধরতে পারতেন। ঠিক থাকলে শুনে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন। তাল বেঠিক হলে চমকিয়ে চোখ খুলে ফেলতেন এবং দেখিয়ে দিতেন কোথায় ত্রুটি। সে সময়কার অধ্যক্ষ ছিলেন একাধারে বৈজ্ঞানিক ও সুরকার শৈলজারঞ্জন মজুমদার। তাঁকেও স্বরলিপির ধাঁচ বুঝিয়ে দিতেন। সব সময় তালিম দিতেন গান ভাল হোক্। আবার আদেশ করেছিলেন—'যেমন গানে দেখেছ তেমনি বিজ্ঞানের দিকেও তাকাও। নতুবা তোমার এবং দশের মরচে পড়ে যাবে।' শৈলজাবাবু তাই মাঝে মধ্যে রসায়ণ শাস্ত্র পড়াতেন। কখনও আলোচনাচক্রে তিনি দেখতেন গানের বালাই নেই, উনি সভা শেষে বলতেন 'গান হবেনা'। সঙ্গীতভবনে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীও গানের সুর ঠিক করতেন। সত্যেন বসুও থাকতেন পাশে। অবশ্য ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল যখন তিনি এম এস-সি. পাশ করেন। তিনি ইন্দিরাদেবীকে মাতৃসম জ্ঞান করতেন। বীরবল খ্যাত প্রমথ চৌধুরী তাঁকে আহ্বান করেছিলেন 'সবুজপত্র' আসরে যোগ দেবার জন্য আনাগোনায় উক্ত প্রতিভাদীপ্ত দম্পতির স্নেহা-

বর্ষণে এসেছিলেন। কাব্যসাহিত্যে তাঁর স্থান ছিল গভীর। সে সময়ে হামেশাই সাহিত্য সভা লেগে ছিল। বিশেষ করে ২২শে শ্রাবণ থেকে সাতদিনের রবীন্দ্র সপ্তাহে সিংহসদন আলোকিত থাকত ওনার সুললিত ভাষণে। ওনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠমহল মিলিত হতেন অনাথনাথ বসু, প্রিয়রঞ্জন সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সুনীল সরকার প্রমুখ। আলোচ্য বিষয়ের উপযোগী নিয়ে ব্যাখ্যা করে যেতেন। কোথায় গণেশের বেদ, বিদ্যাবতীর পদাবলী, কালীদাসের মহাকাব্য, বিদ্যাসাগরের গদ্যসাহিত্য। রবীন্দ্র-শরৎ বঙ্কিম সাহিত্য সমুদয় নিয়ে দারুণ প্রশস্ত বিবৃতি। আরও 'সাহিত্যিকা', মঙ্গলবারে ছোটদের আসর। তরুণ প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী কর্মী নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ওনার উপস্থিতি উৎসাহ বর্দ্ধন করত। এর কারণই ছিল সাহিত্যে সুপরিপাট্য বর্ণনা। তাঁর ছিল অদ্ভুত রচনাশৈলীও ভাষাজ্ঞান। 'পরিচয়' সাহিত্য গোষ্ঠীর তিনি ছিলেন একজন। সেখানে রীতিমত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখতেন। এমতাবস্থায় তাঁকে সাহিত্যরসিক বলা আশ্চর্যের নয়।

গাছপালা সম্বন্ধেও তাঁর বিশদ অভিজ্ঞতা ছিল। আশ্রমের গাছগুলির প্রত্যেকটার পুংখানুপুংখ ব্যাখ্যা করে যেতেন। উত্তরায়ণে যে সব সাজানো গাছ-গাছালি আছে তারও কি প্রকৃতি কোনস্তর তারও বিস্তর বিবৃতি দিতে থাকবেন। এক্ষেত্রে কে বলবেনা তিনি উদ্ভিদবিজ্ঞানী নন। বলতে হয় তাঁর দৃষ্টি ছিল কতদিকে। কত আগে থেকে শান্তিনিকেতনের চিত্রকাহিনী মানসগোচরে রেখেছিলেন। যার জন্য কার্য্যকালে যথোচিতপথ অবলম্বন করতে সক্ষম হয়েছেন।

সর্ববিষয়বিদ্ এই মানুষটিকে আমরা পেয়েছিলাম মাত্র দুইটি বছর (১৯৫৬–৫৮)। এরপর ভারত সরকারের আমন্ত্রণে নিযুক্ত হন জাতীয় অধ্যাপক পদে। সেই সঙ্গে বিদেশী সম্মানও প্রযুক্ত হল রয়াল সোসাইটির ফেলোরূপে। তারপরে কথাই নেই বাকী জীবনটা নিজ প্রতিভায় বৃহত্তর কার্য্যসিদ্ধিতে বিশ্বসার্থক করেছেন। যতটুকু তাঁকে দেখেছি পরমার্থ স্বরূপ আমাদের মনে চির অক্ষত রয়েছে।

প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন

O ভাদ্র সংখ্যার পরে কার্ত্তিক সংখ্যা 'গোধূলি-মন' হস্তগত হয়েছে। কবি মলয় রায়চৌধুরীর সংবেদনশীল প্রবন্ধটি বেশ ভালো লাগলো। লেখাটিতে ফাঁক-ফোঁকর দেখতে পেলাম না। দেবীবাবুর "অসীম রায়ের" স্মৃতিচারণাচিত্র ভালো লেগেছে। সমালোচনা সম্পর্কিত অমল হালদারের নিবন্ধটি পড়াশুনা করে যত্নে লেখা। গৌতম বন্দোপাধ্যায়ের গল্পট সাদামাটা। পাঁচটি কবিতাই পড়লাম। অন্যান্য বিভাগ যথাযথ।

বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়
পোঃ—নটুকবনী, গ্রাম—শালতোড়া, জেলা—বাঁকুড়া

O বু, ব সংখ্যা পেয়ে খুব ভালো লাগলো। প্রভাসবাবু ও অজিত রায় দু'জনেই চিন্তিত, মতামতে মূল্যবান আলোচনা লিখেছেন। সাত্রঁ–এর ওপরেও খুব মূল্যবান একটা সংখ্যা আপনি করেছিলেন। যদি ভারতচন্দ্র, গোবিন্দ দাস, জীবনানন্দ ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ওপর বিশেষ সংখ্যা করেন, উপকৃত হবো।

সংযম পাল
লিলি কটেজ, ফুলবাগান,
বোলপুর, বীরভুম

গৌর বৈরাগীর

হলুদ খামের গল্প
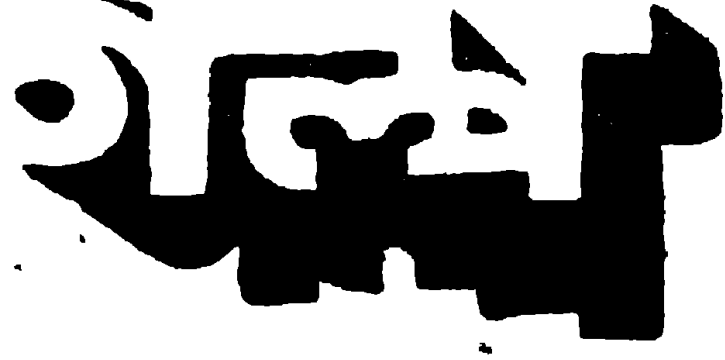
খেতে বসেছে অতনু সেই সময় চিঠিটা এল। রিঙ্কি পিয়নের হাত থেকে চিঠি নিয়ে বলল - বাবা তোমার চিঠি।

কথাটা কানে যেতে অতনুর দুদিকে দুটো ডানা। মুখে ভাত। হাত এঁটো। অবশ্য বাঁ হাতে চিঠিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলে একটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। কোথা থেকে আসছে চিঠিটা। কিন্তু এভাবে এই অগোছাল অবস্থায় জরুরী সুখের সংবাদটুকু পেতে চাইল না সে। বলল— ঘরে রাখো, আমি দেখছি। বলতে গিয়ে হয়ত গলাটা চলকে উঠতে পারে। অনু তাকাল। ওর মুখেও চূর্ণ হাসি। ভাত মাখতে মাখতে হাসি ছড়িয়ে দিল—কোথা থেকে এল।

গলায় ছমছম করছে সুখের ঠমক ঠামক। শুধু যা কৌতুহল। চিঠি আসবেই মনে মনে একরকম নিশ্চিত। মাছের টুকরো মুখে তুলল অতনু। চিবোতে চিবোতে আস্তে করে বলল—হয়ত সেই রিমঝিম থেকে।
—তাহলেই হয়েছে। বলতে গিয়ে ভারি রঙিন হল অনু। ঝটকা দিয়ে চুল বুক থেকে পিঠে ফেলেই খিল খিল হাসি—আমাদের ভাগ্যে আবার লটারী লাগবে তাহলেই হয়েছে।

না লাগলে তো দুঃখ পাওয়ার কথা। খানিক কষ্ট। একটু মন খারাপ। খুব পছন্দ হয়ে গেছল ব্যাপারটা। কাগজের ওপর প্ল্যান। অফিস ফেরত অনু আর অতনু হুমড়ী খেয়ে পড়েছিল। এটা বেডরুম, এটা স্টাডি, ওটা ড্রইং, এই কিচেন, বাথরুম, সিঁড়ি আর ওটা হল দক্ষিণ খোলা আট বাই চার লবি। সাতশো স্কোয়ার ফুট। বিরাশি হাজার। ভাবা যায়। রাত বারোটা বাজল। একটা বাজল। ঘুম আসেনা, ক্লান্তি আসেনা। খালি ব্যাক ক্যালকুলেশন। বিরাশি হাজার পুরতে আর কত ঘাটতি।

নীট হাজার দশেকের ঘাটতি নিয়ে দুদিন বাদে রিমঝিম-এর অফিসে গেল অতনু। গিয়ে ভারি অবাক! শ'দুয়েক ফ্ল্যাট। দু দিনে জমা পড়েছে হাজার খানেক দরখাস্ত। ম্যানেজার বলল—আমাদের ঠিক ধারনা ছিল না। এখন লটারী ছাড়া অন্য উপায় দেখছি না। টাকা এনেছেন!

অতনু ঘাড় নাড়ল।

—তাহলে ফর্ম ফিলাপ করে দিয়ে যান। লটারীতে নাম উঠলে জানিয়ে দেওয়া হবে। না উঠলেও অবশ্য চিঠি যাবে।

—হয়ত সেই চিঠিটাই। মুখে ভাত তুলতে তুলতে বলল অতনু। টাকাটা তাহলে একদিন ফেরত নিয়ে আসতে হয়।

মুখ নামিয়ে ছিল অনু। একথায় চমকে মুখ তুলল একটা আবছা মেঘের আড়াল নেমে এসেছিল যেন। তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলল অনু। ব্যবস্থা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাবনা যখন ঢুকেছে একবার তখন একমাত্র সুযোগের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকার মানে হয় না। যে কোন দিক থেকেই খবর আসতে পারে।

অনু মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে বলল—দাদাও পাঠাতে পারে চিঠিটা।

কথাটা মনে পড়ল অতনুর। লিখেছিল অনু নিজে। প্ল্যানটা ওরই, অনু বলেছিল—হাজার পনের দাদার কাছে কিছু না।

ইচ্ছা ছিল না অতনুর। কিন্তু উপায় নেই। দক্ষিণ খোলা আট বাই চারের একটা লবি তার বড় আকাঙ্খার। মাত্র পনের ষোল হাজারের জন্যে ব্যাপারটা থমকে যাবে সে বড় কষ্টের। অনু লিখেছিল —"দিন পনের'র মধ্যে তুমি অবশ্যই একটা উত্তর দেবে দাদা। আমরা অপেক্ষায় থাকব।"

পনের দিন নয়। মনে মনে হিসেব করল অতনু, দশ দিন। দশ দিন বাদে আজ কি তাহলে সেই চিঠির উত্তরটাই এল।

বাগুইহাটিতে ভি, আই, পি, এ্যানেক্স থেকে দশ-বারো মিনিটের পথ। এটা বলা যেতে পারে অনু-অতনুর দু'নম্বর স্কিম। অনুকে নিয়ে দেখে এসেছে অতনু। ধাঁ ধাঁ করে বাড়ি উঠছে। এপাশে প্লিনথ্ লেবেল ওদিকে রুফ্ লেবেল। একেবারে শুরু থেকে শুরু। এর একটা আলাদা স্বাদ আছে। বলেছিল অতনু। রোদ্দুর আড়াল দিতে ছাতি মাথায় এক পায়ে খাঁড়া বক। দুটো রাজ আর চারটে জোগাড়ের কাজ ইঞ্চি মেপে বুঝে নেওয়া। অতনুর দু'কাঠা তিন ছটাক পরিমান খালি জমি। তিন দিক খোলা। দেখার পরই বুগ বুগ করে রঙিন ইচ্ছেরা খাই মারতে লাগল ভেতরে। বেশি দেরী হলে হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে। শুধু পরিচিতির মধ্যে তাই। মাস খানেক টাইম পেয়েছে অতনু। একমাস আর কতদিন। এই সময় পনের হাজারের খবরটা বড় জরুরী ছিল।

তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে গলায় ভাত আটকাল। চুমুক দিয়ে জল খেল অতনু। শরীর জুড়ে ঝিল ঝিল করে নেমে যাচ্ছে স্রোত। ভেতরটা আথাল পাথাল। চিঠিটা যদি এক্ষুনি একবার দেখে নেওয়া যেত।

না খোলা পর্যন্ত সব চিঠিই এক গোপন রহস্য। এক প্রচ্ছন্ন ভাললাগা থাকে তাকে জড়িয়ে। কি হয় কি হয় ভাব। লটারীতে নাম ওঠা। কি পনের হাজারের প্রতিশ্রুতি। আবার উল্টোটাও হওয়া বিচিত্র নয়।

…"ছোটন, এখন একটু অসুবিধে রয়েছে। ইয়ার এনডিং-এর আগে আগে হার্ড ক্যাশের অবস্থা ভাল থাকে না। দুটো মাস তোকে অপেক্ষা করতে হবে। তারপর…ইতি দাদা"

মনটা ঝিম মেরে যায় অতনুর। দুটো মাস মানেই আবার ভাঙচুর। বাইরে তো বটেই। আবার ভেতরেও। আশঙ্কার চেয়ে স্বস্তি ভাল। মুখ তোলে অতনু।" বলে—আর কটা দিন যেতে দাও।

—কিসের!

—চিঠি আসার। হাসে অতনু। আসানসোলে দাদার কাছে চিঠি যাওয়া তারপর উত্তর নিয়ে ফিরে আসায় দশটা দিন বড় কম যে।

কথাটা অনুও যেন মনে মনে মেনে নেয়। অতনু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে—মাছটা আজ দারুন রেঁধেছো। অনু কথা বলে না। চামচে করে আর এক পিস মাছ নিয়ে অতনুর পাতে দেয়। বোঝা যায় প্রশংসায় এতটুকু উনিশ-বিশ হয় নি অনুর। না তাকিয়েও বুঝতে পারে। খাওয়া থামিয়ে চুপচাপ বসে আছে অনু। কিংবা হয়ত চুপচাপ নয়। থম-থমে আকাশের ওপারে বড় তোলপাড। তর সয়না। ইচ্ছেরা বড় তাড়াতাড়ি ডালপালা মেলে দেয়। আসলে ভেতরের মাটি বোধহয় উর্বর এখন। জমিটুকু রুইতে যা দেরী। গর্ভমুকুল ফাটিয়ে ফুটে ওঠে কুসুম কলি। সবুজ কাণ্ড। চিকন চিকন পাতা। পাতার আড়ালে হলুদ ফুল।

আজ চারটেয় মিটিং। এটা তাদের তিন নম্বর স্কিম। কো-অপারেটিভ বেসিসে জমি বাড়ি তারপর পজেশন। উদ্যোগীদের মধ্যে অতনু একজন। সব জায়গাতেই মাথা গলিয়ে রাখা। অসুবিধে বুঝলে সরে আসতে কতক্ষণ। এখন জমি বাড়ি এমন কি হাউসিং কো অপারেটিভের শেয়ারও বিক্রি করবে না। লোকে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

খাওয়ার টেবিলে বলটা এসে আছড়ে পড়তে চমকে তাকাল অতনু। লাল বল। ঘর থেকে ছিটকে এল বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে ওটা নিতে এল রিঙ্কি। চোখ পাকিয়ে তাকাল অনু—তুমি এখন খেলছ মামন।

কথাটা কানে যেতে মনে পড়ল অতনুর। চিঠিটা এ ব্যাপারেও তো হতে পারে। সে জন্যে অমন রাগ কিংবা অভিমান অনুর। রিঙ্কিকে নিয়ে কি কাণ্ডইনা করেছে ও। সারাদিন সব বাদ দিয়ে পাখীপড়ানো। সেই রিঙ্কি কিনা এ্যডমিশন টেস্টে কোয়ালিফাই করল না। বড় মুষড়ে পড়েছিল অনু। পুরনো স্কুলটা না বদলালেই নয়। অথচ চার চারটে স্কুলের এ্যাড-মিশনে বসে কিছুই করতে পারল না। এসব ব্যাপারে একজন দিবাকরদা ঠিক বেরিয়ে যান। তাকে নিয়ে সরাসরি অতনু স্কুলে গেছল। কথাবার্তার পর আশ্বাস পাওয়া গেল। অপেক্ষা করুন চিঠি যাবে বাড়িতে। দিবাকর দা বলেছিলেন—নিশ্চিন্তে থাক। বাড়িতে ঠিক চিঠি যাবে।

কথাটা কেন যে ভুলে গেছল অতনু। মনে পড়তে হাসল। বলল—এবার হয়েছে।

ভুরু কুঁচকে অতনুর দিকে ফিরল অনু—কি!

– নিশ্চয়ই স্কুল থেকে আসছে চিঠিটা।

দপ করে মুখের ওপর হাসিটা জ্বলে উঠল অনুর। রিঙ্কির দিকে তাকিয়ে বেঁকে যাওয়া চোখের ভুরুটা সরল হয়ে গেল। চোখের তারায় গোল একটা স্বপ্ন। সেই সঙ্গে আশঙ্কা। কি হবে, যদি ভিতটা তৈরী না হয়! ওদিকে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ভাবনারা কলকাতা থেকে উড়ে বিদেশে গিয়ে ল্যান্ডিং করেছে। নিখুঁত পরি-কল্পনা মাফিক এগিয়ে যাওয়া। অথচ প্রথমেই সেট ব্যাক। গত বছরও চেষ্টা কম হয়নি। বাধ্য হয়ে পুরনো স্কুলেই রেখে দিতে হয়েছিল রিঙ্কিকে। এবার।

—ওখান থেকে কি আসবে। আশঙ্কা নিয়ে আধখানা কথা বলে অনু। বুঝতে অসুবিধে হয়না অতনুর। চারটে স্কুলের মধ্যে যেটি তাদের প্রথম পছন্দের তার কথাই অনুর চিন্তায়। গত বছর হারার

সেকেণ্ডারীতে আশির মধ্যে তিরিশটা স্টার। পঁয়ষট্টি জন ফার্স্ট ডিভিশন। পনের জন সেকেণ্ড ডিভিশন।

—আসতেও পারে। কথাটা বলে অতনু। তবে বলতে গিয়ে গলায় তেমন জোর উঠে আসে না। একবার যদি কোন রকমে ওখানে একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়। এতখানি আশা করতে বড় ভয় হয় তার।

—দেখো, আমাদের আবার। হেসে অনু নিজেও হাল্কা হয়। তারপর রিঙ্কির দিকে তাকিয়ে আস্তে করে বলে—যাও, ঘরে যাও।

আঁচিয়ে ধীরে সুস্থে ঘরে ঢুকল অতনু। হাতের চেটোয় মশলা নিয়ে মুখে ফেলল। এক হাতে দেশলাই। অন্য হাতে সিগারেট। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দেশলাই জ্বালল সে। গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ল এক মুখ। কোন তাড়াহুড়োর ব্যাপার নেই। চিঠি খুললেই—"ডিয়ার স্যার, উই আর গ্ল্যাড টু ইনফরম ইউ..."

অবসাদ নয়। আশঙ্কা নয়। চারটের মধ্যে একটা উত্তর তো আসবেই। ঝরঝরে মন নিয়ে চেয়ারে এসে বসল অতনু। সামনে ছোট টেবিল। রিঙ্কির এই টেবিলে পড়াশুনো। বই খাতা পেনদানি। তার পাশে খামটি। দেখে খটকা লাগল অতনুর। চোখের কোলে ভাঁজ পড়ল। অর্ডিনারি খাম। পোষ্টাপিসে যেগুলো কিনতে পাওয়া যায়। উল্টো করে শোয়ানো। পিঠে দুটো পোষ্টাপিসের সিলমোহর। নামী স্কুলে নিশ্চয়ই এরকম খাম ব্যবহার করবে না। খামের মধ্যেও টান টান আভিজাত্য লেগে থাকার কথা। তাহলে।

—কি, কোন্ স্কুল। বারান্দা থেকে অনুর গলা। দুটো মাত্র শব্দ। তবু বলতে গিয়ে জড়িয়ে গেল। না মুখে খাবার আছে যে তা নয়। আসলে উদ্বেগে গলা শুকিয়ে যেতেই পারে। উদ্বেগ থেকে ভয়। না হলে এঁটো হাতে চিঠির ওপর এক পলক চোখ বুলিয়ে যাওয়া কি আর এমন। এখন কথাটা বলে উন্মুখ হয়ে ঘরের দিকে কান পেতে আছে অনু।

চিঠিতে হাত দেবার আগেই অতনু বলল—না, স্কুল থেকে আসে নি।

ঠিকই এরকম খামে ঐ সব স্কুল থেকে কোন চিঠি আসবেই না। তাহলে। তবে কি অনুর দাদা। খামটা হাতে তুলতে গিয়ে আঙুল কাঁপল অতনুর। তিরতির। দশটা দিন খুব কম নয় নিশ্চয়ই। আসানসোলের দূরত্ব আর কতটুকু। পিয়নেরা একটু তৎপর হলে চারদিনের মধ্যেই উত্তর নিয়ে চলে আসা যায়। যদি আসে। এক অন্য রকম উত্তেজনা টের পেল অতনু। সিগারেট টানতে ভুলে গেল। প্রথমেই খামটা তুলে আনল চোখের সামনে। দেখতে গিয়ে ফস করে নিশ্বাস পড়ল তার। প্রেরকের নাম ঠিকানা কিছুই যে লেখা হয় নি। অনেক সময় ভুল করে এমন হয়। আবার তাড়াহুড়োর জন্যেও হতে পারে। ব্যস্ত মানুষদের চিঠি লেখার সময়ই থাকে না। অনুর দাদা সেরকমই একজন ব্যস্ত মানুষ।

—তাহলে কার।

অনুর গলায় এখনও কৌতুহল। খাওয়ার পর টুকিটাকি সেরে বাথরুমে ঢুকবে ও। অনুও যাবে আজ মিটিং-এ। ওরও থাকার দরকার।

অতনু গলা তুলল—মনে হচ্ছে তোমার দাদার।

—তাই নাকি। দেখলে আমি বললাম। এদিক থেকে অনুর ঝরঝরে হাসি শুনতে পেল অতনু। কি লিখেছে দাদা।

—খামটা এখনও খুলিনি। কথা বলে আবার মুখ নামাল সে। খামটা ছেঁড়ার জন্যেই চোখের সামনে তুলে ভেতরের চিঠিটার অবস্থান জানতে চাইল। আর তখনই যেন হঠাৎ চোখ পড়ল তার নামটার দিকে। তার নাম আর ঠিকানা। পরিষ্কার বাংলায় লেখা।

ঠিকানা লিখতে গিয়ে অনুর দাদা কোনদিন বাংলায় লিখেছে বলে তো মনে পড়েনা। যদিও বা লেখে এরকম মকসো করা লেখা। ভাবাই যায় না। তার ওপর আশ্চর্য, ভারি আশ্চর্য। এইটুকু ঠিকানার মধ্যে দু'দুটো বানান ভুল। অনুর দাদা চুটিয়ে ব্যবসা করতে পারে। তাবলে এ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ার মোটেই হেলাফেলার নয়। এ চিঠি কিছুতেই অনুর দাদার হতে পারে না। তাহলে কার চিঠি।

যে হাতে এই ঠিকানা লেখা হয়েছে সেই হাত কি অতনুর পরিচিত। তার চেনাজানার ভেতর এমন হাতের লেখা তো কারো হবার নয়। খুব ধীরে সুস্থে একটা একটা করে শব্দ লেখা হয়েছে। ডট পেনে লেখা। মনে হয় অনেকদিন এক টুকরো ঠিকানা লেখারও দরকার পড়েনি এই পত্র লেখকের। হাসল অতনু। হয়ত ক্লাশ এইট পাশ করে সিনেমায় আজ আট বছর গেট কীপারের চাকরী করছে তার ঠিকানা লেখক।

তো এরকম একজন পত্র লেখক কি তার পরিচিত কেউ। তার পরিচিতির মধ্যে শুভময় আছে। স্বাধীন আছে। অলকেশ আছে। শতদ্রী আছে। আর কোয়েল···ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তারাপদর নামটা মনে পড়ে গেল অতনুর। মনে পড়ার কারণ হয়ত গেটকীপারী আর সিনেমার অনুসঙ্গ।

অফিস থেকে গুসকরায় পিকনিকে গিয়ে তারাপদর সঙ্গে দেখা হয়েছিল—তুই!

প্রথমে ভ্যাবাচাকা। তারপর জিলজিল করে একরাশ ছেঁড়া খোঁড়া হাসি—আমি এখন এখানেই থাকি তনু দা।

মুখে একগাল দাড়ি ছিল ছেলেটার। ফ্যাকাশে দু চোখ। রগের কাছে নীল শিরা। রতন কাকার সেজ ছেলে। তিরিশে দু'ছেলের বাপ। মহুয়া সিনেমা হলের অন্ধকারে হাতে টর্চ নিয়ে দর্শকদের সিটে বসায়।

—তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। বলতে গিয়ে হাতখানা জড়িয়েও ধরে অতনুর। আজ সাত-মাস হল সিনেমা হলে লকআউট। তুমি তো এখন—

বড় আবদারী গলায় দুচোখে বিস্ময় নিয়ে এখনকার তনুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজছিল। চেপে রাখা যায় না। চেপে রাখা যায়ও নি। চর বলরাম-পুর হয়ে এই গুসকরাতেও তনুর হয়ে ওঠার খবর পেঁছে গেছে।

-- যদি একটা কিছু ব্যবস্থা হয় বলো না। শক্ত শক্ত শীর্ণ আঙুল দিয়ে চাপ দিয়েছিল তারাপদ। কথা শেষ করে অপলক তাকানো—তোমার কাছে কি একবার।

—না, তোর আসার দরকার নেই। হিসেবি গলায় বলেছিল অতনু। একবার তাকিয়েছিল এগিয়ে যাওয়া পিকনিকের দলটার দিকে। খবর থাকলে আমিই চিঠি দোব। পকেটে হাত ঢুকিয়ে কলম তুলে এনেছিল। অন্য পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট। তোর ঠিকানাটা কি।

ঠিকানা শুধু নেওয়া নয়। দিতেও হয়েছিল সেদিন। কাগজ না পেয়ে হাতের তালুতে অতনুর ঠিকানা তুলে নিয়েছিল তারাপদ। আমি কিন্তু তোমায় চিঠি দোব তনু দা।

দু'বছর বাদে সেই চিঠি তারাপদ কি আজ পাঠাল। কিন্তু সত্যিই কি তাই। সেজন্যে চিঠি দেবার দরকার ছিল সেই অসুবিধাগুলোর তো এতদিন অপেক্ষা করে থাকার কথা নয়। তাহলে—

—কি লিখেছে দাদা। এবার বাথরুম থেকে গলা ভেসে এল অনুর। গলায় তিন নম্বর স্থির ধীরে ধীরে কংক্রীট হচ্ছে অনুর। টীপেস্ট এ্যাণ্ড সেফেস্ট।

ইনিশিলায় ইনভেস্টমেণ্ট। সুদও বলতে গেলে নাম-মাত্র। ফার্স্ট ফ্লোরের সাড়ে ন'শো স্কোয়ার ফুট। দাপিয়ে ভোগ করা যাকে বলে। ঝুল বারান্দায় এসে দাঁড়ালে বুক খোলা ফুটবল মাঠ। বাঁ দিকে পার্ক। ডান দিকে কো-অপারেটিভের গার্ডেন। গার্ডেনের ভেতর কৃত্রিম পাহাড়।

দেরী হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। মিটিং শুরুর আগেই তাদের উপস্থিতিটা অত্যন্ত জরুরী। তাড়াতাড়ি তৈরী হতে হবে অনুকে। না হলে খবরটা হয়ত কাছে এসেই জেনে যেতে পারত।

—দাদা কত পারবে লিখেছে?

অনুর গলায় একটুও আশঙ্কা নেই। উত্তেজনাও। খুব নির্ভার গলায় কথা বলল অনু। যেন এরকমটাই হবে জানা কথা। অথচ হঠাৎ একদিন তারাপদর যে একটা চিঠি চলে আসতে পারে জানা ছিল না। অনু নিশ্চয়ই কান খাড়া করে অপেক্ষা করছে। তারাপদর নামটাই কি বলবে নাকি অতনু। কিন্তু সে বড় জটিল ব্যাপার হবে।

কে তারাপদ?

সেই যে রতন কাকার সেজ ছেলে। চর বলরাম-পুর গাঁয়ের রতন কাকা। যে রতন কাকা রাজা পঞ্চম জর্জের ছাপওলা একটা রুপোর টাকা দিয়ে তোমার মুখ দেখেছিল। সেই, যে টাকার গায়ে সবুজ কলঙ্ক লেগেছিল প্রাচীনতার। যে প্রাচীনতা…

—কি হল চুপ করে আছ যে, ভেতর থেকে তাড়া দিল অনু।

অতনু গলা তুলে বলল—তোমার দাদার নয়।

ওদিক চুপচাপ হয়ে গেল। কথা বলছে না অনু। স্বাভাবিক। আর অন্য কোন চিঠির এই মুহূর্তে প্রত্যাশা নেই। বাথরুমে কলখোলার শব্দ পাওয়া গেল। অনুর আগ্রহ সরে যাচ্ছে চিঠি থেকে। অতনুরও অবশ্য তাই। আগ্রহ নিভে যেতে মিইয়ে গেল সে। আলতো করে চিঠিটা ফেলে দিল টেবিলের ওপর।

এখন তাকেও তৈরী হতে হবে। শীতের অপ-রাহ্ন বেলা। রোদ মরে আসছে দ্রুত। হাওয়ায় শীত শীত। আকাশে হাল্কা মেঘ। এখান থেকে আকাশ দেখা যায় না। মাঝে মধ্যে কখনও সখনও বাতাসের মৃদু গন্ধ নাকে আসে। কানের পর্দায় সারাদিন ঝম-ঝম ব্যস্ততা। নতুন স্থানান্তর কি রকম হবে তাদের। আকাশ চাই। বাতাস চাই। আলো চাই।

এখুনি উঠতে হবে তাকে। তবু ওঠা যাচ্ছে না। একটা খাম না খোলা অবস্থায় সামনে পড়ে আছে। সে ভারি অস্বস্তি। আবার ভয়ও। খামের ওপর পোস্টাপিসের গোল গোল চাকা। ধেবড়ে যাওয়া কালি। ওখান থেকে কিছুতেই নাম উদ্ধার করা যায় না। কিন্তু সেটা একটা বড় ব্যাপার নয়। খোঁজার আগেই হু হু করে একটা নীল আকাশ। আকা-শের নীচে ঘোষেদের দিঘী। দিঘীতে পদ্ম ফোটে। ন'কর্তার পুজো মণ্ডপ। হরিসভার আটচালা। দোলের সময় চব্বিশ প্রহর সেখানে। সমাপ্তি লগ্নে হরিসভার চত্বরে চারটে দাউ দাউ উনুন। অন্নভোগ গভীর শ্বাস টানলে সেই গন্ধ এখনও নাকে এসে লাগে। চিঠি এলে নিয়ে আসে সেই গন্ধ। বড় ভয় করে অতনুর যেমন এখন। খুললেই যদি—'স্নেহের বাবা তনু, শুনিলাম কলিকাতায় তুমি পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিয়াছ। খুব ভাল হইয়াছে। মাঝে মধ্যে আমাদের এখানে আসিও। পরের বার আসিবার সময় বড়বাজার হইতে আমার জন্য মতিহারি তামাক আনিও। এখানে ঐ জিনিষ পাওয়া যায়না। তুমি আমার প্রাণভরা আশির্বাদ লইবে—ইতি তোমার

—কার চিঠি তাহলে। কলের হড় হড় শব্দ ভেঙে অনুর গলা ভেসে এল আবার। কোন আগ্রহ যে তা নয়। শুধু জানতে চাওয়া। উত্তরটা কানে

যেতেও পারে, নাও পারে। তবু কি বলা যায় এখন! গঙ্গাজল মায়ের কথা

যেতেও পারে। তবে হয়ত একটু বিস্তারিত হতে হবে অতনুকে। সেই তিনি, যার মতিহারি তামাক নিয়ে যাওয়া হলনা। সেই একবার যিনি কাঁপা কাঁপা হাতে পোষ্টকার্ডে লিখেছিলেন "আমাদের অন্নপূর্ণার একটি নৈ-বাছুর হইয়াছে।"

হয়ত বলা যেতে পারত কিন্তু তার আগেই ভেতর থেকে গুন গুন সুর ভেসে এল। মন ভাল থাকলে অনু দু'এক কলি গান গায়। কিংবা গান গাইলে মন ভাল থাকে। যেমন এখন। ভারি নিশ্চিন্ত সে। দিবাকরদার হাত খুব লম্বা। সেই দিবাকরদা কথা দিয়েছে যখন, চিঠি আসবেই। অনুর দাদার কথা দেওয়াই আছে—তোদের যখনই দরকার হবে। বলতে দ্বিধা করিসনি। একটু পরেই অনু শাড়ি বদলে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসবে। আজ একটা শুভ কাজ। এই কাজের সময় হলুদ রঙ চটা খামের কথা তুলতে ভারি ভয় হয় অতনুর।

গঙ্গাজল মা লিখেছিলেন—বাবা তনু তোমাকে বলিতে লজ্জা নাই। মাসে মাসে পাঁচটা করিয়া টাকাও যদি…"। চিঠিটা টেবিলের ওপর ছিল। চোখ পড়েছিল অনুর—কে গঙ্গাজল মা! কি সম্পর্ক টাকার কথাই বা কেন। চোখের কোলে ভাঁজ উঠে এসেছিল অনুর। গলার স্বর থমথমে। মনে ছিলনা অতনুর। গঙ্গাজলমাও বোধহয় জানতেন না। ভয়ের কথা কেউ সাদা সাপটা পোষ্টকার্ডে লেখে না। এখন কথাটা মনে পড়ল। পাঁচ টাকার জন্যে যাঁর হাত আকুল পাতা ছিল খাম যে তাঁর কাছে খুবই মহার্ঘ। তেমন হলে এ চিঠি কার।

টেবিল থেকে চিঠিটা আবার হাতে তুলল অতনু। গঙ্গাজলমা না হলে আর কে? লেখায় মেয়েলি ছাঁচ। বাঁ দিকে হেলে পড়া অক্ষর। কিন্তু কোন মেয়ে? যার ক্লাশ এইট বা নাইনের পর বিয়ের পিঁড়ি। আঠারো বছরে বিয়ে। উনিশ বছরে বিধবা। তারপর আবার জন্মভিটে। সেখানে কারো না থাকারই কথা। থাকলে পড়াশুনোর পাট থাকত। থাকত একটা টাটকা রিফিল লাগানো ডটপেন। অথচ তা নেই। তাই পুরনো বাসি ডটপেনে ঠিকানা লিখতে গিয়ে রিফিল শেষ হয়ে গেছে। কলিকাতার 'কলি' পর্যন্ত ডটপেনে। বাকিটা উড পেনসিলে। লিখতে খুব ঝামেলা হয়েছে সেই মহিলার। কিন্তু কে সেই মহিলা। সে বড় একা। সে একরকম চলে যাচ্ছে জীবন—অসুবিধে তো আমাকে নিয়ে নয় ভাই। বলেছিল তরুলতাদি। কথা হচ্ছে মাকে নিয়ে। রোগে শোকে বুড়ো মানুষটা বড় কষ্ট পাবে।

অতনুর সঙ্গে অনুও তখন—তা কেন, তা কেন। বড় মা আমাদের সঙ্গেই যেতে পাবেন।

কথাশুনে বড় মা হেসে খুন। হাসতে গিয়ে গালের চামড়া থুর থুর করে কেঁপেছিল। হাসির শেষে খক খক করে কাশি। বলেছিল—যাবে যাবে, একদিন ঠিক যাবে তনু বাবা। তবে তোদের বড় মা নয়। যাবে বড় মার খবর।

সেই খবরটাই কি। ভাবতে গিয়ে একটু কাঁপল অতনু। ফেরার পথে অতনু বলেছিল—যদি রাজি হয়ে যেত বড়মা।

ঝিল ঝিল করে হেসেছিল অনু। কোন জবাব দেয়নি। বেশ কটা ছিল কেমন যেন কাঁটা হয়ে ছিল অতনু। বলা যায়না। তরুলতাদি যদি সিদ্ধান্ত বদল করে একটা চিঠি পাঠায়। পাঠায়নি। হয়ত আর পাঠাবেও না। এটাই বোধ হয় শেষ চিঠি।

হাতে খাম নিয়ে চেয়ারে হেলান দিল অতনু। হাল্কা শ্বাস পড়ল তার। আশ্চর্য এবার ভয়টা সরে যাচ্ছে। চাওয়া শেষ হবার খবরে স্বস্তিই তো আসার কথা। ভয় কেটে যাচ্ছে। এবার খামটা

খোলা যেতে পারে। দু' আঙুলের টানে মুখটা ছিড়ল অতনু। আনমনে দুটো আঙুল ভেতরে আঁতি পাতি। একবার। দুবার। শেষে চোখের সামনে তুলে আনল। ভেতরটা রিন রিন করে বেজে উঠল তার। আশ্চর্য ভারি আশ্চর্য। খাম আছে। অথচ ভেতরে চিঠি নেই।

চারদিক হঠাৎ যেন খুব চুপচাপ। বাথরুমে জল পড়া থেমেছে। অনু দ্রুত হাতে শাড়ি জামা বদলাচ্ছে। এসময় গলায় গুন গুন করে সুর থাকে। চোখে সুখ থাকে। সুখের ভেতর সাদা পায়রা। অতনুরও তাই। মানে তাই ছিল। একটু আগেই তো বড় তৃপ্তি করে ভাত খেয়েছে। আজ একটা ক্যাজুয়াল নিয়েছে সে। সারাদিন অবসর। আলস্য। কখনও বিছানায় আধশোয়া। তার মধ্যে হঠাৎ এই চিঠি।

না চিঠি নয়। শুধু একটা খাম। আশ্চর্য, আসবার আর সময় পেল না। যখন নতুন করে জোড়তার ঠিকানা বদলের আয়োজন ঠিক তখনই। কিন্তু এলই যখন তখন দাবী হীন কেন। সত্যিই কি আর কিছুই চাওয়ার নেই। যেমন চেয়েছিল হারান কাকা।

"বাবা, তোমার কাকীমাকে কলিকাতার হাস-পাতালে একবার শেষ দেখাইতে চাই। কলিকাতায় আমাদিগের আপনজন আত্মীয় কুটুম্ব কেহই নাই। বাবা তনু, তোমার ঐ খান হইতে থাকিয়া যদি...'

—কি ব্যাপার তুমি এখনও বসে যে!

অনুর কথায় চমকে তাকাল অতনু। অনু তৈরী। গা বেয়ে হাল্কা সেণ্ট চুঁইয়ে নামছে। সারা মুখে রেণু রেণু সুখ।

ওঠো, তাড়া দিল অনু।

দেরী হয়ে যাচ্ছে। ঠিক চারটেয় মিটিং। আজ মেমোরাণ্ডাম তৈরী হবে। কমিটি ফর্ম হবে, ভাবী সদস্য হিসেবে অতনুর নাম প্রোপোজ করেছে অনে-কেই। প্রথম দিনেই দেরীটেরি হয়ে গেলে সে বড় বিচ্ছিরি ব্যাপার। তবু কেন যে হঠাৎ আলস্য ঘিরে ধরছে। হারান কাকা লিখেছিল—"তোমার জবাবের আশায় উন্মুখ হইয়া থাকিব।"

অনু বলেছিল—ঠিক বুঝে যাবে। চিঠি প্রাপ-কের কাছে পৌঁছয়নি। বাসা বদল হয়ে গেছে।

—কি ব্যাপার গো? পেছনে এসে দাঁড়াল অনু। আলতো হাত ছোঁয়াল অতনুর পিঠে। কার চিঠি। কে লিখেছে।

খামটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল অতনু। সেটাই আলগা তুলে আনল চোখের সামনে। হাসল চর বলরামপুর থেকে আসছে।

—কার। লহমায় চোখের তারা স্থির হল অনুর। কপালে ভাঁজ পড়ল।

হাসি পেল অতনুর। অনুই বলেছিল গাঁয়ের মানুষেরাও এখন জেনে গেছে। শহরে খুব ঘন ঘন ঠিকানা বদলে যায়। জানত না অতনু। তার সব ঠিকানাতেই খুঁজে খুঁজে চর বলরামপুর হানা দিয়ে গেছে। কিন্তু এবার অনু ঝুঁকে এল খামের ওপর। হাত বাড়াল—কে লিখেছে।

হাসতে গেল অতনু। কেউ নয়, কেউ নয়, বলতে গিয়ে হু হু করে উঠল বুকের ভেতর।

এতদিন হারায়নি। কিন্তু এবার নতুন ঠিকানাটা সত্যিই হারিয়ে ফেলল চর বলরামপুর।

হাতছানি দেয়/ধীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

ছুটির কদিন ইচ্ছে ছিল
টুকিটাকিগুলো সেরে ফেলা
অথচ এলেবেলে কিছু ব্যাপারে
ঘেঁসে যায় সে
এখন হাত কামড়ানো !

মনের মতো হয়ে ওঠেনি
কোনটাই
নিছক পার্থিব ব্যাপারগুলো
নাড়াতে পারেনি তাকে
ছুটে বেড়ায় এধার থেকে সেধার !

তাকে নিয়ে দারুণ কানাঘুসো
অথচ সে-ই কান দেয়না
এসবে। থেকেও না থাকা
না ধরা এক জগৎ কল্পনায় !

কেউ বা পাগল বলে
অপদার্থ
বইয়ের পর বই, পত্র-পত্রিকা
লুব্জ পেপার টিলা
ডুবে থাকা
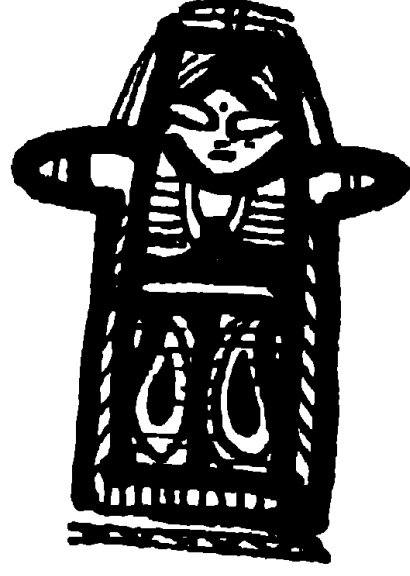
সাধারণের থেকে একটু
অন্যরকম সে
যদিও জীবনের স্বাদ
বাঁচার তাগিদ আছে তার-ও !

তাকে নিয়ে গল্প করা
রসিকতা করে যারা
তারাই স্থান পায় তার
সৃষ্টির মূলে !

নদীর পাশে বসা
ঢেউ ভাঙা ; ঢেউ নিয়ে খেলা
আকাশের নীল
গাছ গাছালির শ্যামলতা
ছড়িয়ে ছিটিয়ে
বরফ-মাথা চুড়ো
হাতছানি দেয় !!

ভূতেরা/কৃষ্ণসাধন নন্দী

আমাদের ভূতেরা শেওড়াগাছ ছেড়ে
নেমে পড়েছে ঘরের মাঝখানে
তারপর গায়ে মাথায় ভর, লক্ষ্য রাখছে
কিম্ভূতকিমাকার চেহারা
পাঁচকে কেমন সাত বানাচ্ছি, পোশাকের
ভেতর লুকিয়ে রাখছি ছুরি
রামনাম উচ্চারণে কুড়োচ্ছি সাধুবাদ
আর যত চতুর তত ফতুর হচ্ছি পকেটে
একের পর এক হারাচ্ছি অনেক কিছুই।
আমাদের ভূতেরা ঘাড় মটকাতে ভুলে যাচ্ছে
আমাদের কেবল।

আমার স্বপ্নের মধ্যে/ভক্তিব্রত চক্রবর্ত্তী

আমার চেতনার মধ্যে দাঁড়িয়েছিল ভুবনেশ্বরের মন্দির ;
আমার স্বপ্নের মধ্যে বাজছিল কোণারকের নূপুরধ্বনি ।
গুহাবাসী অপ্সরার লীলায়িত বাসনা নিবিড় ;
কাঁপালো কি পল্লবিত দুচোখের অমুচ্চার মণি ।

চিল্কিগড়ের বনের মধ্যে মন্দিরে
অষ্টধাতু নির্মিত দেবী মূর্তি এখন বড়ো একাকী -
প্রতীক্ষা করে কোন প্রসাদলোভী ভক্তের ।

আমার চেতনার মধ্যে শূন্যতা ক্রমশ ছড়ায়
অথচ স্বপ্নের জগৎ ক্রমে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে—
আসমুদ্র হিমাচল মন্দিরের প্রচ্ছদ সজ্জায়
অভিমান ভালোবাসা রমণীর রমণীয় ঠোঁটে ।

সময় ভেঙে দিচ্ছে হাতের মুদ্রা
স্তনাগ্রচূড়ার সম্মোহন—সময় মুছে নেয়
ওষ্ঠাধরের লালসা ।
সময় অনন্ত শূন্যতার মধ্য তুলে ধরছে
ভুবনেশ্বরের মন্দির চূড়া —
তবু আমার স্বপ্নের মধ্যে কোণারকের নূপুরধ্বনি
আবহমান আসঙ্গ লিপ্সায়—

"তুমি তো মানুষ"/ত্রিদবকুমার বর্মণ

কেঁদে উঠলে ··· জন্মেই
হাঁটার ভয়ে !
তুমি তো মানুষ ।

সটান দাঁড়াও—হাঁটো, জোরে
বাধা পেরিয়ে
চলো এগিয়ে—
তুমি তো মানুষ ।

থামলে কেন—মানলে কেন হার
মৃত্যুর কাছে
এতো ভয় !
তুমি তো মানুষ ।

জন্ম মৃত্যু ··· ভয় মানে না
জয়ে থামে না
এমন জীবন —
তুমি তো মানুষ ॥

স্বন/মহরম আলি

এক নদী উঠোনকে ডাকে আয় আয় আয়
কিংবা উঠোন নদীকে—
আরো এক নদী থাকে নদীর ওপারে
আমার ঘরের দুয়ার ছুঁয়ে যায় সেই নদী ।

এখন মৃত্যুর শেষ নদীটির মতন এই আমি
আশ্চর্য এক বিকেলের মত বর্ণময় ;
উজ্জ্বল কোনো গ্রহের গান গাই এখন ।

এসো, যাওয়া যাক সময়ের আরো কাছাকাছি
আমরা ছিনিয়ে আনি অশেষ সময়
কোনো দিন শেষ হবেনা
এমন হাসির এক বহমান সুন্দর বর্ণনা ।

জীবনের গান গাওয়া যাক
স্বপ্নের সাদা ফুলগুলি অতুল মহিমায় এবার
মৃত্যুর শেষ সিঁড়ি ছুঁয়ে নূতন কোনো রঙে ফুটুক ।

সংবাদ

০ হুগলী জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রয়াস ও সফলতা

আগামী ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য এবং বর্তমান জন্মহার যা হাজার প্রতি ৩৩ তাকে কমিয়ে ২১শে আনা। এই কর্মসূচীকে সফল ও বাস্তবায়িত করতে চাই ঐকান্তিক ও একনিষ্ঠ কর্মপ্রচেষ্টা। কেবলমাত্র সরকারী প্রচেষ্টায় এত বড় কর্মযজ্ঞ কোনদিনই সফল হতে পারে না।

গত ১৯৮৫-৮৬ সালে এই জেলায় জন্মনিয়ন্ত্রণে স্থায়ী পদ্ধতি হিসাবে ৩৩ হাজার অস্ত্রোপচারের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল। পঞ্চায়েত ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় ২১০৭০ জনকে অস্ত্রোপচার করে মূল লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৭০.২ ভাগ সাফল্যলাভ ক'রে রাজ্যের মধ্যে ৭ম স্থান লাভ করে এই জেলা। সাফল্যের হারকে আরও স্বার্থক করে তোলার জন্য আমরা চলতি আর্থিক বৎসরের শুরু থেকেই আমাদের সরকারী উদ্যোগ ছাড়াও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় জেলার প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, কিছু কিছু উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র মহকুমা ও সদর হাসপাতালগুলিতে ইচ্ছুক মহিলা ও পুরুষদের অস্ত্রোপচার ও আর্থিক অনুদান দেবার ব্যবস্থা রেখেছি। অতি আধুনিক 'ল্যাপ্রোস্কোপ' পদ্ধতিতে মায়েদের অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থার দিকেও এবার বেশী জোর দেওয়া হয়েছে।

একই সাথে জেলার সকল স্তরের মানুষকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী বিষয়ে অবহিত করার জন্য শিক্ষামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে স্বাস্থ্য শিক্ষাদান ও গণসংযোগ বৃদ্ধির ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে সারা রাজ্যের সাথে আমরা এই জেলাতেও গত জুলাই মাস থেকে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত সময় সীমার মধ্যে বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা অভিযান এর ব্যবস্থা নিয়েছি। উদ্দেশ্য: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীকে আরও জনপ্রিয় করা ও আরও বেশী দম্পতিকে এই কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করা। এই সময়ের মধ্যে জেলা সদর শহরসহ প্রতিটি মহকুমা স্তরে ৪টি পদযাত্রা, গ্রাম স্তরে ৭১টি ছায়াছবি প্রদর্শন, ব্লক স্তরে ১৭টি ও গ্রাম স্তরে ১০৬টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক আলোচনাচক্রের আয়োজন সহ পোষ্টার প্রদর্শনী, প্রায় ১২৫০০টি স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ, মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল বিষয়ক পুস্তিকা বিতরণ এবং পরিবার কল্যাণ বিষয়ক যাত্রা অভিনয়েরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ছাত্র-যুবদের এই কর্মযজ্ঞের সামিল করার জন্য তাদের দিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ে প্রবন্ধ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। শহর গ্রামের নেতৃস্থানীয়দের এই কর্মসূচীর সাথে বিশেষভাবে যুক্ত করার জন্য তাদের নিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ শিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা হয়েছে।

জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সেবাকাজ অব্যাহত রাখার জন্য গ্রাম থেকে জেলা অবধি বিভিন্ন স্তরে উপদেষ্টা কমিটি গঠন

করা হয়েছে।

এই সব গণমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলেই আমরা এই সময়ের মধ্যেই পরিবার কল্যাণের স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় পদ্ধতির ক্ষেত্রেই লক্ষ্য-মাত্রার শতকরা ৫০ ভাগ সফল হতে পেরেছি। মূল সাফল্যের কথা বিচার করলে এই সাফল্য হয়তো তেমন কিছুই না। এর জন্য চাই আরও বেশী গণ সংযোগ এবং সকলের সার্বিক আন্তরিক সহযোগিতা।

O *পরলোকে নজরুল সহচর সিরাজুল হক*

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী নেতা কাজী নজরুল ইসলামের দীর্ঘদিনের সাথী ও নিত্য সহচর, হুগলী বিদ্যামন্দিরের সেবক ও নজরুল সাহিত্যের প্রচারক বিপ্লবী সিরাজুল হক গত ১১ই ফেব্রুয়ারী বুধবার হুগলী চকবাজারস্থিত কাটঘরা গলিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

নজরুলের "ধূমকেতু" পত্রিকা কলকাতার "লাঙ্গল" পত্রিকা প্রচারে সিরাজুল হকের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দুটি পত্রিকার বিশেষ সমাদর করতেন এবং আশীর্ব্বাণী লেখেন। এছাড়া কয়েকটি কবিতা এখানে উপহার দেন। সাহিত্যিক ও বিপ্লবী প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সিরাজবাবুর ও নজরুলের ঘনিষ্ঠ সাথী। সিরাজবাবু ও প্রাণতোষবাবু নজরুলের গান ও কবিতা পরিবেশনে ওস্তাদ ছিলেন।

এই দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎকার "গোধূলি-মন" পত্রিকায় ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

সাহিত্য প্রচারের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে এই পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

শীতল দাস, চুঁচুড়া

O *পলসা গ্রামে সাহিত্য ও সঙ্গীত মেলা*

৮ই ফেব্রুয়ারী পলসা গ্রামে ৭ম বর্ষ সাহিত্য ও সঙ্গীত মেলা হয়ে গেল। বর্ধমান জেলার এই গ্রামটির এই উৎসব এই অঞ্চলের এক বিরাট উৎসব। পশ্চিম বাংলার দিক দিক হতে কবি, সাহিত্যিক, আবৃত্তিকার সঙ্গীতকরা আসেন। সকাল নটা থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। সকালের দিকে জমায়েত কম হলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান মঞ্চ কানায় কানায় ভরে ওঠে। সুন্দর বক্তব্য রাখেন মৃদুলমলয় সেনশর্মা, দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতার শব্দ শাব্দিক গোষ্ঠীর সুদীপ রায় চৌধুরী, দুর্গাপুরের কল্লোলশ্রী মজুমদার। মুহম্মদ মতিউল্লাহ, গৌতম বণিক, প্রফুল্ল অধিকারী, চপল মিত্রের কবিতা ভাল লাগলো। রাজেশ কোনার, প্রসূন সেনশর্মা, শুভাশীষ পাঁজার আবৃত্তি হৃদয়গ্রাহী। একটি শিশু আবৃত্তিকার সৌম্য চট্টোপাধ্যায় সম্ভাবনাময়। বরুণ সেনগুপ্ত ও রাণু গুহের গান খুব ভাল। দুলাল চট্টোপাধ্যায়ের "কেন হে অর্জুন" গল্পটি সকলের মন জয় করেছে। গৌরী চট্টোপাধ্যায়ের "শিকার" কবিতাটি বাংলা আধুনিক কবিতা আন্দোলনের এক তেজী ফেষ্টুন একথা বলেছেন প্রধান অতিথি ডঃ বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। ঋষিণ মিত্রের কবিতার গান প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছে। ●

○ প্রসঙ্গ ঃ গোধূলি-মন ○

○ আপনাদের 'বুদ্ধদেব বসু' সংখ্যায় (পৌষ-মাঘ, ১৩৯৩) প্রাবন্ধিক শ্রীঅজিত রায়ের চিঠিটা পড়লাম। ওঁর বক্তব্য বিষয়ের মূল ধরে টানাটানি করার ইচ্ছা আমার কখনোই ছিলনা, এখনও নেই।

আমার সমালোচনা—দুটি সীমিত ব্যাপারে। (১) রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে উনি নিজের খেয়ালখুশীমত বিকৃত উদ্ধৃতি দিয়েছেন ২) কোন কোন জায়গায় অশালীন মন্তব্যও করেছেন।

প্রথমটি আমি প্রমাণ করেছি বলে মনে করি। দ্বিতীয়টির সমর্থনে উদ্ধৃতি "বিবর্তনের এই স্বাভাবিক ধারায় অনিবার্য্য প্রডাক্ট হাল-বাংলার সিদ্ধিদাতা গণেশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"। এটা হয়তো বাংলা সাহিত্যের ডারউইন (Darwin) শ্রীরায়ের কাছে "পরম শ্রদ্ধেয়, পরম প্রিয়" ও "গদ্যে নতমস্তক" হওয়ার প্রমাণ—আমার কাছে নয়।

চিঠিটিতে আরেকটি জিনিষ স্পষ্ট হয়েছে সেটি হচ্ছে শ্রীরায়ের অনৃত ভাষণের প্রবণতা। এর কারণ জনবিশ্লেষণেই ধরা পড়বে। আমার রবীন্দ্র পাঠ 'সহজপাঠে'র কাছাকাছি। সেজন্য ঐ উদ্ধৃতি 'অধ্যাপক' গল্পে খুঁজে পেলাম না। কেউ যদি পান তো আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব। আশা করেছিলাম এ ব্যাপারে সম্পাদক তাঁর মতামত জানাবেন- যাই হোক বিতর্কে আমি আর অংশ নেবনা।

জ্যোতির্ময় বসু
ফ্ল্যাট ২, ব্লক ডি
৮২ বেলগাছিয়া রোড
কলিকাতা-৭০০০৭

○ সংগ্রামী শুভ কামনা রইলো। আপনার গোধূলি-মন (শারদীয়া) সংখ্যা পেলাম। প্রথমেই সাহিত্য নির্বাচনের জন্যে কিছুটা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উন্নতমানের কাগজ, টাইপ আর শাওন সৌন্দর্যে ভরা এই সংখ্যাটি। মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আমাদের মা', বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেটে গেল কতদিন', কৃষ্ণা বসুর 'মুগ্ধের ব্যাকরণ', প্রভাত লাহার 'মাটির গন্ধে', রাখাল বিশ্বাসের 'সুন্দর, তোমাকে ঘিরেই', গৌর শংকরের 'যে দিকেই যাই' কবিতাগুলো আমার ভালো লেগেছে। তাছাড়া শক্তিশালী ছন্দ না হলে যে আধুনিক গদ্য কবিতার কোন পরিপূর্ণতা আসে না—তা আপনার মঙ্গল বাজছে কবিতা পড়েই যে কোন পাঠক বুঝতে পারবে। মুদ্রণের দিক দিয়ে খুব ভালো হয়েছে। তবে গল্পগুলো বেশী আকর্ষিত হতে পারিনি। কিন্তু অমিতাভ বাগচীর 'পদ্মা-পারের জোড়াবট' প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য এবং শক্তিশালী লেখা বলে দাবী করতে পারে। সবকিছু মিলিয়ে শারদীয়া সংখ্যা '৮৬ প্রশংসার দাবী তো রাখেই তাছাড়া আপনার বলিষ্ঠ ও সাহসী পদক্ষেপের কথা আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিতে চায়। তার চেয়ে বড়ো কথা—এত কম বিজ্ঞাপন ছেপে এমন সুন্দর সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের ভার নেওয়া এবং তা যথারীতি প্রকাশ করে যাওয়া নিঃসন্দেহে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। চিঠি দেবেন। নিয়মিত গোধূলি-মন পাঠাবেন। নতুন কথা এবং কবিতা পাঠিয়েছি। পেয়েছেন?

জহুর দরদী
৩১ই তোপখানা রোড, ঢাকা ২/বাংলাদেশ

Member—All India Small & Medium News Paper Association, Delhi.

GODHULI-MONE N. P. Regd. No. RN. 27214/75 March '87 (ফাল্গুন-চৈত্র '৯৩)
Vol. 29, No. 3 Postal Regd. No. Hys-14 Price—Rs. 2·00 only

সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পপুলার প্রিন্টার্স, বারাসত, চন্দননগর হইতে মুদ্রিত ও নতুনপাড়া, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।